CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

756.3 B004

সূচীপত্র

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অভিযাত্রী (গল্প—কিশোর জগৎ)—
ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী ২০, ২০২
অন্তরঙ্গ (কবিতা)—দিব্যেন্দু পালিত ১৪৭
অস্থির নদীর মতো (কবিতা)—নিশ্চার্ত গঙ্গোপাধ্যায় ২৩৮
অজন্তা (কবিতা)—বাণী মজুমদার ৭৪২
অরবিন্দ কাব্যে প্রেম (প্রবন্ধ)—
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭, ৩৪৮
অর্থাভাবে ছেলে (গল্প) —সন্দীপন ৮৬৪
অহংকারী রাজা (মালব দেশের উপকথা)—
শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী ৪৪৩
অর্থনীতির দু'চার কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু ৪৫৭
অতি চালাকের গলায় দড়ি (গল্প—কিশোর জগৎ)—
বর্ষকমল ভট্টাচার্য ৪৭৪
অমিল (গল্প)—শ্রীসুধীরঞ্জন গুপ্ত ... ৫৮২
অগ্নি (গল্প)—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ২৬৫
আর্য সংগীতে 'শ্রীরাগ' (প্রবন্ধ)—শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ ... ২৫
আহুতি (কবিতা)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ... ৭৪৯
আচরণ বিধান (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ১৫০, ২৮৫,
আমার যৌবন যিরে আরতি হ'ল না তব (কবিতা)—
অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৫৪
আনুষ্ঠানিক গান (প্রবন্ধ)—শ্রীঅমরেশ রায় ... ১৬৪
আশা করি তোমরা ভেবে দেখবে (প্রবন্ধ—কিশোর জগৎ)—
উপানন্দ ... ২০১
আধুনিক রন্ধন প্রণালী (মেয়েদের কথা)—
শ্রীমতী অনুরূপাদেবী ... ২১২
আমেরিকার একটি কৃষক পরিবারে কয়েকদিন (প্রবন্ধ)—
হিরণ্ময় গুপ্ত ৩৯৩
আলবেয়ার কামু ও আঁদ্রে জাইদ (আলোচনা)—
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪০১
আর কিছু নয় অম্বালিকা মোর (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোঃ ৮১০
আদর্শের রূপান্তর (মেয়েদের কথা)—আশালতা দেবী ৫৮০
আদর্শ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—সুদর্শন চক্রবর্তী ৫২৯
আহ্বানের ধারায় (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ... ৫২৮
উইল অব (উপন্যাস)—বনফুল ৬৪, ১৮৮, ৩১৫, ৪২৪, ৫০৪, ৬৮৪
উলের প্যাটার্ন (মেয়েদের কথা)—শ্রীহারাণী মিত্র ১১৪
উন্নত গায়ের কথা (আলোচনা)—বিজনলাল চট্টোপাধ্যায় ... ৩০৪
উদ্বোধন (কবিতা)—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৪৭৪
উপহার (গল্প—কিশোর জগৎ)—শ্রীআশালতা দেবী ৪৭১
এলওয়ালের মর্মবাণী (প্রবন্ধ)—
শ্রীশৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০
এক পথ (কবিতা)—শান্তশীল দাশ ১৬০
এক (গল্প)—সাকেথ রায় ১৭০
একটি ঘুমের কাহিনী (গল্প)—প্রদ্যুম্ন রায় ৩৭৪
একটি ঘটনা (অনুবাদ গল্প)—ওগুদাস মুখোপাধ্যায় ... ৪৭৪
এখনো তোমার নূপুরের ধ্বনি কানে যেন আসে মীরা (কবিতা)—
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ... ৬১৩
একটা অপ্রকাশিত গল্প (অনুবাদ গল্প)—
শ্যামলদাস সেনগুপ্ত
ফলহরের ছেলে (স্মরণ কাহিনী)—
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ২১, ১৬৮, ৩২৫, ৪৮৬, ৫৭৭, ৭১৩
কবিসঙ্গ (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ২৮২
কবিকঙ্কণে বৈজবাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৩২১
কথা-সংগীত । কথা ও সুর : মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য
স্বরলিপি : কল্যাণী দেবী
কল্পনার সিদ্ধার্থ (কাহিনী)—রমেন গুপ্ত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রবন্ধ)—শ্রীনবকিশোর ঘোষ
কলিকাতায় বাহ্য আয়মদানী (প্রবন্ধ)—কালীচরণ ঘোষ
কার হয় মৃত্যু (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
কাঠবুড়ো (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
নগেন্দ্রকুমার মিত্র বসুমদার ৯৪

কাকী (গল্প)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... ১০২
কাড়াকাড়ি (কবিতা)—অনিল ভট্টাচার্য ২৪০
কুড়ুনী (কবিতা)—শ্রীসতী সেনগুপ্ত ৭২৮
কাঁই খাই (কবিতা)—পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৯৬
খেলা-ধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ১২৬, ২৪১, ৩০১, ৪০৯, ৬৩৭, ৭৬৫
গড়গড়া গাড়ুলীর গল্প (গল্প—কিশোর জগৎ)—
বীরু চট্টোপাধ্যায় ৩৩৮
গড়াতু হলেও (কবিতা)—শ্রীউমাপদ নাথ ৮৮১
গান। কথা : শ্রীসোমেন চট্টোপাধ্যায়
সুর ও স্বরলিপি : শ্রীবিজেন চট্টোপাধ্যায় ১৮৫
গিরি অবলা (কবিতা)—কণপ্রভা ভাদুড়ী ৫১৬
গোলাপ হতে উটুক ফুটে (আলোচনা)—সন্তোষকুমার দে ... ৫০৪
গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)—রাধেশ্যাম রাসগুপ্ত ৫১২
গ্রামউন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র (আলোচনা)—
শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৩২
চৌপদী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ১৪০
চক্ষু-চতুর্বিধ কবি মোহিতলাল (প্রবন্ধ)—
প্রমথনাথ রায় ৬০১
চিরবাসা (উপন্যাস)—সরোজ বসু ৮৪, ২২৮, ৩৩৭, ৪২০, ৭২৯
জাগরণী গান (কবিতা)—উমাপদ নাথ ... ৫২
জীবে প্রেম (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ৪৬৫
জ্যোতিষী (গল্প—কিশোর জগৎ)—শ্রীহরিপদ ভট্ট ২০৫
টোটকা টুটকী (মেয়েদের কথা)—
শ্রীমতী ইরা ভট্টাচার্য ১১৪
তপস্যা (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ৬৫৫
তারপর আজো (কবিতা)—বিবেকানু পালিত ৬৮৯
তোমরা আর নাগর পারের ছেলেমেয়েরা (কিশোর জগৎ)—
উপানন্দ ... ২০৫
তিন সিঁড়ি (গল্প)—অর্পণ সেন ... ৫৭
তিকতি লোক সংগীত (কবিতা)—জীবনকৃষ্ণ রায় ... ১০০
দাঁত রায় (কবিতা)—হরেন্দ্রনাথ মল্লিক ... ৪০০
দিল্লীতে কুতুবমিনারের প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—
শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ... ২৪০
দিবাস্বপ্ন (কবিতা)—নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৬৪৪
দুই বন্ধু (অনুবাদ গল্প)—শ্রীকানু রায় ৩৪
দুই রব (কবিতা)—বিনায়ক সান্যাল ৩০
দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি (প্রবন্ধ)—শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ১৮৭
দুর্বল দুপুর (গল্প)—শ্রীসুলভ চট্টোপাধ্যায় ২৯৭
দেবভূমি যাদুরাজ্যে (প্রবন্ধ)—অজিতকুমার ঘোষ ১৪৫
দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ও কৃষির শিল্প (প্রবন্ধ)—
শ্রীভবানীপ্রসাদ রাসগুপ্ত ৩০৫
নবরত্ন (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ... ৪৪৯
নদী (কবিতা)—শ্রীবাণীকুমার ঘোষ ... ১৬৩
নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী ২৪৬, ৩৩৭, ৫১২, ৬৬০, ৭৪৮
নারদ স্মৃতি (প্রবন্ধ)—শ্রীমা ... ৭৪২
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (আলোচনা)—
শ্রীঅনিলচন্দ্র চৌধুরী
নীলোৎপল (প্রবন্ধ)—অমিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়
নূতন আলো (কবিতা)—
শ্রীভবানীপ্রসাদ রাসগুপ্ত ... ৬২৯
পট ও পীঠ—শ্রী'শ' ১২০, ৩৭২, ৪০৩, ৬৩৩, ৭৬৩
পরিকল্পনা ও আবাদের দেশ (প্রবন্ধ)—
শ্রীভবানীপ্রসাদ রাসগুপ্ত ৮৭৯
পাহাড় (কবিতা—কিশোর জগৎ)—কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী ২০৪
পুরস্কার (গল্প)—শ্রীপ্রভা দত্ত ৪১৮
পূর্ব পরিচয় (গল্প)—অশোককুমার মিত্র ২৩৭
পৌষ (জীবনী)—অনুরূপা দেবী ৮৬২
প্রতিবেশিনী (প্রবন্ধ)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ৬৪৩
প্রতিধ্বনি (কিশোর জগৎ)—অশোক মুখোপাধ্যায় ৪৪৬
প্রতিশোধ (অনুবাদ গল্প)—শ্রীকানু রায় ৭২০
প্রাচীন ভারতের প্রজনীতি (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমলচন্দ্র মুখু ১০৬
ফ্রাঙ্কেনস্টিনের কথা (কিশোর জগৎ)—উপানন্দ ৩৩৭
বান্ধব (কবিতা—কিশোর জগৎ)—
শ্রীসমুখ রাসগুপ্ত ... ৩৪৩
বাসন্ত (কবিতা)—শ্রীমৈত্রেয়লতা দেবী ... ১৬০
বন্ধু (নাটিকা) প্রমথ চৌধুরী ১৩২, ২৭০
বর্তমান দুর্বিনা ও যুদ্ধের অনিবার্যতা (আলোচনা)—
শ্রীভবানীপ্রসাদ রাসগুপ্ত ... ১৪৫
বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী প্রচারধর্মী ও শিল্পধর্মী কি না (প্রবন্ধ)—
শ্রীমতুলা মিত্র ... ৩৪৩
বঙ্গদেশের (ও ভাষার) বৈদিক বা আর্য ইতিহাস (প্রবন্ধ)
শ্রীরমাপ্রসাদ মজুমদার ৫২৫, ৭৭৬
বাবার তলার গল্প (গল্প)—বিমল মিত্র ৪৪৭
বাংলা সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা (প্রবন্ধ)—সতীরঞ্জন রায় ... ১৫
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮, ২৩৫, ৭৮১, ৪৩১, ৪৪৬, ৭০০
বাগদি রাজা (গল্প—কিশোর জগৎ)—
অশোককুমার গুপ্ত ৩৪০
বিড়লার মন্দির মিরা (কবিতা)—শ্রীসুধাংশুরঞ্জন মল্লিক ... ৫২৩
বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস (প্রবন্ধ)—সুকুমাররঞ্জন দত্ত ... ১৭
বিষনিমুক (গল্প)—দেবাচার্য ১৬১

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন (আত্মকথা)—
শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৭৭
বিষ্টি (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন মল্লিক ২৪৪
বুদ্ধ পূর্ণিমাতে (কবিতা)—শ্রীমধুর দাশগুপ্ত ৭০৭
বেদ ও পুরাণের সমকালিকতা ও যাথার্থ্য (প্রবন্ধ)—
শ্রীরমাপ্রসাদ মজুমদার ১৩
বেদ ও উপনিষদ (প্রবন্ধ)—শ্রীকালীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৮৫
বেদ সম্বন্ধে দার্শনিক মত (প্রবন্ধ)—শ্রীঅরবিন্দ ৫১৩
ব্যস্ত বসন্ত (অনুবাদ গল্প)—গোপাল হালদার ২০৯
বৈদেশিকী—অতুলচন্দ্র ৮০, ২৩৪, ৩৮১, ৪৮৩, ৬১৭, ৭৩১
বৈজ্ঞানিক (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ১৭১
ভগ্ন-পুতুল (উপন্যাস)—
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১১৪, ৩৬১, ৫০৬, ৬৩০,
ভ্যাম্পিয়ার (গল্প-কিশোর জগৎ)—স্নেহকণা বসু ৪৭৯
ভারতীয় দর্শন (প্রবন্ধ)—তারকচন্দ্র রায় ৯, ১৪৭, ৪১৬, ৮৫০
ভারতের প্রথম কার্টুনিষ্ট গগনেন্দ্রনাথ (আলোচনা)—
চণ্ডী লাহিড়ী
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য-দর্শনের চিন্তাধারা (প্রবন্ধ)—
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৪৭
ভারতে শিল্পের জাতীয়করণ (প্রবন্ধ)—
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৪
ভারতীয় সংস্কৃতি ও কবিশেখর (আলোচনা)—
শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪৩০, ৩৮৫
ভুলি নাই ভগবান (কবিতা)—আশুতোষ সান্যাল ৪১৭
ভ্রষ্টলগ্ন (কবিতা)—সুনীল বসু ৪২০
মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া (কবিতা ও ব্যাখ্যা)—
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী ১৪
মরা রূপকথা (কবিতা)—দিলীপ দাশগুপ্ত ২৩৭
মহারাজা নন্দকুমারের লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন (প্রবন্ধ)—
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু ২৩৫
মরু ঝড় (গল্প)—নৃপেন সরকার ৭৮
মাণ্ডুক্য উপনিষদ (প্রবন্ধ)—শ্রীনলিনীকান্ত সেন ২৩৮
মায়ের টান (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ৪৪৩
মাতুলী (গল্প-কিশোর জগৎ)—শ্রীসুধীরকুমার রায় ৯৪
মায়াদীপ (গল্প)—শ্রীসরোজকুমার বসু ৭০৮
মাছ শিকারী (কবিতা)—শ ক চ ৭১২
মেয়েটি (কবিতা)—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৪২০
মৃত্যু (গল্প)—দিব্যেন্দু পালিত ৪৪৮
মুক্তোত্তর জাপান (প্রবন্ধ)—অমলকুমার ঘোষ ... ৪১১
রবীন্দ্র কাব্যে ভগবদ্ভক্তি (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ১
রঙ (গল্প)—সরোজ রায়চৌধুরী ৬৩৭
রবীন্দ্রনাথের প্রেম সৌন্দর্যে চিত্রা ও জীবন দেবতা (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র বসু ... ৬২
রাত জাগা (কবিতা)—রাণা দেবী ... ৫১৯
রাত্রির আকাশ (কবিতা)—সন্তোষকুমার অধিকারী ৩
রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশন ও নয়া বীমা পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)—
শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
রাজা যায় পেছন, রাজা দীর্ঘজীবী হোন (অনুবাদ গল্প)—
শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৬৫
রাখালী গান (প্রবন্ধ)—শ্রীজগদেব রায় ৪৯১
রান্নাঘরের কথা (মেয়েদের কথা)—শ্রীঅনুজবালা দেবী ৬১৪
রিক্ত (কবিতা)—শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩৯
রিক্ত দিনের (কবিতা)—সন্তোষকুমার অধিকারী ২৩৩
রিপোর্টারের ডায়েরী—চৈতন্য— ২৮, ৩৩০, ৪২১, ৫৪১
লাট্টু বান্দরা (মেয়েদের কথা)—শ্রীমতী রাখী চক্রবর্তী ... ৪৮২
লীলা ভূমি (উপন্যাস)—
হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১২৩, ২১৪, ৩৩৫, ৪২৯, ৫২০, ৭৪৩
লুকোচুরি (কবিতা)—শ্রীবরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৪৯
লোকুর কমিটি ও উপকূল পথে পণ্য যানান্তর (প্রবন্ধ)—
শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
শরৎচন্দ্র প্রতি (কবিতা)—দুর্গাদাস গোস্বামী
শরীর চর্চা শিক্ষা পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)—
কবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শরণার্থী সমস্যার জাতীয় গুরুত্ব (প্রবন্ধ)—
ভাবসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৮
শাশ্বতিক (গল্প)—দুর্গাদাস ভট্ট ৪
শান্তিনিকেতন (কবিতা)—শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায় ৪৬৮
শাশ্বত শ্মশান (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ৪৪০
শিশুপালন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (মেয়েদের কথা)—
মীরা দাস ১১০
শিশু শিল্পী (কবিতা-কিশোর জগৎ)—প্রফুল্লকুমার বসু ২০৮
শিশুপাঠ্য সাহিত্যের স্বরূপ (প্রবন্ধ)—শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ... ২৭৭
শেষ পথ (কবিতা)—শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৪
শ্রীশ্রীসৌরীমাতা শতবার্ষিকী জয়ন্তী (প্রবন্ধ)—
উপানন্দ
শ্রীশঙ্করাচার্য ও ভক্তি (প্রবন্ধ)—
শ্রীরঘুনাথ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ৬৩
ষড়পদী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ১৯৪
ষ্টীম ইঞ্জিন (গল্প-কিশোর জগৎ)—শ্রীসত্যগোপাল পাল ... ৫৭৫
সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস (আলোচনা)—
মন্দাক্রান্তা রায়চৌধুরী ... ২৪
সংশয় (অনুবাদ কবিতা)—সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭২৫

সংগ্রহ (কিশোর জগৎ)—উপসংহার ৮৯
সংগৃহীত কথা—শ্রীপ্রমোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর ও স্বরলিপি। শ্রীরঞ্জিৎ রায় ... ৫৫
সব মানুষের দুঃখকে আমি বহন করে চলেছি। (অনুবাদ কবিতা)—
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০৮
সমাজ জীবনে বাঙালী নারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব (প্রবন্ধ—মেয়েদের কথা)—
উমা বিশ্বাস ... ৮৭৬
সহচরী (কবিতা)—পুলক মাচা ১০০
সহজ ধর্ম (প্রবন্ধ)—ডাঃ বিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায় ১২৯
সমাজ সংস্কারক ছবেশ (আলোচনা)—
শ্রীশান্তকুমার মজুমদার ২৯১
সাময়িকী— ৬৮, ২১৮, ৩৫২, ৪৯৯, ৬২৫, ৭৪৮
সাহিত্য সংবাদ— ১২৮, ২৫০, ৩৮৪, ৫১১, ৬৪০, ৭৬৭
সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী ... ৭২৬
সার্থক প্রেম (কবিতা)—শ্রীঅজয়কুমার ২৯৭
সাংবাদিকতার সূচনা (স্মৃতিকথা)—
শ্রীদীনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩১১
সাহিত্য সাধক অমরেন্দ্রনাথ রায় (প্রবন্ধ)—
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত ৭১৯
সামান্য একটী খবর (গল্প)—সুভাষ সমাজদার ৯৮৮
সুন্দর মনের পরিচয় (প্রবন্ধ ভারিণী)—
পরিমল রায়চক্রবর্তী ৭১, ১৮০, ৩০৫, ৮৩৯, ৫৩৩, ৭৫০
সুন্দর মনের রাখি (কবিতা)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ৩১৫
সে এক পৃথিবী ছিল (কবিতা)—বীরেন্দ্র মৈত্র ৫৬৬
সোনপুর মহাবিষুব (প্রবন্ধ)—শ্রীঅপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭
সৌখীনতাদুরস্তনে মেয়েরা (মেয়েদের কথা)—
শ্রীসুলোচনা দত্ত ৮৮১
স্মৃতি (কবিতা)—সুরেশ বিশ্বাস ... ৩৮৮
স্মৃতি (অনুবাদ কবিতা)—শ্রীঅমিতাভ গতি ২১১
স্মৃতির পাহারা (কবিতা)—প্রবীণ বাগচী ৫৬
স্বাস্থ্য সাধনা (প্রবন্ধ)—শ্রীনীহার সরকার ৩০১
স্বীকার (কবিতা)—অরুণকুমার হাজরা ৭৩৭
হাসে অন্তরে জ্যোতি ঐ (কবিতা)—
শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য ৬৩৪
হাতের কাজ (বয়ন)—রানী চট্টোপাধ্যায় ২১৬
হেমন্ত (কবিতা)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৪

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ ১৩৬৪—বহুবর্ণ চিত্র—'রসকেলী'—দ্বিবর্ণ চিত্র—'কান্না ও হাসা' এবং একরঙা চিত্র ১৩ খানি

মাঘ —'প্রথম পরিচয়'—দ্বিবর্ণ চিত্র—'ভালোবাসা ও ঘনকাটা' এবং একরঙা চিত্র ৭ খানি

ফাল্গুন —'শেষ বিদায়'—দ্বিবর্ণ চিত্র—'রাতের প্রহরী ও ছুটবো ঘর' এবং একরঙা চিত্র ৫ খানি

চৈত্র —'বিস্মৃতিরা'—দ্বিবর্ণ চিত্র—'সাগর জলে সিনান করি ও স্থির' এবং একরঙা চিত্র ১০ খানি

বৈশাখ ১৩৬৫ —'তপস্বিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা'—দ্বিবর্ণ চিত্র—স্বরের কাজে ও রাঙের কাজে এবং একরঙা চিত্র ১১ খানি

জ্যৈষ্ঠ —"কাজের ফাঁকে—দ্বিবর্ণ চিত্র—পাহাড়ী মেয়ে ও পাহাড়ী মেয়ে এবং একরঙা ছবি ৫ খানি

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্বক ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি. পি.তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক লাগিবে।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

পৌষ—১৩৬৪

লেখ-সূচী

১। রবীন্দ্রকাব্যে ভগবদ্ভক্তি (প্রবন্ধ)
শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১

২। রাত্রির আকাশ (কবিতা)
সন্তোষকুমার অধিকারী ৩

৩। শাশ্বতিক (গল্প) দুর্গাদাস ভট্ট ৪

৪। ভারতীয় দর্শন (প্রবন্ধ) তারকচন্দ্র রায় ... ৯

৫। বাংলা সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা (প্রবন্ধ)
সতীরঞ্জন রায় ... ১২

৬। বেদ ও পুরাণের সমকালিকতা ও সাধর্ম্য (প্রবন্ধ)
শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার ১৩

চিত্র-সূচী

১। ওলমার্গের পথে, ২। ওলমার্গ, ৩। তুষারাবৃত গিরিপথ, ৪। খিলানমার্গ, ৫। ২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের বিজয়া সম্মেলন, ৬। জাতীয় বধির সম্মেলন, ৭। বসিরহাটের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, ৮। বসিরহাটে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জী প্রভৃতি, ৯। শ্রমদান, ১০। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'র অংশবিশেষ অবলম্বনে শ্রীমতী পিকচার্সের নির্মিয়মান চিত্র 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত'র একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার, ১১। 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীকান্তের ক[illegible] সজ্জায় উত্তমকুমার, ১২। অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের

লেখ-সূচী

৭। মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া (কবিতা ও রাধা)
লেখক : শ্রীহরিবিমল চৌধুরী ১৫
৮। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস (প্রবন্ধ)
শ্রীসুকুমাররঞ্জন দত্ত ১৭
৯। দুই মন (কবিতা) শ্রীবিনয়কে সান্যাল ... ২০
১০। কদম্বনের মেঘে (ভ্রমণ কাহিনী)
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ২১
সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস (আলোচনা)
মনোক্রান্তা রায়চৌধুরী ২৪
১২। আধুনিক সংগীতে শ্রীরাগ (প্রবন্ধ)
শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ ২৪
১৩। রিপোর্টারের ডায়েরী—শ্রীচৈতন্য ২৮
১৫। প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র (আলোচনা)
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২
ভিক্ষা (কবিতা)
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৪

চিত্র-সূচী

প্রচ্ছদপটে 'কদম্বী চাষ' চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্যে আশিষকুমার ও তৎপতি ঘোষ, ১৩। কুমারী ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষ্টুডিয়ো পানের একটি দৃশ্য।

বহুবর্ণ চিত্র—জলকেলি

বিশেষ চিত্র—কান্না ও হাসা

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

জ্যোতিষসম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

এম-আর এ-এস (লণ্ডন), বিশ্ব ভারত গণিত ও ফলিত সভার সভাপতি এবং ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রশ্নের এবং অঙ্গুষ্ঠ ও চিবুক প্রভৃতির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ওষধাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ঘটনার প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে ইনি দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিস্তৃত বিবরণ ও আশ্চর্য্যজনক বিষয়গুলো পাইবেন।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েক পক্ষীক্ষিত কবচের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা

ধনদা কবচ—ধারণে দরিদ্রের দারিদ্র্য বিনাশ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (ওজোড়)। সাধারণ—৭৸০, পক্ষিশালী মূল্য—১১৸০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৸৷৶০, (সর্ব্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ করা)। সরস্বতী কবচ—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৸০/০, মূল্য—৩৸০। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী পুরুষ বশীভূত এবং চিরসঙ্গিনী ভিন্ন হয় ১১৸০, মূল্য—৩৸০, মহাশক্তিশালী ৩০৸৶০ বগলামুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত অর্থোন্নতি, উপস্থিত প্রতিবন্ধক নষ্ট ও সর্ব্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯/০, মূল্য পক্ষিশালী—৩৫/০, মহাশক্তিশালী—১৮৸০ (আমাদের এই কবচ ধারণে আদালত সম্যাসী জয়ী হইয়াছেন)। মৃত্যুঞ্জয় কবচ—সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য, অপমৃত্যু, ভূত, প্রেত, পিশাচ হইতে রক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র ৭/০, মূল্য—১৩/০, মহাশক্তিশালী—৩৩/০। (ভি: পি: করা হয় না।)

জ্যোতিষসম্রাট প্রণীত "কন্যা মাসে ফলশ্রুতি"—কোন্ মাসে কন্যা হইলে কিরূপ ভাগ্য, স্বামী, বিবাহ, পুত্র, ধন, স্বভাব গতি, স্বভাব এবং প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। ৸০। বিবাহ রহস্য ২৲ ধনদার বচন ২৲ জ্যোতিষ শিক্ষা ৩৷৹

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) (রেজিঃ)

হেড অফিস ও পণ্ডিতজীর নিজবাটী ৩০।১, বর্ষতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তরদিকস্থ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৯০। সাক্ষাতের সময়—বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা। ফোন ২৩—৩৩৩০। ব্রাঞ্চ ১০৩, গ্রে ষ্ট্রীট, "ধনদা নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৭৬৬৪। সময় প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা। সেণ্ট্রাল ব্রাঞ্চ অফিস—৩৩, বর্ষতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯০।

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

মাঘ—১৩৬৪

লেখ-সূচী

১। সহজ ধর্ম (প্রবন্ধ)
ডাঃ বিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায় ১২৯
২। বন্ধু (নাটিকা) প্রশান্ত চৌধুরী ১৩২
৩। এলওয়ালের মর্মবাণী (প্রবন্ধ)
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০
৪। দেবভূমি খাজুরাহো (প্রবন্ধ)
অজিতকুমার ঘোষ ১৪৪
৫। আচরণ বিভ্রম (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ১৫০
৬। আমার যৌবন দিয়ে আরতি ক'রে না তব (কবিতা)
শ্রী অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৫৪

চিত্র-সূচী

১। শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ ও আদিনাথ মন্দির, ২। চিত্রগুপ্ত মন্দিরের প্রাচীর চিত্র, ৩। প্রসাধনরতা নারী—পার্শ্বনাথ মন্দিরের চিত্র, ৪। হুগলী জেলা সাংবাদিক সম্মেলন, ৫। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার গ্রহণ করছেন, ৬। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মুদ্রণ প্রদর্শনী নিরীক্ষণ করছেন, ৭। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুদ্রণ শিল্পের প্রদর্শনীর একাংশ।

লেখ-সূচী

৭। বর্ত্তমানে দুনিয়া ও দুঃখের অনিবার্য্যতা (আলোচনা)
শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহাগুপ্ত ১৫৫
ভারতীয় দর্শন (প্রবন্ধ)
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ১৫৭
৯। এক পথ (কবিতা)
শান্তশীল দাশ ১৬০
১০। বসন্ত (কবিতা)
শ্রীমুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী ১৬০
১১। বিশ্বনিন্দুক (গল্প)
দেবাচার্য্য ১৬১
১২। আন্তর্জ্জাতিক গান (প্রবন্ধ)
শ্রীঅজয়ের রায় ১৬৪
১৩। প্রাচীন ভারতের প্রমনীতি (প্রবন্ধ)
শ্রীনিমলচন্দ্র কুণ্ডু ১৬৬
১৪। অন্তরে (কবিতা)
দিবেন্দু পালিত ১৬৭

চিত্র-সূচী

একবর্ণ চিত্র—
প্রথম পরিচয়
বিশেষ চিত্র—
ভালবাসা ও ধান কাটা

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৬৪

লেখ-সূচী

১। অরবিন্দ-কাব্যে প্রেম (প্রবন্ধ)
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৭

২। অগ্নি (গল্প)
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬৫

৩। মরা-রূপকথা (কবিতা)
দিলীপ দাশগুপ্ত ২৬৭

৪। মাণ্ডুক্য উপনিষদ (প্রবন্ধ)
শ্রীনলিনীকান্ত সেন ২৬৮

চিত্র-সূচী

১। বিভিন্ন প্রকার শক্তিপূর্ণ কৌশল আবিষ্কার ও অভিনব ক্রীড়া প্রদর্শক—লেখক, ২। লেখকের বালকপুত্র, ৩। শিকার, ৪। হাওড়া "নৃত্যমে"র সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মণিপুরী নৃত্যের একটি দৃশ্য, ৫। শচীন দেব বর্মণের সম্বর্ধনা সভায় গৃহীত চিত্র।

লেখ-সূচী

৭। বন্ধু (নাটিকা) প্রশান্ত চৌধুরী
৮। শিশুপাঠ্য-সাহিত্যের স্বরূপ (প্রবন্ধ)
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৮১
৮। আচরণ বিভ্রম (প্রবন্ধ)
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ২৮৪
৯। সমাজ সংস্কারক রমেশ (আলোচনা)
শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল
১০। কবি-সঙ্ঘ (আলোচনা)
অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৯২
ভারতে শিল্পের জাতীয়করণ (প্রবন্ধ)
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৭

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র—
শেষ মিনতি
বিশেষ চিত্র—
রাতের প্রহরী ও কুকুরের স্বপ্ন
কার্টুন—শিল্পিচের ভবিষ্যৎ

শ্রীরামপুরের এস.চক্রবর্তীর
হসপিটাল সোপের
XX
নস্য
সোল এজেন্ট
লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-৭

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
— ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি বই —
কপালকুণ্ডলা
মূলগ্রন্থ, ১১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী কপালকুণ্ডলা পরিচিতি, ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দটীকা ও টিপ্পনী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ সুলভ্য প্রামাণ্য সংস্করণ।
দাম—২-৫০
রাধারাণী
বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনাসহ নূতন সংস্করণ। উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। দাম—এক টাকা
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বি-এ পাঠরত ছাত্রগণের অপূর্ব সুযোগ।
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী
প্রণীত
কৃষ্ণকান্তের উইলের
সমালোচনা
বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গ্রন্থের টীকা, টিপ্পনী, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ।
বিষয়সূচী—কৃষ্ণকান্তের উইলের নামকরণ—সমসাময়িক সমাজ—প্রধান ও অপ্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্র—কৃষ্ণকান্তের উইলে মনস্তত্ত্ব—অভিমান—বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন—কৃষ্ণকান্তের উইলে ব্যঙ্গচিত্র ও উহার ভাষা।
ইহা ব্যতীত আরও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা।
পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৮৮।
দাম—দুই টাকা
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

চৈত্র—১৩৬৪

লেখ-সূচী

১। বেদ ও উপনিষদ্ (প্রবন্ধ)
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৮৫
২। সামান্য একটা খবর (গল্প)
সুভাষ সমাজদার ৩৮৮
৩। আমেরিকার একটি কৃষক পরিবারে কয়েকদিন (প্রবন্ধ)
হিরণ্ময় গুপ্ত ৩৯৩
৪। ছিন্নবাধা (উপন্যাস)—সমরেশ বসু ৩৯৭
৫। দাশু রায় (কবিতা)
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ... ৪০০

চিত্র-সূচী

১। তারাচরণ মুখোপাধ্যায়, ২। অভিযান, ৩। প্যাগোর্ড, ৪। কাশ্মীর সেক্রেটারিয়েটে আমাদের শিকার, ৫। সম্রাট কণিষ্ক, ৬। নাগার্জুন—তাঁরি সাম্প্রতিক গুহায় রক্ষিত আলেখ্যের প্রতিলিপি, ৭। হরষের দুঃখ—পর্বতের চেয়ে ছায়া মনোহর, ৮। হরষের দুঃখের বাগানে ফলবাধ ট্রাউটের চাষ, ৯। নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—অগ্রগামী পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' চিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণা।

লেখ-সূচী

৬। আলবেয়ার কামু ও আঁদ্রে জাইড (আলোচনা)
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪০১

৭। ছন্দ-চতুর্ভঙ্গীর কবি মোহিতলাল (প্রবন্ধ)
প্রশান্তকুমার রায় ... ৪০৪

৮। সাহিত্য-সাধক অমরেন্দ্রনাথ রায় (প্রবন্ধ)
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত ৪০৯

৯। আর কিছু নয় অনামিকা মোর (কবিতা)
শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ৪১০

১০। যুক্তোত্তর জাপান (প্রবন্ধ)
অমলকুমার ঘোষ ৪১১

১১। গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)
রাজেশ্বর দাশগুপ্ত ৪১২

১২। তুলি নাই তোমা ভগবান (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৪১৭

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র—

বিষ্ণুপ্রিয়া

বিশেষ চিত্র—

'সাগর জলে সিনান করি—' ও 'স্থির'

শ্রীরামপুরের এস.চক্রবর্তীর
রয়্যাল গোল্ডেন XX নস্য
সোল এজেন্ট
লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১, ষ্ট্রাণ্ড রোড • কলিকাতা-৭

রেডিও একটি অপরিহার্য জিনিষ। বেতারে খুবর ও গানের আনন্দের জন্য প্রতি সহরে ও গ্রামে "বিশ্ব বিখ্যাত কুকুর" রেডিওগুলি পরিচিত।
মডেল ৫২৬৬-এ সি, অথবা এ.সি, ডেসের জন্য ও ব্যাটারি ও প্রবেশযোগ্য, সুইফট আলোকোজ্জ্বল স্কেল, ১০" স্পীকার ও অকল্পনীয় আধুনিক ক্যাবিনেট, মূল্য ৫২৫৲ নেট।
এ সি. ও ডুাই ব্যাটারি সেটও পাওয়া যায়।
"His Master's Voice"
OVER 50 YEARS SOUND EXPERIENCE IN INDIA
BUY FROM AUTHORISED H.M.V. RADIO DEALERS ONLY

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৬৫

লেখ-সূচী

১। বেদ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক মত (প্রবন্ধ)
শ্রীঅরবিন্দ ৫১৩

২। রাত-জাগা (কবিতা)—আশা দেবী ৫১৯

৩। লীলাভূমি (উপন্যাস)
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫২০

৪। বিড়লার মন্দির, দিল্লী (কবিতা)
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৫২৩

৫। আদর্শপুরুষ রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
সুদর্শন চক্রবর্তী ৫২৪

চিত্র-সূচী

১। শালামার, ২। শালামার—অন্তরিক, ৩। নিশান্ত—প্রবেশ পথ, ৪। চলমাশাড়ি, ৫। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬। কাশীরাম দাসের জন্মভিটা, ৭। কাশীরাম দাসের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও স্মৃতিরক্ষা কমিটির কোষাধ্যক্ষ ভ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার, ৮। শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসবের দৃশ্য, ৯। শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ১০। 'কলকাঁচান' চিত্রের একটি দৃশ্যে নবাগতা দীপিকা দাস, ১১। শ্রীশচীনদেব বর্মন।

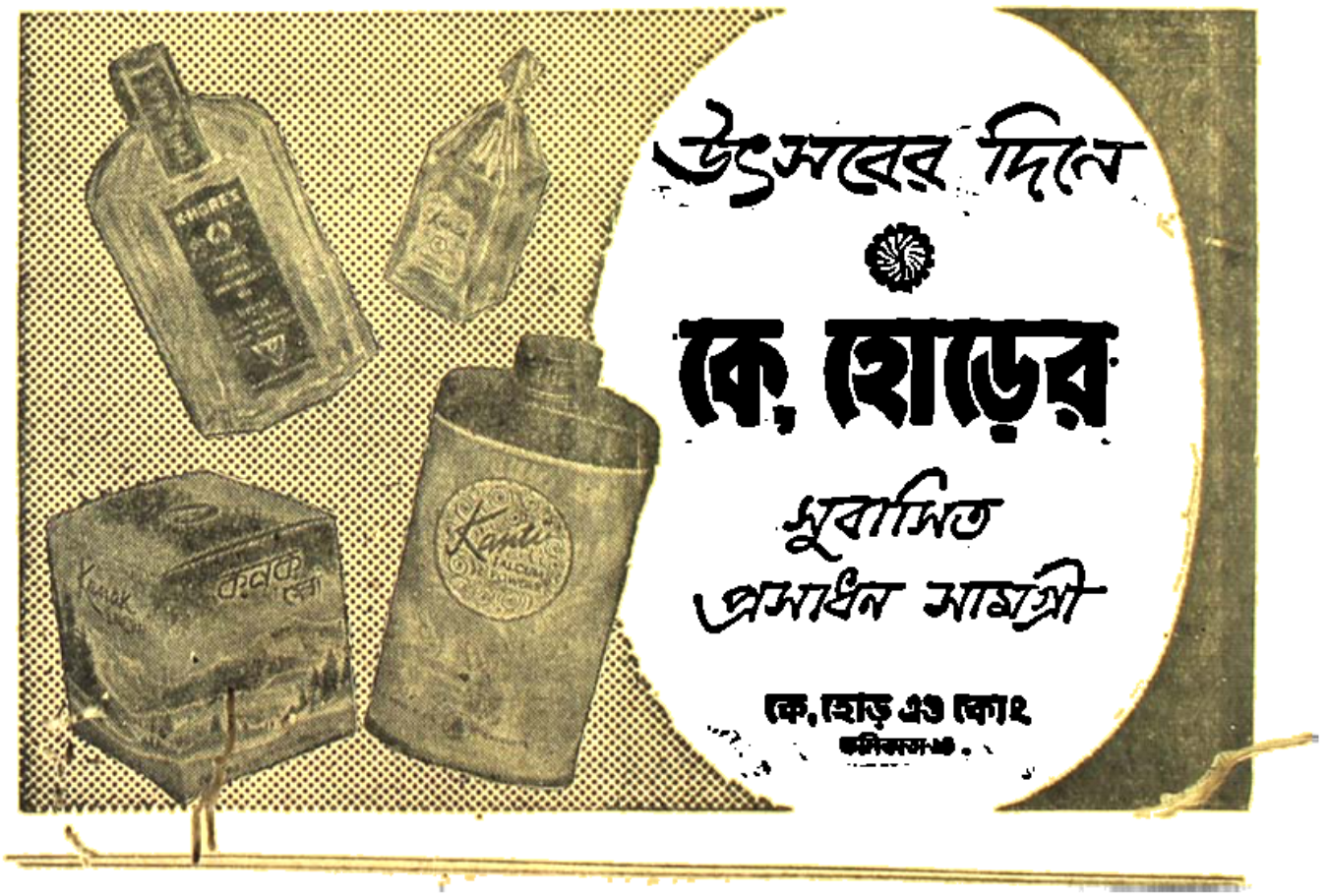

লেখ-সূচী

৬। [illegible]রের ছায়ায় (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ৫২৮
৭। ভারতীয় সংস্কৃতি ও কবিশেখর (আলোচনা)
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... ৫৩০
৮। উদয় অস্ত (উপন্যাস)—বনফুল ৫৩৪
৯। সুন্দর বনের গহনে (ভ্রমণ কাহিনী)
শক্তিপদ রাজগুরু ৫৩৯
১০। মায়ের টান (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত ৫৭৩
১১। কথা ও সুর : মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য
স্বরলিপি : কল্যাণী দেবী ৫৪৪
১২। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৪৬
১৩। শাশ্বত সন্ধান (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত ৫৫০
১৪। রিপোর্টারের ডায়েরী—চৈতন্য ... ৫৫১

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র—
তপস্বিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা
বিশেষ চিত্র—
ঘরের কাজে ও মাঠের কাজে

শ্রীরামপুরের এস. চক্রবর্তীর
হসপিটাল সোপের XX নম্বর
সোল এজেন্ট
লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১, স্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-৭ [illegible]

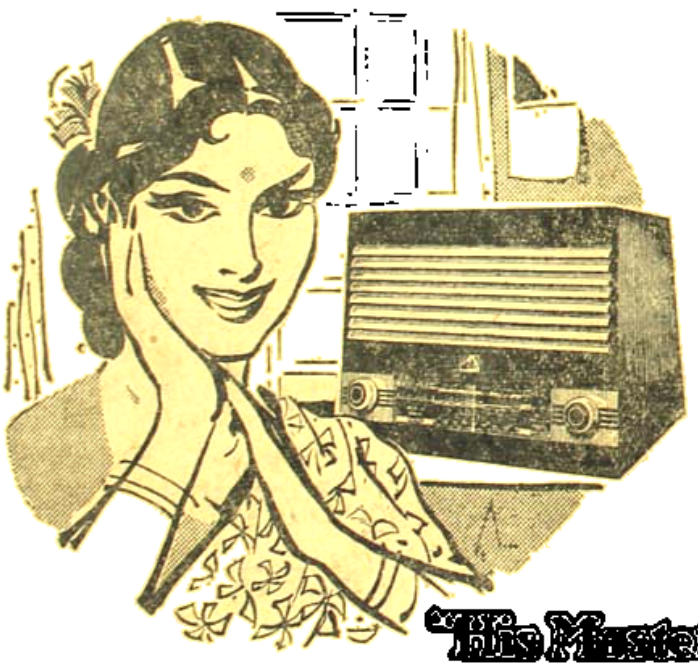

A Proud Possession

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেডিওগুলি ইষ্ট আবহের, কেবল, এগুলি সুন্দর, নির্ভরযোগ্য, উন্নত কারুকার্যযুক্ত এবং নিখুঁতভাবে সম্পন্ন।

মডেল ৫২৬৬—এ. সি. অথবা ডি. সি. মেনের জন্য ৫ ভাল্ব, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, 'সুইচিং—আলোকোজ্জ্বল স্কেল, ১০" মাইক্রো স্পীকার ও সুন্দরভাবে আধুনিক ক্যাবিনেট, মূল্য—৩২৫৲ নেট।

এ. সি. ও ড্রাই-ব্যাটারী সেটও পাওয়া যায়।

"His Master's Voice"
OVER 50 YEARS SOUND EXPERIENCE IN INDIA
BUT FROM AUTHORISED H.M.V. RADIO DEALERS ONLY

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৫

লেখ-সূচী

১। বৈজ্ঞানিক (প্রবন্ধ)
শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৬৪১

২। দিনান্তে (কবিতা)
বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ৬৪৪

৩। তমসা (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ... ৬৪৫

৪। ভারতীয় দর্শন (প্রবন্ধ)
তারকচন্দ্র রায় ৬৫০

৫। প্রতিবেশিনী (প্রবন্ধ)
জ্যোতির্ময়ী দেবী ... ৬৫৩

চিত্র-সূচী

১। সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী, ২। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। শ্রীসমরেশ বসু, ৪। "তানসেন"-এর একটি দৃশ্যে তানসেন রূপে অসীমকুমার ও রাণী মৃগনয়নী রূপে কত্থা রায়।

লেখ-সূচী

৬।	অনুকরণ-কাব্যে প্রেম (প্রবন্ধ)	
	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫৮
৭।	পেরু (চীবনী)—অনুরূপা দেবী	৬৬২
৮।	হল অলায় জয়ী ঐ (কবিতা)	
	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য	৬৬৪
৯।	অশ্বত্থামার ছেলে (গল্প)	
	সঙ্কলন	৬৬৫
১০।	পরিকল্পনা ও আমাদের দেশ (প্রবন্ধ)	
	শ্রীভবানীপ্রসাদ মজুমদার	
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রবন্ধ)	
	শ্রীমনকিশোর ঘোষ	৬৮০
১২।	গতাসু হলেও (কবিতা)	
	শ্রীউমাপদ নাথ	৬৮৪

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র—	
কাজের ডাকে	
বিশেষ চিত্র—	
পাহাড়ী দেশ ও পাহাড়ী মেয়ে	

শ্রীরামপুরের এস.চক্রবর্ত্তীর স্পেশাল গোল্ডেন XX নস্য

সোল এজেন্ট

লক্ষ্মী এজেন্সী

৪৩/১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-৭

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

— জ্যোতিষ গ্রন্থরাজি —

বিবাহে জ্যোতিষ

বিবাহই গার্হস্থ্য জীবনের মূল ভিত্তি। এই বিবাহ যদি সফল ও সার্থক না হয়—তবে সমাজের মূল ভিত্তিতে আঘাত লাগে।

বিবাহের ব্যাপারে আমাদের দেশে যেভাবে জ্যোতিষের সাহায্য নেওয়া হয় এবং যৌটক-বিচার করা হয়, তাতে অনেক সময় উল্টো ফলই ফলে থাকে। জ্যোতিষীর সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজেই যাতে যৌটক-বিচার করা সম্ভব হয়—এই গ্রন্থখানি সেই ভাবেই লেখা।

এতে মিল, মিল-বিচারের তত্ত্ব, প্রজাপতির নির্বন্ধ এবং বিরুদ্ধ মিলের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে। দাম—দুই টাকা

— অন্যান্য গ্রন্থ —

হাতের রেখা ২৲ সরল জ্যোতিষ ৪৲
হাত-দেখা ৪৲ কোষ্ঠী-দেখা ৫৲
ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র ৪৲
নবশিকল ২৲ মাসফল ২৲ লগ্নফল ২৲

দিলীপকুমারের বই ঃ

উপন্যাস ঃ ছায়ার আলো ১ম খণ্ড—৩-৫০, ২য় খণ্ড—৩-৫০
রক্তের পরশ—৩৲, বহুবল্লভ ও দুধারা—৩৲
তরঙ্গ রোধিবে কে? ১ম খণ্ড—৩৲, ২য় খণ্ড—৩৲
দোলা (২য় সংস্করণ)—৮৲
নাটক ঃ তিথারিণী রাজকন্যা—(মীরাবাঈয়ের জীবনী) ২-৫০
শাদাকালো—২৲ আপদ ও জলাতঙ্ক—২৲
শ্রীচৈতন্য—৩৲
কবিতা ঃ ভাগবতী-কথা (ভাগবতের কাব্যানুবাদ)—৪৲
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ : "বঙ্গভাষায় অমূল্য গ্রন্থ।"
মহাভারতী-কথা (মহাভারতের কাব্যানুবাদ)—৩৲
ভাগবতী-গীতি (গান)—৪৲
রশ্মিরশ্মি ঃ সুরবিহার ১ম খণ্ড—৪৲, ২য় খণ্ড—৪৲
ভ্রমণ ঃ দেশে দেশে চলি উড়ে—৬৲
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুন্দরলাল মল্লিক, শ্রীযদুনাথ সিংহ প্রভৃতি কর্তৃক বহু প্রশংসিত।
তীর্থংকর (৩য় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত)—৮৲
ইন্দিরা দেবীর সহযোগিতায়
প্রেমাঞ্জলি (মীরাভজন—বাংলা সুরবাণী সমেত) ৪৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শিল্পী : দ্বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

জলকেলি

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভারতবর্ষ

পৌষ—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

রবীন্দ্রকাব্যে ভগবদ্ভক্তি

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতিদেবী বন্দনা করিতেছেন নিত্য নব নব সাজে বিশ্বদেবতাকে। পূজা করিতেছেন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমকে—ঈপ্সিতকে। ঋতুর আবর্তনপথে চলে তাঁর এই অভিসার। অঙ্গে তাঁর কখনো শ্যামলশস্যের শ্যামলিমা—কখনো বা নীলাকাশের নীলিমা, বিহগের কল-কাকলীতে বাজে আরতিধ্বনি—ফলে ফুলে পূর্ণ হয় পূজার অর্ঘ্য। পূজারিণী প্রকৃতিদেবীর বুকে ভক্তিগঙ্গা চিরবহমানা।

ভজ × ক্তি = ভক্তি। অভিধানকার ভক্তির পর্য্যায়শব্দ বলিতেছেন—[illegible] প্রেম, শ্রদ্ধা। প্রেম-ও ভক্তির ভাব বহন করে। ভক্তি ও প্রেমে সমপ্রাণতা বর্তমান। 'পঞ্চরাত্র' বলিয়াছেন—

অন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।

অন্যের প্রতি মমতা পরিহার পূর্বক ভগবানে যে মমতা তাহার নাম প্রেম, এই প্রেমকেই উদ্ধবাদি ভক্তি বলিয়াছেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও এই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—'সাধনভক্তি হইতে রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥'

প্রেম সম্বন্ধে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলেন—

সম্যঙ্ মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম নিগদ্যতে॥

যাহা হইতে চিত্ত পরিপূর্ণ রূপে নির্মল হয় এবং যাহা অত্যধিক মাধুর্যযুক্ত—এরূপ যে-ভাব—তাহা পাইবা প্রাপ্ত হইলেই বৈষ্ণব তাহাকে প্রেম বলেন।

প্রেম ও ভক্তি একই হৃদয়াবেগের দুইটি দিক। ইহাদের উৎসস্থানের ভেদ নাই।

প্রেম কবির মানসভূমি। প্রেমের সাধনাই কবির জীবনসাধনা। প্রেম হইতেই আদিকবি প্রেরণা লাভ করিলেন কাব্যরচনার—রচিত হইল আদিকাব্য। প্রিয়বিরহকাতর ক্রৌঞ্চীর প্রতি প্রেম শোকার্ত করিয়াছে বাল্মীকিকে। যদি ভালবাসি তবেই জাগে সমবেদনা। আগে ভালবাসা, প্রেম—পরে বেদনাবোধ। ভালবাসিয়াছেন কবি ক্রৌঞ্চীকে। তার দুঃখে তিনি তাই শোকাভিভূত। শোক পরিণতি লাভ করিল শ্লোকে—ছন্দোরূপে। প্রেম-ই কাব্যের আত্মা।

আত্মাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।

—ধ্বন্যালোক, ১।৫

এই প্রেম—এই সসীম-ভালবাসা একদা অসীমের অন্বেষণে যাত্রা করে—অপূর্ণ হইতে পূর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে চায়। হৃদয়ের ঘটে বিস্মৃতি। সীমার মাঝে আর সে আনন্দ পায় না। সীমার মাঝে অসীমকে পাইবার আকুতি জাগিয়া ওঠে। ইহাই ভাগবতী-পিপাসা—ইহাই ভগবদ্ভক্তি। কবিকণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয়—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
তোমায় আমায় মিলন হোলে
সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলাবে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইতো মাধা
আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অঙ্গজলে সুন্দর বিধুর।

—রবীন্দ্রনাথ।

অসীমের প্রতি এই প্রেম—এই ভগবদ্ভক্তি রবীন্দ্রকাব্যে পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহিনী বিশ্বদেবতার বন্দনাগানে মুখরিত। তিনি গাহিয়াছেন—

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগতমন্দিরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান—
পুণ্যকিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহবন্ধ রে।

—বৈতালিক।

ভক্ত প্রার্থনা করেন—'হে হরি, অজ্ঞান-অন্ধকার আমাকে পথভ্রান্ত করিয়াছে। তুমি ভক্তবৎসল। শরণাগতকে তুমি রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার হৃদয়-অন্ধকার দূর কর। হরি বিনা আশ্রয়-দাতা আর তো কেহ নাই!' হরির গুণগানে যে-হৃদয় দ্রবীভূত হয় না শ্রীতুলসীদাস তাহাকে 'কুলিশ-সমান' বলিতেছেন—হৃদয় সো কুলিশ সমান, যে ন দ্রবহি হরিগুণ শুনত। কবীরজী গাহিয়াছেন—হরি সে লাগ্ রহো ভাই, তু ধনত ধনত ধনি যাই। পদ্মপুরাণে আছে—যেনার্চিতঃ হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। ব্রহ্মাদি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥ রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
আঁধার অরণ্যে যাই হে,
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে খুঁজে পাই হে।
সদা মনে হয় 'কি করি কি কাজ'
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী

তাই ভরে ধরি, ডাকি হরি হরি
হরি বিনা কেহ নাই হে।

—গীত বিতান, ৮৩১ পৃঃ

'সেবা' ভক্তিধর্মে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। সেবা হইতে ভক্তি লাভ হয়। আদিপুরাণে আছে—মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা। ভক্তিস্তম্ভৈ প্রদাতব্যা নতু মুক্তি কদাচন॥ সেবাহীন রাত—পূজাহীন দিন রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন—

কী দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি,
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটী ?
পূজাহীন দিন—সেবাহীন রাত
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে পড়ে গেছে
বিজনবিপিনে লুটি।

—জীবনদেবতা

যে গীতিগ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়াছিল তাহার প্রথমস গীত—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে,
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

শুধু এই গান খানি নয়—এই গ্রন্থখানিই ভক্তিসুধায় পরিপূর্ণ। ইহার রসমাধুর্য্য দুর্গম অধ্যাত্মপথকে সরল করে—সেই দূরতমকে নিকটে লইয়া আসে। ইহার আলোকে ভক্তের হৃদয়-অন্ধকার দূর হইয়া যায়—সে প্রিয়তমের সান্নিধ্য অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথের এই সকল গ্রন্থ-ও ভক্তিপদপদ্মে সমৃদ্ধ—'খেয়া' 'গীতিমালা' 'গীতালি' 'গান' 'নৈবেদ্য'।

১৯১২ র ২৭শে মে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড যান। তাঁহার সঙ্গে ৫০টি গানের ইংরাজি-অনুবাদ ছিল। 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' হইতে এই গান গুলি ও অন্য কয়েকখানি গান একত্র করিয়া 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশ করা হয়। 'গীতাঞ্জলি-'ই নোবেল-পুরস্কার লাভ করে।

রাত্রির আকাশ

সন্তোষকুমার অধিকারী

অপরাহ্ণ হ'তে নীল আলোকের ধারাগুলি ধীরে
ফুরাইয়া এলো শেষ শ্যামল বনান্ত শিরে শিরে,
ম্লান হ'লো প্রান্তরের বুকে ; ফুরালো উজ্জ্বল দিন
পৃথিবীর এপারের থেকে। হ'লো ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ
চেতনার পদধ্বনি, কলরব, অরণ্য মর্ম্মর ;
সহসা নিভিয়া গেল পৃথিবীর স্পন্দনের স্বর।

বসিলাম সে বিজনে মুখোমুখী সন্ধ্যার আঁধারে।
মনে হ'লো এ রাত্রি ছড়ানো দূর আকাশেরও পারে
কোন্‌খানে নিশ্চিন্ত নিঃশব্দ, তবু দিগন্ত আকাশ
তাহাতেও জ্যোতিতে ভরা। অজস্র নক্ষত্র প্রতিভাস
দূর অনন্তের পানে প্রসারিত দীর্ঘ ছায়াপথে
উদ্দীপ্ত স্বপ্নের মত। পৃথিবীর অন্ধকার হ'তে
বহুদূরে···তবু তার হৃদয়ে আমার দীপালোকে
জাগ্রত উজ্জ্বল ; তবু কি আশার স্বপ্ন আঁকা চোখে !

জানিলাম এতদিনে, এ' পৃথিবীর অন্ধকার রাতে
কোথা হ'তে আলো পায় পথ চলিবার। কার হাতে
হাত দিয়ে এ' উষর হতাশার মরুবালুচরে
হেঁটে যায় দুর্নিবার ক্লান্তিহীন বেদনার ঝড়ে !
জানিলাম এ' পৃথিবী কি আনন্দে হাঁটে অন্ধকার,
বহু দুঃখ বেদনার পুঞ্জ পুঞ্জ রাত্রি হয় পার !!

শাশ্বতিক

দুর্গাদাস ভট্ট

চোখ আড়ালেই মন আড়াল। বিশেষ করে অনেকদিন যদি কেউ অদেখা থেকে যায়। তবু কিন্তু ওকে চিনে নিতে পারলাম। চোলখাওয়া গালের অভিজ্ঞানটুকু পরিচিত। একটুকালের জন্য ভুলে গেলাম নিজেকে। ভুলে গেলাম যে আমি যাত্রী হয়েছি চৌরঙ্গী বেহালার সকালের ট্রামে। ও তখন মাঠের দিকে দৃষ্টি মেলেছে, অন্যমনে দেখছে বুঝি—কেমন করে সবুজের বাহুপাকে টাটকা রঙ্গুর এসে দাঁড়ায়। আর আমার মনে শুধুই হোমসন—বর্তমান থেকে অতীতে। ভাবনার সুতো ছাড়তে ছাড়তে মনে পড়ে লিওসেইটের ব্যাঙ্কঅফিস। মনে পড়ে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের লতিকা সান্যাল।

আমার অবশ্য ছিল অন্য ডিপার্টমেন্ট। তবু চোখ এড়াতে পারেনি সে। সেদিন সস্তা দরের একটা মিলের সাড়ি পরে সুগঠিত নিতম্বের ঢেউ তুলিয়ে প্রথম ঢুকলো অফিসে—সেদিন অনেকের মত আমিও চোখ তুলে দেখেছিলাম। তবে অনেকের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল বোধ হয়। প্রথমেই চোখ পড়েছিল ওর অতলান্ত চোখে, এক আকাশ ছোঁয়া হতাশা—আর অন্য সবাই দেখেছিল হয়ত অন্যকিছু।

এই হতাশার সঙ্গে আরো কিছু জিজ্ঞাসা ওর চোখের ভাষাকে যেন রহস্য-মধুর করে তুলল দিনকয়েকের মধ্যে। তাই যেচেই আলাপ করলাম। লিফট্ এসে সামনে দাঁড়াতেই একটু ইতস্ততঃ করেই 'যা হয় হবে' বলে উঠে পড়লাম ওর সঙ্গে। আলগা পাউডারের প্রলেপে ঢাকা পড়েনি বিশীর্ণ ক্লান্তি রেখা। তবু স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে যেন একটুকরো অবাক অবাক ঠিকানা। লিফটের ফ্যান্‌খানা—ঘুরে চলেছিল আপন মনে। দুচারটি চূর্ণ কুন্তল উড়ছিল লতিকার। একটু বিগলিত গলায় কথা বললাম—আপনিই তো ক্যাস ডিপার্টমেন্টের নতুন কর্মী। মৃদু একটু প্রতিবাদ করলে লতিকা।

—'বলুন সহকর্মী'—অবশ্য আলাপ এখনও হয়নি আপনার সঙ্গে।

—'আলাপ এতদিন হয়ত হয়নি,এবার তো হয়ে গেল।'

উত্তরে নরম একটু ঘাড় নাড়ল সে। আমার কপালটুকু সামান্য বুঝি রেখা-কুটিল হয়ে উঠল একবার। ততক্ষণ লিফট্ এসে নেমেছে নীচের তলায়।

—সহজ হতে আরও দিন কয় কেটে গেল। তবু এর মধ্যেই ওর দ্রুত পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করে। স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠা কণ্ঠার হাড় দুটো ইতিমধ্যে মাংসের পর্দায় ঢাকা পড়েছে। চোখের কোলের ক্লান্তির রেখা কর্মশক্তির দ্যুতির ন্যায় রূপ নিয়েছে ধীরে ধীরে। আমার চোখেও যেন ওটি ওটি এগিয়ে চলেছে রূপ থেকে অরূপ। অভাব থেকে ভাবে। তবু চুপচাপই ছিলাম—। মনের উচ্ছ্বাস চেপে রেখেছিলাম সযত্নে। কিন্তু সংযমের বাঁধ নিজের হাতেই কেটে দিলে একদিন লতিকা। বস্তাজাত গোলআলুর মতই হরাইজেন্টাল আর ভার্টিকাল প্রেসারের ধাক্কা খেতে খেতে অফিস-পথে বাসে করে ফিরছিলাম। সামনের সেডিজসিটে কচি-কলাপাতা রঙের শাড়ির ইংগিত দেখেই মনটা একটু আনমনা হয়ে ওঠে। বাঁকা চোখে সেদিকে তাকিয়ে দেখি লতিকা লক্ষ্য করছে আমাকে। চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। চোখের ভাবে মনে হল দৃষ্টি দিয়ে ডাকছে বুঝি আমাকে। ইচ্ছা অনিচ্ছার পরিবাদ মিটিয়ে দেবার আগেই পা দুটো তৎপর হয়ে উঠল—ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওর সিটের পিছনেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মরালগ্রীবা একবার ধনুকের মতো নিচুদিকে বেঁকিয়ে মৃদু একটা আহ্বান জানালে আমাকে—'বসুন না'। তাকিয়ে

দেখি লতিকা তার নিবিড় নিকটে বসবার জায়গা করে দিয়েছে। বাসের অন্য সকলের হিংসা আর নিঃশব্দ বিদ্রূপের কারণ হয়ে ওর পাশে বসতে ইচ্ছা করল না। 'এই তো বেশ আছি"—ভাবলাম মনে। ওর দীর্ঘ চুলের অবাক স্পর্শ একএকবার মিলে যাচ্ছে অদম্য বাতাসের দুরন্তপনার। গায়ে জড়ানো কচিকলাপাতা রংএর শাড়ী-খানার অবাধ্য আঁচল মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে এগিয়ে আসছে এধারে। আর কি চাই, তাই অল্প একটু চুপ করে থেকেই বললাম—"কেন এইতো বেশ আছি।" উত্তরে একটাও কথা বললে না ও। পিছন ফিরে শিড়দাঁড়া শক্ত করে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে থাকলো। বাসটা মৌলালির কাছাকাছি আসতেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। নামার পর কি মনে করে আবার একবার তাকালাম বাসের মধ্যে। দেখলাম তখনো বসে আছে লতিকা ঠিক আগের মতন ভংগি নিয়ে। কৃত্রিম একটা গাম্ভীর্য যেন জড়িয়ে ধরেছে ওর সর্ব্বশরীরে।

পরদিন অফিসে গিয়ে দেখি আমার টেবিলের উপরই গোটাপনেরো ফাইল একটা জমাট বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। পাশের টেবিলের সুনীল রায়ের দিকে তাকাতেই বলে উঠলো ও "দেখছো কি?" রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের ওঁতোর চোটে বড়কর্ত্তাদের দশম দশা। আর ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো···মানে এই আমরা। অদ্ভুত এক-ঠোঁট উল্টানো অভিযোগ জানালে সে। বিনানোটিশে গাদা গাদা ফাইলের বোঝা আমার মত ওর কাছেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। আর বাক্যালাপ না করে নিজের টেবিলে বসে পড়লাম। আর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কাজের সাগরে ডুবে গেলাম। কিন্তু—হঠাৎ যেন মনে হল লঘু একটু রিণ্‌রিণ আওয়াজ আমাকে ঘিরেই বেজে উঠছে। কার চটুল চরণধ্বনি এগিয়ে এল আমার টেবিল পর্য্যন্ত। চোখ তুলে তাকালাম এবার। যা ভেবেছি তাই। চুড়ির আওয়াজ বন্ধ হ'ল, আর নড়ে উঠল ঠোঁট জোড়া মৃদু একটু ইতস্ততঃ। আর পরপর ছিটকে এল দুটো কথা "ট্রানজাক্সানের ফাইলটা"?

"সেটা তো আমার কাছে থাকার কথা নয়"—বলে সুনীলের টেবিলের দিকে ইংগিত করি।

সুনীল ততক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে। মদালস পায়ে শ্রীনিকেতনী স্যুটগুলো জোড়া মোজাইক করা মেঝের উপর বসে বসে চলে গেল সে। ফাইলখানা অবশ্য হাতে নিয়ে।

আর কিছু করে হেসে উঠে নাটকীয় ঢঙে, আবৃত্তি করে সুনীল—মন বন উপবনে চলে অভিসারে—মানে লতিকার মত চালু মেয়ে কোন ফাইল কার কাছে থাকা সম্ভব এটা কি জানেন্ না—মনে করো? আর আমাদের অফিসে কি চাকরবাকরের অভাব হয়েছে?

হয়ত বেয়ারাগুলো সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো না তাই। আমি প্রতিবাদ করি।—ও বাবা এর মধ্যেই এত? একেবারে হৃদয় দিয়ে হৃদি। সুনীল রায় চোখ কপালে তুলল। অগত্যা গম্ভীর হতে হল আমাকে। ওর বাচাল-পানাকে প্রশ্রয় দিয়ে শেষে অফিসের মধ্যেই একদৃশ্যের অবতারণা করবে।

গাম্ভীর্য দিয়ে অস্বীকার করা গেলনা চারিপাশের ওজন, আমার আর লতিকার গতিবিধি-বুকি সকলেরই নখদর্পণে। আপন মনের মাধুরি মিলিয়েই রচনা চলছিল তাদের কল্পনার প্রবাল বলয়। এমনি একটি দিনে বৃষ্টি করছিল শ্রাবণের আকাশ থেকে। বড় বড় অফিস-বাড়ী-গুলোর কাঁচের সার্সির উপর জলের ছাট সাপের ফণার মতই ছোবল মারছিল বার বার। কাজের চাপে সময়ের নাড়ী টিপতে ভুলেছিলাম—তাই সামনের আলোটা দপ্ করে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে পেলাম নিজেকে। ফাইলগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে অন্যমনে নেমে এলাম নীচের গাড়ী বারান্দায়, বাইরে শুধু অগাধ বৃষ্টি, একটানা আওয়াজ ঝুপ্-ঝুপ্। তাই রাস্তায় বেরুনোর আগে থমকিয়ে দাঁড়াতে হলো। আর আলো আঁধারের ধুপ-ছায়ায় কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চমক দিয়ে গেল এক ঝলক বিদ্যুৎ। আর সেই আলোতে চিনতে পারলাম লতিকাকে। একটু সৌহৃদ্যের হাসি হেসে কাছে এগিয়ে গেলাম, আমাকে দেখেও যেন না দেখার ভান করলে লতিকা, তাই মুখ খুললাম—কী ভীষণ বৃষ্টি নেমেছে দেখেছেন। মৃদু একটু ঘাড় হেলিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর রহস্য গম্ভীর একটুকরো কথা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়—ওরা কি বলে জানেন?

ওরা যে কি বলে আমি বেমালুম জানতাম, তবু না জানার ভান করলাম—কি বলে ?

—"ওরা বলে....."

কথা বলতে গিয়ে দুবার হোঁচট খেলে লতিকা। বাইরে শোঁ শোঁ হাওয়ার ক্রুদ্ধগর্জন উঠল। বিদ্যুতির ছুরিতে অন্ধকারের কলজে থেকে ফিন্‌কি দিয়ে লালরক্ত বেরিয়ে এল বুঝি। সেই রক্ত আবির মাখানো ওর কোমল কপোলে। কড় কড় করে বাজ ডেকে উঠলো। আর হাতুড়ি হানল আমার বক্ষপঞ্জরে। চমকিয়ে তাকিয়ে দেখি লতিকা কখন বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীরু কপোতির মত ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠছে যেন। অকস্মাৎ আমার পুরুষোচিত বলিষ্ঠবাহু তাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য উদ্যত হতে চাইলো—বললাম—ভয় কিসের ? আকাশে বাজ ডেকে উঠলে এই রকমই আওয়াজ হয়। উত্তর দিতে না পেরে সভয়ে চেপে ধরলে আমার হাতখানা। নির্ভয় আমি তাকে দিলাম আমার আশ্বাসের আশ্রয়। দীর্ঘ সময় চুপচাপই কাটল।

ঘরের গেট লাগানো বাড়ীটার সীমানায় লম্বা দুটো ইউক্যালিপটাসের মাথার উপর বৃষ্টি বাদলের ঝুরু ঝুরু কান্না। আর আঁধারের আড়ালে আত্মগোপন করে আছি আমরা। তবু লতিকাই মৌনতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা আপনার পদবীটা কিন্তু এখনও আমার অজানাই রয়ে গেল।

আমি রহস্য গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ? ঠিকুজি কুষ্টি মেলাবার জন্য দরকার হবে নাকি।

আর অবাক অবসর এগিয়ে চলল সময়ের তালেতালে। সেই মৌনতায় আবার ছন্দপতন ঘটল, আমি বললাম—আমার পদবী হচ্ছে মিত্র—মানে একেবারে কুলীন কায়স্থ। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গায়ের স্পর্শে বুঝতে পারলাম কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল লতিকা। একটু ব্যথাভর চেতনা সাড়া দিয়ে উঠল ওর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উঠা-নামায়। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ। বৃষ্টি ততক্ষণ ধরে এসেছে। কালো পিচের রাস্তায় চোখ ধাঁধান বৈচিত্র্য এনেছে ওপাশের শো কেসের আলোগুলো। একটু নড়ে চড়ে উঠে মুখ খোলে লতিকা—যাই এবার, আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে লেডিজ ছাতাটা মেলে দিলে ওর বেণী ঝোলানো মাথার চারপাশে। আর তারপর ঘুট্ ঘুট্ করে এগিয়ে চলল লিওসে ষ্ট্রীট ধরে চৌরঙ্গীর দিকে।

আসল ব্যাপারটা জানতে বেগ পেতে হয়নি। সেই বৃষ্টি-ঝরা অবসরটুকুর স্বপ্নময়তায় যে প্রসঙ্গ ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল—তার কারণ অনুসন্ধানে জানতে পারলাম—আমার আর লতিকার জাতি বৈষম্য। সেইজন্যই বোধহয় ব্যতিক্রম এল তার সবটুকু আচরণে। অতি সাবধানে এড়িয়ে চলতে লাগল আমাকে। তবু আমি নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সরিয়ে আনতে পারলাম না নিজেকে। অকঠিন মনে হল এতই তংগুর আমার ভালবাসা। এতই এর ভিত্তি ভূমি। তাই একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্যে সময় গুণছিলাম। ততদিন সহকর্মীরা আমাকে 'হতাশ প্রেমিকের' দলে ভর্তি করিয়ে স্নেহ-বিদ্রূপের ইতিহাস সৃষ্টি করছিল। তাই নিঃসঙ্গদিন আর নিঃসঙ্গ মন নিয়ে এতদিন টিকিন খাচ্ছিলাম অফিসের বারান্দায় বসে। শ্রীনিকেতন ভাণ্ডেলের মৃদু আওয়াজ শান্তিত করে তুলল আমার চেতনা। এপাশে ওপাশে ঘরগুলার পর্দাগুলোর আশে পাশে অনুসন্ধানী চোখগুলো মিটমিটিয়ে উঠলো বোধ হয়। পদশব্দ এসে পৌঁছুল আমার পিছনে। এখুনি পেছন ফিরলেই চোখ পড়বে সেই অনেক চাওয়া মুখ। তবু নিদারুণ অভিমানে চুপ করে থাকলাম। শব্দ উঠল "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?" আমাকে অনুরোধ ? হয়ত সে কোনো উঁচুঘরের পয়সা-ওয়ালা অফিসারের অনুগামিনী হতে চলেছে। তার জন্যই হয়ত বিবাহের নিমন্ত্রণ। তবু বললাম "যদি সাধ্যে কুলায়" বলে একটু তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম লতিকার দিকে। ওর কবরি-ভরকে একটা জমাট রুক্ষতা। কালোচোখের অন্তরঙ্গ ইশারায়—আবার সেই ক্লান্তির ভিড়। পলাশ অধরে যেন রক্তহীন শুষ্কতার প্রকাশ। তাই মোচড় দিয়ে উঠল মন। ভাল করে কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই লতিকা বলল—আজকে অফিস্ আওয়ারের পর আমার জন্য একটু অপেক্ষা করবেন ? বিশেষ কতকগুলি জরুরী কথা আছে। প্রত্যুত্তরে ঘাড় নাড়লাম শুধু।

বৈকালি বাতাসকে ছাপিয়ে দিয়ে জেগে উঠে লতিকার কণ্ঠস্বর—"না, না এতবড় অন্যায় চিন্তা বুঝি

কিছুতেই করতে পারে না……"পর্য্যাপ্ত উত্তেজনা অভিব্যক্তির মারপথে টেনে আনল জেদের যবনিকা। সামনেই দুলছিল ইডেনগার্ডেনে প্যাগোডাটার প্রতিচ্ছবি ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পুকুরটার ইস্পাতনীল জলে। খানিক একটু চুপ করে থেকেই আমি বলি—"মিথ্যে কতকগুলি বাজে স্তোকদিয়ে আমাকে ভুলিয়ে কি করবে। আমার সহকর্মী সুনীল রায়ের কাছে শুনেছি তোমার আগামী শুভদিনের ইতিহাস। কোনো মোটা মাইনের অফিসার তো তোমার বাহ'ন হতে চলেছেন। ছি লতিকা, শেষ পরে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হারিয়ে দিল তোমার মনুষ্যত্বকে……" শেষ করতে পারলাম না কথাটা।

কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মত সে কুঁকে পড়ল আমার সামনে। নরম নরম হাত দিয়ে চেপে ধরল আমার মুখ,আর চেঁচিয়ে ওঠে বললে—"কিছুতেই আমি তোমাকে ও ধরণের কথা বলতে দেব না—তুমি শিক্ষিত, তুমি ভদ্রসন্তান। আমার এই সামান্ত কথাটা যদি তুমি সহানুভূতি দিয়ে না বিচার কর"—

এই হল তোমার সামান্ত কথা ? ওসব কেতাবি বুকনির জীবন-ভাষ্য হয় না।

"কে বললে হয় না।"

লতিকা আবার কিছুক্ষণ আগে বলা তার কথাগুলো আরো আবেগ বিহ্বল করে বললে, আমার আত্মার পরিজন বাবা মা সকলেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমার প্রিয়জনকে ছাড়া আর সবাইকে যদি অস্বীকার করি; সংসারের পরিধি থেকে আমি যদি একটা উল্কার মতন ছিটকিয়ে বেরিয়ে আসি,তাহলে সমস্ত সংসার নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আমাকে। এই যে আত্মকেন্দ্রিক ভালবাসা একি নিজের ভার নিজে বহন করতে পারবে? সকলের দীর্ঘশ্বাস কি তোমার ও আমার কল্যাণের পথে প্রয়োজনের পথে বিরাট এক বাধার সৃষ্টি করবে না…"

"—থাক্ থাক্, আর নাটক করে কাজ নেই" একটা ধমকানি দিয়ে চুপ করিয়ে দিই ওকে। মনের মধ্যে কথাগুলো কুণ্ডলি পাকানো বিষাক্ত সাপের মত কিলবিল করে চলে বেড়াতে থাকে। কত বড়বড় কথা, বললো লতিকা—সামগ্রিক স্বার্থ, বিশ্ব-পরিধি যেখানে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অসম্পূর্ণতার প্রতীক। অর্থনীতির প্রতি চাপে ছোড়াতালি দিয়ে সেখানে কাটাতে হয় আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সেখানে এল বিশ্বপরিধির কথা। সামান্ত একটু মা বাবার প্রতিবাদই যার কাছে ভালবাসাকে পিছিয়ে দেয়, তার মুখে এই সব কেতাবী কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। বললাম—"তুমি তোমার বিশ্বপরিধি নিয়েই থাকো। আমাকে তাহলে বিদায় দাও। প্রেমসূচী তোমাদের জীবনের অন্যান্য কর্ম্মসূচীর মতই একটা বিশেষ ধাপ হয়ত, কিন্তু এর জন্য আমাদের যে কতখানি জীবন মূল্য দিতে হয় তা যদি জানতে"…আবেগ উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়ে আসে আমার গলা। শুধু স্থান ত্যাগ করার আগে একবার তাকিয়ে দেখলাম বিদীর্ণ রজনীগন্ধার মতই বাথাক্লিষ্ট মুখখানা চোখের জলে ঢেকে গিয়েছে লতিকার।

তারপর—কতদিন কেটে গেল। বোধহয় সুদীর্ঘ বাইশ বছর। শুধু মাঝে একবার একখানা নেমন্তন্ন পত্র আর লতিকার নিজের হাতে লেখা একখানা চিঠি পেয়েছি—তার নবজীবনের প্রান্তে আশীর্ব্বাদ জানাবার জন্য। আশীর্ব্বাদ! তা জানিয়েছিলাম বই কি। নিজের ঔদার্য্য দিয়ে ক্ষমা করেছিলাম ওর সমস্ত হীনতাকে। এর মধ্যে কত জায়গায় চাকরী করেছি আবার ছেড়েছি, মহিলা বন্ধু যে জোটেনি এমন নয়। তবু আন্তরিকতা দিয়ে বাঁধতে পারিনি কাউকে। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ক্ষত ঠনঠন করে উঠত—আর তার উপর স্মৃতির প্রলেপ লাগিয়ে সাময়িক ভাবে সুখী হতে চাইতাম।

আর আজ?—ওইতো সামনের সেডিয়ন সিটে বসে আছে লতিকা, ওর ওই ঘাড় হেলিয়ে দূরান্তে চেয়ে থাকার ভঙ্গীতো আমার চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। চোখের বিকণে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কত যাত্রী উঠল, কত যাত্রী নামল। তবু আমি আর লতিকা স্থির হয়ে বসে। ও ইতিমধ্যে একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল, কিন্তু দেখতে পেলে না বুঝি আমাকে। সময় এগিয়ে চলল দ্রুত তালে। কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। এক সময় এসে গেল বেলেঘাটার ট্রাম ডিপো। ট্রাম আর এগুবেনা। জনস্রোতের পিছু পিছু লতিকা নামল মাটিতে—আর এগিয়ে চলল ডায়মণ্ড-হারবার রোডের কালো পিচ পথে ঘাড়িয়ে। আমি তখন

ভুলে গিয়েছিলাম আমার গন্তব্যস্থল। গড় গড়ের ডুবে বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম লতিকার। এ যাত্রাও সেই ব্যাঙ্ক অফিসের গাড়ী যাত্রাপথের মত যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল আকাশ গলা দুই। কাগজে কলমে বর্ষা তখনি শেষ হয়েছিল। অথচ ভাদ্র আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও বাষ্পবহা মৌসুমী বেয়াদপী শুরু করলে আকাশে। গত দুই এগুনের পর আরম্ভ হল বারিপাত। আশ্রয় পেলাম পথপার্শ্বের এক মোটর গ্যারেজে। আমার একটু আগেই লতিকাও পৌঁছিয়েছে সেখানে। আমি ভিতরে ঢুকতেই কেমন যেন তির্যক একটু দৃষ্টি মেলে দিল মুখের দিকে। অফিক বোধহয় দ্বন্দ্ব জাগল ওর মনের মহলাসনে। রেখা কুটীল হয়ে উঠল গৌরবর্ণ কপাল। আর তারপর এগিয়ে এল—"যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামই কি?..."

—"তাতে কোন সন্দেহ আছে" রহস্য করার সুযোগটুকু ছাড়তে ইচ্ছা করলো না। একটা সামুদ্রিক ঢেউ মাটির উপর আছড়িয়ে পড়বার আগে ক্ষণেক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো ওর নরম মুখের রেখা বিভঙ্গ। উদাস দৃষ্টিতে ঘনিয়ে এল শ্রাবণের ঘনঘটা। কথা কইতে পারলাম না আমরা কেউ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করলাম অনেক দূরের মেঘের দেশে। তবু কথা কইতে গেল, বললাম—"হঠাৎ এই দিকে যে বড়।"

—"একটু বিশেষ দরকার মানে—মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করতে এসেছি।"

—"তোমার মেয়ে?" একটু অবাক হ'লাম। আগের কথার জের টেনে আবার বলি—"কই মেয়ে হবার খবরতো পাইনি তোমার? আর কত বড়ই বা হয়েছে সে আজকাল?

—"অনেক খবরই তো তুমি রাখনি, চিঠি দিয়ে দিয়ে হয়রাণ হয়েছি।" দিওসে ইটের ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়ার পর বাড়ীও বদল করেছিলাম সে কথা হয়ত লতিকা জানতো না। কিন্তু একি কথা বলছে লতিকা, ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। সেই কালো চোখের অতলান্ত হতাশা যেন আরও প্রকট। কণ্ঠার হাড় দুটো আগের মতই উঁকি ঝুঁকি মারছে। কথার জের টেনে লতিকা আবার বলে—"মনকে চোখ ঠেরে আত্মীয় পরিজনকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলাম, তাই সমস্ত জীবনটা জোড়াতালি দিয়েই কাটল।" মনের মধ্যে বড় তুফানের প্রলয়ঙ্কর দাপট গোলমাল করে দিল সব কিছু।"

তবে কি? তবে কি? বিয়ে করে সুখী হতে পারেনি লতিকা! আর একবার তাকিয়ে দেখলাম—মনে হল প্রৌঢ়ত্বের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন দেখছে সে, সমস্ত শরীরের উদান ঢেলা সংসার যাত্রার লবণাক্ত স্বাক্ষর। গুরু গম্ভীর আবহাওয়ায় হাল্কা বৈচিত্র্যের বেগ টেনে আনার চেষ্টা করি—"থাক্‌গে ওসব কথা। তোমার মেয়ের বিয়ের কথা বল।"

—"আমার মেয়ের বিয়ে? হ্যাঁ সেই কথাই বলা যাক্। আচ্ছা একটা কথা আছে না, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা আবার নতুন করে ফিরে আসে। আমার মেয়ে সবিতাকে দিয়ে সে কথার প্রমাণ পেলাম।"

—"অর্থাৎ! প্রশ্ন করি আমি।

—"সে একজন ভিন্ন জাতের ছেলেকে ভালবেসেছে। আর এই বিয়েতে আমিই করছি আনুষ্ঠানিক ঘটকালি" —কথাটি আর শেষ করতে পারলে না লতিকা।

একটা আবেগ-বিহ্বল চেতনা মূক করে দিল বুঝি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ওর কর্ণা গালের পুলক আবেশে, আর ডাগর চোখের অতীত ইংগিতে মনে হল—এতকাল বুঝি দূরে দূরে থেকেও কাছের মানুষই রয়ে গেছে সে।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শঙ্কর দর্শনে ব্রহ্ম ও জগৎ

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই শঙ্করের বিশিষ্ট মত। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মই আত্মা। আত্মা একটি মাত্র, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। সকল দেহে একই আত্মা সাক্ষীরূপে অবস্থিত। জীবের—ব্যক্তিগত আত্মার—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বাহ্য জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় ঘটনা, যাহা প্রতিক্ষণে সংঘটিত হইতেছে, তাহারা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাস মাত্র, আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। মানসিক ও জড়ীয় সকল প্রতিভাসের তলদেশে যে স্থায়ী অধিষ্ঠান আত্মা বর্তমান, বেদান্ত তাহারই জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট। "তৎত্বম্ অসি, শ্বেতকেতু", ইহাই বেদান্তের মহাবাক্য। সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র ইহারই ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত! বিশুদ্ধ চিৎ ভিন্ন এই জ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

"তৎত্বম্ অসি" এই মহাবাক্যের তৎ শব্দ ব্রহ্ম বাচক, ত্বম্ ব্যক্তিগত আত্মা বা জীববাচক। জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এই ব্রহ্ম (বা তৎ) সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই জ্ঞান যখন অধিগত হয়, তখন জগতের স্বতন্ত্র জ্ঞাতার মনে বিলুপ্ত হয়, জ্ঞাতা তখন ব্রহ্মই হইয়া যান। তাহার ভিন্ন ব্যক্তিগত সত্তা ও তাহাতে প্রতিফলিত জগৎ প্রপঞ্চ বিলুপ্ত হয় এবং স্বয়ং জ্যোতি ব্রহ্মই কেবল প্রকাশিত থাকেন। ইহাই মুক্তি। শঙ্কর বেদান্তের এই মুক্তি অন্যান্য দর্শনের মুক্তি হইতে ভিন্ন। সাংখ্যমতে বাহ্যজগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জীবাত্মা আপনাকে ভোক্তা এবং যে বুদ্ধি ভোগের আশ্রয় এবং প্রকৃতি হইতে উৎভূত, তাহার সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে। ফলে নানা দুঃখকষ্টের উৎপত্তি হয়। জীবাত্মা যখন আপনাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মনে করিতে সমর্থ হয় এবং বুদ্ধি হইতে আপনাকে ভিন্ন বুঝিয়া স্বকীয় স্বরূপ চিৎমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতেও আত্মা যখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, দেহের সহিত সংসর্গ হইতে উদ্ভূত স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও ধন-সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ও তাহাদের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়। আত্মার এই অবস্থায় তাহার চৈতন্য থাকে না। বেদান্তের মুক্তি ভিন্ন। বেদান্তের মতে জগৎই মিথ্যা, তাহার সত্য অস্তিত্ব নাই। জীবের সীমিত চৈতন্যে এই জগতের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়, তখন জীবের জ্ঞানের সাক্ষী যে চৈতন্য, তাহা ব্রহ্ম চৈতন্যে মিশিয়া যায়, (নুনের পুতুল যেমন সমুদ্র জলে মিশিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়), এবং তাহাতে প্রকাশিত জ্ঞান ও তাহার বিষয় যে জগৎ তাহারও (প্রপঞ্চের) বিলয় হয়। জীবের সসীম চৈতন্যের বিলয়-বশতঃ তাহাতে প্রতিফলিত জগতেরও বিলয় হয়। তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই বেদান্তের মুক্তি। প্রপঞ্চের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব না থাকিলেও অনাদি কাল হইতেই তাহার অস্তিত্বের বোধ হইতেছে। এই বোধ মায়িক। শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়। তাহার পরে সত্যজ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যায় যে সেখানে রজতের প্রতীতি হইলেও, রজতের অস্তিত্ব কখনও ছিল না। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যায়—জগতের অস্তিত্ব তো তখন নাই, পরন্তু কখনও ছিল না। যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিনই প্রপঞ্চের জ্ঞান হয়। ততদিন আমরা বুঝিতে পারি না, যে যদিও প্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখে বর্তমান বলিয়া প্রতীত হয় তথাপি তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; আমাদের যে প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্ত, মায়িক। ততদিন আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিতে পারি না; জগতের স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিতে পারি না। জগৎ আমাদের নিকট নিয়মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতীত হয়। আমাদের মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া যে সকল নিয়ম অনুসরণ করে, বাহ্য জগতেও সেই সকল নিয়ম বর্তমান, ইহা আমরা আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানে দেখিতে পাই। কিন্তু এই জ্ঞান পারমার্থিক ভাবে ভ্রমাত্মক। যতদিন জগতের মায়িক জ্ঞান হয়, ততদিনই ইহা সত্য। যখনই পারমার্থিক জ্ঞান হয়, তখনই ব্যাবহারিক জগৎ সহ তাহার জ্ঞানেরও বিলোপ হয়। তখন এক মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। অন্যান্য দর্শনে মুক্তির পরে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না (বৌদ্ধ শূন্যবাদ ব্যতীত), এবং জগৎকে ভ্রান্তিমাত্র বলা হয় না। তখন জগতের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ থাকে না, এই মাত্র বলা হয়। কিন্তু শঙ্কর বেদান্ত মতে মুক্তিতে জগৎ ও তাহার জ্ঞান উভয়ই বিলুপ্ত হয়। উপনিষদে ব্রহ্ম অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। "(সহ মায়ান্তি কিকম)" শঙ্করের মতে এই মায়াবোধ—বিভিন্ন বস্তুসম্বলিত জগতের জ্ঞান—মায়া। ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে এই মিথ্যা জ্ঞানের বিলোপ হয়। ব্রহ্মের সহিত এই মায়ার সংসর্গের কারণ কি, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না কেননা, এই সংসর্গের কখনও আরম্ভ হয় নাই, ইহা অনাদি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সহিত মায়ার কোন সম্বন্ধ নাই, পরম সত্যের উপর তাহার কোনও প্রভাবই নাই। ব্রহ্মের কখনও পরিবর্তন হয় না। মিথ্যা জ্ঞানই মায়া। মায়া কোনও সৎ বস্তু নহে; তাহা অবিদ্যা। তাহা হইতে প্রতিভাসের উদ্ভব হয়। যখন সত্যের জ্ঞান হয়, তখনই তাহা তিরোহিত হয়। যতক্ষণ মায়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে ততক্ষণই অস্তিত্ব। তাই মায়া সৎও নহে, মিথ্যা জ্ঞানের অসৎও নহে। তাহা "সদ্ভ্যামনির্বচনীয়।" শ্রুতি ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে

দর্শ জ্ঞানে এবং কার্য্যে যে যে বস্তু দুই হয়, তাহাদের এই অর্থে অস্তিত্ব আছে যে তাহাদের অনুভূতি হয়। কিন্তু এই অনুভূতি ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনও সত্তা নাই বলিয়া তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। মায়া হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহা আসার তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টির অস্তিত্ব। মিথ্যা জ্ঞানের নাশের সঙ্গে সৃষ্টিরও নাশ হয়।

মায়াবাদের যৌক্তিক ভিত্তি

শঙ্কর কেবল শ্রুতিবচন দ্বারা তাঁর মতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যুক্তি দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বিবর্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিপর্ত ইতি উদাহৃতঃ" (বেদান্তসার)। তত্ত্বের অন্যথা ভাব (পরিণাম) না হইয়া, অন্যরূপে বস্তুর যে ভান, তাহাই বিবর্ত। পরিণামবাদেও (ন্যায়মত) জগৎরূপে ব্রহ্মের পরিণাম দ্বারা তাঁহার অধিকাংশের অস্তিত্ব হয় নাই। কিন্তু পরিণামবাদে ব্রহ্মের পরিণাম যে জগৎ, তাহা দ্বারা ব্রহ্ম, সত্য। শঙ্করের মতে এই জগৎ প্রতীতিমাত্র, তাহার ভান হয় কিন্তু প্রকৃত অস্তিত্ব তাহার নাই। ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, তাঁহার কোনও পরিবর্তন হয় না, অথচ ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভান হয়। জগৎ তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। "অস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ"ই অধ্যাস। ঈশ্বর জগৎ নহেন, অথচ ঈশ্বরকে জগৎ বলিয়া প্রতীতি হয়। রজ্জু-সর্পাদিস্থলে, শুক্তি-রৌপ্য, স্থাণু-পুরুষ প্রভৃতি স্থলে এই তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বেদান্ত মতে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। স্বর্ণের অলঙ্কারের মধ্যে স্বর্ণ ভিন্ন কিছুই পাওয়া যায় না। স্বর্ণই অলঙ্কারে পরিণত হয়। ঘটের মধ্যে মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। উপাদান কারণ হইতে কোনও কার্য্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না। সুতরাং কার্য্যকে উৎপন্ন নূতন বস্তু বলিয়া ধারণা করা যায় না। উপাদান কারণের মধ্যে কার্য্য তাহার তথাকথিত উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উৎপত্তির কল্পনা করা যায় না। উপাদানের রূপের পরিবর্তন হয়। কিন্তু উপাদান হইতে পৃথগ্রূপে রূপ থাকিতে পারে না। তিলের মধ্যে তৈল আছে বলিয়াই তিল হইতে তৈল পাওয়া যায়। বালুকায় মধ্যে তৈল নাই বলিয়া তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায় না। এই সৎকার্য্যবাদ সাংখ্যদর্শনেও স্বীকৃত। কিন্তু সাংখ্যমতে উপাদান কার্য্যে পরিণত হয়, এই পরিণাম সত্য। কিন্তু কার্য্য যখন উপাদানের নূতন রূপ গ্রহণকরে, তখন এই রূপ আসে কোথা হইতে এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যখন অসতের ভাব হইতে পারে না, তখন উপাদান যে রূপ ধারণ করিয়া কার্য্য রূপে গণ্য হয়, সেই রূপেরও পূর্ব্ব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। রূপ উপাদানেরই একটি অবস্থা। যখন রূপের পরিবর্তন হয়, মৃত্তিকা ঘটে রূপান্তরিত হয়, তখন দ্রব্যের কোনও পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন রূপের মধ্যে দ্রব্য অপরিবর্তিত থাকে। রেখাই বলিয়াই থাকুক, গুণ থাকুক অথবা বাঁচাইয়া থাকুক, সে একই বস্তু। (শঙ্করভাষ্য—২।১।১৮)। বস্তু ও তাহার রূপ (অথবা গুণ) যদি ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের উদ্ভব কিরূপে হয়, তাহা কল্পনা করা অসম্ভব হইত। বস্তু ও গুণের মধ্যে সংযোগ বিষয়ের জন্য তৃতীয় এক বস্তুর কল্পনা করিতে হইত। কিন্তু এই তৃতীয় বস্তুর সহিতই বা বস্তুর সংযোগ কিরূপে হয়? তাহার জন্য চতুর্থ এক বস্তু কল্পনা করিতে হয়। এইরূপে অনবস্থার উদ্ভব হয়। সুতরাং বস্তু ও তাহার রূপ যে ভিন্ন নয়, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তিতে কারণের কোনও পরিবর্তন হয় না, কেবল উপাদান ও তাহার রূপ ভিন্ন হয়। প্রত্যেক পরিবর্তনই কারণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু কারণে যখন কোনও পরিবর্তন হয় না, তখন প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনের (বা পরিণামের) কোনও অস্তিত্বই নাই বলিতে হয়। পরিবর্তনের অনুভব হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে সত্য বলা যায় না। অনুভূতির বাহিরে রাবণ, নীলাকাশ এবং সূর্য্যের গতির অস্তিত্ব যে নাই, তাহা আমরা যুক্তি সাহায্যে বুঝিতে পারি। যাহার অনুভূতি হয়, অথচ সত্য অস্তিত্ব নাই, তাহাকে প্রতিভাস বলে। যাবতীয় পরিণামই প্রতিভাস মাত্র—তাহা জগৎ। তাহা বিবর্ত, তাহা দ্বারা বস্তুর স্বরূপের অন্যথা হয় না, কিন্তু বস্তু অন্যরূপে প্রতীত হয়। জগৎ এই অর্থে ব্রহ্মের বিবর্ত। আমরা জগতে যে পরিবর্তন দেখিতে পাই, তাহা আমাদের মনের-ভাব মাত্র, সেই ভাব আমরা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আরোপ করি। এই মিথ্যার আরোপই অধ্যাস। ইহা আমাদের অজ্ঞানের ফল। এই অজ্ঞানবশতঃ যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহার অনুভব হয়। এই অজ্ঞানই অবিদ্যা বা মায়া।

জগতে সকল বস্তুই বিকারী। ঘটের উপাদান যে মৃত্তিকা তাহা অন্য বস্তুর বিকার। অঙ্গুরী স্বর্ণের বিকার, স্বর্ণ অন্য বস্তুর বিকার। বিকারের দ্বারা অধিষ্ঠান, তাহা দ্রব্য। মৃত্তিকা, স্বর্ণ প্রভৃতি যাহা পরিণামের অধিষ্ঠানরূপে প্রতীত হয়, তাহাও অন্য বস্তুর পরিণাম এবং প্রতিভাসমাত্র। এই সকল বিকার বা প্রতিভাসের মূলে এমন কি কিছু আছে, যাহা এই সকল বিকার বা প্রতিভাসের অধিষ্ঠান? শঙ্কর বলেন—"সত্তা"ই সে বস্তু। তাহা সকল বস্তুতেই বর্ত্তমান। এই সত্তাই যাবতীয় বিকারের তলদেশে অপরিবর্তিত থাকে। সকল বস্তুই এই সত্তারই প্রতিভাস। বিভিন্ন সত্তাই বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীত হয়। সকল বস্তুর জ্ঞানে এই সত্তাই প্রকাশিত হয়। সত্তাই যাবতীয় বস্তুর উপাদান কারণ। এই সত্তা হইতেই যাবতীয় "ভূত" উৎপন্ন হয়, সত্তা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং সত্তাতে লীন হয়।

"সত্তা" যেমন দৃষ্টিজগতে সর্ব্ববস্তুসাধারণ, তেমনি মনোজগতের সকল ভাবেই বর্ত্তমান। প্রত্যেক প্রকারের অস্তিত্ব আছে। যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, এরূপ বস্তুর প্রকারেরও অস্তিত্ব আছে। সুষুপ্তি অবস্থা মূর্চ্ছাবস্থারও অস্তিত্ব আছে। যদিও তখন কোনও বস্তুর জ্ঞান থাকে না। বাঁজ ও আম্রের জগতের সকল অবস্থারই অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সত্তাই যাবতীয় বস্তুর উপাদান কারণ। অরূপে প্রতিভাত হইলেও এই সত্তার কোনও রূপ নাই। বস্তুজগতে বিভাজ্যরূপে প্রতীত হইলেও সত্তা নিরবয়ব (অংশ মাত্র)। এই নিরবয়ব সত্তাই জগতের নাম বা উপাদান।

এই অনন্ত সত্তা, যাহার রূপ নাই, যাহা নিরবয়ব, অথচ যাহা সর্ব্ব

বস্তুর মধ্যে বর্তমান, তাহা কি জড় বা চেতন? যাহা বস্তু আমাদের নিকট অচেতন এবং মানসিক অবস্থা চেতনরূপে প্রতীত হয়। মানসিক অবস্থাকে চেতন বলি, তাহার কারণ তাহা আপনা হইতে প্রকাশিত হয়; কিন্তু যখন বাহ্য বস্তুর অনুভব হয়, তখন তাহা ও তো প্রকাশিত হয়। বাহ্য বস্তুর মধ্যে যদি চৈতন্য না থাকে তাহা হইলে তাহা প্রকাশিত হয়—প্রতিভাত হয় কিরূপে? জ্ঞান—প্রতিভাত হইবার শক্তি—যেমন মানসিক অবস্থায় আছে তেমনি বাহ্য বস্তুতেও আছে। সুতরাং সত্তা, যাহা বাহ্য ও আন্তর উভয় জগৎ সাধারণ, তাহাও যে চৈতন্যময়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহার সত্তা নাই, যাহা অসৎ (যেমন বন্ধ্যাপুত্র) তাহার প্রতিভাত হইবার ক্ষমতাও নাই।

কিন্তু স্বয়ং-প্রকাশিতা যদি চৈতন্যের লক্ষণ হয়, এবং সত্তা যদি চেতন পদার্থ হয়, তাহা হইলে যাবতীয় সত্তাবান্ বস্তুই প্রকাশিত, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এমন বস্তুর অস্তিত্বও তো আছে, যাহা প্রকাশিত নহে। ইহার কারণ প্রকাশে বাধা—মেঘদ্বারা আবৃত সূর্য যেমন প্রকাশিত হয় না, তেমনি প্রকাশের বাধা থাকায় অনেক বস্তু প্রকাশিত হইতে পারে না; স্মৃতিতে বাধা উৎপন্ন হয় বলিয়া স্মৃতির বিষয় সকল সময় উদিত হয় না। বাধা বিদূরিত হইলে, এই সকল বিষয় স্মৃতিতে উদিত হয়।

আবার ভাব হইতেছে, অথচ প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, এমন বিষয়ও আছে। সুতরাং প্রকাশের সামর্থ্য ও সত্তা সমব্যাপ্ত বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, যে ভাবের বস্তু নাই, তাহারও তদ্রূপে সত্তা আছে।

যাবতীয় সত্তার সহিত তাহার বোধ সংশ্লিষ্ট। মৃত্তিকা কাহারো সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঘটবুদ্ধি হয়। মৃত্তিকা ঘটে পরিণত হইলে ঘটবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কাল্পনিক বস্তু কল্পনামাত্রে। বাহিরে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রত্যয়রূপে তাহার সত্তা আছে। বস্তুস্বরূপ ভাবের ও প্রত্যয়রূপে অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সত্তার সহিত জ্ঞান নিত্য সংশ্লিষ্ট।

আমাদের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্তার প্রকাশ হইলেও প্রকাশের রূপ বিভিন্ন। অনেক সময় অভিজ্ঞতার এক রূপ অন্যরূপ দ্বারা বাধিত হয়। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগরিত অভিজ্ঞতা দ্বারা, ভ্রান্ত প্রতীতি (Illusion) সত্য প্রতীতি দ্বারা বাধিত হয়। কিন্তু সকল অভিজ্ঞতার বিষয়ের মধ্যেই সত্তা বর্তমান। অভিজ্ঞতার একরূপ রূপান্তর দ্বারা বাধিত হইলেও সত্তা কখনও বাধিত হয় না। সত্য, মিথ্যা সকল অনুভবের মধ্যেই সত্তা বর্তমান। যখন রজ্জুতে সর্পের মিথ্যা জ্ঞান হয়, তখন সেখানে "সত্তা" মিথ্যা হয় না, শুধু তাহার সর্পরূপটিই মিথ্যা। স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা মিথ্যা হইলেও সেই স্বপ্নের অনুভূতি যে হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা হয় না। সেই অনুভূতির "সত্তা" অবাধিত থাকে। সুতরাং সত্তা ও চিন্তা (Thought) সমব্যাপ্ত। এই মানসিক সত্তা বা সংবিতের কখনও বাধা হইতে পারে না, কেননা ইহা সর্বত্র বর্তমান। ইহার বাধার কল্পনা করাও অসম্ভব। ইহাই, এই মানসিক সত্তা চৈতন্যই (সৎ-চিৎ) পারমার্থিক সত্তা। এইরূপ উপনিষদের সৎ ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে শঙ্কর যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মানসিক পারমার্থিক সত্তা কোন কালেই বাধিত হয় না। যাহার বুদ্ধির ব্যভিচার নাই, তাহা সৎ, যাহার বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ। ঘট বুদ্ধির (ঘটজ্ঞান) ব্যভিচার হয়, যখন ঘট বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঘট অসৎ। জাগতিক যাবতীয় বস্তু দেশকালে অবিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহারা অসৎ। কিন্তু ইহাদের ব্যাপক "সত্তা" বিনাশ হীন। সত্তার বিভিন্ন রূপই জগৎ ও তাহার মধ্যস্থ সকল বস্তু। এইসকল রূপই অসৎ। কিন্তু যে সত্তার তাহারা বিভিন্নরূপ, তাহার উৎপত্তিও নাই নাশও নাই। তাহাই পরম সত্য। তাহার কখনও বাধা হয় না।

ভগবদ্গীতার ২।১৬ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "অসতের ভাব অর্থাৎ তখন যা অস্তিত্ব নাই। শীত, উষ্ণ প্রভৃতি সকারণ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, কেননা তাহারা বিকার। বিকারের ব্যভিচার হয়। ঘটাদি চক্ষুগ্রাহ্য বস্তু তাহার কারণ মৃত্তিকার রূপেই উপলব্ধ হয়। মৃত্তিকাবর্জিত তাহার উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ কোন বিকারই কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না, এইজন্য সকল বিকারই অসৎ। ঘটাদি কার্যের কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না এই জন্য তাহারা অসৎ। কিন্তু সেই জন্য সর্বথা অবস্তু হয় না। অর্থাৎ কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, বলা যায় না। কেননা সর্বত্রই দুইটি বুদ্ধির (বোধ-জ্ঞান) উপলব্ধি হয়—সৎ বুদ্ধি (অস্তিত্বের জ্ঞান) ও অসৎ বুদ্ধি (অস্তিত্ব হীনতার জ্ঞান)। যাহার বোধের ব্যভিচার নাই, তাহা সৎ, যাহার বোধের ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ। জ্ঞানে সৎ ও অসৎ—এই দুই বিভাগ আছে বলিয়া, সকলেরই এই দুই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়।—সাধারণাধিকরণ ন্যায় (দুই বোধের অধিকরণ এক বলিয়া)। ঘট, পট, হস্তী প্রভৃতিতে ঘট, পট, হস্তী ইত্যাদি বোধের ব্যভিচার হয়, কিন্তু সৎ বুদ্ধি অর্থাৎ সত্তার বোধের ব্যভিচার হয় না। সুতরাং ঘটাদি জ্ঞানের বিষয় অসৎ, কিন্তু সত্তা জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহা সৎ। ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সত্তার বোধেরও ব্যভিচার হয় ইহা বলা যায় না, কেননা ঘটের অবর্তমানে পটাদিতে তাহার উপলব্ধি হয়। "সদ্বুদ্ধি বিশেষ বিষয়া" এই জন্যও তাহার নাশ হয় না। এক ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ঘটবুদ্ধি দেখা যায়, সুতরাং ঘটবুদ্ধিকে অসৎ বলিবে কেন? ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্যত্র সত্তা বোধ হয় বলিয়াই তো সত্তাকে সৎ বলা হয়। ঘটবুদ্ধি যখন এক ঘটের বিনাশের পরে অন্য ঘটে হয়, তখন তাহাকে সৎ বলিবে না কেন? ইহার উত্তর ঘটবুদ্ধি পটাদিতে হয় না।" সত্তার অনুভব প্রত্যেক বস্তুতে হয়—উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হয়। এই জন্যই উহা নিত্য বা সত্য।

বাংলা সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা

সত্যরঞ্জন রায়

কালের ঘানি এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। প্রবহমান স্রোতের ধারায় ব'য়ে নিয়ে চলেছে আদিম যুগের নির্বাক ভাবলোক। আদিম মনের চিরন্তন মানস-আননী সেদিন সংকেতময় চোখের ভাষায় অনাখ্যায়িত যৌবনের সংগমতীর্থে গান করেছিল যে মানুষ, তারও মনের পাতায় ছিল অঙ্কিত, অস্পষ্ট, অপ্রচারিত সাহিত্য-রস-সুধা। হয়ত তার ছিল না মার্জিত ভাষা, ছিল না অলংকার, ছন্দ, অর্থগৌরব আর ভাবের বৃদ্ধা ; কিন্তু আদিম রক্ত মিশেছিল অন্তরের কোমল পলিমাটিতে। অন্তরের এই রূপটিকে অতিক্রম করেও আর একটি রূপ ধরা দিল। সে হলো আদিম মানবের অতিপ্রাকৃত রূপ। সে কোমল নয়, —সে ছিল নিষ্করুণ কঠোর—মমতাহীন নিষ্ঠুরের ভয়াল ভ্রূকুটি। এতৎ সত্ত্বেও বিভিন্ন রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সে যুগের সেই ভাবলোকের মর্মবেদনা আজও প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। বাইরের সেই কঠোর দৈহিক রূপ মানব-হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিতে পারে নি। সেদিনকার আদিম মানবের দৈহিক বলবীর্য পরাজিত হয়েছিল মানব-প্রাণের বলিষ্ঠতার কাছে। সেই প্রাণ-ধর্ম আজও আকর্ষিত হ'য়ে চলেছে। উৎসিত্ত নর-নারীর পারস্পরিক মানুষপাশ, সংকেত শব্দে অব্যক্ত ব্যঞ্জনায় বহিঃপ্রকাশ ধীরে ধীরে পল্লবিত হ'লো—ভাব এলো, এলো ভাষা। তারই সুর যুগ অতিক্রম করে আর এক যুগে নিয়ে এলো ভাব ও ভাষার সমন্বয় বৈচিত্র্য। সেখা দিল অন্তরের ভাব-মাধুর্য ও প্রেম-সত্যের বিকাশ—ভাষো ও গানে। তারপর আর একদিকে, জীবনস্রোত বিভিন্ন পথ ও মতের জটিল জটালালে বিকীর্ণ হ'য়ে এলো, কিন্তু সমাজের আবেগ হলো স্ফীত। অবরুদ্ধ সেই আবেগ বিভিন্ন পথে গতি নির্ণয় করে এগিয়ে গেল। কেবলাম কত বিচিত্র মানুষের কত বিচিত্র পথ। এলো জীবনে রূপকথা গল্প উপন্যাস। সেই ভাষাহীন যুগের তীর ঠেলে চলতে চলতে মনের আবেগ ছন্দোবদ্ধ সংগীত মন্ত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রচিত হলো ভাষা-গাথা-উপাখ্যান আর সংগীত। কালের মন্থনে মহাকাল পরিবর্তনের মন্থিরা বাজিয়ে চলে। সেই আদিমরাত্রির সংগীত জটিলতাপূর্ণ মানবমনকে নতুন জগতের দ্বারে এনে পৌঁছে দিল। খণ্ডিত জীবনের সংঘাত-চাঞ্চল্য-ঘটনার হলো আত্মপ্রকাশ। মানবজীবনের অপরিমিত অনন্ত ঘটনা মানুষ যেমন রচনা করে চলেছে, তেমনি বিরাট জীবনের পরিধিচ্যুত বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ একটি ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে চকিতে মিলিয়ে যেতে লাগলো। মানবের মনে জাগলো জিজ্ঞাসা। বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোকে রূপায়িত করে চলেছেন যাঁরা, তাঁদেরকেই ছোট গল্পের কথক বলা যেতে পারে।

শিশু সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সামান্য একটু বদলে বলা যেতে পারে—সাহিত্য শিশুর ভূমিকা রচনাই আমার উদ্দেশ্য। পূর্বে যে আলোচনা করেছি, সেই আলোচনায় চিরকালই আমরা দু'জনকেই দেখেছি—নায়ক আর নায়িকা। আদিম যুগের নায়ক নায়িকা আজো মানুষের অন্তরের বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সেই যুগেরই সুর বাজিয়ে চলেছে। সমাজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কোন ভূমিকাই নায়ক-নায়িকার উপাখ্যানের মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য প্রথম যুগের নায়ক-নায়িকার আদি রসাত্মক মর্মকথার আত্মীয়স্বজনদের ঠাঁই হয়েছিল, কিন্তু শিশুদের স্থান নির্ণীত হয়নি। তারপর এমন এক যুগ এলো, যখন গল্পের প্রয়োজনে শিশু চরিত্রের আবির্ভাব দেখা দিল।

আধুনিক যুগের সমালোচকবৃন্দ উপন্যাস ও গল্পের পাত্র-পাত্রীর বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সূত্র ধরে বিশ্লেষণের বিচিত্র সূত্র অতিক্রম করে কোন চরিত্রের মূল্যায়ন করেছেন, আবার কোন চরিত্রের প্রতি অবিচার করেছেন। কোন কোন সমালোচক পাত্র-পাত্রীর বিষয় পরিত্যাগ ক'রে শিশুর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য শিশু চরিত্রের আলোচনার কথা বলতে গিয়ে আমার একটি কথা বলারও প্রয়োজন আছে। অধিকাংশে সমালোচকই শিশুর প্রতি লেখকের মমত্বপূর্ণ অন্তরের দৃষ্টিকোণের কথা বিচার করেছেন। লেখকই সমালোচকদের কাছে বড় হ'য়ে উঠেছেন—শিশুর চরিত্র বিশ্লেষণ অনেকাংশে গৌণ রেখা গেছে। গল্পের প্রয়োজনে যেখানে শিশু চরিত্র এসেছে, তাকে নিয়ে আমার ব্যস্ত হবার কারণ অতি অল্প। সে শিশুচরিত্র গল্পের অতিবেগ, এমন কি অনেক সময় উপন্যাসের মূল স্রোতোধারাকে বিচিত্র পথে পরিবর্তন করে, সেই সকল চরিত্রই আমার প্রধান বিচার্য বিষয়। সে শিশু চরিত্রকে লেখক সচেতন মননশীলতার দ্বারা পরিচালনা করেন, সেই চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিল্পীমনের অন্তরালে হারিয়ে যায়। পরিবেশের অবগুণ্ঠনে শিশুচরিত্রের জন্মলাভ হয়, বিকাশ হয় এবং ঘটনার আবর্তনের আবর্তে ঘটনাকুল রূপ নেয়, সেই চরিত্রের মধ্য দিয়েই সৈন্দিক সংগতি ও রসবোধের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ প্রসংগে শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশায়ের শিশু চরিত্র 'চরণের' কথা বলা যেতে পারে। ছোট শিশু 'চরণ,' অথচ ঘটনার আবর্তে পড়ে সেই চরণ চরম গল্পের নায়কদিই বলা যায়। বিরাট পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের তরংগে খেলে খেলে কুসুম ও বৃন্দাবনের জীবনে। সন্ধান পাওয়া গেল অপ্রকৃতিস্থ সমাজের মুক্তির আবর্জনায়। সেই অসংখ্য ঘটনার অন্তরালে চরণের একটি নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। মাতৃহীন চরণ বিমাতার কাছে আশ্রয় পেয়েছিল, অথচ পিতার অবাধ্য হয়েও সে দেখেনি। যেদিন গ্রামে ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, সেইদিন থেকে এই শিশুর মনে ঘর বেঁধে

দিয়েছিল। চরণ মা'র কাছে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরে আসতে হয় নিজের গ্রামে—মৃত্যুর দ্বারে। কিন্তু মৃত্যুর পেছনে চরণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পিতা মাতার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে মিলনের সেতু তৈরী করে দিয়েছিল। এই চরিত্রই আপন চারিত্রিক মাধুর্যে নির্মল ও সুন্দর। লেখকের পরিচালন কৌশল নিয়ে এই চরিত্রটি গড়ে ওঠে নি, বরং স্বতঃস্ফূর্ত গতির বেগে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে নিয়েছে।

যে শিশুদের নিয়ে আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষিত হবে, তাদের বয়ঃসীমা সম্বন্ধে সঙ্গত প্রশ্ন মনের কোণে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, শিশুর পর্যায়ে আমরা কাকে ফেলি? কারণ পণ্ডিত মশায়ের চরণও শিশু, আবার রামের সুমতির রামকেও শিশু সাহিত্যের আওতায় ফেলে বিশ্লেষণ করতে দেখা গেছে। তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতার গোপালও শিশু, আবার শরৎচন্দ্রের মেজদিদির কেষ্টও কি শিশু? রবীন্দ্রনাথের গল্প গুচ্ছে যে কতরকম শিশু, বালক ও কিশোর চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তার কথা বিশদভাবে আলোচনা না করে এটুকু বলা যায় যে আলোচনার সুবিধের জন্যে বয়ঃসীমাকে কেন্দ্র করে শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং শিশু, বালক ও কিশোর চরিত্রের যথাক্রমে সাধারণত বয়ঃসীমা থাকবে—আট, বার ও তদূর্ধ্ব। ভ্যামিতিক ও গাণিতিক নিয়মানুসারে এই পরিমাপ সর্বদাই মেনে চলতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়ই থাকতে পারে না। হতে সাত বৎসরের এক শিশু চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি দশ বৎসর বালকের চরিত্রে প্রতিফলিত হ'তে দেখা যেতে পারে, তখন সেই বালকের চরিত্রকে শিশু চরিত্রের আওতায় এনে বিশ্লেষণ করলে কোন দোষে অপরাধী হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং বয়ঃসীমাকে কেন্দ্র করে শিশুর এই শ্রেণী বিভাগ তুল বলে পরিগণিত হবে, যতক্ষণ না শিশুর মানসিক সচেতনতার বিষয় তাবুদ্ধি। যাঁরা শিশু সাহিত্যের বিচার করেন, তাঁরা যদি এই দিকে বিশেষ নজর দিয়ে শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করেন, সে আলোচনা যথাযথ হবে বলে মনে করি।

উনবিংশ শতকে যে সকল লেখক সাহিত্যের আসরে মানব জীবনের রূপায়ণে তৎপর ছিলেন, তাঁদের লেখনী শিশু মনের সন্ধান পায়নি। ভাবতেও পারেনি যে মানুষের অন্তরে যে আবিরলের ঝরণা-ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই ঝরণা স্রোতের সঙ্গেই শিশু চরিত্র জটিলতার বন্ধ ঘরে আত্ম-গোপন করেছিল। নায়ক-নায়িকা, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের গ্লানি কখনও বাড়িয়ে দিয়েছে এই শিশু, বালক বা কিশোর; আবার মিলনের সেতুও সৃষ্টি করেছে এই চরিত্রগুলি।

প্রাচীন যুগের অগ্রগতির স্তরে স্তরে মানব জাতির জীবনযাপন বিচিত্র উন্মেষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে এসেছে। আদিমযুগের জীবনধারায় যু' একটি প্রবৃত্তিরই ছিল প্রাধান্য প্রবল। জনসংখ্যার আধিক্য আর ঘটনার বাহুল্য মানব জীবনে এনেছে বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য আর তাই সাহিত্যে নায়ক-নায়িকাই ছিল প্রধান। পরিবর্তনের আবর্তের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্র। নায়ক-নায়িকার অন্তরে নতুন করে সৃষ্টি করলো সংঘাত। ঐ পার্শ্বচরিত্রগুলি এক একজন 'সংঘাতের' প্রতিমূর্তি। আজকের সাহিত্যেও শুধু এঁরা নয়, এমনি সংঘাত সৃষ্টি ও সমাধানের মূলে রয়েছে শিশুর অকৃত্রিম ও সাবলীল ভূমিকা।

বেদ ও পুরাণের সমকালিকতা ও স্বাধর্ম্য

শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার

বেদ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বা 'সংহিতা' বা 'যজ্ঞ-ব্রাহ্মণ' বা 'ঋ এবং বেদ'-লক্ষণযুক্ত। পুরাণ শব্দের অর্থ—'পুরাকালে যে নিয়ে যায়', 'পুরাতন যে হয় না' ইত্যাদি। বেদে প্রধানতঃ যাগযজ্ঞ বা উপদেশের কথা ও বহু ঋষি ও দেবতা প্রভৃতির কাহিনী আছে; আর পুরাণে পঞ্চ বা দশ লক্ষণের মধ্যে গুণগুলির স্থান ত আছেই, উপরন্তু ধারাবাহিকভাবে বহু বংশ বর্ণনা আছে। এজন্য পুরাণ ও ক্ষত্রিয় কাহিনীর মূল্য পার্জিটারএর মতে বেদের অপেক্ষাও অধিক। অগস্ত্য, বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ নয়), বিশ্বামিত্র প্রভৃতি শতাধিক বৈদিক ঋষি ও সোমা যুদ্ধ, পুরুরবা, ঐল প্রভৃতি রাজর্ষি বা রাজার কাহিনী বিস্তৃতভাবে পুরাণে আছে।

বহু পুরাণ বা উপপুরাণে ৪।৬ শত বৎসর পূর্বের কাহিনী থাকায় বেদ পুরাণ-সঙ্কলনের যুগ ১৫।১২ হাজার বছরের মধ্যে তা অনুমান করা যেতে পারে, কিন্তু সেজন্য পৌরাণিক যুগকে ঐ সময়ের ধরা যুক্তি-বিরুদ্ধ। সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন পরবর্তী রাজাদের বংশপরম্পরা রক্ষা করা পুরাণের কাজ হওয়ায় পৌরাণিক যুগের অর্থ হবে ৷(প্রাবৈদিক যুগসহ?) বৈদিক যুগ+পরবর্তী যুগ। পুঁথির যুগ ধরতে গেলে বেদ পুরাণাদির পুঁথি ৪।৬ শত বৎসরের অধিক হবে না। এই সমস্ত বিচার কালে অবিশ্য পুরাণ নামও অসঙ্গতঃ বোধ হয় না। আবার প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতি হতে উক্ত সাহিত্যের কাহিনীর কণিকা বা আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

সংহিতার মধ্যে পাঠভেদ তেমন নাই বলা চলে। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাঠভেদ ও প্রকরণাদির ভেদ আছে। উক্ত ত্রুটিগুলির সঙ্গে অতিরঞ্জন বা অলৌকিক কাহিনী যেমন পুরাণে আছে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও প্রায় তদ্রূপ আছে। এই স্বাধর্ম্যেরই কতকগুলির উল্লেখ করছি। অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসেও ঐরূপ আছে।

আকৃতিগত বর্ণনীয় পুরাণে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চানন, ষড়ানন, দশানন, কবন্ধ, ইন্দ্রকীল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বেদের সংহিতা প্রভৃতিতেও বিশ্বরূপ আর্য জাতি, ত্রিশীর্ষ ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ, বসুমনস বৃহস্পতি, 'অজাস' প্রভৃতির বর্ণনা আছে। চারজন যক্ষ, পাঁচজন পাণ্ডব, বড়যাকৃতি বিশ্বেদেবা প্রভৃতির মধ্যে 'টোটেম' (Totem) এর অথবা বিভিন্ন গোত্রের সমান নামা ব্যক্তির উল্লেখ থাকা সম্ভব।

লিঙ্গ পরিবর্তন বিষয়ে মহাভারতাদিতে দেখি মনু কন্যা ইলা সুদ্যুম্ন নামক রাজায় পরিণত হইয়াছেন, ভীষ্ম পরিত্যক্তা অম্বা তপোবলে বিশ্বতীর্থ পেয়েছেন, অর্জুন স্ত্রীর মূর্তিতে অজ্ঞাতবাস করেন ইত্যাদি। ঋগ্বেদ ৮।১ ও সায়ণভাষ্য হইতেও দেখা যায় যে মেধাতিথিপুত্র অসঙ্গ দেবতার শাপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন ও পরে দেবাতিথি ঋষির প্রভাবে পুংস্ত্বপ্রাপ্ত হন। এইভাবে পরবর্তিকালের ইশ্বার বেদ বৈদিকের ভাষায় আষ্টার—দেবী নামে পরিচিত হন। বর্তমানেও এরূপ দেখা যায়।

দেবতাদের দূত্য সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণে উল্লেখ পাওয়া দুষ্কর। আবার বেদ শব্দের ও দূত্য বা প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির বহু ব্যাখ্যা আছে। ঋগ্বেদ ১০।১৭।১ এ যমের দূত্য ও বিশ্বামের স্ত্রীর দূত্য, পঞ্চপথ ব্রাঃ ১৪।৩।১।১৫ অগ্নি বা বসুর বিশেষভাবে বিষ্ণুর দূত্য ও অগ্নিষ্টোমকে পশুদের কথা আছে। মৎস্য পুঃ (আঃ) ৮।১৮৫ ইত্যাদি বৈশ্বানরের দূত্য ও স্কন্দ পুঃ (মাঃ) নাগর ২৯।১২৫ প্রভৃতিতে অগ্নির সহিত সংগ্রামে দেবতাদের দূত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সনকাদি ব্যক্তিদের চরিত্র বা সাদৃশ্য দুই ঘটনার মিশ্রণ পুরাণে দেখা যায়। অথর্ব ঋষির স্ত্রীর সহিত সুহোত্র-পুত্র ঋষির ঋষির কামের যৌথভাবে ঋষির সংযোগ (বায়ু প্রভৃতি দ্রঃ), হরিবংশাদিতে বৈবস্বত হর্যশ্বের পুত্র বহুর বাণরাজের দৌহিত্রীকে প্রবেশ বা দুর্বাসাবংশীয় দুরন্তের বংশের সোমপুত্র-বংশে প্রবেশ প্রভৃতি দেখা যায়। বেদে এরূপ কাহিনী আছে কিনা বলা শক্ত ; তবে মনু কন্যা ইলা (বায়ু পুঃ মতে)র সমস্ত বৈত্রাবরুণ ঋষিকে (ইহার মনুপুত্র নিত্রি ইক্ষ্বি পুরোহিত) পাওয়া যায়, আর সম্বন্ধে এক স্থলে গাধী বিশ্বামিত্রাদির কালের বশিষ্ঠ ঋষি স্থানে পাঠভেদে মৈত্রাবরুণ বশিষ্ঠ বলা হয়েছে—এটী মিশ্রণ হতে পারে ; অথবা যেমন সংগ্রহ করলে ৩টী পরীক্ষিত জনমেজয়, ৩টী কাণ্ব বেদাতিথি, ৩টী সহস্রের নাম প্রভৃতি পাওয়া যায় এখানে সেরূপও হতে পারে।

অনেকটী মহাপুরুষ বা অবতারাদির বর্ণনা দুই সাহিত্যেই দেখা যায়। ঋগ্বেদ ১০।৯০।২ সহস্রাক্ষ পুরুষের বর্ণনার মত অথর্ববেদাদিতেও তাঁর বর্ণনা দেখা যায়। এইভাবে শতপথ ব্রাঃ র মনু-মৎস্য আখ্যান ও ধ্রুব-কাহিনী তৈ ব্রাহ্মণ সংহিতার বরাহ কাহিনী, ঋগ্বেদ ১।২২।১৯-২৮র বামনকাহিনী প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণোক্ত কাহিনীর অল্পবিস্তর সাদৃশ্য দেখা যায়। রামায়ণ রাম ঋগ্বেদ ১০।১১১-র ঋষি আর এক বেদবৈষম্য কুকের কাহিনী ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে। বেদের পুরাণাদির বিভিন্ন মতে ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্ক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও দেবতার অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় উল্লেখও বহুস্থলে করেছেন।

অথর্ববেদের তুলনায় অল্প হলেও ঋগ্বেদ ১০।১৫৮ প্রভৃতি ৭টী স্থলে বন্ধ্যাকরণাদি সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণেও বন্ধ্যাকরণ প্রকরণ আছে। বিবিধ বহু ঘটনার মধ্যে শুনঃ শেপ, দীর্ঘতমা, অপত্য ও লোপামুদ্রা, গৃৎসমদ, বসিষ্ঠ (বসিষ্ঠ বানান বহু পুরাণে আছে)—বিশ্বামিত্র কাহিনী, নহুষ, দেবাপি-শান্তিনু প্রভৃতির বর্ণনায় ঋগ্বেদ ও পুরাণের মধ্যে বহুস্থলেই সাদৃশ্য আছে।

সোমা যুধ প্রভৃতি পরাধিক ঋগ্বেদীয় ঋষি ও অন্যান্য বেদোক্ত রাজন্যাদির কাহিনী পুরাণে বংশবর্ণনাদিতে আছে।

জৈমিনীয় ব্রাঃ, শতপথ ব্রাঃ, ঐতরেয় অরণ্যক প্রভৃতির মধ্যে বহুস্থলে গুরুপরম্পরায় আদিতে স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মের নাম আছে। পুরাণমতে ব্রহ্মা বেদ ও পুরাণের প্রবর্তক বা প্রচারক। ২টী উদ্ধৃতি (বহ্নিপুরাণমতে) দিচ্ছি।

"প্রেতায়াং প্রথমে ব্যাপ্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।"

"পুরাণং সর্ববাঙ্ময়ানাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।"

এগুলি, বিশেষভাবে পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা অন্ততঃ এই বোঝা যায় যে পুরাণে বৈদিকযুগের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিবরণ ও পরবর্তীকালের ঘটনাও আছে। মতভেদ থাকলেও মৎসংকৃত অতিসংক্ষিপ্ত মতসূচী নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

১।	২।	৩।	৪।
১। বিবস্বান্	১। সোম	...	...
৩২। যাজ্ঞাতা	৩৪। দুষ্মন্ত	...	...
৩৩। হর্যশ্ব	৪১। অজমীঢ় ১ম	...	৩৩। হর্যশ্ব
৪০। হরিশ্চন্দ্র	৪৩। সুহোত্র	৫৯। সুহোত্র	৪০। বসু
৬১। সগর	৬৮। পরীক্ষিৎ	...	...
১০৯। বৃহদ্বল	১৪৩। অভিমন্যু ১৪৮। জয়ানক ১৪২। কুরু		

(৩১০-গুঃ পুঃ ?)

১৬৭। গৌতমবিদ্ধার্থ ১৭৬। শতানীক ১৮১। বিম্বিসার (৫০০-গুঃ পুঃ ?)

মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সন্ন্যাসগমনকালে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি

১

বিষ্ণুপ্রিয়ে পতিপ্রাণে কঠোরোঽয়ং কলের্যুগঃ।
বৈরাগ্যমেব মার্গোঽস্মিন্ আবয়োর্ মহাস্থিতিঃ ॥১
অন্তর্যোগো বহির্ভেদো নাস্তি মে গতিরন্যথা।
বিরহাননসম্ভপ্তা মা ত্যজ পতিব্রতম্ ॥২

২

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
নামকীর্তনযজ্ঞে মে ন ব্যাঘাতঃ কথঞ্চন ॥৩
পিতৃহীনাঃ সুতাঃ সন্তি জীবন্তি হি কথঞ্চন।
মাতৃহীনাস্তু তে নষ্টাঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥৪
সন্ত্রাসার্থং নবদ্বীপে বাসঃ প্রাপ্তো ময়ি স্থিরম্।
মাতুঃসেবা তথা কার্যা নাথা দুঃখব্যপোহতি ॥৫

৩

পঙ্কে নিমজ্জিতং রাষ্ট্রং হিংসায়েরপ্লুতিতম্।
সদা সংরক্ষিতব্যং তে ন রাষ্ট্রং ধর্মবর্জিতম্ ॥৬
ত্বং পঙ্কজিনী ভূত্বা পঙ্কং সর্বং বিদূরয়।
বিষ্ণুপ্রিয়ে জগদ্ধিতে পূর্ণাং শক্তিং প্রদেহি মে ॥৭

৪

মহাপ্রভোর্মহাশক্তে মহাব্রতপ্রপালিনি।
যতীন্দ্রবিমলং দীনং পাদপুষ্পমলং কুরু ॥৮

অনুবাদক

অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী

সন্ন্যাস গমনকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি।

পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া! এই কলিযুগ অত্যন্ত কঠোর।

এই যুগে একমাত্র বৈরাগ্যই মুক্তির পথ। সেজন্য আমাদের একত্রে বাস সম্ভবপর নয়।১

অবশ্য আমাদের বাহিরের দিক থেকে বিচ্ছেদ হলেও অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নেই।

কিন্তু এইভাবে বিরহানলসন্তপ্তা হয়েও তুমি তোমার এই শ্রেষ্ঠ জীবন-ব্রত ত্যাগ করোনা।২

হরির নাম, হরির নাম, কেবলই হরির নাম।—এই নাম সঙ্কীর্তনরূপ মহাযজ্ঞে যেন কোনও প্রকার ব্যাঘাত না হয়।৩

সন্তানগণ পিতৃহীন হলে অবশ্যই দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করে।

কিন্তু মাতৃহীন হলে তারা মনে প্রাণে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।৪

সেজন্য সন্ন্যাসের কল্যাণার্থে তোমাকে নিরন্তর নবদ্বীপেই বাস করতে হবে।

তুমি সেখানে আমাদের জননীর সেবাও করবে, যাতে তিনি কোনও ক্রমেই আমার বিচ্ছেদ দুঃখকে দুঃখ বলে গণনা না করেন।৫

৩

আমাদের এই দেশ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত ও হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তুমিই তাকে সর্বদা রক্ষা করো। কারণ, রাষ্ট্র ধর্মহীন হয়ে চলতে পারে না।৬

সেজন্য তুমি স্বয়ং পঙ্কজিনী হয়ে সমস্ত পঙ্ক বিদূরিত কর।

জগৎকল্যাণকারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া তুমিই আমাকে পূর্ণ শক্তি প্রদান কর।৭

৪

মহাপ্রভুর মহাশক্তি এবং মহাব্রত পালনকারিণী জননী বিষ্ণুপ্রিয়া!—

তুমি দীনহীন সন্তান যতীন্দ্রবিমলকে তোমার শ্রীচরণের ফুলচন্দন পুষ্পদল বা পাপড়ি কর, অর্থাৎ তোমারই শ্রীচরণে সামান্যতম স্থান দাও।৮

মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার উত্তর

মন্দাক্রান্তা

বিশ্বং তব পরমো বিকাশঃ।
অনলেঽনিলে ভূচিরন্তরীক্ষে
স্ফুরতি তে সুষোড়শহাসঃ ॥১
প্রিয়াবেশবাসাং পাশমপ্রকাশিনী
"প্রিয়া" তব ভবতু প্রাণেশ।
ত্বমেব মম শরণং ত্বমেব মম ভরণং
ত্বমসি সাধনং বিশেষ ॥২
জননীক্রন্দনদারং সংসারপারাবারং
স্রোতোধারা-বারণ-ব্রতিনী।
শ্রীগৌরাঙ্গচরণং হারাকারকরোরং
বিলোড়ন প্রশমন-বিধায়িনী ॥৩

নাথপাদপল্লবতলে জন্মান্তরতপঃফলে
সেবাবরা সুখদায়িনী ॥
ইতঃ তব প্রসাদায় রূপং স্বকং প্রকাশয়
নূনমস্মি প্রিয়ঃসাধিনী ॥৩

২

বিশালপাষাণার- সঞ্চারিমানাকার-
"প্রিয়া" তব নবচক্ষুরগোচরা ।
যদি জগদ্ধরেন্দুবরে শ্রীগৌরাঙ্গনটবরে
ভবিষ্যতি ক্ষীণা জলধারা ॥৪
অন্তরে চিরবন্ধে ধরিত্রীপরমুকান্তে
ক্ষুদ্রা বল্লরী মূর্ত্তাপরী ।
মহাকাশে বিস্তরে ধ্যানযোগপ্রপঞ্চরে
স্নেহধারা বহুপাত্রোদরে ॥৫
তপস্যাতপনে "প্রিয়া" তেজোরূপলবতঃ
পরং স্থাস্যতি তে বিরহবিধুরা ।
ব্রহ্মাণ্ডহরচন্দ্রোর- ক্ষীরপ্রবাহাকার-
বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরপ্রকারা ॥৬
সেবাভক্তিসংবলিতে স্নেহযত্নপ্রেমপথে
দূরিষ্যোরণিকর্ষিকাকারা ।
গৌরনরাবতীর্ণে যদি বিষদগীতিতে
বিষ্ণুপ্রিয়া দুর্লভ-তারপরা ॥৮

ধরণীতারহরণ- নাথপদস্মরণ-
দৃঢ়সংনদ্ধ, জবেরং নূপুরম্ ;
পতনদ্বারবিদিনে দুর্গপথকিকরণে
কণ্টকং ন, কুসুমং সুকুমারম্ ॥৯

৩

মাতুলালয়সংবলো বীরনো ধরিত্রিবিহলো
ওপতি হি জননীং বারংবারম্ ।
ত্বমসি গৌরবিধুরা তারাসারপরা
তারয়সি যে পিতরমনিবারম্ ॥১০
ত্বং ভর্ত্রী কর্ত্রী ভবসি বিশ্বধাত্রী
পরং স্থিরজ্যোতিঃ পাদং পাদম্ ।
অন্তেবসি শক্তিঃ পরেন্দ্র মহাগতিঃ
যাত্রাযাত্রেঽপারে পারম্ ॥১১
ধরণীপাপহরে ভক্তিপুক্তিসারে
পাদং যদি বিদেহি শোকহরম্ ।
ময়ৈকাধারে হৃদয়েশ্বরসারে
শ্রোত্তাসর ধরিত্রেয়াকুমম্ ॥১২

অনুবাদ

মহাপ্রভুর প্রতি

মদীয়ার ঈশ্বর !

এই সমস্ত বিশ্বই তোমার পরম স্বরূপের মূর্ত প্রকাশ। নেহরু পৃথিবীর সর্বত্রই—অগ্নিতে, বায়ুতে, জলে, চিরস্থির নীল আকাশে তোমার বিশ্বমোহন হাস্য স্ফুরিত হচ্ছে ॥১

তোমার প্রিয়া ও তাঁর প্রিয়ের আদেশ পালন করতে যেন সর্বদাই সচেষ্ট হয় প্রাণেশ্বর !

একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়, একমাত্র তুমিই আমার ধারক ও পালক, তুমিই আমার সাধন ভজন, বিশ্বেশ্বর ॥২

জননীর অশ্রুধারায় যে সমুদ্রের সৃষ্টি হবে, তার স্রোতোধারা রোধ করাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

একইভাবে তোমারই ভক্তবৃন্দের হাহাকার ধ্বনিতে যে আলোড়ন বিলোড়নের উদ্ভব হবে, তাও আমি প্রশমিত করবো ॥৩

আমার জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলস্বরূপ তোমারই যে শ্রীচরণ আমি লাভ করেছি, সেই শ্রীচরণতলেই যেন আমি সর্বদা বসে থাকতে পারি, তোমারই সঙ্গে যেন সর্বদা থাকতে পারি।

তোমার মঙ্গলহস্ত সর্বদাই আমার দিকে প্রসারিত করে রাখ, তোমার পূত রূপ সর্বদাই আমার সম্মুখে প্রকাশিত কর, আমি যেন সর্বদাই তোমার প্রিয় কার্য সাধন করতে পারি ॥৪

তুমি শুচিস্নাত সমুদ্র, তার মধ্যে নামাবৃতপারিনী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রা বৎসী হয়েই, তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া থাকতে চায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

নটরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ ! তুমি জগদ্ধারণকারী উত্তুঙ্গ পর্বত, তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে একটী ক্ষীণা পার্বত্যনদী হয়েই প্রবাহিতা হতে চায় ॥৫

তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যময় অনন্ত চির-বসন্ত,

তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে একটী ক্ষুদ্রা লতা হয়েই তোমার স্নেহ লাভ করতে চায়।

তুমি ধ্যানগম্ভীর বিপুলবিস্তৃত মহাকাশ,

---

(৩) অর্থাৎ তুমি আজ গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেও আমি তোমার প্রতিচ্ছবি এই জগতের সর্বত্রই নিয়তন তোমাকেই দর্শন করবো। তোমারই সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হবো।

(৮) বিষ্ণুপ্রিয়ার আদরের সংক্ষিপ্ত নাম প্রিয়া।

(১) গৃহত্যাগের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ জননী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুটী নির্দেশ দিয়েছিলেন—(ক) সন্তান-বিয়োগবিধুরা জননী শচীদেবীর সেবা ও শোকে সান্ত্বনা প্রদান এবং (খ) প্রভুর বিরহক্লিষ্ট ভক্তবৃন্দের পরিপালন। এই দুটীরই উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে।

তোমার বিভূতিরা তার মধ্যে একটী বস্তুকণধারিণী মেঘমালা হয়েই বিলীন হতে চায়।৬

তুমি প্রচণ্ড তপস্যার মধ্যাহ্ন-ভাস্কর,

তোমার বিরহ-বিধুরা বিভূতিরা তার মধ্যে একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোককণারূপে সুন্দরভাবে দেদীপ্যমানা হয়ে থাকতে চায়।৭

গৌরাঙ্গ! তুমি ব্রহ্মাণ্ডের হৃৎপিণ্ড, তোমার বিভূতিরা তার মধ্যে একটী ধীরে-প্রবাহিতা ক্ষীণা রক্তধারা হয়েই সঞ্জীবিতা থাকতে চায়।৭

তুমি সেবাভক্তিসংবলিত মঙ্গলময় প্রেমপথ,

তোমার বিভূতিরা তার মধ্যে অর্পিত ধূলিরাশির একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা হয়েই পড়ে থাকতে চায়।

গৌরাঙ্গ! তুমি বিশ্বের সঞ্জীবনকারী মহাসঙ্গীত,

তোমার বিভূতিরা তার মধ্যে একটী মৃদু সুর হয়েই নিরন্তর ধ্বনিত হতে চায়।৮

৫

প্রভু! পৃথিবীর পাপতাপহারিণী তোমার যে শ্রীপাদপদ্ম,

আমি যেন তার নূপুর না হয়ে একটী ক্ষুদ্র নূপুর হয়েই রণিত হতে পারি।

তোমার বিচরণের যে অতি দুর্গম, পতার বনপথ,

আমি যেন তাতে কণ্টক না হয়ে, একটী ক্ষুদ্র কোমল কুসুম হয়েই বিকশিত হতে পারি।৯

৬

মাতৃপদসম্বল দীনাতিদীন ভক্তবিমল জননীকে বারংবার এই কথাই সবিনয়ে নিবেদন করছে :—

[তুমি পিতা গৌরমহাপ্রভুকে বিদায় করে যাই বলনা কেন, আমি নিজে জানি যে,] তুমিই এভাবে গৌরবিরহক্লিষ্টা হয়ে বিলাপ করলেও প্রকৃতপক্ষে তুমিই তো তারা বা তারণকারিণী, তুমিই তো জগতের শ্রেষ্ঠ সার-পদার্থ—অপরপক্ষে তুমিই শ্রীগৌরাঙ্গের অমরত্ব নির্দেশিত প্রেমাশ্রু ধারাপূত নয়নতারা।১০

তুমিই ত আমার পিতা শ্রীগৌরাঙ্গকে নিরন্তর রক্ষা কর।১০
এ ভাবে প্রকৃতপক্ষে তুমিই তো বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী,
তুমিই তো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেয়ঃ পরম শাশ্বত জ্যোতিঃ
তুমিই তো সকল শক্তির পরমা শক্তি, সকল গতির পরমা গতি,
তুমিই তো অকূল ভব-সমুদ্রে একমাত্র কূল।১১
পৃথিবীর পাপহারিণী ভক্তি ও শক্তির সারস্বরূপিণি জননি!
তোমার সেই লোকতারী শ্রীপাদপদ্ম আমাকে স্থাপন কর।
পরমমঙ্গলময়ি সন্তানস্নেহসর্বস্বে জননি!

তোমারই হৃদয়-উদ্যানে দীনাতিদীন ভক্ত ভক্তীন্দ্র-বিমলরূপ যে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অঙ্কুরকে তুমি পরম স্নেহভরে স্থান দিয়েছ, তাকেই তুমি আজ কৃপা করে বিকশিত করে তোল।১২

---

১০) এখানে "তারাসারপরা" এই পদটী দুই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে—(১) তারা সারপরা বা সারভূতা জগত্তারিণী; (২). তারা আসারপরা বা ধারাসংযুক্তা নয়নতারা!

৫

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দত্ত

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বৈষ্ণবপদাবলীর দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি। বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলামাধুরীর পরিমণ্ডলীর মধ্যেই উভয়ে তাঁদের কাব্য-বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন এবং ললিত 'মধুরকমলকান্ত' ব্রজভাষার রীতি আশ্রয় করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্যযুগের মৈথিল-কোকিল, আর গোবিন্দদাস চৈতন্য পরবর্তীযুগের খাঁটালী শুকপাখী, তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তারতম্যগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

'গ্রার্থনাপরতন্ত্রের পূর্ব-পর্যন্ত বিদ্যাপতি ভক্ত নন, কবি—'তাতল-সৈকতে বারি-বিন্দুসম' সুতমিত রমণীসমাজের অসারত্ব উপলব্ধি ক'রে যে-কবি 'জগ-তারণ দীনবন্ধুর' মাধবের পদপল্লব প্রাপ্তির জন্য আকুল হয়ে ওঠেন, অন্যত্র ভক্ত-হৃদয়ের এই নৈতিক আর্তির পরিবর্তে মনের নাগরিকে প্রেম-চেতনা ও সৌন্দর্য-পিপাসার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-বোধই তাঁর কবিকৃতির মূলপ্রেরণা ব'লে মনে হয়। "গোবিন্দদাস যত বড় কবি, তত্তোধিক ভক্ত"—হৃদয়ের সহজাত প্রেমানুভূতি তাঁর কাব্য-প্রেরণা নয়, প্রেমিক-সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙ্‌লার জীবন আশ্রয়ে যে প্রেম-মন্দাকিনীর জোয়ার এসেছিল, সেই অমায়িক ভাবস্রোতের এক-জন কৃতী উত্তরাধিকারীরূপে রাগ-ভক্তির সংজ্ঞান চর্যাই তাঁর শিল্পপ্রেরণার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতি জনম অবধি বিশ্বপ্রকৃতির যে-সৌন্দর্যকে বিভিন্ন ভাবে উপভোগ করেছেন এবং যে-রূপের ধ্যান করেছেন, তাঁর রাধিকার মধ্যে সেই রূপেরই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যকে নিঃশেষ ক'রে ঢেলে

দিয়েছেন, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য তাতে বিলসিত হ'য়ে উঠেছে—যে-প্রেমের এক নব নব আস্বাদনে তাঁর অন্তরের রসলোকটী বর্ধিত হ'য়ে উঠেছে, রাসমণী-সখী রাধিকার মধ্যে তিনি প্রেমের সেই মহিমময়ী মূর্তিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর যে-ভক্তির রাগ-ভক্তির উদ্বেল-আনন্দে গোবিন্দদাসের হৃদয় তরঙ্গিত হ'য়ে উঠেছে, তাঁর রাধিকার মধ্যে—বৃন্দাবনের সহচরীর সঙ্গে বৈকুণ্ঠের শ্রীর অপূর্ব সম্মিলনে ভক্তিমতী আরাধিকা ও প্রেম-গরবিনী শ্রীমতী একাকার হ'য়ে গেছে; সে রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মত—

'কিবা সে আহারে রাঙা বাস পরে
কেমতি যোগিনী-পারা'

নয় ব'লেও 'অভিসারকলাসি চলতপদগমন ধনি সাহসে মন্দিরে বাহিনী লাগি।'

বিদ্যাপতির রাধা কিশোরী মুগ্ধা নায়িকার মতই "অঙ্গে অঙ্গে মুকুলিত ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে।... চারিদিকে একটা যৌবনেরস্পন্দন হিল্লোলিত হইয়া উঠে,...একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা-নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। আপনাকে এবং পরকে (সে) ভাল করিয়া জানে না, সুরে সহসা সকরুণ লীলাময়ী—নিকটে অপরিচিত, অপরিচিত, বিহ্বল।...হৃদয়ের বাসনা সকল পাখা-মেলিয়া উড়িতে চায়, কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহলে এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ইতঃ অগ্রসর হয়, আবার জড়োসড়ো অঞ্চলটীর অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এমন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিষাদ বেশী (রবীন্দ্রনাথ)। এ-রাধা বিশ্ব-সৌন্দর্যময়ী হ'লেও কৈশোর-জীবনের তার রহস্যের উদ্ভিন্ন-তরঙ্গে লীলা চঞ্চল, নবীন তিলোত্তমা। গোবিন্দদাস রাধা রূপের মুণালসূটুকু হরণ করে তার অজানা ভ্রূটিটুকু উন্মাদনা ক'রে তুলেছেন—ঊর্ধ্বমুখী আরতির শিখার মতই নিরালম্ব সৌন্দর্যের এই তপতী ভাব-প্রতিমা পুষ্পিত করে, বিশাখারা করে, প্রেমবুভুক্ষ করে না, মানবচক্ষুকে অতিক্রম ক'রে তা' বিশ্ব-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষণীমাত্র নয়, পরিবেশমণ্ডলে পরিণত করে। 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি' পদটীকে রাধাকে চিনেও চেনা যায় না, তার এই সৌন্দর্য রক্তমাংসে-গড়া সজীব দেহলীলার উর্ধ্বে কবির স্বপ্নে-গড়া কোন্ এক অ-কল্প। গোবিন্দদাস তাঁর মানসলোকের নিখিল সৌন্দর্যকে রাধাভাবের অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় প্রেমরসে অভিষিক্ত ক'রে রাধাকে গড়েছেন। তাই বিদ্যাপতির রাধা নবীনা রূপের রাধা প্রৌঢ়া-ভাবের রাধা।

"বিদ্যাপতির রাধা যেখানে সহজ হৃদয় ধর্মের পথে চলেছেন, গোবিন্দদাসের রাধা সেখানে পদক্ষেপ করেছেন কঠিন দার্শনিকতার ভূমিতে—সংসারের আবিলতাকে খুব চাওয়া ও বর্জন অতিক্রম ক'রে বৃহৎ উপলব্ধির আকাশে অন্তরের দিকে উৎসারিত হ'য়ে; প্রাণের কামনা ও অন্তরের সাধনার দুস্তরবেদী রচনা করে ভাবানন্দের চাইতে যোগানন্দই এখানে অধিক প্রকটিত, বিদ্যাপতির হরি মোর মধুপুর পদটীতে রাধা যখন কেঁদে ওঠে—'বিপথে পড়ল কৈছে যাদবীর মালা' তখন বিহ্বলিতার সেই আর্ত চরমের হাহাকারের সঙ্গে ধূলিলুণ্ঠিত মালার যাদবনামী মূর্তিটীও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর গোবিন্দদাসের 'যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে' পদখানি দেখি, বিরহ-বরণ ও মৃত্যুকামনা নিয়ে রাধা হৃদয়ে যে দোলাচল-বৃত্তি সৃষ্টি হ'য়েছিল, কবি তার এক চমৎকার সমাধান করেছেন।

বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধা শুধুই প্রেম-বিহ্বলা উচ্চাংগের নায়িকা মাত্র, গোবিন্দদাসের রাধা অন্তরে পূজার অর্ঘ্য থালিকা সাজিয়ে ভক্তির অনির্বাণ দীপশিখাটী জ্বালিয়ে রেখেছেন—অভিসার এখানে প্রেমানুরাগের পর্য্যায় থেকে ভক্তির পর্য্যায়ে উন্নীত। 'কণ্টকগাড়ি...' পদখানিতে যেমনার সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়সী রাধার তপশ্চর্য্যার সঙ্গে একমাত্র মহা-যোগিনী উমার পঞ্চতপা সাধনারই তুলনা হ'তে পারে। কিন্তু ভাব-সম্মিলনেও বিদ্যাপতির রাধা যেখানে—

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই'

সেখানে প্রথম প্রণয়ের চপল উচ্ছ্বাস বা অতৃপ্তির আর্তি নয়, অখিল প্রশান্তিতে ভাবের এই যে প্রেমাত্মতা—তন্ময়তার ও মগ্নতার প্রেমের এই অন্তর-অনুভূতি কোন তাত্ত্বিক উপলব্ধি নয়, অনুক্ষণ প্রিয়-ধ্যান ও প্রিয় ভাবনার ফলে ধ্যানানন্দ ও ভাবানন্দের সহজ যোগ সাধনা। কিন্তু 'অধিক-আনন্দিনী' পদটীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বহুভাবুকের—এমন কি জগতের সমস্ত প্রণয়িনীর চিত্তরে শ্রীমতীর যে স্বতন্ত্র মূর্তিটী গোবিন্দদাস প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন, বিদ্যাপতির মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পাইনে—

"প্রেমবতী প্রেম— লাগি জিউ তেজব
চপল জীবন ধনু সাধ।

প্রিয়ের জন্য প্রিয়ার প্রাণ বিসর্জন যেওয়াই জগতের সাহিত্যে চরম কথা, কিন্তু রাধা যে প্রাণোৎসর্গের চিরকিশোর বরণ করিতে চায় না, তার কারণ গোবিন্দদাসের রাধা চরিত্রের ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই নিহিত।

বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে শ্রীমতীর প্রতি যে-উপেক্ষা, যে-সান্ত্বনা-বাণীর সাক্ষাৎ লাভ করি, তাতে সখ্যভাবের ইংগিত থাকলেও পূর্ণ বিকাশনা নেই; রাধার দুঃখে তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠলেও কবি এখানে শ্রীমতীর চলার পথের বিশারী, সহযাত্রী নন। গোবিন্দদাস কিন্তু লীলার বর্ণনা ক'রেই ক্ষান্ত নন, তিনি লীলার মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে ও মিলিয়ে দিয়েছেন—রাসন-নেত্রে লীলারস উপভোগ করতে শ্রীমতীর ব্যথার ব্যথী, দুঃখে দুঃখী, সাধের সাধী—লীলাসঙ্গিনী হ'য়ে উঠেছেন। সখীভাবের এই নাটারসসমৃদ্ধ স্ফূর্তি অন্য কোনও পদকর্তায় নেই। 'প্রাবৃষি' পদগুচ্ছে পঞ্চরসাত্মক সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরসের সঙ্গে ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণ ঘটাতে দ্বিধাবোধ করেন নি, অন্তরের স্বাভাবিক আকৃতিবশে। গোবিন্দদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদর্শ-

কারিক অনুশাসন মেনে ঐশ্বর্যাভাবের আরোপ দ্বারা রসাভাস ঘটাতে চায় নি। বিদ্যাপতির ভক্তি এখানে স্বাভাবিক সংস্কার, গোবিন্দদাসের এই ভক্তিই তাঁর কবিত্বের উৎস খুলে দিয়েছে। সংক্ষেপে, বিদ্যাপতি কালিদাসপন্থী, আর গোবিন্দদাস জয়দেবপন্থী।

গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণলীলার রূপানুরাগ, রূপোল্লাস, রসালস, গ্রৌঢ়-বিলাস প্রভৃতি কোন পর্যায় বাদ দেন নি—গৌরচন্দ্রিকা, মান ও অভিসারের পদে তিনি অদ্বিতীয়; বিশেষতঃ জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভিসার, দিবাভিসার, প্রীষ্মাভিসার ইত্যাদি অভিসারের এত বৈচিত্র্যও আর কারও পদে দেখা যায় না। আবার মহাসন্ধি, বিরহ মাথুর, রূপোল্লাস ও প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস উভয়েই সম্ভোগের কবি, উল্লাসরসের কবি। বিদ্যাপতির যে-রাধা বিরহ-মাথুরে

এতরা মাধব মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর'

ব'লে অসহ দুঃখে কেঁদে ওঠে, সেই-ই আবার আসন্ন প্রিয়-মিলনের আশায় 'মংগল যৌতুক করব নিজ দেহে'র অটুট সংকল্পে আত্মহারা হ'য়ে ওঠে। গোবিন্দদাসের রাধাও একদিকে যেমন সমস্ত অস্থির-বিচলিত-করা আসন্ন বিরহে আকুল হ'য়ে কেঁদে ওঠে—

'যাহক লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জনু
দুরজনে কিয়ে নাহি কেল'

অন্যদিকে তেমনি বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে চির-আকাংক্ষিত বল্লভের দর্শন-লাভে সব দুঃখ বেদনা ভুলে গিয়ে সার্থকতার আনন্দে ও পরিতৃপ্তিতে ব'লে ওঠে—

'তুয়া মরমমে আপে কুছ নাহি জানলুঁ
চির দুঃখ তব দূর গেল'।

তথাপি বিরহের বর্ণনা করতে, দুঃখের কথা বলতে বিদ্যাপতির লেখনী রস-সংবেদনে উদ্বাহু বেগে ছুটে চলে, বিরহের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য আহরণ ক'রে মধুচক্র রচনা করে; গোবিন্দদাসও অনুরাগের আধারে সমস্ত জগৎকে রঞ্জিত ক'রে তোলেন, বিশ্বপ্রকৃতির বুকে সমারোহ ক'রে চলে আনন্দ-দুঃখের বিচরণ। "বিদ্যাপতির বর্ষিত বর্ষাপ্রকৃতি ও বসন্ত-শ্রী-রতি-রসের উদ্দীপন বিভাবের কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মানব ও প্রকৃতির যে একটা গূঢ় সত্তার সংযোগ আছে, তাহারও আভাস দিয়াছে" (কালিদাস রায়)। কবি বিরহের মিলে বসন্তকেও উপেক্ষা ক'রেছেন কিন্তু বর্ষার দুর্দাম প্রভাবে তাঁর রাধাহৃদয়ের হাহাকার গগনের অশ্রুধারায় মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হৃদয়ের গভীর অভিজ্ঞতা করে এই যেশকালাতিশায়ী শাশ্বত প্রেমের উপলব্ধিতে বিশ্বিলনের সকল মুখাবয়ব, সমস্ত লীলাভুবন একাকার হয়ে গেছে। "গোবিন্দদাসের কবিতায় ও প্রকৃতির সহিত মৃদু ভাবে না হইয়া, সৌষ্ঠবভাবে মানব হৃদয়ের সংযোগ দেখান হইয়াছে"—প্রকৃতি শ্রীমতীর উল্লাসে উল্লসিত ও বিরহে সহমর্মীই হয় নি, অভিসারের পথে যেখানে বিঘ্নও ঘটিয়েছে, সেখানেও রাধাপ্রেমের দুর্নিবারতাই বাড়িয়েছে। সর্বত্র মিলেও যে-প্রেম 'মিলে মিলে নূতন যোর,' দুঃখবেদনা, ত্যাগ-সাধনা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে যাকে উপলব্ধি করতে হয়, যে-প্রেম অন্তরে অন্তরের স্পর্শ এনে দেয়, 'উচ্চ কবিই সেই-প্রেমের বেদীমূলে জয়মাল্য অর্পণ ক'রে, তাকে বন্দনা জানিয়েছেন। তথাপি বলতে হয়, বিদ্যাপতির পদে অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনা বেশী, আর গোবিন্দদাসের পদে আত্মত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক। বিদ্যাপতি একাধারে রসজ্ঞ ও কবি, গোবিন্দদাস পরং। বিদ্যাপতির কবিতা "মুখর বীণ সংগিনী শ্রীকণ্ঠ গীতি" (বঙ্কিমচন্দ্র)—তা'তে পুরবী ও বেহাগ'দুইয়েরই মধুর আলাপ চলে, গোবিন্দদাসের কবিতা মৃদংগ-বাদ্যের মন্দ্রধ্বনি।

এই প্রসংগেই গোবিন্দদাসের ওপর বিদ্যাপতির অসাধারণ প্রভাবের কথা ওঠে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 'সর্বসাধারণ' কায়া-প্রেমের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হ'য়েও পদরচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতিকেই আদর্শরূপে বরণ ক'রেছেন। তাই ব্রজবুলির ললিত মধুর ধ্বনি-হিল্লোল বা অলংকৃতির সুষমার তাগিদেই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ভাবের দিক থেকেও গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিরই অনুগামী হ'য়েছেন। 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে' পদটী বিদ্যাপতির 'যাঁহা যাঁহা পদ যুগ ধরই তহিঁ' পদেরই প্রতিধ্বনি এবং 'মাধবি তপন তপন ভেল···' দ্বিপ্রহরীর অভিসারের পদখানি বিদ্যাপতির 'তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল' পদের রূপান্তর মাত্র। নব-অনুরাগের আবেগ-কম্পিত 'আধ কি আধ মিঠি অকলে' পদখানি বিদ্যাপতির (কবিরঞ্জনের?) 'কি পুছসি অনুভব মোয়'-র প্রায় সমতুল, 'তাহারে নয়ন মন্দ-নন্দন অতর চরণার বিন্দরে' পদটী বিদ্যাপতির প্রার্থনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবুও উভয়ের মধ্যে শুধু মার্গনিকতার পরিমণ্ডল নয়; প্রকাশ ভংগীর দিক দিয়েও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পদ চয়ন, বাক্য-বিন্যাস, ছন্দ-ঝংকার, অলংকরণ, রচনা শৈলী প্রভৃতির সমবায়ে যে সূক্ষ্ম মণ্ডন-কলা উভয়ের পদেই স্ফূর্তিলাভ ক'রেছে, সেখানে বিদ্যাপতির কাব্যে চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের অভিনব মেল-বন্ধন হয়েছে, কিন্তু গোবিন্দদাসের কাব্যে মাধুর্যের চাইতে চাতুর্যের আকর্ষণই বেশী। মণ্ডন-কলার পারিপাট্যে শিল্প কখন কখন ওস্তাদকে ছাড়িয়ে গেছেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন কোন পদ ওস্তাদের হাতে না প'ড়েও অলংকৃতির আতিশয্যে পংগু হ'য়ে গেছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। উদাহরণ স্বরূপ কাজের অমরতিথির তনু', 'যোগিনি গোচর বিলিবহি সজনি,' 'বেনুক ফুলে ফুলে মদনানল,' প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু কবি যেখানে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' শ্রীগৌরাংগের ভাবকান্তিকে বাণীরূপ দিয়েছেন, সেখানে শুধু কল্পনার সবলতার দৃপ্তে প্রকাশভংগীর নির্মল অনবদ্যতা মিলে রচনা করে অপূর্ব মধুচক্র—"যে-অলংকারের সাহায্যে মহাপুরুষের ঐশ্বর্য্য বাক্যে রূপলাভ করে, সেই উদার সরল 'উদাত্ত' অলংকারই এখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে (কালিদাস রায়)। বিদ্যাপতিও রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি,

অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অলংকারের প্রচুর প্রয়োগ করেছেন কিন্তু বিদ্যাপতির হাতে অলংকার যৌবন-ভার নয়, কুসুম-মালিকাতেই যেন দিয়েছে আর রাধিকার চাঞ্চল্যভাষণ ও বর্ণচ্ছটিতে তার সৌরভ পাঠকচিত্তকে আমোদিত ক'রে তোলে। এমন কি বাসুর বিরহের পদাবলীতে তিনি অলংকরণের ইচ্ছাও অনেকটা সংযত ক'রে সহজ-ভাবের ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রেছেন। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই গোবিন্দদাসের পদে আবেগাত্মক ক্রম-বিন্যাস, আলংকারিক পারম্পর্য (Rhetorical sequence) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। "রস সম্বন্ধে বিদ্যাপতি ভক্তি প্রভৃতির সহিত ব্যবসায়ের অনুগত, গোবিন্দদাস বিশেষভাবে রূপসোপাধীরই অনুগত" (অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী)। এমন কি 'উন্মদ যৌবনি', 'বিরহমাধব প্রভৃতির কোন কোন শ্লোককেও তিনি সুললিত পদে পরিবর্তন ক'রেছেন। 'যাঁহা পহু অরুণ চরণে' পদখানি উন্মদ যৌবনির 'পতবং তনুতনু' ইত্যাদি শ্লোকের, 'সজনি, মরমকালিব বহুবাসি' পদটি বিরহমাধবের 'একাগ্রশ্রুত বেণুসম্পতিভিঃ' শ্লোকের অনুবাদ ব'লেও কাব্যসৌষ্ঠবে অভিনব আস্বাদের বস্তু হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির মত তাঁর ভাষার গঠন-পারিপাট্য ও মধুর-প্রসাদগুণ নিষ্কলংক।

তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, ভাবের রস-প্রকৃতির দিক থেকে বিদ্যাপতি, ভাবের গভীরতার দিক থেকে গোবিন্দদাস এবং মণ্ডন-কলার সৌকুমার্যের দিক থেকে উভয় কবিই পদাবলীর কাব্যকুঞ্জে অমরত্বের প্রীতি-মালিকা কণ্ঠে ধারণ ক'রে আছেন।

দুই মন

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

আষাঢ়ের মন মোর চলে—শুধু চলে,
নীড় নাহি বাঁধে কোন ছলে।
বাসা-বাঁধা ঘরকুনো মন
দেখে শুধু ঘরেরই স্বপন।
এক মনে আছে দুটি মন ;
কে বলিবে কে মোর আপন।
ঘরে আছে ভীরু ভালোবাসা,
পিছু-ডাকা মিনতির ভাষা,
সেবাস্নিগ্ধ আছে দুটি চোখ,
অপলক প্রেমের আলোক !
এ স্নেহ-সেবা দিয়ে ঘেরা
এ যৌবন যায় কি গো ছেড়া ?
এক মন বলে, 'এই খাসা,
ভালোবাসি এই ভালোবাসা।'
এরি মাঝে ফাঁকে ফাঁকে পথ ডেকে যায় ;
মন ভ'রে যায় মোর পথের নেশায় !
ডাকে বাট, ডাকে মাঠ, 'প্রিয়ারি প্রান্তর,
ডাকে মেঘ, ডাকে ঘন গোবি আর থর,
হিমাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ, জলধির তরঙ্গ-বর্তন
এরা মোর একান্ত আপন।
পাখী-ডাকা জাগা প্রভাত,
তারা-জাগা দুহকিনী রাত,
ডাকে মোরে ডাকে আর ডাকে
আবিষ্ট আবির মনে চেতনার ফাঁকে।
এ ধরণী আনন্দের খনি ;
ওরে মোর অর্থ ব'লে গণি !
এর কাছে তুচ্ছ ক্ষুদ্র-ঘরের স্বপন,
প্রাণ-বাণী ভ'রে লই প্রকৃতির প্রীতির চুম্বন !
ছিঁড়ে যায় স্বপ্নজাল, ভাঙ্গা যায় টুটে,
আঁখি-আগে ছোট সেই নীড়খানি ফুটে
বৃহতের বুক থেকে নীলের মতন ;
পিছু ফিরে চলে মোর মন।
যেখানে উৎসুক দৃষ্টি উন্মুখ আগ্রহে
মোর আসা-পথ চেয়ে নিত্য জেগে রহে,
চলে চলে গৃহ-কর্ম, তিক্ত লাগে
জীবনের স্বাদ,
মধুলুব্ধ মধুপের আছে যেথা প্রীতির প্রাসাদ,
সেথা ফিরে যেতে চায় মন ;
মুক্তি চেয়ে মিঠা লাগে স্নেহের বন্ধন !
মমতায় মাখা-মাখা জীবনের শত অভিজ্ঞান
সেথায় আকীর্ণ আছে আজিও অম্লান
নিজ হাতে-পাতা সেই সুখীর সংসার,
নিজহাতে গাঁথা সেই ফুল ফুলহার,
স্থির ক'রে নিজ হাতে নামানো
কি সোজা
বিস্মৃতির সুস্থিতলে জীবনের বোঝা ?
এই মত ঘরে-পথে ঘুরে ফিরে মন,
মুক্তি ও বন্ধনে যেনো আপন জীবন।
জন্ম মৃত্যু সেও বুঝি এ নিয়মে বাঁধা,
আসা-ও-যাওয়ার ছন্দে তারো সব সাধা !
গৃহী ও বিরাগী দুই-ই বাস করে মনে ;
পূর্ণ ক'রে তোলে তারে মুক্তি ও বন্ধনে !

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুলমার্গ—খিলানমার্গ

কাশ্মীরের দুনিয়ার প্রচার পত্রিকাতেও গুলমার্গের উল্লেখ আছে। মূরি, ল্যান্সডাউন, কোয়াইকেনাল, এরা যেমন পুরোপুরি এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সভ্যতার তীর্থস্থান, এরা যেমন সাহেব-মারা ভারতীয়বাবুদের স্বাস্থ্যের মাতাপুরী, গুলমার্গ তেমনি কাশ্মীরের তীর্থস্থল। সেকালের ইংরাজদের আক্ষেপ ছিল যে ভারতবর্ষে ইংরেজ সেরকম পাড়লোনা। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, কোথায় নয়? সর্বত্র ইংরেজ নিজে নিজের সোড়া তুলেছে। পারেনি ভারতবর্ষে। এ জন্য একদল ইংরেজের মহা আক্রোশ, ধিক্কার। শেষে তারা প্রচার আরম্ভ করলো "যদি ভারতে ইংরেজ নিজের আচ্ছা গড়ার উপযুক্ত জায়গা চায়, এই গুলমার্গ থেকে আরম্ভ করো। অধিকাংশ ফরো কাশ্মীর বীরে ধীরে। একবার এখান থেকে একের 'ফেটো' করে তাড়াতে পারলেই···ইত্যাদি। কাশ্মীরে ইংরেজের ভারতীয় কলোনী হতে পারেনি, কিন্তু অন্তিম আক্রিকায় এর সার্থক জয়যাত্রা পূর্ণ বিক্রমে চলেছে।

'গুলমার্গ যাবো', 'গুলমার্গ যাচ্ছি' এই কথা বলার মধ্যেই যেমন একটা বিলাস, একটা গর্ব আছে; অন্য জোগাড় নেই। 'পহেলগাঁও যাচ্ছি' বললেই তীর্থযাত্রীদের ধুলা অর্থবিলাস প্রভৃতি ভাবির প্রতি তেমন নাক উঁচু হয়ে কুঁচকে যায়, কিন্তু 'গুলমার্গ' যে একালের ধান পান, কবি-লালের মহাতীর্থ। সাহেব-সাহেব মেলার এমন আনন্দ স্থান নেই।

ভারতসরকারের পক্ষ একজন সুদক্ষ কমিশনারের ঘোড়া থেকে

গুলমার্গের পথে

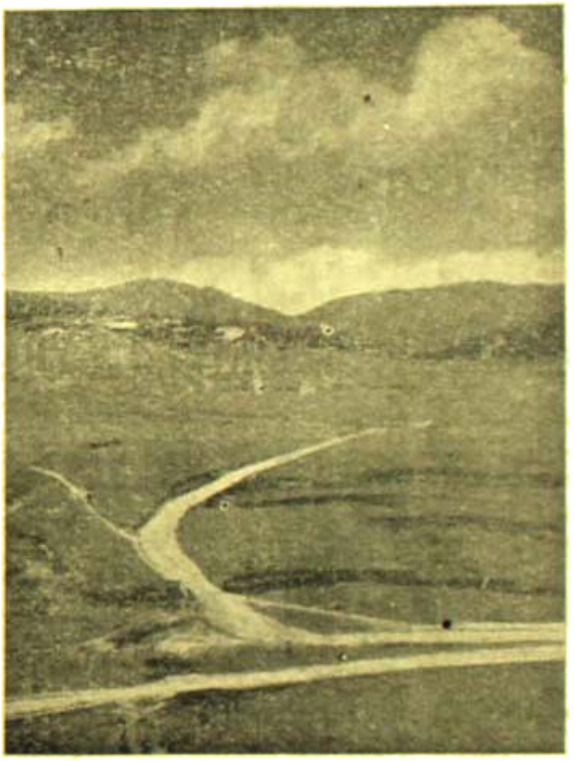

গুলমার্গ

পহেলগামে তার শিক্ষা আমায় শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপ, গুলমার্গ আর সোনীমার্গের মধ্যে কোন্‌টা তোমার ভাল লাগে?" "আপা জ (ছোট হুজুর, তত দূরের ঘোড়া যদি অমন না উঠতো। যদি থাকতো সভ্যতানুলভ বিনয়) তুলে বললো "হে ঈশ্বর, কিসে আর কিসে। গুলমার্গ—আহা নন্দনে!" বলা বাহুল্য সবটাই ইংরাজীতে বলেছিল

P 30462

ইংরিজি ছু ফাটায় তলায় কাঁচা ডিমের রংয়ের মুখখানা চেকে। খুব কৌতুক লেগেছিল তাই জিজ্ঞাসা করলাম,—'সোনামার্গ কোন্ পথে গিয়েছিলে তোমরা ?'

"সোনামার্গ ?" চোখ উঁচুকে ভ্রূকুঞ্চন করে ছোট্ট জবাবদিহি করলে,—"যাওয়া বন্ধ। কাশ্মীর সরকার এখনও ও পথ খোলার কথা ঘোষণা করেন নি। জমাট বরফ যে।"

সেই গুলমার্গ যাবার দিন আজ। খাবার বাঁধা হয়ে গেছে। অসিত স্নান নিয়েছে। আমাদের দল পাকা হয়েছে একপাড়ীতে। আমি চড়েছি পাঁড় শিকারীর পাড়ীতে। আজ ওরা ছাড়লো না। সবাই হোমরা চোমরা অফিসার। মেজাজ যেন, অসিত আর মনোরম।

তুষারাবৃত গিরিপথ

আমরা বাকী সব "বড় বড় পেট—মাথা করে হেঁট"—সেই দলের চাই। কিন্তু এ যে সব এক করে দেবার দেশ। এখানে যে বড় থেকে ছোটো, ধনী থেকে দরিদ্র সকলেরই আত্মবোধ চুর চুর হয়ে যাবে। নিরালস সৌন্দর্য্যের পায়ে পায়ে।

খানিক যেতেই এসে গেল এক দেশ। দুধগঙ্গার দেশ। গাড়ীকে খানিকক্ষণের জন্য থামতে হোলো। কল্ কল্ পথে নদী বয়ে চলেছে, যেন নীচে দিয়ে হলেও খুব নীচ দিয়ে নয়। দুধগঙ্গা তো দুধগঙ্গা! জল করে যাচ্ছে, তার রং শাদা; পালকের মতো শাদা, দুধের মতো শাদা। তুষারহারবলা যে কি জিনিষ বোঝা যায়। নদীর ধারে ধারে মনোরম ক্ষেত—'সরিতঃ স্নানপুলিনঃ'। তার পাশে পাশে পপ্লারের সারি, আপ্, উইলো। মাঝে মাঝে আপেল, আখরোট, খোবানী। ফুলের সময় নয় এটা কাশ্মীরে। সে আরও মাস তিন পরে। তবু ফুলের ছুপপত্তা নেই। এর মাঝে মাঝে গা ঢেকে তিনচার খানা পাথর কাদায় গেঁথে তোলা খুঁড়ে ঘর। কয়েকটা ছেড়া, কয়েকটা গরু, ঘুঁটে ঘোরে, ছোটো ছেলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে, হাত পেতে চায় ভিক্ষা—"বখ্শিশ"।

একজোড়া ছায়াচেরা হরিণীর একটু পরিবেশ লক্ষ্য করলাম। দুর্বার লোভ সামলালো গেলনা। অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যও মনে পড়লো অলক্ষ্যে যেন দরজের ছায়ায় মিলিয়ে গেলাম। পপলার, আখরোট আর চিনারে ঘেরা একটু ছোঁকো জায়গা। চারধারে কোমর উঁচু ঘোরাল তোলা। একটি কাঠের ফ্রেমের ওপর হলি-হকের মতো ফুলের গন্ধ। চরৎকার সাজানো বাগান। দু-দার সাইপ্রেসের তলায় বর্ডার করা ফুলের গাছ। ঝকঝকে তকতকে পরিচ্ছন্নতার ছবি। একধারে একটি মেয়ে পায়ের ওড়না দিয়ে একটা কবর থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলছে। এমনি অনেক কবর। গাঁয়ের কবরস্থান। কাশ্মীরের গ্রামের কবরস্থান ঠিক আর পাঞ্জির একটি আকর। যেখানেই গেছি এর ব্যতিক্রম পাইনি। অথচ জীবনে কাশ্মীরীরা নোংরা!

সেদিনকার ডায়েরি থেকে তুলে দি কয়েকটা পাঙ্তি—"আমি বলতে পারবোনা যে এমন বৃক্ষ জীবনে দেখিনি। কিন্তু গুলমার্গ যাবার চড়াইয়ের পথের সৌন্দর্য্য, সেই পথ থেকে গিরিবরের দক্ষতলের চুল ছড়ানো, পাছড়ানো, যাদেরপূর্ণ সুষমার বর্ণনা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। আগাগোড়া পথে ঝরণার কুলকুল মনকে মাতিয়ে রাখে।"

একটা 'হল্ট্'। তমমার্গ। এখান থেকে গুলমার্গ পাহাড়ের চড়াই। গুলমার্গ একটা পর্বত শিখরে অধিত্যকা ভূমি। আরোহণ করতে হবে।

ঘোড়া মিলায় তিনটে। পাঁচ টাকা করে ভাড়া। বেপুর ঘোড়ায় চড়ার হাতে খড়ি। ভয়ে ভয়ে চড়লো। কিন্তু কাঠ হয়ে বসে রইলো। ঘোড়াও জানলো কি বুদ্ধি যা পিঠে চেপেছে। একেবারে মুখটী নীচু করে চলতে লাগলো যারপর নাই অপমানে বিপর্য্যস্ত।

আমি আর অসিত ঘোড়ায় চড়েছি। তবে আমরা তত ঘুরিনা চড়েছি, ঘোড়া যত ঘুরছে যে ফেট চড়ছে।

ঘোড়া চলেছে। পাশে পাশে ছেলের দল দৌড়ুচ্ছে, লাফাচ্ছে। মেয়েরা আর ছেলেরা উঠছে দলে দলে। কত জনই যে ঘোড়ায় চড়ছে। সব ঘোড়া আমাদের দলই কাবার করে দিয়েছে। চলে চলে হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি নীচে একটা সবুজ মখমল ঢাকা বাটী। ওই বাটীটাই গুলমার্গ।

গুলমার্গে হাল্কা হাওয়া বেড়াতে আসে মুহূর্তকে ঘিরে। সেই কবিমনটাই আবিষ্কার করে গুলমার্গের সুষমা। সেই থেকে গুলমার্গ হয়ে যুগে যুগে বেড়াবার জায়গা। শীতের দিনে বরফে 'স্কি' খেলার জায়গা। সমস্ত গুলমার্গ-বাটীটির বিশেষত্ব কচি ঘাসের বাহার। মাটীর রং এক পীচঢাকা পথ ছাড়া আর দেখা যায়না। এত নরম, ঘন, কচি ঘাসে ঢাকা এতখানি জায়গা আগে দেখিনি আটহাজার ফুটের মাথায়। বর্ষাতীতি দিয়েদের-মেয়া আছে পাহাড়ের গায়েতে। পাইনের গাছই বেশী এখানে। একটা হোটেলে চা-ইত্যাদি হচ্ছে। ডাকখানায় গিয়ে একখানা চিঠি লিখলাম। তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের একটা ছবি নিলাম। গুলমার্গে সৌখীন ইংরাজী-কায়দার বাংলো ঘরবাড়ী বিস্তর। ঘোড়দৌড় খেলার উপযুক্ত জায়গা। বরফের সময়ে যে এই 'বেসিনে' চমৎকার স্কেটিং চলতে পারে তা বেশ বোঝা যায়। মাঝ দিয়ে ক্ষীণ একটি স্রোত ধারায় কনকনে ঠাণ্ডা জল। মুখে মাথায় দিয়ে শরীর মন তাজা হোলো।

ঘোড়ায় চড়ে খানিকটা ছোটাছুটি করে উঠতে লাগলাম খিলান মার্গ। পথে গুলমার্গের ছোটো একটা বাজার চোখে পড়লো।

খিলানমার্গ

আর চোখে পড়লো বহু তাজা বাংলো, একটা তাজা চার্চ। ইংরেজরা যখন যেখানে থাকে পরিবেশটা রমনীয় করে রাখে ফুলে, বেড়ায়, গাছে, ঘরে। চার্চ এবং তার আশেপাশের জায়গা এককালে যে কতো সুন্দর ছিল এখনও তা বেশ বোঝা যায়। কে যেন, কারা যেন, আদিরে পুড়িয়ে ভেঙ্গে চুরে, লণ্ডভণ্ড করে গেছে। তিন চার বছরের মধ্যে নানা গুল্মলতায় আকীর্ণ হয়েছে ভগ্নস্তূপ, ঘেয়ালের ইঁটে গাঁথনা জমেছে, বরফীর কুথার কবলে প্রস্তু হয়েছে মানুষের হস্ত, আর ধর্মের সীমানা। ঘোড়ার মালিক যুবকটী বললে আফ্রিদিদের কীর্ত্তি!

মনে পড়ে গেল ১৯৪৭, ১৯৪৮ এর সেই ভীষণ সংবাদ, কাশ্মীরে উপজাতির আক্রমণ। গুলমার্গে বিদেশী মেমসাহেব মহিলারা পর্য্যন্ত বাদ যায়নি, চার্চ, কলেজ, হাসপাতাল বাদ যায়নি। সভ্যমানুষ মেরিয়ে দিয়েছে ক্ষুধার্ত জীবের জন্যে ক্ষুধাকে। প্রাক্‌মানবিকতার কবলে বিকাশ তখনকার নেতৃস্থানীয়েরা করতে দ্বিধা তো করেননি। রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার উপলক্ষে এই নির্মম আতঙ্ককে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সর্বরাষ্ট্রীয় মহাধিকরণে।

প্রায় মাইল দেড় ঘুরে এই অত্যাগারিত বনভূমি পার হলাম। তারপর দুঃখের ও দুস্তর পথ। পাথরের নুড়িতে ভর্ত্তি। কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কেউ আগে, কেউ পরে। পাহাড়ী পথে চলার এই এক সুবিধা হারিয়ে গেলে একেবারে গেলে, নইলে হারাবার তো নেই। যে যার নিজের চালে চলে; কেউ বিমতালে, কেউ দ্রুত লয়ে। কাজেই খানিক চলার পর যে যার খুঁজে পায় নিজের মনের ছন্দ, যে ছন্দে বাঁধা পড়ে চলার ছন্দ। গতির ছন্দ তো মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে আফিসের তাড়া নেই, পাওনাদারের তাড়া নেই। ট্রেণ ধরার তাড়া নেই, রেসারেসির তাড়া নেই। এখানে সব স্থাণু, স্তব্ধ, সমাহিত। এখানে সব নিবিড়, প্রচ্ছন্ন, তন্দ্রিত। এখানে সময় ধরে যায়না ঘড়ির কাঁটায় তালে তালে; কাল এখানে বৃত্ত করে শিখর শিখরে, পরব হতে পরবে, সবুজ থেকে নীলে। আকাশ এখানে ক্লান্ত মধ্যাহ্নকে পার করে সন্ধ্যার কুয়াশে প্রবেশ করার জন্য ব্যস্ত নয়; আসন পেতে রেখেছে সে সমগ্র প্রকৃতির উপর মানুষের মনের শান্ত সুন্দরকে চির সমাহিত করার প্রত্যাশায়। এখানে এসে নানা চোখে লোকে

চায়, বাল ভাষায় কথা বলছেন, বাল সীমান্তেরই কথা চিন্তন। এখানে কেউ ওঠে নেমে, কেউ যায় খেয়ে; কেউ ছেড়ে চড়ে, কেউ নেমে। তাই পায়ে-চলার পথ এক নয়। চোখের চাওয়া যেখানে এক নয়, মনের পাওয়া যেখানে এক নয়, হৃদয়ের কথাও যেখানে এক নয়, সেখানে পায়ে চলা এক হবে কেন? কেউ এগিয়ে যায়, কেউ পেছিয়ে। মনে মনে সবাই জানে পথ একই। আগেই যাই, পিছেই থাকি তবু ক্ষতি যে পথই কেন না ধরি—"সুগাং এক্কো পন্থা:" মিলবো গিয়ে সেই মিলনমার্গে।

মিলনও সেখানে। শেষ ঘাস টাটি। অত্যন্ত খাড়াই পথ হলে ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছি অনেকক্ষণ। পিছনে পিছনে ঘোড়াওলা ঘোড়া নিয়ে আসছে। মিলনের মার্গের ওপরে এসে গেছি। হঠাৎ চেয়ে দেখি দীর্ঘ দেহ বলিষ্ঠ অথচ কোমলতা পরিচিত ব্যক্তি একা একা নেমে আসছেন, হাতে লাঠি। বাংলার মুখ্য মন্ত্রী তাঁকে রাজকে এখানে দেখব এমনি একটা চমৎকার পরিবেশে, কি করে আশা করি? কোনও লোকজন সঙ্গে নেই, প্রচার নেই, তোষামোদকারী নেই, একা একা এই আনন্দে অবগাহন এবং ঐটি বয়সে; এক বয়েসকালের রবীন্দ্রনাথের দেশের মনটি নেলে দেবার না। হাত তুলে অভ্যর্থনা করলাম; মনে মনে সন্দেহ তিনি নন্ হয়তো। তারপরেই মনে হোলো, কাশ্মীরে এখন সর্বভারতীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন হচ্ছে। ধীরে ধীরে পাহাড়ী বন্ধুর পথে দীর্ঘ-দেহ পাইনের জঙ্গলের মধ্যে সে মূর্তি নেমে গেল।

'মার্গ' মানেই পর্বত শিখর—যে শিখর তুঙ্গ নয়, খানিক সমতল এবং তা তুষারাচ্ছন্ন। ওলমার্গ সাহেবদের প্রিয় আড্ডা ছিল, এবং মিলনমার্গ ছিল চড়ি ভাতির আড্ডা। বেশি নয় তিন মাইল চড়াই। আশপাশের শিখরটা তুষারাবৃত। নীচের দিকে ঢালটার ওপরেও বরফ জমা। মিথি 'স্কী' খেলা চলে। স্লেজ তো চলেই। স্লেজ গাড়ীও আছে কিছুদূরে ব্যবসায়ীদের বন্দোবস্তে। ছেলেরা তাড়া দিচ্ছে আর চড়ছে। শিখরের চূড়া অবধি ফুরে ফুরে ছেলেমেয়েদের দল উঠে গেছে। শাদার গায়ে শিঁপড়ের সারের মতো উঠছে। কী আনন্দ ওদের এই বরফ পেয়ে। মাথে মাঝে ঝির ঝির করে জলের কণা পড়ছে গায়ে, আকাশে যে মেঘ চলাচল করছে তারই মাঝেই যে আমরা। মনে হয় আকাশ যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে শিকরকণায়; আবার রোদে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনজন আঁকিয়ে বসে গেছে ছবি আঁকতে; আমাদেরই মনের। ফটিগীও আছে এদের মধ্যে। আরও একজন মহিলা। শিল্পশিল্পী কিন্তু মেয়েদের চেহারা, মোহনা ভাষী, স্তিমিত দৃষ্টি মানবজীবন ভরা; ফুল বস্তুজগতের সাধারণিকতা মাখানো। কিন্তু আঁকার হাত পাকা। সামান্য রং ব্যবহার করছেন, কিন্তু আঁচড় কাটছেন এক মনে অনেকটা স্থির। মনের চল শরীরের চলের মতই প্রবণ; সাবলীল ও দৃঢ় ওঁর রেখাপাত; পাকা উলটে করা মুৎখাবার মতোই পরা বর্ণ অথচ বিকাশ আছে চিত্রে। নাম মনে নাই। (ক্রমশঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস

মন্দাক্রান্তা রায়চৌধুরী

ছবি দেখে তার সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত না হয়ে আর্টের বিচার করতে বসেন, তাঁদের সৌন্দর্য্যপিপাসু মনটার ভাগে পড়ে ফাঁকি। তেমনি কাব্য পড়তে বসে কবিত্বের রসের বিচার করতে বসা যায়, তবে পাঠকের সূক্ষ্ম রসের আস্বাদগ্রহণে ব্যাঘাত হয়ে পড়ে; সহৃদয় পাঠকের অনুভূতিশীল মনই গ্রহণ করতে পারে সে রসের আস্বাদ। মনের বাইরে রসের পরম কোনও আসন নেই। "রসের প্রতীতি বা অনুভূতি" হচ্ছে রস। এ দুইয়ে তোলো ভেদ নেই। রসের আস্বাদই রস।

রসবিচার ও বিশ্লেষণ উভয়ই রসাস্বাদের পরিপন্থী হলেও রসের বিচারের হাত থেকে রসপিপাসুর নিষ্কৃতি নেই। রসের আস্বাদই রস।

রস বিচার ও বিশ্লেষণ উভয়ই রসাস্বাদের পরিপন্থী হলেও রসের বিচারের হাত থেকে রসপিপাসুর নিষ্কৃতি নেই। এই বিশ্লেষণের মূলে দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে রসের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশীরকম অনুভূত হয়েছে বলে প্রাচীন আলংকারিকরাও এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" সুতরাং কাব্য বিচারের প্রতি পদক্ষেপে তাঁদের রসসম্বন্ধীয় প্রশ্ন সম্মুখীন হতে হয়েছে। মনের ভাব হতে রসের উৎপত্তি। রস সম্বন্ধীয় অল্প আলোচনা এখানে বিশেষ প্রয়োজন।

যে ভাবের আলোকে রস উদ্ভাসিত হাস্যরস সেই মধুমালারই একটি রশ্মি। আলংকারিকরা রসকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

হাস্যরস তাদেরই অন্যতম।

সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু এই হাস্যরসের স্থান অতি নিম্নাসনে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' আবিলতে পর্য্যবসিত হয়েছে। নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। বিরল কেন, নেই বললেই হয়। কাজেই হাস্যরসকে কখনও অন্যরসের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে গণনা করা হয়নি। সভার মনোরঞ্জনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচ্য-অপ্রাচ্য ভাষায় এই রস পরিবেশিত হতো। কাজেই এর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিলো সাহিত্যের নিম্নশ্রেণীতে। হাস্যরস যে কেবল প্রহসনের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য যে সমস্ত বিষয়কেই আলোকিত করতে পারে, সে সংবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের রসবেত্তাদের কাছে ছিলো প্রায় অজানা। হাস্য জ্যোতির সংস্পর্শে যে গভীর বিষয়ের গভীরত্বের লঘুত্বও হোতে পারে,

সৌরভ ম্লান না করে সে বিষয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে পারে, প্রাণ ও গতির ছন্দ যে আরও সহজ ও ধীশাধান করে তুলতে পারে, সেই সম্ভাবনার দুয়ার সংস্কৃত সাহিত্যে ছিলো প্রায় রুদ্ধ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাস্যরস পরিবেশিত হতো বিদূষকের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে বিদূষক যতই ত্রিংশোর্দ্ধ হোক না কেন, কোনও পক্ষের আলোচনায় একে পক্ষের পরিহার করা হতো। এই বিদূষক-পরিবেশিত হাস্যরস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো শূন্যগর্ভমূলক। তাতেই তা ভাঁড়ামোরই সাম্যস্তর মাত্র ছিলো। Humour অথবা এর পর্য্যায়ের এই হাস্যরস কোনোদিনও চরিত্র হোতে পারে নি। কেবলমাত্র শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিকে" এবং কালিদাসের "মালবিকা অগ্নিমিত্রমের" বিদূষক ভাঁড়ামিবিমুক্ত। কিন্তু তথাপি হাস্যরসে এদের অবদান কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। চারিত্রিক অবদান হিসেবেই এই বিদূষকযুগলের খ্যাতি। কালিদাসের বিদূষক-সৃষ্টি অনন্যসাধারণ। অনেকের মতে Shakespeareও বিদূষক-সৃষ্টিতে তেমন সফল হন নি। কিন্তু তা'হলেও হাস্যরস পরিবেশনে কালিদাসও প্রায় অপরাপর সংস্কৃত সাহিত্যিকের মতো। এবং সে গণ্ডীটুকু কাটিয়ে উঠতে তিনিও সমর্থ হন নি।

রামায়ণ মহাভারতে হাস্যরসের কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মেলে না। পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত নাটক, এক ধাপ থেকে আর এক ধাপের অবতারণায় দর্শকচিত্তের ক্লেদক বিশ্রান্তি লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে পরিবেশনের জন্য এই বিদূষক সৃষ্টি হয়েছিলো। যেমন স্বপ্নবাসবদত্তা'র বসন্তক ও "অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের" বিদূষকের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দর্শকচিত্তের বিশ্রান্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শুধু যে হাস্যরসের জন্য এই চরিত্রসৃষ্টি, তা নয়। কারণ নাটকের বহু ইঙ্গিত ও গতিশীলতা বহনেও বিদূষক সহায়তা করেছে। শকুন্তলায় বিদূষকের মাধ্যমে কালিদাস বহু ইঙ্গিত সাধিত করেছেন। আবার নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, নাটকের সকল রসে পুষ্ট হওয়া উচিত। তাইতে সেই প্রয়োজন সাধনার্থেও এ রসের অবতারণা করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু স্বত-উৎসারিত রস ও চেষ্টাকৃত রসসৃষ্টি—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা অতি স্পষ্ট। প্রথমটা দিতে পারে সহজ অনাবিল নির্মল হাস্য। দ্বিতীয়টার সে উচ্ছল শুভ্র হাস্য-দানের ক্ষমতা নেই। তাই প্রয়োজন সাধনার্থে সৃষ্ট হাস্যরস সংস্কৃত সাহিত্যে কোনোদিন উচ্চাসনে আসীন হতে পারে নি। বক্রোক্তি, শ্লেষোক্তি ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম হাস্যরস আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কোনও নাটকীয় চরিত্রাবলম্বনে হাস্য পরিস্ফুটনে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না।

† সাহিত্যদর্পণ

আর্য্য সঙ্গীতে "শ্রী" রাগ

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

"শ্রী" রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে "শ্রী"র উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। তাহা না হইলে রাগটী সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় না।

পুরাণ বলে—ব্রহ্ম প্রজাপতির কন্যা খ্যাতির ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগুর সহিত বিবাহ হয়। ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে "শ্রী" নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যা নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করেন।

পরমেশ্বর যখন অবিদ্যা সহায়ে জগদ্রূপ প্রাপ্ত হন ও উন্মেষমুখী হইয়া বিবিধ কল্পনাময় হন তখন মনরূপে বিরাজ করেন। অর্থাৎ চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ। যাহা বাহ্য ও অন্তরের অবস্থান পূর্ব্বক সত্তা ও অসত্তার বোধ সম্পাদন করে এবং যাহা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে তাহা চিদাকাশ। যাহা জীবগণের ব্যবহার পরম্পরার প্রধান কারণ এবং যাহা দ্বারা জগৎ বিস্তার তাহার নাম চিত্তাকাশ। এই চিত্তাকাশই কালের প্রকাশাত্মা। অর্থাৎ চিত্তাকাশ হইতেই কালের উৎপত্তি। প্রাণদাতা পবন ও অন্নকারী মেঘ যাহাতে অবস্থিত ও যাহা ভূমণ্ডলের দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে তাহাই ভূতাকাশ। চিদাকাশই সকলের কারণ। ইহা হইতেই চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ অবিদ্যা মায়ার দ্বারা আবির্ভূত। এই চিৎ চিত্তরূপে আবির্ভাব হইয়া মনের রূপ প্রকটন করে। অর্থাৎ মনরূপে বিরাজ করে। সেই মন জগৎরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করে। এই মনই ব্রহ্মা। কারণ ব্রহ্মা মন সহায়ে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার কল্পনাময় মনোরূপ। এই মনই জগতের কর্ত্তা ও হিরণ্যগর্ভ নামক পরম পুরুষ।

এক বস্তু হইতে আর এক বস্তু যখন উৎপন্ন হয় তখন সেই উৎপাদিত বস্তুকে পুত্র বলে। যখন এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার আবির্ভাব হয় সেই নব আবির্ভূত অবস্থার নামকরণ করা হয় পুত্র। অর্থাৎ যখন উচ্চ সূক্ষ্মতা হইতে নিম্নমুখী হইয়া স্থূলগামী হয় তখন সেই নিম্নমুখী শক্তির অবস্থাই হইল ভৃগু। ভৃগু অর্থে প্রপাত, (ভৃগু—ভ্রসজ্+কু ক। ভ্রসজ্ অর্থে উচ্চ হইতে পতন)। মন নিম্নমুখী হইলেই ভৃগু প্রকাশ শক্তির বিকাশ। এই প্রকাশ শক্তিই হইল খ্যাতি। যাহা প্রস্ফুটিত বা বিকসিত করে তাহাই হইল "শ্রী"। "শ্রী"র অর্থ হইল সৌন্দর্য্য ও শোভায় বিকসিত হওয়া। "শ্রী" শব্দটি শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্বিপ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। তাহার অর্থ হইল বৃদ্ধি, সিদ্ধি,

কীর্ত্তি, বুদ্ধি, লোক, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ত্রিবর্গ। ইহারা ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে "শ্রী" অমৃত মন্থন সময়ে ক্ষীরাব্ধিতে উৎপন্ন। জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণুশক্তি "শ্রী" নিত্যা। বিষ্ণুর ন্যায় ইনিও সর্ব্বগতা। বিষ্ণু অর্থ ইনি বাণী। বিষ্ণু বোধ ইনি বুদ্ধি। বিষ্ণু ধর্ম্ম ইনি সংক্রিয়া। বিষ্ণু স্রষ্টা ইনি সৃষ্টি। বিষ্ণু ভূধর ইনি ভূমি। বিষ্ণু কাম ইনি ইচ্ছা। ইনি বিহা বিষ্ণু হুতাশন। বিষ্ণু শম্ভু ইনি গৌরী। বিষ্ণু অবকাশ ইনি আকাশ। বিষ্ণু শশাঙ্ক ইনি কান্তি। বিষ্ণুরূপ সংহিতা ইনি সত্যক্রিয়া। বিষ্ণুধর্ম্ম ইনি পতাকা। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত ইনি ক্ষণ। বিষ্ণু রাগ ইনি রতি। অর্থাৎ বিষ্ণু আধার ইনি আধেয়। ইঁহারা অভিন্ন।

দুর্ব্বাসা শাপে যখন স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট ও অসুর আক্রান্ত, তখন ইনি ক্ষীরোদ সাগরে নিমজ্জিত। দেবতাদের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু সর্ব্বৌষধি নিক্ষেপ করত মন্থন আরম্ভ দিয়া স্বয়ং কূর্ম্মরূপ গ্রহণ করত মন্দার পর্ব্বত মন্থ দণ্ডরূপে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া মন্থন করেন। সেই মন্থনে "শ্রী" উৎপন্না হইয়া নারায়ণের বক্ষ সংলগ্না হন।

যিনি নার আশ্রিত তিনিই নারায়ণ। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূ নবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণ স্মৃতঃ।"

আপকে নার বলা হয় এবং এই আপে ইন্দ্রিয় কারণে নব নব তরঙ্গ উৎপন্ন। কারণ ইন্দ্রিয় আপ্ত হইল আজ। এই রূপ তরঙ্গাশ্রিত আপ আশ্রিত যিনি তিনিই নারায়ণ। নার কথাটি নৃ শব্দ+ক ইবনর্থে। অর্থাৎ পরা সত্বিৎকে অভিন্নরূপে রূপায়িত করিবার জন্য ইবনর্থে ক প্রত্যয়। নর শব্দের এক অর্থ তরঙ্গ। এই নারকেই কারণ, প্রয়োজন, কারণ বারি, প্রকৃতি, নারা ইত্যাদি বলে। কারণ বারি বলিবার হেতু—যাহা পরম কারণকে ধারিত করে ও স্বয়ং কারণ রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই কারণ বারি। বারি শব্দটি বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃ অর্থে আবরণ। এই বারিতে যখন তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তখন সেই বারি চিহ্নিত হয়। মনই কারণ বারি। বেদ বলেন—

"সংবৎসরস্যার্দ্ধ প্রতেরহি কেতুনা
হবির্যো বিশ্ব বিরাজতে।"

সংবৎসরূপ মহাপুরুষ যখন তরঙ্গ দ্বারা চিহ্নিত হয়, তখন যে শক্তিতে জগৎ বিরাজ করে। প্রতিষ্ঠানটা মনের স্বভাব এবং ইহার প্রতিষ্ঠানই বেদাদিরূপে প্রতিভাত হয়। মন বিদ্যা বিজ্ঞান। মন আছে বলিয়াই বেদাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। সমাধি অবস্থায় মন যখন অতীত্ব ভিন্নে পাত নিষিদ্ধ হয় তখন আর কোন বাক্যবস্তু সত্তা প্রতীতি হয় না। তখন জগৎ বিলুপ্ত। মন কাম ও কর্ম্মাদি বাসনার অনুসরণ হেতু আত্মাকে বহুরূপে বিস্তার করে। এই কারণ হেতু পুরুষের অংশ। মন স্থূল মাত্রির অধিভূত হইলে জীব নামে অভিহিত ও তদ্বিহীন হইলে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই কারণ হেতু মন ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। উহাই আমি, তুমি নাম রূপাদি স্বরূপ। পরমার্থ রূপিণী বিশুদ্ধ চিৎই জীবরূপী মন হইয়া যেহাদি ভাব অনুভব করে। এই হেতু মন জড় ও অজড় বিবিধ স্বরূপ। উহা ব্রহ্ম রূপ, এইরূপ অজড় ও বৃত্তরূপ এইরূপ জড়। ব্রহ্ম সকলের আত্মা এই জন্য জগৎ জড় ও চিন্ময় স্বরূপ।

নার আশ্রিত যিনি তিনি নারায়ণ। অর্থাৎ এই মনোরূপ নার আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থিত তিনি অন্তর্যামী নারায়ণ। এই নারায়ণ একবার কারণপায়ী, একবার গর্ভোদকশায়ী ও একবার ক্ষীরোদকশায়ী। পরা সত্বিৎ যখন অবিদ্যা হেতু কলঙ্কত্ব প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কারণপায়ী। যখন সূক্ষ্ম অনুরঞ্জনরূপে পরম বিশিষ্ট দেহরূপ কুক্ষেয় সমুদ্ভাবন করেন তখন গর্ভোদকশায়ী এবং যখন সেই পরিচ্ছিন্ন দেহের জগতের সার গ্রহণে পুষ্টি ও আনন্দ বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হন তখন তিনি ক্ষীরোদকশায়ী।

জীব যখন জননী জঠরে সূক্ষ্ম অনুরঞ্জনরূপে প্রবেশ করে তখন কারণপায়ী এবং যখন পরমবিশিষ্ট দেহ ধারণ করে তখন গর্ভোদকশায়ী এবং যখন ক্ষীরোদক মাতৃকুলের দ্বারা সেই দেহের পুষ্টিসাধন করেন তখন তিনি ক্ষীরোদকশায়ী।' ক্ষীর কথাটি ক্ষর্ (ভোজন করা)+ঈরন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। যখন অবস্তুকে বস্তুরূপে রূপায়িত করা হয় তখন ঈরণ, প্রত্যয়। ঈরণ্ অর্থে ঈরয়, অনুর্ব্বর ইত্যাদি। এইরূপ অবস্তুকে যখন বস্তুরূপে রূপায়িত করিবার প্রয়োজন হয় তখন ঈরণ প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ যাহা অভোজ্য তাহা ভোজ্যরূপে রূপায়িত। সর্ব্ব অবস্থাতেই তিনি অবিদ্যা বহন করেন বলিয়া "শ্রী" তাঁহার বক্ষ-সংলগ্না।

সঙ্গীতশাস্ত্র বলেন যে পঞ্চাননের সদ্যোজাত মুখ হইতে "শ্রী" রাগের আবির্ভাব। এই সদ্যোজাত মূর্ত্তি সম্বন্ধে পুরাণ বলে ব্রহ্মা শ্বেতলোহিত-বর্ণে সৃষ্টি মানসে ধ্যান নিরত হইলে তাঁহার সম্মুখে এক শ্বেত লোহিত বর্ণ, শ্বেত উষ্ণীষ ও শ্বেতাম্বরধারী অগ্নিসম তেজ পুঞ্জ এক কুমার আবির্ভাব হন। ব্রহ্মা ধ্যানে জানিতে পারিলেন যে ইনিই যোগেশ্বর মহাদেবের সদ্যোজাত মূর্ত্তি। ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করাতে সুরম্য, নবরূপ, বিমনস্ক ও নবম নামক চার কুমারের আবির্ভাব। অপর পুরাণে ইহারাই, সনৎ, সনাতন, সনক ও সনন্দ। যাহার আবির্ভাব হেতু কন্দর্পকে কুৎসিত বলিয়া বোধ হয় তিনিই কুমার।

ইহা সকলেই বিদিত আছেন যে সদ্যোজাত শুদ্ধ শ্বেত লোহিত বর্ণ এবং তাহার আবির্ভাবেই চতুর্দ্দিক আনন্দিত ও কন্দর্প কুৎসিত বলিয়া প্রতিপাদিত। শ্রী এই নারায়ণরূপী শিশুর বক্ষ সংলগ্না হেতু দিন দিন তাহার শোভা বৃদ্ধি। এই হেতু সদ্যোজাত মূর্ত্তি হইতে "শ্রী" রাগের আবির্ভাব।

সঙ্গীতশাস্ত্র বলে—

"ষড়জে গায়তী সমুদ্ভূত শ্রীরাগঃ।
সম্পূর্ণ ত্রিসপ্তাধিঃ ত্রাম্বারোহে বক্র বর্জ্জিতঃ।

—হনুমান প্রকাশ—

"শ্রীরাগস্তীব্র গান্ধার আরোহে ধৈবতবর্জিত।"

—সঙ্গীত পারিজাত—

শ্রীরাগ সম্পূর্ণ জাতীয়,কিন্তু ঋষভাদির আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত এবং অবরোহণে তীব্র গান্ধার ব্যবহার্য্য। ইহাতে ষাড়জী গ্রাম ব্যবহার্য্য, ইহা ষড়জ স্বর হইতে উৎপন্ন।

আর্য্য সঙ্গীত শ্রুতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শ্রুতির বণ্টন যথা—৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২। ইহাই হইল ষাড়জী গ্রাম। অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম চতুঃশ্রুতিক, ঋষভ ও ধৈবত ত্রিশ্রুতিক এবং গান্ধার ও নিষাদ দ্বিশ্রুতিক। শ্রীরাগে কোন শ্রুতিতে কোন স্বর অধিষ্ঠিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কি কারণ হেতু আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত ও অবরোহণে গান্ধারকে তীব্র করিবার তাৎপর্য্য যেখান প্রয়োজন।

যেহেতু ষড়জ স্বর ইহাতে প্রধান ও ষাড়জী গ্রাম।সমুদ্ভূত সেই হেতু ষড়জ স্বর হৃষ্যোবতী নামক চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত। জমি হৃষ্যযুক্ত না হইলে তাহাতে মধুরতা আসে না। মধুরতা না থাকিলে তাহার শোভা বা শ্রী আসে না। এই কারণ হেতু হৃষ্যোবতী শ্রুতিতে ষড়জ অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বে যেখান হইয়াছে যে শ্রী নিজেই রতি। এই হেতু রতিকা নামক সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ। গান্ধার সাধারণতঃ ক্রোধা নামক নবম শ্রুতিতে অবস্থিত। যেখানে ক্রোধা সেখানে শ্রী অন্তর্হিত। পুরাণে উক্ত আছে যে দেবাসুর সংগ্রামের পর যখন বলি রাজা পাতাল প্রবেশ করিলেন তখন শ্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেব রাজের নিকট আসিলেন। দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবী, আপনি কি কারণে বলি রাজাকে ত্যাগ করিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন—যেখানে ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অনাচার ইত্যাদি অবস্থিত সেখানে আমি থাকি না। তখন দেবরাজ কহিলেন—কি উপায়ে আপনাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইব। দেবী কহিলেন—আমাকে চতুর্থা বিভক্ত করিয়া চতুর্স্থানে সংস্থাপিত কর। তাহাতে দেবরাজ অনুরোধ করাতে তিনি নিজেকে চতুর্থা বিভক্ত করিয়া প্রথমাংশ পৃথিবীতে; দ্বিতীয়াংশ দলিলে, তৃতীয়াংশ হুতাশনে ও চতুর্থাংশ যোষিতদের মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন। এই কারণবশতঃ আরোহণে ক্রোধশক্তি জ্ঞাপক গান্ধার বর্জিত। আরোহণেই রাগের রূপ প্রকটিত হয়। অবরোহণে গান্ধারকে তীব্র করিয়া প্রদায়িণ নামক একাদশ শ্রুতিতে স্থাপিত করা হইয়াছে। কারণ শ্রী হেতুই জীবের প্রসার। তরঙ্গের প্রপাত হেতু প্রসার। মধ্যম মার্জ্জনী নামক ত্রয়োদশ শ্রুতিতে অবস্থিত। মার্জ্জন অর্থে শোধন। যেখানে শুদ্ধতা সেইখানেই শ্রীর আবাস। আলাপিনী নামক দশমশ শ্রুতিতে পঞ্চম। যেখানে শ্রী সেইখানেই সমাগম। সাধারণতঃ ধৈবত স্বর রম্যা নামক বিংশ শ্রুতিতে অবস্থিত। আরোহণে রাগের রূপ। উন্নতির পথ রমণ ক্রিয়া বর্জ্জিত। সেই হেতু আরোহণে ধৈবত বর্জ্জিত। নিষাদ ক্ষোভিণী নামক দ্বাবিংশ শ্রুতিতে অবস্থিত। ক্ষোভিত অর্থে চালিত, ঘর্ষিত, আন্দোলিত। ইহার শক্তিতেই ভাবের আলোড়ন হয়। চালন অর্থে শ্রম বা তপস্যা। শ্রম বা তপস্যা ভিন্ন শ্রীর আগমন নাই। এতদ্ব্যতীত ক্ষোভিনী হইল দ্বাবিংশ শ্রুতি। কালচক্রে দ্বাবিংশ নক্ষত্র হইল শ্রবণা যাহা তপস্যারিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা বিষ্ণু যাঁহার বক্ষসংলগ্না শ্রী।

এই বিশ্লেষণ হেতু দেখা যায় যে ইহাতে ষাড়জী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল। এই হেতু ইহা রাগ।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে ইহা বিষ্ণুশক্তি সম্পন্ন, ত্রিলোক ব্যাপ্ত; বিশুদ্ধ শ্বেত বর্ণ, সলিলোত্থিত এবং ইহাতে মধুর রস নিবদ্ধ ও ইহা পর্ব্ব পর্ব্ব করিয়া বৃদ্ধি পান। এই ছয় প্রকার ভাব থাকা হেতু ইহা হইতে ছয় রাগিণীর উদ্ভব। তাহারা যথা—

বিষ্ণুশক্তি হইতে—মালশ্রী
ত্রিলোক ব্যাপ্তিকারণ—ত্রিবণ
বিশুদ্ধ শ্বেত হেতু—শ্রীরাগ
সলিলোত্থিত বলিয়া—কেদারী
মধুর রস বশতঃ—মধুমাধবী
পর্ব্ব পর্ব্ব বৃদ্ধি হেতু—পাহাড়ী

ইহাদের আলোচনা পরে করিবার বাসনা রহিল।

সকল আর্য্য শাস্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কারণ তাহা না হইলে সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। যাহারা শক্তি মানেন না তাহাদের সম্মুখেই শোভা পায় বলা যে রাগিণী বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতবাদীরাও মাত্রায় কাহা স্বীকার করেন। যাহারা সমগ্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন তাহারা বলিতে পারিবেন না যে রাগিণী বলিয়া কিছুই নাই।

—শিবম্—

রিপোর্টারের ডায়েরী

চৈতন্য

[১]

[যাকুরদার কুলির মতন সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কুলিটও কম আকর্ষণীয় নয়। এর মধ্যে নানান বিচিত্র বৈচিত্র্য-কাহিনী পাওয়া যাবে। এক তরুণ রিপোর্টার তাঁর 'রিপোর্টারের ডায়েরী'তে ধারা-বাহিকভাবে এই সব মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত প্রকাশ করবেন। লেখকের ইচ্ছায় লেখাটি ছদ্মনামে বেরুবে এবং অনিবার্য কারণবশতঃ মূল কাহিনী অটুট রেখে দুই একটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের নামের পরিবর্তন করা হবে।—সম্পাদক ভারতবর্ষ]

এক

মধ্যরাত্রির কিছু পরেই টেলিপ্রিন্টারে এক 'ফ্লাশ মেসেজ' এলো।

...Pakistans newly appointed Prime Minister, Mr. Mohammad Ali will pass through Calcutta early this morning on his way from Karachi to Dacca.

ইংরেজি মতে তখন ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলেছে। আলি জিন্ন মঞ্জিল বলতে রাত একটা না দুটো, তিনটা না চারটে, তার কোন ইঙ্গিত নেই ফ্লাশ মেসেজে। কোন্ বিমানে তাঁর আগমন, তারও কোন হদিশ নেই এই সংক্ষিপ্ত খবরে। মাত্র কদিন আগে নিতান্ত নাটকীয়-ভাবে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী পদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছেন। লিয়াকত আলি খানের আকস্মিক মৃত্যুর পর ঢাকার মসনদ ত্যাগ করে করাচীর তৎ-এ-তাউস অলঙ্কৃত করে জনাব নাজিমুদ্দীন একদিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, সেটা অচিন্তনীয় কিছু হয়নি। কিন্তু প্রৌঢ় বয়স্ক নবীন রাজনীতিবিদ মহম্মদ আলির পক্ষে মার্কিনী মুলুকে দূত হওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হলেও, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগে সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং দমদম বিমান বন্দরে সেই সৌভাগ্য চূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের লোভ কলকাতার সাংবাদিকরা কর্তব্য ও আগ্রহের আতিশয্যে সম্বরণ করতে পারেননি। নাইট্ ডিউটির সব রিপোর্টাররা এখানে-ওখানে-সেখানে টেলিফোন করলেন। নানান মহলে খোঁজ খবর করে জানলেন, প্রত্যুষে পাচটা নাগাদ বি-ও-এ-সি-বিমানে তাঁর আগমন হচ্ছে দমদমে। বিমান ও বিমানযাত্রীরা প্রাতরাশ শেষ করে যাবেন ঢাকা।

এখনও এক সপ্তাহ হয়নি। করাচী রেলষ্টেশনে নিয়মিত যাত্রীদের আগমন-নির্গমন সেদিনের মত শেষ হয়েছে। ভোরের আগে আর কোন বাষ্পীয় শকটের আবির্ভাব হবার কথা নয় করাচী ষ্টেশনে। হঠাৎ মধ্য-রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে হুঁস হুঁস শব্দে একটা ট্রেন ষ্টেশন প্লাটফর্ম প্রবেশ করল। কুলিরা সব ঘুম থেকে চট করে উঠে বসল। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল, এটা কোন সাধারণ যাত্রী গাড়ী নয়। আবার তারা সব গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। প্লাটফর্মে গাড়ী থামল। কর্তাব্যক্তিদের ত্বরিত গতিতে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি। সান্ত্রীদের উপস্থিতি। প্লাটফর্ম লাল কার্পেটে মুড়ে দেওয়া হলো। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন যাবেন লাহোর না রাওয়ালপিণ্ডি। তাঁরই শুভাগমন প্রত্যাশায় ষ্টেশন প্লাটফর্মে রেল আর পুলিশের কর্তারা সব 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' করে অপলক নেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কয়েক মিনিট বাদেই টেলিফোনের আওয়াজ। তারপর আবার কর্তাদের ত্বরিত গতিতে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা। সামনের লাল আলো নীল হলো। নির্দিষ্ট যাত্রীকে না নিয়েই ট্রেনটা ষ্টেশন পরিত্যাগ করল। যাত্রীরা তাদের অস্ত্রাদি ঘাড়ে করে শিথিল পদক্ষেপে ফিরে গেল। পোর্টারের দল এগিয়ে এলো। লাল কার্পেট গুটিয়ে রাখা হলো। করাচী ষ্টেশন আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

সারা শহরটাও তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু আরব সাগর পারের করাচী বন্দর থেকে

আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রমত্ত নাবিকদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় তরণীর নাবিকদেরও সে রাত্রে ঘুম হয়নি। সারা রাত্রি চলেছিল শলা-পরামর্শ আর মন্ত্রণা। ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধান-মন্ত্রীর পদ থেকে মুক্তি দিলেন নাজিমুদ্দীন সাহেবকে। আর সেই সোনালী সিংহাসনে বসালেন মহম্মদ আলিকে এই রাত্রিতেই।

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কিছুকালের জন্য মহম্মদ আলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর ঐতিহাসিক রাজত্বকালে সাময়িকভাবে অর্থমন্ত্রীর পদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে কারণে কলকাতার রিপোর্টার মহলের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধ্য-রা'ত্রির অনেক পরে খবর পেয়েও ভোর পাঁচটায় দমদম বিমান-বন্দরে কার্পণ্য হয়নি রিপোর্টারদের উপস্থিতিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী, আর পাকিস্থান ডেপুটি হাইকমিশনের জনকয়েক কর্তা-ব্যক্তি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য হাজির ছিলেন। আর বিশেষ কেউ ছিলেন না। ভোরের আলো তখন সবে ছড়িয়ে পড়লেও, সূর্যরশ্মি তখনও ঠিকরে পড়েনি দমদমের পথ। রানওয়েতে। ঠিক সময় বি-ও-এ-সি বিমানটি এসে পৌঁছাল। বিমানের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে 'এয়ার হোষ্টেস্' ইঙ্গিত করে জানালেন, বিমানে ভি, আই, পি (Very Important Person) রয়েছেন। নিম্নকর্মচারীর পরিবর্তে পদস্থ কর্মচারীরাই অধিকতর উৎসাহী হয়ে বিমানে সিঁড়ি লাগালেন। সহাস্য বদনে নেহরুজীর মতন এক 'ব্যাটন' হাতে বেরিয়ে এলেন মিঃ আলি।

বিমান থেকে নেমে আলি সাহেব দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে ভি-আই পি রুমে প্রবেশ করলেন। পিছন পিছন এলেন প্রধানমন্ত্রীর একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী। তরুণ বাঙালী যুবক। আগে রাইটার্স বিল্ডিংএ ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। আর এলেন খাকি প্যান্ট ও মোটা শোলার হাট পরে পাকিস্থান সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা। মিঃ মীর্জা আর ঘরে ঢুকলেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। উপস্থিত অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। ঘরের ভিতর মিঃ আলির সোফার চারদিকে বসে দাঁড়িয়ে রইলাম রিপোর্টারের দল। একজন প্রৌঢ় বাঙালীকে প্রধানমন্ত্রীরূপে পেয়ে রিপোর্টারদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। প্রধানমন্ত্রী হয়েও মহম্মদ আলির মুখের হাসিকে অহেতুক গাম্ভীর্য্য গ্রাস করেনি। দেখে সবাই আনন্দিত। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার চীফ্ রিপোর্টারের দিকে ফিরে বল্লেন, 'হাউ আর ইউ, মিঃ গাপ্তগুপ্ত?' পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অমৃতবাজারের ষষ্ঠীদার (মুখার্জী) দিকে লক্ষ্য করে তাঁর কুশলবার্তা জানতে চাইলেন। কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করে জিজ্ঞেস করলেন, এর-ওর কথা। কাগজের অফিসের নানাজনের কথা। রাইটার্স বিল্ডিংস'এর টুকি টাকি। ডাঃ রায়ের সংবাদ। তারপর সুরু হল কাজের কথা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পাকিস্থানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানালেন ভারত-পাকিস্থানের মৈত্রী বন্ধন কোনদিন কোন কারণেই শিথিল হতে পারে না; বরং সে বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। নেহরুজীকে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতন শ্রদ্ধা করেন জানিয়ে নিকট ভবিষ্যতে কাশ্মীর ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অভিপ্রায়ও মিঃ আলি জানান।

আমেরিকায় পাকরাষ্ট্রদূত ছিলেন মিঃ আলি। রাষ্ট্রদূত পদ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী। ঘোড়ার থেকে সহিস না হলেও, অনুরূপ একটা কিছু বটে। আইসেন-হাওয়ার প্রভুদের কোন হাত নেই তো এই পরিবর্তনে! আমেরিকা মহম্মদ আলিকে দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবে নাতো? সেদিন আরো পাঁচজনের সাথে সাথে কলকাতার রিপোর্টারদের কাছেও এ সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকলে যেমন তান্ত্রিক সাধনা সম্ভব নয়, তেমনি আজকের দিনে খবরের কাগজের রিপোর্টার হওয়াও অসম্ভব। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই প্রশ্ন করা হলো:

...'Is it not but natural that the United States would enjoy some special favour during your Prime Ministership?'...সব সন্দেহ ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। সরাসরি এ আশঙ্কা অমূলক

বলেন। এমন দরদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন যে, তা অবিশ্বাস্য মনে হলো।

সুদীর্ঘকাল পূর্বপাকিস্তানে কলকাতার সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ। যুগান্তরের চীফ্ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্যই প্রথম সেকথা পাড়লেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন মিঃ আলি, ঢাকা গেলেই এই সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন। দমদম ত্যাগ করে ঢাকা যাবার জন্য আবার বিমানের দিকে রওনা হলেন। বিমানে চড়বার আগে সব রিপোর্টারদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। সিঁড়ি দিয়ে বিমানে উঠে গিয়ে অনুরোধ করলেন, দমদমে গৃহীত ফটোগুলির কপিগুলো যেন তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্মতি জানালেন তারকদাস ও অন্যান্য ফটোগ্রাফারের দল।

পরদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রগুলির প্রথম ও প্রধান সংবাদরূপে দমদমে মহম্মদ আলির সঙ্গে সংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণী ছাপা হলো। রিপোর্টারদের সঙ্গে তার ছবিও বেরুল। ঢাকা সফরের খবরও নিত্য বেশ ভালভাবেই বেরুতে লাগল। ঢাকা থেকে করাচী উড়ে যাবার পথে আবার দমদম আসবেন বলেও খবর ছাপা হলো। এবার একটু বেলাতেই মিঃ আলির প্লেন দমদমে এলো। দমদমে কিছু উৎসাহী লোকেরও জমায়েত হয়েছিল। 'প্রটেক্টেড্ এরিয়া' থেকে বেরিয়ে ভি-আই-পি রুমে যাচ্ছেন মিঃ আলি। পাশে ভীড়ের মধ্য থেকে একটা আধা ময়লা হাফ্ সার্ট পায়জামা পরা এক ছোকরা এগিয়ে এলো।

—'কাকা,' কাকাবাবু,—ছেলেটি ডাকল।

মিঃ আলি পিছন ফিরলেন। ছেলেটি সোজাসুজি সামনে এলো। চিনতে পারেননি মিঃ আলি। ছেলেটিই উৎসাহী হয়ে নিজের কাকার নাম করল। বগুড়ার বাসিন্দা। সম্পর্ক ছিল এই দুজনের মধ্যে। ফেলে আসা দিনের বন্ধুর খোঁজখবর করলেন। জানলেন, বন্ধু এখন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাসিন্দা। ত্রুটি করলেন না সংসারের আরো পাঁচজনের কুশলবার্তা নিতে। ছেলেটিকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন। করাচীতে চিঠি লিখতেও বলেন। গভীর গুণে সারল্য বিসর্জন দেননি মহম্মদ আলি। দেখে সবাই খুশি।

দলবল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘরে ঢুকলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথেয়তা রক্ষার জন্য। এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস' হাতে নিয়ে সেই চেনা মোটা গোলার হ্যাট পরে ডিপ্লোম্যাটিক সেক্রেটারী ইয়ান্দার মীর্জা বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেশ বিভাগের আগে থেকেই দেশরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদে বহাল ছিলেন মিঃ মীর্জা। লম্বা চওড়া চেহারা। মুখখানা বিশালকায়। তাঁর আড়ালে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলা হতো। মীর্জাকে বলেও অন্যায় বা অত্যুক্তি হবে না কোন দিকে থেকেই। বারান্দার একপাশে সরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সামান্য সময়ের জন্য আলাপ আলোচনা করলাম। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে দেরী হলো না, মিঃ মীর্জা একজন ডাঁদরেল অফিসার। এর কাছে কেন জানি না মহম্মদ আলিকে কেমন যেন অসহায় মনে হলো। পশুরাজ সিংহের সঙ্গে নেংটি ইঁদুরের খেলা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প আছে। আশা হলো ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ইতিহাসে মীর্জা-আলি নিয়েও বোধ হয় এমনি গল্প আবার লেখা হবে।

আমাদের কৃষ্ণমেননের মতন স্বদেশী সাংবাদিক দেখলে ভ্রু কুঞ্চিত করেন না মিঃ আলি। প্রেস সাইনেসের' বালাই মহম্মদ আলির নেই। এবারও রিপোর্টারদের কাছে এক লম্বা-চওড়া বিবৃতি দিলেন আগের দিনের সুরে। নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম করে হাতের ছাতিটাকে স্পোর্টস্ টীকের মতন ঘুরাতে ঘুরাতে প্লেনের দিকে চলেন। সিঁড়ি দিয়ে দু' এক ধাপ উপরে উঠতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। আমরা সব কাছেই ছিলাম। আমাদের আগের দিনের আশঙ্কার মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্য হাতের ছাতিটাকে ঘোরিয়ে বলেন :

'জেন্টলম্যান অফ্ দি প্রেস! নেভার মাইণ্ড, দিস ইজ নট এ্যান আমেরিকান রাইফেল, বাট এ্যান অর্ডিনারী আমব্রেলা।' উপস্থিত সকলের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন মহম্মদ আলি।

উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে করতোয়া নদী বয়ে গেছে। করতোয়ার পশ্চিমে শেরবর্ষ পরগণার কুন্দগ্রামের জমিদার ছিলেন নবাব আবদুল সোহবান চৌধুরী। নবাব নন্দিনী আলতাফান্নেসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নবাব আলি চৌধুরীর। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রকালে বাংলাদেশের মন্ত্রিত্ব করেছেন এই নবাব

আলি চৌধুরী। এঁদেরই পুত্র হলেন মহম্মদ আলির পিতৃদেব নবাবজাদা আলতাফ আলি চৌধুরী। এক ময়মনসিংহ দুহিতার সঙ্গে আলতাফ আলির প্রথম বিয়ে হয়। তাঁরই গর্ভের পাঁচটি পুত্রের প্রথমটি হলেন মহম্মদ আলি। আলতাফ আলি মহম্মদ আলির গর্ভধারিণীকে তালাক দিয়ে পরে সাগর পারের এক কটা সুন্দরীর পানি-গ্রহণ করেন। পূর্বতন আলতাফ বেগমও মালা জপ করে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাননি। তিনিও এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে নিকায় বসেছিলেন। এখন সে মহিলা পরলোকে ত্যাগ করেছেন। সাধারণভাবে ভদ্র বিনয়ী থাকলেও, আলতাফ আলি শনিবারের বারবেলায় বা রবিবারের প্রাক্ গোধূলিতে দিঘিরপুরের ঘোড় দৌড়ের মাঠের সঙ্গে গাটছড়া না বেঁধে থাকতে পারেননি। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘোড়ার খুরের ধূলায় উড়িয়েছেন। সন্ধ্যার ঝিমিত আলোকে হস্তান্তরের দলিলে দস্তখতের সাথে সাথে কলকাতার বহু বাড়ী চৌধুরী পরিবারের হাতছাড়া হয়েছে। 'গ্লো হর্স এ্যাণ্ড ফাষ্ট উওমেনের' কৃপায় মৃত্যুকালে লক্ষাধিক টাকা দেনা রেখে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবতঃ আরো পাঁচজন ধনীর মত সে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

আলতাফ আলির ফিরিঙ্গি পত্নীর গর্ভের প্রথম সন্তান হলেন ওমর আলি। লেস বসানো জরি আঁটা পাঞ্জাবী পরে কানে আতর গুঁজে সন্ধ্যায় তানপুরা হাতে নিয়ে বসতেন ওমর আলি। পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিছুকাল। আরো পরে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ আলি যখন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী, তখন সুরাবর্দীর পক্ষে ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ প্রচার করে পাক-রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন।

মহম্মদ আলি করাচী থেকে দীর্ঘ পথ উড়ে নয়া দিল্লী এসেছিলেন। আনন্দভবন-নন্দনকে দাদা বলে ডেকে-ছিলেন; এক সোফায় পাশাপাশি বসে ভূস্বর্গ কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্থানী নরক সৃষ্টির এক ফয়সালা করার চেষ্টাও করে-ছিলেন। শুধু মুখের হাসি দিয়েই আবার করাচী উড়ে গিয়েছিলেন। কাজের কাজ কিছু হয়েছিল বলে মনে হয় না। মহম্মদ আলির নিয়োগকালীন আশঙ্কার বুদ্বুদ শুধু মধুমাখা বিবৃতিতেই তিরোহিত হয়নি। পলাশীর আম্রকুঞ্জে যেমন একদিন ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল, মহম্মদ আলির প্রধানমন্ত্রিত্ব-কালেও তেমনি করাচীতে মার্কিনী প্রভুত্বের বীজ বপন ও তাকে পল্লবিত করার দুর্নিবার প্রচেষ্টায় 'সিয়াটো' প্যাক্টে পাকিস্থান দস্তখত করেছিল। অনাগত ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা 'গান এ্যাণ্ড গোল্ডে'র দেশ আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্থানের মৈত্রীকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, তা সবার অজ্ঞাত হলেও, মহম্মদ আলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। এরই রাজত্বকালে পাকিস্থানের উর্বরা ভূমিতে 'মিলিটিসিয়ানের' পলিটিসিয়ানদের জন্ম হয়। খাকি পোষাক, মেজর জেনারেল উপাধি, মোটা গোলার ছাট আর ডিফেন্স সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করে মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা পলিটিসিয়ানের তিলক পরে পূর্ব বাংলাকে সায়েস্তা করবার জন্য লাট সাহেব হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের অজুহাতে অতীতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতন গোলাম মহম্মদকে কায়েদী আজম পথে আসান দিতে হয়েছিল। মহম্মদ আলিও বেশী দিন সুখে কাল কাটাতে পারেন নি। মীর্জার ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য ও মুসলিম লীগের অন্তর্কলহ ঈশান কোণের মেঘের মতন মহম্মদ আলির সারা অন্তর নিত্য আশঙ্কিত করে তুলেছিল। পাকিস্থানী রাজনীতি সম্পর্কে আরো আশঙ্কাগুলির মতন এ আশঙ্কাও সহজে চলে যায়নি। মীর্জা গভর্ণর-জেনারেল হলেন। মার্কিনী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মধুর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে 'সিয়াটো' প্যাক্টের প্রিমিয়াম দিলেন। মহম্মদ আলি 'বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া'র মতন প্রথমা বেগমকে তালাক দিলেন। এক বিদেশিনীকে গাউন ছাড়িয়ে শাড়ী পরিয়ে হুবহু সং সেজে দিলেন। জীবন যৌবন নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি। জীবনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘর বাড়ীরও নতুন চেহারা সৃষ্টিতে মন দিলেন। সারা বাড়ী লাইমজুল কলারে ডিস্টেম্পার করা হলো। ভিতরের লনে সুইমিং পুল তৈরী আরম্ভ হলো। রাজমিস্ত্রীদের কাজ শেষ হতে না হতেই রাজত্বের পরিবর্তন ঘটলো। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিত্বের খবরও আর একবার নড়ে উঠল। উড়ে এসে জুড়ে বসলেন সুট-টাই আঁটা চৌধুরী মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলি আবার পাক রাষ্ট্রদূত হয়ে ডালেস-তীর্থে ফিরে গেলেন।

গ্রাম-চর্চা গবেষণা-কেন্দ্র

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতবর্ষে নূতন করে দীক্ষা প্রদান করিয়া ভারতবাসীকে নূতন জীবন ও কর্মপদ্ধতি দান করেন, তখন তাঁহার প্রথম কথা ছিল, গ্রামে ফিরিয়া চলো। সে কথাও একেবারে নূতন নহে—১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর প্রথমে সারা বাংলায় ও পরে সারা ভারতে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহাতেও নেতারা চলুন পল্লীকে গ্রাম-মুখো করার কথা বলেন। রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ মত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময়ে গ্রাম সংগঠনের উপায় লইয়া এক কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন—কিন্তু জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করেন নাই—মাত্র একদল লোক নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গ্রাম সংস্কারে মন দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কাজও করিয়াছিলেন; তাই বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকট সুরুলডাঙ্গার মাঠে প্রথমে শান্তিনিকেতন ও পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। ৫০ বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের রূপ কি রকমের ছিল, তাহা আজ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। স্বদেশী যুগের যত কর্মী যেমন গ্রামে আশ্রম, বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষির প্রতি দেশবাসীর মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের যুগেও তেমনই আরও বৃহত্তর একটি দল গ্রামে যাইয়া কাজ আরম্ভ করেন। আজ আর তাঁহাদের কার্যের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বাংলাদেশের খবর রাখেন, তাঁহারা সেরূপ বহু কর্মকেন্দ্রের সহিত পরিচিত। তাহার সংখ্যা যত ও যেটি নহে, কিন্তু কর্মীদের আন্তরিকতা কম নহে।

তাহার পর প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলেই এ দেশে অনেক সম্ভব হইল। ১৯২০ সালে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা কঠিন ছিল, ১৯৪৭ সালে সেই স্বাধীনতা আমরা লাভ করিলাম। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের নেতারা ও দেশের সর্বসাধারণ রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বাধীন ভারতের শাসনের ভার লাভ করিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা, গান্ধীজি নেতাদের শাসন-কার্যে পরামর্শ দানের জন্য অধিক দিন আর আমাদের মধ্যে রহিলেন না। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি চলিয়া গেলেন—কিন্তু তাঁহার ১০ বৎসর পরেও আজ আমরা—যাহারা তাঁহার কাছে নূতন দেশাত্মবোধের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম—জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁহার কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারি না। এই গুরুদের মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে তাহা—রবীন্দ্রনাথের মত মুক্ত চিত্তের রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখাইবার মত শক্তি আমাদের নাই—এখন করিব না। তবে অতীতকালের দিক দিয়া তাহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি। তাই ঘরে ঘরে আজ ও গান্ধীজির চিত্র শুধু ফুলের মালা দিয়া বন্ধন করে না—বৎসরের সকল দিনে না হইলেও উৎসব অনুষ্ঠানের দিন—বিশেষ করিয়া ৩ দিন—২রা অক্টোবর, ৩০শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগষ্ট তাঁহা পূজিত হইয়া থাকে। কর্মজীবনেও যে তাঁহার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক কোটি লোকজনের সমর্থন ব্যবস্থা করিতে দেখিয়া বুঝিতে পারি। সরকারী ব্যবস্থাতেও চলা ও বাঁচাকে আজ পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। শুধু তাহা নহে, গান্ধীজির আদর্শের অনুসরণ করিয়াই আমরা সরকারী প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহরের উন্নতির কথা চিন্তা করি নাই—গ্রামগুলিকে সর্বাগ্রে উন্নত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। সে জন্য গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কিলে ইউনিয়নে পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পল্লী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামে যাতায়াতের সুবিধার জন্য গ্রামাঞ্চলেই প্রথমে বড় বড় পীচ-ঢালা রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে, রাস্তার জন্য খাল ও নদীর উপর পুল নির্মিত হইয়াছে—নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র, জলদানের আন্দোলনের ব্যবস্থা, গ্রামে কর্মকেন্দ্র ও অভিনয়ের উৎসাহ দান প্রভৃতি কার্য চলিতেছে। সারা ভারতের সকল গ্রাম নিয়াই একযোগে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা জাতীয়াল এক্সটেনসন সার্ভিসের মধ্যে আসিয়া নূতন রূপ ধারণ করিবে—সব স্থানে সে কার্য আংশিক সাফল্যমণ্ডিত যে হইয়াছে, তাহা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলেই বুঝিতে পারা যায়।

তাহা ছাড়া যে সকল বড় বড় পরিকল্পনার আজ চলিতেছে, সেগুলি মূলতঃ গ্রামের অধিবাসীদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই করা হইতেছে, যদুরাকী পরিকল্পনার ফলে কত পতিত জমী উদ্ধার হইয়া আজ সোনার ফসলে ভরিয়া যাইতেছে, তাহা আর ঐতিহাসিক গবেষণার বা বিশ্লেষণের দেখার জন্যে নাই—সর্বত্র তাহা আমরা চক্ষে দেখিয়া থাকি। দামোদর পরিকল্পনা আমাদের কি করিয়াছে, তাহা একথায় বিলাড়া, বোকারো, কোনার, দুর্গাপুর, পাঞ্চেৎ প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আসিলেই বুঝিতে পারা যায়।

গ্রাম সংগঠনের কাজে শুধু সরকারী চেষ্টাই দেখা যায় না, বেসরকারীভাবে শিক্ষিত যুবকদের দল সে বিষয়ে কম আগ্রহ দেখাইতেছেন না। সম্প্রতি সেরূপ একদল যুবকের কার্যের সহিত বন্ধুত্ব পরিচয়ের সুযোগ মিলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচমন্ত্রী ও আমাদের দেশনেতা শ্রীঅতুল্যকুমার মুখোপাধ্যায়, পল্লীশ্রী শ্রীনারায়ণ সাহু, শ্রীইউ-পি-মল্লিক, ডাক্তার সোবাসন্দী গঙ্গারাম প্রভৃতিকে অগ্রণী করিয়া শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীসুধাংশুকুমার পাইক নামক দুই

তরুণ কর্মী গ্রামচর্চা গবেষণার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অগ্রণী হইয়াছেন। গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার নদীয়া জেলায় মুড়াগাছার নিকটস্থ সাধনপাড়া গ্রামে প্রথম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

১৭ই নভেম্বর সকালে ২ খানি মোটরে একদল কর্মী ঐ গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। দলে ছিলেন মন্ত্রী অজয়কুমার, ডাক্তার গণপতি, খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার সিন্ধুর-তনয়াবাসী শ্রীইষ্ট-পি-মল্লিক, লেখক স্বয়ং, নীরেন্দ্রনারায়ণ, সুশান্তকুমার প্রভৃতি। পূর্ব হইতেই ট্রেণে একজন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং আর একখানি মোটরে সুলেখা কালীর কারখানার অন্যতম পরিচালক শ্রীমনীন্দ্রলাল মৈত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাম্বুলী তথায় গমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সাধনপাড়া প্রায় ১০০ মাইল—তথায় যাইতে ৫ ঘণ্টারও অধিক সময় আমাদের লাগিয়াছিল। গ্রামবাসী তরুণ স্বেচ্ছাসেবক শ্রীপান্ডিয়ন গাঙ্গুলী পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সুশান্তকুমার ঐ গ্রামেরই অধিবাসী হইলেও বর্তমানে কলিকাতাপ্রবাসী—তিনি ত প্রথম উৎসাহের সহিত গ্রামের তথা বলিতে বলিতে সঙ্গে যাইতেছিলেন। কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর এক ঘোড়ে যাওয়া যায়—কিন্তু তাহার পাই জলঙ্গীতে এখনও পুল নির্মিত হয় নাই—সেজন্যে নৌকায় করিয়া সেখানে মোটর গাড়ী পারাপার করিতে হয়। সেখান হইতে সাধনপাড়া গ্রাম ১২।১৩ মাইল হইলেও অনেকটা বহরমপুর রোডের পীচের রাস্তায় যাইয়া অর্ধেকের বেশীর ভাগ কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামের মধ্যে যাইতে হইল। মুড়াগাছা হাইস্কুলের কাছে গাড়ী রাখিয়া 'গুড়গুড়ে' নামক ছোট নদী বা খাল নৌকায় পার হইয়া সাধনপাড়ায় যাওয়াই সুবিধাজনক—কিন্তু সুশান্তকুমার ও শান্তিসরের উৎসাহে আমাদের ৩ মাইল মাঠ-পথে ঘুরাইয়া মোটরেই গ্রামে লইয়া যাওয়া হইল। সুশান্তকুমারের গৃহে সকলের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল—সেখান হইতে প্রায় আধ মাইল দূর পর্যন্ত পথে কয়েকটি তোরণ নির্মাণ করিয়া মন্ত্রী-সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথম তোরণেই শতাধিক গ্রামবাসী অভ্যর্থনা জানাইলেন ও সেখান হইতে কয়েকশত লোকের অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী অজয়কুমার নদীয়ার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণস্পর্শ পূত ধূলা মাখিতে মাখিতে পদব্রজে গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথের দুইধারে গ্রামবাসী তাঁহাকে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া আবাহন করিল। গৃহস্বামী সুশান্তকুমারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পাঠক ও খুল্লতাত শ্রীপ্রভাতকুসুম পাঠক গৃহদ্বারে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিনয়বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান লীলাময় কলিকাতা হইতে পূর্বেই আসিয়াছিলেন, তিনি তরুণ, কাজেই সোৎসাহে সকলের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে কয়েকশত গ্রামবাসী আসিয়া, সকলকে পাঠক-বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। শ্রীমান সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পাঠকবাড়ীর সম্মুখে—তাঁহার জমিদারপতি শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী হিসাবে সর্বজনপরিচিত এবং সোমনাথের ভাগিনেয় শ্রীমান সূর্য্যকুমারও কাশীরহাটী জুট মিলের সেবায় অফিসার হিসাবে লেখকের অন্তরঙ্গ। কাজেই সোমনাথ ও সর্বদা সকলের যাতায়াত বিধানে অবস্থিত ছিলেন। সোমনাথ আমার বর্ষীয়ান বিপ্লবীবন্ধু রাসবিহারী রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণনগরবাসী শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায়ের জামিনেয়। কাজেই সে সপ্তমাত্মীয় জ্ঞানে লেখকের আদর আপ্যায়নে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। প্রথম দফায় চা ও জলখাবার, তাহার পর ভূরিভোজ। কাজেই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন হইল।

বেলা ৪টায় গুড়গুড়ে নদীর ধারে সাধনপাড়া স্কুলের মাঠে জনসভা হইল। ঐ বিদ্যালয় বর্তমান খ্যাতনামা লেখকস্বেক গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (এম-এল-এ) অনেক বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। মুড়াগাছাবিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিলেন, তথায় নরেন্দ্রনারায়ণ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন এবং গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে সোমনাথ কয়েক বিঘা জমী ও একটি পাকাবাড়ী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য দানপত্র করিয়া নীরেন্দ্রনারায়ণের হস্তে দানপত্র প্রদান করিলেন। তাহার পর মন্ত্রী অজয়কুমার সুদীর্ঘ প্রায় ২ ঘণ্টা কাল সুচিন্তিত ও সুমধুর ভাষণ দ্বারা দেশের বর্তমান অবস্থা ও তাহাতে জনগণের কর্তব্য কি—তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাষণ এমন হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে—আর ও অধিকক্ষণ চলিলেও তাহা কাহারও বিরাগ উৎপাদন করিত না। যাহা হউক, পল্লীগ্রাম, অন্ধকার রাত্রি, শীত পড়িয়াছে—কাজেই প্রায় সাড়ে ৬টায় তিনি ভাষণ শেষ করিলেন। সভাপতি চণ্ডীপ্রসাদবাবুকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে বলিয়া তিনি পূর্বেই চলিয়া গেলেন—তাঁহার স্থানে মুড়াগাছার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ছোট) কে সভাপতি করা হইল। মন্ত্রী মহাশয়ের পর লেখককে গবেষণা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল ও শেষে সভাপতি গোপেন্দ্রবাবুর ভাষণের সহিত সন্ধ্যা ৭টার পর সভার কার্য্য শেষ হইল। বহু দূরের গ্রামসমূহ হইতে কয়েকশত গ্রামবাসী সে দিন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় সাধনপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি রাখালপাহি গ্রামের অধিবাসী শ্রীহরীশ মুখোপাধ্যায়, সাধনপাড়ার উৎসাহী কর্মী শ্রীহরিগোপাল গাঙ্গুলী (শান্তিসরের অগ্রজ), মুড়াগাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমন্মথ গাঙ্গুলী, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ঐকান্তিকতায় সেদিনের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মন্ত্রী মহাশয়কে অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন এবং সভায় লোকসমাগম দেখিয়া বুঝা গেল, ঐ গ্রামের লোক প্রাণহীন নহেন—যাঁহারা সাদরে ও সাগ্রহে গবেষণা কেন্দ্রের জন্য জমী ও বাড়ী দান করিলেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই।

গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী ঐ গ্রামগুলি প্রাচীন—এক সময়ে সেগুলি যে সমৃদ্ধ ছিল, তাহা বর্তমান অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। মুড়াগাছায় বহু বড় বড় দ্বিতল গৃহ আজিও বিদ্যমান। সাধনপাড়ায় ও পাকা বড় বাড়ীর সংখ্যা কম নহে। আজও সাধনপাড়ার প্রায় দুইশত পরিবার

কাঁদার বাবন তৈরারীর কাজ করিয়া থাকেন। প্রায় ৭ হাজার লোক ঐ বাসন ব্যবসায়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন। কাঁসারী, টামাটীর, এলুমিনিয়মের, কলাই করা অর্থাৎ এনামেলের ও সর্বশেষে গ্রামোফোন রেকর্ডের মূলে আমরা এই কাঁসার বাসনের ব্যবসাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব কি না জানি না—কিন্তু সে বিষয়ে গ্রামবাসীদের এক বিরাট কর্তব্য পড়িয়া আছে। ঐ পরিবারের শ্রীমান রেণুপদ দাস এম-এ পাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে ও গ্রামের অন্যান্য শিক্ষিত তরুণগণকে আমরা এ বিষয়ে কর্তব্য সম্পাদনে আহ্বান জানাই। স্থানীয় ইউনিয়ন কৃষি-কর্মী শ্রীযুত বসুমদার তাঁহার উৎসাহ ও কর্মপ্রবণতার দ্বারা ঐ অঞ্চলের তরুণগণকে কৃষি বিষয়ে অধিকতর অবহিত করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সভাপতি মু-অফিসের ব্যস্ততা তাঁহার ও তাঁহার কন্যার অধিনয় দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করি। কৃষ্ণনগর হইতে সদর এস-ডি-ও এবং সাব্‌ডেপুটি অফিসার মন্ত্রী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকালে সাধনপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন—অল্প কাজ থাকায় তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

রাত্রি ৮টায় স্থানীয় সাহায্যাগারে আমাদের লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথায় দুধ, চাঁদ ও বাঙ্কে এবং মুগমবড়া নাটকের নির্বাচিত অংশ অভিনয়ের দ্বারা আমাদের আনন্দদানের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে প্রভাত-কুসুম পাঠক মহাশয়ের গায়কী সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সভা বসুমদারের অভিনয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অধিক রাত্রি পর্যন্ত অভিনয় দেখিয়া আমরা নৈশ ভোজনের পর যখন বিশ্রাম করিতে গেলাম—তখন ইংরাজি মতে নূতন দিন আরম্ভ হইয়াছে।

পরদিন সোমবার ভোর ৬টায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আমরা ৭টায় রওনা হইলাম। এবার পরকুলে স্কুলের নিকট আসিয়া মোটর নদী পার হইলাম ও কলিকাতার খাদ্যসচিব ডাক্তার প্রফুল্লপতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখের মাঠে মোটরে চড়িয়া সভাস্থলে অর্থাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। পথে শান্তিপুর ষ্টেশনের নিকট বন্ধুবর শ্রীহরিদাস দে এম-এল-এ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ডাক্তার প্রফুল্লপতির পুত্র ডাক্তার উমাপতি গাঙ্গুলী বেঙ্গল এমারেন্স সিন্ডিকেটের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিত হইয়াছেন।

একটা পল্লীগ্রামে—সহর হইতে বহুদূরে—যাইয়া, দেখিয়া আশাতিত হইলাম যে উপযুক্ত উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়া গ্রামগুলিকে অতি সহজে আবার প্রাণবন্ত করা যায়। কৃষি ও ঐ অঞ্চলের প্রধান জীবিকা—গঙ্গার চরে যেমন তরি তরকারী, বিশেষ করিয়া পটোল প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তেমনই তোলা, মুগ, মুসুর প্রভৃতি ফসলাইও ভালই হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে প্রচুর খেজুর ও তালগাছ—কাজেই গুড় উৎপাদন ভাল ভাবে হইতে পারে। আখও প্রচুর উৎপাদন হইতে পারে। মুড়াগাছায় যাই স্কুল সর্বাধুনিকভাবে বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে—সেখানে জমীর অভাব নাই—আবাসিক বিদ্যালয় ও আবাসিক কলেজ চলিতে পারে—কৃষি বিদ্যালয় ঐ অঞ্চলে আছে কি না জানি না, তাহা ও করা দরকার। গ্রাম চর্চা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে আবাসিক শিক্ষা গ্রামের অবস্থার উন্নতি বিধান করা যাইবে।

স্থানটি বর্তমানে নবদ্বীপ নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত—ঐ কেন্দ্রের সকল উৎসাহী কর্মীকে আমরা গবেষণা কেন্দ্রের কার্যে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাই। গ্রামবাসী তরুণগণের যে দিন যে উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, তাহা স্থায়ী হইলে সত্বর গ্রাম উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। সাধনপাড়ার আর সর্বপ্রধান সমস্যা—উড়ুক্কে নদীর পুল—তাহা করা কঠিন হইলেও অসম্ভব হইবে না। এইভাবে সভা সমিতি করিয়া, নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া, তরুণগণকে বার বার গ্রামে একত্র করিয়া ব্যবস্থা করিয়া গ্রামের উন্নতিকর কার্যাবলীতে অগ্রসর হইতে হইবে। মন্ত্রী অতুলবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে তিনি যথাসাধ্য গ্রামবাসীদিগকে সরকারী সাহায্য প্রদান করিতে চেষ্টা করিবেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করিয়া, তাহাদের মধ্যে দীর্ঘ দান-সঞ্চিত যে শিল্পোৎসাহের ভাব আছে তাহা মুক্ত করিয়া দেওয়াই আজিকার প্রধান কার্য। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীযুক্তমাতাগণ, সুপাত্রকুমার, সোমনাথ প্রভৃতির মত কর্মীরা উৎপন্ন হইলে সাধনপাড়া গ্রাম-চর্চা গবেষণাকেন্দ্র সাফল্যমণ্ডিত করা আদৌ কঠকর হইবে না।

রিক্তা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সপ্তদশ বসন্তের যৌবন তোমার
বুনেছিল কত স্বপ্নজাল,—
কঠিন কুলিশে ঝরি, ভাঙিল সে ঘুম,
হেরিলে কি মৃত্যু ভয়াল ?
স্নেহ, প্রেম, হাসি কান্না, কে করিল চুরি ?
কে ছিল জীবন তব বেদনাতে ভরি ?
জীবনের দীর্ঘ পথে,—অঙ্ক শুধু পাথের তোমার ?

প্রীতির পরশ, সখি ! আজি হ'তে পাবি নাক আর ?
কিংশুক পলাশে হেরি, একি অগ্নি জ্বালা,
কে জানিত এত ব্যথাভরা কুসুমের মালা ?
জাগুন আজ, আগুন হ'য়ে, তোমার বুকে যারে,
সর্বহারা হ'য়ে তুমি কাঁদিতেছ দুখে, লাজে ;
প্রাণপুষ্প শুষ্ক তোর, চারিদিকে জ্বলে মরুভূর জ্বালা,
প্রেম নাই, প্রীতি নাই, বহে যায় দীর্ঘশ্বাস বেদনাতে ঢালা !

দুই বন্ধু

অনুবাদ ঃ শ্রীকানু রায়

তারা দুই বন্ধু। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল স্কুলে থাকতেই।

জীনতের বাবা ছিলেন নামজাদা ব্যক্তি। স্বচ্ছল অবস্থা—ঘোড়ার ব্যবসা আরো অন্যান্য কারবার থেকে প্রচুর আয় হত তাঁর।

কলিনের বাবা থাকতেন শহরতলীতে। সামান্য কিছু ক্ষেতখামার তাঁর ছিল, নিজেই চাষবাস করতেন। কিন্তু তাহলেও বেশ কষ্টেই দিন কাটত। কারণ হরেক রকম খাজনা কর ইত্যাদি দিয়ে দিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তেন। আর প্রত্যেকবার বছরের শেষে যখন জমা-খরচের খাতা খুলে বসতেন তখন হিসাবের প্রাণান্তকর অঙ্কগুলি, চোখের সামনে ভয়াবহ অন্ধ ভবিষ্যৎ।

জীনৎ আর কলিন দুজনেই দেখতে খুব সুন্দর। সেই স্কুলে শহরটিতে এমনটি আর কখনো দেখা যায়নি। তাদের দুজনের বন্ধুত্ব ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ট হতে অন্তরংগতার রূপ পেল। তাদের মধ্যে গোপনীয় বলতে কিছু ছিলনা—একে অন্যেকে নিজের মনের কথা অকপটে খুলে বলতে পারত। লোকে বলত তারা হরিহরআত্মা, স্কুলের ছেলেরা ডাকত মাণিকজোড় বলে।

এখন, এমনি যখন অবস্থা—সামান্য একটা কোটের জন্য সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। স্কুলের পড়া প্রায় শেষ হব হব করছে এরকম দিনে জীনতের বাড়া থেকে তার জন্য দামী ভেল-ভেটের একটা কোট এল, আর সেই সংগে একটা চিঠি। কলিন তার বন্ধুর কোটটার খুবই প্রশংসা করল—সরল মনেই সে তা করেছে। কেননা তার মনে হিংসা দ্বেষের এতটুকু ছায়াও ছিল না। কিন্তু এর ফলাফল জীনতের উপরে অন্য রকম প্রভাব বিস্তার করল। দামী কোট পেয়ে সে এমন একটা অহংকারের ভাব দেখাতে থাকে—যে কলিন মনে বড় ব্যথা পায়। বন্ধুর কাছ থেকে এমন ব্যবহার সে প্রত্যাশা করেনি। জীনত ওসব ঘোড়াই কেয়ার করে। সে আজকাল আর লেখাপড়া করবার মত সময় পায়না। নিজেকে নিয়ে বড়ই ব্যস্ত থাকে, আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত যে পরিচর্যা করে। নিজেকে বেশী করে জাহির করতে লাগল সে। সে যে ধনীর সন্তান এটা সবাই বুঝুক, জানুক, টের পাক্। তাকে সমীহ করুক। কিছুদিন পরে জীনতের বাবা আর একটি চিঠি পাঠালেন—তাতে লেখা ছিল সে যেন তাড়াতাড়ি প্যারিসে চলে আসে। যাত্রার আয়োজন ঠিকঠাক। সেজেগুজে গাড়ীতে গিয়ে উঠল সে—তার মুখে প্রচণ্ড ভারিক্কী ভাব, ঠোঁটের কোণে আত্ম অহংকার। কেমন যেন নিরাসক্ত, নিষ্করুণ-ভাবে শীতল হাতটা বন্ধুর উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দেয়।

বেচারা কলিন! জীনতকে সে প্রকৃত বন্ধুর মতই ভালবেসেছিল। অর্থের অহমিকা যে এমন ভয়াবহ আঘাতের প্রবৃত্তি দেয় সে ধারণাও করতে পারেনি। নিজেকে তার আরো গরীব আরো রিক্ত বলে মনে হল।

সে আর থাকতে পারল না। কেঁদে ফেলল।

জীনতের এত সব দেখবার সময় নেই। ভুরু দুটি কুঁচকে গাড়োয়ানের দিকে মুখ বাড়িয়ে সে বলল, চলো।

গল্পের আগে থাকে ভূমিকা। সেটা প্রধান না হলেও সব সময় একেবারে অনাবশ্যকও নয়। জীনতের বাবা সম্বন্ধে জীনতের কথা তাই জানা দরকার। আগেই বলেছি ব্যবসায় খুব লাভ হতো, তবু কী করে যেন রাতা-রাতি আরো বড়লোক হয়ে গেলেন। এটা কী করে সম্ভব হল? ব্যাপারটা, বলতে গেলে ভাগ্য ছাড়া কিছুই

নয়। মঁসিয়ে এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই সুশ্রী। একটা মামলার তদ্বির করতে তাঁরা প্যারিসে এসেছিলেন। নিয়তির কী ইচ্ছা কে জানে, এখানে ক্রমেই তাঁদের সংগে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়ে গেল—লোকটা বৃদ্ধ-হাসপাতালের একজন বড় কণ্ট্রাক্টার। পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় হতে না হতেই মঁসিয়ে জীনত ভদ্রলোকটির ব্যবসাতে অংশীদার হয়ে গেলেন। তৎপর হয়ে উঠলেন আরো নানা ব্যাপারে। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন মানুষকে আর বেশী ভাবতে হয়না। শুধু সুবিধে বুঝে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই যথেষ্ট টাকা আসতে থাকে। মঁসিয়ের প্রতিপত্তি ক্রমে এত বাড়তে লাগল আর তাঁর ধনসমৃদ্ধও এমন স্তরে এসে পৌঁছোল যা অনেকের মনেই ঈর্ষা জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। ছ'মাসের মধ্যেই তিনি জমিদারী কিনলেন এবং ছেলেকে প্যারিসের অভিজাত সমাজে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন।

জীনতের পিতামাতা উভয়েই যথেষ্ট করিৎকর্মা এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। প্রথমেই তাঁরা ছেলের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এই শিক্ষকটির আদব-কায়দা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, আর সেই সংগে অপরিসীম দুর্বৃত্তা। কাজেই ছাত্রকে শেখাবার মত তার কিছু ছিল না।

মঁসিয়ে চেয়েছিলেন ছেলে ল্যাটিন শিখবে। কিন্তু মাদামের তা ইচ্ছে নয়। এই সময় জনৈক ভদ্রলোক কয়েকটি বই লিখে প্যারিসে খুব নাম করেছিলেন। জীনত ঠিক করলেন এই লেখকের অভিমত জানা দরকার। কাজেই কোন এক ডিনারে তাঁকে নেমন্তন্ন করা হ'লো।

মঁসিয়ে প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনার তো ল্যাটিন ভাষা ভালো করে জানা আছে। তা ছাড়া গ্রীকলতার আদব কায়দা—

আমি? সেই লেখক বললেন, আজ্ঞে না ল্যাটিন ভাষার একটা শব্দও আমার জানা নেই। অবশ্য এটা আমার পক্ষে ভালই হয়েছে। কারণ একটা লোক যখন মাতৃভাষা ছাড়াও বিদেশী ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে তখন তার পক্ষে মাতৃভাষাও ভালো করে শেখা সম্ভব হয় না।

ডিনার টেবিলের চারদিক দেখে নিয়ে তিনি আবার সুরু করেন, সমবেত ভদ্রমহিলাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাঁরা কী চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী পারদর্শিনী। তার একমাত্র কারণ হ'ল তাঁরা ল্যাটিন জানেন না।

মঁসিয়ে জীনতের স্ত্রী খুব খুশী হলেন।

এবার হ'ল তো? আমি আগেই বলেছিলাম—ল্যাটিন শিখে কিছু হবে না। আমি চাই আমার ছেলে বেশ রসিক হয়ে উঠুক এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। ল্যাটিন শিখে চৌদ্দপুরুষ কী উদ্ধার করবে শুনি? আর তাছাড়া কোর্টে যখন মামলা হয় তখন কি ল্যাটিন ভাষায় শুনানী চলে? লোকে কি ল্যাটিন ভাষায় প্রেম করে?

মঁসিয়ে এতগুলি যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারলেন না—খড়কুটোর মত ভেসে গেলেন তিনি। অবশেষে ভেবে-চিন্তে তাঁকে অভিমত জানাতে হ'ল যে ল্যাটিন ভাষার সিসেরো হোরেস বা ভার্জিল পড়ে ছেলের ভবিষ্যৎ মাটি করতে তিনি সত্যই দেবেন না।

কিন্তু তাহলে শিখবে কী? কিছু পড়াশুনা করার প্রয়োজন আছে—আচ্ছা, ভূগোল শেখালে কেমন হয়?

ভূগোল! এবারে অবাক হওয়ার পালা শিক্ষকটির—তিনি ঠোঁট নাড়েন, তাতে কী লাভ? ভূগোল শিখে কী আর হবে! মঁসিয়ে, আপনি যখন কোথাও বেড়াতে যান তখন তো আপনার অনুচরেরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, পথ হারাবার কোন ভয়ই থাকেনা। তাছাড়া কেউ বেড়াতে গেলে সেল্ফ্যাস্কও নিয়ে যায়না, এমন কি অক্ষাংশ দ্রাঘিমা ইত্যাদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলেও আপনি অনায়াসে প্যারিস থেকে ফরাসীদেশের যে কোন অঞ্চলে ঘুরে আসতে পারেন।

ঠিক কথা, মঁসিয়ে সায় দেন—কিন্তু আমি শুনেছি লোকেরা প্রায়ই একটা গভীর তত্ত্ববিদ্যার কথা বলে থাকে। নামটা যতদূর মনে পড়ে বোধহয় জ্যোতির্বিদ্যা। এটা নাকি বিজ্ঞান শাস্ত্রের খুব দামী শাখা।

হায় ভগবান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শিক্ষকটি বললেন, গ্রহনক্ষত্রের কাণ্ডকারখানা দেখে পৃথিবীতে বেঁচে আছি নাকি আমরা? মঁসিয়ে আপনি কি অংক কষে, মাথা ঘামিয়ে কবে

কোথায় কখন গ্রহণ লাগবে তা' বার করতে যাবেন? কেন একটা অ্যালমানাক খুললেই তো সব মুস্কিল আসান। তাতে সব লেখা আছে—মিনিট সেকেণ্ডের সঠিক হিসাব পর্যন্ত। তাছাড়া এতে আপনি পাবেন ধূমকেতুর গতিবেগ কত, চন্দ্রের বয়স এবং সৌরজগতের অনেক খবরাখবর—এমনকি ইউরোপের সমস্ত রাণীদের খুঁটিনাটি যাবতীয় তথ্যও।

মাদাম শিক্ষকের সংগে একমত। কিন্তু মঁসিয়ে নিজে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। জঁানতের খুবই মজা লাগছিল। চুপ করে খাবার খেতে খেতে সে মা-বাবার কথা শুনছিল।

মঁসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ওকে কি শেখানো উচিত?

নিমন্ত্রিত লেখক বললেন, যদি আপনার ছেলেকে উপযুক্তরূপে গড়ে তুলতে চান তবে সব বিষয়েই কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হবে। আর আমি মনে করি এবা পারে মাদামই সবচেয়ে কৃতকার্যা হবেন।

মঁসিয়ের স্ত্রী মুচকি হেসে উত্তর দেন, কী যে বলেন। আপনার চেয়ে উপযুক্ত আর সববিষয়ে পারদর্শী কে আছে। আমার মনে হয় ছেলেকে অল্পবিস্তর ইতিহাস পড়ালে মন্দ হবেনা। আপনার কি মত?

: কিন্তু মাদাম তাতে কোনই লাভ হবেনা! সত্যি কথা বলতে কি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মানেই রূপকথা উপকথা আর কিছু গাঁজাখুরি গল্প। বার্নার্ড ফন্টেনের মত বিখ্যাত ঐতিহাসিকও তা' স্বীকার করেছেন। আধুনিককালে এসব নিতান্তই অর্থহীন। কোন্ শতাব্দীতে কে রাজপ্রাসাদ গড়েছিল, কিংবা তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে কে খুব ভাল বক্তা ছিল এ সব জেনে আপনার ছেলের কী উপকারে আসবে? তাতে কার কী এসে যায়?

আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, শিক্ষকটি উল্লসিত হয়ে ওঠেন, শিশুদের কচি কচি মনগুলি এই সমস্ত অর্থহীন জ্ঞানের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে অকালেই শুকিয়ে যায়। আমার মনে হয় বিজ্ঞানের যতগুলি বিভাগ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিরর্থক, নীরস আর বিরক্তিকর হ'ল জ্যামিতি। জ্যামিতি প্রতিভার শেষ রসবিন্দু পর্যন্ত শুষে নেয়। বাস্তব জগতে যার কোন অস্তিত্বই নেই যথা রেখা, তল, বিন্দু ইত্যাদি নিয়ে এই হাস্যকর বিজ্ঞানের কারবার। বস্তুস্পর্শকারী একটি সরলরেখার মধ্যবর্তী বিন্দু দিয়ে হাজার হাজার বক্ররেখার গমনপথ কল্পনা করা চলে, কিন্তু বাস্তব জগতে সামান্য একগাছি খড় পর্যন্ত তার মধ্যে দিয়ে ঢোকাতে পারবেন না।

শিক্ষকটি যা বলছিলেন তা মঁসিয়ে বাতাঁর স্ত্রী বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেন নি। তবু তাঁদের মনে হল কথাগুলি খুবই সারগর্ভ। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

শিক্ষকটি আবার শুরু করেন—

: মঁসিয়ে জঁানতের মত এমন একজন মাননীয় ভদ্রলোকের এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয়। আপনার ছেলেকে কষ্ট নিয়ে জ্যামিতি শিখিয়ে কী লাভ? যদি কোনদিন সে তার বিষয় সম্পত্তির ভুল নক্সার প্রয়োজন বোধ করে তবে অনায়াসেই কিছু টাকা দিয়ে একজন কর্মচারী রাখবে। অন্যান্য ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। টাকা থাকলে আবার অভাব কীসের? ধনীর ছেলে, ভাগ্য যার সুপ্রসন্ন সে কোনদিনই গায়ক, শিল্পী, স্থপতি বা ভাস্কর কিছুই চায়না। অত্যন্ত মহানুভবতার সহিত ঐ সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ দেয় মাত্র। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই সমস্ত ব্যাপারে চর্চা করার চেয়ে পৃষ্ঠপোষক হওয়া অনেক ভালো—অনেক বেশী সম্মানজনক। আপনার ছেলের যদি রুচি থাকে তবে তা-ই যথেষ্ট, গায়ক শিল্পীরা তার ইচ্ছানুযায়ী হুকুম পালন করবে। লোকে তাই বলে টাকা থাকা মানেই প্রতিভাবানের লক্ষণ, কেননা অর্থও যা প্রতিভাও তাই।

উৎসাহের আধিক্যে তিনি আরো বলেন, মাদাম আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হওয়াই মানুষের চূড়ান্ত সফলতা। কাজেই ভেবেচিন্তে এমন কোন বিজ্ঞান আপনার ছেলেকে শেখাতে হবে যাতে তার ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত হয়। সত্যিকারের ভদ্রলোককে কি কখনো জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন? কিংবা কোন শিক্ষিত লোক সূর্যের আশে-পাশে ক'টা গ্রহনক্ষত্র আছে এই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে? ভোজের আসরে বসে ইতিহাসের বৃত্তান্তের কথা কেউ কি জানতে চায়?

: না না কিছুতেই নয়।

মাদাম তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। শিক্ষকটির কথা-বার্তা তাঁর চিন্তাধারার সংগে একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কাজেই তিনি জানালেন, না এই সমস্ত বাজে জিনিষ পড়িয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়না। কিন্তু আসল কথা হল সে শিখবে কী? সমাজে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা পেতে হলে কিছুত জানা চাই?

এইভাবে একে একে সব কিছুই অমনোনীত হ'ল। অংকশাস্ত্র জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যাও বাদ গেল। অবশেষে বিস্তর গবেষণার পর স্থির হয় যে জাঁনতকে নাচ শেখানো হবে। কারণ প্যারিসের সৌখিন সমাজে মিশতে হলে নাচ জানা একান্তই দরকার।

হার শিক্ষা সুরু হয়ে গেল। মাদাম তাঁর নিজের খুশীমত ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দক্ষ করে তুললেন। নাচ এবং গান উভয়দিকে তার পারদর্শিতা। দেখতে সে সুন্দর ছিল, তার উপর এই গুণ জাঁনতকে করে তুলল আকর্ষণীয়। ফলে প্যারিসের সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের কাছে তার কদর বেড়ে গেল। মাদাম মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন একজন প্রতিভাবানের মা হওয়া কত গর্বের। তাঁর মনে প্রবল একটা আত্মবিশ্বাস দেখা দেয়। প্যারিসের নামজাদা অভিজাত লোকদের তিনি ডিনার দিতে লাগলেন। কিন্তু বেচারা জাঁনত একটু মুষড়িয়ে পড়ল। কোন কিছু না জেনে কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতায় নিজেকে সে তৈরী করেছিল, তাই কাজের সময় দেখা গেল সে সব কাজেই অক্ষম। মঁসিয়ে পুত্রের 'বাগ্মিতাপূর্ণ' কথাবার্তা শুনে মনে মনে বড় আপশোষ করলেন, হায়, যদি তাকে ল্যাটিন শেখাতেন! সে তাহলে অনায়াসেই বিচারালয়ে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। মাদামের আরো উচ্চাশা। তিনি ভাবলেন, ছেলেকে একটা সৈন্যদলের অধিনায়ক করে দিলেই ভালো হত।

সে যাই হোক, যুবক জাঁনত শীঘ্রই প্রেমে পড়ে গেল। একটা গোটা সৈন্যদল পুষতে যা লাগে প্রেমিকার খরচ তার চেয়ে কম নয়। অকাতরে সে টাকা উড়িয়ে চলে। মঁসিয়ে এবং মাদাম তাতে বাধা দেননা। এমন কি তলে তলে গণপ্রজাতন্ত্রের চরেও বাইরের ঠাট, জাঁকজমক বজায় রাখলেন। ছেলেকে টাকার জন্য কখনই নিরাশ করলেন না।

জাঁনতদের বাড়ীর কাছাকাছি কোন বাড়ীতে একটি তরুণী বিধবা ছিল। তার অবস্থা সুবিধের নয়। সে ভাবল, জাঁনতের সংগে যদি তার বিয়ে হয় তবে ভাবনার কোন কারণ থাকবেনা। পরিবারের অর্থকষ্টও দূর হবে। কাজেই জাঁনতকে সে ভালো করে অভ্যর্থনা জানালো এবং প্রেমে পড়ার সুযোগ দিল। নানা কলাকৌশলে তরুণীটি নিজেকে একান্ত একনিষ্ঠ প্রেমিকা বলে জাঁনতের কাছে তুলে ধরল—ফলে, সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, জাঁনত তার অনুগত হয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরে অনেক বৃদ্ধ প্রতিবেশী তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। জাঁনতের মা-বাবা এতে খুব খুশী হয়েই সম্মতি দিলেন, কারণ এতে দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়ে উঠবে। বিয়ের সব বন্দোবস্ত একরকম ঠিকঠাক। দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা অভিনন্দন জানালেন। বিয়ের চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল। পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ইত্যাদিও কেনার বন্দোবস্ত হতে থাকে। একদিন সকালে জাঁনত আর সেই তরুণীটি একসাথে বসে ভবিষ্যতের সুখীস্বচ্ছল জীবনের কথা কল্পনা করছে, আলোচনা করছে এমন সময় একটা লোক জাঁনতের জন্য পরম দুঃসংবাদ বহন করে আনল।

লোকটা বলল, আপনি খুবই দুঃখ পাবেন তবু আপনাকে বলতে হচ্ছে। পাওনাদারেরা আপনাদের বাড়ী দখল করেছে। সেরিফের কর্মচারীরা সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলেছে। এমন কি তারা গ্রেফ-তারের কথাও বলছে।

আর্তনাদের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল জাঁনতের মুখ দিয়ে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। এর মানে কি? আমাকে আসল ব্যাপারটা জানতে হবে।

প্রেমিকাটি বললে: হ্যাঁ তাই ভালো। তোমার এখন সেখানে যাওয়া খুবই দরকার। যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে এস ব্যাপারটা কি।

বাড়ীর দিকে ছুটল জাঁনত। সেখানে গিয়ে দ্যাখে সব ওলটপালট। মঁসিয়েকে আগেই কয়েদখানার আটক

করা হয়েছে। চাকরবাকরেরা হাতের সামনে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে পালিয়েছে। তার মা একা একপাশে চুপ করে বসে আছেন। তাঁকে বড়ই নিরাশ আর অসুখী লাগে। অতীত ঐশ্বর্যের অলস কল্পনাবিলাস ছাড়া যাঁর আর কিছু বাকি রইলনা, জঁানত তার মা-কে অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, বলল : ভেঙে পড়লে চলবেনা মা। সেই মেয়েটি আমাকে আন্তরিক ভালবাসে। ঐশ্বর্য তার না থাক, কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে অনেক বড়। আমি এখনই যাচ্ছি তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে। তাকে দেখে তুমি মনে শান্তি পাবে।

সুতরাং জঁানত আবার তার প্রেমিকার কাছে ফিরে এল। সেখানে গিয়ে দেখে মেয়েটি আরেকজন যুবক অফিসারের সংগে বসে খুব হেসে হেসে আলাপ করছে। জঁানতকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

: আশ্চর্য! জঁানত তুমি? আমার কাছে হঠাৎ কী দরকার পড়ল? আর তাছাড়া তোমার মাকে এমন অবস্থায় ফেলে তুমি কী করে এখানে আসতে পারলে! যাও, এখনই যাও—তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন। তোমার উচিত মাকে গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া। তোমার মা-কে বলো আমি সব সময়েই তাঁর মংগল কামনা করি।

মেয়েটির কথা শেষ হলে সেই অফিসারটি গোঁফে তা দিতে দিতে বললেন, ওহে ছোকরা—শোন। তোমার চেহারাটা দেখছি দিব্যি ক্যাতিকঠাকুরের মত। আমার সৈন্যদলে ঢুকবে? যদি রাজী থাকো তবে—

জঁানত কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাইরে বেরিয়ে আসে। এবার সে যায় তার শিক্ষকের কাছে। সরল বিশ্বাসে তাঁকে সব কথা খুলে বলে। শিক্ষকটি প্রস্তাব করলেন জঁানত যেন একটা মাষ্টারী নেয়।

: মাস্টারি, হায় ভগবান!

আমি যে কিছুই জানিনা, তাতা গলায় প্রায় কাঁদতে কাঁদতে জঁানত বলে, আপনি আমাকে কিছুই শেখান নি। আমার দুঃখকষ্টের জন্য আপনি দায়ী।

সেখানে একজন রসিক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন, তাহলে বাপু তুমি উপন্যাস লিখতে শুরু কর। প্যারিসের মত শহরে উপন্যাস লিখতে জানলে কোন ভাবনাই নেই।

তারপর জঁানত গেল তার মায়ের পরিচিত এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে। তিনি একটা আশ্রমের পরিচালক।

: কি জঁানত? তোমার মা কেমন আছেন? গাড়ীটা কোথায় রেখে এলে?

সেই হতভাগা যুবক একে একে তাদের পরিবারের এই আকস্মিক পতনের সব কাহিনীটি খুলে বললো।

হুঁ, তিনি ঘাড় নাড়লেন, সবই তাঁর ইচ্ছে। এই নিয়তির খেলা। তবে ঈশ্বর যা করেন সবই মংগলের জন্য। তোমার মাকে যে তিনি সর্বহারা করেছেন এর মধ্যেও আমি ভগবানের অসীম করুণা দেখতে পাচ্ছি। হাঁ, এখন আর ভাবনার কিছু নেই—ত্যাগেই শান্তি। মৃত্যুর পর তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করবেন।

জঁানত কাতর স্বরে বলল : কিন্তু পৃথিবীতে আপাতত বাঁচবার কোন উপায়ই কি নেই?

ধার্মিক বৃদ্ধটি তাঁর কথায় কান দিলেন না। পরম করুণায় ভগবানের কথা স্মরণ করতে করতে তিনি জানান, আচ্ছা আজ তাহলে আসি। আশ্রমে কয়েকজন মহিলা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

জঁানত আর সহ্য করতে পারেনা। সে যেন তখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। তার অন্যান্য সব বন্ধুরাও ঠিক একই ব্যবহার করল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল যা সে এর আগে কখনো পায়নি। এই সময় রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী যাচ্ছিল তাতে একজন আরোহী আর তার স্ত্রী। গাড়ীটির পেছনে মালপত্র বোঝাই আরো কয়েকটা গাড়ী ধীর বেগে চলছিল। আরোহীটি মুখ বাড়িয়েই ছিল। জঁানতকে দেখে সে চিনতে পারল। জঁানতের বিবর্ণ পোষাক, ক্লান্ত শরীর। দুঃখে বেদনায় আরোহিটির অন্তঃকরণ ভরে ওঠে।

: হে ভগবান! জঁানত তুমি?

তার নিজের নাম উচ্চারিত হতে দেখে জঁানত মুখ তুলে তাকাল। ইতিমধ্যে গাড়ীটা থেমে গেছে। আরোহী তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এল। প্রবল আবেগের সংগে জঁানতকে জড়িয়ে ধরল। জঁানত বন্ধুকে চিনতে পেরে লজ্জায় মুখ নীচু করে রাখে।

কলিন। তার ইস্কুল জীবনের সেই পুরনো বন্ধু!

তুমি আমাকে ভুলে গেছ, কলিন বললে, আমি কিন্তু ভুলিনি। যত বড়লোকই তুমি হও, যত দূরেই সরে থাক আমি তোমাকে চিরদিন ভালবেসে এসেছি।

জানতের বলবার কিছু নেই। সত্যিই কী সে বলতে পারে! শুধু একই ইতিহাসের অনিচ্ছুক পুনরাবৃত্তি করল:

: আমি যে হোটেলে উঠব সেখানে চল। বাকী সব ঘটনা শুনব।

কলিন তার স্ত্রীকে দেখিয়ে বলে, এ হ'ল আমার স্ত্রী। জানত আমার বন্ধু। চল আমরা এক সংগে খাবো।

তারা তিনজন হেঁটেই হোটেলে গেল। মালপত্র নিয়ে গাড়ীগুলি পেছন পেছন আসছিল। জানত জিজ্ঞেস করল, এত সব আসবাবপত্র কার? তোমার নাকি?

কলিন মৃদু হাসে:

: হ্যাঁ এগুলি আমারেই।

তারপর কলিন নিজের কাহিনী বলে যায়, আমরা এখন গ্রাম থেকে আসছি। আমি বর্তমানে বড় একটা কারখানার মালিক, বিয়ে করেছি ধনী ব্যবসায়ীর মেয়েকে। ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় আছেন। তাঁর আশীর্বাদে দিন-গুলি সুখেই কাটছে।

জানত আমি তোমাকে সাহায্য করবো। অর্থের অহংকার একটা অর্থহীন—এসব তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করে তুমি এস। আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবেই পেতে চাই। তুমি আমাদের সংগে গ্রামে চল। সেখানে তোমাকে ব্যবসা শেখাবো। ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়—তুমি একটু চেষ্টা করলেই বুঝে নিতে পারবে। আর আমরা কখনোই আলাদা হবোনা।

কলিনের এই সদয় ব্যবহারে জানত যেন দুঃখ আর আনন্দ, বেদনা আর তৃপ্তিতে দ্বিধান্বিত হতে থাকে। সে মনে মনে বলে, আমার সম্পর্কালের বন্ধুরা মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে। শুধু কলিন—যাকে আমি অবজ্ঞা দেখিয়েছিলাম সে-ই শেষকালে এসে আমাকে সাহায্য করতে। আমি এ কী শিখলাম!

কলিন বললে, তোমার মায়ের প্রতি এখন বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। আর তোমার বাবা যাঁদিয়ে জানত যাতে অবিলম্বে মুক্তি পান সেদিকেও চেষ্টা করছি। ব্যবসাতে অনেক কল-কৌশল জানা আছে আমার। পাওনাদাররা তোমার বাবাকে মুক্তি দিতে নিশ্চয়ই রাজী হবে।

পরের ইতিহাস সহজ। স্বচ্ছন্দ।

কলিনের চেষ্টায় যাঁদিয়ে জানত-পরিবার প্যারিস ছেড়ে গ্রামে চলে আসে এবং আগের ব্যবসাতে মন দেয়। অর্থের অহমিকা, একটা মিথ্যে প্রহেলিকা থেকে তারা মুক্ত হয়েছে। সহজ প্রীতি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই যে মানুষ অনেক বেশী সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, পেতে পারে অনেক বেশী শান্তি এতথা ক্রমে তাঁরা উপলব্ধি করলেন।

হ্যাঁ আরো একটা খবর বাকি আছে। কলিনের বোনটি দেখতে যেমন লাবণ্যময়ী স্বভাবেও তাই। সে তার ভাইয়ের মতই সহনশীল শান্ত-স্বভাবা। তারপর? সংস্কৃত শ্লোক বুঝাই লেখা হয়নি—ভোজের শেষে বসুও আছে। যাঁদিয়ে আর মাদাম পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

[অপরবিখ্যাত মরীচী কথাশী মেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পক ওলটেয়ার। এটি তাঁর 'Jeannot and colin' নামক অপরূপ গল্পটির বাংলা অনুবাদ। মূল গল্পের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকলেও স্থানে স্থানে কিছু পরিমান স্বাধীনতা নিয়েছি—অনুবাদক]

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুন্দরবনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এই অঞ্চলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে। বর্তমানে সুন্দরবনের বেশীর ভাগ এবং অপেক্ষাকৃত অরণ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল পড়েছে পাকিস্তানের দিকে, ভারতসীমায় পড়েছে তার তুলনায় অনেক ছিরেস অঞ্চল।

বর্ধমানের খালিমপুরলিপি, দেবপালের নালন্দালিপি এবং লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপিতে "ব্যাঘ্রতটী" মণ্ডল নামে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল কথাটির অর্থ করলে মনে হয় যে সমুদ্রতট ব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত। খুব সম্ভবতঃ চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশালের নীচের অংশ বোঝান হয়েছে। এর থেকে মনে হয় আশপাশে বসতি থাকলেও নবম-দ্বাদশ শতকে এই অঞ্চলের কিছু অংশ গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে অনেকাংশে বনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়—এ সম্বন্ধে এখনও অনেক প্রমাণ আবিষ্কৃত হচ্ছে। ডায়মণ্ডহারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্বদিকে বকুলতলা গ্রামে লক্ষ্মণসেনের পট্টোলী দ্বাদশ শতকে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়, সনের মাইল দক্ষিণপূর্বে মলয়ে পাওয়া গেছে জয়নাগের তাম্রলিপি, এর প্রচার কাল সপ্তম শতক, রাজসখালি দ্বীপে পাওয়া গেছে ভোজবর্মণের পট্টোলী এবং প্রচুর মাটির ঠিলসোহর। এগুলো অনুমানিক দ্বাদশ-একাদশ শতকের বলে ধরা হয়।

সুন্দরবন জনশূন্য থাকলেও—তার অনেক অঞ্চল যে সমৃদ্ধশালী ছিল একথা স্বীকার করে নেওয়া যায়। গোসাবা আশ্রম থেকে প্রায় পনের মাইল দক্ষিণে ঘন অরণ্যের মধ্যেও আজ ও দেখা যায় ভগ্নপ্রায় মন্দির, নীচে কয়েকটা ঘরের অস্তিত্ব, সেখানে আজও লোকে পূজো দেয় বনে যাবার সময়; বিবিবিবি বাড়ী বলে পরিচিত এই ধ্বংস স্তূপ, এক-কালে সমৃদ্ধিশালী কোন সামন্ত রাজের বাসস্থান ছিল বলে মনে হয়।

মুসলমান সুলতানরা এই অঞ্চলে কিছু কিছু আবাদ করে বসতি-পত্তন করেন। আকবরের সময় মুসলমানরা এখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন তার পরিচয় ইতিহাসে পাই। বারো ভূঁইয়ার মধ্যে ঈশাখাঁর আধিপত্য এই অঞ্চলে ছিল, পঞ্চদশ শতকে মুবারক—সৈয়দ হোসেন শাহ—নসরৎ শাহ প্রভৃতি সুলতানেরাও এই অরণ্যের কিছু কিছু আবাদ করিয়েছিলেন। বর্তমানেও এই অঞ্চলের অনেক গ্রাম-নগরের নাম খুঁজলে তাদের নামের পিছে-ফোঁটা দেখা যায়, এর জন্য ইতিহাস যার করা ঐতিহাসিকের ব্যাপার; কিন্তু 'বসিরহাট'—হোসেনাবাদ নামগুলোও অনেক প্রশ্নের অবকাশ রাখে।

তারপর যেমি প্রতাপাদিত্যের সুন্দরবন অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে); বর্তমানে ওই এলাকা পাকিস্তানের সীমায় পড়েছে।

কিন্তু চব্বিশ পরগণার বন অঞ্চলের নিম্নভূমি কোনও অজ্ঞাত কারণে জনবসতিহীন—পরিত্যক্ত হয়ে ওঠে। হয়তো—প্রবল বন্যা—মারণ কিছু ঘটেছিল; তারপর থেকে মোনা মাটিতে আর ফসল ফলেনি। এছাড়া অন্য একটা কারণ দেখা যায়—সেটা হচ্ছে মগ এবং পর্তুগীজ জল-দস্যুদের উপদ্রব হত্যা এবং লুণ্ঠন লীলা। গ্রামকে গ্রাম তারা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল, লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে ধন-প্রাণ মানুষ পর্যন্ত। এর কোন প্রতিকার হয়নি, প্রতিরোধ করতে পারেনি জন-সাধারণ; প্রাণ ভয়ে তারা ওই ভূমি পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসে। কালক্রমে যে বন কেটে মানুষ ওই গ্রাম গড়ে তুলেছিল, সেই বনই আবার গ্রাস করে নিল গ্রামকে। ওর ইতিহাস পরিণত হল অন্ধকার রহস্যে।

আজ বাসভূমি নাই, কিন্তু আছে সেই জনপদগুলের বংশধর। আজও তারা বিনাবাধায় অপ্রতিহত গতিতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছে।

সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ-জলের বুক থেকে শেষ আভাটুকু মুছে যায়নি এখনও।

এমন সময় সন্ধ্যা কালো করে তুলেছে ওরা। পাশেই নৌকা বাঁধাছিল কয়েকটা জেলের, মুসংবাদটা তাদের মুখেই শোনার। দু'দিন আগে বিহারীখালের কাছে ডাকাতির পর আরও নীচে সমুদ্রের মুখে একটা চরে তারা জেলেদের একটা দলকে আক্রমণ করেছিল। কোথায় ওই পথে যাত্রা করা লঞ্চের উপরও হামলা হয়েছে। এককথায় আমাদের সামনের পথ একেবারে বন এবং উপদ্রুত অঞ্চল। কাছাকাছি খান তিনেক নৌকা নিয়ে গোলপাতা কাটাই হচ্ছিল, তারাও প্রাণ ভয়ে ঘরে গেছে সেখান থেকে।

এখন আমাদের অদৃষ্টে কি অপেক্ষা করছে কে জানে। নীরবতা ভেদ করে বার হয়ে গেল একটা স্পিড ডিঙ্গি, কয়েকজন পুলিশের লোক চলেছেন চারদিন আগে খালের মোহনায় যে ডাকাতি হয়েছিল তার দারোগাদিন তদন্ত করতে। ডাকাতের দল আজও সেখানে যেন বসে প্রতীক্ষা করছে তাঁদের জন্য, হাইকেল উঁচিয়ে খালে ঢুকলেন তারা। জনমানবহীন খাল ডাকাত এবং বাঘের উপর ডাকাতি হয়েছে তাদের কেউই সেখানে নাই, তবু ও চাকরী বজায় রাখতে হবে তো।

আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে। জোয়ার আসতে জেলের দল কে কোথায় চলে গেল উজানে, সেই গভীর বনের ধারে পড়ে রইল আমাদের

নৌকা ; চেউএর দোলায় দুলছে, দূরে ডেকপোর্টে জ্বলছে আলো, দু'একটা ষ্টীমার এসে দাঁড়িয়েছে—কে জানে কি ডেকে হচ্ছে সেখানে, অন্ধকারে বসে আছি ক'টি প্রাণী। পুলিসবোট ফিরছে সকেণে হুকুম দেবে—আমরা ডাকাডাকি করি—টর্চের আলোজেলে দাঙের জানালায় অন্ততঃ রক্ষাকর্তাদিগকে একটু চোখের দেখা দেখাবে, দুটো কথা শুনলেও কলজের ভরসা পাবো, কিন্তু তখন ভোলবার নয়, বেল অফিসারের লক্ষ আমাদিগকে যে ভাবে আকস্মাতীর হাটখোলার ফেলে গিয়েছিল, এই 'স্যারেও' হলও ঠিক তেমনি করে অকূলে ভাসিয়ে রেখে গেলেন। বঁধু ছিলা ঘাটে নাবিয়ে পান খেতেও গেলো না—চোখ ইসারা করতেও দাঁড়ালো না।

ঘড়ির সঙ্গে অনেক মালপত্র চাল ডাল চলেছে। কলের মধ্যে কাঁই কাটাই হচ্ছে, প্রায় পঞ্চাশজন লোকের এক বেলার খাবার মতন সব কিছু, তারাও সঙ্গীন সঙ্গে একটি সঙ্গে রয়েছে, সে এই অবধি। যদি কিছু হয় পরে। নিজের জন্য কিছু ভাবেন না—ভাববার মত প্রবৃত্তি তার নাই দেখলাম।

যদি কোন নিরাপদ নির্জন পাওয়া যায়, তারই জন্য একবার খাল থেকে পুলিশ অফিসার এসেছেন তাঁর জন্যে এবং বনবিভাগের পেট্রল অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চললেন।

বড় নৌকাটা রইলো মালপত্রও একজন মাঝি সমেত পোষার জিম্মায়। ছোট টাপুরি খানায় দুজন হাঁড়ি আর মাঝিকে নিয়ে বড়রা চললেন কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে ডেকপোর্টের ওদিকে। ষ্টীমারগুলো চলাফেরা করছে, তাঁরে বড় বড় ঢেউ, তারই বুকে অতল গাংএ পাড়ি জমিয়ে চলেছি। দেখা যাক কি হয়!

পেট্রল বোট এগিয়ে গেল দেখলাম—পুলিশ অফিসার এখানে নাই, তিনি গিয়ে আগের নিয়েছেন গাংএর মধ্যে ডেকপোর্টের বোতাসা জাহাজে। পেট্রল ইন চার্জ—আমাদিগকে দেখে একটু মনে মনে অসন্তুষ্টই হলেন। ভদ্রলোকরা যে আলাতনই করতে ওস্তাদ সেই কথাটাই প্রকারান্তরে পাড়লেন। আমরা বাচার, যখন আসল কথাটা পাড়লাম—ভদ্রলোক তো শুনে চুপে হতভম্ব। আমাদের যেন তিনি,—বলাই, অদৃষ্টে যা আছে কে আর খণ্ডাবে বলুন। ভগবানের নাম নিয়ে চোখ বুজে চলে যান—বাস্!

বাস্! কিন্তু খরচ। একেই বলে 'জলপুলিশ'। পুলিশের সব কর্তব্য জল করে বসে আছেন। ভদ্রলোকের নাম ধামিক জিজ্ঞাসা করলাম না। কে জানে, হয়তো তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাসের জন্য বোধ হয় 'প্রমোশন' ও পেয়ে গেছেন এতদিনে! এরপর আর এক মাইল পথ টেনে গাংএর বুকে পুলিশ ভদ্রলোকের বিশ্রামে বাধা দিতে ইচ্ছা হোল না, সত্যিই তাঁরা তো আমাদের আসতে বলেননি এই জলে, তবে তাঁরা কোন সূত্রে আমাদের জানোয়ালের জন্য দায়িক, ওঠাবেন ঘুটঘুট। তাঁরা কি আমার খালতাদুকের প্রজা?

নীরবে ফিরে এলাম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। জলের খলখলে অন্ধকার ভেদ করে কানে আসে হরিণের ডাক। আমরা ছাড়া এপাশে আর মানুষ নাই।

কি নিরাপদ আশ্রয়?...বহুদূরে নদীর মধ্যে একটা ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে, প্রয়োজন হলে তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্যও পাবো না। সামনেই খালের মুখ থেকে ডিঙি নিয়ে এসে চাতালের মত এক একটি শেষ করে গেলেও—কেউ টের পাবে না, ফিরিবপত্র নিয়ে যা যা ইচ্ছে। তবে কিসের ভরসায়, একে নিরাপদ আশ্রয় বলে নির্দিষ্ট করে সাহসের চাঁটা সৃষ্টি করে দিচ্ছি!

একদিন এক রাজা ঘোষণা করলেন—যার মাথের ছিদ্রে সারা রাত যে লোক তাঁর রাজপ্রাসাদের নীচে পড়া ডোবাতে থাকতে পারবে তিনি তাকে একশো মোহর পুরস্কার দেবেন।

এক বুড়ো ব্রাহ্মণ অন্ধকারে বসেছিল, একদিকেও মৃত্যু—অন্যদিকেও মৃত্যু, তার চেয়ে জলে থেকে যদি বেঁচে ওঠে—বেশ কিছু জুটে যাবে। এসে নামলো জলে, রইলোও সারা রাত। পুরস্কার নিতে গেছে, রাজার ঈর্ষার সাহেব বুঝিয়ে যেন রাজাকে—'মহারাজ, আপনার তিন মহলার সারা রাত আলো জ্বলেছিল, তার পরও যাবে ডোবার, সেই জলে ডোবার জলও গরম হয়ে উঠেছিল। বেশ আরামেই ছিল ওই চালাক মানুষ। ওকে আবার পুরস্কার দেবেন কেন?

...রাজার মাতার তেমহলার আলো জ্বললে নীচে ডোবার জল গরম হয়ে যায় মাথের ছিদ্রে, সুতরাং ডেকপোর্টের আলোর বিশ্বাস করতে যায় সেই জায়গা নিরাপদ কেন হবেনা?

...ছিদ্রের চাড়ি, সন্ধ্যা থেকে আঁধার জুড়ে বসেছে, আগামীকাল অমাবস্যা, তাইই খুশিতে বুক ভরেছে আকাশভোরা আঁধারের আদর পেয়ে, জ্বলছে দু'একটা তারা। চুপ করে বসে আছি। সব সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অকূল গাং—মিথিড় মনে আজ এই অন্ধকারে বসে আছি পরম লগ্নের মুখোমুখি।

নিজেকে আজও চিনতে পারিনি, বিশাল বিস্তৃত তারাজ্বলা আকাশের নীচে অন্তহীন পৃথিবীর শুরুগম্ভীর গভীরে—জীবনের নশ্বরতা—আদিম বিভীষিকার দৈত্যের সামনে এসেও আমার মুখোস খুলে পড়েনি। এখনও আজন্মের স্বার্থপরতা মন খোঁজে নিজের নিরাপত্তা,...মনের রীতিনীতিকে মানতে পারিনি, ঢাপা ঘৃণা করি আর ভয়ে, ওর বিশাল সৌন্দর্যকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছে আমার পরে পরে, তাই এখানের জীবনযাত্রায় আমি অতল ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

তোমার বুকে সূর্যের প্রথম দেখবার চোখ আমার নাই, আকাশের প্রথম আলিঙ্গন রাতের পৃথিবী তোমার ঘরঘরালার সাজায় তারার হারায়ে ঘুম—সাগর পরায় তোমার ললাটে নিত্যনব পদ্ম, দিক-অঙ্গনার চকল উড়ানী উড়িয়ে যাতাস নেচে যায় তোমার অঙ্গে; শুধু গভীর মহাদেবতার যে নীরব পূজা চলেছে প্রতিটি দিন রাত্রে, আমি তার সুর খুঁজে পাইনি, কানে আসেনি তোমার জয়ধ্বনির সাম্যগান। আমি অন্ধ-মূক! তাই নিজেকেই দিয়ে উর্ধ্বলোকের মত মার্থ ওর বাঁচবার জাল বুনবার বৃথা চেষ্টা করেছি। তুমি হেসেছো খলখল করে; সেই অট্টহাসি দেখেছি দিগন্তীন গাং এর বুকে বুকে-।...ভয়! ভয়! মানুষকে সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত

করে রেখেছে। জীবনের সত্যের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ব্যর্থ করেছে আমার এই যাত্রার মাধুর্য্য।

…ঘুমের ঘড়তা এসেছিল বোধ হয়…কানে আসে একটা ডুম ডুম শব্দ, বৈশ গভীরতা ভেদ করে উঠছে একটা বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার, ওই একটানা শব্দ দূরে গাংএর ওপারে. গভীর বনতলে মুখর হয়ে উঠেছে, জলছে কয়েকটা মশাল, লালচে বীভৎস একটা ছায়া পড়েছে বনের গাছগুলোতে।…

—'ছেলেরা বনবিবির পূজো দিচ্ছে।'

ছোলামাঝি বললো।…ওই সুরের দিকে চেয়ে থাকি, সভ্যজগতের কোন সুর-তাল-ছন্দ ওতে নাই। জমের মর্ম্মরের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে ওই বিচিত্র শব্দ,…আলোটা পরিণত হয়েছে মনের একটি অংশ হয়েই।…কি ওর অর্থ—কি সে যাতনা—তারা ওই লোক জানিনা—মনের জীবনে-ওরা মিশিয়ে গেছে নিঃশেষে।

—"এই ভাটাতেই নৌকা ছাড়বো আমরা!"

বড়দার আপত্তি নাই, আমার সম্পত্তিই যেন চাইছিলেন। এখানেও সেই অনিশ্চয়তা—পথেও তাই। এগিয়ে যাওয়া যাক—যা থাকে বরাতে। দুঃখ যদি থাকে তবে তাড়াতাড়িই আসুক—তারজন্য নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষা করে দিনের পর দিন কাটানো অসহ্য।

—"বেশ, তোল নোঙর।"

—যদি আসেই কেউ, বলবো যা ইচ্ছে নিয়ে যা যাবা; বেঁচে থাকলে আবার আসবো, আবার পাবি তোরা। প্রাণে মারলে আর পাবি না. এই শেষ পাওনা। জমেদী ডাকাত যদি হয় ঠিক বুঝবে।"

হাসতে থাকেন বড়দা—"এতক্ষণ ভেবে চিন্তে ওই ঠিক করলে নাকি!"

…নৌকা ছাড়লো, পিছনে পড়ে রইল বিহারীখাল, আমাদের নৌকা এগোচ্ছে গোসাবা নদীর দিকে। এর পর ছোট গাং আর নাই—গোসাবা নদী ধরে একেবারে সমুদ্রে আসবো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঙ্করাচার্য ও ভক্তি

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

অনেকেই মনে করেন যে শঙ্করাচার্য্য কেবল জ্ঞানমার্গীই ছিলেন। কারণ তিনি অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। অদ্বৈতবাদ দর্শনের জ্ঞান ক্ষেত্রের চরমতার পরিচায়ক। কিন্তু তিনি কেবল জ্ঞানমার্গীই ছিলেন না, যুক্তিযান জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিবাদী ছিলেন। যখন যেরূপে লীলা করিয়াছেন তখনই মনে হইয়াছে তিনি একমাত্র সেই মতবাদী। শুধু যে ধর্ম্মক্ষেত্রেই এইরূপ দেখা যায় তাহা নহে, সাহিত্যেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। জাতুসিংহের পদাবলীর লেখক রবীন্দ্রনাথই, নাট্যকার, সমালোচক ও উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। তথাপি সামগ্রিক দৃষ্টির অভাবে পূর্ণের প্রকাশের পরিবর্ত্তে অংশের প্রকাশ হয়। আর পরিণামে হয় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ভক্ত শঙ্করাচার্য্য।

যাহার জীবন দর্শনে, কর্ম্মে, ভক্তির লীলাবিলাস দৃষ্ট হয়—সেই হয় ভক্তপদ বাচ্য। শঙ্কর আধার ও ভক্তি আধেয়। ভক্ত শঙ্করের আলোচনা করিলেই শঙ্করাচার্য্য ও ভক্তির সম্পর্ক নির্ণীত হইবে। এই আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—জীবনী, সাধনা ও রচনা।

শঙ্করাচার্য্য পরম পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি যে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাহা সুধীগণের অজ্ঞাত নহে। তাঁহার মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কাহিনী জানা যায়। তিনি মাতৃভক্ত পিতামাতা পরমগুরু। তাঁহাদের অসন্তুষ্ট করিয়া কোন কর্ম্ম-কার্য্য হইতে পারে না। সেইজন্য তিনি মায়ের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি লইয়াছিলেন। অধিক কি, যাহা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন শাস্ত্রবিরুদ্ধ জানিয়াও মাতার অনুরোধে বৎসরে একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুকালে তিনি আসিয়া স্বয়ং মাতার ঔর্দ্ধ-দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মাতৃভক্তির চরম ও পরম আদর্শ করিয়াছেন। —'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাই'—মাতা পিতা পরম দেবতা জানে, তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। প্রবাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রবোধের মালিকাতে ইহাদের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—'প্রত্যক্ষং কা মাতা, পূজ্যতরশ্চ কস্তাতঃ'।

তাঁহার সাধন জীবনের বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার গুরুভক্তি সুবিদিত, তাঁহার প্রতিষ্ঠা আজ প্রতীত। তাঁহার ইষ্টদেবতা হরিতে (অদ্বৈতানুভূতিঃ শ্লোক ক) পরবর্ত্তী শ্লোকে তাঁহার ভক্তি বিস্তর ভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

যস্য প্রণামাদহমেব বিষ্ণুর্ধ্বেয়ো সর্ব্বং পরিকল্পিতঞ্চ।

ইথং বিজানামি সদাত্মরূপং তস্যাংঘ্রি যুগ্মং প্রণতোঽস্মিনিত্যম্।

যাঁহার প্রণামে—আমি বিষ্ণু এবং আমাতেই সমস্ত বিশ্ব পরিকল্পিত'—এই জ্ঞান আমার হইয়াছে, নিত্য ও পরমাত্মা স্বরূপ তাঁহার চরণ যুগলে নিত্য প্রণাম করি। গুরুই নিত্য প্রণাম পায়. ইহা ভিন্ন তাঁহার বহু গ্রন্থেই শ্রীগুরুর বন্দনা দৃষ্ট হয়, গ্রন্থের সেব বন্দনা প্রথা সুপ্রচলিত। এই বন্দনা ভক্তিরই প্রকাশক। সাধন জীবনে ভক্তির গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণেই স্বীকৃত। তিনি ভক্তিকে বৈরাগ্যের সাধন বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য নামধেয়ো ভক্তিস্তেতি ত্রয়ং ঘটিতম্।

যুক্তং সাধনমালৈক্য বিরাগো বিকৃতা জ্ঞেয়া। ৫।

"বৈরাগ্য আত্মজ্ঞান ভক্তি এই তিনটি মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বৈরাগ্যের নামান্তর বিকৃতা" অন্যত্রও ইহার নিরোধক উপায়রূপে শ্রীহরিচরণ ভক্তিযোগ কথিত হইয়াছে—'হরিচরণ ভক্তি যোগাদনঘং স্বয়মসৌ তদাপ্তি সাধনং'। ভক্তি জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা অথবা ভক্তিই পরবর্ত্তী কালে জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে ভক্তি ব্যতীত অন্যরাজ্য অর্থাৎ মনস্তুষ্টি প্রাপ্ত হয় না, হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব বা স্থায়িত্ব অসম্ভব। [বিবাদভক্তিপ্রকরণ ১৩৮-১৩৭]

ভক্তির স্থানে পরমুখ আচার্য্য শঙ্করের 'মণিরত্নমালায়' বসিয়াছে জ্ঞান। আত্মজিজ্ঞাসার স্থলে জনগণকে উপদেশ দান কালে, শিব বিষ্ণু ভক্তিকে মাত্র প্রিয় করিবার জন্যই উপদেশ প্রদান করেন নাই। নিজ অনুভূতি সত্যের প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে—

অহমিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং
সংসার মিথ্যায় শিবায় তস্মৈ।
কিং কর্ম্ম যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ
কায়া ন কায়া সততং তদর্চ্চৌ। ৩১।ঐ

"অহর্নিশ কের কি? সংসারের অনিত্যতা ও আত্মস্বরূপ শিবতত্ত্ব। কর্ম্ম কাহাকে বলে? যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন। কিসের প্রতি আস্থা রাখা উচিত? তদেকমূলে"। এই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি দ্বারা মানুষের সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। ইহার সমর্থনে পাওয়া যায়—

"ফলমপি তদপরভক্তেঃ কিং তল্লোক স্বরূপ সাক্ষাৎ"।

(প্রবোধসুধাকরিকা ৬৭)

ভক্তির প্রয়োজন ও ফলাদি বলিয়াও শঙ্করাচার্য্য মুক্ত হইতে পারিলেন না। অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালে নানা পণ্ডিত নানা ব্যাখ্যা করিবেন ভাবিয়া ভক্তির সংজ্ঞা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিলেন এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তি সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী
স্ব স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ৪৩। [বিবেক চূড়ামণি]

'যত মুক্তির কারণ আছে ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে স্বীয় স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি।

শঙ্করাচার্য্য নিজের চরম মত প্রকাশ করিয়াও মনে করিলেন যে ভক্তির এই সংজ্ঞা সকলের অনুভূতির মধ্যে না আসিতে পারে। সেইজন্য অপর মতেরও প্রকাশ করিলেন।

'যাবতত্ত্বানু সন্ধানং ভক্তিরিত্যাপরে জগুঃ'।

অপরে বলেন—যত আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার ও ঈশ্বরের তত্ত্বানুসন্ধানই ভক্তি।

তাঁহার জীবনে আচরণে সর্ব্বত্রই ভক্তির প্রাধান্য দৃষ্টইয়। ভক্তি জ্ঞানের বিকাশক বা পরিপূরক ইহা তিনি উপদেশে আদেশে সর্ব্বত্রই সরলভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

ভাব পরিপ্লুত না হইলে কেহই ভাবময় রচনার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তিভাব যাঁহার হৃদয়ে নাই, সে কখন ভক্তিমূলক রচনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। রচনার সিদ্ধি কালের নিকটে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। সাহিত্যে সিদ্ধি বিষয়ে জানিতে হইলে, জানিতে হইবে জনমনে রচয়িতার ভাব কতখানি সংক্রামিত হইয়াছে। যত অধিক সেই ভাব সংক্রামিত হয় তত অধিক সিদ্ধি সূচিত হয়। শঙ্কর স্তোত্রাবলী পঠন করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ভগবৎ গীতা কিঞ্চিদধীতা
গঙ্গাজল লবকণিকাপীতা।
সকৃদপি যেন মুরারি সমর্চ্চা
তস্য যমঃ কিংকুরুতে চর্চ্চাম্।
ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং
ভজগোবিন্দং মূঢ় মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে
নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।

(চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্রম্)

ভক্তি শব্দের মূল ধাতুরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ভজনা ও ভক্তি পর্য্যায় শব্দ বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। তিনি যখনই যাঁহার স্তব করিয়াছেন তখনই মনে হইয়াছে যে তিনি তাঁহারই পরম ভক্ত। যখন যে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তখন তাঁহাকে সেই মত স্বামী মনে হয়। কৃষ্ণভক্ত শঙ্কর বলিতেছেন—

বিনা যস্য জ্ঞানং ব্রজতি পশুতাং পাশপতিরপি
বিনা যস্য জ্ঞানং জনি মৃতিজনং যাতিজনতা।
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমি শতজনিং যাতি ন বিভুঃ।
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽথি বিষয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্

অনেকে মনে করিতে পারেন যে কৃষ্ণ তাঁহার কুলদেবতা। সেইজন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তব করিয়াছেন। তিনি মাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্তব রচনা করেন নাই, বহুদেব দেবী স্তব সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্য একটি স্তব উদ্ধৃত করা হইতেছে—

অনন্তানন্দে পরমানন্দে
কর মহি করুণাং কাতর বন্দ্যে।
তবতট নিকটে যস্য নিবাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ। গঙ্গাস্তোত্রম্।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভক্তি সম্বন্ধে বহুপ্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ততা রক্ষার জন্য অধিক উদ্ধৃতি হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইলাম।

শিব জ্ঞানের মূর্ত্তি কিন্তু তিনি ভক্তির ও মূর্ত্ত স্বরূপ। শিব অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত কেহ নাই এবং শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা শিবের ভক্ত কে আছে? শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য যে ভক্তিবাদী হইবেন—ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রজগোপালের বাসায় পৌঁছিয়া চন্দ্রসুন্দর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের ঘরের লোক হইয়া গেলেন। ব্রজগোপালের স্ত্রীকে মা বলিয়া এবং তাহার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠাকুর-দা সম্পর্ক পাতাইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিলেন তিনি। ব্রজগোপাল যে ছাত্র-জীবনে কতপ্রকার দুষ্টামি করিত এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া যাইত, Circumnavigation শব্দটার প্রকৃত অ্যাক্‌সেন্ট-সম্মত উচ্চারণ তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, এই সব গল্পে তিনি আসর গুলজার করিয়া ফেলিলেন। ব্রজগোপালের স্কুল ছিল, তাহার ছেলেমেয়েদেরও ছিল, তাহারা তাড়া-তাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল কেবল ব্রজগোপালের ছোট ছেলে মটরু, (বয়স পাঁচ বছর, সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে) আর ব্রজগোপালের স্ত্রী শিপ্রা।

চন্দ্রসুন্দর শিপ্রার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও সকাল সকাল খাব মা। আমিও স্কুল-মাস্টার তো, নটার সময় খাওয়াই অভ্যাস বরাবর—"

শিপ্রা বলিল, "জানি তো। আপনি চান টান করুন। ছানার ডালনাটা হয়ে গেলেই খেতে দেব আপনাকে"

"ছানার ডালনা হচ্ছে না কি! বাঃ"

চন্দ্রসুন্দর মাছ-মাংস খান না বটে, কিন্তু মুখাস্তের দিকে বেশ লোভ আছে।

"আমাকে একটু তেল দাও তাহলে—"

"কি তেল মাখেন"

"গায়ে সরষের তেলই মাখি। মাথায় মাখি একটা কবরেজি তেল, সেটা আমার সঙ্গেই আছে। ওই কাঠের বাক্সটা খোল, ওর কোণের দিকে আছে"

পৈতা হইতে একটি চাবি খুলিয়া শিপ্রার হাতে দিলেন। শিপ্রা কবিরাজি তেলের শিশিটি বাহির করিয়া দিল। তাহার পর একটা বাটিতে খানিকটা সর্ষপ তৈল আনিয়া ছোঁড়া চাকরটাকে বলিল, "মাখিয়ে দে বাবুকে—"

চন্দ্রসুন্দর বামহাতের তালুতে খানিকটা কবিরাজী তৈল ঢালিয়া লইয়া সেটি মাথায় ঘসিতে লাগিলেন। ঘসিতে ঘসিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি আধ-বোজা হইয়া আসিল। শিপ্রা রান্নাঘর হইতে আসিয়া একটি ছোট মোড়া আগাইয়া দিল।

"এইটেতে বসে' তেল মাখুন। আমি রান্নাঘরে যাই ; ঘি-টা চড়িয়ে এসেছি—"

"যাও"

শিপ্রা চলিয়া গেল। ছোঁড়া চাকরটা পাশে তেল মালিশ করিতে লাগিল। মটরু একধারে দাঁড়াইয়া নূতন ঠাকুরদাটির দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাহাকে কাছে ডাকিলেন।

"এদিকে সরে' এস দাদু। লিখতে শিখে গেছ?"

সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শিখিয়াছে।

"আচ্ছা। কি কি শিখেছ—বল দেখি—"

"অ, আ আর ই—"

মটরু ঘাড়টি কাৎ করিয়া মুখের মধ্যে বামহস্তের তর্জ্জনীটি পুরিল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"বাস, ওই পর্য্যন্ত? ঈ?"

"ওটা বড্ড শক্ত। ঠিক হয় না"

"হতেই হবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। ছিঃ নখে আঙুল দিতে নেই। আচ্ছা ওর তিনটে আগে লিখে দেখাও দিকি আমাকে"

মটরু একটুটে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরে হেঁড়ে হাঁকা-বাঁকা করিয়া অ-আ-ই লিখিয়া আনিল।

"বাঃ, এতো চমৎকার হয়েছে। একেবারে মুক্তাক্ষর দেখছি। দুই-ইটার লাঠিটা একটু ছোট হয়েছে যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চান করে উঠে ঠিক করে' দিচ্ছি সব। ঈ-টা যদি ভাল করে' লিখতে পার, তাহলে মজার জিনিস খেতে দেব একটা"

"কি ?"

"চুরণ"

"চুরণ, কি ? লবেনচুস ?"

"না। তার চেয়েও ভালো"

চন্দ্রসুন্দরের কাছে হুলোমনি লবণ, লেবুর রস এবং অন্যান্য তারক মশলা-যুক্ত একপ্রকার মুখরোচক কবিরাজী চূর্ণ কৌটা ভরতি সর্ব্বদা থাকে। বিচারীরা ইহাকে 'চুরণ' বলে। তাঁহার এক বিচারী কবিরাজ গুরুভাই তাঁহাকে নিয়মিত এই 'চুরণ' সরবরাহ করেন। ঔষধটি পাচক, কিন্তু ইহার প্রধান গুণ ইহা খাইতে চমৎকার। চন্দ্রসুন্দর আবিষ্কার করিয়াছেন ছোট ছোট শিশুদের আকর্ষণ করিবার শক্তিও ইহার যথেষ্ট। চন্দ্রসুন্দর তাই প্রায়ই ইহাকে টোপ-স্বরূপ ব্যবহার করেন।···ছোঁড়া চাকরটি পা দুইটি শেষ করিয়া পিঠে তেল মালিশ করিতে যাইতেছিল, চন্দ্রসুন্দর বাধা দিলেন।

"পিঠে দুটো ছোট ছোট ফোড়া হয়েছে, ওখানে তেল লাগিও না। যোমা—"

শিপ্রা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"বাড়িতে চন্দন-পিঁড়ে আছে নিশ্চয়"

"আছে"

"আর গোল-মরিচ ?"

"তা-ও আছে"

"তাহলে খাওয়ার পর আমার একটা ওষুধ করে' দিও মা। চন্দন পিঁড়িতে একটু গঙ্গাজল দিয়ে কয়েকটা গোল-মরিচ ঘসে' ঘসে' দিলে একটা কাথ মতন হবে। সেইটে আমার পিঠের ফোড়া দুটোতে লাগিয়ে দেব। গোড়ায় গোড়ায় দিলে খুব উপকার হয়—"

শিপ্রা বলিল, "বেশ তো, করে' দেব"

চন্দ্রসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "A Stitch in time Saves nine। মায়ের ইংরেজি পড়াশোনা আছে তো—?"

"কিছু আছে—"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল সে। পুরা খবরটা বলিল না। সে বি. এ. পাশ।

আহারাদির পর পিঠের ব্রণ দুইটিতে গোলমরিচের মলম লাগাইয়া চন্দ্রসুন্দর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া লইলেন। ঘুমাইবার পূর্ব্বেই তিনি মটরুকে ঈ লিখিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। উঠিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মটরু কোথা"

"পাড়ায় খেলতে গেছে"

"খুব ব্রাইট্ ছেলে—"

তাহার পর পকেট হইতে নিকেলের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিলেন তিনটা বাজিয়াছে।

"ব্রণ ক'টা নাগাদ ফেরে—"

"পাঁচটা। কোন কোন দিন সাড়ে পাঁচটাও হয়ে যায়।

"এত দেরি হয় কেন"

"স্কুলের কাছেই ঘোষবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়ান। আপনাকে চা করে' দি—"

"আমি একটু বেরুচ্ছি, এসে খাব"

চন্দ্রসুন্দর জামাটি গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ হইতে একটি মতলব তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল। দাদার জামাইয়ের সঙ্গে এখানকার এস. ডি. ও সাহেবের যখন এত বন্ধুত্ব, তখন তাঁহার ছোট ছেলের একটা ভাল চাকরি কি তিনি করিয়া দিতে পারেন না ? ছেলেটা অত পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ার ভোগে, কাছে-পিঠে কোন ডাক্তার পর্য্যন্ত নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে এবং দুএকজন পুলিশ কনেষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে তিনি এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর সম্মুখীন হইলেন। প্রথমেই একটি গেট। গেটের ভিতর দিয়া একটা লাল কাঁকরের রাস্তা বাংলোর

বারান্দা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বারান্দার উপর ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর বাঁধা। বারান্দার অপর প্রান্তে সুদৃশ্য একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে। এস. ডি. ও সাহেবের স্ত্রী না কি? চন্দ্রসুন্দর চশমাটা বাহির করিয়া পরিলেন। তবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। গেটের ভিতর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র কুকুরটা চীৎকার করিয়া উঠিল। চন্দ্রসুন্দর আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটাকে ধমক দিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চন্দ্রসুন্দরের দিকে আগাইয়া আসিল।

"কাকাবাবু, আসুন—"

চন্দ্রসুন্দর যাহাকে এস. ডি. ও র স্ত্রী ভাবিয়াছিলেন সে সন্ধ্যা। তাহার মুখে মৃদু হাসি।

"কুকুরটা কিছু বলবে না তো"

"বাঁধা আছে। আপনি কি ওয়েটিং রুমেই আছেন?"

চন্দ্রসুন্দর স্টেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি এক ছাত্রের বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করিতে যাইতেছেন। কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেই ছাত্রটির বাসাতেই আছি। ওরা ছাড়লে না কিছুতে। এরা সব কোথা—?"

"উত্তর দিকের বারান্দায় গল্প করছে সব"

"তুমি এখানে একা কেন"

সন্ধ্যার মুখমণ্ডলে একটা লজ্জার আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"আমি প্রুফ দেখছি"

"কিসের প্রুফ"

"দৃশ্বতী বলে' আমি একখানা মাসিকপত্র বার করি। তারই প্রুফ—"

"তাই না কি। বাঃ। আমি তো কিছুই জানতাম না"

"বসুন"

চন্দ্রসুন্দরকে একটি চেয়ারে বসাইয়া কুকুরটাকে আর একবার ধমকাইয়া সন্ধ্যা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিল সে, তাহার হাতে দুই-খানি দৃশ্বতী। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুরুচির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। প্রচ্ছদপটে একটি প্রস্তরাকীর্ণ নদীর ছবি রহিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর যদিও খুশী হইবার ভান করিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন একটু। দৃশ্বতী শব্দটির অর্থ তাঁহার জানা ছিল না। একটি প্রবন্ধের শিরোনামাও তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। প্রবন্ধটির নাম—"তথা-কথিত সতীত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি।" তৃতীয়ত মনে পড়িল, সন্ধ্যা এম. এ. পাশ তিনি এফ. এ. ফেল।

"পড়ে দেখব'খন। ওদের খবর দিয়েছিস?"

"না। আপনিই চলুন না ওধারে। মিস্টার রহমন্ লোক খুব ভালো"

"তোদের খাতির করে খুব। না?"

"ওঁর সঙ্গে তো খুব বন্ধুত্ব"

"গণেশটা বাঁকড়ো জেলার এক অজ পাড়া-গাঁয়ে পড়ে' আছে। রহমন সাহেবকে বলে' ওর যদি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারিস—"

"বলব ওঁকে। গণেশ কতদূর পড়েছে—"

"ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি। উপর্য্যুপরি অসুখ, দু'বছর পরীক্ষাই দিতে পারলে না"—তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"হাতের লেখাটা কিন্তু চমৎকার"।

"টাইপ করতে পারে—"

"না। শেখবার সুযোগই পায় নি"

সন্ধ্যা আর কোন প্রশ্ন করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

"বলিস একটু, বুঝলি। তুই বললে কাজ হবে"

"আমি মিস্টার রহমনকে বলতে পারব না। তবে ওঁকে বলব। ওঁর সঙ্গে খুব ভাব"

"তা যা ভাল বুঝিস করিস। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা—"

"চলুন না, আপনার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিই রহমন সাহেবের। আলাপ হ'লে দেখবেন খুব ভালো লোক—"

"না থাক। দরকার হয়তো পরে দেখা করব আমি। শিপ্রা হয়তো চা করে' বসে' আছে আমার জন্যে। আমি যাই এবার—"

"শিপ্রা কে"

"আমার ছাত্রের বউ। ভারী ভালো মেয়েটি"

চন্দ্রসুন্দর উঠিয়া পড়িলেন।

"স্টেশনে দেখা হবে আবার।' এখন চলি—"

গেট হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রসুন্দর নানা কথা ভাবিতে

ভাবিতে আবার পথ হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি কেমন যেন বিমর্ষ বোধ করিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িলেন। গাছের তলায় একটা ফল-ওয়ালা কমলালেবু, বেদনা, খেজুর প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল দাদার জন্য এক টাকার কমলালেবু কিনিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দোকানে কালো-কোট-পরা একটি বেঁটে লোকও তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া ফল কিনিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাহার পিঠটা দেখিতে পাইতেছিলেন, মুখটা দেখিতে পান নাই। ভদ্রলোক মুখ ফিরাইতেই চিনিতে পারিলেন।

"আরে, হাবুল মামা যে—"

হাবুল মামা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মুখের ভিতর হইতে বাঁধানো দাঁতের পাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "চন্দর! সকালের ট্রেণে এসেছ বুঝি"

"হ্যাঁ। দাঁতটা বললে কেন—"

"নতুন করিয়েছি। মুখে থাকলে ভালো করে কথা কইতে পারি না। মনে হয় এখনি পড়ে যাবে বুঝি—"

"তুমি কোন ট্রেনে এলে"

"এখনি এলাম একটা মালগাড়িতে"

"মালগাড়িতে?"

"হ্যাঁ, চেনা গার্ড ছিল। তুমিও চেন তাকে। নরেন-বাবুর ছেলে ক্যাবলা। ভাগনা কেমন আছে—"

"দাদার অসুখের খবর তুমি পেলে কি করে।' কুমার কি তোমাকেও টেলিগ্রাম করেছিল?"

"না। ওরা তো আমার ঠিকানা জানত না। আমি বোলপুরে যোগেনের কাছে শুনলাম। এসে দেখি ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। খবর পেলাম একটু পরেই একটা মালগাড়ি ছাড়ছে, আর ক্যাবলা তার গার্ড। তার সঙ্গেই চলে' এলাম। ভাগনার কি খবর বল তো—"

"টেলিগ্রামে অসুখের খবর পেয়েছিলাম। আর তো কিছুই জানি না"

হাবুলমামা পকেট হইতে ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া দাঁতের পাটি দুইটি তাহাতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন।

"দাঁত বাধালে কবে"

"মাসখানেক হল। মাড়ির ঘা এখনও শুকোয় নি"

"কৌটায় পুরছ কেন"

"অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল—গল্প করতে হবে তো। বললুম তো, দাঁত পরলে কথা বলতে পারি না, মনে হয় এখুনি পড়ে' যাবে। খেতেও পারি না ও দিয়ে। অনিলার জেদে করাতে হয়েছে। জলে গেছে কতকগুলো টাকা অনর্থক—"

"অনর্থক কেন। ভালো করে' চিবিয়ে খেতে পারবে, ভালো হজম হবে"

"আমি এমনিতেই বেশ চিবিয়ে খেতে পারি, হজমও খুব হয়। আমার মাড়ির জোর খুব আছে। তোমার আঙুলটা আমার মুখে পুরে দাও না, কুট করে' কেটে নেব"

চন্দ্রসুন্দর হাসিলেন।

"এখনও মাংস টাংস চালাচ্ছ না কি"

"খুব। তবে পাই না, যা দাম আজকাল। পুজোতেও আজকাল লাউ কুমড়ো বলি দিচ্ছে"

"লেবু কিনলে না কি"

"হ্যাঁ, অসুখের বাড়িতে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে নিলাম"

"দুজনে তো একসঙ্গেই যাচ্ছি, তাহলে আমার আর আলাদা করে' নেবার দরকার নেই, কি বল। একসঙ্গে কতকগুলো নিলে আবার পচে যাবে হয় তো—"

হাবুলমামা কোনও উত্তর দিলেন না। নাক দিয়া সশব্দে একবার নিশ্বাস টানিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ।

"দাদার মেয়ে জামাইরাও এসেছে। তারা এস. ডি. ওর ওখানে আছে"

"হ্যাঁ, তাতো থাকবেই। এক গ্লাসের ইয়ার নিশ্চয়।"

হাবুলমামা মুচকি হাসিয়া ভুরু নাচাইলেন।

"তুমি আজকাল রেলে চাকরি করছ না কি মামা"

"না। হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন তোমার? ও, এই কোটটা। এটা ক্যাবলার। গার্ড গাড়িতে এলুম কিনা। ক্যাবলা বললে তুমি এই কোটটা পরে' থাক, কেউ যদি দেখতে পায় ভাববে তুমিও বুঝি রেলের লোক। আজকাল কেউ 'চুগলি' করলেই তো চাকরিটি যাবে। চুগলি-খোরের অভাবও নেই। চল—"

"কোথা যাবে তুমি"

"ক্যাবলার বাড়ি। তার কোটটা তাকে দিয়ে যেতে হবে"

"আমিও ওই পাড়াতেই উঠেছি এক ছাত্রের বাড়ি"

"চল তাহলে"

উভয়ে কুলিপাড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন।

৫

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সূর্য্যসুন্দরের অসুখের খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম হইতে লাগিল। দশ বিশ ক্রোশ দূরের লোকেরাও আসিয়া হাজির হইল। কেহ পালকি করিয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, কেহ গো-শকটে, কেহ বা পদব্রজে। কেহ খবর লইয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা রহিল। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা বলিয়া গেল শীঘ্রই আবার আসিবে। রাধানাথ গোপ যে চালাগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বাহিরের লোকেরাই সেগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। কুমার ভাবিতে লাগিল আরও করাইবে কি না। তাঁবুগুলি বাড়ির লোকেরা দখল করিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনরা এখনও সকলে আসিয়া পৌঁছায় নাই। সূর্য্যসুন্দরের মেজ এবং সেজ ছেলেই আসে নাই এখনও। মেজছেলে পৃথ্বীশ আসিবেন কিনা তাহা অনিশ্চিত। সেজ ছেলে উশনাও দূরে থাকেন। অনেক সময় তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হয়। তিনি কণ্ট্রাক্টরি করেন, কখন যে কোথায় তাঁহার কাজ থাকে তাহা এখান হইতে সব সময় নির্ণয় করা যায় না। কুমার মাসখানেক পূর্ব্বে নাগপুর হইতে তাঁহার চিঠি পাইয়াছিল। সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাম করিয়াছে। তিনি ঠিক আসিয়া পৌঁছিবেন, হয়তো একটু দেরি হইবে। কিন্তু মেজদা আসিবেন কি না ঠিক নাই। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি বিরাগী হইয়া গিয়াছেন, মাঝে মাঝে কুমারকে চিঠি লেখেন বটে, কিন্তু তখন হইতে আর বাড়ি আসেন নাই। সূর্য্যসুন্দর তাঁহার সম্বন্ধে বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও কুমার বুঝিতে পারিতেছিল মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুমারের নিকট তাঁহার যে ঠিকানাটা ছিল সেই ঠিকানাতেই সে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনও খবর আসে নাই। মেজদা সপরিবারে আসিবেন। গগনের শ্বশুর-বাড়ির লোকেরাও আসিবেন খবর আসিয়াছে। আরও আত্মীয় স্বজন আসিবে। কিন্তু বাড়িতে আর স্থান কই? ইহার উপর আর একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে, সূর্য্যসুন্দর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে গগনের বৌয়ের সাধ দিতে হইবে। সুতরাং আরও জনসমাগম অনিবার্য্য। কুমার অগ্রসর হইয়া দেখিল রাধানাথবাবু নাই। তিনি জনমজুরদের বলিয়া গিয়াছেন, আরও একটি বড়-গোছের আট-চালা প্রস্তুত করিতে। এটি প্রস্তুত করিলে আপাততঃ আর কিছু করিবার থাকিবে না। যদি প্রয়োজন হয় পরে দেখা যাবে। বাঁশ খড়ও ফুরাইয়া গিয়াছিল! কুমার ঠিক করিল আরও কিছু বাঁশ খড় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কুমার দেখিতে পাইল গঙ্গা আসিতেছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে কিছু পূর্ব্বে পুরসুন্দরীর নিকট হইতে একটি ফর্দ্দ লইয়া বাজারে গিয়াছিল। জামাইরা আসিয়াছে, পুরসুন্দরী পোলাও-মাংসের আয়োজন করিতেছেন।

গঙ্গা নিকটে আসিতেই কুমার প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল—"

"এখানে যা কিসমিস রয়েছে তাতে চলবে না। ডাক্তারখানা আলুবোখরা তো পাওয়াই গেল না। মুগলের দোকান কি একটা দোকান। ভালো লবেঞ্চুস পর্য্যন্ত নেই। ভেবেছিলাম উঁহার ছেলেদের জন্য আনব কিছু—"

"কি হবে তাহলে—"

"আমাকে কাটিহারে দৌড়তে হবে, দেড়টার ট্রেণে চলে যাই। সাধের জন্যে কি কি লাগবে সে ফর্দ্দটাও পেলে এক সঙ্গে সব কিনে আনতাম"

"বাবা এখন এসব হাঙ্গামা না করলেই পারতেন—"

"বাঃ, বৌমার সাধ দেবেন না, বলিস কি তুই। হাঙ্গামা আবার কি। কাটিহার থেকে ঠাকুর আনলেই চলবে। বৌদি একা কতদিক সামলাবেন। ঊর্ম্মিলা তো বাবার কাছেই রাতদিন বসে' আছে, আর থাকতেই হবে। হাঁ আর একটা সুখবর আছে—"

"কি—"

"নিখিলবাবু আর তাঁর স্ত্রী আজ সকালের ট্রেণে এসে গেছেন। এখুনি আসবেন তাঁরা। নিখিলবাবু যদি সাধের ভারটা নিয়ে নেন, তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না"

"আচ্ছা, রাধানাথবাবু কোথা গেলেন বল তো"

"নিখিলবাবুর কাছেই গেছেন বোধহয়। কুঠির দিকেই তো যেতে দেখলাম। একটু খোসামোদ করতে গেছেন আর কি—"

"যাঃ। উনি শুধু শুধু নিখিলবাবুর খোসামোদ করবেন কেন"

"কেন আর, স্বভাব—"

চুকি হাসিয়া গঙ্গা অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। কুমারও তাহার পিছু পিছু আসিতে লাগিল।

সূর্য্যসুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুমার দেখিল, বাবাকে কেন্দ্র করিয়া মেঝেতে বেশ একটি সভা বসিয়াছে। কাকা-বাবু গীতা পাঠ করিতেছেন। চন্দ্রসুন্দরের ধারণা হইয়াছে দুর্গা-পথ-যাত্রীর ইহাই একমাত্র পাথেয়। সূর্য্যসুন্দর পাথেয় লইতে আপত্তি করেন নাই, চন্দ্রসুন্দরের আত্মতৃপ্তির জন্যই সম্ভবত তিনি রাজি হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটি সর্ত্ত করিয়াছেন, একবারে যেন পাঁচটি শ্লোকের বেশী পড়া না হয়। এক সঙ্গে বেশী পড়িলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে, তাছাড়া সকলের হয়তো ভালও লাগিবে না। ঊর্ম্মিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া চুল কুরিয়া দিতেছিল, চম্পা বসিয়াছিল পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইতেছিল সে। মেঝেতে কম্বলের উপর চন্দ্র-সুন্দরের পাশে গলায় আঁচল দিয়া এবং হাতজোড় করিয়া বসিয়াছিল কিরণ। একটু দূরে উষা পান সাজিতেছিল। সন্ধ্যা আর একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া পড়িতেছিল সেদিনকার খবরের কাগজটা। তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। দিগন্তও তাহার পাশে বসিয়াছিল, সম্ভবত গীতাই শুনিতেছিল।

পশ্চিমদিকের প্রশস্ত বারান্দায় কুমার কয়েকটি চেয়ার, ক্যাম্প চেয়ার, তেপায়া, ছোট-টেবিল প্রভৃতি পাতাইয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গনাথ, গগন এবং গ্রামের আরও জনকয়েক যুবক সেখানে বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতে-ছিলেন। প্রচুর সিগারেট পুড়িতেছিল। সদানন্দ কোণের ছোট ঘরটায় বসিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন। গ্রামের নাপিত লোচন (তাহার গলায় গলগণ্ড এবং গল-গণ্ডের উপর একটি তুলসীর মালা) তাঁহাকে কামাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু সদানন্দ বলিয়াছেন তিনি নিজে কামানোই পছন্দ করেন। লোচন তবু যায় নাই। সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল জামাইবাবুদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া তবে যাইবে। কুমারের এইরূপই নির্দ্দেশ। বিরুবাবু গিয়াছিলেন স্টেশনে। তাঁহার মেয়ে-জামাইরা কেহই আসিয়া পৌঁছায় নাই। কোথায় কি রকম ট্রেণের যোগাযোগ আছে, তাহারা কখন আসিয়া পৌঁছিতে পারে এই সব খবরাখবর করিতে তিনি গিয়াছিলেন। উষার ছেলে তিনটি, এক-দুই-তিনও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পার্ব্বতী পুরসুন্দরীর সহকারিণীরূপে রান্নাঘরের দিকে আছে এবং কয়েকটি বোকা চাকরের উপর তদ্বী করিতেছে। তাহার ধমকে সন্ত্রস্ত হইয়া একটি চাকর উর্দ্ধশ্বাসে মশলা পিষিতেছে, একটি কাপড় কাচিতেছে এবং আর একটি ইঁদারা হইতে জল তুলিতেছে। ঊর্ম্মিলা সংসারের সমস্ত ভার বড়দির উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং বড়দির দক্ষিণ-হস্ত পার্ব্বতী যে এই বোকা-অথচ-পাজি চাকরগুলাকে দুই ধমকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে খুব খুশীও হইয়াছে। হাবুলমামা বাহির-বাড়িতে নূতন কম্পাউণ্ডারটির সহিত আড্ডা জমাইয়াছেন। কম্পাউণ্ডারটি যুবক। যুবকদের সহিত এবং কিশোরদের সহিতই হাবুলমামার জমে ভাল। তিনি গীতার আসরে আসেন নাই। গঙ্গা একনজরে সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কুমার একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রসুন্দর আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে পড়িতেছিলেন—

যোগ-যুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।

যিনি বিশুদ্ধাত্মা কিনা শুদ্ধ-চিত্ত, বিজিতাত্মা কিনা আত্মাকে যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ যিনি সংযত-দেহ, জিতেন্দ্রিয় কিনা যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কিনা, সর্ব্বভূতের আত্মাকে যিনি নিজের আত্মার মতো দর্শন করেন, যিনি যোগযুক্ত, অর্থাৎ যোগী, মানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তিনি কুর্ব্বন্ অপি মানে কাজ করেও, না লিপ্যতে, কাজে লিপ্ত হন না।

চন্দ্রসুন্দর সহসা চম্পার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,

"বউমা, বুঝতে পারছ তো? আই-এতে তোমার সংস্কৃত ছিল কি—"

চম্পা সলজ্জভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল ছিল।

দিগন্ত নিম্নকণ্ঠে বলিল, "বউদি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছেন গেলবার। ফার্স্টক্লাস পেয়েছেন—"

"ও তাই না কি। তাতো জানতুম না—"

চন্দ্রসুন্দর চুপ করিয়া গেলেন।

পুনরায় তিনি গীতা পাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সূর্যাসুন্দর বাধা দিলেন।

"এখন আর থাক। এদের সঙ্গে একটু গল্প করি"

চন্দ্রসুন্দর ইহাতে একটু মর্মাহত হইলেন। কিন্তু দাদার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। তাই বলিলেন, "আমি তাহলে আহ্নিকটা সেরে নিই গে। ওবেলা আবার হবে"

তিনি গীতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। ক্রমশঃ

রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশন ও নয়া বীমা পরিকল্পনা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম. এ

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, বর্তমানে প্রায় আটত্রিশ কোটি লোক ভারতে বসবাস করছেন। প্রশ্ন হল, এঁদের মধ্যে বীমাকারীর সংখ্যা কত। অবশ্য সঠিকভাবে এই সংখ্যা নির্ণয় করা—সম্ভবপর নয়। তবে অনুমান করা যেতে পারে, ভারতে বীমাকারীর মোট সংখ্যা পঁচাশ লক্ষের কাছাকাছি। ভারতের লোক সংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যাটি মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

যাঁরা ভারতীয় বীমাব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, ভারতে জীবনবীমার প্রসারের জন্য যেন কিছুটা কুত্রিম বেসরকারী পরিচালকরা দায়ী করতে পারেন। তবে সাধারণতঃ যাঁরা সহরে বসবাস করেন কিম্বা যাঁদের আমরা মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি কিম্বা যাঁরা শিক্ষার আলোক পেয়েছেন তাঁরাই বেসরকারী পরিচালনার আমলে বীমার সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন। যাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কিম্বা সাধারণ ভাষায় যাঁদের গরীব বলা হয়—যেমন চাষী, শ্রমিক, গ্রামের অন্যান্য কারিকর ইত্যাদি তাঁরা এই ধরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতেন। তাছাড়া তখন জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এঁদের কোন জ্ঞান কিম্বা ধারণা ছিল না। এর প্রধান কারণ হল, এঁরা যাতে বুঝতে পারেন সেভাবে জীবনবীমার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রচারকার্য চালান হয়নি। অথচ যে ঋণ এরা পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে যাচ্ছেন সে ঋণের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য এঁদের পক্ষে জীবনবীমা খুব প্রয়োজনীয়।

বেসরকারী পরিচালনার আমলে একদিকে যেরকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বয়স ও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সঠিক খবর দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল সেরকম অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত খরচে বীমার টাকা কোম্পানীর দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে অবশ্যপালনীয় বাধ্যবাধকতা দেখা গেছে। এই সব ব্যাপারে যদি কোন ত্রুটি দেখা দিত তাহলে জীবনবীমা সম্পর্কীয় সুবিধা লাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়ত এবং নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির উদ্ভব হত। নির্দিষ্ট সময়মত প্রিমিয়াম জমা না দেবার ফলে যদি কখনও বীমাপত্র বাতিল হয়ে যেত তাহলে প্রত্যেক নিয়ম পালন করে সে বীমাপত্র আবার চালু করা গরীব এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বীমাকারীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত। মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্প্রতি যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সে পরিকল্পনা যদি যথাযথভাবে কার্যকরী করা হয় তাহলে একদিকে যেরকম গরীব চাষী ও শ্রমিক, সেরকম অন্যদিকে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত চাকুরীজীবীরা উপকৃত হবেন, কারণ তাঁরা নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষে একটি থোক টাকা পাবেন। এই টাকার সাহায্যে এঁদের পক্ষে যে কোন এককালীন ব্যয় মেটান অনেকটা সম্ভবপর হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বীমাকারী যদি বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই মারা যান তাহলে তাঁর বীমার টাকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাঁর পোষ্যগণ এক সঙ্গে বীমার টাকা পাবেন। যেহেতু পোষ্যগণ বীমাকারীর টাকার সাহায্যে সাময়িকভাবে খরচ মেটাতে সমর্থ হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে সেহেতু এঁদের পক্ষে কপর্দকশূন্য হবার আশঙ্কা অনেক কমে যাবে।

পূর্বাঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত জীবনবীমার উদ্বোধন উপলক্ষে ব্যারাকপুরে স্যার বীরেন মিত্রের সভাপতিত্বে সম্প্রতি একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছেন, "The Life Insurance Corporation Janata policy will benefit industrial workers. Their small savings under the policy will also contribute towards the success of the second Five Years Plan." পরিকল্পনাটি আলোচনা করলে দেখা যাবে, স্বাস্থ্যপরীক্ষা সম্পর্কীয় আইনকানুনের কঠোরতা হ্রাস করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

কয়েকটী ক্ষেত্রে একেবারে স্বাস্থ্যপরীক্ষা না করেই এক একজনের উপর সর্ব্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত বীমার ঝুঁকি নেওয়া যাবে। অবশ্য এইপ্রকার ক্ষেত্রের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করে হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঝুঁকি নেবার গুরুত্ব অনেকখানি। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার হাজার টাকা পর্য্যন্ত বীমার ঝুঁকি নেবার আগে সংক্ষেপে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট কথা হল, পরিকল্পনার প্রবর্ত্তিকারা হাজার টাকা পর্য্যন্ত বীমাকারীর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর তেমন জোর দিতে চাননি। বলা হয়েছে, এমন কোন বীমার আবেদন বিবেচিত হবেনা যেটা আড়াই শত টাকার কম। তা ছাড়া অন্ততঃ বার টাকা বার্ষিক প্রিমিয়ম হওয়া চাই।

বর্ত্তমানে পশ্চিম, দক্ষিণ, মধ্য, উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্ব এই পাঁচটী অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশনের পরিকল্পনাটি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অবশ্য এই সব অঞ্চলের সর্ব্বত্র আপাততঃ পরিকল্পনাটি প্রবর্ত্তন করা হবে না। যে সব স্থানে পরিকল্পনাটি চালু করার আয়োজন চলছে সে সব স্থানকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পল্লী নির্ব্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাচন করা হয়েছে—শ্রমিক মহল্লা। অবশ্য সবগুলি শ্রমিক মহল্লা নির্ব্বাচিত হয় নি। কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট শহরের শ্রমিক মহল্লায় প্রস্তাবিত বীমা চালু করার জন্য আয়োজন চলছে। জানা গেছে, আপাততঃ যে সব স্থানে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হয়েছে সে সব স্থানে যদি আশানুরূপ ফলাফল দেখা যায় তাহলে আরো ব্যাপকভাবে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হবে।

পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছে, যাঁরা বীমা করবেন তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে এজেন্ট এবং অর্থ সংগ্রহকারীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রিমিয়াম আদায় করবেন। অবশ্য যে কোন এজেন্ট এবং অর্থসংগ্রহকারী প্রিমিয়াম আদায় করতে পারবেন না। কেবলমাত্র সেই সব এজেন্ট এবং অর্থ-সংগ্রহকারী প্রিমিয়াম আদায় করতে পারবেন যাঁরা রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অনুমোদিত। প্রশ্ন হতে পারে, কেন বীমাকারীর বাড়ী গিয়ে প্রিমিয়াম আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে যাঁদের দিনের পর দিন জর্জ্জরিত হতে হচ্ছে তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি কতটুকু সেটা বিশদভাবে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এঁরা থোক বার্ষিক অথবা ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম জমা দিতে অসমর্থ। তাই বীমা কর্পোরেশন এজেন্ট এবং অর্থসংগ্রহকারীর মারফৎ প্রিমিয়াম আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন।

যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর কিম্বা পঁয়ত্রিশ বছরের কম তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বীমার আবেদন স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করেই বিবেচিত হবে বলে পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। কিন্তু যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের অনেক বেশী তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বীমার আবেদন বিবেচনা করার আগে নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এঁদের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

রাষ্ট্রিয় ও বীমাকর্পোরেশন কর্ত্তৃক অনুমোদিত যে সব এজেন্ট এবং অর্থ সংগ্রহকারী বীমাকারীর কাছ থেকে প্রিমিয়াম আদায় করবেন তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য হল বীমাকারীর সাথে নিয়মিতভাবে সংযোগ রক্ষা করা এবং বীমা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। এজেন্ট এবং অর্থ-সংগ্রহকারীরা যদি যথাযথভাবে তাঁদের কর্ত্তব্যপালন করেন তাহলে দুটী সুফল আশা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বকেয়া দফি-অর্দ্ধায়ুযোগে প্রিমিয়াম পাঠাতে যে অতিরিক্ত খরচ পড়ে সে খরচ দাঁড়াবে হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সুফল হচ্ছে, প্রিমিয়াম বাকী পড়ার আশঙ্কা দূরীভূত হবে। তাছাড়া মোটা পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করার জন্য যদি ঐকান্তিক-ভাবে চেষ্টা করা হয় তাহলে জাতীয় মূলধন এবং লগ্নীর পরিমাণও কেন কিছুটা বর্দ্ধিত হবার আশা আছে।

জীবন : ভালবাসা

শ্রীউমাপদ নাথ

জীবনের ঘুম নেই, জীবনের সিঁড়ি ভাঙা কাজ ;
জীবনই জিয়ায়ে রাখে প্রেমময় মর্ম্মরীয় তাজ।
এ স্বাদে অরুচি নেই, আমি তো জেনেছি তাকে তাই ;
পৃথিবীর প্রেম ছেড়ে পালাবে সে ? ঠাঁই নাই নাই।
চোখে চোখে ঘুম ভাঙে, পিছু পিছু পা পড়ে তাহার ;
নরম ধুলোয় রাখে মালা গাঁথা পায়ের বাহার।
তুমি-আমি ঘুম দিই : সে উঠে নীরবে চলে যায়—
শীতল আকাশে গিয়ে মিশে থাকে তারায় তারায়।
জীবন সহিষ্ণুতম। পিঠ গড়া গণ্ডারীয় ত্বকে।
কামারের কর্ম্মশালে হাতুড়ির নীচে চকচকে
কী অগ্নি ছিটায়, হাসে ! মৃত্যু কি সেখানে কাছে যায় ?
জীবন নিয়ত হাঁটে, প্রেমের নূপুর বাজে পায়।

এখানে বালির চরে জাহাজ ঠেকুক, নেই ভয়।
জীবন খেলার ঘরে পুতুল পুতুল শুধু নয়।

সুর—মিশ্র অরুণ মল্লার ॥ তাল—দাদ্‌রা

তোমার রঙে রঙিয়েছি আজ আমার হিয়া খানি
আসবে তুমি গোপন পথে এই কথাটি জানি।
অভিসারের মালাটি মোর গেঁথেছিলাম ভোরে,
সন্ধ্যা বেলায় শুকিয়ে এলো ফুল যে গেল ঝরে।
বল প্রিয় আসবে কবে আমার আঙিনাতে,
জীবন আমার সঁপে দেবো মিলন মধুর রাতে।

কথা—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপ্রিয়নাথ দাস

II { গা মা রা | রসা ণ্‌া ধ. | ণ্‌া সা ।| । । । | সা ধা ধা | পা পমা পা |
তো মা র র ০ ঙে ০ র ঙি য়ে ছি আ জ আ মা র ০ হি ০ য়া

পা ধা ।| ণধা ধপা মা } ।
খা নি ০ ০ ০ ০ ০ }

গা মা মরা | রসা ণ্‌া ধ্‌া | সা পা পা | ধপা মা মা | র্সা র্সা র্সা | র্সণা ণধা পমা |
আ স বে ০ তু ০ মি ০ গো প ন প ০ থে ০ এ ই ক ০ থা টি ০ ০

পধা ।ণধা | ধপা মা মা II
জা নি ০ ০০ ০ ০ ০ ০

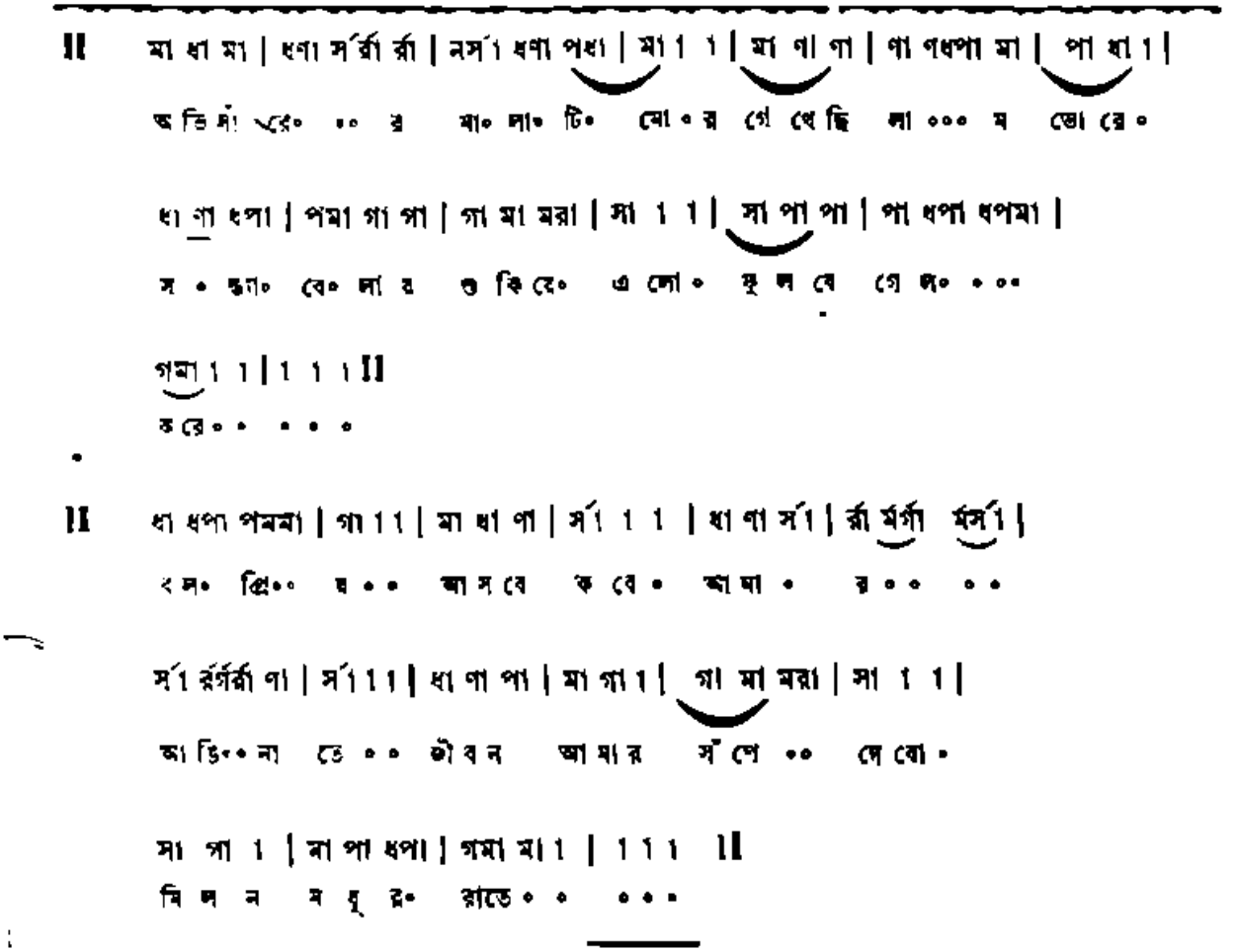

নীলোৎপল

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশে শারদীয় পূজা যথার্থই জাতীয় উৎসব। মহাশক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তির সামনে বাঙ্গালী আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানায়, কামনা করে তার বহুবাঞ্ছিত ফললাভের আশায়: রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি নমস্তুতে। দেবীপূজা উপলক্ষ করে বাসনা-কামনার চরিতার্থতার জন্য জাতীয়ভাবে এমন একনিষ্ঠ আবেদন বাঙালী বিষ্ণুর আর কোনও ধর্মানুষ্ঠানে দেখা যায় না। তাই বাঙালীর দুর্গাপূজা বহুকাল হতে পবিত্র জাতীয় অনুষ্ঠানের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে গণ-অভ্যুত্থানের নানা ক্ষেত্রে শারদীয় উৎসবের অবদান অসাধারণ। ইতিহাসের নজীর থেকে দেখা যায় গত এক হাজার বছর কাল ধরে বাংলাদেশে দুর্গাপূজা জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করে আসছে। তারও পূর্বে দুর্গাপূজা শুধুমাত্র সমাজের পল্লী ব্রাহ্মণদের মধ্যে, রাজন্যকুল বা ভূমির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কি না তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যেতেও. দুর্গাপূজা সেকালে যে ব্যাপকভাবে গণ-উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে নি, একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। শরৎকালে ওরূপটীর পূজা দেবীর অকালবোধন বলে সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত হ'য়ে এসেছে। দেবীর অকালবোধন করেন শ্রীরামচন্দ্র। রাবণকে বধ করতে পারার আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে বিশ্বের সকল শক্তির আধারভূতা দেবী মহামায়ার কৃপা লাভ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর পূজা ক'রে দেবীকে অকালে বোধন করেন। বস্তুত রামায়ণে বর্ণিত সেই অপূর্ব কাহিনীর যাত্রা অনুসরণ করেই শরৎকালে দেবীকে আবাহন করার মহালগ্ন যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

রামায়ণের বর্ণনায় রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দেবীর আদেশ

হয়েছিল দেবীকে তুষ্ট করার জন্য একশত আটটি নীলপদ্ম বা নীলোৎপলে বিশ্বের সৃষ্টি-সংস্থিতি-লয় কর্ত্রী দেবী মহামায়ার আরাধনা করতে হবে। রামভক্ত হনুমান নীলপদ্মের সন্ধানে বেরুলেন, কত দুর্গম পাহাড় পর্বত, গিরিকন্দর পেরিয়ে তিনি সংগ্রহ করে আনলেন একশত আটটি নীলপদ্ম। শ্রীরামচন্দ্র দেবী মহামায়ার পূজা আরম্ভ করলেন। নীলপদ্ম দিয়ে অঞ্জলি দেওয়ার সময় হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন একশত আটটির মধ্যে একটি নীলপদ্ম তো নেই, মাত্র একশত সাতটি আছে। আর একটি নীলপদ্ম কি হ'ল? হতাশ হয়ে দশরথ-তনয় তখন সমুদ্রতীরের পূজা প্রাঙ্গণে সব কিছু খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পদ্ম খুঁজে পেলেন না। তখন পূজার লগ্ন সুরু হয়ে গিয়েছে, আর একটি নীলপদ্ম সংগ্রহ করে আনার সময়ও নেই। কি করা যায়? এদিকে রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একশত আটটি নীলপদ্ম দিয়ে মায়ের পূজা করবেন। তখন রামচন্দ্র ভাবলেন, জনসাধারণের বিশ্বাস আমারও নাকি পদ্মের মতো চোখ: আমার আর এক নাম, পদ্মপলাশলোচন:, আমি তো অনায়াসেই আমার একটি চোখ উৎপাটিত করে সেই চোখ দিয়ে একটি পদ্মের অভাব মেটাতে পারি। তখনই রামচন্দ্র ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলেন তাঁর একটি চোখ উৎপাটন করতে। ঠিক এমনি সময়ে দেবী দশভুজা সামনে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'বৎস, বিরত হও। আমি তোমার একনিষ্ঠতায় তৃপ্ত হয়েছি।' মহামায়া তাঁর অনন্ত মায়ার বলে একটি নীলপদ্ম হরণ করে নিয়ে রামচন্দ্রকে এতক্ষণ ধরে শুধুমাত্র পরীক্ষা করছিলেন।

অকালবোধনের যথার্থ তাৎপর্যটুকু একটি নীলপদ্মকে অবলম্বন করে বিদ্যমান। হারিয়ে যাওয়া নীলপদ্মের অভাব পূরণ করতে ভক্ত তাঁর নিজের চোখ উৎপাটিত করে তা দিয়ে দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। যুগ যুগ ধরে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় দেবতার প্রতি ভক্তের এমনি একনিষ্ঠ আত্মাহুতি, সর্বস্ব সমর্পণের এমনি অকুণ্ঠ প্রয়াস মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নীলোৎপল বা নীলপদ্ম তাই শারদীয় পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বাংলাদেশে এখনকার পূজার উপচারে নীলপদ্ম বিরল, কারণ এ দেশের জল মাটিতে নীলপদ্ম জন্মায় না। নীলপদ্মের অভাবে সাধারণ পদ্মফুল দিয়েই দেবীর পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু নীলপদ্ম এখনো ভারতের কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায়। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে, ভারতীয় কাব্যে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে নীলপদ্মের অনন্ত উল্লেখ রয়েছে, নীলপদ্মকে উপজীব্য করে কত বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য পরিকল্পনাই না করা হয়েছে! এমনিতে পদ্মফুলকে নিয়ে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে যে কত অপূর্ব সুন্দর কাহিনী লেখা হয়েছে তার অন্ত নেই। সংস্কৃত মহাকাব্যে বীর নায়কের চোখকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে তার গৌরব ও মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। পদ্মের মতো আঁখি এই উপমা আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের আঙিনায় অতি পরিচিত আর অতি প্রাচীন।

ঋগ্‌বেদে এবং পরবর্তী যুগের সকল বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান প্রভৃতিতে দুই প্রকার পদ্মের উল্লেখ রয়েছে। একপ্রকার পদ্মের নাম হ'ল পুণ্ডরীক; ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে মনুষ্য-হৃদয়কে ও পদ্মের সহিত (হৃদয়-কমল) তুলনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদে নারায়ণের বর্ণনায় দেখা যায়—ক্ষীর সমুদ্রে তিনি যোগনিদ্রায় (শায়ত অবস্থানে) শয়ন করে আছেন, তাঁর কণ্ঠে পদ্ম বৈজয়ন্তী। অথর্ববেদে উল্লিখিত আর এক ধরণের পদ্ম হল "পুষ্কর" অর্থাৎ নীলপদ্ম। নীলপদ্মের কথা অথর্ববেদে নানা প্রসঙ্গে এবং পরবর্তীকালের বেদপুরাণাদিতে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। সেই উল্লেখ থেকেই বোধ হয় 'নীলোৎপল' নামটি প্রচলিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে 'নীলোৎপল দুধে জন্মে এবং যে দুধে 'নীলোৎপল' জন্মে না, তাকে দুধ বলে বিবেচনা করা হয় না। সেইজন্য বোধহয় দুধকে বলা হয় পুষ্কর (পদ্ম) দুগ্ধ।

'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' দেখা যায় প্রজাপতি সংসার সৃষ্টির কামনায় জলের মাঝে জন্ম নেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি পদ্মপত্র তরঙ্গময় জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। পদ্মপত্রটি নিশ্চয়ই কোন রকম অবলম্বনের উপর রয়েছে মনে করে তিনি বরাহবেশে জলে প্রবেশ করলেন এবং নীচে মাটি দেখতে পেয়ে তার এক টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে জলের উপর ভেসে উঠলেন। তারপর তিনি এ' মাটির টুকরো পদ্মপত্রের উপর মেলে ধরলেন। এইভাবেই নাকি পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

'তৈত্তিরীয় আরণ্যকে' এক বিচিত্র বর্ণনায় রয়েছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল শুধু জল। সেই জলের আবর্জনা থেকে একটি মাত্র পদ্মপত্র জন্মে জলের উপরে ভেসে বেড়ায়। আর তা থেকেই প্রজাপতি সৃষ্টি হন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করতে অগ্রসর হন। মহাভারতে দেখা যায়—যখন বিষ্ণু নারায়ণরূপে যোগনিদ্রায় ক্ষীর-সমুদ্রে শায়িত ছিলেন, সেই সময় তাঁর নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত পদ্ম থেকেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টি হন। সেইজন্য ব্রহ্মাকে বলা হয় অম্বুজ বা অম্বুযোনি এবং বিষ্ণুকে বলা হয় পদ্মনাভ।

মহাভারতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, বিষ্ণুর কপাল থেকে একটি পদ্ম জন্মে এবং তা থেকে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী সৃষ্টি হন। সেইজন্য লক্ষ্মীকে বলা হয় পদ্মা বা কমলা। মহাভারত পাঠ করে আরও জানা যায় যে, মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী নলিনী হ্রদ আর মন্দাকিনী নদী সুবর্ণ পদ্মে পরিপূর্ণ। পদ্মের অন্য এক নাম নলিনী। মানস সরোবরের সম্পর্কে পদ্মের আরও অন্য নাম হল সরোজ ও সরোজিনী।

হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, অগ্নি, গণেশ, রাম ও সূর্য প্রভৃতি সকল দেবতার হাতেই রয়েছে পদ্মফুল। এই সব দেবতাদের আবার পদ্মাসনে আসীন অবস্থারও বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রে যেমন পদ্মফুলের সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে, ঠিক বৌদ্ধ ও জৈনদের সাহিত্যেও পদ্মফুলের কথা পরম ভক্তি ভরে বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধ চরিত ও সদ্ধর্মপুণ্ডরিক নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় রয়েছে যে লক্ষ্মী পদ্মাসনে বসে রয়েছেন, আর তাঁর প্রত্যেক হাতে রয়েছে একটি করে পদ্মফুল। আর দুইটি হাতী

শুদ্ধ দিয়ে ওজন করে তা থেকে যে বস্তু দুষ্ট পক্ষে ভর চাপাচ্ছে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী ও পোলানুবাদকারী তাদের দিয়ে এই দুষ্ট অংশটি বাদ যায়। বুদ্ধদেবের বর্ণনায় দেখা যায় যে তিনি পদ্মের উপর বসে আছেন অথবা পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এইরূপ চিত্র রাজপুত, কাংরা, জাসি, পাহাড়, নেপাল, ব্রহ্ম চীন ও তিব্বতে দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন এমন অনেকগুলি ছাপের মূর্তি তো ভারতবর্ষের সর্বত্র রয়েছে।

জৈন তীর্থঙ্করগণও পদ্মাসনে বসে আছেন এবং তাঁদেরও হাতে পদ্ম রয়েছে, এমন অনেক প্রাচীন চিত্র রয়েছে।

ভারতীয় আদর্শে পদ্মফুল অতিশয় পবিত্র ও শুভ্র বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশুদ্ধতা ও অমরতার প্রতীক—এই ফুলের সংস্পর্শেও কোন পাপ বা মালিন্য আসতে পারে না। পদ্ম মহিমা চিরকালের তরে, কিন্তু তবু এই ফুল কত সুন্দর, কত নির্মল, ভারতীয় আদর্শে মানুষকেও পদ্মের মত হতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যেন সংসারে থেকে সংসারের কাজ করে যায়, কিন্তু সংসারের প্রতি মনুষ্য-হৃদয় কখনো আসক্ত না হয়। তার যেন সংসারের মালিন্যের স্পর্শ থেকে দূরে থাকে।

পদ্মফুলের সঙ্গে একটি অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যানুভূতি যেন বিজড়িত রয়েছে; ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিকুল অনেক সময় তাঁদের নায়িকাকে পদ্মমুখী, কমলাক্ষী ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেছেন।

শুধুমাত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরেও বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের প্রসঙ্গে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করার জন্য একটা শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। গুরুদেবের পদ, পিতৃদেবের পদ, মাতৃদেবীর পদ প্রভৃতির প্রসঙ্গে পাদ পদ্ম বলে উল্লেখ করা হয়। পদ্মফুলই মনুষ্য-জীবনের উৎস বলে গর্ভকে বলা হয় গর্ভপদ্ম। যোগ সাধনায় ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতির নানাবিধ আসন ও করমুদ্রার মূলে পদ্মের মতো আকার পরিকল্পিত হয়। পদ্মের ন্যায় বা পদ্মের ন্যায় আকার ধ্যানযোগীদের নিকট সুপরিচিত।

শারদীয়া পূজার বিচিত্র উপচার এবং বর্ণসম্ভারের মধ্যে পদ্মফুল যেন একটি অনিন্দ্যসুন্দর উপকরণ। শরতের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোয় পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ভক্ত সাধকের হৃদয়ও যেন উন্মোচিত হ'য়ে ওঠে। শুভ্রতের বর্ণনায় মানুষের হৃদয়কে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে হৃদয়-কমল বলা হয়েছে, আর তারই সূত্র ধরে পদ্মকে শতদল বা সহস্রদল বলেও কবির কবি-কবি তাঁর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন। বাংলার জাতীয় উৎসবের ও একটি অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল পদ্মফুল।

স্মৃতির পাহারা

প্রতীপ দাশগুপ্ত

আমার নির্জন মনের ভাবনাগুলো
ডানা মেলে শুধু ওড়ে
ধীরে ধীরে নিঃসীম স্মরণের
চেনা-অচেনার তীরে,
তবুও মন পায় না সেই হারিয়ে-যাওয়া
দিনগুলি আর ফিরে,
তাই তো মনে সকরুণ-অরুণ
নানা সুরে ওঠে ভ'রে।
যে-সব স্মৃতি সূর্যমুখী ফুলের মত
তাকিয়ে থাকে আমার পানে,
তারা আমার প্রাণে পুলক এনে
ভরে দেয় গানে গানে।
কিন্তু ভাল-না-লাগা বিদেহী স্মৃতি
ভাঙে আমার শুভ্র মনোরথ,
তাই মনের গোপন পায়ে দ'লে দ'লে
রুদ্ধ করি তাদের পথ—
তবু তারা নিঃসাড়ে এসে বিভীষিকা সুরে
মায়াময় চোখে ডাকে,
এরই ভেতর মনে আসে ভীরু লজ্জার মত
ভাল-লাগা স্মৃতি কোন ফাঁকে।
মনের শিয়রে আলো-আঁধারীর এই দ্বন্দ্ব নিয়ে
মোদের জীবন-যাত্রা,
এদের তারে বেদনাল হ'য়ে কখনো কখনো
হারাই মনের মাত্রা;
এদের আবার কেনিয়ে রাঙিয়ে রচি কত
ছন্দ ও সুর, গল্প আর কাব্য—
পারি নাকো ছাড়তে এদের, তাই
এদের কথা ভাবি এবং ভাববো।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কান্না ফটো : রতন বাগচী

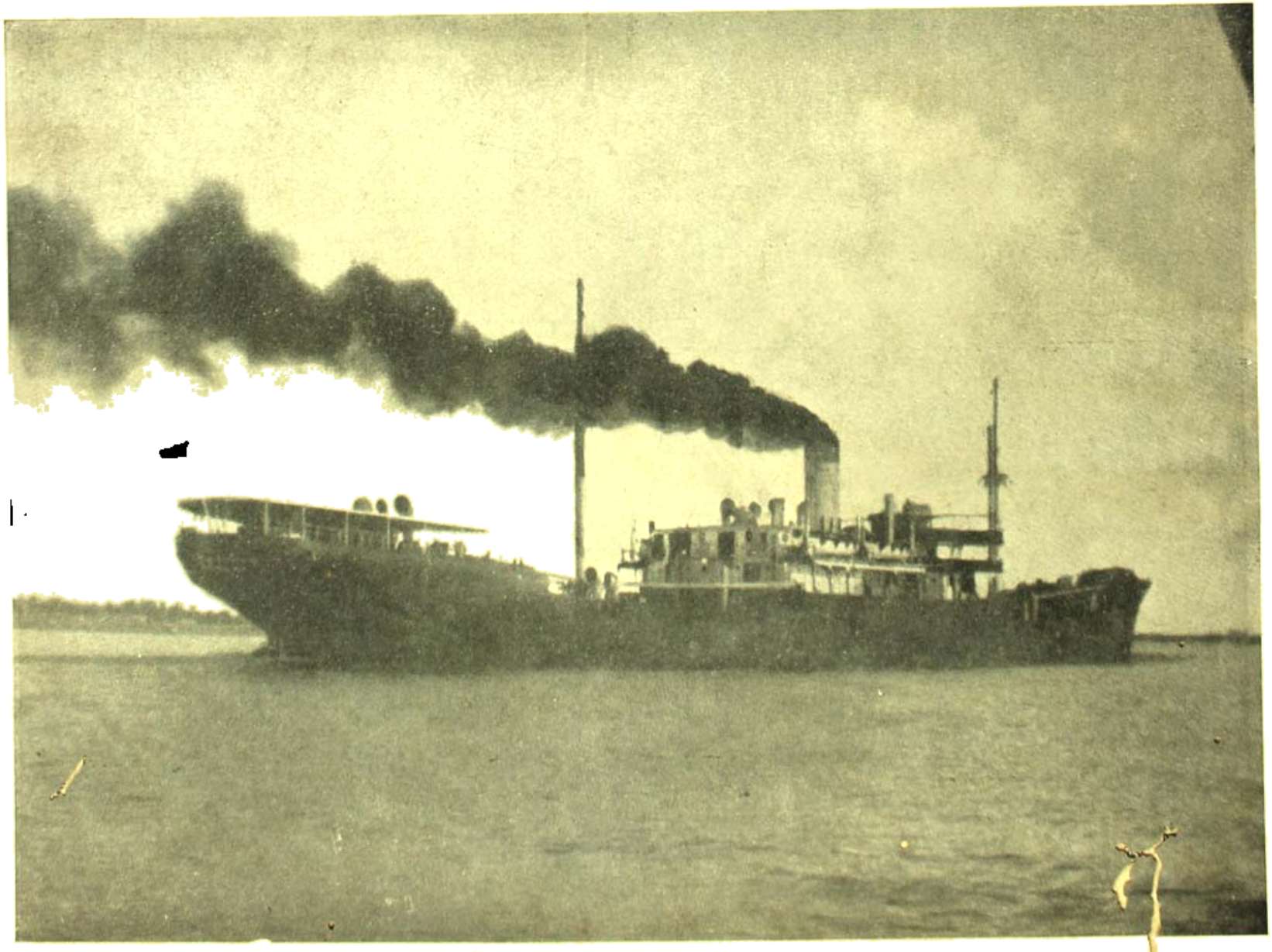

তিন সিঁড়ি

অর্ণব সেন

সম্পর্কটা খুব কাছের নয়। অনেক ডালপালা লতাপাতা বেয়ে চলত কোন একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা ঠাট্টা মনে হতে পারে। কিন্তু সম্পর্কটাই সব সময়ে বড়ো নয়। তাই এ বাড়িতে সাত বছরের যাতায়াতে সুনীল আজ অনেক কাছে এসে পড়েছে। অন্ততঃ পরিমলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী মালিমা দেবী সুনীলকে এই ক'বছরে অনেক কাছে টেনে নিতে পেরেছেন। পরিমল-বাবু ছাড়া বাড়িতে আর পুরুষমানুষও ছিল না। তাই হয়ত কিছু বাড়তি দায়িত্বও সুনীলের ওপর এসে পড়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনা, বাজার করে দেওয়া, অসুখের সময় ডাক্তারের কাছে ছোটা, ইত্যাদি অনেক কিছুই সুনীলকে করতে হয়েছে এই দূর সম্পর্কের মাসিমা মেসোমশায়ের জন্যে। আর অন্য কে করবে? তিন মেয়ে আছে বটে। কিন্তু তাদের দিয়ে তো আর বাইরের কাজ হয় না। আরতি, প্রীতি, বীথি।

সাত বছর আগে ওঁরা যখন প্রথম এলেন তখন আরতি সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আর প্রীতি বীথি তখন অনেক ছোট। সুনীল তখন চাকরিতে ঢুকেছে বছরখানেক হলো।

সেই সময় থেকেই সুনীলের সঙ্গে এ বাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিজের বাড়ীতে ওর থাকার প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না। তাই সময়ে অসময়ে এদের বাড়ীতেই ও থেকেছে। তখন থেকেই এ বাড়ীর সব কিছুই ওকে টেনে ধরে রেখেছে। মাসিমা মেসোমশায়ের স্নেহও আরো বেশী টেনেছে। প্রীতি বীথি তো সুনীলদাকে ছাড়া থাকতেই পারতো না। ওদের পড়া দেখিয়ে দিতে হলে সুনীলকে চাই। স্কুলের ম্যাপ এঁকে দিতে হলে সুনীলকে চাই। আবার বেড়াতে বের হলেও সেই সুনীল। সুনীল ওদের দু-বোনকে যতো সহজে কাছে পেয়েছিল বড়ো বোন আরতিকে কিন্তু এতো সহজে পায়নি। প্রথম প্রথম কিছুদিন আরতি ওকে এড়িয়েই চলতো। ওকে অবশ্য সুনীলদা বলেই ডাকতো। ওর সঙ্গে গল্পও করতো। কিন্তু প্রীতি বা বীথির মতো আপন করে নিতে পারেনি আরতি। কেমন যেন একটা সংকোচ আরতিকে দূরে সরিয়ে রাখতো। তবে সে সংকোচটুকুও কিছুদিন পরে কেটে গিয়েছিল।

একদিন পরিমলবাবু বললেন, 'দেখো সুনীল, আরতির পরীক্ষা এসে গেছে। তুমি মাঝে মাঝে যদি ওকে একটু সাহায্য করো পড়া-শুনায়, তাহলে মেয়েটার একটু সুবিধে হয়। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে হয় তাহলে দরকার নেই।'

সুনীল বলল, 'অসুবিধে আর কি! আমি তো সন্ধ্যের দিকে বসেই থাকি। ওকে একটু দেখিয়ে দিতে আর কি অসুবিধে আছে বলুন।'

তারপর থেকে সুনীল আরতির পড়ার ভার নিল। আরতি ইণ্টারমিডিয়েট পাস করল ভালভাবেই। তারপর বি-এতে ভর্তি হলো। এদিকে প্রীতিও সে বছর প্রথম কলেজে ভর্তি হলো। এর পর থেকে আরতি যেন কতকটা ইচ্ছে করেই সুনীলের সাহায্য উপেক্ষা করে চলতো। অন্তত নিজের পড়াশোতে সুনীলের সাহায্যও আর চাইতো না। বাড়ীর উত্তরদিকের ছোট্ট ঘরখানায় একলা পড়া-শুনা করে সময় কাটাতেই ওর ভাল লাগতো। বেশি হৈ-চৈ আরতির কোনদিনই ভাল লাগতো না। প্রীতি বা বীথির মতো হৈ-চৈ করতে ও কোনদিনই পারতো না। কিন্তু থার্ড ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পর থেকে ওর নির্জনতা-প্রীতি যেন আরো একটু বাড়লো।

সুনীল একদিন ওদের তিন বোনকে নিয়ে একটা ইংরেজী সিনেমা দেখতে যাবে ভেবেছিল। প্রীতি আর

বীথি অনেকদিন থেকেই ওকে ধরেছিল। তাই শনিবার দিন ও চারখানা টিকিট এনেছিল। হঠাৎ আরতি বলল, 'সুনীলদা, আমার ভাল লাগে না ইংরেজী সিনেমা, আমি যাবো না। প্রীতি বীথি যাক্।'

সুনীল বলল, 'সে কি আরতি। আমি টিকিট কেটে আনলাম, আর তুমি যাবে না।'

বীথি বলল, 'চলুন, চলুন সুনীলদা। দিদি যাবে না তো ভারি বয়ে গেল। আমরা দুজন তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

প্রীতি বলল, 'যাবে না কেন, যেতেই হবে। খালি বই খুলে বসে থাকা ঘরের মধ্যে। দিনরাত কি এত ভাবিস্ রে দিদি?'

আরতি বলল, 'তুমি চুপ করো। অসভ্য মেয়ে। আমার ভাল লাগে না, আমি যাবো না।'

আরতি চলে গেল ওর ঘরের দিকে। একটু পরেই সুনীল ওর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখলো আরতি জানলার পাশে বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

সুনীল ডাকল, 'আরতি, তুমি যদি সিনেমা না যাও তাহলে আমরাও কেউ যাবো না।'

আরতি সুনীলের দিকে মুখ ফিরিয়েই হেসে ফেলল। 'আপনি ভীষণ চালাক সুনীলদা। আচ্ছা, আমি যাবো।'

সুনীল বলল, 'তুমিও কম চালাক নও। নিজের মত নিজেই বাড়িয়ে নিতে জানো দেখছি।'

সুনীল মাঝে কয়েকদিন ওদের বাড়ী যেতে পারেনি। সেদিন বিকেলে আরতিদের বাড়ী ঢুকতেই বীথি ছুটে এল।

'এই যে আসুন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল? কতদিন আমাদের বাড়ি আসেন নি বলুন তো! দিদি, মেজদি তো আপনার জন্যে ভেবেই অস্থির।'

সুনীল বলল, 'তাই নাকি!'

বীথি বলল, 'শুনুন সুনীলদা, আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা বলি। কাউকে বলবেন না কিন্তু! দিদির বিয়ে হবে শিগ্‌গিরি—দু'এক মাসের মধ্যে। একজনরা প্রপোজ করে গেছে ওকে!'

সুনীল বলল, 'নতুন খবর তো। তোমার দিদি কি করছে এখন?'

বীথি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'কি আর করবে, কেবল ভাবছে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে। আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না বেশি।'

আরতির বিয়ের সময় সুনীলের ওপরই প্রায় সমস্ত কিছুর ভার পড়েছিল। বিয়ের জিনিষপত্র কেনা, লোক-জন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা, ছাতে সামিয়ানা খাটানো, মেয়েদের পছন্দ মতো শাড়ি-ব্লাউস্ কিনে আনা, সমস্ত কিছুই সুনীলকে করতে হয়েছিল। অবশ্য সে জন্যে পরিমলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর দিক থেকে সুনীলের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

পরিমলবাবু বিয়ের দিন রাত্রেই ওঁর পরিচিতদের বলেছিলেন, 'সুনীল, আরতির বিয়েতে যা করল, নিজের বোনের বিয়েতে লোকে তা করে না। সুনীল না থাকলে আমি এখানে কি যে করতাম।'

সুনীল সেই সময়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল লুচির ঝুড়ি হাতে নিয়ে। ও বলল, 'কি যেসোমশায়, আমি যে আপনাদের কাছের আত্মীয় নই তাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন বুঝি।'

পরিমলবাবু বললেন, 'না, না, সুনীল, তুমি আমাদের সবচেয়ে কাছের লোক। শুধু কি সম্পর্ক দিয়েই আত্মীয়তা হয়।'

সকালবেলা সুনীল আরতির ছোট্ট ঘরখানার বসে বসে হিসেব লিখছিল। কাল সারারাত খাটুনি গেছে ভীষণ। সেই রাত সাড়ে তিনটায় পর ঘুমোবার একটু সময় পেয়েছিল। কিন্তু আবার বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছে ছটার মধ্যে। এখনো দায়িত্ব শেষ হয়নি। সকালের ট্রেণে বর-কনে যাবে। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিতে হয়েছে সুনীলকে। এখন ওদিককার কাজ এরকম শেষ হয়েছে। এইবার বোধহয় ওদের যাওয়ার সময় হয়েছে। মোটর তো অনেকক্ষণ থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রীতি বীথি ও আরো অনেক পরিচিত অপরিচিত মেয়েদের ছুটোছুটি করতে দেখছে ও সামনের বারান্দা দিয়ে। না, এখন আর ওদিকে ও যাবে না। যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। আরতি যাওয়ার আগে একবার দেখা করতে আসবে না? নিশ্চয় আসবে।

সত্যিই আরতি এল প্রীতির সঙ্গে একটু পরে। ফিকে চাঁপা রঙের শাড়ি পরেছে ও। চেহারা একটু শুকনো দেখাচ্ছে। কপালের কাছে চুলগুলো একটু রুক্ষ।

সিঁথির সিঁদুরের রক্তিমা ওর স্বচ্ছ শাড়ির ঘোমটার নিচে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ও দাঁড়িয়েছিল দরজার চৌকাঠের কাছে।

সুনীল বলল, 'এসো আরতি, তোমার নিজের ঘরে ঢুকতেও লজ্জা পাচ্ছো, আশ্চর্য! একেবারে বধূ হয়ে পড়েছো দেখছি।'

আরতি ঘরে ঢুকলো লজ্জাকুণ্ঠিত পায়ে। ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

'আমি এবার যাই সুনীলদা?' আরতি চলে যেতে চাইল।

'সেকি প্রণাম করলে না যে! প্রণাম না করলে আশীর্বাদ করবো না আমি।'

আরতি নিচু হয়ে সুনীলকে প্রণাম করল। ওর চোখে-মুখে একটু বিরক্তির ছায়া নামলো।

সুনীল আরতির হাত ধরল।

'দেখো আরতি আমাদের একেবারে ভুলে যেও না। আমি কিন্তু একবার তোমাদের ওখানে বেড়াতে যাবো। তোমাদের বাড়িতে থাকতে দেবে তো দু'একদিন?'

আরতি ঘোমটার ফাঁকে হাসল।

আরতি চলে যাওয়ার পর বাড়িটা একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। প্রীতি-বীথি দুই বোন কিছুদিন একটু মনমরা হয়েছিল। তারপর আবার সব কিছু সহজ হয়ে এল। আরতি চলে যাওয়ার পর সুনীল ওদের বাড়ি যাওয়া কমিয়েছিল। কিন্তু একদিন প্রীতি অভিমান করে বলল, 'কি সুনীলদা, দিদি চলে গেছে বলে কি আমাদেরও ভুলে গেলেন?'

সুনীল বলল, 'দূর বোকা মেয়ে। দিদি গেছে তো গেছে, তোমরা রয়েছো তো। আসল কথা কি জানো, আজকাল সময় পাই না।'

প্রীতি বলল, 'আমার কলেজের পড়াটা একটু দেখিয়ে দিলে বুঝি ক্ষতি হয় আপনার। দিদিকে তো নোট লিখে দিতেন নিজের ইচ্ছেতে, আর আমি মুখ ফুটে বলছি তাও আপনি দিচ্ছেন না। একে কি বলব?'

সুনীল বলল, 'বেশ কথা দিচ্ছি, কাল থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমাকে পড়াবো।'

প্রীতি সেবার বি-এ পাশ করার পর পরিমলবাবু একটা ছোটখাট অনুষ্ঠান করেছিলেন। খুব বেশি লোকজনকে অবশ্য বলা হয়নি। প্রীতির পরিচিত বন্ধুরা এসেছিল। আর এসেছিলেন পরিমলবাবুর দু'একজন বন্ধু। সুনীলকেও নেমতন্ন করা হয়েছিল।

সুনীল প্রীতিকে বলল, 'প্রীতি, এটা তোমার ভারি অন্যায়। আমি তোমাকে এতদিন পড়ালাম, অথচ আমাকে তুমি একটা প্রাইজও দিলে না।'

প্রীতি হাসল। 'কি আর দেবো বলুন?'

বীথি বলল, 'সুনীলদাকে গোটা দুই রুমাল প্রেজেন্ট-করিস দিদি। আর তা ছাড়া কি করবি বল্?'

ঠিক সেই সময়ে প্রীতির দুজন বান্ধবী এল।

বীথি বলল, 'চলুন সুনীলদা আমরা ওপরে যাই, দিদি ওদের সঙ্গে গল্প করবে এ ঘরে।'

বীথি সুনীলকে নিয়ে ওপরের ঘরে এল।

'সুনীলদা এবার পুজোর ছুটিতে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে চলুন না। খুব ঘুরবো আমরা।'

সুনীল বলল, 'এবার পুজোতে অনেক কাজ আছে। তোমাদের সঙ্গে ঘুরলে আমার চলবে না।'

বীথি বলল, 'যতো বাজে কথা। আপনি ভীষণ মিথ্যে কথা বলতে পারেন। আগের বারও এমনি একটা মিথ্যে কথা বলেছিলেন। না কিচ্ছু শুনবো না, আপনাকে যেতেই হবে।'

'সত্যি বলছি আমার ভীষণ কাজ আছে এবার।'

'আচ্ছা আমি মেজদিকে বলছি। তারপর দেখি কি হয়।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পুজোর ছুটিতে প্রীতি-বীথিরা রাজগীর গেল বেড়াতে পরিমলবাবুর সঙ্গে। সুনীল গেল না ওদের সঙ্গে। একে অফিসের ছুটি বেশি দিন ছিল না, তার ওপর আরো নানা অসুবিধে ছিল। ও ষ্টেশনে ওদের ট্রেণে তুলে দিতে গিয়েছিল। প্রীতি বীথি দুজনেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

বীথি বলল, 'শেষ পর্যন্ত আপনি গেলেন না, আমাদের সঙ্গে। আচ্ছা মনে থাকবে।'

প্রীতি বলল, 'আপনাকে ভাল করে চিনলাম। এত করে বললাম তবু গেলেন না। ক'দিনের জন্যে বেড়িয়ে

এলে কি এমন ক্ষতি হতো আপনার! সোজাসুজি বললেই পারতেন আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে আপনার ভাল লাগে না। অতো ঘুরিয়ে বলার কি দরকার ছিল।'

সুনীল হেসে বলল, 'আমার বলবার কিছু নেই। এখন দয়া করে ওখানে গিয়ে তোমরা দুবোন অভিমান না করে চিঠিপত্র দিও।'

মাসখানেক পরে ফিরে এল ওরা। সুনীল ওদের ফেরার খবর চিঠিতেই জানতে পেরেছিল। বিকেলবেলা দেখা করতে গেল ও। সুনীল দেখল ওখান থেকে ঘুরে এসে প্রীতি বীথি দুজনের চেহারাই আর একটু ভাল হয়েছে। তবে প্রীতিকেই বেশি ভাল লাগল ওর।

বীথি বলল, 'শুনুন সুনীলদা, ওখানে একটা ভীষণ মজার কাণ্ড হয়েছে। আপনাকে বলবো, কিন্তু মেজদির সামনে নয়।'

প্রীতি হেসে ফেলল। তারপর বীথিকে বলল, 'কেবল ফাজলামি। যা এখান থেকে। না, সুনীলদা ও আপনার সঙ্গে ইয়ারকি করছে।'

বীথি ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলল, 'আচ্ছা ইয়ারকি কিনা দু'মাস পরেই বুঝতে পারবেন।'

সুনীল কিন্তু পরের দিনই পুরো কাহিনীটা শুনলো বীথির কাছে। যদিও বীথি সেটাকে অনেক মিথ্যে দিয়ে রঙ চড়িয়ে সুনীলের কাছে বলেছিল তবু মূল কাহিনীটা সত্যি। রাজস্থানে প্রীতির সঙ্গে একটি ছেলের আলাপ হয়েছে। এমন কি তার সঙ্গে বিয়েরও ঠিক হয়ে গেছে ওর। ছেলেটি এঞ্জিনীয়ার। বয়েসও বেশি নয়। রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে দুজনের আলাপ ক্রমে গভীর হয়েছে। বিয়েতেও আপত্তি ওঠার কিছু ছিল না।

প্রীতির বিয়েতেও আবার সুনীলের ওপর সমস্ত কিছুর দায়িত্ব এসে পড়ল। মাসিমা বলেছিলেন, 'কি সুনীল, অন্যের বিয়ে দিয়েই কি তোমার জীবন কাটাবে? এবার নিজের কিছু একটা করো। তোমার মা কবে থেকে বলেছেন, অথচ তাঁর কথা গ্রাহ্যই করো না।'

সুনীল উত্তর দিয়েছিল, 'মাসিমা নিজের ভারই বইতে পারিনা। অন্যের বোঝা বইবো কি করে?'

প্রীতির বর শ্যামলের সঙ্গে সুনীলের আলাপ হলো। শ্যামল ছেলেটিকে সুনীলের বেশ ভাল লাগল। প্রীতির সঙ্গে ওর মনের মিল নিশ্চয় হবে। শ্যামল ছেলেটি গম্ভীর নয়, নিজে হাসতে পারে, অন্যকে হাসাতেও পারে। বেশ কথা বলে।

বিয়ের পরই শ্যামল প্রীতিকে নিয়ে একেবারে পাটনা চলে যাবে। তিন মাসের আগে আর আসতে পারবে না কলকাতার দিকে।

মোটরে ওঠবার আগে প্রীতি অল্প কাঁদছিল বীথিকে জড়িয়ে ধরে। তারপর প্রীতি সুনীলকে প্রণাম করতে গেল। সুনীল তখন ছাদের সাদিয়ানার ঘড়িগুলো খুলছিল। প্রীতি ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুনীল হাতটা ধরে ফেলল নিজের মুঠোর মধ্যে।

'ওকি কাঁদছো কেন? ছি, ছি, এত বড়ো মেয়ে বিয়ের পর কাঁদে নাকি! শ্যামলের সঙ্গে আলাপ হলো। ভারি সুন্দর ছেলে।'

প্রীতি ম্লান হাসল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'সুনীলদা আপনি আমাদের চিঠি দেবেন, কেমন? আর আমি চলে যাওয়ার পর এখানে আসবেন তো?

সুনীল বলল, 'কেন আসবো না? নিশ্চয় আসবো।"

প্রীতি বলল, 'আচ্ছা আমি যাই তাহলে।' প্রীতি কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সুনীলকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি চলে যাচ্ছি বলে আপনার মন কেমন করছে না, সুনীলদা?

সুনীল হাসল। কোন উত্তর দিল না। হঠাৎ আরতি এসে বলল, 'চল্ চল্ প্রীতি, তোর জন্যে আমরা কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। প্রীতিকে নিয়ে চলে গেল আরতি। সুনীল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই তো ওরা যাবে। একদিন আরতি চলে গেছে, প্রীতিও আজ চলে যাচ্ছে, বীথিও একদিন যাবে। তারপর বাড়িটা শূন্য হয়ে যাবে। এখনো কি ও এই শূন্য বাড়িটায় আসবে?

বীথির জন্যে সুনীলকে এখানে আসতেই হবে। বাড়িটা আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্জন মনে হয়। তবু তো বীথি আছে। এর পর?

সুনীল সেদিন বীথির সঙ্গে গল্প করছিল। হঠাৎ বীথি উঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়ান্, দাঁড়ান্ সুনীলদা, আপনার মাথায় পাকা চুল।'

বীথি সুনীলের চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিল। পর পর দুটো পাকা চুল তুলল।

একি, এর মধ্যে আপনার মাথার চুল পেকে গেল!

সুনীল হেসে বলল, 'বয়েসও তো কম হয়নি। তিরিশ বছর অনেকদিন পেরিয়ে গেছি।'

বীথি বলল, 'আবার মিথ্যে কথা আরম্ভ হলো। থাক্ ওসব কথা। এখন একটা কথার জবাব দিন তো। আপনি আজকাল সুবিধে পেলেই আমাদের বাড়ি আসেন না, কেন বলুন তো?

সুনীল বলল, 'কই আসি তো।'

'হ্যাঁ, তাই আজ তিন দিন পর একবার এসেছেন। আজকে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে—চলুন।

সেদিন বীথিকে বেড়িয়ে নিয়ে সুনীল অনেক রাতে বাড়ি ফিরল। বীথিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

সুনীল বাড়ি পৌঁছে দেখল ওর মা তখনো জেগে আছেন।

'এত দেরি হলো! আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। কোথায় গিয়েছিলি?'

সুনীল বলল, 'তোমাকে তো বলেই দিয়েছি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রো না। আমি বীথিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম একটু। তারপর ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হলো।'

সুনীলের মা বললেন, 'আশ্চর্য, ওদের বাড়ির জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা, অথচ নিজের মার কথা চিন্তাই করো না!"

সুনীল খেয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ওর ঘুম এল না। আরতি, প্রীতি, বীথি সকলেই চলে যাবে। তারপর ও একলা। আর ভালো লাগে না। কিন্তু বীথির জন্যে ওকে যেতেই হয়। তাছাড়া সাত বছরের যাতায়াতকে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া যায় না। দাসিমা মেসোমশায় কি ভাববেন? বীথিও কতো বড়ো হয়ে উঠলো এই ক'বছরে। এই তো সেদিন ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াতো মেয়েটা। অথচ সন্ধ্যেবেলা ওকে দেখে কি মনে পড়ছিল সেই ছোট্ট মেয়েটিকে? বীথিও যেন আজকাল আর আগের মতো চঞ্চল নেই। কেমন একটা ধীর-স্থির ভাব ওর মধ্যে এসেছে। তবে হ্যাঁ, ওর হাসিটি এখনো সেই ছোটবেলার মতো। মিষ্টি সুরে মন মুগ্ধ করে।

পরিমলবাবু সেদিন আবার সুনীলকে ডেকে পাঠালেন। বীথির বিয়ের ঠিক হয়েছে। বরের সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নিতে হবে সুনীলকে। সুনীল খবর নেওয়ার ব্যবস্থা করল। ছেলেটি ভালই কাজ করে। স্বভাব-চরিত্রের ত্রুটিও নেই। সুতরাং আপত্তির কিছু নেই। বরপক্ষ থেকে বীথিকে আগেই দেখে গিয়েছিল। তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছিল।

বীথির বিয়েতে অনেকেই এসেছিল। আরতি, প্রীতিও এসেছিল। আরতির ছোট্ট মেয়েটিকে সুনীলের খুব ভাল লাগল। কুমুও সুনীলমামাকে ভীষণ পছন্দ করল। বীথির বিয়েতে হৈ চৈটা একটু বেশি মাত্রাতেই হলো। এই তো শেষ-মেয়ের বিয়ে। এর পর নিশ্চিন্ত একেবারে। তাই পরিমলবাবুও আয়োজনটা কিছু বেশিই করেছিলেন।

বিয়ের পরের দিন বরকনের যাওয়ার কথা। সন্ধ্যের গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হয়েছিল। বীথিকে আরতি, প্রীতি ও অন্যান্য মেয়েরা বেলা সাড়ে চারটের মধ্যেই সাজিয়ে দিল। ট্রেন ছ'টায়। তারপর ফটো তোলার পালা শেষ হলো। বীথির বর শোভন আধুনিক ছেলে। মেয়েদের অযথা অত্যাচারে সে বিরক্তিবোধ করে না! এমন কি প্রীতি যখন শোভনকে ধরে চন্দনের ফোঁটায় সাজিয়ে দিল তখনো সে আপত্তি করল না। বরং প্রীতির সঙ্গে সুযোগ-মতো দু'একটা ঠাট্টা করল।

সুনীল ওসব গণ্ডগোলের মধ্যে ছিল না। দোতলার কোণের দিকের নিরিবিলি ঘরটায় ও তখন ঘুমোচ্ছিল। কাল সারারাত ঘুমোনোর সময় পায়নি। সকালেও কাজ করতে হয়েছে। ওকে ডেকে তুলল আরতি।

সুনীলদা উঠুন। বিকেলবেলা ঘুমোবেন না, শরীর খারাপ হবে। তাছাড়া এবার বীথি যাবে। আপনাকে ডাকছে।

'ও, তাই নাকি।' সুনীল বিছানার ওপর উঠে বসল। আরতি ওর কাছে চলে গেল।

গাড়ির সময় হয়ে গিয়েছিল। শোভন সেকথা

মেয়েদের স্বয়ং করিয়ে দিল। বীথি ভেবেছিল সুনীল নিশ্চয় আসবে। কিন্তু কই এখনো তো এল না। অথচ আরতিকে দিয়ে ও সুনীলদাকে বলে পাঠিয়েছিল। মোটরে ওঠবার আগে প্রীতিকে আর একবার বলল সুনীলের কথা। প্রীতি সমস্ত বাড়িটা খুঁজে এল। না, কোথাও নেই। কোথাও না। চলে গেছে সে।

প্রীতি ফিরে বীথির কানে কানে বলল, 'সুনীলদা নেই, চলে গেছেন বোধহয়।'

বীথি তখন শোভনের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। প্রীতির দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলল, 'নেই? ও আচ্ছা।'

বীথি শোভনের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল। একবার ওদের বাড়ির দিকে ফিরে চাইল মোটরের জানালা দিয়ে। ওই শেষ জন। এর পর বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। শুধু মা, আর বাবা থাকবে। তখন নিশ্চয় সুনীলদা আর আসবে না।

বীথি তবু ভেবেছিল সুনীল অন্তত শেষ মুহূর্তে একবার আসবে। কিন্তু এল না। ও পালিয়েছে। ভয়ে? যে পালিয়ে যায়, সে কি নিজে থেকে ফেরে?

মোটর ষ্টার্ট নিল। বীথি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভীরু, কাপুরুষ!'

শোভন বীথির দিকে মুখ ফেরালো।

'কিছু বলছো আমায়?' শোভন হাসল।

'না।' বীথি ঘোমটা একটু টেনে মাথা নিচু করল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমসৌন্দর্যে চিত্রা ও জীবনদেবতা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম, এ

রবীন্দ্র-কবি-মানসের একটি ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকতার ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে-পাঞ্চজন্যগুলি পড়েছে, তাতে কখনো আছে প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের আনুভূতিক উজ্জ্বলা, কখনো আছে আধ্যাত্মিক প্রশান্তিতে শান্ত ভাবনার লোকোত্তীর্ণ মাধুর্য। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গেই যেন তাঁর কবি-মানস জগৎ ও জীবনকে সর্বপ্রথম নূতন দৃষ্টিতে চিনে নিয়েছিল, জীবন-আকৃতির গভীর আবেষ্টনে বিশ্বজগৎ তাঁর সম্মুখে রূপ-সৌন্দর্যের দ্বারখানি খুলে দিয়েছিল। প্রথম যৌবনের দিনে এই দ্বার দিয়েই কবি প্রবেশাধিকার পেয়ে এক চিরন্তন সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে প্রত্যক্ষ করলেন। মানবীয় চেতনা দিয়ে অরূপ-চেতনাকে গ্রহণ ক'রে একটি অপূর্ব আনন্দরসে অন্তরকে পূর্ণ ক'রে নিলেন। তারপরের যে-অনুভূতি, সে হচ্ছে দিব্যানুভূতি-আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্বিন্দুর অন্তরকে মিলিয়ে দেওয়ার মৌন প্রস্তুতি। কিন্তু এই দিব্যানুভূতিকে বুঝবার পূর্বে আমাদের বুঝে নিতে হ'বে কবির প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির বৈশিষ্ট্যকে।

সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-কবি-মানস প্রেম-সৌন্দর্যের অদ্ভুত এমন একটি রূপসত্তাকে দেখতে এবং বুঝতে চেয়েছেন, যার 'স্পর্শে মর্মান্ত পুলকে রোমাঞ্চ অঙ্কুরিত' হ'য়ে ওঠে, অন্তর কেবল উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে 'অন্তর সীমান্ত প্রান্তে'। সীমার নদী থেকে অসীমের অভিব্যঞ্জনাকে তিনি অন্তরের গভীর গ্রহণ ক'রে প্রেমের এক অনন্ত স্বরূপকে অনুভব করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-কবি-মানস-প্রেমের সীমাবদ্ধতাকে কোনদিন স্বীকৃতি দেয় নি। দেহকে ছাপিয়ে দেহাতীত একটি সৌন্দর্য ও প্রেম-চেতনা হৃদয়ের মূলদেশে যখন জাগ্রত হ'য়ে নূতন একটি মুখরতা সৃষ্টি করেছে, তখনই তিনি মানসসুন্দরীকে কল্পনা করেছেন। এটুকু না ক'রে যেন তাঁর কবি-মানসের উপায় ছিল না। দেহ তাঁর কাছে রূপা-ভূলতাকেই বাঁধে যেন সব চেয়ে বেশি। যৌবন-মুহূর্তের গায়ত্রী দিন-গুলিতে যে-দেহকামনা তাঁর কবি-অন্তরকে বিচলিত ক'রে তুলেছিল, এবং যে-নারীর বাহু, চরণ ও বিভিন্ন অঙ্গের রূপ-বন্দনার সঙ্গে প্রাণের কামনাকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—তাকে ঘিরেই একটি আবেগময় মুহূর্তলোকে হৃদয়ের বেদীতে রেখে ঘিরে থাকল সুন্দরীর ধ্যান-কল্পনায় আত্মমগ্ন হ'য়ে রইলেন। বস্তু নিরপেক্ষ একটি ধ্যানজগৎ তাঁর কবি-হৃদয়ের সম্মুখে যেন অন্তরের অনুভূতিকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে গেল। তাই ঘিরের সমস্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রমূল থেকে একটি নারী মূর্তিকে যেন তিনি আহরণ ক'রে নিলেন, যে-নারীর কোন রূপ সত্তা নেই এই বিশ্ব পৃথিবীর কোন বস্তু বন্ধনের সঙ্গে; অসীমের সুর আর ব্যাকুলতা দিয়ে প্রতিটি অঙ্গ তার গড়া এবং সে শুধু—

নিশুথ পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ছাদ হাতে
বিছাইয়ে শুভ্র-শুভ্র বিরহ শয়ন।

(মানসসুন্দরী—সোনার তরী)

কবি দৃষ্টিতে সে কেবল বিরহ ব্যথাই বিছিয়ে যায়, কারণ তার জন্ম অনন্তকালের ধ্যান আছে ; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে কোনদিনই সে ধরা দেয় না। কবিমনের কাছে সৌন্দর্যের বিগ্রহরূপিণী সে, কিন্তু অ-ধরা মায়ার স্বয়ম্ভূত্বতাও সে কবির ধ্যানের চোখে চিরদিন বিছিয়ে দিয়ে যায়। কবি তাই তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন অন্তরের সুগোপন মেঘে। কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজ, এর পিছনে যেন বহু জন্মের, বহু পরিচয়ের মর্ম-আলাপন নিগূঢ় ভাবে লুকিয়ে আছে, কবি তা' ভুলেন নি, ভুলতে যেন নি তাঁর মানসী প্রিয়াকেও। কবি-হৃদয়ের ভাবগহন সেই 'মানসসুন্দরীর' মধ্যে আছে বলেই সে হ'য়ে উঠেছে রহস্যময়ী। কখনো পূর্বজন্মের কুয়াশাময় সুদূরলোকে তাঁর কবিকল্পনাকে পাঠিয়ে দিয়ে সেই রহস্যময়ীর ঠিকানা সন্ধান করতে চেয়েছেন, এবং সেই সন্ধান-প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় পাঠকের ভাবনালোকে চিরপ্রেয়সী ক'রে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন তাঁর আদর্শগত মানস-প্রেয়সীকে। এই রহস্যময়ী নারীর রূপকে অবলম্বন করেই তাঁর কবিপ্রাণের জাগরণ ও তন্ময়তা—কিন্তু চিরকাল যেন একটি রহস্যের কুয়াশা এই সৌন্দর্যলোককে আবৃত ক'রে রেখে দিয়েছে। 'সোনারতরী' কাব্যের প্রারম্ভিক যাত্রার সোপানে সোনার তরীর যিনি অধীশ্বর তিনিও রহস্যময়—বিশ্ব-প্রকৃতির নিগূঢ় সত্যকে অনুভব করতে গিয়েই কবি সেই রহস্যময়ের পরিচয় লাভ করেছেন—আর কাব্যের শেষে 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' 'সোনারতরী'র রহস্যময়ীর দেহসৌরভে কবি লাভ করেছেন বিশ্বসৌন্দর্যের রহস্যের অনুভূতিতে। একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তব-জীবনের সম্বন্ধেও সত্য নির্ণয়ের প্রয়াস,আর একদিকে বিশ্বসৌন্দর্যের রহস্যময়তায় অবগাহন। এই রহস্যময়ীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে কবি তাঁর সত্যরূপকে বারবার চিনে নিতে চেয়েছেন। সৌন্দর্য ও প্রেমের যে-সত্য তাঁর ভাবজগৎটিকে ব্যাপ্তময় ক'রে রেখে দিয়েছিল, তাই রূপ ধ'রে দেখা দিল 'মানস সুন্দরী-রূপে। মানব-জগতের রূপ-উৎসবে জেগে ওঠে যে কবি-মনের আদর্শগত ভাবমায়রূপিণী, সেই তো মানসী। এই বিশ্বের রূপরসগন্ধগীতিময় প্রতিটি তরঙ্গাভিঘাতে কবিহৃদয়ে সে অপূর্ব অনুভূতির আবেশ জন্ম লাভ করছে, মানসী প্রতিমা তারই স্নিগ্ধ-সুন্দর বাণীরূপ। এই নারীরূপিণী মানসীর মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম বিশ্বসৌন্দর্যের মূলগত ভাবটিকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছেন আর সেইজন্যই সেই মানসী বা মানস সুন্দরী একটি ভাবময়ী অনুপ্রেরণার মতো তাঁর কবি-মানসটিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখে দিয়েছিল,—সে-কথার মধ্যে—

শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি,
নামে বাঁধো-বাঁধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উদ্যান
নয়ন কূলে।
তুমি সে ফুলের ফুলে' গেছি, তাই
এসেছি ভুলে। [ভুলে—মানসী]

কবি মনে করেন তাঁর ধ্যানলোকের সৌন্দর্যময়ী মানসীর ধ্যানে তিনি অকস্মাৎ ভুল ক'রে এসে পড়েছেন, কিন্তু না এসেও তো উপায় ছিল না ! তিনি যে চিরজীবনের 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে' মানসী-প্রতিমাটিকে গ'ড়ে তুলেছেন ! সেইজন্যই তো তাঁর বহুদিনকার সৃষ্টির জগতে লাজে-বাধো-বাধো সোহাগের বাঁশরীর হাসিমুখখানি জেগে উঠেছে। যে-প্রেমের সৌন্দর্যময় ধরণীর কোন নারীর মধ্যে তাঁর আদর্শগত রূপের সন্ধান পেল না, তার এক অপরূপ রূপময়ী মানসী-প্রতিমা গঠন ক'রে নিতেই হবে, আর তার ধ্যানে ভুল ক'রেই হোক, বা যা' ক'রেই হোক আসতেই হবে। কবি এসেছেন এবং তাকেই অবলম্বন ক'রে সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের মধ্যে অনন্তের মাধুরীরা একটি উপলব্ধিতে অন্তরকে ভ'রে তুলেছেন। কবির মানসলোক বা ধ্যানলোক তার স্নিগ্ধ-মধুর স্পর্শে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে বলেই মানসী নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম তাঁকে এত অধিক আকৃষ্ট করেছে। কারণ বিশ্ব-সৌন্দর্যের নারীরূপ ও প্রেম কবির মানসলোকে অসীমতার একটি আস্বাদ সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি 'সোনার তরী' যুগে 'মানস সুন্দরী'র উপলব্ধিতে এসে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে তাকে দেখতে চেয়েছেন। কবিদৃষ্টির কেন্দ্রভূমিতে মর্তের বহুবাঞ্ছিতা বাসনা-কামনাময়ী প্রিয়া বিরাজ করছিল কিনা, তা' জানি নে,—কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যায় : তাঁর প্রেমবোধের উপর অতীন্দ্রিয়তার এক স্নিগ্ধ উত্তরীয় বিস্তার করবার জন্য তিনি মানবীর প্রেমকে এক উর্ধ্বলোকে এনে স্থাপন করেছেন। বিশ্বসৌন্দর্যের পটভূমিকায় একটি মনোময়ী নারী সৌন্দর্যের স্বপ্ন প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তিনি শান্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, আর এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রেমসৌন্দর্যবোধ চিরদিন এক সৌন্দর্যলোককে সন্ধান ক'রে ফিরেছে।

'জ্যোৎস্নারাত্রে' জ্যোতির্লোকের শুভ্র সিংহাসনে যেখানে 'বিশ্ব-মোহিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা' বসে আছেন, সেইখান থেকে নব জ্যোৎস্নাস্রোতে ভেসে এসেছে কবির কাছে নূতন রূপলোকের সংবাদ—আর সান্ত করুণ জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ কবি সৌন্দর্যের মূলীভূত শাশ্বত সৌন্দর্যরূপকে খুঁজে নিতে উৎসুক হ'য়ে ওঠেন। তার জন্য রেখে আসেন একখানি মালা, তার স্থানে হৃদয়কে পূর্ণ ক'রে তুলে 'বাসনার তীরে একা বসে আপন হৃদয় ভেদে' অনন্ত প্রতিমা গ'ড়ে তোলেন। ভাবসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে মনে রূপময়কে। জ্যোৎস্নার যাত্রায়ন-পথে যার অনুভূতি এই বস্তু-পৃথিবীতে রজনীর নিভৃত মুহূর্তে ভ'রে পড়ছে—তাকেই ডেকে বলেন—

আলিঙ্গন স্মৃতি
অঙ্গে ভরিয়া যাও, অনন্তের প্রীতি
বাজাক শিরায় তব। কাটুক হৃদয়
সুখানন্দে। [জ্যোৎস্নারাত্রে-চিত্রা]

সুখানন্দের ব্যাকুলতার অন্তরকে ভ'রে তুলে' অনুভব করতে চান সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নীরব পদচারণাকে। সীমা থেকে অসীমের দিকে, খণ্ড থেকে অখণ্ডের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর কবিমানস, নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূলে যে-শাশ্বত সৌন্দর্যলক্ষ্মী রয়েছে, তারই স্বপ্ন গান করেছে। এই বন্দনাগানের মধ্যেই ফুটে উঠেছে কবির

প্রবল সৌন্দর্য-পিপাসার অপরিসীম ব্যাকুলতা এবং প্রেমের এক সুমহতীর উপলব্ধি। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সে-রস বা আনন্দ-চেতনা একত্র প্রতিমুহূর্তে আপ্লুত ক'রে রাখে, সেই রসসাধনই প্রেমের উপলব্ধিতে হৃদয়কে ভ'রে তোলে। এইজন্যই মনে হয়, সৌন্দর্যবোধের তারে প্রেম যেন একটি সুর। এই সুরের সঙ্গে যেন একটি ধ্যানের যোগবন্ধনও আছে। নিজ হৃদয়ের রস-চেতনার সঙ্গে প্রেমের গভীরতাকে যুক্ত ক'রে নিয়ে বিশ্বের সৌন্দর্যের আদি ভাবটিকে বিশ্বজগতের বুকে বিচিত্র সজ্জায় প্রত্যক্ষ করেছেন, আর 'চিত্রা' বলে তাঁর নাম দিয়ে আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠেছেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অয়ি আলোকে বলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
ছায়ালোকে ফুলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী। [চিত্রা]

রবীন্দ্রনাথের এই চঞ্চলগামিনী 'চিত্রা'কে যখন বুঝতে যাই, তখনই বুঝি—প্রেম এবং সৌন্দর্যবোধ চিরদিন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রেমের মধ্যে যখনই আবেগ বলেই তাকে এমন বিচিত্ররূপে দেখা চলে ও অনুভব করা চলে। এই দেখার দেহাতীত চৈতন্যগত একটি প্রেম-আবেগের আছে বলেই ইন্দ্রিয়জগতের অতীত একটি ভাবসত্তায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীর অপার্থিব প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সুদূর আকাশে শোনা যায় তার সুরের নূপুর ধ্বনি, মন্দ বাতাসের হাওয়ে ভেসে আসে তার অঙ্গগন্ধ, মধুর মুহূর্তগুলির মধুর রাগিণীতে নিখিল চিত্ত বিকশিত হ'য়ে ওঠে। সৌন্দর্যবোধের অন্তঃপ্রেরণায় কবি-প্রকৃতির দিকে চেয়ে এ মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অন্তরিক্ষের বাইরের রূপকে দেখা। সেখানে বিচিত্ররূপিণী আবার প্রেমের চৈতন্যলোকে যে-রূপের উপলব্ধি তিনি করেছেন, সে-রূপের প্রকাশ সীমাহীন নীলগগনের অদূর আলোকে, পুষ্পের আকুলতায় ফুলকাননে তার বিহরণ; সে-সৌন্দর্য যখন হ'য়ে বিশে' আছে নক্ষত্রের মুহূর্তায়, পরে হ'য়ে ফুটে আছে হৃদয়ফুলের মাঝখানে, চির যামিনীর নিঃসীমতায় একক চন্দ্রের আলোক দিয়ে চিত্তগগনকে আলোকিত ক'রে রেখেছে। আর অদূর পাখি, বিপুল বিরতির স্তব্ধতায় একটি শুভ্র হৃদয়ে নিজা থাকে তার বীণাবিনাটিকে জাগিয়ে রেখেছে। সেইখানে চিত্রা কবির অন্তরঙ্গিনী। যার গভীর মৌন মহিমায়, উদারলোকের প্রশান্ত বাসিকে একদিকে তার আলোক-বিস্তৃতির, অন্যদিকে কবির অন্তর গহনে তার নীরব সঞ্চরণ! চিত্রা রবীন্দ্র-কবি-মানসে এমনি করেই সুদূরতার সঞ্চার করেছে, আর অসীমের অভিমুখে চিত্তের ব্যাকুলতাকে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে। কবি-মানসের অন্তর্লোকে শাশ্বত সত্যের এই নারী-প্রতিমাটি একদিকে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর দীক্ষার ক'রে দিয়েছে, অন্যদিকে কবির চিত্তকে সুমহতীর আনন্দ-আধারে পূর্ণ ক'রে তুলেছে। চিত্রা তাই রবীন্দ্র কাব্য জগতে অপরিচিত্রা, সৌন্দর্য-উপলব্ধির নন্দনময়ী রূপ।

চিত্রার সাক্ষাৎ পেয়েও কবি যাকে যাকে অখণ্ড বিশ্বসৌন্দর্যকে খণ্ড রূপে ও মনে অনুভব করতে চেয়েছেন, কারণ লোকোত্তীর্ণ সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্নতার তীব্র কবিমানস যেন বৈচিত্র্যবোধের আনন্দকে হারিয়ে ফেলেছে। তাইAbstract এবং Absolute সৌন্দর্য-স্বর্গ থেকে তিনি মানবী-প্রিয়ার মত সুখদুঃখপূর্ণ মর্ত্যভূমিতে নেমে আসতে চেয়েছেন। বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে আমার মানবী-প্রতিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়ে নয়ন ভ'রে দেখতে চেয়েছেন। 'ফুলনের স্বর্গখণ্ডগুলি' সুখদুঃখময় প্রেমাশ্রুতে চিরস্নাত হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বপৃথিবীর যমুনাকূলে 'রেণুস্মৃতি'-ভরা চাপা ও বেলফুলগুলি, কবি-হৃদয়ের উপকূলে নূতন আলোবাসার রস-আবেদন নিয়ে ফিরে এসেছে। প্রেমের হাতে গাঁথা বহুজনদের মালাখানিকেও খাঁটুক সম্মান দিয়ে বহু-জনতার প্রেমকে ও মহীয়ান করতে চেয়েছেন। আত্মার প্রেম জগতে, নরনারীপ্রেমের মর্ম-রোমাঞ্চে লহরিতে—আনন্দবধূর কণ্ঠে কবি যাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

দুটি বাহু দিয়ে বলো,
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে? [মানস সুন্দরী]

তাকেই সীমার বেদীভূমিতে মাঝে মাঝে স্থাপন ক'রে খণ্ড রূপ-প্রতিমাকে দেখতে চেয়েছেন, আর কবিকণ্ঠে নবতর আবেগ মিশিয়ে বলে' উঠেছেন—

অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হ'তে সর্বময়ী আপনারে
হরিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি? [মানসসুন্দরী]

আবার বলেছেন—

কখনো বা আধখানা কখনো মূরতি।

সৌন্দর্যের বহুরসাশ্রিত ভাবরূপগুলি তাদের আবেগে গ'ড়ে তোলা প্রতিমাকে এমনি খণ্ডিত রূপের মধ্যে মাঝে মাঝে না দেখলেও বুঝি শান্তি পাওয়া যায় না।

তাই চিত্রার যুগে রবীন্দ্র-কবি-মানস এমনি অখণ্ডত খণ্ডের সাধনায়, সীমা এবং অসীমের ভাবসমাধানের দোলায় মধুময় হ'য়ে উঠেছে। 'সোনার তরী' 'বিসর্জনের যাত্রায়' সৌন্দর্যের যে-নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা কবির মনে প্রবল হ'য়ে উঠেছে, চিত্রার 'বিশ্ব দেখে' এসে পার্থিব সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশিয়ে কবি আর একটি চির সুন্দরের ছায়া গ'ড়ে নিয়ে মাঝে মাঝে যেন তাঁই ক'রে নিতে চান। এক ছায়া থেকে আর এক ছায়ে যাওয়ার আসা যাওয়া কবির আর ভালো লাগছে না! চিত্র তারুণ্যময়ী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর হাতের বেঁাওয়ায় ধরিত্রী যেন 'নিরুদ্দেশের' গোধূলি আলোকে স্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছে,—সুদূরের দুরাশার প্রবাস এই বিশ্বপৃথিবীর বুকে যেন এক হ'য়ে মিশে গেছে চাইছে। সুরের ঢেউয়ে যেখানে ঢেউটি জাগছে, তালেরো পথখানি সেতারাতেই গড়ে উঠছে, কাননে প্রাণের ছুটে' যেতে আসা হরণী সেখানে আঁধারের আবরণ জড়িয়ে নিচ্ছে, বেড়া দেওয়া উপবনের কাছে সেখানে সারি সারি গৃহ-নিকেতন,—কবি

সেইখানে বাসা বাঁধতে চান। কারণ এখানকার পথের চিরন্তনী সৌন্দর্যময়ী তাঁর প্রেমতরী ঘটের ছল ছল রব তুলে ককিকে রেখা দিয়ে যান। তাই 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়' কবি যখন প্রশ্ন করেছিলেন—'বলো, কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী'—তখন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানে নিরুদ্দেশ যাত্রার যে রহস্যময় এক আকুলতা কবি-প্রাণকে উতলা ক'রে তুলেছিল। কিন্তু কবি বুঝতে পারেন নি,—

বেলা বয়ে যায়, পালে লাগে হাওয়া,
সোনার তরী ; কোথা চলে যায় ;—

শুধু কেবল বুঝেছিলেন, সামনে আছে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রসারিত করপদ্ম, আর আছে পশ্চিম দিগন্তব্যাপী কেনোচ্ছ্বাসিত অসীম সাগর। সূর্য তখন অস্তাচলে, আকাশ-সিন্ধুর মতো চঞ্চল আলো সেখানে কেবল কাঁপ্‌ছে! আর 'চিত্রা'র 'বিজয়িনী' কবি পার্থিব সৌন্দর্যের মায়া ঘেরা সৌন্দর্যলোকে ফিরে এসেই হৃদয়মধুর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।' কবি হৃদয়ের ব্যগ্র ব্যাকুল সমস্ত অনুভব অখণ্ড ভাবনার স্রোতধারায় ভেসে ভেসে খণ্ডের সীমিত সৌন্দর্যের রূপবন্ধনে বাঁধা পড়ে মাঝে মাঝে আর্ত সৃষ্টি করেছে। এই আবর্তনকুল দ্বন্দ্ব ছিল বলেই রবীন্দ্র মানস পরবর্তী যুগে অতীত ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাঙ্গণে মানস ভ্রমণ করতে পেরেছেন। সেই যুগে তাঁর দৃষ্টি যতটা অন্তর্মুখী; তার চেয়ে অনেক বেশি বহির্মুখী। অনন্তসাগর রূপ সমুদ্রের তল থেকে দৃষ্টিকে তুলে নিয়ে বহির্দিগন্তের ঐতিহ্য গৌরব ও নিজ হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার বৃত্তলীলায় মগ্ন থাকতে পেরেছিলেন।

আমার মনে হয়, 'চিত্রার' বিচিত্ররূপের অনুভাবনাই রবীন্দ্র কবি মানসে নারীর ভাবমূর্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। সীমা অসীমের পটভূমিতে প্রেম সৌন্দর্যের এরূপ গভীর অনুধ্যান না থাকলে নারীরূপের দুইটি দিককে প্রত্যক্ষ করা চলে না। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে নারীর আছে একটি প্রেয়সীরূপ, আর একটি কল্যাণীরূপ। কবিমানসে 'দুঃখ সুখ বিরহমিলন পূর্ণ ভালোবাসা'র মধ্যে যে-লৌকিক প্রেমবোধ, আর 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার' মধ্যে যে-লৌকর্যবোধ, এই দুইটি অনুভূতিই রবীন্দ্র-মানসে একদিকে নারীর প্রেয়সী-রূপ, আর একদিকে কল্যাণীরূপ গঠন করতে সাহায্য করেছে। প্রেমে যখন খণ্ড ভাবের প্রাধান্য এসেছে, তখনই নারীর প্রেয়সী-রূপকে কল্পনা করেছেন—আর অসীমের বাঞ্ছনায় সীমা অসীমের দুইটি দিকেই তাঁর মনোযাতায়ন খুলে' দিয়ে নারীর উর্বশী আর কল্যাণীরূপকে, ভোগময়ী ও ধ্যানময়ী রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর তিনি বলে' উঠেছেন—

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন যেযীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি নয়নভরে রয়েছ দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে

আজ বিশ্বনাথের শান্ত উষায়
বিজন নদীতীরে। [রাত্রে ও প্রভাতে—চিত্রা]

একজন 'বিশ্বের কামনা রাজ্যে রাণী, স্বর্গের অপ্সরী', অন্যজন—'লক্ষ্মী সে কল্যাণী, বিশ্বের জননী তারে জানি।' একজন বহু পুরুষের উপভোগ্য হতে ভবিষ্যৎ টেনে দিয়ে, সংকীর্ণ গৃহকোণ দিয়ে প্রাণ-মন হরণ করে,—পৃথিবীর অন্য কোন সম্বন্ধ সে স্বীকার করে না। অন্যজনের স্নিগ্ধ-মাধুর্যময় পরিবেশে মাতৃত্বরূপধারী শুভ্রোজ্জ্বলরূপ। জগতের সমস্ত সম্বন্ধই তাঁর কল্যাণময় মাতৃত্ব জাতির আত্মসমর্পণের দ্বারাই হয় সম্ভব। যৌবনের যোড়শিয়া একদিকে, অন্যদিকে প্রৌঢ়া সৌন্দর্যময়ীবিশ্বজননীর সমন্বয়। সৌন্দর্যের চিরন্তন যে-উদ্ধামতা আছে, তাকে প্রশান্ত করে উর্বশী, আর একে মঙ্গল স্পর্শে স্নিগ্ধ সুন্দর ক'রে তোলে কল্যাণময়ী নারী। কল্যাণের শুভ স্পর্শে সমস্ত রুদ্র অমঙ্গল ঘুচে মুক্ত গান বলেই সে কল্যাণী! সৌন্দর্যের প্রেমবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নারীভাবাদর্শের কল্যাণীরূপকে বিবিচ্ছভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন,—শুভ্রতার সঙ্গে সুন্দরকে পবিত্রতার একটি মালিকা রচনা ক'রে অন্তরী মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানসসৃষ্টির কান্তি এসে চোখের সৃষ্টির রূপকে কল্যাণ শ্রীতে মণ্ডিত করেছে।

নারীরূপের অনিন্দনীয় পূর্ণতাকে খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবঘনতার স্বর্গলোকে তাঁর সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ আদর্শকে 'উর্বশী'রূপে ধ্যান করেছেন,—আবার প্রেমের অভিধেকে 'মহিয়সী মহারাণী' ক'রে তুলেছেন মানবী চিত্রাকে। রবীন্দ্র-কবিদৃষ্টিতে এইভাবে মানবলোকের সমস্ত বাসনা কামনা, জীবন সত্যের সমস্ত রূপশ্রী নারীরূপের মাধ্যমে ধরা দিয়েছে—যেমন ক'রে সূর্যের আলোক সৃষ্টিতে ধরা দেয় শতদল পদ্মের বিভিন্ন পাপড়ির রূপমাধুরী। রবীন্দ্রনাথ প্রেমসৌন্দর্যের মোহানায় দাঁড়িয়ে নারীর কল্যাণীরূপ ও উর্বশীরূপে জীবন ও সৃষ্টি সত্যকে ধরতে চেয়েছেন।

তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী 'বিজয়িনী' হয়েছে সেইখানেই, যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে পুরুষের রূপধ্যান। একটি নিরাবরণ নারী-বিগ্রহের প্রতি অঙ্গে যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গ লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে বন্দী হয়ে আছে, প্রকৃতির রৌদ্রলেখা তার প্রতিটি অঙ্গেই উচ্ছল স্পর্শ দিয়ে আরো মোহন করে তুলেছে; নবীন বসন্ত প্রথম প্রেমস্পন্দনের মতো তার চারিদিকে একটি সৌন্দর্যের শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছে। আকাশ বাতাস সেবকের মতো তার স্নিগ্ধ তনুকে সেবা দিয়ে স্নিগ্ধ ক'রে রাখছে। প্রকৃতির এই সেবা সেই তনুদেহে জাগিয়ে দিয়েছে এমনি একটি গভীর প্রশান্তি, যাতে পুরুষের রূপধ্যান একটি কল্যাণশ্রী পরিণতিতে সার্থকতা লাভ করেছে। প্রকৃতি এখানে এসে সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য একটি শান্ত মধুর পরিবেশ রচনা করেছে, সেজন্যে খেয়ালালসা নিশ্চিহ্নভাবে ঘুচে যায়, পুরুষের ধ্যান প্রশান্তি সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে শুচিস্নাত স্নিগ্ধ বসনে ঢেকে রাখে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের জগতে প্রকৃতি এসে সৌন্দর্যের পুষ্পাঞ্জলিপী নারীকে ঘুচিয়ে তুলেছে এক লোকাতীত ব্যঞ্জনা দিয়ে, সেই সঙ্গে

প্রেমের ও আসক্তি ঘটিয়ে কবিপুরুষের চিত্তকে অসীমের উপর মুক্তিতে এসে ধ্যানলক্ষ্মির পরিতৃপ্তিতে ভ'রে দিচ্ছে। এইখানে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে প্রকৃতি ও একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে; প্রকৃতি ও সৌন্দর্যী যেন এক হয়ে মিলে গিয়েছে। প্রকৃতিই যেন এই 'বিশ্বরিণী' মায়ীলক্ষ্মে সমস্ত সৌন্দর্য পিপাসার চির অনুভূতির প্রেরণাদিতে এসে হাজির হ'য়ে দিয়েছে। পুরুষের প্রাণের আসনকে ধ্রুব ক'রে দিয়ে অন্তরের চির-নূতনকে জাগিয়ে তোলবার উপাদান জুগিয়েছে। এইজন্যই রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রেম একদিকে সৌন্দর্যবস্তু দিয়ে মানবীকে পাচ্ছে, আর একদিকে পারিপার্শ্বের আবেশ দিয়ে প্রিয়কে দেবতা ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই অনন্তকে দেখার ধ্যান আছে। প্রকৃতির দুই রূপের ব্যাপকতাকে গ্রহণ ক'রে সেই ব্যাপকতর সত্তার সঙ্গে নিজের ধ্যান কল্পনাকে যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। তাই মনে হয়, প্রকৃতির গহন গভীর উৎস থেকেই তাঁর সমস্ত ভাবনা—কল্পনার উদ্ভব। তাই নিজেকে ভুলে' গিয়ে তাঁর হৃদয় ব্যাপকতার মুক্তিতলিকে দিয়ে একটি জগৎব্যাপী গানের মধ্যে অবগাহন করতে চেয়েছে।

এর সঙ্গে একটু চিত্রা কালেই বুঝা যায়, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের গভীরতা থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির জন্ম। প্রেমের বস্তু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে কেবল অবলম্বন ক'রে তাঁর কবি-আত্মা বেশিদিন দূরে থাকতে পারে নি; বিরহের স্বর্গলোক লাভ ক'রে এবং অনন্ত সৌন্দর্যলোকে চির জন্মের এবং সৌন্দর্যধ্যানের বিরহিণী প্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করেও তিনি পরিতৃপ্তি খুঁজে পাননি। মৃন্ময়ের পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অন্তরে সংঘাতময় জীবনের আবর্তে টেনে আনতে হয়েছে,—বিশ্বলোকের মানব-মানবীর জীবনের দুরূহের ইতিহাসকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন; দূর প্রান্তের আগুন-লাগা পিপাসাকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সমস্ত বিশ্বের বিপুলতম পটভূমিকায় সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে দেখতে দেখতে নিখিল বিশ্বের মানব মানবীকে না ভালোবেসে যেন পারা যায় না। তাদের সুখ-দুঃখের অংশভাগী না হ'তে পারলে লোকাতীত সৌন্দর্যানুভূতির গভীরতার মধ্যেও যেন একটি ফাঁক থেকে যায়। মনের তৃপ্তি যেন পরিপূর্ণতার আনন্দে চির প্রশান্তিতে স্তব্ধ হ'তে পারে না। কবি তখন বলেন,—

চিরদিন আঁখিনীরে ধাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, ঘিরেছে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সকল চাহিয়ে। [মানসসুন্দরী]

তখন বিরহের ব্যথা দিয়ে তিনি যেমন মানসসুন্দরী-রূপিণী চির সৌন্দর্য লক্ষ্মীকে সমস্ত বিশ্বের পটভূমিকায় দেখতে পাচ্ছেন, তেমনি সৌন্দর্য-উপলব্ধির কল্পনাকে সংঘাতময় ক'রে বলেছেন।

হে সুন্দরে চঞ্চলা! ধূলাতে যা নদীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলনে যা মোহিনী মায়ার।
বিজন বিষাদ গন অন্তরের নিভৃত ছায়ায়
রেখো না ধরায়ে আর। [এবার ফিরাও মোরে—চিত্রা]

বিশ্বের সুখ দুঃখকে মিথ্যা ক'রে দিয়ে, একমাত্র সত্যকে প্রত্যক্ষ ক'রে রেখে, 'অসীমের জীবনের তরঙ্গে নাচতে নাচতে তিনি নির্জনে ছুটতে চান। সমগ্র বিশ্বের বেদনাতরা অন্তরের ডাক তাঁকে আজ যেন পাগল ক'রে দিয়েছে। প্রাণ-সমুদ্রের তটে কোন্ এক বিপুল প্রাণের জন্মোল্লাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এই দুনিয়ের অন্তর্যাত্রাকে মন্থন ক'রেও কবি তাঁর অভিসারে যেতে চান, যাকে তিনি তাঁর 'জীবন সর্বস্বধন' রূপে ভ'রে অর্পণ করেছেন। তিনি কে? কবির এই 'জীবন সর্বস্ব' অর্পণ করা ধন যিনি, তিনি হচ্ছেন সত্য। এই সত্যকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে দুর্যোগ-আঁধার দিনে জীবনের পথে চলতে চেয়েছেন, এবং নিষ্ঠুর চিত্তের বিচিত্র বিষানুভূতিকে মুক্তাফলেও বরণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই সত্যও কবির কাছে 'বিরূপা সৌন্দর্য-প্রতিমা' হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। এই সৌন্দর্য-প্রতিমার পায়ের তলায় স্বামী তাঁর দান সমর্পণ করেছে, যাঁ বিনাশন দিয়েছে নিজের প্রাণকে, বিশ্ববিলাসী নীলাম্বর দিয়ে তাঁর অঙ্গন প্রান্ত পড়েছে লুটিয়ে। শুধু তাই নয়, যত বাহ্যির একটি পরম রূপে প্রিয়জন-সুখে সেই প্রেমমূর্তিখানি ভেসে ওঠে। তখন সে বিশ্ববিলাসিনী, এবং তার পরের যে-রূপ, সে-রূপ বিশ্বপ্রিয়ার। সমগ্র বিশ্বমানবকে আপন করার মধ্য দিয়েই এই বিশ্বপ্রিয়ার উপলব্ধি ঘটেছে কবির মনে। একান্তভাবে কবির অন্তর বাসিনী বিশ্বব্যাপিনী হয়ে কবিদৃষ্টির দিগন্তে জেগে উঠেছেন। নয়নে তার আনন্দ জ্যোতি, রূপে তার উন্মন মহিমা। তখন যেন জ্যোতিরীধারিকার অন্তর্ধানিনী বেদী বিশ্বানুভাবনার প্রকৃতি। এই বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমেই সমস্ত দুরূহতা যায় ঘুচে, জীবনের সর্ব অসম্ভাব যায় নিশ্চিহ্ন ভাবে ঘুচে। ব্যক্তি-হৃদয়ের সৌন্দর্য-প্রতিমা এমনি করেই 'দুঃখহীন নিকেতনের মহিমালক্ষ্মী' হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। কবি মনে করেন, এই বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যপ্রিয়ার প্রেমেই কবি জীবনের সর্বপ্রকার দুরূহ যেন মিটে যাবে, তেমনি তিমিরাচ্ছন্ন দুঃখবিদারও অবসান ঘটবে। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর এক দানে চিরসুন্দরের বন্দনীমাত্রিকারী রূপলক্ষ্মির পরিস্ফুটন, আর এক দানে বিশ্বপ্রেমার রহস্যের মুক্ত রেখে' সত্যরূপিণী বিশ্বপ্রিয়ার রূপ অঙ্কন। প্রেম ও সত্যবোধ একই সৌন্দর্যময়ীর ভিন্নরূপকে গড়ে তুলেছে। অসীমতার পূজারী রবীন্দ্র-মানসের এ-ছাড়া উপায় ছিল না।

রবীন্দ্র-কবি-মানসে 'চিত্রা'র হাতে-গড়া একটি রূপলোক ও একটি ভাবলোক আছে। রূপলোকে একটি অপরূপা সৌন্দর্যময়ী, ভাবলোকে লোকাতীত সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পদধ্বনি ও জীবন দেবতার আবির্ভাব। সৌন্দর্যানুভূতির ঢেউয়ে বাঁধা-পড়া মানসীকে নিয়ে চিত্রার সাক্ষাৎ, এবং চিত্রাকে অন্তরবাসিনী ক'রে জীবনদেবতার অভিনন্দন লাভ। এই সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের গভীরতাকে যুক্ত নিয়েই রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—'যে কোন জিনিস আমার প্রিয়, তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই বলেই সে প্রিয় তাই সুন্দর।' রবীন্দ্রনাথ চিত্রার মধ্যে নিজ হৃদয়বোধের নিবিড়তায় নিজেকেই গভীরতরভাবে পেয়েছেন,—তাই চিত্রায় ফুটে উঠেছে আত্মভাবনার সমৃদ্ধ সৌন্দর্যবোধ। এই আত্মদর্শনের মধ্যেই নিজ অন্তরের গভীরতম চাওয়াকে খুঁজে নেবার

বাসনা জেগেছে। রবীন্দ্র-কবি মানস সেই আত্মিক উপলব্ধির উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনদেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের যে-জীবনদেবতা, তিনি হচ্ছেন জীবনের গভীরতর স্তরের একটি চেতন সত্তা, আর জীবনদেবতার যে রবীন্দ্রনাথ তিনি হচ্ছেন পঞ্চভূতের বন্ধন থেকে অখণ্ড সামগ্রিকতার আলোকরাজ্যের পানে চিরন্তন অভিযাত্রী। তাঁর অভিযাত্রার পাথেয় হচ্ছে সেই চেতনসত্তার প্রেরণা বা আদর্শ। তাঁরই প্রেরণাতে জীবন ও মৃত্যু এক হ'য়ে মিশে গিয়েছে; কেননা, জন্ম জন্মান্তরের বহু সুদীর্ঘ পথ বেয়ে তার সঙ্গে কবির অন্তর-জগতে পরিচয় ঘটেছে। কবির অন্তরের গভীরে সেই জীবনদেবতা যখন থেকে কবির বুকের তালা কেড়ে নিয়ে প্রাণের সুর দিয়ে নিজেই যেন কথা বলেন। তাই কবি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার—
দেখি তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি। (অন্তর্যামী)

শুধু তাই নয়, কবির 'সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ' নিয়ে সেই জীবন-দেবতা কবির জীবনকে রচনা ক'রে চলেছেন। জীবনের সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে ঐক্যদান ক'রে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে বর্তমান অভিব্যক্তির মধ্যে তিনি কবিকে উপস্থিত করেছেন; তাই সৃষ্টির প্রবহমানতার পথটি ধ'রে বর্তমান জীবনে এসে পৌঁছিলেও নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি কবির মন থেকে মুছে যায়নি। অন্তর্পূর্ণ একটি সৃজনীশক্তির মতো তিনি কবির অন্তরে ব'সে আছেন—কবির সমস্ত কাব্যসাধনার মধ্যেও তিনি যেন একটি প্রেরণা। তাঁর প্রতি কবির প্রেমও তাই অসীম। এইজন্যই কবি সমস্ত প্রাণ দিয়ে জেনে নিতে চান—

লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত,
আমার ধর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজনবাসে।

যদি এ-জগতের আর সব কিছুকে ভালো না লাগে, তবে কবি আজকের এই সত্তাটিকে ভেঙে দিতে চান, তিনি নূতন রূপে, নূতন পোষাক নিয়ে আবার সেই জীবনদেবতার সঙ্গে নূতন বিবাহ ডোরে বাঁধা পড়তে চান। জন্ম-জন্মান্তরের সুগভীর প্রেমবন্ধনে যে দু'জনের হৃদয় বাঁধা! তাই কবির আত্মা মৃত্যুকেও এতটুকু ভয় করে না। মৃত্যুর দ্বারপথ বেয়ে যে তিনি চিরপ্রার্থিত জীবন দেবতার কাছে পৌঁছিবেন,—তিনি জন্মে জন্মে কি যেন আশায় কবিকে নিজেই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন! কবির জীবনের উপর সেই অনিমেষ আনন্দ দৃষ্টির কোনদিনই অবসান ঘটে না। তাই জীবনদেবতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা এসে মিশে গিয়েছে,—মৃত্যুও এসেছে কবির কাছে প্রণয় সুন্দর এক বরমূর্তি নিয়ে। মৃত্যু-মানুষের মধ্যেই যেন কবি প্রাণের অন্তঃপুরকে খুঁজে পেয়েছেন। কারণ জীবনদেবতাই মৃত্যুর দ্বারপথ দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের পথ ধ'রে কবিকে পরিপূর্ণতার স্বর্গলোকে নিয়ে চলেছেন,—নিয়ে চলেছেন রাত্রি যেখানে এসে চির আলোকের দিবসের পারাবারে মিশে যায়। কবির জীবনে জীবনদেবতার ভূমিকা যদি আনন্দের হয়, মৃত্যুর ভূমিকাও পরমতম পরিতৃপ্তির।

আত্মভাবের প্রাবাল্য নিয়েই রবীন্দ্র-মানস জীবনদেবতার আরাধনা আরম্ভ করেছিল, এবং জীবনদেবতা-বোধের মধ্যেই নিজেকে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছে। জীবনদেবতার প্রতি প্রেমদৃষ্টিতে জীবনসৌন্দর্যও অনুরক্ত হ'য়ে ধরা দিয়েছে; জীবনদেবতা তাই কবির কাছে মাঝে মাঝে নারীমূর্তিতে এসে দেখা দিয়েছেন। কারণ, রবীন্দ্র-নাথের মতে, রমণী পুরুষের কাছে শুধু কেবল রমণী নয়, তার মধ্যে রয়েছে বিধাতার তপস্যার আদিম ধ্যানমূর্তি। এই আদিম ধ্যানমূর্তিটিই যুগে যুগে কাব্য ও শিল্পের প্রেরণা জুগিয়েছে। জীবনদেবতাও কবির কাছে তেমনি প্রেরণা রূপিণী! তাই জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা নয়। জীবনদেবতার যদি কোন আসন থাকে, তবে তা' কবির অন্তরতম প্রদেশে! চিত্রা তাই রবীন্দ্র-কবি-মানসে প্রেম সৌন্দর্যের পথটি ধ'রে জীবনদেবতার জন্য সেই আসনটি পাতা দিয়েছে, যে আসনটির কাছে মৃত্যুও সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে!

চিত্রা রবীন্দ্র-কবি-মানসের রূপময়ী সৌন্দর্যপ্রতিমা, আর জীবনদেবতা তার ভাবতত্ত্বের বরমূর্তি। চিত্রা অন্তর বাসিনী, জীবনদেবতা কবির অন্তর জীবনে চিরদিনকার বরণীয়।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—

গত ২২শে নভেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় মৈমনসিংহ গৌরীপুরের জমীদার, খ্যাতনামা স্বদেশ-ভক্ত, দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ২২ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী তাঁহার একমাত্র পুত্র। ব্রজেন্দ্রবাবুও সঙ্গীত ও নাট্যকলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং পরিণত বয়সে বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কুচবিহারের মহারাজার সহযোগে বেঙ্গল জিমখানা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের তরুণগণের নিকট তিনি হয় ত অপরিচিত—কিন্তু গত ৬০ বৎসরের বাংলার সকল সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে ও বিপ্লব আন্দোলনে তিনি যে ভাবে অকাতরে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অসাধারণ। তিনি নিজের সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিয়া দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে রাজসাহীর এক গ্রামে তাঁহার জন্ম—তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে গৌরীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোরের দত্তকপুত্র হন। মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের চেষ্টায় তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের সংস্রবে আসেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের সময় ৫ লক্ষ টাকা দান করেন—তাহার ফলে আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলে ব্রজেন্দ্রবাবুই সর্বপ্রথম একলক্ষ টাকা দান করিয়া-ছিলেন। বৃটীশ সরকার দুইবার ব্রজেন্দ্রবাবুকে মহারাজা উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন—স্বাধীনচেতা ব্রজেন্দ্রবাবু দুইবারই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি শুধু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। 'ভারতবর্ষে' তাঁহার লিখিত বহু সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ক্রীড়া জগতেও তাঁহার বিশিষ্ট স্থান ছিল। ব্রজেন্দ্রবাবু বিরাট ধনী হইয়াও সাধারণের জীবন যাপন করিতেন এবং সাধারণের সহিত মিশিবার সময় তাঁহার অমায়িক, সহজ, সরল ও স্নেহময় ব্যবহারে সকলে বিস্মিত হইত। ব্রজেন্দ্রবাবু সত্যকার ধনীদের এক বিশিষ্ট প্রতীক ছিলেন, তাঁহার মত ব্যক্তির সংখ্যা দেশে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

আসামে নূতন রাজ্য—

আসামের নাগাপাহাড় ও তুয়েন সাং অঞ্চল লইয়া গত ১লা ডিসেম্বর এক নূতন রাজ্য গঠন করা হইয়াছে। রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলির অধীনে একজন কমিশনার উহার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন ও উহাকে তিনটি জেলায় ভাগ করিয়া এক একটি জেলা একজন করিয়া ডেপুটী কমিশনারের অধীন করা হইয়াছে। নাগা পাহাড়ের মোট আয়তন ৪২৯৮ বর্গ মাইল ও তুয়েনসাংএর মোট আয়তন ২০০০ বর্গ মাইল। নাগা পাহাড়ের জন সংখ্যা ২০২৯৫০ এবং তুয়েনসাংএর জনসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। তিনটি নূতন জেলার নাম (১) নাগা পাহাড়—সদর—পাটকিয়—কোহিমা (২) মকোচুঙ—সদর মকোচুঙ ও (৩) তুয়েনসাং—সদর তুয়েনসাং। ঐ অঞ্চলে ১৯টি প্রধান জাতি বাস করে—প্রত্যেকের ভাষা ও সামাজিক রীতি-নীতি স্বতন্ত্র। বহু বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলের বিদ্রোহীরা শাসন কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিয়াছে - এখন তাহাদের উপরই প্রকৃতপক্ষে শাসন কার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত হইল। ঐ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করিতে পারিলে ভারতের বহু খনিজ সম্পদ ও নানা বাণিজ্যিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে—রেল, রাস্তা, খাল, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ফলে অঞ্চলের

অধিবাসীরাও উপকৃত হইবে। যে দল শুধু অন্তাহ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা ক্রমে সভ্য জীবন যাপন করিবে।

কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রেণ—

গত ১লা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা—হাওড়া হইতে সেওড়াফুলী পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ঐ ব্যবস্থা একদিকে তারকেশ্বর ও অন্যদিকে ব্যাণ্ডেল হইয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত চালু করা হইবে। কলিকাতা সহরে আসা যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে—নূতন ব্যবস্থা চারিদিকে চালু হইলে লোকের বহু অসুবিধা ও কষ্ট দূর হইবে। ক্রমে শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, বনগাঁ, লক্ষ্মীকান্তপুর, বজবজ, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি লাইনেও বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা—

গত ২রা ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে পশ্চিম-বঙ্গের শ্রম মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার জানাইয়াছেন—কলিকাতায় হাজার করা ৫৯ জন ম্যাট্রিকুলেট, ১৭·৪ জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ১৫·৪ জন গ্র্যাজুয়েট বেকার আছেন। রাজ্যের সহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা হাজার করা ম্যাট্রিকুলেট ১০৫·৭ জন, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ২৮·৩ জন ও গ্র্যাজুয়েট ২১·৮ জন। গ্রামাঞ্চলের হিসাব জানার জন্য ২টি জেলায় তদন্ত করিয়া জানা যায় সেখানে বেকারের সংখ্যা হাজার করা ম্যাট্রিক—৭ জন, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট—১·২ জন ও গ্র্যাজুয়েট—০·৫ জন। কি করিয়া এই সব শিক্ষিত বেকারকে কাজ দেওয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিয়া সকলে আকুল হইয়াছেন। বড় বড় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার সহিত ছোট শিল্প ও কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষি, গোপালন, পশুপালন প্রভৃতিতে শিক্ষিত বেকারগণকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলিতেছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা সত্বর সম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারত রাজ্যে চাউলের অভাব—

গত ২৬শে নভেম্বর দিল্লীতে লোকসভায় ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন যাহা জানাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীকে চিন্তিত করিয়াছে। এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গ মাইল স্থানে ধান নষ্ট হইয়াছে—তাহাতে ৮ কোটি লোকের খাদ্যাভাব হইবে। বিহার, উত্তর-প্রদেশের পূর্বাংশ, পশ্চিম বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও বোম্বাইয়ে বৃষ্টির খুব বেশী অভাব ছিল। শ্রীজৈন সকলকে জানাইয়াছেন—কোন রকমে খাদ্য আমদানী করিয়া সকলকে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে বটে, কিন্তু সর্বত্র প্রয়োজন অনুসারে চাল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে গম পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু বিদেশী মুদ্রার অভাবে বিদেশ হইতে বেশী চাল আমদানী করা যাইবে না। দুইটি কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য গভর্ণমেণ্ট কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন—(১) ভারতের ঋতু পরিবর্তনের অবস্থা (২) ছোট সেচ ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত না হওয়া। সংবাদটি পশ্চিম বাংলার পক্ষে সত্যই ভয়াবহ—এ প্রদেশে লোক ভাত না খাইয়া থাকিতে পারে না। ভাতের অভাব ১৯৫৮ সালে পশ্চিম বাংলার কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

শ্রীনেহরু ও যৌগিক ব্যায়াম—

গত ১লা ডিসেম্বর পুনায় এক ব্যায়ামাগারে বক্তৃতা-কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—নিয়মিত যৌগিক ব্যায়াম চর্চাই আমাকে কার্য্যক্ষম ও সুস্থ রাখিয়াছে—আমি সামান্য মাত্রায় এই ব্যায়াম করিয়া থাকি—তাহাতে আমার দেহ রোগমুক্ত আছে।" তথায় শ্রীনেহরুকে একখানি তরবারী উপহার দেওয়া হইয়াছে। ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলার লোক খুব কম ব্যায়াম চর্চা করে। তাহাদের পক্ষে শ্রীনেহরুর এই উক্তি অনুধাবন যোগ্য।

বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মিলন—

গত ২৮শে নভেম্বর হইতে কয়েকদিন বিহার রাজ্যের মজঃফরপুর জেলার সদর হইতে ৮ মাইল দূরে তুর্কি নামক স্থানে যাদশ নিখিল ভারত বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানী নয়ী তালিমী সংঘের সভাপতি শ্রীআর্য্যনায়কম্ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন—বিহারের রাজ্যপাল শ্রীজাকির হোসেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন-ধেবর সম্মিলনে বক্তৃতা করেন। গান্ধীজির প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রণালী সমগ্র ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও এবং সরকার ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও কেন সর্বত্র মানুষ বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে না, তাহাই

আছ সকল ডিগ্রীধারী ব্যক্তির ভাবিবার বিষয়। এ বিষয়ে কাজ করিবার জন্য এখনও দেশে একদল স্বার্থত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন। সরকারী ব্যবস্থায় সেরূপ কর্মী প্রস্তুত হয় না—সে জন্য শ্রীঅরবিন্দের মত কর্মীরা দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। টলষ্টয় বা সক্রেটিসের মত বুনিয়াদি শিক্ষাও ভারতের মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা পরিবর্তিত করিবে।

শিবাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

তিন শত বৎসরের পুরাতন প্রতাপগড় দুর্গে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের এক অশ্বারূঢ় মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে—গত ৩০শে নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তথায় যাইয়া মূর্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব করিয়াছেন। শিবাজী মহারাজ ঐ দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি বিজাপুরের নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উৎসবে প্রায় এক লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী শিবাজী মহারাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

কবি বিদ্যাপতির স্মৃতি সৌধ—

খ্যাতনামা ভক্ত কবি বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও সমগ্র পূর্বভারতের লোক তাঁহাকে আপন জন বলিয়া মনে করে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে তাঁহাকে বিশিষ্ট স্থানই দান করা হইয়াছে। আজও বাংলার ঘরে ঘরে তাঁহার রচিত পদ ও গান গীত হইয়া থাকে। সম্প্রতি বিহার গভর্নমেণ্ট তাঁহার জন্মস্থান দারভাঙ্গা জেলার বিনাকী গ্রামে ২১ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সৌধ নির্মাণ করিতেছেন—তাহাতে একটি পাঠাগার ও সভাগৃহ থাকিবে। বিদ্যাপতি ষোড়শ খৃষ্ট শতকে জীবিত ছিলেন। বহু শত বৎসর পরেও যে তাঁহার কথা লোক স্মরণ করিতেছে—ইহাই জাতীয়তা-ব্যঞ্জক মনোভাবের লক্ষণ।

ভারতের রাজ্যসমূহ—

গত ১লা ডিসেম্বর দিল্লীতে সাম্প্রতিক লোক গণনার এক সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়। বোম্বাই বর্তমানে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ—তাহা পাকিস্তানের অর্দ্ধেকেরও বড়। তবে লোক সংখ্যা হিসাবে বোম্বাই দ্বিতীয়—কারণ উত্তর প্রদেশের লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ—বোম্বাইয়ের লোক সংখ্যা তাহা অপেক্ষা দেড় কোটি কম। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর অর্থাৎ রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে মধ্য-প্রদেশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য ছিল—এখন তাহা দ্বিতীয়—তাহার এলাকা ১ লক্ষ ৭১ হাজার বর্গ মাইল—জাপান অপেক্ষা সামান্য বেশী। কেরল পূর্বেও সর্বাপেক্ষা আকারে ছোট রাজ্য ছিল—নূতন ব্যবস্থায় ৯ হাজার বর্গ মাইল এলাকা বেশী পাইয়াও কেরল সর্বাপেক্ষা ছোট রাজ্যই আছে। পশ্চিম বাংলা কেরল অপেক্ষা সামান্য বড়—কেরল ১৪৯০৭ বর্গ মাইল ও পশ্চিম বাংলা ৩৯৮৮৫ বর্গ মাইল। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশ প্রত্যেকের এলাকা ১ লক্ষ বর্গ মাইল। আসাম, বিহার, মাদ্রাজ, মহীশূর ও উড়িষ্যার এলাকা ৭০ হইতে ১ লক্ষ বর্গ মাইলের মধ্যে। জনসংখ্যা হিসাবে আসামের লোক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম—মাত্র ৯০ লক্ষ। অন্যান্য রাজ্যগুলির নূতন গণনার ফলে লোক সংখ্যা এইরূপ—পশ্চিমবঙ্গ—২ কোটি ৬০ লক্ষ, অন্ধ্র—৩ কোটি ১৪০ লক্ষ, বিহার ৩ কোটি ৮০ লক্ষ, কেরল ১ কোটি ৩০ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ—২ কোটি ৬০ লক্ষ, মহীশূর ১ কোটি ৯০ লক্ষ, উড়িষ্যা—১ কোটি ৪০ লক্ষ, পাঞ্জাব—১ কোটি ৬০ লক্ষ, রাজস্থান—১ কোটি ৬০ লক্ষ। দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশের লোক সংখ্যা ১০ লক্ষ করিয়া এবং ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রত্যেকের লোক সংখ্যা ৭ লক্ষ করিয়া। বর্তমানে সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩ শত ৯৪—ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৮টি—তন্মধ্যে শুধু উত্তর প্রদেশে ১১ হাজার গ্রাম। সমগ্র ভারতে ৩০১৮ সহর—তন্মধ্যে বোম্বায়ে ৬২৫টি সহর আছে। অন্য কোন রাজ্যে এত অধিক সহর নাই। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন ব্যবস্থার পর নূতন করিয়া সংখ্যা গণনার প্রয়োজন হইয়াছিল—নূতন গণনার ফল উপরে প্রদত্ত হইল। এ সম্পর্কে প্রকাশিত সরকারী পুস্তকে আরও অধিক তথ্য পাওয়া যাইবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা—

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিবার অর্থের অভাব হইয়াছে। সে জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে অর্থসচিব শ্রীকৃষ্ণমাচারী অর্থ সংগ্রহের জন্য সম্প্রতি

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। আপাততঃ ৩০০ কোটি টাকা প্রয়োজন—ঐ অর্থ দ্বারা উন্নয়ণ পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ করা হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে আমেরিকা বা ইংলণ্ড কেহই টাকা দিতে সম্মত হন নাই। আমেরিকা পাকিস্তানকে বহু পরিমাণ অর্থ দান করিতেছেন; শুধু উন্নয়ণের জন্য নহে, পাকিস্তান যাহাতে সামরিক শক্তি বাড়াইয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে, সেজন্যও প্রচুর অর্থ আমেরিকার নিকট হইতে পাইতেছে। ইংলণ্ডের পক্ষেও মাত্র ২০ কোটি পাউণ্ড ভারতকে প্রদান করা কষ্টসাধ্য ছিল না। এ অবস্থায় ভারতকে সোভিয়েট রাশিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্ট নীতিতে বিশ্বাসী নহে, সেজন্য ঐ টাকা পাওয়া ও লওয়া, উভয় কার্যই কষ্টকর। চীন বা জাপান ধনী দেশ নহে, তথাপি ভারতকে তাহাদের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইতেছে। জগতের গতি কোন দিকে বা ইংলণ্ড-আমেরিকা সত্যই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধাইতে আগ্রহশীল কি না—তাহা আজ বুঝা কঠিন হইয়াছে।

স্কুলের পরীক্ষার সময়—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পরীক্ষার সময় ডিসেম্বরে না করিয়া মার্চ-মাসে করার আদেশ দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীযুক্ত-বি-মিত্র এক সাংবাদিক সম্মিলনে সরকারের ঐ ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী এই ৪ মাস ভাল করিয়া পড়ার সময়—গরম থাকে না—উৎসবাদিও কম। ঐ ৪ মাসে ছাত্রদের ভাল করিয়া পড়াইবার সুযোগ পাইয়া প্রধান শিক্ষকগণ আনন্দিত হইয়াছেন। পূজার ছুটীর বড় উৎসবে ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পায় না—কাজেই ছুটীর পরই বার্ষিক পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হয়। গরমের ছুটী পরীক্ষার অব্যবহিত পরে করিলে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে করিলে ছাত্ররা এক টানা বহু মাস ভাল করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইবে। অবিলম্বে যাহাতে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় ও বিনামূল্যে স্কুলে জল খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য প্রধান শিক্ষক সমিতি সরকারকে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, আগামী এপ্রিল মাস হইতে সরকার এ ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ করিবেন।

বুনিয়াদি শিক্ষা অপরিহার্য্য—

গুজরাট বিদ্যাপীঠের আচার্য্যরূপে তথায় সমাবর্তন উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন—গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত সরকার সে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করার ফলেই দেশ দিন দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রপতি ত একথা বলিলেন—কিন্তু গ্রহণ করিবে কে? সরকারী কর্মকর্তারা বুনিয়াদি শিক্ষার তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করেন না, বুঝেন না। আমরা বহু বুনিয়াদি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুনিয়াদি-শিক্ষণপ্রাপ্ত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও বুনিয়াদির নীতিতে বিশ্বাস করেন না। মাত্র চাকরী হিসাবে তথায় কাজ করেন—কার্য্যে আন্তরিকতা নাই। এ অবস্থার পরিবর্তন কবে হইবে?

গম আমদানী—

ভারতের খাদ্যাবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। একদিকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা জনগণের আগ্রহের অভাবে আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে না, অপর দিকে দৈব-দুর্বিপাকে বহু শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সে জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া চাল ও গম আমদানী করিতে হইতেছে। কানাডার মন্ত্রী মিঃ ব্রাউন দিল্লীতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা অবিলম্বে ভারতকে ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যে কানাডিয়ান গম সরবরাহ করিবে। কিন্তু এইভাবে কতদিন ভারতকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের বৃদ্ধি—

ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গত কয় বৎসরে নূতন বি-টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এ বৎসর সরকার ২টি নূতন কলেজ খুলিবেন—একটি বেলুড়ে ও অপরটি কল্যাণীতে। দুইটিতে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। সেজন্য এককালীন ২১ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ২টি কলেজ হইতে প্রতি

বৎসর ১২০ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে। ফলে বৎসরে ১২৫০ জন উচ্চ-বিদ্যালয় শিক্ষকের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল।

ভারত সাধু সমাজ—

২ বৎসর পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় ভারতবাসী সন্ন্যাসীদের লইয়া ভারত সাধু সমাজ গঠিত হইয়াছে। গত ২রা নভেম্বর আমেদাবাদে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত সাধু সমাজের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় এক হাজার সাধু, সন্ত ও মণ্ডলেশ্বর সন্ন্যাসী তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু বলেন—ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় এবং বাঁধ নির্মাণে এঞ্জিনিয়ারগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, জাতির নৈতিক মান-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঐরূপ ভূমিকা গ্রহণের জন্য সকল রাষ্ট্রে সাধু সমাজ গঠিত হউক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। জাতিগঠন কার্যে আজ ভারতের প্রত্যেক মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছে। সন্ন্যাসী সমাজকে এ কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়া রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। কি ভাবে সন্ন্যাসীরা কাজ করিবেন, তাহা তাঁহারাই স্থির করিয়া লইবেন।

নেতাজীর মৃত্যুরহস্য—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয়নাথ বসু পূজার সময় ২ সপ্তাহের জন্য জাপানে যাইয়া নেতাজীর মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। নেতাজী সম্বন্ধে সরকারী কমিটীর তদন্ত-বিবরণ তিনি ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ব্যারিষ্টার বসুর ধারণা উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই। নেতাজী এখনও জীবিত আছেন কি না, সে বিষয়ে অমিয়নাথ কোন মন্তব্য করেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন—জাপানীরা সেখানে নেতাজীর নামে একটি বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান করিতে চাহে। বর্তমান সময়ে এক দিকে চীন ও জাপান এবং অপর দিকে ভারত—এই দেশগুলির মধ্যে যাহাতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনটি দেশের লোকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান যাহাতে বাড়ে সে জন্য সকলের বিশেষ চেষ্টা করা কর্তব্য। নেতাজীর স্মৃতিতে সেইরূপ কার্যের জন্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে তিনটি দেশের লোকই উপকৃত হইবে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

দার্জিলিংয়ে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিদের এক সম্মিলনের ফলে ভারতের সর্বত্র পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জমী পাওয়া গিয়াছে। সে সকল জমী দেখিবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মহীশূরে সফর করিবেন। বিহারে ১১ হাজার একর জমী দখলে আসিয়াছে ও আরও ১১ হাজার একর দখলে আসিবে। বোম্বায়ে ৬ শত একর জমী পাওয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশে ৫০০ কৃষি পরিবারের বাসের ব্যবস্থা হইবে। রাজস্থানে ৫ হাজার একর জমী পাওয়া গিয়াছে, আরও ৫ হাজার একর পাওয়া যাইবে। মহীশূরে ৮ হাজার একর পাওয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার মালকান গিরিতেও হাজার একর ও কালাহাণ্ডিতে ২০ হাজার একর জমী পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরায়ও নূতন ৮০ হাজার একর জমী পাওয়া যাইবে। পশ্চিম বঙ্গে জমীর অভাব অত্যন্ত বেশী। উদ্বাস্তু ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গবাসী কেহ যদি অন্য প্রদেশে জমী লইতে ও বাস করিতে সম্মত হন সরকারের তাহাতেও সম্মত হওয়া উচিত। পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ী অধিবাসীদেরও আজ পুনর্বাসন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

উদ্বাস্তু সমস্যার কথা—

হাওড়া মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর এক সাধারণ সভায় উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করিয়া উহার পর পূর্ববঙ্গ হইতে আগতদের উদ্বাস্তু বলিয়া গণ্য না করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সভায় বলা হইয়াছে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। পরদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারিত এক আদেশে বলা হইয়াছে যে, যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের বা পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ বা চাকরীতে নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহাদের নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে সকল পরিবারের পুনর্বাসন হইয়াছে বা যাহারা আংশিক ভিত্তি দিয়া স্থায়ী,

তাহাদেরও আর আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে না। যে সকল উদ্বাস্তু সরকারের পুনর্বাসনের প্রস্তাব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে তাহাদের আর উদ্বাস্তু শিবিরে থাকিতে দেওয়া হইবে না ও তাহাদের নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে না। এই আদেশ অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে দেশের শাসন কার্য্যে বাধা উৎপন্ন হইতেছে।

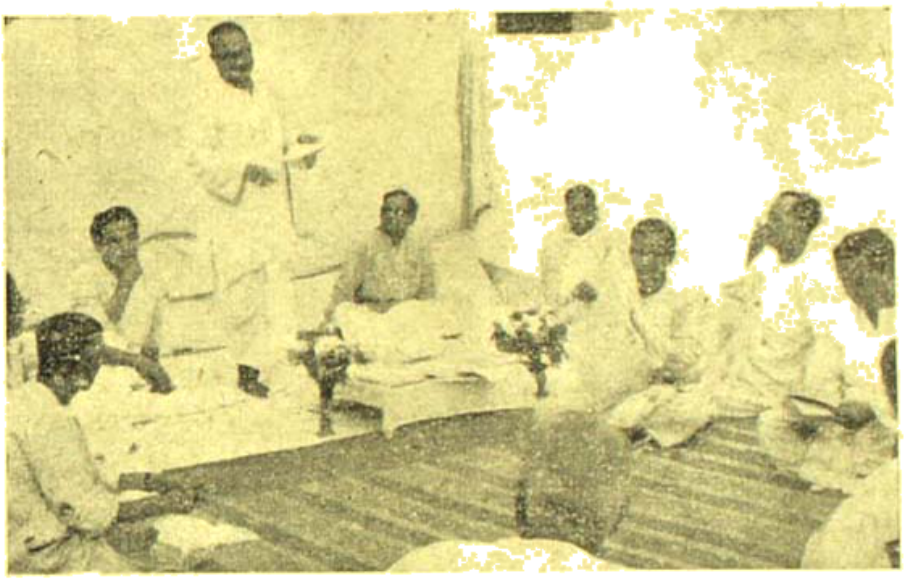

২৩ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের বিজয়া সম্মিলনে (অভ্যন্তরে) সমবেত সাংবাদিকবৃন্দ

পাকিস্তানে বাংলা ভাষা শিক্ষা—

করাচীতে পাকিস্তানের নূতন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী নূরুল রহমন নির্দেশ দিয়েছেন যে অতঃপর পাকিস্তানের রাজধানী করাচীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে উর্দু ও বাংলা উভয় রাষ্ট্রভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত শুধু উর্দু ভাষার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। করাচীতে ২ হাজার বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী আছে—সেজন্য অবিলম্বে মন্ত্রীর নির্দেশ কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী—

স্কুল ফাইনাল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ৫৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বৎসর বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী বৎসর ঐ সংখ্যা বাড়াইয়া ১১০০ করা হইবে। যোগ্যতা ও দারিদ্র্য—দুইটি বিষয় সর্বত্র বিবেচিত হইবে। পারিবারিক আয় মাসিক ৪ শত টাকার অনধিক হওয়া দরকার। আই-এতে ১২ টাকা, আই-এস-সি ২০ টাকা, বি-এতে ২০ টাকা ও বি-এস-সিতে ২৫ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা বহু দরিদ্র ছাত্রকে উপকৃত করিবে সন্দেহ নাই।

কালনায় স্মারক স্তম্ভ—

বুদ্ধ জয়ন্তীর স্মারক হিসাবে বর্দ্ধমান জেলার কালনা সহরে স্থানীয় অঘোরনাথ পার্কে একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব সমিতির সভাপতি শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় মহাবোধী সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ ঐ উৎসবের উদ্বোধন করেন। বাংলার মফঃস্বল সহরে এইভাবে বুদ্ধ-জয়ন্তীর স্মারক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া কালনাবাসীরা নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালনাবাসী শ্রীরাসবিহারী সেনের নেতৃত্বে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় জমীর সন্ধান—

পশ্চিম বাংলার কয়েকটী জেলার তদন্ত করিয়া প্রায় ২ লক্ষ একর অনাবাদী ও পতিত জমীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ জমীর উন্নতি বিধান করা হইলে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু তথায় বাস করিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। জমীগুলি সংস্কার করিতে কিছু বেশী টাকা ব্যয়

হইবে। উহার এক দফা একর জমীতে তাল ও নারিকেল চাষ করা যাইবে। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ঐ জমী অবস্থিত।

ভারতের প্রতিনিধি শ্রীরুফমেনন বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—১৯৪৬ সালের ৪ঠা মে তুরস্ক ও ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুন ইরাক ভারতবর্ষকে জানাইয়াছে যে,

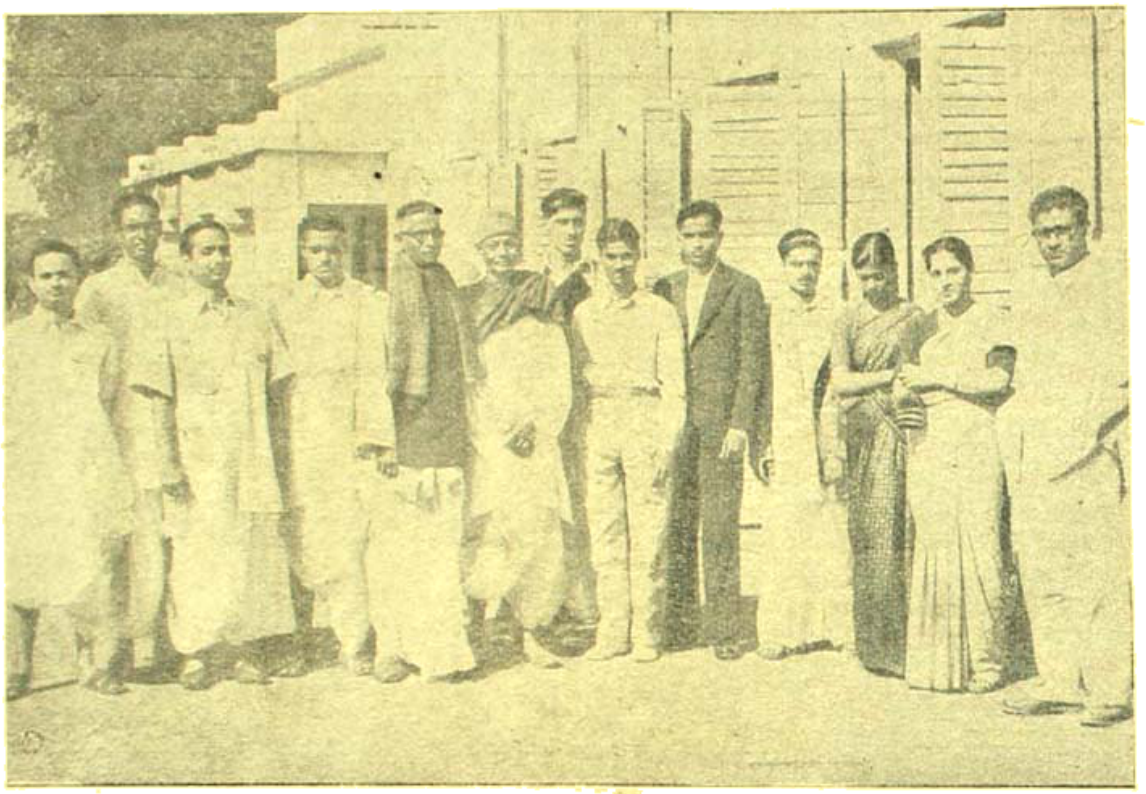

জাতীয় ঘরির সম্মেলন

বাম হইতে—৮ম—শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, ৯ম—ডাঃ সন্তোষনাথ রায় সভাপতি জাতীয় ঘরির সম্মেলন।
১ম শ্রীমদনমোহন পাল সাধারণ সম্পাদক জাতীয় ঘরির সম্মেলন

ভারতীয় মহিলার সম্মান—

পশ্চিমবঙ্গ বাটানগর নিবাসী ভারতীয় মহিলা শ্রীমতী লায়লা শেঠের বয়স ২৮ বৎসর—তাঁহার ২ সন্তান। তিনি ২৬শে অক্টোবর বিলাতে ব্যারিষ্টার বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এবারের ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম লক্ষ্ণৌ সহরে। এই ভারতীয় মহিলার অসাধারণ সম্মানলাভে ভারতবাসী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

ইরাক ও তুরস্ক ভারত-বিরোধী—

গত ৭ই নভেম্বর নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কাশ্মীর সমস্যার উভয় দেশের স্বার্থ আছে—কারণ ঐ সমস্যা বাগদাদ চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ 'পাকিস্তানে'র উদ্বেগ ঘটাইতেছে। উহা ভারতবর্ষ 'সামরিক হুমকী' বলিয়া মনে করে। বৃটেন বাগদাদ চুক্তির পূর্ণাঙ্গ সদস্য ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঐ চুক্তির সামরিক কমিটির সদস্য। কাজেই ইরাক ও তুরস্ক ভারতের বিরুদ্ধে যে হুমকী জারি করিয়াছে, তাহার পিছনে মার্কিণ ও বৃটেনের সমর্থন আছে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীজহরলাল নেহরুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তলে তলে বহু দেশ যে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিরোধ বাধাইবার জন্য সচেষ্ট, এই সংবাদে তাহাই প্রমাণিত হয়।

মালা সিনহা বলেন, "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এত শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!"

উজ্জ্বল কালো চোখ, লাবণ্য, সব মিলিয়ে মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মতনই মালা সিনহা ব্যবহার করেন বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান—তিনি পছন্দ করেন মোলায়েম, সুগন্ধ এই সাবানটি।

আপনিও এই বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিন! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যের জন্যে এবং খরচ বাঁচাবার জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

বসিরহাটে গোবিন্দ মন্দির—

মহারাজা প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনিয়া যশোহরের নিকট গোপালপুরে তাহা

বসিরহাটের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ

প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান হইবার পর ঐ মূর্ত্তি বসিরহাটে আনিয়া টাকী রোড ও সার রাজেন্দ্র রোডের

বসিরহাটে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জি প্রভৃতি

চৌমাথার নিকট পূজিত হইতেছেন। গত ১লা অগ্রহায়ণ মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক উৎসবে ঐ মূর্ত্তির জন্য মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উৎসব হইয়াছে। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উৎসবে প্রধান অতিথি হইয়া মূর্ত্তির ইতিহাস বিবৃত করেন। বর্ত্তমানে রাজা শ্রীলালমোহন রায় ও শ্রীনেপালচন্দ্র রায় বিগ্রহের সেবাইত। তাঁহারা উদ্যমী ও অর্থহীন। যাহাতে মন্দির নির্ম্মাণ সুসম্পন্ন হয়, সে জন্য বসিরহাটের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে অর্থ সাহায্য করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। সেবাইতগণ অর্থগ্রহণ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রমদান

ভারতের প্রাণ ভারতের গ্রাম। এই বিশাল দেশের সর্বত্র যে বিপুলসংখ্যক গ্রাম ছড়িয়ে রয়েছে; সহর ও সহরতলীর বাইরে গেলেই যাদের চোখে পড়ে—সেই সমস্ত অনাবৃত, অবহেলিত, অপরিকৃত গ্রামগুলির সর্ববিধ উন্নতি হওয়া উচিতই শুধু নয়, অতি আবশ্যকীয়ও বটে। সুখের বিষয় আধুনিক গ্রামবাসীরাও এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছেন, আর শ্রমদানের মাধ্যমে বাল-বৃদ্ধ সকলেই গ্রামোন্নয়নে সাহায্যও করছেন। এখানে উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামের এক বৃদ্ধ চাষীকে হাস্যমুখে গ্রামোন্নয়নের কাজে মাথায় ঝুড়ি বইতে দেখা যাচ্ছে।

গল্প

মরু স্বপ্ন

নৃপেন সরকার

"ইয়া ছাবিবতি, এগ্রি, এগ্রি, এগ্রি ইয়া ইং" (ওগো প্রিয়া, জাগো, জাগো, জাগো)—মরুভূমির বুক চিরে বাঁশীটা উঠলো বেজে দূর "ওয়েসিস্"টার মাঝ থেকে। জ্যোৎস্না রাত—রাত তখন দুটো। শেষ রাতের প্রহরী বদল চচ্ছিল বুটের খট্ খট্ আওয়াজের ভিতর। তাঁবুর ভেতরের স্তব্ধ বাতাস যেন উতলা হয়ে উঠেছে। জানিনা কখন উঠে বসেছি। আস্তে আস্তে ড্রেসিং গাউনটা চড়িয়ে রিভলবারটা গাউনের পকেটে রেখে বেরিয়ে পড়লুম ওয়েসিস্টার দিকে।

ধপধপে জ্যোৎস্না রাত। মরুর বালুগুলোর ওপর আজ কে যেন নোতুন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। দূরের বেদুইনদের তাঁবু থেকে মাঝে মাঝে হুল্লার রেশ ভেসে আসছে রাতের হাওয়ায় ভর করে। ওরা বোধ হয় বড় রকম কিছু লুঠ করেছে—তারই উৎসব; সব কিছু ছাড়িয়ে কিন্তু বেজে চলেছে বাঁশী করুণ সুরে সেই ওয়েসিস্টার মাঝ থেকে।

জলের ধারে খেজুর গাছের সারি। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে চব্বিশ কি পঁচিশ বছরের এক বেদুইন—সেই বাঁশী বাজাচ্ছিল। পরণেকাল লম্বা ঝুলের জামা—মাথায় সাদা চাদরের ওপর কাল কাল দড়ির প্যাচ। অজানা শিল্পী যেন বছরের পর বছর ধরে পাথর খুদে তাকে মূর্তি দিয়েছে। অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। আমার সম্বোধনের উত্তরে "আলে কুম সালাম"—তোমার শান্তি হোক—বলে তারই পাশে বসতে ইসারা করলো, আরবী ভাষাটা বেশ ভাল করেই জানা ছিলো—চার বছর লড়াই করতে এসে থাকতে হয়েছে মরুর বুকে এই বেদুইনদের মধ্যেই। তাই আলাপ জমে উঠতে সময় লাগলো না বেশীক্ষণ। এ কথা সে কথার পর যখন বাঁশীর কথা উঠলো, দেখি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখ। চাঁদটা হঠাৎ যেন আরো বেশী জ্যোৎস্না ঢেলে দিল, তার ঠোঁটের একটু বাঁকা হাসি সেই আলোতে মনের মধ্যে অজানা ভয় ও আনন্দের একটা মেশানো ভাবই যেন তুললো জাগিয়ে।

"জান, রদিক্ (বন্ধু)"—বলতে সুরু করলো সে, বাঁশীটাকে তার সবল হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে—"তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিলো আমেদ শেখের দল থেকে। আমেদ শেখ তো লড়াইতে হেরে গেল, আর মেয়েদের ফেলে পালিয়ে বাঁচালো জান্। যখন ভাগাভাগি আরম্ভ হলো—সর্দার আবদাল্লার প্রিয় ছিলুম খুবই, তার সব চাইতে খুব সুরুৎ বলে তাকে দিলো আমার ভাগে। সব সময় চুপ করে মুখ বুজে থাকতো পড়ে সে। বন থেকে দল ছাড়িয়ে ধরে আনা গ্যাজেল হরিণীর মতন —পুরানো দলের কথা ভাবতো তাঁবুর কোণে বসে। যখন কিছুতেই তার মন পেলুম না, তখন শেষ শরণ নিলুম এই বাঁশীর। ছোট বেলায় উট্ চড়বার সময় সখ করে শিখেছিলুম, আজ তা কাজে লাগলো। তার মনের সঙ্কোচ আস্তে আস্তে গেল কেটে, বাঁশীতেই তার যত লোভ বিশেষ করে এই চাঁদনী রাতে।

ঠিক এই গাছের নীচে বসে আমি বাজাতুম—আর সে—সে আমার কোলে মাথা রেখে তার ভাসা ভাসা চোখ দুটোতে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ্ করে শুনতো। দূরের ওই তারাটা অমনি করেই জ্বল জ্বল করে উঠতো—খানিক বাদে আশমানে যখন লালচে রোশনাই উঁকিঝুঁকি মারতো, নমাজের আজানের আওয়াজ পেতুম, দুজনে ফিরে যেতুম তাঁবুতে। বছর গেল কেটে। দমকা ঝড়ের মতন আচমকা শেখ আমেদ হাম্লা (আক্রমণ) করলো একরাতে বদলী নিতে। কেউ ছিলুম না তৈরী। তাকে পিছনে রেখে লাগতুম লড়তে।

কোত্থেকে একটা সড়্‌কি এসে লাগলো তার বুকে, ফিরে যেই বাঁচাতে গেছি সঙ্গে সঙ্গে আমারো বুকে পড়লো একটা সড়্‌কি। দুজনে দুজনকে বুকে জড়িয়ে পড়লুম। আর এই দুনিয়ার ভোরের আলোয় নমাজের আজান শোনেনি। বাঁশীটা কিন্তু সে হাত থেকে ছাড়েনি। সেই রাতই হল আমাদের মিলনের শেষ রাত; এইখানে, ঠিক এই গাছের নীচে। তাই জ্যোৎস্না রাতে এখনো তাকে জাগিয়ে দিতে আসি—এখনো বলি জাগো জাগো, জাগো প্রিয়া, আমাদের পুরানো সেই দুনিয়ায়—"

গাছের পাতাগুলো হঠাৎ যেন বিশ্রীভাবে মড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠলো। মরু ঝড় হয়েচে সুরু। দূর থেকে ঘূর্ণি বালু চার ধার অন্ধকার করে আমাদের দিকে ছুটে আসছিলো। হঠাৎ দেখি বেদুইন ছেলেটা নেই—খেজুর গাছের নিচে বসে আছি আমি একা। সে গেল কোথায়? রফিক, রফিক বলে ডাকলুম কতো—কেউ কোথাও নেই, খালি দূর থেকে মরু ঝড়ের সোঁ সোঁ আওয়াজ। তারপর—যখন চোখ খুললুম, দেখি আমি মিলিটারী হাসপাতালে। রাতের মরু পেট্রলপার্টি ওই ওয়েসিসের মধ্যে নাকি আমায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে—তারাই তাড়াতাড়ি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিল হাসপাতালে।

তারপর কতদিন গেছে কেটে—কিন্তু এখনও চাঁদনি রাতে যখনই আকাশের দিকে তাকাই মনে পড়ে আরব-মরুর সেই রাতের কথা—এখনো শুনি সেই বেদুইনের বাঁশী বেজে চলেছে "ই আবিবাতি, এগ্রি, এগ্রি, এগ্রি ই ই (ওগো প্রিয়া, জাগো, জাগো, জাগো)।"

[লেখক তাঁর ১৯৪১-১৯৪৩ সালের সৈনিক জীবনের কালে ইরাকের মরুভূমিতে এই গল্পটি লিখেছিলেন]

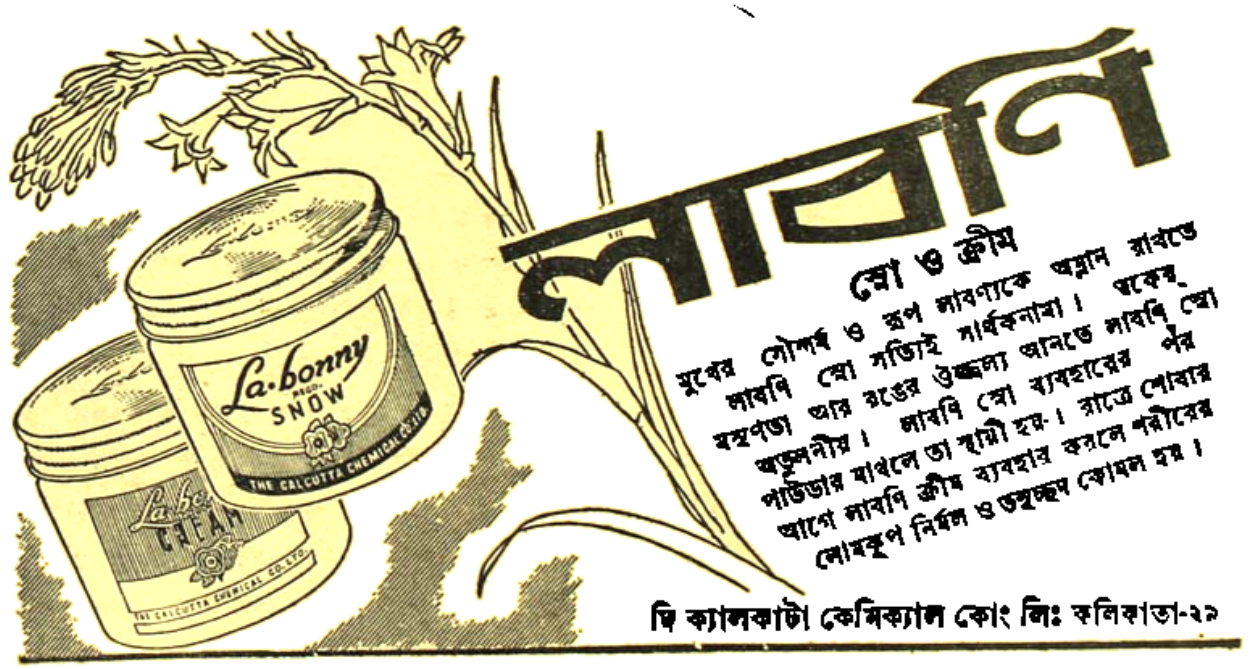

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

বিজ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য সত্যের সন্ধান। এই সাধনার ক্ষেত্রে জাতি-ভেদ নাই; জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মনুষ্য সমাজের পক্ষ হইতে সাধকবৃন্দ প্রকৃতির গোপন তথ্যের সন্ধান করেন। সে সন্ধানে কোনও বিশেষ জাতির বিজ্ঞানী সাধনা অর্জন করিলে তাহারও উল্লেখের বা গর্বের সঞ্চার হইবার কথা নয়। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্থান সেখানে নাই; জাতীয় জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। কিন্তু মনুষ্য-জাতির চরিত্র আজ বিকৃত: স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাস মানুষ হারাইয়াছে, সমবন্ধুত্বের এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সর্বক্ষণ তৈয়ারী হইয়া প্রস্তুত হইতেছে। স্বভাবতঃ, এই সমাজে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের বিচার হয় সর্বাপেক্ষা সমরায়োজনের উপর—সে সাফল্যের প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিতে,—সত্যের প্রতিষ্ঠা সেখানে আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। গত অক্টোবর মাসে রুশিয়া যখন রকেটের সাহায্যে আকাশে প্রথম উপগ্রহ (রুশ নাম স্পুটনিক) নিক্ষেপ করে, তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার সে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের বিচার হইয়াছিল সমরায়োজনের দৃষ্টিতেই। নভেম্বর মাসের প্রথমে রুশিয়া একটি বৃহত্তর উপগ্রহ (বা স্পুটনিক) শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া সমরায়োজনে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আরও বেশী বিস্ময় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয় "স্পুটনিক"—

গত ৩রা নভেম্বর রেডিওর ঘোষিত হয় যে, সোভিয়েট রুশিয়া আধ টন ওজনের একটি স্পুটনিক শূন্যে নিক্ষেপ করিয়াছে; জীবদেহে মহাশূন্যের প্রতিক্রিয়া জানিবার জন্য উহাতে একটি কুকুরও পাঠান হইয়াছে। দ্বিতীয় স্পুটনিকের গতিবেগ প্রথমটির মত ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল; উহা ৯০০ মাইল উপর দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রথম স্পুটনিক ৫৬০ মাইল উপর দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এবং প্রতি ৯৬ মিনিটে উহার একবার প্রদক্ষিণ শেষ হইতেছিল। দ্বিতীয়টি আরও বেশী উপর দিয়া ঘুরিতে থাকায় উহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার সময় ১০৫ মিনিট। প্রথম স্পুটনিক নিক্ষিপ্ত হইবার পর মার্কিণ বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহার প্রতি পাউণ্ডের জন্য এক হাজার পাউণ্ড করিয়া রকেট প্রয়োজন হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে আধ টন্ ওজনের স্পুটনিকের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ রকেট আকাশে নিক্ষেপ করা একরূপ অসম্ভব। এখন নিশ্চিত জানা গিয়াছে যে, রুশিয়া এক নূতন শক্তির সাহায্যে আকাশে স্পুটনিক নিক্ষেপ করিতেছে—সে শক্তির সন্ধান অন্য কোনও দেশের বৈজ্ঞানিকের জানা নাই।

রুশ বিপ্লবের ৪০শ বার্ষিক অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে রুশিয়া এই অনুষ্ঠান-সপ্তাহেই দ্বিতীয় স্পুটনিক নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক বক্তৃতায় মঃ ক্রুশ্চেভ স্পুটনিক নিক্ষেপে "রুশিয়ার বিজয়ের" জন্য আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিলেও যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য আগ্রহ জানান; আলোচ্য-আলোচনার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক আহ্বানের সুস্পষ্ট প্রস্তাবও করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কোনও গুরুত্ব দেন নাই; উহা নাকি আন্তরিকতাবিহীন প্রচার মাত্র। রকেট নির্মাণে ও উহার ক্ষেপণ-পদ্ধতিতে রুশিয়ার বিরাট সাফল্য অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় তাহার যে প্রাধান্যের সূচনা করে, তাহাতে আমেরিকার গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পাশ্চাত্য শক্তি-বর্গকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য পক্ষ কম্যুনিষ্ট দেশগুলি অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে অধিকতর শক্তিশালী—আণবিক অস্ত্রের পরিমাণ তাহাদের এত বেশী এবং এত দ্রুত তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কম্যুনিষ্ট দেশগুলি তাহাদের নাগালের বাহিরে থাকিবে না। ইহার পর তিনি জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আণবিক অস্ত্রসজ্জার এক ভয়াবহ বিবরণ শুনাইয়াছেন। এই বিবরণ শুনিয়া কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি আতঙ্কিত হউক, আর না-ই হউক, আমেরিকার মিত্ররাষ্ট্রগুলি উহাতে আদৌ বোধ করিবে না। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি হয়, তাহা হইলে আণবিক অস্ত্রের অবাধ ব্যবহার আজ সুনিশ্চিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র আণবিক অস্ত্রের আঘাতে শত্রুপক্ষ-ঘাঁটীগুলি চূর্ণ করাই হইবে প্রতি-পক্ষের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্ররাষ্ট্রগুলির পক্ষে চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন একেবারেই গৌণ। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র আণবিক অস্ত্রের আঘাতে তাহাদের নিশ্চিহ্ন হইবার সম্ভাবনাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা।

কবি গোল্ডস্মিথের গ্রাম্য শিক্ষক যেমন তর্কে হারিয়া গেলেও তর্ক করিতে পারিতেন, তেমনি পাশ্চাত্য কূটনীতিকদের Position of strength-এর নীতি ব্যর্থ হইলেও সেই নীতিতে অবিচলিত থাকিবার যোগ্যতা তাঁহারা দেখাইতেছেন। বর্তমানে আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে গোপন তথ্য আমেরিকা ও অন্যান্য মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে, এবং অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থাকে হাইড্রোজেন অস্ত্রে পুখানুপুখ সজ্জিত সামরিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য শিবিরের অগ্রবর্তী ঘাঁটী দেশগুলির বিপদ ইহাতে কমিবে না; এই ব্যবস্থার পরও কম্যুনিষ্ট পক্ষের দ্রুততর আঘাতে এই সব ঘাঁটী নিশ্চিহ্ন হইবার আশঙ্কা

থাকিবে। ইউরোপের যে সব দেশ সামরিক শক্তির দ্বারা কম্যুনিজমের প্রসার নিবারণে দক্ষিণ নীতির (position of strength) সমর্থক, তাদের প্রথম ও প্রধান যুক্তি—অস্ত্রশক্তির প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য শিবির যে অত্যন্ত প্রবল, ইহা নিশ্চিত জানিলে সোভিয়েট রুশিয়া কখনও আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বনে সাহসী হইবে না। তাহাদের দ্বিতীয় যুক্তি—যদি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ঘাঁটী হইতে দ্রুত আঘাত করিয়া রুশিয়ার আক্রমণ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করা সম্ভব হইবে। এই দুইটি যুক্তিই আজ সম্পূর্ণ অসার অস্ত্রশক্তির সুস্পষ্ট প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং সেই প্রতিষ্ঠার দ্বারা সোভিয়েট রুশিয়াকে নতি স্বীকার করাইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে; যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র দ্রুত আঘাতের দ্বারা তাহাকে পঙ্গু করিবার আশাও বৃথা প্রতিপন্ন হইয়াছে—রকেটবাহী হাইড্রোজেন্ অস্ত্রের যুগে এই আশা নিতান্তই অলীক।

নূতন ফরাসী মন্ত্রিসভা—

গত অক্টোবর মাসে বুর্জোয়া মাস্সী মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের পর মাসাধিক কালের চেষ্টায় নভেম্বর মাসের প্রথমে মেসিয়ে-গাইয়ারের নেতৃত্বে ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। আলজেরিয়ান অভিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রথম গণ-বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী এবং শেষ পর্যন্ত বামপন্থী সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের (আইনসভার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বল) মিলনে পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারে। ম: গাইয়ারের নেতৃত্বে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থীরা একত্রে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সম্মত হইয়াছেন এই আশঙ্কাতেই It is the spectre of a popular front that has brought the followers of M. Pinay and those of M. Mollet together into a new co-alition.—(London Economist) স্বভাবতঃ, কোন রকমে টিকিয়া থাকা ছাড়া এই গভর্ণমেণ্টের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নাই—সম্মিলিত দলগুলির উদ্দেশ্য পরস্পর-বিরোধী। ম: মেসিয়ে গাইয়ার পূর্ববর্তী মন্ত্রিমণ্ডলের অর্থসচিব ছিলেন। বয়সে তিনি খুবই তরুণ (৩৮ বৎসর বয়স); ইতিমধ্যেই তিনি অর্থনৈতিক সঙ্কট নামলাইতে দক্ষ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বাম ও দক্ষিণ-পন্থীরা তাঁহার নেতৃত্বে একত্র হইবার ইহা অন্যতম কারণ।

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কট এখন খুবই প্রবল; ম: গাইয়ারের পক্ষে ইহার সমাধান সাধ্যাতীত। আলজেরিয়ার যুদ্ধের জন্য এখন ফ্রান্সের বাৎসরিক ৭০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে; মার্কিণ সাহায্যে ইহার কিছুই পূরণ হইতেছে না। ফলে আন্তর্জাতিক লেন-দেনে ও বাজেটে ঘাঁটতি দেখা দিয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। ম: গাইয়ার আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ৩০ কোটী ডলারের মত ঋণ পাইতে পারেন; পশ্চিম জার্মাণীর নিকট হইতেও কিছু ঋণ লইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাতীয় ঋণ এবং কিছু কর বৃদ্ধির দ্বারা তিনি বাজেট ঘাঁটতি নিবারণে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু ইহা বাড়ুড়ি বাওয়াই মাত্র। ইহার দ্বারা সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়; কারণ আলজেরিয়ার যুদ্ধজনিত বিরাট অপব্যয় তাহাকে করিয়া যাইতেই হইবে। এই যুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয়ের দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্কট অবসান হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই।

ন্যাটোর অভ্যন্তরে বিরোধ—

গাইয়ার গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতালাভ করিয়াই "ন্যাটোর" অভ্যন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের পুরাতন মিত্রশক্তি ইউনিসিয়ার কুটেন্ তিন শত ছোট মেসিন্ গান এবং দশটি ফ্রেঞ্চ গান পাঠাইয়াছিল; আমেরিকা পাঠাইয়াছিল পাঁচ শত রাইফেল। ইহাদের এই আচরণে "আতলান্তিক সংহতি" নষ্ট হইয়াছে বলিয়া গাইয়ার মন্ত্রিমণ্ডল অভিযোগ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্যারিসে 'ন্যাটোর' পার্লামেণ্টারী সম্মেলনের সময় ফরাসী প্রতিনিধিরা এই জন্য ক্ষুব্ধ চিত্তে সম্মেলন ত্যাগ করেন। ইউনিসিয়া স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ফ্রান্সের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র পাইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই যুক্তিতে ইউনিসিয়ার অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করেন যে, এই সব অস্ত্র আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের হাতে পড়িবে। এই যুক্তির উত্তরে ইউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বারগুবা বলিয়াছেন যে, আলজেরিয়ার বিদ্রোহীরা ইউনিসিয়ার দেশরক্ষী বাহিনী অপেক্ষা ভালভাবে অস্ত্রসজ্জিত; ইউনিসিয়া হইতে অস্ত্র লওয়ার প্রয়োজন তাহাদের নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কুটেন্ ও আমেরিকা হইতে ইউনিসিয়া যে অস্ত্র পাইয়াছে, তাহার দ্বারা শুধু অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করাই সম্ভব। এই ধরণের অস্ত্রের অভাব ঘটিলে রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং, প্রেসিডেণ্ট বারগুবা সঙ্গতভাবেই বলিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত অস্ত্র যদি তিনি নাই পান, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তিনি কম্যুনিষ্ট শিবিরের পরপাপন্ন হইবেন। তাঁহার এই কথার কাজ হইয়াছে। আরব জগতের বিশ্বয়ে ও সীরিয়ায় কম্যুনিষ্ট অস্ত্র প্রবেশ করায় এই রাষ্ট্র দুইটি ক্রমে পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাবের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ইউনিসিয়াও যাহাতে সিরিয়া ও মিশরের দলে ভিড়িয়া না যায়, সে জন্য কুটেন্ ও আমেরিকা তাহাকে নামমাত্র কিছু রাইফেল-বন্দুক পাঠাইয়া জানাইয়াছে যে, তাহারা ইউনিসিয়ার পক্ষে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইউনিসিয়ার স্বাধীনতালাভ সম্পর্কে ফ্রান্সের সহিত যে চুক্তি হয়, তাহাতে এমন কোনও কথা নাই যে, ইউনিসিয়া তাহার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র শুধু ফ্রান্সের নিকট হইতেই ক্রয় করিবে।

ফ্রান্স আতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) একটি স্তম্ভ। কুটেন্ ও আমেরিকা তাহার সহিত বিরোধ বাড়াইয়া তুলিবে না। ফ্রান্সেরও এই অভিযোগে প্রশ্রয় দিবার সাধ্য নাই। সুতরাং, ন্যাটোর অভ্যন্তরের এই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। কিন্তু এই বিরোধে "ন্যাটোর" অভ্যন্তরে যে আদর্শগত ঐক্য এবং স্বার্থের সম্প্রীতি সূচিত হইয়াছে,

তাহা উপেক্ষণীয় নহে। "স্বাধীন দুনিয়ার" স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক সন্ধি এই "ব্লকের"। কিন্তু বাস্তবিক স্বাধীন দুনিয়ার এই প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত এক-তৃতীয়াংশ দেশ ও পর্তুগালকে গ্রহণ করিতে ফ্রান্স ও আমেরিকা ইতস্তত করে নাই। আমেরিকা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করিয়া থাকে। অথচ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স "আটোর" বিশিষ্ট সভ্য। ইহা ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ রহিয়াছে। সাইপ্রাস লইয়া গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধ ফ্রান্স বেশ ভালভাবেই পাকাইয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে সাইপ্রাস-সমস্যা জটিল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে; ফ্রান্স-তুর্কি বিরোধ প্রায় জটিল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। সর্বোপরি ইরান-প্রশ্নে মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্য লইয়া ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তীব্র বিরোধ।

কাশ্মীর প্রশ্ন ও সোভিয়েট রুশিয়া—

গত নভেম্বর মাসে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে। প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়ার "ভিটোর" হুমকীতে কাশ্মীর সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নূতন চাল ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান যে কাশ্মীর আক্রমণকারী—এই মূল কথাটা চাপা দিয়া তথাকথিত গণ-ভোটের নামে পাকিস্তানকে নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির তুলিতে বিশ্বের চক্রান্ত গত বৎসর যাবৎ চলিতেছে। ফ্রান্স, আমেরিকা ও তাহাদের তিনটি অনুগত রাষ্ট্র এবারও এই চক্রান্ত সিদ্ধির আয়োজন করিয়াছিল; তথাকথিত গণ-ভোটের প্রাথমিক পর্যায়রূপে কাশ্মীর হইতে সৈন্য সরাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহারা আর একবার ডাঃ গ্রাহামকে ভারতীয় উপ-মহাদেশে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। পাকিস্তানের বস্তুতান্ত্রিক চাপা দিবার এই কূটকৌশলী প্রয়াসের বিরুদ্ধে ভারত তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। কিন্তু "Four of the permanent members of the Security Council (Britain, U. S. A., France and Nationalist China) support Pakistan for political reasons while Iraq, the Phillipines, Columbia and Cuba are politically in Washington's pocket" (New Statesman) হওয়ায়, ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গ্রাহাম মিশন সংক্রান্ত নূতন প্রস্তাব অনায়াসে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাধিক্যে পাশ হইয়া যাইত। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার "ভিটোর" হুমকীতে হইতে পারে নাই। (নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা যার: পাঁচটি স্থায়ী: ছয়টি অস্থায়ী। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সনদের বিধান অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য একমত না হইলে কোনও কার্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না, অর্থাৎ একটি সদস্য বিরোধিতা করিলে বাকি ছোট সদস্যের কার্যকরী প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়। স্থায়ী সদস্যদের এই প্রস্তাব বাতিল করিবার অধিকারই "ভিটোর" অধিকার বলিয়া অভিহিত।) ইহার পর গ্রাহাম মিশন সংক্রান্ত নূতন প্রস্তাবের এই মর্মে সংশোধন হয় যে, ডাঃ গ্রাহাম ভারতীয় উপমহাদেশে আসিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পূর্ববর্তী দুইটি প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। সোভিয়েট রুশিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নাই—উহা সমর্থনও করে নাই। কাজেই, উহা পাশ হইয়াছে। ভারত এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই; কারণ পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া প্রস্তাবে স্বীকার করা হয় নাই। তবে, ভারতের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, ভারত তাহার অন্যান্য অতিথিপরায়ণতা অনুযায়ী ডাঃ গ্রাহামকে যথোচিত সম্বর্ধনা জানাইবে।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গের আলোচনার সময় রুশ-প্রতিনিধি যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্যই যে শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের কাশ্মীর নীতি সমর্থন করে না, এই সমর্থনের পশ্চাতে যে তাহার নিজস্ব গভীর স্বার্থ রহিয়াছে, ইহা সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ সুবোলেভের বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি শুধু গ্রাহাম মিশন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করেন নাই—পাকিস্তানকে আরও সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করিবার দাবীও তিনি জানাইয়াছেন। গ্রাহাম মিশন সংক্রান্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেন এই কারণে "Britain and the U. S. A. had tried to keep open the door for strategic penetration of Kashmir.... The large-scale military assistance given by the west had exposed the true nature of their intentions which was to turn Kashmir into a fortified military bulwark.

কাশ্মীর প্রশ্ন প্রথম হইতেই আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গের সহিত জড়াইয়া গেলেও পূর্বে সোভিয়েট রুশিয়া এই সম্পর্কে সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, কারণ এই সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট ভারত ও পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তখন সুস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আজ পাকিস্তান সুনির্দিষ্টভাবে সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক জোটের সভ্য, এবং ভারত সুনির্দিষ্টভাবেই সমস্ত সামরিক জোটের বাহিরে। পাকিস্তানে যদি এখনও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি নির্মিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে ইহা নিশ্চিত; প্রয়োজন হইলে তখনই পাকিস্তানের প্রত্যেকটি বন্দর, রেল ষ্টেশন ও বিমান-ঘাঁটি যে সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। পক্ষান্তরে, ভারতে বর্তমানে যেমন কোনও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি নাই, তেমনি ভবিষ্যতেও কোনও ঘাঁটি স্থাপিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই; আর যা কাল—কোনও দিনই ভারতের বন্দর, রেল-ষ্টেশন ও বিমানঘাঁটি অন্যের সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে না। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে যে সমরোপকরণ আসিতেছে, তাহা ভারতের

ও-আর-সি-এল এর
কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়
UMARESH
দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

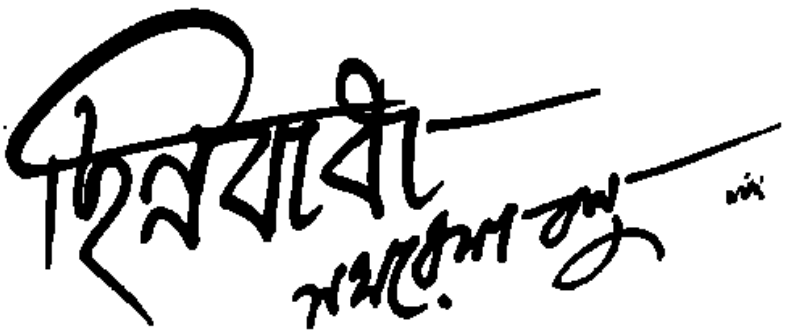

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শুধু মন তার হয় বৈ কি অন্তরের। সকলের স্নেহ ভালোবাসা নিরঙ্কুশ ভোগ করার কোনো উপায় নেই। বোধহয়, সেটা সংসারেরই আইন। শৈলবালার সঙ্গে ভামিনীর বিবাদ, এর যতো দায়, যতো অশান্তি, সবই যেন অন্তরের।

ভামিনীর পাল্লার বাইরে পেলে, শৈলবালাও অন্তরকে অনেক কথা বলে। শৈলবালা মনে করে, কথাগুলি সে ফিস্‌ফিস্ করেই বুঝি বলে, কেন, শৈলী ওর বাড়া-ভাতে করে ছাই দিতে গেছে? শৈলীর হবু-জামাই কি ভামি'র ধার না পরে। সুরীনদাদা বলে, 'ছেলের একটা কাজকম্মো না হলে, বে' দেওয়া চলে না শৈল-দিদি, তাতে আমার মানে লাগে।' হ্যাঁ, সুরীনদাদার মত-ই কথা। নইলে কি বসে থাকতুম? দিনখ্যান দেখে, কবেই দু'হাত এক ক'রে দিতুম। ব'লে শৈলবালার মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে, চোখ দু'খানি বড় ক'রে সত্যি সত্যি ফিসফিসিয়ে বলে, বুঝি বাবা, বুঝি, মাগীর বুকে কেউ নেই। সে জ্বালা বড় জ্বালা। তা' ব'লে তুই শৈলীর খোঁয়াড় করিস্ কেন? তুই না আমার বেয়ান চ'ষে বাচ্ছিস্?

ভামিনীর সন্তানহীনতার কথা বলতে গিয়ে শৈল-বালার গলায় স্নেহের আভাস ফোটে। তবে এ বিবাদের জন্যে, অন্তরের মনের ভাব প্রাণান্তকর হয়। মানুষ সবাই একরকম হয় না। ভামিনী-খুড়ির স্নেহ একটু জটিল, কিন্তু দুজনের ভালোবাসা অন্তরের মনের এক-ই স্থানে, এক-ই সুরে বাজে। কাউকে স্নেহের বন্ধে লড়িয়ে দিয়ে, তলায় ভালোবাসা কুড়িয়ে বেড়ায় না সে। জীবনে এই মানুষগুলিকে পাওয়া, সে-ই যে তার অনেকখানি।

অন্তরের তত্ত্ব আছে, ভাব আছে। যে বসে আছে তার ভিতরে, সে গুনগুন ক'রে উঠতে চায়। গান গাইতে ইচ্ছে করে, মনে মনে কথাও বেঁধে ফেলে। কিন্তু সেই অপথান আর অভিমানের ভারটুকু কাটে নি এখনো।

আরো লোক আসে সন্ধ্যার পরে, সুরীনের কাছে। বাড়িতে ব'সে দশ রকম কথাবার্তা হয়। যারা আসে, তারা সকলেই কোনো না কোনো মিলের মিস্তিরি। তাদের মধ্যে নানারকম আলোচনা হয়। মিল সংক্রান্ত বিষয় তার মধ্যে বেশী। তা' ছাড়া শহরের কথা, এ পাড়া সে পাড়ার বিষয়, কোথায় কি ঘটেছে কিছু বাদ যায় না। এদের মধ্যে গোদলপাড়া কারখানার মিস্তিরি অনাথ সবচেয়ে বেশী মন কেড়েছে অন্তরের। এ শহর আর কারখানার বাইরে, দূরের সংবাদ বলে সে। কলকাতার কথা বলে, আরো দূর দূরান্তে, হিল্লীদিল্লীর সংবাদ আনে। অন্তরের কাছে সে সব রাজা রাজড়ার সংবাদ। সে যখন কথা বলে, বাকী সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। সুরীন খুড়োর বড় ভক্তি এই অনাথের উপর।

লোকটির বয়স অনুমান করা যায় না। সব সময়েই মাথায় রাশিখানেক রুক্ষ আধপাকা চুল, গোঁফ দাড়ি খোঁচা খোঁচা। এমনিতে আছে বেশ গম্ভীর মানুষ, মনের ভাবসাব বোঝা যায় না। যেমনি হাসে, অমনি সাদনের দুটি দাঁতহীন সেই হাসিতে, একেবারে শিশু ব'লে মনে হয়। বড় মানুষের হাসিটুকু শিশুর মতো দেখতে হলে,

মানুষের শুধু আনন্দ হয়। কিন্তু অনাথের পেশীবহুল শক্ত মুখখানিতে দুটি দাঁতহীন অনাবিল হাসি দেখে, নিজে হাসতে গিয়ে অভয়ের বুকের মধ্যে কেন যেন টনটন করে। ওই দুটি শূন্য দাঁতের অন্ধকারে কী যেন লুকিয়ে রেখেছে, দেখে বড় মায়া লাগে শক্ত সমর্থ মানুষটার জন্যে। পনর বছর আগে নাকি জেল খেটেছিল। চুরি ডাকাতি নয়, কারখানার কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে। এমন আসামী অভয় তার জন্মে দেখে নি। জেল থেকে বেরিয়ে, দশ বছর কোনো চাকরি পায়নি মানুষটি। বছর পাঁচেক হল, আবার কাজ পেয়েছে গোদলপাড়ায়।

অনাথেরও নাকি বড় ভালো লেগে গেছে অভয়কে। শুধু সুরীন হেসেছিল মনে। ভামিনীকে ঘরে গিয়ে বলেছিল, ভাখ্ গো ভামিনী, দুটো পাগলকে কেমন এক গারদে পুরে দিয়েচি।

ভামিনী অবাক হ'য়ে বলেছিল, সে আবার কি?

বিস্ময় কাটতে দেরী হয়নি ভামিনীর। কথাটা মিথ্যে বলে নি সুরীন। অনাথকে কী বলেছিল সুরীন অভয়ের বিষয়, কে জানে। সে প্রথমদিনেই অভয়কে খানিকক্ষণ দেখে শুনে বলেছিল, তোমাকে বেশ লাগল বাবা।

বলা মাত্র অভয় অনাথের পায়ে হাত দিয়ে বলেছে, সে এঁজ্ঞে আপনি ভাল ব'লে।

অনাথ তাড়াতাড়ি অভয়ের হাত চেপে ধরে বলেছে, আ হা হা, পায়ে হাত দিও না, ছি।

—এঁজ্ঞে কেন?

—মানুষ হ'য়ে মানুষের পায়ে হাত দেবে কেন?

—মানুষের মত মানুষ হ'লে তার পায়ে যে পড়ে থাকতে হয়।

অনাথ একটু মিটিমিটি করে হেসে বলেছিল, নইলে, সাঁতরা কবির মত বুঝি ঘাড়ে রদ্দা মারতে হয়? ব'লে অনাথ হা হা ক'রে হেসে উঠেছে। কিন্তু অভয় আর লজ্জায় বাঁচি নি। মাথাটি নীচু ক'রে বলেছে, সে এজ্ঞে আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে।

অনাথ তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বলেছে, না, কোনো অন্যায় করনি বাবা, অন্যায়কে কখনো মানতে নেই। তার জন্যে প্রাণ যায়, সেও ভি আচ্ছা। তবে একটা কথা কি, যা করবে, তা মোক্ষম করবে। দেখ, সংসারে কত অন্যায় ঘটছে, কত পাপ ঘটছে তোমার চোখের সামনে, সবকিছুর কি তুমি শোধ নিতে পার?

—একটু বুঝিয়ে বলেন।

—এই ধর না কেন, সংসারে একজন খায়, আর এক জন উপোস যায়।

—সে তো মানুষের ভাগ্য?

—তবে সাঁতরাকে তুমি মারলে কেন? ভাগ্য বলে মানলেই পারতে।

অভয় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে, অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেছে অনাথের দিকে।

অনাথ আবার বলেছে, গাল দিলে মানে লাগে, খিদে কি বাবা তার চেয়ে বড় মান নয়? অভাবে যে মরে, সেই অভাবীর অপমান তার চেয়ে বড় নয়, বল? তবে তারা সইছে কেন? না, দায়ে প'ড়ে সইছি। তোমাকেও দায়ে প'ড়ে সইতে হবে বাবা, সাঁতরাকে তোমার শোধ নিতে হবে অন্য ভাবে।

—কেমন ক'রে?

—সাঁতরার চেয়ে বড় কবিয়াল হ'য়ে।

অভয়ের চোখ ফেটে বুঝি জলই এসেছিল। বলেছে, কিন্তু আমি যে অন্য কাজ করব?

—করবে করবে, তাতে কি আছে? রাস্তা ছাড়বে কেন?

অভয় অমনি দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছে, আপনি আমার গুরু।

অনাথ চেঁচিয়ে উঠেছে, না না, গুরু টুরু নয়—

—হ্যাঁ গুরু। গুরু, শোন আমি বড় মুখ্খু।

গুরু, ঢেঁকিকে বোঝাবে কতো
কথায় বলে নাথির ঢেঁকি
চাপড়েতে ওঠে না তো?

অনাথ বলেছে, নিজেকে যে ঢেঁকি বলে, সে কখনো ঢেঁকি হয়? গুরু টুরু নয়, তুমি আমার বন্ধু! তুমি একটা পোয়েট মানুষ, শৈলদিদির জামাই।

—এঁজ্ঞে 'পোট' কী?

—হুঁ হুঁ, ইংরেজী বলেছি, বুঝলে। পোট নয়,

পোয়েট পোয়েট, মানে কবি। তুমি আমাদের পোয়েট জামাই। কিন্তু গান শোনাতে হবে যে?

আবার অভয় থম্‌কে গিয়েছে। অনাথ বলেছে, না না, তোমাকে আমি হুকুম করব না। যে-দিন তোমার মন চাইবে, সেদিনে।

অভয়ের মুখখানি থম্ থম্ করেছে। বলেছে, এঁজে, সে সোঁত বন্ধ হয়ে গেছে।

অনাথ কথার কারবার করে না বটে, মানুষ নিয়ে কারবার করে। বলেছে, স্রোত পাক খাচ্ছে বাবা। পথ পেলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এইটি নিয়ম যে? সে যে তখন মরা গাঙে বাণ ডাকিয়ে ছাড়ে।

কথাটি শুনে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছে অভয়ের। সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে সাজানো মিঠে পদ, তার ঠোঁটের কূলে এসে সত্যি পাক খেয়েছে। তার বোবা স্বর যেন টনটনিয়ে উঠেছে বড় ব্যথায়। পারেনি গাইতে। মনে মনে তয় হয়েছিল, মনের মধ্যেই ঘোর পাক খেয়ে গিয়েছে।

এমনি করে ভাব হয়েছে দু'জনের। একজন অনাথ খুড়ো, আর একজন পোয়েট জামাই। অভয় আরো শুনেছে, অনাথ নাকি কিছু লেখাপড়াও জানে।

সুরীন হেসে বলে, আমি জানতুম, দুটিতে দেখা হলে হয়, কেমন জমে একবার সবাই দেখবে।

অনাথ ছাড়াও সন্ধ্যার আসরে আরো কয়েকজন আসে। তাদের সকলের সঙ্গেই অভয়ের বড় ভাব। কম বেশী সকলেরই মন কেড়েছে সে। অনাথ বলে, পোয়েটের জন্যে আমাদেরও ধান্দা করতে হয়, একটা চাকরিবাকরি দরকার।

তা ঠিক। সুরীন মুখ গম্ভীর ক'রে বলে, হ্যাঁ। এক মাস হয়ে গেল, হাঁটাহাঁটি সার হ'চ্ছে। টর্ণ ঘরের সাহেব একটা আশা দিয়ে রেখেছে। সহজে যে হ'য়ে উঠবে, মনে হয় না।

অনাথ বলে, চাকরির বাজার বড় মন্দ। তা দেখা যাক। সবাই মিলে দেখ। অগস্‌দলে তামনগরেও দেখ, আমিও দেখি। বন্ধুকে আমি কাজে লাগাতে পারলেই ভাল হয়।

সবদিক থেকেই অভয়ের মন ভরা। কেবল, এই কথাটি সে ভুলতে পারে না। বসে খাওয়ার রীতি তার অজানা ছিল। জীবনের পালে যে তার নতুন বাতাস লেগেছে, কখন না জানি বাতাস ঢিল পড়ে যায়। আশা বড় মারাত্মক বস্তু। কাজে না সার্থক হলে, মরণের সামিল মনে হয় তখন। হাঁটতে না শিখতে যে মানুষ খুঁটে খেতে শিখেছে, একমাস ধরে তার নিজেকে গলগ্রহ ঠেকেছে। এক এক সময় হাসতে গিয়েও যে বুকের মধ্যে খচ্ ক'রে লাগে। সন্ধ্যাবেলার এই আসরে তামিনীও যোগ দেয় তার কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে। সবাইকে চা দেয়, পান থাকলে খাওয়ায়। সে ঠোঁট টিপে হেসে বলে, হ্যাঁ, তা ছাড়া ছেলের আমার মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে তো।

সহসা সবাই ধরতে পারে না তামিনীর মনের কথা।

তামিনী বলে, তোমরা যেন সব হাবা হ'য়ে গেলে। একজনের জন্যে তো মনটাও খালি খালি লাগতে পারে। আপনার মানুষ, তাকে পাবার জন্যেও—

ও, তামিনী শৈলবালার মেয়ে নিমির কথা বলে।

অভয় লজ্জা পায়। তামিনী হাসে, ক্ষণিক গম্ভীর হ'য়ে বলে, সত্যি।

অনাথ বলে, তা হ'লে তো বটে, বউ না হলে কাজের কি চলে?

ব'লে তামিনীর দিকে চেয়ে চোখের ইসারায় হেসে জিজ্ঞেস করে, শৈলদিদির মেয়েও বুঝি তর সইছে না।

তখন একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে তামিনী বলে, কী জানি! উঁকি ঝুঁকি কি আর না মারছে।

অভয় অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হ'য়ে বলে, মন টন আবার কী। কাজ নেই, কম্মো নেই, বউ একটা হলেই তো হল না।

তার কথা শুনে সবাই হাসে হো হো ক'রে।

তারপর একলা শুয়ে ভাবে অভয়। ভাবে, সত্যি তার মন কেমন কেমন করে নাকি? একটু দেখতে ইচ্ছে করে?

কবে একদিন সে বাচ্ছিল পাড়ার জলকলের পাশ দিয়ে। মেয়েরা ভিড় করেছিল সেখানে। অভয় দূরে থাকতেই মেয়েরা চাপা গলায় ব'লে উঠেছিল, ওই রে, সে আসছে, এই নিমি, ভাগ ভাগ। আ' ম'লো মুখপুড়ি, পালাচ্ছিস্ কেন।

কল কলের ভিড়ে একটা ধরাধরি টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। একজন পালিয়েছিল আঁচল ছিনিয়ে নিয়ে। চোখের পলকে কত কী যে চোখে পড়েছিল, যা কখনো চোখের পলকে চোখে পড়ে না। তার গোরা রং গায়ে, তার বন্ধু গুলার বউয়ের মত বড় বড় চোখ, ভেঙে পড়া খোঁপা, খসে পড়া আঁচল। তারপর মেয়েদের ভিড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময়, সকলের কী হাসি! কে একজন বলে উঠেছিল, আহা, ফস্‌কে গেল। আর একজন বলেছিল, ছুঁড়ি ভয় পেয়েছে।

হ্যাঁ, ভয়ে ঘুম হয় না রাতে।

অভয়কে দাঁড় করিয়েছিল তারা, ও জামাই, শোন শোন।

অমন জোয়ান মানুষ অভয়, তারো বুকের মধ্যে কেমন ধরধরিয়ে উঠেছিল। সে মাথা নীচু ক'রে বলেছিল, এঁজে বলেন।

তার গ্রাম্য বিনয় দেখে সবাই আর হেসে বাঁচেনি। বলেছিল, দেখতে পেলে না তো?

মাথা নীচু ক'রে হেসেছিল অভয়। বলেছিল, এঁজে, দেখা না দিলে কি কাউকে দেখা যায়!

ওমা, ওমা—শব্দের সঙ্গে আবার একটি হাসির ঝড় উঠেছিল।

আরো কয়েকদিন এমনি ঘটেছে। যাবার পথে শুনতে পেয়েছে মেয়ে-গলায়, এই নিমি, এই যে যাচ্ছে রে।

গত বছরেই কবে যেন একদিন গাঁয়ে, এক বিয়ে বাড়িতে কাজ পড়েছিল অভয়ের। বর আসতে সেও চেঁচিয়ে বলেছিল, দেখি দেখি, একটু দেখে নিই। কে যেন পিছন থেকে বলে উঠেছিল, হ্যাঁ, দেখে নে। তোর জীবনে তো আর ওসব কোনদিন হবে না।

সুরীন খুড়ো কোথায় টেনে নিয়ে এল, বন্ধের ঘোর লেগে গেল মনে। ধন্দ কাটতে চায় না, সন্দেহ হয়, গুলার মত সেও একটি মেয়ের সঙ্গে ঘর করবে। তার এত বড় শরীর দিয়ে অনেকের অনেক কাজ মিটেছে, সেটা প্রয়োজনীয় ছিল। মন নিয়ে কেউ মাড়াচাড়া করে নি, সেটা অপ্রয়োজনীয় ছিল। মন নিয়ে অভয় একলা ছিল। মিথ্যে নয়। এখন সেই মনে অপরের ভাগ পড়েছে। একটি বিস্ময়কর ছায়া পড়েছে সেখানে। যে-ছায়া হাতড়ে হাতড়ে তার রক্তের টানা স্রোতে হঠাৎ ঘূর্ণী লাগিয়ে দেয়। তখন গান গাইতে ইচ্ছে করে অভয়ের।

সব মিলিয়ে, মনের দিগন্ত জুড়ে, নতুন জীবনের স্বাদ নেশা ধরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাজের কথা মনে হ'লে, তখন বড় বিস্বাদ লাগে অভয়ের।

কয়েকদিনের পর সুরীনদের কারখানায় নিয়মিত হাজিরা দিয়ে ফিরে, অভয় ঘরে ফিরে গেল না। এদিক ওদিকে ঘুরে গঙ্গার ধারে খেয়াঘাটের কাছে গিয়ে দেখল, ঘরামিরা নতুন ঘর তুলছে। মস্তবড় ঘর, বোধহয় মালখানা হবে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে, একজনকে জিজ্ঞেস করল অভয়, লোকের দরকার আছে আর?

কাজ করতে করতে কয়েক মুহূর্ত অভয়কে দেখে, আর একজনকে ডাকল।

সে এসে জিজ্ঞেস করল, ঘরামির কাজ জান?

নিজের না হোক, পরের ঘর অনেক তৈরী করেছে অভয়। বলল, বাজিয়ে দেখুন।

বাজিয়ে দেখা গেল, ভালোই বাজে। দু'টাকা রোজে সারাদিন কাজ ক'রে যখন ফিরল, তখন সুরীনের বাড়ীতে একরাশ মেয়ে-পুরুষ। সন্ধ্যা উৎরে গেছে তখন, বাতি জ্বলেছে। সুরীনও ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ। সারাদিনে অভয় ফিরে না আসায় সোরগোল প'ড়ে গেছে।

শৈলবালাই প্রথম চীৎকার ক'রে উঠল, অই গো, অই এসেছে। কোথায় ছিলে?

অভয় বলল, এই একটু এদিক ওদিক করছিলুম।

ভামিনী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, তা রাতটুকুও বাপু এদিক ওদিক ক'রে এলেই পারতে?

অভয় হাসল, সবাই চলে যাবার পর অভয় সুরীনের দিকে টাকা দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কাজ করেছি খুড়ো আজ।

সুরীন অবাক হ'য়ে বলল, কী কাজ, কোথায়?

সব বলল অভয়। শুনে সুরীনের মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। শৈলদিদি শুনলে তার মান যাবে। জামাইকে দিয়ে শেষে ঘরামির কাজ করালে সে।

অনাথ খুব খুশি। অভয়ের পিঠ চাপড়ে বলল, বেশ করেছ বন্ধু, বাপের ব্যাটার মত কাজ করেছ। কাজ না করলে মানুষ বাঁচে কখনো!

তিনদিন পর পর কাজ পেল অভয়।

চতুর্থ দিনে আবার বেকার হয়ে বসেছিল অভয়। ভামিনী পাড়ার কোথায় গিয়েছে দুপুরের পাট মিটিয়ে। অভয়কে বলে গেছে দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমোতে। ঘুম আসে নি। অভয় বসেছিল দাওয়ায়। কিন্তু কয়েকবারই চমকে উঠেছে, ফিসফাস্ শব্দ শুনে। মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু চুপি চুপি কথা, চুড়ির রিনিঠিনি কোথা থেকে যেন বেজে উঠেছে কয়েকবার।

তারপর নিমিকে চেপে ধরে, দুটি মেয়ে ঢুকল বাড়ির পিছন থেকে। লাপাদাপি করছিল নিমি, চুল এলো ক'রে, শাড়ি বিস্রস্ত ক'রে। সামনেই অভয়কে দেখে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু মুখখানি যেন তার, যদিও কর্সা মুখে একটু রক্ত ছড়িয়ে গেছে। ঘাড় না ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল অন্যদিকে। অভয় দেখল—গুলার বউয়ের চেয়েও চোখ দুটি ভালো, কালো মণি দুটি বড় বেশী ঝলমলে, কিন্তু স্থির। ঠোঁটের কোণ দুটি টিপে রয়েছে নিমি, মুখখানি তাতে কঠিন হয়ে উঠেছে।

বিদ্যুৎ অভয় হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। উঠে দাঁড়াল শুধু।

এক সঙ্গিনী বলল, নে, কি বলবি বল্, খুব তো তড়পাচ্ছিলি।

ব'লে আঁচল টেনে দিল।

আর একজন বলল অভয়কে, কেমন?

অভয়ের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল। নিমিকে সে এতদিন ভাল করে দেখে নি। আজ দেখে তার তীব্র আনন্দের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ সংশয় খেলে গেল। কোথায় যেন একটু দূরত্ব রয়েছে অভয়ের সঙ্গে, কাছের মেয়ে নয়। এ যেন নিটুট শরীরে, ছেয়ালো ছেয়ালো স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। জোয়ার এসেছে যেন উজান ঠেলে, তাই প্রথম মুখপাতে একটু যেন বেশী থামাল মনে হয়। এবং কর্সা, শৈলবালার মত। গুলার বউয়ের চেয়ে চোখ দুটি ছোট, কিন্তু চাউনিটি ভাল।

সঙ্গিনী বলল, কি হল, বাক্যি হরে গেল যে!

অভয় হেসে বলল, হাঁা, কথায় যে কুলায় না।

—তবে গান দিয়ে হোক।

হাঁা, গান গাইতে ইচ্ছে করে, কিন্তু লজ্জা করে। বলল, সেই গান শুনেছিলুম, গোরো-চনা গোরী নবীনা কিশোরি সেইরকম।

সঙ্গিনী দুটি হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি। বলল, কিন্তু রাগ করেছে।

অভয় হাত জোড় করে বলল, কেন ঠাকরুণ?

—জিজ্ঞেস কর।

দাওয়া থেকে নেমে এল অভয়। সামনে এসে বলল সঙ্গিনীদের, আমি অতি অভাজন, রাগ কেন তাই?

মেয়ে দুটি হেসে উঠে ধাক্কা দিল নিমিকে। নিমি ততক্ষণে মুখে আঁচল চেপে, হেসে উঠেছে।

একজন বলল, তোমাকে বলেছে, গেরো, গেরো মিন্‌সে।

অভয় ছড়া কেটে বলল,

গাঁয়ে আমার ছম্মো কম্মো,
শহর আমি চিনি না যে।
সে আমাকে ডাক দিয়েছে
যে আছে এই শহর গঞ্জে॥

এবার নিমি পালাবার জন্যে দৌড় দিতে গেল। ধরে রাখল সঙ্গিনীরা। বলল, ওমা, সত্যি সত্যি কবিরাজ রে।

আর একজন বলল অভয়কে, আরো বলেছে। বলেছে, বড্ডো কালো।

বুঝি সত্যি কালো কি না দেখে নেবার জন্য নিমি চোখ তুলতেই, চোখাচোখি হল অভয়ের সঙ্গে। অভয় বলল, হাঁা ভাই ঠাকরুণ,

'কালো, খুব কালো আমার বরণ'
যে বলে তার চোখের মণির মতন।'

—আরো বলেছে। বলেছে, আর কতদিন, চাকরি কেন হয় না?

এবার নিমি জোর ক'রে ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়ে দুটিও গেল হাসতে হাসতে। কিন্তু অভয়ের মুখখানি ভার হ'য়ে উঠল।

কিন্তু ভার ক'রে তাকে বেশীক্ষণ থাকতে হল না। নিমি এসে ভার ভরা জোয়ার দিয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা অনাথ এল চীৎকার করতে করতে, পোয়েট, এই পোয়েট জামাই, বন্ধু আমার কোথায় গেলিরে।

অনাথের দুই তোকারি শুনে একটু অবাক হ'লেও একটু বেশী খুশি টের পেয়ে অভয় বলল কী বলছ?

অনাথ বলল, কি বলছি? কী না বলছি, তাই বল্। আসছে হপ্তা থেকে তোর কাজ হয়েছে আমাদের মিলে।

—সত্যি, সত্যি?

—তবে কি মিথ্যে?

অভয়, পায়ে হাত দেবে ভেবেছিল। কিন্তু জড়িয়ে ধরল অনাথকে দু'হাতে।

সুরীন তখনো আসে নি। কেবল রান্নাঘরে ভামিনীর মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল। ক্রমশঃ

সৎপ্রসঙ্গ

উপানন্দ

সৎ এবং অসৎ দু'রকমের চিন্তাই মানুষের অন্তরে ওঠে। দয়াদাক্ষিণ্য, সেবা, ভগবৎ চিন্তা, নামকীর্তন, প্রার্থনা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি উচ্চ-চিন্তাগুলিই গ্রহণ করা উচিত—কেননা এগুলি আমাদের পরম বান্ধব ; আর পরহিংসা, অসৎ প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, আত্ম-গরিমা, পরের অনিষ্ট চিন্তা প্রভৃতি বর্জ্জন করা আবশ্যক,—এরাই মানুষের প্রকৃত শত্রু। এইগুলিকে দমন করতে পারলে বহির্শত্রুও দমন করা যায়। মানুষ বহির্শত্রুর পিছনে ছুটেই, হৃদয়ের শত্রুগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে, তার ফলে তাকে জীবনে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। তোমরা অসৎ চিন্তাকে কখন হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিয়ে নিজেদের ও জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করো না।

পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরশ্রীকাতরতা এগুলি পরিত্যাজ্য অভ্যাস। যাদের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, তারাই পরসমালোচনায় হস্তক্ষেপ করতে যায়, আর অপদস্থ হয়। জীবনের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করতে বাসনা থাকলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আর সাহসের আবশ্যক। সাহসী বীর ব্যতীত কেউ ভবিষ্যতের অন্ধকার দূর করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকারময় ভেবে উদ্যোগী হলে সিদ্ধিলাভ হয় না। জীবনের দৈনিক ঘটনাবলী নিয়ে তার বিচার করা দরকার—যদি গলদ থাকে, তা হলে সংশোধিত হতে পারে। যে লোকের শত্রু বেশী, তার সৎ ও ভদ্র হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষালিপ্সার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগত দোষ সংশোধিত করবার চেষ্টা না করলে মানুষ হওয়া যায় না। যে জাতি উন্নত হতে পেরেছে তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানই সে জাতির উন্নতির ভিত্তি। আলস্যই অভাবের জনক—এই রোগ প্রদেশের অস্থিতে মজ্জায় ঢুকেছে, তাই দেশে এত অভাব, এত দৈন্য। অভাব দৈন্য দূর করতে হলে কিন্তু কাজ করতে হবে। সাগরপারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাজ করে—তা থেকে তাদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন সম্ভব হয়। সেই অর্থ দিয়ে তারা লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করে, মাতাপিতার গলগ্রহ হয় না।

বাল্যকাল থেকে আবশ্যকী হোলে সংসারের পথে চলবার সময়ে যাতে যাতে হোঁচট খেয়ে পড়তে হয় না ; নিশ্চিন্ত বিশ্রামের চরাচর আশায় প্রলোভনে পরিত্যাগ করতে নেই, তা হোলে ঠকতে হবে। অপরিমিত জীবন কেবল কর্ম্মের দ্বারাই অমরত্ব লাভ করে। জ্ঞানী যুক্তিতেই সতর্ক হয়, কিন্তু অজ্ঞানী ঠেকে শিক্ষালাভ করে। অতি বড় মূর্খ অভাবে পড়লে শিক্ষালাভ করে, কিন্তু পশু প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হয়। অত্যাচারের প্রকৃত প্রতিশোধ ভালবাসা। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ, প্রতিহিংসা নীচতার পরিচায়ক। দেশের এবং সমাজের গৌরবের জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের মহাবাক্যগুলিতে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবে। এইসব মহাবাক্য পালন করলে জগতে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

লোকপ্রীতি, সৎসাহস এবং সাধু অভিপ্রায় যেন তোমাদের অন্তরে স্থান পায়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি লোক সমাজে বিশ্বাস, ভক্তি ও গৌরবের পাত্র হোয়ে থাকে। তাই যাতে চরিত্রবান্ হোতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করবে। ধর্ম্মভাব পারিবারিক সুখসম্পদের উৎকৃষ্ট সহায়। যে পরিবারে ধর্ম্মভাব নেই, তা কেবল প্রয়োজন সাধন ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উপায়স্বরূপ, আর পাশববৃত্তিগুলির পীঠক্ষেত্র।

ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা যেন রাখবে না, কেননা সামান্য কণ যেমন স্তূপে স্তূপে বেড়ে ওঠে, অশ্রদ্ধাও সেইরকম সামান্য পরার্থ পেলেই বৃদ্ধি পেয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। একজন গুণবান পুত্র নিজের সাধনায় বংশ উজ্জ্বল করে—আর একটি মূর্খ পুত্র পরে পরে পিতামাতাকে দুঃখ যন্ত্রণা দেয়। এজন্যে তোমরা লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবার চেষ্টা করবে। দুর্জ্জনের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা করবে না, কেননা দুর্জ্জনের দোষে নিজের সর্ব্বনাশ আর বিপত্তির কারণ হয়। যেমন অন্যায় উক্ত হোলে তার সংশোধনে হাত পুড়ে যায়, আর শীতল অন্যায়

হাতে নিলে সেই ছোট্ট কথাটা মনে পড়ে। যে মানুষের মাথায় যত কম সে তত বেশী কথা বলে। যার মাথা যেমন অধিকতর ফুল, তেমনই সে হয়তো বিদ্বান ও লিখিয়ে সে সব ক্ষেত্রে বেশী কুল হয়ে থাকে। একটা গল্প শোন :—

একদা একটী ইঁদুর নদী তীরে গেল জলবিহার করবে বলে সঙ্গী পায় কাছে, এমন সময়ে একটা দুষ্ট ব্যাঙ সেখানে এসে বললে—ভাই! তুমি কি চাও?

ইঁদুর মনের ভাব প্রকাশ করে বললে—'তাই তো, কেমন করে নদী পার হবো—'

ব্যাঙ হেসে বললে—'এর জন্যে আমার ভাবনা, এসো, তোমাকে পার করে দিচ্ছি—'

এই বলে ঐ ব্যাঙ ইঁদুরের লেজে এক ঘড়ি বেঁধে জলে প্রবেশ করে নিজের কোমর বাঁধলো। এই ভাবে ইঁদুরকে বেঁধে আর নিজে চড়িয়ে ব্যাঙ জলে সাঁতার কাটতে লাগলো। নদীর মাঝ খানে এসে দৌড়ুইই ব্যাঙ জলে ডুব দেবার উপক্রম করতেই ইঁদুর ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। বললে—'কর কি? এ কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে মেরে ফেলতে চাও?'

ব্যাঙ মুখ ফেরে বললে—'সবাই অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের বেলায় কেউই কথা রাখে না—দুজনে ডাঙা—'

ব্যাঙের কথা শুনে ইঁদুর জীবনের আশা ত্যাগ করলো। এমন সময়ে আকাশ থেকে একটা পাখী ছোঁ মেরে ব্যাঙটাকে নিয়ে গেল; আর ইঁদুরটাকে লেজে দিয়ে ব্যাঙটিকে উদরস্থ করলো। কেবে রেখে চতুর লোকই সতর্ক হয়। পরের মন রক্ষে করতে গেলে আপনার মন আগে হারাতে হয়—তোমরা তখন পরের মন রক্ষা করবার চেষ্টা করো না।

অভিযাত্রী

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম, এ,
পি এইচ ডি, পি আর এস

এই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে প্রায় কুড়ি বছর আগে। জার্মান ভাষায় রচিত বিখ্যাত একটি জীব-বিদ্যার বইএর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম। বৈজ্ঞানিকের নিজের নতুন নতুন অনেক গবেষণা পেলুম—সেগুলি যেমন বিস্ময়কর আর তেমনই তার রচনা-ভঙ্গী। জীব-বিদ্যা যে এতো আকর্ষণীয় হ'তে পারে তা আগে বুঝিনি। ঐ লেখকের পরবর্তী অন্যান্য রচনার জন্য মনটা ভারী উৎসুক হয়ে উঠলো। সে সময় জার্মানীতে আমার সহপাঠী বিশেষ বন্ধু ষষ্ঠীশ ছিলো—তাকে পরদিনই বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলুম এ বিষয়ে খোঁজ করতে। ষষ্ঠীশ যদিও তখন বানিনে তার রসায়ন-শাস্ত্রের গবেষণা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত—তবু পত্রপাঠই আমায় জবাবে লিখলে যে ঐ বইয়ের লেখক বৈজ্ঞানিক ফন ওয়াইমার বহুদিন হলো বিজ্ঞান-চর্চা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। অনেকে বলে, তিনি নাকি ভারতে গিয়ে সাধু হয়েছেন। এই খবর পেয়ে আমি তো একেবারে অবাক—কৌতূহল যেন আরও শতগুণ হয়ে উঠলো ঐ বিদেশী জ্ঞানীর সম্বন্ধে। ঐ য়ুরোপীয়ান গুণীর জন্য পরম শ্রদ্ধা অনুভব করতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ষষ্ঠীশকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলুম যেন সে এই রহস্যময় মহান জীবন-কাহিনীর আবরণ উন্মোচনের একটু চেষ্টা করে—একবার যেন সে বৈজ্ঞানিক ওয়াইমারের বাসস্থানেতে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর পরিবারবর্গের কাছ হতে সব খবর নিয়ে আমায় জানায়।

—বেশ কিছুদিন পরে ষষ্ঠীশ লিখলে যে সে আমার অনুরোধে কোলোনের যে বিদ্যালয়ে ওয়াইমার শিক্ষকতা করতেন এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের বাসস্থানের গৃহে যেখানে বৈজ্ঞানিকের শৈশব কেটেছিলো—এই দুই-জায়গাতেই গিয়েছিলো—কিন্তু বিশেষ কোনো খবর পায়নি। অনেক অনুসন্ধানে ষষ্ঠীশ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে যে দুটি কাহিনী শুনেছিলো তাও তার পাঠানো সেই রেজিস্ট্রী প্যাকেটটায় ছিলো। প্রথমটি ষষ্ঠীশ কোলোনের সেই বিদ্যালয়ে ফন-ওয়াইমারের এক পুরাণো সহকর্মীর কাছে শোনে—সহকর্মীটি বলেন—তিনি প্রথম থেকেই কেমন একটু খেয়ালী গোছের মানুষ ছিলেন—কোনো দিকে একবার ঝোঁক হলে সেই নিয়েই ওয়াইমার আহার-নিদ্রা ভুলে যেতেন। যেমন তিনি হঠাৎ খেয়ালের বশে জীব-বিদ্যার চর্চা শুরু করে দিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র এবং তাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে অধ্যাপনা করতেন। ঐ সময়েই তিনি বিয়ে করেন ও একটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে ওঁরা খুব সুখে শান্তিতে ছিলেন। ছেলেটিও তার বাবার মতোই মেধাবী হয়েছিলো—নানা রকম বই পড়তো ঐ বয়সেই, আর বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতে ভালোবাসতো তার বাবার সঙ্গে

বেড়িয়ে আর গল্প কোরে। সাত বছর বয়সে ছেলেটি স্কুলে ভর্তি হলো—কিন্তু বছরখানেক যেতেই সে খুব অসুখ হয়ে পড়লো—এক রকমের পেটব্যথা তার বার বার হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। ওয়াইমার তার কাছে-কাছেই থাকতেন। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করলে—'বাবা! ব্যথা কেন হয়? এ কি কোরে ভালো হবে?' ব্যস ওয়াইমার লেগে গেলেন শরীর-বিদ্যার বই পড়তে এবং তারই গোড়া ধরবার জন্ম লেগে গেলেন জীব-বিদ্যা নিয়ে। তিনি যদিও এ বিষয়ে কোনও ডিগ্রী নেননি—তবু তাঁর মৌলিক গবেষণা এবং বিশেষতঃ ঐ বইখানির জন্ম জার্মানীর নানা জায়গা হ'তে ভালো ভালো পদে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। একটা খুব ভালো জায়গায় ওয়াইমার যাবেনও স্থির কোরেছিলেন। এমন সময় কি হ'তে কি হোল কে জানে—তিনি উঠে পড়ে লাগলেন যতো রাজ্যের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে। তাঁর গবেষণার টেবিলে খরগোশ আর ইঁদুরের পাশে জড়ো হলো স্তূপাকার পুরোণো পুরাণো ধর্মগ্রন্থের রাশি। তারপর শুনলুম যে ওয়াইমার সংস্কৃত শিখছেন। আমার বাড়ী হ'তে তাঁর বাড়ী ছিলো অনেকটা দূরে—তবু একদিন তাঁর বাড়ীতে যাই তাঁর ছেলের অসুখটা খুব বেড়েছে শুনে। ধর্ম-চর্চা সম্বন্ধে বলতে জবাব দিলেন—'খোকনের নানা রকম প্রশ্নের উত্তর যোগাবার জন্ম এতো পড়তে হচ্ছে আমায় ধর্ম সম্বন্ধে।' কদিন পরেই হঠাৎ শুনি—ওয়াইমার নিরুদ্দেশ হয়েছেন স্ত্রী আর অতো আদরের রোগ-শয্যাশায়ী ছেলেকে ফেলে। আশ্চর্য—বিশ্বালয়ের কর্তৃপক্ষকে তিনি একখানি চিঠি দিয়েছিলেন—: বন্ধুগণ! আমার ক্ষমা কোরবেন। অনেকগুলি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েচি—যা আমার জীব-বিদ্যার সমস্যাগুলির চেয়ে অনেক জরুরী—এবং হয় তো সেগুলির জবাব পেলেই ঐ সমস্যা-গুলিরও উত্তর আপনিই পাবো। তাই আমি চললেম সেই উত্তরের খোঁজে। অবশ্য সে উত্তর আমি পাবো নিজের কাছ হ'তেই—তবু তার জন্ম চাই সাধনা, আর বিশেষ ধরণের জীবন-যাপন। তাই আমার এখন এমন পারি-পার্শ্বিক চাই—যেখানে ঐই দুইটি সম্ভব হয়। সে স্থান আছে ভূমে। আমার জন্ম ভাববেন না—ভালোই থাকবো আমি সেখানে। (ঐ চিঠিটা বৈজ্ঞানিকের বন্ধু সহকর্মী গটীশের হাতে দিয়েছিলেন এবং গটীশ সেখানাও ঐ প্যাকেটে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলো।—সহকর্মীটি আরও বলেন গটীশকে: আপনার বন্ধুকে লিখবেন হিমালয়ে ওয়াইমারকে খুঁজতে—সেখানেই হয়তো তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব। বন্ধু এই সব আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অবজ্ঞা-ভরে মন্তব্য কোরে আক্ষেপ জানালেন: ওঃ কি ভালোই তিনি নিজের অমন জ্ঞান আর শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় কোরলেন—জার্মানীতে থেকে কাজ চালিয়ে গেলে জীব-বিদ্যার কি উৎকর্ষই না ঘটাতে পারতেন ওয়াইমার—সঙ্গে সঙ্গে কি নির্মমভাবেই না নিরুদ্দেশ হলেন স্ত্রী-পুত্রের কাছ হতে—অমন সোনার সংসার ভেঙে—ওঃ!

গটীশ ওয়াইমারের দেশের বাড়ীতে গিয়ে দ্বিতীয় কাহিনীটি পেয়েছিলো। বৈজ্ঞানিকের পিতৃপুরুষের বাস-স্থান গ্রামটি কোলোন হ'তে পাঁচ সাত মাইল দূরে। মস্ত বাগানওলা সেকেলে বাড়ী। গোলাপের বনে পরীর মাথার কেশের চূড়া হতে ঝিরঝির করে ফোয়ারা ঝরছে—সমস্থানে কেমন এক স্নিগ্ধতা। সেখানে ওয়াইমারের এক দূর-সম্পর্কের ভায়ের সঙ্গে গটীশের দেখা হয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবিবাহিত—একাই থাকেন অতো বড়ো বাড়ীতে দুটি চাকর নিয়ে। অতো বড়ো বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলায় খুব বিরক্ত। তিনি গটীশকে অনেক কথাই বলেন: ওয়াইমার লোকটাই ছিলেন খাম-খেয়ালী।—তাঁর ছেলেটি অনেকদিন ধরে ভুগছিলো। ওয়াইমার তার চিকিৎসা এক রকম নিজেই কোরছিলেন—অবশ্য তাঁর বন্ধু একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতেন। অসুখ ভালোর দিকেই যাচ্ছিলো—এমন সময় হঠাৎ একদিন ওয়াইমার আর কলেজ হ'তে ফিরলেন না। বৈজ্ঞানিকের ভায়ে দুঃখ কোরে বললেন: ওয়াইমার এই রকমই একটু খামখেয়ালী ও খামখেয়ালী ছিলেন। তাঁর চলে যাবার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠবার পর তাঁর স্ত্রী ছেলের চিকিৎসার জন্ম বার্লিন চলে যান। সেখানে যে কি হোলো—কোনো খবরই আজ পাঁচ বছর ধরে খোঁজ কোরে কিছু জানতে পারিনি। কিছু টাকা তাঁর ছিলো—শুনেছি ছেলেটির নাকি অসুখ বেড়ে যায়, আর তার মা তাকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে একটি খবর নেই, চিঠি নেই—কিছু না। এমনই সব দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোক!

যতীশ ভদ্রলোকের অনুরোধে সমস্ত বাড়ীটি ঘুরে দেখে এসেছিলো। লাইব্রেরী-ঘর, ল্যাবোরেটরী, ড্রইংরুম, শোবার ঘর—একটু প্রাচীনভাবে সাজানো—সব জায়গাতেই রাশি রাশি বই। ভদ্রলোক বললেন: অনেক বেচে দিয়েছি—কি হবে ওগুলি এখানে ফেলে রেখে পোকায় কাটিয়ে? যতীশ শোবার ঘরের দেওয়ালে একখানি বিরাট আলোক-চিত্র দেখলো—হাসিমুখ সুন্দরী মায়ের গলা জড়িয়ে একটি ৬।৭ বছরের ফুটফুটে ছেলে—নীচে ওয়াইমারের হাতে লেখা—'কাল-সমুদ্রে দুটি ঢেউ।' ভদ্রলোক বললেন: ছবিটি আমার তোলা, আর ঐ নামকরণটিও তাঁরই হাতের লেখা—বুঝতে পারছেন তো ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান একটু কমই ছিলো।

ভদ্রলোক ওয়াইমারের দুই তিনটি বিভিন্ন বয়সের ফটো ও কতকগুলি হাতে লেখা কাগজ-পত্র (সেগুলি ইংরাজীতে লিখেছিলেন) যতীশকে দিয়েছিলেন। যতীশ সে সবই আমার ঐ রেজিস্ট্রী প্যাকেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। আমি পরম যত্নে সেগুলি রেখে দিলুম। বৈজ্ঞানিকের একখানি সাম্প্রতিক ফটো ও দুই তিনটি চিঠি আমার নিজস্ব ডায়েরীর সঙ্গে সবসময়ই ভেতর পকেটে ঠাঁই নিতো। আমার অতৃপ্ত কৌতূহল ঐ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে নানা ভাবনায় কেবলই ঘুরপাক খেয়ে ফিরতো। ভাবতুম এই অদ্ভুত মানুষটি নিশ্চয়ই সাধারণ একজন রামখেয়ালী লোক নয়। তাঁর পরবর্তী জীবন ও ধ্যান-ধারণা সে কি রূপ গ্রহণ করলো কিছুই জানতে পারলুম না—কেবল নানা কল্পনাতে চিন্তার জাল বোনা চলে। তারপর এই বিশ বছর ধরে নিজের নানা ভাবনা ও কাজকর্ম এবং সাংসারিক ব্যাপারে 'ওয়াইমার প্রহেলিকা'ও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এলো—যদিও ওয়াইমার নামটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিকৃতির সেই দীপ্ত প্রশান্ত মুখ আর সরল টানাটানা হস্তাক্ষর মেঘ-রৌদ্রভরা আকাশে ক্ষণিক-দেখা রামধনুর মতো ভেসে উঠতো।

…কিন্তু জগতে মানব-বুদ্ধির অগম্য সব বিস্ময়কর ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দেয়—তাই বৈজ্ঞানিক ওয়াইমারের পরবর্তী জীবনের রহস্যপুরীর দুয়ারও আমার সমুখে হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে উন্মুক্ত হলো। গত বছর অফিসের কাজে হঠাৎ শ্রীনগর যেতে হলো। কাজ-কর্ম যদিও ভালভাবেই মিটে গেলো—হঠাৎ রওনা হবার দুদিন আগে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লুম। কোন মতে টাঙ্গায় কোরে কাছের এক ডাক্তারখানায় গিয়ে হাজির হলুম। ডাক্তারসাহেব চেম্বারে আমার পরীক্ষা কোরছেন, এমন সময়ে ওপাশে ওষুধ নেবার জায়গায় কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে একজন কাশ্মীরী বৃদ্ধের কণ্ঠ-স্বরে খুব কথা কাটাকাটি ও বচসা শুনলুম। সব কথার মর্ম না বুঝলেও বুঝলুম কম্পাউণ্ডার বলছে: এ ওষুধ পাবে না—ডাক্তারের সই নেই প্রেসক্রিপসনে। তাছাড়া এর কয়েকটা ওষুধের নামই শুনিনি। কিসে কি হবে—শেষটা কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের। অপরদিকে শুনলুম: গরীব মানুষ হুজুর—মেহেরবানি কোরে ওষুধ দিয়ে দিন—আট নয় মাইল পথ ভেঙ্গে আমরা পাহাড়-জঙ্গলভরা গ্রাম হ'তে এসেছি—সেখানে লোকালয়ও নেই—ডাক্তারও নেই। দুই মাস ধরে দুবছরের ছোট্ট নাতিটি ভুগছে! হুজুর মা-মরা ছেলে। ওষুধ-পথ্য কিছুই দিতে পারিনি ভালো কোরে—ছেলে যায় যায়—হঠাৎ দুদিন আগে গভীর রাত্রে আমার কুঁড়ের ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলেন এক মহাদেবের মতো সন্ন্যাসী (এইখানে বৃদ্ধের গলা আবেগে বুজে গেলো) শিশুর মাথায় হাত রেখে তার শিয়রে দাঁড়ালেন তিনি… সঙ্গে সঙ্গে রোগীর রোগ যেন অর্দ্ধেক কমে গেলো। হুজুর! এই চিরকুট তাঁরই হাতের লেখা—এ কখনো মিথ্যা হতে পারে? ওষুধ দিয়ে দিন হুজুর—গরীবকে বাঁচান!

—ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষা শেষ হয়েছিলো—ওদিকে কোনও মীমাংসা তখনও হয়নি, অতএব আমরা দুজনেই এক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলুম। কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপসনটি ডাক্তারের হাতে দিলে—আমিও সেইদিকে চেয়েই যেন এক প্রচণ্ড বিস্ময়ের নাড়া খেলুম—অভিভূতভাবে চেঁচিয়ে উঠলুম: একি ওয়াইমারের হাতের লেখা? ডাক্তার সাহেব, আপনি শীঘ্র এ ওষুধ দিয়ে দিন যদি থাকে—এ একজন বিরাট মানুষের দেওয়া প্রেসক্রিপসন! বলতে বলতে প্রত্যাশা-পূর্ণতার আনন্দে কেমন উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারের হাত হ'তে প্রেসক্রিপসনটি হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে সেই দরিদ্র পাহাড়িয়া বৃদ্ধের হাত ধরে ব্যাকুল প্রশ্ন সুরু কোরে দিলুম: কোথায় তিনি? তাঁর দেখা পাবো তো আমি?……

: বাবুসাহেব! তিনি কাল ভোরেই চলে যাবেন অমরনাথের পথে। আপনি কি তাঁকে চেনেন?

: কেমন দেখতে তিনি বলো তো—সাহেবের মতো ?

: তিনি দেবতার মতো দেখতে— দুধারগুভ্র তাঁর দেহের রং, ধবধবে শাদা জটাশ্মশ্রু। মৌনী কিন্তু সর্বজ্ঞ, এই সাধু-বাবার দেখা যে কোন পুণ্যে পেলুম জানিনে। তিনি দিনান্তে একবার সামান্য ফল-দুধ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না—কারো গৃহে রাত্রিবাস করেন না!

: এখন তিনি কোথায় আছেন ? বাধা দিয়ে প্রশ্ন করি।

: আমার কুঁড়ের পাশেই একটি চিনার গাছের তলটি পরিষ্কার কোরে আমার ছেলে ডালপালা লতাপাতা দিয়ে একটি ছোট্ট কুঁড়ে কোরে দিয়েছে। ইশারায় আমাকে কাগজ আনতে বলে এই চিরকুটটুকু লিখে দিলেন, আর ইঙ্গিতে জানালেন যে তিনি নিঃস্ব সন্ন্যাসী—এ অসুখে যে গাছ-গাছড়ার প্রয়োজন, ওষুধ কোরতে তা' দেখতে পাচ্ছেন না—শহর হতে ওষুধ আনতে হবে। আমি তাঁর পায়ে ধরে আমি ফেরা পর্যন্ত দয়া কোরে থাকতে বলেছি—তিনিও শিবের মতো প্রসন্ন হাসিতে আশ্বাস দিয়েছেন আমায়।··· হুজুর! মনে হয় অমরনাথের যাত্রাপথে আমার নাতির শক্ত অসুখের বিষয় জানতে পেরে করুণাবশে তাকে প্রাণ-দান দিতে এসেছেন!···ওষুধ দিন হুজুর—আমি গ্রামে পৌঁছতেই তো ভোর হয়ে যাবে—রাতে তো পথ হাঁটতে পারবো না—চোখে কম দেখি! ডাক্তারবাবু ও কম্পাউণ্ডার দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। ডাক্তারবাবু এবার নিজেই তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপসনে যে কটি ওষুধ তাঁর ছিলো ঠিক করে দিয়ে দিলেন বৃদ্ধের হাতে। আমি বৃদ্ধকে বললুম : তুমি শীঘ্র একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো। বৃদ্ধ অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে বললুম—

: আমিও যাবো তোমার সঙ্গে সাধু দর্শন করতে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ট্যাক্সি চিনার গাছের তলে সাধুর কুটীরের কাছে থামলো। কুটীরের অপরিসর পথে হাঁটুমুড়ে ঢুকে তাঁকে দর্শন কোরে সত্যই ধন্য হলুম। ইনিই কি ওয়াইমার? সাদা জটাজুটভরা সেই গৌরবর্ণ সুন্দর সৌম্য মূর্তি তখন ধ্যানমগ্ন—হিমালয়ের শিখরের মতো স্বচ্ছ দৃঢ় সুগম্ভীর আর তেজোদৃপ্ত। শ্রদ্ধানত মনে—নির্নিমেষ করতোক্ষণ তাঁর পানে চেয়েছিলুম জানিনা—হঠাৎ তিনি তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি হেনে আমার পানে চেয়ে ইঙ্গিতে কাছে বসতে বললেন। মনে হলো তিনি আমার মনের কথা সবই জানেন।

প্রণাম করতেই তিনি মৃদু হেসে আমার মাথায় হাত রাখলেন। আমি সাহস পেয়ে আমার ডায়েরী ও কলমটি তাঁর সামনে রেখে বললুম : আপনি কি বৈজ্ঞানিক ফন ওয়াইমার? আমি আপনার লিখা একখানি জীব-বিদ্যার বইর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে অবধি আপনার সম্বন্ধে সব কথা জানতে আজ বিশ বছর ধরে পরম আগ্রহান্বিত। আপনার দেশ জার্মানীতে কোলোনের সেই গ্রামেও খোঁজ করেছি এজন্য···!

একবার কৌতুক-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি লিখলেন : হাঁ। আমিই ওয়াইমার—কিন্তু তুমি আরও বড়ো বিষয় কৌতূহলী হও না কেন ?

সাগ্রহে বললুম : আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই হবো, ঈশ্বরকে জানবার আকাঙ্খাও আমার কম নয়—তবে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের অভিমুখে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার এই বর্তমান কৌতূহলের নিবৃত্তি করুন দয়া কোরে।—আপনি কেন বিজ্ঞান-সাধনা আর আপনার প্রিয় স্ত্রীপুত্র ছেড়ে এলেন ?

ঈষৎ গাম্ভীর্যের ছায়া পড়লো সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখে—লিখলেন : সে জিনিষ ঈশ্বরকে জানলে তবেই বুঝতে পারবে—নইলে আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে কি হবে তোমার ?—পাগলামী মনে হবে। তবে তাই তুমি জানতে চাইছ মনে হয়। আমার গবেষণাগারের দেরাজে একটি ডায়েরী রেখে এসেছিলেম—সেটি হয়তো আমার সহকর্মী লেম্যানের কাছে পেতে পারো—তাতে আমার মানসিক পরিণতি ও অভিজ্ঞতার আলো কিছু ছিলো।·····জানো! আমার খোকনই এ পথের দিশারী আমার।

—দুজনেই তারপর অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলুম—মনে হলো যেন একই অনুভূতির ছায়া পড়েছে আমাদের মনে। একসময় ধীরে জিজ্ঞাসা করলুম : সে কি বেঁচে আছে ?

: হাঁ—আর সে অতি শীঘ্র আমায় খুঁজে আসবে আমার কাছে।

আমি আশ্চর্যভাবে বললুম : তবে কি আপনার সঙ্গে তাঁদের পত্রালাপ আছে ? কাগজে ছুটে উঠলো—

: না।

ক্রমশঃ

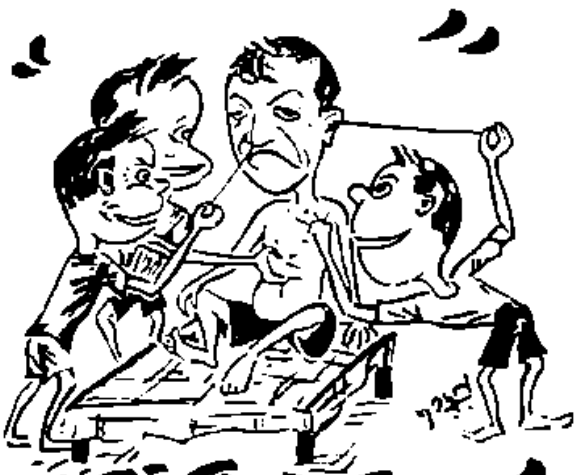

কাতুকুতু

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাবা ডাকে কাতু, মা ডাকে কুতু,
ছয় দিনে মামা নাম
রেখেছিলেন তুতু।
সে দিন ছিল বিদ্যেবারের দিন,
তাই পড়ে কেবল বিরামহীন।
বর্ষা জলে মাঠ ঘাট যায় ভেসে,
সর্দ্দি কাশির সড়ক লাগে দেশে।
লোকগুলো সব ঠাণ্ডা লেগে
হাঁচতে সুরু করে,
পিতৃদেব হলেও আমার
সর্দ্দি কাশি ধরে।
সর্দ্দি কাশে নাক গলা যায় বুজে,
মরা বাঁচা দুয়ের মাঝে
চলেছি আমি যুঝে।
বকে বাবা, মুখ করে ছুঁ ছুঁ,
বন্ধিবলে, খাওয়াও বাসক জল।
হাসাও সবাই যেমন করে পারো,
সুড়সুড়ি দাও, কাতু-কুতু আরও।
সুড়সুড়ি দেয় সবাই ছুটে
আমার নাকে, কাণে,
বগলে দেয় কাতু-কুতু
বাঁচাতে মোরে প্রাণে।
সুড়সুড়ি আর কাতু-কুতু খেয়ে,
খুসির দোলা জাগলো মোর
গোমড়া মুখ ছেয়ে।
তখনি আমি হাসতে থাকি হিহি,
যেটক যেমন চেঁচায় চিঁহি চিঁহি।

বন্ধি, বলে, বাচলে ছেলে ছোর,
কাটল এর সকল বিপদ ঘোর।
সেই থেকে সব কাতু-কুতু
ডাকতে আমায় থাকে,
মামার দেওয়া তুতু নাম
ঘুচল দুশ্চিন্তাকে!

মাদুলি

শ্রীসুধীরকুমার রায়

আমার পিতৃদেবকে নিয়ে সেবারে যে মুস্কিলে পড়েছিলাম তা আর জনসমাজে বলবার মত নয়। সে রকম দায়ে না ঠেকলে কেউই সে কথা যে বিশ্বাস করবে না তাও জানি। তবুও আজ আমাকে একথা লিখতে হচ্ছে শুধু মুস্কিলের চাইতেও তার আসানটা আরও চমকপ্রদ হয়েছিল বলে।

শুনুন তবে—

আমার পিতৃদেব সেকেলে মানুষ। অর্থাৎ কিনা পুরো

বাহাত্তর বছর বয়েসেও তাঁর দাঁতগুলো ঝরেনি আজও। এখনও রোজ ভোর পাঁচটায় বিছানা থেকে উঠে পুরো পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে প্রাতর্ভ্রমণ-সমাধা করে থাকেন। আজকালকার অজস্রধরণের মাজন কিংবা হরেক রকমের টুথপেস্টের ধার ধারেন না তিনি। পথ হাঁটতে হাঁটতে কাঁচা নিমের দাঁতনে দন্ত ধাবনের কাজটুকু বেশ নিখুঁত-ভাবেই নিত্যি সেরে নিয়ে থাকেন। এখনও বেশীর ভাগ দাঁত তাঁর অটুট আছে। দাঁতের ডাক্তারের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়নি কোন দিনই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তাঁর চোখে এতটুকু পুলো দেবার উপায় নেই—এমনই তাঁর চোখের দীপ্তি। তাইতো সেবারে বিজয়ার দিন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটু বেশী মাত্রায় সিদ্ধি খেয়ে যখন আরও একটু বেশী মাত্রায় বেসামাল হয়ে বাড়ী ফিরেছিলাম, তখন বেশ সেয়ানা হওয়া সত্ত্বেও পিতৃদেবের হাতের একটা বিরাশী ওজনের চড়ও সিদ্ধির সাথে আমাকে বেমালুম হজম করতে হয়েছিল। এখনও আমার বেশ মনে আছে, মা আমাকে বলেছিলেন—ওরে বোকা ছেলে, একি তোদের চশমা আঁটা চোখ—তোর বাপের চোখ হচ্ছে নিজের পুকুরের মাছের খড় খড় মুড়ো খাওয়া চোখ, ও চোখকে ফাঁকি দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

আহ্নিক না করে পিতৃদেব আমার জলগ্রহণ করেন না। দেবদ্বিজে তাঁর অগাধ ভক্তি।

এ হেন পিতৃদেবও আমার হঠাৎ একদিন অসম্ভব রকম কাহিল হয়ে পড়লেন। তাঁর নিত্যকার্যে বাধা পড়তে লাগলো, আর তিনি ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনও তাঁর বন্ধ হয়ে যায়। নিমের ডাল ভেঙে দাঁত ঘসাও আর হয় না। আহ্নিক করতে বসে অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই মুখ সিঁটকে সেখানে মাগো বলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েন। ডাক্তার বদ্যি চিকিৎসার আর অন্ত নেই। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হয় না। একবাক্যে সকলে তখন বলতে থাকে, এ চলো আসল অম্লশূল। কোন ওষুধেই এ রোগ সারবার নয়। মহাপাপ না করলে এ রোগ কখনও হয় না। যদি সারে তো দৈবতেই সারতে পারে।

এসব মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে হাসি। কারণ সত্যি কথা বলতে কি—মহাপাপ তো দূরের কথা, সামান্য পাপের কাজও কোনদিন জ্ঞান হয়ে আমি পিতৃদেবকে করতে দেখিনি। বরং পাপের কথা ধরলে অম্লশূল আমারই হওয়ার কথা। কেননা প্রতিদিন আমি লোককে কত-ভাবে ফাঁকি দিচ্ছি তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার ঘরে যে দু' আলমারি মোটা মোটা বই ঠাসা দেখেছেন, তার একখানিও আমি নগদ পয়সা দিয়ে কোনদিনই খরিদ করিনি। সবগুলোই পড়তে নিয়ে ফেরৎ দিতে ভুলে যাওয়ার মুনাফা। তাছাড়া আমি নিজে তো বটতলার উকিল। বুঝতেই পারছেন, সারাদিন তোর আমাকে কত পাপের কাজ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করতে হয়।

যা হোক কিছুতেই যখন কিছু হলো না, তখন পাড়ার যামনদিদি এসে পিতৃদেবের কাণে এক মন্ত্রণা দিয়ে গেলেন যে খাপখাড়া গোবিন্দপুরের পীরানন্দ স্বামীর মাদুলি নাকি অম্লশূলে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। ধারণের তৃতীয় দিনেই রোগের পরিসমাপ্তি।

পিতৃদেব তো নাছোড়বান্দা। সেই মাদুলি নাকি আমার এনে দিতে হবে। যে ব্যক্তি সেই মাদুলি আনতে যাবে, তাকে নাকি সারাটা দিন উপোসী থাকতে হবে। মাদুলি এনে রোগীর হাতে না পরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত জলগ্রহণ করতে পারবে না সে। তার মানে—যাকে বলে একেবারে শিবরাত্রির উপোস আর কি। অথচ ঘুম থেকে উঠে বিছানায় শুয়ে বাসিমুখে চা না খেলে আমার কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয় না। কিন্তু সে কথা তো আর প্রবীণ পিতৃ-দেবকে মুখ ফুটে বলা যায় না—তাহলে নির্ঘাৎ হাতের যষ্টিটির ওপর শরীরের সমস্ত ভর আরোপ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে দুর্বাসা মুনির মত রোষকষায়িত নেত্রে ফরমান জারি করবেন—অপদার্থ কুলাঙ্গার, তোমাকে আমি অদ্য হইতে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম।

দরকার কি আমার ওসব ছেঁড়া ন্যাকড়ায়। সে জন্যে পিতৃদেব প্রস্তাব করা মাত্র আমি অতি বাধ্য ছেলের মত বললাম—তথাস্তু।

কিন্তু তারপরে কি করলাম?—কিচ্ছু না। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রবিবারটি উপভোগ করলাম বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তাস পিটে। শুধু কি তাই—বন্ধু পত্নীর পেলব হস্তের ঘন ঘন ধূমায়িত চায়ের সদ্ব্যবহার, দুপুরে পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে বেরাল ডিঙোতে পারেনা এমন এক থালা ভাত গলাধঃ-

করে। সর্বশেষে বন্ধু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দ্রাণীর ভরন ও খেয়ালে নিজেরই আজকাল খেয়াল থাকে না যে কখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

বাড়ী ফিরলাম বেশ রাত করে। এসেই পিতৃদেবের হাতে ভক্তিভরে পৈতের গুচ্ছো দিয়ে মাদুলি পরিয়ে একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম টান টান হয়ে। মা ছুটে এলেন—আহা বাছার আমার মুখখানা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। উপোস করা তো সাত-জন্মে অভ্যেস নেই। নে আয়, হাত-মুখে জল দিয়ে আগে দুটি খেয়ে নে।

আড়চোখে দেখলাম পিতৃদেবের মুখখানিতে গভীর পরিতৃপ্তি। ভাবখানা যেন এই—কোথায় লাগে এর কাছে রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি।

কী আশ্চর্য মাদুলী ধারণের ঠিক তিনদিনের পর থেকেই পিতৃদেবের অমন যে বহুপালক অম্লশূল, সত্যিই তার আর চিহ্নমাত্র রইলো না। রোগমুক্ত হয়ে তিনি আবার আগের মতই প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। বামনদিদিও বেশ দো পেয়ে খুব বড়াই করে বলতে থাকেন—দেখলে তো পেরদুম, আমি বলিনি অমন বৈদ্যি ওষুধ আর কখনও হয় না। যাকে বলে একেবারে হাতে হাতে ফল।

বামুনদিদির এহেন কথা শুনে পেরদুম অর্থাৎ কিনা আমার বয়োবৃদ্ধ পিতৃদেব মাথায় হাত ঠেকালেন। বোধহয় অমন গুণের দেবতার উদ্দেশে তাঁর প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন।

আমি মনে মনে আর একবার একটু হাসলাম। মাদুলি ধীরানন্দ স্বামীর কাছ থেকে আনা নয়—ওটি আমারই স্বকপোল-কল্পিত। হরের দোকানের দু'পয়সা দামের তামার একটা মাদুলি এবং আমার বন্ধুবর গজানন পাকড়াশির সিমেন্টটা উঠনের এক চিমটে মাটি—তাতেই এই আশ্চর্য ফল! তাইতো ভাবছি আমার পেশাই যখন মিথ্যে নিয়ে—তখন ওকালতি ছেড়ে দিয়ে এবারে মাদুলির এই নতুন ব্যবসায়ে নামবো কিনা……

খাই খাই

শ্রীপার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাথা খাও শোন এসে খাইবার কথা,
ভ্যাবাচাকা খায় যত বেয়াকুব হাঁদা।
কলা খায় হনুমানে বুড়ো খায় ভিরমি,
লাট খায় ডাক দুড়ি—চিনি খায় কিরমি।
টোল খায় ঘটিবাটি লাগে যদি ধাক্কা,
বোকা ছেলে বোল খায় পেট ভরে পাকা।

বুল খায় দারোগারা, ঘাস খায় ছাগলে,
পাক খায় গুলি সুতা—কি না খায় ছাগলে?
হাওয়া খান বড়বাবু সন্ধ্যা ও সকালে,
'লস' খায় ব্যবসায়ী তার পোড়া কপালে।
ভয় খায় ভীতু যারা টাকা খায় দালালে,
গুলি খায় জনতারা—সরকারে আগালে।

খাই খাই চারিদিকে যেথা চলে সৃষ্টি,
খেতে হয় সব শেষে ঘুষি আর মিষ্টি।

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

BP. 160-X52 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে, পক্ষে হিন্দুস্থান লীভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও ফার্সি-শব্দের বাহুল্য, এই দুই শক্তির মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যে দ্বন্দ্ব চলে তার মধ্যে থেকে সাধুরূপপূর্ণ বাংলা গদ্যের সাহিত্য ক্ষেত্রে উদ্ভব হয় উনিশ শতকের প্রথম পাদে—প্রথমত নবীন রাম-মোহনের প্রচেষ্টায় ; দ্বিতীয়ত নবীনীপ্রবর বিদ্যাসাগরের সাধনার জোরে ঐ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলা গদ্যসাহিত্য দুই কূলের বাঁধন করে। শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা সেই গদ্যভাষা সৌন্দর্যসুষমায় ভূষিত হয়ে লীলাচঞ্চল রূপ লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকে এই সুগঠিত গদ্যের মধ্যে থেকে আবার দুটি ধারার উদ্ভব হয় ; একটি হচ্ছে লেখ্য কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার গদ্য, অপরটি শিষ্ট সমাজের কথ্যভাষার গদ্য যা বলায় ও লেখায় সমান কাজের। এই দুই ধারা পরস্পরবিরোধী শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে। তাদের নতুন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রথম প্রস্তুত করলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের অভিমতও রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ধারার বিশেষ অনুকূল ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এসে এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরিণত হল প্রথম চৌধুরীর সবুজ প্রয়াসে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কথ্যভাষার গদ্যের শক্তিই জয়লাভ করেছে। তবে তার জন্যে চলতি ভাষার গদ্য লেখ্যভাষার গদ্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করে নবীভূত হয়েছে। বিংশ শতকের পরবর্তী পাদে অর্থাৎ ১৯২১ সাল-পরবর্তী যুগে কথ্য-ভাষার গদ্যের প্রাধান্যলাভ সুনিশ্চিত। তার সমস্ত লক্ষণ এখন সুপরি-স্ফুট। পরে সে-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

সংস্কৃত ও ফার্সি, দুই ভাষার বিরুদ্ধ চাপে ১৮০৮ সালের অব্যবহিত আগে বাংলা গদ্য যেন মরমরি হয়ে পড়েছিল। তখন চিঠিপত্রে চলতি ফার্সির অবাধ প্রতিপত্তি আর সমস্ত বিষয়-প্রকল্পে ছিল নীরস সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা গদ্যের আধিপত্য। দুই প্রভাবের মধ্যে বাংলা ভাষার ধাতুপ্রকৃতির পক্ষে ছিল সংস্কৃত-প্রভাব বেশি অনুকূল ও বাঞ্ছনীয়। ইতিহাসের গতিও সংস্কৃত প্রভাবের প্রতি আনুকূল্য করল যে, সাধারণভাবে সমস্ত শিক্ষিত বাঙালি সমাজ এবং বিশেষভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজ থেকে ফার্সি প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। ১৭৭৮ সাল থেকে বিদেশি সরকারের আনুকূল্য বাংলা ও সংস্কৃতের পক্ষে এবং বিশেষভাবে ফার্সির বিপক্ষে পরিচালিত হল। তার অনিবার্য পরিণামে বাংলা গদ্যভাষা থেকে ফার্সির প্রভাব ক্রমে ক্রমে উবে গেল। বিদেশি ইংরেজ সরকার বাংলাদেশে মুসলমান শাসক শক্তি ও তার ভাষা ফারসিকে প্রথমে মুনজরে দেখেনি কেন, তা সহজেই বোঝা যায়।

ফার্সি প্রভাবের যাদুমোহক পরিবেষ্টন থেকে বহুদিন পরে মুক্তি পেয়ে বাংলা গদ্য সহজেই বহুদিনসঞ্চিত আবর্জনা দূর করতে পারল তার নবীন প্রাণোচ্ছলতার সাহায্যে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় কয়েকজন শক্তিশালী জাতি-সংগঠক বাঙালিদের অধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁরা ইংরেজদের বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার প্রতি অনুকূল মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নবলব্ধ ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি-জাত নব উদ্দীপনার সাহায্যে স্বজাতি ও স্বভাষার সমৃদ্ধি সাধনে বদ্ধপরিকর হন। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরা বর্জনমূলক মনোভাব গ্রহণ না করে বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পোর্তুগীজ ভাষার সাহিত্যে এসে বাংলা গদ্যভাষা যতটা উপকৃত হয়েছিল, ইংরেজির সাহচর্যে এসে তার চেয়ে ঢের বেশি সুফল পেয়েছিল। নবগঠিত বাংলা গদ্য প্রথমে অতি-উৎসাহী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নির্মুক্তিতার জন্যে একটু জবুথবু হয়ে গেলেও শীঘ্রই স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের ফলে তার একটি সুললিত গদ্যভাষা গড়ে উঠল। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে, এমন এক উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হল যার তুলনা দাবা এশিয়ায় মেলে না। জগতের শ্রেষ্ঠ গদ্যসাহিত্যগুলির সঙ্গে সে এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াল।

দীর্ঘকাল ধরে একমাত্র অভিনন্দিত ভক্তিপ্রাণ কাব্যসাহিত্যের চর্চা করে বাঙালির অন্তরাত্মা অষ্টাদশ শতকে বিরাট ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল, সে যে গদ্যের সাহায্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে প্রাক্-আধুনিক গদ্য লিখক-প্রবন্ধ গুলিতে। শুধু গদ্যের প্রতি রচনাশৈলীগত অনুরাগই নয়, এই সময়ে বাঙালির অন্তর যুক্তিতর্ক সংশয়ের তাড়নায় নতুন ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশের জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। যুক্তিতর্ক সংশয়ের সবচেয়ে ভালো বিকাশ-মাধ্যম হচ্ছে গদ্যভাষা। সেইজন্যেও এই সময় গদ্যরচনার চাহিদা ও চেষ্টা বেড়ে যায়। ধর্মসম্পর্কিত বিতর্কমূলক রচনায় গদ্য প্রায় অপরিহার্য।

কিন্তু অভাবে গদ্যরচনার প্রধান বাধা রয়ে গেল মুদ্রাযন্ত্রের অভাব।

তার হাতেই ভারতচন্দ্রের পরিশীলিত ভাষা গদ্যের যথোচিত পরিণতি লাভ করতে পারল না। তাঁর গদ্যরচনার উপাদান রীতি গদ্যভাষার প্রতিফলিত হলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আমরা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক গদ্য দেখার সুযোগ লাভ করতাম। ভারতচন্দ্রও তাঁর প্রতিভার পূর্ণ সার্থকতার সন্ধান গদ্যরচনাতে খুঁজে পেতেন। ফলত উপযুক্ত সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবেশে প্রবর্তিত হলে কবিকঙ্কণ কবি না হয়ে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হতেন। যাই হোক, ইংরেজ-আমলে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সাহিত্যিকের অভীপ্সা বাস্তবে প্রসূত হওয়ার সুযোগ পেল। অচিরে অন্য প্রদেশীয় দেশগুলির মতো এখানেও গদ্যরচনাই মুখ্য স্থান অধিকার করল।

যদি ভারতচন্দ্রের পদ্যের ভাষাকে সোজাসুজি গদ্যের রূপ দেওয়া যেত, তাহলে হয়ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের এত কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হত না। ভারতচন্দ্রের ভাষার গদ্য রূপান্তরের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেত সাবলীলতার ললিত মোহন ভাষাসৌন্দর্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হল না। সাময়িকভাবে প্রচুরতম তৎসম শব্দের পাষাণভার বাংলা গদ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। তার একটা ফলও অবশ্য ফলেছিল। বাংলা গদ্যের গঠন হল প্রস্তরবৎ সুদৃঢ় এবং ভাবী আক্রমণের মুখে অটল ও দুর্ভেদ্য। এইজন্যে পরের যুগে বাংলা গদ্যভাষায় প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি বাগ্‌ভঙ্গি প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু ইংরেজি শব্দাবলীর আক্রমণে বাংলাভাষা তেমনভাবে জর্জরিত হয়নি যেমন হয়েছিল ফার্সি-ভাষার দ্বারা।

ভারতচন্দ্রের পদ্যরচনাকে গদ্যরূপ দিলে কেমন হত, তার একটু নিদর্শন দেওয়া যাক :—

"প্রসাদগুণ রবে না, রসাল হবে না। অতএব যাবনী-মিশাল ভাষা যদি। প্রাচীন পণ্ডিতগণ কয়ে গিয়েছেন, ভাষা যে হোক সে হোক, কাব্য রস নিয়ে।"

এই ধরণের ভাষার পরিবর্তে আমরা দীর্ঘকাল কৃত্রিম সাধুভাষার কাজ চালাতে বাধ্য হয়েছি। ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টায় ও বৈদেশিক সহায়তায় মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের আগে বাংলা গদ্যের যে দুই ধারার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তাদের মধ্যে সংস্কৃতপ্রভাবিত ধারার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যা ১৭৭৮ সালের আগে লেখা, নিচে তুলে দেওয়া হল :—

গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়, তাহা কৃপা করিয়া বলহ।" তাহাতে গৌতম উত্তর করিয়েছেন, তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়," তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদার্থ কত?" তাহাতে গৌতম কহিতেছেন, "পদার্থ সপ্ত প্রকার; দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব।"

"ভাষা পরিচ্ছেদ"—এর ঐ উদ্ধৃত অনুবাদের ভাষা থেকে এখন বোঝা যায় যে, ১৭৭৪-৭৫ সালের ঐ গদ্যে ইচ্ছা করলে সাহিত্য সৃষ্টি করা যেত। যখন স্বয়ং ভারতচন্দ্র বলছেন, "যে হোক সে হোক ভাষা, কাব্য রস নিয়ে," তখন কোন যোগ্য রসস্রষ্টা সাহিত্যিক তাঁর অভিমত অনুসারে চেষ্টা করলে যে ঐ গদ্যভাষা নিয়েই বাংলা গদ্য সাহিত্যের গোড়াপত্তন করতে পারতেন, তাতে আর কোন ভুল নেই। কিন্তু নানা কারণে কোন সাহিত্যিক সে-কাজে উৎসাহ বোধ করেননি। অথচ উনিশ শতকে ওর থেকে খারাপ ভাষাতেও সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ফার্সিপ্রভাবিত ধারার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আলোচনা করা যাক। এই ভাষার উদ্ভব ১৭৪১ সালে :—

"আমার সন্তান রহিত। তুমি কন্যা; আর কেহ ক্রিয়া আদি আমার করে, এমত নাই এই রূপ। ক্রিয়াকর্তা তুমি। একারণ, আমি স্নেহপূর্বক আপন অট্টালিকা ও ভূমি ও পুষ্করিণী নাকিম তলকীল সমস্তপ আঠার বিঘা—ব্রহ্মোত্তর পৈত্রিক ও যোপার্জিত—ও শিষ্যসেবক যেখানে যে আছে তাহা সমস্ত বিচারকৃতা তোমাকে দিলাম। যে তক জীবিত থাকিব, তদবধি আমার ও আমার স্ত্রীর সেবা ও শুশ্রূষা আদি করিবেক, করিয়া ধর্মকর্ম যথাযোগ্য করাইবা। অন্যেষ্টি ক্রিয়া আদি করিয়া, নাকিম তলকীল ভূমি আবাদ তবদুস্ত করিয়া ও শিষ্যসেবক বহাল রাখিয়া, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিয়া ইহার দানবিক্রয়ের স্বত্বাধিকার তোমার। আমি কিম্বা আর কেহ দাওয়া করে, সে ঝুটা ও বাতিল। এতদর্থে দানপত্র দিল।"

এই ভাষার সাহায্যেও সাহিত্যসৃষ্টি করা যায়।

ভারতচন্দ্র গদ্যরচনায় নবীন সেনার ভাগীরথীতীরবর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষার ব্যবহার করতেন যদি তাঁর গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করার ইচ্ছা হত, এমন অনুমান করলে দোষ হবে না। কেন-না, তাঁর কাব্যে ঐ ভাষার প্রভাব প্রবল। ১৭৮৯ সালের ভাদ্র মাসের "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় রাধা নবকৃষ্ণ দেবের নামে যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তা প্রায় ঘরোয়া ভাষায় লেখা। সে-ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি উপভোগ্য হতে পারত। সেটি ১৭৭০ সালের আগেই লেখা; কারণ, তাতে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আছে।

১৭৭৪ থেকে ১৭৭৮ সালের বাংলা গদ্যভাষার বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই সময়ে বাংলা গদ্য প্রথম প্রবন্ধ রচনার উপযোগী হয়ে উঠল। আগের যুগের গদ্যভাষায় প্রাঞ্জলতা ছিল। কিন্তু একটা বক্তব্যবিষয়ের বর্ণনায় ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে বিষয়টির সম্পূর্ণ বিবরণ রচনা করবার সামর্থ্য ছিল না। অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যে সাহিত্যের কোন লক্ষণ বা রীতি দেখা না গেলেও তা সুসংবদ্ধভাবে মনোভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছিল। আগে উদ্ধৃত নানা দৃষ্টান্ত থেকে একথা বোঝা যায় যে, এ যুগে বাঙালির গদ্য রচনার প্রবণতা এবং গদ্যে মনোভাব পরিস্ফুটনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য তখনও তার গদ্যরচনার পেশা সাহিত্যের রস উপচে পড়ে নি। কিন্তু দুর্বোধ্য ফার্সি শব্দের আধিক্য এবং সংস্কৃতানুগ আড়ষ্টতা সত্ত্বেও এযুগের গদ্যে সাহিত্যরচনার উপযুক্ত গুণ অন্তর্নিহিত ছিল। এমনকি উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের অনেকের গদ্যভাষার তুলনায় এযুগের গদ্য বেশি এগিয়ে গিয়েছিল।

কেবল ছাপাখানা ও উপযুক্ত সাহিত্য-সাধকের অভাবে তখন গদ্য-সাহিত্য গড়ে উঠতে পারেনি। তবে এজন্যও মনে রাখা দরকার যে, অনেক ফার্সিবহুল বাংলা চিঠির ভাষার চেয়ে এ সময়ের খুলনা বহুর আমের বাংলা গদ্যভাষা বেশি উন্নত ছিল।

সাধারণত দেখা যায় যে, রাজধানীর প্রগতিশীলতা মফঃস্বলে পৌঁছতে দেরি হয়। এইজন্যে সমাজের উচ্চতম স্তরের শিক্ষাদীক্ষার দাবিদিবার সাধারণ লোক অনেক পেছিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের বিদ্যুচ্চমক উন্নতি হয় বিশেষত ইংরেজি গদ্যভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে। কিন্তু তার প্রভাব সাধারণ বাঙালির চিঠি লেখার ভাষায় অনেক পেছিয়ে এসে পড়ে। এই জন্যে, শিক্ষিত নাগরিকের পরিচ্ছন্ন পোষাক অল্প গ্রামবাসীর দ্বারা পরিহিত হওয়ার মতো, সাধারণ বাঙালি লোক-ব্যবহারে ফার্সির বেতাল-মেশানো বাংলা গদ্য প্রয়োগ করেছিল বহুদিন পর্যন্ত। প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন-এর ছত্রে ছত্রে তার বহু নিদর্শন আছে।

১৭৭৮ সালে যে-যুগ সুরু হল তা ফার্সি বর্জন ও সংস্কৃত বরণের যুগ। ১৮৩৫ সালে ফার্সি প্রয়োগের প্রবণতা শান্ত হবে এল রাজদরবার থেকে ফার্সি চূড়ান্তরূপে বিতাড়িত হল দেখে। কিন্তু তার আগে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষাসরস্বতী প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় "কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন।"

ক্রমশঃ

সহচরী

পুলক আঢ্য

বিগত-যৌবনা কোন কুমারীর মত—
দিনগুলি যবে মোর অনাস্বাদিত কামনায়—
জ্বলে জ্বলে ওঠে, আর সে জ্বালায় জ্বলে সারা মন,
সেই সব বন্ধ্যা দিনে—তোমারে প্রসব-বেদনায়—
বিধুর হইয়া ওঠে—সারা মর্ম মোর,
সেই সব বন্ধ্যা দিনে তুমি আলো বন্ধুর মতন।
আবার যখন কোন অভিসারিকার প্রীতি সম—
সুগোপনে মনে মনে বয়ে যায় প্রেম কল্পধারা,
জীবনের সে বসন্তে—সেই সে ফাল্গুনে—
তোমারে নিকটে পাই। নিবিড় করিয়া বক্ষ'পরে
ধরিয়া রাখিতে চাই—অয়ি প্রিয়তমে।
তবুও সেদিন তুমি চলে যাও লীলা অবসানে,
পরকীয়া প্রেমসম সে পাওয়াও সামান্য ক্ষণিক,
নিদাঘ মধ্যাহ্নে মোর রহেনাক মাধবীর গানে।
কিন্তু সেই গান, আহা সেই সব গানগুলি কবে—
মরিতে জানে না, মনে পাতা থাকে আসন তাহার,
যাহারা আসিয়া ছিল বন্ধ্যা দিনে বান্ধবের মত।
হৃদয় হারায় তাই—নয়নের সারে,
হাসিতে হারাই ভারে—হারাতে যে চেয়েছে আমারে।
তাই যত বন্ধ্যা দিন—গানে গানে বন্ধু হ'য়ে আছে।

তিব্বতী লোক-সংগীত

জীবনকৃষ্ণ দাশ

পারস্পরিক

হিজল গাছের ছায়ার কাছে ঠাঁই পেয়েছে পাখি,
সেখান থেকে পালানো তার সাধ্য আছে নাকি ?
স্নেহ-কৃতজ্ঞতায় ওরা জড়িয়ে পরস্পরে
আসবে আসুক ঈগলপাখি ভয় ওরা না করে।

চপলা নারী

মায়ের গর্ভে জন্মেছে অই নারী !
না, না জন্মেছে সে পীচ গাছের ডালে
তাই বুঝি ওর প্রেমটুকু হায় !
চোখের পলক ফেললে শুকায়
পিচ ফুলেরে ও—ছি ! ছি ! হার মানালে।

উৎস, যার হিয়ার অতল তল
কালি দিয়ে লিখ যে কথা তুমি কাগজ'পরে
মুছে যায় পেলে জল,
কিন্তু সে কথা মুছিবে কে বল উৎস যার
হিয়ার অতল তল,
মুছিতে তাহারে চাওনা যতই দেখগো শুধু
হয় সে আরো উজল।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধূলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধূলোময়লায় ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধূলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা ঝরঝরে বোধ করবেন। **প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।**

L. 246-X52 BG

হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

কাঞ্চী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

একটু উঁকি দিয়েই কাঞ্চী বেড়ার ধারে সরে এল।

সিলভার-ওক আর পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে পিচ গলিতে রাস্তা উঠে এসেছে। হালকা কুয়াশায় সব অস্পষ্ট। কিন্তু কাঞ্চী ঠিক দেখতে পেল। বটল-গ্রীন সোয়েটার, মাথায় কালো টুপি, ছাই-রঙা প্যাণ্ট। দীর্ঘ একটি দেহ দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে।

প্রথম প্রথম খুব হাসি পেত কাঞ্চীর। কোথায় শীত, তার ঠিক নেই। এখনও ফাল্গুনেও এক টিলতে বরফের রেখা নেই, কিন্তু সমতল দেশের মানুষগুলো সোয়েটার, কনফর্টার, আলষ্টার, লংকোট সব জড়িয়ে অদ্ভুতভাবে ঘোরা-ফেরা করে। সর্বাংগ মুড়ে। কোথা দিয়ে যেন একটু শীতের ঝলক না গায়ে লাগে। নিজেরাতো এমনভাবে সাজেই, ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে পর্যন্ত উলের পুঁটলি ক'রে তোলে।

এবার বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু-হাত প্যাণ্টের পকেটে, মাথার টুপিটা একটু হেলানো। পাইন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে।

কাঞ্চী আরো একটু সরে দাঁড়াল। বুনো গোলাপের ঝাড়টা ডালপালা বিস্তার করে সামনের সব কিছু ঢেকে রেখেছে। দেখবার উপায় নেই।

লোকটি পকেট থেকে রুমাল বের করে আলতো ঘাড় আর কপাল মুছে নিল। ঘাম নয়, পাতলা কুয়াশা জমেছে। হালকা রুপোলী পাতের মতন। তারপর রুমাল পকেটে পুরে হন হন করে এগিয়ে গেল।

সিমেন্টের সাঁকোটা পার হয়ে যেতেই লোকটিকে আর দেখা গেল না। ছোড়া পপলার গাছটার আড়ালে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল।

নিশ্বাস ফেলে কাঞ্চী বাড়ীর ভিতর চলে গেল। সারাটা বিকেল পার হয়ে যাবে, সারাটা রাত, আবার সেই সকালে এই পথ দিয়ে যাবে। এমনি ভাবে হনহন করে। ঠিক এমনিভাবেই কাঞ্চীর দিকে না ফিরে সোজা চলে যাবে।

কিন্তু তবু কাঞ্চী এসে দাঁড়াবে বেড়ার ধারে। এক-

দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখবে যতক্ষণ না লোকটা পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবে।

মনকে কাকী অনেক বুঝিয়েছে। কি লাভ এতে। অতটুকু দেখায় মনের আর কতটুকু ভরে। তাছাড়া পাহাড়ী একটা মেয়ের অত লোভই বা কেন! মাঝে মাঝে মনকে শক্ত করে কাকী। না, আর নয়, আর কোনদিন নয়। কিছুতেই বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াবে না। মার কাছে বসে উলের টুপি বুনবে কিংবা উলের মোজা, তবু হাটে বিক্রী করলে কিছু পয়সা আসবে।

কিন্তু ম্লান রোদের রেখা সরতে সরতে বুনো গোলাপ গাছের কাছ বরাবর গেলেই কাকী চমকে উঠে বসে। দ্রুত স্পন্দন বুকের মাঝখানে। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে সারা শরীর কেঁপে ওঠে। কাঁটা আর উলের গোছা সরিয়ে রেখে কাকী ছুটে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিসর্পিল পথের দিকে। একটু পরেই তাকে দেখা যাবে। আর একটু পরেই।

লোকটা বাঙালী এটুকু কাকী জেনেছে। ম্যালে দাঁড়িয়ে আরো দু একজনের সঙ্গে কথা বলতে হাট-ফেরত কাকী দেখেছে। শুনেছে বাঙলা কথা। অবশ্য লোকটা সাধারণ বাঙালীর তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ, অনেক গৌরাঙ্গ। কিন্তু দুটো চোখ দেখলে ঠিক বোঝা যায় যে বাঙালী। এমন কটাক্ষ, এমন চঞ্চল চোখ বুঝি আর কোন জাতের দেখা যায় না।

ঠিক তাই। ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কাকী দেখেছে। দীর্ঘ পক্ষ, রহস্যময় চোখ, পাহাড়ের চূড়োর মতন খাড়া নাক।

মার বেতের বাক্স থেকে খুব সাবধানে কাকী ফটোটা বের করেছিল। মা জানতে পারলে, আর কিছু নয়, হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হবে, মুখোমুখি হতে হবে অজস্র প্রশ্নের।

কাকীর ভালো মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। মার কাছে শুনেছে, দিদির কাছেও।

কার্সিয়ংয়ের স্যানাটরিয়ম। নামকরা ডাক্তার বিজন বসাক। অপারেশনে সিদ্ধহস্ত। যমের কবল থেকে রোগীকে ছিনিয়ে আনে। সেখানকার ছোট্ট নার্স কাকীর মা। কোন পরীক্ষায় কোন দিন পাশ করেনি, না সার্টিফিকেট, না ডিপ্লোমা, কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকে ছিল ওই স্যানাটরিয়মে। হাতে কলমে সব কিছু শিখেছে।

বিজন ডাক্তারের প্রিয়পাত্রী। কঠিন রোগী কিংবা গোলমেলে অপারেশনের কেস এলেই ডাক্তার বসাক কাকীর মার খোঁজ করেন। হাতের গ্লাভস থেকে সুরু করে ফোরসেপ, ডিসেকশন নাইফ—সব কিছু এগিয়ে না দিলে ডাক্তার বসাকের মন খুঁতখুঁত করে। কাজে গা লাগে না।

আশ্চর্য কাণ্ড। ছুরি, কাঁচি দেওয়া নেওয়ার ফাঁকে কোন এক মুহূর্তে মন দেওয়া নেওয়ার পালাও সাঙ্গ হ'ল। সহপাঠিদের বিদ্রূপ, কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি—সব উপেক্ষা করে বিজন বসাক কাকীর মাকে কাছে টেনে নিয়েছিল।

বাধা শুধু বিজন বসাককেই পার হ'তে হয়নি, কাকীর মাকেও হ'য়েছিল। পর্বতপ্রমাণ বাধা পার হয়ে তবে পর্বত-দুহিতা মনের মানুষের নাগাল পেয়েছিল।

তারপর একটানা সুখের স্রোত। কাকীর দিদি আর কাকী সেই স্রোতেরই ভেসে আসা দুটি ফুল। নিজের সমাজে, গাঁয়ের মোড়লদের কাছে কাকীর মাকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু অনমনীয় দৃঢ়তা আর ধৈর্য দিয়ে কাকীর মা সব কিছু জয় করেছিল। শত আঘাতেও ভেঙে পড়েনি।

শত আঘাতে ভেঙে পড়েনি, কিন্তু আচমকা এক আঘাতেই যেন কাকীর মাকে মাটিতে ফেলে দিল। শীত-শীর্ণ হুতপত্র লতার মতন বর্ণ, দীপ্তি, তেজ সব চারাল।

মাত্র দুদিনের জ্বর। প্রথম প্রথম সামান্য একটু গলা ব্যথা। দুটো চোখের রংয়ে ডালিম ফুলের ছোঁয়াচ। তারপর ঘমে মানুষে টানাটানি। দার্জিলিং থেকে সিভিল সার্জন, শিলিগুড়ি থেকে কবিরাজ। কাকীর মা কিছু আর বাদ রাখল না। সারাদিন রাত শিয়রে বসে রইল। এক সাধুর দেওয়া রুদ্রাক্ষ বালিশের তলায় রেখে। তিব্বতী গুম্ফা থেকে যোগাড় করা।

কিন্তু মানুষ হার মানল। কাকীর মার একটা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে বিজন বসাক শেষ নিশ্বাস ছাড়ল।

কাকীর মা স্যানাটোরিয়ম ছাড়ল। কার্সিয়াংও। দার্জিলিংয়ে এসে বাসা বাঁধল। কার্সিয়াংয়ের কথা মনে নেই কাকীর। তার জীবন শুরু দার্জিলিং থেকে।

দিদির বিয়ের কথা তার বেশ মনে আছে। বাহাদুর শের-পা কাছাকাছি গাঁয়ের ছেলে। হাটে আসত হাঁস আর মুরগির পাল নিয়ে। দিদির সঙ্গে হাটেই দেখা—কিছু-দিন পর দুজন উধাও। অনেকদিন কোন খোঁজ-খবর নেই, তারপর এক বরফ-ঝরা অন্ধকার রাতে দুজনেই এসে হাজির।

বাহাদুরের উন্নতি হয়েছে। অনেক দূর থেকে এক সাহেবের দল এসেছে পাহাড়ে চড়তে, তাদের মোতায়েন কাজ পেয়েছে। তাকে বেশী ওপরে উঠতে হবে না। নিচের তাঁবুতে সাহেবদের জিনিসপত্র আগলাতে হবে।

বাহাদুর অনেকবার বলেছে। এ রকম আলাদা থেকে লাভ কি। কাকী আর তার মা এখানকার বাস উঠিয়ে এক সঙ্গে থাকলেই পারে।

কিন্তু কাকীর মা রাজী হয়নি। কাকীরও ইচ্ছা নয়। কি জানি কেন পাহাড়ী ছেলেগুলোকে কাকীর আদৌ ভাল লাগে না। পেত্নাচেরা চোখ, বোকা বোকা চেহারা। মানুষ বলে যেন মনেই হয় না।

কথাটা কাকী ওর মার কাছেই শুনেছে। বাপের মুখের সঙ্গে কাকীর মুখের অদ্ভুত মিল। টানা চোখ, নাকও উঁচু, মুখেও তেমনি পেলবতার পরশ। শুধু মুখচোখই নয়, তার মনটাও কেমন বাঙালী ঘেঁষা। বাঙালী ছেলেদের দেখলেই বুকের মধ্যে টনটন করে। মনে হয় কোথায় একটা মিল রয়েছে এদের সঙ্গে। সুপ্ত রক্তকণিকায় তীব্র একটা আকর্ষণ। কাছে যেতে ইচ্ছা করে, কথা বলতে ইচ্ছা করে। ভাষা জানে না, তবু মনে হয়, আকারে ইঙ্গিতে নিজের মনের কথা ঠিক এদের বোঝাতে পারবে।

কিন্তু এবারের ব্যাপার একেবারে আলাদা। বেড়ার ধারে কাকী দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ ঝড়োপায়ে একটি লোক এসে সামনে থামলো। চলতে চলতে জুতোর ফিতে খুলে গিয়েছিল। বেড়ার গায়ে পা রেখে হেঁট হ'য়ে ফিতেটা বেঁধে নিল।

সব মিলিয়ে বড় জোর মিনিট কয়েক। কিন্তু সেটুকু সময়ের মধ্যেই শরীরের সমস্ত রক্ত কাকীর মুখে এসে জমা হ'ল। থরথরিয়ে উঠল লালচে ঠোঁট দুটো। মনে হ'ল কাকীর নিজের বলে যেন আর রইল না কিছু। সামনের হেঁট হ'য়ে থাকা লোকটা সব ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর থেকে রোজ সকাল-বিকাল কাকী বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ায়। শুধু একটু চোখের দেখা। কিন্তু সেইটুকু সম্বল ক'রেই তার সারাটা দিনরাত কাটে, হয়তো সারাটা জীবনই কাটবে।

ব্যাপারটা কাকীর মায়েরও চোখে পড়েছে। কিন্তু মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই থেমে গেছে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলতে পারে নি। বোধ হয় নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে গেছে। অতীত কাহিনীর স্মৃতি। তা ছাড়া মেয়েকে সাবধান করে দেবার মতনও কিছু ঘটে নি। বাঙালীবাবু এসেছে দার্জিলিং বেড়াতে। শীত পড়লেই নেমে যাবে। কাকীরও চোখের নেশার অবসান হবে।

কিন্তু একদিন অঘটন ঘটল। হাট থেকে কাকী ফিরছিল। হাতে শাকসব্জীর সাজি। হঠাৎ সোলমালে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখল।

একটা ঘোড়া লাফাতে শুরু করেছে। পিঠে সওয়ার। ঘোড়াটা পাশে আসতেই কাকী থমকে দাঁড়াল। এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। ঘোড়ার পিঠে সেই ভদ্রলোক। সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়েছে ঘোড়ার ঘাড়ের চুল ধরে। হাতের লাগাম ঝুলে দুপাশে দুলছে।

একটু ছুটতেই কাকী লাগামের নাগাল পেল, তারপর পাহাড়ী মেয়ের পক্ষে ঘোড়াকে থামান খুব শক্ত ব্যাপার নয়। ঘোড়াটা থামবার আগেই লোকটি লাফিয়ে নেমে পড়ল।

শীতের মধ্যেও ঘামের বিন্দু জমেছে কপালে। জিজ্ঞে মাথার চুল। ভয়-পাওয়া চোখ দুটো আরো আয়ত। উত্তেজনায় বুকটা ওঠা নামা করছে।

অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই বলল, হঠাৎ লাগামটা ফসকে গিয়েছিল হাত থেকে।

ভাবটা যেন লাগামটা না ফসকালে সে যে কত বড় ঘোড়সওয়ার সেটা আশপাশের লোকজন টের পেয়ে যেত। তারপরই বোধ হয় কথাটা মনে পড়ে গেল। একটু হেসে কাকীকে বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি না ধরে ফেললে বিপদ হ'তে পারত।

কাকী মনে মনে হাসল। পাজর-সার দীর্ঘ ঘোড়া।

সমতলের বাবুদের চড়বার জন্য মজুত করে রাখা। পেটে আগুনের ছোঁয়া লাগলেও এসব ঘোড়া দৌড়বার কল্পনা করে না। গুটি গুটি হাঁটে জলাপাহাড়ের দিকে, কিংবা লাডেন লা রোড ধরে সোজা খানিকটা। পিঠে মোটা-সোটা সওয়ার।

আজ হঠাৎ এ ঘোড়াটার মনে পক্ষীরাজ হওয়ার বাসনা কেন হ'ল বলা মুস্কিল। বোধ হয় ভয় পেয়ে থাকবে, কিংবা পিঠের ওপর জোয়ান মদ একটা লোক ওই ভাবে ঘাড়ের চুল আঁকড়ে পড়ে আছে ভেবেই বোধ হয় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তা হ'লেও মারাত্মক কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল না। একটু ছুটেই আবার ঘোড়াটা শান্ত হ'য়ে আসত। আচমকা বেপরোয়াভাব দেখাবার জন্য লজ্জিত হ'য়ে ঘাড় হেঁট করে ফিরে আসত সহিসের কাছে। একটু ভয় পেয়ে যাওয়া ছাড়া সওয়ারের আর কোন ক্ষতি হ'ত না।

তাই কাঞ্চী ভাঙা হিন্দিতেই উত্তর দিল, আমায় লজ্জায় ফেলবেন না। এমন কিছু বড় কাজ আমি করি নি।

লোকটি কিছু বলার আগেই সহিসের দল এসে হাজির হ'ল। পিছন পিছন বোধ হয় সওয়ারের গোটা কয়েক বন্ধু।

কাছে এসেই সহিস সজোরে চাপড় মারল ঘোড়ার মুখে। চিৎকার করে বলল, জানোয়ার কাঁহাকা। এতদিনের শিক্ষা সহবত সব ভুলে এমনি করে আমার মুখ পোড়ালি?

বন্ধুরা লোকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। চোটটোট তো লাগে নি। কোনরকম শক।

—হয়তো লাগত, এ মেয়েটি ঠিক সময়ে ধরে না ফেললে। ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলতে গিয়েই লোকটা অবাক। পায়ে পায়ে কাঞ্চী সরে পড়েছে। ধারে কাছে কোথাও নেই।

বাড়ী ফিরে সজীর ঝুড়িটা মার জিম্মায় দিয়ে কাঞ্চী সোজা বিছানায় গিয়ে ঢুকল। বালিশটা বুকে চেপে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল। অসম্ভব জ্বালা দুটো চোখে। দুটো হাত দিয়ে বুক চেপেও দ্রুত স্পন্দন কমাতে পারল না। কেন এমন হ'ল। কেন এমন হয়।

সেদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে কাঞ্চীর বেশ বেলা হ'য়ে গেল।

প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত বিছানায় ছটফট করেছে। ঘুম আসে নি।

ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়াতেই লোকটা লাফিয়ে নেমে পড়েছিল। টাল সামলাতে পারে নি। ঢালু জমিতে প্রায় কাঞ্চীর পায়ের ওপর এসে পড়েছিল। একটু ছোঁয়া। কাঞ্চীর কাঁধের ওপর হাতের স্পর্শ। কিন্তু তাতেই কাঞ্চীর শিরা-উপশিরায় আগুনের ফুলিঙ্গ। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

কাঞ্চীর মনে হয়েছিল এ যেন শুধু দেহ দিয়ে দেহ ছোঁয়া নয়, হৃদয় দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করা।

অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পরে একটু তন্দ্রার ভাব আসতেই স্বপ্ন দেখেছে! পাঁজর-সর্বস্ব ঘোড়া নয়, বিরাট এক পক্ষীরাজ। কাঞ্চী আর ভদ্রলোক দুজনেই তার পিঠে। মাটি ছেড়ে, মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছে পক্ষীরাজ। পাহাড় পর্বত হিমেল কুয়াশা সব পিছনে ফেলে। শস্যশ্যামল সমতল ভূমিতে।

তারপর পরিপাটি এক গৃহ। শান্ত নিরুত্তেজ জীবন দুজনকে ঘিরে। বাঙালীরাই পারে ও ভাবে ঘর বাঁধতে। নিজেকে ছাপিয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসায় ঢেকে দিতে মনের মানুষকে।

কাল কাঞ্চীর দিদির চিঠি এসেছে। দুখানা চিঠি। অবশ্য মার চিঠিতে কাঞ্চীর দিদি লিখেছে খুব ভাল আছে দুজনে। কোলের বাচ্চাটা কি দুষ্টু হ'য়েছে। আপনমনে অনর্গল কত কথাই বলে। কিন্তু কাঞ্চীকে লেখা চিঠির সুর আলাদা।

নিজের ঘরের মানুষের কথা লিখেছে। কিছুদিন আগে থেকেই কাঞ্চীর দিদির একটু সন্দেহ হয়েছিল। একটা উগ্র গন্ধ। চোখ দুটোও লালচে, অবশ্য কথাবার্তা চলাফেরা খুব স্বাভাবিক। আজকাল আর সন্দেহ নয়। স্পষ্টই বোঝা গেছে। মাঝরাতে টলতে টলতে এসে সারা পাড়া চিৎকারে মাতিয়ে তোলে। কাঞ্চীর দিদির নাম ধরে কুৎসিত গালিগালাজ। ইদানীং মারধোরও শুরু করেছে। বাচ্চাটার দিকে ফিরেও একবার চায় না।

শুধু মরা নয়, জীবনে সুরেরও সন্ধান পেয়েছে। কোন চা বাগানের ম্যানেজারের আয়া। এ তল্লাটে খুব নাম। বছর বছর নাগর বদলায়। এ বছর বোধ হয় কাকীর দিদির ঘরের মানুষের পালা পড়েছে।

শেষ লাইনে কাকীর দিদি আপসোস করে লিখেছে, আমি কি করব তুই আমায় বলে দে কাকা! ঘরের মানুষই যদি আমার ঠিক না রইল, তবে কি হবে আমার ঘর আঁকড়ে পড়ে থেকে।

এর উত্তর কাকী দিতে পারে নি। এর উত্তর তার জানা নেই। কিংবা বুঝি যে উত্তর জানা আছে, সেটা কাউকে বলা চলে না। নিভৃতে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাকে শুধু পালন করা যায়।

কাকীর মার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এ জিনিস অজানা ছিল। একদিনের জন্য মতান্তর নয়, মনান্তর তো নয়ই। যখন বাঙালীরা ভালবাসে, তখন পৃথিবী ভুলে যায়। কোন বাধাকেই বাধা বলে মানে না।

মার কাছেই কাকী শুনেছে। কোনদিন যদি শরীর খারাপ হ'ত কাকীর মার। মাথা ধরা কিংবা জ্বরভাব, কাকীর বাবা সমস্তদিন বসে থাকত তার শিয়রে। অডি কলোনের ফোঁটা দিত কপালে, আস্তে আস্তে মাথা টিপে দিত। প্রতি মিনিটে ছবার করে কাকীর মাকে প্রশ্ন করত, তার শরীর সম্বন্ধে। আতঙ্কে, উদ্বেগে, এত বড় ডাক্তার যেন নীল হ'য়ে যেত।

জানলার ধারে বসে এসব কথা বলতে বলতে কাকীর মা উদাস দুটি চোখ তুলে বাইরের দিকে দেখত। শুধু দূরের পাঁহাড় নয়, যেন বহুদূরে ফেলে আসা দিনগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছে।

মার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে মার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কাকী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, ঘর যদি বাঁধতেই হয় তো বাঙালীর সঙ্গে।

ম্যালে কতবার দেখেছে। বাঙালী স্ত্রী আর স্বামী। পাশাপাশি চলেছে। স্ত্রীর হাতে শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ। স্বামীর হাতে বাকি সব জিনিসপত্র। মাঝে মাঝে ছেলে মেয়েও।

এমন দৃশ্যও কাকীর চোখে পড়েছে। স্ত্রী একদৃষ্টে এভারেষ্টের দিকে চেয়ে রয়েছে। দু চোখে অগাধ বিস্ময়। স্বামীর মুগ্ধ দৃষ্টি কিন্তু স্ত্রীর মুখের ওপর। কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়েও রহস্যময় কিছু যেন নজরে পড়েছে।

ভাঙা হিন্দিতে কথা কানে যেতেই কাকী চমকে মুখ ফেরাল। সেই লোকটি বেড়ার ওধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আমায় কিছু বলছেন? কাকীও ভাঙা হিন্দিতেই উত্তর দিল। তার ভাষাজ্ঞানও পরিমিত।

লোকটি মুচকি হাসল।

—ওখানে দাঁড়িয়ে আর কি করব? কাকী গলার স্বর আর একটু তুলে বলল, আজকেও ঘোড়ার পিঠে চাপতে যাচ্ছেন নাকি? কাকীর দু চোখে কৌতুকের রোশনাই। গলার স্বরে তরল পরিহাসের ছিটে।

—তার মানে, লোকটি পকেটে হাত দিয়ে বেড়ার আরো কাছে এগিয়ে এল, তোমার কথায় মনে হচ্ছে কালকের ঘটনার পরে আমার যেন গাধার পিঠেই চড়া উচিত।

কাকী হাসিতে ভেঙে পড়ল। ঘাড় নেড়ে বলল, না, না, সে কথা বলছি না। দু একটা পাজি ঘোড়া থাকে কিনা। আর তা ছাড়া উঁচু নীচু রাস্তা। দুর্ঘটনার কথা কিছু বলা যায়।

—বেশ, চলতে চলতে লোকটি বলল, একদিন তুমি এইখানে ঠিক এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি ঘোড়া ছুটিয়ে তোমার সামনে দিয়ে যাব।

লোকটি আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হ'য়ে গেল।

পথের দিকে চেয়ে কাকী বিড় বিড় করে বলল, যা তুমি যাবে এই পথ দিয়ে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে। একটু থেমে আমাকে তুলে নেবে তোমার পাশে। তারপর দুজনে চলে যাব অনেক দূরে। তাল নারিকেল ভরা শান্ত পল্লীপ্রান্তে।

দিন দুয়েক পরে। বিকেল হ'তেই কাকী সেজেগুজে বের হ'য়ে পড়ল। মাকে বলল, একটু ঘুরে আসি মা। বাড়ীতে বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

ম্যাল ছাড়িয়ে কাকী আরো এগিয়ে গেল। নির্জন পথ। দু পাশে পাইনের ঘন সারি। একদিকে গভীর খাদ।

এর আগে দুদিন কাঞ্চী দেখেছে। এই পথ দিয়েই লোকটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে। রহস্য কলরবে জনবিরল পথ মাতিয়ে।

অনেকটা পথ কাঞ্চী এগিয়ে গেল কিন্তু লোকটির পাত্তা পেল না। হয়তো আজ আসেই নি এ পথে। ক্লান্ত পায়ে সে আবার ফিরে এল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। ষ্টেশনের কাছ বরাবর এসেই থেমে গেল।

পাতলা কুয়াশার আস্তরণ। তবু দেখা গেল। পথের ধারে এক বেঞ্চে লোকটি বসে আছে।

কাঞ্চী কাছে আসতেই লোকটি দাঁড়িয়ে উঠল, আরে আশ্চর্য কাণ্ড তো, তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম বসে বসে।

—আমার কথা! কাঞ্চীর দু গালে গোলাপের আভা।

—হ্যাঁ। দুবার তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে গিয়েছি, তুমি নেই। তোমার নামও ছাই জানি না, যে খোঁজ করব। নাম কি তোমার?

—আমার নাম কাঞ্চী।

—কাঞ্চী! বেশ নাম তো। কাঞ্চী মানে তো যুক্ত, তাই না?

মাথা নিচু করে কাঞ্চী হাসল।

লোকটি আর একটা কি বলতে যাবার মুখেই থেমে গেল।

হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হ'ল। শাণিত বর্ষার ফলার মত তীক্ষ্ণ ধার। সঙ্গে বরফের গুঁড়ো।

কোটের কলারটা উল্টে দিয়ে লোকটি চলতে শুরু করল। যেতে যেতেই বলল, কাল সকালে আমি কার্শিয়ং যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব। তুমি রাত সাতটা আটটার সময় দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে? জুবিলি স্যানাটরিয়ম। ডিন নম্বর কটেজ। বিশেষ দরকার। যে কথাটা তোমায় দেখা অবধি আমার মনে হয়েছে, সে কথাটাই তোমাকে বলব। আসবে তো?

মন্ত্রমুগ্ধের মতন কাঞ্চী ঘাড় নাড়ল।

লোকটি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঞ্চী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। চুলের ফাঁকে, পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে পেজা তুলোর মতন বরফের গুঁড়ো।

চেতনা হ'ল পথচলতি একটা বুড়ো লোকের চিৎকারে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটা ভিজছে কেন? ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লেই তো পারে।

কাঞ্চী জোর পায়ে ষ্টেশনের ছাউনির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

বৃষ্টি কমতেই কাঞ্চী বেরিয়ে পড়ল। সারাটা রাত অপেক্ষা করতে হবে, কাল সারাটা দিন। তারপর দেখা হ'বে লোকটার সঙ্গে। কি কথা যে বলবে তাও কাঞ্চীর জানা! এমন সুযোগ এর আগে তার জীবনে আসে নি, তবু সে অনুভব করতে পারছে এমন একটা কথা শোনার পর তার মনের কি অবস্থা হবে। লজ্জায় মুখই তুলতে পারবে না অনেকক্ষণ, কিংবা বলিষ্ঠ দুটি বাহুর চাপে এগিয়ে গিয়ে মাথা রাখবে স্পন্দমান একটি বুকের ওপর। সারা জীবন ধরে কথা বলেও যা কোনদিন কাঞ্চী বোঝাতে পারবে না, তারই আভাস দেবে লজ্জারেহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে। নিজেকে সমর্পণ করবে।

হয়তো লোকটি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে। বলবে কাল সকালেই চল আমার সঙ্গে। তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কাঞ্চী শুধু একটু সময় নেবে। মার কাছে অনুমতি নিয়ে আসার সময়টুকু।

কাঞ্চীর মা বাধা দেবে না। নিজের অতীতকে স্মরণ করে কিছুতেই কাঞ্চীর ভবিষ্যত সে ভেঙে দিতে পারে না। শুধু কাছে ডেকে আদর করবে মেয়েকে। বেতের বাক্স থেকে ফটোটা বের করে মাথায় ছোঁয়াবে। খিড় খিড় করে বলবে অর্ধোচ্চারিত মন্ত্রের সুরে, কাঞ্চীকে সুখী কর। ওপর থেকে আশীর্বাদ কর তুমি, যেন কাঞ্চীর জীবন সুন্দর হয়, মধুর হয়।

মার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঞ্চী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে চিঠি দেবার প্রতিশ্রুতি দেবে, তারপর সোজা ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে।

বাড়ী ঢুকতেই কাঞ্চীর মা চেঁচিয়ে উঠল, কি আক্কেল রে তোর? এমনি করে ভিজে আসতে হয়? কেন সারা দার্জিলিং শহরে কি দাঁড়াবার স্থান পেলি না।

মনে মনে কাঞ্চী হাসল, সারা দার্জিলিং শহরে কোথায়

আর স্থানে পেলাম। পেলাম না বলেই তো সরে যাচ্ছি অনেক দূরে।

মুখে কিছু বলল না। মুচকি হেসে পাশ কাটাল।

সে রাত্রে কাকী বাপের ফটোটা বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। মাথায় ঠেকাল। নতুন জীবনের শুরুতে আশীর্বাদ ভিক্ষা করল।

ভোরবেলা উঠেই নিজের জামাকাপড়ের বাক্সটা গোছাতে শুরু করল।

কাণ্ড দেখে মা অবাক।

—কিরে জিনিষপত্র গোছাচ্ছিস যে? শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস নাকি?

—হ্যাঁ মা। কাকী হাসল।

মাও হেসে বাজারের সাজি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কতকগুলো জামা কাকী বাতিল করল। এসব পোষাক পরে গরম জায়গায় ঘোরাফেরা করা চলবে না। যে দু একটা বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে তাদের কাছেই শুনেছে। এত গরম যে গায়ে ব্লাউজ রাখাই দায়। দুপুর বেলা অনেকেই গায়ে শুধু পাতলা কাপড় জড়িয়ে থাকে। সে অবশ্য কাকী মরে গেলেও পারবে না। অন্ততঃ গায়ে ব্লাউজ তো চড়াবে।

খুব বড় শহর। জনবহুল। আলো, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন। হৈ হল্লা-চিৎকার। এখানকার মতন একটু রাত নামলেই ঝিঁঝিঁর ডাক আর বুনো জন্তুদের আওয়াজ শুনে সময় কাটাতে হয় না।

সারাটা দিন কাকী মার কাছে কাছে কাটাল। কাই করবার ঘটিল। অকারণ গলা জড়িয়ে আদর করল।

কাকীর মা অবাক।

—কি ব্যাপার বল তো তোর কাকী। আজ যে এত খুশি খুশি ভাব?

—আহা মা যেন কি, কাকী ত্রু কোঁচকাল, খুশী আবার কিসের। কি সুন্দর ঝলমলে রোদ ঝলত। এমন সময়ে এরকম রোদ দেখা যায়?

কাকীর মা মেয়ের মুখটা দু হাতে তুলে ধরল। হেসে বলল, তাই বুঝি রোদের ছিটে মেয়ের মুখে লেগেছে।

সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই কাকী তৈরী হয়ে নিল। যত্ন করে চুল আঁচড়াল। উলের কেপ জড়াল। তুলে রাখা মার সোনার হারটা গলায় ঝোলাল। আয়নার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখল।

এ দেখার আশ মিটল না। যতক্ষণ না আর একজনের মুগ্ধচোখের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে, ততক্ষণ যেন মন ভরবে না।

বেরবার মুখেই মা ডাকল, এত রাত্রে কোথায় যে কাকী?

—রাত আবার কোথায়। হুবিলি স্নানাটোরিয়মে একটা বাঙালী-বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে মা। সেই দেখা করতে বলেছে। কাল চলে যাবে।

মার দিকে না ফিরেই কাকী তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

স্নানাটোরিয়মের সামনে যখন পৌঁছল তখন প্রায় পৌনে আট। তিন নম্বর কটেজের কাছে যেতেই নজরে পড়ল পেতলের বড় তালা।

কাকীর বুকটা কেঁপে উঠল। ঠিক সময়েই তো এসেছে। তবে দরজা বন্ধ যে।

পাহাড়ী এক ছোকরা কাঁধে তোয়ালে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছিল, কাকী তাকে ডাকল।

—এ বাবু কোথায়?

—সেনবাবু? ডাইনিংরুমে আছেন বোধ হয়।

ছোকরা আর দাঁড়াল না। হন হন করে এগিয়ে গেল।

কাকী একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা আকাশের নিচে বেশ একটু ঠাণ্ডাভাব। গায়ের কাপড়টা ভাল করে জড়াল।

আধ ঘণ্টারও ওপর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকীর পা দুটো টনটন করে উঠল। সরে গিয়ে বেড়ালে ঠেস দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দূরে একটু গোলমাল। অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। বোঁয়ার কুণ্ডলী। কাকী আরো একটু সরে দাঁড়াল।

মাত্র দুজন লোক এদিকে এগিয়ে এল। আর সকলে বাঁ দিকে মোড় নিল।

একটু কাছে আসতেই কাকী চিনতে পারল। গাঢ় নীল কোট আর প্যাণ্ট। কোটের ফ্লাপে পাহাড়ী গোলাপ। কি একটা কথায় উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল।

একেবারে কাঞ্চীর সামনাসামনি এসে দুজনেই থমকে দাঁড়াল।

সঙ্গের লোকটি ইংরাজীতে কি একটা টিপ্পনী কাটল।

সেই লোকটি কিন্তু একটু ঝুঁকেই ঠিক চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে হাতঘড়িটা দেখে বলল, আরে এসেছ! আমি প্রায় পৌনে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য।

—আমি ঠিক পৌনে আটটাতেই এসে পৌঁচেছি।

কাঞ্চী আস্তে আস্তে বলল।

—এস, এই সামনেই আমার কামরা।

লোকটি নিচু হ'য়ে তালাটা খুলে ফেলল। সঙ্গের লোকটি আরো এগিয়ে গেল।

ছোট্ট ছোকো ঘর। পরিপাটি সাজান। নীল বাতির মোলায়েম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

লোকটি সামনের কৌচের ওপর গিয়ে বসল। কাঞ্চী ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে।

—তোমাকে দেখে পর্যন্ত আমার খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তোমাকে একলা পাচ্ছি না বলে কথাটা কিছুতেই বলতে পারছি না।

কাঞ্চীর সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। জানত কাঞ্চী, এইভাবে নিভৃতে ডেকে এনে এমনি সুরেই একদিন ওকে এই কথা বলবে। লোকটির চোখের তারায় এমনি কথারই আভাস ছিল।

—তুমি দার্জিলিং ছেড়ে যেতে পারবে আমার সঙ্গে? এখানে তোমার আর কে আছে?

কাঞ্চী অনেক চেষ্টা করে কথা বলল, আমার মা আছে শুধু।

—যেতে পারবে তাকে ফেলে?

—হ্যাঁ পারব। সব ছেড়ে যেতে পারব তোমার সঙ্গে। যখন বলবে।

কাঞ্চী আর সামলাতে পারল না নিজেকে। এমন একটা মুহূর্ত মানুষের জীবনে বার বার বুঝি আসেও না। নিজেকে নিবেদন করার শুভলগ্ন।

—তোমার মতন একটা মেয়ে পেলে আমার খুবই উপকার হয়। তোমার কোন রকম কষ্ট হবে না সেখানে। কাজও এমন কিছু বেশী নয়। শুধু একটি বছর দেড়েকের বাচ্চাকে আগলানো। তোমরা তো এ কাজ ভালই পার। যদি রাজী থাকো তো, কাল ভোরেই চলে এস। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। কালকেই রওনা হতে হবে।

প্রথমে খুব আস্তে আস্তে তারপর দ্রুত দুলে উঠল ছাদনা, দরজা, রঙীণ পর্দা, মেঝের পাতা জাজিম, কৌচ, টিপয় আর ফুলদানী। নীল বাতিটা ম্লান হ'য়ে যেন নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের কঠিন দেয়ালে কঠোর আঘাত খেয়ে কাঞ্চীর সমস্ত সত্তা অবশ হ'য়ে গেল। এ অন্ধকার থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, কোন আশা নেই এ অন্ধকার পার হবার।

কাঞ্চীর সারা জীবনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে।

খুব সাবধানে দরজা ধরে টলতে টলতে কাঞ্চী বাইরে বেরিয়ে এল। দেয়াল ধরে একটু বিশ্রাম করবে, সে উপায় নেই। এখনি লোকটা বেরিয়ে আসবে। প্রতিশ্রুতি চাইবে কাঞ্চীর কাছে। দয়ামায়া স্নেহ মমতা দিয়ে তার আত্মসম্ভ্রম তিল তিল করে গড়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি।

দ্রুত পায়ে কাঞ্চী স্নানাটোরিয়মের গেট পার হ'য়ে এল। বরফের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। কিন্তু সে জন্য সামনের পথ অস্পষ্ট নয়। এমনভাবে কাঞ্চীর পথ চলার খুব অভ্যাস আছে। বাদ সাধছে পোড়া চোখের জল। মুছেও কাঞ্চী শেষ করতে পারছে না।

কিছুতেই তাকে সামনের পথ চিনে উঠতে দেবে না।

—

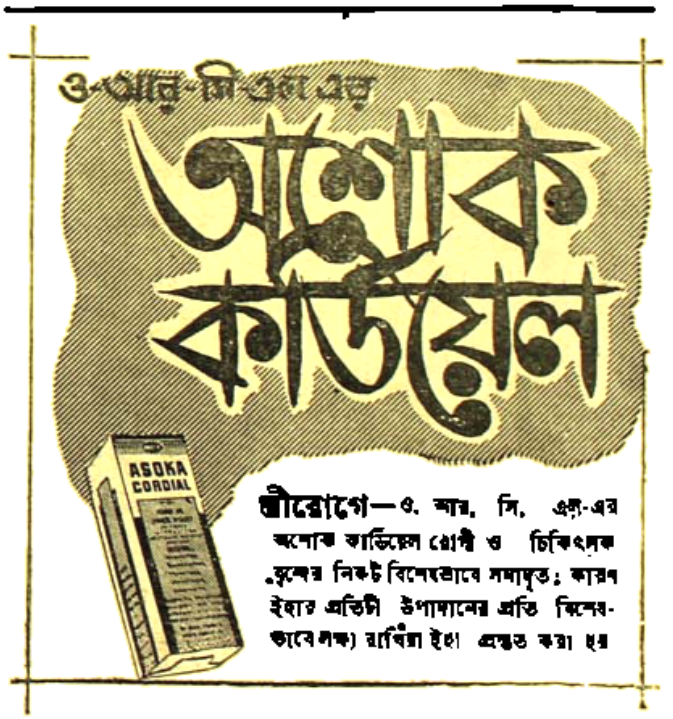

মেয়েদের কথা

শিশু-পালন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

মীরা দাস

শিশু আমাদের স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ। এরাই আমাদের জাতীয় জীবনের বল ও আশা। এই শিশু ছাড়া আমাদের বংশ রক্ষা, জাতি রক্ষা বা দেশ রক্ষা কিছুই সম্ভব না। কিন্তু এই শিশু যদি স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান ও ধর্মপ্রাণ না হয় তাহা হইলে সমাজের কি দুরবস্থা হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং আমরা মায়েদের শিশুর স্বাস্থ্য ও চরিত্র-গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি। তাহাকে এ সম্বন্ধে কর্তব্য যথারীতি পালন করিতে হইবে। কিন্তু কেবল তাহার আহার ও নিদ্রার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই—'পালন' করা হয় না। বালো মায়ের কোলে শিশুর—যে শিক্ষা অলক্ষে ক্রমে ক্রমে লাভ হয় তাহাই কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার সমগ্র জীবন ছুড়িয়া থাকে। স্কুল কলেজে পরে যে শিক্ষা হয়, তাহাতে সে কৃতবিদ্য হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভ হয় না।

শিশু স্বভাবতঃই আবদার করিতে ভালবাসে। কিন্তু তখন যদি ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া অন্ধ স্নেহবশতঃ সকল রকম আবদারই নির্বিচারে পূর্ণ করা হয় তাহা হইলে তাহার পরবর্তী জীবন খুবই দুঃখ-ময় হইবে। শিশুকাল হইতেই তাহাকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে। জীবনের প্রথম দিন হইতেই সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সুশৃঙ্খলতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি সদ্‌গুণ-রাজি যাহাতে তাহার কোমল অন্তঃকরণে স্থান পায় তাহার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। শিশুর সবকিছুর জন্যই মা বত্সারী ভত আর কেহ নয়। তাহাকে 'মানুষ' করিয়া তুলিতে হইলে মায়ের কোমল, অথচ দৃঢ় হওয়া চাই। কেবল স্নেহ-কোমল অথবা শুধু কর্তব্য-কঠোর হইলে চলিবে না।

শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখার সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপর ন্যস্ত। আহার, নিদ্রা, স্নান, পোষাকপরিচ্ছদ এবং খেলাধুলা ইত্যাদি সবগুলির উপরেই কিন্তু শিশুর সু-স্বাস্থ্য লাভ করা নির্ভর করে।

প্রথমতঃ দেখা যাক শিশুর খাদ্যের বিষয়। মাতৃস্তন্যই শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য। যে শিশু দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত (৮।৯ মাস) কেবল মায়ের দুধই খায়, তার শরীর আজীবন সুস্থ থাকে। কিন্তু মায়ের দুধের অভাব হইলেই সমস্যা। তখন তাহাকে গোরুর দুধ বা ছাগলের দুধ খাওয়ানো যাইতে পারে জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া। কিন্তু এই দুধ নিজ গৃহপালিত গোরুর কিংবা ছাগলের হইতে হইবে। এই জন্য আমার মনে হয় গোরু অপেক্ষা ছাগল পালন করাই অধিক সুবিধাজনক। ছাগলের দুধ খুব পুষ্টিকর। ছাগলের দুধে ঘৃতের পরিমাণ গোরুর দুধ অপেক্ষা বেশী। এই জন্য যতটুকু দুধ তার তিনগুণ জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। চামচ বা ঝিনুক দিয়া খাওয়ানো অভ্যাস করাই ভাল। কিছু বড় হইলে চুমুক দিয়া খাওয়ানো যাইতে পারে। দুধ ছাড়া—রোজই একটু একটু ফলের রস (যেমন কমলা, বেদানা) ও পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল পান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। কোন অবস্থাতেই "পেটেন্ট ফুড," বাজারে যা খুব পাওয়া যায়, শিশুকে দেওয়া উচিৎ নয়। ইহাতে শিশুর 'রিকেটস্' নামক রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। দাঁত উঠা সুরু হইলে মায়ের দুধ একবারেই না দেওয়া ভাল। না হইলে দাঁত খারাপ হয়। তখন শিশুকে সাগু, বার্লি, ডালের জুস্, খুব নরম পুরানো চালের ভাত ২।১ চামচ খাইতে দিতে হয়। শরীরের পুষ্টির জন্য দুধ ছাড়া এ সবেরও দরকার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে দাঁত উঠার আগে সাগু বার্লি ইত্যাদি শিশুর পক্ষে অহিতকারী।

শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। শরীর সুস্থ রাখিতে

হইলে নিত্য স্নানের প্রয়োজন। স্নানে মন প্রফুল্ল হয়। শিশুকে প্রথমে অল্প গরম জলে স্নান করাইলে ভাল হয়। পরে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা জলে অভ্যাস করাইতে হইবে। স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই।

তারপর আসে ঘুমের কথা। এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত রোজ ৮ হইতে ১০ ঘণ্টা ঘুমানো শিশুর একান্ত প্রয়োজন।

—রোজ নিয়মিতভাবে মলমূত্র ত্যাগ না করিলে স্বাস্থ্য খারাপ হইবে এবং স্বভাব খিটখিটে হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম হইতেই তাহাকে এই অভ্যাস করাইতে হইবে।

শিশুর পোষাক কখনও জাঁকজমকপূর্ণ করা উচিত নয়। যথাসম্ভব 'সাদাসিদে' এবং ঢিলে হওয়া চাই। কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার।

আহার ও নিদ্রার ন্যায় খেলা ধুলাও শিশুর দরকার। ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই জন্য সব সময় কোলে না রাখিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলে ছেলে নিজের ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে।

এই ত গেল শিশু পালনের মোটামুটী কয়েকটি কথা। কিন্তু সবার উপর হইল শিশুর নৈতিক শিক্ষা। শিশু মায়ের পোষা পাখী। মা তাহার সম্মুখে যে আচরণ করিবেন বা যা বলিবেন সে তাহাই শিখিবে। তখন হইতে যা অভ্যাস হইবে তাহাই মজ্জাগত হইয়া যাইবে। শিশু অনুকরণ-প্রিয়। কাজেই মায়েদের খুব সাবধান হইতে হইবে।

সবার শেষে বিখ্যাত ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিয়া শেষ করিব। তিনি আমাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "মা, যদি তুমি সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাও, যদি তোমার সন্তানকে বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব স্বরূপ দেখিতে চাও, তবেতাহার জীবনের প্রথমদিন হইতেই তাহার সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও। তুমি ধন্য হও! সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির—প্রতি গৃহ সুস্থ বলিষ্ঠ চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পূর্ণ হউক।"

টোট্‌কা-টুট্‌কি

শ্রীমতী ইরা ভট্টাচার্য্য

মেছেতার ঔষধ—গালে মেছেতা পড়লে মুখশ্রী নষ্ট হয়ে যায়; যাতে মেছেতা না পড়ে, তার জন্যে নানা প্রকার ঔষধ বেরিয়েছে; কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে গ্লিসারিন মেছেতার প্রধান ঔষধ। রৌদ্রে ঘুরে এসে যে জলে মুখ ও হাত ধু'তে হবে, সে জলে ৩।৭ ফোঁটা গ্লিসারিণ দিয়ে মুখ ধুলে মেছেতা পড়বে না, কিম্বা ৩।৪ ফোঁটা গ্লিসারিণ হাতের তালুতে নিয়ে ফোঁটা কতক জল দিয়ে মুখে মেখে তার পর মুখ জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে এ রোগ হবে না।

গাঁদাফুলের উপকারিতা—মূত্র পরিষ্কার না হোলে ৪।৫টী-গাঁদা ফুল (বিশেষতঃ দাল ছোট) পাঁচনের মত জলে সিদ্ধ করে সেবন করলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং যন্ত্রণা দূর হয়। একটি গাঁদাফুলের সমুদয় বীজগুলি প্রতিদিন চিনির সঙ্গে সেবন করলে শুক্রমেহের আশ্চর্য্য উপকার হয়। পৃষ্ঠ ব্রণ ও অন্যান্য দুষ্টক্ষতে গাঁদা পাতা বেটে অল্পময়দা বা সুজির সঙ্গে একত্র করে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করে পুলটিস দিলে ব্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলটিস দিতে দিতে পৃষ্ঠ ব্রণ ক্রমশঃ নরম হয়ে আসে, পরে তা থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হয়ে গিয়ে শীঘ্র আরাম হয়। ছোট-গোয়ালে পাতার প্রলেপে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে ব্রণ স্থান চুলকায়, গাঁদা পাতায় তা হয় না।

মুখের ব্রণ—অনেকে মুখের ব্রণ নষ্ট করবার জন্যে ফেস পাউডার, মিষ্ক অব রোজ প্রভৃতি ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। গ্লিসারিণ আড়াই তোলা, উৎকৃষ্ট গোলাপ জল পাঁচ ছটাক, আর পাঁচ আনা ওজনের গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশিয়ে একটি পরিষ্কার শিশিতে ছিপি বন্ধ করে রাখতে হয়। *যখন ব্যবহার করতে হবে, তখন শিশি নেড়ে তুলি বা পালক দিয়ে ব্যবহার করা আবশ্যক,

তা হোলে মুখের ব্রণ নষ্ট হয়ে গিয়ে সুন্দর মুখশ্রী দেখা দেবে।

সাপের কামড়ের ঔষধ—কোন ব্যক্তিকে সাপে কামড়ালে তাকে ধুঁধুল পাতার রস পান করিয়ে দেওয়া হয়, তা হোলে অনেকক্ষণের রোগী আরোগ্য লাভ করে।

কুষ্ঠীর অসুখ—কিট হলেই রোগীর হাতের তালুতে কিঞ্চিৎ লবণ দিলে সহজেই জ্ঞান হ'য়ে যাবে।

নাকদিয়ে রক্তপাতে—নাকে রক্ত পড়লে রোগীর হাত দুটি সোজাকরে মস্তকের দিকে উঁচুকরে ধরলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

মাছি তাড়াবার উপায়—গরম জলে অল্পে অল্প লাইসোল কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে ঘরে ছড়িয়ে দিলে ঘরের ভেতর পোকা ও মাছি কয়েক দিন ধরে প্রবেশ করতে পারে না। যে স্থানে মাছির উপদ্রব খুব বেশী, সে স্থানের লোকেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সর্দ্দি প্রতীকার—গলা বসে গেলে বা কফ অতিশয় ও আঠাল হোলে সন্ধ্যার সময়ে একটা ন্যাকড়ায় আধপোয়া আন্দাজ মিছরি বেঁধে এক পোয়া আন্দাজ পানীয় জলে টাঙ্গিয়ে রেখে দিতে হবে, তারপর প্রাতে সেই মিছরির সরবত গরম করে খালি পেটে পান করলে কফের উপশম হবে, আর গলার বা কফ নরম হবে। এই ভাবে ৩।৪ দিন করলেই সাধারণ সর্দ্দি নির্ব্বিবাদে আরোগ্য লাভ করবে।

মেয়েদের রক্তস্রাব—আতা গাছের ছাল উল্টো দিকে কেটে তা জলের সঙ্গে বেটে একটি বড়ি প্রস্তুত করে রোগীকে সেবন করালে প্রচুর রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

বসন্তের ঔষধ—লালচে রঙের একটি নারিকেল (যার খোলা পুরু হয় নি) নিয়ে তার জল বসন্ত রোগীর শরীরে বারবার লেপন করতে হবে। উক্ত নারিকেলের জল অন্য কোন পাত্রে ঢালা চলবে না। এই ঔষধে বহু হতাশ রোগীকে নিরাময় করা হয়েছে। যা শুকিয়ে গেলেও এই ঔষধ নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

বিষ ফোড়া—বিষ ফোড়া ধরে জ্বালা যন্ত্রণা হোলে, তার চারিদিকে কেরোসিন তৈল মালিশ করলেই অতি অল্পসময়ের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

এক্‌জিমার ঔষধ—গোয়ালে লতার পাতা, গোয়ালের মধ্যে যে গরুর চোনা মিশ্রিত মাটী থাকে তার সঙ্গে বেটে প্রলেপ দিলে একজিমা ভালো হয়।

রোগীর উপযুক্ত যুষ বা স্যুপ—এক পোয়া আন্দাজ চর্ব্বিশূন্য মাংস চারি সের জলের সঙ্গে জ্বালে চড়িয়ে দু সের থাকতে নামাতে হ'বে। শীতল হোলে মাংস গুলি সেই জলে বেশ করে চটকে নিয়ে পুনরায় জ্বালে চড়াতে হবে এবং যখন অর্দ্ধসের মাত্র জল অবশিষ্ট থাকবে, তখন ওটা নামিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। একটি আলাদা পাত্রে চার ফোঁটা ঘৃত দিয়ে তাতে দু'টি গোলমরিচ ও কয়েকটী ছোট এলাচের দানা দিয়ে সাঁৎলাতে হবে, তা হোলেই রোগীর উপযুক্ত যুষ তৈয়ারী হবে।

দাঁতের মালিশ—রসুন, হিং ও আকন্দের আঠা একত্র করে দাঁতের গোড়ায় মালিশে লাগালে আরোগ্য এবং পোকা থাকলে মরে পড়ে যায়।

ঘায়ের ঔষধ—সামুকে চূণ ও গব্যঘৃত সম পরিমাণে একসঙ্গে রগড়ালে যে মলম হয়, তা ব্যবহারে সকল প্রকার ঘা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করে।

সন্ধানক্ষতের ঔষধ—কোন স্থান পুড়ে গেলে মধু ও লবণ একত্র ফেটিয়ে লাগালে তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়।

শীর্ণতার ঔষধ—বটগাছের শাখা ও পাতা ভাঙলে যে শ্বেতবর্ণ আঠা বাহির হয়, তাকেই বটক্ষীর বলে। এই বটক্ষীর দশ হতে ত্রিশ ফোঁটা পর্য্যন্ত নিয়ে বিশুদ্ধ জলে চিনির সঙ্গে মিশিয়ে অথবা চিনির সরবতের সঙ্গে পান করলে শরীরের পুষ্টি হয়ে শীর্ণতা দূর হয়।

টাক রোগে—হরিতাল, মনছাল, বৃহতীমূল সমভাগে নিয়ে মধুর সঙ্গে টাকে প্রলেপ দিলে চুল হয়।

চুনকো—বাবলা কিম্বা ডালিমের ছাল সিদ্ধজলে অল্প পরিমাণে ফটকিরি মিশিয়ে চুনকো স্থানে প্রলেপ দিলে ৪।৫ দিনে ভালো হয়।

দেখুন! অর্থ [redacted]নলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

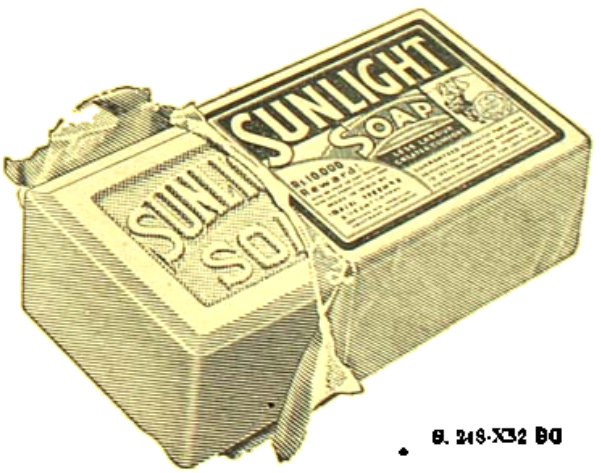

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।

S. 248-X52 BG

হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

উলের প্যাটার্ণ

গীতারাণী মিত্র

পাতা—১২ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হইবে। শেষে ২ ঘর বেশী।

১ম—২ উল্টা ১ সোজা ২ উল্টা ৭ সোজা ২ উল্টা।

২য়—২ সোজা, ৭ উল্টা ২ সোজা ১ উল্টা ২ সোজা।

৩য়—২ উল্টা সামনে সূতা ১ সোজা পিছনে সূতা ২ উল্টা, ১ তোলা ১ সোজা তোলা ঘর ফেলিয়া দাও। ৩ সোজা ১ সোজা জোড়া ২ উল্টা।

৪র্থ—২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা ৩ উল্টা ২ সোজা।

৫ম—২ উল্টা ১ সোজা (সামনে সূতা ১ সোজা) ২ বার, ২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা তোলাঘর ফেলিয়া দাও, ১ সোজা ১ সোজা জোড়া ২ উল্টা।

৬ষ্ঠ—২ সোজা, ৩ উল্টা ২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা।

৭ম—২ উল্টা, ২ সোজা (সামনে সূতা ১ সোজা) ২ বার, ২ সোজা, ২ উল্টা ১ তোলা, ১ সোজা জোড়া, তোলা-ঘর ফেলিয়া দাও, ২ উল্টা।

৮ম—[illegible] উল্টা ২ সোজা ৭ উল্টা ২ সোজা।

৯ম—২ উল্টা ৭ সোজা ২ উল্টা ১ সোজা ২ উল্টা।

১০ম—২ সোজা ১ উল্টা ২ সোজা ৭ উল্টা ২ সোজা।

১১শ—২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলিয়া দাও, ৩ সোজা ১ সোজা জোড়া, ২ উল্টা সামনে সূতা ১ সোজা, পিছনে সূতা ২ উল্টা।

১২শ—২ সোজা ৩ উল্টা ২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা।

১৩শ—২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা, তোলাঘর ফেলিয়া দাও, ১ সোজা, ১ সোজা জোড়া, ২ উল্টা ১ সোজা (সামনে সূতা ১ সোজা) ২ বার, ১ সোজা ২ উল্টা।

১৪শ—২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা ৩ উল্টা ২ সোজা।

১৫—২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা জোড়া, তোলাঘর ফেলিয়া দাও, ২ উল্টা ২ সোজা (সামনে সূতা ১ সোজা) ২ বার, ২ সোজা ২ উল্টা।

১৬শ—২ সোজা ৭ উল্টা ২ সোজা ১ উল্টা ২ সোজা।

শরৎচন্দ্রের প্রতি

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী এম-এ

হে শরৎ, তব দরদী হিয়ার ঘর-সন্ধানী আলো
নর-নারীদের গহন মনের ধবনিকা ঘন কালো
একে একে সব ভেদি'
সকল তর্ক, সব সংশয় ছেদি ;
প্রকাশিল সেই অজানা দেশের কত না রত্ন-ধন
দুর্লভ সুগোপন !
কত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা, কত সেথা ব্যাকুলতা,
বলি-বলি ক'রে-না-বলা কত না কথা,
নিভৃতে দুয়ার-আঁটা
তরুণ কোমল বুকে-বেঁধা হায় ! কত না তীক্ষ্ণ কাঁটা,
কত অভিমান, কত না চাতুরী ছল,
কত না মধুর কলহাসি, কত তপ্ত অশ্রুজল,
কত ঘৃণা-দ্বেষ-ঈর্ষা, কত না মায়া-মোহ-মরীচিকা
গায়ে গায়ে সব লিখা
ক্ষুধিত প্রেতের নানা অপরূপ ছায়াময় তনু ধরি'
কাঁদিয়া ফিরিছে অস্ফুট গুঞ্জরি,
আকাশ-বাতাস ব্যথিয়া দীর্ঘশ্বাসে,
বুক ফাটা হা-হুতাশে !
তব সন্ধানী আলোর সম্মুখে চকিতে পড়ে যে ধরা
রঙ-বেরঙের কত না মুখোস-পরা
সারা দুনিয়ার নানা সমস্যা-প্রশ্নের কত মূল
সূক্ষ্ম, মারাত্মক, স্থূল !
আদি বর্বর নর ও নারীর বুত্তিরা দলে দলে,
প্রাসাদ-লগ্ন যত্নে-লালিত পুষ্পিত তরুতলে
অন্ধ বিবরে সরীসৃপের মতো
ঘুঁসিয়া ঘুঁসিয়া উঠিতেছে সেথা কত।
দীন অসহায় মূক
আর্ত ক্লিষ্ট নর-নারীদের সুখ-দুঃখ, ভুল-চুক,
ভাব-অনুভূতি, আবেগ-আকুতি, আকাঙ্ক্ষা আর আশা
লভিল তোমার ক্ষমা-সুন্দর অশ্রু-সজল ভাষা।
অমর শিল্পী ! তাই তো তাহারা তোমারে আপন করি,
বসালো হৃদয়ে—চির-অক্ষয় প্রেমের আসনে বরি' ॥

—পনেরো—

বনশ্রী 'কপি' পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে একটা একশো টাকার চেক। কথা রেখেছে। ব্যবসার ব্যাপার যখন, ব্যবসায়ীভাবে চওয়াই ভালো।

দু'দিন একেবারে সময় পায়নি সত্যজিৎ। ইন্দ্রজিৎ বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল—বাড়ীতে এক লাইন লেখাপড়া করবার জো ছিল না। কাটা আঙুল নিয়েও রম্বুকে কড়া নজর রাখতে হয়েছে ওর ওপর। আজ সকাল থেকে ইন্দ্রজিৎ নিঝুম মেরেছে। ওর নিয়মই এই। দিন কয়েক অবিশ্রান্ত ক্যাপামির পরে আবার তিন চারদিনের জন্যে একেবারে শান্ত হয়ে যায়—সতেরো আঠারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, জোর করে নাওয়াতে খাওয়াতে হয়। যেন অসহ্য শ্রান্তির পরে ওইটুকু তার বিশ্রাম।

বাবার অবস্থাও খুব স্বাভাবিক ছিল না। দিন দুই অত্যন্ত বেশি মাত্রায় মদ খেয়েছেন। শরীরের এই রকম অবস্থায় এ ভাবে মদ খাওয়া যে ঠিক নয়—সেকথা সত্যজিৎ তাঁকে বোঝাতে পারেনি। জীবনে কেউ-ই কোনোদিন বোঝাতে পারেনি শিবশঙ্করকে। পারলে মুখার্জি-ভিলার ইতিহাস অন্যরকম হত।

কিছুই করবার নেই—সত্যজিৎ জানে। চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুখার্জি ভিলা। কেবল তলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। বাবার সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারেরা মুখার্জি ভিলা দখল করবে—সত্যজিতের অধ্যাপনার সামান্য টাকা আর দুখানা ভাড়াটে বাড়ির সাধ্য নেই চারটে মর্টগেজের হাত থেকে একে বাঁচায়। শুধু মুখার্জি ভিলাই নয়—ওই বাড়িদুটো বেচেও দেনাশোধ হবে কিনা সন্দেহ। তারপর—তারপর কলকাতার অসংখ্য মধ্যবিত্তের সঙ্গে একই ইতিহাসের পথ দিয়ে যাত্রা করতে হবে।

কিন্তু ভেনাস আর অ্যাডোনিসের ছবিটা? কী গতি হবে ওটার? একটা অর্থহীন কৌতূহলে ভাবতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ।

বারান্দার অর্কিড কাঁপিয়ে এক ঝলক পুবের হাওয়া ঘরে এল—বনশ্রীর পাণ্ডুলিপি খস খস করে উঠে সত্যজিৎকে কাজের কথা মনে করিয়ে দিলে। অনর্থক দুর্ভাবনা ছেড়ে সত্যজিৎ চোখ নামালো লেখার ওপর। গ্যালিভায়স্ ট্র্যাভেল্স্-এর নোট লিখেছে বনশ্রী। গ্যালিভায়স্ ট্র্যাভেল্স্!' নিতান্ত শিশুতোলানো গল্পের আড়ালে মানুষের সম্পর্কে কী ঘৃণাই ঘোষণা করে গেছেন জোনাথান সুইফ্‌ট্! কী যন্ত্রণা—কী ক্রোধ! লোকটা না পারল ভালোবাসতে—না পারল ভালোবাসা নিতে। ভ্যানেসার চোখের জলের দাম দিতে পারলে হয়তো শেষ পর্যন্ত এমনভাবে পাগল হয়ে যেতেন না। কে জানে!

"He gave the little wealth he had
To build a house for foods and mad
And show'd by one satiric touch—"

নাঃ—জোনাথান সুইফ্‌ট্ থাকুক। বনশ্রী কী লিখেছে তাই দেখা যাক।

মিনিট কয়েকের জন্যে ডুবে রইল সত্যজিৎ। দু-একটা লাইন এদিক ওদিক করে দেওয়া, এক আধটা শব্দের সামান্য অদল-বদল করা। বনশ্রী সত্যিই বিনয় করেছিল। বিশেষ কিছু তার করবার নেই।

বীথি এল।

—খুব ব্যস্ত আছেন স্যার ?

সত্যজিৎ চোখ তুলল।

—ইয়ারকি হচ্ছে ?

—বাঃ, ইয়ারকি কেন ? ক্লাসে তো স্যার বলতেই হয়। কোন্ দিন ফস্ করে ক্লাসেও ছোড়দা বলে ডেকে ফেলি তাই বাড়িতেও অভ্যাস রাখছি। বীথি হেসে উঠল, চক্‌চক্ করে উঠল চোখ।

—খুব হয়েছে, তোকে আর পাকামো করতে হবেনা। তোদের কেস্ কবে ? বারোই ?

—তাই তো শুনেছি। কী আর হবে। দিন কয়েক জেল খাটতে হবে।—সামনের চেয়ারটায় বীথি বসে পড়ল, আর তখনই চোখ পড়ল সত্যজিতের।

—বাঁ হাতটা ও-ভাবে রেখেছিস কেন রে ?

বীথি মৃদু রেখায় হাসল।

—ও কিছু না। একটু চোট লেগেছিল।

—কী করে লাগল ?

—ভ্যানে তোলবার সময়।

—ওঃ !—সত্যজিৎ চুপ করল। কিছু নয়, সত্যিই ও কিছু নয়। এখনো অনেক দাম দিতে হবে। অনন্ত সেন-গুপ্তকে মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে সেই মানুষটাকে—রোদে যার মাথার শাদা চুলগুলো ঝিকমিক করছে—

আর নিকেলের ফ্রেমের চশমা দুটো জ্বলন্ত অগ্নিনেত্রের মতো তাকিয়ে আছে ভ্যালহাউসি স্কোয়ারের দিকে।

—আচ্ছা ছোড়দা ?—বীথি প্রশ্ন করল।

—কী বলছিস ?

—তোমরা কিছু করবে না ? তোমাদের প্রফেসার অ্যাসোসিয়েশন ?

অস্বস্তিতে নড়ে উঠল সত্যজিৎ।

—আমরা আবার কী করব ?

—বাঃ, তোমরাও তো এডুকেশনিস্ট্। তোমাদের কোনো কর্তব্য নেই ?

সত্যজিৎ তিক্তভাবে হাসল : আমরা এডুকেশনিস্ট্ বটে—কিন্তু অনেক ওপরতলার আমাদের বাস। আমরা জনকয়েক সামান্য টীচারের জন্যে মাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পারি, তার বেশি আর কিছু করতে পারি না।

—চারদিকে যখন আগুন ঘিরে আসছে, তখন নিজেদের ভ্যানিটি নিয়ে তোমরা কী করে বাঁচবে ছোড়দা ?

—বীথির গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে এল, ঝকঝক করে জ্বলে উঠল চোখ : সত্যি ঠাট্টা নয়। তোমরাও টোকেন স্ট্রাইক করো না একদিন। অনেক জোরদার হবে আন্দোলন।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। টোকেন স্ট্রাইক! দু বছর আগেও হয়তো চেষ্টা করা যেত। কিন্তু আপাতত সে-কথা আর ভাবাই চলেনা। অনেক জল বয়ে গেছে এর ভেতর—অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অনেক তাণ্ডব হয়ে গেছে। বছরে একটা কনফারেন্স—গোটা কয়েক সাধু প্রস্তাব—দু তিনটে সুদীর্ঘ বক্তৃতা, তারপরেই সব শেষ। মাঝখানে যে শক্তি নিয়ে সংগ্রামী ভূমিকায় মাথা তুলেছিল অ্যাসোসিয়েশন, বুদ্ধিজীবীর অহমিকায়, ভ্রান্তির পাপ-চক্রে, স্বার্থের তুচ্ছতায়, আর শ্রেণীসুলভ নির্বিকার ঔদাসীন্যে তার সমাধি রচিত হয়ে গেছে অনেকদিন।

—সত্যি, তোমরা একদিন টোকেন স্ট্রাইক করলে—

—থাম থাম, খুব হয়েছে।—আলগা ভাবে একটা ধমক দিলে সত্যজিৎ : নিজেরা তো পড়াশুনো চুলোয় দিয়েছিস, আমরা স্ট্রাইক করলে আরো সুবিধে হয়—না ?

বীথি এবার উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল।

—এ একেবারে হিজ মাস্টার্স্ ভয়েস্—প্রিন্সিপ্যালের প্রতিধ্বনি—স্যারের মতো কথা। আমি কিন্তু স্যারের মতামত চাইনি—ছোটদার কথা শুনতে চেয়েছিলুম।

সত্যজিৎ হাত বাড়িয়ে বললে, ছোট্‌দা এবার তোমার কান টেনে ধরবে। যা, এখন পালা এখান থেকে। বিরক্ত করিসনি। বীথি হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালো।

—কথাটা কিন্তু এড়িয়ে গেলে।

—পালা বলছি। সারাটা বিকেল আড্ডা দিয়ে বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা কাজলামো করতে এসেছে। পড়াশুনো নেই ?

—যাচ্ছি পড়তে। গিয়ে বলছি তপস্যায়। পার্সিভ্যালের এই মার্চেন্ট-অব-ভেনিস্‌টা নির্ঘুম তোমার টেবিল থেকে।

—পার্সিভ্যালের সৌভাগ্য।

—আর ইউনিভার্সিটিরও—বলে বই নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বীথি।

মুখার্জি ভিলার এই একটি আলো। একটি মাত্র আলো। কতক্ষণ জ্বলবে। হঠাৎ নিবে যাবে একদিন? না জ্বালিয়ে তুলতে পারবে সকলকে?

'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স'-এ আবার মন দিতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ, কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছেনা। তারও ছাত্রজীবন ছিল, ইউনিয়ন ছিল, উত্তেজনা ছিল, কলকাতার পথে পথে অনেক ঝড়ের ডাকে সে-ও সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সে-ও কি কোনোদিন ভেবেছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই এখন একটা মানসিক শূন্যতায় সে পৌঁছুবে—কোনো কিছু করবার উদ্যম থাকবেনা—যেমন চলছে তাকে মেনে নিয়ে কাটিয়ে যাবে দিনের পর দিন? 'কেবল স্টাফ্‌রুমের বদ্ধ আবহাওয়ায়, হাজিরা বই, ডাস্টার, ভাঙা খড়ির টুকরো, চায়ের পেয়ালা, সিগার আর সিগারেটের গন্ধের ভেতরে কথার বুদ্‌বুদ তৈরি করে মানসিক আভিজাত্যকে ঘোষণা করতে হবে?

সত্যজিৎ একটা চুরুট ধরালো। কেন এমন হয়? আজকের অগ্নিগর্ভ ছাত্র কাল অধ্যাপকের চেয়ারে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে মিইয়ে যায় কী করে? কেন তার মনে হতে থাকে—তাদের যুগটাই ছিল ভালো, এ যুগের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার?

যাঁদের চুলে পাক ধরেছে, তাঁরা অনেকে আরো নিশ্চিন্ত। স্টাফ্‌রুমের কোণায় ডেক চেয়ারে ঘুমোতে ঘুমোতে তাঁদের কেউ কেউ তর্কের আওয়াজে চমকে জেগে ওঠেন। বিরক্ত হয়ে হাই তুলে পাশের প্রৌঢ়কে বলেন, খাওয়াটা আজ বড্ড বেশি হয়ে গেছে—বুঝলেন। সস্তায় একটা বড় ইলিশ এনেছিলুম—

আরো একটু বয়েস বাড়লে হাঁপানি আর ডায়াবেটিস তত্ত্ব। সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলীর রোমাঞ্চকর অলৌকিক কাহিনী।

'For Thine is the Kingdom—'

ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তবু এই হচ্ছে মহাজনপন্থা! সত্যজিৎও সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের দিকেই চলেছে। তান্ত্রিক সাধু। তাবিজ। বাত। 'এরা গোল্লায় গেছে—এদের কিচ্ছু হবেনা।' হেড্‌ এক্সামিনারশিপ্‌। বড়বাজারের শাঁসালো প্রাইভেট টিউশন। কলেজ কমিটি। ভবিষ্যৎ ভাইস্‌-প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা। পোর্ট-কমিশনার জানাশোনা কেউ আছে মশাই? আমার ছেলেটাকে ঢোকাবার চেষ্টা করছি—'

একটা অঙ্কের যোগফল। সত্যজিৎ আপাতত ঘাপে সেই অঙ্কটাকেই সাজিয়ে চলেছে। নিজের অজ্ঞেই।

বীথি ফিরে এল।

—ছোড়দা?

—আবার কী চাই?

বীথি একটু ইতস্তত করল।

—কী বলছিলি?

—দিদিকে বোধ হয় রীতেনবাবুর সঙ্গে ছেড়ে না দেওয়াই উচিত। একে ক্লাউনের মতো চেহারা—তেমনি মনে হয় যেন সার্কাসের দল থেকে পালিয়ে এসেছে। লোকটাও বোধ হয় ভালো টাইপের নয়।

রীতেন? হাঁ—ঠিক কথা। রীতেন দি গ্রেট! সত্যজিৎ আশ্চর্য হয়ে বললে, রীতেনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল নাকি প্রীতি?

—হাঁ রেডিয়োতে গেছে। সন্ধ্যায় দুটো প্রোগ্রাম আছে ওর।

—হঠাৎ রীতেন কেন? রঘুই তো যায় বরাবর।

—রীতেনবাবু কাল বিকেলে এসেও তো গল্প করে গেছে অনেকক্ষণ। বাবার কাছে গিয়ে খুব জমিয়ে গিয়েছিল। কী, খাওড়াস রসিকতা আর হাউ হাউ করে হাসবার কী বিকট ভঙ্গি! বাবাকে দারুণ ইম্‌প্রেস্‌ করেছে।

চুরুটের গোড়াটা কাপড়ে ধরল সত্যজিৎ।

—ওঃ!

—আমার কাছে বিশেষ পাত্তা পায়নি। বীথি বলে চলল: কিন্তু বাবা দেখলুম খুব হাসছেন ওর কথায়। আর দিদি তো একেবারে মুগ্ধ! বাবাই নিশ্চয় দিদিকে ওর সঙ্গে রেডিয়োতে যাওয়ার পারমিশন দিয়েছেন।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল।

—তোমার কিন্তু দিদিকে বারণ করা উচিত ছোড়দা। রীতেনবাবু লোক ভালো নয়।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব।—ক্লান্ত গলায় জবাব দিলে সত্যজিৎ। তার আর ভালো লাগছেনা। মুখার্জি-ভিলা নিজের হাতে নিজের ইতিহাস রচনা করে চলেছে। সেখানে কারো আর কিছু করবার নেই।

বাবার ঘরে রেডিয়ো বেজে উঠল। প্রীতির প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না—" (ক্রমশঃ)

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা, "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহর-তলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সংকুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ঘরে অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না

তাঁকে। বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন। উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি—কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

HVL 314B-X52 BG

হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে কর্তৃক প্রস্তুত

পাটি ও পীঠ

শ্রী'শ'—

সঙ্গীত নাটক একাডামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে—ফিল্ম সেমিনার। মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি ডাঃ রাজা মন্নার সঙ্গীত-নাটক একাডামী চেয়ারম্যান। শ্রী বি. এন সরকার ফিল্ম সেমিনারের চেয়ারম্যান, আর চিত্রজগতে স্বনামধন্যা শ্রীমতী দেবিকারাণী রোরিক ও পৃথ্বীরাজ কাপুর দুজনেই সেমিনারের ডাইরেক্টার।

ও শিক্ষা-প্রদ। শুধু তাই নয়, সেমিনারের বিভিন্ন অধিবেশনে সর্ব্বশ্রী ডাঃ পি. ভি. রাজা মন্নার, বি. এন. সরকার, এস. এস. ভাসানি, ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, এস ভাবনানী, পরলোকগতা সুপ্রভা মুখার্জি, ভি. শান্তনম, কিশোর সাহু, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, মার্কাস বার্টলী, এম. এ. ফজলভাই, অনিল বিশ্বাস, দুর্গা খোটে, কে. এম. মোদী, ডেভিড আব্রাহাম, কে. এ. আব্বাস প্রভৃতি ফিল্ম বিশেষজ্ঞের শিল্পীর বক্তৃতা চিন্তা জাগায়, বুঝিয়ে দেয়, ফিল্ম সম্বন্ধে কত কি জানবার আছে ভাববার আছে। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আলোচনাও। আলোচনায় যোগ দিয়েছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী ও শিল্পবিশারদগণ। যথা সর্বশ্রী রাজকাপুর, নার্গিস, দিলীপকুমার, উদয়শংকর,

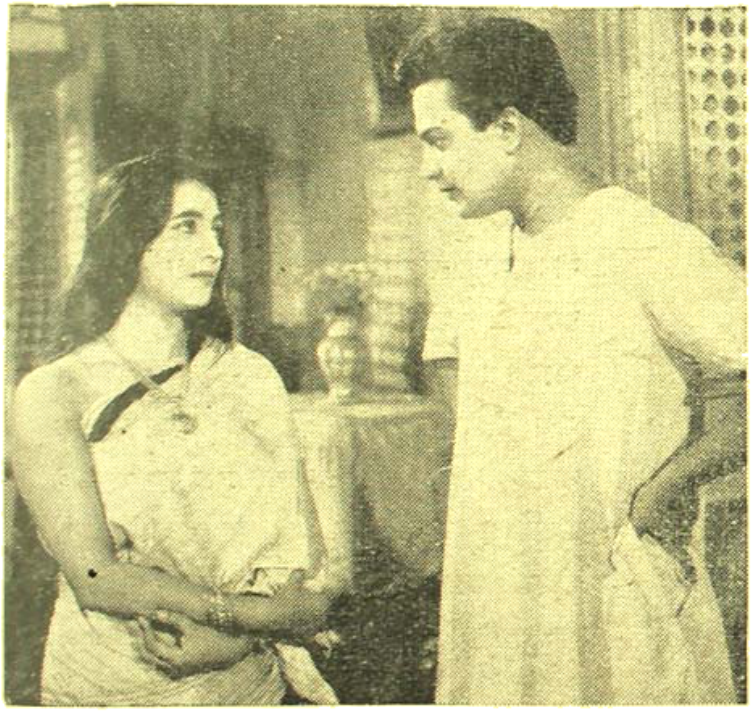

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস "শ্রীকান্ত"র অংশবিশেষ অবলম্বনে শ্রীমতী পিকচার্সের নির্মীয়মান চিত্র "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত"র একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

বাংলা অঞ্চলের অনারারী জেনারেল-সেক্রেটারী ডাঃ আর. এম, রায় এই রিপোর্ট সংকলন করেছেন। সেমিনারের সংগঠনের পর থেকে ১৯৫৭ সালের ঘটিত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯৫৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফিল্ম সেমিনারের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী বক্তৃতা সত্যি বড় কৌতুকোদ্দীপক আর. রঞ্জন, দেবকী বোস, সৌরেন সেন, মধু বসু, পঙ্কজ মল্লিক, নমিতা সিংহ প্রভৃতি। আলোচনা হৃদয়-গ্রাহী ও শিক্ষণীয় যে হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং ফিল্ম সেমিনার সৃষ্টির সার্থকতাও প্রমাণ করে। ফিল্ম সেমিনারের মাধ্যমে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প নিশ্চিত পদক্ষেপে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে, আগ্রহ

ভারত-গঠনে করবে সহযোগিতা—এ আমরা আশা করতে পারি।

"রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত" চিত্রের একটি দৃশ্যে
শ্রীকান্তের রূপসজ্জায় উত্তমকুমার

॥ পথে হল দেরী ॥

অগ্রদূত প্রডাকসন্সের 'পথে হল দেরী' চিত্রটি সম্প্রতি কলিকাতায় বিশেষ আকর্ষণীয় চিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু চিত্রটিতে রঙের খেলা ছাড়া নতুনত্ব আর কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। বাংলা রঙীণ চিত্ররূপে "পথে হল দেরী"ই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল। এই দিক থেকে চিত্রটির বিশেষত্ব আছে, তা ছাড়া আর সব কিছুই মামুলী।

বাংলা চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পীযুগল উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন এই ছবিটির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হলেও অভিনয়ের দিক থেকে তাঁরা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি বললে ভুল বলা হবে না। তবে শেষের দিকে সুচিত্রা সেনের অভিনয় মর্মস্পর্শী হয়েছে একথা বলা চলে। উত্তমকুমারের অভিনয়ের মধ্যে সেই গতানুগতিক গম্ভীর অভিনয় ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। গোড়ার দিকে সুচিত্রা সেনের হিন্দী ফিল্মের মতন চোখ-মুখ ঘোরান গান ও অভিনয় বিরক্তি উৎপাদন করে। গানগুলিও শোনবার মতন এমন কিছু নয়। তা ছাড়া ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় নায়িকার শাড়ীর বাহার ও দার্জিলিং-এর মনোরম বহির্দৃশ্য দেখানই এই ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য। গল্পের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও বলতে হয় গল্পটির বাঁধন অত্যন্ত দুর্বল। নায়িকার দাদুরূপী ছবি বিশ্বাসকে অত্যন্ত কঠোর বলেই মনে হয়। নিজের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী নাতনীর প্রতি এতটা কঠোর ব্যবহার মনকে আহত করে।

যাই হোক, বাংলা রঙীণ চিত্রের অগ্রদূত হিসাবে "পথে হল দেরী"কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, আর অগ্রদূত প্রডাকসন্সের শিল্পী ও পরিচালকদেরও জানাচ্ছি আমাদের শুভেচ্ছা—তাঁরা যেন আরও সুন্দরতর রঙীণ চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হন।

* * *

ভারতীয় অভিনেতা শ্রী আই, এস, জোহার একটি ব্রিটিশ চিত্রে অভিনয় করবার চুক্তিতে বদ্ধ হয়েছেন। ছবিটিতে তিনি একটি শিকারীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। চিত্রটির নাম "Harry Black" এবং লেখকের নাম David Walker। এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ মাইসোরে করা হবে। ছবিটিতে হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা Stewart Granger ও Barbara Rush এবং খ্যাতনামা ব্রিটিশ অভিনেতা Anthony Steel অভিনয় করবেন। এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীকে এই ছবিতে কাজ দেওয়া হবে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে মাইসোরে ছবিটির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে। চিত্রটির প্রযোজক হচ্ছেন বোম্বের প্রাক্তন গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের পুত্র লর্ড জন্ ব্রাবোর্ণ।

* *

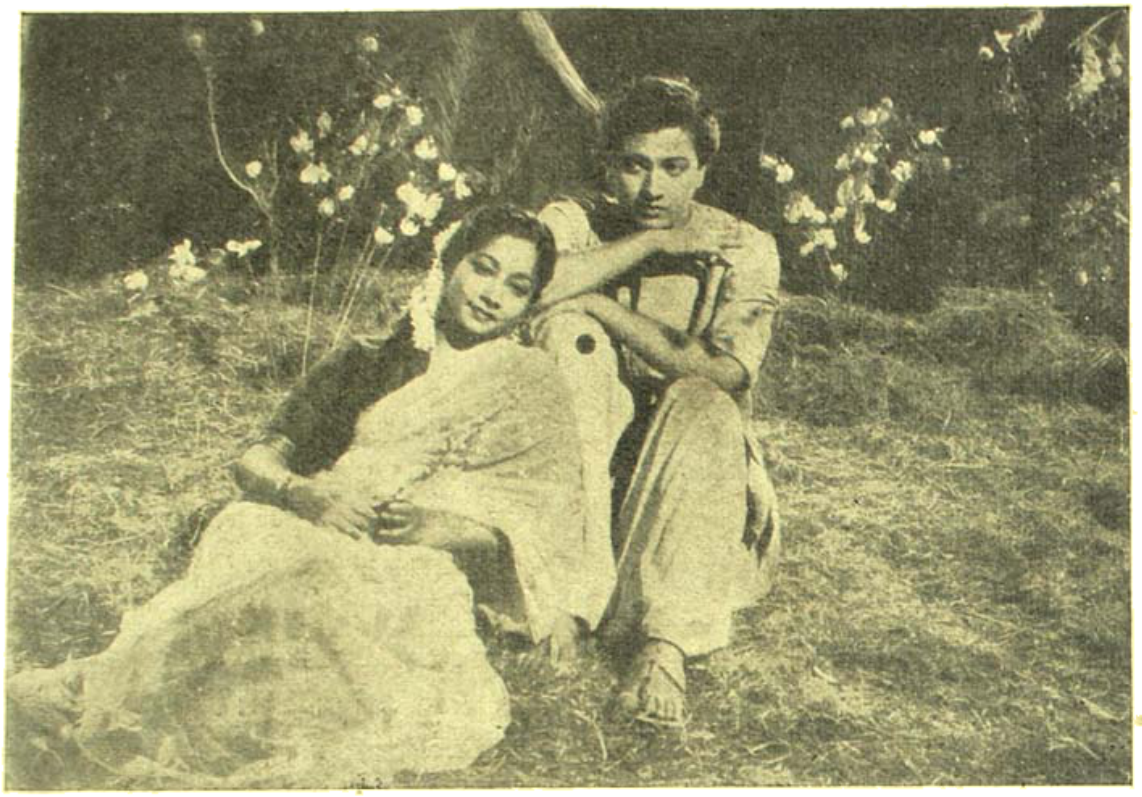

অদিন চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথমবারের "কলঙ্কী চাঁদ" চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্যে অশোক কুমার ও ভগবতী ঘোষ
চিত্রখানি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক শিব চট্টোপাধ্যায়

গীত, বাদ্য ও নৃত্যকলায় বালিকার কৃতিত্ব

অতি অল্প বয়সেই কুমারী ইরা বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার বাদ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বিগত ১৯৪০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত সম্মেলনে ইরা সকল গ্রুপের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ভীপ্‌সী নৃত্যে সৌরীশংকর সুবর্ণ পদক লাভ করে। মনিপুরী নৃত্যেও অনুরূপ পারদর্শিতা দেখিয়ে সুধীজনের অভিনন্দন অর্জন করে। ১৯৪৭ সালে মহাজাতিসদনে দুই-দিনের অনুষ্ঠানে ইলেক্‌ট্রিক গীটারে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। ইতিপূর্বে বেনারস এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বহু অনুষ্ঠানে কুমারী ইরা গীত বাদ্যে যোগদান করে। সে বর্তমানে একজন বিশিষ্ট বেতার-শিল্পী। আমরা তার গীত ও নৃত্যে অসামান্য প্রশংসা অর্জন করে। ইরার বয়স মাত্র চৌদ্দ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

শিবেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

লাবনিক থেকে বেরিয়ে ওরা ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালো। সুলেখা চলে গেল চোপরার গাড়ীতে। কিন্তু শিপ্রা গেল না।

পড়ন্ত বিকেল। এক পশলা বৃষ্টির পর আবার চকাস করেছে। কিন্তু মেঘের চলাচল থামে নি। আকাশটা যেন অভিমানিনীর মত আলুথালু বেশে হেঁটমুখে মাটির দিকে চেয়ে আছে। কান্না থেমেছে, কিন্তু চোখের পাতা এখনও ভিজে।

এতক্ষণ বেশ লাগছিল অজিতকে। হঠাৎ মনটা কেমন ভেসে উঠলো। অজিতের হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে শিপ্রা বললে, ফিরে যেতে পারবে তো একলা ?··· ডালহৌসি বা এস্‌প্লানেডে গেলেই সাউথের ট্রাম পাবে।

জানি: অজিত ঘাড়টা হেলিয়ে শিপ্রার মুখপানে চেয়ে হাসে। আমেজের ডিক্যান্টারটা গড়িয়ে যেন একটুখানি স্যাম্পেন ঢেলে দিতে চায় ওর মনের পেয়ালায়।

শিপ্রা হাসে না। কাজল-চোঁয়ানো চোখদুটো শুধু একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঝুল-বটুয়াটা এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বলে—গুড নাইট, অজিত !··· কাল রবিবার।···বিকেল চারটের দেখা হবে হোস্টেলে।

হাত তুলে শিপ্রা ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে যায় ফুটপাথের কিনারায়। হঠাৎ উত্তরগামী বাসটায় উঠে বসে। অজিতকে দ্বিতীয় কোন কথা বলবার সুযোগ দেয় না। বাসের জানালায় শুধু একবার ঘাড়টা ফিরিয়ে মুখখানা তুলে ধরে অজিতের দৃষ্টিপথে।

এক ঝলক ক্রুড-অয়েলের কালো ধোঁয়া ছেড়ে বাসখানা গন্তব্য পথে ছুটে চললো। ধোঁয়ার গন্ধে বাতাসটা বাঁজালো হয়ে ওঠে। তবুও অজিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাসখানার দিকে। বাসের স্পীড বাড়লো, কিন্তু ওর মনের গতিটাকে যেন শিপ্রা হঠাৎ মন্থর করে দিয়ে গেল বাঁ-হাতে ব্রেকটা টেনে।

ক্ষণকাল নির্ভাবের মত দাঁড়িয়ে থেকে অজিত ধীরপদে এগিয়ে চললো এস্‌প্লানেডের পথে।···বাসখানা তখন দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বটুয়াটা খুলে শিপ্রা ডায়েরির ছেঁড়া পাতাটা বের করে আর-একবার দেখে নিলে জয়ন্তর ঠিকানাটা।···বেনেটোলা লেনের মেস ছেড়ে জয়ন্ত উঠে গিয়েছে বরানগরের একটা বাগান বাড়ীতে। হয়তো বিনা পয়সায় থাকবার জায়গা পেয়েছে। কুকারে রান্না করে খায়। বাগানে মালী নিশ্চয়ই আছে, তবুও একজন বিশ্বাসী লোক থাকলে দেখা-শোনার সুবিধা হয়, তাই বোধহয় প্রশান্ত জোয়ারদার বিনা-পয়সায় দোতলার একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন জয়ন্তকে। নিরিবিলি জায়গাই সে খুঁজেছিল এতদিন। কিন্তু মেসের চার্জ মিটিয়ে নতুন জায়গায় উঠে যেতে হলে যে টাকার দরকার, তার ব্যবস্থা করতে পারে নি বলেই উঠে যাওয়া ওর হয় নি।

শিপ্রা চেয়েছিল টাকা দিতে। কিন্তু জয়ন্ত নেয় নি। ওর প্রস্তাবে সে শুধু একটু হেসেছিল। নিতান্ত নিষ্প্রভ একটুকরো হাসি। জয়ন্তর সেই হাসিটুকুই যথেষ্ট হয়েছিল শিপ্রাকে নিরস্ত করতে। তারপর প্রায় তিনমাস শিপ্রা আর জয়ন্তর মেসে পা বাড়ায় নি।

এই তিন মাসের ভিতরেই হয়েছে অজিতের সঙ্গে তার পরিচয়। মনটা আবার নতুন উদ্যমে ভরে উঠেছে। স্পোর্ট না হলে ও থাকতে পারে না। একটা স্পোর্ট ছেড়ে আর একটার জন্যে নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নেবার আনন্দে

ও মশগুল হয়ে থাকে। সেই আনন্দ যখন কমে আসে, শিপ্রার মনটা কেমন মন্থর হয়ে পড়ে।

জানা-চেনা বন্ধুবান্ধব যত ছিল সব যেন কেমন একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল। একই জিনিস রোজ রোজ ওর ভাল লাগে না। উপরো-উপরি সাতদিন ভাত খেতে হলেও যেন সে হাঁপিয়ে ওঠে। হয়, হঠাৎ বাড়ীর খাওয়া বন্ধ করে হোটেলে গিয়ে ডিনার করে আসে, না-হয় নিরম্বু উপবাস করে কাটায় সারাটা দিন।…তাই বেশ লাগলো অজিতকে। অজিত আর কুললীপ ওরা দুই বন্ধু। দুজনেই লক্ষ্ণৌ য়ুনিভার্সিটী থেকে এম-এ পাশ করে প্রথমশ্রেণীর সরকারী চাকরি নিয়ে এসেছে কলকাতায়।

মহারাষ্ট্র ভবনে ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অনুপম ভট্টাচার্য্যি আর সমর সেন। সেদিন ওদের সঙ্গে ছিল এঞ্জিনিয়র বালকৃষ্ণণ। বালকৃষ্ণণকে শিপ্রার আরও ভাল লেগেছিল। ভারি মিষ্টি চেহারা। চোখেমুখে যেন বুদ্ধির দীপ্তি মাখানো! কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ। মুখপানে চেয়ে মনের তলায় কোথায় যেন একটু স্নেহের দাগ লাগে! তাই শিপ্রা আলগোছে পাশ কাটিয়েছে। অনুপম টের না-পেলেও সমর সেন টের পেয়েছিল শিপ্রার চোখদুটোর দিকে চেয়ে।

মিষ্টার অ-জিৎ!

শিপ্রার দৃষ্টি ছিল বালকৃষ্ণণের মুখপানে। কিন্তু হাতখানা বাড়িয়েছিল অজিতের দিকে।…পরিচয় বিস্মৃত হবার আগেই প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবে গিয়েছিল। মহারাষ্ট্রভবনে সেদিন ছিল পূবালি সঙ্ঘের 'বিসর্জন' অভিনয়।

হঠাৎ জয়ন্তর কথা মনে হতে শিপ্রা অনেকদিন পরে আবার বেনেটোলার মেসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা হয় নি। জয়ন্ত তার দুমাস আগে মেস ছেড়ে চলে গিয়েছে। আলো জ্বালতে গিয়ে আঙুলটা যেন হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিকের ভাঙা সুইচে পড়েছিল। আকস্মিক বৈদ্যুতিক প্রবাহে শিরা-উপশিরাগুলো মুহূর্তে ঝিন্ ঝিন্ করে উঠেছিল।…টাকা ও পেয়েছে। হয়তো সুরেশাদির কাছে। খাওলওয়ালের টাকার অভাব নাই। তার ওপর সোনার ফসলে লেগেছে মরশুমি বাতাস: ছুটেছে নতুন বন্ধু চোপরা।

একটু ইতস্তত করে পাশের ঘরের ভদ্রলোকটিকে শিপ্রা জিজ্ঞেস করেছিল—বলতে পারেন, কোথায় উঠে গেছেন উনি—মানে, মিষ্টার জয়ন্ত চ্যাটার্জী?

জানি না: ভদ্রলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর মুখপানে চেয়েছিলেন। একটু থেমে, কি ভেবে বলেছিলেন—নীচের তলায় উত্তর দিকের ঘরটায় ম্যানেজার থাকে।

ও! ধন্যবাদ।

শিপ্রা আর অপেক্ষা করে নি। ক্ষিপ্র পদে সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে এসেছিল। ভদ্রলোকের মুখে যে চোরা হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল, সেটুকু তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বিব্রত সে হয়নি। তবুও দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তি তার ছিল না সেদিন।…ধার হিসেবে জয়ন্ত যে টাকা ওর কাছে নিতে পারে নি, সে-টাকা কেমন করে হাত পেতে নিয়েছে সুরেশাদির কাছে! একথা ভাবতে ওর সারামন পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে উঠেছিল।

সিঁড়ির সামনেই ম্যানেজারের ঘর। কালো মোটা-সোটা লোকটি খয়েরি রঙের একখানা সুজি পরে বসেছিলেন চৌকীর ওপর। সারা গায়ে বড় বড় লোম। অদ্ভুত চেহারা! মনে হয়, ঘাড়ের নীচে কালো ভাঁজটার ভিতর থেকে গায়ের রঙ গলেগলে পড়ছে ঘামের সঙ্গে।

দরজার সামনে গিয়ে শিপ্রা একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল, চলে আসবে। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে দু'পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে জয়ন্ত চ্যাটার্জী ছিলেন। জানেন তাঁর ঠিকানাটা?

চেনা মুখ। ভদ্রলোক আগেও অনেকবার দেখেছেন শিপ্রাকে এই মেসে আসা-যাওয়া করতে। তবুও যেন চোখ দুটো কেমন বড় হয়ে উঠেছিল ওর মুখ পানে চেয়ে। বিধন্ন মুখে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—আজ্ঞে না। ভুল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করা হয়নি। টাকা-পয়সা সব মিটিয়ে সিট ছেড়ে দিয়ে গেছেন কিনা।…তা, আসেন মাঝে মাঝে ডাকের চিঠি-টিঠি আছে কিনা, খোঁজ নিতে।…বলতে হবে কিছু?

না।…শিপ্রা মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছিল। ভদ্রলোকের কথা বলবার আগ্রহ যেন উপচে পড়ছিল। যা জানবার, তার বেশি জানতে সে চাইনি কিছু। নতুন করে কিছু বলবারও ছিল না তার।

বেনেটোলা থেকে ম্যানডেভিলা পর্যন্ত সারাটা পথ শিপ্রা যে কি-ধন নিয়ে ফিরেছিল, তা শুধু সে-ই জানে।… বেনেটোলার মেস ছেড়ে জয়ন্ত চলে গিয়েছে। উঠে গিয়েছে অন্য কোন মেস না-হয় বোর্ডিং-এ। কিন্তু ওরা কেউ-জানে না কোথায় উঠে গেল সে। যাবার আগে মেসের দেনা মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঠিকানাটা

পর্যন্ত রেখে যায় নি কারো কাছে। টাকা তার ছিল না, সে-কথা শিপ্রা ভালো করেই জানতো, এখনও জানে। হঠাৎ কেমন করে এত টাকা সে হাতে পেয়েছে, যাতে ক্ষমলের দেনা শোধ করেও নতুন আস্তানায় উঠে গেল, সে-কথা শিপ্রা ভাবতে পারে না। নিশ্চয়ই সুরেখাদি দিয়েছে টাকা। যে-টাকা এতদিন ওর কাছে ধার বলেও নিতে পারে নি, সে-টাকা সুরেখাদির কাছে কেমন করে দান পেতে নিয়েছে জয়ন্ত? তাতে কি পরাজয় ঘটে নি তার!

জয়ন্তকে ও ডাকে জায়ান্ট বলে। পুরুষের এত অহংকার ও দেখেনি জীবনে। তাই প্রথম-প্রথম শিপ্রার ভালো লাগে নি ওকে। কিন্তু সে অনুভূতি মিলিয়ে যেতে দেরী লাগে নি। জয়ন্তর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিপ্রা যেন জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল নিজের নারীত্ব। অজ্ঞাতসারে মনটা নরম হয়ে ঝুয়ে পড়েছিল। মনে মনে জয়ন্তকে স্বীকার করতে তার তিলমাত্র বাধেনি। নারীর মূল্য যে জয়ন্ত বোঝে না, তা নয়। হয়তো অন্যের চেয়ে অনেক বেশী বোঝে। নারীর মর্যাদা দিতেও সে কারো চেয়ে কম জানে না। দরদ-ভরা অদ্ভুত একটা শিল্পী মন। তবুও পোষ মানতে চায় না অন্য কোন দরদী মনের কাছে। সাড়া দিতে জানে না, তা নয়। কিন্তু সাড়া সে দেয় না। কেন দেয় না, সে-কথা শিপ্রা অনেক করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খুঁজে পায় নি কোন উত্তর।…দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। সারা দেহে কোথাও এতটুকু মেদ নেই। চওড়া বুকখানা দেখে মনে হয়, পলিমাটির ওপর চিউনি দিয়ে কোন কারিগর যেন নিখুঁত ভাবে প্রত্যেকটী ভাঁজ এঁকে দিয়েছে। লম্বা-লম্বা হাতদুটো যেন আফ্রিকী ইস্পাতের গান-ব্যারেল। লেমনেডের বোতল খুলতে চাবি লাগে না। চোখের নিমেষে মোচড় দিয়ে টিনের ছিপিটা তর্জনীর ঠেলনী দিয়ে অবলীলাক্রমে খুলে ফেলে। তাই দেখে, কতদিন শিপ্রা অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকেছে মুখ-পানে।…অদ্ভুত! সত্যি অদ্ভুত। বিজ্ঞানের ছাত্র অথচ কাব্য-সাহিত্য দর্শন ফাইন আর্টস্—সবকিছুতেই সমান অধিকার। বোঝে সব, জানে সব। জানে না শুধু পরাজয় স্বীকার করতে। এতটুকু কম্প্রোমাইজ করতে হলে, ছিটকে ওঠে স্প্রীংএর মত। বাজপাখীর ধৈর্য নিয়ে ওকে শিকার করা চলে না। অথচ শিপ্রাও জানে না হার মানতে। তাই যেন নিজেকে সরিয়ে আনতে সে হিমসিম খেয়ে যায়। যে-শিকারকে অস্বীকার করা চলে না, তাকে জায়ান্ট ছাড়া আর কি বলবে সে!

অনেক চেষ্টা করেও শিপ্রা যোগাড় করতে পারেনি জয়ন্তর ঠিকানা। মঞ্জরী, রেবা সোম, লীলা হালদার, কারুর্ম্মা, জগৎ চক্রবর্তী—কেউ পারেনি ওর সন্ধান দিতে। জগতের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব যে, তাকে জন্ম ছাড়া ভুলেও কোনদিন সে জগৎ বলে না। বোটানির নাম-করা অধ্যাপক জগৎ। চক্রবর্তী কিন্তু জয়ন্ত তাকে বলে গ্রাস্-হপার: ক্রম বিবর্তনের স্রোতে বোটানিষ্টের পর্যায়ে উঠেছে। শুধু ডারউইনের থিওরিতে সংজ্ঞা নিরূপণ করলে চলবে না, ওয়ালেস্‌ধান বা লামার্ক স্পষ্টই এ ইঙ্গিত রেখে গিয়াছেন যে, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দুটোই ক্রমবিবর্তনের পথে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে।

জগতের কাছেও যখন জয়ন্তর সন্ধান মেলেনি, শিপ্রা হতাশ হয়েছিল, কিন্তু নিরস্ত হয় নি। ওর জমাট-বাঁধা চিন্তা মস্তিষ্কতন্তুর ফাঁকে ফাঁকে পাক খেয়ে দাঁড়িয়েছিল মনের অন্তরালে। সেই স্পাইরাল সিঁড়ির ধাপে ধাপে বারবার সুরেখা চকল পদে ওঠা-নামা করেছে।

সন্দেহ ওর ঘোচে নি, তাই দাম ছাড়ে নি শিপ্রা। মনের ছবিয়ায় দাঁড় টেনে টেনে যখন শিপ্রা ক্লান্ত হয়ে এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ, নিতান্ত হঠাৎ, কলম্বাসের মত সে আবিষ্কার করেছে নোঙর ফেলবার মাটি।… নিউ আলিপুরের বাড়ীতে। যাওেলওয়াল তখন ছিল না। স্নানঘর থেকে বেরিয়ে সুরেখা ড্রেসিং-রুমে ঢুকেছিল প্রসাধন করতে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছিল চুলের গোছা শুকিয়ে ব্লো করে নিতে। মেসিনের শব্দটা মৌমাছির বাঁকের মত ছানা দিচ্ছিল ড্রয়িং রুমের জানালায়।

শিপ্রার অপেক্ষমান মন মামুলী বয়ে দ্রুত চলাফেরা করে। প্রতীক্ষা করবার ধৈর্য ওর কোনদিনই ছিল না, আজও নাই। তবুও বসে থাকে। চোখদুটো ড্রেসিং রুমের জানালা থেকে ফিরে আসে ছোট সেক্রেটারিয়াট টেবিল-টার ওপর: সফরিতা, তার গায়ে কাৎ হয়ে আছে মনের ট্রেন্‌ড্রিং অব দি লীফ, লাক্সনেসের সাদ্‌কা ভালসা, স্টাকেন জাইসের গল্প সমষ্টি—আর! ঘরোয়া-লেখার সিল্ট-এজেড একখানা ছোট ডায়েরি।

আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে শিপ্রা জানালাটার দিকে চেয়ে নিয়েছিল। সরু লম্বা আঙুল দিয়ে ক্লিপ করে টেনে এনেছিল ডায়েরিটা। তারপর দ্রুত অঙ্গুলি-সঞ্চালনে উল্টে গিয়েছিল পাতাগুলো: দিন-তারিখ, এনগেজমেণ্ট, মেমোরান্‌ডাম্, ঠিকানা!…জয়ন্তর ঠিকানা! মুহূর্তে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠেছিল ওর দেহের রক্তস্রোত। টুকে নেবার মত ধৈর্য তখন ছিল না। পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বটুয়ায় ভরেছিল। এক মিনিটও আর অপেক্ষা করে নি। সুরেখা ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ও-যখন দরজাটা পার হয়ে এসেছে, প্যান্ট্রী থেকে বয় বেরুচ্ছিল দুহাতে দু' প্লেট খাবার সাজিয়ে নিয়ে। ওকে চলে আসতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শিপ্রা ভ্রূক্ষেপ করে নি।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৫৭ সালের রোভার্স কাপ ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল ৩-০ গোলে ক'লকাতার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং গত বছরের রোভার্স বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের ইহা ষষ্ঠ জয়লাভ। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়-ক্রমে পাঁচবার রোভার্স কাপ জয়লাভ ক'রে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়লাভের রেকর্ড স্থাপন করে। তা ছাড়া প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র হায়দ্রাবাদ দলই ছয়বার রোভার্স কাপ জয়লাভ ক'রে সর্ব্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়লাভেরও রেকর্ড করেছে।

ফাইনাল খেলায় হায়দ্রাবাদ দলেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল, বিরতির ক'রে প্রথমার্দ্ধের খেলায়। খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই হায়দ্রাবাদ দলের জুলফিকার প্রথম গোলটি করেন। ২য় গোলটি দেন ইউসুফ। খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৫৭ মিনিটে ৩য় গোলটি দেন জুলফিকার।

হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল ফাইনালে ওঠে আই সি এলকে ৪-০ গোলে, মোহনবাগানকে ২-১ গোলে এবং ক্যাল-টেক্সকে ৩-০, ২-১ গোলে হারিয়ে।

মহমেডান স্পোর্টি ফাইনালে ওঠে ভিজাগাপত্তমের স্পোর্টসমেন ক্লাবকে ৪-০ গোলে, সেকেন্দ্রাবাদের ই, এম, ইকে ৩-০ গোলে এবং রাজস্থানকে (কলকাতা) ২-০ গোলে পরাজিত ক'রে।

সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ২-১ গোলে ক্যাল-টেক্স স্পোর্টস ক্লাবকে এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে ক'লকাতার রাজস্থান ক্লাবকে পরাজিত করে।

গত বছরের রোভার্স কাপের রাণার্স-আপ মোহনবাগান কোয়ার্টার-ফাইনালে ১-২ গোলে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের কাছে পরাজিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গত বছরের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান হায়দ্রাবাদ পুলিশদলকে পরাজিত করেছিল।

২য় রাউণ্ডের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১-৩ গোলে বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৭ সালের ৪র্থ বার্ষিক 'ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়ান-সীপ' প্রতিযোগিতার ফাইনালে সার্ভিসেস দল মোট ১০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭টিতে জয়লাভ ক'রে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান-সীপ লাভ করেছে। রেলদল বাকি তিনটিতে খেতাব লাভ ক'রে রানার্স-আপ হয়েছে। এ বছর সার্ভিসেস দল ৬৪-৩১ পয়েন্টে রেলদলকে পরাজিত করে। গত বছরও সার্ভিসেস দল চ্যাম্পিয়ান এবং রেলদল রাণার্স-আপ হয়েছিল।

ফাইনাল ফলাফল :

ফ্লাইওয়েট : নায়ক দেবদানন্দ (সার্ভিসেস); ব্যাণ্টমওয়েট : এস খাটাউ (রেলওয়ে) ; ফেদারওয়েট : সারওয়ান সিং (সার্ভিসেস) ; লাইটওয়েট : নায়ক সুন্দর রাও (সার্ভিসেস) : লাইট ওয়েল্টারওয়েট : নায়ক

শ্যামরাজ (সার্ভিসেস) ; লাইট-মিডলওয়েট : বি ডি' সুজা (রেলওয়ে). মিডলওয়েট : হরি সিং (সার্ভিসেস) ; লাইট হেভীওয়েট : এস বসু (রেলওয়ে) ; হেভীওয়েট : আবে রাম (সার্ভিসেস) ; ওয়েল্টারওয়েট : রঙ্গনাথন (সার্ভিসেস)।

বিজ্ঞানসম্মত লড়ায়ের জন্য স্বামী খাটাউ (রেলওয়ে) বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ ২১-১৪, ১৮-২১, ১৪-২১, ২১-৭, ২১-১০ পয়েন্টে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জীকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী এবং সমীর মুখার্জী ১৭-২১, ২১-১৪, ২১-১৭, ২১-১১ পয়েন্টে দীপক ঘোষ এবং পি মিত্রকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস উষা আয়েঙ্গার ২১-১০, ২১-১৬, ২২-২০ পয়েন্টে মিসেস সি কাপুরকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ ২১-৮, ২১-৯, ২৮-২৬ পয়েন্টে হ্যারী অ'কে পরাজিত করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে ইস্টার্ণ রেলওয়ে এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ৫-০ খেলায় বি বি এ সি দলকে পরাজিত করে।

পেশাদার টেনিস প্রদর্শনী ঃ

জ্যাক ক্রেমারের দলের পেশাদার খেলোয়াড়রা ক'লকাতার সাউথ ক্লাব লন্ টেনিস মাঠে দু'দিনের প্রদর্শনী টেনিস খেলায় যোগদান করেন। খেলায় যোগদান করেছিলেন জ্যাক ক্রেমার (যুক্তরাষ্ট্র), লুই হোড, এবং কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া), এবং পাঞ্চো সেগুরা (ইকোয়েডর)। এঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাক ক্রেমার হ'লেন ১৯৪৭ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ; অষ্ট্রেলিয়ার লুই হোড গত দু বছরের (১৯৫৬ ও ৫৭) উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ; অষ্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল ১৯৫৬ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে লুই হোডের কাছে পরাজিত হ'ন। কিন্তু ঐ বছরই আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় লুই হোডকে পরাজিত করেন। বর্তমানে তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ষ্টোক খেলোয়াড় বলা হয়। সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা লণ্ডন পেশাদার লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় রোজওয়াল ফাইনালে সেগুরাকে পরাজিত ক'রে খেতাব লাভ করেন। এক কথায় এঁরা চার জনই হ'লেন বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়।

প্রথমদিনের প্রদর্শনী খেলা দেখে দর্শকরা হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। মাঠের অবস্থাকে চারজন খেলোয়াড়ই আয়ত্বের মধ্যে আনতে সক্ষম হন নি। তাছাড়া তাঁদের খেলায় এমন সমস্ত ভুল ত্রুটি চোখে পড়েছিল যে, কোন সময়ই মনে হয়নি চোখের সামনে বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়দের খেলা দেখছি। এক এক সময় খেলা এমন একঘেঁয়ে হচ্ছিল যে,দর্শকদের আসন ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছিল অথবা আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাতে হয়েছিল। খেলার মধ্যে কোন প্রেরণা ছিলনা ; ফলে প্রথম দিনের খেলাগুলি মোটেই উপভোগ্য হয়নি। কেবল জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে বলা চলে। দ্বিতীয় দিনের খেলা যা কিছুটা উপভোগ্য হয়েছিল। এবং এই দিন রোজওয়ালের খেলাই দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছিল। কিন্তু ত' দু'বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান লুই হোডের খেলা দর্শকদের নিরাশ করে।

প্রথমদিনের সিঙ্গলস খেলায় কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩ ও ৬-৩ সেটে লিউ হোডকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। পাঞ্চো সেগুরা (ইকোয়েডার) ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে জ্যাক ক্রেমারকে (যুক্তরাষ্ট্র) পরাজিত করেন। ডাবলস খেলায় জ্যাক ক্রেমার ও সেগুরা ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে লিউ হোড ও কোন রোজওয়ালকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের সিঙ্গলস খেলায় রোজওয়াল ৭-৫ ও ৭-৫ সেটে সেগুরাকে এবং জ্যাক ক্রেমার ৬-৩, ২-৬, ৬-৩ সেটে লুইহোডকে পরাজিত করেন। ডাবলস খেলায় লুইহোড এবং কেনরোজওয়াল ৬-২, ১-৬, ও ৬-৩ সেটে সেগুরা ও ক্রেমারকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্ব দিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন।

ইউইফিল্ড এ্যাণ্ড ইউটেন্সেন টেবল টেনিস ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস : কে নাগরাজ (রেলওয়ে) ১১-২১, ২১-১৫, ২১-৯ ও ২১-২ পয়েন্টে থিরুভেঙ্গেডামকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : থিরুভেঙ্গেডাম এবং নাগরাজ (রেলওয়ে) ২১-১০, ২১-১২ ও ২১-১২ পয়েন্টে জে ব্যানার্জি এবং এস মুখার্জিকে (বাঙ্গলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সরোজ ঘোষ এবং মিস উষা আয়েঙ্গার ২০-২২, ২১-১৫, ২১-২৩, ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েন্টে দীপক ঘোষ এবং মিসেস কাপুরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : উষা আয়েঙ্গার ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১৩ ও ২১-১৩ পয়েন্টে মিসেস কাপুরকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৩ ও ২১-১৭ পয়েন্টে হ্যারী অ'কে পরাজিত করেন।

সাহিত্য সংবাদ

ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ : বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীমুখোপাধ্যায় ডক্টরেটের জন্যে যে প্রবন্ধ রচনা করে সম্মানের সঙ্গে ডি. ফিল্ উপাধি লাভ করেন, এ-গ্রন্থ তাহারই মুদ্রিত রূপ। ভারতীয় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েছে মুক্তি—বেদের যুগ থেকে, তথা মরণ থেকে মুক্তি। এ মুক্তির জন্যে এ দেশে পথ ও মতের অন্ত নেই। বেদ বেদান্ত ও উপনিষদ, মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, যোগ, পুরাণ, তারপর বৌদ্ধমত, জৈনমত, প্রত্যেক মতানুযায়ী মুক্তির ব্যাখ্যা সুপণ্ডিত অধ্যাপকের রচনা গুণে সর্বসাধারণের বুদ্ধি-গ্রাহ্য হয়েছে। গ্রন্থ-ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ বলেছেন, "কি জাতীয় পরিশ্রমের ফলে এই প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তাহা প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং পাঠকের চিত্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইবে।" এ গ্রন্থ পাঠে যদি পাঠকপাঠিকা মুক্তি-লাভ প্রণালী বুঝতে পারেন তবেই গ্রন্থকারের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হবে। পণ্ডিত-সমাজে এ গ্রন্থের বহুল সমাদর হবে এ-কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

প্রকাশক—ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।
১৯, বিশ্বকোষ লেন। বাগবাজার কলিকাতা—৩

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিষ্টিমন (কাব্যগ্রন্থ) : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত

আলোচ্য গ্রন্থে 'আটাশটী কবিতা আছে'। কবিতাগুলির রচনা কাল বলা হয়েছে ১৩৪৭ থেকে ১৩৬৩ আষাঢ়। সবগুলি বাংলার নানা পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার বাংলার কাব্যক্ষেত্রে নবাগত নন, সুতরাং এঁর সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক হয় না। রোমান্টিকধর্মী কবিতাগুলির বাচনায় আধুনিকতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। নূতন প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে নব নব ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতা গ্রন্থকার দেখিয়েছেন তাঁর 'মিষ্টিমনে'—বিশিষ্ট বাকভঙ্গিমায় ও শব্দ প্রয়োগে রবীন্দ্র-প্রতিভের প্রভাবযুক্ত হবার প্রচেষ্টাও দেখা গেছে অনেকগুলি কবিতায়। সাম্প্রতিক কবিতার ক্ষেত্রে স্বকীয় ভাবকল্পনার গ্রন্থকার যেভাবে রসসৃষ্টি করছেন তা'তে আশা করা যায়—তাঁর কাব্যসাধনা একদা সাফল্য-গৌরব লাভ করবে। 'মিষ্টিমনে' গ্রন্থকারের লিখন-শৈলী ও ভাবের অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়। কাব্যরসিক পাঠকপাঠিকারা এই গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দলাভ করবেন। লাইনো টাইপে ছাপা গ্রন্থখানি আকর্ষণীয়, চিত্রিত প্রচ্ছদপট ও রম্য।

প্রকাশক—মল্লিক সাহিত্যতীর্থ ৬৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬। ৭২ পৃষ্ঠা

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নতুন রেকর্ড

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্"

P 11932—সর্বজনপ্রিয় শিল্পী কুমার শচীনদেব বর্মণ গেয়েছেন "ঘুম ভুলেছি নিতুর এ নিশীথে" ও "ও আমি তোমায় কেন কথা কয় না"। দুখানা গানই সর্বাধিক দিয়ে সুখরভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

N 76059—'ওগো শুনছো' বাণীচিত্রের "আকাশে সোনালী কুসুম" ও "চৈতী চাঁদের চোখে" গান দুখানা আলপনা ব্যানার্জীর কণ্ঠে অপূর্ব সুর-ঝংকারে সত্যিই সুন্দর হয়েছে।

N 80124—উৎপলা সেন ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন দুখানা গীত "হায়রে বিদেশিয়া" ও "পিয়ারোজ ওয়োয়া নাহি মোর"।

N 76060—দুখানা আধুনিক গান "মন যে কেমন যাইগো" ও "ফাল্গুন রেশ দোল" গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। শিল্পী শ্রোতাদের মনেও আনন্দের দোলা দিতে পারবেন আশা করি।

"কলম্বিয়া"

GE 30372—'ছায়াসঙ্গী' বাণীচিত্রের দুখানা ত্রিয় গান "তুমি যে আমার" ও "আজ দুজনার দুটী পথ"—গেয়েছেন সুপারিচিতা গীতা দত্ত (রায়) দুখানা গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

GE 30373—'অভয়ের বিয়ে' বাণীচিত্রের দুখানা গান "মনে মনে গাঁথা মালা" ও "বাঁশি বলে ওগো পাপিয়া" গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গান দুখানা চমৎকার হয়েছে।

GE 30374—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় "অভয়ের বিয়ে" বাণীচিত্রের আর দুখানা গান গেয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। গান দুখানা "কোন অচিন মধুকর" ও "দীপ নেভা রাতে"।

GE 30379—'চন্দ্রনাথ' বাণীচিত্রের দুখানা গান "আকাশ পৃথিবী খোঁজে" ও "ঐ রাঙার দুলালী সীতা" গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাবে-ভাষায়, ছন্দ ও সুর মাধুর্যে গান দুখানা মর্মস্পর্শী হয়েছে।

GE 30380—'চন্দ্রনাথ' সবাক চিত্রের আর দুখানা গান "মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি" ও "স্মৃতির বাঁশরী কাঁদে" গেয়েছেন যথাক্রমে বাংলার দুইজন অতি জনপ্রিয় শিল্পী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মান্না ভট্টাচার্য। গান দুখানার মাধুর্যতা আছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

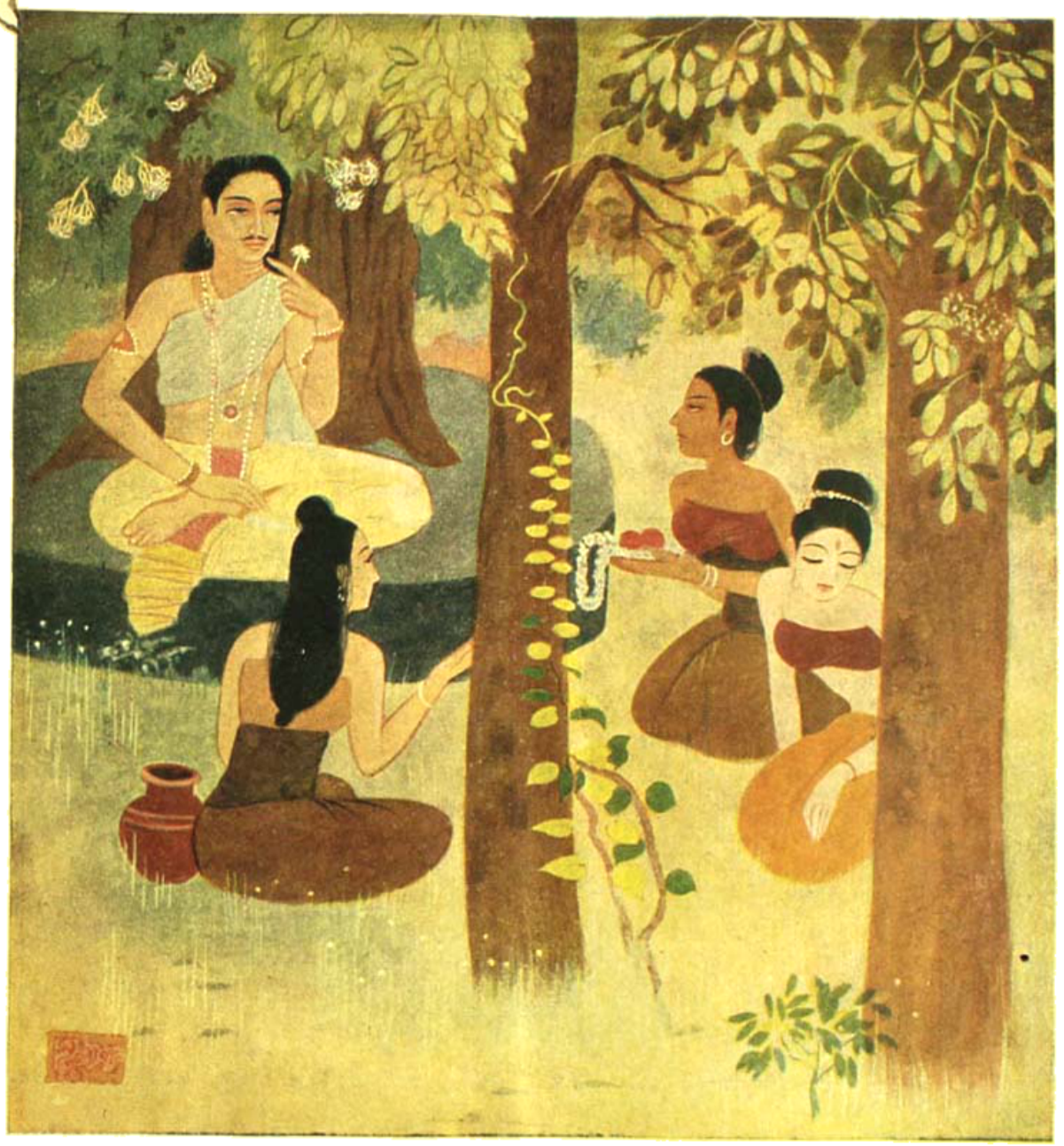

শিল্পী : শ্রীসতীন্দ্রনাথ সাহা এম. এ.

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষ

মাঘ—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সহজ-ধর্ম্ম

ডাঃ বিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরত্ন যোগাচার্য

১

"সহজ-ধর্ম্মে"র কথা মনে হইলেই আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ অথবা তন্ত্রের লতাসাধনের কথাই মনে আসে, আর মনটাও কেমন বিরস হইয়া যায়। সত্যই উহার বহিরঙ্গ সাধন জ্ঞানী সাধকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর এবং অনেক সময় লজ্জাজনকও বটে। কিন্তু ইহার একটা ভিতরের দিকও আছে এবং তাহাই সত্যিকার সত্যান্বেষীর পক্ষে সাধনীয়। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রই দ্ব্যর্থভাববাচক। প্রবৃত্তিমার্গা বা অজ্ঞানী সাধকের জন্য বহিরার্থ এবং জ্ঞানীদের জন্য অন্তর বা পারমার্থিক অর্থ। তাই পারমার্থিক সাধক বা সাধিকা বাউলে আছে—

"সরম না জানে ধরম বাখানে,
এমন আছয়ে যারা—
কাজ নাই সই তাদের কথাতে
বাহিরে রহুক তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা—

তোরা নিসার: * হইয়ে আয়লো সজনী,
আঁধার পেরিলে আলা।
সেই আলার মাঝারে কালাটি † আছয়ে,
চৌকী ‡ আছয়ে তথা,—
দেদেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগয়ে পরাণে ব্যথা।

অর্থাৎ সে কথা কাহাকে বলিব? আর তাহা শুনিবেই বা কে? সাধক ছাড়া সে কথা বুঝিবেই বা কয়জন? হয়তো বিদ্রূপ ও রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিবে। ইহাতে সাধকের প্রাণে ব্যথা লাগিতে পারে। তাই তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—"গোপয়েৎ কুলবধূবৎ," "গোপয়েৎ মাতৃসম্ভোগবৎ।"

আজকাল অনেকেই পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক নাম শুনিলেই নাক সিটকান; বলেন যে, যাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে—সেই অর্থই লইতে হইবে; ঐ সব কটমট অর্থ লইবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা বলেন, তাঁহারা সাধক নহেন এবং জীবনে সাধনার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না। মাত্র আধ্যাত্মিক মার্গের সাধকেরাই ইহা মর্মে মর্মে বুঝেন যে, আধ্যাত্মিক অর্থেরই পরম প্রয়োজনীয়তা আছে। বহিরার্থ মাত্র "পশুরেষ বকনাম:" লিখিত। তন্ত্রের সাধনীয় অংশের অন্তরার্থ লইতেই হইবে, নচেৎ সাধনার সার্থকতার স্থলে নিরর্থকতারই হা হুতাশ লইয়া পশুবৎ বিচরণ করিতে হইবে। মালাজপের ব্যবস্থার তন্ত্র বচন আছে—"মাতৃযোনী পরিত্যজ্য সর্বযোনী বিহারেৎ।" মাতৃযোনী বলে মালার মেরুটিকে, যেটি লাল সুতা দিয়া উপরে থাকে; আর বাকী মালার এক একটি দানাকে যোনী বলা হয়। অন্য বচনে—"সর্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবা-রাত্র ন পূজয়েৎ।" অর্থাৎ যে সুষুম্না নাড়ী সর্বদাই অতীব অনুভবনীয় ভাবে চলিতেছে, তাহা ক্রিয়া দ্বারা যেন প্রকাশমান হইলে তখনই দেবী পূজা করিবে। দিবা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায়, রাত্রি অর্থাৎ বাম নাসিকায় যখন শ্বাস বহে, তখন দেবীপূজা করিবে না; করিলে তাহা আদর্শ বজায় রাখা ছাড়া লক্ষ্যোদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হইবে না।

এইরূপ প্রায় সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। আরও বিশেষ কথা এই যে, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমেই তাহার বিজ্ঞান বা যুক্তি কি—তাহা বুঝা (গুরু উপদেশে), তারপর সাধন করিয়া তাহার জ্ঞান বা অনুভূতি লাভ করা। নচেৎ বৃথা শাস্ত্রাধ্যয়নে লাভ কি? মাত্র সময়ের অপব্যয়।

আমাদের শাস্ত্র-বুঝা, মানে আমাদের বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে যে মাপ পাইলাম, সেইটুকুই স্বীকার করা; আর বাকীটুকু নানান যুক্তি-তর্ক দিয়া অস্বীকার করা; অথবা তাহা সেকালের অল্পবুদ্ধি মুনি-ঋষিগণের গাঁজাখুরী কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া। যাক্ ওসব অন্য কথা। এখন যে কথা বলিব বলিয়া এই প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাই কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করি। সাধারণতঃ "সহজ" মানে যাহা অনায়াস-সাধ্য বা সুখ-সাধ্য; আর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—(সহ+জন+ড), জন্মের সহিত যে ধর্ম আসিয়াছে বা পাওয়া গিয়াছে এবং যে ধর্ম সাধন করিতে সংসার বা ইহ-জগতের কর্তব্য-কর্ম ছাড়িতে হয় না, পুত্র-দারাদি ত্যাগ করিতে হয়না; সংসারে ও সমাজে থাকিয়াই অতি সহজেই যে কর্মের আচার-অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, যাহা সার্বজনীন অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিই করিতে পারে, যাহাতে কোনও রকম সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামী নাই—আমি তাহাকেই 'সহজ-ধর্ম' বলিতে চাই। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে তাই এই সহজ-কর্মই করিতে আদেশ দিতেছেন।—

"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ,
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।"

—হে অর্জুন, তুমি সহজ-কর্ম করো। প্রথম প্রথম ঠিক-ভাবে করিতে না পারিলেও অর্থাৎ দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিও না; কারণ, সকল কাজের আরম্ভে দোষ হইবেই। অগ্নি জ্বালিবার পূর্বে যেমন ধূম উদ্গীরণ হয়। এখানে তিনি সহজ "কর্মের" কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "ধর্মের" কথা বলেন নাই। ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু "কর্ম"ই ধর্ম, আর "ধর্ম"ই কর্ম—কেননা, যাহা ধরিয়া থাকে তাহাই ধর্ম

* নিসার: প্রাণ সংযম না হইলে সিদ্ধার: হওয়া যায় না।
† কুলকুণ্ডলিনী।
‡ জ্যোতি:, যাহার প্রভায় চোখ ধাঁধিয়া যায়

(৫+মন); এবং যাঁহাকে ধারণ করিয়া আমি, তুমি, তিনি এমন কি সারাবিশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং যিনি এই সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই অব্যয়-অক্ষয়-শাশ্বত ও প্রকৃত ধর্ম্ম এবং এই সৃষ্ট্যাদি কার্য করিতেছেন বলিয়া কর্ম্ম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, এই ধর্ম্মটি কি ?—ইহার উত্তরে যোগ-শাস্ত্র বলিতেছেন—তাহা একমাত্র প্রাণ।

"প্রাণোহি ভগবান্‌ইশ, প্রাণং বিষ্ণু পিতামহ,
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।"

সুতরাং প্রাণ বা শ্বাস-প্রশ্বাসই ধর্ম্ম এবং প্রাণ-ক্রিয়াই সর্ব্বকর্ম্মের মূল ; সুতরাং কর্ম্ম। ইহাই জন্মের সহিত পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং ইহাই সহজধর্ম্ম ও কর্ম্ম অর্থাৎ ইহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারই আচরণ করিতে হয়, আর ইহাকেই ধর্ম্মাচরণ বলে। এই প্রাণ নির্গুণ-নির্ব্বিকার ; যাঁহাকে ঋষিরা ভগবান বলিয়াছেন তাঁহাকে প্রমাণ করা দুরূহ (প্রমাণাভাবাৎ [সাংখ্য]) ; কিন্তু এই প্রাণ, এই ভাগবতীধারা চিরপ্রামাণ্য, অর্থাৎ ইনিই আমার প্রকৃত আমি। ইনি না থাকিলে আমি কে বা কোথায় ? সৃষ্টিই বা কি ? থাক সে অনেক কথা। তবে সকলেরই ভাবিবার বিষয় কে, পূজা হয় কাহার ? প্রতিমার না প্রাণের ? প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরই তো 'মূর্ত্তি' পূজার যোগ্যা হন। মৃণ্ময়ীকে প্রাণময়ী বা চিন্ময়ী না ভাবিয়া পূজার সার্থকতা কি ? তাহাতো সংস্কারান্ধ বালকের পূজা ! তাহাতো মাত্র গতানুগতিকতা ! তবে তাহাতে একটা পুরুষানুক্রমিক চলমান ধারা বজায় রাখা যায় মাত্র। আজ যে পূজারী, সে না বুঝিলেও তাহার পরবর্ত্তী পুরুষ হয়তো এই করিয়াই সত্যের সন্ধানে উন্মুখ ও উদ্যোগী হইতে পারে। সুতরাং ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু এই মন্দের ভাল—এই গতানুগতিকতা—এই অন্ধ-সংস্কারের দাস হইয়া আর কতদিন চলিব ? যে মানব আত্ম-পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী বলিয়া জীব-শ্রেষ্ঠ, সেকি সেই শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য চেষ্টিত না হইয়া চিরকালই কি প্রকৃতির, ভাগ্যের ও কালের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবে ? না ভগবানের পক্ষ-পাতিত্বের দোষ দিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে ? যে মানব বিজ্ঞান-বুদ্ধিবলে ও পুরুষকারের শক্তিতে আজ কতশত অজানা, অচিন্ত্য বস্তুর উদ্ভাবক ও আবিষ্কর্ত্তা হইয়া স্বয়ম্ভু ঈশ্বর-রূপে পরিচিত, সেকি না আজ নিজ পরিচয়ে অপরিচিত ! যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া যায়—সেই প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি নিজ হৃদয়াষ্ঠিত দেবতাকে জানিল না, জানিবার আকুতিও জাগিল না ! যিনি হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে মুহূর্ত্তে সে "নাই" হইয়া যাইবে—সেই প্রাণদেবতার উপাসনা কি এতই কঠিন ? মোহিনী-মায়ার কি মহীয়সী শক্তি ! মানব ! তুমি এত জানিয়াও কিছুই জান না ! কিন্তু কেন ? মায়া ? মায়া কি ? তোমার মন। মন কি ? কতকগুলি বাসনার সমষ্টি। বাসনা ত্যাগেই তো মনোনাশ ! বাসনা ত্যাগ কিসে হয় ? অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। অভ্যাস কি ? যোগ অভ্যাস। যোগ কি ? প্রাণ কর্ম্মের কতকগুলি কৌশল (গুরুমুখী) মুখ্যতঃ প্রাণায়ামে। কেননা, "চলে বাতে চলে চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।" সুতরাং বাসনা থাকিতে যেমন মনরূপ চিত্তপ্রবাহ থামে না, তেমনি বায়ু বা প্রাণস্পন্দন না হইলে মনরূপ মহাশত্রু নিপাত হয় না। অতএব জীবনে শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ের প্রয়াসী যে কেহ হউক, প্রত্যেকেরই যোগ-জীবন লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বন্ধু

(নাটিকা)

প্রশান্ত চৌধুরী

দিল্লীর কুতুবমিনারের ঘোরানো সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে কথা কইতে কইতে উঠছিল দুই বন্ধু—বিজয় এবং রমেশ

বিজয় : রমেশ ?—এই ?

রমেশ : (হাঁপাচ্ছে) কি বলছিস ?

বিজয় : এরিমধ্যে হাঁপিয়ে উঠলি ?—একটু পা চালিয়ে ওঠ্। এমন করে উঠলে কুতুবমিনারের চূড়োয় উঠতে যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

রমেশ : পা ভেরে গেছে ভাই বিজয়। আমি একটু আস্তে আস্তে চলি, তুই বরং···

বিজয় : এরই মধ্যে পা ভেরে গেল তোর ?

রমেশ : কলিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে···

বিজয় : ইনফ্লুয়েঞ্জায় তো দুজনে একই সঙ্গে ভুগেছি। তুই তো আর বাড়তি কিছু ভুগিস্‌নি আমার চেয়ে।

রমেশ : সকলের শরীর তো আর সমান নয় ভাই।

বিজয় : শরীর বলিসনি ; বল্ শরীরের প্রতি মায়া। ওরে, শরীরকে অত তোয়াজ করিস্‌নি, পেয়ে বসবে।

রমেশ : কারা যেন ওপরে আসছেন।

বিজয় : দেওয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়া।

উঠছেন একটি বয়স্কা মহিলা এবং এক যুবক, মাসী এবং বোন্‌পো

মাসী : (হাঁপাচ্ছেন) বাপ! আর কতক্ষণ উঠতে হবে রে বাপু এমন করে ?

অবিনাশ : এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে মাসী ? এখনো তো আদ্ধেক উঠিনি আমরা।

মাসী : কি ছাইয়ের শুম্ভ যে গড়েছিল তোদের কুতুবুদ্দিন বাদ্‌শা !

অবিনাশ : মিনারটা যে সত্যি কার তৈরী, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু মাসী। কেউ বলে, এটা পৃথ্বিরাজের তৈরী—কুতুবুদ্দিন তারই ওপর দাপরাজি ক্ষোরে···

মাসী : তা' সে যেই করুক বাপু, এমন সরু উঁচু আর ঘোরানো সিঁড়ি করা বাপু মোটেই উচিত হয়নি। আর দেয়ালের মাঝে মাঝে আরো খানকতক ফোকর করলে ক্ষতিটা কি ছিল ছাই ? একটু আলো বাতাস লাগত তবু প্রাণে।

অবিনাশ : কিন্তু মাসী···(বিজয় ও রমেশকে সিঁড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে) আপনারা এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে ? নামছেন বুঝি ?

বিজয় : না। উঠছি। বন্ধুটির পা ভেরে গেছে, তাই একটু···

অবিনাশ : আচ্ছা, ওপরে দেখা হবে তাহলে আবার।

বিজয় : নিশ্চয়ই।

অবিনাশ : এসো মাসী।

মাসী বোন্‌পো ওদের পাশ দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন

রমেশ : বিজয়, আমি বলি কি, তুই বরং এগো। মিছি মিছি আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠতে গিয়ে তুই কেন কষ্ট পাস ? আমার সঙ্গে থেকে তুই কেন শুধু শুধু পিছিয়ে পড়বি ?

বিজয় : পিছিয়ে তো সবেতেই পড়ছি তোর কাছে। কুতুবে ওঠার ব্যাপারেই বা এগিয়ে গিয়ে লাভ কি ?

রমেশ : কাল থেকে তোর কথাগুলোর কেমন যেন ঘুটো করে অর্থ আছে বলে মনে হচ্ছে। কি হয়েছে বল্ তো তোর ?

বিজয় : কৈ ?

রমেশ : তবে পিছোনোর কথায় অমন হেঁয়ালী করলি কেন ?

বিজয় : পিছিয়ে কি সত্যিই পড়ছি না ?

রমেশ : বুঝলুম না।

বিজয় : সত্যিই বুঝলি না ?

রমেশ : তোর কথা কাল থেকে এমন ধারা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কেন বল্ তো ?

বিজয় : বাঁকা ?—(মৃদু হাসে) কুতুবের সিঁড়িটাই ঘোরানো কিনা, তাই বোধহয় আমার কথাগুলো

ঘোরালো হয়ে উঠছে। নৈলে কথাগুলো আমার নিতান্তই সোজা এবং স্পষ্ট। বুঝতে একটুও কষ্ট হবার নয়।

রমেশ : হয়তো। কিন্তু তবু বুঝতে পারছি না।

বিজয় : কাল সন্ধ্যের অঞ্জলিদের বাড়ী গেছলুম। শুনলুম, আমার আগেই তুই গিয়ে তাকে নতুন গান শুনিয়ে এসেছিস। কথাটা সত্যি নয় কি ?

রমেশ : হ্যাঁ।

বিজয় : কিন্তু কাল ফিরে এসে তোকে যখন জিজ্ঞেস করলুম, তুই সে কথাটা বলতে পারলি না আমাকে।

রমেশ : বলতে পারলুম না নয়—তোর শোনবার মত ধৈর্য্য ছিল না কাল। কিন্তু, তুই কি ঝগড়া করবার জন্যে কুতুবমিনারে ডেকে নিয়ে এলি আমায় ?

বিজয় : ঝগড়া ? পাগল হলি তুই ? ছেলেমানুষ নাকি যে, দুই বন্ধুতে ঝগড়া করব দাঁড়িয়ে ? তাহলে তুই আস্তে আস্তেই আয়, আমি ওপরে অপেক্ষা করছি তোর জন্যে।

সেই মাসি-বোনপো দু'তলার বারান্দায় এসে উঠলেন

অবিনাশ : এই—এই—এই, আর একটা সিঁড়ি—ব্যাস্। এই তো কেমন এসে পড়লে মাসী দু'তলার বারান্দায়।

মাসী : (ভীষণ হাঁপাচ্ছেন) হ্যাঁ, কেমন বৈকি !—আলাসনে বাপু, ডিবেটা থেকে পান দে দুটো—একটু বসি।

অবিনাশ : পান ? এই নাও মাসী।

মাসী : তোদের ঐ কুতুবুদ্দিনই বল্ আর পৃথ্বিরাজই বল্, মাংস ছিল না কারুর গায়ে এক ফোঁটা।

অবিনাশ : কেন গো মাসী ?

মাসী : আরে বাপু, আমার মতন গতর যদি হত, তাহলে কি আর এমন মাথা-ঘোরা সরকুটে সগ্‌গের সিঁড়ি করবার সাধ জাগত প্রাণে ?

অবিনাশ : তা' যা বলেছ মাসী। আরে ! এই যে মশাই, এতক্ষণে উঠলেন ?

বিজয় এসে উঠেছে

বিজয় : আপনি ?

অবিনাশ : বাঃ ! সেই যে আপনি আর একজন ভদ্রলোক সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি আর আমার ঐ মাসিমা···

মাসী : অবিনাশ, পান দে বাপু আর দুটো। আর জর্দার কৌটোটা।

অবিনাশ : এই নাও মাসী।—আপনার সঙ্গের সেই ভদ্রলোকটি ?

বিজয় : আমার বন্ধু।

অবিনাশ : তাঁর যে এখনো দেখা নেই ?

বিজয় : ও একটু ধীরস্থির মানুষ।

অবিনাশ : আপনারা থাকেন কোথায় ?—পান ?

বিজয় : না, পান খাই না, ধন্যবাদ। দিল্লীতেই থাকি। একই মেস্-এ একই ঘরে থাকি দুজনে। চাকরি করি। বুঝতেই পারছেন।

অবিনাশ : ছুটির দিন দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

বিজয় : হ্যাঁ—একটু সময় কাটানো আর কি।

অবিনাশ : আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে পারি ?

বিজয় : স্বচ্ছন্দে।—বিজয় দাশগুপ্ত।—আপনার ?

মাসী : ও অবিনাশ, চুনের কৌটোটা কি তোর ব্যাগে আছে ?

অবিনাশ : এই নাও, ছুঁড়ে দিচ্ছি।—নাম তো শুনলেনই। পদবী সেনগুপ্ত। আপনার বন্ধুটির নাম ?

বিজয় : রমেশ। রমেশ সেন।

অবিনাশ : এখনো উঠলেন না উনি ?

বিজয় : বড্ড শরীর-শরীর বাতিক। একটু ঠাণ্ডা লাগল কি হজমের গোল হল—অমনি ডাক্তারের বাড়ী ছোটে। একটানা উঠলে পাছে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় একটু, পাছে ঘাম হয়—তাই জিরিয়ে জিরিয়ে উঠছে আর কি।

অবিনাশ : এক একজন অমন থাকেন। শরীরের ওপর ভীষণ মায়া। হাতের কাছে একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখবেন ? ঐ যে, আমার মাসীটি।

বিজয় : বন্ধুটি আমার ছুটির দিনগুলো স্রেফ্ গান লিখবে, না হয় সুর দেবে, না হয় ছবি আঁকবে। মানে ঘর থেকে আর বেরুবে না।—আসুন একটু বারান্দার ধারে গিয়ে দাঁড়াই।

[দুজনে পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

অবিনাশ : পাঁচিলগুলো এমন বিপজ্জনক নিচু করেছিল কেন বলুন তো সে যুগের মিস্ত্রিরা ?

বিজয় : সত্যি, বড্ড নিচু।

গাইড্। এ-মাইজী, বারান্দাসে হাট্‌কে থোড়া হো যাইয়ে।

মাসী : কেন রে বাপু ? একটু হাওয়া খাচ্ছি···

গাইড্ : এ বারান্দা বহোৎ কমজোরি মাইজী। জাদা চাপ দেনে সে গির্ যা সেক্‌তা···

মাসী : ও বাবা ! বলিস কি রে ! ওরে, ও অবিনাশ, এ গাইড্‌টা বলে কি রে !

গাইড্ : সাচ্ বোলা মাঈ। পরশুরোজ এক জওয়ান আদ্‌মি ঐ উপর্ তল্লাসে একদম উলট্‌কে·····

অবিনাশ : শুনছেন বিজয়বাবু ?

মাসী : কী যে অনাছিষ্টির গুষ্ঠি গড়েছিল বাপু তোদের চতুর্বুদ্ধিন না পৃথ্বিরাজ ! উঠতে দম বেরোয়—আবার বারান্দার ধারে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সরে দাড়া বাপু অবিনাশ। শুনছিস ?

অবিনাশ : সত্যি। সরে দাঁড়ান বিজয়বাবু।

বিজয় : দাঁড়াই।

অবিনাশ : সত্যি ডেন্‌জারাস্ জায়গা মশাই। একটু ঝুঁকে গেলেই···

বিজয় : হুঁ।

অবিনাশ : য়্যাক্‌সিডেন্ট্ তো যে কোন মুহূর্তেই ঘটতে পারে।

বিজয় : হুঁ।

অবিনাশ : গাইডের কথাটা শুনে নিচের দিকে তাকাতেই যেন ভয় করছে। কি বলেন ?

বিজয় : হুঁ—ভারী বিপজ্জনক ! একটু অসতর্ক হলেই·····

(এইক্ষণে রমেশ এসে ডাকে)

অবিনাশ : আরে, এই যে বিজয়বাবু, আপনার বন্ধু এসে গেছেন।

বিজয় : উঁহু হু,—রমেশ, বারান্দার অত কাছে নয়,—সরে এসে বেরাদ ঘেঁষে দাঁড়া।

অবিনাশ : পরশু একজন এখান থেকে উল্টে পড়ে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। জানেন নাতো ?

মাসী : (কাছে এসে) আজকেই তো আর একটা হতে যাচ্ছিল।

অবিনাশ : সে কী মাসী ? কখন ?

মাসী : বাঃ, গাইড্‌টা না চেঁচালে আমিই তো ঐ আকরি-কাটা পাঁচিলে যাচ্ছিলুম একটু ঠেস্ দিতে ! নারায়ণ বাঁচিয়েছেন বাবা। আঃ ! আর একটু সরে দাঁড়া না বাপু,—কাজ কি অত বাহাদুরীতে ? তোধরাও বাছা একটু সরে দাঁড়াতে পারছ না ? ও ছেলে ? ও ওধারের ছেলে ? কি নাম তোমার ?

রমেশ : আজ্ঞে রমেশ।

মাসী : একটু সরে দাঁড়াও না বাছা।

রমেশ : দাঁড়াই মাসীমা।

অবিনাশ : আবার দেখছেন কি মশাই ঝুঁকে ?—সরে দাড়ান।

রমেশ : দেখছি, নিচেটা কত নিচুতে।

বিজয় : খুব হয়েছে ! দয়া করে একটু সরে দাঁড়াও। এখনি আবার মাথা ঘুরবে—আর ছুটবে ডাক্তারবাড়ী।

রমেশ : ঠাট্টা করছিস ?

বিজয় : ঠাট্টা মানে ? জানেন অবিনাশবাবু, সেবার আমাদের মেস্ থেকে তিনখানা বাড়ী তফাতে একটা মেসে লাগল কলেরা। ব্যাস্,—বন্ধুটি আমার চাকরিতে রিজাইন্ দিয়ে দেশে পালাবার জন্যে একেবারে···

রমেশ : (ম্লান হেসে) একটু বাড়িয়ে বলছিস বিজয়। রিজাইন্ নয়—ছুটি নিয়ে। জানেন আপনজন কেউ নেই তো আমার ছোটবেলা থেকে,—চিরকাল নিজেই নিজেকে সামলেছি—তাই শরীরের দিকে একটু—

মাসী। বেশ করেছ বাছা।—নিজের শরীরের যত্ন নিজে কর—তাতে কার কি ? সংস্কৃতিতে একটা কথা আছে না ? 'শরীরো বাদ্যম্ ; খেলে ধর্ম সাধনম্।'—থাবে, আর দামী বাক্সি-বাজনার মতন শরীরটাকে সদা-সর্বদা ঝেড়েপুঁছে যত্ন করে রাখবে। তাইতেই ধর্মকর্ম হবে। অবিশ্যের কথা।—এস বাছা, জর্দা দিয়ে একটা পান খাও।

রমেশ : মাসীমা, পান তো খাইনা—জর্দ্দাও নয়।

বিজয় : ওরে বাবা ; কাকে কি বলছেন মাসীমা ? জর্দ্দা খেলে মাথা ঘোরে, আর পান খেলে দাঁত নষ্ট হয়। দাঁত থেকে শরীর খারাপ হতে কতক্ষণ ?

রমেশ : আপনি যখন বলছেন মাসীমা—দিন একটা পান।

মাসী : না বাছা, খেওনা তুমি। কিন্তু এমন সন্দেশ-রসগোল্লা নয় যে, খেতে হবে।—হাঁ। বাছা,—কেউ নেই তোমার বলছিলে ?

রমেশ : কেউ নেই মাসীমা—শুধু ঐ বিজয় আছে। ও' আমাকে কথায় কথায় ঠাট্টা করে, খোঁচা দেয়, কিন্তু ভালবাসে ভীষণ। আমরা দুজনে দিল্লীর মেস্-এ একসঙ্গে এক রুমে আছি পাঁচবছর।

মাসী : এলো না বাবা এক দিন আমার বড়দির কোয়ার্টারে। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি আমি। আরো দিন সাতেক আছি। ডুরকদান রোডের ন-নম্বর কোয়ার্টার। যাবে তো বাবা এর মধ্যে এক দিন ?

রমেশ : নিশ্চয় যাব মাসীমা।

মাসী : তুমিও সঙ্গে যেও বাবা বিজয়, কেমন ?—অবিনাশ, এবার আমরা উঠি চ'।

অবিনাশ : উঠবে ?—এই তো, এই তো আমার মাসীর মতন কথা ! আর কতটুকু ? একটু কষ্ট করলেই একেবারে top.

মাসী : রেখে দে তোর top ;—এখন টপ্ করে নিচে চল দিকিন্।

অবিনাশ : নিচে !—আর এইটুকুর জন্যে শেষ পর্য্যন্ত উঠবে না মাসিমা ?

মাসী : উঠে কি দুটো বাড়তি হাত গজাবে বাপু ? এই তো দেখলুম যথেষ্ট। নিচের মানুষগুলো সব এই এখান থেকে দেখাচ্ছে আরশোলার মতন ; ঐ ওপর থেকে না হয় পিঁপড়ের মতন দেখাবে ; এই তো ? গাইড্, বাবা আগে আগে চল তো, একটু জিরায়কে জিরায়কে নামি।

অবিনাশ : (অনুরোধ জানায়) মাসী—

মাসী : চল্ চল্।—তোমরাও বাছা নেমে এলেই ভাল করতে। এ সব্বনেশে জায়গায় থাকা কেন বাপু ? পরশুদিন দেখানে একটা অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে, মানুষ থাকে সে-জায়গায় ? সাতদিন না কাটলে এ-জায়গার দোষ কাটবে ভেবেছ ?—এ গাইড্, খাড়া হোকে কিয়া শুনতা ? নাবো, নাবো।

অবিনাশ : চলি দাদারা। ভেবেছিলুম একসঙ্গে ওপরে উঠব, তা আর বরাতে চল না। আমরা নিচে চললুম—নিচেই থাকব কিন্তু আপনাদের জন্যে। এক-সঙ্গে ফেরা যাবে। চলো মাসী—

মাসী : রমেশ, যেও বাছা।

রমেশ : নিশ্চয়ই যাব মাসীমা।

(ওঁরা নেমে গেলেন।)

বিজয় : রমেশ ?

রমেশ : হুঁ্যা ?

বিজয় : ওঠবার সময় সিঁড়িতে যদি তখন তোকে আঘাত দিয়ে কিছু বলে ফেলে থাকি, ক্ষমা করিস ভাই।

রমেশ : আরে দূর্—ঐ নিয়ে আবার তুই এখনো ভাবছিস ?

বিজয় : ওপরে উঠবি নাকি ? না, এখান থেকেই নেমে যাবি নিচে ?

রমেশ : ভাবছি উঠব।

বিজয় : (হেসে) শরীরকে কিন্তু একটু কষ্ট দেওয়া হবে।

রমেশ : আবার ঠাট্টা ?

বিজয় : পাগল !

রমেশ : আকাশে কি রকম মেঘ করেছে দেখেছিস বিজয় ? এখনি বোধহয় ঝড় উঠবে।

বিজয় : (হাল্কা সুরে) তাতে আর যাই হোক্, কুতুবমিনারটা নিশ্চয়ই ভেঙ্গে পড়বে না। অনেক দিন থেকে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে ও। ভয় নেই, ওপরে উঠলে আমরা কেউ উল্টে পড়ে মরব না। আমি চল্লুম। তুই আয় আস্তে আস্তে।

ওরা দুজনে উঠে গেল। মাসী-বোন্পো তখন নামছেন নিচের দিকে।

মাসী : অবিনাশ ?

অবিনাশ : কি মাসী ? হাত ধরব ?

মাসী : উঁহু।

অবিনাশ : পান দেব ডিবে থেকে ?

মাসী : ছেলেটি বেশ ; না রে ? ঐ যে ঐ রমেশ ?

অবিনাশ : হ্যাঁ। দুই বন্ধু ওরা। ভাল চাকরি করেন এখানে, এক মেস্-এ থাকেন। খুব বন্ধু।

মাসী : পদবী কি যেন ?

অবিনাশ : হালদার আর সেন। কেন ?

মাসী : মুখশ্রী বড় পরিষ্কার কিনা বাপু।

অবিনাশ : কার ?

মাসী : দুজনেরই। ওর মধ্যে ঐ রমেশের মুখটি খানো ভাল। কেমন যেন মায়া হয় দেখলে ; না রে ? আমাদের সুবালার মেয়েটার জন্যে দেখলে হয় ; কি বল্ ?

অবিনাশ : হাঃ, তোমারও যেমন ! কুতুবে এসেও ঘটকালী।

মাসী : বাপের নাম ঠিকানাগুলোও তো কথার সাঁটে জেনে নিতে হয় বাপু।

অবিনাশ : চলো চলো, ভাল করে নিচের দিকে দেখে দেখে নামো। অন্ধকারে পড়ে-টড়ে যাবে। ঘটকালী করতে হয়, নিচে গিয়ে বলবে চল, ওঁরা নামলে চায়ের নেমন্তন্ন কোরো বরং বড়মাসীর ওখানে।

মাসী : তাই চ, নিচে গিয়ে বসি। তারপর ওরা নামলে আজই ওদের নেমন্তন্ন করা যাবে।

গাইড। ইণ্ডিয়ারীসে ষ্টাইলী। ইথারকা এক সিঁড়িকা পাথর টুটা হ্যায়।

কুতুব মিনারের চূড়া। বিজয় যেন কিছুক্ষণ আগেই উঠেছে। আকাশের রঙ আরো কৃষ্ণীভূত হয়েছে। ঝড়ের হাওয়া সুরু হল বলে। যেন খানিকটা পর রমেশ এসে উঠল।

বিজয় : এই যে রমেশ, আয় আয়, জলের ঘোতলটা দে আগে। জলের জন্যে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

রমেশ : এই নে। কতক্ষণ উঠেছিস রে ?

বিজয় : মিনিট পনেরোর কাছাকাছি।

রমেশ : আহা !—চমৎকার ! আকাশ একেবারে কালো হয়ে উঠেছে ! ওঃ ওপর থেকে কী চমৎকার দেখতে !—নিচে অশোকস্তম্ভটা ভাখ, যেন ক্রিকেটের উইকেট্।

বিজয় : হুঁ।

রমেশ : এদিকে আয় না বিজয়,—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। পুরোনো ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ ওপর থেকে কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ভাখ্।

বিজয় : তুমি ঐ ইন্দ্রপ্রস্থই ভাখো।—আমাকে দয়া করে বাইনোকুলরটা দাওতো,—ওদিকে দাঁড়িয়ে নয়া দিল্লীর চেহারাটা দেখি।

রমেশ : আমাদের পেছনে-ফেলে-আসা অতীত ঐশ্বর্যের চেয়ে তোর কাছে—

বিজয় : আজ্ঞে হ্যাঁ। অতীতের চেয়ে আমার কাছে বর্তমানটাই বড়। দূরবীণ দে।

রমেশ : (হেসে) কিন্তু বর্তমানটা তো কাছের জিনিষ। তার জন্যে দূরবীণ কি হবে ? অতীতটা দূরের তো অনেক, তাই দূরবীণটা আমারই বেশি দরকার নয় কি ?

বিজয় : অতীতটা যেমন দূরের, তেমনি অপ্রয়োজনেরও। বর্তমানটা তো শুধু কাছের নয়, প্রয়োজনের। তার সঙ্গে দুবেলা ঘর করতে হয়। তাই তার চেহারাটা যথাসাধ্য স্পষ্ট করে দেখাই দরকার। অতীতটা একটু ঘোঁয়া থাকলেও ক্ষতি হবে না ; বরং রহস্যময় হবে আরো। দূরবীণটা দে।

রমেশ : অগত্যা। (দূরবীণ প্রদান)

বিজয় : (দূরবীণ নিয়ে) ব্যাস্।—এবার তুমি দাঁড়াও ঐ ওদিকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে মুখ করে, আর আমি দাঁড়াই এই এদিকে নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়া গেট্-এর দিকে দূরবীণ্ বাগিয়ে।—কেউ যদি এই কুতুবমিনারের ওপরে ওঠে, তাহলে আমাদের দেখে ভাবতেই পারবে না যে, আমরা দুই বন্ধু।

রমেশ : তবে কি শত্রু ভাববে ?

বিজয় : শত্রু না হোক্ :—বন্ধু তো নয়ই।

ঝড়ের হাওয়া উঠেছে। গায়ে লাগছে। হঠাৎ সেই হাওয়ার তার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল শুধু বিজয়েরই কানে,—"শত্রু নয়ই বা কেন ?"

বিজয় : (অস্ফুটে) কে ?

মন : আমি।—তোমার মন।

বিজয় : ওঃ !

মন : ওদিকের ঐ প্রায়-অদৃশ্য দিক্‌চক্রে বিপীন মাঠের দিকে দূরবীণ ধরে কি দেখছ ?

বিজয় : এই···

মন : বাইনোকুলারে শুধু দূরের 'দৃশ্য'ই কাছে আসে ; চলে-যাওয়া দূরের ঘটনা তো কাছে আসে না।—তুমি চাইছ, এক বছর আগে লোদীপার্কের ধারে বারোয়ারী দুর্গাপূজার মেলায় সেই ঘটনাটা দূরবীণের ভেতর দিয়ে যদি কাছে আসত·····

ঝড়ের হাওয়ার শব্দ যেন মিলিয়ে গেল বিজয়ের কান থেকে। বর্ত্তমান যেন ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গেই উড়ে গেল কোথায়। ভেসে এল অতীত। ভেসে এল ছয়মাস আগেকার ঢাক-ঢোলের শব্দ, ভেসে এল জন-কোলাহলের শব্দ।

ছ'মাস আগে। লোদীপার্কের দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেল। নাগরদোলা, খাবারের দোকান, ষ্টলের সারি, লোকের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে একটি অচেনা তরুণীকে নিরখ করে ডাকলে বিজয়।

বিজয় : শুনুন ?—শুনছেন ?

অঞ্জলি : কে ?

বিজয় : আমি।

অঞ্জলি : আমাকে ?

বিজয় : যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে আপনাকেই।

অঞ্জলি : কিন্তু—

বিজয় : আপনার ছোটভাইকে হারিয়েছেন কি মেলায় ?

অঞ্জলি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে—

বিজয় : ব্যস্ত হবেন না ;—তাকে পাওয়া গেছে।

অঞ্জলি : পাওয়া গেছে ?—ওঃ, আপনি বুঝি ভলান্টিয়ার ?

বিজয় : আজ্ঞে না, আগন্তুক দর্শক। আপনার ভাইটিকে কিন্তু ঐ ভলান্টিয়ারদের সাবিয়ানার নিচেই রেখে এসেছি। চলুন।

অঞ্জলি : চলুন। কেমন করে জানলেন যে—

বিজয় : যে আপনারই ভাই হারিয়েছে ?

অঞ্জলি : হ্যাঁ ?

বিজয় : আপনার ভাইয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে।

অঞ্জলি : ও, বুন্টু বলেছে বুঝি যে দিদি মুর্শিদাবাদী সিল্কের চাপা শাড়ী পরেছে—আর ছেলেটের লাল ব্লাউজ ?

বিজয় : আরো কিছু বেশি।

অঞ্জলি : ও,—তাও বলেছে বুঝি যে, পায়ে বড়দির জরির চটি, আর খোঁপায় মার সোনার ফুলটা লাগিয়ে এসেছি ?

বিজয় : আরো কিছু।

অঞ্জলি : কি ছেলে মানো !—বুন্টুরই নীলরং-এর ফুলকাটা রুমালটা আমার হাতে আছে, তাও বলেছে ?

বিজয় : আরো কিছু। অভয় দেন তো বলি।

অঞ্জলি : কি ?

বিজয় : বলেছে—দিদির মাথার চুল রেশমের মতন নরম, অমন চুল কারুর নেই। বলেছে—দিদির বড় বড় টানা টানা চোখের তারাগুলো সোনালী ; দিদি চোখে কখ্‌খনো কাজল দেয় না, তবু মনে হয় কাজল টেনেছে ; গায়ের রং চাঁপার মতন। বলেছে,—

অঞ্জলি : (কিঞ্চিৎ কঠিন কণ্ঠে) ধন্যবাদ।

বিজয় : ওঃ !—আচ্ছা—নমস্কার। (প্রস্থানোদ্যত)

অঞ্জলি : নমস্কার। (কিছুক্ষণ পর) শুনছেন শুনুন।

বিজয় : আমাকে ?

অঞ্জলি : হ্যাঁ।

বিজয় : কেন বলুন তো ?

অঞ্জলি : বাঃ, আমাদের বাড়ী যাবেন না ?—আমার ভাইকে খুঁজে দিলেন আপনি—বাড়ী নিয়ে গিয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে না দিলে ভীষণ বকুনি খেতে হবে যে বাবার কাছে।

বিজয় : কিন্তু—

অঞ্জলি : বাঃ রে !—সম্পূর্ণ ভুল বর্ণনা মিলিয়ে একেবারে ঠিক লোককে খুঁজে বের করতে পারেন যিনি—এমন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে না দিলে কখনো চলে ?

কথা কইতে কইতে ওভারব্রিজ-ব্রীজের কাছাকাছি এসে পড়ে ওরা। বুন্টু দেখতে পায় ওদের

বুন্টু : এই যে দিদি, এসেছো ?—আপনিই খুঁজে আনলেন তো দিদিকে ?

বিজয়: যে নিখুঁৎ বর্ণনা দিয়েছিলে তুমি—খুঁজে বের করতে কি আর অসুবিধে হয়?

বুল্টু: তবে?—বলুন!

অঞ্জলি। তুই থাম বুল্টু।

বুল্টু: থাম মানে? উনি কি শুধু তোমাকে খুঁজে এনেছেন ভেবেছ? আমাকে পুরো এক প্যাকেট চকোলেট খাইয়েছেন।

অঞ্জলি: তাই নাকি?—ওরে বাবা!—তবে তো আর কথাই নেই—আপনাকে তো তাহলে যেতেই হবে আমাদের বাড়ীতে। বুল্টুকে আপনার চকোলেটের বদলা দেবার সুযোগ দেওয়া নিশ্চাই উচিত আপনার। কি বল্ বুল্টু?

বুল্টু: নিশ্চয়!

ওরা তিনজনে অঞ্জলিদের বাড়ীতে এসে পৌঁছল। অঞ্জলির পিতা তখন ড্রইংরুমে বসে বই পড়ছিলেন এক মনে

অঞ্জলি: বাবা!

পিতা: উঁ?—ও: অঞ্জলি, এরই মধ্যে···ইনি?

বিজয়: আমার নাম বিজয় দাশগুপ্ত।

অঞ্জলি: বুল্টুটা হারিয়ে গিয়েছিল বাবা ভিড়ের মধ্যে—আমি তো ভেবেই সারা, এই ভদ্রলোকই খুঁজে বের করলেন ওকে।

বুল্টু: আমাকে? না তোকে? তোকেই তো খুঁজে বের করলেন আমার বর্ণনা মিলিয়ে।

অঞ্জলি: চুপ কর্।

বুল্টু: চুপ কর্ মানে? আচ্ছা, আপনিই বলুন তো? কাকে খুঁজে বের করেছিলেন আপনি ভিড়ের ভেতর থেকে—আমাকে, না দিদিকে?

পিতা: (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। আপনি বসুন।

বিজয়: আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। অনেক ছোট আমি।

বুল্টু: বাবা, উনি না,আমাকেই প্যাকেট চকোলেট খাইয়েছেন।

পিতা: তা' তুমি তার বদলে এঁকে কফি খাওয়াও এক কাপ।

বিজয়: আজ্ঞে, কেন বাস্ত হচ্ছেন?

পিতা: (হেসে) তোমার খাতিরে আমিও পাব এক কাপ। নৈলে এরা দেয় না।

অঞ্জলি: আমি করে নিয়ে আসছি বাবা কফি।

বুল্টু: তা বলে শুধুই কফি আনিসনি যেন দিদি।

মাস দেড়েক কেটে গেছে। অঞ্জলিদের বাড়ীর ফটকে একাকী দাঁড়িয়েছিল বুল্টু। পিতা ক্লাব থেকে ফিরলেন

পিতা: বুল্টুবাবু এমন একা একা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে? বিজয় কোথায়? অঞ্জলি?

বুল্টু: জানি না।

পিতা: আজো বুঝি ওরা তোমাকে নিয়ে যায়নি বেড়াতে?

বুল্টু: গেলে তো নিয়ে যাবে। আমি যদি ওদের পিছু পিছু যেতুম, কী করতে পারত ওরা? ইচ্ছে করেই যাইনি।

পিতা: (হেসে) তবে একা একা ওদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে কেন?

বুল্টু: এমনি।

পিতা: তাহলে এস ভেতরে, গল্প করি তোমাতে আমাতে।

বুল্টু: তুমি পোশাক্ বদলে ফিরোও বাবা, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

পিতা চলিয়া গেলেন

কিয়ৎক্ষণ পর—বেড়িয়ে ফিরল অঞ্জলি ও বিজয়

বুল্টু: এই যে—এতক্ষণে ফেরা হল বুঝি তোমাদের দিদি? বিজয়দা, বলে গেলেন সকাল সকাল ফিরে আজ ক্যারম খেলবেন আমার সঙ্গে? খু-উ-উ-ব!

বিজয়: বেশ তো, চলোই না, এখনই সুরু হোক্ খেলা। আজ না হয় তোমার জন্যে রাত নটায় না ফিরে দশটায় ফিরব।

বুল্টু: ভেরী গুড্! আসুন তাহলে আপনি। আমি সাজাতে চললুম বোর্ড।

বুল্টু ছোটল

অঞ্জলি: না।

বিজয় : কী না ?

অঞ্জলি : তোমার আজ আর আমাদের বাড়ীর ভেতর যাওয়া চলবে না।

বিজয় : কেন ?

অঞ্জলি : তুমি এত ঘন ঘন এস না আর আমাদের বাড়ীতে।

বিজয় : কোন্ অপরাধে এ নিদারুণ নির্বাসন দণ্ড দেবী ?

অঞ্জলি : কাল, তুমি চলে যাবার পর, বাবা আর মা তোমার আর আমার—

বিজয় : ইজ্ ইট্ ? আন্দাজ করে নাগাদ ? শুনলে নাকি কিছু ?

অঞ্জলি : জানি না, যাও। মোট কথা এবার একটু এ-বাড়ীতে তোমার আসাটা কমানো উচিত ; নৈলে দেখতে বড় কেমন কেমন হয়।

বিজয় : কমানো মানে ?

অঞ্জলি : সপ্তাহে দুদিন ! বাকি ক'দিন—

বিজয় : শুধু তোমারি মিলন লাগিয়া, তব বিরহ-শয়নে জাগিয়া ?

অঞ্জলি : না গো না—দশেরার মাঠে দেখা হবে।

মেসের ঘর। রমেশ একমনে কবিতা লিখছে। বিজয় ঢুকল

বিজয় : রমেশ, রমেশ, কি খাবি বল্ ?

রমেশ : (একমনে লিখতে লিখতে) একটু—

'দেখিনি তোমায় কোন দিন ওগো কন্তে
তবুও তোমার জন্তে
গান যে আমার গাঁথা হল সুরে সুরে।
তোমার চোখের···'

বিজয় : তোমার চোখের তারা দুটি কবিতা লেখার খাতা থেকে তুলে আমার দিকে ফেরাবে কি ?

রমেশ : (তেমনি তন্ময়) একটু—'দেখিনি তোমায় কোন দিন ওগো কন্তে—'

বিজয় : এদিকে আমি যে চলেম হন্তে ! কবিতা লেখা বন্ধ করে কথাটা আমার শুনবি রমেশ ?

রমেশ : (এতক্ষণে ধ্যান ভাঙে) ও বিজয় তুই ! বল্ বল্।

বিজয় : কোন ওজর আপত্তি চলবে না—কাল তোমাকে আমার সঙ্গে বিকেলে দশেরার মাঠে যেতেই হবে।

রমেশ : বেশ তো।

বিজয় : আর, সেখানে অঞ্জলির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করতেই হবে।

রমেশ : স্তাখ্, বলছিলুম কি—

বিজয় : আচ্ছা, কী বলত তুই ? এত কিসের লজ্জা তোর বল্ তো ? অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ করতে কিসের লজ্জা তোর ? কবে থেকে বলছি—কেবলি এড়িয়ে যাচ্ছিস। কোন কথা নয়, কাল তুমি আমার সঙ্গে দশেরার মাঠে যাবেই—এবং অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ করবেই।

রমেশ : কাল ?

বিজয় : হ্যাঁ, কাল।—জানিস, তোর কত কথা বলেছি তার কাছে ?—তুই আমার, বলতে গেলে একমাত্র বন্ধু এই দিল্লীশহরে, অথচ যে-অঞ্জলি দুদিন বাদে আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে, আরো তোর সঙ্গে তার চাক্ষুষ আলাপটাও করিয়ে দিতে পারলুম না ! কী লজ্জার কথা বল্ তো আমার পক্ষে ?

রমেশ : বেশ—তুই যখন বলছিস—তাই হবে। কিন্তু—

বিজয় : কোন কিন্তু নেই।

দশেরার মাঠ

বিজয় : (কানে কানে) রমেশ, ঐ যে লাল শাড়ী, হলদে ব্লাউজ, এলোচুল হাওয়ায় উড়ছে—আসছে এদিকে ঘাড় নিচু করে ?—ঐ অঞ্জলি।

রমেশ : আহা, পেছনের ঐ বাঁকা দেবদারু গাছ—তার ওপর সাদা মেঘের টুকরো—নিচে সবুজ ঘাস—মাঝখানে টক্‌টকে লাল শাড়ী—চমৎকার 'ছবি' হয়েছে !—চমৎকার !

বিজয় : অঞ্জলি-ই।—এই যে, আমরা এখানে।

রমেশ : (কানে কানে) এই বিজয়, শোন্। স্তাখ্—রাগ করিসনি—বলছিলুম কি—আমার এখানে থাকাটা ঠিক।···

বিজয় : এই যে অঞ্জলি, আলাপ করিয়ে দিই আগে। এই আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু রমেশ সেন, যার কথা তোমাকে কতবার বলেছি।

অঞ্জলি : নমস্কার।

রমেশ : নমস্কার।

বিজয়। আর ইনি হলেন শ্রীপ্রসাদরায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী অঞ্জলি রায়, যাঁর কথা আমি তোকে কোনদিন বলিনি।

রমেশ : নমস্কার।

অঞ্জলি : নমস্কার।—আপনিই তো চমৎকার কবিতা লেখেন, সুন্দর ছবি আঁকেন, আর অদ্ভুত ঠুংরী গাইতে পারেন? বিজয় রোজ একবার করে বলে আপনার গানের কথা। শোনাবেন এক দিন? চলুন না, আজই? এই একটু এগিয়েই তো আমাদের বাড়ী। চলুন না, একটা ভাল গান শোনাবেন বেশ। গানের যে আমার কী ভীষণ শখ।—যাবেন?

রমেশ : (নার্ভাস) এ আর বেশি কথা কি?

বিজয় : (কানে কানে হেসে) কি রে?—অবাক করলি যে! তোর কান লাল হল না—ঘাড় চুলকোলি না···

অঞ্জলি : আবার ফিস্‌ফিস্ কি হচ্ছে?—রমেশবাবু তো রাজি হয়েছেন। বিজয় চলো। চলুন রমেশবাবু।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

এলওয়ালের মর্মবাণী

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ইতিহাসে এক মহত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত হল—গত নিঃশব্দে বিহার রাঁচী শেলা হতিসুর থেকে মাত্র সাইল দূরবর্তী এলওয়াল নামক ক্ষুদ্র জনপদে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দশ বৎসর পর আমার এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা এক ছত্রছায়াতে সম্মিলিত হলেন, এক কর্মসূচি অনুসরণ করা সম্বন্ধে পূর্ণ সহমত জ্ঞাপন করলেন তাঁরা। বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এ অভিনব। আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার মত জটিল ও বিতর্কমূলক বিষয় সম্বন্ধে আর বোধ হয় কখনও বল, মত ও পথ নির্বিশেষে কোন দেশের চিন্তানায়কেরা এমনভাবে একমত হননি। মত ভারতের ইতিহাসে এই অভিনব ঘটনার বীজ সুপ্ত ছিল—মনের মিলন প্রবেশে এক ঐক্যিত নিষ্ঠা।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তেলেঙ্গানার এক গ্রামে গান্ধীজির বিনোবার মাধ্যমে ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত হয়েছিল। ভূমিহীনদের যৎকিঞ্চিৎ ভূমি দান থেকে আরম্ভ করে কর্তব্যবোধে ভূমিহীনদের অধিকার—ষষ্ঠাংশ ভূমিদান এবং তারপর সম্পত্তিদান, শ্রমদান, বুদ্ধিদান—অহিংসা সমাজ বিপ্লব যা আমাদের যুগে বিকশিত হতে লাগল। "সমাজায় ইদম, ন মম", এই মন্ত্রের আধুনিক রূপকার বিনোবাজীর যাত্রাপথে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক ও সংশয়বাদীদের কণ্ঠ মুখর হতে থাকলেও গ্রামদান বা গ্রামের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি, শ্রম ও বুদ্ধিসম্পদের গ্রামীকরণের প্রেরণার প্রতিক্রিয়ার অদ্ভুত সাফল্য দৃষ্টে অবশেষে বিরোধীরাও ক্রমশ কাবু হলেন। গ্রামদানেরভিত্তির সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পরিস্ফুটমান হয়ে উঠল। তাই গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত সকল গঠনমূলক কার্যের প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত রূপ—অখিল ভারত সর্ব সেবা সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে এলওয়ালে গত ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর বিনোবাজীর উপস্থিতিতে গ্রামদান পরিষদ আহ্বান করা হ'ল। মত ও মত নির্বিশেষে দেশের প্রায় চল্লিশজন বেতৃস্থানীয় জনসেবক এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেন। তখন পর্যন্ত সমগ্র ভারতে তিন হাজারেরও অধিক গ্রাম স্বেচ্ছায় ভূ-সম্পত্তি বিসর্জন করে প্রেমের পথে সাম্যযোগী সমাজ বা গ্রাম স্বরাজ স্থাপনা করার শুভ সঙ্কল্প গ্রহণ করে নিজ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবার নবীন যাত্রা আরম্ভ করে দিয়েছে।

আমন্ত্রণ যাঁরা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর ভাই, প্রজাসমাজবাদী দলের চেয়ারম্যান শ্রীমঙ্গলানারায়ণ সিংহ, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, কমিটনিষ্ট পার্টির পলিটবুরোর সদস্য ডাঃ জেড. এ. আহমদ, গান্ধী-স্মারক নিধির সভাপতি শ্রীদিবাকর, গান্ধীজীর একান্ত সচিব শ্রীপ্যারেলাল, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্নারায়ণজী, ভারত সরকারের কমিটনিষ্ট প্রদেশ বস্তুরের মন্ত্রী শ্রী এস. কে. ধে, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালিনী এবং বোম্বাই, মহিশূর, কেরল, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী যথাক্রমে সর্বশ্রী চাবন, নিজলিঙ্গাপ্পা, বাবুভিপাম, কামরাজ নাদার, ও হরেকৃষ্ণ মহতাব উপস্থিত ছিলেন। এঁদের ছাড়া আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং সর্বশ্রী ধীরেন্দ্র মজুমদার, আচার্য নরেন্দ্রদেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, বরজ স্বামী, সিদ্ধরাজ ঢড্ডা, দাদা ধর্মাধিকারী, শঙ্কর রাও দেও ও আশা দেবী প্রমুখ সর্ব সেবা সঙ্ঘের প্রবন্ধ সমিতির সদস্যবৃন্দ গ্রামদান পরিষদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আমন্ত্রণ স্বীকার করা সত্ত্বেও আকস্মিক অসুস্থতার কারণে

কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী অজয় ঘোষ সম্মেলনে যোগদান করতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। বিমানের গোলযোগের কারণে প্রজাসমাজবাদী দলের নেতা শ্রী অশোক মেহতা শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারেন নি।

আশা দেবীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর ২১শে ডিসেম্বরে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সর্ব সেবা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার সভাস্থ উপস্থিত জনসাধারণবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে বলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নেতৃবৃন্দ যেমন জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনরূপী আদর্শাভিমুখে চালিত করেছিলেন, তেমনি গ্রামদানের মাধ্যমে সত্যকার স্বরাজ প্রাপ্তির লক্ষ্য-পথে দেশের সর্ব সাধারণকে নিয়ে এগিয়ে চলার কাজেও যেন তাঁরা অগ্রণী হন।

এর পর বিশেষজ্ঞী বক্তাবসিদ্ধ, সুললিত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, "গান্ধীজী জীবিত থাকা কালীন আমি কোনদিন আশ্রম ছেড়ে বাইরে যাইনি। ত্রিশ বৎসর কাতাই, বুনাই, গ্রাম পাকাই ইত্যাদি কার্য করেছি। কিন্তু গান্ধীজীর তিরোধানের পর দেশের অবস্থা দেখে মনে হ'ল যে ভারতের এই পরিস্থিতিতে আর বসে থাকলে চলবে না, গান্ধীজপ্রদর্শিত পন্থা ভারতের জনজীবনে সফল করে তুলতে হবে। বাপুজীর মার্গের রূপায়ণ প্রসঙ্গে পাওনার, দিল্লী ইত্যাদি স্থলে আমি উদ্বাস্তুদের সেবা করেছি এবং এই অন্বেষণা আমাকে তেলেঙ্গানা নিয়ে যায় ও পোচমপল্লী গ্রামে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল এই ইঙ্গিত আমি পেয়েছিলাম। এই মৌলিক বিশ্বাস আমার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে আপাত পরিদৃশ্যমান শতবিধ দোষ ত্রুটিসত্ত্বেও মানুষ মূলতঃ সৎ এবং তার অন্তর্নিহিত অন্তর্যামীকে জাগাবার কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করাই প্রধান কর্তব্য, পোচমপল্লীতে ভূমিহীনদের জন্য জমি চাওয়া মাত্র তা পেলাম এবং সেই দিনই স্থির করলাম যে দেশের ভূমিহীনদের সমস্যার সমাধানের জন্য এইভাবে পাঁচ কোটি একর ভূমি সংগ্রহ করব। আমি উপলব্ধি করলাম যে সকলের কাছে প্রেমের এই বাণী নিয়ে উপস্থিত না হলে তা অন্যান্য কাপুরুষতার কাজ হবে। আমি জানি যিনি শিশুর জন্মের পূর্বে দুধ দিয়েছেন, তিনিই আমার মাতৃবক্ষে দুগ্ধেরও ব্যবস্থা করেছেন। তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে আমি ভূমিহীনদের দুঃখ দূর করার কাজে প্রবৃত্ত হলাম। আমি প্রচার করা আরম্ভ করলাম যে বায়ু, জল ও সূর্য কিরণের মত ভূমিও ঈশ্বরের দান এবং তাই ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা বৈধবিরুদ্ধ প্রথা। দেশবাসী একটু করে দেওয়া শুরু করলেন এবং অতঃপর ষষ্ঠাংশ চাইতে লাগলাম। আমার যুক্তি ছিল অতীব সরল। ঘরে যদি পাঁচটি ভাই থাকে, তবে দরিদ্রনারায়ণের প্রতিনিধি স্বরূপ আমাকে আপনারা ষষ্ঠ ভ্রাতা বলে মনে করে আমার প্রাপ্য ষষ্ঠাংশ দান করুন। আমি দেখলাম ভারতের মোট কৃষিযোগ্য ভূমি ৩০ কোটি একরের ছয় ভাগের এক ভাগ ৫ কোটি একর ভূমি পেলে ভূমিহীনদের সমস্যার সমাধান হবে। আমার এই সহজ সরল আবেদন জনমানসে সাড়া জাগাতে লাগল। দেশ-বিদেশ থেকে অনেকে এসে এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখে যেতে লাগলেন। এই পদযাত্রা দ্বারা ভূমিহীনদের সমস্যার যে খুব একটা সমাধান হয়েছিল, তা নয়। হিংসাপ্রতিষ্ঠিত এবং নিত্য বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কে দিনাতিপাতকারী বিশ্বে গান্ধীজী প্রবর্তিত প্রেম ও অহিংসার বাণী বিমূঢ়চৈতন্যরূপের এই অভিনব প্রক্রিয়াই সকলকে এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ছয় ভাগের একভাগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ কথাও প্রচার করতে লাগলাম যে ভূমির বর্তমান মালিক বাকী অংশের অছি হবেন। অছি দুইপ্রকারের—যাঁরা পিতা মাতার মত অছি তাঁরা নিজেরা কষ্টে থেকেও সন্তানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের অছিরা সাধারণতঃ ঠিকাদারীর মানুষ কয়ে তাদের হাতে সম্পত্তির অধিকার তুলে দেবার ব্যবস্থা করেন। আমি দ্বিতীয় প্রকারের অছি হবার জন্য সকলকে আবেদন জানিয়ে বলতাম যে শেষ পর্যন্ত গ্রামদান বা গ্রাম থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার বিলোপই আমার লক্ষ্য। অবশেষে উত্তরপ্রদেশের বান্দিয়পুর জেলার মংরোথ গ্রাম সর্বপ্রথম এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ করল।"

অতঃপর ভূদান আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "এক বৎসর তো আমি একাই কাজ করছিলাম এবং তারপর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী প্রবর্তিত গঠনমূলক কাজের সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান অখিলভারত সর্বসেবাসঙ্ঘ এই আন্দোলনকে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন। প্রত্যেক প্রদেশে প্রায় প্রতিটি জেলায় ভূদান সমিতি গঠিত হ'ল এবং গান্ধী স্মারক নিধির কাজ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে স্থানে স্থানে সর্বকর্মের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হ'ল। এর ফলে কাজের পরিধির বৃদ্ধি পেলেও গান্ধীনিধির কাছ থেকে অর্থ নেওয়া আমার খুব মনোমত ছিল না। আমি অবশ্য মনে করি যে ভূদানের কাজে অর্থ দিয়ে গান্ধীনিধি তাঁদের অর্থের সদ্ব্যবহারই করেছেন। তবু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের ও নৈতিক অভ্যুত্থানের আন্দোলনে কোন রকম সংগঠন রচনা করা লক্ষ্যপূর্তির পথে বাধক হয় বলে আমি মনে করি। এ বিশ্বাস আমার আজকের নয়, গান্ধীজীর জীবিতাবস্থায় বাধী সেবা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আমার এই অভিমত। যাই হোক, চার বৎসর এই ভাবে কাজ চলার পর এবং প্রায় ৭২ লক্ষ একর ভূমি সংগৃহীত ও প্রায় দুই হাজারের মত গ্রামদান পাবার পর আমার সহকর্মীরাও গান্ধীনিধির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনের মারফত আন্দোলন চালানর পরিবর্তে আন্দোলনকে জন-আধারিত করা অধিকতর কাম্য বলে সিদ্ধান্ত করলেন এবং তদনুযায়ী আন্দোলন নিধি ও তন্ত্রমুক্ত হ'ল। এর ফলে কোন কোন প্রদেশে আন্দোলনের গতি মন্থর হলেও অন্য কোন কোন প্রদেশে আবার এ তীব্র রূপ ধারণ করল এবং সব মিলিয়ে আন্দোলনের নৈতিক সুর ঊর্ধ্বগামী হ'ল ও কর্মীদের ভিতর শক্তি, চেতনা এবং আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পেল।"

ভূদান থেকে গ্রামদান আন্দোলনের বিকাশ ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, "ভূদানের মূল প্রেরণা ছিল করুণা এবং গ্রামদানের

প্রেরক শক্তি হচ্ছে কল্পনা-আধারিত সহযোগীতাবৃত্তি ও সমবোধ। কাল্পনাবহির্ভূত কৃত্রিম সমতা কখনও কল্যাণকারী হবেনা। গান্ধীজীকে আমরা যেমন মহাত্মা আখ্যা দিয়েছি, মার্কসকেও আমি তেমনি "মহামুনি" বলে থাকি। আমার মতে বুদ্ধের পর এত বড় কল্পনাবতার আর অবতরণ করেন নি। তবে বুদ্ধের ভিতর গভীর বিশ্বাসক (Positive) কল্পনা ও আধ্যাত্মিকতা ছিল বলে আড়াই হাজার বৎসর পরও তাঁর বিচারধারা চির-নবীন এবং এখন কি এক অর্থে এতদিন পর আদর্শ পথাবলম্বে বিশ্বে হবার পথে চলেছে। কিন্তু ইউরোপের সমসাময়িক আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মার্কসের বিচারধারার উদ্ভব হয় বলে এর ভিতর আধ্যাত্মিকতার অভাব আছে; তবুও আমার মতে উভয়ের বিচারধারার মূল প্রেরণা অভিন্ন এবং এ হচ্ছে করুণা। এই জন্য ভারতীয় কমিউনিষ্ট বন্ধুদের আমি বলি যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট ঐতিহ্যের কারণ—তাঁদের ইউরোপীয় কমিউনিজমের হুবহু নকল হলে চলবেনা, এ দেশে তাঁদের বিশিষ্ট চারিত্র্য-কে বিকশিত করতে হবে। এই সভায় উপস্থিত রবীন্দ্রভক্তদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন আমি তাঁর জীবনী জানতে চেয়েছিলাম। তিনি অন্যান্য প্রেরণার উল্লেখ করেছিলেন যে বাল্যকালে তিনি বেদাধ্যয়ন করেন। তাহলে এই বেদ, উপনিষদ এবং বেদের ঋক্-বাদ ইত্যাদি প্রভাব কোথায় যাবে? কেবল কমিউনিজম নয়, এ বেদের খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সকলকেই তা প্রভাবিত করবে।"

ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, "বহুর মধ্যে একের খোঁজ, বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সম্প্রতি এই ভারতীয় সাধনার গতিপথে বিকারের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং তাই ধর্ম, জাতি, ভাষা এবং প্রদেশের পার্থক্য নিয়ে ভারত জুড়িতে বিদ্বেষ ও হানাহানি মাথা তুলছে। এর উপর স্বাধীনতার পর নির্বাচনের ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতভেদের ফলেও দেশময়ের বিকট ও মারাত্মক রূপের আবির্ভাব হচ্ছে। এ বেগ থেকে দেশকে মিটাতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। তাই দেশে এখন কোন ন্যূনতম কার্যক্রম থাকা চাই, যার আধারে কংগ্রেস, প্রজাসমাজবাদী, কমিউনিষ্ট ইত্যাদি সকলে মিলিত হতে পারেন। আমার বিশ্বাস বিনোবাজীর এই যে গ্রামদান সেই কার্যক্রম। তাই আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে আপনারা সম্মিলিতভাবে দেশবাসীকে এই কার্যে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করুন। সকলের সহযোগীতায় এই ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ভিতর ভারতের মোট পাঁচলক্ষ গ্রামের ভিতর দুই লাখ গ্রামদান স্বরূপ পাওয়া বিশেষ কঠিন হবেনা। কারণ যেখানে গ্রামদান পাওয়া যেত, সেখানকার লোকেরা বেহদ্দ, সর্বস্ব না কিরণ মন, তা অন্তত সেখানে গ্রামদান হয়নি সেখানে মানব বা মানুষ নেই—সর্বত্র নারায়ণ বিরাজমান। দুই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি গ্রামদানের আবশ্যকতার উপর জোর দিই। প্রথমতঃ এর ভিতর যীশু-কথিত প্রতিবেশী কর্মের বীজ বিদ্যমান—নিজ প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা। সত্যিকার সকল কর্মের সার হচ্ছে এই শিক্ষা। আধুনিক ভাষায় এরই নাম "কো-অপারেশন" বা সহযোগীতা। দ্বিতীয়তঃ আজ যদি কোন বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায় তাহলে আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ বানচাল হয়ে যাবে। আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য আধারিত আমাদের অর্থ ব্যবস্থা ভীষণ সঙ্কটে পড়বে। এমতাবস্থায় গ্রামবাসীদের মূল্যবৃদ্ধি জনিত মহা দুর্ভোগের হাত থেকে কে বাঁচাবে? ১৪ বৎসর পূর্বে বাঙলার দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী হিসাব মতে তিন লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ভবিষ্যত বিশ্বযুদ্ধের করাল ছত্রছায়ায় যে মহা-মন্বন্তর হবে, তার বলি আরও কতগুণ হবে? তাই বলছি যে এই বিপদাপন্নার হাত থেকে প্রাণ পাবার পূর্বপ্রস্তুতি হচ্ছে গ্রামদান। আমার কাছে গ্রামদান তাই 'ডিফেন্স মেজার'।"

অতঃপর গ্রামদানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি ঘোষণা করলেন, "গ্রামদানের অর্থ কেবল ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির গ্রামীকরণ না। লোকে ভুল করে যে এই পৃথিবীতে কিছুসংখ্যক হচ্ছে বিত্তবান (Haves), আর বাকী সকলে সর্বহারা (Have-nots)। এই শ্রেণী-বিভাজন ভ্রান্ত। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এই জাতীয় ভ্রমাত্মক শ্রেণী-বিভাজন থাকতে পারেনা। কারও কারও হাতে হচ্ছে ভ্রম-শক্তি এবং অন্যের আছে বুদ্ধি। এ ছাড়া প্রেম তো সকলের হৃদয়েই আছে। নিঃস্ব বা সর্বহারা এ দুনিয়ায় কেউ নয়। এই সব সম্পদকে আমরা এখন কেবল আমাদের পরিবারের গণ্ডির মধ্যে ভরে করে রেখেছি। ডিফেন্স মেজারের অর্থ হচ্ছে এই যে ভূমি, সম্পত্তি, বুদ্ধি, শ্রম, ও প্রেম—অর্থাৎ সব কিছুকে গ্রাম সমাজের সেবায় উৎসর্গ করে দেওয়া। কিছু লোক দেবে এবং বাকী সকলে নেবে—এই একাগ্রী আচরণ সর্বোদয়ের মত বিপ্লবনীন অর্থনীতিতে খাপ খায় না। তাই সর্বোদয়ের বাণী হচ্ছে—সকলের সব কিছু গ্রাম-সমাজের কাছে সমর্পণ করা। এর পর গ্রামের বাঁচা মাল গ্রামেই উপভোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করার জন্য গ্রামে কুটীর শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। গান্ধীবাদী বা বিশেষ কোন বুদ্ধিজীবী চালিত হয়ে আমি এ কথা বলছিনা। নিছক বাস্তববাদীর চোখ দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে যে বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় গ্রাম-স্বাবলম্বন ছাড়া আর পন্থা। অবশ্য কোন সঙ্কুচিত অর্থে স্বাবলম্বনের কথা ব্যবহার করা হচ্ছেনা। গ্রামে গ্রামে পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে এবং প্রয়োজন হলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সমাজকে বাঘ ও কেন্দুর মত দুই স্থায়ী শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে। এক দল কেবল বুদ্ধির চালনা করেন এবং অপর দলের দুই হাত ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ব্যক্তিকে পূর্ণ মানব সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাই শিক্ষাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজ কৃষক বা শ্রমিকও উপবাসী থেকে নিজ সন্তানকে স্কুল কলেজে পাঠায়। এ জ্ঞানতৃষ্ণার সমর্থন নয়—শ্রম থেকে বাঁচার আগ্রহ। এ ভাবে শ্রম পরিহার করে জাতি টিকে থাকতে পারেনা। তাই এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, যাতে শ্রমশিল্প ও

জ্ঞান কাপড়ের টানা-পোড়েনের মত একরূপ হয়ে গেছে। অতএব গ্রামদানের ভিতর তিনটি বিষয় অন্তর্নিহিত—ব্যবস্থার সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ, কুটীর শিল্পের বিকাশ এবং বর্তমান শিক্ষার পরিবর্তে নয়-তালিম প্রবর্তন।"

গ্রামদানী গ্রামের পুনর্গঠন কোন্ পদ্ধতিতে হবে? এই বিতর্ক বিষয়ে সকলের আশঙ্কা নিরসন করে বিনোবাজী বলেছেন, "উপনিষদে বলেছে 'অন্নং বহুকুর্বীত'—অর্থাৎ অন্নের উৎপাদন খুব বৃদ্ধি কর। তবে ছোট ছোট টুকরায় চাষ হবে কি না, কোন্ ধরণের সার ব্যবহার করা হবে, কৃষি কার্যের জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে কি না—এ সব নিয়ে মতভেদ হবার কোন কারণ নেই। এ সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে উপনিষদ বলেছেন যে, যে পদ্ধতিতে অধিকতম শস্য উৎপাদিত হবে, তা-ই অনুসরণ করতে হবে। অতএব গ্রামদানী গ্রামে অন্ন ও অন্যবিধ সম্পদ বৃদ্ধি করার কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে বলে আমি মনে করিনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ফলে সমৃদ্ধ হবে। সর্বোদয়ে কোন রকম গোঁড়ামীর স্থান নেই। আমি বার বার বলেছি যে আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় না ঘটলে পৃথিবীর উদ্ধার নেই। আত্মজ্ঞান অহিংসা শিক্ষা দেবে এবং বিজ্ঞান ভৌতিক শক্তির সদ্ব্যবহার শেখাবে। বিজ্ঞানের অধিকতর বিকাশের জন্যই একে অহিংসার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। নচেৎ হিংসার সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করলে তার পরিণাম যে কী ভীষণ হবে, তা সকলেই অনুমান করতে পারেন। সর্বোদয় মোটেই বিজ্ঞান-বিরোধী নয়, বরং সর্বোদয় অত্যধিক মাত্রায় বিজ্ঞানপ্রেমী বলে বিজ্ঞানের সুষ্ঠুপ্রয়োগার্থে অহিংসার উপর জোর দেয়। তাই আমরা কোন রকম যন্ত্র বিরোধী নই। তবে এ প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যন্ত্র যেন সকলের কল্যাণকর হয় এবং জনগণের কোন অনিচ্ছুক অংশের প্রতি তা যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়।"

বিনোবাজী তাঁর বক্তৃতার উপসংহার করলেন এক ধর্মস্পর্শী আবেদন দিয়ে। এই সম্মেলনের প্রতি দেশবাসী কত আশা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তার উল্লেখ করে তিনি বললেন—"এই বহুধা-বিভক্ত দেশ এক সূত্রে গ্রথিত হোক—এই আমার জীবনের একমাত্র কামনা। কিছু দিন পূর্বে কমিউনিটি প্রজেক্ট বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেহ তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি দুঃখ করে বললেন যে দেশে আজ কমিউনিটিই নেই, তো তার প্রজেক্ট সফল হবে কি করে? শ্রীযুক্ত মেহ মন্তব্য নয় সত্য। উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে আমি বিনম্রভাবে নিবেদন করতে চাই যে গ্রামদানের ফলে এই কমিউনিটি বা সমাজ চেতনার সূত্রপাত হয় এবং তাই দেশকে দৃঢ় সংবদ্ধভাবে একরূপ করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে গ্রামদান। আজ থেকে আটাশ বৎসর পূর্বে স্বামী নদীর তীরে সমগ্র রাষ্ট্র যে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে, তার অটুট শক্তিতেই দেশ আরও আঠার বৎসর তপশ্চর্যা করে স্বাধীনতা অর্জন করে। আজ আবার আপনারা এইখানে গ্রামদানের জাতীয় সঙ্কল্প গ্রহণ করুন এবং দেশবাসীকে নূতন ভারত গড়ার পথ নির্দেশ করুন, এই আমার ঐকান্তিক মিনতি।"

এর পর জহরলালজী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে উঠলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বিনোবাজীর বক্তৃতায় তাঁর ভিতর গান্ধীজীর প্রভাব জাগরিত হয়ে উঠেছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে গ্রামদানে তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা আছে এবং একে সফল করার জন্য সর্ব-প্রকারে সহায়তা করতে হবে। তারপর সরকারের কর্তব্য প্রসঙ্গে বললেন, "সরকার বা সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যক্ষভাবে গ্রামদান সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বা এ রকম করা উচিতও হবেনা। কারণ তাতে জনসাধারণের উপর চাপ পড়বে এবং এটা এ আন্দোলনের আদর্শের প্রতিকূল। তবে সরকার তার নিজের পদ্ধতিতে এ কার্যে সহায়তা করতে পারেন। অনুকূল আইন করে এবং গ্রামদানী গ্রামের পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা দিয়ে সরকার নিজ কর্তব্য পালন করবে। ভারতের সমস্যা পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে পৃথক। এখানে জমির উপর চাপ খুব বেশী। মাথা পিছু এক একরের ও কম জমি। এরূপাবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে কৃষি করলে এক একরে দশ বার ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করলেও দু মুঠা অন্নের সংস্থান করা দুরূহ ব্যাপার। সমস্যার সমাধান হচ্ছে সমবায়মূলক কৃষি এবং গ্রামদানে এরই সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে সমবায়ের ইউনিট যেন এত বড় না হয়, যার ফলে তা ব্যক্তিগত সম্পর্ক রহিত যন্ত্রপার্শোন্যাল ব্যাপারে পরিণত হয়। একটি বা দুটি গ্রাম নিয়ে একটি বৃহৎ পরিবারের মত সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্য করা যেতে পারে। এতে প্রত্যেকের ভিতর পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বজায় থাকবে। তা ছাড়া সমবায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এ সব গ্রামদানের ভিতর দিয়ে হওয়া সম্ভব। এর পর জমির উপর থেকে চাপ কমাবার জন্য কুটীরশিল্প, ছোট ছোট কারখানা এবং প্রয়োজন মত বৃহৎ যন্ত্রোদ্যোগও চালাতে হবে। আগামী সাত বৎসরের মধ্যে ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামকে কমিউনিটি প্রজেক্টের আওতায় আনা হবে। তাই গ্রামদানের সঙ্গে কমিউনিটি প্রজেক্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত।"

জহরলালজীর পর কংগ্রেস সভাপতি ধেবর তাই গ্রামদানের কার্যক্রমের প্রতি তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বললেন, "গ্রামদানের ফলে দেশে এক অভাবনীয় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, অতঃপর দেশের পুনর্গঠনের জন্য উচ্চ প্রেরণা কর্মী সৃষ্টি করার উপর আমাদের সকলকে জোর দিতে হবে। কারণ নূতন মানুষ ছাড়া নব সমাজ নির্মাণ সম্ভবপর নয়।" কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটবুরোর সদস্য ডাঃ ভেড, এ, আহমদ বললেন, "এক মাত্র গ্রামদানেই সকল সমস্যার সমাধান হবে বলে কমিউনিষ্টরা বিশ্বাস না করলেও আমরা এ কথা স্বীকার করি যে এর ফলে জনসাধারণের নৈতিক উত্থান হবে এবং যে কোন প্রগতিশীল কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য এ অত্যাবশ্যক। কমিউনিষ্ট হয়েও আমি এ কথা বলছি বলে আপনারা যেন বিস্মিত না হন। যাই হোক যদি গ্রামদানের স্বেচ্ছামূলক ও স্থির পরিবর্তন আধীরিত পদ্ধতি দ্বারা দেশের কৃষি সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে কমিউনিষ্টরা এ আন্দোলনকে সাদুবাদ দেবে। আমি তাই এ আন্দোলনের সমর্থন করায় প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এই ভাবেই সমস্ত ভারতীয় সমস্যাবলীর সমাধানের পন্থা আবিষ্কারের জন্য সর্বসেবাসঙ্ঘ বিভিন্ন বিচারধারার কর্মীদের এক প্ল্যাটফর্মে মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আশা করি যে ভবিষ্যতেও এ রকম সুযোগ পাওয়া যাবে।" প্রজা সমাজবাদী দলের নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সিংহও গ্রামদানের কর্মসূচিকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা দেন। অতঃপর এই কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করার পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং শ্রীভূদানযজ্ঞ কমিটির মন্ত্রী, পণ্ডিত পদ্মী, শ্রী দে ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

পরদিবস আলোচনার শেষে পরিষদের তরফ থেকে এক সর্বসম্মত বিবৃতি প্রকাশ করে ভারতবাসীদের গ্রামদান আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে আহ্বান জানান হয়। উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই ঐতিহাসিক ঘোষণা সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয় :

"সর্ব সেবা সঙ্ঘের আমন্ত্রণক্রমে বিহারের রাজধানী এলাহাবাদ নামক স্থানে ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর গ্রামদান পরিষদের বৈঠক হয়। রাষ্ট্রপতিও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে এতে যোগদান করেন।

সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাবলী এবং বিশেষতঃ ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য আচার্য বিনোবা কি ভাবে এই অহিংস পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তা তিনি পরিষদের নিকট জ্ঞাপন করেন। ভূমিদানে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং এর বিকাশ হতে হতে আজ গ্রামদানের স্থিতি অর্থাৎ সমগ্র গ্রামকে গ্রাম পরিবারের হাতে সমর্পণ করার অবস্থা এসে গেছে। তিন হাজারেরও অধিক গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ নিজেদের সকল ভূ-সম্পত্তি স্বেচ্ছায় গ্রাম-পরিবারের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

পরিষদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ গ্রামদান আন্দোলনকে অন্তর্নিহিত করেন এবং এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রশংসা করেন। গ্রামদানের ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রামসমূহে সমবায়-মূলক জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টার পূর্ণ বিকাশ হবে এবং তাদের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্বমুখী বিকাশ সংসাধিত হবে। এতদ্ব্যতিরেকে এর পরিণামে সমগ্র ভারতে ভূমি সমস্যা সমাধানের অনুকূল মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়মূলক জীবনধারা বিকশিত হবে। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অহিংসাত্মক পদ্ধতি এবং ঐচ্ছিক স্বরূপ। এই ভাবে নৈতিক মানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আর্থিক উন্নতির সমন্বয় ঘটেছে এবং সহযোগিতা ও স্বাবলম্বী সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের সূত্রপাত হয়ে গেছে। তাই এই আন্দোলন সর্ব প্রকারের সহায়তা ও প্রোৎসাহ-পাবার অধিকারী।

পরিষদে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীবর্গ গ্রামদান আন্দোলনের প্রশংসা করেন ও একে সহায়তা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন যে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহকে নিজ নিজ ভূমি সংস্কার, সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ, জোতের উচ্চতম সীমা নির্ধারণ এবং জমিদারীসমূহের সম্পত্তিগ্রহণে ভূমির সর্ব স্তরে সমবায়মূলক পদ্ধতির প্রবর্তন হবে তাঁদের ভূমি সংস্কার নীতির মূল সূত্র। সরকারের এই সব পরিকল্পনা গ্রামদানের বিরোধী নয়, পক্ষান্তরে এর সহায়ক হয়ে সিদ্ধ হবে। তাঁরা এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে সরকারের কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট পরিকল্পনা ও গ্রামদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিষদ তার দুই দিবস-ব্যাপী অধিবেশনের শেষে বিনোবাজীর আন্দোলন এবং অহিংসাত্মক ও সমবায়মূলক উপায় দ্বারা জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান-কল্পে তাঁর প্রচেষ্টার ভূরি ভূরি প্রশংসাকরতঃ ভারতের সর্ব শ্রেণীর জনতাকে সোৎসাহে এই আন্দোলনকে সমর্থন করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।"

পরিষদের সমাপ্তি দিনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আশীর্বাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে বলেন, যে গ্রামদান এক নবীন সমাজ রচনার আদর্শাভিমুখে দেশকে নিয়ে যাবে এবং তাই তিনি একে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দেন। তিনি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দেন যে আন্দোলন সরকারী সাহায্য নিলেও যেন তার স্বাবলম্বী চরিত্র-ধর্ম বজায় রাখে। কারণ স্বয়ম্ভর-নিরপেক্ষতাই এ আন্দোলনের প্রাণ। সর্বশেষে দুই মিনিট মৌন প্রার্থনা করে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

গ্রামদান পরিষদের ফলশ্রুতি কি? এ আন্দোলনের প্রবর্তক বিনোবাজীর ভাষায় "পরিষদ দেশের সম্মুখে যুক্ত বিবৃতিরূপী এক সংহিতা উপস্থাপিত করেছে। সংহিতার দুটি শব্দ আমাদের কাছে বিবিধ আশীর্বাদ স্বরূপ। এতে বলা হয়েছে যে বিনোবা সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য যে অহিংসাত্মক এবং সমবায়মূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।.....অহিংসাত্মক পদ্ধতি আত্মার একতার অনুভূতির উপর আধারিত। তাই এ এক আধ্যাত্মিক বিচারধারা। আর সমবায়মূলক পদ্ধতি বিজ্ঞান-নির্ভর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নেতৃবৃন্দ এ কথা উপলব্ধি করেছেন যে সর্বোদয়ের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক—এই উভয়বিধ বিচার ধারার সংযোগ সাধিত হয়েছে।.....সর্বোদয়ের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিলনা; কিন্তু এর ভিতর বৈজ্ঞানিকতা আছে কি না, এ বিষয়ে সংশয় ছিল। এবার উভয়বিধ দিক সম্বন্ধেই সকলে নিঃসন্দেহ হয়েছেন, আর আমরা তাই বিবিধ আশীর্বাদ লাভ করেছি।" পরিষদের পরদিবস মহিসুর সহরে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে "গ্রামদানকে তাঁরা তাঁদের পার্টির ভূমি সংস্কার পরিকল্পনার এক সুসঙ্গত বিকল্প যোজনা বলে স্বীকার করেন।" মার্কসবাদীদের মনে ও আর গ্রামদান সম্বন্ধে কোন বিরোধীতা নেই, বা এর সার্থকতা সম্বন্ধে কোন রকম দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ নেই।

আপাত প্রাপ্তির হিসাব খতিয়ে গ্রামদান পরিষদের সাফল্য পরিমাপ করা সঙ্গত হলেও প্রথমতঃ যত দিন যাবে এলাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বই ভারতীয় জন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধৃত হয়ে নব ভারত গঠনের কঠিন কার্যকে সহজতর করে তুলবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা নব যুগবোধ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিত শক্তির

প্রভাবে ভারত আবার জগত সভায় এক গৌরবজনক আসনে অধিষ্ঠিত হবে। বিশ্বের রূপান্তরের পন্থায় বিশ্বকে সংশোধিত করে, এক মানবীয় ক্রান্তির রূপায়ণ করে বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ভারত হিংসোন্মত্ত বিশ্বকে আবার নূতন করে প্রেম ও অহিংসার পথ দেখাবে। নিপীড়িত মানবাত্মা ভারতের এই প্রয়োগের ভিতর আবার শান্তির মার্গ খুঁজে পাবে। বস্তুতঃ জওহরলালজীর কণ্ঠে গত ২৭শে সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের এক জন সভায় যেন ভারতাত্মার এই শাশ্বত বাণীই মূর্তায়িত হয়ে উঠেছিল। গ্রামদান ও বিনোবাজী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "বিনোবাজীর কর্ম পদ্ধতিকে আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরা বিদ্রূপ করতে পারেন এবং অর্থশাস্ত্রীরা এর নানাবিধ বিদ্রূপ সমালোচনা করতে পারেন; কিন্তু চেতনাত্মার মূর্ত প্রতীক ভারতীয় জনগণের ভিতর পরিব্রজনকারী এই কৃশকায় মানুষটি দেশে এক অভূতপূর্ব এবং কার্যকরী পরিবর্তন সংসাধন করছেন। গ্রামদান আর এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা এক দল কর্মীর আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—ভারতীয় পটভূমিকায় এর মূল সূত্রসংবদ্ধ। গ্রামদান বিনোবাজীরই মত ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট সাধনার অভিব্যক্তি। আমি আশা করি যে জনজীবনের সুউচ্চ কলরব ও পতবিধ ধূলার মধ্যেও বিনোবাজীর শান্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অধিক থেকে অধিকতর লোকের কর্ণে প্রবেশ করবে এবং তাঁরা উপলব্ধি করবেন যে রাজনীতিকদের মাপকাঠি ছাড়াও অন্যবিধ মানদণ্ড এই পৃথিবীতে আছে। বিনোবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে বুঝতে পারা যায় যে ক্ষীণ দেহের ভিতরও আত্মার বিপুল বার্তা কেমন প্রকট রূপে মোদিত হচ্ছে! চারিত্র শক্তি ও আত্মিক বলের মূর্ত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে কোন জাতির বিকাশ অচিন্তনীয় ব্যাপার। এই বিবিধ শক্তির আকর বিনোবাজী অতীব প্রশংসনীয় সরলতা এবং সেবাপরায়ণতা চালিত হয়ে তাঁর রোগজীর্ণ শরীর সত্ত্বেও ভারতীয় জনসাধারণের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহাত্মা গান্ধীর ভিতর ও আমরা আত্মিক শক্তির এই রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর মহান এবং সর্বব্যাপী আত্মশক্তি পরমাণবিক বোমার চেয়ে বহুগুণ বলশালী ছিল। আমি আশা করি যে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে অন্যান্য দেশেও বিনোবাজীর মত সাধু সন্তের আবির্ভাব হবে; কারণ এক মাত্র এই জাতীয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান সভ্যতার জটিল ব্যাধিসমূহের নিরাকরণে ও সুদৃঢ় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। আজ যে সভ্যতার বাহ্য রূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান, বিনোবাজীর চৈতন্যশক্তি এবং তাঁর কর্মধারা এ সকলের বহু ঊর্ধ্বে। এই জাতীয় চেতনার অভাবে যুদ্ধ ও ধ্বংসের সম্ভাবনা বিদ্যমান। যুদ্ধের এই সভ্যতার মারাত্মক ব্যাধিকে এই জাতীয় চৈতন্য ও আত্মিক শক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে হবে।"

দেবভূমি খাজুরাহো

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গভীর মন্ত্রে সন্ধ্যারতি বাজে
জনশূন্য পুণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য'পরে সন্ধ্যারশ্মি রেখা।

সন্ধ্যার রক্তিম আলোকে খাজুরাহোর মহাদেব-মন্দিরের চত্বরে বসে স্বপ্ন দেখছিলাম। অস্তগামী সূর্যের ম্লান অঙ্গুলীগুলি তখন দূরের ও নিকটের মন্দিরগুলির চূড়ায় চূড়ায় পূরবী রাগিণী বাজিয়ে চলেছে। শিবসাগরের পদ্মগুলির উপর ঘুমের ছায়া ঘনিয়ে এলো। মন্দিরে মন্দিরে শত শত শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠলো। সহস্রদীপের আলোকে মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণ জ্বলে উঠলো। পূজার অর্ঘ্য হাতে নরনারীর দল এসে ভিড় করলো মন্দির প্রাঙ্গণে। ধূপের ধোঁয়ায় ও পুষ্পগন্ধে সন্ধ্যার-বাতাস উতলা হ'য়ে উঠলো। দেবতার জয়ধ্বনি অন্ধকার ভেদ ক'রে ঊর্ধ্বে আকাশকে স্পর্শ করলো। কিন্তু এ হলো স্বপ্ন! এক হাজার বছর আগে এ স্বপ্ন সত্য ছিল। আজ মহাদেব-জগদম্বা-চিত্রগুপ্ত-বিশ্বনাথ সব মন্দির নিঃসীম শ্রীহতার মধ্যে দণ্ডায়মান। চিরযৌন পাষাণের মধ্যে আজ দেবতার জাগ্রত মহিমা সমাহিত হ'য়ে রয়েছে। স্বপ্নের পাখা এখন তাদের আরতি জানায়। ম্লান জোনাকীর আলো এখন প্রদীপ হ'য়ে জ্বলতে থাকে। শিবসাগরে এখন পদ্মগুলি ফুটে উঠে দেবতার চরণে আর স্থান পায় না, তাদের স্বার্থ পাপড়িগুলি ম্লান হ'য়ে ঝ'রে পড়তে থাকে। এমনি ভাবে মহাকালের অবোধ বিধানে সব কর্ম, সব ভাবনার পাপড়ি বুঝি ঝ'রে পড়ে। কিন্তু তবুও মন্দিরগুলি হাজার বছর ঝ'রে মহাকালের বিধানকে অগ্রাহ্য ক'রে বেঁচে রয়েছে। তারা বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষের স্বপ্ন ও সাধনাকে।

আগ্রা থেকে খাজুরাহোর পথে যাবার সময় মানুষের এই চিরন্তন স্বপ্ন ও সাধনার কথাই ভাবছিলাম। আগ্রার মোগল আমলের স্থাপত্য ও চিত্রকলার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মধ্যে বিলাস-ব্যসন ও অহমিকা ঘোষণার উদ্দেশ্যই যেন পরিস্ফুট। কিন্তু যে সৌন্দর্যের মধ্যে ত্যাগ, ভক্তি ও কল্যাণের আদর্শ-ই জাগ্রত তার সন্ধান পেয়েছিলেন বোধ হয় প্রাচীন যুগের হিন্দুগণ। সেজন্য হিন্দুর প্রাচীন কীর্তিকলার যা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাই ছড়ানো রয়েছে মন্দির, দেবস্থান ও তীর্থক্ষেত্রে। খাজুরাহোর মন্দিরের খ্যাতি

ভুবনেশ্বরায়, মনেকদিন থেকে সেখানে যাবারও ইচ্ছা ছিল। এবার সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হলো।

মাদ্রাজ এক্সপ্রেস যখন ঝাঁসি ষ্টেশনে পৌঁছল তখন রাত প্রায় বারটা। লেডিওয়েটিং রুমে কিছু খাবার সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরলাম, কিন্তু অত রাত্রে কি মিলবে? অতি কষ্টে শুকনো পাঁউরুটি একখানি চিবিয়ে রাতের খাওয়া সমাধা করলাম। ওয়েটিং রুমে খাজুরাহোর মন্দিরের কয়েকখানি ছবি ছিল, সেগুলি দেখা ও ছারপোকার উৎপাত থাকলেও মন তখন খাজুরাহোর স্বপ্নে বিভোর। পরদিন ভোরে মালিকপুরগামী ট্রেণে আমার রওনা হলাম। বহুদূর রাঙ্গামাটির প্রান্তরের উপর দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলল। চারদিকে শস্য-হীন, লোকালয়হীন রুক্ষতা। দূরে আকাশের গায়ে উঁচু নীচু পাহাড়ের সারি। মাঝে মাঝে দু'একটি নদী পড়ছে। কিন্তু সেগুলি নিরবচ্ছিন্ন নদী নয়, তাদের মাঝে নানা রকমের পাথর ও বৃহৎ শিলাখণ্ডও রয়েছে। আশে পাশে প্রকৃতির এক অনড়াচ্ছন্ন দৃষ্ট নয়নাভিরাম রূপ চোখে পড়লো। ট্রেণ লাইনের পাশে ছোট ছোট গাছের ঝোপে কয়েকটি

পার্শ্বনাথ, পার্শ্বনাথ ও আদিনাথ মন্দির—খাজুরাহো

ফটো—অজিত ঘোষ

ময়ূরকে এক জায়গায় দেখতে পেলাম। হরপালপুরে গাড়ি যখন পৌঁছল তখন বেলা প্রায় বারটা। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ যেতে হবে মোটর যোগে। নওগাঁ, ছতরপুর প্রভৃতি হয়ে যখন খাজুরাহোর এলাকায় যান পৌঁছল তখন—

গলিয়ে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
মেউটি জ্বালিয়ে দূরে মেটলে।

খাজুরাহোতে ঢুকতেই শিবসাগরের এক রাশ পদ্মফুলের রঙীন হাসিতে পথের ক্লান্তি ও অবসাদ সব জুড়িয়ে গেল। মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় তখন অস্তরাগের সোনালী রঙ লেগেছে। গাছে গাছে পাখীর বিচিত্র কাকলী অপরাহ্নের নিস্তব্ধ পরিবেশকে মুখরিত ক'রে তুলছে। মুহূর্ত মধ্যে বেরিয়ে এল—'এখান লেগেছে ভালো বড়ো!'

খাজুরাহোতে থাকবার একমাত্র জায়গা হলো সার্কিট হাউসটি। দেশ বিদেশ থেকে যত ভ্রমণকারী খাজুরাহোর মন্দির দেখতে আসেন। তাঁদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার একে একটি অনাড়ম্বর আবাস-ভবনে রূপায়িত করেছেন। এর থাকবার ঘর-গুলি যেমন সুসজ্জিত, তেমনি আরামদায়ক। খাবার বন্দোবস্তও অতি সহজে ও সুচারুরূপে করা যায়। খানসামাকে বললেই সব রকম খাবারই পাওয়া যাবে, তার দামও খুব বেশি নয়। সার্কিট হাউসের চারদিকে সযত্নপালিত সুন্দর ফুলের উদ্যান। পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারের পরে উদ্যানের পাশ দিয়ে বন্ধু বিহঙ্গের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। সমস্ত আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদ জ্যোৎস্নার বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। সেই বাঁশীর মায়ামদিরা বিশ্বের অবচেতনার মধ্যে ঢেলে যাচ্ছে। দূরে বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়ায় যেন কোন্ অতীতের স্বপ্নাবেশ। এমনি চাঁদের আলোক এক হাজার বছর আগে যেমন এসেছে এই মাটিতে। তখন চন্দেল রাজের কীর্তি ও মহিমাই সেই আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। যশোবর্মণ, ধঙ্গ, বিদ্যাধর—এঁদের ঐশ্বর্য ও শিল্পানুরাগের ফলে খাজুরাহোর কত গৌরব ও প্রতিষ্ঠাই না সেদিন ছিল! তারপর এক এক কালো ঝড়ের ঝাপটে এই চাঁদিনী রাতের সব আলো, সব সুরই একসঙ্গে নিভে গেল। দুর্দমনীয় মানুষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চন্দেলগণ মাহোবা, অজয়গড় আর কালিঞ্জর দুর্গে শক্তি সংহত করতে লাগলেন। শিল্প, সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগে শিথিল হয়ে পড়লো, দেশরক্ষাই প্রধান সমস্যা হ'য়ে উঠলো। এমনি ভাবে ইতিহাসে উন্নত শক্তির কালো ছায়া সুন্দরের শুভ্র বেদীকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু তবুও তো সুন্দর মরে না। চন্দেলগণ বিলুপ্ত হলো, কিন্তু খাজুরাহো বেঁচে রইল তার মন্দিরগুলির অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তির মধ্যে। চতুর্দিকের নিঃশব্দ বনানীর মধ্যে জ্যোৎস্নার বাঁশী যেন ঝিল মিল করে কি ব'লে চলেছে। অনেক কথা তারা জানে, ভাঙ্গাগড়ার অনেক লীলাই তারা দেখেছে। যুগ যুগ ধ'রে নিরন্তর সেই সব কথাই তারা মুগ্ধ অরণ্য ও নিস্তব্ধ চরাচরকে জানিয়ে চলে।

পরদিন সকালে মন্দিরগুলি দেখতে গেলাম। খাজুরাহোর মন্দির-গুলি তিনটি শ্রেণীভুক্ত। বাস রাস্তার পশ্চিম দিকে যে মন্দিরগুলি রয়েছে সেগুলিই সর্বত্রের বিখ্যাত এবং সেগুলি পশ্চিমাঞ্চলশ্রেণীভুক্ত। ঐ মন্দিরগুলিও আবার দুইটি পঙ্‌ক্তিতে স্থাপিত। শিল্পীদের অর্থাৎ পশ্চিম পঙ্‌ক্তিতে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে ক্রমে ক্রমে চৌষট্টি যোগিনী, মহাদেব, জগদম্বা ও চিত্রগুপ্ত অথবা ভারতীশ্রীর মন্দিরগুলি স্থাপিত। সম্মুখের অর্থাৎ পূর্ব পঙ্‌ক্তিতে আদিম খাজুরাহার উদ্ভবের পর পর মাতঙ্গেশ্বর, লক্ষ্মণ, পার্বতী, বিশ্বনাথ ও নন্দীর মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত। বাসস্ট্যাণ্ডের পূর্ব দিকে কিছু দূরে গেলে পূর্বাঞ্চলীয় মন্দিরগুলি দেখা যায়। ঘণ্টাই, জাবেরী, ব্রহ্মা এবং শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ ও আদিনাথের মন্দিরগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় অর্থাৎ দক্ষিণী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে দুলাদেব ও চতুর্ভুজ মন্দির দুইটি। এগুলি জৈনমন্দিরগুলির দক্ষিণে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলির আকৃতি ও গঠনপ্রণালী অনেকটা একই রকমের। মন্দিরগুলির স্থাপত্য ও গাত্রের প্রাচীর-চিত্রগুলি ভাস্কর্যের

মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরগুলির কোন বহিঃপ্রাচীর-বেষ্টনী নেই, উন্মুক্ত ও অবারিত স্থানেই এগুলি দাঁড়িয়ে আছে। মাটি থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। সেই চত্বর থেকে আরও কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। প্রধান মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি অংশ আছে, যথা, অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল, গর্ভগৃহ ও প্রদক্ষিণ পথ। ছোট মন্দিরগুলির মধ্যে শুধু মাত্র অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ ও গর্ভগৃহই থাকে। এই বিভিন্ন অংশের বহির্ভাগ আলাদা আলাদা দেখালেও আসলে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একটি অখণ্ড স্থাপত্য-সামঞ্জস্য গ'ড়ে তোলে। মণ্ডিরের প্রবেশ-পথে পাথরে খোদাই করা বিচিত্র কারুকার্য চোখে পড়ে। মন্দিরের ছাদ কয়েকটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভের উপরে অদ্ভুত আকৃতির মানব-মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। গোলাকার মিলিরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য ও মনোরঞ্জিকর ছন্দ দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। আধুনিক কোন স্বর্ণশিল্পী গলানো সোনার উপরে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর শিল্পসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন ব'লে মনে হয় না।

মন্দিরগুলির বহির্ভাগে দুইটি কিংবা তিনটি স্তরে অনবদ্য ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি শিল্পীর সুস্থতার জীবনচেতনা ও সূক্ষ্মতম শিল্পচাতুর্যের অবিনশ্বর সাক্ষী হ'য়ে রয়েছে। ভারতের সব মন্দির দেখিনি, কিন্তু খাজুরাহোর মন্দিরগুলির প্রাচীর-গাত্রে নর-নারীর দেহছন্দ ও ভাববিলাসের যে সব চিত্র দেখতে পেলাম তাদের চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও জীবন্ত চিত্র হ'তে পারে কিনা জানি না। চিত্রগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু মানবজীবনের বহু বিচিত্র ও বলিষ্ঠতম রূপ তাদের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মূর্তিগুলির মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমা-মহেশ্বর, সূর্য, গণেশ ইত্যাদি প্রধান প্রধান দেবতা রয়েছেন; আমার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট-দিকপাল, অপ্সরা, সুরসুন্দরী, বিদ্যাধর ইত্যাদি মূর্তিও যথেষ্ট আছে। কোথাও কোথাও নাগমূর্তি এবং শার্দূল মূর্তিও দেখা যায়। একটি রমণী মূর্তির সহিত বিশেষ ধরণের একটি হিংস্র শার্দূল মূর্তি অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়।

খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রের চিত্রগুলি দেখলে মনে হয়, এক হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষগণ দেবতার পুণ্যস্থান থেকে সুখদুঃখময়, কামনা-বাসনা-পূর্ণ মানব সংসারকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। ইন্দ্রিয় স্পর্শহীন, বেরাগ্যব্যঞ্জক দৃষ্টি দিয়ে ওঁরা দেবতার মহিমাকে উপলব্ধি করেন নি। ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রস্তর-চিত্র দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়েছিল তা' মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। ধূলিলিপ্ত, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসংকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতি-মূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।' খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখবার সময় আমার ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল। এই সব মন্দিরের শিল্পী মানবজীবনের সমস্ত তুচ্ছ ও ধূলিমলিন বিষয়গুলিই যেন অকপট আগ্রহের সঙ্গেই মন্দিরগাত্রে প্রস্তর-রেখায় লেখে রাখলেন। এমন কি দেব ও দেবযোনিমূর্তিগুলির মধ্যে মানবীয় আবেগ অনুভূতির রূপায়নও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দেখলাম শিব ও পার্বতীর বিবাহ এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মিলনের চিত্র শিল্পীর সুঠাম হাতে অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে, পুরুষ ও নারীমূর্তিগুলির মধ্যে স্বভাবতই নারীমূর্তিরই বহুলত্ব চোখে পড়ে। যে সব শিল্পী নারীমূর্তিগুলি অঙ্কন করেছিলেন তাঁরা নারীর আকৃতি ও প্রকৃতি যে কত সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এক একটি নারীমূর্তি এক একটি ছন্দময়ী কবিতার মতই মন্দিরের গায়ে ফুটে রয়েছে। তার সুঠাম লীলায়িত দেহলতার প্রতিটি রেখার মধ্যে ভাবের এক একটি মূর্ত বাণীরূপই যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে লাস্যময় কটাক্ষপাত, কামনা-বিলোল কটাক্ষ, চাপা ওষ্ঠাধর, সুডৌল নাসা ও সুনিত চিবুক-রেখা নিতান্ত অরসিকেরও মনকে মোহমুগ্ধ ক'রে তোলে। কেশসজ্জা ও আভরণেরও বা কত চমৎকারিত্ব! হার, কুণ্ডল, বলয়, মেখলা ইত্যাদি অলঙ্কারের সুশোভন পারিপাট্য চোখের দৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। কোন কোন চিত্রে রমণীদের দেহবিন্যাস ও প্রসাধনের রূপ ধরা পড়েছে। কোথাও হাতে দর্পণ ও সীমান্তমণ্ডন রয়েছে, কোথাও বা কোন রমণী অঞ্জনরেখায় নয়নযুগলকে আরও সুশোভিত ক'রে তুলছে।

চিত্রগুপ্ত মন্দিরের প্রাচীর চিত্র—খাজুরাহো

ফটো—অজিত ঘোষ

পুরীর মন্দিরের ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রেও নরনারীর দেহসম্ভোগের নানা চিত্র খোদিত রয়েছে। দেবমন্দিরে অনাবৃত দেহলীলার চিত্র-স্থাপনাকে হয়তো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বোঝান যেতে পারে। বস্তুত, অনেকেই তো বলে থাকেন, এই সব কামকলার চিত্র দেখে চিত্তকে শুদ্ধ ও সংযত রাখতে পারলেই দেবদর্শন সার্থক হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয়, এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন লোকদের নর-নারীর মিলন সম্বন্ধে একটা সহজ ও নির্মুক্ত দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। দেহের সঙ্গে দেহের মিলনের মধ্যে বিশ্ববিধানের আদিম ও পরম সত্যটিই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই হয়তো শিল্পিগণ এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। বাৎস্যায়ন কথিত দেহমিলনের বহু ভঙ্গিই চিত্রগুলির মধ্যে

রূপায়িত হয়েছে। মেথুনির মানুষ রূপরেখা ইন্দ্রিয়-কামনাকে উত্তেজিত করে না, সহজাত জীবনোল্লাসের দিকে এক অবিকৃত প্রত্যয় আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

মন্দিরগুলির মধ্যে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে মন্দিরটির অনেকখানিই ভেঙেচুরে গেছে এবং চতুর্দিকে তৃণ ও আগাছাতেও দুর্গম ও অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। সবচেয়ে বৃহৎ ও সুদৃশ্য মন্দির হলো কান্দারিয় মহাদেব মন্দির। চিত্রগুপ্ত ও বিশ্বনাথ মন্দির দুইটিও বিশেষ বৃহৎ ও মনোজ্ঞ চিত্র সম্ভার। চন্দেলবংশের রাজাগণ প্রথমত শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন, সেজন্যে খাজুরাহোতে শিবমন্দিরেরই বহুলত্ব লক্ষ্য করা যায়। মহাদেব, বিশ্বনাথ, মাতঙ্গেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে শুধু কেবল মাতঙ্গেশ্বর

* প্রসাধনরতা নারী—পার্শ্বনাথ মন্দিরের চিত্র—খাজুরাহো

ফটো—অজিত ঘোষ

মন্দিরেই বর্তমানে নিয়মিত পূজা হ'য়ে থাকে। অন্যান্য মন্দিরের মূর্তিগুলির মধ্যে বরাহ মন্দিরের বিরাট বরাহ মূর্তিটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিরাট বরাহ-মূর্তিটির শরীরে বহু চিত্র খোদিত এবং তার পায়ের তলায় কুণ্ডলীকৃত একটি প্রকাণ্ড সাপ প'ড়ে রয়েছে।

মহাদেব মন্দিরের চত্বরে বসেছিলাম। চারদিকে ছোট বড় মন্দিরের শিখা সূর্যের প্রখর আলোকে ঝলমল করছে। চতুর্দিক ঘিরে তৃণ ঘাসা আচ্ছাদিত। অদূরবর্তী মহুয়া বৃক্ষ থেকে পাখীর সঙ্গীত ভেসে আসছে। মাঠে গোরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। তাদের গলায় এক রকমের অদ্ভুত ঘণ্টা বাঁধা, সেই ঘণ্টার মধুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রৌদ্রক্লান্ত দৃষ্টি ঘুরে এলিয়ে দিই। মন্দিরের গর্ভগৃহে পার্শ্বনাথের বাঁধনে দেবতা মৌনী হ'য়ে রয়েছেন। হাজার বছর কেটে গেল। চারদিকে মানুষ ও প্রকৃতির নিত্য-গঠন জীবন প্রবাহ ব'য়ে চলেছে। নিত্য নোতুন প্রাণের স্পর্শ জাগছে মন্দিরের চারদিকে, কিন্তু দেবতার মৌনতা ভাঙলো না। হাজার বছরের কথা তাঁর পাষাণভিত্তিতে প্রস্তরীভূত হ'য়ে রইল। চারদিকের সচলতার মধ্যে এই রহস্যমৌন নীরবতা মনের মধ্যে একটি গুরু গাম্ভীর্যের ভাব জাগিয়ে তোলে।

বিকেল বেলায় জৈন মন্দিরগুলি দেখতে যাচ্ছিলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো রাস্তার ধারে একটি বিরাট হনুমানমূর্তি। কিন্তু মূর্তিটিকে আর চেনা যায় না, সর্বাঙ্গ তার সিঁদুরে লেপিত। খাজুরাহো গ্রামের মধ্য দিয়ে মন্দিরে যাবার পথ। গ্রামের বসতি কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা ঘর, শহরের মত পরস্পর-সংলগ্ন ঘর। ঘরে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থালী জীবনযাত্রা। আমাদের দেখে একদল ছেলেমেয়ে ছুটে এল, বলতে লাগল, 'বাবু প্যাসে, পয়সা চাইতে লাগল ঘটে। কিন্তু ভাওয়ার মালিন্য তাদের মুখে নেই, বেশ হাসিখুশি ভাব। বস্তি ছাড়িয়ে শস্যক্ষেতের আলের উপর দিয়ে কিছুদূর হাঁটতে হলো। লাল অথবা গেরুয়া রঙের কাপড়-পরা মেয়েরা ক্ষেতের কাজে নিরত। এখানে এসে ঐ দুই রঙের কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙের কাপড়-পরা মেয়ে তো চোখে পড়লো না। জৈনমন্দিরগুলির প্রাঙ্গণে যখন নিয়ে উপস্থিত হলাম তখন বিকেলের আলো তির্যক ভাবে মন্দিরের গায়ে এসে পড়েছে। প্রথমেই শান্তিনাথ মন্দির। মন্দিরটি আধুনিক, কিন্তু তার ভিতরে শান্তিনাথের বিরাট নগ্ন মূর্তি স্থাপিত। মূর্তিটির অসাধারণ বিরাটত্ব বিস্ময় উদ্রেক করে। জৈন মন্দির গুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ হলো পার্শ্বনাথ মন্দির। মন্দিরটির ভিতরের সিলিংয়ের সূক্ষ্ম কাজ এবং প্রাচীর চিত্রগুলির বর্ণবৈচিত্র্য বিশেষ আকর্ষণীয়। ঐ মন্দিরের পাশেই আদিনাথ মন্দিরটি আকারে অনেক ছোট। মন্দির-চত্বরের চারপাশে অনেক ছোট বড় মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অদূরে উত্তর দিকে বামনজী ও জাবেরী মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে। বহিঃপ্রাচীর ঘুরে দুপাশের মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বহুদূরে চতুর্ভুজ মন্দিরটির বৃষাজ্জোধিত চূড়াটির অস্পষ্ট রূপ চোখে পড়ছে। পার্শ্বনাথ মন্দিরের সামনের বাড়িটির ছাদে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলাম। মাথার উপরে উন্মুক্ত নীলাকাশের সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপ, আকাশের বিলম্ব সীমারেখায় পাহাড়ের প্রাচীর। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে নানা ক্ষুদ্র চিত্রাপিত রূপ, মাঝে মাঝে সবুজের সমারোহের মধ্যে দুই একটি মন্দিরের উত্থান, প্রকৃতির খোলা খাতায় যেন স্থানে স্থানে দেবতার স্বাক্ষর।

খাজুরাহোর পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহশালাটির মধ্যে অনেকগুলি মূর্তি ও মন্দির-চিত্র সংগৃহীত হয়েছে শুনেছিলাম। একদিন সেই সংগ্রহশালাটি দেখতে গেলাম। সংগ্রহশালায় রক্ষিত শিল্পনিদর্শনগুলির কয়েকখানি আলোকচিত্র নেব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে যাবার জন্যে দু'টাকা দর্শনী দিতে হলো। খাজুরাহোতে প্রাপ্ত নানা মূর্তি, মন্দিরের নানা অংশ ও প্রস্তর-চিত্র সংগ্রহশালায় দেখতে পেলাম।

কয়েকটি বৃহদাকার বৃষমূর্তি ও হৈমবতী একদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিশিষ্ট মূর্তিগুলির মধ্যে উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু, সূর্য, বীণাপাণি, অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী, নবগ্রহ ও সপ্তমাতৃকা মূর্তিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্বরূপ বিষ্ণুর একটি মূর্তির মধ্যে ভাবের যে বাস্তব রূপায়ন দেখলাম তা' ভোলা যায় না। প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় চিত্রও চোখে পড়লো। একটি শিকারদৃশ্য দেখলাম, সেখানে গতিশীল ভাবের যে অপরূপ অভিব্যক্তি চোখে পড়লো তার তুলনা মেলে না। পাথর কাটা ও ব'য়ে নিয়ে যাবার একটি সুন্দর চিত্রও দেখতে পেলাম। বিভিন্ন ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরীদের যে বিলোল ও সুচঞ্চিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা দেখে চোখ ফেরান অসম্ভব। মিথুন মূর্তিগুলির ভাববিলাসও চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে।

সংগ্রহশালা থেকে আমরা দু'জনে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিই। চা-ওয়ালার আদরযত্নের ত্রুটি নেই। গর্ব ক'রে আমায় বলে, তার চা একবার যে খেয়েছে সে নাকি কোনদিন ভুলতে পারে না। আমাদের প্রতি একটু অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বের ফলেই বোধ হয় সে চা তৈরী করবার সময় চায়ের অংশ অপেক্ষা দুধের অংশ বেশিই দিত। খুশি হ'য়ে আমাদের স্বীকার করতে হত, এরকম খেতজোগ্য চা একমাত্র এই দেবস্থানেই সম্ভব। কিন্তু হায়, তবুও বন্ধু নির্মল এই চা আস্বাদন করত না! চা-ওয়ালা চা বানাত আর তার বৌ বানাত পুরী। চা-ওয়ালা যতই তর্জন গর্জন করুক না কেন, তার বৌয়ের সুখেলী বঙ্কনি খেয়ে একেবারে চুপ। এই চায়ের দোকানকে কেন্দ্র ক'রে এই জনবিরল স্থানের কয়েকটি মানুষকে মিতা দেখতাম। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ'ড়ে উঠলো। সেখানে আসতেন সংগ্রহশালার সহকারী অধ্যক্ষ ধনারলী লাল। ভারী সহৃদয় ও পরোপকারী লোকটি। খাজুরাহো সম্বন্ধে কয়েকখানি বই পড়তে দিয়ে আমার যথেষ্ট উপকার তিনি করেছিলেন। আর আসতেন পোষ্টমাষ্টারটি। চিঠির খোঁজে পোষ্টাফিসে যেতাম, আদর আপ্যায়ন ক'রে বসাতেন, গল্প করতেন। চা খেতে এসে ঘুটত টাঙ্গাওয়ালাটি। বোধ হয় খাজুরাহোর একমাত্র টাঙ্গার মালিক সে। খুব রসিক ও চটাপটে ছেলেটি। কয়েকজন চাষীগোছের লোকও এসে সেখানে বসত। অবাক হ'য়ে আমাদের দেখত, সসম্ভ্রমে আমাদের কোন সাহায্য করবার জন্ত এগিয়ে আসত। বিস্মিত মনে তাদের বৈচিত্র্যহীন জীবন ব'য়ে চলে। বাইরের জগতের কোন খবর তারা রাখে না। ব্যস্ততা ও বিক্ষোভ তাদের নেই, ঐ মন্দিরগুলির মত তাদের জীবন ধ্রুব ও প্রশান্ত।

সার্কিট হাউসের খানসামার রন্ধন-নৈপুণ্যে দু'বেলা খাওয়া হচ্ছে বেশ ভালো আবেই। উত্তম আহার ও বাসস্থান, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অতীতের স্বপ্নজগতে বিচরণ—এ লোভ ছেড়ে কেই বা যেতে চায়! সার্কিট হাউসে বেশ বিদেশ থেকে অনেক লোক আসেন। তাঁদের কারুর কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। অবশ্য সবের ভ্রমণ-কারী যে আসেন তা' নয়। কেউ কেউ এসে একঘণ্টার মধ্যেই মন্দিরগুলি একবার পরিক্রমা ক'রে চ'লে যান। খাজুরাহো দেখেছেন, এ গল্প অবশ্য তাঁরা করতে পারেন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে। তবে অনেকেই আসেন নিষ্ঠা নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে, পুরাতত্ত্বের আগ্রহ নিয়ে। কলকাতার আর্ট স্কুলের দু'জন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁরা সারাদিন মন্দিরে ব'সে একনিষ্ঠ তন্ময়তার সঙ্গে চিত্র এঁকে যান। খাবার ঘরে হাঙ্গেরি নিযুক্ত আমেরিকার কাইস-কনসালের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরা সস্ত্রীক বেরিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন স্থানের ফেমেডউলগুলি পরিদর্শন করবার জন্তে। নির্মল ভারতের বহু স্থানে বেড়িয়েছে জেনে তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক তথ্য ও সংবাদ তাঁরা জেনে নিলেন। ভারত সম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীর এত-খানি কৌতূহল ও শ্রদ্ধা দেখে গর্বে আনন্দে মন ভ'রে ওঠে। রাত্রে খাবার পরে সার্কিট হাউসের সামনে বৃক্ষকুঞ্জের নীচে গিয়ে বসি। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি, আলো ও আঁধারের কি রহস্যময় মিতালী! পত্রপুঞ্জের ওপর দিয়ে আলোর ঢেউ ব'য়ে চলেছে, মনের মধ্যে অতীত ও বর্তমানে মিলে এক বিচিত্র ঐকতান সুরু হলো বুঝি।

খাজুরাহো থেকে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। কয়েকদিন কাটলো স্বপ্নের মত। যাবার সময় এই তাৎপর্যটির মিনতি-ভরা আহ্বান মনের মর্মতলে অনুভব করলাম। হাজার বছর ধ'রে এ কত পথযাত্রীকে এভাবে আহ্বান ক'রে ফেরাতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ ফেরেনি। তবে তারা না ফিরলেও তাদের পরশটুকু এখানে রেখে গেছে। আমরাও আমাদের হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা যেটুকু পরশটুকু এখানে রেখে গেলাম। বাস ছাড়লো হলো পান্নার দিকে। শিবসাগরের পদ্মগুলি তখনও আলো ক'রে অবগুণ্ঠন মোচন করে নি। এক একটি ক'রে মন্দিরের বিচিত্র চূড়া মিলিয়ে গেল। মহুয়া ও আমবীথির ভিতর দিয়ে আমাদের বাস দ্রুত এগিয়ে চলল।

আচরণ-বিভ্রম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

তখনও মোহমুক্ত হননি অর্জুন। শুনছেন শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব উপদেশ—ধর্মের কথা, নীতির কথা, মনুষ্য জীবনের প্রকৃষ্ট চলার পথের সমাচার। মানুষকে কাজ করতে হবে অনাসক্ত হয়ে। পালন করতে হবে স্বধর্ম। ক্ষাত্রধর্ম ন্যায়যুদ্ধ। সে ধর্ম বর্জন করলে সমাজ টিকতে পারবেনা।

মনে মনে কথাগুলা বিচার করছেন অর্জুন। সবই উপদেশ নীতি কথা। সত্য কিন্তু শুভ সংকল্প তা সর্বদা মানুষকে কল্যাণ কর্ম-পথে নিয়ে যেতে পারেনা। জীবনের এ কঠোর অভিজ্ঞতা। কে যেন টানে প্রাণকে অন্ধকারের দিকে অশুভের বন্ধপথে। মনের ধারণাকে পালটে দেয় যে আকর্ষণ। উপেক্ষা করে কর্মেন্দ্রিয় মনের মতে প্রতিষ্ঠিত সে সৃষ্টি ভাব, তার ক্রিয়াকে। টান বেশ প্রবল। মন বোঝে সে টান পাপের পথের আকর্ষণ। ফল ভোগ করে দিনের পর দিন জীব এমন আচরণের। তবু তাকে পরাজয় করতে পারেনা সাধারণ জীবন স্রোত। কেন? এর মূল রহস্যটি কি? স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন পাণ্ডব সারথি-সখা উপদেষ্টাকে। বল্লেন—হে বার্ষ্ণেয়। তবে কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে কেন মানুষ, অনিচ্ছা থাকলেও যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হ'য়ে পাপাচরণ করে?*

শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন—সে উত্তরে পুঞ্জীভূত ভারতের বিশেষ সংস্কৃতি। উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, দর্শন সকল কৃষ্টির এক বিশেষ নির্দেশ পাওয়া যায় এই উত্তরে। পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। এ শিক্ষা ধীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলে লুপ্ত হয় আমাদের চরিত্রের বিচিত্রতা সম্বন্ধে মনের বিভ্রম। মনোবিজ্ঞানে হিন্দু-দর্শনের ত্রিগুণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত অপূর্ব। সংশয় অপনোদন করে বহু, প্রকৃতির ত্রিগুণ তত্ত্ব। সাংখ্য-দর্শনের এ অধ্যায় শিক্ষাপ্রদ।

বলছিলাম অর্জুনের বিভ্রান্তির কথা। প্রত্যুত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—রজোগুণ হতে সমুদ্ভব দুষ্পূরণীয় অতিশয় উগ্র এই কাম এবং তজ্জনিত ক্রোধকে মোক্ষমার্গে শত্রু বলে জেনো।*

পরে ভগবান প্রকৃতি-পুরুষ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন যথাকালে—যখন অর্জুনের বুদ্ধি-শক্তি ক্রমশঃ আবার মোহ-বিমুক্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন যে পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। বিবিধ বেদে বিভিন্নরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ গীত হয়েছে। সংশয়রহিত যুক্তি-যুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদ সমূহে এ বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে।†

প্রকৃতিই সমস্ত কার্য করেন। পুরুষ মাত্র দর্শক। যেমন সর্বপদার্থে অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্ম। তার একান্ত সূক্ষ্মতাবশতঃ সর্বত্র তাকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না। আকাশ সর্বত্র বিদ্যমান কিন্তু নির্লিপ্ত। তেমনি পুরুষ বা আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান অথচ নির্লিপ্ত।

তাই প্রকৃতির উপলব্ধি হ'লে দেখি তার লীলা—নানা রূপে, নানা আচরণে, কত অভিনব বিকাশে। মানুষের মাঝে আত্মা বিরাজিত—নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, দর্শক। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণে প্রকৃতির সচকল ক্রিয়াশীলতা বৈষ্ণবীমায়া সৃষ্টি করে জীবে—নিজের স্বরূপে। তাই প্রকৃতির গুণ বিদ্যমান জীবে। প্রকৃতির ধর্ম জীবধর্ম। জীবের শক্তি বিচারে মানুষ মহাশক্তির ক্ষীণ ধারণা করতে পারে—যদিও মহামায়ার আসল অনন্ত স্বরূপ অব্যক্ত—বাক্যও মনের অতীত।

সেই অনির্বচনীয় অচিন্ত্য প্রকৃতির ক্ষীণ পরিচয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। যে ভাবে জীবে বিকসিত সে শক্তি, দিলেন তার আভাষ। কাম হতে ক্রোধ হয়। কাম মানুষের বৈরী। কেন?

জীবন রহস্যের একটা বিকাশ তার আচরণ বিভ্রম। অনবদ্য কর্ম তো সবাই করেনা সবাই। কোনো মানুষ

---

* গীতা ৩।৩৬

* কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্। ৩।৩৭

† গীতা ১৩।৪।

সর্ব্বদাই সুষ্ঠু কর্ম্ম করেনা। আবার এমন দুষ্ট ও কেহ দেখেনি মানুষের সমাজে, যে প্রতি মুহূর্ত্ত মাত্রসদ্ভায় আচরণ করে। মানুষের কাজ দেখেও তার মনোভাবের নির্ভুল বিচার সম্ভবপর নয়। দেব-মন্দিরের মাঝে মালা চন্দন তিলক আন্তরিক দর্প-দম্ভ-অহঙ্কারের ঘূর্ণীপাক পণ্ড করে সাধকের পূজা ও যজ্ঞ। আবার কত দস্যু লুটের সময় অনুভব করে তীব্র মনোবেদনা—যার প্রভাবে তার লুণ্ঠন-লব্ধ ধন দান করে দরিদ্র নারায়ণকে। দানও তো পরিচয় দেয়না আন্তরিক মনোভাবের। দানে উপকৃত হয় পর। কিন্তু দাতা কোথাও দান করে যশের লোভে, কভু দেয় ভয়ে, কভু অর্থ ছুঁড়ে ফেলে ভিক্ষুকের প্রতি বিরক্ত হয়ে, তার সান্নিধ্য হতে মুক্ত হবার তাড়নায়। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ যে দানের উপদেশ দিয়েছেন, তা দুঃস্থের উপকারের জন্য। শ্রদ্ধয়া দেয়ম—শ্রদ্ধায় দান করবে। এ নির্দ্দেশ দাতাকে সম্পন্ন করে। কিন্তু অশ্রদ্ধয়া দেয়ম—অশ্রদ্ধায় দান করবে, শ্রিয়া দেয়ম—শোভন ভাবে দান করবে—হ্রিয়া দেয়ম—লজ্জায় দান করবে—ভিয়া দেয়ম—ভয়ে দান করবে—সংবিদা দেয়ম, চুক্তি অনুসারে দান করবে—এ ব্যবস্থাগুলি হয়ে ছিল গ্রহীতার উপকারার্থে। এমন দান দাতাকে বিশেষ উন্নত করেনা।

আমরা ভাব বাবচ্ছেদ করলে স্পষ্ট বুঝি প্রতিকর্ম্মের মূলে থাকে নানা মনোভাব—কতকগুলি কর্ম্মফলের বিপরীত, কতকগুলি সুষ্ঠু ও সমীচীন। সত্যই মনোবিজ্ঞানের এ অধ্যায় বিভ্রান্ত করে অনুসন্ধিৎসুকে।

প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ সূচনা করলেন আচরণবিভ্রমনিরাকরণের। প্রকৃতি ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আমি অন্যত্র। আপাততঃ বোঝবার চেষ্টা করব ত্রি-গুণের বিকাশ। আর্ষ্য-দর্শন বিদ্যা-অবিদ্যা, শ্রেয়-প্রেয় সম্বন্ধে প্রভূত বিচার করেছে। পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, ঐ শিক্ষায় কেহ যেন না ভুল বোঝে ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয়। সে বিষয় ব্যাখ্যায় সাবধান করেছেন শঙ্করাচার্য্য। সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজমান কিন্তু সে কারণে ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবানের সংসারিত্বের গন্ধমাত্রও আশঙ্কার কারণ নাই।*

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলেন—কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন।† সুতরাং সাংসারিক ক্রিয়ার কারণ প্রকৃতি।

জীবের স্বভাব—কার্য্য কারণ। কর্ম্ম করে জীব প্রকৃতিবশে। সুতরাং প্রকৃতির বিষয় সম্যক জ্ঞান হলে আচরণের জ্ঞানের পাওয়া যাবে সন্ধান। কারণ প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং আত্মাকে অকর্ত্তারূপে যিনি দেখেন তিনি সম্যকদর্শী।†

এরপর তিনি সুস্পষ্টভাবে বোঝালেন প্রকৃতি-সম্ভব তিনটি গুণের কথা। যে তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝলে আচরণ-বিভ্রমের সংশয় নাশ হয়। তিনি বলেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্। ১৪।৫

হে মহাবাহু প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ তিনটি দেহ মধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন ক'রে রাখে।

মানুষ-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারেনা আত্মার মুক্ত ভাব। আমাদের এই প্রকৃতি-সম্ভব গুণ সদাই ক্রিয়মান। এক অন্যকে নিবৃত্ত করে আপনি প্রতীয়মান হ'তে। এ তিনটি গুণ বাঁধে মানুষকে, রজ্জু যেমন বন্ধন করে। এদের কোনটিকে বাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ তিনটিই প্রকৃতিগত। এদের সাম্য-অবস্থা হ'লে তবে মুক্তি। সাম্য-অবস্থা এদের কর্ম্ম নিরোধ। তখন স্বপ্রকাশ হয় আত্মা। প্রকৃতির গুণ তার পূর্ণ পরিচয় হ'তে বঞ্চিত করে জীবকে।

মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পায় সাত্ত্বিক প্রকৃতির ফলে। তখন অপর দুই প্রকৃতির টানের উপরে ওঠে সত্ত্বগুণ। বাকী দুটি লোপ পায় না।* আবার যখন তার রাজসিক প্রকৃতি হয় বিজয়ী—তখন অনুরক্ত হয় মানুষ কর্ম্মে—উৎপন্ন হয় তৃষ্ণা এবং আসক্তি। মানুষ কর্ম্ম করে যার ফলে কর্ম্ম পিপাসা বাড়ে যদি তার মূলে থাকে সংসার পিপাসা। সাত্ত্বিক কর্ম্ম করে মানুষ। সে প্রবৃত্তি কার্য্যকরী হয় রাজসিক গুণে। প্রকাশের আলো সমুন্নত ও উজ্জ্বল করে পথকে। কিন্তু রাজসিক প্রবৃত্তি আবার তৃষ্ণাসঙ্গকে জাগায়—সাত্ত্বিক ভাবকে পিছনে

* এবং চ সতি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বেপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরস্য সংসারিত্বগন্ধমাত্রমপি নাশঙ্ক্যম্।"

* গীতা—১৩।২১

† গীতা—১৩।৩০

ফেলে। তামসিক প্রবৃত্তি মোহ প্রসূত—প্রমাদ আলস্য নিদ্রা প্রভৃতির জনক।

মানুষ সদাই জ্ঞানের আলোর সন্ধান পায়না, পারেনা সদাই কর্ম করতে। মোহ আসে ভ্রান্তি আসে। মোহ আচ্ছন্ন করে অন্তরের অন্তর্ভাব। আবার আলস্যের পর মোহেরও মাঝে জাগে কর্মের ইচ্ছা, ধমনীতের আলোর রূপে আসে প্রকাশ।

এই তিন গুণে মানুষ বাঁধা—এই হ'ল তার স্বভাবের মূল নির্দেশ। এই বাঁধন তিন পাক দড়ির বাঁধন। কেহ বাকী দুটি হতে মুক্ত নয়—তখন একটি প্রাধান্য লাভ করে। তখন সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বশে মানুষ কাজ করে সে মগ্ন হয় সুখে। রজোগুণ প্রবৃত্ত করে তাকে কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে প্রমাদ সৃষ্টি করে।

মানুষকে কর্ম করতেই হয়। অথচ এই তিনগুণে সে বাঁধা। কাজেই একই প্রকারের কর্মে হয়তো নিযুক্ত হয় মানুষ বিভিন্ন মনোভাবে—বিভিন্ন গুণের প্রেরণায়।

শিক্ষায়তন কুরুক্ষেত্রের কথা ভাবলে বড় আনন্দ আসে এই ত্রিগুণ তত্ত্বের বিচারে। জ্ঞানী ও কর্মী অর্জুন। তখন তাঁর তামসিক গুণ প্রাবল্য লাভ করেছে অন্য দুটিকে পিছনে ফেলে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। কিন্তু নরের রূপ ধারণ করেন যখন তিনি, তখন ভগবান নরের মত আচরণ করেন। মানুষের সংসারের নিজের গড়া নিয়মকে ধ্বংস করেন না। তাঁর মধ্যে বিকাশ দেখতে পাই তখন সত্ত্বগুণ, যার ফলে জ্ঞানের আলোক প্রোজ্জ্বল। সেই দীপের শিখায় জ্বালাচ্ছেন তিনি সখা পাণ্ডবের নির্বাসিত জ্ঞান প্রদীপ।* তিনি সারথী—রথ-চালক—কর্মী—রাজসিক গুণের সহজ ভাবে দেহ মন স্পন্দিত। সাত্ত্বিক উপদেশ দিচ্ছেন অথচ রাজসিক গুণে—বক্তৃতা, বিশ্বরূপ প্রদর্শন, শঙ্খবাদন প্রভৃতি। তাই সে শিক্ষায়তনে পরিচয় পাই তিন গুণের ক্রিয়ার। এ বড় শিক্ষাপ্রদ অধ্যায়—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের।

সাংখ্যাচার্যগণ সত্ত্বগুণকে বলেছেন লঘু এবং প্রকাশক। লঘু কারণ সহজে উপরে ওঠে, সংসারের জাল জঞ্জালের ভারমুক্ত হ'য়ে। রজঃ গুণ স্বয়ং চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং অপরের উপষ্টম্ভক বা চালক। তমঃ গুণ গুরু এবং অন্যের আবরক। এরা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হ'লেও প্রদীপের মতো বৃত্তিতে মহত্তত্ত্বাদি কার্যের জনক। বাতি, তেল, অনল পরস্পর বিভিন্ন। কিন্তু তিনে মিলে আলোক বিস্তার করে। অনল প্রবল হ'লে আলো হয় দীপ্তিময়। তেল বা ইন্ধন তাকে সচল রাখে। সলিতা একেবারে স্থূল। কিন্তু তিনে মিলে আলো। তাই সাংখ্য-কারিকা (১৩ শ্লোক) বলে—

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥

কর্মযোগ গীতার শিক্ষা। মনস্থির হ'লে মুমুক্ষু দেখে কর্মের ব্যর্থতা। তখন দেহের কর্মত্যাগ করা হয় সহজ এবং প্রয়োজন। ত্যাগ প্রশংসনীয়। কিন্তু মানব প্রকৃতি সকল কর্মকে রূপ দেয়। সকল কর্মে আবার সেই তিনটি প্রকৃতির প্রেরণা হয় উপলব্ধ। অবশ্য যজ্ঞ, দান বা তপস্যা ত্যাজ্য নয়। কিন্তু নিরাসক্ত হ'য়ে সে সকল কর্ম করা কর্তব্য। অন্য কর্ম ত্যাগ কাম্য—হেতু হিসাবে। অথচ দেখি লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করে।

সে সন্ন্যাস বিচারেরও ত্রিগুণের লক্ষণ মানি। কর্মের ফলত্যাগই ত্যাগ—সাত্ত্বিক ত্যাগ। ভগবান বলেন—কর্তব্য-বোধে কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে, কর্মে আসক্তি এবং কর্মফল কামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ। দুঃখের ভয়ে কায়িক পরিশ্রমের ফলে নিত্যকর্ম ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ। রাজসিক, কারণ মনের কাজ ফলের কামনা প্রভৃতিতে মন সক্রিয়। আর মোহবশতঃ কর্ম ত্যাগ হয় তামসিক ত্যাগ। আলস্যে কাজ না করা কর্ম সন্ন্যাস নয়—তামসের প্রমাণ।

এই ত্রিগুণের কষ্টি-পাথরে যাচাই ক'রে কোন্ প্রকার কর্ম সাত্ত্বিক, কোন্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হ'লে সেই কর্ম রাজসিক বা তামসিক গুণ প্রসূত, যে বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। সংসারের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারি সেই মানে।

জ্ঞান লাভে সবাই ব্যস্ত। কিন্তু কোন্ জ্ঞান সত্ত্বগুণ প্রসূত? রাজসিক জ্ঞানই বা কি আর তামসিক প্রবৃত্তির বশেই বা মানুষ কী জ্ঞান লাভ করে?

যে জ্ঞানের দ্বারা বিভিন্ন ভূত সর্বত্র বিভক্ত হ'য়েও অবিভক্তরূপ প্রত্যয় হয়, সকল ভূতের এক অব্যয় স্বরূপ উপলব্ধি হয় সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিপ্রসূত। সাপের

এও এক অপূর্ব্ব উপদেশ। আত্মবিস্তারে মুক্তি, সংকোচনে অবনতি। পরকে নিজের মধ্যে দেখা, নিজের উপমায় তার সুখদুঃখ, অভিরুচির সন্ধান করলে, অহিংসা দ্বেষহীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি সদগুণ দিন দিন বাড়ে। মানুষের সঙ্কীর্ণতা লোপ পায়, সন্ধান পায় সে মহত্বের। তাই সর্ব্বভূতের একতা দেখার জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান।

কিন্তু মানুষ প্রকৃতির অন্য গুণের বশে লাভ করে ভিন্নরূপ জ্ঞান। যাদের অন্য বিষয়ে জ্ঞান হয়েছে তাদেরও সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বিষয়ে পরিচয় পাই মূর্খতায়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সৃষ্টি ও সংহার প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান লাভ করেছে আজ। কিন্তু সে জ্ঞানে ধ্বংসের লীলায় প্রেরণা পায়। সে জ্ঞান রাজসিক। গীতা বলেন—পৃথক পৃথক দেহাদি ভূতসমূহে যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথক পৃথক পদার্থের অনুভব হয়, সে জ্ঞান রাজস জ্ঞান।*

সত্যই বাহির হ'তে দেখলে রাশি রাশি পার্থক্য বোধ হয় জীবে জীবে। কিন্তু তারা যে একই আত্মা-শক্তির বিভিন্ন বিকাশ—সাত্ত্বিক, পরিশ্রমী জ্ঞান-চর্চ্চার অধিকারী সে কথা ভাবেনা। আজ বিজ্ঞান বলে পৃথিবীতে একটা শব্দ করলে সারা বিশ্বে তার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই বিজ্ঞান বিশ্বাস করেনা, সমস্ত বিশ্বের নিবিড় একতা। মূল বিভিন্নতার জ্ঞান রাজসিক। এ হ'তে আরও শুভ ও সূক্ষ্মজ্ঞান সাত্ত্বিক।

আর তামসিক গুণে অভিভূত ব্যক্তি জীবে জীবে কোনো সম্বন্ধই মানেনা দেখে প্রত্যেক পদার্থ স্বতন্ত্র। কেহ কারও সম্পর্ক রাখে না।

জ্ঞানের পর কর্ম্ম।

কোন্ কর্ম্ম সাত্ত্বিক? যে পুরুষ রাগ দ্বেষ শূন্য হয়ে কাজ করে, যে আসক্তি রাখে না কর্ম্মফলে, কর্ত্তব্য ভেবে করে কাজ, ফলাফল না ভেবে শ্রীভগবানের কর্ম্ম অর্ঘ্য দেয় শ্রীচরণে, এমন পুরুষের কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

আবার বলি—একই পুরুষ সকল সময় সকল কাজ একই মনোভাব নিয়ে করেনা। সাত্ত্বিক ভাবে এক কর্ম্ম সম্পাদন করে তখনই সে কাজ করে হয়তো রাজসিক প্রবৃত্তির প্রেরণায়।

রাজসিক কর্ম্মের কী রূপ?

কামেপ্সু কর্ম্ম, কোনো কর্ম্ম অহঙ্কারের দ্বারা কৃত, অতি ক্লেশপ্রদ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—রাজসিক। এমন কর্ম্মের মূল প্রেরণা কামনা। কর্ম্মী কর্তৃত্বাভিমানে স্ফীত শির।

পৃথিবীতে এই শ্রেণীর কর্ম্ম আমরা প্রত্যক্ষ করি চারিদিকে। তাতে জগতের উপকার হয় না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু কর্ত্তার উপর তার কী ফল—সে কথা আলোচনা করলে নিশ্চয় বোঝা যায় যে সকল কার্য্যে হরির স্মরণ নিয়ে, তাঁরই কর্ম্ম করছি এই বিশ্বাসে কাজ করলে চিত্ত হ'ত প্রশস্ত—কর্ত্তার স্বভাব হতে স্ফুরণ হত সাত্ত্বিক প্রভা।

তামসিক গুণ মানুষকে যে কর্ম্ম করায়, তারও পরিচয় দিলেন নারায়ণ।

যার ফল শুভ কি ভবিষ্যতে অশুভ, যে কার্য্য ক্ষয়, হিংসা, পারুষ্য হতে সম্ভূত, মোহবশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত সে কাজ তামসিক।

কাজেই সেই কর্ত্তা সাত্ত্বিক যে ফলকামনা বর্জ্জিত, অনহংবাদী, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার চিত্ত।

রাজস কর্ত্তা সেই ব্যক্তি যে বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচহীন, হর্ষ ও শোকযুক্ত।

বলা বাহুল্য সংসারে সমৃদ্ধিলাভ করতে গেলে এই সব রাজসিক গুণের আবশ্যক বিবেচনা করে লোক। হয়তো হিংসাপরায়ণতা তার মাঝে কদর্য্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় না। প্রতিযোগিতায় ঈর্ষাবাদ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু লোভ বাড়ায় লোভ, কৃতকার্য্য হলে নিজের ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি পায়। আমিত্ব বড় বিরাট আকার ধারণ করে, উদারতা সাফল্য অনুসারে ততো ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আবার কৃতকার্য্য, যশস্বীলোক যদি ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে হতমান বা হৃতধন হয়, হিংসা ধারণ করে কদাকার রূপ। তাই মানুষের পক্ষে আবশ্যক নির্লোভ হওয়া। কারণ ভাগ্য-লক্ষ্মী চিরদিন প্রসন্ন থাকেন না। দুঃখ অনিবার্য্য লোভীর পক্ষে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মী লাভালাভ জয়াজয়ে সমান উদারতা দেখিয়ে ক্লেশ ভোগের দহন হ'তে মুক্ত হয়।

আর তামস কর্ত্তা?

* গীতা ১৮।২১

সে অন্ধবিশ্বাসী, বিবেকশূন্য, অজ্ঞ, বঞ্চক, পরাপকারী, অলস, বিষাদী এবং দীর্ঘসূত্রী।

বলা বাহুল্য রাজসিকের সাফল্যের মূলে থাকে তার ভ্রম, অথচ যার মূলে থাকে লোভ। তামসিক ব্যক্তির কর্মমূলে লোভ থাকে, অথচ থাকে অলস কর্ম-বিমুখতা এবং মোহ।

মানুষ বুদ্ধিজীবী। পশুর সঙ্গে তার পার্থক্যের মূলে বিদ্যমান জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান তো সবার সমান নয়, আর এক মানুষের চিত্তে সব সময় জ্ঞানের প্রদীপ সমান দীপ্তিময় নয়। তাই মানুষের প্রথম কর্তব্য জ্ঞানকে শুদ্ধ করা। বারবার দেখেছি গীতার শিক্ষার মূলে বর্ণিত কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তির শুদ্ধি সাধনের উপায়। কর্মকে ত্রিগুণের মাপকাটিতে বিচার করে যে ফল হল, তার অন্তরে প্রবেশ করলে নিশ্চয় বোঝা যায়, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির বশে কাজ করলে দুঃখভোগ হয় অনিবার্য—কারণ লোভ এবং কামনা বুদ্ধিকে করে নির্বাসিত অন্ততঃ ক্ষণ। বুদ্ধি স্পষ্ট হলে কর্মের মূল হয় পবিত্র তার ফল হয় কল্যাণকর।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের এক মসলাকে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—সম্যক দৃষ্টি। এ জ্ঞানের চরম সম্যক ভাবে প্রত্যেক কর্মের সকল ভাবের প্রতি শাস্ত্রের আগ্রহ দেখে জীবন যাপন না করলে দুঃখনিবৃত্তির পথ মেলে না কোনো দিন। তাই জ্ঞান ও বুদ্ধি যখন সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে প্রকৃত মঙ্গল আনে কর্মের অন্তে। মানুষের যশ, মানব ঐশ্বর্যের ভাতি হয়তো বিদ্যুৎবেগে জীবনের আকাশে ছুটাছুটি করেনা কিন্তু যার দৃষ্টি সম্যক তার জীবন রসকে স্নিগ্ধ করবার অবকাশ পায়না সংসারিক ক্লেশতাপের অভিঘাত।

তাই শ্রীকৃষ্ণ তিন প্রকার বুদ্ধির বিবরণ দিলেন। বল্লেন —হে পার্থ। যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তির রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক।*

রাজসিক বুদ্ধি অযথারূপে দেখে ধর্ম ও অধর্মের ভেদাভেদ, কার্য অপকার্যের পার্থক্য।

নিজের সুবিধার জন্য রাজসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অধর্মের কার্যকে ধর্ম ভাবে, এ সত্য আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি সমাজের সকল স্তরে। কর্তব্যকে ভাবে অকর্তব্য এবং নিষিদ্ধ কর্মকে ভাবে কর্তব্য সুবিধাবাদী রাজসিক বুদ্ধি।

আর তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ স্পষ্ট অধর্মকে ধর্মভাবে। ধর্মকে ভাবে অধর্ম। তামসিক বুদ্ধি সর্ববিষয়ে বিপরীত বুদ্ধি। (ক্রমশঃ)

* গীতা—১৮।৩০

আমার যৌবন দিয়ে আরতি হোলো না তব

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অশ্রু-সিক্ত-উদ্বেলিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত আমি
এ ভগ্ন জীবন বহি।
ভরে ওঠে দিনে-দিনে সহস্র বেদনা—কারে কহি!
অনাদি বিরহ কাঁদে অনন্ত তৃষ্ণায় দিবাযামী।

জীবন মৃত্যুর সাথে আলোক ছায়ার খেলা চলিতেছে নিতি,
করুণা মমতা শূন্য হৃদয়ের কূলে কূলে আসে ঢেউ;
প্রণয় শিখাটী জেলে নৈশক্ষণে এলো না তো কেউ
হাসি অশ্রু কোলাহলে এ পৃথিবীতে দুঃখে সুখে
ওঠে কত গীতি!

প্রতিটি নিমেষ ধরি যত কথা জাগে
ঘুমন্ত বাসনা মোর জাগায়ে জাগায়ে—তারা সব
স্বপ্নের তরঙ্গ দলে যায় মিশে। প্রাণের বৈভব
আবর্তে আবর্তে পড়ি বিষাদতরীতে ভুলে আর্ত হয়ে ডাকে।

ঝরতে ঝরতে আর অয়নে অয়নে আমি সকরুণ সুরে
তোমারে আহ্বান করি। বিষাদের ছায়া আসে নেমে,
ভুল কোটে আর ঝরে যায়, সুরগুলি যায় থেমে।
আমার যৌবন দিয়ে আরতি হোলোনা তব—তুমি কতদূরে?

বর্ত্তমান দুনিয়া ও যুদ্ধের অনিবার্য্যতা

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর দুনিয়া আজ সুস্পষ্ট দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে—আমেরিকার নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক শিবির ও রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক বিরোধিতা এত তীব্র ও প্রকট যে আশঙ্কা হয়, হয়ত বা আবার পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে যুদ্ধের কালো ছায়া। আবার সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মরনারীকে ভোগ করতে হবে যুদ্ধের অপরিহার্য্য পরিণামফলিত অশেষ দুঃখ ও ক্লেশ—সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অগ্রগতির উপরে আসবে প্রচণ্ড আঘাত—বৈজ্ঞানিক ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নতির ফলে এমন কি মানুষের অস্তিত্ব ও হয়ত বা হবে বিলুপ্ত। এই দ্বিধাবিভক্ত দুই শিবিরের তীব্র বিরোধিতায় আতঙ্কিত হয়ে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ আজ আওয়াজ তুলেছে শান্তির—জোরদার করে তুলেছে শান্তির আন্দোলন। শান্তিকামী মানুষের মুখপাত্র হিসাবে খ্রীনেহেরু ঘোষণা করেন তাঁর "পঞ্চশীল" নীতি, গোটা পৃথিবীর অভূতপূর্ব অভিনন্দন লাভ করল খ্রীনেহেরুর পঞ্চশীল নীতি। তবু ও মানুষ যুদ্ধের অনিবার্য্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। দুই শিবিরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈপরীত্য (contradictions) যতদিন বজায় থাকবে যুদ্ধের আশঙ্কাও ততদিন দূর হবেনা বলেই মানুষের বিশ্বাস। এর ফলেই আমরা ঠাণ্ডা লড়াই বা অনুরূপ অনেক কথাই শুনতে পাই। এই সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার না করে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতীত ইতিহাসের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, দ্বিধাবিভক্ত বিদ্যমান উপরিউক্ত দুই শিবিরের যুদ্ধের সম্ভাবনার চেয়ে ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের মধ্যেই লড়াইএর সম্ভাবনা অধিকতর অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অবিরোধিতাই রচনা করে নিজ শিবিরেই যুদ্ধের সম্ভাবনা।

একথা ঠিক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ব্ব বর্ণিত পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের অনেকের মনেই এই ধারণার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। তার কারণ ধনতান্ত্রিক শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতার তীব্রতার জন্য। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যে অবিরোধিতা বর্ত্তমান, তার তীব্রতা বিদ্যমান দ্বিধাবিভক্ত দুই শিবিরের তীব্রতার চেয়ে অধিকতর নহে। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নেতা আমেরিকা তার শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে নিজেদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সতর্ক করে দিচ্ছে ও অর্থের প্রভাবান্বিত করছে, যারই অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই—বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের মধ্যে পরস্পর কতকগুলি সাময়িক চুক্তি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আমেরিকা এই শিক্ষা লাভ করেছে যে নিজেদের ভিতর লড়াই করে নিজেদেরই শুধু ক্ষতি সাধন করা হয়না—নিজেরাই শুধু দুর্ব্বল হয়ে পড়েনা—পরন্তু বিপরীত শিবির তাদ্বারা লাভবান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে দেখেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া পৃথিবীর এক মহাদেশকে বিস্তৃত ছিল, যুদ্ধান্তরে তা প্রায় আট গোটা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে।

কাজেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত এসে যায় যে বর্ত্তমান অবস্থা থাকাকালীন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই বিপরীত শিবিরের (opposite camp) মধ্যে। মহামতি লেনিনের বক্তব্যও আমাদের সিদ্ধান্তের আপাত-যৌক্তিকতার সপক্ষে সায় দেয়,—যখন তিনি বলেন "The existence of the Soviet Republic side by side with the Imperialit states for long time is unthinkable. One or the other must triumph in the end etc. (Lenin—Selected works. Vol VIII P.83) অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি অনেকদিন ধরে বেঁচে থাকা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে অচিন্তনীয়। পরিণামে যে কোন একটী প্রাধান্য লাভ করবে। বাস্তবতঃ তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নেতা আমেরিকা আজ পশ্চিম জার্ম্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক প্রভাবে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে যে এই সকল দেশগুলি বিনা প্রতিবাদে নির্দ্বিধায় আমেরিকার নির্দ্দেশ মেনে চলছে। তাছাড়া যে কথা প্রবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ যেহেতু ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতার তীব্রতা ধনতান্ত্রিক শিবিরের নিজেদের অবিরোধিতার তীব্রতার চেয়ে অধিকতর, ধনতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যুদ্ধ অনিবার্য্য। শান্তি আন্দোলন বা অনুরূপ কোন আন্দোলনে তাকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ রাখা গেলেও তার সম্ভাবনা ও অনিবার্য্যতাকে একেবারে রোধ করা যাবে না।

কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও অর্থনীতির সুদৃষ্টি নিয়ে যদি বিষয়টি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে ঘটনা আমাদের কাছে অন্যরূপ প্রতিভাত হবে—অর্থাৎ যুদ্ধের অনিবার্য্যতা ধনতান্ত্রিক শিবিরের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে প্রকটতর, যতটা না রয়েছে বিপরীত শিবিরের সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কথাই ধরা যাক্। ধনতান্ত্রিক দেশ হিসাবে (লক্ষ্যণীয় আমি ফ্রান্সকেও সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলছি না) সস্তা দামে কাঁচা মাল ক্রয় ও উৎপাদনী পণ্য বিক্রয়ের

ওর তাদের বাজারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই "মার্শাল পরিকল্পনা সাহায্যের" আবরণে আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্সের অর্থনীতিকে কবলিত করে তাদের বাজারগুলির কোথাও বা অংশীদার হচ্ছে, আবার কোথাও বা দখল করে নিচ্ছে। ইংরেজ এবং ফরাসী উপনিবেশগুলি থেকে সস্তাদরে কাঁচা মাল কিনে সেইখানেই আবার তাদের উৎপাদনী সংগার বাজার তৈরী করছে। বৃটেন এবং ফ্রান্স অধিক পোষ্টির মুনাফা-গ্রাসে এমনি করে ধীরে ধীরে আমেরিকা। তখনই প্রশ্ন জাগে মনে, ইঙ্গফরাসী অর্থনৈতিক বাজারে মার্কিনী হস্তক্ষেপ কি তারা চিরদিন বরদাস্ত করবে,—মার্কিনী অর্থনীতির কবলমুক্ত হয়ে আবার তারা উচ্চহারে মুনাফা-লাভের চেষ্টা। স্বাভাবিক ভাবে কারণে—যে প্রচেষ্টার অনিবার্য পরিণতি হবে ইঙ্গফরাসী গোষ্টির সঙ্গে মার্কিনী গোষ্টির সংঘাত। তাছাড়া আমরা যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকাই, আমরা ইতিহাসের শিক্ষা থেকে অনুরূপ ছবিই দেখতে পাই। গত যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাপান এবং জার্মানীই ছিল প্রধান, একদা অর্থনৈতিক উৎকর্ষতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই রাষ্ট্রদ্বয় আজকে মার্কিনী অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট। তাদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনৈতিক নীতি এবং এমনকি পররাষ্ট্রনীতি পর্যন্ত আমেরিকার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। দ্বিতীয়যুদ্ধ-পূর্বে এই রাষ্ট্রদ্বয় ছিল ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী, যাদের প্রভাব ছিল ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্ধেক, এবং যাদের প্রভাবে ইঙ্গমার্কিনফরাসী অর্থনীতির ভিত্ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল—শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তারা অধিকতর পরিণামী ব্যবস্থা করে এই রাষ্ট্রদ্বয়ের এবং জার্মানীর অর্থনৈতিক একাধিপত্যের (Economic monopoly) ভয়ে। এই রাষ্ট্রদ্বয় কি আবার চেষ্টা করবে না—তাদের অর্থনীতিকে মার্কিনী প্রভাব মুক্ত করে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবার? চিরদিন আমেরিকার প্রাধান্য না করে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা আবার তারা অবশ্যই করবে—যার অনিবার্য পরিণতি হবে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাত। ইতিহাসের শিক্ষা সেই কথাই স্মরণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর ফরাসীদের মনে এমন বিশ্বাস জন্মেছিল যে জার্মানী চিরতরে পঙ্গুত্ব হয়ে পড়ল। তার কোনরূপ উত্থানেরই—কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক কোন সম্ভাবনাই নাই। জার্মানী আর কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেনা। এমনি করে সেদিনও মনে হয়েছিল ধনতান্ত্রিক শিবির নিজেদের মধ্যে আর কোনরূপ কোন লড়াই হবে না। ধনতান্ত্রিক শিবিরে খকিরোধিতার লড়াইএর পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ প্রমাণ করল। জার্মানী তার পরাজয়ের ১৪।১৫ বছরের মধ্যেই সমস্ত নাগপাশ মুক্ত হয়ে আবার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে দাঁড়াল। ফ্রেমিংয়ের বিদ্রিত জার্মানীর প্রভাবে ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল বিজয়ী ইঙ্গমার্কিণ পরিগোষ্টি। তার (জার্মানীর) অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তারের পরিণতি হিসাবেই জন্ম উঠেছিল দ্বিতীয় যুদ্ধের যাবতীয় প্রথমে ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের মধ্যেই। (প্রসঙ্গক্রমে ইহাও লক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বৃটেন এবং আমেরিকা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অবশ্য তারা যে আশা নিয়ে জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিল তাদের সেই আশা ফলবতী হয় নাই। বরঞ্চ ফল হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইঙ্গমার্কিণ ফরাসী শক্তিবর্গ ভেবেছিল জার্মানীকে ব্যবহার করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সুযোগ সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতিহাসের গতিপ্রবাহ প্রবাহিত হল সম্পূর্ণ অন্যদিকে, জার্মানী প্রথমেই তার সমস্ত শক্তি ও বল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করে প্রয়োগ করল প্রতিযোগী ধনতান্ত্রিক শিবির তথা ইঙ্গমার্কিণ ফরাসীর গোষ্টির বিরুদ্ধেই। অকস্মাৎ বিজয় নেশায় মত্ত হয়ে জার্মানী যখন সেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখনকার কৌতুকাবহ ঘটনা হল যে—সেই ইঙ্গমার্কিণ ফরাসী যারা নাকি জার্মানীকে ব্যবহার করে ছেড়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারাই তখন হাত মেলাল বা হাত মেলাতে বাধ্য হল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে। জার্মানীর বিরুদ্ধে—যুদ্ধ করবার জন্য ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এমনই খকিরোধিতা বর্তমান রয়েছে। এই থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যে লড়াই এবং সেই লড়াই যে তাদের প্রতিযোগী অপর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতার চেয়ে প্রবলতর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের কাছে ইহাই প্রমাণ করেছে যে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের লড়াইএর সম্ভাবনার চেয়ে ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাই অধিকতর, তার আরও একটি কারণ রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ধনতান্ত্রিক শিবিরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে এবং সুনিশ্চিত হতে হবে যে তার সামরিক ও অস্ত্রশস্ত্র শক্তি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের চেয়ে অনেক বেশী এবং নিজের উৎকর্ষতায় সুনিশ্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার পক্ষে বিপরীত শিবিরের বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব, কারণ সেই যুদ্ধের ফল পরাজয়ের উপরে নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অস্তিত্ব বা সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের ভিতর যুদ্ধের ফলাফলের ধনতন্ত্রের বিলুপ্তির প্রশ্ন সূচিত হয় বিশেষ এক গোষ্টির অপর এক প্রতিযোগী গোষ্টির উপর প্রাধান্য। কাজেই আজকে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিপরীতধর্মী দুই শিবিরের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কথা শুনতে পাওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে ও দুনিয়ার অন্যান্য যায়গায় ধনতান্ত্রিক শিবিরে তেলের বাজার বা অন্য সাম্রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে দু একটি অভিব্যক্তি দেখতে পাই তখন স্বভাবতই অতীতের কথা স্মরণ করে মনে প্রশ্ন জাগে—এই অভিব্যক্তিই ধনতান্ত্রিক শিবিরে যুদ্ধানলের সৃষ্টি করবে না ত আবার।

অবশ্য আমার এই বক্তব্য থেকে যদি কেউ মনে করে থাকেন যে ধনতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংঘাতের সম্ভাবনাকে আমি একেবারে অস্বীকার করছি, তাহলে আমার প্রতি সুবিচার করা হবে না। যতদিন ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবির বর্তমান থাকবে

ততদিন সেই সম্ভাবনাও বর্তমান থাকবে। একথা অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করার সমতুল। প্রসঙ্গতঃ মহামতি লেনিনের বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন,—"We must remember that we are surrounded by people, clasess & Governments who openly express their intense hatred for us. We must remember that we are at all times but a hairs breadth, from every manner of invasion" Lenin—Collection works. Russian edition, Vol. XXVII, P. 117) অর্থাৎ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে আমাদের চতুর্দিকে এমন সব লোক ও সরকার রয়েছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ভাবে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। আরও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমাদের উপরে যে-কোনও সময়ে আক্রমণ আসতে পারে।" কাজেই বিংশশতাব্দীর দুই শিবিরের যুদ্ধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার না করে এবং সেই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়ার সাধারণ শান্তিকামী মানুষের শান্তি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেই, ইতিহাসের শিক্ষা থেকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে বর্তমানের শিবিরে বিভেদের ভিতরে লড়াইএর সম্ভাবনাই অধিকতর এবং তার কারণ আমি পূর্বেই [মহামতি ষ্টালিনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে] বর্ণনা করেছি। তাই আজকে শান্তি আন্দোলনকারীদের সেই বিষয়েও অবহিত ও সচেতন হতে হবে। আজকে যুদ্ধের অনিবার্যতা একেবারে রোধ করে ফলে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তাহল বর্তমানের চরম পরিণতি, সে সাম্রাজ্যবাদিতার উচ্ছেদ সাধন। ষ্টালিনের ভাষায়,—"To eliminate the inevitability of war, it is necessary to abolish imperialism. (J. Stalin—Economic Problems of socialism in the U. S. S. R. P. 41). বর্তমান শান্তি আন্দোলন সাময়িকভাবে যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে নিঃসন্দেহ—যেমন নিশ্চয়ও অন্যান্য যায়গায় এবং সেই দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করতে হলে আজকে শান্তির আন্দোলনকে রূপায়িত করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের আন্দোলনে—তবেই হবে পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধ-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। বেদের তিন কাণ্ড—কর্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। শেষ কাণ্ড উপনিষদ্, তাহাই বেদান্ত। উপনিষদেই বেদের শেষ-সিদ্ধান্ত বা সারকথা নিহিত আছে। এই অর্থেও উপনিষদ্ বেদান্ত।

উপনিষদের সংখ্যা বহু। সকল উপনিষদেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সু সম্বদ্ধ দর্শনের আকারে বিবৃত হয় নাই। বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্ম-তত্ত্বের মধ্যে সর্বত্র সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যও প্রতীত হয় না। মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদ্‌গুলির মর্ম সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া বিভিন্ন দর্শনের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। বাদরায়ণের সূত্রের নাম ব্রহ্ম-সূত্র। "ব্রহ্ম-সূত্র্যতে (সূচ্যতে) এভিঃ ইতি ব্রহ্ম সূত্রাণি (শঙ্কর)। ইহাদের দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হন বলিয়া ইহাদিগকে ব্রহ্মসূত্র বলে। ব্রহ্মসূত্রসমূহের সংখ্যা কোন মতে ৫৫৫, কোন কোনও মতে ৫৫৮। সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল—এই চারি অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্র বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া "পাদ" আছে। প্রত্যেক পাদে একাধিক অধিকরণ আছে।

ব্রহ্ম-সূত্রের বহু ভাষ্য ও টীকা আছে। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে বহুশাখায় উদ্ভব হইয়াছে। বহু-ভাষ্য-সমন্বিত বেদান্ত সূত্রই বহুশাখা-সমন্বিত বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি।

বেদান্ত সূত্রের এক নাম শারীক-সূত্র, শরীরে অধিষ্ঠিত জীব বা শরীরে অনুভূত সুখ ও দুঃখের নাম শারীরক। তৎসম্বন্ধীয় সূত্রসমূহ শারীরিক সূত্র। যে সকল সূত্রে জীবের অধিষ্ঠান শরীরের প্রকৃতি বা শরীরে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-বিষয়ক আলোচনা আছে, তাহার নাম শারীরক মীমাংসা সূত্র।

জৈমিনির কর্ম মীমাংসায় বেদোক্ত কর্মের ও তাহার অনুষ্ঠান হইতে যে ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বেদের প্রথম কাণ্ড ইহার বিষয় বলিয়া জৈমিনির দর্শনের নাম পূর্ব-মীমাংসা। বেদের শেষ বা উত্তর কাণ্ড বাদরায়ণের দর্শনের বিষয় বলিয়া তাহার নাম উত্তর-মীমাংসা। চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রমে অবলম্বনীয় বলিয়াও উত্তর মীমাংসা নাম অন্বর্থ।

বেদান্ত-সূত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনের আকারে রচিত হয় নাই। উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যাই তাহার উদ্দেশ্য। দৃষ্টীয় ধর্মব্যাখ্যাতাগণের (Dogmatists) সহিত মিউ টেরোমেন্টের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মসূত্রের সহিত উপনিষদের সম্বন্ধও সেইরূপ। ইহাতে ঈশ্বর ও জগৎ এবং জীবাত্মার সংসার-ভ্রমণ ও মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদিগকে সু-সংবদ্ধ করা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এই মত প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অধিকাংশ সূত্রেই দুইটি বা তিনটির অধিক পদ নাই। তাহাদের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর। ইহার ফলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং বিভিন্ন দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার উপর

সপ্তম ঔপনিষদ-বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মোটের উপর বিভিন্ন বিভিন্ন মতের ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

রচনাকাল

ব্রহ্মসূত্র মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে। (১৩শ) ব্রহ্মসূত্রেও "গীতায়ে" (স্মৃতিতে উক্ত আছে। বলিয়া গীতার উল্লেখ আছে। উহার দ্বারা এতদুভয়ের নির্দিষ্ট সময়—অসম্ভব নহে। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে বৈষ্ণব বৌদ্ধ মতেরও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ ইহাকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পরবর্তী বলেন। ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নাম একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। জৈমিনিও পূর্ব মীমাংসার বহুস্থলে—কোনস্থলে পূর্বপক্ষরূপে কোনও স্থলে বা মতের সমর্থকরূপে বাদরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। প্রাচীন ভারতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাদ প্রতিবাদ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। ইহা হইতে ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ এবং জৈমিনি গুরু বেদব্যাস একব্যক্তি কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ব্রহ্মসূত্রেই সূত্রকারের মত-সমর্থনে বাদরায়ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেও বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা কিনা তাহাতেই সন্দেহ হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে এ প্রশ্ন বিরল ছিল না, ইহাও কেহ বলিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রে সাংখ্য ও বৈশেষিক মতের উল্লেখ আছে। গরুড় পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং মনুসংহিতায় বেদান্ত সূত্রের উল্লেখ আছে। হরিবংশেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতেরা খৃঃ পূঃ ৪০০ হইতে ২০০ মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মতে বেদান্তসূত্র গীতার পূর্ববর্তী। পরাশরের সূত্র বলিয়া বেদব্যাসের নাম পাওয়া যায়। পাণিনি "ভিক্ষু-সূত্রের রচয়িতা বলিয়া এক পারাশর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই ভিক্ষুসূত্র ও বেদান্ত-সূত্র অভিন্ন। রাজেন্দ্রলাল বলেন, ইহার উপর নির্ভর করা গেলে বেদান্তসূত্রকে পাণিনির পূর্ববর্তী বলিতে হয়।

অন্যান্য দর্শনের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধ

ব্রহ্মসূত্রে ন্যায় দর্শনের উল্লেখ নাই। কিন্তু বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ পূর্ব-মীমাংসা, অনেকগুলি বৌদ্ধ দর্শন, লোকায়ত দর্শন এবং ভাগবত মতের সমালোচনা আছে। রামানুজ বলেন পূর্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা এক সময়ে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শঙ্কর ইহা স্বীকার না করিলেও উভয় দর্শনই বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বেদের ব্যাখ্যা উভয়েরই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে, যে উহারা এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধ মত, লোকায়ত মত এবং ভাগবত মত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগমতের বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকিলেও, তাহাদের কতকগুলি মত বেদান্তসূত্রে গৃহীত হইয়াছে। ভাগবত মতের সমালোচনা থাকিলেও গীতা ও ভাগবত মতের বিশিষ্ট প্রভাব ব্রহ্মসূত্রের উপর দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য ও টীকা

ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেও যে বেদান্ত দর্শন প্রচারিত হইয়াছিল এবং বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে আশ্মরথ্য, ঔডুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকার ছিলেন বোধায়ন। আচার্য্য রামানুজ বোধায়নের ভাষ্যই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বোধায়নের ভাষ্যই বেদান্তের সর্ব্বপূর্ব্ব ভাষ্য ছিল। কিন্তু বোধায়নের ভাষ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বোধায়নের পূর্ব্বে উপবর্ষ নামে এক বৃত্তিকারের নাম পাওয়া যায়। শঙ্কর তাঁহার উল্লেখ আছে। পাণিনির গুরু উপবর্ষ এবং বৃত্তিকার উপবর্ষ এক ব্যক্তি কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে (৭৮০) গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের তাঁহার মাণ্ডুক্যকারিকায় উক্ত উপনিষদের অদ্বৈত মতে ব্যাখ্যা করেন। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ, গোবিন্দের শিষ্য শঙ্কর (৭৮৮-৮২০)। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য। শঙ্কর ভাষ্যরূপ মূল হইতে বহুসংখ্যক টীকা গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছে। শঙ্করের শিষ্য আনন্দগিরি "ন্যায় নির্ণয়" এবং গোবিন্দানন্দ "রত্নপ্রভা" এবং বাচস্পতি মিশ্র (৮৫০ খৃঃ অঃ) "ভামতী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ "কল্পতরু" নামে টীকা, এবং অপ্পয় দীক্ষিত (১৫৫০) "কল্পতরু-পরিমল" নামে কল্পতরুর টীকা রচনা করেন। পদ্মপাদ (সনন্দন) রচিত পঞ্চপাদিকার ব্রহ্মসূত্রের কেবল প্রথম চারিসূত্রের টীকা আছে। প্রসিদ্ধ মীমাংসক মণ্ডন মিশ্র শঙ্কর কর্তৃক তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইবার পরে তাঁহার শিষ্য এবং সুরেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া শঙ্করের অনুমতি অনুসারে শঙ্কর ভাষ্যের এক বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। কিন্তু শঙ্করের অন্যান্য শিষ্যগণ বলেন যে তিনি যখন মীমাংসক ছিলেন তখন তিনি শঙ্করভাষ্যের—টীকা রচনার অধিকারী নহেন। ইহার পরে সুরেশ্বর "নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পদ্মপাদ এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন, কিন্তু এই টীকা দুর্ভাগ্যে অসম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থ শঙ্কর পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতি হইতে তাহার উদ্ধার করেন, এবং পদ্মপাদ তাহা আবার লেখেন। প্রকাশাত্মন্ (১২০০) পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার "পঞ্চপাদিকা বিবরণ" নামে টীকা রচনা করেন। অমলানন্দ এবং বল্লিবিদ্যা-গ্রন্থ মুনি এই শেষোক্ত গ্রন্থের "তত্ত্বদীপন" এবং "বিবরণ ভাব প্রকাশিকা" নামক দুইখানি টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ এবং বিদ্যারণ্য ও পঞ্চপাদিকার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম "পঞ্চপাদিকা-দর্পণ" ও "পঞ্চপাদিকা-টীকা" বিদ্যারণ্যের (১৩৩০) "বিবরণ গ্রন্থের সংগ্রহ গ্রন্থে "পঞ্চপাদিকা বিবরণের" ব্যাখ্যা আছে। বেদান্তের মুক্তি সম্বন্ধে বিদ্যারণ্যের "জীবন মুক্তি বিবেক' গ্রন্থ বিখ্যাত।

বিদ্যারণ্যের "পঞ্চদশী" বেদান্ত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সুরেশ্বরের "নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি" ও বিখ্যাত গ্রন্থ। সর্বজ্ঞাত্ম মুনির (১০০ খৃঃ) "সংক্ষেপ-

শারীরক", এবং শ্রীহর্ষের (১১৯০) "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য", চিৎসুখের "তত্ত্বদীপিকা", প্রত্যক্‌স্বরূপের "নয়ন প্রসাদিনী" ও অপরিচিত গ্রন্থ। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রণীত (১৪৪০) "বেদান্ত পরিভাষা" বেদান্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাহার ছাত্র রামকৃষ্ণ এবং অমলানন্দ নামে এক পণ্ডিত "শিখামণি" ও "মণিপ্রভা" নামে বেদান্ত পরিভাষার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতীর "অদ্বৈত সিদ্ধি" বেদান্ত সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। "গৌড় ব্রহ্মানন্দী" "বিচিত্রদেবোপাধ্যায়ী" এবং "সিদ্ধিব্যাখ্যা" নামে ইহার তিনখানি টীকা আছে। "অদ্বৈত সিদ্ধি সিদ্ধান্ত সার" নামে ইহার এক সংক্ষিপ্ত সার লিখিয়াছিলেন সদানন্দ ব্যাস। সদানন্দের "বেদান্তসারের" "সুবোধিনী" এবং "বিদ্বান্ মনোরঞ্জিনী" নামে দুইখানা টীকা আছে। সদানন্দ যতির "অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি" ও একখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ। আনন্দ বোধ ভট্টারকের "ন্যায়-মকরন্দ" মায়াবাদ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকাশানন্দের "বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে" চিত্তের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ, সৃষ্টি সৃষ্টিবাদ প্রভৃতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপ্পয় দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তলেশ" এবং নরসিংহাশ্রমের "ভেদাধিকার" এবং "বেদান্ত তত্ত্ব দীপিকা" এবং "সিদ্ধান্ত তত্ত্ব" নামে অল্প দুইখানি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। আরও বহু গ্রন্থ বেদান্ত সম্বন্ধে আছে।

ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষিপ্ত সার

ব্রহ্ম-সূত্রে চারি অধ্যায় ও ষোলপাদে বিভক্ত। প্রত্যেকেই আছে. (১।১।১) "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" অথ অর্থাৎ ইহার পরে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। কিসের পরে? শঙ্কর বলেন নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহ ও অমুত্র ফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতিতিতিক্ষা, সমাধান (মনের স্থৈর্য) ও শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে বিশ্বাস), এই সকল লাভ ও মুমুক্ষুর অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা এই সকল হইলে তাহার পরে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। রামানুজ বলেন—বেদপাঠ ও পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের আলোচনা শেষ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাই প্রথমপাদের প্রথম সূত্র। দ্বিতীয় সূত্রে আছে—যাহা হইতে জগৎ-স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তৃতীয় সূত্রে আছে—ব্রহ্ম-তত্ত্ব শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। তাহার অন্য উপায় নাই। শাস্ত্রেই আছে ব্রহ্ম ভূতগণের জন্ম স্থিতি ও লয়ের কারণ। চতুর্থ সূত্র আছে "তৎসমন্বয়াৎ" —ব্রহ্মই সকল বেদান্তে প্রতিপাদিত। বেদান্ত বাক্য সকলের তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ।

এই চারিসূত্রের ভূরি ভূরি ব্যাখ্যা ভাষ্য ও টীকাকারগণ দিয়াছেন। এই চারিসূত্রকে চতুঃসূত্রী বলে। পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার কেবল চতুঃসূত্রীরই টীকা আছে।

পঞ্চম সূত্র হইতে পাদ শেষ পর্য্যন্ত (১।১।৩২) ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, এই মতের বিরুদ্ধ যুক্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমত উপনিষদের "সৎ" সাংখ্যের প্রধান নহেন; প্রধান অচেতন, কিন্তু বেদের "সৎ" "ঐক্ষত" (অর্থাৎ আলোচনা করিলেন) সুতরাং চেতন। শ্রুতিতে বহুস্থলে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। (আনন্দময় = প্রচুর আনন্দের আধার) উপনিষদে ব্রহ্মকে বুঝাইতে "আকাশ" প্রাণ ও জ্যোতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদের তর্কগুলি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তৃতীয়পাদের প্রথমে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকে যে সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই।" ব্রহ্মই তাহাদের লক্ষ্য ইহা বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে যে "ঈক্ষতে"র কথা বলা হইয়াছে। তাহাও ব্রহ্মবাচক ইহা বলা হইয়াছে। তাহার পরে বেদতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কিনা তাহার বিচার করিয়া বেদতাদিগের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। পরে পুত্রের বেদপাঠে অধিকার নাই বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাতেও অধিকার নাই বলা হইয়াছে।

চতুর্থ পাদের প্রথমে বলা হইয়াছে যে কঠোপনিষদে সাংখ্যের প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয় নাই। উক্ত উপনিষদের ১।৩।১১ শ্লোকে যে অব্যক্তের কথা আছে (মহতঃ পরং অব্যক্তং) তাহার অর্থ শরীর, শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থা। উক্ত উপনিষদের "মহৎ" শব্দের অর্থ বুদ্ধি নহে। "অজাম্ একাং ইত্যাদি শ্লোকে (শ্বেতাশ্বতর উপ) প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর রূপ। পরমেশ্বরের যে শক্তি হইতে এই তিন সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাই অজা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাহাকে "পঞ্চ পঞ্চজন" প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই "পঞ্চপঞ্চজন" সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাবিধ, তাহাদিগকে পাঁচটি করিয়া একত্রিত করিবার কারণ নাই। আবার উপনিষদে তত্ত্ব সংখ্যা ২৭টি, কেননা আকাশ ও আত্মা উপরিউক্ত পঞ্চ পঞ্চজনের অতিরিক্ত "সমাকর্ষাৎ" (১।৪।১৫) সূত্রে তৈত্তীয় উপনিষদের "অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ এই শ্লোক লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই বাক্যে অসৎকেই আদি কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও আছে "তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব এবং তৎ সত্যং ইতি আচক্ষতে তাহাকে সত্য বলা হয়। উক্ত শ্লোকে ব্রহ্মকে অসৎ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ তখন তিনি নাম-রূপ ধারণ করিয়া জগৎ গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অবিরোধ) বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তির খণ্ডন এবং বিরুদ্ধ মত সকলের সমালোচনা যাহাতে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধ এবং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাহাতে লয়ের বর্ণনা আছে। আত্মার স্বরূপ ও তাহার ধর্ম, এবং দেহের সহিত কৃত কর্ম্মের-সহিত এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের বর্ণনাও আছে।

প্রথম পাদের প্রথমে সাংখ্য ও যোগমতের খণ্ডন করা হইয়াছে সাংখ্য ও যোগ স্মৃতি হইলেও মনু ও ব্যাস প্রণীত স্মৃতির সহিত তাহাদের বিরোধ আছে। সাংখ্য প্রধান ব্যতীত অন্য যে সকল তত্ত্বের

উল্লেখ আছে, তাহাদের অনেকগুলি উল্লেখ রেখে নাই। সুতরাং সাংখ্য মত গ্রহণীয় নহে।

ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন, উভয়ের স্বভাব ভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। এ আপত্তির মূল্য নাই, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশলোমাদির উদ্ভব দেখা যায়।

জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যদি হয়, তবে প্রলয়ে ব্রহ্মে বিলীন হইবে এবং এই বিলয়ে জগতের দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হইবে, এই আপত্তি মূল্য হীন। ঘটের যখন ভাঙ্গে হয়, তখন ঘটের গুণ (বা দোষ) উপাদান মাটিতে সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না। (২।১।৯)

তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। তাহার প্রয়োজন থাকিলেও, তাহার যোগ নিরস্ত হয় না। প্রকৃত সত্তা কেবল বেদ হইতেই জানা যায়। (২।১।১১)

উপনিষদে আছে যাহাকে মৃত্তিকার বিকার বলা যায়, তাহা 'বাচারম্ভণ' মাত্র—নাম মাত্র, মৃত্তিকা হইতে তাহার পৃথক সত্তা নাই, তেমনি জগৎও নামমাত্র, ব্রহ্ম হইতে তাহার পৃথক সত্তা নাই। শ্রুতিতে যে আছে, জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহার অর্থ জগৎ তখন নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হয় নাই, এইমাত্র, যাহা কার্য্য তাহা কারণের মধ্যে পূর্ব্বেই থাকে। সুতরাং কার্য্য জগৎ কারণ ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত ছিল।

শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক।

জগৎ সৃষ্টিতে কোনও উপকরণ পূর্ব্বে হইতে ছিল না। দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়, ব্রহ্মও তেমনি জগতে পরিণত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম যদি জগৎরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তবে সমস্ত ব্রহ্ম অথবা তাহার অংশই এইরূপ হইয়াছেন? সমস্ত ব্রহ্ম যদি জগতে পরিণত হইয়া থাকেন, (কৃৎস্ন প্রসক্তি) তাহা হইলে এখন আর ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই। যদি অংশমাত্র জগতে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম যে নিরবয়ব, বেদের এই কথার সহিত বিরোধ (নিরবয়বত্ব শব্দ কোপঃ) হয়। ইহার উত্তর এই যে শ্রুতিতে আছে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও, নির্বিকারই আছেন। সুতরাং উপরিউক্ত আপত্তি মূলাহীন। স্বপ্নকালে শিল্পের মধ্যে বিচিত্র রথ আদির সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহাতে আত্মার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না। জগৎ সৃষ্টিও সেইরূপ।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিযুক্ত এই বেদশ্রুতিতে আছে। তাঁহার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও সকল ইন্দ্রিয়শক্তি তাঁহার আছে। জগৎ সৃষ্টিতে তাঁহার কোনও প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। তিনি আপ্তকাম। সৃষ্টি তাঁহার লীলা। "লোকবৎ লীলা কৈবল্যম্।" (২।১।৩৩) তাঁহাতে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা নাই। জীব নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি। প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছু ছিল না। সুতরাং কর্ম্মের কর্ত্তৃকাল ভোগ অনাদি।

এক পথ

শান্তশীল দাশ

আর কোন পথ নেই :
আর পথ খুঁজে পাই নাকো—
ভালবাস, সকলেরে ডাকো।
সবাই আসুক কাছে, সকলের কাছে ছুটে যাও :
দ্বার খোলো, দ্বার ভেঙে দাও।
দ্বার-খোলো, দ্বার-ভাঙা ঘরের ভেতর
আসুক মানুষ সব : শুনোনাকো কে আপন পর।
ওপারের লোকজন এপারেতে এসে
এপারের মানুষকে ডেকে নিয়ে যাক্ ভালবেসে।
এপার ওপার হোক ;
ওপার সে হোক না এপার :
এ পার ওপার মিলে হয়ে যাক সব একাকার।

বসন্ত

শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দেবী, ভারতী

বসন্ত জাগে যদি মনে
মানস নিকুঞ্জে ওঠে বিহগ কূজন,
কুসুমে কুসুমে ভ্রমি গুঞ্জরে ভ্রমর
সাথে সাথে শোভে
নব রুচি কিশলয়,
বনের বসন্ত তখন দূরে সে কি রয়?
শুধু অকারণ পুলকে পরাণ
বেজে ওঠে সুরে সুরে
বনের বসন্ত আর রহনা দূরে।
পরাণে দক্ষিণ বায়ু আপনি বহিয়া যায়
উতলা করিয়া হিয়া দোলা দিয়া ধীরে,
বসন্ত এসেছে বলি, চলে কত কানাকানি,
ভুবন ভরিয়া সাড়া পড়ে বনে বনে—
বসন্ত জাগে যদি মনে।

গল্প

বিশ্বনিন্দুক

দেবাচার্য

গণেশ বটব্যাল ও ব্রাউনিং

[যাঁরা কবি ব্রাউনিংএর "এক সঙ্গে শেষবারের মতো ঘোড়ায় চড়া" (Last Ride together) পড়েন নি তাঁদের জন্যে নোট : একটি ছেলেকে একটি মেয়ে প্রত্যাখ্যান করে। ছেলেটি বললে, একটা অনুরোধ, শেষবারের মতো চলো—তোমাতে আমাতে এখনকে ঘোড়ায় চেপে বেড়িয়ে আসি। মেয়েটি রাজী হ'ল এবং মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে মেয়েটির মাথা এলিয়ে পড়েছিল ছেলেটির বুকে—সম্পাদকের পক্ষে নোঃ]

বিশ্ব-নিন্দুক গণেশ বটব্যাল বলেন :…

দাঁড়ান, ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি। স্থান, গ্যারেজ দিয়ে ঢুকে মাঝারী সাইজের একটি ঘর।—বৈঠকখানা, আড্ডাখানা, সম্পাদকের দপ্তরখানা। —অন্ কম্বাইন্ড। একটা টেবিল ; দুটো চেয়ার। একটা খাটও আছে। ইচ্ছে ক'রলে কাৎ হওয়াও যায়। জানালা খুললে লোনাধরা একটি বা দুটি একতালা বাড়ীর ফাঁক দিয়ে আকাশ নজরে পড়ে।

জনা দশেক আড্ডাধারী নিয়মিত আসেন। আড্ডা জমে রবিবারে। সকাল ৮৷৷০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। আড্ডাটার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। এখানকার মধ্যমণি যিনি, তিনি আবার যমরাজ ও বাংলার পল্লীপ্রীতির ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছেন, স্বয়ং যমদেব এসে নাকি একদিন রাত্রিবেলায় স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলছেন, ধন্যবাদ, তোমাকে ও তোমার পার্শ্বচরদের মৃত্যুভয় থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি দিলাম।

এত সহজে অমরত্ব পাওয়া যাবে যেখানে, সেখানকার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যাবে, সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

যাই হোক, গণেশবাবু—নাকটা ঠিক দেবতার মতো না হলেও পরিপাকযন্ত্রের বিশালত্বে তিনি দর্শনযোগ্য পুরুষ। বয়েস পঞ্চাশ। রং—না কালো, না ফর্সা।—চুল এখনও মিশমিশে কালো, দাঁত একটাও পড়ে নি, চামড়া এখনও ঝোলে নি, তবে মুখে আসল বসন্তের দাগ।…

গণেশবাবু বলেন :

…শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রধান রোগ, চিন্তাশক্তির দুর্বলতা। তাই আমাদের দেশে পাড়ায় পাড়ায় অবতার ও মহাপুরুষ।…

আরে ছি ছি…আজকাল বাঙ্গালারা কোনো মহৎ সাহিত্যই সৃষ্টি ক'রছে না।—কেবল অন্ধ অনুকরণ!… আঙ্গিকের দোহাই দিয়ে যত রাবিশ চালিয়ে দিচ্ছে।… পয়সার জোর আছে এমন সব সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের সম্পাদককে…ছানার জিলিপি খাওয়াও…হলাহুলা ডান্স দেখাও, ফিরপো চাংওয়ায়—নিতান্তপক্ষে কফি-হাউসে নিয়ে যাও—রেগুলারলি কল্ থ্রি মান্থস্—মেখে নিও, তুমিও বছর তিন চারেকের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বনে গিয়েছ। তোমারও জন্মদিনে অভিনন্দন দেওয়া হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্কলন বের হচ্ছে।

—না না, কি যে বলেন। আমি প্রতিবাদ জানাই ক্ষীণস্বরে।

—কি বল্লেন, না না—আচ্ছা, কাম্ টু আরগুমেণ্ট। আমি প্রমাণ করে দেব, আমি যা বলেছি তার মধ্যে কোথাও অতিশয়োক্তি নেই।…আচ্ছা…বলুন সাহিত্য বোঝেন ?…এঃ, শেষে লরেন্সের নাম ক'রলেন—আপনি দেখছি সমালোচনায় রামখোকা—

আমি উত্তেজিতভাবে লরেন্সের গুণাবলী বর্ণনা করি ; গণেশবাবু ধীরভাবে শোনেন, তারপর বলেন—আপনি কিচ্ছু জানেন না, লরেন্স ছিলেন কনসামটিভ, মরেছেনও বোধ হয় যক্ষ্মায়, তাই যতটা তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল—মানে সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না, তাই লেডী চ্যাটারলীকে দিয়ে

মেন্টাল স্কাউন্ড্রেলক্যাশন মিটিয়েছেন। একটা জমিদারীর বৃদ্ধি আর স্যাহাবান লোক ছুঁতো না?···

আমরা সবাই হাঁ করে শুনি।

আমি ভদ্রলোকের রসনার প্রখরতায় একটু ভয় পেয়ে এবার নাম ক'রলাম—আচ্ছা ধরুন, ব্রাউনিং—তাঁকে তো উঁচু দরের সাহিত্যিক মানেন?

—ব্রাউনিং! ইংরেজরা অবশ্য ব্রাউনিং ব্রাউনিং করে চেঁচায়, আর এখানকার কালো চামড়ার প্রফেসরেরা নোট লেখেন—হাউ ওয়ানডারফুল। কিন্তু, বিচার করে দেখলে বলতেই হবে ব্রাউনিংএর সাহিত্যের অমরত্ব নেই। বড়জোর আর পঞ্চাশ বছর। তারপরে তাঁর জনপ্রিয়তা কমবেই। এক সেঞ্চুরী পরে মাইনর পোয়েটদের দলে যাবে না, কে বলতে পারে?

আমরা সবাই হাহা করে উঠি।

—হা হা ক'রলেই কি মহাকাল শুনবে?

—কেন, ব্রাউনিংএর কি দোষ?

—কেন, কি দোষ!—এখনও তা বুঝতে পারেন নি! বুঝবেন কি করে! আপনারা তো ঐ নোট-মেকারদের উচ্ছিষ্ট পড়ে মানুষ। পড়েছেন "লাস্ট রাইড টুগেথার?"

আমি সরবে বলি—পড়েছি কি মশায়, ক্লাশে পড়াই। ওটা যে বি-এর পাঠ্য এবার।

—তবেই হয়েছে। ওসব লাস্ট রাইডের অসঙ্গতি বোঝবার বুদ্ধি যদি থাকতো আপনার, তাহলে মাস্টারি ক'রতেন না! কি বুঝেছেন বলুন—ঐ লাস্ট রাইড টুগেদারে কি এমন চিরন্তন সত্য আছে, আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

···আমি অধ্যাপকের বাগ্মিতায় বল্লাম অনেক কিছু। ব্রাউনিং, বিনিহন, মর্লে, মিণ্টো, এডমণ্ড গসে, ফ্রেক ফলে, হেনরী জেম্‌স, ভারজিনিয়া উলফ—এমন কি রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনলাম। যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করে প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রলাম—পৃথিবীর সাহিত্যে এটি ক'ল একটি অনবদ্য নৈবেদ্য। কী পোয়েটিক ইমাজিনেশন্!—ওয়েস্টার্ন স্লাইড···বিলোই বুলস্ড···কী স্ট্রাচুরাল্ ডেস্ক্রিপশন্—হতাশার মাঝে ভরসা—বিলভার লাইনিংএ—বেনেডিক্শন্ অব দি কেডিং সান্—অর্থাৎ অস্তগামীন সূর্যের আলো, উদয়াচলের সুধাংশু কিরণ—আর···আর···সন্ধ্যাতারার হাতছানি···তাছাড়া, কী সাইকলজিক্যাল্ এ্যাপ্রিসিয়েশন্! —মানে, স্ল্যাম্পড্, স্ক্রোল্!—নতুন লেখকের প্রেমের কবিতা ভালভাবে না পড়ে যেমন সম্পাদকেরা দলিয়ে মুচড়িয়ে হাতের মুঠোয় চিপে, তারপর, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেন—হঠাৎ আসেন কবি, কণ্ঠে তার অনুনয়—সম্পাদকের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুবিচার সম্বন্ধে এমন অসীম উৎসাহ প্রকাশ করে বসেন, যে সম্পাদক আবার সেই ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে কাগজটা (কবির অলক্ষে) কুড়িয়ে নেন,—ইতস্ততঃ করেন—পিটি ও প্রাইডের মাঝখানে হেসিটেশন্—যেমন সেই মেয়েটি ব্রাউনিংএর হতাশ-প্রেমিকের লাস্ট অনুরোধ মেনে নিয়েছিল—সম্পাদক ছেপে দেন একটি কবিতা—প্রথম ও শেষ বারের জন্যে। হাউ ফরচুনেটলি রীজনেবল!

হাউ পোয়েটিক্যালি সুইট! সন্ধ্যে হয়ে আসছে, তাও শেষে রাজী হল মানিনী, বল্লে—বেশ, যাব আমি তোমার সঙ্গে। শুধু কি তাই, ঝুঁকে পড়লো মেয়েটি, মুহূর্তের জন্যে মাথাটি ছুইয়ে দিলো ছেলেটির বুকে! এ গ্লোরিয়াস পিস্ অব একস্টাটিক্ পোয়েট্রী—মহীয়সী কবিতা একেই বলে—এ মোমেণ্ট মেড্ এ্যান্ ইটারনিটী! ক্ষণ-মুহূর্ত অনন্ত আনন্দের আশীর্বাদ পেলো!

তা ছাড়া দেখুন, এই কবিতার কাহিনীটা ফিল্ম হবার যোগ্যও বটে। মোড়ায় বসেছে প্রেমিক। সামনেই বসেছে মেয়েটি। জোড়াভুরু। টানা টানা চোখ। কাঁকুনিতে কাঁকুনিতে এলিয়ে পড়েছে শিথিল কবরী। আর—

—কবরী কি করে হবে? মেম্ যে।—পতিতপাবনবাবু হঠাৎ অত্যন্ত বেরসিকভাবে বাধা দিলেন।

বক্তৃতায় বাধা পড়লে আমি—আমি কেন, সকল প্রফেসরেরাই তো-তো করেন। গণেশ ঘটব্যাল পকেট থেকে কৌটো বের ক'রলেন—আর একটা পান, একটু দোক্তা ও জর্দা মুখে পুরে বল্লেন—

—ঠিক আছে, আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। যদিও প্রফেসরি করি না, করি কণ্ট্রাক্টরি—তাহলেও এককালে ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম—ব্রাউনিং আমার পড়া আছে।

কুমারেশবাবু টিপ্পনি করেন—গণেশদা এম-এ, বি-এল। ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট ছিলেন—ইংলিশে ফার্স্ট ক্লাশ।

আমি এইবার একটু অপ্রতিভ হই।

গণেশবাবু উদাসীনভাবে আমার দিকে তাকান—দোষ নেবেন না প্রফেসর চক্রবর্তী—আপনি পণ্ডিত লোক, তবে আসল বসন্তের জ্বালা কি, তা বোধ হয় আপনি জানেন না। মুখে তো দাগ দেখছি না।

আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকি।

—আপনাদের ব্রাউনিং কবি ছিলেন, তা অস্বীকার করা বাতুলতা। কিন্তু তার সাইকলজিক্যাল্ ইনসাইট্ ছিল না, থাকলেও গভীরতম স্থলে যে সব লুকোনো রহস্য আছে, তার সন্ধান তিনি পেয়েছেন বলে তো মনে হয়না।

—কেন, কেন?

—আরে মশায়, তাহলে কি এমন গাঁজাখুরী কবিতা লিখতেন, আর ভাবতেন মোমেণ্টকে ইটারনিটি করেছেন! সেই স্বীকৃতি দেবে বিংশ শতাব্দীর যুবক যুবতী? শুধু ইংলণ্ডের জন্যে অথবা নাইন্‌টিন্‌থ সেন্‌চুরীর জন্যে কবিতা লিখলে তো চলবে না। ইউনিভারস্যালিটি—যাকে বলে বিশ্বজনীনতা দাবী করতে হ'লে সকল দেশ ও সকল শতাব্দীর জন্যে লেখা দরকার।

—বুঝলাম না কথাটা।

—বুঝলেন না, আর কবে বুঝবেন। ও সব ভিক্টোরীয় যুগের উচ্ছ্বাস। প্রথমতঃ, যে মেয়েটি ছেলেটিকে প্রত্যাখ্যান ক'রল, সে কখনই এক ঘোড়ায় চেপে যেতে রাজী হবে না। সুতরাং টুগেদারের অর্থ অস্পষ্ট। ধরে নিলুম, আর একটা ঘোড়াও ছিল। পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়াতেও আনন্দ থাকতে পারে। মানলুম, কিন্তু ভুলে যাবেন না, সময়টা ছিল সন্ধ্যেবেলা—সন্ধ্যেবেলায় কোনো মেয়েই শুধু কাব্যের প্রয়োজনে বের হতে রাজী হবে না।

—কেন?

—কারণ আছে বৈ কি। কারণ সন্ধ্যেবেলায় আর একজন হয়তো এসে ফিরে যাবে। নতুন পাখী হাতে না পেলে, কোন মেয়েই বলুন, পুরনো পাখীকে উড়িয়ে দিয়েছে? সেক্‌লি ধরে নিতে পারেন, দুই নম্বর ইতিমধ্যে মেয়েটির সান্ধ্য-সাহচর্যের আকর্ষণে আসা যাওয়া শুরু করেছে। বুঝুন, তলিয়ে বুঝুন। এতদিন উৎসাহ দিয়ে হঠাৎ বেঁকে বসবার কি কারণ থাকতে পারে? কোনো কারণই যখন কবি দেননি, তখন আমাদের সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিতে হবে সবটা।

—এ্যাঃ, এসব কথা কি বলছেন আপনি! আমরা তো এসব ভাবি নি।

—ছেলে পড়ান, খাতা দেখেন, শুনতে পাই আজকাল আবার তিন শিফটেও কাজ করেন অনেকে—ভাববার সময় কোথায় আপনাদের। যা বলছি শুনুন, বাড়ী গিয়ে ভাববেন পরে! বলছিলাম, দুটো পাখীকে দু'হাতে আদর জানানো কঠিন। এক হাতে ঠ্যাঃ, আর এক হাতে লেজ না ধরলে পাখা পোষা কঠিন। তাই হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চিতই ধরতে পারেন, ব্রাউনিংএর লাভারটি ছিল একটি ছিপ-পকেট ভাবালু-কম্পোজার। তার সকল কবিতা বিক্রী করলেও মেয়েটির জন্যে ব্রাইডাল্ ড্রেস্ কেনা যাবে না—মেয়েটি যখন পরিষ্কার বুঝে নিল ব্যাপারটা, যুবকটি একেবারে ওয়ার্থলেস, গুড্ ফর্ নাথিং—মাইণ্ড, আমি মেয়েটির সাইকলজিক্যাল্ স্টেটের বর্ণনা দিচ্ছি, কবিতার নিন্দে ক'রছি না কিন্তু···

—বলুন, শোনা যাক থিসিসটা। ঘোষবাবুর কণ্ঠস্বরে এইবার যেন উৎসাহের উষ্ণতা অনুভব করি। গণেশ বটব্যাল গম্ভীরভাবে বলে যান—

···তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করি, মেয়েটির দুই নম্বর সেদিন আসবে না, মেয়েটি আগে থেকেই জানতো—আর মেয়েটি যে চারকোটি বছর আগে মার্জারী ছিল, সে তো কবি নিজেই ইঙ্গিতে পাঠককে জানিয়েছেন।

—সে কি মশায়!!

—পড়েন নি? প্রত্যাখ্যাত প্রেমিককে—ঠিক মার্জারী যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে—সেইরকম খেলিয়ে নেবার মতলবে গুম্ হয়ে, ওৎ পেতে, খানিকক্ষণ বসে থাকলো? যেই দেখলে ছেলেটি আধমরা হয়ে এসেছে, নরম হয়ে বলেছিল নিশ্চয়ই, বেশ তাই যাবো, একসঙ্গে ঘোড়ায় চাপলেই যদি তোমার কোনো উপকার হয়, না হয় ক'রলাম উপকার। কিন্তু মনে থাকে যেন, এই শেষবার।—আরে মশায়, গল্পিকা আর কাকে বলে!

—বুঝলাম না আপনার হেঁয়ালী?

—বুঝলেন না, তবুও বুঝলেন না!! যান, বাড়ী

গিয়ে রাত্রিবেলায় সহধর্মিণীদের জিগ্যেস করুন—মাইরি, কৌশলে দিব্যি দিয়ে নেবেন—

—দিব্যি কিসের ?

—সত্যি কথা বলতে হবে। হাঁ, অথবা না—আর কিছুই বলতে পাবে না। এই কড়ার করিয়ে নেবেন।

—নিলাম। তারপর ? মুখুজ্জে মশায় মন্তব্য সহ প্রশ্ন করেন।

—ঐ লাস্টলাইন্ কবিতাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন, আর বুদ্ধিমতীদের জিগ্যেস করবেন—ঐ যে জায়গায় মেয়েটি মাথা রাখলো ছেলেটির বুকে—মাত্র এক মুহূর্তের জন্য—মাত্র একবার—এটাকি সত্যি—হাঁ বা না বলতে হবে, আর কোন কথাই বলা চলবে না—জানিনা' বলাই মেয়েদের স্বভাব কিনা, তাই এই দিব্যির প্রয়োজন। বুঝতে পেরেছেন ?

—না, এখনও বুঝতে পারলাম না ঠিক।

—দেখবেন, সতীসাধ্বীরাও বলবেন, ব্রাউনিং ভুল লিখেছেন, একবার পুরুষের বুকে মাথা রাখলে আর রক্ষা নেই। বারবার মাথা রাখতেই হবে। তাছাড়া—'থাকগে, অলমতি বিস্তারেন—বুঝে দেখুন কতটা ল্যাক্ অব্ ডীপ্ ইনসাইট্, মানে, গভীর দৃষ্টির অভাব থাকলে ঘোড়ায় চড়া যবনী ও যবনের কাছে এতটা প্রাণহীন ব্যবহার আশা করা যায় !!

গণেশ বটব্যাল আর একটা সিগারেট ধরান। আমরা হতভম্ব হয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাই।

আনুষ্ঠানিক গান

শ্রীজয়দেব রায়

বিভিন্ন যুগের গানের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ, শিল্প, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ছায়াপাত হয়। প্রত্যেক যুগের বিশিষ্ট সঙ্গীত যে আনন্দের স্বরূপের মনের যেন প্রতিচ্ছবি। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে, কালের রূপান্তরের সঙ্গে গানের রূপ বদল হইতেছে। এককালের বিশিষ্ট চাহিদা মিটাইতে যে গান রচিত হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মূল্যহীন নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিয়া এক শ্রেণীর দেশ-প্রেমোদ্দীপক গান এক সময়ে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, আজ সে গানগুলি মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে; আজকের পরিবেশে সে গানগুলি গাহিবার অবকাশ আর নাই।

নীলকরদের অত্যাচার লইয়া গান লিখিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। সেকালের ঐ শ্রেণীর গানের মধ্যদিয়া যে ভাবে দেশপ্রীতি এবং ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্র রচিত নিম্নের গানটি রীতিমত বৈঠকী ঢঙে রচিত—

> হে নিরহর নীলকরগণ।
> মানুষেতে না মহে না প্রাণে এ নীলযন্ত্রণে।
> লাঙ্গলের সুকৌশলে, খেতমাঝের ফলে,
> লুটেছে সকল ধন কি আর আছে এখন ?
> দীনজনে দুঃখ দিতে কাহার না লাগে চিতে,
> কেবল নীলের হেরি, পাষাণ সমান মন॥
> বুটন-স্বভাবে শেষে কালী দিলে বঙ্গ এসে,
> তরিলে জলধিজল পোড়াতে স্বর্গভবন॥

নীলকরদের অত্যাচার লইয়া দীনবন্ধুর ন্যায় আরও বহু অজ্ঞাতনামা অখ্যাত পল্লীকবিও গীত রচনা করিয়াছিলেন। যেমন—

> নীলদর্পণে লঙসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
> নীলকর বীরে দয় দিলে প্রজার বল তাই কি রেখেছে।
> কারো কার, তাদের উপর অত্যাচার,
> তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরিণ মরেছে।
> ইডন, গ্রাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
> করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে॥

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কারাবাস ঘটিয়াছিল। হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রচার করিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন।

পাকিস্তানে ইদানীং যে হিন্দুনিধন যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্কটের মধ্যেও পল্লীকবিরা তাহার বর্ণনা করিতে ছাড়েন নাই। এই সকল গানে হয়ত বেশ কিছুটা কিংবদন্তী, বহু দুঃখমাহাত্ম্যমণ্ডিত বৃদ্ধামিশ্রিত অত্যুক্তি একত্রিত, তাহা সত্ত্বেও দেশের ঐতিহাসিক গানের মধ্যে সেগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বরিশাল জেলার রাজাপুরে সম্প্রতি হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহার বর্ণনা আছে নিম্নের গানে—

শোনেন এক নতুন লীলা বরিশালের জিলা
ঘটিল কি দুর্ঘটনা প্রাণে সহেনা।
৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাজাপুরের এলাকা
পুটপাট মারামারি নাই লেশমোখা।
তখন ঘরে পায় তারে কাটে ঘরবাড়ী বেয় লুটে
টাকার মাল বলতে কিছু বাকি রাখে না।
যখন 'আল্লা হোআকবর' ডাকগুলি সব হিন্দু হয় পাগলিনী
যেমন গুলিখোরে যাদিনী তেমনি ঘটনা।
তখন ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ের কোলে নিয়ে
জঙ্গল মাঝারে গিয়ে করে ভাবনা।

বরিশাল জেলার মুলাদি নামক স্থানে জনৈক পুলিস দারোগার বিদ্বেষ-দুষ্টতা ও পক্ষপাতিত্বের ফলে কয়েক হাজার হিন্দু একদিনেই নিহত হয়। সেই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া রচিয়াছে পল্লীকবির গান—

তখন দারোগা নিয়ে গুণ্ডাগণে বসে গুদামের মাঝে
চারজন গুণ্ডা দাড়া করে, দাঁও চায় খানা।
এক একজন বের করে এক কোপে দুই ধড় করে
ছোটবড় উনত্রিশ চার হাজার কম হবে না।
তখন মদের বোতল হাতে নয় নূপুর শিঞ্জিতে পায়
ঝুমুর ঝুমুর বাজনা বাজায়—প্রাণে সহেনা।
সে ভাবেতে অত্যাচার কি ভাবে করি প্রচার
কিছু কিছু সংভাবে করি বর্ণনা।
দ্বিজ বলরাম তাই করে মানা মুলাদিতে গেল জানা।
পাকিস্তানে হিন্দুধর্ম তাই কেউ বেওনা।

তবে এই অত্যাচার প্রতিবিধানের জন্য এ যুগে কোন দীনবন্ধুই আর নূতন কোন 'নীলদর্পণ' রচনা করিতে সাহস করেন নাই, নূতন কোন লঙ্ সাহেব আর এদেশে পদধূলি দেন না!

সমাজে বিজাতীয় প্রভাবের দুষ্টকটুতা সর্বপ্রথম বিদ্রূপের যোগান দিয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলালের গানে। এই শ্রেণীর ইঙ্গবঙ্গীয় চালচলন আজও পল্লীকবিদের রঙ্গরসাত্মক গানের উপকরণ হইয়া আছে। বলরাম অধিকারী নামক এক অখ্যাতনামা পল্লীকবি দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া গান ধরিলেন—

দেশের উল্টে গেছে হাওয়া
স্কুলই ভারতে দেখি পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার।
যত সব বাংলার ছেলে ইংরেজি শিক্ষার ফলে
দশ বৎসর বয়স হইলে চোখে চশমা দেওয়া।
তারা শিখতে চায় পেন্টুলের ফলে গেছে নুলি রাখা।
এখন শিক্ষা কর বঙ্গবাসী মোটা পরা মোটা খাওয়া।

সংবাদ-বৈচিত্র্য লইয়া আনুষ্ঠানিক গান পাঁচালী—কবির দলের গায়করাও রচনা করিতেন। তাজকেশ্বরের জনৈক মোহান্ত কুৎসিত মকদ্দমায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বিখ্যাত পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্ত গান বাঁধিয়াছিলেন—

মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক ফোঁটা দিলে, টাক ধরে না চুলে
কানায় চোখে দেখতে পায়।
বিলাতি গানি নূতন আমদানি
শিবের ষাঁড় ঘুরেছে, তেলে ভোলে কামিনী—
হয়েছে ন্যাজে গোবরে পুর, কখন কি হয় ঘটায়।

আর এক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক গান রচিত হয় নানা পর্ব উপলক্ষে। দেকালেও রচিত হইত। বাংলার নবযুগের পীঠ-প্রবর্তক বিদ্যাবারিধি সর্বপ্রথম বাণী বন্দনায় আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের সূত্রপাত করেন—

জয় জয় বাগ্‌বাদী বিদিত প্রভাষিনী
পদ্ম মধ্যে মৃদাযোজ, বক্ষে কর সন্নিজ,
পঞ্চাশতো বর্ণময় মানি।
সদা-সরসিজোদ্ভব, হংসোপরি সমাসিন প্রভৃতি অবয়বন্বিনী।
অক্ষ গুণ আর বিদ্যা, অমৃত কলস সমুদ্রা, বেদিপদ, চতুষ্টয় পানি।
সদাশিবোরস্তলনি ঈশ্বরাত্মা ত্রিনয়নি, সর্ব ইন্দু শিরোধারিণি
জগন্মোহন বীণে, আনন্দ স্বকীয় গুণে,
সেই সব অম্বুজে ভবানি:

অনেকে বলেন গানটি তাঁহার স্বরচিত নয়, তাঁহার কোন এক বন্ধুর রচনা; তবে গানটি তিনি নিজে সুরযোজনা করিয়া পূজার দিনে গাহিতেন।

যাত্রা-পাঁচালী-কবির গানের আসরেও প্রথানুসারে বাণী বন্দনার ধারা চলিত ছিল। এ সকল গানে গায়কের কণ্ঠে ভক্তির আনুকূল্য না থাকিলেও সুরের চাতুর্য থাকিত। ইহাও এক শ্রেণীর বন্দনাগান।

ব্রজমোহন রায় রচিত তাঁহার যাত্রা দলে গীত একটি বাণী বন্দনা উদ্ধৃত করা হইল—

বীণাপাণি বাক্‌বাদিনি, ব্রহ্মরূপিণি, মা,
ব্রহ্মসুতা বেদমাতা, বেদবিধি-বিধায়িনি,
বিমল বরনি বরদে বাণি,
কি কব মহিমা, কোথা মা বাণি,
বর্ণনা করিতে বর্ণনা জানি,
যা বলাও বলি, যা, শুনাও শুনি।

প্রাচীন ভারতের শ্রমনীতি

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু

সুদূর অতীতেও ভারতের শ্রমনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে তখন সভ্যতার আলোকপাত হয় নাই—এমন সময় খৃষ্টজন্মের প্রায় তিনশত বছর আগে ভারতের শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানা প্রকার বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনেও সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী উপেক্ষিত হয় নাই। সামাজিক কল্যাণের জন্য, ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যাতে বৈষম্য দেখা না যায়, তার মূলসূত্র ও বিধিবদ্ধ হয়েছিল বহুপূর্বতীত কালে। এই উদ্দেশ্যেই প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র নায়কেরা কর্ম্মচারীদের মঙ্গল সাধনের দিকে অধিকতর নজর দিয়েছিলেন।

যে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কথা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সারাবিশ্বের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই প্রচেষ্টার নির্দ্দেশ প্রাচীন ভারতেও পাওয়া যায় না—তা নয়। আজ হ'তে বাইশ শো বছর আগে পৃথিবীর অন্যতম সেরা অর্থনীতি-বিদ ও রাজনীতিবিদ—তিনি কূটনীতিজ্ঞ বলে সমধিক সমাদৃত—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রধানমন্ত্রী চানক্য তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন। জগতের সে যুগে চানক্যের সমতুল্য মনীষা বিরল বলিলে অত্যুক্তি হবে না। কল্যাণ-কামী রাষ্ট্র-বাদ ও সমাজতন্ত্রের যে প্লাবন বর্ত্তমান যুগে এসেছে—চানক্যকে তার উৎস বলে অভিহিত করা যায়। তাঁর মতে প্রজার হিত ও সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—এই উদ্দেশ্যেই সে যুগে শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের হয়েছিল সুব্যবস্থা। ধন-বণ্টন ব্যাপারে যাতে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক তাদের প্রাপ্য অংশ পায় ও যাতে সমাজের মুষ্টিমেয় জন সংখ্যার হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত না হয়—সে দিকে লক্ষ্য রেখে ধনোৎ-পাদনের বিশিষ্ট উপায়গুলি রাষ্ট্রের হাতে ছিল ন্যস্ত। কৌটিল্য (এ নামেও চানক্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন) সর্ব-সাধারণের হিতার্থে কতকগুলি কাজ—যেমন দুঃস্থ, অভি-ভাবকহীন ও ভরণ-পোষণে অসমর্থ প্রজাদের জীবিকানির্বাহ প্রভৃতি রাষ্ট্রের হাতে অর্পণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এগুলি রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় বলে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রের এবম্বিধ কার্যকলাপেই বর্ত্তমান যুগের সামাজিক নিরাপত্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-ভাগে বিভক্ত করেছেন ও প্রত্যেক বিভাগের পরিচালনার ভার একজন রাষ্ট্র-নিযুক্ত অধ্যক্ষের (Superintendent) উপর ন্যস্ত করেছেন। রাষ্ট্রের কতকগুলি বিভাগের অধ্যক্ষ—কোষাধ্যক্ষ, স্বর্ণাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, মুদ্রাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, ইত্যাদি। অধিকতর কল্যাণমূলক নীতির উপর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ গ'ড়ে উঠার ফলে সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রনায়কদের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা বর্ত্তমান কালের ন্যায় অধিকতর জটিল আকার ধারণ না করার ফলে সমাজ-কল্যাণ সহজ-সাধ্য ছিল।

যদিও কৌটিল্য শ্রমিকদের তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রমাধ্যক্ষ অথবা বর্ত্তমান কালের শ্রম-মহাধ্যক্ষের পদের সৃষ্টি করেন নাই, তথাপি তিনি তাঁর অর্থশাস্ত্রে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের নিয়োগ প্রণালী, ন্যূনতম বেতন, কার্য্যকাল ও শ্রমিক কল্যাণমূলক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এই সব বিষয়ে, কৌটিল্য যা বিধিবদ্ধ করে গিয়েছেন—প্রকৃতপক্ষে সেই নীতিই অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় তৈরী হয়েছে। এ দিক দি'য়ে বিচার করলে দেখা যায়, জগতের শ্রমনীতির আদি স্রষ্টা চানক্য।

সে যুগে তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা সৃষ্টি ও রাষ্ট্র তৈরী হয়েছিল, কিন্তু পুরাপুরি ধনতন্ত্রের আমদানী হয় নাই। কাজেই তখনকার বেশীর ভাগ লোকের শোষিত হবার সম্ভাবনা কমই ছিল। ছোটখাটো শিল্পে দেশ ছিল ভরপুর। ফলে শ্রম বিরোধের মাত্রাই কম ছিল। কৌটিল্য শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধা সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদির অবতারণা করেছেন, তা থেকে সে কালের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। তিনি অর্থশাস্ত্রে শ্রমিক,

চাকর, মজুর প্রভৃতি শব্দকে একই অর্থে সর্বত্র প্রয়োগ করেছেন। গায়ক, শিল্পী, চিকিৎসক, পাচক, পুরোহিত প্রভৃতি যারা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে শ্রমদান করতো—তাহাদিগকে ও শ্রমিক আখ্যা দিয়েছেন। উচ্চশ্রেণীর মাস মাহিনার কর্মী ও দৈহিক পরিশ্রমকারী সাধারণ মজুরের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন প্রভেদ করেন নাই। বর্তমান কালের শ্রম-আইন সম্বন্ধে মাহিনার মানদণ্ডে ও কর্মের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে শ্রমিকের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। উচ্চ-শ্রেণীর চাকুরিয়া, অবশ্যই আজকালকার আইনের আওতার বাহিরে। এই দৃষ্টিভঙ্গী কালের অগ্রগতির পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নাই।

যদিও কৌটিল্যের নিকট তৎকালীন শ্রমিক শ্রেণী স্থায় বিচার হ'তে বঞ্চিত হয় নাই, তথাপি তিনি শ্রমজীবী-দের শাসনের জন্য নানা দণ্ডবিধির পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রমিকদের মজুরী নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কৌটিল্য নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রচলিত প্রথা বা চুক্তির দ্বারা মজুরী স্থিরীকৃত হবে। আজকালকার দিনেও মজুরী নির্দ্ধারণ কাজে এ পন্থাও অবলম্বিত হ'য়ে থাকে। মজুরী-সংক্রান্ত বিরোধের সালিসীর সাহায্যে নিষ্পত্তি হতো। বর্ত্তমান যুগে সালিসীর মাধ্যমে শ্রমবিরোধের অবসান একটি সুপরিচিত পন্থা। অর্থশাস্ত্রে 'সঙ্ঘব্রাৎ' শব্দ হ'তে তখনকার দিনের শ্রমিক সংস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকের মতে এর দ্বারা শিল্প-সঙ্ঘ বুঝায়। শ্রমিক সঙ্ঘ হিসাবে ইহাই জগতের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত।

সে যুগে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু বুঝাপড়া থাকার দরুণ একজোটে কাজ বন্ধ করা অর্থাৎ ধর্মঘটের (Strike এর) হিড়িক ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের সুচিন্তিত বিধিব্যবস্থা থাকার ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভালই ছিল। সমাজকে শ্রমিকদের খেয়াল-খুসীর হাত হতে রক্ষা করার জন্য কৌটিল্য কর্মীদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও কম কাজকরার (negligence and go-slow) প্রথাকে দণ্ডনীয় বলে অভিহিত করেছেন! আবার এখনকার দিনের মালিকের ইচ্ছা মতো কারবার বন্ধ করার (Lock-out) হাত হতে শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য মালিককে তাঁর ইচ্ছাকৃত বন্ধ দিনের মজুরী দিতে বাধ্য করা হতো। অসঙ্গতভাবে লক্-আউট করার জন্য একালে মালিককে লক্-আউট কালীন যাবতীয় মজুরী দেবার ফল ভোগ করতে হয়। কৌটিল্যের যুগে কর্মীকে সময়মতো মজুরী না দিলে মালিক আইন মাফিক দণ্ডনীয় ছিল। এ প্রথা ও শ্রমিকদের অন্যান্য দমনবিধি বর্ত্তমান কালের মজুরী দেওয়ার আইনের (Payment of wages Act-এর) পুরাতন দৃষ্টান্ত। ন্যূনতম বেতন (Minimum wages) হিসাবে সে কালের মজুর যা উপায় করতো, তাতে তার মোটাভাত কাপড়ের খরচ কুলিয়ে যেতো। মালিকের কারবারে অংশীদার হবার জন্য, কিংবা তাঁর মুনাফায় ভাগ বসাবার জন্য শ্রমিক কোনদিন আন্দোলন করে নাই। উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পে শান্তি চিরবিরাজমান ছিল। অধুনা জগতে শিল্পে গণতন্ত্রের আমদানী হয়েছে; ফলে শ্রমিক কারবার পরিচালনা করার ভার পাচ্ছে, আর তার মিলছে মালিকের মুনাফার অংশ। এত সব অগ্রগতির ফলেও শিল্পে শান্তি কই?

অন্তরঙ্গ

দিব্যেন্দু পালিত

আমার দু'চোখে তবু শ্রাবণের জল ;—
প্রার্থনায় পরাজিত বৈরাগীর মতো :
ধূ ধূ মাঠ, শ্যাম-শূন্য পৃথিবী, উপল
পথ ভেঙে রাত্রি দিন হাঁটি অবিরত।
দিন যায়, রাত্রি যায় শূন্যতার মাঝে ;—
হাঁপায় না, হারায় না আমার এ-মন
বিচিত্র ঐশী সুরে বাজে শুধু বাজে
কাহার প্রত্যাশা কাঁপে অন্তরে তখন!
কেই বা সে, জানিনা তা, সুদূর সময়ে
কাহার ব্যাপ্তি তবু আমাকে জড়ায়!
জীবনের সুখে দুঃখে যন্ত্রণা ও ভয়ে
আমার হৃদয়ে তার সুষমা ছড়ায়!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অসিত কোথায় হারিয়ে গেছিল। এতক্ষণে বেশি শ্রীমান হাতে একগাদা শেকড়, পাতা, লতাপাতা নিয়ে হাজির। প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটু অবধি তুলেছে। বাঁ হাতে ওষুধ-বুটির একটা ঝোলা এবং একজোড়া বাঁচি। অপরূপ হয়েছে কাকা যেন। মুখচোখ আনন্দের ডেউ।

"বাঃ অনেক স্পেসিমেন! যেখে এসেছি সব জায়গা। নামার পথে আরও দেখো। যোড়াওলাকে বখশিস্ কবুল করতেই এমন সব জায়গায় নিয়ে গেল, কি বলবো দাদা! ওরা যে সাহেবদের নিয়ে যুরছো। গুপ্তধন-সন্ধান জানা আছে। ঐ যেখুনি, কি আছে বার করো, আমার খিদের জ্বালায় নাড়ী চুঁই চুঁই করছে।"

বেণু একটা জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্পের রাবিশগুলোকে ঘটটা সম্ভব সমান্তর করে দাঁড়াচ্ছিল। অসিতের মন দাদার মনকে যেখে হাসছে। পরোপকারী ছেলেটা।

এবার অসিত ছোর গলায় ওর প্রিয় হাসি হাঁকড়ালে একেবারে চিৎ হয়ে শুয়ে, পাশে গড়িয়ে পড়ে।

বেণুর জিজ্ঞাসার উত্তরে অসিত বললে—"আমা করছেন ইকনমিক্যাল্ সাহেব। তাই নজা বেনছিলাম বেণু-দি জানো। ঐ যে ছোটো ছোটো টাঁসুগুলো যেখছো না, ওর ভেতর গরম জল, চা, ডিম, মাংস ইত্যাদি আছে। আর এখানে এই আলুর যেঁট আর পুরীর 'খবেড়া'। দাদার ইচ্ছে—"

আমিনেকে বলি, "বাঃ, অমনি খাবার ইচ্ছে। তোর বুঝি যোটেই ইচ্ছে নয়?"

হাসতে হাসতে বলছে, "আরে আমি কি আর বলছি আমার ইচ্ছে নয়? আমি তো খাদ্যলোলুপ সবার জানা; আপনারা যে সংযমের কড়ং করেন—"

বেণু ব্যাগটা অসিতের হাতে দিয়ে বলে,—"আমারও তো খাবু ইচ্ছে করছে। যাওনা অসিত, যেখো না কি পাও।"

দু' চারটে ছোটো ছোটো ঝরনাধারা। শ্রান্ত পথিকদের চা-খাবার-টুকটী ইত্যাদি বিক্রয় করে। একটার কাছে গরীবদের চায়ের আড্ডা। কাশ্মীরী গরুর পাতা চা, নুন দিয়ে সেদ্ধ করে খাচ্ছে 'সইস্'গুলো। আমাদের 'সইস্'রা এসে বলে "চা খাবার জন্য কিছু দাও।" চার আনা করে দেওয়া গেল। পরে জেনেছিলাম কাশ্মীরে ভাড়া ইত্যাদি না করার জন্যে বহু, তদুপরি এই বখশিসের খাবাই গাবে মাখতে হয়। পথে পথে পানটা, সিগারেটটা, দু-আনা, চার-আনা খুচরো, এ আছেই।

উত্তর দিকটায় মস্ত একটা খোলা জায়গা। যেখে খুব পরিষ্কার যেখা যাচ্ছে না। কিন্তু খানি জায়গাটা বিস্তৃত বলেই মজরে পড়ে। তারপরে বিরাট পর্বত শ্রেণীর মধ্যে শিবালিকের মতো তীক্ষ্ণ, উচ্চ এক গগনচুম্বী সুঙ্গ। এই বিস্তৃত সমতল কিছুই নয় উপায় মুখ। তার ওপারে ঐ গিরিরাজটী আর কেউ নন্ নাঙ্গা পর্বত। বেশ চোখে পড়ে, বেশ যেখা যায়। উচ্চতার জলরাশি ২৮ মাইল বিস্তীর্ণ এবং নাঙ্গা পর্বত ২৬,৬২০ ফুট উঁচু।

অসিত ফিরে এলো শুধু হাতে। "কথাবাত্র নেই। আছে কচু। যে সব পজপাল নিয়ে আসা গেছে।"

বেণুর ব্যাগ বেণুর কোলে ফিরে এলো। আচারের টাবুনা আর সেদ্ধ ডিমের ওঁড়ো দিয়ে সেই রাবিশগুলো পেটে পুরলাম। ঝরনার জল নিয়ে খেলাম। এতো ঠাণ্ডা যে খেতে কষ্ট হোলো।

আজ খেতে খেতে সন্ধের হোলো—খাবারটার যেন পাচা চর্বির গন্ধ! এই খাবার জন্য এতো জবন্য লাগছে।

খাবার দিকে আর মন নেই। মন এখন ঐ ছেলেদের আনন্দ আর খেলার দিকে। দলে দলে ছেলে আর মেয়ে উঠে গেছে খিলানমার্গের চূড়ায়। সেখান থেকে গড়িয়ে নামছে বরফের চালের গায়ে গা এলিয়ে। এমন বরফ নিয়ে খেলা তো ওদের জাগো। এর আগে জোটেনি। যেন কি পেয়েছে ওরা। মাঝে মাঝে এই সবুজ ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করছে। প্রকৃতির এই শান্ত-গম্ভীর চেহারায় আওতায় পড়ে ওদের সেই ওখৎ-ই-সুলেমানের উচ্চ খল উল্লাস নেই যেন। আমি আর কিছুতে মন দিতে পারছিলাম না। সারা রাস্তায় নামার পথে, গুলমার্গের প্রান্তরে, আমাদের যাচ্ছাবা যেন পরিয়ে দিয়েছিলো উৎসবের দিনে পরিয়ে-দেওয়া রঙীন কাগজের শিকল। খিলানমার্গের চূড়া থেকে গুলমার্গের গোড়ার সেই ছোটেলটি পর্যন্ত এই কিশোর কিশোরীর রঙীন শিকল পরম উল্লাসে দুলছে।

গুলমার্গে এসে আবার সেলাম বালিপাত। এর আগেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেল বেণু; পড়ে যাওয়া নয় তো, সেটা যেন একটা শয্যা বিলাস। সবাই হাসলো, যেন আনন্দে অবগাহন সেটা। ছোটো ছোটো ছেলেরা স্ফূর্তির সঙ্গে পাই-পাই করে ছুটছে ঘোড়ার। চা খেলাম আর গান শুনলাম আমার ঘোড়ার সইসটার কাছ থেকে। কিছুতেই গাইতে চাইলো, এমন লজ্জা ওর। চরওয়ার ইংরাজী বলছে। ঘরে, ইংরাজী

আসলে ক্রমাগত ইংরেজদের দিবদৎ করে ভাষাটা জেনে নিয়েছে প্রাণের দায়ে। গুলমার্গের বেন্টর ভাগ দইদুই ইংরাজী জানে। গুলমার্গ যে ইংরেজদের কলোনী হবার উপক্রম হয়েছিল, কে-না বলবে?

"তোরই ঘোড়া?"

"কোত্থেকে হবে বাবু?"

"কার তবে?"

"মালিকের। সেও কাশ্মীরী আর আমারই মতো মুসলমান।"

"কত ঘোড়া আছে তার?"

"এক এক জনার ত্রিশটা চল্লিশটা ঘোড়া। আমরা যা পাই তার ওপর টাকায় চার আনা পাই। বাকী আপনারা যা বখশিস দেন!"

অবাক্ মানি। এরা গুঠানামা করবে। অথচ পাবে টাকায় চার আনা। বারো আনা ওর সেই প্রভুর। প্রচুর বাস পায় গুলমার্গে, তাই খাত বেশি লাগে না। লোকটার লাল হয়ে যাবার কথা!

"কিছু হয় না বাবু?

"কেন?"

"সব আর ছুটা। একটাও মালিক বড়লোক নয়।"

"বড়লোক কাকে বলিস তুই?"

"দুবেলা খায়, ভালো জামা কাপড় জুতো পরে, মাংস খায়, খাসা খায়, বিস্কুট খায়, টিনের খাবার খায়....."

খাবার কষ্ট করে মনের বিচার! কতই যুক্তিযুক্ত ওরা। বুদ্ধ নয়, জমী নয়। বিলাস নয়—কেবল খাওয়া।

"গান গা তো, তোদের মেয়ের গান!"

লজ্জায় মরে যায়! গান গাইতে চায় না। অতি কষ্টে বখশিস্ কবুল করতে গান গাইতে লাগলো;—

কেন বলো প্রিয়া ফেলে চলে গেছে ফিরবেনা
কেন বলো তার আঁখি দুলো দুলো যুচবেনা।
কাঁদেনি কখনো যাবার বেলায়
হাসি আছে তার ফুলের মেলায়,
আছে কমলের মনের মতোতে—ঘুচবেনা
ভুলে গেছে সব কেন বলো শুধু? ভুলবেনা।
ঐতার শাড়ী বিছানো মনের কোলে,
পায়ের নূপুর বাজে শোনো নদী জলে,
নাশিশে তার চোখের ইশারা দুরছেনায় মন,—ঘুলবেনা।
কেন বলো তবু সে আমার নেই—ফিরবেনা?

অনেক কষ্টে গানের মানে বুঝিয়ে দিলো। ওরে রেখেছি মানে অনেক কষ্টে। কার গান? কার গান? সেই হাব্বা। "আচ্ছা হাব্বা ছাড়া আর গান জানিস?"

গাইতে লাগলো—

মন্দিরে যে পাষাণ দেবি দেবতাতে সেই পাষাণ ওরে
পাষাণে তোর বুক বাঁধা কি? মেনা সকল পাষাণ করে
যোকার মতো কারে পূজিস্
কোন্ পাষাণে কারে খুঁজিস্
সকল পাষাণ এক-করা সেই পূজিস পরম দেবতারে
বেদীতে যে পাষাণ দেখিস্ সেই পাষাণই বক্ষ পেতে
পথের পরে শুয়ে চরণধূলি শোনে নীরবেতে
ধাতার কলে পাষাণ পেষে
বিগ্রহে সেই পাষাণ পেষে
এক হয়ে যায়, জানিস্ কি তুই, শুধায় গোপন অহঙ্কারে
মনের কাছে গুরুর খবর কারে খুঁজিস্ বারে বারে।"

এ আবার কার গান?

"লাল দীঘ" (ক্রমশঃ)

নদী

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

রাত্রির রঙীণ-ছাঁচের গান ঝরা নদী
নাম লেখে যদি,
কথার করুণ আঁচের আলপনা দিয়ে:
জানো সে থামবে কোথায়, কোন দেশে গিয়ে?
কি যেন, কি যেন তার নাম ভুলে গেছি,
হয়ত বা হৃদয়ের আরো কাছাকাছি
কোন নীল নির্জনে, পাতার শিশিরে,
সব রঙ মিশে আছে রূপের গভীরে।
প্রবাল দ্বীপের রাণী ধর তার নাম,
সিকিম ভুটান কিংবা ভাবের আসাম
পার হ'য়ে এসেছিল স্নেহ-স্মৃতি নিয়ে;
জানো কোথা চলে গেছে, কোন পথ দিয়ে?
আজ নয়, কাল নয়, চেতনার ভোরে—
ক্যানারী দ্বিপের লাল আলো জ্বালা ঘরে,
ব্রেংগুণে বার্মায়, সিংহলে এসে
কুমারিকা, জাভা, বালি আরো দূর দেশে
ম্যাপের ছবির মত—কবিতার রথে,
নদী বেয়ে চলে গেছে সিঁড়ি-ছায়া পথে।
তোমায়, আমায় ডাকা অভিমানী প্রিয়ে,
জানো, কোন্ দেশে আছে, কোন আশা নিয়ে?

এক

সঙ্কর্ষণ রায়

বাগানে জিনিয়া, আইপোমিয়া, পিটুনিয়া ও কসমসের সমারোহ। হলদে, লাল ও বেগনি রঙ সন্ধ্যার রোদে ঝলমল করছে। ফুলের বেড়গুলির চার পাশে সবুজ লন। বেতের চেয়ার টেনে বাগানের এক কোণে ব'সে আছে বীথিকা ক্যালকুলাসের বই নিয়ে।

ইন্টিগ্রেশনের একটি প্রবলেম কষবার চেষ্টা করছিল বীথিকা। সংখ্যাতত্ত্বের জটিল সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি সে ভাবছে। 'জিরো' থেকে 'ইনফিনিটি'—সংখ্যার বিপুল সমুদ্রের অতলে সে তলিয়ে আছে। সংখ্যাগুলোর পারস্পর্য রক্ষিত কি না-ভেবে সে জিগেহারা। সংখ্যায় সংখ্যায় ক্ষুদ্রতম পার্থক্য কী? ক্ষুদ্রতম সংখ্যাই বা কোনটি?

সাদে বাগানে সবুজ, লাল, বেগনি ও হলদে রঙে মিলে মিশে যে রঙের ঐকতান শুরু হয়েছে, ক্যালকুলাসের পাতা ডিঙিয়ে তার খবর নিতে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে না বীথিকার চোখ দুটি।

বীথিকার পাশে ব'সে আছে তাপস। স্ট্যাটিস্টিক্সের মেধা ছাত্র ছিল—এখন স্ট্র্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিট্যুটে রিসার্চ করছে। গালে হাত দিয়ে সে ফুলের বেড়গুলির দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভাবছিল, ফুল ফোটে কেন? ক্যালকুলাসের ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলার পাশে ফোটা ফুলের বৈচিত্র্যের স্থান আছে কী?

বাতাসে অল্প অল্প কাঁপে জিনিয়া ও কসমসের পাপড়িগুলি। লাল ও হলদে রঙ স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। পশ্চিম আকাশের আবীর রঙের ছোঁয়া এসে লাগছে বর্ষাপুষ্ট সবুজ পাতাগুলোতে। তাপসের মনে হ'ল, এমন রঙিণ সন্ধ্যা আর বুঝি সে কখনো দেখে নি।

তার জীবনের এই রঙিণ মুহূর্তগুলি সংখ্যাতত্ত্বের দেয়ালে আর কতকাল নিষ্ফল মাথা কুটবে? আর কত দিন ফর্মুলা-নির্দিষ্ট শীতল সান্নিধ্যের পাশে তার বার্থ প্রতীক্ষার কঠিন পরীক্ষা চলবে।

এক ঝলক সোনালি রোদ বীথিকার মুখে এসে পড়েছে। ফুলের পাপড়ির চেয়েও কোমল মুখশ্রীতে সন্ধ্যার মেঘের লাবণ্য প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকক্ষণ অনিমেষ চোখে চেয়ে দেখল তাপস। তারপর ঈষৎ কাঁপা গলায় ডাকল, বীথি!

ক্যালকুলাস থেকে মুখ তুলে তাকাল বীথিকা। আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটিতে সমুদ্রের গভীরতা—অথচ কী হিম-শীতল চাউনি!

বীথিকা বললে, কী বলছ?

তাপস বললে, বলছিলাম—মানে বলতে চাই আর কি যে, কী সুন্দর সন্ধ্যাটি!

ও।—ব'লে বীথিকা আবার ক্যালকুলাসে মন দেয়।

দিনরাত তো অঙ্ক কষছ। ঐ ক্যালকুলাসে যতটা মন দিচ্ছ তার শতকরা এক ভাগ অনুগ্রহও যদি আমাকে করতে! তোমার ঐ ক্যালকুলাসের বইয়ের একটি পাতা হ'লেও যেন বর্তে যেতুম।

বাজে কী সব বকছ!—বীথিকা বই থেকে মুখ না তুলেই বলে।

বাজে বকছি! আমার প্রাণের আসল কথাটি বললুম—আর তুমি বলছ কিনা বাজে বকছি।

ব্যাপার কী বলো তো? প্রোপোজ করবে না কি!—মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে বলে বীথিকা।

যদি করি!

নিরুত্তাপ কঠিন স্বরে বীথিকা বললে, কোরো না। দেখো তাপস, তুমি আমার বন্ধু—তোমার সাহচর্য আমার কাছে খুবই মূল্যবান। আমাদের এতদিনের সহজ

সৌহার্দের সীমানা লঙ্ঘন করতে যেয়ো না। বেশি লোভ করতে গেলে সবই হারাবে।

কতটুকু পেয়েছি যে হারাবো!—কাতর স্বরে তাপস বললে। তোমার অঙ্ক কষার সঙ্গী আমি—আমাদের সম্পর্কটা—

তাপসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বীথিকা বললে, পুরোপুরি ম্যাথমেটিক্যাল। এ ছাড়া আর কী সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে পারে বলো তো? তুমি তো জান, আমার মন-প্রাণ সব ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফিতে সমর্পণ করেছি। আমার জীবনে আমার রিসার্চ ছাড়া আর কিছুরই ঠাঁই হ'বে না। তোমায় তো কতবার বলেছি যে আমার জীবনের ভাগ আমি কাউকেই পারবো না দিতে—আমি একা থাকতে চাই।

একা থাকতে চাও! কিন্তু একদিন যখন অতল নিঃসঙ্গতাবোধ তিলে তিলে তোমাকে গ্রাস করবে—

আমি তা'ই চাই তাপস। চরম নিঃসঙ্গতাবোধের মধ্যেই আমার জীবনের পরম সার্থকতা। পুরোপুরি অহং-বোধ অর্জন করাই হ'ল আমার লক্ষ্য। 'থিয়োরী অব্ নাম্বার্সে'র মধ্যে সবচেয়ে প্রবলেম কোনটা জান? 'নাম্বার' গুলোর ডেফিনিশন। পুরোপুরি ডিফাইন্ড্ এমন কিছুই নেই যা দিয়ে ডেফিনেশন শুরু করতে পার। 'একের' ডেফিনিশন কী হ'তে পারে ভেবেছ কখনো?

তাপস খানিকটা ভাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বললে—না। ম্যাথমেটিক্যালি সঠিক ডিফাইন করা যায় ব'লে শুনিনি। কিন্তু বীথি, তুমি যা বলতে শুরু করেছিলে—তার সঙ্গে একের ডেফিনিশনের সম্পর্কটা ঠিক—

বীথিকা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, সম্পর্ক রয়েছে ব'লেই বলছি। আমার রিসার্চ প্রবলেম আমার জীবনের প্রবলেম। থিয়োরী অব্ নাম্বার্সে'র চুলচেরা বিচার আমি করব। সংখ্যাগুলোর সংজ্ঞা খুঁজব। গাণিতিক সংজ্ঞার দার্শনিক ব্যাখ্যা করব। শুরু করব 'এক' থেকে। প্রথমেই আমাকে জানতে হ'বে 'এক' কী? ফিলজফিক্যাল ম্যাথমেটিক্সের বিচার—কিন্তু সমগ্র জীবন দিয়ে আমাকে উপলব্ধি করতে হবে। আমার অস্তিত্বের মধ্যে চরম আত্মকেন্দ্রীভূত সত্তাকে আবিষ্কার করতে হবে। ভেবো না, এ আমার তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা। যাকে ডিফাইন করতে চাই তাকে জীবন দিয়ে অনুভব করব। 'ওয়ান্‌নেস্' এর বোধ থাকলে 'ওয়ানের' ডেফিনিশন উপলব্ধি করব কী ক'রে? আমাকে অনুভব করতে হ'বে যে আমি একা—চরম একা।

হেঁয়ালি ছড়াচ্ছ বীথি—কিছুই বুঝতে পারছি না—কী বলতে চাও তুমি।

বীথিকা রাগ ক'রে বলে, কাজ নেই বুঝে। শুধু এইটুকু বুঝে রাখো যে ইউ গুড্ লিভ্ মি এলোন।

উঠে দাঁড়াল তাপস। মুখে কষ্টকৃত হাসি ফুটিয়ে তুলে সে বললে, তাই হোক। তোমার একাকীত্বের মধ্যে আর নাক গলাতে আসবো না। কিন্তু আমার সাহচর্য তোমার কাছে খুব মূল্যবান বলেছিলে কেন বলো তো? আমার সঙ্গ তোমার ওয়াননেসের উপলব্ধিতে যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, তা' কী জানো না?

বীথিকা ব্যস্ত হ'য়ে বলে, ম্যাথমেটিক্যালি তোমাকে আমি চাই। সত্যি তাপস, অনেক প্রবলেম আছে যা' তোমার কাছ থেকে বুঝে নিতে হ'বে। না, না, তুমি যেও না।

তোমার থিয়োরী অব্ নাম্বার্স আমার বোধের অগম্য। প্রবলেমগুলো নিজে নিজে সল্‌ভ্ ক'রে নাও—আর কেউ ক'রে দিলে তোমার ঐ চরম ওয়াননেসে কদাপি পৌঁছুতে পারবে না—একের সংজ্ঞাও খুঁজে পাবে না। চলি আমি।

তাপস চ'লে গেল। তার গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ক্যালকুলাসে মন দিল বীথিকা।

দিন কয়েক বাদে য়ুনিভার্সিটির প্রফেসার নিয়োগী বীথিকাকে ডেকে বললেন, চিরদিন পিওর ফিলজফির চর্চা ক'রে এসেছি। ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি বুঝি না। তুমি যে বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাও, ওটা হাইয়ার ম্যাথমেটিক্সের ব্যাপার। তুমি বরং ম্যাথমেটিক্সের রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা কর।

বীথিকা বলে, কিন্তু আমার সাবজেক্টটা তো ফিলজফিই। ওটা তো ফিলজফিক্যাল ম্যাথমেটিক্স নয়, ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি।

ও সব আমি বুঝি নে মা। শুধু এইটুকু জানি

যে তোমার ঐ থিয়োরী অব্ নাম্বার্স বেদান্ত, ন্যায় বা বৈশেষিকের সঙ্গে খাপ খাবে না। আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্যই তুমি পাবে না। এ হেন অবস্থায় কী ক'রে তোমাকে কাজ করতে দিই বলো? সিণ্ডিকেট যদি টের পায় স্কলারশিপটাই দেবে বাতিল ক'রে।

কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বীথিকা বলে, তা হ'লে কী হ'বে স্যার! আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করব ব'লেই ফিলজফির পরই ম্যাথমেটিক্সে এম-এ পড়লাম। আপনিই তো আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন—বলেছিলেন, হাইয়ার ফিলজফি বুঝতে হ'লে ম্যাথমেটিক্স পড়া দরকার।

ডক্টর নিয়োগী বিব্রত হ'য়ে বলেন, তা' না হয় বলেছিলাম। কিন্তু যে সাবজেক্ট তোমাকে আমি গাইড করতে পারবো না, 'সে' সাবজেক্ট নিয়ে তোমাকে রিসার্চ করতে দিই কী ক'রে?

জলভরা চোখে নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত ডক্টর নিয়োগীর মুখের পানে চেয়ে থেকে বীথিকা বললে, আপনার কী আমার ওপর এতটুকু বিশ্বাস নেই স্যার? আমি তো আপনাকে বলেছি যে আমি কারুর সাহায্য চাই নে।

কিন্তু পুরোপুরি তোমার ওপর ছেড়ে দিই কী ক'রে? স্কলারশিপটা তো আমারই আণ্ডারে কাজ করার জন্য।

বীথিকা জলভরা চোখে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল—কিছু বললে না।

অবশেষে ডক্টর নিয়োগী কিছুটা নরম হ'য়ে বললেন, ডক্টর রূপক মিত্রকে চেন? সম্প্রতি রিডার হ'য়ে এসেছেন। বন য়ুনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছিলেন তিনি—ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি নিয়ে কাজ করছিলেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা কর। উনি যদি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হন তা' হ'লে স্কলারশিপটা তোমাকে আমি দিয়ে দিতে পারি।

উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে বীথিকার মুখ। ডক্টর রূপক মিত্রের কথা সে শুনেছে। বন্ য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে তিনি যে বিশেষ নাম করেছিলেন তা সে জানে। শুধু সে জানত না যে ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি নিয়ে তিনিও কাজ করছেন।

সে তৎক্ষণাৎ গেল রূপক মিত্রের ঘরে।

ঘরের মাঝখানে মস্ত টেবিল—তার ওপর স্তূপীকৃত অসংখ্য বই। বইগুলো প্রায় দেওয়ালের মত আড়াল ক'রে রেখেছে রূপককে।

টাইপ-করা একরাশ কাগজ সামনে নিয়ে ব'সে আছে রূপক। নিবিষ্ট হ'য়ে পড়ছে—বীথিকার পায়ের শব্দ তার কানেও যায় নি।

বীথিকা অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখল রূপককে দেখল, ইস্পাতের বলিষ্ঠতার ওপর অগ্নিশিখার স্বাক্ষর—ধ্যানমৌন আত্মভোলা মুখখানিতে গলা সোনার দীপ্তি। দেখে গা শিউরে ওঠে। এমনটি কখনো দেখেনি—বুঝি কল্পনাও করে নি।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল বীথিকা—ডেকে কথা বলবে সে সাহস হ'ল না তার।

প্রায় মিনিট পনের বাদে রূপক মুখ তুলে তাকাল—ইস্পাত-শীতল ধারালো চোখের দৃষ্টি। চোখে চোখ পড়তে বীথিকার বুক কেঁপে ওঠে।

কী চাই?—রূপক ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলে ওঠে—আপনার কাছে এসেছিলাম।—বীথিকা মাথা নিচু করে বলে—গলার স্বর রীতিমত কাঁপে তার।

তা তো দেখতে পাচ্ছি।

মানে এই—থিয়োরী অব্ নাম্বার্সের ওপর রিসার্চ ক'রব ভেবেছি। একটা রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ডক্টর নিয়োগী বলেছেন যে যদি আপনি আমাকে গাইড করেন তিনি স্কলারশিপটা আমাকে দিতে পারেন।—কথা কটি ব'লে বীথিকা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রূপক বললে, রিসার্চের ব্যাপারে কাউকে গাইড করি না আমি। তা' ছাড়া গাইডেন্সের দরকার কী? সত্যিকারের তাগিদ থাকলে নিজে নিজেই রিসার্চ করতে পারবেন। আমি নিজে কারুর কাছে গিয়ে গাইডেন্স ভিক্ষা করি নি—আই হেট্ ইন্টারফিয়ারেন্স!

কিন্তু ডক্টর নিয়োগী বললেন যে কেউ যদি গাইড না করেন তিনি আমাকে স্কলারশিপটা দেবেন না!

দি ওল্ড ফুল!

কী বললেন স্যার!—বীথিকা চমকে উঠে বলে।

বলছিলাম যে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।—ব'লে রূপক তার কাজে মন দিল।

কিন্তু আমি কী করব স্যার!—বীথিকা ব্যাকুল কণ্ঠে বললে।

মুখ না তুলেই রূপক বললে, কাজ করুন গে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকুন। কারুর কাছে যেতে হ'বে না।

কিন্তু ডক্টর নিয়োগী যে আমাকে স্কলারশিপ দেবেন না!

রূপক মুখ তুলে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বীথিকার মুখের ওপর। তারপর বললে, আমাকে কী করতে বলেন আপনি?

মাথা নীচু ক'রে বীথিকা বললে, অনুগ্রহ করে ডক্টর নিয়োগীকে একবার আপনি বলুন যে আপনি আমাকে গাইড্ করবেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনাকে কখনো আমি বিরক্ত করতে আসবো না। আমি নিজে নিজেই কাজ করব।

খানিকটা ভেবে রূপক বললে, বেশ বলব আমি ডক্টর নিয়োগীকে। কিন্তু মনে থাকে যেন আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবেন না আপনি। কখনো কোন সময়েই কোন বিষয়েই আলোচনা করতে আসবেন না। আই—ওয়াণ্ট টু-বি লেফ্ট্ এলোন—এ্যাব্সোল্যুট্লি এলোন। বাই দি ওয়ে—আপনার নামটা কী?

বীথিকা রায়।

নোট ক'রে নিলাম। ভাল কথা—কী প্রবলেম নিয়ে আপনি কাজ করবেন?

ডেফিনিশন অব্ নাম্বার্স।

রূপকের ঠোঁটের কোণে ক্ষুরধার হাসি ঝিলিক দেয়—সে বললে, ঐ নিয়ে তো আমিও কাজ করছি। তাতে অবশ্য কিছু যাবে আসবে না। আপনি স্বাধীনভাবে কাজ ক'রে যান।

নিমেষে বীথিকার সমস্ত উৎসাহ যেন নিভে গেল। নিষ্প্রভ মুখে সে বললে, আপনার থীসিসের পাশে আমারটা যে একেবারে—

রূপক বীথিকার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিদ্রূপ ছিটিয়ে বললে, গোড়াতেই থীসিসের কথা ভাবছেন! ভয় নেই—ডক্টরেট পেয়ে যাবেন।

বীথিকা অধীর হ'য়ে বলে, আপনি কী লাইনে এ্যাপ্রোচ্ করছেন সেটা না জানলে হয়তো আমার কাজটা আপনার কাজের সঙ্গে ক্ল্যাশ করবে।

রূপকের চোখ দুটি জ্ব'লে উঠে। সে বললে, আমার কাজ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবো না। সত্যিকারের মৌলিকতা থাকলে ওরিজিন্যাল কিছু অনায়াসে দাঁড় করাতে পারবেন। তা' যদি না থাকে, এ কাজে হাত না দিলেই ভাল।

মাথা নীচু ক'রে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে বীথিকা।

রূপক বললে, এখন আসুন আপনি। আর মনে থাকে যেন, আই হেট্ ইণ্টারফিয়ারেন্স—আমাকে বিরক্ত করতে আসবেন না কখনো।

বীথিকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

স্কলারশিপ পেয়ে যায় বীথিকা। ডক্টর নিয়োগী বললেন, রূপক যে তোমাকে গাইড্ করতে রাজি হ'বে তা' আমি' আদৌ ভাবি নি। রণেন ও জয়শ্রীকে তো সে হটিয়েই দিয়েছিল। মনে হ'চ্ছে, সে তোমার ওপর ইম্প্রেস্ড্ হ'য়েছে।—ব'লে ডক্টর নিয়োগী হাসলেন।

উদ্দাম হ'য়ে ওঠে বীথিকার বুকের রক্তস্রোত। ইম্প্রেস্ড্ হয়েছেন! অথচ ইস্পাত-শীতল চোখ দুটিতে তার কোন আভাসই তো ছিল না। অতলান্ত সমুদ্র-গভীর দৃষ্টিতে আত্মকেন্দ্রিক সত্তা যেন বিশ্ব-সংসারের সকলের প্রতি অবজ্ঞা হানছে—শুধু বিদ্রূপের বক্রতা—আত্মসর্বস্ব অসহিষ্ণুতা!

স্কলারশিপ পেয়ে যতটা খুশি হওয়া উচিত ছিল—হ'তে পারল না বীথিকা। যে কাজ তার সমস্ত জীবনকে অধিকার করবে ভেবেছিল—তা' যেন তার অধিকারের সীমানার বাইরে চলে গেছে। সংখ্যাতত্ত্বের সূক্ষ্ম পথে বিচরণ তার অগোচরে অনেক আগেই শুরু করেছে রূপক—হয়তো সে তার লক্ষ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তার নিঃসঙ্গ বিচরণের পথ সে কল্পনাও করতে পারছে না। সে কী ক'রে জানবে—কোন উপলব্ধির আলোয় আলোয় আর সকলের দুর্বল প্রয়াসের ওপর ভাস্বর উঠেছে তার অবজ্ঞা। সেই একক আত্মকেন্দ্রীভূত সত্তা কোন সুদূর স্বর্গের আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে!

লাইব্রেরীতে রেফারেন্স বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বীথিকা

কেবল যে এক অতি অসাধ্য সাধ সে তার অহঙ্কারকে তৃপ্ত করবার জন্য মনের মধ্যে পুষে এসেছে এতদিন।

বীথিকা অস্থির হ'য়ে উঠে। কী করবে সে? কোথা থেকে শুরু করবে তার কাজ? এতদিন যা স্পষ্ট ছিল তা' যেন ক্রমশঃ কুয়াশায় ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে। মোটা মোটা বইগুলোর অক্ষরের কালিমার সমুদ্রে কোথাও যেন আলোর স্ফুলিঙ্গটুকুও নেই—শুধু আঁধার।

কান্না পেল বীথিকার। রূপক যদি সাহায্য না করে, কী ক'রে কোথা থেকে শুরু করবে সে তার কাজ?

আবার এল সে রূপকের ঘরে। রূপক ইজিচেয়ারে—আধশোয়া হ'য়ে বিলিতী একটি দার্শনিকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। বীথিকা ঘরে ঢুকতেই সে মুখ তুলে তাকাল। বীথিকার আর্ত-করুণ চোখের চাহনির সম্মুখে শীতল মর্মভেদী দৃষ্টি তলোয়ারের মত ঝলসে ওঠে। থর থর ক'রে কাঁপে বীথিকা।

রূপকের চোখ দুটি থেকে নিষ্করুণ অবজ্ঞা নির্মম জ্বালা ছিটিয়ে বীথিকার অস্তিত্ববোধকে যেন পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলতে চায়।

রূপক বললে, স্কলারশিপ তো পেয়েছেন—আবার এসেছেন কেন? আমি আপনাকে বলেছিলাম না যে আমার কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য পাবার প্রত্যাশা রাখবেন না আপনি?

বীথিকা মুখ তুলে তাকায়। তার চোখ দুটিতে অনেক কান্না-জমাট-বাঁধা ছায়া সন্তেও। আত্মসংবরণ ক'রে সে বললে, বলেছিলেন। কিন্তু আমি যে বুঝতে পারছি না কোথা থেকে আমার কাজ শুরু করব!

অবশেষে!- রূপক হেসে ফেললে। সে হাসি যেন হাজার হাজার ছুঁচের মত তার সর্বাঙ্গ বিঁধে ফেলে।

রূপক বলে চলে, শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন তো যে সাধ থাকলেও সব সময় সাধ্য থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে খুব একটা কঠিন বিষয় নিয়ে কাজ করবেন ভেবেছিলেন। বুঝতে পারছি না কী ধরণের মনোবিলাস এটা আপনার!

দুঃসহ অপমানের বৃশ্চিক জ্বালা নীরবে হজম করল বীথিকা। চরম অবমাননার জন্য যেন প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে সে।

বীথিকা বললে, মনোবিলাস নয়, সত্যিসত্যিই রিসার্চ করতে চেয়েছিলাম। ফিলজফির সঙ্গে ম্যাথমেটিক্সের চর্চা আন্তরিকভাবেই করেছিলাম। থিয়োরী অব্ নাম্বার্স সম্বন্ধে আমার উপলব্ধির স্বচ্ছতা সম্পর্কে এতদিন কোন সন্দেহের অবকাশ হয় নি। নাম্বার্সের চুল চেরা-ডেফিনিশন কি ভাবে সম্ভব তা'-ও যেন জানতুম। কিন্তু এখন হঠাৎ সব কিছু যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারছি না কোথা থেকে আমার কাজ শুরু করব।

দেখুন মিস রায়, অজ্ঞাতকে জানবার জন্যই রিসার্চ। সামের আঁধারের পানে আলোর পথ তৈরী ক'রে এগুতে হ'বে। আঁধারে আলোক সম্পাতই হ'ল রিসার্চ। কিন্তু অন্ধকারকে দেখে ভয় পেলে মুশকিল। আপনার ভেতরকার আলো হয়তো এই ভয়ে দিশাহারা হ'য়ে যাবে।

বীথিকা ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, তাই হ'য়েছে ডক্টর মিত্র—আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই হ'য়েছে! আমার আঁধারের মধ্যে আমি দিশেহারা হ'য়ে পড়েছি। দয়া ক'রে আপনার আলো দিয়ে আমাকে পথ দেখান।

রূপক গম্ভীর গলায় বললে, সে হয় না। রিসার্চ স্পুন-ফিডিং নয়। আপনাকে আপনার নিজের আলোয় পথ দেখে নিতে হ'বে। আমি নিজে কারুর কাছ থেকে পথের হদিস নিই নি। নিলে সে আমার পথ হ'ত না। গতিশীল মন আপনার পথ আপনি ক'রে নেয়। মনটা জড়বৎ হ'য়ে গেলে হাজার পথ দেখালেও সে পথের সন্ধান পাবে না। তা' ছাড়া প্রত্যেকের নিজস্ব বিচরণ ক্ষেত্রে তাকে একলা চলতে হ'বে—সেখানে আর কারুর স্থান নেই—হ'তে পারে না। যে একা চলতে ভয় পায়, তার পক্ষে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। আমার নিঃসঙ্গ বিচরণক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে আপনাকে বা কাউকেই আমি সাহায্য করতে পারবো।

রূপকের জলদ-গম্ভীর গলার স্বর ঘরের ভেতরে গম্ গম্ করে। কথা তো নয়, যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। রূপকের সমস্ত মুখখানা অগ্নিঘাত ইস্পাতের মত ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। বীথিকা নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে—তার মুগ্ধ চোখে জ্বলে আলোর বন্দনা।

বীথিকার চোখে চোখ পড়তে চমকে উঠল রূপক। হঠাৎ যেন একটা অননুভূত আবেগ তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে তার বুকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংবরণ ক'রে সে বললে, রিসার্চ আপনি করতে পারবেন না মিস রায়।

কেন?—বীথিকা চমকে উঠে বলে।

নিঃসঙ্গ পথচলা আপনার পক্ষে কঠিন।

বীথিকা আহতকণ্ঠে বলে, আমার অনেক দিনের সাধ ডক্টর মিত্র!

রূপক তিক্তস্বরে বলে, দুধের সাধ মেটাতে দুধ সব সময় আয়ত্তের মধ্যে আসে না মিস রায়। ঘোল দিয়ে সে সাধ মেটান। যে কোনও একটা মাইল্ড টপিক্সের ওপর থীসিস খাড়া করুন—সহজেই পেয়ে যাবেন ডক্টরেট।

ডক্টর মিত্র!—কান্নার উচ্ছ্বাসে বীথিকার গলার স্বর অবরুদ্ধ হ'য়ে আসে।

রূপক দেখল অশ্রু-আকুল চোখ দুটির মৌন আবেদন যেন সজল মেঘের মায়াকে ফুটিয়ে তুলেছে।

কিছুটা নরম হ'য়ে রূপক বললে, ডিস্‌কারেজ করব না আপনাকে। চেষ্টা করুন—হয়তো পেয়ে যাবেন পথের হদিস। কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবেন না।

পাংশু মুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে রূপকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বীথিকা।

রেফারেন্স বই স্তূপীকৃত হ'ল বীথিকার টেবিলে। পড়াশুনা ও অঙ্কষবার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় সে। মস্তিষ্ককে সূক্ষ্মতম চুলচেরা উপলব্ধির পথে সজাগ করবার চেষ্টা করে সে। জটিল সব ফর্মুলার প্রতিটি ধাপ মেপে এগুতে চায়—সে জানে যে সামান্যতম ভুলও তাকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করবে।

নিত্য সজাগ নীরস পথ চলা—বর্ণহীন এ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে জীবনটাকে পিষে ফেলা—বীথিকার মনে হ'ল এর চেয়ে নির্মমতর আত্মশাসন বুঝি কল্পনা করা যায় না।

রূপক নিষ্ঠুর! সে কী বোঝে না এ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তার ধাপে ধাপে কী যন্ত্রণা। এতটুকু সমবেদনা নেই ওর মনে!

নিরালম্ব শূন্যতাবোধ বীথিকাকে ঘিরে ফেলে। রিসার্চ তো নয়—দুরাশার পাষাণ স্তূপে নিষ্ফল মাথাকোটা।

শেষ পর্যন্ত বীথিকা বুঝল যে সে পারবে না—সারের অন্তঃস্পর্শী আঁধারকে আলোক চিহ্নিত করতে সে অক্ষম। সংখ্যাতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে নিজেকে দিশে-হারা বোধ করে সে।

রূপকের কাছে এসে বীথিকা বললে, আমি পারবো না স্যার। থিয়োরী অব্ নাম্বার্স নিয়ে রিসার্চ করার ক্ষমতা যে আমার নেই, তা' এখন বুঝতে পেরেছি।

বীথিকার শুকনো বিবর্ণ মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে রইল রূপক। তারপর সে হেসে বললে, কী ক'রে বুঝলেন যে আপনার ক্ষমতা নেই? না আমার ওপর রাগ ক'রে বলছেন?

বীথিকা সবিস্ময়ে দেখল—অবজ্ঞামুক্ত চোখের দৃষ্টিতে আকাশের নীলিমা—তার অবাক চোখে রূপকের নিবিড় দৃষ্টি স্বর্গের আলো বিকীর্ণ করে।

রূপক তার পাশের শেল্‌ফ্ থেকে অনেকগুলো পুস্তিকা তুলে এনে বীথিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, এগুলো পড়লে হয়তো বুঝতে পারবেন আমার লাইন অব্ এ্যাপ্রোচ। কিন্তু আমি চাই না, একই লাইনে আপনিও অগ্রসর হন।

বীথিকা কম্পিত স্বরে বললে, বুঝতে পারবো কিনা জানি নে।

কেন পারবেন না? বুদ্ধির দরজা নিশ্চয়ই কুলুপ এঁটে বন্ধ ক'রে রাখেন নি। অবশ্য নিজের ওপর আস্থা যদি হারিয়ে থাকেন, যান ডক্টর নিয়োগীর কাছে—দর্শনের ইতিহাসের ওপর আপনার জন্য কিছু একটা থীসিস দাঁড় করিয়ে দেবেন তিনি—ছেড়ে দিন থিয়োরী অব্ নাম্বার্স নিয়ে রিসার্চের দুরাশা।

বীথিকা মাথা নীচু ক'রে বললে, আপনার পেপারগুলো প'ড়ে দেখি—তারপর হয়তো দুরাশামুক্ত হ'ব।

দরকার নেই পড়ে!—হঠাৎ রেগে উঠে প্যাড্ সেট ও কাগজগুলো আবার শেল্‌ফে তুলে রেখে রূপক বললে।

বীথিকা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে, যাই তা হ'লে?

রূপক তার চেয়ার থেকে উঠে এল। বীথিকার চোখ দুটির ওপর নিষ্পলক মর্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন ক'রে সে বললে, কোথায় যাবেন? ঐ ওল্ড ফুল ডক্টর নিয়োগীর কাছে?

আপনিই তো যেতে বলছেন!—বীথিকা অবরুদ্ধকণ্ঠে ব'লে।

আমি বললেই আপনি যাবেন! থিয়োরী অব্ নাম্বার্স নিয়ে রিসার্চের এতদিনের পরিকল্পনা আমার কথাতেই বিসর্জন দেবেন?

অভূতপূর্ব রূপকের এ উত্তেজনা। বীথিকার কাছে রীতিমত হেঁয়ালির মত মনে হ'ল।

খুব কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে রূপক। তার উত্তেজিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বীথিকার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে।

নির্বাক বীথিকার কাতর বেদনাবিদ্ধ চাইনি রূপকের মুখের ওপর এসে স্থির হ'য়ে থাকে।

রূপক বললে, দিন কয়েক ধ'রে আমার মনে হচ্ছিল, এতদিন ভুল পথে চলেছি আমি। 'এক-কে' জানতে চেয়েছি 'শূন্য' দিয়ে—কিন্তু 'শূন্য' দিয়ে শুরু করা যায় কী? আর সব সংখ্যাকে না জানলে শূন্যের উপলব্ধি কী সম্ভব? শূন্যকে সুস্পষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে সীমিত করা যায় কী? সংজ্ঞানির্দিষ্ট শূন্যের শূন্যতা কী সঙ্কুচিত হ'বে না?

রূপকের গলার স্বর কাঁপে। বীথিকা বিমূঢ়। রূপকের প্রশ্নগুলি সংখ্যাতত্ত্বের জটিল জিজ্ঞাসাই শুধু নয়—তারা যেন তার জীবনের চরম প্রশ্নের মত তার অন্তরের গভীরতম অন্তস্তল মথিত করে।

রূপক ব'লে চলে, বহু বৎসর ধ'রে জীবনে চরম নৈঃসঙ্গকে উপলব্ধি করতে একা থেকেছি—আমার জীবন-দর্শন আমার একক সত্তায় কেন্দ্রীভূত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপর আপনি এলেন।

ব'লে রূপক থামল। রূপকের চোখের দৃষ্টির স্বাভাবিক তীব্রতা স্নিগ্ধ বিষাদে উধাও হয়েছে। বীথিকা মন্ত্রমুগ্ধ। রূপকের বিষণ্ণ চোখের অব্যক্ত বেদনা তার মনকে দোলা দেয়।

বীথিকার হাতে হাত রাখল রূপক। তার অন্তরের আবেগ হাতের কাঁপনে স্পন্দিত। বীথিকা শিউরে ওঠে। তার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তবে নেমে এসেছে যেন স্বর্গীয় পারিজাত-স্পর্শ।

অনেকক্ষণ ধ'রে কোন কথা বলে না রূপক। তবু কত কথা বলা হ'য়ে যায়।

রূপক বললে, তুমি এসে আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়েছ। আজ আমি বুঝতে পেরেছি 'শূন্যের' আগে আর সব সংখ্যাকে জানতে হ'বে। আরও বুঝেছি যে 'এক' পুরোপুরি 'এক' নয়। 'একের' মধ্যে 'দুই' আছে—'দুই' এর মধ্যে এক। 'একের' সত্য উপলব্ধি করতে 'দুইকে' জানতে হ'বে। 'দুই'য়ের সমন্বয়ে যে 'এক'—সেই 'একই' সত্য। এতদিন আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম—তুমি আমাকে আমার মধ্য থেকে বের ক'রে এনেছ। তুমি যেমন আমার সাহায্য চেয়েছ—আমিও তেমি তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

রূপকের গলার স্বর কাঁপে।

বীথিকার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নামে। গাঢ় স্বরে সে বলে, আমি তো জানি নে কী সাহায্য আমি আপনাকে করতে পারবো। শুধু জানি, আপনার সাহায্য আমার চাই। নইলে আমি ব্যর্থ।

রূপক হেসে বললে, তোমাকে বাদ দিলে আমিও অসার্থক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা যে যুগে ছাত্র ছিলাম, তাহা ছিল নবজাগরণের যুগ। তখন পুরাতন ভাঙিয়া নূতন ভারত গঠনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সময়েই কলিকাতায় প্রথম বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—একদল মহাপাপী তাহাতে যোগদান করিতে চলিয়া যান। পূর্বপ্রান্তে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে এম-এ ক্লাস খোলা হইয়াছে—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদানের জন্য এম-এ ক্লাসে ৯টি বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত পড়ানো হইতেছে। আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বি-এ পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত অনার্স পাঠ করি—তাহা ছাড়া স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে পাঠ করি। আর্থিক অভাবের মধ্যে লেখা পড়ার সুযোগ হইত না—পরীক্ষা দিবার পূর্বে অনার্স ছাড়িয়া দিয়া পাস কোর্সে ১৯১৯ সালে বি-এ পাশ করিলাম। তখন ১৭নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বর্গত পণ্ডিত তুলসী-প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের কাছে থাকি। তাঁহার গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ দেখা-শুনা করি। তাঁহার গৃহে নিজস্ব ভাল পাঠাগার ছিল—দর্শন, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের বই বেশী ছিল। সকল বইই নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতাম। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, লোচন ও জ্ঞানানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীঘন মহাপ্রভু সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় লিখিত বহুগ্রন্থ সে সময়ে দেখিবার সুযোগ হয়।

পরম শ্রদ্ধাভাজন আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ পল্লীরই অধিবাসী। তিনি আমাদের পরিচিত, কারণ আগড়পাড়ায় আমার প্রতিবেশী পূজনীয় ডাক্তার সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল—সুনীতিবাবু আমাকে সংস্কৃত অনার্সের কয়খানি বই কিনিয়া দিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষার খবর তখনও প্রকাশিত হয় নাই—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আচার্য ষষ্ঠীচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্নেহ ও কৃপার পাত্র ছিলাম—তিনি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার ১০।১৫ দিন পূর্বে আমাকে জানাইয়া দেন যে আমি পাস করিয়াছি। পথে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা—তাঁহাকে পাশের খবর বলিলাম ও জানাইলাম, সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পড়িব। তিনি হাসিয়া বলিলেন—তাহা করিও না—কালই সকালে আমি সুশীল-বাবুর বাড়ীতে (আচার্য শ্রীসুশীলকুমার দে) কলিকাতা মেডেল দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে নূতন বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দান সম্বন্ধে সকল খবর প্রকাশিত হইয়াছে—বলিয়াই একটুকরা কাগজে সুশীলবাবুকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন এবং আমাকে সুশীলবাবুর বীডন রো'স্থ বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। সুশীলবাবুর সহিত পূর্ব হইতে পরিচিত হইয়াছিলাম—তিনি পূজনীয় তুলসীপ্রসাদবাবুর বন্ধু ও তুলসীপ্রসাদবাবুর গৃহে প্রায়ই যাইতেন। মেডেল দেখিলাম ও পরে জানিলাম, প্রতি অতিরিক্ত ভাষা গ্রহণকারী একজন করিয়া ছাত্রের এম-এ ক্লাসের বেতন লাগিবে না—অধিকন্তু মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পাওয়া যাইবে। প্রথম যাঁহারা অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তাঁহাদের তালিকায় সুনীতিবাবু ও সুশীলবাবু উভয়েরই নাম ছিল। তবে তাঁহারা উভয়েই সে সময়ে সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত চলিয়া যান—তাঁহারা মাত্র ২।১ দিন ক্লাসে আসিয়াছিলেন। সুনীতিবাবুর স্থলে স্বর্গত কোবিদ আচার্য বিধুভূষণ মজুমদার (অঙ্ক) এবং সুশীলবাবুর স্থানে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজির খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আমাদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রফুল্লবাবু ইংরাজি সাহিত্যের লোক হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং আচার্য মজুমদারের যে কত গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা বলার ক্ষমতা নাই। তিনি বহুদিন পূর্বে বৃত্তিপরীক্ষা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় তিনি অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ব পড়াইতেন বটে, কিন্তু তাহা এত মধুর ও সরল করিয়া বলিতেন যে ক্লাসে ছাত্র-ধারণের স্থান থাকিত না। সংস্কৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আসিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও মধুর ছিল—তিনি যখন সংস্কৃত কাব্য বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত হইয়া তাহা শুনিয়া বিমলানন্দে অভিভূত হইতাম।

আমরা এম-এ ক্লাসে বহু সুধী ব্যক্তিকে অধ্যাপকরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শিবাজী ও পৃথ্বিরাজ মহাকাব্য এবং মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত লেখক আচার্য যোগীন্দ্রনাথ বসু আমাদের মধুসূদনের মেঘনাদবধ পড়াইতেন। বৈষ্ণবে তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলাম—কলেজের সেই খ্রিষ্ট-কবিকে অধ্যাপকরূপে পাইয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মধুসূদনকে তিনি কত ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রতি কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তিনি বহুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এম-এ ক্লাসে পড়াইবার সুযোগ দেওয়ায় তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রম করিতেন ও বোধ হয় স্কুলে প্রবীণ হইলেও তরুণ অধ্যাপকদের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসকে হৈচৈ করিয়া আসিতেন। আমাদের দলে ভাল ছেলেও ছিল—উত্তরকালে তাহারা খ্যাতনামা অধ্যাপকরূপে পরিণত হইয়াছিল। কাজেই অধ্যাপকগণকেও বেশ সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইত। স্বর্গত চারুচন্দ্র ঘোষোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সে সময়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রের

সহ-সম্পাদকের কাজ করিতেন ও বিদ্যালয়ের হলে লেখা পাঠ করিতেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক উপন্যাস তাঁহাকে কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি আমাদের কবিকঙ্কণ লিখিত চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য পড়াইতেন। তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য কি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার লিখিত 'চণ্ডীমঙ্গল বেরিবী' পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের পড়াইবার জন্যই তাঁহাকে ঐ সুবৃহৎ টীকা-পুস্তক রচনা করিতে হইয়াছিল। লোক চিনিবার তাঁহার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রথম দিন নাম ডাকিয়া তিনি রোল-কল করিবার সময় সকলকে চিনিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দিন ক্লাসে আসিয়া রোল-কল করিলেন না। তৃতীয় দিন তিনি আসিতেই আমরা বলিলাম, স্যার, কাল আপনি রোল-কল করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন—আমি তোমাদের সকলকে চিনিয়া লইয়াছি। আর রোল-কল করার প্রয়োজন নাই। তোমরা আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারো। ৩০ জন সহপাঠী পর পর দাঁড়াইয়া উঠিতেই তিনি তাহাদের পূর্ণ নাম বলিয়া দিলেন, আমরা সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বহু প্রকার রন্ধনের বর্ণনা আছে। আমাদের সকলকে একদিন তিনি অনুরোধ করিয়া ঐ সকল রান্না তরকারী বিষয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্নে ব্যস্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করিতে এবং 'ঘৃত বিনা লালিতার পাতা রান্না' প্রভৃতি করিতে তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি কত ছাত্রবৎসল ছিলেন, তাহা আজ স্মরণ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। আমাদের চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়াইতেন, হসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির পাঠোদ্ধার ও টীকা রচনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা—ইহার ছাত্রগণ—পরিষৎ প্রকাশিত ৫০ টাকা মূল্যের গ্রন্থ মাত্র ১০ টাকায় ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনিও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ছাত্রদের পড়াইবার জন্য নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। লাল আলুতোষ লাহা বাংলাদেশ হইতে আমাদের অধ্যাপক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ধনশালী ছিলেন—এই সকল অধ্যাপককে তিনি বৎসরে মাত্র তিনশত টাকা মাহিনা দিতেন—কোন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা তখন সম্ভব ছিল না। আমাদের পালি ও প্রাকৃত পড়াইতেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈলেন্দ্রবাবু তখনও সেই প্রলুব্ধকর বিভাগের সেক্রেটারী হন নাই—তিনি তখন কৌন্সিলের শর্ট্‌হ্যাণ্ড রিপোর্টার ছিলেন। তিনি আমার বাসগ্রাম সন্নিহিত আড়িয়াদহের অধিবাসী—পথে চলা পরিচয় ছিল। অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ আমার পূর্ব-পরিচিত, তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও স্নেহে অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তাঁহার নিকট শিশুপাল বধ—(সাধারণ সংস্কৃত বিভাগে) নীতিশাস্ত্র (দর্শন বিভাগে) ও কিছুকাল সংস্কৃত অলঙ্কারের ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার নিকট যে উৎসাহ ও স্নেহ লাভ করিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। বাহিরে তাঁহাকে গম্ভীর বলিয়া মনে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনা সরল ও ব্যবহার অতীব কোমল ও মধুর ছিল। আমাদের সময়ে প্রাচ্যবিদ্যা কমিশনের সদস্যগণের সহিত স্যার্ জন্ উড্‌রফ্ সাহেব নিজে সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসেন। সুরেন্দ্রবাবু তখন আমাদের শিশুপালবধ পড়াইতেছিলেন। শ্লোকের প্রথমার্ধ ছিল 'উদ্যন্নিতান্তং নিগৃহীত মানসৈ'—তিনি এমন সুন্দর করিয়া তাহা ছাত্রদের বুঝাইলেন যে, স্যার্ জন্ তাহা শুনিয়া সুরেন্দ্রবাবুর অধ্যাপনার উচ্চ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রবাবুর পিতা আচার্য যদুনাথ ব্যাকরণের কথক ছিলেন এবং সুরেন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস শুধু তাঁহার মহামহোপাধ্যায় সহিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নহেন, গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছেন। এম-এ ক্লাসে অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ আমাদের কিছুদিন সৌন্দর্যতত্ত্ব পড়াইয়াছিলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও আচার্য বিনয়চন্দ্র মজুমদারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বন্ধুবর হেমন্তকুমার সরকার তখন ঋত্বেক-ব্রাহ্মণ—বিদ্যাসাগর অনুপস্থিতিতে তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের পড়াইতে আসিতেন। চট্টগ্রামের কবি পণ্ডিতমোহন সেনও অল্প কিছুদিন আমাদের অধ্যাপক হইয়াছিলেন ও সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইয়াছিলেন। তৎকালীন ছাত্রবন্ধু সাহিত্যিক অধ্যাপক আশুতোষ বীরেশচন্দ্র দেব সে সময়ে আমাদের বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইলেন। তাঁহারই একান্ত আগ্রহে ও চেষ্টায় স্যার আশুতোষ অধ্যয়নাধ্যাপনে অগ্রসর হন—অর্থাৎ বিদ্যাতার (ইংরাজি) মুখে যাতার (বাংলা) স্থান দেন। বীরেশবাবু বাংলা এম-এ ক্লাসের শুধু প্রবর্তক ছিলেন না—প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করিয়া স্যার আশুতোষের কার্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। লেখক এম-এ ক্লাসে গুজরাটী ভাষা পাঠ করিয়াছিল—তখন হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া, তামিল, অসমিয়া, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম, মারাঠী, গুজরাটী, পঞ্জাবী প্রভৃতি বহু ভারতীয় ভাষার একটি বাংলার এম-এ পরীক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য ছিল—অবশ্য পালি ও প্রাকৃত মূল-ভাষা হিসাবে সকলকেই শিক্ষা করিতে হইত। গুজরাটীর অধ্যাপক ডক্টর আই-জে-এস-তারাপুরওয়ালা পার্শী, বোম্বাইবাসী ছিলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন—পূর্ব নাম ছিল ইরাক জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুর ওয়ালা। তাঁহার পিতার নাম ইরাক, পিতামহের নাম জাহাঙ্গীর, পিতামহের নাম সোরাবজী ও তারাপুরগ্রামের লোক বলিয়া তারাপুরওয়ালা। আমরা ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, ঐ সঙ্গে ডাকঘরের নামটি যোগ করিয়া দিলে পুরা ঠিকানা হইয়া যাইবে। তিনি বয়সে তরুণ, উৎসাহী ও সহৃদয় লোক ছিলেন। আমি প্রায়ই সন্ধ্যায় তাঁহার ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ফ্ল্যাটবাড়ীর বাসায় যাইয়া পড়িতাম ও তাঁহাদের সহিত একত্র আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইতাম। পার্শী হইলেও তাঁহারা নিরামিষভোজী—কাজেই কোন অসুবিধা ছিল না। ৩০ বৎসর পরেও তাঁহার স্নেহমধুর, স্নেহময় ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারি নাই।

বাংলায় এম-এ নূতন খোলা হইল, আমরা প্রথমবর্ষের ছাত্র—তখনও বেশী ছাত্র আসুই হয় নাই। আমরা ১৭জন ছাত্র ছিলাম। পরে সুষমতা ও সুধালতা বোয়ারা নাম্নী দুইটি অসমীয়া ছাত্রী আমাদের সঙ্গে পড়িতে আসিয়াছিল। সহপাঠীদের মধ্যে শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। শ্রীবিভূতিচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর কলেজ (তখন নাম মেট্রোপলিটান), শ্রীবিভূতিভূষণ কাঁঠাল সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (তখন নাম রিপন), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বর্দ্ধমান রাজ কলেজে অধ্যাপক হইয়াছেন। স্বর্গত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত আমাদের সহপাঠী ছিলেন বটে, কিন্তু ১৯২১ সালে আমাদের সহিত পরীক্ষা না দিয়া পরে এম-এ পাশ করেন ও কলিকাতা স্কটীশচার্চ কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বপতি একাধারে কবি, গল্প লেখক, উপন্যাস-লেখক, সমালোচক, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি বহুগুণের অধিকারী, কিন্তু আলস্য তাঁহাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত করিয়াছে। ৺যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া সাবডেপুটী ও পরে ডেপুটী হইয়াছিলেন। রাধাচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করিতেন। শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া চট্টগ্রামে চলিয়া যান। তিনি চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত ডাঃ বেণীমোহন দাস ও কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাসের ছোট ভাই—নিজেও কংগ্রেস-নেতা। চট্টগ্রাম হইতে দৈনিক পাকস্থলী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ পাল রাজসাহী-নাটোরে ফিরিয়া গিয়া ওকালতী ব্যবসা করিতেন, পরবর্ত্তীকালে একবার নাটোরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অধ্যাপক ও সহপাঠীরূপে আরও কয়েকজনকে পাইয়াছিলাম, আজ দীর্ঘকাল পরে আর তাঁহাদের সকলের কথা মনে পড়ে না। যতীন্দ্রকুমার, অম্বিকাচরণ ও লেখক এক বৎসর কাল ২০।৩ বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে পোই গ্র্যাজুয়েট মেসে বাস করিয়াছিলাম। সে সময়ে তথায় বহু এম-এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও কর্ম-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, অনেকে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য দীনেশচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসিয়া ও তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছি—তাহারই কথা সংক্ষেপে বলা যাইবে। আমি ১৯২০ সালের প্রথমেই শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহকারী রূপে দৈনিক বসুমতীতে সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করি। কাজেই এম-এ পড়া ও পুরাপুরি সাংবাদিকের কাজ করা একই সঙ্গে চলিয়াছিল। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় শ্রীমতী এনি বেসান্টের সভানেত্রীত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বেচ্ছাসেবক রূপে যোগদান করি—রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং তখনকার দিনে তরুণ ব্যারিষ্টার যুগল—বসন্তকুমার লাহিড়ী ও ইন্দুভূষণ সেন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। তাহার পর ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে আবার কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল—সভাপতি পাঞ্জাব কেশরী লালালাজপৎরায় ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এবার সাংবাদিক রূপেই কংগ্রেসে যোগদান করি এবং প্রায় সর্বক্ষণ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। এই ভাবে কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ট যোগাযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতেই ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়—গান্ধীজি সে আন্দোলনের নেতা ও স্রষ্টা। সমগ্র ভারতকে তাহা অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে ইতিহাসের কথা। তাহার ফলে আমাদেরও পাঠ্য জীবন কিছুকাল বন্ধ রহিল—আন্দোলনের তীব্রতা কাটিয়া গেলে বা আমাদের মন ভিন্নমুখী থাকায় ১৯২১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৮ দিন এম-এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল অধ্যাপক লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের জ্ঞান, বিদ্যা, মনুষ্যত্ব, জীবনে সাফল্য প্রভৃতির কথা যতই লেখা যাউক না কেন, তাহা সম্পূর্ণ করা যাইবে না। আচার্য্য দীনেশচন্দ্র, আচার্য্য চারুচন্দ্র, আচার্য্য যদুনাথ, আচার্য্য তারাপুরওয়ালা, সুপণ্ডিত বিধুশেখর, কোবিদ-প্রবর সুনীতির প্রভৃতির কথা পৃথক পৃথক ভাবে লিখিবার বাসনা রহিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহারা ছিলেন দিক্‌পাল। যে দেবতার নিত্যপূজা করি তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য কোন দিন হইবে কি না জানি না—কিন্তু আচার্য্যগণের মধ্যে যে দেবত্ব দেখিয়াছি, আজও সেই আদর্শই জীবন পথের সম্বল হইয়া আছে। সেই সকল দেবতার কথা যে দিন স্মরণ করি, সেই দিনই জীবনের সুদিন বলিয়া মনে করি।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

—'তুমি কত দেশে
বিদেশে বিদেশে
ঘুরেই বেড়াও।'

....এ আর এক নোতুন রূপ দেখলাম। ভোরবেলাতে খুব ভাঙলো—ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্রশস্ত নদী, শান্ত-বিস্মিত স্থির। ওপারে ঘন হাওয়ার মত বনশীমা দেখা যায়, আকাশের ধনকালো ছায়া-মূর্তি চোখে পড়লো, নদীর জলের উপর এসে দাঁড়ালো কুয়াশার ঘোমটা ঢাকা একটি নারী, কপালে সিন্দুরের টিপ...রাতের অভিসারে যেন ভার নারী কোন অভিসারিনী ঘুম ভাঙিয়ে এসেছে আমার আঙিনায় ঘুম পথে।

...মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি, চুমোয় চুমোয় ভরে তুললো সে আমার কপোল,...ওর সিন্দুরের আভা লাগলো আমার দাড়া ললাটে, অনুভব করি একটি অতীন্দ্রিয় স্পর্শ, আমার যেমন পূর্বরাগ কামার কামার জলতে উঠেছে। অনুভব করি সমস্ত শরীরে কি অনাস্বাদিত-পূর্ব প্রসাদি ; গাংএর জলে যে লাল ঘোমটা মুখের শিখে উপুড় করে দিয়েছে, কোন না দেখা তুলির রং লাল ছোপ বসিয়েছে গায়ের মাথায়—উড়ন্ত গাংচিলের পাখায়। কি এক মহাভাষা—কি এ অপূর্ব ছবি। কাছে আছে তবু দেখা যায় না, ধরা যেয়না। এ সেই যেবতায় মহাভাষা, যে ধরা যায়—ছুঁয়া যায়—এ অবিনশ্বর।

...নৌকার মাঝিরা, ষড়রা সবাই ঘুমে অচেতন। একা জলে আছি দাঁড়িয়ে—বুক আকাশের নীচে। যেদিকে দুচোখ যায় ঘুমে কোথাও মানুষের চিহ্ন নাই ; অসীম আকাশের নীচে আমি একা—প্রথম আলোর পুলকস্পর্শ আমার যেহমনে ; হে মহাদেবতা আমার শতপাপের সব কলুষ তুমি তোমার পুণ্য জলধারায় ধুয়ে করে যাও ; যে মহাজনমে নীরবে চলেছে তোমার আরাধনা—সেই মহাজীবনে আমাকে মিলিয়ে নাও। কৃপণ তুমি ! শত মাথাকুঁড়েও তোমার কণামাত্র পাইনা মানুষ। শুধু ইসারা করো, অবহাই থেকে যাও। স্বার্থ ভরা আর সংসারের দোলায় দিয়েকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রেখেছি। কি তাগি করতে পেরেছি যে মহান কিছু পাবার দাবী আমার করেছে ?

প্রথম লোকালয় ছেড়ে যখন জলে প্রবেশ করি তখন মন ছেয়েছিল একটা আতঙ্কে। বন্যজন্তু মানুষের নাগিয়া পাওয়া মন নিরাপদ মাটিকে ছেড়ে আসতে চায় নি। যে মন মাঁকড়ে ধরেছিল সেই গ্রামীন জীবনকে, সেই পুরোনো মন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, তার জায়গায় যে চাপাপড়া মন মাথা চড়া দিয়ে উঠেছে সে খুনো-মানুষের। কোন যখন মানেনি সে, কোন শ্রীতি-সম্পর্ক আকর্ষণে ওকে জড়িয়ে ফেলতে পারেনি। বিশাল উন্মুক্ত বিশ্বের বুকে যে বাধাবন্ধনহীন মনটিকে আবিষ্কার করলাম অবিকের জন্ত সে আমার অজানাই ছিল, ধরা ওকে যায় না। আমার হাতেও ওকে হারিয়ে ফেলবো। অন্ত-মনে যে এসেছিল আপন খেয়ালেই সে চলে যাবে। মাঝিরা বলে—ঘুমঘরে এলে মানুষ সব ভুলে যায় ; অন্ত কোন জিন ভর করে তার ঘাড়ে, তাই রাতের আঁধারে এ ঘরে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না. ...অন্ধকার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়—তাদের দুহাতে ঢাকা মুখ থেকে ভীষণদের চীৎকারে।

—হু—"হু—উ উ উ"

পিছনের নৌকা থেকে সাড়া আসে—"হু-উ-উ"

বিদের বেলাতে উঠলো উত্তরে হাওয়া, জোয়ারের টান আর বিপরীত হাওয়া, বিপদপ্রসারী নদী উঠলো মেতে, মাঝিরা ভুলে গিলায়, পিছনে হাওয়া,...দেখতে দেখতে সাড়ে তিনঘণ্টি বেতলাই নৌকা মেতে উঠলো। ছোটএর মাথায়, একটার পর একটা ছোট টপকে চলেছে নৌকা। হালে বসেছে ছোকরা মাঝি কালাচাঁদ। এ গাং তার চেনা—হাল ধরেছে সেইই। ষড়রা বসেছেন চায়ের জল সামনে নিয়ে ; এরাবি তাঁর চায়ের সঙ্গে অন্ত একটা কাপ ফেড়েছে, পাইচার দিক শুনতে হয়, একটি ধারণা থাকলে চলবে না, তারপর চাএর 'স্পেশাল ষড়ম' আছেই।

হঠাৎ শোনা মাঝির সঙ্গে কালাচাঁদের ঝগড়া। ছোলা নীচে থেকে চীৎকার করে।

—'হাল ধরতে শিখিসনি মোক্ষা করে—সঙ্গে আমার ডুংগো।'

—'পড়ে গেল তা কি করবো। দেখনা পালে কেমন টান ধরেছে। এখন হাতছাড়া যায়, নৌকা বেকায়দা হয়ে যাবে।'

'রাম হুমারই কথা, হাল ধরেছে সেই সঙ্গে কালাচাঁদ মাঝিরা ডুংগো। মাঝিদের বেবদায় রাজপুতদের সঙ্গে একজায়গায় মিল আছে। কথায় বলে—'যারো রাজপুত তেরো দাড়ি, তবু ঘরে দাঁড়ি দাঁড়ি।'

এরেও তাই, এক একজনের একটা করে হুকো। হুকো খেলে ছোলার তত দুঃখ ছিলনা, কালাচাঁদ গাংএ পড়লেও ধো সো করে উঠবে, কিন্তু যে খেয়ে সে আর উঠবেনা। সন্ত তামাক সাজা সরস আবেজি কলকেটা হুকোর মাথা থেকে খুলে পড়ে গেছে গাংএর জলে।

ষড়রা মাঝিকে বলে—'এই ছোলা, নিয়ে যা নোতুন কলকে, ওই আছে তামাক, সকাল বেলাতেই টেঁসালনা।'

ছোকে আর তামুক যদি খেতে দিই ? গজগজ করে ছোলা কালাচাঁদের উদ্দেশ্যে।

ক্রমে পৌঁছতে আর বেড় ভাটি লাগবে। যদি পালে ভালো হাওয়া থাকে তবে এই ভাটিতে পৌঁছতে পারবো। লোকের মুখ দেখবো একটু

নিরাপদ আশ্রয় পাবো, লোক সমুদ্রের চরে তবু ত ক'দিন নিরুদ্বেগ কাটাতে পারবো।

—'বেরে চল মাঝি।'

প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হচ্ছে নদী, জোয়ার চলেছে, এখনও ভাটা সামনে। দেখা যাক কতদূরে গিয়ে ঠেকে নৌকা।

এতদিন পর্যন্ত নদীর বাঁকগুলো চোখে পড়তো, ঘুরে বাঁ'লাতে কি ডানহাতে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু এবার আর সেটা হলো না, নদী গিয়ে পড়ছে মোহনার মুখে, শুনেছে সমুদ্রের ডাক, দীঘল লীল আঁচল মেলে দিয়ে সে ছুটেছে, এতদিনের প্রতীক্ষার পর পেয়েছে প্রিয়ার সন্ধান। এই মিলনের আশায় কেটেছে তার কতকাল, ফুলে ফুলে রঞ্জিত হয়েছে কত ব্যাকুলতা, বাধা পেয়ে দুধারবাপে ফুঁসে ফেঁপে উঠেছে মত্ত আক্রোশে। নৌকা চলেছে, সোজা বাঁক এড়িয়ে নদীর মাঝ বরাবর, দুদিকে বহুদূরে দেখা যায় অস্পষ্ট বনরাজি :

—'বাবু। পিছনে দুটো নৌকা আসছে।

—'দেখা যায় বহুদূরে নদীর বুকে চলিষ্ণু কালোবিন্দুর মত এগিয়ে আসছে দুটো খোলা ডিঙ্গি ; ছিপ কি অন্য কিছু বোঝাগেল না ;··· দুপুরের শুষ্ক রোদ—জলের বুকে লুটিয়ে পড়েছে, বাতাসও নাই যে পালতুলে এগিয়ে যাবো ; সামনে বাঁকের মাথায় সমুদ্রের মোহনা ; কিন্তু সেই দূরত্বও পাঁচ মাইলের কম নয়।

মোহনার মুখ থেকে আর চার পাঁচ মাইল ওদিকে পাড়িদিতে পারলেই সমুদ্রের বুকে কেনোর চরে পৌঁছে যাবো' একশো মাইল বিপদসঙ্কুল পথ পার হয়ে এসে কূলের কাছে যদি লুটে-পুটে দিয়ে যায় সব, এর চেয়ে আর আপশোষের কি হতে পারে। যদি সেই অনাহার, শীতের কাপড়, বিছানা অভাবে কষ্টই ঘটবে—সেটা পথের প্রথমে ঘটলেই তো হতো ; অকূলসমুদ্রের বারে ওকাণ্ড ঘটলে সভ্যজগতে ফিরতে পাঁচদিন ; পাঁচদিন নাথেয়ে এই ঠাণ্ডায় রাতের হিমে কাঁপতে কাঁপতে আসলে ফিরতেই পারবো কিনা—কে জানে।

দাঁড় নৌকা দুটো এগিয়ে আসছে। এক ছোট ছুট জাতীয় নৌকা, গতিবেগ ওদের বেশী, চারটে দাঁড়ের বেগে আসছে, দূর থেকে চলমান দাঁড় দুটো যেন সূর্যের আলো পড়ে শাণিত তরবারির মত ঝকমক করে কি এক পৈশাচিক নৃশংসতায়।

আমাদের ডিঙিরাও বাইছে, কিন্তু বেশ অনুভব করি ওদের গতিবেগও মন্থীভূত হয়ে এসেছে। দুপাশে তীর ভূমি অনেক দূরে আবছা দেখা যায় মাত্র। শুনেছি নৌকা চড়াও হলে অনেকসময়ি প্রাণভয়ে লাফ দিয়েই পড়ে গাংএর বুকে, তারে কাছে হলে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায় ; কারণ কুমীর বাঘের ভয়ও তুচ্ছ হয়ে ওঠে প্রাণের তারের কাছে। নৌকা ভেসে যায় অকূলে বিনাবাধিবাধিতে। এখানে বোধহয় সেটা ঘটবেনা, কারণ কোন হুসিয়ার মাঝিই এই অকূল গাংএ লাফদিয়ে পড়তে যাবে না। দূর থেকে কাছেই এগিয়ে আসছে নৌকা দুটো।

···ব্যাগ থেকে সিগারেটের কয়েকটা টিন নৌকার খোলে এদিক ওদিকে ফেলে দিলাম ; পাক্কা সিঙ্গনে ছুটো দিন কাটবে, কিন্তু এই উত্তেজনা—আতঙ্ক আর শীতের দিন রাত্রি কাটাতে ওর সাহায্য চাই।

···আর কিছু নগদটাকা একটা বইএর ভিতর রেখে দিলাম ; চাকাতের দল একগাদা বই ঘেঁটেছে, ওই গুলোলিয়ে যাবেনা বা ওতে হাত দেবেনা নিশ্চয়ই।

বড়দা স্থির হয়ে বসে আছেন ; পলুইএর ফাঁক দিয়ে ওই নৌকা দুটির দিকে চেয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চার জন দাঁড়ি একজন মাঝি রয়েছে হালধরে। খালি গা, মাথায় গামছা বাঁধা, হাঁড়ের টানেটানে আন্দোলিত হচ্ছে পেশীবহুল দেহটা, একখানা নৌকা বাঁয়াতে চলে গেল ঘুরে পালের দিকে, এগিয়ে আসছে একখানা।

—'কোথাকার নৌকা!'

ছই থেকে বার হয়ে দাঁড়ালাম, হাফপ্যাণ্টএর উপর মাথায় ক্যাপ, কণ্ঠস্বরে যতদূর সম্ভব ভয়ের উপর সাহসের গিল্টী করিয়েছি।···

এগিয়ে এল নৌকাটা ; চেয়ে দেখি ওদের খোলে বন্দুক বা অন্য কি অস্ত্র-শস্ত্র আছে। বড়দা কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে—

—'জবাব দিচ্ছনা যে? কোথাকার নৌকা—যাবে কোথায় তোমরা?'

নৌকাটা এগিয়ে আসে,···

'—আমের ডিঙ্গি, খোলের ভিতর জাল শুপকরা রয়েছে।

চলে গেল নৌকাটা ; ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো—তাহলে চোর! ডাকাত নয়, জেলেরা আছে এখানে ওখানে এই সমুদ্রের চরে, কিন্তু এতদূরে যে বজরা চলেনা, দূরে দেখা যায় একটা সাদা পালকের মত কি—জেলেডিঙ্গি চলেছে বালামতুলে। এর বেশী কোন অস্তিত্ব চোখে পড়েনি।

শরিফ বলে—'জাল ফাল দিয়ে কথা বাবু, ওরা তলাস নিতে যায় হয়েছিল···

—'তুই খোলের ভিতর কি করছিস্? বাইরে আয়—

ডাক শুনে বার হয়ে এলো সে। সঙ্গে রয়েছে সেই মুরগীটা। ওটা ও চুরি করে নিয়ে যাবার মত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে কিনা—তাই পরীক্ষা এত সাবধানী'।

"—উই···দূরে···বহুদূরে দেখা যায় কেনোর চর। আমাদের যাত্রার শেষ হবে ওখানে। মিলবে ক'দিনের জন্য নিশ্চিন্ত নির্ভর একটু আশ্রয়, লোকজনের মুখ দেখতে পাবো, বড় বড় নৌকা ভরে আছে ওখানে কফিয়ের জন্য, বন মুখর হয়ে উঠেছে বাওয়ালিদের।···

চরে থাকি, সামান্য একটু কালোরাগ দিগন্তের বুকে কে টেনে রেখেছে, চারিদিকে নীলসমুদ্র, ঢেউএর মাথায় মাথায় সাদা ফেনার স্পর্শ, ···ওখো ওই স্থির বারিবিন্দু,···জলের উপর মনে হয় কি যেন ভাসছে··· মাটির বুকে কোন অস্তিত্ব ওর নাই···ভাসমান একটা অচল পদার্থ! সমুদ্র ওই মাটিটুকুকে তার লবণাক্ত জিহ্বার আগে এনে ধাক্কিয়ে রেখেছে,—এক মুহূর্তের মধ্যেই প্রলয়করে ফেলবে ওই সর্বনাশা মহাসমুদ্র। ক্ষুদ্র বুদ্বুদকায় পটলুকে।

—'কোন দিকে চলেছিস রে!'

কালাচাঁদ জবাব দেয়—কিন্তু পা'টা ঘষে গেছে যাদু, আর টান নাই, পায় যন্ত্রণা করছে, জোয়ারের মুখে 'পাউড়ি' দিয়ে কি আমাদের পড়বো এই সময়ে?"

নীচের দিকে তাকাতে হবে আমাদিগকে, পা'টা ছাড়া এগোনো যাবেনা, সুতরাং আমার নোঙর করে বসে থাকতে হবে। রাত্রি এগারোটায় আসবে ভাটা। আকাশের অবস্থা ভাল থাকলে—মাঝ রাত্রি থাকলে তবেই জমবে পাউড়ি, নয়তো কাল দিনভাটার অর্থাৎ আগামীকাল বেলা ১১টার। নিকটে এসে এই দুস্তর বিপদের সামনে মানুষকে পড়ে থাকতে হবে—এ অভাগার নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কি? ওই ডিঙিওয়ালা তরাস নিয়ে গেছে ডাঙ্গাকান্দিই আছে কোথায়, রাত্রির গভীরে এসে হানা দেবে। না হলে এত পথ এসে শেষ মাথায় ঠেকে পড়ে থাকতে যাবা হবো কেন? এও কোন নিষ্ঠুর ভাগ্যের পরিহাস।

…নৌকা মাঝ পার থেকে তীরমুখো করে আনলো; বাঁপালের চরে না গিয়ে এলো দূরে ডাইনের চরে।

—"এপারের দিকে চইলি না কেন?"

…ক'দিনে ওই তোলা—'চর—সেদিন শুনিলাম? দুটো কেরেকে ধরেছে এই বড় বিয়ালে। সে ব্যাটা হকের যোয়ার পেয়ে ছোঁ ছোঁ করে খুজছে। পেলেই দেখা যায় চরের বাইরে, জেনে শুনে ওই খানে যাবো নৌকা?…চল ওপারে—"

…এপার থেকে ওপারে। ওপারেই বা কোন মহানগর গড়ে তোলা হয়েছে যে ওই পারই নিরাপদ! সেখানেও তো ওদেরই রাজত্ব; যে বাঘ—সেতো এখানে উঠতি যাকতে যাকতে পার হয়ে যাবে। তার পর মানুষ-বাঘের গল্পগুলো পাড়ই হয়েছি, লক্ষ করে এখনও কেন গ্রাস করেনি ভগবানই জানেন।

…বৈকাল গেছে। জোয়ার আসছে; বিস্তৃততর ভূমির একপ্রান্তে সমুদ্রের সফেন ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে—অন্যদিকে সুরু হয়েছে সুন্দরী গাছের বনবীথা; লোনাজল জন্মেছে তীরে; নৌকা থামতে দেখি গাছের ফাঁকে কয়েকটা হরিণ, সিঙ্গেল ও রয়েছে একটা। আমাদিগকে দেখে ছাল দিয়ে সরে গেল, একটা বাচ্চা তখনও দূর থেকে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে, একটা চীৎকার! নীরবতাভঙ্গের ভয়ে মনের ভিতর থেকে ডাকদের মতো হরিণ…বাচ্চাটা চলে গেল ভিতরে।

…শুরু মাঝি, জল কানা জমে আছে ঠাঁই ঠাঁই। বাঙ্গলায় কিরূপ চরে, মাঝিতে আমাতে দুদিন দুরাত্রির পর! বাংলার শেষ সীমান্ত…এই পুণ্যভূমিরই পা ধুইয়ে দিচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ:…ঠাঁই ঠাঁই জমে আছে বড় বড় ভেলিকিসের ডেলাডেলে মেয়াকলস, ঝিনুক-আছড়ে পড়ে এসে চেউয়ে…আকাশে বাতাসে মন্ত্রগর্জন,…

শোঁ শোঁ শোঁ!

প্রতিধ্বনিতোলে বনভূমি।

কালাচাঁদ হাল নিয়ে নেমে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে চললাম আমরাও দূর বনের দিকে লক্ষ্য রেখে, কে জানে যদি কেউ বাঘ ঘরে আসে হালুম করে। বড়দা বলে ওঠে—

—"মা—মা, এত সহজে ফেরেনা ওরা।"

…ছাড়ে—পাগলী—শিলেট মাঝ আসছে জানে। দেখতে দেখতে একখানতী মাঝ হয়ে গেল।…সন্ধ্যার সময়ে জানো।…সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে গাছের মাথায়ে, বিশাল সীমাহীন বিস্তৃতির এক কোণে পড়ে আছি আমরা কয়েকটি প্রাণী, অন্তহীন অতল তমসা এসে গ্রাস করল আমাদিকে; চরভূমি সব ডুবে গেছে জোয়ারের জলে, কেবল জল আর জল! আকাশে বাতাসে সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন…আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো তীরে।

…রাত্রি নেমে এসেছে,…তীরে তীরে আঘাত করে ফিরছে জলস্রোত ছল—ছলাৎ…ছলকে উঠছে জল।

ওই বুঝি ঘাড় ফেলে ঝিপ মেরে কারা আসছে।…অধীর প্রতীক্ষায় কাটে রাত্রি,…নৌকার আলো মিটিমিটি-মিলায়,…রাত্রে থাওয়া তাড়াতাড়ি সেরেই। কথা বলিনা, নীরবে মুখবুজে বসে আছি। রাত্রির বুকে অশরীরীর দল ছায়ামূর্ত্তি ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের স্পর্শ আসে বাতাসে বাতাসে, কানাকানিতে ওঠে তাদের চাপা ষড়যন্ত্রের গুঞ্জরণ।…কি এক অজানা আতঙ্ক;…কত বিরাট এই প্রকৃতির দুস্তর বুকে কী নিরাশ্রয় অসহায়ের মত পড়ে আছি!…তখনও নিজের অস্তিত্বের জন্য নিজেকেই বারবা দিচ্ছি, সাবাস আমি। এত বিপদের মধ্যেই ঠিক বাঁচিয়ে রেখেছি নিজেকে কৌশল করে, কিন্তু মানুষ কেন কিসের জোরে কার ভরসায় বেঁচে আছে—সে সত্য উপলব্ধি করবার মত শিক্ষার অভাব আমার ছিল।

…রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে; নৌকায় ঘুম নোঙর করা অবস্থাতেই ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো; কালাচাঁদ যায় হয়ে আসে ছই থেকে —নৌকা 'বাইল' দিছে বাবু!'

অর্থাৎ পা'টার টান সরু হয়েছে! বিশাল আকাশ হাজারো তারার আলোয় ঝিকমিক করছে,—নিথর পার-এর বুক পড়ে আছে আয়নার মত স্থির হয়ে, একটি ঢেউও নাই। কোন দুরন্ত শিশু যেন তার দুইটি ভুলে দিয়ে বিছানায় স্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—"পাউড়ি দিবি?"

আকাশের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়েথাকে কালাচাঁদ। বিরীক্ষণ করছে মধ্য গগনের গ্রহতারায়! ছায়াপথের ঠিক ছাতি একদিক থেকে অন্যদিকে অফুল সমুদ্রে মেশে গেছে, তার কোণে জল জল করছে মীনাঙ্ক তারাটা, ওপাশে নীচে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল! মনে মনে হিসাব করছে।

পার-কূল দেখা যায় না, বঙ্গোপসাগরের বুকে পাড়ি দিতে হবে কোন ঘাঁপের সন্ধানে, একটু পথ ভুল হলেই যায় হয়ে যাবে উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে, তারপর? কিছুদিন আগেই সংবাদপত্রে বার হয়েছিল খবরটা পাকিস্থানের নীচে বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে এমনি কোন ঘাঁপে পাড়ি জমাতে গিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল নৌকা—প্রায় আঠারো দিন পর মাত্র কয়েকটি জীবন্ত কঙ্কাল সমেত সেই নৌকা পৌঁছেছিল ওপারে আরাকান বিপাখা-পত্তনের কূলে। আরাকান তবু কূল পেয়েছিল—সে জীবিত ব

মৃত্যু যে অবধারিতই হোক, কিন্তু অকূলে ভেসে যায় কতো নৌকো তার হিসাব কে রাখে ?

বড়দা বলে ওঠেন—"তোল নোঙর, এখানে এভাবে বসে থাকা যায় না। ঘর পাড়ি।"

উঠলো নোঙর ! হালের মোড়ে নৌকা একটা আর্তনাদ করে তীরের সীমা থেকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো। কালাচাঁদ মাঝির বসে জোনাকুনি হাল ধরেছে,—ধ্রুবতারা এবং কালপুরুষ এই কোণের ঠিক সোজা জায়গায় পাউড়ি।

লেখাপড়া জানেনা, তবু ওদের চোখে আকাশ ধরা দেয় অসীম হয়ে, গাংএর জলধারা-কলকল শব্দে ওদিকে পথ বাতলে দেয়, বুক ঢালা নিশ্বাস নিয়ে বাতাসে আগামী ঝড়ের ইঙ্গিত শুনতে পায়। প্রকৃতির সন্তান—কত তারাজ্বলা রাতে মেপেছে পৃথিবীর নিঃশব্দ সাধনা, ভালবেসেছে এই গাং-বনানীকে, তাই আকাশ বাতাস নদী এদের ধরা দিয়েছে ওদের হাতে, জানে জানে শুনিয়ে যায় কত সুখ দুঃখের কথা।

—"তোরে ভাই—বিঁকের মায়"—

ঘাড় পড়বে। দাঁড়িয়া ঘাড় টেনে চলেছে প্রাণপণে সবশক্তি একত্রিত করে। তাদেরও প্রাণের ভয় আছে, যত তাড়াতাড়ি পাউড়ি ওঠে, ততই মঙ্গল, কে জানে কোন মুহূর্তে এই শান্ত সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠবে। ছপোর দাঁড়ে কে যেন ঘাঁড় ফেলেছে,—ঝলকে উঠছে রাতের আঁধারে ছপোলি ফল। অসংখ্য ঝকঝকে জলকণা ছিটকে পড়ছে, ঘুরে ঢেউএর মাথায় কল্পকল্লোলের কলকানি। এ কোন এক জল কথার রাজ্যে এসেছি। জীবনকৌটায় বন্ধ আছে জীবন ভ্রমর, অতল রহস্য লুপ্ত রয়েছে ওর বুকে।

পাড়ি জমতে লাগবে আড়াই ঘণ্টা ; গোলাঘা, হলদি এবং ভাঙ্গাগুলানী নদী এসে সমুদ্রে মিশেছে এই পানে, আর আছে নারায়ণতলার খাল। ভাঁটার সময় চারটে স্রোত এই একাকার বাতাসাত করে, তারের আলোড়নের ঘূর্ণিতে ঘেরে আছে কালাচাঁদ। জলের ধারা লক্ষ্য করছে, আর খোচড় মারছে হালে। কট কট আর্তনাদ করে ওঠে হাল।

ছইএর ভিতর শুয়ে চোখ বোজবার চেষ্টা করি। টাপুরে নৌকাটা যাতে বাঁধা হয়েছে, সেটাতে ঘুমুচ্ছে সরীফ ; সারাদিন খাঁড়টানার পর বেচারাকে আর তোলা হয়নি, ওর বাকী কাজ টানছে খাঁড়।

হঠাৎ একটা কাঁকানিতে তন্দ্রা ছুটে গেল। আবছা অন্ধকারে কানে আসে তোলা মাঝির অস্ফুট আর্তনাদ—'ইয়া আল্লা !"

কালাচাঁদ উপর থেকে ঝিড় ঝিড় করছে। টাপুরে নৌকাটা এসে বড় নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ে, প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে ওঠে নৌকাটা, যেন ওর তক্তাগুলো খুলেই যাবে এখুনি।

আবার একটা ঝাঁকুনি,···কে যেন নৌকাটাকে আসমানে তুলে ছেড়ে দিল অতলে,·· কাঁকানির বেগে ছিটকে পড়লো জলের কুঁজোটা ; ছইএর ভিতর গড়িয়ে পড়ছে জল।···বিছানা বালিস ভিজে গেল।

বড়দা তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলেন পাটাতনে। আমিও।

পাঁচ সেলের টর্চের আলো দামনের দিকে ফেলতেই দেখি···ছোরালো আলোর সামনে হিংস্র জন্তুদের মত অবর্ণনীয় লালসায় কুণ্ডলি পাকাচ্ছে চাপ চাপ সাদা কুয়াশা। আকাশের তারা গেছে মিলিয়ে, ঘন কুয়াশার আস্তরণ গ্রাস করেছে দমুদ্র—আকাশ-বাতাস—সমস্ত ধরিত্রীদেশ। ফেঁপে ফুলে উঠেছে সমুদ্রের বুক, কিছুমাত্র বেগা যায় না, শোনা যায় হাজারো ঘোড়ার খুর উন্মাদ কলরবে ছুটে আসছে। বাতাসে বাতাসে ভাষের বাঁধনছেঁড়া মাতামাতি—উন্মাদ কলরোল :

আমরা শুদ্ধ, হতবাক্। নিঃশেষ অপেক্ষা করছি নিশ্চিত মৃত্যুর !

—"কোথায় এসেছি ?"

—"কি করে বলবো, কিছুই মালুম পাই না। আসমানের তারাও ঢেকে গেছে।"

"কি করবি ?"

একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো টাপুরে নৌকার গলুইএ, মোচার খোলার মত দুলছে নৌকাটা, যে কোন মুহূর্তে ওর কাছি ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে তলিয়ে যাবে অতলে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে সরিফ টাপুরের চাল থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়ল বড় নৌকার খোলে, বগলে একটা রংচটা সুটকেস, হাতে সেই বুধপীর বাচ্চা। সভয়ে সেটাও আর্তনাদ করছে। ভিজে বেরে উঠেছে শরীর। ভয়ে—শীতে কাঁপছে ঠক ঠক করে।

"নোঙর ফেল। বেচে কাজ নাই। কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বি।"

সেইটাই নিরাপদ পন্থা, আর এগোন উচিত নয়, কে জানে একবার যদি পথ ভুল হয়, তাহলেই নিশ্চিত মৃত্যু, আর পথ ভুল যে করি নাই—তাই বা কে জানে। তারার দিশারায় চলেছিলাম—সেও তো ঢেকে গেছে অনেক আগে।

নোঙরের কাছি খুলেই চলেছে, মুখব্যাদান করে রয়েছে কোন দুর্বার রাক্ষস, তার ক্ষুধা আর মেটে না। সজোরে মোটা নোঙরখানা কাছিটার দিকে ছেড়ে থাকি, ঢল মেলে না। নখুই হাত নীচে জলের মাঝে ঝুলছে কাছি,—অন্য একটা কাছি ছুড়ে নামলো মোচার প্রায় একশো কুড়ি হাত জলের নীচে। একশো কুড়ি হাত জলের উপর ওঠেনি, কোথায় মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঢেউ আসবে—ছিঁড়ে ফেলবে নৌকাকে তারপর ? আমার প্রাণহীন দেহটাও ওই জলের নীচে পাতালপুরীতে পৌঁছবে, অবশ্য আমি তার খোঁজ পাবো না এই যা সান্ত্বনা !···

ঘুম ছুটে গেছে। সেতারের তারে যখন সুর ওঠে, তখন প্রতি মিনিটে তার নির্দিষ্ট একটা কম্পনবেগ থাকে, কিন্তু সেই কম্পনবেগ যদি কোনকারণে বেশী হয়ে পড়ে সেই তারে কণিকাগুলো বন্ধ করতে পারেনা সেই আলোড়ন, ছিঁড়ে যায় তখনই। আমার মনের সমস্ত তন্ত্রীগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বোধহয় নিঃশেষ হয়ে আসছে। এতদিন বিপদ—দুর্যোগের চোকায় সাড়া দিয়ে দিয়ে আজ সীমারেখার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে। কেমন যেন নির্জিব হয়ে পড়েছে সে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বসে—ভুলছি সংসারের জোলায়। মনে হয় চীৎকার করে বলি ওদিকে—খুলেদে নৌকা, যদি মৃত্যু আসে এখুনিই আসুক, এমনি করে মৃত্যুর মুখোমুখি বসে তার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকতে পারি না।

জীবনকে ভালবাসতে হবে নিজের সুখদুঃখ অতীতকে। মিছুর কর্তব্যের থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের কোটরে লুকতে চায়, চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার সন্তান—শ্রীর মুখ। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে তার পাশে সুবোধ; হয়তো ছেলের ছোট হাতখানা বেষ্টন করে ধরেছে তার মায়ের গলা, কপালে গালে লুটিয়ে পড়েছে একরাশ চুল,... তার জানবেও না—এমনি রাত্রিতে কোথায় অন্নোপসাগরের বুকে জলে আমি জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাদের কথা স্মরণ করে গেছি।

মিছুর প্রকৃতি—মিছুর ভগবান! ছিলে ছিলে মানুষকে বেঁধেছো। জননীর মায়ার বন্ধনে, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, সংসার-বন্ধু-বান্ধব। ভালবাসতে শিখিয়েছো, শিখিয়েছো পৃথিবীকে ভালবাসতে। মুহূর্তের প্রখর আলোর ঝলকানি তাকে দেয় লাগায়, বহুদিনের ঘেরা ধরণী তার কাছে নববিবাহিতা বধূর মত মধুর হয়ে ওঠে,—এ তোমার মিছুর পরিহাস! মৃত্যুর শর দিয়ে তুমি সেই সকলকে পঙ্গু করে ফেলে। যদি সে পৃথিবীকে, মানুষকে না ভালবাসে, তবে এই দুনিয়ায় তার স্থান থাকবে কি?

তোমার মৃত্যুর চোখরাঙানিকে সে তো পরোয়া করবে না। মানুষের এতদিনের ভালবাসা একদিকে, অন্যদিকে রেখেছো তুমি মৃত্যুকে। তাকে করেছে পরম সত্য। সত্যই যদি হয় তবে তার সৌন্দর্য কোনখানে? কে জানে? হয়তো এই চোখ তাকে পরখ করতে পারেনা,...তারজন্য প্রয়োজন অন্য চোখ—অন্য মন, অন্য হৃদয়।

একটি স্মরণীয় রাত্রি! প্রতিটি পল—মুহূর্ত তার প্রভাব রেখে গেছে আমার জীবনে। বিরাট ভেষজাহীন, নিষ্ক্রিয় রাত্রি, প্রকৃতি আপনমনে আমার আমার মনের পাতায় নিজের আপনে রচনাকরে গেছে সেই রাত্রির মহাকাব্য। বর্ণনা করতে পারিনা—অনুভব করতে পারি।

কখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে জানিনা, চোখমেলে দেখি ছই এর বাইরে পালের নীচে গুঁড়ি মেরে বসে আছি। কুয়াশায় ভিজে গেছে শরীর। সমুদ্রের ফোঁপানি থেমে গেছে, পুবদিকে আবীরের রং জমে উঠেছে। ঝাঁপাপেশের চমকে উঠি—মনে পড়ে রাত্রির জমাট আতঙ্কের স্মৃতি। মাঝি বলভূমি জেগে উঠেছে; আমাদের নৌকা থেকে হাজার হাতের মধ্যে। ঠিকই এসেছিলাম আমরা কাল রাত্রিতে।...মাঝি মাল্লারা পালের নীচে গুঁড়িসেরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক ওরা—সারারাত কাটিয়েছে কি এক দুশ্চিন্তায়, একটু বিশ্রাম করুক। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি আমরা।

আকাশে ভিড় জমিয়েছে গাংচিল। বাটার পাখার মত নৌকার উপর ঘুরে বেড়ায়—চীৎকার করে। ওদের দিকে চেয়ে থাকি। সমুদ্রের বুকে রং এর তুফান তুলে সূর্য উঠছে?

ক্রমশঃ

হেমন্ত

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তের অপূর্ব বৈকাল!
সোনালি গাঁদারা এসে ভরিয়া দিতেছে শূন্য ডাল।
দোপাটীরা চলে গেছে কবে!
দল-পদ্ম সেই পথে একে একে মিলায় নীরবে!
খর্জুররসের লোভে গাছে গাছে পাখাদের ভীড়;
শালিখের কিচির-মিচির,
ছাতারের অশ্রান্ত বকুনি,
ঘুঘুর করুণকণ্ঠে বৈরাগ্যের একতারা শুনি;
বুলবুলিদের কণ্ঠে বাজে জল তরঙ্গের সুর;
রক্তসূর্যা বনানীরে পরায় সিঁদুর!
কী সুন্দর আজিকার অপরাহ্ণ বেলা!
কাঠবিড়ালীরা করে খেলা।
চারিদিকে বসুধার সবুজ সুষমা।
তোমরা করিও মোরে ক্ষমা—
তারা বলে, রজনীর স্বপ্ন এ সংসার,
আজিকার এই যে বিকাল,
খর্জুরের রসে যত বুনো পাখী হয়েছে মাতাল,
ওদের বাঁধন-হারা কণ্ঠের কাকলি দিয়ে ভরা
মিথ্যা হোলো এই বসুন্ধরা?
মিথ্যা হোলো এই রবিরশ্মির আবীর?
মৃত্যুই একান্ত সত্য? আর সবই কল্পনা কবির?

মেঠো পথ

শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়

এতো শুধু মেঠো পথ তবে কেন এতো আলো
রাত জাগা করা পাতা কংকাল প্রাংগণে
প্রাণের বিচিত্র পথে কতো আবির ছড়ালো
ক্ষণিক পরশ লাগে এ নিষ্পেষিত মনে।

এতো শুধু মেঠো পথ কাল পথের ওধারে
হলুদ বিদেহী চোখে উত্তপ্ত নিশ্বাসে
চলমান ইতিহাস বারে বারে উঁকি মারে
করুণ আর্ত সুরে এই আকাশে বাতাসে।

ভয়াল প্রকৃতি ফেরে তন্দ্রায় তন্দ্রায়
জাগা পথে আসা আলো মনের গোপন কোনে
প্রাণের আকুতি জাগে কত আবেগ জাগায়
প্রলম্বিত আশাপথে ঘুনিবিড় আলাপনে।

তাই আজ ভাল লাগে আলো আর মেঠো পথ
লাল কনিকায় জাগে শুধু বাঁচার শপথ।

"ক্রান্ত কাতরা"

لوحة رقم ٥٧ : النسر

গান

ওগো শ্রীপঞ্চমী—
(তুমি) লহ প্রণাম, লহ প্রণাম।
জনম জনম ধরি হে দেবী বাগীশ্বরী
আশিস করগো অবিরাম॥
বেদ-বেদান্ত গণিত-কবিতা
জ্ঞানদায়িনী বীণা-শোভিতা
ওগো পূতা, ওগো পবিতা
(দেবী) লহ প্রণাম লহ প্রণাম॥

বীণার মধুর তানে, ভরাও কণ্ঠ গানে
জ্ঞানের উজ্জ্বল-শিখা কর বিতরণ
হে মোর পরম, হে মহাস্মরণ

কুসুম কোরকে গাঁথা মালাটি পরাও
নবীনা, প্রবীণা-অভিরাম

লহ প্রণাম, লহ প্রণাম

কথা—শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদ্বিজেন ভট্টাচার্য্য

```
II  সা  সঋা  ণ্া  |  সা  ঋা  পধপা  I  মা  ।  ।  |  গমগা  ঋগঋা  সা  I
    ও  গো  শ্রী      প  ন্  চ০০       মী  ০  ০     ০      ০     ০

    সা  সঋা  ণ্া  |  সা  ঋা  পধপা  I  মা  ।  ।  |        ।     ।  I
    ও  গো  শ্রী      প  ন্  চ০০       মী  ০  ০        তু     মি

    মা  পা  দা  |  র্সা  র্ঁ  র্ঁ  I  না  র্সা  দা  |  পা  ।  মা  I
    ল  হ  প্র      ণা  ০  ম্       ল  হ  প্র      ণা  ন্  ০

    গা  মা  ঋা  |  সা  ।  ।  I
    ন  ঃ  প্র      ণা  ০  ম্
```

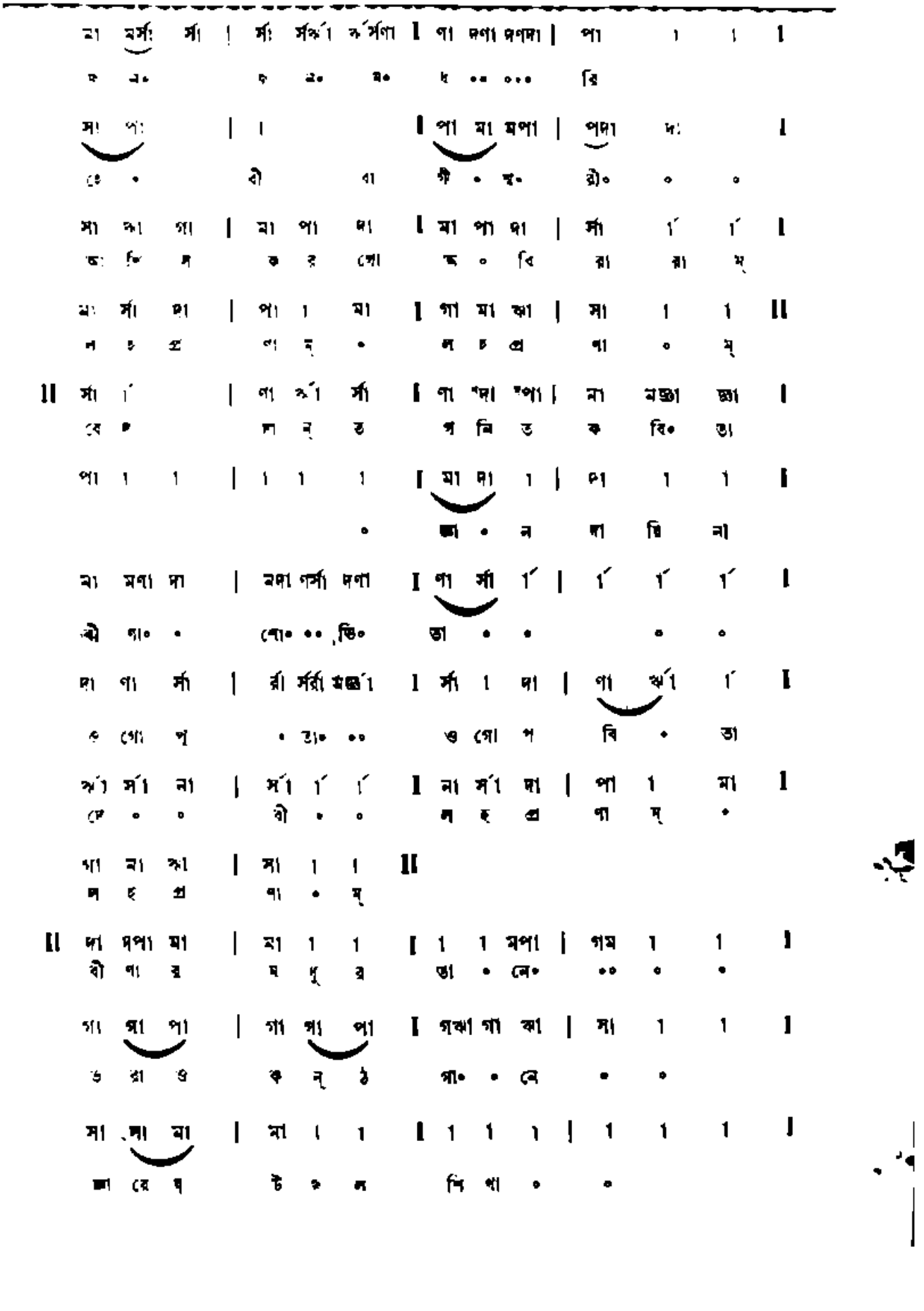
ম মর্সা র্সা | র্সা র্সর্ঋা ঋর্সণা | ণা দণা দণদা | পা । । ।
ক ল০ ক ত০ ম০ ধ ০০ ০০০ রি
সা পা | । | পা মা মপা | পদা দা ।
হে ০ বী বা শী ০ মু০ রী০ ০ ০
সা ঋা গা | মা পা দা | মা পা দা | র্সা র্ । র্ ।
ভা ব্লি ল ক র গো ক ০ বি রা রা ম্
মা র্সা দা | পা । মা | গা মা ঋা | সা । । ॥
ল চ প্র ণা ন্ ০ ল চ প্র ণা ০ ম্
॥ র্সা র্ | ণা ঋা র্সা | ণা ণদা ণপা | মা মজ্ঞা জ্ঞা ।
বে ণ লা ন্ ত গ নি ত ক বি০ ত্তা
পা । । | । । । | মা দা । | দা । । ।
০ জ্ঞা ০ ন দা ত্তি না
মা মণা দা | মদা ণর্সা দণা | ণা র্সা র্ | র্ র্ র্ ।
ঋী ণা০ ০ শো০ ০০ ,ভি০ ত্তা ০ ০ ০ ০
দা ণা র্সা | র্সা র্সর্রা ঋজ্ঞর্া | র্সা । দা | ণা ঋর্া র্ ।
ও গো পূ ০ ত্তা০ ০০ ও গো প বি ০ ত্তা
ঋর্া র্সা না | র্সা র্ র্ | না র্সা দা | পা । মা ।
কে ০ ০ বী ০ ০ ল হ প্র ণা ম্ ০
গা মা ঋা | সা । । ॥
ল হ প্র ণা ০ ম্
॥ দা দপা মা | মা । । | । । মপা | গম । । ।
বী ণা রু ম ধু রু ত্তা ০ নে০ ০০ ০ ০
গা গা পা | গা গা পা | গঋা গা ঋা | সা । । ।
ভ রা ও ক ন্ ঠ গা০ ০ নে ০ ০
সা সা মা | মা । । | । । । | । । । ।
জ্ঞা রে ষ্ ট ০ ল শি খা ০ ০

•	মা	।	নগা	গপা	মা	।	।	।	।	।	।	।
	ও		র বি০	ত০	র	ণ্	০	০	০	০	০	০
	সা	মা	।	মা	গা	মা	মা	পা	।			।
	কে	কো	ব্	প		০	র	ন্	০		০	
	পা	।	।	পধা	মপা	পণা	ধা	।	।	।	।	।
	কে	ম	ছা	স্থ০	০০	০	র	ণ্	০	০	০	০
	ধা	ণা	র্সা	র্সর্জ্ঞা	র্জ্ঞা	।	র্জ্ঞর্রা	সর্রর্সা	ণা	ধা	।	।
	কু	সু	ম	কো০	র	কে	গা	০	ণা	০	০	০
	পা	দপা	পা	মা	সা	ঋা	মা	।	।	।	।	।
	মা	লা০	টি	প	০	রা	ন্	০	০	০	০	০
	সা	।	ঋা	মা	।	।	মা	গা	মা	পা	।	।
	ন	০	বী	না	০	০	প্র	০	বী	না	০	০
	ধা	মা	পা	ধা	।	র্সা	।। লহ প্রণাম, লহ প্রণাম্।					
	অ	০	ন্তি	রা	০	ম্						

(পূর্বানুবৃত্তি)

উষা একসঙ্গে দুই খিলি পান এবং খানিকটা কিমাম মুখে পুরিয়া গল্প করিবার জন্য সূর্যাসুন্দরের বিছানায় আসিয়া বসিল। বসিয়াই বুঝিতে পারিল পিক্ ফেলিবার জন্য উঠিতে হইবে। পিক্ ফেলিয়া আসিয়া আবার বসিল। কুমার তখনও দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া উষা বলিল, "তুইও ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে ব'স্ না। দাঁড়িয়ে রইলি কেন। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয় বাপু"

"তোমরা গল্প কর। আমাকে একবার মাঠে যেতে হবে"

কুমার বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বাবার 'স্নুতিকথা'টি লইয়া গেল।

"তোমার শরীর দুর্বল লাগছে না তো বাবা"—উষা জিজ্ঞাসা করিল।

"না। আমি বেশ ভাল আছি। তোদের সবাইকে দেখে আমার অর্ধেক অসুখ সেরে গেছে। যেতে তো হবেই এবার, তবু অসুখ হয়েছিল বলেই দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে, তা না হলে সবাইকে একসঙ্গে এমনভাবে একসঙ্গে পেতাম কি—

সূর্যাসুন্দর হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

কেন থামিলেন তাহা বুঝিতে উষার বিলম্ব হইল না।

"মেজদা সেজদার কোন খবর এখনও আসে নি, নয় ?"

"না। উশ্ আসবে। পৃথ্ কি করবে কে জানে"

"মেজদার খবর কি পাও কোনও—"

"কুমার মাঝে মাঝে চিঠি পায়। কুমার তাকে খবরও দিয়েছে"

"মেজদা খবর পেলে আসবে ঠিক"

সূর্যাসুন্দর চুপ করিয়া রহিলেন।

সূর্যাসুন্দরের অবস্থার সত্যই অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। মুখ-চোখের স্বাভাবিক রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বাম হাত এবং বাম পায়ের অবশ্য তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার নিজের কোনও অশান্তি বা উদ্বেগ ছিল না। ব্যাপারটাকে তিনি মানিয়াই লইয়াছিলেন।

উষার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুই ডায়েট কনট্রোল করছিস শুনলাম। ওসব করতে যাস নি, দুর্বল হ'য়ে যাবি। আমাদের বংশে রোগা কেউ নেই। তোর মতো যখন আমার বয়স, তখন আমার ওজন ছিল আড়াই মন। সাধারণ ঘোড়া আমাকে বইতে পারত না"

"তোমাদের সে যুগই আলাদা ছিল। এখন যে সবাই ঠাট্টা করে। আমার দেওর আমার কি নাম রেখেছে জান? ফ্যাট ফাক্টারি। এক্ এক্ বলে' ডাকে। ওদের গুষ্টির সব কড়িংয়ের মতো চেহারা। ওদের মধ্যে আমি হয়েছি বকো মধ্যে হংস যথা। প্রত্যেকটি হাড়ের কাঠি-কাঠি চেহারা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। আর জান বাবা, দরকারই আমার চেয়ে বেশী খায়। সেজা তো তিনবার ভাত নেয়, অথচ ওই রোগা সিক্‌লিকে চেহারা—"

সন্ধ্যা খবরের কাগজের একটা অংশের উপর আঙুল বুলাইয়া তাহা দিগন্তকে দেখাইল। দিগন্ত তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া পড়িতে লাগিল সেটা। সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে তাহার কানে কানে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না।

সূর্য্যসুন্দর উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর শ্বশুর-পোর বিয়ে বেশ ভালয় ভালয় হয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ। সে ক'দিন যে খাটুনি গেছে তা আর বলবার নয়। ঝি চাকরের অভাব নেই, কিন্তু কেবল ঘুরতে ঘুরতেই কাবু হ'য়ে পড়েছিলাম আমি। যে দিকে না গেছি, অমনি একটা কাণ্ড হ'য়ে বসে' আছে। পঞ্চাশটা ছোট ছেলেই জুটেছিল বাড়িতে, আর প্রত্যেকটি ছেলে বারনাদার। খাও বললেই খাবে না, প্রত্যেকের পিছনে খাবার নিয়ে নিয়ে ঘুরতে হবে। কুটুমের ছেলেদের বকা-ঝকাও যায় না। ওরি মধ্যে আবার শ্বশুরের মামা-শ্বশুরের আলাদা তর। শ্বশুর ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় খাবেন, চার পাঁচ রকম নিরামিষ তরকারি চাই—ভাজাভুজি, সুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল—রোজ হওয়া চাই। আর মামা-শ্বশুরের আছে কলিক ব্যথা। তিনি ভাত রুটি খাবেন না। কখনও একটু হরলিক্স্। কখনও দু' স্লাইস পাউরুটি, কখনও ছানা, কখনও ফলের রস। বাড়িতে পুরোনো ঝি চাকর সবই আছে, কিন্তু আমি নিজে না দাঁড়ালে ঠিক মতো কিচ্ছু হবে না। শাশুড়ি যখন ছিলেন তখন তিনিই এসব করতেন। এখন তিনি নেই, সব ঝক্কি আমার উপর—"

"বউ কেমন হ'ল—"

"ওই হয়েছে একরকম। ওরা তো সবাই বলছে সুন্দর-সুন্দর, আমার কিন্তু বাপু তেমন পছন্দ হয় নি। মানুষ নয় যেন পুতুল। কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকায়, সরু সরু হাত, মুখে একটা মেকি হাসি, প্রাণ নেই যেন। গায়ের রং ঠিক কি তা বোঝবার উপায় নেই, দিন-রাত পেণ্টের উপরই আছে—। তবে জিনিসপত্র দিয়েছে একটি কাঁড়ি, মায় রেডিও পর্য্যন্ত—"

সূর্য্যসুন্দর স্নেহভরে তাঁহার বাক্যবাগীশ কন্যাটির বাক্য-প্রবাহ উপভোগ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন উষার বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় নাই। ছেলে-বেলায় নিজের পুতুলের সহিতও সে ঠিক এইভাবে অজস্র কথা বলিত।

উষা উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "উর্ম্মিলা, তুমি উঠে চান টান করে' এস না। আমি ততক্ষণ বাবার কাছে বসছি"

উর্ম্মিলা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মেজদির শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে বেশ লাগিতেছিল।

"আমি বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে তবে যাব। সাড়ে আটটায় ফলের রস খাবেন"

"সে আমি করে' দেব এখন। তুমি চানটা সেরে এস। এর পর বাথরুম খালি পাবে না"

উষা নিজে তখনও স্নান করে নাই। উর্ম্মিলাকে সে তাড়া দিতেছিল, সন্ধ্যাকে তাড়া দিয়া পূর্ব্বেই স্নান করাইয়াছে, কারণ নিজে যখন সে বাথরুমে ঢুকিবে তখন বেশ দেরি হইবে তাহার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে। তাই বাথরুমটা যাহাতে খালি থাকে সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। দিদি বউদির স্নান সকালেই হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারও হইয়াছে, উর্ম্মিলার হইয়া গেলেই সে বাথরুমটা দখল করিবে। স্নান সম্বন্ধে তাহার একটি বিশেষ পদ্ধতি সে তাহার ফয়জাবাদ-প্রবাসিনী পিসশাশুড়ির কাছে শিখিয়াছে। তাহা অনুসরণ করিয়া ফলও পাইয়াছে। তাহার বুকে-পিঠে চুলি হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে। প্রথমে একটা চটচটে কালো তেল মাখিতে হয়, হাকিমি তেল, বিশ্রী গন্ধ। তাহার পর সাবান দিয়া ঘষিয়া ঘসিয়া সেটা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। বেশ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। ইহা ছাড়া আরও একটা কাজও সে করে, নিজের কাপড় সায়া ব্লাউস প্রভৃতি নিজের হাতে কাচিয়া আলাদা শুকাইতে দেয়। তাহার ধারণা নোংরা চাকরদের দিয়া কাপড় কাচাইয়াই তাহার উক্ত চর্ম্মরোগটি হইয়াছিল।

উর্ম্মিলা বেচারী কি করিবে, উঠিয়া গেল। উর্ম্মিলা চলিয়া যেতে সন্ধ্যা দিদির দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিল একটু, হাসিয়া দিগন্তর কানে কানে চুপি চুপি কি বলিল।

"সন্ধ্যা কি বলছে রে দিগন্ত—"

দিগন্ত নিরীহ মুখভাব করিয়া বলিল, "হিন্দু কোডবিল নিয়ে আলোচনা করছি আমরা—"

"তাতে আমার দিকে চেয়ে সন্ধ্যার মুচকি হাসার কি আছে! জানো বাবা, সন্ধ্যাটার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে। কাগজের সম্পাদক হ'য়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—"

সন্ধ্যা আর একবার মুচকি হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, দিগম্বর সঙ্গে যেমন নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিল তেমনি করিতে লাগিল। উষা হয় তো আরও কিছু বলিত কিন্তু মিস বোসের পুরা নাম অনুপমা বসু। সকলে তাহাকে অনু বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমার তাহার জন্য আলাদা একটা ছোট তাঁবু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

অনু আসিয়া চম্পাকে বলিল, "বৌদি, আসুন একটু আমার সঙ্গে এবার—"

চম্পা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন থাক—"

অনু দিগম্বর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আগেই জানতাম, বৌদি এখানে এসে আর কিছু করতে চাইবেন না। আপনও ইউরিণ রাখেন নি—"

চম্পার নত মস্তক আরও নত হইয়া পড়িল।

"চলুন ব্লাড প্রেসারটা নিয়ে নি। আমি কথা দিয়ে এসেছি ওঁদের রোজ রিপোর্ট পাঠাব। কাল পাঠানো হয় নি, আজও হবে না কি। চলুন—"

চম্পার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় না রাগে ঠিক বোঝা গেল না।

সে আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গেল।

উষা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "গগনের শাশুড়ি দেখছি একটি মেয়ে ধারোগা পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে!"

সন্ধ্যা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাগজ পড়িতেছিল, একথায় তাহার ভ্রু আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভালই করেছে। যা করা উচিত তা ঠিক ঠিক হবে। ও না এলে কিছু হ'ত না।"

"ওসব না হলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমাদের রোজ ব্লাড প্রেসারও কেউ মাপে নি, পেচ্ছাপও কেউ দেখে নি, অথচ তিন তিনটে সুস্থ ছেলে বেশ নির্ব্বিঘ্নেই হয়েছে। সকলেরই হচ্ছে। ওসব আদিখ্যেতা—"

দিগম্বর চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুক-মিশ্রিত শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। তাহার ভয় হইল দুই পিসিতে ঝগড়া না বাধিয়া যায়। সে সন্ধ্যাকে চুপি চুপি বলিল, "চল, ও ঘরে যাই—"

সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "বিজ্ঞানের রোজ কত উন্নতি হচ্ছে। যতটা সম্ভব তার সাহায্য নেওয়া উচিত বই কি। যার সামর্থ্য আছে সে কেন নিবে না—"

বাবার সমর্থন পাইয়া সন্ধ্যা তির্য্যক দৃষ্টিতে দিদির পানে একবার চাহিয়া তাহার পর পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে বিজয়িনীর মতো আর একবার উষার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—শুনলে তো!

উষা কিন্তু হারিবার মেয়ে নয়, সে পুনরায় বলিল, "বিজ্ঞান টিজ্ঞান বুঝিনা, ও সব আদিখ্যেতা। সব খরচ দাদাকেই দিতে হবে, গগনের শ্বশুর একটি আধলা দেবে না, দেখে নিও"

এ আলোচনা কিন্তু আর অধিকক্ষণ চলিল না। ডাক্তারি ব্যাগ হস্তে গগন প্রবেশ করিল।

"দাদু, আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করে' দেখি"

"দেখ—"

সূর্য্যসুন্দর মুখে আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—সেই আশাতেই তো আছি।

গগন নানারকম যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় তিনটি ক্যাম্প চেয়ারে তিন জামাই বসিয়াছিলেন। গ্রামের যে তিনটি যুবক আসিয়াছিল, যোগেন, রামপ্রসাদ এবং প্রিয়গোপাল, গগন উঠিয়া যাইবার পর তাহারাও একে একে উঠিয়া গেল। ইহারা তিনজনেই শিকারী। কৃষ্ণকান্তের মুখে শিকারের গল্প তাহারা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, আশা ছিল এবারও তিনি কিছু শুনাইবেন। কিন্তু সদানন্দ এবং রঙ্গনাথের সম্মুখে কৃষ্ণকান্ত মুখ খুলিলেন না। বলিলেন, পরে শুনাইবেন। বিলাত-ফেরত এই ভায়রাভাই দুইটির সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। বিলাত-ফেরত বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটু সভয় কৌতূহলও ছিল। তাঁহার ধারণা বিলাত-ফেরত মাত্রেই একটু চালিয়াত হয়, কখনও জ্ঞাতসারে—কখনও বা অজ্ঞাতসারে। স্বদেশবাসীদের, এমন কি স্বদেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদেরও তাহারা যেন একটু অনুকম্পার চক্ষে দেখে। তাহাদের বিশ্বাস সাগরপারে গিয়া এবং একটা বিশেষ দেশে বা শহরে

কিছুদিন ঘোরা-ফেরা করিয়া তাহারা যেন উচ্চতর শ্রেণীর জীবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুখে এ ভাবটা সকলে প্রকাশ করেনা, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের বিশ্বাস মনে মনে ইহারা সকলেই একজাতের। তাই কৃষ্ণকান্ত নীরবে ইহাদের চাল-চলন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন আসল, মৎস্যটি ধরা পড়ে কি না। কৃষ্ণকান্ত একজন শিকারী, শিকারীসুলভ সাবধানতা সহকারে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন।

মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁ কেমন লাগছে তোমাদের। সাহেব মানুষ তোমরা, অসুবিধা হওয়ারই কথা। আর এ একেবারে অজ পাড়া-গাঁ তো—"

রঙ্গনাথ একটু মুচকি হাসিয়া পুনরায় গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সকাল হইতেই একটি চীনা গল্প-সংগ্রহে মন দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহা কৃষ্ণকান্ত প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি একটা মামলি বিনয়-বচন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহা মামুলি বিনয়-বচন নহে। তাহাতে একটা আন্তরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিল, সেকি মনে হইল না।

সদানন্দ বলিলেন, "পাড়া গাঁয়েই তো চিরকাল বাস করেছি ভাই। বিলাতে তো দিন কতকের জন্যে গিয়ে ছিলাম পড়াশোনা করবার জন্যে। যে ক'দিন ছিলাম অতি কষ্টেই ছিলাম। বিলাতে গিয়েই প্রথম বুঝেছিলাম যে মুখে ওরা যত কেতা-দুরস্তই হোক না, ওটা বাইরের চাকচিক্য মাত্র, আমাদের ওরা কখন আপন বলে' ভাবতে পারে না। ওদের চোখে সবাই আমরা 'ব্রাউনি'। কি বল হে রঙ্গনাথ।"

রঙ্গনাথ আর একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আর আমাদের চোখে ওরা ফিরিঙ্গি—"

সদানন্দ এ উত্তর শুনিয়া দমিলেন না, ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ওদের যে আমরা ঘৃণা করি তার একটা সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের দেশে ওরা লুটপাট করতে এসেছিল। ডাকাতদের সম্বন্ধে কারও সম্ভ্রম থাকতে পারে না"

রঙ্গনাথ আর একবার হাসিলেন। কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে একটা উত্তর আসিয়াছিল—মারাঠা দস্যুরাও আমাদের দেশকে এই কিছুদিন আগেই তছনচ করিয়াছিল, বর্গীদের ভয় দেখাইয়া ছেলেদের যে ঘুমপাড়ানি ছড়া রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মারাঠা বীরদের নাম আমরা সগর্ব্বে উচ্চারণ করি না কি? ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহা সত্য তাহা স্বীকার করিতে ক্ষতি কি। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না। তর্কটা তিনি পারতপক্ষে এড়াইয়া চলিতে চান।

সদানন্দ কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা সার বুঝেছি স্বদেশকে ভালবেসেই আনন্দ বেশী। বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল। তাছাড়া পুরো-পুরি স্বদেশী না হতে পারলে আমরা বাঁচতেও পারবো না। পরের দ্বারে হাত পেতে কতদিন চলবে। স্বদেশী হবার জন্যে যদি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় তা-ও করতে হবে—"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় রঙ্গনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেদিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটাইয়া পুস্তকের দিকেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন—এ ছোকরা বেশ চতুর। চিতা-বাঘের মতো প্রকৃতি। সদানন্দের কথা শুনিয়া কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত স্বদেশী বক্তৃতায় ভুলিবার লোক নন। তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে আমাদের দেশে স্বদেশীর ধুয়া প্রধানত বিলাত-ফেরতরাই তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ধারণা যে ওটা তাহাদের আহত অহঙ্কারের আস্ফালন মাত্র। ওটা মুখোশ, আর ওই মুখোশের তলায় আছে নানাজাতের লোভ এবং মোহ। তাই তাঁহাদের মুখের বুলি সহজে কাহারও অন্তর স্পর্শ করে না। এদেশের লোক অধঃপতিত বটে, কিন্তু আসল নকলের প্রভেদ তাহারা বোঝে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে চিনিতে তাহারা ভুল করে নাই। কৃষ্ণকান্তের মতে শ্রীরামকৃষ্ণই আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক এবং একমাত্র স্বদেশী নেতা। সদানন্দের কথার সুরে তিনি কিন্তু বিস্মিত হইলেন, সুরটা সেকি মনে হইল না।

সদানন্দের মানসিক জগতের খবর রাখিলে তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। সদানন্দের মানসিক জগতে ধারধার কত পরিবর্ত্তন হয়। যখন প্রথমে তিনি বিলাত হইতে ফেরেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল সাহেবী-কেতায় ব্যবসায় না করিলে প্রকৃত ব্যবসা করা যায় না। তিনি নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাই নাম রাখিয়াছিলেন 'চ্যাটো ইন্ডাস্'। তিনি নিজে চট্টোপাধ্যায় এবং ভারত-বর্ষীয়, কার্মের নামে ইহাই তিনি বিলাতী ঢঙে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কার্মের নাম এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তাঁহার মনের কত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরাপুরি স্বদেশী না হইতে পারিলে আত্মসম্মম বজায় থাকে না, আনন্দও পাওয়া যায় না—এই কথা ভাবিয়া এখন তিনি সুখ পাইতেছেন এবং ইহার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি আহরণ করিতেছেন। গত বৎসর কার্মের নাম বদলাইয়া তিনি "চট্ট-ভারতী" করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লায়ারা তাহা করিতে দেন নাই। অনেক বিষয়েই তাঁহার মত বদলাইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি বিদেশী জিনিস এদেশে আনিয়া বিক্রয় করিতেন, এখন তিনি এদেশের জিনিস বিদেশে বিক্রয় করিবার আয়োজন করিতেছেন। এদেশের তাঁতের কাপড়, শাল, রেশমবস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনে এবং প্যারিতে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি বিলাতী-ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। এখনও তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার ছুতায় প্রগলভতার প্রশ্রয় দিতে চান না। বিদেশের পার্কে, মিউজিকহলে, ক্যাবারেতে যে সব দৃশ্য একদিন তিনি সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন সে সব দৃশ্য আমাদের দেশে দেখিতে তিনি আর প্রস্তুত নহেন। এখন তাঁহার মানসিক জগতে যে ঋতুর রাজত্ব রঙে রসে তাহাতে স্বদেশীয়ানারই প্রভাব। হয়তো এ ঋতুও বেশী দিন থাকিবে না, আবার নূতন কোন ঋতুর আবির্ভাব হইবে নূতন ভাবের পশরা বহিয়া। কৃষ্ণকান্ত এত খবর জানিতেন না, তাই একটু বিস্মিত হইলেন। তবু একটু টিপ্‌নি কাটিতে ছাড়িলেন না।

"তোমার ওই কৃচ্ছ্রসাধন কথাটা থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তোমার কষ্ট হচ্ছে"—

"কিছুমাত্র না। খুব ভাল লাগছে আমার এখানে। আর কিছু না হোক, কান আর চোখ বিশ্রাম পেয়েছে। এতদিন শহরের ঘাপা জলে স্নান করেছি, এখানে অবগাহন হচ্ছে। রঙ্গনাথেরও নিশ্চয়ই তাই মনে হচ্ছে—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "যে কোনও পরিবর্ত্তনই আমার ভাল লাগে"

হাস্যদীপ্ত চক্ষে কৃষ্ণকান্তের দিকে একনজর চাহিয়া আবার চীনা-পত্রে মনোনিবেশ করিলেন। কৃষ্ণকান্তের পুনরায় চিতাবাঘের কথা মনে হইল। তিনি পুনরায় প্রশ্নের একটি টোপ ফেলিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। দাদুর পরীক্ষা শেষ করিয়া গগন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কেমন দেখলে দাদুকে ছোট ডাক্তারবাবু"

"ভালই। হার্ট বেশ ভালো। তবে রক্তটা পরীক্ষা করতে হবে। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় চলে যাক কেউ"

"কুমারকে বল—"

"ছোটকাকা কোথা"

"মাঠে গেছে গুনদাম"

"আচ্ছা আসুক"

সূর্য্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিলেন।

সকলে মনে করিল তাঁহার ঘুম আসিয়াছে, কথা বলিয়া আর বিরক্ত করা উচিত নয়। এক উর্ম্মিলা ছাড়া আর সকলে একে একে উঠিয়া গেল। উর্ম্মিলা চুপ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল। সে-ও ক্রমশঃ ঢুলিতে লাগিল। একবার ঝুঁকিয়া দেখিল, বাবা ঘুমাইয়াছেন কি না। তাঁহার নিমীলিত চক্ষু দেখিয়া মনে হইল ঘুমাইতেছেন। তখন সে-ও শিয়রের দিকে যে জায়গাটুকু ছিল তাহারই একধারে সন্তর্পণে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্য্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। চোখ বুজিয়া মনে মনে তিনি অদ্ভুত একটা ছবি দেখিতেছিলেন। প্রকাণ্ড একটা পথ যেন পূর্ব্বদিগন্ত হইতে আসিয়া পশ্চিমদিগন্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথের আদি-অন্ত কিছু নাই। সেই পথে তিনি যেন একা চলিতেছেন। তাঁহার পিছন দিক হইতে মাঝে মাঝে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে।

মামার, মামীর, দিদিমায়ের, মায়ের, মন্মথর, রাজেশ্বরীর, বাবার, পৃথ্বীশের, আরও অনেকের। মনে হইতেছে অনেকদূর হইতে যেন ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। সম্মুখ দিকেও কেহ নাই। কেবল পথ, দিগন্তবিস্তৃত পথ, সরিল রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিমদিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সে পথে একা তিনি যাত্রী। দুইদিকে ধূ ধূ করিতেছে প্রান্তর, প্রান্তরও দিগন্তপ্রসারী। কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমদিগন্ত হইতে ওই পথ ধরিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ একটি মনুষ্যমূর্তি। ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, ওই কি কৃষ্ণ? তখনই মনে হইল কৃষ্ণ তাঁহার কাছে আসিবেন কেন, তাঁহাকে তো জীবনে তেমন করিয়া কখনও ডাকি নাই। তবে ও কি মৃত্যু? নিষ্পলকনয়নে সূর্য্যসুন্দর সে দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে আসিতেছে, কিন্তু আসিতেছে···।

৬

কুমার মাঠে গিয়াছিল। মাঠের কুঁড়ে ঘরটিতে বসিয়া সে সূর্য্যসুন্দরের জীবন-স্মৃতি পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিকে ফাঁকা মাঠ। রবিফসল বুনিবার সময়, কোথাও জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা বীজ ছিটাইতেছে। দূরে একটা জমিতে কিছু আখ ছিল, কয়েকটি চাকর তাহা কাটিয়া কাটিয়া একধারে স্তূপীকৃত করিতেছে। কুমার মাঝে মাঝে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল বাবার 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাহার মনে হইতেছিল বাবার অসুখের পটভূমিকায় তাঁহার অতীত জীবন-চিত্রটা অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিশু সূর্য্যসুন্দর এবং বৃদ্ধ সূর্য্যসুন্দর যেন এক বিছানায় পাশা-পাশি শুইয়া আছেন। সাগ্রহে সে পড়িতেছিল।

"সাহেবগঞ্জে আমাদের রাখিয়া বাবা পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সাহেবগঞ্জে পৌঁছিয়া দিন সাতেক ছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়ই বাগচী মহাশয়ের বাসায় গান-বাজনা লইয়া থাকিতেন; খাইবার সময় এবং শুইবার সময় অনেক ডাকাডাকি করিয়া তবে তাঁহাকে বাড়িতে আনিতে হইত। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। দিদিমার অশ্রুধারা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মা-কে কোনদিন কাঁদিতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তিনি যেন পাষাণ-প্রতিমার মতো হইয়া গেলেন। যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের কাজ করিয়া যাইতেন, কোনও কথা বলিতেন না। তিনি স্বভাবতই স্বল্পভাষিণী ছিলেন, আরও যেন নীরব হইয়া গেলেন। ইহার আরো একটা কারণ বোধহয় ছিল। দেশের বাড়িতে মা-ই ঘরের গৃহিণী ও সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সাহেবগঞ্জে আসিয়া কিন্তু মামীমার আধিপত্য স্বীকার করিতে হইল। কারণ ইহা বেশ বোঝা যাইত যে মামা যদিও মুখে খুব 'দিদি' 'দিদি' করিতেন, দিদিকেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু চাবিকাঠিটি ছিল মামীমার হাতে। সংসারে যে পুরুষ উপার্জ্জন করে স্বভাবত তাহার স্ত্রীরই সেই সংসারে প্রতিপত্তি হয়। আজকাল খোলাখুলি ভাবেই হয়, সেকালে লোক-দেখানো ভব্যতার একটা আবরণ থাকিত। আবরণ সত্ত্বেও কিন্তু বোঝা যাইত। আমি তখন নিতান্ত ছেলে-মানুষ, আমিও তাহা অনুভব করিতাম নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং নিজের ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া মা যে ভাবে মামার সংসারে থাকিতেন তাহার তুলনা বড় একটা মেলেনা। তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝানও শক্ত। নিজের জন্য বা আমার জন্য মা কখনও কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতেন না। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে গভীর রাত্রে গোপনে সেলাই করিয়া লইতেন, তবু বলিতেন না যে কাপড় কিনিয়া দাও। দিদিমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তিনি ভাল করিয়া দেখিতেই পাইতেন না। মামীমা মায়ের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, নিজে বেশ সাজিয়া গুজিয়া থাকিতেন, মাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কিছু কিনিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহার ভাবটা ছিল—দিদিই তো কর্ত্রী, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আমার উপর-পড়া হইয়া কিছু করিতে যাওয়া কি ভালো? মা কিন্তু নিজের জন্য কিছুই করিতেন না। সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পর হইতে মায়ের মুখভাবে

অপূর্ব্ব একটা আত্মসমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সে মুখভাব আমি কখনও ভুলিবনা। দুঃখ এই যে আমার ছেলে-মেয়েরা তাহা দেখিল না, কখনও দেখিবেও না। তাঁহার কোনও ছবি নাই। তখন ফোটো তোলার রেওয়াজ অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার মায়ের বা বাবার ফোটো তোলানো সম্ভবপর হয় নাই। বাবা কোথাও বেশীদিন থাকিতেন না, ফোটো তোলাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তিনি রাজি হইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মনোভাবই অন্য-প্রকার ছিল। তিনি সুরূপ শক্তিমান লোক ছিলেন, কিন্তু শরীর লইয়া কোনপ্রকার আস্ফালন তিনি পছন্দ করিতেন না। মায়ের ফোটো-তোলানো হয় নাই, কারণ তখন মামার বাড়িতে পরদা-প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি ছিল। রাস্তা দিয়া সমারোহে শোভাযাত্রা গেলেও বাড়ির মেয়েরা জানলার ধারে বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবার অনুমতি পাইত না। অপরিচিত ফটোগ্রাফারের সম্মুখে মুখের কাপড় খুলিয়া বসিবার কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। যাহারা পারিত তাহাদের অভি-নেত্রীর বা কুলটার সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া রক্ষণশীলেরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। তখন ঘরে ঘরে ক্যামেরারও এত ছড়াছড়ি ছিল না। প্রতি শহরে এত ফটোগ্রাফারও ছিল না। তখন একমাত্র কলিকাতাতেই বোধহয় পেশাদার ফোটোগ্রাফাররা কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

ক্রমশ

ষটপদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

কবরে গোলাপ ফোটে, গোবরে কমল,
ঘৃণা মনসারও ডালে ধরে স্বাদু ফল,
হেরেছি হিংসারও কোলে করুণা ও ক্ষমা
মনসার গর্ভে নব জন্ম লভে রমা,
বিষের মন্থনে হয় অমৃত উদ্ভব
লেখেছি এ দুনিয়ায় সকলি সম্ভব,

(২)

অপূর্ব সুন্দরী জায়া, কর্ণবাস্ত ইনজিনিয়ার
অবসর পায় নাক তার সাথে কথা বলিবার।
তরুণী সুন্দরী বধূ কলাবতী ; পশারী উকিল
তার সাথে প্রেমালাপে পায় না সময় একতিল
অভাগা কুরূপা জায়া তারে লয়ে শিল্পী আঁকে ছবি,
বিগতযৌবনা তবু প্রিয়ার স্তব রচে কবি।

(৩)

নদীজলে মিশি নাই আত্মরক্ষা আশে
তরঙ্গের অঙ্গীভূত হয়ে নৃত্য করি নি উল্লাসে।
ক্ষুদ্র বারিবিন্দু আমি রবিরে ধোরাই
নিজের হৃদয়ে তার প্রতিবিম্ব পাই।
দু-দণ্ডে শুকাবে লবে দিবসের আলো,
জনতায় ডুবে মরা চেয়ে মোর এ মরণ ভালো।

(৪)

শ্যাম সুচিক্কণ পত্র একান্ত দুর্লভ
শুষ্ক পত্রে শুনি শুধু মর্ম্মরের রব।
পাইনা কাহারো পত্রে মর্ম্মের পরশ,
কুণ্ঠিত-শুষ্কিত পত্র হৃদি মোর করে না সরস,
স্থান তার ছিন্ন পত্রখানী
স্মরণে রয় না তার বাণী।

(৫)

একটি একটি দিন চলে যায়
ভুলায় তারে রাতের গভীরতা।
জীবনতরুর পত্র খসে
একে একে, বুঝতে না দেয় ব্যথা।
কমছে ছায়া, দোয়েল গেছে নীর্ণ শাখা ছেড়ে,
শুকনা পাতার মরমরানি থাকে শুধু বেড়ে।

(৬)

ধূলিধূমে সমাচ্ছন্ন কর্মঘন কোলাহলে ভরা
দিবালোক সাথে থাক বর্ত্তমান লয়ে তপ্ত ধরা।
দিনান্তে আকাশে চাহি ছায়াপথে নক্ষত্র-পংক্তিতে
শান্ত-চিত্তে হের নিত্য স্মৃতিঘন তোমার অতীতে।
নিশান্তে দিগন্তভরা রাগরক্তে অরুণের রথে,
জেগে উঠে হের নিত্য আশাঘন তব ভবিষ্যতে।

(৭)

দ্বন্দ্বেরি মাঝে আপনারে মোরা চিনি
বিরোধীরে জিনে নিজেরেও মোরা জিনি।
মুগ্ধ শক্তি তাহাতেই পায় প্রাণ
তাহা যে কতটা জানি তারও পরিমাণ।
দ্বন্দ্ব বিরোধে যে জন এড়ায়ে চলে,
লভি জড়ত্ব মরে সেই পলে পলে।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরে বাংলাদেশের ৩৫ লক্ষ নরনারী অনাহারক্লান্তে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলিতেছে, অসামরিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারী অবহিতির একান্ত অভাব ছিল। তার জন উডরেডের নেতৃত্বে গঠিত "দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন" সুস্পষ্টভাবে মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই মন্বন্তর সৃষ্টিতে প্রকৃতি যতখানি দায়ী, মানুষ দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি জীবনের বিনিময়ে ইহাতে খাদ্যশস্যের কারবারীদের লাভ হইয়াছিল গড়ে ১০০ টাকা।

এই দুর্ভিক্ষের পর হইতে বাংলার তথা ভারতের খাদ্যসঙ্কটতা কখনই যায় নাই, তবে কৃষিকেন্দ্রিক প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আপেক্ষিক সাফল্যে খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা অবশ্য বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্যে অসচ্ছল ভারতের বার্ষিক ঘাটতি দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ টনের মত। ইহার উপর প্রায় এক কোটি শরণার্থী পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসেন। সর্বোপরি আছে ভারতের স্বাভাবিক জনসংখ্যার বাড়তি। সব লইয়া অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া পড়ে যে, ভারত সরকার কর্তৃক তার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে গঠিত "খাদ্যশস্য নীতি নির্ধারণ কমিটি" ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতের বার্ষিক খাদ্যশস্য ঘাটতির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টন বলিয়া অনুমান করেন।

বলা বাহুল্য, এ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে বিদেশ হইতে আমদানী যেমন বাড়াইবার প্রয়োজন, তাহার চেয়ে বেশি প্রয়োজন দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির। ভারতে জানা জোগ্যপণা ও খনিজপাতির প্রচুর অভাব এবং বিদেশী মুদ্রার অপ্রাচুর্যের জন্য সে অভাব মিটানো কঠিন। এ অবস্থায় খাদ্য আমদানী করাইতে না পারিলে ভারতে পুনর্গঠন পরিকল্পনা কেমন করিয়া সম্ভব? যুদ্ধোত্তরকালে এদেশে বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইতেছিল, একমাত্র ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে ভারতকে ২১৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

ভারতে শিল্পের জন্যই কৃষি-সচ্ছলতার প্রয়োজন এবং খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অভাবে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী চলিতে থাকিলে বিদেশী মুদ্রার অভাবগ্রস্ত ভারতের পক্ষে শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী অসম্ভব। এই জন্যই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিকেন্দ্রিক করিয়া রচিত হয় এবং ইহাতে শিল্প খাতে যখন ধরা হয় ১৭৯ কোটি টাকা যা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৭·৬ ভাগ, কৃষিখাতে তখন ধরা হয় ৩৭৭ কোটি টাকা যা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১৫·১ ভাগ। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, কৃষি ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ সংস্কার ঘটিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে বার্ষিক খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ৭০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে।

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, শেষপর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে কৃষিব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হইয়াছে এবং লক্ষীভূত ৭০ লক্ষ টনের স্থলে খাদ্যশস্যের প্রকৃত বার্ষিক উৎপাদনবৃদ্ধি ১ কোটি ১৩ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা খাদ্যাভাবগ্রস্ত ভারতের পক্ষে খুবই আশার কথা। অতঃপর কৃষির উপর আরোপিত গুরুত্ব কিছুটা কমাইয়া পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে মৌলিক (Basic) শিল্পের উপর জোর দেন এবং আশা করেন যে, এ-হিসাবে সাফল্যলাভ হইলে তৃতীয় বা পরবর্তী পরিকল্পনার আমলে ভোগ্যপণ্য-শিল্পের প্রসার ঘটাইয়া ভারতকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা সহজ হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে মোট ব্যয়বরাদ্দের (৪,৮০০ কোটি টাকা) শতকরা ১১·৮ ভাগ কৃষি-খাতে এবং ১৮·৭ ভাগ শিল্পখাতে ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

প্রথমে কৃষির উপর আপেক্ষিক জোর কম হইলেও পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এক কোটি টন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করেন (৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন হইতে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন)। ক্রমে কৃষিমন্ত্রী এই দেশে কৃষির অব্যাহত শুভ্রয়ন্ত্রার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীদের যুগ্মসম্মেলনে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পুনর্বিবেচিত হইয়া দেড় কোটি টন (মোট ৮ কোটি ৭ লক্ষ টন) হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের এই জানুয়ারী মাসেই সহকারী খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এম্ ডি কৃষ্ণাপ্পার এক ঘোষণা হইতে জানা যায় যে, ভারতে খাদ্য-পরিস্থিতির অবনতি প্রতিরোধকল্পে ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেই ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের একটি স্থায়ী মজুত ভাণ্ডার গঠন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস নাগাদ ভারত সরকার এই ভাণ্ডারে ১০ লক্ষ টনের কিছু বেশি খাদ্যশস্য সঞ্চয়ও করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের খাদ্যপরিস্থিতির সম্প্রতি অপ্রত্যাশিত অবনতি ঘটিয়াছে। এই অবনতি লক্ষ্য করা যায় মাত্র কয়েকদিন আগে অর্থাৎ এদেশে আমন ধান কাটিবার সময়। সমগ্রভাবে ভারতে এ বৎসর ভাল বৃষ্টি হয় নাই, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে অনাবৃষ্টির ফলে কৃষির প্রভূত ক্ষতি হয়। বিহারে বৃষ্টির অভাবে চাষের ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, সরকারী হিসাবেই এ বৎসর বিহারকে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সাহায্য করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে প্রায় ২২,০০০ বর্গমাইল জমি এবং পশ্চিমবঙ্গে এ বৎসর ১২

লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইবে বলিয়া বহু পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসচিবই আশঙ্কা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও মনে করেন, এই রাজ্যকে এ বৎসর ৮ লক্ষ টন সাহায্য না করিলে চলিবে না। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থার এইরূপ অবনতির বিপরীত দিকে যদি আরও অন্যান্য রাজ্যের খাদ্যাবস্থা ভাল হইত, তাহা হইলে আপত্তির তেমন কিছু থাকিত না, কিন্তু এবার অনাবৃষ্টি ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেরই অল্পবিস্তর ক্ষতিসাধন করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ এই দুইটিই বাড়তি রাজ্য এবং গত বৎসর এই দুই রাজ্য হইতে ১০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। এ বৎসর কিন্তু রাজ্য দুইটির উৎপাদন আবশ্যকীয় চাহিদা মিটাইতে পারিবে কি না সন্দেহ। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅতুল্যপ্রসাদ সৈন অনুমান করিয়াছেন, এবৎসর খাদ্যাভাব হইতে মোটামুটি রেহাই পাইতে হইলে বিদেশ হইতে অন্ততঃপক্ষে তিন লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে এবং এজন্য ৯০ কোটি টাকার মত দরকার। বলা নিষ্প্রয়োজন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকারিতার সময় অপ্রত্যাশিত খাদ্য আমদানী খাতে এই ৯০ কোটি টাকা ব্যয় সরকারী অর্থ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিবেই। ইহার চেয়ে বড় কথা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবগ্রস্ত ভারতের পক্ষে মৌলিক শিল্পোন্নয়নের সহিত খাদ্য আমদানীখাতে এত টাকা ব্যয় বিপজ্জনক এবং ঘটিত উপস্থিত কিছুই আমদানীর দায় মিটাইতে ভারত সরকার অতিরিক্তের সাহায্যে টাকার বিনিময়ে বৈদেশিক ঋণদিতে বিশেষভাবে সম্মতি করিয়াছেন, তথাপি এই সাময়িক ব্যবস্থা মুদ্রানীতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই স্থায়ী করা উচিত নহে বলিয়া বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

এছাড়া ৫০ লক্ষ টন বা ততোধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে শস্যের উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা এবশ্যই আসিয়া পড়ে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশের উপর ভারতের বিশেষ ভরসা, সেগুলি মূলতঃ শস্য-উৎপাদনকারী এবং শস্য রপ্তানীই তাহাদের পক্ষে সম্ভব। চাউল আমদানীর বিনিময়ে ভারতের সম্বন্ধে বড় ভরসা ব্রহ্মদেশ, কিন্তু ব্রহ্মদেশে এবার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় প্রায় ২ লক্ষ চাউল উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এ অবস্থায় ভারতকে খাদ্যের হিসাবে আগামী বৎসর বাঁচিতে হইলে খাদ্যশস্যের ব্যবহার সমগ্রভাবে এবং চাউলের ব্যবহার বিশেষভাবে কমাইতে হইবে। এ সম্পর্কে সরকারী আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে, চিন্তাশীল কেহ কেহ দেশবাসীকে অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দেশবাসী এই সাংঘাতিক অবস্থা যথাযথভাবে এখনো উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। খাদ্য মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় পণ্য, খাদ্য পরিস্থিতি অবনত হইলে তাহা দ্রুত বাজারের অবস্থাও ঘটাইবে। এখন মনে আশা হয় উঠিয়াছে, এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক ব্যবস্থা যদি এখন হইতেই অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে আগামী আশ্বিন সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চাশ মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি।

চাষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্যই সমস্যা সমাধানে অনেক সাহায্য করিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী পন্থা। শ্রীঅশোক মেটা পরিচালিত খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Food Grains Enquiry Committee) তাঁহাদের রিপোর্টের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন যে, ভারতে বর্তমানে বৎসরে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবমত শতকরা ১½ ভাগ হারে জনবৃদ্ধি না ঘটিয়া শতকরা ২ ভাগ হিসাবে বাড়িতেছে; লোকবৃদ্ধির হারের সমান্তরালভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে বিপদ অনিবার্য। কাজেই কৃষির সাধারণ উন্নতির সহিত জনবৃদ্ধির সমস্যাটিকেও বিবেচনা করিতে হইবে।

উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে খাদ্যশস্যের বিকল্প আহার ব্যবহার প্রসার একান্ত আবশ্যক এবং সেজন্য শাকসব্জির ফলন যতটা সম্ভব বাড়ানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাদামের ও মরুভূমীয় সেচের জলের সাহায্যে ধানের অধিকে যে-ফসল করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার কার্যকারিতার উপরও সমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করে। অবশ্য যতই আমরা আহ্বান করি, অন্নভোজী ভারতবাসী যদি অধিকহারে চাউলের ব্যবহার কমাইয়া গম ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলেও চাউলের তীব্র অভাবে বাজারে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে অন্ন ক্রয়নীতির চাপে দুর্ভিক্ষ ত্বরান্বিত হইবে। তাছাড়া সময় থাকিতে অভ্যাস না করিলে হঠাৎ সময়ে গমের ব্যবহার শরীরও সহ্য করিতে পারিবে না।

লোকসভার বিগত শরৎকালীন অধিবেশনে খাদ্য সম্পর্কে বিতর্ককালে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীএস্ সি আক্রার মত কয়েকজন সদস্য ভারতের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতির নিরিখে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন দাবী করিয়াছিলেন। ভারত সরকার কিন্তু অশোক মেটা কমিটির অভিমত গ্রহণ করিয়া বর্তমান অবস্থায় আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে রাজী হন নাই। নিয়ন্ত্রণ সাধারণের প্রবর্তিত হইয়া সকলের সুবিধা বিধানের না হইলে ইহার সার্থকতা নাই। কিন্তু এরূপ সাধারণের সমস্যা হাতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রাখিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় এই জটিল ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন। ইহার পরিবর্তে সরকার স্থির করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের বাজারে খাদ্যে দুর্নীতি না চলে তজ্জন্য তাঁহারা খাদ্যশস্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবেন।*

---

* খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলিয়াছেন: The Mehta committee report has recommended that controls in the sense as they existed during the war and afterwards should not be revived. They have said that the trade should be controlled in the various activities and some regulation at the end of producers and consumers may also be exercised. But over all

একথা না বলিলেও চলিবে যে জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটক্ষণে যেখানে যাঁহাইতে সকলেরই সক্রিয় হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলিয়াছেন, বর্তমান শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমভাবে না হইলেও শতকরা ৭০ ভাগ দায়ী, বাকী ২০ ভাগ দায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সরকারের দায়ের অংশকে বিরোধী দলের সহযোগিতা-সমালোচনার আশ্রয় এই বক্তব্য অধিক হইলেও ইহার মূলতথ্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আয়ত্তটি বাহিরে অবশ্যই সচেষ্ট হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় খুলনার অগ্রাধিকারে খাদ্য-সঙ্কট প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করিয়া দেশবাসীকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও তলার স্তরে খাদ্য পরামর্শ-দাতা কমিটি (Food Advisory Committees) গঠনের প্রতি-শ্রুতি দিয়াছেন। সর্বদলীয় ভিত্তিতে গঠিত এইরূপ কমিটি সঙ্কট সমাধানে সকলের সহায়তা করিবে আশা করা যায়। লোকসভার গত ৩রা ডিসেম্বরের অধিবেশনে সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে খাদ্য পরিস্থিতির সম্ভাব্য সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ১০ হাজার ভূমি-সেনা (Land army) গঠনের যে পরামর্শ দেন, তাহা গৃহীত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেস সদস্য শ্রীপ্রাণবাবাদন ভট্টাচার্যও এই ভূমি-সেনাবাহিনী গঠনের কথা বলিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্য হইতে একটু বাছাই করিয়া এই সেনাবাহিনী গঠিত হইলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা কাজ হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

---

control of the nature which existed during the war and afterwards may not be revived because of the inherent difficulties in these controls and the huge requirements of food that these controls entailed with ever increasing demand and general aversion of the country to controls"……The Policy of the Government is that trade should be controlled. We must know how and where stocks are, how they are being disposed of, at what prices they are being disposed of, and where we find that trade is indulging in speculative activity trying to push up prices, we shall not hesitate to lay hands on them.

সোমপুরী মহাবিহার

শ্রীঅপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে গুপ্তযুগের যতখানি, বাঙলাদেশের ইতি-হাসের পক্ষে পালযুগেরও ততখানি মূল্য ও মর্যাদা। সমগ্র বাঙলাদেশ না হইলেও উত্তর ও পশ্চিম বাঙলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, এবং এই যুগেই বাঙলার প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পালযুগে আসিয়া বাঙলাদেশ আত্মস্থ হইল। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ধর্মে, শিল্প ও স্থাপত্য-সৌন্দর্যে সে তখনকার ভারতে অনতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল। এই বিকাশের মূলে ছিল পাল সম্রাটদের অকুণ্ঠ দান। রাজা হিসাবে তাঁহাদের দৃষ্টি সকল শ্রেণীর প্রজার সর্বাঙ্গীণ কুশলের প্রতি নিবদ্ধ থাকিলেও পরম-সৌগত এই রাজারা বিশেষের ধর্মের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই। পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, সোম-পুরী, জগদ্দল ইত্যাদি প্রখ্যাত মহাবিহারগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। সেকালের বাঙলাদেশে সোমপুরী বিহারই ছিল সর্বপ্রধান। ধর্মপালের সময় হইতে রামপালের জগদ্দল বিহার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর ধরিয়া এই সোমপুরী মহাবিহারটি উত্তর বাঙলার এক বিপুলশ্রী প্রতিষ্ঠানরূপে বিরাজ করিতেছিল এবং শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বাঙলাদেশে বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রায় সমকক্ষতা দাবী করিত। এত বড় সংঘারাম তখনকার বাঙলাদেশে আর কোথাও ছিল না। কিন্তু দুঃখ এই, তাহার সেই পরম বিস্ময়ের বিস্তৃত বপু ও ঐশ্বর্যের সব সন্ধান এখনও আমরা পাই নাই। কাল তাহার সেই সৌরমণ্ডল অতীতের অনেকখানিই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর নামে পরিচিত এই স্থানে গুপ্তি কত-গুলি মাটির স্তূপের বা টিলার সমষ্টিমাত্র। ইহার মধ্যস্থলের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় টিপিটি ছিল সর্বাপেক্ষা উঁচু ও স্থানস্তূপেই একটি অবশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড়ের অনুরূপ আকার হওয়ায় প্রথমই স্থান স্থানটি 'পাহাড়পুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত ইহার প্রকৃত পরিচয় কাহারও জানা ছিল না। বিশাল এক বটবৃক্ষের দ্বারা মণ্ডিত, ঘন জঙ্গল বেষ্টিত ও হিংস্র প্রাণী অধ্যুষিত এই স্থানটি বিস্মৃতির গর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে আগত ইয়োরোপীয়দের দৃষ্টি ইহার প্রতি নিয়তই আকর্ষিত হইতে থাকে। রাজকর্মচারী, সৈনিক, পর্যটক যাহাই হোন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অনুসন্ধিৎসু হৃদয় ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই স্থানস্তূপের মধ্যে এক অতীত স্মৃতি মিশ্রায় অচেতন হইয়া আছে—এই সম্ভাবনা যারে যারে তাঁহাদের মনে আঘাত হানিতে থাকে। ইঁহাদের মধ্যে বুকানন হ্যামিলটন ও ওয়েষ্ট-মাকট হইলেন প্রথম পর্যবেক্ষকদের অন্যতম। অনুবিস্তর খনন করিয়া বুকাননই সর্বপ্রথম বলিলেন ইহা একটি বৌদ্ধ মন্দির, কারণ যতটুকু

বাহির হইয়াছিল তাহার সহিত ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সাদৃশ্য দেখা যায়। বুকানন আরও বলিলেন যে মন্দিরটি পাল সাম্রাজ্যের সমসাময়িক।

তৃতীয় ব্যক্তি হইলেন কেনায়েল কানিংহাম এবং ইঁহারই উদ্যমে প্রকৃত খনন কার্য আরম্ভ হয়। কিন্তু যাহা আসিল স্থানীয় জমিদারের নিকট হইতে—তাঁহার জমিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ চলিবে না। কানিংহামকে কেবলমাত্র মহাস্থানের স্তূপটির খনন ও নীচের জঙ্গলের কিছু অংশ পরিষ্কারেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। একটি বৃক্ষরক্ষকে হিন্দু দেবতার মূর্তি দেখিয়া তিনি কিন্তু মন্দিরটি হিন্দু মন্দির বলিয়া স্থির করিলেন। প্রকৃত পরিচয়টি কিন্তু জানা যায় এক অপূর্ব উপায়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা নিজ নিজ প্রয়োজনে এই স্থান হইতে ইট সংগ্রহ করিতে আসিত। এই টিপি-গুলির নীচে যে অক্ষুণ্ণ ইটের স্তর আছে তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। একদিন সমীর সোনার নামে একজন স্থানীয় অধিবাসী—ইট সংগ্রহ করিতে আসিয়া একটি অষ্টকোণ প্রস্তর স্তম্ভে উৎকীর্ণ একটি লিপি আবিষ্কার করে। ইহাই হইল শ্রীধর্মপালদেবের বিখ্যাত লেখ। উৎকীর্ণ লিপি একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাঙ্গলা লিপির নিদর্শন বলিয়া নির্দারিত হইল। লিপির অর্থ হইল, "এই অপূর্ব গুরু শ্রীধর্মপালদেব কর্তৃক ত্রিরত্নের (বুদ্ধ ও সংঘ) সম্ভোষের ও সমস্ত জীবিত প্রাণির হিতার্থে নির্মিত হইল।"

বুকানন হ্যামিলটনের মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল - মন্দিরটি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের এবং পাল সাম্রাজ্যের সমসাময়িকও বটে। বিষয়-টির গুরুত্ব বুঝিয়া উঠিলেন এবং অনেক চেষ্টার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্থানটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে নিয়মিত খনন কার্য আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিস্তৃত বস্তুর পরিচয় উদ্ধার সহজ কাজ নয়। মন্দিরটির প্রথম নির্মাতা কে, প্রথম হইতেই কি ইহা বৌদ্ধ মন্দির ছিল—ইত্যাদি বিষয় লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নের অবতারণা হইতে লাগিল। প্রাচীন বাঙ্গলার সংস্কারান ও শিল্পের এই পরমবান্ধব নিদর্শনটি কাহার নিকট হইতে সর্বপ্রথম আপন রূপটি পাইয়াছিল?

প্রথম দিকে প্রায় সকল পণ্ডিতগণের ধারণা হইল যে প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে জৈনদের, পরে হিন্দুদের ছিল ও তৎপরে বৌদ্ধ সংঘারামে পরিণত হইয়াছিল। একটি প্রতিষ্ঠানের উপর তিনটি বিভিন্ন ধর্মের দাবীর কারণও ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। প্রথম একটি জৈন তাম্রশাসন, দ্বিতীয় মন্দির গাত্রে বৃক্ষ ভঙ্গকে উৎকীর্ণ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও কতিপয় হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি এবং তৃতীয়তঃ একটি মোহর (sealing) উৎকীর্ণ ধর্মপাল ও সোমপুরী মহাবিহারের নাম। জৈন তাম্রশাসনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রস্তর মূর্তিগুলির কয়েকটিকে ইহার পরের যুগে দেখা যায় এবং সকলে সর্বাপেক্ষা নবীন হইল ধর্মপালদেবের মোহরটি।

তাম্রশাসনটির তারিখ (গুপ্তাব্দের) ১৫৯ = ৪৭৯ খৃষ্টাব্দ (১)। ইহাতে লিখিত আছে, পুণ্ড্রবর্ধনের বটগোহালি গ্রামে অবস্থিত জৈন-প্রধানাচার্য গুহনন্দীর নামে উৎসর্গীকৃত বিহারটির পূজা অর্চনা ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য নাথশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী রামী চারিটি বিভিন্ন গ্রামে ভূমি ক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলেন। পাহাড়পুর স্তূপের সংলগ্ন গোয়ালভিটা গ্রামটিকে এই বটগোহালি বলিয়া নির্দেশ করা হইল।

মন্দির গাত্রের বৃহৎ মূর্তি কয়টিকে পাল যুগের বলিয়া নির্দেশ করা গেলেও সমস্ত প্রস্তর মূর্তিগুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। অধুনা ইহাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর মূর্তিগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও ভাবগাম্ভীর্য দেখা যায় অন্য দুইটি শ্রেণীতে তাহা নাই। এই শ্রেণির মূর্তি সংখ্যাও কম এবং ইহাদের গুপ্তযুগের পূর্ব-শ্রেণীর রূপ বলা হইয়াছে (২)।

মোহরটিতে উৎকীর্ণ আছে, "শ্রীসোমপুর শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার আর্যভিক্ষুসংঘস্য।" অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রতিষ্ঠানটি যে বৌদ্ধদের অধীনে ছিল তাহাও প্রমাণিত হইল। মোহরে উৎকীর্ণ এই সোমপুরের নামের সহিত সাদৃশ্য আছে বর্তমান ওমপুর গ্রামের, যাহা এই ধ্বংসস্তূপের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বোধ হয় এই পরম্পরাক্রমে মন্দিরটি প্রথমে জৈনদের, তাহার পর হিন্দুদের এবং সর্বশেষে বৌদ্ধদের অধিকারে আসায় অন্তত তিনটি স্তরে হইয়াছিল। অবশেষে প্রতিষ্ঠানটির উপর হিন্দুদের দাবী অনেকটা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কারণ মূর্তিগুলি সম্বন্ধে তাহাদের সংস্থান দেখিয়া এ কথা বলা গেল যে—ঐগুলি ঠিক ঐ মন্দিরগাত্রে স্থাপিত করিবার জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত হয় নাই। কাজাকাছি কোন স্থান হইতে ঐগুলি মন্দিরটিকে সুশোভিত করিবার জন্য খুব সম্ভব সংগৃহীত হইয়াছিল।

পরলোকগত কে, এন, দীক্ষিত মহাশয় মন্দিরটি পূর্বে জৈনদের ছিল এরূপ ইঙ্গিত করিলেন এবং প্রমাণ স্বরূপ জৈনদের সর্বতোভদ্র বা চতুর্মুখ নামক মন্দিরের সহিত পাহাড়পুর মন্দিরের সাদৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার মতে মন্দিরটির প্রথম নির্মাণ কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই নিহিত —যদিও পরবর্তীকালের সংযোজন চিহ্নও ইহাতে বর্তমান এবং তাহা সাব্যস্ত হইয়াছিল নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু সংখ্যারাম প্রথম নির্মিত হইয়াছিল অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে—যখন পাল নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম আবার বাঙ্গলাদেশে শ্রীবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু জৈন মন্দিরের উপর বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের কথাটা ভাল লাগে না। সেই যুগের বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে পরধর্মসহ অসহিষ্ণুতার এরূপ কোন দৃষ্টান্ত একটিও জানা যায় না। সম্ভবতঃ জৈন মন্দিরের এই বিশেষ পরিকল্পনাটি বৌদ্ধরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মতের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সরস্বতীকুমার সরস্বতী ব্রহ্মদেশের পেগানে বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সহিত জৈনদের চতুর্মুখ মন্দিরের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন (৩)।

(১) Archeological Survey of India, Annual Report, 1927-28, p. 107.

(২) Early Sculpture of Bengal, S. K. Saraswati.

(৩) History of Bengal. (Dacca University), Vol. I, Temple architecture—S. K. Saraswati.

ইহার দ্বারা কিন্তু পাহাড়পুরে জৈন বিহারের অবস্থিতির কথা একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে এই একটিমাত্র তাম্রশাসনের কথা ভিন্ন জৈনধর্মের আর কোনও চিহ্ন সেখানে পাওয়া যায় নাই।

এইবার বিহারটির নাম ও নির্মাতার নামের প্রসঙ্গ আসে। বাঙ্গলাদেশে বৌদ্ধদের অনেকগুলি বিখ্যাত বিহার ছিল এবং তাহার মধ্যে সোমপুরী বিহার অন্যতম। উপরে উল্লিখিত মৃত্তিকামিশ্রিত মোহরটির সাহায্যে জানা যায় যে পাহাড়পুরের এই ধ্বংসস্তূপটিই সোমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ। বাঙ্গলার এই বিখ্যাত বিহারটির উল্লেখ বোধগয়ার ও নালন্দার প্রাপ্ত অনেকগুলি শিলালিপিতেও আছে। "সোমপুরের অন্তর্বাণী মহাযান-স্বামী বিশ্বের পারমণী বীর্যেন্দ্র নামক এক পুরিষবৃক্ষ তাঁহার আচার্য, উপাধ্যায়, মাতাপিতা ও সমগ্র জীব-জগতের পুণ্য অভিবৃদ্ধির কামনায় পূর্বীয় গগন পত্তনে বোধগয়ার এক অনুরূপাকার স্থানক পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন" (৪)। নালান্দার বিপুলশ্রীমিত্রের লিপিতে বঙ্গাল সৈন্যদের দ্বারা সোমপুরী বিহারের বিধ্বস্ত হওয়া ও বিপুলশ্রী কর্তৃক তাহার সংস্কারের কথা জানা যায় (৫)। তারনাথের গ্রন্থে, পগ্-সম্-জোন্-জঙ্গ এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদেও সোমপুরী বিহারের নাম পাওয়া যায়।

কিন্তু এই বহুপ্রশংসিত মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন কে? পাহাড়পুরে প্রাপ্ত সীলে স্পষ্টই লেখা আছে যে ইহা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত। কিন্তু তারনাথের সহিত পগ্-সম্-জোন-জঙ্গের গ্রন্থকর্তা একমত হইয়া দেবপালকে নির্দেশ করিয়াছেন। এই দুই আপাতবিরোধী তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এই বলিয়া যে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ধর্মপালের সময় এবং সমাপ্ত হইয়াছিল তাঁহার পুত্র দেবপালের রাজত্বকালে (৬)।

মন্দির ও সংঘারামের সংস্কার যে অনেকবার সাধিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপুলশ্রীমিত্রের লেখটিতেও সেই কথা আছে। হয়ত প্রথম মহীপালের সময়েও একবার সংস্কার হইয়াছিল। মহীপালদেব নরবর্মের পরম অনুগত ছিলেন এবং বাঙ্গলার বাহিরেও তাঁহার রাজত্বকালে যে কোনও কোনও বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার সাধন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সোমপুরীর সহিত বোধগয়ার মহীপালদেবের নামটিও সংযুক্ত আছে। সমগ্র পাহাড়পুর এলাকাটি চারিপার্শ্বের স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট মহীপলন নামে পরিচিত। নিকটবর্তী একটি স্থানকে এখনও তাহারা মহীপলনের কন্যা সন্ধ্যাবতীর স্নানের ঘাট বলিয়া নির্দেশ করে। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় স্তূপের দক্ষিণপূর্ব কোণের কিছু দূরে একটি ইষ্টকনির্মিত স্নানের ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে (৭)। পালযুগের বিখ্যাত এই বিহারের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত উপাখ্যানের এই মহীপলন রাজা মহীপালদেব হওয়াই সম্ভব। এই সন্ধ্যাবতী ও তাঁহার অলিন্দ সন্তান সত্যপীরকে লইয়া অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে এবং মূলস্তূপের পূর্বদিকে কিছুদূরে অবস্থিত একটি স্তূপ সত্যপীরের ভিটা নামে পরিচিত। স্বর্গীয় অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারকরের মতে, দেবপালের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী দুর্বল পালনরপতিদের সময় প্রতিষ্ঠানটি বোধহয় পরিত্যক্ত হইয়াছিল; (রাজানুগ্রহ ব্যতীত এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখা সম্ভবপর ছিল না, কারণ ইহার অবস্থান জনবহুল নগর হইতে দূরে), এবং প্রথম মহীপালের সময় ইহার সংস্কার সাধন করা হয়। কিন্তু বিপুলশ্রীমিত্রের লিপিতে উল্লিখিত বঙ্গাল সৈন্যরা কাহারা? কাহারও কাহারও মতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বরেন্দ্রে যে কৈবর্ত বিদ্রোহ হইয়াছিল সেই বিদ্রোহীদের দ্বারাই সোমপুরী বিহার আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং এই লেখটিতে তাহারাই বঙ্গাল নামে আখ্যাত (৮)। আর একটি মত অনুসারে বঙ্গাল নামে একটি জাতি ছিল, যাহাদের মধ্যে বঙ্গাল-বড় এবং বঙ্গাল-ছোট বলিয়া এক শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল, তাহারাই বোধ হয় ইহার জন্য দায়ী। এই জাতির চিহ্ন এখনও তিব্বতের কুলুক্রমেণে পাওয়া যায়, এবং খুব সম্ভব কুতাত্মিক টলেমি তাঁহার গ্রন্থে ইহাদের পূর্ব-ভারতের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৯)। নবম-দশম শতাব্দীর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত অধ্যাপক নলিনাক্ষ বসু মহাশয় অনুমান করেন, ইহারা হয়ত সৈন্ধব-প্রাবক নামে সিংহল-দেশীয় হীনযান ভিক্ষুর দল, যাহারা ধর্মপালের জীবদ্দশাতেই বিক্রমশীল বিহার আক্রমণ করিয়া হেরুকের মূর্তি এবং কতগুলি তন্ত্রের গ্রন্থ নষ্ট করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতে ইহাদের অধিষ্ঠান ছিল সিন্ধু প্রদেশে। বোধ হয় ইহারা গুর্জর-প্রতীহার নরপতিদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেন রাজাদের সময়েও ইহাদের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল (১০)। কিন্তু এখন ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে, বাঙ্গলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গাল এবং এই ভূখণ্ড হইতেই এক সেনাদল, সম্ভবতঃ কোনও অ-বৌদ্ধ রাজার অধীনে, দিয়া একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সোমপুরী বিহারকে অগ্নিঘাতে বিনষ্ট করিয়াছিল। গুরুপরম্পরায় তিন পুরুষ পরে ভিক্ষু বিপুলশ্রীমিত্র উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

সোমপুরী মহাবিহারের আয়তন ছিল বিশাল, বিরাট। স্বর্গীয় কে. এন. দীক্ষিতের ভাষায়, "এরূপ বিরাট সংঘারাম ভারতে আজ পর্যন্ত

(৪) বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম, শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২০৯

(৫) Ep. Ind. Vol. XXI, pp. 97 ff.

(৬) Indian Culture, Vol., p. 231; বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ২০৮

(৭) Arch. S. I. Ann. Report. 1922-23, Dr. D. R. Bhandarkar.

(৮) Memoir of the Arch. Surv. India. No 55, K. N. Dikshit, p. 6.

(৯) Indian Culture. Vol. II, p. 755.

(১০) The Age of Imperial Kanauj. pp. 272 ff.

আবিষ্কৃত হয় নাই।" বিপুলশ্রীমিত্রের লিপি প্রত্নরাজের লিখিয়া রাখিয়াছে, "শ্রীমৎ-সোমপুরে চতুর্দিগবস্থিতঃ পঞ্চমোৎপন্ন আয়ত্ত নবীন-কর্ম-প্রসরাং নৈত্রেক বিহারস্থঃ" (১১)। সংঘারামের চারিদিকের কক্ষগুলি সংস্কার করার পর ইহা তৎকালীন মনের একমাত্র বিহারস্থল হইয়াছিল। কাজেই প্রতিষ্ঠানটি কেবল তাহার আয়তন লইয়াই গর্ব করিত না, উহা দেখিতেও ছিল নয়নাভিরাম।

যে যুগে ধর্মপালদেব যে কত উচ্চ হইয়াছিল পাহাড়পুরের মন্দিরের নির্মাণ সৌষ্ঠব তাহার সাক্ষ্য দেয়। তিনটি ক্রম-হ্রাসমান তলে মন্দিরটি বিন্যস্ত। তৃতীয় তলের উপর মূল মন্দিরটি অবস্থিত ছিল, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় তল নিরেট। ইহার গঠন-সৌন্দর্য বহির্ভারতের শিল্পীদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছিল। জাভার বরবুদুর, কাম্বুজের আঙ্কোর ভাট এবং ব্রহ্মদেশের এই প্রকার ক্রম-হ্রাসমান প্যাগোডাগুলির মূল আদর্শ পূর্ব-ভারতে ছিল বলিয়াই পণ্ডিতেরা মনে করিতেছেন।

মন্দিরটির ভগ্নাবশেষে বর্তমানেও উত্তর-দক্ষিণে ৩৬৯ ফিট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৮ ফিট চওড়া। চতুষ্ক মন্দিরের প্রতি দিকে প্রায় ৪৫টি করিয়া সর্বসুদ্ধ ১৭৭টি কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতি কোণে একটি করিয়া মণ্ডপ ছিল। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বারান্দা, চত্বর ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও ছিল।

মন্দিরটিকে সুন্দর করিয়া তোলার কোনও ব্যবস্থাই উপেক্ষিত হয় নাই। পাষাণফলকের অভিনবত্ব, কারুকার্যমণ্ডিত ইষ্টক, সুন্দর মূর্তি-ফলক এবং প্রস্তর মূর্তি দিয়া ইহাকে সুশোভিত করিয়া তোলা হইয়াছিল। প্রস্তর মূর্তিগুলি ও প্রাচীরে সংলগ্ন এই সুন্দর ফলকগুলি শিল্প-পিপাসুদের নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করে। সুন্দর ফলকগুলি কোথাও দুই এবং কোথাও তিন সমান্তরাল সারিতে রক্ষিত। প্রস্তর মূর্তিগুলি ত্রিস্তরীয় সংলগ্ন প্রাচীরে রক্ষিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বহু হিন্দু দেবদেবী এই মূর্তি ও সুন্দর ফলকগুলির মধ্যে স্থান সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হইতেও উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। এমন কি, শিল্প-মনোগ্রাহী বিচিত্র বর্ণন জীবজন্তুর মূর্তিও বাদ পড়ে নাই। ভাস্কর্যের ধারাটিকে বজায় রাখিয়া শিল্পীরাও আপন আপন উদার সৃষ্টি প্রসারিত করিয়া যেন বৈচিত্র্যের ধরণা বহাইয়া দিয়াছেন। পূর্বে কথিত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তর মূর্তিগুলিকে প্রথম শ্রেণীর পরের যুগের, অথবা প্রথম শ্রেণীর সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্পধারা যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন বলা চলে। তৃতীয় শ্রেণীকে কিন্তু এইরূপ কোন অভিধা দেওয়া যায় না। এইগুলি নির্মিত হইয়াছিল একান্ত এই দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা এবং তাহারা গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর যুগের শিল্পী,—যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলির নির্মাতা, তাহাদের নিকট হইতে বহুদূর কালীন।

নালন্দার স্বর্ণযুগের অবসান ঘটিলে বিহার প্রদেশে বিক্রমশীলা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল, আর বাঙ্গলায় বিক্রমশীলের অনেকটা সমকক্ষতা দাবী করিয়াছিল সোমপুরী। পণ্ডিতপ্রবর অতীশ এইস্থানে বসিয়া অন্যান্য পণ্ডিতদের সহিত তাঞ্জরিক্ষিতের মধ্যমক-অলঙ্কার-প্রদীপের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর বিহারের অন্যতম পণ্ডিত প্রজ্ঞাবর্মনের গুরু ছিলেন সোমপুরী বিহারের যোগিভদ্র। যোগিভদ্রের উপাধি ছিল আচার্য এবং মহাপণ্ডিত এবং তাঁহাকে ভিক্ষু আরণ্যকও বলা হইত। 'মহাজ্ঞানসূত্র-টিকা', 'সমাধি-সম্ভার-পরিবর্ত' প্রভৃতি অনেকগুলি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার একখানি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। যোগিভদ্রের আরও একটি উপাধি ছিল কালাম্বরপাদ। সম্ভবতঃ তিনি সোমপুরী বিহারের কালপাদ বা কালমহাপাদ বলিয়া উল্লিখিত পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন। যোগভদ্র বুদ্ধদেবের এক ধ্যানস্থ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সোমপুরী বিহারের অধিবাসী বীরেন্দ্র নামে এক স্থবির বুদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে রামপালদেবের প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সোমপুরী আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সম্ভবতঃ সোমপুরীর দুর্দিনের সুরুই রামপালের পক্ষে তাঁহার রাজধানী রামাবতীতে নূতন মহাবিহার স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। সোমপুরী অক্ষুণ্ণ থাকিলে হয়ত জগদ্দলের সহসা অভ্যুত্থান সৌষ্ঠব লাভ সম্ভবপর হইত না। কিন্তু যাহাই হোক, ধর্মপাল-দেবপালের কীর্তি সোমপুরী তাহার তিনশত বৎসরেরও অধিক পরমায়ুর মধ্যে পূর্ব-ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছে একমাত্র নালন্দা ও বিক্রমশীল ব্যতীত আর কোনও প্রতিষ্ঠানই তাহা পারে নাই।

(১১) Ep. Ind., XXI, p. 90

আশাকরি তোমরা ভেবে দেখবে

শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়

যেমন কেউ ঘুঙুরে কাচ আর নূপুরে মণি ধারণ করলেও মণির সম্মান নষ্ট হয় না, বরং প্রয়োগ কর্তার মূর্খতা প্রকাশ পায়, সেই রকম মূর্খকে উচ্চপদে ও বিজ্ঞকে নিম্নপদে স্থাপন করলেও বিজ্ঞের সম্মানের নষ্ট হয় না, বরং নিয়োগকর্তারই মূর্খতা জানা যায়। যেমন কোন বনে একটি সুগন্ধি পুষ্পিত বৃক্ষ থাকলে সমস্ত বন সুবাসিত করে, সেইরূপ কোন হীন বংশে একটি সুপুত্র জন্ম গ্রহণ করলে, তার সৎকার্য্যের সৌরভে সেই হীন বংশও সর্ব্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত হয়।

বিদ্যার আদর কোন দিনই নষ্ট হয় না। ক্ষমাবান তাপসগণ যেমন কুরূপ হোলেও লোকের শ্রদ্ধার পাত্র, সাধ্বী স্ত্রী কুৎসিতা হোলেও যেমন সকলের ভক্তির পাত্রী, কোকিল কালো হোলেও যেমন সুস্বরের গুণে সকলের আদরণীয়, বিদ্বান ব্যক্তি কুরূপ হোলেও সেই রকম জনসাধারণের প্রীতিভাজন হোয়ে থাকে। পূর্ণবিকশিত পলাশ ফুল বড় গাছেই জন্মায়, আর দেখতেও সুন্দর, কিন্তু পলাশ ফুলের গন্ধ নেই বলেই যেমন তাকে কেউ নেয় না, তেমনই বিদ্যাহীন ব্যক্তি রূপযৌবনসম্পন্ন আর কুলীন হোলেও বিজ্ঞলোকে তার সমাদর করে না। তাই বালো সময় নষ্ট না করে যাতে প্রকৃত বিদ্বান ও জ্ঞানী হওয়া যায় সেদিকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক—চিন্তাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির উন্মেষের জন্যে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর চেষ্টা করা উচিত।

পাঠ্যপুস্তকগুলির পাঠনের উদ্দেশ্য না জানা থাকলে কোন ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক উৎকর্ষতা লাভ হয় না। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অনেক প্রয়োজনীয় সদ্গ্রন্থ পড়ার দিকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী আগ্রহশীল না হোলে, প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হওয়া দুষ্কর। যে সকল গ্রন্থপাঠে অন্তঃকরণে জ্ঞান-তৃষ্ণা, ভক্তি, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশানুরাগ, ভগবৎপ্রেম প্রভৃতি মহান্ ভাব উদ্দীপিত হয়, সেগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ না করতে পারলে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, কিভাবে জীবনের ভবিষ্যৎ পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হোতে পারে।

এক্ষেত্রে সময়ের ব্যবহার সম্যক্‌জ্ঞানের প্রয়োজন আবশ্যক। সময়ের প্রকৃত মূল্য না জানাতেই অনেকে বৃথা সময় নষ্ট করে। যেমন সূক্ষ্ম অণুর সংযোগে সমস্ত স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিমেষ নিয়ে দিন, মাস, বৎসরাদির উৎপত্তি হয়েছে;—এই রকম কতকগুলি বৎসরের সমষ্টিই জীবনের পরিমাণ, অথচ এমন নিঃশব্দে এরা চলে যাচ্ছে যে সহজে বুঝতে পারা যায় না। ছাত্রজীবনে সময়ের সদ্ব্যবহারেই পার্থিব জীবনের উন্নতির নিদান, এটা ভুললে চলবে না। লেখা পড়ায় অবহেলা করলে ভবিষ্যৎ জীবনে বহু কষ্টই পেতে হয়, এজন্যেই পূর্ব্বহোতে সতর্ক হওয়া উচিত।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও চরিত্র সংগঠন। শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার প্রণালী অনুন্নত হোলে কোন জাতির ভবিষ্যৎ উন্নত হোতে পারে না। অর্থোপার্জ্জনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞানার্জ্জনই তার প্রকৃত লক্ষ্য। শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আছি।

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় কলেজে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অধ্যাপকগণ লেকচার বা বক্তৃতা দিয়েই খালাস হয়ে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র নেই বললেই চলে। যে সব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অন্যবিধ্যেতা দোষ আছে, তাদের সে দোষ সংশোধনের কোন চেষ্টাও তাঁরা করেন না। আজকের দিনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা বড় কম নয়, এসব শিক্ষকের দ্বারা কখনও প্রকৃত শিক্ষার কাজ নির্ব্বাহ হয় না। শিক্ষকমাত্রেই ছাত্র-ছাত্রীকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করবেন, এইটাই প্রত্যেক জাতি আশা করে। শিক্ষকের পক্ষে অতি

কঠোরতা বা অতিমৃদুতা উভয়ই বর্জ্জনীয়। আধুনিক শিক্ষা সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শিনী। এরূপের শিক্ষায় বুদ্ধিশক্তির অনুশীলন হোতে পারে, চিত্তশক্তির সামান্য বিকাশ হয় না। বর্ত্তমানে সহজসুলভ পন্থা অনুসরণ করে সামান্য পরিশ্রমের মাধ্যমে কি ভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাই খুঁজে বের করার দিকেই সাম্প্রতিক ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য। আজকের দিনে দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেমের অভাব ঘটে গেছে। এদের অনেকেই বেশভূষার আড়ম্বর ও অঙ্গপ্রসাধনের দিকে যেরূপ দৃষ্টি দেয়, লেখাপড়ার দিকে সেরূপ দৃষ্টি দেয় না। দেহ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক বটে, কিন্তু বিলাসিতার দিকে জোর দেওয়া উচিত নয়। যারা উন্নতি-শিল্প, তারা ছাত্রজীবন কখন আরামে প্রমোদে অতিবাহিত করে আত্মশক্তি নষ্ট করেনা। তারা সাংসারিক ঘটনাস্রোতে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভেসে যায় না,—তারা বদ্ধপরিকর হয়ে স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ বা তটিকারূঢ়ে দণ্ডায়মান হয়ে নিজেদের আত্মশক্তি প্রয়োগ করে উন্নত হয়।

আজকের দিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গের কোন মূল্য নেই,—ব্রহ্মচর্য্য পালন, নৈতিক [illegible] করে না। ধর্মসঙ্ঘকে অন্ধতা ও অন্ধবিশ্বাসের ভস্মে ছেলেমেয়েদের মনে যে সব ভ্রান্ত ধারণা এসেছে, তার পরিণাম যে শুভ নয়, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। যৌন জীবন যাপন না করলে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কা করা যায়। দেশের সকল শিক্ষার ভার রাষ্ট্রশক্তির হাতে থাকা দরকার,—ঘরোয়া শিক্ষা সব সময়ে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে না। কুশিক্ষা মানুষকে অসৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলে, আর তাতে সমাজের সর্ব্বনাশ হোতে পারে।

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। প্রোডোবিদ্যার নলিন যেমন কৃষি-সম্পন্ন ও ধনিক হয়, অলস ও বিদ্যাবিহীন ব্যক্তির চিত্র ও সেই রকম নানা-বিধ কুচিন্তায় কলুষিত হয়। অনেকে মনে করে থাকে যে পরিশ্রম-শীলতা ও প্রতিভা প্রায় এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়না। যাদের প্রতিভা আছে; তাদের পরিশ্রম করতে হয় না, এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপই মানুষ উৎকর্ষ লাভ করে থাকে। যার প্রখর বুদ্ধিশক্তি আছে, পরিশ্রম করলে তার উন্নতি সাধিত হবে—আর যার বুদ্ধিশক্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, পরিশ্রমই তার অভাব পূর্ণ করবে। সুপরিকল্পিত পরিশ্রমের কাছে কিছুই অপ্রাপ্য নেই। নিশ্চেষ্টতা সুখের আদর্শ নয়, অধ্যবসায়ই উন্নতির মূল।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যাঁদের বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বজ্ঞান মাত্র জন্মেছে, তাঁরা উদ্ধত, নির্দ্দয় ও অবিশ্বাসী হোতে পারেন, কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকে জেনেছেন, তাঁরাই সেই একমাত্র অচিন্ত্যশক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য দেখে বিস্ময় ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছেন। জীবের প্রতি প্রেম আর ভগবানের প্রতি অনুরাগ এই দুইটাই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। আত্মাভিমান ও লালসায় পূর্ণ কঠোর মানবহৃদয় দুঃখবিগলিত না হোলে ভগবৎ প্রেম গ্রহণ করতে পারে না। যার জীবনে কোন উচ্চ লক্ষ্য নেই, তার চরিত্রে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি সদ্গুণ স্ফুরিত হয়না।

কর্ত্তব্যপথ কণ্টকাকীর্ণ ও বিঘ্নবিকাময়। কর্ত্তব্যসাধনে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়, অনেক লোকের বিরাগভাজন হোতে হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্ভীক হৃদয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন করতে হয়। স্বার্থশূন্য কর্ত্তব্যসাধনেই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা। বিনয় আত্মমর্য্যাদার প্রতিকূল নয়, কিন্তু বিনয়ের আতিশয্য চাটুকারিতাই প্রকাশ করে। চাটুকারের বাক্যবহুলতাকে বিনয় বলা যায় না, এটা তার অসারতা ও কপটতার পরিচায়ক মাত্র। অস্বাভাবিক বিনয়বশতঃ অন্যের বা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া কাপুরুষের কাজ।

ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভবিষ্যতে কি হবে তার কিছুই স্থিরতা নেই। বর্ত্তমানকালকেই আশ্রয় করে বুদ্ধিমান লোক কাজ করে থাকেন। যে কাজ করতে হবে, তা এখনই করা উচিত, নতুবা তা সম্পাদিত হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। নিশ্চিতকে ছেড়ে অনিশ্চিতের আশায় থাকা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়।

ইচ্ছে থাকলে পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে, উদ্দেশ্য প্রাপণের চেষ্টা করে কৈশোর অবস্থায় লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হওয়া দরকার। সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধূলা, আড্ডা, কুৎসিত আমোদপ্রমোদ আর আলস্য ছাত্রজীবন গঠনে প্রতিবন্ধক। আশা করি এ বিষয়ে তোমরা ভেবে দেখবে।

অভিযাত্রী

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম. এ.,
পি এইচ ডি, পি আর এস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সময় বৃদ্ধ মেহেরচাঁদ শুদ্ধাচারে ভক্তিভাবে সাধুর জন্য কিছু দুধ ও ফল নিয়ে এলো ও আমায় তার কুটীরে নিয়ে গেলো কিছু খাওয়াতে। তার নাতিটি খুব ভালো আছে—হাসচে খেলচে দেখলুম। আমি নিজের মনে আমার জীবনের এই ওয়াইমার-দর্শনের আশ্চর্য অধ্যায়টি নাড়াচাড়া করছি—জানিনা তখনও আরও অপূর্ব অবিস্মরণীয় ঘটনায় আমার মন চিরদিনের মতো ভরে উঠবে। মেহেরচাঁদের আন্তরিক আপ্যায়নে তৃপ্ত মনে তার কুটীর হতে সাধুর কুটীরের দিকে পা বাড়িয়েছি হঠাৎ শুনলুম ভারী বুটের শব্দ—চেয়ে দেখি অনেক দূরে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, আর

একটি যুবক সাহেব একজন দেশী লোকের সঙ্গে দ্রুত পায়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। পলকের মধ্যে যুবকটি আমার সম্মুখে এসে বললে: সুপ্রভাত স্যর। তিনি কই, সাধু ওয়াইমার?—যুবকের মুখ পরিশ্রমে ও উত্তেজনার আবেগে অরুণ-রাঙা—তার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ জার্মান টান শুনে আমি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলুম। তারপর সযত্নে তার হাতখানি ধরে তারই মতো আবেগে দুলতে দুলতে সাধুর কুটীরের মধ্যে ঢুকলুম। সাধুর চোখ তখন ধ্যানে নিমীলিত। : বাবা—বাবা। বলে যুবক সন্ন্যাসীর হাতদুটি দুই হাতে টেনে নিয়ে চুম্বন দিতেই সাধু দুই চোখে অতি কোমল শান্ত দৃষ্টিতে অসীম স্নেহকরুণা ঢেলে ছেলের পানে নিথর হয়ে চেয়ে রইলেন—মুখে ফুটে উঠলো স্বর্গের হাসি।—সেই মুহূর্তেই আমি পিতাপুত্রের এই অপূর্ব মিলনের মধ্য হতে সরে এলুম বাইরে।

সে রাতে স্নেহেরচাঁদের ওখানেই রইলুম—কিছুতেই ছাড়লে না সে। পিতাপুত্রে সেই চিনার গাছের তলের ছোট্ট কুটীরেই রইলেন। সকালে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতে গেলুম কুটীরে। সন্ন্যাসীর আসন শূন্য—পুত্র বসে আছে চোখ দুটি বন্ধ করে। আমায় দেখে বললে: আসুন! বাবা চলে গেছেন খুব ভোরেই অমরনাথের পথে। : আপনি কেমন কোরে খোঁজ পেলেন ওঁর? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে সে বললে: খুব সহজেই—হিমালয়ের দু তিনজন তপস্যা-মগ্ন সাধুর কৃপালাভ করলুম—তাঁরাই সব বলে দিলেন—সকলেই চেনেন বাবাকে। অমরনাথের পথে তাঁকে পাবো—এও তাঁরাই বলেছেন। তাছাড়া শ্রীনগরের এক ডাক্তারের কাছে বাকী খবরটাও পেয়েছি।

যুবক ওয়াইমারের সঙ্গে অনেক গল্প হলো। বিদায় নেবার সময়ে সে ব্যাগ হ'তে একটি ছোট পুরানো ডায়েরী আমার হাতে দিয়ে বললে: বাবা এটি আপনাকে দিতে বলেছেন—পড়া হয়ে গেলে আবার আমায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

: ঠিকানা? কোলোনে দোবো তো?—আমার এ প্রশ্নের জবাবে সে হেসে বললে: না। তিনমাস আগে মা কোলোনের বাড়ীতে মারা যান—আমিও চলে আসি ভারতে। এখন আমি হিমালয়ের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াবো। আপনি আলমোড়ার রামকৃষ্ণ মঠে পাঠিয়ে দেবেন ডায়েরীটি।

* * * *

ফিরতি পথে কলকাতার ট্রেণে ডায়েরী খুলে পেলুম আমার প্রশ্নের উত্তর।—

: আজ এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। খোকন বিছানায় পড়ে—স্কুলে যেতে পারে না। শুয়ে শুয়ে কেবল গল্পের বই পড়ে, আর ভাবে ওর সঙ্গী-সাথীরা না জানি কতো কি শিখে নিলো। আমায় আজ বলছিলো—'অসুখটা সারে না কেন বাবা?' আমি গল্প কোরে ওর পাঠ্য জিনিষগুলির কতক শেখালেম—সান্ত্বনা দিয়ে বললেম—'এ সব সোজা জিনিষ তো' তুই দুদিনেই শিখে নিবি খোকন সেরে উঠে। তারপর ওর মনে উৎসাহ দেবার জন্য ওকে রসায়ন-শাস্ত্রের দুই একটি পরীক্ষা দেখাই—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে কেমন করে জল হয়, আবার জলকে বিদ্যুৎ দিয়ে কেমন কোরে এই দুইটি গ্যাসে পরিণত করা যায়। খোকন চোখ বড়ো বড়ো কোরে সব দেখলো—তারপর এক সময় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো।··· এই রকম আরও আট দশটি পাতা। তারপর—

: আজ সকালে ওর ঘরে আরও দু একটি পরীক্ষা দেখাবো বলে যেই গিয়েছি ও বললে—'ওসব আর দেখে কি হবে—আমি কাল রাতে জেগে-জেগে আপন মনে অনেক ভাবচি বাবা!' ওর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে হেসে বললেম—'কি ভাবলি খোকন?'

'তুমি কাল বললে যে পৃথিবীতে এই রকম একশোটি মৌলিক পদার্থ আছে, আর তাদের মিশ্রণে নানা বস্তুর উৎপত্তি।—আর তুমি তো বলতেই পারলে না যে কেন এতোগুলি মৌলিক পদার্থ হলো—আর কেন এরা এই নিয়মে অন্যান্য যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে?'

'খোকন। বৈজ্ঞানিক সে কথা কোনদিনই বলতে পারবে না, কারণ এসব তো আর চোখে দেখা বা পরীক্ষার ব্যাপার নয়। ধরে নে—আমরা যেন এই ঘরের পিঁপড়ে—কেবল দেখতে পাই কি-কি আসবাব-পত্র বাসন-কোসন—আর কেমন নিয়মে তারা আসে যায়। কিন্তু যেহেতু তারা আমাদের মনের কথা জানে না—তারা এদের পেছনের কারণও জানতে পারে না। 'তাহলে কি আমরা

চিরকাল পিপড়ে হয়েই থাকবো? কি হবে বাবা—এ সব ওপর ওপর বৃত্তান্ত সংগ্রহ কোরে? এতো পরীক্ষা কোরে? এতো বই পড়ে? আসল কারণই তো জানতে পারবো না। আর এমনি একজন লোক কতোটুকুই বা জানতে পারে?"

খোকনের আন্তরিক বিশ্বাস ও বুদ্ধিমাখা গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বোললেম —'তাহলে তোমার বক্তব্যটা কি? বিজ্ঞান ছেড়ে দেওয়া উচিত আমাদের?'—খোকন সেই রকম ভাবেই বললে—'ভগবান এই সব সৃষ্টি কোরেছেন আর এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মে পৃথিবী চালাচ্ছেন তো? তাহলে আমরা তাঁকে না জেনে—তাঁকে না জিজ্ঞেস কোরে বাইরে হ'তে দেখে-দেখে কতোটা শিখতে পারি? আর সে শিখেই বা কি হবে?···জানো বাবা! আমার অসুখের কথাও ভেবে দেখচি। এখন তিনিই কয়েকটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে আমার এই শরীরটি তৈরী কোরেছেন আর তাঁরই ইচ্ছা বা নিয়মে এর সমস্ত কাজকর্ম চলছে—তখন তিনি যদি আমার এই শরীরটিকে সারাতে না চান আমরা কেন বোকার মতো নানা ওষুধ দিয়ে সে চেষ্টা করবো?···তাই ভাবচি বাবা, আমি আর কোনও ওষুধই খাবো না। দেখি না কি হয়।'

আমি ওর কাছে বসে বুঝিয়ে বললেম যে মানুষকে ভগবান এমন কোরেছেন যে তাকে এমনি দেখে-দেখেই শিখতে হবে—উপায় নেই। খোকন মাথা নেড়ে বললো—'মানুষ শুধু শুধু তার অন্ত সহজ পথ ছেড়ে এই উল্টো পথে চলতে শিখছে। ভগবান যদি আমাদের পিতা হন তো আমরা তাঁকেই তাঁর ঘর-বাড়ী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবো—আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় কোরে। তা না কোরে—চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে কিম্বা গোয়েন্দা পুলিশের মতো তন্ন তন্ন কোরে সমস্ত পরীক্ষা কোরে দেখার কোনো মানে হয়? এর কি শেষ আছে? তুমি আমায় কতো পরীক্ষা দেখাবে বলো?'—আমি এখন তাঁকে জানতে চাই—যাকে জানলে সবই জানা যায়।'

আমি বললেম—'খোকন এসব তোর আজগুবী কথা। তোর শরীর ভালো হয়ে যাক—তখন দেখবি বিজ্ঞান কতো ভালো—কতো সুন্দর।' ও ওর ছোট চলচলে সুন্দর মুখখানি তুলে তুলতুলে হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—'তুমি আমায় ওভাবে না শিখিয়ে যদি একেবারে গল্পচ্ছলে সমস্ত জিনিষের কারণ বলতে পারো—তবেই আমার ভালো লাগবে, আর আমার সব অসুখ সেরে যাবে, ভালো হয়ে যাবো বাবা।'

আমি তো অবাক। খোকন ঐভাবেই বলতে লাগলো —'বইতে পড়েচি যে আমাদের দেশে আর পূর্বদেশে বিশেষ কোরে এমন সব সাধুপুরুষ আছেন যে তাঁরা মনশ্চক্ষে কতো-কি দেখতে পান—কতো কি জান তাঁদের এমনিই হয়। ভগবানের কাছ হ'তে সরাসরি তাঁরা এসব পান।···তাছাড়া জানো বাবা। তাঁকে পেলে নাকি এতো আনন্দ হয় যে এতোসব খুঁটিনাটির জ্ঞান—যা বিজ্ঞানে তোমরা খুঁজে সারা হও—তার দরকারই থাকে না। ঐ বইটা কাল পড়ে অবধি আমার আর এই অসুখে পড়ে থাকতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। এই পৃথিবীতে বেঁচে না থাকলেও ভগবানের রাজ্যে কোথাও না কোথাও আমি নিশ্চয়ই থাকবো। ভগবান নিশ্চয় আমার জন্ত কিছু না কিছু ভেবে রেখেছেন—আর তা' আমার ভালোর জন্তই—কারণ তাঁর ইচ্ছায় যেভাবে থাকবো তাই আমার ভালো লাগবে—যেমন সেই যে স্কুলে যে নাটক কেরোছিলেম তাতে যা পার্ট পেয়েছি তাই ভালো লেগেছে।'

আমি খোকনের মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইলেম—ওর কচিমুখ রাঙা—নীল চোখ দুটি জ্বলজ্বল কোরছিল। মনে হলো ওর অনুভূতিতে হয়তো এমন একটি সত্যের প্রকাশ ঘটেছে—যা আমি পেয়েও হারাচ্ছি। হয়তো আমার এ পথ ভুল—অনাবশ্যক সময় আর শক্তির অপচয় মাত্র। হয় তো আজকের সমস্ত মানুষের সত্যতাই ভুলপথে চলেছে। বিজ্ঞানের অভিমান হয়তো আমাদের আসল ছেড়ে বহিরাবরণের দিকেই চিৎ-শক্তিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি তলে আজ হয়তো খোকনের মতো দুএকজনের সতর্কবাণী কোন অতলে তলিয়ে যাবে। কিন্তু আমি নিজেও কি এ বাণী কাণে তুলবো না? একবার পরীক্ষা কোরে দেখবো না অন্ত পথটা? হয়তো ওটা খুবই সহজ হবে। শুনেছি অনেকেই এপথে বিবাহীন হয়ে বার হন ও তাঁদের লক্ষ্যেও

পৌছান। আমিও কি বার হবো? তবে খোকন আর তার মা? তাদের কি হবে?···কি করবো—ভগবানের হাতেই সব কিছুর সঙ্গে নিজেকেও করবো সমর্পণ?··· তিনিই নিন সব কিছুর ভার—আমি আত্মনিবেদন করলেম।" • • • •

পারুল

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

ঝক্‌মকে জ্যোছনায় চারিদিক্ ঝল্‌মায়
কেন মা'গো বকো মোরে বলো, 'চোখে ঘুম নাই।'
জ্যোছনার আলো আসে বাতায়ন পথে ওই—
পূর্ণিমা চাঁদ হাসে— আকাশের বুকে রই'।

চারিদিক আলো-করা আজ রাত দুপুরে—
আকাশের চাঁদ দেখো, ভাসে তালপুকুরে।
সাত ভাই চম্পারা জাগে ঐ আকাশে
আমি যে তাদের বোন চোখে কি মা ঘুম আসে!

চুপ ক'রে শোন মা'গো ঝিঁঝিমিঁঝি কলরব
গাছে গাছে পাখে পাখে ডাকে যত পাখা সব।
নিশীথের ফুল-বীথি ভরে' গেছে ফুলে ফুলে
কেন মা'গো চোখ্ তোর মরে' ঘুমে ঢুলে ঢুলে।

আজকের মত মা'গো, 'মেয়ে হও তুমি মোর,'
হাই তোল, তুড়ি দাও, ঘুচে ভাঙি' ঘুম তোর।
নিভিয়ে ঘরের আলো বসি এসো আঙিনায়,
আমি যে 'পারুল' বোন চোখে তাই ঘুম নাই।

জ্যোতিষী

শ্রীহরিপদ গুহ

পুরোনো বই কেনা আমার মত বাতিক। ম্যাট্রিক পাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোনো মাস বাদ পড়েছে বলে আমার মনে হয় না যে, অন্ততঃ একখানা বইও কিনি নি। বইপড়া আমার একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। অফিসে সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পর লোকে ঘরে ফিরে মনের সুখে বিশ্রাম উপভোগ করে। আমিও যে বিশ্রাম করি না তা' নয়, তবে হাতে একখানা বই নিয়ে। তাতে মনে পাই প্রচুর আনন্দ! এজন্য গৃহিণীর অনেক মৃদু ভর্ৎসনাও শুনতে হয়। অবশ্য সেটা এখন খুব গা-সহা হয়ে গেছে—মনে আর কোন ব্যথা পাই না।

ছাত্রজীবনেও বই পড়া নিয়ে অভিভাবকের কাছে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁদের কড়া শাসনও আমার এ' নেশা দূর করতে পারে নি। আজ মাঝে মাঝে হাসিও পায়—তাঁদের চোখে কি ধুলোই না দিয়েছি!

বছর কয়েক আগেকার কথা বলছি। সেদিন শনিবার। আফিস ফেরৎ কলেজ ষ্ট্রীটে নেমে পড়লুম। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ফুটপাতে পুরোনো বই বেচছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করছে—'যা' নেবে তা চার আনা, তোলো বাছো চার আনা।'

ইংরেজী, বাংলা একখানা বই বেছে নিলুম। পাতা-গুলো সব একেবারে লাল হয়ে গেছে। খানিকটা পড়ে দেখলুম—জ্যোতিষ সম্বন্ধে লেখা। চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে বইখানা নিয়ে আমি চলে এলুম।

বাড়ী এসে জামাটা খুলে বিছানায় শুয়ে বইখানা নিয়ে গো-গ্রাসে পড়তে আরম্ভ করে দিলুম।

একটু পরে গৃহিণী চা ও জলখাবার দিয়ে গেলেন। আমি পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলুম।

একটু পরে কি একটা কাজে তিনি ঘরে এলেন। চা-খাবার তেম্‌নি পড়ে আছে দেখে তিনি অবাক হয়ে

প্রশ্ন করলেন—কি হলো? চা খেলে না? কাপে হাত দিয়ে দেখি—চা একেবারে জল হয়ে গেছে। তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কটমট্ করে চেয়ে থেকে—গম্ভীরভাবে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই চা গরম করে ফিরে এসে কাপটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আগে খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করো বাপু। এক কাজ আমাকে দুবার করে করাবে। আমি সুবোধ বালকের মত তপ্ত কাপে চুমুক দিতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে খাবারও খেতে লাগলুম। খাওয়া শেষ হতেই সে কাপ্ ডিস্ নিয়ে চলে গেল। আমিও পাঠে মনোনিবেশ করলুম। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারেই বইখানার প্রায় অর্দ্ধেক পড়ে ফেললুম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গা' ধুয়ে গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম। বাসায় যখন ফিরলুম, তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

রান্নার রান্না তখনো শেষ হয় নি। আমার হাতেও বিশেষ কাজ ছিল না, তাই সেই বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগলুম। তখন রাত দশটা বেজে গেছে। গৃহিণী খেতে ডাকলেন। আমি বই বন্ধ করে তাঁর পেছন পেছন রান্না ঘরে গেলুম। দশ মিনিটের মধ্যেই আমার খাওয়া হয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে এসে আবার বই নিয়ে শুয়ে পড়লুম। বইটা খুবই ভাল লাগছিল।

বইটা পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ইতিমধ্যে গৃহিণী সব কাজ শেষ করে কপাট বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর শয্যায় শোয়া মাত্র তারও দু'চোখে ঘুম নেমে এসেছে।

অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক বিরাট কাপালিকের মূর্ত্তি। মাথায় তার বড় বড় চুল, কপালে রক্তচন্দন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বড় বড় চোখ মেলে সে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললে—অনেক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছি। সেই সাধনার ফলেই এই বই লিখতে পেরেছি। আজ আমি কি-না হতে পারতুম, একটা ভুলের জন্য সব খুইয়েছি।

তাঁর কাছে কত কি চাইব ভেবেছিলুম, কিন্তু কিছুই চাওয়া হলো না। ছলনাময়ীর ছলনায় সব কেমন তাল-গোল পাকিয়ে গেল, আমার জীবন হলো একেবারে ব্যর্থ! অন্নপূর্ণা যখন ঈশ্বরী পাটুনীকে বর দিতে চাইলেন, সে বলেছিল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' এই নিয়ে তখন কত হেসেছি, সেযে আমারই হলো কি না সেই মতিভ্রম! তারপর অঙ্গুলি সঙ্কেতে সে আমায় ডাকলে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করে চললুম।

গভীর বনের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। চারদিক্ নিঃঝুম, মধ্যে মধ্যে দু' একটা পেচক কর্কশস্বরে ডেকে উঠছে। নিবিড় বনের মধ্যে যেখানে অন্ধকার বেশী, সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাক্ জ্বলছে। সেই ক্ষীণ আলোয় আমরা পথ চলেছি। চলতে চলতে আমরা একটা নদীতীরে এসে উপস্থিত হলুম। সামনেই মহাশ্মশান। সেখানে তখন একটা চিতাও জ্বলছিল না।

কাপালিক নদীর ঘাটে নেমে গিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা শবকে শ্মশানে টেনে নিয়ে এলো। তারপর সেই মৃত দেহটার বুকের ওপর আসন করে বসে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর সেই শবটা একটু একটু 'হাঁ' করতে আরম্ভ করছে। কাপালিক তখন তার মুখে মন্ত্রপূত কারণ বারি একটু একটু করে দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর শবটা চোখ মেলে চাইলো। কী ভীষণ সেই চোখের দৃষ্টি! আমার সমস্ত দেহ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। মনে হলো—আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবো। সহসা কাপালিক 'মাভৈঃ' বলে বিকট চীৎকার করে উঠে ইঙ্গিতে আমায় বসতে বললে। ভয়ে ভয়ে আমি তার আদেশ পালন করলুম।

একটু পরেই দেখি—কতকগুলি কঙ্কাল কাপালিকের চারদিকে চক্রাকারে নেচে চলেছে। তাদের নাচের তালে তালে শব উঠছে খট্ খট্ খট্। আতঙ্কে আমার চোখ বুজে এলো। প্রাণপণ চীৎকার করতে গেলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। সহসা কঙ্কাল গুলো ভোজবাজীর মত কোথায় মিলিয়ে গেল। কাপালিকের মন্ত্র পাঠও আরো স্পষ্ট ও দ্রুততর হয়ে উঠল। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ তার কোমর জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে ফোঁস্ ফোঁস্ করে গজরাতে লাগল। সে কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। তার মন্ত্রপাঠ সমানেই

চলেছে। সাপটা বুকের প্যাচ্ খুলে ফেলে ভয়ে ভয়ে যেন পালিয়ে গেল! তার মন্ত্র আরো তীব্র হয়ে উঠ্‌ল। তারপরই শুনতে পেলুম—যেন শত শত ঢাক একসঙ্গে বেজে উঠ্‌ল। কী ভয়ঙ্কর সে শব্দ! মনে হলো—বুঝি কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেল! তার মন্ত্রপাঠ সমানেই চলেছে। একটু পরেই সব শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। দেখা গেল—পরম রূপসী কয়েকটি নর্তকী-বেশী রমণী তাকে ঘিরে নেচে চলেছে। কাপালিকের কোন ভ্রূক্ষেপও নেই! আপন মনেই সে শব-সাধনা করে চলেছে। এই নর্তকীর দল যেমন সহসা এসেছিলো, তেমন হঠাৎই কোথায় মিলিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটা বায়োস্কোপের ছবির মতই চোখের সাম্‌নে ভেসে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ফুটে উঠ্‌ল—ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এমন পরিষ্কার দিনের মত আলো সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কী স্নিগ্ধ সেই আলোক-ধারা! মনটা যেন কেন খুসীতে ভরে উঠ্‌ল। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা উজ্জ্বল আলোকশিখা ফুটে উঠল। সেই আলোর ভেতর থেকে এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি প্রকাশিত হয়ে কাপালিকের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন—বৎস, তোমার সাধনায় আমি পরম তৃপ্ত হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো। ইহলোকে তোমার যা বাসনা বলো। যশ, ঐশ্বর্য্য, দেবকন্যা, কিন্নরী, কি চাও তুমি? যা তোমার আকাঙ্ক্ষা তাই পাবে। বলো কি চাও?

কাপালিক সেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর চরণে মস্তক স্পর্শ করে বল্‌লে—তুমি যদি খুসী হয়ে থাকো, তবে আমাকে এই বর দাও মা—আমি যেন জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশারদ হতে পারি, আমার মুখের বাক্য যেন কখনো মিথ্যা না হয়!

'তথাস্তু' বলে সেই দেবীমূর্তি সহাস্য মুখে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হা—হা শব্দে কাপালিক বিকট শব্দে হেসে উঠল। বট্‌গাছ থেকে কয়েকটা নিশাচর পাখী ভয় পেয়ে উড়ে গেল। সমস্ত স্থানটা আবার ঘন ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গেল। কাপালিককে কোথাও আর দেখ্‌তে পেলুম না, সে গেল কোথা? দারুণ ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠ্‌লুম।

সহসা গৃহিণীর ঠেলায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখ্‌লুম—আমার বিছানায় শুয়ে আছি, চাদর ও বালিশ-ঘামে একেবারে ভিজে গেছে। সমস্ত ঘটনাটাই তখন আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হলো!

গৃহিণী গজরাতে লাগ্‌লেন—না' তা রাত্রে বই পড়ে এই সব বিশ্রী স্বপ্ন দেখ্‌ছ। যাও, চোখে মুখে জল দিয়ে একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে শোও!

অনেকদিন হয়ে গেছে। বই খানার নাম এখন আমার মনে নেই। দু' একবার বাসা বদল হয়েছে, তাতে হারিয়েই যাক্ কিম্বা কেউ পড়্‌তে নিয়ে গিয়ে দয়া করে ফেরৎ দিতে ভুলে যাক্, এই রকম একটা কিছু হয়েছে। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও বইখানি পাই নি। ভালই হয়েছে। সেখানি যতদিন আমার কাছে ছিল, এমন একটি রাতও যায় নি, যখন আমি এমনি ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠি নি। যেদিন থেকে বইখানি গেছে, সেদিন থেকে আমার এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হয়েছে।

ছোটদের ম্যাজিক

যাদুকর রতনকুমার দাস

আজ তোমাদের যে খেলাটির কথা বোলব সেটি তাসের খেলা। তাসের খেলাই হ'ল ম্যাজিকের প্রথম ধাপ (Step)। তাসে যদি তোমাদের হাত ভালো হয়ে যায়, তাহলে ঐ এক প্যাকেট তাস নিয়ে দু এক ঘণ্টা দর্শকদের সম্মোহিত করে রাখতে পারবে। তাসের খেলা দু রকম তাস নিয়ে করা যায়। এক হ'ল বিশেষ ভাবে প্রস্তুত তাস নিয়ে, আর এক হ'ল সাধারণ তাসের প্যাক নিয়ে। আমি সাধারণ তাসের প্যাক নিয়েই খেলা দেখিয়ে থাকি। সাধারণ তাসের প্যাক নিয়ে খেলা দেখাতে হলে খুব একটা অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। বিশেষ ভাবে তৈরী তাস নিয়ে সাত বছরের ছেলেও খেলা দেখাতে পারে। এবার শোন খেলাটি কি!

যাদুকর রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের অভিনন্দন

জানিয়ে বললেন, "দর্শকগণ আপনারা আমার হাতে একটা সাহেব আর একটা বিবি দেখছেন।" এই বলে যাদুকর হাতের তাস দুটো টেবিলের উপর রেখে দুটো সাদা খাম তুলে নিয়ে একজন দর্শককে দিয়ে একটা খামের উপর 'বিবি' আর একটার উপর 'সাহেব' লিখিয়ে নেন। তারপর খাম দুটো দুজন দর্শকের হাতে উঁচু করে ধরতে দিয়ে বলেন, "আমার কাছে প্রথমে দুটো তাস দেখেছিলেন। তাস দুটি হ'ল 'বিবি' আর 'সাহেব'। আর দুটো খামের উপর আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে দিয়ে একটা খামের উপর 'সাহেব' আর একটা খামের উপর 'বিবি' লিখিয়ে নিয়েছি। পরে যাতে ভুল না হয় সেই জন্য এই রকম করা। এবার আমি বিবি লেখা খামটায় বিবি—আর সাহেব-লেখা খামটায় সাহেব রেখে দিচ্ছি।" যে দর্শকটির হাতে 'সাহেব'-লেখা খাম ছিল তাঁকে সাহেব দেখিয়ে পুরে দিলেন খামের ভেতর। বিবি লেখা খামটায় বিবিটাকেও পুরে দিলেন। তারপর বিড় বিড় করে কিছুক্ষণ মন্ত্র বলে সাহেব-লেখা খাম থেকে বিবি, আর বিবি-লেখা খাম থেকে সাহেব বের করে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন।

প্রথমেই তোমাদের বলেছি যে তৈরী তাস নিয়ে একটা সাত বছরের ছেলেও খেলা দেখাতে পারে। এটা হ'ল সেই তৈরী তাসের খেলা। আগে একটা 'সাহেব' ও আর একটা 'বিবি' সংগ্রহ করে নাও। তারপর সাহেবটার একদিককার 'ইনডেক্স' (K) ধারাল ব্লেড দিয়ে ঘষে তুলে দাও। বিবিটারও ঠিক সাহেবের মত একদিককার 'ইনডেক্স' (Q) তুলে নেবে। এবার সাহেবের যে দিককার 'ইনডেক্স' তুলে দিয়েছো সেই দিকটা একজন আর্টিষ্টকে দিয়ে বিবির মত একটা 'ইনডেক্স' আঁকিয়ে নেবে। বিবির যে দিককার 'ইনডেক্স' তুলে দিয়েছো সেই দিকটায় সাহেবের মত একটা 'ইনডেক্স' আঁকিয়ে নেবে। তারপর খুবই সহজ। এবার বুঝতে পারছো যে তৈরী-করা তাস নিয়ে ম্যাজিক দেখান কত সুবিধা। আজ তাহলে আসি কেমন?

শিশু-শিল্পী

প্রফুল্লকুমার দত্ত

কাগজে দাগ্ কেটে মলিন করা শেষ,
থোকন তবু ভাবে : এই তো হ'ল বেশ!
অর্থ এর যা' তা' বোঝেনা বুড়ো-বুড়ি—
আল্‌তো রেখা ঘিরে ভাবের-ই লুকোচুরি!

এ-রেখা-ব্যঞ্জনা থোকন-ই একা বোঝে—
অসীম উৎসাহে তাকিয়ে চোখ বোজে!
শিল্পী থোকনের এটাই সান্ত্বনা—
আমরা কভু এর মূল্য জানব না!

বয়েস হ'ল ঢের : আমরা বুড়োখোকা
ওসব দেখে ভাবি, থোকন ভারি বোকা!
যখন ও বড় হবে, ও-খেলা যাবে ভুলে—
চমকে উঠ্‌বেই অনিয়ম এক চুলে!

তবু এ-শিল্পীর ব্যাস্ত আল্‌পনা
দুলালো আজ আমাকে মৃত্যু-কাল গোণা॥

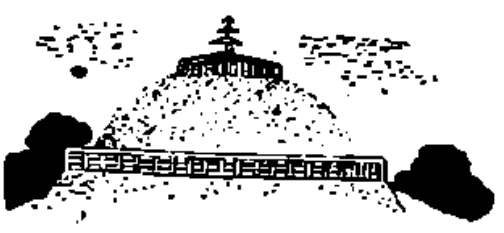

ব্যস্ত-বসন্ত

গোপাল দাস

তখন সকাল সাড়ে ন'টা। হার্ভে ম্যাক্সওয়েল এক-প্রকার ঝড়বেগে ঘরেই প্রবেশ করল তার নিজের অফিসে। সঙ্গে রয়েছে তরুণী ষ্টেনোগ্রাফার। "গুড্ মর্ণিং, পিচার," সংক্ষেপে সম্ভাষণ জানিয়ে ছুটে গেল নিজের ডেস্কের দিকে। ডেস্কের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারলেই যেন হ'ত ভাল। অনেকটা সময়ই বাঁচত তা'হলে। মুহূর্তের ভেতর স্তূপীকৃত চিঠি ও টেলিগ্রামের মধ্যে ডুবে গেল ম্যাক্সওয়েল, নিউইয়র্কের কর্মব্যস্ত দালাল হার্ভে ম্যাক্সওয়েল।

পিচার এই ফার্মের কন্‌ফিডেন্সিয়েল ক্লার্ক। বহু দিনের পুরানো কর্মচারি। তার ভাবলেশহীন মুখেও আজ পড়েছে কিঞ্চিৎ বিস্ময় আর কৌতূহলের ছাপ।

তরুণীটি ম্যাক্সওয়েলের অফিসে ষ্টেনোর কাজ করছে আজ একবছর। তরুণীটি সুন্দরী। আর তার কমনীয় তনুশ্রীতে এমন কিছু ছিল, যা তার ষ্টেনোগ্রাফীর সঙ্গে খাপ খায় না মোটেই। প্রসাধন আর পরিচ্ছদ—দুইই তার সংযত। নিজেকে দর্শনীয় করবার প্রয়াস নেই কোথাও। তার গলায় ছিল না কোন সোনার চেন বা লকেট। হাতেও পরেনি ব্রেসলেট। কোন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার মতো ঝলমলে পোষাকও তার নয়। তার পরণে ছিল ধূসর রঙের সাদা-সিধে একটা গাউন। ওটাতে তার আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল চমৎকার। তার মাথার পরিচ্ছন্ন কাল টুপিটায় গোঁজা ছিল ম্যাক' পাখীর সোনালী সবুজ পালক।

ওই দিনের সকাল বেলায় ওকে দেখাচ্ছিল শান্ত আর লজ্জারুণ। স্বপ্ন-রঞ্জিত দুটি চোখ। আর পিচ্‌ফলের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছিল তার দুটি নরম কপোলে। একটা পুষ্টীর হাওয়া হালকা রেশমী ওড়নার মতো ঘিরে রেখেছিল তার নিটোল দেহবল্লরী! আর তা' ছিল স্মৃতির সুবাসে স্নিগ্ধ। সুখের স্মৃতি।

তরুণীর এই ভাব পরিবর্তন পিচারের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। কৌতূহলের সঙ্গে সে লক্ষ্য করছে ওর চলা-ফেরা।

তরুণী তার নিজের ঘরে না গিয়ে বাইরের অফিস ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। অনিশ্চিত তার চালচলন। কতকটা অস্থিরও মনে হচ্ছিল তাকে। একটু পরে সে ম্যাক্সওয়েলের ডেস্কের দিকে গেল এগিয়ে। ম্যাক্স-ওয়েলের নজরে আসার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু নিউইয়র্কের কর্মব্যস্ত দালাল তো আর মানুষ নয়, একটি যন্ত্র। যন্ত্রের ন্যায়ই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে কাজ করে চলেছে ম্যাক্সওয়েল। কাজ ভিন্ন অপর কিছু সহজে তার নজরে পড়েনা, চিন্তায় আসে না।

"কি ব্যাপার?" হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞেস করে ম্যাক্সওয়েল। "কিছু দরকার আছে?"

ডেস্কের ওপর সেদিনকার ডাকের চিঠির পাহাড় জমে উঠেছে। ম্যাক্সওয়েলের মুখে চোখে অধৈর্যের ছাপ।

"না, কিছু না," স্মিত হেসে সেখান থেকে চলে আসে তরুণী ষ্টেনো।

"আচ্ছা, মিঃ পিচার," কন্‌ফিডেন্সিয়েল ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলে তরুণী ষ্টেনো, "মিঃ ম্যাক্সওয়েল কি নতুন ষ্টেনো রাখার সম্বন্ধে কাল কিছু বলেছেন আপনাকে?"

"হ্যাঁ," উত্তর করলে পিচার। "আর একজন ষ্টেনো রাখার কথাই বলেছেন তিনি। আমি কালই ষ্টেনো

সরবরাহকারী একটা সংস্থাকে বলে দিয়েছি—আজ সকালেই কয়েকটি ভাল নমুনা পাঠাতে। কই, এখনও তো দেখছি একটুকরো চিউইংগাম্ কি চকোলেটের আবির্ভাবও ঘটল না।"

"তা'হলে যতক্ষণ না নতুন লোক আসছে, ততক্ষণ অন্তত কাজ চালিয়ে যাই।" কতকটা স্বগতোক্তির ধরণে বললে মেয়েটি। তারপর সে প্রতিদিনকার অভ্যস্ত স্থানে মাথার সবুজ সোনালী পালক বসানো টুপিটি ঝুলিয়ে রেখে বসল গিয়ে নিজের ডেস্কে।

ম্যাক্সওয়েল তখন ভয়ানক ব্যস্ত। সার্কাসে যাঁরা সবুজ ঘোড়ার খেলা দেখেছেন কেবল তাঁরাই কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারবেন এখানকার কাজের ধরণ। ডেস্কের ওপর উঁচু হয়ে উঠেছে কাইলের পাহাড়। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের নোটিং হয়ে গিয়ে ফিতে বাঁধা পর্যন্ত শেষ। অমনি একরাশ বিল এসে হাজির। তাও সই হয়ে গেল। সংবাদ-বাহকেরা নিয়ে আসছে সব রুদ্ধশ্বাস সংবাদ। টেলিগ্রামও আসছে ঝরঝর। অধৈর্য সাক্ষাৎপ্রার্থীর দল ঝুঁকে পড়েছে রেলিঙের ওপর। অনর্গল বকে যাচ্ছে তারা। করণিকের দল দ্রুত পায়ে ছোটাছুটি করছে ডেস্ক থেকে ডেস্কে। সমস্ত ঘরে বেসামাল জাহাজের নাবিকদের মতোই তাদের অবস্থা।

ম্যাক্সওয়েল অফিসের সেদিনের কর্মচাঞ্চল্য পিচারের দোকানে দুধেও এনে দিয়েছিল একটা রক্তিম সজীবতা।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং। টেলিফোনের কল আসছে অনবরত। ফোনের ওপারে যেন বয়ে যাচ্ছিল ঝড়, তুষার-ঝঞ্ঝা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। আর এপারে সকলের মানসিক উদ্বেগ আর চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল তারই প্রতিক্রিয়া। ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসে ম্যাক্সওয়েল একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে—আবার পরমুহূর্তেই সামনে ঝুঁকে পড়ে কাজ করে যাচ্ছিল।

ঠিক এমনি সময় তার সামনে এসে হাজির হ'ল নতুন ষ্টেনো, পেছনে পিচার। ঈষৎ গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল নতুন ষ্টেনো। মাথায় তার উটপাখীর পালক খোঁজা ভেলভেটের টুপি। সোনালী চুলের দুটি পাকানো গোছা দু'কানের পাশ ঘেঁসে ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। নকল সীলের চামড়ার গাউন পরণে। তার কণ্ঠদেশ জুড়ে ছিল হিকরি বাদামের মত বড় বড় কৃত্রিম মুক্তোর মালা।

"ষ্টেনো সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন ইনি, পরিচয় করিয়ে দেয় পিচার। একটা পোষ্ট খালি হয়েছে আমাদের আফিসে।"

"কিসের পোষ্ট?" ভ্রূকুঞ্চকে জিজ্ঞেস করে ম্যাক্সওয়েল।

"ষ্টেনোগ্রাফারের," উত্তরে বললে পিচার। "গতকাল এঁদের প্রতিষ্ঠানেই খবর পাঠাবার জন্যে বলেছিলেন আমাকে। ওঁরা যেন অন্তত একজনকে আজ সকালেই পাঠিয়ে দেয়।"

"তুমি দিন দিন বড্ড ভুলোমন হয়ে যাচ্ছ পিচার," বিরক্ত হ'য়ে বললে ম্যাক্সওয়েল। "তোমাকে কেন আমি ওরকম বলতে যাব! মিস্ লেস্‌লি একবছর থেকে কাজ করছে এখানে। তার কাজ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। যতদিন সে এখানে কাজ করতে চাইবে, ততদিন অন্য ষ্টেনোগ্রাফার নেবার কথাই উঠতে পারে না। বড়ই দুঃখিত, ম্যাডাম। বর্তমানে কোন পোষ্টই খালি নেই। পিচার, দেখো আবার কোন নতুন ক্যান্‌ভিডেট্ এনে হাজির ক'রো না যেন।"

চেয়ার ঠেলে সরিয়ে রেখে ডেস্কের ওপর টোকা মারতে মারতে অফিস থেকে বেরিয়ে যায় অসন্তুষ্ট তরুণী কর্মপ্রার্থিনী।

"এই অভিজ্ঞ ভদ্রলোক দিন দিন কি রকম অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন," এক ফাঁকে বুক-কীপারের কাছে মন্তব্য প্রকাশ করে পিচার।

ম্যাক্সওয়েলের ডেস্কের ওপর জমে উঠেছে সব বন্ধকী দলিল দস্তাবেজ,তমসুক আর শেয়ারের কাগজপত্র। কখন সে তলিয়ে গেছে কাজের ঘূর্ণির মধ্যে। ঘড়ির কাঁটার মতোই নিখুঁত যান্ত্রিক নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করছে সে প্রতিটি কাজ। সে বাস করছে তার নিজের সৃষ্ট জগতে। সে জগতে আছে শুধু অর্থনীতি। সে জগতে স্থান নেই মানুষের, স্থান নেই রক্ত মাংসের প্রকৃতির।

লাঞ্চের সময় ঘিনিঠ হ'য়ে এল কাজের হুড়োহুড়ি।

ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়েছিল ম্যাক্সওয়েল। দু'হাত ভর্তি তার টেলিগ্রাম আর মেমোরেণ্ডাম। ডান কানে আটকানো রয়েছে একটা কাউন্টেন পেন। তার প্রশস্ত

ললাটের ওপর বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছিল বিশৃঙ্খল অলকের গুচ্ছ।

বাতায়ন পথ ছিল উন্মুক্ত। ফাল্গুন পৃথিবী তখন তার দয়িত বসন্তের উষ্ণ স্পর্শে সন্ত জেগে উঠেছে।

ওই বাতায়ন পথেই ভেসে এল এক উদ্‌ভ্রান্ত, হয়তো বা পথভ্রষ্ট লাইল্যাকের কোমল মিষ্টি সুরভি। এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল নিউ ইয়র্কের কর্মব্যস্ত দালাল ম্যাক্‌সওয়েল। এই সুঘ্রাণের মালিক মিস্ লেস্‌লি। অন্য কেউ নয়, আর কেউ হ'তে পারে না!

নেশার মতো ওই চিন্তাটা মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলল তার সমগ্র অনুভূতি। লাইল্যাকের সুরভি রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে জীবন্ত জাগ্রত হয়ে দেখা দিলে তার সামনে। সেই জীবন্ত প্রতিমা মিস্ লেস্‌লির।

অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল তার কর্মের জগৎ, অর্থনীতির জগৎ। পাশের ঘরেই রয়েছে মিস্ লেস্‌লি। মাত্র দশ গজের ব্যবধান।

"এক্ষুণি কাজটা সেরে ফেলব আমি," অনুচ্চস্বরে বললে ম্যাক্‌সওয়েল। "এখনই, এই মুহূর্তেই জিজ্ঞেস করব ওকে। অনেক পূর্বেই কেন কাজটা সেরে ফেলিনি—সেকথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

দ্রুতপায়ে সে ছুটে গেল ষ্টেনোগ্রাফারের ঘরে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ডেস্কের ওপর।

মুখ তুলে তাকাল মিস্ লেস্‌লি। একটা নরম লালচে আভা ফুটল তার মুখে। চোখের দৃষ্টি তার শান্ত আর সরল। ও'র ডেস্কের ওপর একটা কনুই রাখল ম্যাক্‌স-ওয়েল। তখনও তার দু'হাত ভর্তি কাগজপত্র। কানে গোঁজা রয়েছে কলম।

"মিস্ লেস্‌লি," হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলে ম্যাক্‌স-ওয়েল, "আমার হাতে রয়েছে এক মুহূর্তের সময়। এই সময়টুকুর ভেতরই কিছু বলতে চাই তোমাকে। তুমি কি আমার স্ত্রী হ'তে রাজী আছ? এর আগে তোমাকে আমার ভালবাসা জানাতে পারিনি। নেহাত সময়ের অভাবের জন্যেই সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি। তাড়াতাড়ি উত্তর দাও। ওদিকে যে রেলওয়ে কোম্পানীর লোকেরা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।"

"কি বলছেন আপনি?" উত্তর করলে তরুণী ষ্টেনো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়।

"তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না?" অধীরভাবে বলে উঠল ম্যাক্‌সওয়েল। "আমি চাই যে তুমি আমাকে বিয়ে কর। আমি তোমাকে ভালবাসি, মিস্ লেস্‌লি। কাজের চাপটা একটু কমতেই একমিনিট সময় করে নিয়ে একথা বলতে ছুটে এসেছি তোমার কাছে। ওরা আমাকে ডাকছে ফোনে। পিটার, ওদের বলে দাও একমিনিট অপেক্ষা করতে। তুমি কি রাজী হবে না, মিস্ লেস্‌লি?"

এর পরে তরুণীর ব্যবহারগুলো বড়ই বিচিত্র বলে মনে হ'ল। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন সে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেছে। একটু পরেই ওই বিস্ময়-বিমূঢ় চোখ থেকে নামল অশ্রুর প্লাবন। কিন্তু তারপরই আবার ওই অশ্রুসিক্ত চোখেই চিকমিক করে উঠল একটুকরো স্নিগ্ধ-করুণ হাসির বিলিক। আর দেখা গেল তার একখানা সুগোল বাহু ম্যাক্‌সওয়েলের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে আছে পরম আশ্লেষে।

"আমি এখন ঠিক বুঝতে পেরেছি," শান্তকণ্ঠে বললে তরুণী! "এই বিশ্রী কাজের ঝঞ্ঝাটেই সব কিছু ভুলে গেছ তুমি। আচ্ছা, হার্ভে, তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না? লিটল চার্চে আমাদের যে বিয়ে হয়ে গেছে কাল রাত আটটায়।*

* ও. হেনরী রচিত Romance of a busy broker গল্প দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি

(পি, বি, শেলীর একটি কবিতার অনুবাদ)

শ্রীভবতোষ পতি বি-এ

থেমে যায় গান—তবু তার সুকোমল ভাষা
স্মৃতির আকাশ পথে করে যাওয়া আসা।
ঝরে যায় ফুল, তবু তার গন্ধ নিবেদন
ভরে রয় বহুক্ষণ মানুষের ইন্দ্রিয় ও মন।

ছিন্নদল গোলাপ, সেও তার মূল্য খুঁজে পায়
মিলনের মধুরাতে দম্পতির বাসক শয্যায়।
তেমনি তোমার স্মৃতি বিস্মরণ বুকে রবে ফুটে
মোর প্রেম নিদ্রা যাবে সুকোমল তারই পত্রপুটে।

মেয়েদের কথা

আধুনিক রন্ধন প্রণালী

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত রন্ধন প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর উন্নত হোতে আরম্ভ হয়েছে। আধুনিক প্রগতিশীল জীবনযাত্রার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই মেলামেশা আর আহার-বিহার অবাধগতিতে চলেছে, পূর্ব্বের ন্যায় সংরক্ষণশীলতা নেই। আজ বিশ্বজনীন সামাজিক বোধ আমাদের মধ্যে নবচেতনা এনেছে, এটা অবশ্য সুলক্ষণ বলতে হবে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালেই প্রথম সভ্যতার আলোকে জীবনযাত্রা সুরু করেছিল। আর্য্যঋষিরা পার্থিব ও অপার্থিব বস্তু নিয়ে সমাকৃভাবে সাধনা করে জাতিকে কিভাবে চলতে হবে তার নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন—ভোজনের দিকটাও তাঁরা বর্জ্জন করেন নি। জলবায়ু, গ্রহনক্ষত্র, বারতিথি হিসাব করে খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও ব্যবস্থা করে গেছেন খাদ্যগবেষণায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে। ঋষিরা নিরামিষ খাদ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন—কেন না ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশে শরীরের পক্ষে আমিষ খাদ্য হিতকর নয়। আমিষ খাদ্যের বহুল প্রচলন মুসলমান আমল থেকে সুরু হয়, আর ইংরাজ আমলে চরমে উঠেছে। ফলে আমাদের প্রধান তালিকায় রকমারি খাদ্য স্থান পেয়েছে।

আমরা বাঙালী। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের যেরূপ বৈশিষ্ট্য আছে, আহারবিহার, চালচলনেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—যা ভারতের অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রন্ধনে বাংলার মহিলারা বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। গৃহকে কেন্দ্র করেই সমাজ-সংসার গড়ে ওঠে। সুতরাং গৃহিণীর কাজ আদৌ সহজ নয়। রন্ধন বিদ্যায় পটু গৃহিণী গরীবের সংসারেও আনন্দ এনে দেন। মেয়েলি কর্ত্তব্যের শৈথিল্য যেখানে প্রকাশ পায়, সেখানেই আসে অশান্তি, অনাচার আর ব্যাধি। গৃহিণীকে একদিকে যেমন প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে খাদ্য প্রস্তুত ও বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যদিকে তেমনই উৎকৃষ্টভাবে রন্ধন করে পরিজনদের পরিবেশন করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে। বর্ত্তমানে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবনযাত্রার জন্যে ঘর ছেড়ে চলেছে বাইরে—দশটাপাঁচটা অফিসে চাকুরী করছে, তাই হোটেলের রান্নাই হয়ে পড়ছে একমাত্র অবলম্বন। ক্রমেই দেখা যাচ্ছে রান্নার দিকে অনেকেরই ঔদাসীন্যভাব। যা হোক নিম্নে কতকগুলি রন্ধনের প্রণালী দেওয়া গেল—যাঁদের পক্ষে কিছুমাত্র অবসর আছে, তাঁরা রন্ধন করে পরীক্ষা করতে পারেন।

মাছের কোপ্তা—পাকা মাছ ভিন্ন মাছের কোপ্তা ভালো হয় না। সর্ব্বাগ্রে সাইজ মত মাছটাকে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়, আর তার আঁশটে গন্ধ যাতে না থাকে তার জন্যে খানিকটা নুন আর হলুদ মাখিয়ে একটি পাত্রে মাছের খণ্ডগুলি ঢেকে রাখতে হবে। এর পর আবার উত্তমরূপে পরিষ্কার জলে সেগুলি ধুয়ে নিয়ে কিছুটা নুন, হলুদ ও আদার রস মাখিয়ে তারপর ঘিতে সাঁৎলাতে হবে। এই সময়ে আদা, ধনে, মরিচ, পিঁয়াজ, নুন, কালোজিরে, সামান্য চিনি প্রভৃতি সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে কড়ায় ঢেলে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে জলটা একেবারে মরে এলে পুনরায় ঘি গরম মসলা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। যাতে ভেঙে না যায় এজন্যে সতর্ক হোতে হবে, তারপর ঘি ও গরম মসলা মাছের সঙ্গে মিশে গেলে নামিয়ে ফেলতে হবে।

এদিকে ধার উঁচু বড় থালাখানা নিয়ে মাছগুলি সাজিয়ে রেখে তারপর যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে,

তখন আস্তে আস্তে কাঁটাগুলি বের করে ফেলতে হবে। যে রসটা মাছের সঙ্গে আর থালায় লেগে থাকবে, সেই রসের সঙ্গে মাছগুলি পোস্ত, ডাল, ডিমের তরল সাদা অংশ, মৌরির গুঁড়ো, খানিকটা ঘই একত্র করে চট্‌কে ডিম বা নৈনিতালের আলুর আকারে এক একটি গুলি পাকাতে হবে।

এবং পূর্বোক্ত রকমের একটি প্রশস্ত পাত্রে ঘি দিয়ে পর পর এই গোলকগুলি সাজিয়ে অল্প আগুনের আঁচে চাপিয়ে দিতে হবে, তারপর আর একটি পাত্র দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। অল্প কিছুক্ষণ পরে নামিয়ে নিলে সুন্দর মাছের কোপ্তা হয়ে যাবে।

আধ সের মাছের পরিমাণ নিয়ে উপকরণের ভাগগুলি দেওয়া গেল। এক পোয়া ঘি, আধ ছটাক কাঁচা মুগডাল বাটা, আধপোয়া ঘই, আধছটাক ছোলার ছাতু, আধপোয়া পেঁয়াজ, সওয়া তোলা আদা বাটা, তিন আনার গরম মশলার গুঁড়ো, চার আনার মৌরির গুঁড়ো, চার আনার মরিচ আর চারি আনার কালোজিরা বাটা।

মাছের সাধারণ রান্না বলতে আমরা বুঝি মাছের ঝোল, কাল, চচ্চড়ি প্রভৃতি। মাছের অবস্থা ভেদে তরকারী না দিলেও চলে, তবে সে সব ক্ষেত্রে মাছের পরিমাণ বেশী হওয়া দরকার। যে কোন মাছের ঝোল হোতে পারে—কিন্তু সব মাছের কাল বা চচ্চড়ি হয় না, আর এ ক্ষেত্রে এদের মসলাও এক রকমের নয়। ঝোলের মশলা হচ্ছে আদা, জিরা, লঙ্কা হলুদ, ধনে প্রভৃতি বাটা; কিন্তু কাল বা চচ্চড়ির মশলা ভিন্ন—লঙ্কা, সর্ষে আর হলুদ বাটা। ঘির চেয়ে তেলই প্রশস্ত। অনেকে পেঁয়াজ অপরিহার্য্য বলে মনে করেন, কিন্তু টাটকা মাছের ঝোলে পেঁয়াজ দিলে সমাক্‌ভাবে আস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটে। মাছ, রান্নার উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ভালো করে মাছ আর আনুসঙ্গিক তরকারী রেঁধে নেওয়া। পাকা মাছ রেঁধে না নিলে আঁসটে গন্ধ থেকে যায়, ফলে ব্যঞ্জন ভালো হয় না। সব মাছ বেশী রাঁধা উচিত নয়—বিশেষতঃ ইলিশ, চিতল, বাটা, কৈ, সিঙ্গী, মাগুর, পুঁটি, মৌরলা, খলসে, ট্যাংরা, ফলুই প্রভৃতি। মাছ ভেলের ওপরে নুন হলুদ দিয়ে সামান্য এপিঠ ওপিঠ করে নেওয়া ভালো। এভাবে খানিকটা রান্না করলেই উক্ত মাছের ঝোল খেতে সুস্বাদু হবে। ঝোলের চেয়ে ঝাল বা চচ্চড়িতে লঙ্কার ঝাল ও তেলের পরিমাণ একটু বেশী দেওয়া দরকার। ঝোলের মাছ কড়া ভাজা করলে আস্বাদ নষ্ট হয়।

ইংলিশ কারি—রুই মাছের ইংলিস কারি অতি উপাদেয়। একসের মাছ বাজার থেকে কিনে এনে তাকে সাধারণ ভাবে কেটে নুন ও জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, তারপর মাছের টুক্‌রোগুলিকে মেখে রাখতে হবে হলুদ ও নুন দিয়ে। তারপর কড়াতে দেড়ছটাক আন্দাজ তেল ঢেলে তা থেকে এলে মাছগুলি ভাজতে আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু কড়া ভাজা করা চলবে না। মাছ ভাজার পর তেলটা কড়াতে দিয়ে মশলাটা কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করে ভেজে নিতে হবে, মসলার গন্ধ ছাড়লে জল ঢেলে দিয়ে কড়ার মুখটা ঢেকে দিতে হয়। জল ফুটে উঠলে মাছগুলি ছেড়ে দিয়ে আবার মুখটা এঁটে দিয়ে খানিকক্ষণ পরে লঙ্কা বাটা ও নুন ফেলে খুব সাবধানে দু চারবার নাড়া দরকার, তারপর জলটা মরে মাখা-মাখা অবস্থায় এলেই নামিয়ে নিলে সুন্দর রুই মাছের ইংলিস কারি হয়ে উঠবে। এই কারি রাঁধতে তিন ছটাক তেল, দু' তোলা পেঁয়াজ বাটা, এক তোলা হলুদ বাটা, দু আনার রসুন, আর চার কাঁচা পরিমাণ লঙ্কাবাটা ও নুন দরকার।

গলদা চিংড়ির প্রোক্কা—বড় বড় গলদা চিংড়ি মাছ দশটি এনে সেগুলোর মাথা থেকে খোলা ছাড়িয়ে নিতে হবে আর উত্তমরূপে ধুয়ে নিয়ে মাছের অংশ মিহি করে কাটতে হবে। পরে আন্দাজ মত নুন, মরিচ, মাছের মাথায় তেল, বিস্কুটের গুঁড়ো আর খানিকটা দুধ দিয়ে ঐ মাছগুলো বেশ করে মেখে আবার একটা কি দুটো ডিম ফাটিয়ে মাছে মাখতে হবে; আর বড়ার মত গোল পাকিয়ে তা'তে বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে একটি পাত্রে রাখতে হবে। তারপর উনুনে কড়ায় তেল বা ঘি চাপিয়ে দিতে হবে, তেল বা ঘি পেকে এলে, কেটে-রাখা মাছের মাথা ও শির দাড়াগুলোর ভিতরের অংশের সঙ্গে খানিকটা কাঁচা ধনে বাটা মিশিয়ে ঐ সব গোল বড়া লাল টক্‌টকে করে ভাজতে হবে। তারপর তেজপাতা

আর ঘিয়ে ফোড়ন দিয়ে পরিমিত নুন ও জল দিয়ে বড়াগুলি সিদ্ধ করা দরকার। খানিকক্ষণ পরে ঝোলটা ঘরে এলে অল্প পরিমাণে গরম মসলা দিয়ে নামিয়ে ফেল্‌লে মসলা চিংড়ির ঝোকা হবে। এই ঝোকা তৈরী করতে লোসে আড়াই ছটাক তেল, এক কাঁচা লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে ও মরিচের গুঁড়ো বারো আনা, টেবিল চামচের চার চামচ বিস্কুটের গুঁড়ো, আর দুটো ডিম লাগবে।

মাছের উপকারিতা অনেক। এটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। কই, সিঙ্গি, মাগুর, রুই, খল্‌সে প্রভৃতি মাছে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস আর লোহার পরিমাণ খুব বেশী। সিঙ্গি মাছে খাদ্যগুণ খুব বেশী, এর পরেই হচ্ছে মাগুর। ছোট বড় প্রত্যেক মাছেই অ্যালবুমেন থাকে, তাতে শরীর পুষ্টিকর হয়। চোখের দৃষ্টিশক্তি ও মেধাবৃদ্ধির পক্ষে রুই মাছের উপকারিতা অত্যন্ত বেশী। ছোট ছোট মাছগুলি বিশেষতঃ পুঁটি, মৌরলা, দেহের রক্ত ও জীবনীশক্তি বাড়াতে বিশেষ সাহায্য করে। আজ মাছের অভাবে বাঙালীর মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে, আর শরীরও পড়ছে ভেঙে, তাই নানা দিকে সে হটে আসছে। বাত রোগে কই, সিঙ্গি, মাগুর, রুই প্রভৃতি উত্তম পথ্য।

যাঁরা সহরে বাস করেন, তাঁরা ইলেক্‌ট্রিক উনুনে রান্না করে খেতে পারেন, তা'তে কয়লার জন্য বাজারে দৌড়াতে হবেনা, কয়লা ভেঙে আঁচ দেওয়ার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবেনা, —ইলেক্‌ট্রিক লাইট্‌কানেক্‌সান মিটার নিয়ে রান্নার কাজ চলতে পারে—কয়লার অনুপাতে যে খরচ হয়, ইলেক্‌ট্রিক উনুনের সাহায্যে রন্ধনাদি করলে অনেকটা ব্যয় হ্রাস হোতে পারে। দেড় হাজার দু-হাজার ওয়াটের উনুন নিয়ে দিব্যি রান্না চলতে পারে, ইচ্ছামতন যখন তখন গরম গরম তরি-তরকারী খাওয়া যায়, মাঝে মাঝে তার বা স্পাইরাল ওয়্যার খারাপ হোলে কিনে নিলেই চল্‌বে, আর এ তার দেড় টাকা দু-টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। আমি ইলেক্‌ট্রিক উনুনে রান্না করে বিশেষ সুবিধা বোধ করছি; ধোঁয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, আর রান্না ঘরও বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হয়ে আছে। বর্ত্তমানে বহু সভ্যতার আনুকূল্যে সব দিকেই যখন আমরা এগিয়ে চলেছি তখন এদিকটায় পিছিয়ে থাকার কোন কারণ তো দেখিনে! যাঁরা মনে করেন ইলেক্‌ট্রিক উনুনে রাঁধলে খুব খরচ হবে তাঁদের ভুল ধারণা—ঘুঁটে কয়লা আর কেরোসিন তেলের হিসেব একত্র করে এর সঙ্গে খতিয়ে দেখ্‌লেই আমার কথার যথার্থতা উপলব্ধি হবে।

হাতের কাজ

উলের ব্লাউজ

মানী চট্টোপাধ্যায়

মিক্সপাত্তা প্যাটার্ণ

এই প্যাটার্ণটিতে ১৬ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়। বয়স অনুপাতে ঘর কম বেশী লইতে পারেন। ১৪নং কাঁটা দ্বারা ৩ ইঞ্চি ১ ঘর সোজা ১ ঘর উল্টো বুনিয়া; ১১নং কাঁটা দ্বারা প্যাটার্ণ আরম্ভ করিতে হয়।

১ম—উল্টো ২ সামনে সুতা সোজা ১ ঘর, সোজা ৪ জোড়া ২ বার সোজা ৪ সামনে সুতা সোজা ১।

২য়—উল্টো এক কাঁটা।

৩য়—উল্টো ২ সোজা ১ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ৩ জোড়া ২ বার সোজা ৩ সামনে সুতা।

৪র্থ—উল্টো এক কাঁটা।

৫ম—উল্টো ২ সোজা ২ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ২ জোড়া ২ বার সোজা ২ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ২।

৬ষ্ঠ—উল্টো এক কাঁটা।

৭ম—উল্টো ২ সোজা ৩ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ১ জোড়া ২ বার সোজা ১ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ৩।

৮ম—উল্টো এক কাঁটা।

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

বাসটা যখন সাঁথির মোড়ে এসে থামলো, তখন আবার বৃষ্টি নেমেছে। রোদ আর বৃষ্টি! পাশাপাশি হাসি কান্নার মত গাছগুলোর মাথায় মাথায় ঝিলমিল-ঝিরঝির করে: বৈকালী সূর্যের সোনালি রোদ আর অভিমানিনী প্রকৃতির বিনত-দৃষ্টি চোখের জল। একটু ইতস্তত: করে শিপ্রা নেমে পড়ল। বাসখানা আবার গরম নি:শ্বাসের কাঁজ ছড়িয়ে ছুটে চললো গন্তব্য পথে।

পথের পাশে কোথাও দাঁড়াবার মত একটু জায়গা নাই। দু'পা এগিয়ে গিয়ে বড় বাদাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে শিপ্রা একবার ঘাড় ফিরিয়ে শাড়ির আঁচলটা দেখে নেয়। পাতাগুলোর গা বয়ে টসটস করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে।…পথের পাশে গাছতলায় দাঁড়াতে ওর সম্ভ্রমে বাধে। মুহূর্তে শক্ত মুঠোয় মনের লাগামটা ধরে আবার পথে নামে। হনহন করে এগিয়ে চলে বরানগরের দিকে।

গায়ের রঙ ওর ফর্সা নয়। ফর্সা হলে হয়তো এত সুন্দর হতো না শিপ্রা। শিপার…মিস্ শিপারিন্! অদ্ভুত চোখ দুটো ওর। তন্বী—লম্বা। কাঁচ-কাঁচ রঙের সঙ্গে নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন মানান-সই সমন্বয় খুব কম মেয়েরই আছে। আগে ও পরতো না বাঙালী মেয়েদের মত সর্বাঙ্গ মুড়ে শাড়ি। বাস্‌কিন আর পেটিকোটের ওপর জড়িয়ে নিত একখানা ভিনিসিয়ান ওড়না, না-হয় সিল্ক ফেব্রিকের কালার-দেওয়া স্কার্ফ। বাতাসের মুখে হিলে ভর দিয়ে যখন মোড় ফিরতো, ফাল্গুনী প্রজাপতির ডানার মত ছড়িয়ে পড়তো ওর ওড়নার আঁচল।

কিন্তু এখন!…এখন শিপ্রা শাড়ি পরে। পেটিকোট আর আনারসী ভয়েলের জ্যাকেটের ওপর হাল্কা রঙের জর্গাণ্ডি, টিসু বা নাইলনের শাড়িখানা নিপুণভাবে জড়িয়ে নেয় ব্রাসিয়ারের ফিতেগুলো সযত্নে ঢেকে। দ্রুত পায়ে চলতে চলতে পিঠের ওপর শাড়ির আঁচলটা ফুলে ফুলে ওঠে। চুলগুলো কখনো এলো খোঁপা ক'রে ঢিলিয়ে দেয়, কখনো বা শিঙ্গল করে। না হয়, এপার-ওপার সমান দুভাগ করে ঘাড়ের পাশ দিয়ে দুলিয়ে দেয়। আগেও ব্যবহার করতো বিলিতি মেক্সন রঙের ছাতা। কিন্তু এখন আর ছাতা ব্যবহার করে না। পথ চলতে ক্ষিপ্রতায় বাধা দেয় বলে ছাতা আর ওড়না সে ছেড়ে দিয়েছে।

শিপ্রা যখন জোয়ারদার-ভিলায় এসে পৌঁছলো তখন সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে ঝরণা-ঝরা বৃষ্টির জলে। ঝিন্‌ঝিনে শাড়ির আঁচলটা বারবার পিঠে জড়িয়ে আসে। বিব্রত হলেও শিপ্রা বিরত হয় না। মনটা যেন ওর হঠাৎ মাতাল হয়ে উঠেছে আজ।

জয়ন্ত বসে ছিল দোতলার বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে। নিবিষ্ট মনে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। তাই শিপ্রাকে সে দেখেনি। কিন্তু শিপ্রা দেখেছে তাকে, ফটকটা পার হবার আগেই। মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল, নিমেষে কেটে গিয়েছে।

রকমারি বিলিতি ফুলের কেয়ারির মাঝখান দিয়ে সুরকি-ঢালা লাল রাস্তা। সবুজ গাছপালার অন্তরালে ঘোমটা-ঘেরা সুন্দরী তরুণীর নিদ্রালু চোখের মত জোয়ার-দারের মার্বেল হাউস নি:শব্দে চেয়ে আছে ফটকের পথে অনাগত অতিথির আশায়।

সিঁড়ির এ-পাশে একজন আধা-বয়েসী লোক ছুরি দিয়ে আলু পটোলের খোসা ছাড়াতে ব্যস্ত। হয়তো মালী বা দারোয়ান। শিপ্রার জুতোর শব্দে সজাগ হয়ে লোকটা একবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে।

কাকে চান? প্রশ্নটা মনে এলেও হয়তো তার মুখে এলো না। ঘাড় গুঁজে সে আবার মনোনিবেশ করে তার কাজে।

হলঘরটা পার হয়ে শিপ্রা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো জয়ন্তর পিছনে:

আশ্চর্য!

কথাটা জয়ন্তর কানে যায় নি। তন্ময় দৃষ্টিতে সে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। বৃষ্টিটা তখন থেমে এসেছে। ছোট ছোট নুড়ির গুঁড়ি বাতাসে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে।

...রামধনু! রামধনু উঠেছে বায়ুকোণের কিনারা ঘেঁসে। অদ্ভুত বর্ণ-বৈচিত্র্যে তন্ময় হয়ে আছে জয়ন্ত।

জয়ন্ত!

জয়ন্ত!...শিপ্রা?...জয়ন্ত চমকে ওঠে। পিছন ফিরে চেয়ে দেখে। শিপ্রা হাসে। হাত বাড়িয়ে নতমুখে বলে: চাবিটা দেখি, স্যুটকেসের।

খোলাই আছে।

মুহূর্তে জয়ন্তর মনটা কেমন বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শিপ্রা এসে হাজির হয়েছে ওর এই নির্জনবাসের আস্তানায়। কিন্তু কেমন করে পেয়েছে সে ওর ঠিকানা! আর কেনই বা এলো হঠাৎ!

রামধনু দেখুন। এদিকে চাইবেন না এখন। কাপড়টা বদলাতে হবে।

দ্রুতপদে শিপ্রা ঘরের ভিতর চলে গেল। জয়ন্ত বিমূঢ়-ভাবে বসে রইল কোনোদিকে না চেয়ে। রামধনুর সাতটা রঙ যেন নিমেষে গায়ে গায়ে জড়িয়ে গলদে হয়ে গেল।... এতদিন পরে শিপ্রা আবার হয়তো এসেছে তার ঐশ্বর্য দেখাতে। না হয়, জানাতে এসেছে তার নতুন কোন গৌরবের কথা—সাফল্যের নতুন ইতিহাস।

প্রায় দশ মিনিট পরে শিপ্রা বারান্দায় বেরিয়ে এলো। চুলটা টেনে নিয়ে এসে বসলো জয়ন্তর সামনে।

জয়ন্ত অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। ভিজে কাপড় বদলে শিপ্রা স্যুটকেস থেকে ওর একখানা ধুতি বের করে নিয়ে পরেছে। চেহারাটা নিমেষে শুচিস্নাতা তপস্বিনীর মত হয়ে উঠেছে।

শিপ্রা হাসে। তীরের ফলার মত ধারাল এক ঝলক হাসি ছিটকে আসে ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

ব্যাপারটা কি শুনি?

কিসের? জয়ন্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

নিমেষে শিপ্রার হাসিটুকু মুছে গেল: চুপি চুপি এখন গা ঢাকা দিয়েছেন যে!

গা ঢাকা?

হাঁ। তা ছাড়া আর কি!...টাকাটা শেষ পর্যন্ত সুরেখাদির কাছেই নিলেন বুঝি?

না।

তবে?

সে কথা জেনে লাভ কি?

লাভ আছে বৈ কি। অন্ততঃ লোকসানের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। মোতিবিবির তো টাকার অভাব নেই। আগে ছিল সত্যেন সেন। তারপর জুটলো খাণ্ডেলওয়াল। এখন আবার খেলার মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছেন নতুন হীরের আংটি—মিস্টার চোপরাকে। অগাধ টাকার মালিক চোপরা। টাকাই তো সে চায়। দু-হাতে টাকা ছড়াতে সুরেখাদি ভালবাসে। আর ওঁরা ভালবাসেন টাকার গোছায় নরম হাতের মুঠো ভরে দিতে।

কে কার হাতের মুঠো টাকার গোছায় ভরে দিতে ভালবাসে, সে কথা জানবার কোন কৌতূহল নেই, প্রয়োজনও নেই আমার। খাণ্ডেলওয়াল, চোপরা বা ইব্রাহিম লোদী—যেই হোক, তাদের টাকার সঙ্গে জয়ন্ত চ্যাটার্জীর কোন সম্পর্ক নেই।...জয়ন্ত সিধে হয়ে বসে।

একটু ইতস্তত করে শিপ্রা বলে: তাহলে মেসের চার্জ মেটালেন কেমন ক'রে?

ভিক্ষে করে নয়, নিশ্চয়ই।

শিপ্রা যেন হঠাৎ হোঁচট খায়। একটু থেমে বলে—ধার করেছেন বুঝি?

অদূর ভবিষ্যতে শোধ করবার সম্ভাবনা যেখানে খুব কম, সেখানে ধার করা আর ভিক্ষে করাতে বিশেষ তফাৎ আছে কি?...জয়ন্ত শিপ্রার মুখপানে এক নজর তাকিয়ে চোখ দুটো আকাশের দিকে ফিরিয়ে নেয়।

তবে?

জানবার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

না : শিপ্রা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

ওকে বিব্রত করবার ইচ্ছা জয়ন্তর ছিল না। পরক্ষণেই কথাটা তরল করে দিয়ে হেসে বললে—টাকা আপনি এসে গিয়েছে হাতের কাছে। দু'দিন ব্লাডডোনেট করে যা পেয়েছিলাম তাই যথেষ্ট হয়েছিল প্রয়োজনের তুলনায়।

শিপ্রা শিউরে ওঠে। স্বচ্ছ চোখদুটো নিমেষে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আত্মগতভাবে বলে—রক্ত-বিক্রি করে টাকা যোগাড় করেছেন!

জয়ন্ত কোন উত্তর দেয় না।

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে মুখোমুখি বসে থাকে।

মালী দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে বাঁশের টিপয়টার ওপর নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন সূর্য নেমে পড়েছে বৃষ্টির অন্তরালে।

শিপ্রার থমথমে ভাবটা কাটিয়ে দিয়ে জয়ন্ত উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে বলে—যা যায়, তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। কি বলে তোমার জগৎ?

ইডিয়টের নামান্তর।

অজিৎ?

ত্রীন হর্ণ। এখনও গেরো গন্ধ কাটে নি। স্পোর্টিং চলে, কিন্তু আবোড়ের হাতে আত্ম-সমর্পণ করা চলে না। মনের লাগাম ঢিল হয়ে আসে। মেয়েরা খেলতে ভাল-বাসে। কিন্তু ছ্যাকরা গাড়ীর চাকায় পা বাড়ায় না।

জানি।

জানেন?…যদি জানেন,তা হলে মর্যাদা দেন না কেন? মেয়েদের প্রতি আপনার এত উপেক্ষা কেন, বলতে পারেন?

পারি। কিন্তু এখন নয়। অনেক দূর পথ যাবে তুমি। সন্ধ্যে হয়ে এলো। দেরী করো না আর।

এই সন্ধ্যেবেলা ভিজে শাড়ি প'রে বরানগর থেকে ম্যানডেভিলা গেলে, কাল আর দেখতে হবে না। নিউমোনিয়ায় পড়বো।

কিন্তু তা ছাড়া তো উপায় নেই : জয়ন্ত হঠাৎ কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে।

শিপ্রা তার কথায় কর্ণপাত করে না। ধুতির জাঁচলটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসে :

জোয়ারদার না-হয় থাকতেই দিয়েছেন তাঁর এই বাগান বাড়িতে, কিন্তু অন্যান্য খরচ চলে কেমন ক'রে? য়ুনিভার্সিটী তো দিয়েছে রিসার্চ স্কলারশিপ বন্ধ ক'রে।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায়। অস্থির পায়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বলে—আর-একদিন বলবো সে কথা। আজ নয়।

বেশ তাই বলবেন। কিন্তু আজ আর আমি ফিরবো না ম্যানডেভিলায়। শাড়িখানা ওপাশের জানালায় শুকোতে দিয়েছি। শপ-শপে হয়ে আছে বৃষ্টিতে ভিজে।… সেটা আর একদিন বলবেন, সেটা আজই বলুন না, শুনি।

তুমি কি পাগল হয়েছ, শিপ্রা?

না হলেও, হতে আর খুব বেশী বাকী নেই। শিপ্রা দুর্নাম সইতে পারে। কিন্তু পরাজয় সইতে পারে না।

শিপ্রা!

বলুন।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমায় উঠিয়ে দিয়ে আসি বাসে।

যেতে আমি একাই পারবো। কিন্তু আপনি কি জোর করে তাড়িয়ে দিতে চান জয়ন্তবাবু? এত দুর্বল আপনি! শুনলেন তো, কাপড়-চোপড় আমার ভিজে গোবর হয়ে আছে। এ অবস্থায় একটা রাত্রি আপনি পারেন না আমায় এখানে থাকতে দিতে?

না। এ বাড়ীতে তোমার থাকা চলে না। থাকবার কোন ব্যবস্থাও নেই। মালী আর দারোয়ানও থাকে ওই আউট হাউসে। ওপরে থাকি শুধু আমি, আর পাশের ঘরে থাকেন মিস্টার জোয়ারদারের ভাইপো : টি বি পেশেন্ট।

টি বি পেশেন্ট!…শিপ্রা চমকে ওঠে।

জয়ন্ত হাসে। চাপা হাসির ঢেউ টেনে বলে—হাঁ! তাঁর শুশ্রূষা আর সাহচর্যের জন্যেই তো মিস্টার জোয়ারদার আমায় রেখেছেন এখানে। থাকা-খাওয়া ছাড়া মাসিক একশো টাকা হাত-খরচা দেন।

টাকা রোজগারের কি এ-ছাড়া আর কোন পথ ছিল না জয়ন্তবাবু?…শিপ্রার কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে।

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠে বলে—পথ হয়তো ছিল, কিন্তু মতটাও তো থাকা চাই। থাক, তাই নিয়ে অকারণ মাথা ঘামাতে রাজী নই।

রক্তও বোধহয় ওই কুণ্ঠীর জন্যেই দিয়েছিলেন?

হাঁ। নইলে অত টাকা দেবে কে? গ্রুপিং-এ ভালো মিলেছে।

জয়ন্তবাবু!…শিপ্রা যেন ধক্ করে জ্বলে উঠলো—এখানে আপনার থাকা চলবে না। চলুন, আজই চলুন আমার সঙ্গে। নইলে আমি এক পাও নড়বো না।

তখনও আলো জ্বলেনি। শিপ্রার মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না। তবুও যেন মনে হলো সে অটল হয়ে বসে আছে টুলটার ওপর।

ক্রমশঃ

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—

গত কয়েক বৎসর হইতে নূতন নূতন স্কীমে ধান্য উৎপাদনের ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সারা ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় ধান্য কম উৎপন্ন হইতেছে। ১৩৬৩ সালে নানা দুর্যোগের ফলে শুধু বাংলায় নহে—সারা পূর্ব-ভারতে কম ধান হইয়াছিল—সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রচুর পরিমাণ আমদানী করিয়া ঘাটতি পূরণ করিতে হইয়াছে। ১৩৬৪ সালে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ—সর্বত্র অনাবৃষ্টির ফলে শতকরা ৫০ ভাগ ধানও হয় নাই। কাজেই এখন হইতে হাহাকার রব শোনা যাইতেছে। পৌষ মাসে চালের মণ ৩০ টাকায় উঠিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তারা বার বার ঘোষণা করিতেছেন, এবার অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে আর প্রয়োজনীয় চাল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না—সকলে চালের পরিবর্তে এখন হইতে গম খাইতে আরম্ভ কর। বাংলাদেশের লোক আটা খাইতে অভ্যস্ত নহে—বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুরা আদৌ আটা খাইতে পারে না—কি যে ব্যবস্থা হইবে, তাহার জন্য চিন্তাশীলব্যক্তি মাত্রই বিচলিত হইয়াছেন। ইহার উপর মুনাফা-খোর ও চোরা-কারবারীদের রাজত্ব আরও বাড়িতেছে—অভাব হউক বা না হউক, একদল ব্যবসায়ী গুদামে মাল তুলিয়া বাজারে জিনিষের দর বাড়াইয়া দেয়। পুলিস বা রাজশক্তি তাহার বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হয় না—অর্থাৎ দুর্নীতি দেশকে এমন ভাবে গ্রাস করিয়াছে যে দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য কেহ অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। চাউলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সকলে অধিক বেতন দাবী করিতেছে—অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় জিনিষের দামও বাড়িয়া গিয়াছে। সরিষার তৈলের দর ৮০ টাকা মণ, চিনি ৪০ টাকা মণের কমে পাওয়া যায় না—অথচ সরকার সচেষ্ট হইলে অনায়াসে চিনি বা সরিষার তৈলের দর কমাইয়া দিতে পারেন। কাপড়ের কলওয়ালারা জোট বাঁধিয়া কাপড়ের দাম অন্যায়-ভাবে বাড়াইয়া রাখিয়াছেন। কোন জিনিষের কথা বাদ দিব—সবই দুর্লভ, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। গমও এদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয় না—বিদেশ হইতে গম আমদানী করিতে হয়। আমেরিকা হইতে এক অদ্ভুত চাল আনিয়া এদেশে ৯ আনা সের দরে বিক্রয় করা হইতেছে—সাধারণ লোক তাহা আদৌ পছন্দ করে না—কিন্তু তাহা না লইয়াও উপায় নাই। চাকীওয়ালাদের হাতে সব গম দিবার ব্যবস্থা করায় বাজারে আটার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। শীতের ২।৩ মাস তরকারী সুলভ থাকিলেও পরে তাহার মূল্য বর্দ্ধিত হইবে। এদেশে প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়—কিন্তু ১২ মাস ১০ টাকা মণ দরেও আলু পাওয়া যায় না—বৎসরে ৪।৫ মাস ২০।২২ টাকা মণ দরে আলু কিনিতে হয়। সুলভে মাছ সরবরাহের ব্যবস্থা আজও হইল না। জাপানী জাহাজ ভারত মহাসাগর হইতে মাছ ধরিয়া লইয়া গিয়া টোকিও সহরে তাহা ১২ আনা সের দরে বিক্রয় করে—আর আমরা কলিকাতায় সমুদ্রের মাছ আড়াই টাকা সের দরে কিনিতে বাধ্য হই। দুধ, ডিম, ফল প্রভৃতির উৎপাদন সম্বন্ধে পরিকল্পনার কথা শুনা যায়, কিন্তু বাজারে ঐসব জিনিষের দাম কমে না। সাধারণ নিরন্ন দরিদ্রগণের দুঃখের শেষ নাই। এই 'দরিদ্রের ক্রন্দন' কে শুনিবে। মুখে যতই সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলা হউক না কেন, দেশে এখনও ধনীতন্ত্রবাদই চলিতেছে। শুধু বিষয়ে—কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্যসরকার—সকল ধনীর সুখ সুবিধা বিধানে সচেষ্ট। যাহারা সামান্যমাত্র ভাত-কাপড় পাইয়া সন্তুষ্ট, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। আর কত দিন মানুষ এই ভাবে দুঃসহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে?

কলিকাতায় ভারতীয় লেখক সম্মিলন—

গত ২৩, ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতা মহাজাতি-সদন হলে নিখিল ভারত লেখক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন

হইয়া গেল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং প্রথম দিনে শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা সভানেত্রী হন। খ্যাতনামা লেখক ডক্টর মুলুক রাজ আনন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের এক অধিবেশনে ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিনে উড়িষ্যার শ্রীযুত কালিন্দি-চরণ পানিগ্রাহীর সভাপতিত্বে অধিবেশনের সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সম্মিলনে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—হিন্দী ভাষা জোর করিয়া অপর কোন ভারতীয় ভাষা-ভাষীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না—তবে যাহারা কেন্দ্রের অধীনে চাকরী করিবেন, তাঁহাদের চাকরী লাভের পর কাজের সুবিধার জন্য হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। তিনি সাহিত্য রক্ষা অপেক্ষা দেশ রক্ষাকে ও দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে আর অধিক প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া মনে করেন। প্রবীণ রাজনীতিক ও সাহিত্যিক শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সম্মিলনে এক বাণী প্রেরণ করেন এবং তাহাতে তিনি সাহিত্যিকগণকে সরকারী সাহায্যের দিকে চাহিয়া কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং সর্বভারতের সুবিধার জন্য ও বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষার জন্য ইংরাজি শিক্ষা বজায় রাখিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—সর্বভারতীয় ভাষারূপে বর্ত্তমানে প্রচলিত ইংরাজিকে বাদ দিয়া কোন নূতন ভাষা চালাইবার চেষ্টা ক্ষতিকর হইবে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিথিলার ডক্টর এল-ঝা, উড়িষ্যার শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী কে-এল-জর্ষ, শ্রীঅন্নদা-শঙ্কর রায় প্রভৃতি বিভিন্ন দিনে সম্মিলনে বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। খ্যাতনামা গুজরাটী কবি শ্রীউমাশঙ্কর যোশী সম্মিলনের একটি অধিবেশনে সভাপতি হইয়া বলেন—বর্তমান ভারতীয় সাহিত্য ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের নিকট বিশেষ ঋণী—কাজেই তিনি ইংরাজি শিক্ষা বর্জন করিতে নিষেধ করেন। শেষ দিনের অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন যোগদান করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনিও হিন্দীর পরিবর্তে ইংরাজি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে রক্ষা করিতে সকলকে অনুরোধ জানান। শেষ দিনে খ্যাতনামা মারাঠী লেখক শ্রীবি-ভি ওয়ারেরকর সভাপতিত্ব করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী লেখকের সকল গ্রন্থই মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সারা ভারতের প্রায় একশত লেখক ও বাংলার প্রায় সকল খ্যাতনামা লেখক সম্মিলনে যোগদান করেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুশিয়া, হাঙ্গারী, পূর্ব জার্মাণী, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের কয়েকজন লেখকও সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট একদিন রাজভবনে ও কলিকাতা কর্পোরেশন তাহাদের গৃহে একদিন সম্মিলনে সমবেত লেখকবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভাষা সমস্যাই সম্মিলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এবং প্রায় সকল ভারতীয় লেখকই—শুধু নিজ নিজ রাজ্যের প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করার কথা বলেন নাই, ইংরাজিকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে চালাইবার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। কলিকাতায় নিখিল ভারত লেখক সম্মিলনের প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাঙ্গালী লেখকদের পক্ষে তাহা গৌরবের বিষয় হইয়াছে।

ইংরাজি ভারতের জাতীয় ভাষা—

৩০শে ডিসেম্বর আমেদাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের শেষ দিনের সভায় এক প্রস্তাবে ইংরাজি ভাষাকে ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা রূপে গণ্য করিবার দাবী জানানো হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষাকেই ভারতের জাতীয় ভাষারূপে স্বীকার করিবার জন্যও ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শুধু একমাত্র হিন্দীকে যাহাতে ভারতের অহিন্দীভাষী জনগণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া না হয়, সে জন্য সর্বত্র সকল রকম চেষ্টা হইতেছে—ইহা আনন্দের সংবাদ।

তিন মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি—

অন্ধ্ররাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএন সঞ্জীব রেড্ডী, মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকে-কামরাজ ও মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএস-নিজলিঙ্গাপ্পা বাঙ্গালোরে মিলিত হইয়া গত ১লা জানুয়ারী এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—১৯৬৫ সালে ভারতরাষ্ট্রে জাতীয় ভাষা-রূপে ইংরাজির ব্যবহার বন্ধ করা অসম্ভব। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনম্বুদ্রিপাদেরও ঐ দিন তথায় আসার কথা ছিল—অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি আসিতে পারেন নাই। সরকারী ভাষা কমিশন হিন্দীকে জাতীয় ভাষা

করার প্রস্তাব করায় এই বিবৃতি প্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে। মহাবলীপুরম শুধু ঐতিহাসিক স্থান নহে—দর্শনীয় ও স্বাস্থ্যকর স্থান। সে জন্য সকলে তথায় সমবেত হন। তিনটি রাজ্যের বহুসংখ্যক মন্ত্রীও ঐ বিবৃতির আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। দেখা যায়, ইংরাজিকে সর্বভারতীয় জাতীয়-ভাষারূপে ব্যবহারের জন্য দাবী ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

উদ্বাস্তু সমস্যা—

গত ১২ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ হইতে এক বিবরণ বিতরিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়—পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ২ লক্ষ পরিবার এখনও পুনর্বাসন পায় নাই—তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে ৬১ কোটি টাকা প্রয়োজন। ৫৭ হাজার ৭ শত পরিবার আংশিক পুনর্বাসন পাইয়াছে—তাহাদের জন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। ৪৩ হাজার ৭ শত কৃষক পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য ১৩ কোটি টাকা, ২৮ হাজার ২ শত সহরবাসী অকৃষিজীবী পরিবারের জন্য সাড়ে ৮ কোটি টাকা ও ৭৫ হাজার ৬ শত গ্রামবাসী অকৃষিজীবী পরিবারের জন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা দরকার। সরকার পক্ষ সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন—অতঃপর পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিবে, তাহাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশে কোন বাধা দেওয়া হইবে না বটে, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ সাহায্য দান করা সরকারের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। গত ১০ বৎসরে যে সকল উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ প্রায় ১০।১২ লক্ষ লোক এখনও উপযুক্ত পুনর্বাসন লাভ করে নাই—তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যয় ৬০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে বর্তমানে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর আর কোন নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। গত ১০ বৎসর যাহারা নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বাস করিতেছেন, দশ বৎসর পরে এখন তাহাদের পক্ষে এ দেশে আসা কখনই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ১৪ই ডিসেম্বর বিধান সভায় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—পশ্চিম বাংলায় আর পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের স্থান বা অবকাশ নাই। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম ৯০, ৬৪, ১৫ ও ১০ হাজার বিঘা পতিত জমী আছে বটে, কিন্তু সেখানে এক ব্যক্তিকে ৩০ বিঘা জমী দিলেও সে তাহা দ্বারা সংসার চালাইতে পারে না। সে সকল পতিত জমীকে আবাদের যোগ্য করা বহুব্যয়-সাপেক্ষ। পশ্চিম বাংলার মোট জমীর শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ বনভূমি—এই বনভূমি নষ্ট করিলে দেশের অকল্যাণ হইবে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যবসা-ঋণ হিসাবে ৩ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২ কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে। বাংলায় ২ লক্ষ বেকার আছে বটে, কিন্তু বাংলার কারখানাসমূহে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪ লক্ষ অবাঙ্গালী। কলিকাতায় এক শত পান বিড়ির দোকানের মধ্যে ৯৩টি অবাঙ্গালী পরিচালিত। উদ্বাস্তু সমস্যা আজ আমাদের সকলকে বিব্রত করিলেও তাহার সমাধানের উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদল উদ্বাস্তুকে কারখানায় কাজ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা কাজ না করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন-প্লাটফরমে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতিতে যে সকল বাঙ্গালী উদ্বাস্তু প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা কোন না কোন অছিলায় বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। সরকারী অর্থে বসিয়া খাওয়াই তাহারা পছন্দ করে, কেহ পরিশ্রম করিতে চাহে না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জয়ী হইবার সঙ্কল্প তাহাদের মধ্যে নাই। এই সকল কারণে বর্তমান পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা হয়ত অনেকের কাছে কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু আজ সকলকে এই সকল কথা ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে।

রাজগীর ও সোহানায় স্বাস্থ্যনিবাস—

পাটনা হইতে ৬০ মাইল দূরে রাজগীরে ও দিল্লী হইতে ৩৪ মাইল দূরে সোহানায়—দুইটি স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ব্যবস্থা করা হইতেছে। সোভিয়েট দেশের বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়া ঐ সকল স্থানের উষ্ণপ্রস্রবণের জল পরীক্ষা করিয়া তাহার রোগ নিবারণ ও প্রতীকারের শক্তি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজগীর মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল—তথায় ১৩টি প্রস্রবণ আছে—কিন্তু ভালভাবে সেখানে থাকার বা জল ব্যবহারের

কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে পরিষ্কার ভাবে জল রাখাও হয় না। চারিদিকে পাহাড়-বেষ্টিত, নৈসর্গিক শোভামণ্ডিত রাজগীরে স্বাস্থ্যনিবাস নির্মিত হইলে বহু লোক তথায় যাইয়া বাস করিবার সুযোগ পাইবে। কলিকাতা বা দিল্লী হইতেও মোটরে তথায় যাওয়া যায়। রাজগীর হইতে ১০ মাইল দূরে তপোবন নামক স্থানেও গরম জলের ফোয়ারা আছে। সোহানাতেও ৬।৭ শত রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে পারে। বাংলা দেশের বীরভূম জেলায় বহু উষ্ণপ্রস্রবণ আছে—সেখানেও স্বাস্থ্য-নিবাস নির্মাণের ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের মনোযোগী হওয়া উচিত।—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস—

গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ পুনরায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ-সম্পাদক পদে শ্রীবিজয়সিংহ নাহার ও কোষাধ্যক্ষ পদে শ্রীঅভয়কুমার মুখোপাধ্যায় পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআভা মাইতি ও শ্রীনির্মলেন্দু দে সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে বিজয়ানন্দবাবু ও শ্রীমতী মাইতি পূর্বেও সম্পাদক ছিলেন। সহ-সভাপতি হইয়াছেন—ডাঃ জীবনরতন ধর, শ্রীকালোবরণ ঘোষ ও শ্রীমতীলাবণ্যপ্রভা দত্ত।

ডাঃ সি-ভি-রামণ—

বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ়তর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর মস্কো হইতে যে ৭জনকে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে—নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সি-ভি-রামণ তাঁহাদের একজন। সিংহলের একজন বৌদ্ধ পুরোহিত এই দলে আছেন। সোভিয়েট কবি টিখানোভ এবং ইতালীয় গ্রন্থকার নালিনো বলসিও এই দলের অন্যতম। ডাঃ রামণের এই সম্মান-লাভে ভারতবাসী মাত্রই আনন্দিত।

বুদ্ধ-শিষ্যদ্বয়ের অস্থি রক্ষা—

গত ২৯শে ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের ভূপালস্থ সাঁচী শৈলশীর্ষের উপর নবনির্মিত বিহারের নিম্নদেশস্থিত একটি ঘরে বুদ্ধ-শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লায়নের পুত অস্থি স্থায়ীভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে তথায় ৫ দিন ব্যাপী উৎসব হইয়াছে ও বহু সম্ভ্রান্ত লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বারুইপুরে নূতন উপনগরী—

গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে বারুইপুরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক নূতন উপনগরীর উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রায় ১২০ বিঘা জমির উপর উপনগরী নির্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানের অধি-কাংশই জলমগ্ন ছিল। ডাঃ রায় সাত দিন দিঘাতে বিশ্রামের পর পূর্বদিন শনিবার কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায় তিনি পূর্ণোদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ভারতে মার্কিণ সাহায্য—

ওয়াসিংটন হইতে খবর আসিয়াছে যে মার্কিণ-সরকার ভারতবর্ষকে ৩০ কোটি ডলার সাহায্য দিবার সিদ্ধান্ত শীঘ্রই জানাইয়া দিবেন। নিম্নলিখিত তিন খাতে উহা পাওয়া যাইবে—(১) আমদানী রপ্তানী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ (২) নবগঠিত উন্নয়ন ভাণ্ডার হইতে ঋণ ও (৩) টাকার মূল্য পরিশোধের সর্তে ভারতের নিকট মার্কিণ কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়। কোন খাতে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। শ্রী টি-টি-কৃষ্ণমাচারী আমেরিকায় যাইয়া ৫০।৬০ কোটি ডলার ঋণ চাহিয়া-ছিলেন—কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে মোট দেড়শত কোটি ডলার সাহায্য প্রয়োজন হইবে! পৃথিবীর সকল দেশ ভারতের পুনর্গঠনে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতেও ভারত ঋণলাভ করিবে। আমাদের কথা—এই সব অর্থ যাহাতে অপব্যয়িত না হইয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতি—

পাকিস্তানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুত সি-সি-দেশাই গত ১৫ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে আসিয়া বলিয়াছেন —পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এখানে-সেখানে ছোট-খাটো সংঘর্ষ হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ যে হইবে না, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিবে না। পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতির

উদ্দেশ্য ভারত উপেক্ষা করিতে পারে না। সে জন্য যাহা হইয়া ভারতকে তাহার অর্থ-নীতি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষতি করিয়াও প্রতি বৎসর বহু অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করিতে হইতেছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের ইতিহাস এক, সংস্কৃতি এক ও ঐতিহ্য এক—কাজেই যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। মার্কিণ সাহায্য লাভ করিয়া পাকিস্তান তাহার সমর সম্ভার বাড়াইয়াছে। যদিও ইহা শুধু কম্যুনিষ্ট দমনে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত, উহা দ্বারা ভারত আক্রমণ করা চলিবে না—তথাপি পাকিস্তানের একদল লোক তাহা দ্বারা ভারতকে ভয় দেখাইয়া থাকে। ইহা সত্যই অতীব পরিতাপের বিষয়।

ভিলাই ইস্পাত কারখানা—

১১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ভিলাই নামক স্থানে যে নূতন ইস্পাত কারখানা নির্মিত হইয়াছে, গত ১৬ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। ভারতের তিনটি সরকারী ইস্পাত কারখানার এটি একটি। ১৩ বর্গমাইলেরও অধিক স্থান জুড়িয়া কারখানা নির্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানে যে লৌহ প্রস্তর পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা ৬২ হইতে ৬৮ ভাগ লৌহ আছে—সে জন্য কম ব্যয়ে তথায় ভাল ইস্পাত নির্মিত হইবে। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ইউ-নু শ্রীনেহরুর সহিত কারখানা দেখিতে গিয়াছিলেন।

রৌরকেল্লায় শ্রীনেহরু—

১৫ ডিসেম্বর শ্রীজহরলাল নেহরু ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ইউ-নু কলিকাতা হইতে কাড়ঙ্গুণ্ডায় যাইয়া নিকটস্থ রৌরকেল্লা ইস্পাত কারখানা পরিদর্শন করেন। উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীসুখতঙ্কর, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং প্রভৃতি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। রৌরকেল্লা কারখানা নির্মাণের জন্য জার্মানীর সঙ্গে, ভিলাই কারখানার জন্য রুসিয়ার সঙ্গে ও দুর্গাপুর কারখানার জন্য বৃটীশের সঙ্গে ভারত সরকার চুক্তি করিয়াছেন। রৌরকেল্লা কারখানা নির্মাণে ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে।

পাকিস্তানে নূতন মন্ত্রিসভা—

পাকিস্তানে চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা পতনের পর ১৬ই ডিসেম্বর মালিক ফিরোজ খাঁ নূন করাচীতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। ৯টি দলের সদস্য ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। গত ১০ বৎসরে পাকিস্তানে এই সপ্তমবার মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। মন্ত্রিসভায় আছেন—রিপাবলিকান দলের (১) আবজের আলি (২) মিয়া জাফর সাহ (৩) মুজাফর আলি কিজিল বাহ (৪) গোলাম আলি তালপুর (৫) আবদুল হামিদ, (৬) কাম্বিনীকুমার দত্ত ও (৭) মৌলাবক্স সুমরো। স্বতন্ত্র তপশিলী (৮) এ-কে-হাস ও কৃষক শ্রমিক দলের (৯) রমিজুদ্দীন। হাস ও সুমরো রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দত্ত ও রমিজুদ্দীন ছাড়া সকলেই পূর্বমন্ত্রিসভার সদস্য। আওয়ামী লীগের কোন সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নাই। শ্রী এচ-এস-সুরাবর্দী ও শ্রীহামিদল হক চৌধুরী হয়ত পরে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

গত ২৪শে ডিসেম্বর নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। ৭০ বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা পরিষদরূপে ইহার সূচনা হইয়াছিল। সরকার আইন করিয়া ২ বৎসর পূর্বে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণাচরণ সেন বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর। এবার সমাবর্তনে খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, বিহারের রাজ্যপাল ডক্টর জাকির হোসেন ভাষণ দিতে আসিয়াছিলেন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুও সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে তথায় বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে এক প্রদর্শনী হইয়াছিল।

বঙ্গীয় সাময়িক পত্র সংঘ—

বর্তমান বৎসরে মহাপূজার পর বঙ্গীয় সাময়িক পত্র সংঘের কর্মীরা তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন। বালীগঞ্জ অশ্বিনীদত্ত রোডে সহ-সম্পাদক শ্রীসুনীল গুহের গৃহে বিজয়া সম্মিলন, হাওড়ায় 'হাওড়া বার্তা' কার্যালয়ে এক প্রীতি সম্মিলনে সদস্য শ্রীকুমারেশ ঘোষের রুশিয়া ভ্রমণের আলোচনা, বালীগঞ্জে বিশ্ববার্তা কার্যালয়ে ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয়নাথ বসু কর্তৃক তাঁহার সাম্প্রতিক জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আলোচনা, কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটায় মন্মথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্বর্দ্ধনা ও ডালহৌসি স্কোয়ারে নীতি কার্য্যালয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংঘের সদস্যগণকে অভিনন্দনের উৎসব হইয়াছে। তাহাছাড়া সংঘের ৬ জন বিশিষ্ট সদস্য একদিন পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের সাময়িক পত্রগুলির ভবিষ্যৎ ও সে বিষয়ে সরকারী সহযোগিতার কথাও দীর্ঘসময় ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। দৈনিক পত্রগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি কাগজগুলিও যাহাতে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সে জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল নেতার সমবেত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

সিকিম রাজ্যে শ্রীনেহরু—

ভারতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ডিসেম্বর মাসে কয় দিন দার্জিলিংয়ে থাকার সময় ২৮শে ডিসেম্বর সিকিম রাজ্যের রাজধানী গ্যাংটক দর্শনে গিয়াছিলেন। সকাল ৮ টায় একখানি খোলা গাড়ীতে সিকিমের যুবরাজের সহিত যাত্রা করিয়া তিনি দার্জিলিং রাজভবন হইতে ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করেন। পথে রংপো নামক স্থানে তামার খনি আবিষ্কারের কাজ তিনি দর্শন করেন। উহা ভারত রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। সিংটামে ভারত কর্তৃক সিকিমকে প্রদত্ত ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যে জল-সংরক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে শ্রীনেহরু তাহার উদ্বোধন করেন। গ্যাংটকে তিনি মহারাজার প্রাসাদে এক সভায় বক্তৃতা করেন। পথের দুধারে মানুষ সমবেত হইয়া 'সিকিম-ভারত ভাই-ভাই' ধ্বনি করিয়া শ্রীনেহরুকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী শারীরিক অক্ষমতার জন্য পদত্যাগ করায় শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং শ্রীদেবেশ্বর বর্মা, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ত্রিপাঠি, শ্রীহরেশ্বর দাস, শ্রীমইনুলহক চৌধুরী, শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ হাজারিকা মন্ত্রিসভার সদস্য হইয়াছেন। শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতায় নূতন ইলেকট্রিক রেল—

গত ১৪ই ডিসেম্বর এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কলিকাতা হইতে দেওড়াফুলী পর্য্যন্ত নূতন ইলেকট্রীক রেল চলাচলের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। ঐ দিন দুপুরে তিনি কলিকাতায় বণিক সভা সমিতির বার্ষিক সভায় বক্তৃতা করেন ও সন্ধ্যার পর রাজভবনে এক বিদেশী ছাত্রসভায় ভাষণ দেন। কলিকাতাপ্রবাসী বিদেশী ছাত্ররা তথায় প্রধান মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরদিন শ্রীনেহরু ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ-নু-কে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের নূতন লোহার কারখানাগুলি দেখিতে গিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব সততা—

হাওড়া দেওয়ানী আদালতের শমনজারীকারক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হাওড়ার পথে একটি কাগজের প্যাকেট কুড়াইয়া পান। তাহার মধ্যে ২ হাজার টাকার নোট ছিল।—তিনি উহা আত্মসাৎ না করিয়া থানায় গিয়া জমা দেন। তাঁহার ঐ কার্য্যের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গুণানুসারে তাঁহাকে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমানে ৫০ টাকা মাসিক বেতনে অস্থায়ীপদে নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমান যুগে এই আদর্শ দুর্লভ। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট—

গত ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের ১৩ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর শ্রীপ্রমথনাথ বাানার্জি, ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ ও অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ বসু একাডেমিক কাউন্সিল হইতে নির্বাচিত হন। শিক্ষক নহেন এমন ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে নিম্নলিখিত ৮ জন নির্বাচিত হইয়াছেন—(১) শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ (২) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক (৩) শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ (৪) শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (৫) শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় (৬) শ্রীকালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) ডাঃ বিনোদবিহারী বসু (৮) কলিকাতার সেরিফ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়। আমরা সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

অবৈতনিক স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামাঞ্চল এলাকায় (মিউনিসিপ্যাল এলাকায় নহে) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অষ্টম শ্রেণী

পর্যন্ত বালিকাদের শিক্ষা অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী আর্থিক বৎসরের গোড়া হইতে এই নিয়ম চালু হইবে। সেজন্য বৎসরে এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করাই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক : তাহার পরবর্ত্তী আর ৪টি শ্রেণীতে স্ত্রী শিক্ষা অবৈতনিক করা হইলে লোক উপকৃত হইবে।

নূতন কংগ্রেস সভাপতি—

শ্রীইউ-এন-ধেবরগত কয় বৎসর নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতির কাজ করিতেছেন। গত ২৭শে ডিসেম্বর নূতন কংগ্রেস-সভাপতির নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। ঢেবরের পুনরায় ২ বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আর কেহ ঐ পদের প্রার্থী ছিলেন না। শ্রীধেবর তাঁহার ত্যাগ, নৈপুণ্য, ধীরতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের দ্বারা এই পদের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

দিল্লীর প্রেষ্টিজ স্বীকৃত—

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থা সম্পর্কে ভারত, সুইডেন ও যুগোশ্লোভিয়া রাষ্ট্রসংঘের রাজনীতিক কমিটীতে যে প্রস্তাব দিয়াছিল তাহা ১৪ই ডিসেম্বর গৃহীত হইয়াছে। আলোচনা কালে প্রকাশ পায়—উনবিংশ শতাব্দীতে লণ্ডন জগতের শ্রেষ্ঠ সহর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওয়াশিংটন, মস্কো ও লণ্ডন—তিনটি সহরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ জগতে ৭টি সহরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়—তন্মধ্যে দিল্লী অন্যতম—বাকী ৬টি হইল—ওয়াশিংটন, মস্কো, লণ্ডন ও পিকিং। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে—এই কবি বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছে।

ভারতে প্রচুর কয়লার সন্ধান—

গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় কয়লা ক্রেতা সমিতির বার্ষিক সভায় খাদানের শিল্পপতি শ্রী ডি-সি ড্রাইভার বলিয়াছেন—সম্প্রতি গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে ভারতের ভূগর্ভে কোক কয়লা সম্পদ বর্ত্তমান অপেক্ষা ৪ গুণ ও তাল জাতের অন্যান্য কয়লা আরও বেশী পাওয়া যাইবে। তৃতীয় বা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে বেসরকারী প্রচেষ্টায় কয়লাখনি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ বৃদ্ধি করিতে হইলে দুর্গাপুরের কোক-ওভেন প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। তাহাতে দুর্গাপুরে প্রতিদিন ১৮ শত টন উৎকৃষ্ট কোক উৎপন্ন হইবে ও তন্মধ্যে হাজার টন কোক-কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইবে। শ্রীযুত ড্রাইভার যে আশার কথা শুনাইয়াছেন, সে জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন—

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদিগের বেতনের হার সম্বন্ধে বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ হার স্থির করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কমিশন গঠন করিয়াছেন। কমিশনের সভাপতি হইলেন সুপ্রীমকোর্টের জজ শ্রীজগন্নাথ দাস। সদস্য হইলেন—(১) শ্রীভি-আর-গাব্গী (২) শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (৩) শ্রীএম-এল-সীতলবাদ (শ্রীমতী মায়াদেবী চন্দ্রশেখর (৫) শ্রীএল-পি-সিংহ আই-সি-এস—সদস্য ও সেক্রেটারী (৬) শ্রীএচ-এফ-বি-পাইস্—সহযোগী সেক্রেটারী। যত শীঘ্র সম্ভব কমিশন তাঁহাদের নির্দ্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইবেন। যদি কোথাও এখনই কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, কমিশন তাহা জানাইবেন। কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে এখনই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কমিশনের কথা শুনিলেই লোক ভীত হয়—যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস স্বাধীন দেশে কমিশন সত্বর কাজ করিবেন ও তাহার ফলে দরিদ্র কর্মীদিগের দুঃখের অবসান হইবে।

শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—

কলিকাতা বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ ফ্যাকালটির সদস্য কবিরাজ শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার পিতা ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও কবিরাজ ছিলেন—শচীন্দ্রনাথ কিছুকাল মেডিকেল কলেজে পড়িয়া পিতার আদেশে কবিরাজী ব্যবসা গ্রহণ করেন। তিনি কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্রও আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী।

ঐতিহাসিক বটবৃক্ষ রক্ষা—

২৪ পরগণা পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে যে ঘাটে প্রায় ৪ শত বৎসর পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নৌকা হইতে নামিয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই ঘাটের উপর প্রায় ৭ শত বৎসরের পুরাতন একটি বটবৃক্ষ

আছে। বৈজ্ঞানিকগণের মতে গাছটি আর ৫০ বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকিবে না। ঐ স্থান বৈষ্ণব জগতের তীর্থস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি তথায় গমন করিয়াছেন। বটবৃক্ষকে রক্ষা করার জন্য গত গুরু-পূর্ণিমার দিন পুরাতন বৃক্ষের মূলের নিকট নূতন দুইটি বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া বৃক্ষ রোপণ উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উৎসবে পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর পরিচালক শ্রীঅমিয়চন্দ্র মিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং খ্যাতনামা বৈষ্ণব ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী ভাষণে মহাপ্রভুর কথা বিবৃত করেন এবং বৃক্ষ রোপণের পর ভক্তগণের সহিত কীর্তনসহ নৃত্য করিয়া সকলকে আনন্দদান করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সকলকে সাদর অভ্যর্থনাদি করিয়া পানিহাটীর ঐতিহ্য বিবৃত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটি সরকারী পুরাতত্ত্ব রক্ষা আইনে গৃহীত হইলে উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে—গঙ্গার ভাঙ্গনে কবে যে উহা বিপন্ন হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

হুগলী জেলা সাংবাদিক সংঘ—

গত ১লা ডিসেম্বর হুগলী জেলার সেওড়াফুলী উদয়ন সিনেমা হলে জেলা সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে! শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও অধ্যাপক কবি শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সংঘের সভাপতি শ্রীঅবনীমোহন মজুমদার, শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভা শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ 'নেতাজী' চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এই ভাবে সম্মিলন করিয়া মফঃস্বলবাসী সাংবাদিকদের অধিকার-রক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

হুগলী জেলা সাংবাদিক সম্মিলনে সমবেত সাংবাদিকবৃন্দ

বরোদার মহারাজা—

লোকসভার সদস্য বরোদার মহারাজা ফতেসিং রাও গায়কোয়াড় গত ৩১শে জুলাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশীয় রাজাদের মধ্যে তিনি প্রথম চাকরী গ্রহণ করিলেন। বরোদার মহারাজা বার্ষিক ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহার এই কার্য্য প্রশংসনীয়।

সমবায় সমিতির সংগঠন—

সমগ্র পৃথিবীর লোক বর্তমানে সমবায় প্রথায় সকল কাজ করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছে। বহু সভ্য দেশের মানুষ সমবায় প্রথায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি করিয়া দেশের জনসাধারণকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুও প্রায়ই দেশ-বাসীকে সমবায় পদ্ধতি দ্বারা সকল কাজ করিতে আহ্বান করিতেছেন। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সরকার পক্ষও অর্থ সাহায্য করিয়া কর্মীদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় শিক্ষায়তনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার 'সমবায় সমিতির সংগঠন ও ব্যবস্থাপন' নাম দিয়া এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা—৬, ১৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীলেন-নিবাসী খ্যাতনামা সমবায় কর্মী শ্রীপ্রশান্তকুমার গুপ্ত উহা প্রকাশ করিয়া জন সাধারণের উপকার করিয়াছেন। বই খানির মূল্য মাত্র এক টাকা!

যাহারা নূতন সমবায় সমিতি গঠন করিবেন, বইখানি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। ইহাতে সমবায় আইন বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আইনটি যদিও বহু ত্রুটিপূর্ণ এবং সত্বর ইহার সংশোধন করা প্রয়োজন, তথাপি এই পুস্তকখানি সমবায় কর্মী মাত্রেরই বিশেষ সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষায় এইরূপ সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত সমবায় বিষয়ক গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

নোবেল পুরস্কার—

বৃটীশ বৈজ্ঞানিক আলেকজাণ্ডার টড উচ্চ-রসায়ন বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্য ১৯৫৭ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর, তিনি গ্লাসগো সহরের লোক। ডাঃ সুং লাওলী ও চেন লিং ইয়াং নামক আমেরিকাবাসী দুই জন চীনা বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে পরমাণু বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। তাহাদের বয়স যথাক্রমে ৩১ ও ৩৪ বৎসর। এত কম বয়সে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ নোবেল পুরস্কার পান নাই।

নৃত্যগোপাল রায়—

খ্যাতনামা রাজনীতিক ও সমাজ-সেবী কর্মি নৃত্যগোপাল রায় মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যে সাধনা ছিল এবং বহু সাময়িক পত্রে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইত। ১৯৩০ সালে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—নৃত্যগোপাল মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধৃত হন। তিনি বিবেকানন্দ কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিতেন।

১ কোটি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ—

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৬১০০ একর জমীতে নারিকেল চাষ আছে। নূতন একলক্ষ একর জমীতে নারিকেল চাষ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই এক কোটি নূতন নারিকেল গাছ বসাইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। হাওড়া, হুগলী, ২৪পরগণা, মেদিনীপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ী জেলায় নূতন নারিকেল গাছ বসানো হইবে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বৎসরে রাজ্যের বাহির হইতে সাড়ে ৬ কোটি টাকার নারিকেল ও তৎজাত দ্রব্য আমদানী করে। নারিকেল গাছ বসাইবার ৭ বৎসর পরে ফল হইতে আরম্ভ হয়। এক কোটি গাছ বসাইলে পরবর্ত্তী ৮০ বৎসর বার্ষিক ১০ কোটি টাকা আয় বাড়িবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কেরালা রাজ্যে সর্ব্বাধিক নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমীতে ২০ ফিট অন্তর নারিকেল গাছ বসাইলে তাহার মধ্যে কলা, আনারস, হলুদ, আদা, এরারুট প্রভৃতি চাষ হইতে পারে। নারিকেল একটি স্বাস্থ্যপ্রদ, সুখাদ্য। তাহার চাষ বাড়িলে দেশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দূর হইবে। এ বিষয়ে নানাভাবে প্রচার কার্য্য পরিচালন করিয়া দেশে নারিকেল গাছ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অবহিত হওয়ায় দেশবাসী আনন্দিত হইবেন।

হরিদাস কর—

২৪পরগণা সোদপুর (বিলকা-দা) নিবাসী, কলিকাতা ভবানীপুর মিত্র ইনিষ্টিটিউসনের প্রাক্তন্ প্রধান শিক্ষক হরিদাস কর ৭৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা কালীঘাটে পরলোকগমন করিয়াছেন। ৪২ বৎসর শিক্ষকতার পর তিনি ১৯৪৯ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নানা ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—

দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী বাংলা, হিন্দী, মালায়ালম ও তেলেগু ভাষায় লিখিত ৪টি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের রচয়িতাকে ৫ হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছেন। গত ৩ বৎসরের মধ্যে (১৯৫৪-৫৬) প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত বই গুলি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে—(১) বাংলা—সাগর থেকে ফেরা—কবিতা, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (২) হিন্দী—বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন—৺আচার্য্যনরেন্দ্র দেব (২) মালায়ালম চেম্বিন উপন্যাস—থাকজি শিবশঙ্কর পিলাই (৪) তেলেগু শ্রীরামকৃষ্ণাজি জীবিত রচিত—রামকৃষ্ণপরমহংসের জীবন চরিত—চিরন্তনানন্দী স্বামী। আমরা শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে এ জন্য অভিনন্দিত করি।

বিপিনচন্দ্র পাল—

স্বর্গত খ্যাতনামা দেশ প্রেমিক, পণ্ডিত ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের ৯৯তম জন্মদিবসে কলিকাতা মিলন-সভা (কেডারেশন) হলে এক জনসভা হইয়াছিল। শ্রীধেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সভাপতিত্ব করেন এবং ৮৭ বৎসর বয়স্ক স্বদেশীযুগের গায়ক শ্রীহেমচন্দ্র সেন বন্দেমাতরম্ গান করেন। আগামী বৎসর যাহাতে বিপিনচন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিক উৎসব উপযুক্তরূপে পালিত হয়, সে জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত জড়িত ও সংস্কৃতি প্রচারে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার জীবনী জাতির একটা যুগের ইতিহাস হইবে। তাহাদের মত আদর্শবাদীর জীবন আজ বিরল হইয়াছে। কাজেই এ যুগের তরুণগণের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের জীবন কথা প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষার রচনাই পাঠককে মুগ্ধ করে। তাহার রচনাবলী এই উপলক্ষে প্রচারিত হইলে দেশের ভাব সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

সুভন্ন কারিগরী শিক্ষালয়—

কলিকাতায় টেকনিকাল শিক্ষার নিখিল ভারত কমিটীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া খ্যাতনামা শিল্পপতি সার জালাজীর গাঙ্গী জানাইয়াছেন —সমগ্র ভারতে টেকনিকাল শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হয়, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ পূর্বাঞ্চলে ব্যয়িত হয়। নূতন ৫টি কলেজে ও ১২টি পলিটেকনিক স্কুলে সম্প্রতি ৭২৮ জন ছাত্র ডিগ্রী কোর্সে ও ১৪২০ জন ছাত্র ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইয়াছে। সেজন্য এককালীন ২৬৬ লক্ষ টাকা ভারত সরকার ব্যয় করিয়াছেন। আরও ২টি নূতন কলেজ ও ৮টি স্কুল প্রতিষ্ঠাতা হইবে; তাহাতে ৪০০ ছাত্র ডিগ্রী কোর্স ও ১৪৪০ জন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইবে। বর্তমানে এদেশে শিক্ষিত কারিগরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শিক্ষিত, ভদ্র ও পরিশ্রমী যুবকগণ যাহাতে কারখানায় কাজ করার সুবিধা পায়, সে জন্য এতগুলি কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু চাকুরী করিবে না, নূতন নূতন ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে।

পরলোকে অমরেন্দ্রনাথ রায়—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অমরেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার কলিকাতার বাটীতে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নায়ক, প্রবাহিনী প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক প্রচার বিভাগের সম্পাদক ছিলেন ও ১৯৩৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমালোচক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

পরলোকে নির্মলপদ চট্টোপাধ্যায়—

বর্দ্ধমান আসানসোল হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বঙ্গবাণীর সম্পাদক ও স্থানীয় খ্যাতনামা অধিবাসী নির্মলপদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ৬২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ৫ পুত্র ও ৪ কন্যা বর্তমান। তিনি আসানসোলের সকল সদনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার সদ্ব্যবহার, অমায়িক ও সরল ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

পরলোকে শৈলেশচন্দ্র মিত্র—

অগ্নিযুগের বিপ্লবী কর্মী ও পরবর্তীকালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম সংগঠন ও খেলোয়াড় শৈলেশচন্দ্র মিত্র ৫৫ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৩০ সালে রাজবন্দী হইয়া তিনি বহু বৎসর আটক ছিলেন। দেশবন্ধু ও নেতাজী প্রতিষ্ঠিত 'স্বরাজী' দৈনিক পত্রেও কিছুকাল তিনি সহ-সম্পাদক ছিলেন। সদাহাস্যময় উৎসাহী শৈলেশচন্দ্র সকলের প্রীতি অর্জন করিতে সমর্থ হইতেন।

আসামে সুভন্ন শাসন অঞ্চল—

১লা ডিসেম্বর হইতে আসামের নাগা পাহাড় ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের লিলঙ ডুসাং অঞ্চল লইয়া নূতন প্রশাসনিক অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। ডিব্রুগড়ের কমিশনার শ্রীনোরনহা ঐ অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আসামে অবস্থান কালে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

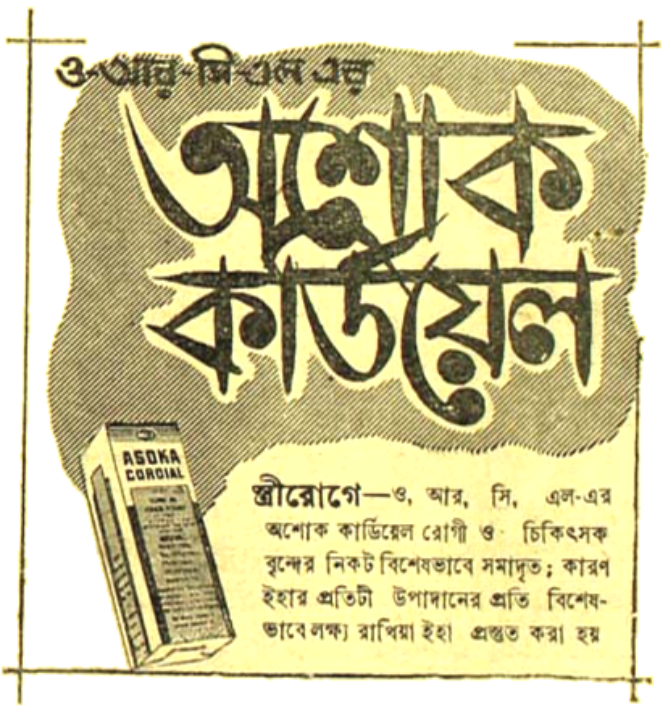

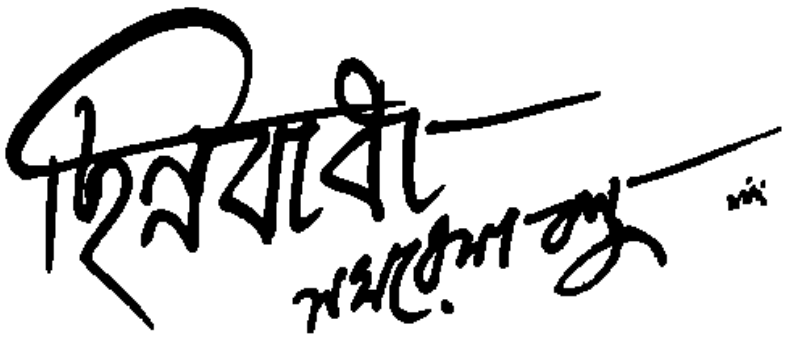

(পূর্বানুবৃত্তি)

অভয়ের চাকরি পাওয়ার দিনটি সুরীনের কাছে একটি উৎসবের দিন হিসেবে অপেক্ষা করছিল। অনাথও অভয়কে সাক্ষী রেখে ভামিনীকে বলেছিল, জানলি গো ভামিনী—অভয়ের যেদিনে কাজ হবে, সেদিনে আমি ভালো মদ খাব, তুই খাবি, অনাথ ভায়াকে খেতে হবে, অভয় বাবাজীকেও চুঁতে হবে এটুসখানি। আর যে'র দিনে আমি ধিতাং ধিতাং নাচব।

কাজ হওয়ার কথা শুনে সুরীন নাকাল, কাঁজালো মদ আনল। মদ যে সুরীন বাড়িতে খায় না, তা নয়। হপ্তার দিনে বাড়িতে বসে মদ খায় প্রায়ই। অনাথ নাকি আগে খেত না। বড় বেশী নিটপিটে ছিল, ঘেন্নাও করত। তা' ছাড়া স্বদেশী করত—লেখাপড়াজানা ভদ্রলোকদের সঙ্গে। তাঁরা মদের নাম শুনলে মূর্ছো যেতেন। অনাথও খেত না। এখন সেই তীব্রের প্রতিজ্ঞা আর নেই। মাঝে মাঝে খায়। তবে নেশাখোর নয়, মাতালও নয়। ভামিনীও হাসে। বরাবরই খেয়ে এসেছে। সুরীনের পাল্লায় প'ড়ে এখন রাশ টেনে চলে। সুরীন যেদিন বাড়িতে বসে খায়, সেইদিন ভামিনীরও একটু আধটু হয়। পুরনো জীবনের অভ্যাস। তখনকার জীবনে না খেলে ধকল সইত না। এখনো একবারে না ছুঁলে কষ্ট হয় বৈ কি!

এ এমন কিছু ঘটনা নয়, বলার মতো বিষয়ও নয়। বিকারহীন স্বাভাবিক জীবনযাত্রারই অঙ্গ। সুরীনদের কাছে এটা ভালো মন্দ বিচারের মাপ কাঠি নয়। কেউ বেশী বেলেল্লাপনা করলে নিজেরাই বিরক্ত হয়। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে মারধোরও করে।

মদ আনল সুরীন আজ। অনাথ নিজেই বলে উঠল, দিয়ে এস, ভাল করে নেশা করা যাক আজ একটু—পোয়েটের কাজের জন্যে।

আরো দু'একজন যারা আসে প্রতিদিনই—তারা খেল। সুরীন খেল। ভামিনীকে ডাকল। ভামিনীর যেন একটু বিরাগ বিরাগ ভাব। মুখ ভার ক'রে বলল, না থাক্। রান্না বান্না সব প'ড়ে আছে। বেসামাল হ'লে কে দেখবে সে-সব।

সুরীন বলল, আরে নে নে, বেসামাল তোকে হ'তে দিচ্ছে কে? আর হোস্ তো হবি, বাজারের যেনা খাবার দিয়ে চালিয়ে নোব।

মুখ ভার ছিলই ভামিনীর। তবে পান ভোজনের ব্যাপারে আসলে তেমন বিরাগ ছিল না। পুরুষদের কাছ থেকে একটু তফাতে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুমুক দিল গেলাসে। কিন্তু সে একটু অবাক হচ্ছিল সুরীনের দিকে চেয়ে। মানুষটাকে একটু অন্যরকম লাগছে। অনাথ দিল অভয়কে, নাও হে পোয়েট, মেজাজ খোল।

অভয়ের গাঁয়ের গুরু নিতাই ভট্টাচার্যের মতো মাতাল এরা নয়। তা' ছাড়া, এখানে ঘরে বসে ভাত খাওয়ার মতো সকলে মিলে এমন ভাবে খায়, যেন ঘরোয়া ব্যাপার কিছু। তা' ছাড়া অনাথও খায়। তবু বলল, এঁজে, চলে না।

অনাথ বলল, একদিন চালাও। রোজ চালালে কি আর তোমার মুখ দেখব ভেবেছ? ওই মাসে মধ্যে এক আধ দিন, একটু মন চাঙা-করা। দশজনের সঙ্গে একটু সুখ বদল হয়। শৈলবালাও হাজির হ'ল এসে। সে আজকাল যথেষ্ট সামলে চলে। মাতাল দেখে দেখে আর মাতালের খোয়ার সয়ে সয়ে, ঘেন্না বলে সাড়টুকুও ভোঁতা

হয়ে গেছে। নিজে কোনদিনই নেশাখোর হ'তে পারেনি। দশজনের মধ্যে না খেয়ে পারে না, বোধ হয় ইচ্ছেও করে। মেয়ে বড় হওয়ার সেটুকুও কালেভদ্রে। ভামিনীদের মতো প্রায়ই খায় না। আজ একবার সাধতেই, ভামিনীর পাশে বসে পড়ল শৈলবালা। অভয়ের কাজ হয়েছে, সেই আনন্দে।

অভয়ও খেল। জীবনে এই প্রথম ইচ্ছে ক'রে খেল।

সবই হল, সকলেরই চোখ মুখের চেহারা বদলাল, স্বর বদলাল গলার। হাসাহাসি বকবকানি কম হলনা। কিন্তু ওই সেই একই কথা, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। বস্তুটির গতিবিধি অন্ধিসন্ধি নিজেরা কি পুরোপুরি জানা থাকে? নইলে এই আনন্দের দিনে সুরীনের মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল কেন? না, সে নিজের হাতে কাজ যোগাড় করে দিতে পারে নি অভয়কে।

তারপর কখন তাদের সবাইকে ঘিরে এখানে নেমে এল এক নিশি-পাওয়া ঘোর। যেন তারা পৃথিবীর বাইরে, অন্য কোনো জগতের অন্ধকারে বসে আছে প্রেতের দল। মেয়ে পুরুষের গলা চেনা যায় না।

কবে একদিন হরেকেষ্ট ব'লে একটি ছেলে এসেছিল, তিলকবালার মেয়েকে বিয়ে করেছিল এখানে। কবে আবার একদিন হরেকেষ্ট বলে গিয়েছিল, তিলকবালার মেয়ে যে-কে-সেই বারো ঘরের আঁস্তাকুড়ে। আগুনের মতো মেয়ে রম্ভা, বামুনের ছেলেকে বিয়ে করল, ভদ্রলোকেরা এসেছিল সেই বিয়েতে, কত ঢাক ঢোল পেটানো হয়েছিল। খবরের কাগজেও উঠেছিল নাকি। তারপর কবে আবার সে সব ভেঙে গিয়েছিল।

মালীপাড়ার বিচিত্র ভাঙা গড়ার কাহিনী রূপকথার মতো আওড়াতে লাগল তারা, কেন না, আজকে তারা তাদের আর একটি মেয়ের বিয়ে দেবে। ভয় তাদের, তাদের বড় সংশয়, নদীর কূলে মাটি, সে যে জলে ধুয়ে যায়। শক্ত মাটির ঠিকানা নিয়ে যুগ যুগ ধরে তারা রওনা হয়েছে। ঘুরে ফিরে আবার এসে পৌঁচেছে সেখানে।

অনাথ উঠে পড়ল। তার পিছনে পিছনে গেল অভয়। বলল, চলে যাচ্ছ গুরু?

অনাথ বলল, হ্যাঁ।

—ঘরে বুঝিন আমার গুরুমা বসে আছেন?

অনাথ নিঃশব্দে হেসে উঠল। সামনের সেই দুটি দাঁত হীন অন্ধকারের ভিতর থেকে হেসে বলল, মরে গেছে অনেকদিন।

—ছেলেপুলে?

—ছিল। এক মেয়ে, দুই ছেলে। মরে গেছে।

—তবে ঘরে কে আর আছে গুরু?

—আমি, আর একটা ভূত।

—ভূত?

—হ্যাঁ, ওই শালা আমাকে বড় জ্বালাতন করে।

—কেমন করে?

—আবার একটা গুরুমা আনতে বলে ঘরে। বলে, আবার একটা মেয়ে দুটো ছেলে না হ'লে সে ব্যাটা ভাগবে না।

ব'লে অনাথ আবার হাসল। বলল, আঠারো বছর বয়সে কুড়ি বছরের মেয়েকে ঘরে এনেছিলুম। বড় সাধ ক'রে, অনেক লড়াই করে এনেছিলুম। ছেলে গেছলুম, শুনলুম, একে একে মরেছে। ভূতটা ভূত, শালা বোঝে না, ওঘরে আর কোনোদিন কাক ভরাট হবেনা।

হাসতে হাসতেই চলে গেল অনাথ।

অভয় আজ আর সামলাতে পারল না। উঠোনে ফিরে এসে বলল, খুড়ো, এ্যাট্টা গান গাইব, কথা এসেছে মনে।

সবাই একযোগে সায় দিল। অভয় গালে হাত দিয়ে, টেনে টেনে গাইল,

জগতের একটি বড় কল
শুনি, তার তিনভাগ জল, একভাগ স্থল
বল কে করল হে এই কল?
এই কল করেছি তুমি আমি।
দেখেছেন জগত স্বামী,
মানুষের চোখের জলে ভাসে সোম্‌সার
হাসি হ'য়ে রয়েছে খল,
জগতের একটি বড় কল।

সুরীন খড়খড়ে গলায় বলে উঠল, যথার্থ বলেছ বাবা, তিন দুখ, এক সুখ, এইটি বিধি।

অভয় আবার গাইল,

তবে কাঁদাকাটি কেন ?
ভাঙা যেমন আঁকড়ে থাক
হাসি তেমন ধরে রাখ
দুখের মনে দুখ বয়ে থাক
হাসতে মানা কর না যেন।

মনের কোঁকে কি গানের আবেশে, কে জানে, শৈল ফোঁপাতে লাগল। সুরীন বলল, ঠিক বলেছ বাবা, সৃষ্টি করতে গিয়ে দুখের ধন্দ লেগে গেল। হাসা বড় কঠিন কি না।

কিন্তু ভামিনীর ভার ঘুচল না। তার মনের সেই বিড়ম্বনা না-ছোড়বান্দা হয়ে বুঝি লেগেই রইল।

পরদিন দুপুরবেলা, না না ক'রেও মনকে বোঝাতে পারল না ভামিনী। অভয়কে বলল, চল একটু ঘুরে আসি।

দুপুরবেলা পাড়ায় যায় ভামিনী। কোনোদিন ডাকে না অভয়কে। অভয় বলল, কোথায় যুড়ি ?

কোথায়, কোনো সর্বনাশের মধ্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে নাকি ভামিনী ? থাক্, পা' বাড়িয়ে কাজ নেই। তবু ভামিনী সামলাতে পারলনা। বলল, চল, কাছে পিঠেই।

কয়েকটা বাড়ি ছাড়ালেই খাসমেয়ে-পাড়া। সেই পাড়ার মধ্য দিয়ে। বড় রাস্তার কাছাকাছি একটি দোতলা বড় বাড়িতে ঢুকল ভামিনী। অভয়কে বলল, এস, একটু বেড়িয়ে যাই।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই, দালানে মেয়েদের আড্ডা চোখে পড়ল। একটি বর্ষীয়সী মেয়েমানুষ মোটা গলায় ব'লে উঠল ভামিনীকে, কী ভাগ্যি, ভামি এসেছিস্, আয় আয়। ওইটি কে ?

ভামিনী মুখ টিপে হেসে বলল, আমার ভাসুরপো।

বর্ষীয়সী একমুহূর্ত তাকিয়ে কি ভাবল কে জানে। বলল, এস বাবা, বস।

অভয় গোড়াতেই থমকে গিয়েছিল। গুটি চার পাঁচেক মেয়ে, বয়স সকলেরই ত্রিশের মধ্যে, বর্ষীয়সী ছাড়া। কেউ শুয়ে, কেউ আধশোয়া, বসে আছে কেউ। সকলেই অগোছালো, এলোমেলো বিস্রস্ত। বিশেষ নড়াচড়া করল না কেউ অভয়কে দেখে। পায়ের দিকে আর বুকের ওপরে কাপড় টেনে দিল দু'একজন। অভয় কয়েক-মুহূর্ত বিমূঢ় নত মুখে দাঁড়িয়ে, একটু ঘুরে বলল।

ভামিনী বলল, কই রাজুমাসী, তোমার গানের বাড়ি এমন চুপচাপ কেন ?

বর্ষীয়সী রাজুমাসী পানের ছিবড়ে হাতে নিয়ে বলল, ঝাঁটা মারো। গান শুনতে আজকাল আর কোন শালা আসে নাকি ? রেডিও, কলের গান, সিনামাতেই সে সব সাধ মিটে যায়। গান শোনার ভান করে আসে, আসলে মেয়েগুলোর জন্যেই আসে, কাজ মিটিয়ে চলে যায়। গানের বাড়ি আর নেই, যে-মেয়ে-সে-মেয়ে-বাড়িই আছে।

ভামিনী বলল, আমি যে সে-জন্যেই ভাসুরপোকে নিয়ে এলুম। গান বাজনার বড় ভক্ত, তাই। রাজুমাসী তার ঢুলুঢুলু রক্তাভ চোখে সস্নেহ হেসে বলল, তাই বুঝি ?

ভামিনী অভয়ের দিকে ফিরে বলল, জানলে, খুব বড় গাইয়ে ছিল আমাদের রাজুমাসী। বয়সকালে এ তল্লাটের সবচেয়ে নাম করা কীর্তন-গাইয়ে ছিল। এখেনকার উলীন কবিয়ালের সঙ্গে গাইত।

রাজুমাসী হেসে মুখ ঝামটা দিল, নে বাপু, আর পুরনো কাসুন্দি ঘাটিস্ নে।

কিন্তু অভয়, মুখে কিছু না বলতে পারলেও, দূর থেকেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করেছে ততক্ষণে। রাজুমাসী অবাক হ'লেও সলজ্জ হেসে বলল, না না বাবা, ওসব কিছু নয়। কোন্‌কালের কথা সব। আজকাল আর ওসব আছে নাকি ? বেবুঝে বেবুঝেই। সেইজন্যে আসে, তাই না কত। আবার গান শুনে টাকা দেবে ?

বাকী মেয়েরা অভয়কে দেখে দেখে নিজেদের মধ্যে টিপে টিপে হাসছিল। একজন বলল, তোমার ভাসুরপো'রই গান একখানি শোনাও না ভামিনীদি।

ভামিনী বলল, গাইবে, তোরা গা।

হেসে উঠে একজন বলল, আমরা আবার কবে গান করলুম।

—কেন, নাদু গা' না।

বছর ত্রিশের নাদু, কাজল ধোঁয়া ঘুম জড়ানো চোখে হেসে বলল, ওসব পাট অনেকদিন চুকিয়েছি ভামিনীদি।

হারমোনিয়া নিয়ে গান ধরলেই মিনসেরা ঘাড়ের ওপর পড়ে বলে, গান থাক।

সকলেই হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে।

নাদু আবার বলল, তবে, সেদিন একটা রিক্সাওয়ালা দু'টাকা দিয়ে দুটো গান শুনে গেছে আমার, মাইরি। দুটো কেত্তন শুনেই চলে যাচ্ছে দেখে ব্যাটাকে হাত ধরে টানলুম, বললে, না, খালি গান শুনতেই নাকি এসেছিল।

কথা শেষ হবার আগেই আবার হেসে কুটিপাটি হল সবাই।

রাজুমাসী বলল, পারবি নাদু? পারলে গা না, বলছে ভামিনী।

নাদু নিশ্বাস ফেলে বলল, না মাসী, সত্যি পারব না, গাইতে গেলেই হাঁপ লাগে। জান তো সবাই।

এবার আর কেউ হাসল না, সকলেই গম্ভীর হ'য়ে গেল। নাদু মুখ গুঁজে রইল।

রাজুমাসীও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা বটে, সত্যি, রাতের ধকল কাটিয়ে গান আর আসে না।

ভামিনী বলল, আর সে কোথায়, তোমার মহারাণী? শুনলুম, তাকে নিয়ে গোটা শহর নাকি মেতে আছে।

রাজুমাসী বলল, সুবালা? সে এক হয়েছে আমার ঐশিখ্যি। গান জানে, গলা ভাল, গায়ও। বয়সও কাঁচা, দেখতেও ভাল, তবে ওই, বড় মেজাজ। ছোট দারোগাকে খেপিয়েছে।

—কী করে?

—কী করে আবার? বলেছে, গান শুনতে চান তো বসুন, নইলে পথ দেখুন। সে দারোগা মানুষ, শুনবে কেন? টানাটানি, জেদাজেদি, সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

—ওমা! তা'পর?

—তা'পর আবার কি, শাসিয়ে যাচ্ছে এসে রোজ রোজ। তা' বাপু, শরীল বেচতে বসেছি, আমাদের কি চলে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ? এখন জেদাজেদির ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। সুবালারও জেদ, ওর সঙ্গে ঘরে থাকব না।

নাদু ব'লে উঠল, তবে বেশীদিন আর নয়, সুবলির জেদও ভাঙবে। আইন তো নেই খুশি মত চলবে।

ধন্দের কড়ি ফেলবে, খেয়াল মেটাবে।

কথা শেষ হবার আগেই সুবালা ঢুকল হাই তুলতে তুলতে। আঁচল লুটাচ্ছে মাটিতে, খোলা চুল ছড়ানো ঘাড়ে পিঠে। বয়স বোধ হয় বাইশ চব্বিশের ওপরে নয়। রং কটা-ই, তার ওপরেও পাউডার বুলানো আছে। পান খাওয়া ঠোঁট একটু বাড়াবাড়ি রকমের লাল। বলতে বলতেই ঢুকল, সুবলির আবার কী খোয়ার হচ্ছে শুনি?

নাদু বলল, তোমার গুণকেত্তন হচ্ছে।

ততক্ষণে ভামিনীকে পেরিয়ে সুবালার নজর পড়েছে অভয়ের ওপর। আঁচল তুলতে তুলতে বলল, এ আবার কে গো?

জবাব দিল ভামিনী, আমার ভাসুরপো।

—অ! ঠোঁট বাঁকিয়ে, অপাঙ্গে তাকিয়ে একবার দেখল সুবালা অভয়কে। অভয়ও তাকিয়েছিল, চোখ নামিয়ে নিয়েছে। রূপ আছে সুবালার, চাউনিটি খর, একটু যেন অ-ভক্তির আভাস, কথায়ও ধার। অভয় যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। খুড়ি আর জায়গা পেল না, এখানে এল।

ভামিনী বলল, অ আ নয়, একখানি গান শোনাতে হবে আমার ভাসুরপোকে।

সুবালা বলল, তোমার ভাসুরপোর সখ আছে তা'লে খুব?

নাদুরা হেসে উঠল সবাই। ভামিনী বলল, সখ নয়, গুণী মানুষ, কবিয়াল, বুঝেছ? সেই মন্ত্রে নিয়ে এসেছি।

অভয় তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, না না, ছি ছি, কী যে বল তুমি খুড়ি।

অর্বাচীন ভঙ্গিটুকু দেখে বোধ হয় সুবালার আবার একটু ঠোঁট কোঁচকালো। হারমোনিয়ম নিয়ে এল গিয়ে একটি সেবক।

রাজুমাসী বলল, তবলা বাজাবার লোক নেই, নইলে—

গানের নামে সঙ্কোচ কখন কেটে গিয়েছে অভয়ের। গায়ে নিতাই ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গত ক'রে বিদ্যেটি একটু আয়ত্ত করেছে অভয়। তার চেয়েও পাখোয়াজ ভাল আসে তার হাতে। বসে উঠল, থাকলে আনেন, এটুকু ঠ্যাকা দিতে পারব।

রাজুমাসী বলল, খুব ভাল। যা' নিয়ে আয় পুতুল বাঁয়া তবলাটা।

ভাব-ভঙ্গিতে বাঁকাচোরা বলে মনে হয় সুবালাকে, হারমোনিয়ম নিয়ে বসতে সাধাসাধি করতে হল না। রীডের ওপর তার আঙুল চালানো দেখে অভয় মহাবুধ হয়ে গেল। ওই বস্তুটি সে সুবিধে করতে পারে না।

কয়েক কেরতা আঙুল চালিয়ে বলল সুবালা, বিস্তেধরী নই বাপু ভামিনীদি, ফরমায়েস মত গাইতে পারিনে। পারলে নাকি কলকাতার ভাল জায়গায় পাত্তা পাওয়া যেত।

নাহু বলল, মুখপুড়ি!

বাকীরা হেসে উঠল। রাহুমাসী বলল, যা খুশি গা না একখানা।

অভয় বাঁয়া-তবলায় এক আধটি ঠোকা দিয়ে মাথা নীচু করে আছে।

সুবালা গমকের চংএ গান ধরল,

হাসতে পার, হাসো বঁধু
মানা কিছু নাই গো
বিনা প্রেমে হাসির মধু
প্রাণে পরশ নাই গো।

নাহু-ই তুড়ি মেরে বলল, খাসা।

খাসা-ই। গলাটি সুবালার চাঁছাছোলা, চড়ানো, কিন্তু মিষ্টি।

গান শেষ হ'তে অভয়ই আগে বলল, বাঃ, সোন্দর, চমৎকার!

নাহুই আবার বলল চোখ ঘুরিয়ে, দিব্যি গেলে বলছ তো?

ভামিনী ধমকে উঠল, দূর ছুঁড়ি, বকিস্‌নে।

সুবালা বলল অভয়কে, তোমার হাতটিও ভাল চলে দেখছি। এবার গানের পরখ হ'য়ে যাক্।

অভয় হাত জোড় করে বলল, এঁজে আপনাদের সামনে কী গাইব?

বোধ হয় 'আপনি' শুনেই সুবালা একটু অবাক হয়ে তাকাল ভামিনীর দিকে। আশ্চর্য, ভামিনীও তার দিকেই তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই ইশারা করল, গাইতে বল।

সুবালা বলল, তা' বললে শুনব না, শোধবোধ হোক।

—কিন্তু ওসব চংএর গান যে জানি নে। হারমোনিয়া বাজাতে পারিনে।

রাহুমাসী বলল, যেমন চংএর তোমার আসে, তেমনই গাও। হারমোনিয়ার দরকারই বা কী?

অভয় মাটিতে আঙুলের আঁক কেটে বলল, পদাবলী শুনবেন?

—তাই হোক।

অভয় গলা নামিয়ে গাইল,

সখি একি এ পীরিতী
নাহি জানি রীতি
পরাণ রাখিতে নারি।
আসে যদি কালা
তুষিবে অবলা
পরাণ ধরিতে পারি।

এবারেও নাহু-ই প্রথম অবাক হ'য়ে বলল, ওমা, এ যে ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল গো!

রাহুমাসী বলল, বেশ, বেশ বাবা, ভাব আছে খুব, গলাটিও মোলায়েম।

ব'লে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাহু। এককালে ওই সব গানেই তার খ্যাতি ছিল। তখন প্রতি বছর মাঘ মাসে ধুলোটের সময় যেত নবদ্বীপ। এই নাহুকেও কতবার নিয়ে গেছে। বড় বড় লেখাপড়া-জানা মহাজনদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কত। বেবুঝে ছিল ব'লে তাঁরা গুণের অনাদর করেননি কোনোদিন। কত কথা মনে পড়ছে।

সুবালাও অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিল অভয়ের দিকে। কাছে উঠে এসে বলল, মাইরি, চমৎকার হয়েছে, এমন কেত্তন আমিও গাইতে পারিনে। আর একখানা হোক।

ইতিমধ্যে একটি লোক এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে। মুখে হাসি, ভাবে ভঙ্গিতে বিশেষ ব্যস্ত। বলল, কই গো নাদুমণি, তাড়াতাড়ি এস, আমাকে আবার সাড়ে চারটের খেয়া ধরতে হবে। বাড়ি ফিরে যাবার পথে যেন বিশেষ কাজে এসেছে। নাহু বলল—মুখ বামটা দিয়ে, রোজ রোজ এক ক্যাচাং। সময় মত বৌয়ের কাছে ফিরতে হবে, আবার এখেনেও পাক দিয়ে যেতে হবে, এতটা না হলেই নয়? সময় অসময় আছে তো। হাত মুখ ধোবার সময়—

লোকটা বলল, এই দেখ, এক মিনিট কাটিয়ে দিলে,

আর মাত্র সতর মিনিট সময় আছে, আমাকে আবার ঘাট অবধি যেতে হবে, এস এস।

রাজুবাসী বলল, বিরক্ত চাপা গলায়, যা বাপু যা, সন্ধ্যের মুখে আর খদ্দের ফেরাস্‌নি, মুখে হাসি রাখ্‌।

অভয় অবাক হয়ে তাকিয়েছিল লোকটির দিকে। নাচু উঠে গেল! ভামিনী বলল, চল, যাই।

সুবালা ছাড়ল না। বলল, ইস্‌, আর একটা গান শুনব বললুম যে?

ভামিনী যেন একটু কেমন ক'রে হাসে সুবালার দিকে চেয়ে। বলল, ভাল লাগল?

সুবালা বলল, তবে?

—তবে আজ আর নয়, বেলা প'ড়ে এল। ভাব ক'রে দিয়ে গেলুম, পাঠিয়ে দেব, ঘরে বসে গান শুনো।

অভয় নীরব। ভামিনীর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল নীচে। সুবালা আর পুতুলও এল পিছনে পিছনে। ভামিনী বলল, দারোগার সঙ্গে ভাব করে ফেলিস সুবলি।

সুবালা বলল, তা করব। কিন্তু তুমি আসছ তো আবার তাসুরপো'কে নিয়ে।

—আসব।

অভয়ের বড় অস্বস্তি। তার মনে হল, যেন সুবালার নজর খোঁচার মত বিঁধে আছে তার গায়ে।

হঠাৎ আবার বলল ভামিনী, তবে কথা দিতে পারিনে। তাসুরপো আমার মৈলদির মেয়ে নিমিকে বে' করছে শীগ্‌গিরিই। তখন কি আর আসতে চাইবে?

সুবালা অভয়ের দিকে ফিরে বলল, জবাবটা তা'হলে শুনেই রাখি।

অভয় হেসে বলল, আসব বৈ কি ঠাকরুণ, নিশ্চয় আসব।

পুতুল হেসে বলল, মনে থাকে যেন। ক্রমশঃ

রিক্ত দিনের

সন্তোষকুমার অধিকারী

আমি ত' তোমায় দিয়েছি আমার
হৃদয়ের থেকে সকল আলো
দিয়েছি মনের উচ্ছল মধু, মুগ্ধ প্রেমের ভরা জীবন;
অনুরাগে ভরা উজ্জ্বল আশা—
যে আশা নিত্য নয়নে জ্বালো,
আমি ত' তোমায় দিয়েছি আমার কামনার রাঙা মুকুল মন!

দিয়েছি তোমায় মর্ম্মজুড়ানো হৃদয়ের প্রেমশঙ্খটীক,
আমি ত' দিয়েছি বাসনার রাঙা অর্ঘ্য—আকুল মর্ম্ম মোর;
রয়েছে নীরব হাহাকারে ভরা, বেদনায় ঝরা রক্ত শুধু,
বহু দিবসের বহু বেদনার
যন্ত্রণাভরা অশ্রুলোর।

আমি ত' তোমায় দিয়েছি বন্ধু,
আশা ও প্রেমের মুগ্ধ গান,
পড়ে আছে শুধু দুঃখ জড়ানো নিবিড় হতাশা অপূর্ণতা:
তুমি কি আমার দুঃখ ল'বে না,
আমার কালিমা—বেদনা ম্লান,
তুমি কি আমার রিক্তদিনের অর্ঘ্য নেবেনা—
এ ব্যর্থতা!!

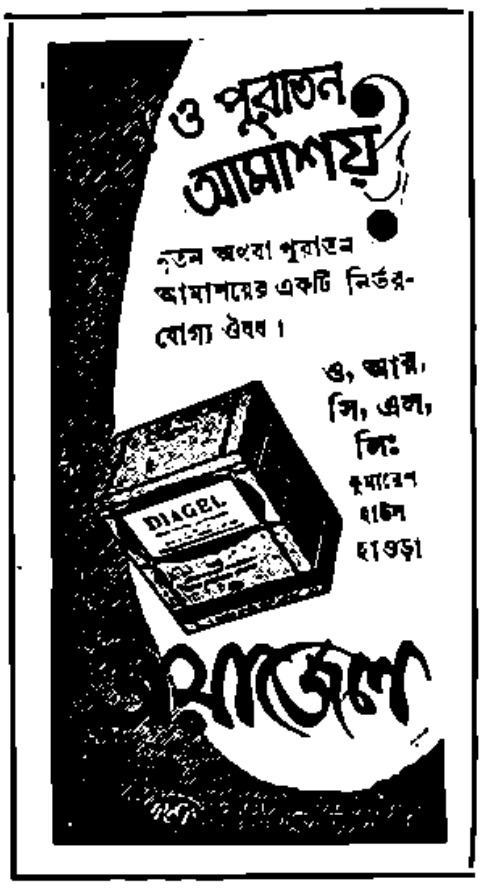

ইন্দোনেশিকা

অতুল দত্ত

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয় প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া ওঠে : পশ্চিম ইরিয়াণ (ওলন্দাজ নিউগিনি) সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার দাবীর প্রতি জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের ঔদাসীন্য ইন্দোনেশীয়দিগকে এক নূতন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে, যাহা সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ক্ষেত্রে এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে পাশ্চিমে "জাটো" শক্তিগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মতবিরোধ ও স্বার্থসংঘাত কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কায়রোর প্রবিণ-আফ্রিকা গণ-সম্মেলন প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী ও স্বাধীনতাকামীর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ইন্দোনেশিয়া ও পশ্চিম ইরিয়াণ—

ইন্দোনেশীয় দ্বীপমালার পূর্বতম প্রান্তে পশ্চিম ইরিয়াণ বা ওলন্দাজ নিউগিনি অবস্থিত। ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌম জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ এই দ্বৈপায়নে যেটুকু ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে বটে ; কিন্তু এই অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশা সে ছাড়ে নাই। সে স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহার একটি পাদভূমি প্রয়োজন। পশ্চিম ইরিয়াণ সেই পাদভূমি ; ইহা সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। গত অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পশ্চিম ইরিয়াণ সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘ পরিষদে নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়,—জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশীল্ডের মধ্যস্থতায় ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষ ও ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা হউক। প্রস্তাবটি জাতি-সঙ্ঘ পরিষদে ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের কোনও প্রস্তাবকে কার্যকরী করিতে হইলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। প্রস্তাবটির পক্ষে এই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট না হওয়ায় উহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় জিদের প্রতি জাতি-সঙ্ঘ সমর্থন কত ব্যাপক, সাম্প্রতিক আলোচনায় তাহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পশ্চিম ইরিয়াণ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ নির্দোষ : এই অঞ্চল এখনই ইন্দোনেশিয়ার হাতে অর্পণের কোনও কথা প্রস্তাবে ছিল না ; এই সম্পর্কে দুই পক্ষে আলোচনার ব্যবস্থা করিবার কথাই শুধু হইয়াছিল। এই নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ আপোষকামী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় শুধু এই কারণে যে, ওলন্দাজ প্রতিনিধি ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার আপত্তিতে প্রস্তাবটির পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট জোটে নাই ; যে সব বৃহৎ শক্তির ইঙ্গিতে বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভোট-বিলক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত আসে নাই। ইহার কারণ—ওলন্দাজ নিউগিনি স্বাধীনতা লাভ করিলে অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ নিউগিনি সম্পর্কেও দাবী উঠিবে বলিয়া দুশ্চিন্তা ফুটবেল ; ডিমোর সম্পর্কে আশঙ্কা পর্তুগালের ; অষ্ট্রেলিয়ার খেয়াল প্রভুরা তাহাদের রাজ্যের প্রবেশদ্বারে বন্যাতীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য একেবারে মরিয়া। জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের সিদ্ধান্ত শুনিয়া ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি খন্নার আক্ষেপে বলিয়াছিলেন, "ইন্দোনেশিয়া উদ্ভূত সমস্যার মীমাংসা চাহিয়াছিল···কিন্তু জাতি-সঙ্ঘের জোরে সে চেষ্টা সফল হইতে পারিল না।" তিনি পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে বলেন যে, অতঃপর, জাতি-সঙ্ঘের বাহিরে "অন্য পন্থা" অবলম্বন করা ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার আর গত্যন্তর রহিল না।

বিচিত্র সংগ্রাম—

এই 'অন্য পন্থা' কি তাহা গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইন্দোনেশীয় জাতি এবং ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জাতীয় দাবী পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজ ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে এক বিচিত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট ঐ রাজ্যে ওলন্দাজদের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন। রাজ্যের ৫০ হাজার ওলন্দাজ অধিবাসীকে অন্যত্র যাইবার আদেশ দিয়াছেন। আন্তর্দেশীয় ওলন্দাজ জাহাজ কোম্পানীর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কে-এল-এম্ নামক ওলন্দাজ বিমান কোম্পানীর বিমানগুলির পক্ষে জাকার্তা বিমানবন্দর ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে ; সমগ্র দেশের ওলন্দাজ কন্সালেটগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজদের যত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার ইন্দোনেশীয় কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানগুলি শান্তিপূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্যে বাধা দেন নাই ; তাহাদিগকে নিরুৎসাহও করেন নাই। কেবল পূর্ব জাভার কয়েকটি ওলন্দাজ খামার পুড়াইয়া দেওয়ায় ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, এই ধরণের কার্য তাঁহারা যেন করিবেন না। তবে, ইন্দোনেশীয় শ্রমিক ও কর্মচারীরা শান্তিপূর্ণভাবে ওলন্দাজ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অধিকারে তাহাদের আপত্তি নাই। এইভাবে অধিকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। তবে, নেদারল্যাণ্ডসের সহিত ইন্দোনেশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই ; অর্থাৎ আপোষের দ্বার সম্পূর্ণরূপে অর্গলবদ্ধ হয় নাই। পশ্চিম ইরিয়াণের হস্তান্তর সম্পর্কে ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টকে আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যেই ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট এবং

ইন্দোনেশিয়ার জনগণের এই সংগ্রাম। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইন্দোনেশিয়ার গভর্ণমেণ্ট কোনও ওলন্দাজ সম্পত্তি আইন করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন নাই; বৈদেশিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কোনও সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে গৃহীত হয় নাই।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমস্যা—

ইন্দোনেশিয়ার এই ওলন্দাজ-বিরোধী তৎপরতায় সাম্রাজ্যবাদী মহলে আর্তনাদ উঠিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করিয়াছে, স্বাভাবিক শিষ্টতা বর্জন করিয়াছে প্রভৃতি নানা কথা বলা হইয়াছিল। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট "ক্যাটোর" মুরুব্বিদের নিকট ধাবনি গাহিয়াছেন, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রশ্নটি উত্থাপিত করিবেন বলিয়াও শাসাইয়াছেন। কিন্তু মাসাধিক কাল ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করিবার পর মালাদালি এখন কিছু করিয়াছে; এখন যেন সিয়ামে সাম্রাজ্যবাদী মহলে যারপর নাই দুশ্চিন্তা। ইন্দোনেশিয়া তাহার বিচিত্র সংগ্রাম-পদ্ধতির দ্বারা যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রভাব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অত্যন্ত পরিপন্থী। অথচ, করিবার কিছুই নাই। ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত তৎপরতা শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত। এমন কি মার্কিন ওলন্দাজরা পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় নাই, কোথাও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তাঁহারা দেখেন নাই। সুতরাং, এই অবস্থায় বিরুদ্ধে কোনও সামরিক তৎপরতা চলে না। সামরিক তৎপরতা অবলম্বন করিতে হইলে খোঁচাইয়া একটা অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করিয়া লওয়া দরকার। সে সুযোগ এই ক্ষেত্রে নাই। ইহা ছাড়া, সামরিক তৎপরতা অবলম্বনের অর্থ বিশ্ব-যুদ্ধের ঝুঁকি লওয়া। ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে মিলিতভাবে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করাও সহজ নয়। অবশ্য, রুশ্চী শোনা গিয়াছে যে, এই অভিজ্ঞতার পর কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় আর লগ্নী করিতে আসিবে না; অথচ, তাহার পক্ষে বৈদেশিক পুঁজি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই হুমকী আমিকার বিশেষ গুরুত্বহীন। অর্থ-নৈতিক চাপ দিয়া অন্য রাষ্ট্রকে বশ করিবার চেষ্টায় মধ্য-প্রাচ্যে যে ফল ফলিয়াছে, তাহার পর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অন্যত্র সে চেষ্টা করিতে আর সাহসী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ ও বিশেষের প্রতি আর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্রোধ যত, তাহা অপেক্ষা বেশী তাহাদের প্রতি পূর্বের আচরণের জন্য বিশ্বের অনুশোচনা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টরা অন্যান্য শক্তিশালী। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই রাজ্যে মার্কিনের কম্যুনিষ্ট শক্তির অনুপ্রবেশের উপযোগী অর্থ নৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টির পূর্বে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বার বার চিন্তা করিবেন।

ক্যাটোর সিদ্ধান্ত—

গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে প্যারিসে উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) কাউন্সিলের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়াছে। এই অধিবেশনে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রধানগণ মিলিত হইয়াছিলেন। "ন্যাটোর" চরমতম পর্য্যায়ে এই আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছিল এই কারণে যে, সম্প্রতি মার্কিন সেনেটের সাব কমিটীর সম্বন্ধে অনেক গুরু বিস্ফোরক সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন—আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে সোভিয়েট রুশিয়া শুধু আমেরিকার অগ্রবর্তী নহে—সে ইতিমধ্যে আমেরিকার অধিকাংশ ঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া তাহার মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সাজাইয়া রাখিয়াছে; সামরিক সাহায্য দান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণ পরিচালনের ব্যবস্থাও করিয়াছে। অর্থাৎ সোভিয়েট-বিরোধী সমরায়োজনের মূলে আঘাত করিবার এবং সে আয়োজনের অধিকারী যে আমেরিকা, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাতের জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ। অতলান্তিকের দুই পারে এতদিন যাহারা শুধু সমরায়োজনের প্রাধান্যের দ্বারা কম্যুনিষ্ট আক্রমণ অসম্ভব করিবার কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের এই সাক্ষ্য শ্রবণ করিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। এমনের আক্রমণের যে অকস্মাৎ এইরূপ আঘাত লাগিতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ইহার পাল্টা ব্যবস্থারূপে ইউরোপের মার্কিন ঘাঁটি-গুলিতে আণবিক অস্ত্র লাগাইবার এবং 'ন্যাটোর' অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। এই পরিকল্পনা লইয়া মার্কিন-পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ প্যারিসে উপস্থিত হন; প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্যারিসে আসিয়াছিলেন উচ্চতম পর্য্যায়ে আলোচনার দ্বারা "ন্যাটো" রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আমেরিকার এখনও ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই.—আগামী ১৯৬০ সালের মধ্যে নির্ম্মিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

'ন্যাটোর' অভ্যন্তরে বিরোধিতা—

এতদিন পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ "ন্যাটোর" যোগ দিয়াছিল কম্যুনিষ্ট আক্রমণের প্রকৃত অর্থ করিয়া আসিতেছে; কম্যুনিষ্ট আক্রমণ-বিরোধী সমরায়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব তাহারা বিনিদ্বায়ে মানিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এবার ইউরোপের নিজের দেশে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি বসাইবার প্রশ্ন ওঠে যার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা "ইনার" প্রয়োজনে। "It is···necessary to station the means to deliver the nuclear deterrent in Europe. This is no longer primarily for the purpose of defending the territories of W. Europe; it is to save the United States (and thus to fortify its allies in all parts of the world) from being left helpless in the face of the threat of Moscow's intercontinental missiles (Economist) আমেরিকার প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হইবার এই গুরুত্ব আশঙ্কা লক্ষ্য করিয়া বৈঠকে যেন যেন যে, পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ মার্কিন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্বেই ফ্রান্স ও জেনারেল দ্য গলের সহিত জানাইয়া দেয় যে, তাহারা কোনও অবস্থাতেই তাহাদের দেশে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতে দিবে না। ওলন্দাজ প্রতিনিধি জানাইলেন যে, ক্ষেপণাস্ত্রের প্রয়োজন

আছে ঘটি, ফ্রান্স ও ইতালীই ঐ অস্ত্রের ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত স্থান। বেভিনের্ ওজস্বিনী প্রতিনিধিকে সমর্থন করিল। ইতালী বলিল যে, সে এখনও মনস্থির করে নাই, প্রীম তুলিল সাইপ্রাস প্রসঙ্গ। ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জানান হইল যে, আণবিক অস্ত্রের প্রতি ফ্রান্সের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। এ অবস্থায় আমেরিকার পক্ষে সুরক্ষা করা সম্ভব নয়; কারণ আণবিক অস্ত্রের কর্তৃত্ব অন্যের হাতে দেওয়া আমেরিকার আইনতঃ নিষিদ্ধ। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, আমেরিকার সমর্থনে ও প্রচেষ্টে যে আডেনয়ার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হইয়াছেন, সেই ডাঃ আডেনয়ারও মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। পশ্চিম জার্মানীর সমরনায়কেরা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, পশ্চিম জার্মানীর অবস্থিতি বিপদসঙ্কুল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের ঠিক মাঝে; এখানে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপন নিরুদ্বিগ্ন, বরং পশ্চিম জার্মানীর প্রয়োজন ট্যাক্টিক্যাল্ অস্ত্র বা কাছাকাছি যুদ্ধের অস্ত্র। ডালেসের প্রস্তাব বিশ্লেষণে পলবোধ করিয়াছিল কেবল বৃটেন ও ফ্রান্স। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিলান্ প্যারিস বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্বেই ক্ষেপণাস্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিল; বৃটেনের ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপনের স্থানগুলি নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। ডালেসের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের এই আপত্তির সঙ্গেই সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আর একবার আলোচনার আগ্রহ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। এই আগ্রহ উপেক্ষা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আর একবার আলোচনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তবে ইউরোপে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপনের প্রস্তাবটি মূলনীতি হিসাবে আটলাণ্টিক ইউরোপীয় সমস্তদিগকে গ্রহণ করানো সম্ভব হইয়াছিল।—The U. S. has been obliged to accept a hard bargain: in exchange for an agreement in principle—but only in principle—to bring her missiles across the Atlantic, she has been forced to undertake a definite commitment for further talks with Russia. (Paul Johnson).

রুশিয়ার পাল্টা প্রস্তাব—

প্যারিসে আটো রাষ্ট্রপ্রধানদের পররাষ্ট্র সচিবের পর্যায়ে রুশিয়ার সহিত আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মস্কোর কর্তৃপক্ষ ইহার উত্তরে রাষ্ট্রপ্রধানের পর্যায়ে আলোচনার দাবী জানাইয়াছেন। এই পাল্টা প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া মস্কোর কর্তৃপক্ষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। পররাষ্ট্র সচিবের পর্যায়ে আলোচনায় সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তি দুইটি কারণে—প্রথমতঃ নীতিগত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সে আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক; পররাষ্ট্র সচিবের পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ঘরোয়া-ভাবে চলিতে পারে, নীতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সদ্ভাবোদ্রেক করিতে হইলে আমেরিকার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার মুখোমুখি সম্মেলনে বেশী প্রয়োজন। অথচ আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ উগ্র সোভিয়েট-বিরোধী। প্যারিসে "আটো" সম্মেলনে রুশিয়ার সহিত আলোচনার আগ্রহ প্রকাশিত হওয়াটা মিঃ ডালেসের মুখপাত্র খবিয়া মার্কিন কংগ্রেস মহলেও বলাবলি করা হইয়াছে। সেই মিঃ ডালেস্ রুশ পররাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা সফল করিয়া তাঁহার নিজের পরাজয়কে স্থায়ী করিতে ঐকান্তিকতা দেখাইবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না। সে যাহা হউক, ইউরোপের জনমত রুশিয়ার সহিত আপোষ-আলোচনার পক্ষে। সুতরাং সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধানের পর্যায়ে আলোচনার ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিলান্ সর্বতোভাবে আমেরিকার নিকট নতি স্বীকার করিলেও তাঁহার পক্ষেও বৃটিশ জনমত উপেক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। প্যারিসের বৈঠক শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার পরই তিনি রুশিয়ার সহিত অবাধ্যুদ্ধ চুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছেন। অথচ, ইতিপূর্বে রুশিয়ার পক্ষ হইতে উত্থাপিত এই ধরণের প্রস্তাব আমেরিকা বরাবর প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তখন বৃটেন সে প্রত্যাখ্যানে সমর্থন করিয়াছে। হঠাৎ মিঃ ম্যাক্‌মিলানের এই ভাববৈলক্ষণ্য আমেরিকায় দারুণ বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে।

এশিয়া-আফ্রিকা গণ-সম্মেলন—

ডিসেম্বর মাসের শেষে কায়রোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার চল্লিশটি দেশের একদল প্রতিনিধি এখানে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু কোন দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন নাই—প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন দুইটি মহাদেশের রাজনৈতিক ভাবধারার। এই সম্মেলনে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার জন্য আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট আবেদন জানান হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের নিকট এই মর্মে অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং সঞ্চিত আণবিক অস্ত্রগুলি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজ নিজ দেশের গভর্নমেণ্টের উপর যথাযথ চাপ দেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নিন্দা-মূলক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে: (১) সাম্রাজ্যবাদ (২) কোনও দেশের বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ; (৩) সামরিক ও রাজনৈতিক জোট; (৪) সামরিক সাহায্য দান; (৫) সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে জাতির শোষণ; (৬) সর্তাধীন অর্থনৈতিক সাহায্য; (৭) বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটী স্থাপন; (৮) দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অন্যান্য দেশের বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি। সম্মেলনে পকড়ীল এবং বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত দশটি নীতির প্রতি সমর্থন জানান হয়। বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত দশটি মূলনীতি এইরূপ—(১) মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি এবং জাতি-সঙ্ঘের সনদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধা; (২) সর্ব জাতির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা; (৩) সমস্ত জাতির সমানাধিকার স্বীকৃতি; (৪) অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরতি; (৫) জাতি-সঙ্ঘের সনদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রত্যেক দেশের একক ভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রতিরক্ষার প্রযুক্ত হইবার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা; (৬) ক-সমষ্টিগতভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে বৃহৎ শক্তি-সমূহের নিজের স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ না দেওয়া; খ—একদেশ কর্তৃক অন্যদেশকে চাপ না দেওয়া; (৭) কোনও দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা রাজ্যগত অখণ্ডতা কোনরূপে লঙ্ঘন না করা; (৮) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসার প্রয়াসী হওয়া; (৯) পারস্পরিক সহযোগিতার প্রসার; (১০) ন্যায় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা।

কায়রোর এশিয়া আফ্রিকা গণসম্মেলন ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনের আদর্শেই আছুত। কিন্তু সরকারী পর্যায়ের সম্মেলন ইহা নয়; সুতরাং, ইহার গুরুত্ব বান্দুং সম্মেলনের সমান নহে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় ভাবধারার অভিব্যক্তির দিক হইতে এই সম্মেলনের গুরুত্ব নূতন ধরণের। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও সামরিক স্বার্থের রাজ্যবাদী কোনও সরকারের প্রতিনিধি শুধু কৌণোগিক অবস্থিতির অধিকারে এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই; কোনও প্রতিনিধির কণ্ঠে কূট-নৈতিক বাধ্যবাধকতার সংযম হয় নাই। নব উদ্ভূত আরব জাতীয়তা-বাদ, আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য-বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী ভাবধারা এবং এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবোধ এখানে অবাধে স্বাভাবিকভাবে মিলিত হইয়াছিল। ৭।১।৫৮

গল্প

পূর্ব্বপরিচয়

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

বম্বেতে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বাংলা ভাষা কদাচিৎ কানে আসে। বাংলা ভাষা শোনবার জন্য মন যদি আপনার উতলা হয়ে ওঠে তবে আসুন বম্বের বিখ্যাত সিনেমা "নাজে"। রবিবার সকাল দশটার "শোতে"। বাংলার যে ছবিই থাকুক না কেন, দেখবেন প্রবাসী বাঙ্গালীর ভিড়!

"নাজে" রবিবার সকাল দশটার 'শো'তে "ব্রহ্মচারিণী" দেখতে গিয়েছিলাম। একাই গিয়েছিলাম। ইলেকট্রীক ট্রেণে করে "গ্রাণ্ট রোড" ষ্টেশনে যখন পৌছালাম, তখনই দশটা বেজে গিয়েছে। হেঁটে 'নাজে' পৌছুতে আরও দশ মিনিট দেরী হয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহ তখন অন্ধকার। গেটকিপারের টর্চের আলোয় অন্য দর্শকদের বিব্রত করে নিজের সিট খুঁজে নেওয়ার বিড়ম্বনা বড় কম নয়। লজ্জাই হল একটু। যাঁদের বিরক্ত করলাম, তাঁদের কাছে মাপ চাইলাম। আমার বাংলা ভাষা শুনে তাঁরা হয়তো আমাকে ক্ষমা করলেন। অন্ধকারে হাতড়ে নিয়ে নিজের নির্দিষ্ট সিটে কোন রকমে বসে পড়লাম। আমার ডাইনে বামে পিছনে দর্শকদের জনতা। আমার সিটটি এরা যেন বন্ধ করে আগলে রেখেছিলেন এতক্ষণ! দেরী করার জন্য আমার একটু কৈফিয়ৎ আছে। ইলেকট্রিক ট্রেণটি পথে বিগড়ে না গেলে দেরী হয়তো আমার হোতো না। কিন্তু আমি নিমন্ত্রিত নই এই প্রেক্ষাগৃহে। আমার কৈফিয়ৎ শোনবার শ্রোতা তাই এখানে নেই। প্রয়োজনও নেই।

"নিযুক্ত হিল" শেষ হবার পর, ছবি শুরু হয়ে গেল। তন্ময় হয়ে ছবিখানা দেখতে লাগলাম। ভাবপ্রবণ আমি, ব্রহ্মচারিণীর কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্ট দেখে অনেক সময়ই চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। লুকিয়ে রুমাল বার করে চোখ মুছলাম। ছবি শেষে চোখ আমার ছলছল্ করছে। কোন'রকমে নিজেকে সংযত করে নিলাম। প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে উঠতেই লজ্জিত হয়ে রুমালে মুখ ঢাকলাম। কিন্তু লুকোবো কা'কে? আমার পাশেই ছিল আমার পুরানো বন্ধু শ্রীশ মজুমদার। সস্ত্রীক!

শ্রীশ আমার হাত ধরে বললো—"আরে প্রশান্ত যে!"

আমি শ্রীশের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম—"এ কি, আপনি কাঁদছিলেন বুঝি?"

লজ্জিত হয়ে উত্তর করলেন তিনি—"কৈ না তো!" চশমাটা খুলে তিনি তাঁর ছোট্ট সিল্কের রুমালটি দিয়ে তাঁর সজল চক্ষু মুছতে লাগলেন।

শ্রীশ ঠাট্টা করে বললো—পয়সা খরচ করে কেন যে সিনেমা দেখতে এসে কাঁদো বুঝি না আমি!

বহুদিন পরে শ্রীশের সঙ্গে দেখা হল। ভিড়ের মধ্যে আলাপ হল সামান্যই। এ পরিবেশে বেশী আলাপ করা শোভনও নয়। পিছন থেকে জনতা বাইরে যেতে চাইছে আমাদের সঙ্গে নিয়ে। আলাপ করার সুযোগই বা কৈ? জনতার স্রোতে আমরাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম।...

শ্রীশ ও আমি একসঙ্গে বি-এস্, সি পড়তাম। আই-এস্, সি ও পড়েছিলাম একই কলেজে। একই ক্লাসে। শ্রীশ ছিল ধনীর সন্তান। আমি ছিলাম কৃতি। আমার অর্থ-সঙ্গতি না থাকলেও আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তার কারণ আমি শ্রীশের টিউটার ছিলাম বলা যায়। পরে প্রবাসী হয়ে সে বস্ত্র ব্যবসাদার হয়েছিল শুনেছিলাম। তার যথাযথ প্রমাণ পেলাম তার সাজসজ্জায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে। কলিকাতার একটি কাগজের বম্বের সংবাদদাতা হয়ে আমি এখন প্রবাসী।

আমার এবং শ্রীশের আর্থিক অবস্থার প্রভেদ এখন অনেক। শ্রীশের সঙ্গে প্রায় দশবছর পরে এভাবে দেখা হবে যাবে কোনদিন কল্পনাও করিনি।···

শ্রীশ ছাড়বে না কিছুতেই। বললে—চলো আজ তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যেতেই হবে। প্রায় ১টা বাজে—আমাদের ওখানেই খাওয়া সেরে নেবে। ওঃ কতদিন পরে দেখা বলো তো! কোথায় থাকো? তুমি যে বম্বেতে আছো—খবর দাওনি তো?

খবর কি করে দেবো! আমি কি ছাই জানি শ্রীশের ঠিকানা—সে যে বম্বেতে আছে তাই আমার জানা ছিল না! যাই হোক্ এত কথা না বলে বললাম—"আমি থাকি আন্ধেরীতে—সে এখান থেকে অনেক দূর। ঠিকানা বলো, সুবিধামত নিশ্চয়ই একদিন আসবো।"

—"না না, আর একদিন নয়। আজই। আমি থাকি ভূলেশ্বরে, আন্ধেরী সেখান থেকে দূর পড়বে না। গাড়ী করে আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো—কেমন?"

বাধ্য হয়ে রাজি হতে হলো। কৃতার্থ হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলাম!

কথা বলতে বলতে দরজার কাছে এসে গেলাম আমরা। হঠাৎ গেটকিপার এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললো—

—"কি রে চিনতে পারিস? ওঃ কতকাল পরে দেখা বলতো! আমার কিন্তু চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি। তোর ওই চোখ···

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরমুহূর্তেই শ্রীশের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনিও আমার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে আছেন।

থতমত খেয়ে গেটকিপারকে বলে ফেললাম—"একটু ভুল করেছেন আপনি!"

কোন রকমে দরজাটা পার হয়ে বাইরে চলে এলাম। শুনতে পেলাম গেটকিপার বলছে—"ভুল! ওঃ মাপ্ করবেন।"

শ্রীশের ঝক্‌ঝকে মস্ত দুইক্ গাড়ীখানায় আমরা উঠে বসতেই, ড্রাইভার গাড়ীর দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে গিয়ে বসলো। গাড়ী চলতে সুরু করলো।

শ্রীশ ও তার স্ত্রী গেটকিপারের আশ্চর্য্য আচরণে তখনও হাসছে।

আর আমি?

আমি ভাবছি গেটকিপার কাঙ্গালীচরণের কথা। আমার গ্রামের স্কুলের এক ক্লাসের বন্ধু। একই ক্লাসে যার সঙ্গে দিনের পর দিন পাশাপাশি বসে পাঠ নিয়েছি। ও'ই বোধ হয় অন্ধকারে আমার পথপ্রদর্শক হয়ে আমাকে আমার নির্দিষ্ট সিটে নিয়ে গিয়ে আজ বসিয়ে দিয়েছিল।

আমার আশ্চর্য্য আচরণের কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না!

অস্থির নদীর মতো

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

অস্থির নদীর মতো ছুঁয়ে গেল চিন্তার উপল,
এর আগে বুঝিনি তো, এ দুরন্ত তটিনীর জল,
আমার বৈরাগ্যবাঁধে নাড়া দিয়ে ভেসে যাবে স্রোতে,
তারপর চুপি চুপি মিশে যাবে নীল সাগরেতে।

কবে যে দুর্দম তার চলা হবে শান্ত আর ধীর,
ঘন চুলে বিলি দেবে ফাল্গুনের উদাস সমীর,
তারা-জ্বলা আকাশের মুখ আঁকা হবে তার বুকে,
নিদ্রা যাবে আকাংখার স্বপ্ন-শিশু বিধানত্র সুখে?

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

(১৭৭৮—১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

১৭৭৮ সাল থেকে বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাসে যে-যুগের সূচনা, সে-যুগে বাংলা গদ্যে প্রথম সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু ঐ প্রয়াস সত্ত্বেও এই যুগে প্রকৃত সাহিত্য খুব কমই রচিত হয়েছে। ভাষার মনোভাব প্রকাশের সামর্থ্যের দিক থেকে বিচার করলে গদ্য-ভাষাও এই যুগে খুব বেশি যে এগিয়ে গেছে সে-কথা অসঙ্কোচে বলা যায় না। এই যুগে বাংলাগদ্যের জগতে সংস্কৃত ও ফার্সি প্রভাব চূড়ান্তভাবে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত প্রভাবেরই জয়লাভ হয়েছিল। অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দের প্রভাবে গদ্য-ভাষা কোথাও কোথাও পূর্ব যুগেরও তুলনায় পিছিয়ে পড়লেও নব-প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে এই যুগে গদ্যভাষার প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনার প্রবণতা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। প্রবন্ধাদি রচনার ভাষা পূর্ব যুগেই গঠিত হলেও সেই ভাষার প্রকৃত অনুশীলন এই যুগেই সম্ভবপর হয়; অবশ্য, তার কারণ, প্রধানত বৈদেশিক সরকারের নিজ প্রয়োজনে গদ্য রচনার কাজে উৎসাহ প্রদান এবং গৌণত মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের ফলে গদ্য-লেখকদের মনে স্মৃতিশক্তি ও অনুলিপি নিরপেক্ষভাবে নিজেদের রচনার প্রসার ও প্রচার বিষয়ে আস্থা লাভ। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হলেও সে-যুগে বই ছাপানো খুব সহজসাধ্য ছিল না। বৈদেশিক সরকার নিজ গরজে পণ্ডিতদের দিয়ে বই লিখিয়ে নিয়ে সেই বই না ছাপালে বাংলা-ভাষায় গদ্যগ্রন্থ মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হতে আরও বহু দেরি হত। ঐ ভাবে ছাপানো সুরু হল দেখে গদ্যরচনায় সমর্থ অনেক লোক সরকারি সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে বই ছাপানোর কাজে উৎসাহ পেয়েছিল এবং তার ফলে মুখ্যত অসাহিত্যিক আর গৌণত সাহিত্যিক গদ্য-সৃষ্টির কাজ এগিয়ে চলেছিল, একথা নির্ভয়ে বলা যায়।

পরবর্তীকালে মুদ্রাযন্ত্রই বাংলা গদ্যের প্রসারলাভে প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক সরকারের আনুকূল্য তেমন কিছু ছিল না। এই যুগে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাধারণত যতটা মনে করা হয়, তাঁদের প্রয়াস ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ কর্মচারী চার্লস উইলকিন্স (১৭৪০-১৮৩৬) মুদ্রণের উপযোগী বাংলা হরফ প্রথম তৈরি করেন। শ্রীরামপুর-নিবাসী পঞ্চানন কর্মকার উইলকিন্সের কাছে বাংলা অক্ষর তৈরি করা শিখে নিয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রগুলির প্রয়োজনীয় অক্ষরমালা ছেনি দিয়ে কেটে তৈরি করে দিতেন। কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে প্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রণের যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সব মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম মুদ্রাকর ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। কোম্পানির আর একজন ইংরেজ কর্মচারী স্যাথানিএল ব্র্যাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সর্ব-প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহার করলেন কয়েকটি বাংলা শব্দ দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করার জন্যে। এর পর ১৭৮৫ সালে জোনাথান ডানকান একটি আইনের বইএর অনুবাদ-কার্যে বাংলা অক্ষরে ছাপা বাংলা গদ্যভাষা ব্যবহার করেন। ১৭৯১ সালে আর একটি আইনগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তার সংকলয়িতা ছিলেন নিল বেঞ্জামিন এড্‌মনষ্টোন। এই সঙ্গে ১৮০০ সালে প্রকাশিত বাইবেলের বঙ্গানুবাদের অংশবিশেষের কথা ধরা যেতে পারে। তবে, সম্পূর্ণ অনুবাদটি অষ্টাদশ শতকে শেষ হয় নি। ইচ্ছা করলে রামমোহন রায়-বিরচিত একেশ্বরবাদ-সমর্থক হস্তলিখিত অমুদ্রিত বইখানির কথা বিবেচনা করা যায়। সেটি ১৭৯৮ সালে লেখা হয়েছিল। এই রচনাগুলি একত্রে আলোচনা করলে উনিশ শতকের আগে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে বাংলা গদ্যভাষার অবস্থা কেমন হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়।

ঐ রচনাবলীর ভাষা পূর্বোদ্ধৃত চিঠিপত্রের ভাষার মতোই দুর্বোধ্য। "প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যসংকলন"—এ উদ্ধৃত ১৭৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখিত পত্রের আগে-দেখানো ভাষার সঙ্গে ১৭৯৩ সালে রচিত ফর্স্টারের ভাষার বেশ মিল আছে। ফর্স্টারের ভাষা এই রকম :—

"এদেশে অন্য অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতি বিস্তর লোক আছে। তাহারদিগের ব্যবহার ও আহারের তাৎপর্য অর্থাৎ নিম পাতের তরকারি ভূমির উৎপত্তা সামিগ্রতেই বর্তে এবং হিন্দু ছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও

দেশাচার ও অসঙ্গতি কারণ আপনার বিদেশ কালহরণের আশা দুরিত উৎপাটনের উপরেই রাখে, এবং বর্ণন হইতেছে।"

এই ভাষার বর্ণাশুদ্ধি ও যতিচিহ্নের অভাব আগের চিঠির ভাষার মতোই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপের আগে ইংরেজ লেখকের গদ্য রচনাতেও উপযুক্ত বিরামচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। উপরে উদ্ধৃত রচনার আগে কোন বিরামচিহ্ন ছিল না। আধুনিক পাঠকের সুবিধার জন্যে আমরা দু একটি চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছি। পূর্ববর্তী পত্রের সঙ্গে এই রচনার ভাষাগত তারতম্য দেখা যায় শব্দ উপাদানের ক্ষেত্রে। চৈতন্যের ভাষায় এই ফুল খাদির বাহুল্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু সমস্ত গদ্যরচনার মতোই কর্ণারের অনুবাদেও দেখা যায় তৎসম শব্দের আধিক্য। ভাষার বর্ণাশুদ্ধি দূর করে উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসিয়ে দিলে এই ভাষা কেমন হয়, তার একটু নিদর্শন দেখানো হচ্ছে :—

"অবিলম্বে এমত উদ্যোগ করিলেও দৈবযোগে অনেক স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টির ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু এককালীন সর্বত্রে আশু উপস্থিত না হইলে স্থান বিশেষে শস্যের হানি ও কোন স্থানে শস্যের কদাচ বর্ধনে হইলে যে স্থানে দুষ্কর শস্য জন্মে, তথাকার আমদানিতে আশুপ্রয় স্থানের ইংপাত মোচন হইতে পারে। অতএব, যে চাষকর্মের আধিক্য সর্বত্রে সকল সানগ্রী অথেষ্ট জন্মিতে পারে, তাহার কুশলচেষ্টা সকল কর্মের অগ্র সরকারের কর্তব্য হইয়াছে। এতদর্থই সিদ্ধার্থে অর্থাৎ চাষবৃদ্ধির আধিক্যার্থীন দেশের আবাদ যে নিমিত্ত যাবন্ত উদ্যোগের মূল এই উদ্যোগ।"

এই ভাষা দুরূহদোষে একটু দুষ্ট হলেও বিদেশি অনুবাদকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ফার্সি শব্দ বর্জনও লক্ষণীয়।

এই ১৭৭৮-১৮১৪ সনের বৈদেশিক-লিখিত সমগ্র রচনাবলীতে সংস্কৃত শব্দসমূহের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। রাজশক্তির সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে ফার্সিকে ক্রমশ দূরীভূত করে ইংরেজিকে শাসনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল নবগঠিত বৈদেশিক সরকারের নীতি। ১৭৭৩ সনে "নিয়ামক আইন" বা Regulating act প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে ইংরেজ জাতি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে। প্রথমে দেশের ভাষাগুলিকে উৎসাহ দিয়ে ফার্সি প্রভাবের উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নতুন ভাষা ইংরেজি। পথ সুগম করার জন্যেই ফার্সিকে অপসারণের সংকল্প নিয়ে ইংরেজ সরকার, বিদেশি খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক ও পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষাব্রিরা বাংলাভাষায় প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত ও বেশি শব্দের ব্যবহার আরম্ভ করেন। উনিশ শতকে রচিত কেরি ও অন্যান্য ধর্মযাজকের লেখায় ফার্সির বিজাতীয় প্রভাব দূর করার ঐ ইচ্ছার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালের চিঠিপত্রের ভাষাকে কেরি ও ধর্মযাজকেরা বাংলা গদ্যের আদর্শরূপে মোটেই গ্রহণ করেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য এই পর্যন্ত সফলও হল যে; বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে পুনর্গঠিত হল, ফার্সি ভাষার প্রভাব ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হল এবং ১৮০৪ সাল থেকে রাজেরবারের ভাষারূপে ইংরেজির প্রচলন সুরু হল। দেশীয় ভাষাসমূহের উপর অন্তত শাব্দ উপাদানের দিক থেকে ফার্সির যে প্রভাব ছিল, ইংরেজির সে-প্রভাব কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং তেমন কোন প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছাও ইংরেজ বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের কোনদিন ছিল না। তবে, ইংরেজি বাক্য গঠন রীতির প্রভাব পরে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। সে-আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন ও তার বিরাট মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮০০ সালেই ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। বিলাত থেকে নবাগত কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে ১৮০০ সালের মে মাসে স্থাপিত এই কলেজের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন উইলিয়ম কেরি (১৭৬১—১৮৩৪)। ১৮০১ সালের মে মাসে এ কলেজের বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ১৮০১-১৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরের মধ্যে দুজন পণ্ডিত ও দুজন সহকারী নিয়ে কেরি সাহেব বিভিন্ন জনকে দিয়ে লিখিয়ে মোট ১৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত দুজন হলেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু; সহকারী দুজনের নাম, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু, কাশীনাথ ও আনন্দ চন্দ্র। কলেজের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকবর্গ এবং বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যেও কেউ কেউ কেরিকে সাহায্য করেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা নানা স্থান নানা সময়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম রচনার প্রকাশ-কাল সমেত পরে দেওয়া হয়। ১৮১৪ সালের পরেও ঐ কলেজের পণ্ডিতদের কারও কারও কোন কোন রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বই বলা না গেলেও এই প্রসঙ্গে সেগুলিরও আলোচনা করা চলে। কারণ, যুগপ্রভাবের বিচারে সেগুলিও ১৮১৪ সনে অবস্থিত. যুগের অন্তর্গত।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশ-কাল
(১) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	... রামরাম বসু	... ১৮০১
(২) কথোপকথন	... উইলিয়ম কেরি	... ১৮০১
(৩) হিতোপদেশ	... গোলোকনাথ শর্মা	... ১৮০২
(৪) লিপিমালা	... রামরাম বসু	... ১৮০২
(৫) বত্রিশ সিংহাসন	... মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... ১৮০২
(৬) ঈসপের গল্প	... তারিণীচরণ মিত্র	... ১৮০৩
(৭) তোতা ইতিহাস	... চণ্ডীচরণ মুন্সি	... ১৮০৪
(৮) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র	... রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১৮০৪
(৯) হিতোপদেশ	... মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... ১৮০৮
(১০) রাজাবলি	... মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... ১৮০৮
(১১) ইতিহাসমালা	... উইলিয়ম কেরি	... ১৮১২
(১২) পুরুষ পরীক্ষা	... হরপ্রসাদ রায়	... ১৮১৪

ব্যতিক্রম গ্রন্থ রামকিশোর তর্কালঙ্কার-প্রণীত "হিতোপদেশ"

বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই বইটির রচনাকাল ঠিকভাবে বলা শক্ত। সম্ভবত "ইতিহাসমালা" রচনার আগেই এটি লেখা হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র ঘোষের মতে, এটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়; আবার তাঁরই মতে এটি "ইতিহাসমালা"-র আগে লেখা। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, পনেরো বছরের মধ্যে তেরোখানি গদ্যপুস্তক রচনার কথা।

"পুরুষপরীক্ষা" গ্রন্থটি হরপ্রসাদ রায়ের নামে প্রচলিত বটে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামে ১৮০৫ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ঐ একই বই প্রকাশিত হয়। সে-বইটি আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তা হরপ্রসাদ রায়ের বইএর অনুরূপ। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়েরও ধারণা, বইটি মৃত্যুঞ্জয়েরই লেখা। সুতরাং বিদ্যাপতির মূল রচনা থেকে সাধারণভাবে বাংলা "পুরুষপরীক্ষা" বইটি কার দ্বারা বাস্তবিক অনূদিত, সে নিয়ে একটু সংশয়ের অবকাশ আছে।

১৮১৭ সালে "বেদান্তচন্দ্রিকা" এবং ১৮১৯ সালে "প্রবোধচন্দ্রিকা" নামে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত আর দুটি বই প্রকাশিত হয়। বই দুখানি ১৮১৯ সালের মধ্যেই লেখা। কারণ তিনি মারা যান ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং রচনাকালের বিচারে দুটি বইকেই আলোচ্য যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত গ্রন্থমালার পরবর্তী প্রভাব বিশেষ কিছু ছিল না। সাধারণ্যে ঐসব বইএর খুব বেশি প্রচার হয়নি। সে-যুগে তা হবার উপায়ও ছিল না। প্রথম প্রকাশ-কালে বইগুলির অতিরিক্ত উচ্চ মূল্য সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার অতীত ছিল। বইগুলি কেবল ইংরেজ কর্মচারীরা এবং ধনী ও শিক্ষিত বাঙালি কয় সম্প্রদায় কিনে পড়বে, হয়ত সেই উদ্দেশ্যই প্রকাশকদের ছিল। অনেক পরে যখন ঐসব বই অপেক্ষাকৃত অল্প দামে প্রচারিত হবার ব্যবস্থা হল তখন বাংলা সাহিত্যের প্রগতি বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে; আর কোন লোকেরই ঐসব বই পড়তে ভালো লাগার কোনই কারণ অবশিষ্ট ছিল না। সেই জন্যে সাধারণ লোকদের রচনার উপর সমসাময়িক কালে এই গ্রন্থমালার তেমন কোন প্রভাব দেখা যায় না। তখনকার ধনী ও শিক্ষিত বাঙালিরা ঐসব বই কিছু কিছু কিনেছিলেন। কার উপলক্ষে কিম্বা অনুসন্ধানী মনের উৎসাহের ফলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের যুগান্তর বিকাশলগ্নে ঐ বইগুলি পড়েছিলেন। তাঁদের কারো কারো রচনায় হয়ত এই গ্রন্থমালার সামান্য প্রভাব দেখা যাবে। কিন্তু সাধারণের লেখা চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ শিক্ষিত সমাজের লেখার ভাষায় তার কোন প্রভাব নেই।

কেরি সাহেব ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা গদ্য শিক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন, পেশাদার উপকরণ গদ্যগ্রন্থের একান্ত অভাব। সেই অভাব যে কত ভীষণ, তা বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, পাঠযোগ্য সমস্ত বাংলা বই দু তিন দিনে শেষ করা যায় এবং বর্ষকাল অপেক্ষা না করলে নতুন পাঠযোগ্য বই পাওয়া যায় না। একথা ১৮৭২ সালের—যখনকার তুলনায় কেরি সাহেবের সময়ের অবস্থা আরও অনেক বেশি খারাপ ছিল।

উইলিয়ম কেরির দ্বারা যে সব বই ছাপানো হল সেগুলির সাহায্যে ভাষা শিক্ষার উপায় বা উপকরণের অভাব খানিকটা দূর হল বটে, কিন্তু বাংলা গদ্যভাষার বেশি কিছু উন্নতি তাতে হল না। সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন যুগে তাঁর মহান্ প্রয়াস বেশব্যাপী নিরক্ষর ও অবসাদ দূর করে এক নব-জাগরণের সৃষ্টি করতে পারত কিনা সন্দেহ, যদি একই সময়ে শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রিদের সঙ্গে রামমোহনের ধর্মবিষয়ক লেখনী-যুদ্ধ সুরু না হত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থমালার সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে মহামনীষী রামমোহনের মনোযোগ বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি যুক্তিপূর্ণ সুসংবদ্ধ গদ্যে ধর্মবিষয়ক বিতর্ক রচনা আরম্ভ করে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র বাঙালী জাতির অন্তরে নব উদ্দীপনার বন্যা বইয়ে দিলেন। তার ফলে বাঙালি প্রথম নিজের গদ্যভাষার উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বই-লেখকদের মধ্যে কেরি, মৃত্যুঞ্জয় ও রামরাম সকলের বেশি নাম-করা। কেরির রচনাবলীর ভাষা তাঁর নিজস্ব হলে একজন বিদেশি লেখকের পক্ষে বড় গৌরবের বিষয়। কেরির বই দুখানি এমন ধরণের যে, তাদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের লেখা হতে বাধা নেই। নানা আখ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ফার্সিনবিশ মুন্সির রচনা কেরির দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়ে তাঁর নামে "কথোপকথন" ও "ইতিহাসমালা," এই দুটি বইএর আকারে প্রকাশিত হয়েছে, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। অন্য প্রমাণের অভাবে আমরা অবশ্য কেরি-নামাঙ্কিত রচনাগুলির লেখক বলে একমাত্র কেরি সাহেবকেই ধরব।

কেরির রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর তৎসম শব্দপ্রীতি তথা সংস্কৃত প্রভাব। অনেক সহজ ও বহু-প্রচলিত খাঁটি শব্দ ও প্রয়োগের জায়গায় তিনি ইচ্ছা করেই দুরূহ ও অপ্রচলিত তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমি শব্দের বদলে সংস্কৃত শব্দের এমনকি ভুল প্রয়োগও দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দের প্রতি এই পক্ষপাতের কারণ আগেই বলা হয়েছে। কেরির রচিত বিষয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ। একথা খেয়াল রাখা দরকার যে, কেরি মোটেই কথ্যভাষার প্রধান সমর্থক ছিলেন না। কথ্যভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তিনি চলিত ভাষার গদ্য রচনার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। তিনি কথ্যভাষাকেও তথাকথিত সাধুভাষার কাঠামোর মধ্যে ধরে বেঁধে রূপ দিয়েছেন। উপভাষাসমূহের নিদর্শনগুলির প্রতি তাঁর যে বিশেষ কোন প্রীতি-পক্ষপাত ছিল, তাও নয়। বাংলাভাষা শিক্ষার পথ সুগম করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বৈদেশিক শিক্ষার্থীদের সামনে বাংলাভাষার নানা নমুনা, আঞ্চলিক প্রভেদব্যঞ্জক দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপিত করেন। কেরিকে চলতি ভাষার সমর্থক বলে না ধরে—ফার্সির বিরুদ্ধে সংস্কৃতের সমর্থক ইংরেজ রাজপুরুষ বলে মনে করলেই ঠিক

হবে। কেরির উপর সংস্কৃতবিশারদ পণ্ডিতদের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁর আটজন সহকর্মীর মধ্যে দুজনকে বাদে সকলেই ছিলেন সংস্কৃত-অনুরাগী। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর রচনাবলীর দ্বারা এই প্রথমাবার ভাষার মূল ধারাটি নির্দেশ করে গেছেন। কেরির রচনার বহুলাংশ তাঁর লেখা হতে পারে। মূল কিন্তু এই যে, কেরি প্রভৃতির রচনার সুনির্দিষ্ট ধারা বা স্বতন্ত্রতা বলে এমন কিছু ছিল না যাকে রচনারীতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেই রচনারীতির পার্থক্য বিচার করে কোন্ রচনার কার প্রভাব তাহাদানি, তা অনায়াসে আজ আর বলা যায় না। সমসাময়িককালে লেখকদের পরিচয় পরিচিত মহল হয়ত এ বিষয়ে কিছু আভাস দিতে পারতেন। এখন সাধারণ অসাধারণ যে কোন পাঠকের চোখেই মৃত্যুঞ্জয়, হরপ্রসাদ ও কেরির রচনা এক ধরণের বলে মনে হবে। বিশেষত "ইতিহাসমালা" বইটির গল্পগুলি কেরি শুধু যে নানা জায়গা থেকে শুনেছিলেন তা নয়, নানা লোককে দিয়ে সেগুলি লিখিয়ে নিয়েছিলেন, এমনও মনে করা যায়, যদি পাশাপাশি "পুরুষপরীক্ষা" ও "প্রবোধচন্দ্রিকা"-র ভাষার সঙ্গে ঐ বইটির ভাষা মিলিয়ে দেখা হয়। স্পষ্টত, তিনটির ভাষা এক রকমের।

এই প্রথমালার লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর পরিমাণে প্রতিভাবান্ মাত্র তাঁর রচনাতেই আমরা জায়গায় জায়গায় চলতি ভাষা প্রয়োগের সচেতন প্রয়াস দেখতে পাই। অবশ্য তখনও কথ্য-ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে নিন্দিত ছিল; মৃত্যুঞ্জয়ও দুঃসাহসী পথপ্রদর্শক ছিলেন না। সুতরাং সংলাপ বা কথাবার্তায় ভাষার ছাড়া অন্য জায়গায় তিনি কোথাও কথ্যভাষার পূর্ণাঙ্গ প্রবর্তনের চেষ্টা করেননি। সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করলে মনে হয়, রামরাম বসু ও অন্যান্য পণ্ডিতের মতোই মৃত্যুঞ্জয়ও কথ্যভাষার কাছে কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন। একমাত্র তাঁর রচনা এযুগের বাংলা গদ্যে প্রগতির আভাস দেয়। এই পূর্বে বিবর্তনের স্তরে স্তরে সংস্কৃত শব্দের উপলখণ্ড বাংলা গদ্যভাষার বেলাভূমি বিষবহুর করে তুলেছে। তার একপ্রান্তে ১৮১৫ সালের কাছাকাছি সময়ে লেখা এই রচনাংশ সুবিস্তীর্ণ বালুবেলার মতোই আমাদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে :—

"রে রে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার! স্বয়ংপলায়নতুল্য রণকালের যুদ্ধপরাঙ্মুখ নির্লজ্জ ঘৃণাস্পদ ব্যক্তিকে নিঃসাহস সহিত ছুড়িয়া মেটা! তোর নিমিত্তে আমাদের ভীষ্ম, বা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রী, পুত্রী, জোঠা, জোঠী, বি, জামাই, মামা, মামী, পিসা, পিসী, মাসুলা, মাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী, বেহাই, বেহানী, শালা, শালী, ভাইজ, ভাইঝু, ভাগ্নাভাই, ভাগ্নী প্রভৃতি স্বজনেরা বিনষ্ট নিমেষে হইয়া-প্রাণপণে শরণাপন্ন-প্রতিপালন-ধর্ম-প্রতিপালনার্থে নিঃসংশয় একত্র তুমুল যুদ্ধে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটী যুবতী মমতা-ত্যাগে অন্যায়ক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া কোপের মাথে চুপ করিয়া রহিয়া আছিস্! ছি, ছি, ধিক তোকে! জন্মিয়া না মরিলি কেন? ওরে পোড়ামুখ, পোড়াকপালে, কুলকলঙ্ক! তোর মুখ হাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা, পোকায় খা, চুলায় যা, মাথায় বাজ পড়ুক, বাতিঘায়, কাঁটা মার, ভূতা মার, যেত মার, তোর জন্যে সর্বনাশ উপস্থিত হইল! দূর হ, দূর হ!"

আলোচ্য অংশের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রচনাটির মধ্যে বহু গুরুগম্ভীর জটিল সংস্কৃত শব্দ থাকলেও মাঝে মাঝে লেখক যেখানে খাঁটি কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। অবশ্যম্ভাবিতাবশত এমন হয়েছে বলার উপায় নেই। ভাষা রচনার কৌশল দেখে বোঝা যায়, লেখক ইচ্ছা করেই কটূক্তির ভাষার প্রাণশক্তির জন্যে মাঝে মাঝে কথ্যভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। যেখানেই সজীবতা আনার চেষ্টা করা হয়, বাংলা গদ্যে সেখানেই আপনা থেকেই মুখের ভাষা, চিন্তার ভাষা প্রশ্রয় পায়. যেখানেই চলতি ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে সেখানেই আপনা হতেই একটু সরলতা এসে পড়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে-গড়া বাংলা গদ্য নিয়ে আলোচনা করলে এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু তিনি নিজে চলতিভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি তো করেন নি বরং জটিল সমাসবদ্ধ পদ যে বাংলা গদ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই ত্রুটিস্বরূপ বলেই বর্জনীয়, এই সত্যটি যথেষ্ট পরীক্ষিত হলেও তাঁর নিকাশ অজানা ছিল। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত, দুই ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন বলে ভাষা রচনার কলাকৌশল সমস্তই আয়ত্ত করে ফেলেও, সাধারণত সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞের এক ঝোঁক, শব্দাড়ম্বর একেবারে ভুলতে মনে করেননি, নইলে এযুগে তিনি মোটেই লিখতে পারতেন না যে এমন সব বাক্যও "বৈষম্যদোষ রহিত সাধুগদ্যবৎ বাক্য" :—

"কোকিলকুলকলালাপব্যাপারে যে বলবাচালাবিল, সে উচ্চলজ্জীকরাতাঙ্ক-নির্ভরাঙ্কোপাঙ্কের হইয়া আসিতেছে!"

এবং এমন সব অনুপ্রাসও বাদ্যনীয় :—

"ঘূর্ণদ্ঘূর্ণদ্ঘূর্ণদ্ঘূর্ণায়মানঘোরঘর্ঘরনাদ শব্দায়মানগগনমণ্ডল ধূলিপটলে ইন্দ্রনীলমণি-নিকষসঙ্কাশ অতি দুর্দ্দর্শ সন্ধান করে!"

এই যুগটাই ছিল শব্দাড়ম্বরশ্রীতির যুগ। কথ্যভাষার গদ্যের চকিত স্ফুরণ আমাদের মাঝে মাঝে বিস্মিত করে, এই মাত্র। তখনও ভাষাদেবীর বর্ণপ্রতিমার গঠনকার্য অসমাপ্ত, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে অনেক দেরি, তখনও জীবনশিল্পীর আবির্ভাব হয়নি। তখনকার সব পণ্ডিতের মতোই মৃত্যুঞ্জয়ও মনে করতেন যে, ভাষাসরস্বতীর চারু অঙ্গে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যের অড়োয়া গয়না পরানো তাঁর সজ্ঞার অপরিহার্য অংশ। "প্রবোধচন্দ্রিকা"-র প্রথমেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন :—

"সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা, এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্বোত্তমা সংস্কৃতভাষাবাহুল্যহেতুক।"

অর্থাৎ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মনে করতেন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি, ওড়িয়াতি, মারাঠীর তুলনায় বাংলা ভাষা যে অনেক বেশি উন্নত, তার কারণ এই ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। আমরা আগেই দেখেছি যে, পোর্তুগীজ ও ফরাসি সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য বাংলা ভাষাকে পাশের অঞ্চলের ভাষাগুলি থেকে একটা পার্থক্য ও উৎকর্ষ দিয়েছে। বাংলা ভাষার বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে মনোভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ গঠন করতে হলে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সাহায্য অপরিহার্য। অবশ্য সাবধানে শব্দ নির্বাচন করতে হবে। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এই সত্যটি উপলব্ধি করে যে, সংস্কৃত ভাষার সুবিখ্যাত গৌড়ী রীতি যেমন শব্দ- ও অর্থ-অলঙ্কারবহুলতার জন্যে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সম্ভবত সেই গৌড়ী রীতির সংস্কৃত ভাষার বংশোদ্ভবা বলে গৌড়দেশীয় ভাষা বা বাংলা ভাষাও তেমনি এখনকার দিনেও সংস্কৃত শব্দবহুল এবং সেখানেই উদ্ভব ও বেশি শব্দপ্রধান অন্যান্য দেশীয় ভাষার তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য নিহিত। হিন্দি ভাষার লেখকদের তুলনায় প্রায় দেড়শো বছর আগে বাঙালি লেখক বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলা ভাষার অক্ষয় সম্পদ্ হচ্ছে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার।

মৃত্যুঞ্জয় যেমন একদিকে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আপেক্ষিক বাহুল্য ও তার যৌক্তিকতা অনুমোদন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ফোর্ট উইলিয়ম প্রত্নশালার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে লিখে গেছেন :—

"সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত "প্রবোধচন্দ্রিকা" নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।"

কেরিও নানা আঞ্চলিক উপভাষায় ঐ "অভিনব যুবক সাহেব জাত"-কে পারদর্শী করে তুলবার জন্যেই বিভিন্ন উপভাষায় রচিত গল্পগুলি সঙ্কলিত করেন। কোন কথ্যভাষার প্রতি কোনরকম সমর্থনের ভাব দেখানো তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সেই কারণে তাঁর অধীন লেখকেরা তাঁদের রচনায় কথ্যভাষাকে বেশি আমল না দিয়ে সংস্কৃতের প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন। এই ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকা সর্বপ্রধান; তাই মার্শম্যান বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :—

"The student should be occasionally interrupted in the perusal of it by words and phrases of unusual occurence,···Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language."

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় দুর্বোধ্যতা স্থানে স্থানে মার্শম্যানের বক্তব্য যে কত নির্ভুল তা প্রমাণ করে। কিন্তু ঐ ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের আসন যে রামমোহনেরও উর্ধ্বে সে-কথা শুনে অনেকে চমকে উঠতে পারেন বটে, তবু তা অত্যুক্তি নয়। মনীষী হিসাবে রামমোহনের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের কোন তুলনা চলতে পারে না। কিন্তু বাংলা গদ্যের মনোযোগী পাঠক একথা ঘোষণা করতে বাধ্য যে, মৃত্যুঞ্জয় গদ্য রচনার যে বেশি পাকা হাতের পরিচয় দিয়ে গেছেন। গদ্য রচনায় প্রথম প্রেরণা সঞ্চার করার জন্যে রামমোহনই পুরস্কৃত বলে বন্দিত হবার যোগ্য। কিন্তু ভালো গদ্য রচনা মৃত্যুঞ্জয়ের, রামমোহনের নয়। ভাল হিসাবে তিনি রামমোহনের পূর্ববর্তী এবং রামমোহনের রচনারীতি তাঁর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিল। বস্তুত বাংলা গদ্য রচনার ক্রমবিকাশের পথে তিনি একটি সুষ্ঠু দিগ্‌দর্শন; তাঁর রচনার ধারাই ক্রমবিবর্তিত হয়ে বিদ্যাসাগরের রীতিতে পরিণত হয়েছে। রামমোহনের প্রভাব বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর বা অক্ষয়কুমারের উপর যতটা, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব তার চেয়ে কম নয়। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা সমর্থনীয়।

(ক্রমশঃ)

দিল্লীতে মুদ্রণ-শিল্পের প্রদর্শনী

শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরের প্রচেষ্টায় মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে এবং এই উপলক্ষে একটি চমৎকার প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা আহ্বান করার ভিত্তিতে মুদ্রণ শিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট আরো অন্যান্য কারু-শিল্পসমূহের উৎকর্ষতার জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণার ব্যবস্থা ভারত সরকার প্রথম করেন ১৯৫৫ সালে, গত ২১শে নভেম্বর তারিখের অনুষ্ঠানে এই রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যমের তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল। এখনকার কালে মুদ্রণ শিল্পের মান অনেক উঁচু স্তরে এসে উপনীত হয়েছে; ভারতবর্ষের মুদ্রণ শিল্প পৃথিবীর যে-কোন অগ্রসর দেশের বর্ষীয়ান মুদ্রণ-পারিপাট্যের তুলনায় কোন ক্রমেই নিকৃষ্টতর নয়। আমাদের দেশে অন্যান্য শিল্পের অগ্রগতির মতোই মুদ্রণ-শিল্পেরও উন্নতি ঘটেছে বেশ দ্রুতগতিতে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে আমাদের দেশের মুদ্রণ-পারিপাট্যের নিদর্শন ও উল্লেখযোগ্য কোন মান ছিল না; মুদ্রণের যে বিষয় একটা গৌরব থাকা উচিত সেই বিষয়েও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোন প্রকার আগ্রহ দেখা যেত না। তৎপূর্ব কালের মতো তখনকার কালেও কোন প্রকারে ছাপাখানা থেকে ছেপে বের করাটাই ছিল মুদ্রণের আসল উদ্দেশ্য। সেই ছাপা সাদামাটা ভাবে কাজ চালানো গোছের হ'লেই হ'ত। মুদ্রণের সুষ্ঠুতা ও নিখুঁতত্বের দিকে একেবারেই নজর দেওয়া হ'ত না, মুদ্রিত বিষয়বস্তুর গুণাগুণের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো। সেই সময়েও আমাদের দেশে রঙীন মুদ্রণ, একাধিক রংয়ের মিশ্রণে ছবি, মাসিকপত্র বা চিত্রবহুল পত্র-পত্রিকার মুদ্রণের রেওয়াজ চালু হয় নি। ছবির ব্লক ক'রে, হাফ-টোন ও লাইন ব্লকের উপর মুদ্রণ পদ্ধতি অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল। সেই সময়কার সচিত্র "আর্য্যোপাখ্যান," "লালা-লজপত", "গায়কের উপকথা", প্রভৃতি বইয়ে বিচিত্র সব ছবির

মুদ্রণ, ২টহলার বই, বিবাহের উপহারের বই, গোয়েন্দা কাহিনী, পত্রিকা, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণ, মঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি নানা গ্রন্থে লাল-নীল-হলুদ রং মিশিয়ে নানা ভাবের ছবির মুদ্রণ যে কতো ছিল, তা এখনকার কালের তুলনায় প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের বলে মনে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ব্লক নিমাণে হাফ্-টোন ও লাইন পদ্ধতির দ্রুত ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হওয়ার পরে আর সেই সঙ্গে মনোরম চিত্রকলার নমুনা অন্তর্ভুক্তি কি ভাবে হতে পারে তা'তে বহু-ভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায় মুদ্রণ শিল্পেও অতি দ্রুত ঢোল পাল্টাতে লাগ্‌লো। এই পরিবর্তনের যুগে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কতকগুলো সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠানের, কিশোর কারিগরের ট্রেনিং এণ্ড কোং, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, মাক্‌মিলন কোং, বাপ্‌টিস্ট মিশন প্রেস, খাকার' স্পিঙ্ক এণ্ড কোং প্রভৃতি ইংরেজদের

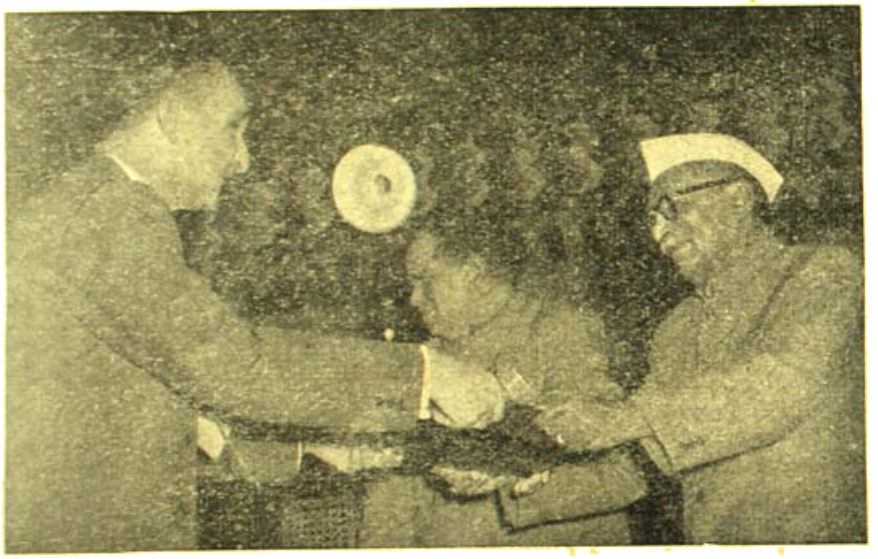

ম্যেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার প্রতিনিধি রাইপ তার নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার গ্রহণ করছেন। ইংরাজিতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার জন্য ম্যেট্‌স্‌ম্যান ও ষ্টেট্‌স্‌ম্যান এই দুটি দৈনিকই একসঙ্গে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন

প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মুদ্রণ-অভিজ্ঞ অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞের আকর্ষণ অবদান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই ধীরে ধীরে আমাদের দেশে মুদ্রণ শিল্পের একটি উঁচু মান গড়ে তোলেন, ভারতের সংবাদপত্র ও প্রকাশনা ব্যবসার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু মুদ্রণের সার্থকতা সম্পর্কে এঁরাই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সচেতন ও উৎসাহী ক'রে তোলেন। এদিকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্যাপকভাবে বহুবিধ শিল্পের উন্নতি ঘটতে থাকে, দেশীয় ব্যবসার প্রসার মহানগরী থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে—আর তখন প্রচার-কার্যের প্রয়োজন খুব বেশী ক'রে অনুভূত হতে থাকে। প্রচারের সব চেয়ে কার্যকরী বাহন হ'ল বিজ্ঞাপন। সংবাদ-পত্রে ও নানা ভাষার পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের প্রকাশ আর সেই সঙ্গে নানা দেশ জুড়ে প্রচারের সুবিধার জন্য সচিত্র প্রচার-পুস্তিকা, প্রসিটার, লীফ্‌লেট, বুকলেট, ক্যাটালগ, ফোল্ডার ও ক্যালেণ্ডার প্রভৃতির অজস্র মুদ্রণ আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় মুদ্রণ-কার্যের সুস্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও গ্রহণযোগ্যতার উপরে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও টাকা খাটানোর যারা মালিক, তাঁরা সবাই অত্যন্ত মনোযোগী হ'য়ে উঠলেন। একমাত্র মুদ্রণের সৌষ্ঠবই যে বিজ্ঞাপনটিকে লক্ষ্যযুক্ত ক'রে তুলতে পারে, আর স্বভাবতঃই প্রচার কার্যকে সার্থক করতে পারে তা পরীক্ষিত সত্য হিসেবে সবাই মেনে নেন। কাজেই মুদ্রণ-নৈপুণ্যের জন্য রীতিমতো একটা আন্দোলন সুরু হ'য়ে গেল, মুদ্রণ-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের লোকের মনে একটা সাড়া জেগে উঠলো। তৃতীয় দশকের প্রথম থেকেই এই আন্দোলন একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ-শিল্পও অনেকটা উন্নত স্তরে এসে উপনীত হয়। ইতিমধ্যে দেশের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। ব্যবসাক্ষেত্রে ও কাজের ব্যাপকতা বেড়ে যায়, ফলে প্রচার কার্যের বহুমুখিতা নিশ্চিতভাবেই মুদ্রণশিল্পের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ভরশীল হ'য়ে উঠে। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন ও প্রসার হতে থাকে—আর তখন সকল শ্রেণীর পণ্যের চাহিদা বিষাক্ত গতিতে বেড়ে যায়। দেশী, বিদেশী পুঁজি-পতিরা এমনিতে প্রচার কার্য করা ছাড়াও আগের যখন বছরে অর্থের বৃহৎ একটা অংশ প্রচারের জন্য অতিরিক্তভাবে খরচ করতে থাকেন। সেই অবস্থায় বিজ্ঞাপন এজেন্সী ও লো ও অফিসগুলি গতিতে প্রচার কার্য চালানোর জন্য সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থের বরাদ্দ পেতে থাকেন, ক্রমান্বয়ে তাঁদের কাজ বাড়তে থাকে আর লক্ষ লক্ষ টাকা মুদ্রণশিল্পের জন্য ব্যয়িত হয়। এই অবস্থায় মুদ্রণ শিল্পের আদর্শ, উৎকর্ষতা ও নিপুণতার উপরে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এইভাবে মুদ্রণ শিল্পের যে উচ্চ মান গড়ে উঠতে থাকে, আজো পর্যন্ত তার ক্রমবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রয়েছে আর তার ফলেই আমাদের দেশের মুদ্রণ শিল্পের অভূতপূর্ব উৎকর্ষতা আজ একটা গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভারত সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ডাইরেক্টরেট অব্ এ্যাডভার্টাইজিং এণ্ড ভিস্যুয়েল পাবলিসিটি আমাদের দেশের সকল স্তরের মুদ্রণ কার্যের নিদর্শনগুলোকে সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকদের গোচরীভূত করার জন্য ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে একটি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করেন।

আর সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উৎকৃষ্টতর মুদ্রণ কার্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় বার মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য প্রদর্শনী ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান বছরের ২১শে নভেম্বর তারিখেও অনুরূপভাবে তৃতীয়বারের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় এবং মুদ্রণের উৎকৃষ্ট নমুনা নিদর্শনের জন্য অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। গত দুই বারের মতো এইবারকার প্রদর্শনীতেও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার ও মুদ্রণের উৎকর্ষতা অনুযায়ী সার্টিফিকেট অব্ মেরিট—এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত উনিশটি পর্যায়ের সব চেয়ে সেরা কাজের জন্য এইবারে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই উনিশটি পর্যায় হ'ল, দশ বছরের কম বয়স্কদের জন্য মুদ্রিত বই, দশ বছরের বেশী বয়স্কদের জন্য মুদ্রিত বই, চিত্রবহুল পুস্তক-পুস্তিকা, চারুকলা বিষয়ক পুস্তক, ইংরেজী ভাষায় পুস্তক প্রকাশনা ও ভারতীয় ভাষাসমূহে পুস্তক প্রকাশনা, ভারতে প্রস্তুত কাগজে মুদ্রিত বই, ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত দৈনিক সংবাদপত্র ও ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত দৈনিক সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপনের প্রকাশভঙ্গী, চারুকলা বিষয়ক সাময়িকপত্র, প্রতিষ্ঠান-মুখপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পোষ্টার, অফসেট ফোল্ডার ও লেটার-প্রেস ফোল্ডার, অফসেট ক্যালেণ্ডার ও লেটার প্রেস ক্যালেণ্ডার, দিনপঞ্জী, দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত, প্রচার-পুস্তিকা, লেবেলও সব চেয়ে সুষ্ঠু পদ্ধায় বাঁধানো বই।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মুদ্রণ প্রদর্শনী নিরীক্ষণ করছেন। রাষ্ট্রপতির বামপার্শ্বে প্রচার ও তথ্য মন্ত্রকের মন্ত্রী ডাঃ বি-ভি-কেশকার

এই বছরের মুদ্রণ শিল্পের প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠতম কাজের নিদর্শন ও নক্‌শা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ক্ষোদিত একটি মূল্যবান্ "তাম্রপত্র" বা অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। মুদ্রণের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনের জন্য যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট অব্ মেরিট সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও উক্ত কাজের উদ্যোগকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশককে এবং উক্ত কাজের নক্‌শা অঙ্কনকারী শিল্পী ষ্টুডিয়ো বা বিজ্ঞাপন এজেন্সীকেও দেওয়া হয়। বিগত দুই বছরের অনুষ্ঠানে যে যে পর্যায়ের কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, সেই সব পর্যায়ের কাজ ছাড়াও এইবারে একটি নতুন বিষয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বিষয়টি হ'ল বিজ্ঞাপনের প্রকাশভঙ্গী অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের লে-আউট। গত দুইবারের তুলনায় এইবারেই সব চেয়ে বেশীসংখ্যক প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ শিল্পের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। ভারতের সকল অঞ্চল থেকে এইবারে সবশুদ্ধ দশ হাজার প্রতিযোগী তাঁদের কাজের বিভিন্ন ধরণের নিদর্শন পাঠিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষের প্রায় সব বড় বড় শহরের প্রকাশক, মুদ্রাকর, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপন এজেন্সী, বাণিজ্যিক কলাকার সংস্থা, আর্ট ষ্টুডিয়ো, দেবনাগরী হরফ প্রতিষ্ঠান, বই বাঁধাইয়ের প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগ।

ভারতের সকল অঞ্চল থেকে যে প্রায় দশ হাজার প্রতিযোগী তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাজের নমুনা পাঠিয়েছিলেন, পুরস্কার দেওয়ার জন্য তা থেকে সেরা কাজগুলো নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি নির্বাচক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মিঃ হর্মান এলিস, শ্রী এন, বি, চোপরা, মিঃ পোথেন ফিলিপ ও দিল্লী পলিটেকনিকের শ্রী বি, সি, সাস্তাস; ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী বি, এন, কৃপালের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিটি ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর, এই দুই দিন ধরে সমস্ত ধরণের মুদ্রণ নিদর্শনগুলো নিপুণভাবে পরীক্ষা করেন—আর পুরস্কার দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত বিচারেও তাঁরাই করেন।

এবারকার মুদ্রণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে পুস্তক প্রকাশনা, সংবাদপত্র ও মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে

তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপজীব্য ক্রমপরিবর্ধনশীল এই মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির আন্তরিক অনুরাগ তাঁর ভাষণে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে; তিনি বলেন, "মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রচার ও তথ্য দপ্তর যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্য আমি উক্ত দপ্তরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ধরণের আয়োজন মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক কলার উন্নতি বিধানের জন্য প্রেরণার সৃষ্টি করবে।

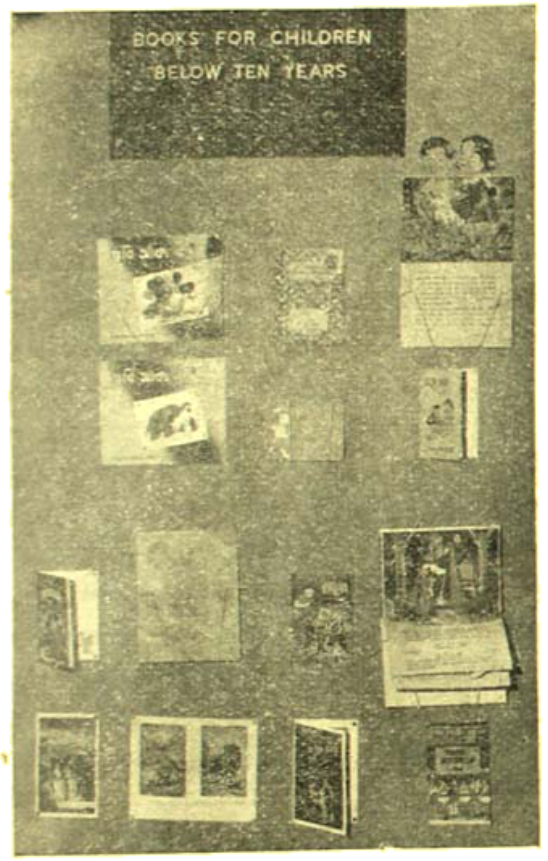

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুদ্রণ শিল্পের প্রদর্শনীর একাংশ

"এখনকার কালে মুদ্রণশিল্পের যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তা দেখে আমার সেই অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যখন আমি পাটনা সহরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেকালে ছাপাখানায় হাতে কম্পোজ করা হত, আর মুদ্রিত বিষয়বস্তু কোন রকমে বুঝতে পারলেই তা উৎকর্ষের নিদর্শন বলে বিবেচিত হত। সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তাও এত ছিল না। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্র পত্রিকার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। এখনকার কালে শুধু যে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে তাই নয়, প্রকাশভঙ্গীরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মুদ্রণের জন্য অনেক নতুন ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় মুদ্রণ শিল্পের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বহুবিধ বিষয়কে অবলম্বন ক'রে বর্তমান সময়ে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, আর তাদের প্রচার সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। আমাদের সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মুদ্রণ কলার উন্নয়নের উপর নির্ভর করছে। উন্নতিশীল জাতি হিসেবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতা বিদূরিত করতে চাই, মুদ্রাকরের সহযোগিতা ভিন্ন এই কাজ সম্ভবপর করা কখনো সম্ভব নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণের জন্যই হোক, অথবা তথ্য ও জ্ঞান বিতরণের জন্য বিবিধ পত্র-পুস্তিকার প্রকাশনাই হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুদ্রণকলাকে কাজে লাগাতে হবে। তাই মুদ্রিত অক্ষরই বর্তমান সময়ে জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম। প্রচার ও তথ্য দপ্তর বহু সরকারী পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ ক'রে থাকেন, তা ছাড়া এই দপ্তর নানা ভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদপত্র ও পত্রিকা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মুদ্রণ শিল্পের এই প্রতিযোগিতায় যে বিষয়ের পরিবেশ করা হয়েছে, বিশেষ ক'রে পুস্তক প্রকাশ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ-ব্যবস্থার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হওয়াতে আমি খুবই প্রীতি লাভ করেছি। গত দুই বছর ধরে মুদ্রণ শিল্পের এই জাতীয় কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। গত দুই বারের তুলনায় এই বছরে অনেক বেশী প্রতিযোগী তাঁদের মুদ্রণ নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছেন; এই বারের প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত মুদ্রণ নিদর্শনগুলোর সংখ্যা ১৯৫৫ সালের তুলনায় দ্বিগুণ এবং গত বৎসরের সংখ্যার তুলনায় তেড় গুণ। এতেই বুঝা যায় যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা ক্রমশঃই অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে। দেশের সংবাদপত্রগুলির ও মুদ্রণ শিল্পকে সরকারী প্রচেষ্টায় উন্নততর ক'রে তোলার ব্যবস্থা এই ভাবেই সুরু হয়েছে। শিল্পের মান উন্নয়ন করার পক্ষেও এই জাতীয় উদ্যম প্রকৃতই সংগঠন মূলক পন্থা বলে বিবেচিত হবে। যদিও মুদ্রণ শিল্পে এখনো আমরা পাশ্চাত্যের ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় এবং প্রাচ্যের জাপান প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি, তবু অগ্রগতির পথে ভারতবর্ষ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, তা'তে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আমরা ঐ সব দেশের সমকক্ষ হ'য়ে উঠ্‌তে পারবো।"

ভাষণ শেষ করার পরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-সমূহকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন পর্যায়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজের জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁদের নাম ইতিপূর্বেই দৈনিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে আর ঐ সব নামের তালিকা দেওয়া হ'ল না।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারা*

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচডি

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের সাম্য বা বৈষম্য দেখা যায়? অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শনে একটিমাত্র চিন্তাধারা আছে এবং পাশ্চাত্য দর্শনে আর একটি মাত্র চিন্তাধারা আছে তাহা নহে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উভয় দর্শনেই একাধিক চিন্তাধারা প্রবহমান এবং একটিতে যে সব চিন্তাধারা আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই অপরটিতে বিদ্যমান। তথাপি একথা সত্য যে ভারতীয় দর্শনের প্রধান চিন্তাধারার মূলগত এবং প্রায় সর্বগত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেইরূপ পাশ্চাত্য দর্শনেরও প্রধান এবং বহুগত চিন্তাধারার অন্যপ্রকার বিশেষ লক্ষণ আছে। এই বিশেষ লক্ষণগুলি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারাকে এক একপ্রকার বিশিষ্টরূপ দিয়াছে। উহাদের উৎপত্তি, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগতি, প্রমাণপদ্ধতি ও চরমলক্ষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে এ বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

ইতর প্রাণী হইতে মানুষের মূলগত ভেদ এই যে, ইতর প্রাণীরা তাহাদের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। মানুষের মধ্যে জ্ঞান তৃষ্ণা বলিয়া একটি প্রবল পিপাসা আছে, এ পিপাসা মানুষের চিরসাথী। মানুষ তাহার জ্ঞান-পিপাসার শান্তি করিবার জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। মানুষের জ্ঞান-লাভের এই প্রয়াস তাহার স্বভাবসিদ্ধ, প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। দর্শনশাস্ত্র মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি চিরন্তনী প্রচেষ্টা। ইহাতে মানুষ জীব, জগৎ ও পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

যদিও মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধিতেই দার্শনিক চিন্তাধারার সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে তাহার প্রেরণা ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়াছে দেখা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তা-ধারার প্রেরণা প্রাচীন গ্রীকদের বিস্ময়ানুভূতি ও প্রকৃত জ্ঞানানুসন্ধিৎসা হইতে আসিয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য দর্শনে গভীর বিস্ময়বোধ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন, এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনা নিচয়ের কারণ নির্ধারণ করিয়া তাহাদের মূলগত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতেই পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দর্শনে বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি, সামাজিক নীতি, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর আলোচনাও করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দর্শনের মূল ও প্রবল চিন্তাধারার মধ্যে বহির্জগৎ এবং মানুষের বাহ্য প্রকৃতি ও তাহার কল্যাণসাধনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে বলা যায়। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের প্রেরণার উৎস হইতেছে প্রাচীন আর্য ঋষিদের দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মানুষ জীবনে যে সুখ ভোগ করে তাহা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে সকল মানুষকেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার দুঃখ অনিবার্যভাবে ভোগ করিতে হয়। অন্য সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, জরা ও মরণের হাত হইতে কোন মানুষেরই পরিত্রাণ নাই। জীবনে দুঃখের এই সর্বব্যাপী ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব দেখিয়া প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহার কারণ এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে জীব ও জগতের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইলেও, তাহার আধ্যাত্মিক সত্তা সকল শোক, দুঃখ ও মোহের অতীত, চির শান্তি ও আনন্দের অধিকারী। মানুষ তাহার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরাশান্তি ও আনন্দানুভূতি অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ভারতীয় দর্শনে প্রধানতঃ অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে এবং দর্শনকে আত্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও উহাতে প্রসঙ্গক্রমে জড়প্রকৃতি ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের সমস্যাগুলির যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণাস্থল।

দুঃখানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ এবং জীবনে দুঃখের অনিবার্য প্রভাব স্বীকার করায় কোন কোন সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদদুষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ ভারতীয় দার্শনিকগণ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা হইতে পরিত্রাণের সম্ভাব্যতা ও সুযোগ উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে মানুষ দুঃখদুঃখের অতীত, পরা শান্তি ও আনন্দানুভূতির অবস্থাও লাভ করিতে পারেন; এবং এই

---

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

অবশ্য কালের উপায় নির্দ্ধারণ করাই প্রায় সব ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিত্য আনন্দানুভূতি যে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাকে দুঃখবাদ বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত নহে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। জড়বাদী চার্ব্বাক দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের মতে মানুষ দেহমাত্র নহে, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি বা মন মাত্রও নহে। মানুষ দেহমনবিশিষ্ট, কিন্তু তদতিরিক্ত চৈতন্যবিশিষ্ট বা চৈতন্যময় আত্মা এবং তাহার ভোগময় জন্মমরণের অধীন হইলেও আত্মা অজর, অমর, নিত্য-শুদ্ধ ও মুক্ত। সেইরূপ এই বৈচিত্র্যময় জগৎ এক আধ্যাত্মিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ও উহা হইতে উদ্ভূত; ইহা জড়প্রকৃতি হইতে যন্ত্রবৎ উৎপন্ন নহে। ঐহিক ভোগবিলাস মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে, আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ এবং অমরত্ব লাভই তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সমগ্র জীবজগৎ এক সর্ব্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বা নৈতিক নিয়মের বশবর্ত্তী ও তাহার দ্বারা পরিচালিত। এই নৈতিক অনুশাসনের ফলেই জীবনে আমাদের সুখদুঃখ ভোগ হয় এবং একদেহ হইতে দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু কোন জীবই চিরকাল এই জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া থাকিবে না। সকল জীবেরই চরমগতি ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। আধ্যাত্মিক অনুশাসনের ফলে জন্মমৃত্যুর সমস্যারই জীবের এই চরম উৎকর্ষলাভ হইবে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাহার সহিত ধর্ম্মের নিকটতর সম্বন্ধ দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দর্শনের সহিত ধর্ম্মের কোন বিরোধ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে অতি নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান। অনেকস্থলে দর্শন ধর্ম্মানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং ধর্ম্মানুভূতিকে যুক্তিতর্কের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে তাহাতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রবল ও ব্যাপক। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের কোন কোন স্থলে একপ্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। কিন্তু তাহা ঠিক ভারতীয় দর্শনের মত নহে এবং সেরূপ প্রবল ও ব্যাপকও নহে। বরং পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাকৃতিক (Naturalistic) দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বলা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জড়প্রকৃতিকে অথবা প্রাণ বা মন শক্তিকে মূলতত্ত্ব ধরিয়া তাহা হইতেই আপাতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাখ্যা এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলিরও সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্য দর্শনে একদিকে ধর্ম্মের সহিত দর্শনের বিরোধ এবং অপরদিকে জড় বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের অধিকতর ও ঐকান্তিক প্রায়শঃ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রগতি প্রধানতঃ বিজ্ঞানমূলক, উহা বৈজ্ঞানিক সত্যনিচয়ের আলোকে ও সাহায্যে পরিচালিত ও বিপন্ন হইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-সিদ্ধ না হইলে অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থন না পাইলে দার্শনিক মতের কোন মূল্য থাকে না। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অনেকস্থলে দর্শনকে বিজ্ঞানের সহিত একীভূত বা একপ্রকার বিজ্ঞানে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে, দর্শন বিজ্ঞানেরই একপ্রকার উচ্চাঙ্গের তর্কশাস্ত্র।

ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি বা শব্দ ও আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইয়াছে এবং অধিকাংশস্থলে তাহারই ভিত্তিতে দর্শনশাখাগুলির প্রগতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। অবশ্য জড়বাদী চার্ব্বাক-দর্শনে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চার্ব্বাকমতে বেদ বা শ্রুতির কোন প্রামাণ্য নাই এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণগ্রাহ্য নহে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দর্শনশাখায় শ্রুতি বা আপ্তবাক্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। আস্তিক-দর্শনগুলির মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বেদানুগ। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগ দর্শন স্বতন্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে নাই। বরং বেদ ও উপনিষদের বাণীর সহিত যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক মতগুলির সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে আরও সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও শব্দ বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার উপরই উহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী নিহিত আছে, তাহাই বৌদ্ধদর্শনের মূলগ্রন্থ এবং পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধদর্শনের শাখাগুলির মতবাদ গঠনের প্রধান উপাদান ও তাহাদের বিচারের মানদণ্ড। সেইরূপ জৈনদর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি মহাবীর ও তাঁহার পরবর্ত্তী তীর্থঙ্করদের শিক্ষা ও উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে শ্রুতি বা আপ্তবাক্যমূলে যে সব দার্শনিক মত প্রচলিত হইয়াছে তাহাদের এক একটিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা—বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ ইত্যাদি। প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকগণ তাহাদের মূল শাস্ত্র বা গ্রন্থগুলির ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া নিজ নিজ দর্শনশাখার প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই নিজেকে নূতন দর্শনের প্রণেতা বলেন নাই, কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দর্শনের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন স্থলে ঐরূপ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা গ্রন্থে একপ্রকার নূতন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামানুজাচার্য্য-কৃত শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্থাপনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে অথবা উহাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্ম্মতত্ত্বের কিছু প্রাধান্য দেখা যায় এবং তাহার ভিত্তিতে এক-প্রকার দর্শনমত গড়িয়া উঠে, উহাকে ধর্ম্মাচার্য্যদের দর্শন (Patristic Philosophy) বলা হয়। কিন্তু ইহা অতি অল্পকাল স্থায়ী হয়, এবং কখনও উহা সর্ব্বজনস্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু উহাকে সব সময়েই প্রবল বাধা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দর্শনে বিভিন্ন দার্শনিক স্বতন্ত্র যুক্তি বলেই নিজ নিজ দার্শনিক মত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতবাদের পরস্পরিক আলোচনা বা সমালোচ-

নার ফলে উহার প্রগতি ঘটিয়াছে। কোন কোন স্থলে কোন দার্শনিকের মতবাদকে অবলম্বন করিয়া কোন দর্শনশাখারও উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাঁহার অনুগামী দার্শনিকদের ঐশাণীয় দার্শনিক বলা হয়। কাণ্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এখানেও তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদকে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের সম্মান দেওয়া হয় নাই, কেবল তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুকূলে যুক্তিতর্ক দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হইয়াছে।

দার্শনিক প্রমাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভেদ আছে। ভারতীয় দর্শনে সাধারণ লৌকিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে একাধিক প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল জড়বাদী চার্বাক দর্শনেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শনশাখার মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকে, কোথাও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে এবং কোথাও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটিকে, স্বতন্ত্র ও যথার্থ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। আবার মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে তাহাদের সঙ্গে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামক আরও দুইটি প্রমাণ যুক্ত হইয়াছে এবং এই ছয়টিকেই অপরিহার্য প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কোন কোন দর্শনশাখায় এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক তত্ত্ববিষয়ে বিভিন্ন দর্শনশাখায় বিভিন্ন প্রকারক ও বিভিন্নসংখ্যক প্রমাণের উল্লেখ থাকিলেও পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বা উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শন শাখার মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়। তাহাদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ অপরোক্ষানুভূতি বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (intuition)। অতীন্দ্রিয় সত্তা বা পারমার্থিক সত্যের জ্ঞানলাভে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ বা মানুষের বিচারবুদ্ধি পর্যাপ্ত নহে। এজন্য আমাদিগকে যৌগিক সাধনপথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে যম, নিয়ম প্রভৃতি ব্রতপালন করিতে হইবে। পরে পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে অনুরূপ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার হইবে। এই জন্যই চার্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই তত্ত্বদর্শনের জন্য যোগ বা তদনুরূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যোগোপদিষ্ট সাধন মার্গের নির্দেশ আছে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইহাই একমাত্র উপায়। বিচারবুদ্ধি বা তর্কযুক্তির সাহায্যে তাহা লাভ করা সম্ভব নহে। অবশ্য তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের লৌকিকার্থে এবং উহার প্রতিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির জন্য বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্ক যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

অপরদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে লৌকিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে কেবল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তি-প্রয়োগ অনুমানকেই (inductive and deductive inference) প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আধুনিককালে শব্দ বা আপ্ত-বাক্যকেও (testimony) কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক আর একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামক প্রমাণগুলির কোন স্বীকৃতি বা উল্লেখ দেখা যায় না। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পারমার্থিক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যও পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (sense-experience and reason) উপর নির্ভরশীল দেখা যায়। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ প্রজ্ঞাই (reason) সব বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ। কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং তদ্মূলক বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাবৃত্তি (thought and reasoning) ব্যতীত অন্যপ্রকার অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানলাভে অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় নাই। অবশ্য কতিপয় পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনে এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (intuition-এর) আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মনন বা বিচার বুদ্ধিরই একরূপ প্রকর্ষ বা একরূপ বৌদ্ধিক সহানুভূতি (intellectual sympathy)। উহা ঠিক ভারতীয় দর্শনসম্মত তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি নহে। উহাতে চিত্তশুদ্ধি ও যোগজ প্রত্যক্ষের কোন আভাস নাই।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে দর্শনের চরম উদ্দেশ্য ও জীবনে দর্শনের স্থান সম্বন্ধে যে পার্থক্য—উপসংহারে তাহার আলোচনা করা যায়। জড়বাদী চার্বাক-দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য জীবাত্মার বা মানবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। এ দর্শনের মতে মানুষ দেহেন্দ্রিয়-মনবিশিষ্ট আত্মা। তাহার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নশ্বর ও অল্পকাল-স্থায়ী। কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য। দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয় না। পরন্তু জীবাত্মা কর্মানুসারে এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে এবং তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করে। আত্মার কোন দেহের সহিত সংযোগের নাম জন্ম এবং সেই দেহ-বিয়োগের নাম মৃত্যু। জীবাত্মা অজ্ঞানবশে এবং কর্মানুসারে জীবনে নানাপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করে এবং শেষে মৃত্যুরূপ মহাকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে। সুখদুঃখবিচড়িত জন্ম-মরণের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইতেছে অজ্ঞান-বিরোধক তত্ত্বজ্ঞান। এরূপ তত্ত্বজ্ঞান সহায়ে দুঃখনিবৃত্তি বা পরম শান্তি ও আনন্দলাভ করাই জীবাত্মার মুক্তি। ভারতীয় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মুক্তি বা মোক্ষ মানুষের পরম পুরুষার্থ হইলেও ভারতীয় দর্শনে কাম, অর্থ ও ধর্মকেও পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং জীবনে সেগুলি লাভ করিবারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এসব পুরুষার্থ মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে এবং উহাদের সন্ধান ও ভোগ এরূপ-ভাবে করিতে হইবে যে তাহারা মোক্ষমার্গের পরিপন্থী বা হইয়া তাহারই সহায়ক হয়। অতএব ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য মানুষের মুক্তি

হইলেও উহাতে মানবজীবনের অন্যান্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি অস্বীকৃত বা অবহেলিত হয় নাই।

মানবের মুক্তিসাধক জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া ভারতবর্ষে দর্শনের সহিত জীবনের নিবিড় সম্বন্ধ দেখা যায়। জীবনাত্মেই দুঃখ পরিহার করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করিতে চাহে। কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং অবিমিশ্র ও অপরিচ্ছিন্ন সুখ, মানুষের অধিগম্য অন্য উপায়ে লাভ করা সম্ভব নহে। এজন্য দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র সম্ভাব্য উপায় ও অপরিহার্য সাধন। অতএব মানুষের পক্ষে দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখলাভের চেষ্টা যেমন অপরিহার্য, তেমনি দার্শনিক চিন্তা ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাও অত্যাবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান মানবের মুক্তির সাধন তাহা মাত্র বৌদ্ধিক বোধ (intellectual understanding) বা যুক্তি-তর্ক-লভ্য পরোক্ষ জ্ঞান নহে। উহা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সাক্ষাৎকার। মানুষ তাহার বহির্ব্যবহারে যেরূপ জড়জগতের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ করে, জীবনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আবার ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব জীবন যেমন পরিচালিত হয়, সেইরূপ দার্শনিক-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালিত করিতে হইবে। দর্শনে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়াই তাহাকে ভারতীয় সাহিত্যে "দর্শন" বলা হয়। দার্শনিক জ্ঞান শুধু বিচারের বস্তু নহে; উহা জীবনে অনুভূতির বিষয়, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্তা এবং জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

পাশ্চাত্য দর্শনের চরমলক্ষ্য কিন্তু জীবাত্মার স্বরূপমুক্তি বা মোক্ষ নহে। ইহাতে জীবাত্মা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে জীবাত্মার দেহাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। এরূপ স্থলে তাহার স্বরূপগত নিবৃত্তিরূপ বা অন্যরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির কোন প্রশ্নই উঠেনা। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের কোন কোন শাখায় জীবাত্মার আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ স্থলেও তাহার দেহমনের অতিরিক্ত সত্তা এবং দেহবিনাশের পর ঊর্ধ্বলৌকিক অস্তিত্ব ও মোক্ষলাভ প্রাপ্তির কথা মধ্যযুগে খ্রেটোর দর্শন ব্যতীত অন্যত্র স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এ জন্য এদব দর্শন শাখায় এই দেহে এবং এই জীবনে জীবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের চরম উদ্দেশ্য, বৃহত্তর জগতের জ্ঞানে সীমাবদ্ধ এবং উহা জীবাত্মার ঐহিক কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত বলিয়া মনে হয়। তারপর জীবজগৎ সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য উহা বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিতর্কলভ্য একরূপ পরোক্ষ জ্ঞান, উহাতে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের বা তাহার অপরোক্ষানুভূতির কথা বিশেষভাবে দেখা যায় না। ফলে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সকলের জীবনে সম্যক্ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের জীবন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সম্যকরূপে প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে তাঁহাদের দর্শন জীবজগতের আলোচনা ও ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং অনেকপ্রকার দার্শনিক মতবাদই সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা যেন বিচারবুদ্ধি দ্বারা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের বা সত্যের প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিয়া জীবনে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইতেন। অতএব আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে তত্ত্বসাক্ষাৎকার এবং তদ্দ্বারা জীবাত্মার মুক্তি, আর পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে জীবজগৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং তাহার দ্বারা মানবের ঐহিক জীবনের উন্নতি; ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক, আর পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ জীবজগতের বিচারসঙ্গত জ্ঞানপ্রদায়ক। অন্যভাবে আমরা একথাও বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য দর্শন প্রবৃত্তিমার্গের সহায়ক, আর ভারতীয় দর্শন নিবৃত্তি মার্গের নির্দেশক, পাশ্চাত্য দর্শন শ্রেয়াভিমুখী, ভারতীয় দর্শন প্রেয়াভিমুখী।

কাছাকাছি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

কখন হঠাৎ এলো ছায়া।
পশ্চিম দিগন্ত ঘিরে রঙ,
সূর্য কাঁপে থর থর
নক্ষত্রের মিটি মিটি চাওয়া,
এইবারে বুঝি কাছে পাওয়া,
বুঝি কাছে ফিরে পাওয়া দু'জনাতে মিল,
তোমার চোখের তারা তাই এত নীল।
সুললিতা ছিলে নাক তুমি,
উদগ্র স্নেহের মাঝে কামনার রোষ—
আমারো চোখের ক্ষুধা, জঠরের আশা!
প্রান্তিহীন দিবসের বহু দাবি-দাওয়া।
স্নেহ নেই, নেই স্নেহ-ছায়া।
অতন্দ্র-নয়নে কোথা আলো ঝিলমিল্?
ছিনু শুধু পাশাপাশি, ছিল নাক মিল।
তুমি-আমি একাকার
এ-ধার ও-ধার,
জনতা মিছিলে এক লাইনের সারি;
তারই মাঝে দুপুর গড়ায়।
সুললিতা, তুমি-আমি সেথানে কোথায়?
কখন হঠাৎ এল ছায়া·
মধ্যাহ্নের দীপ্ত রোদ চিলের পাখায়
এখন ঝিমায়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ক্রিকেট ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৪৭০ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জে ওয়েট ১১৫, ডি ম্যাকরু ১০৮, গডার্ড ৯০, এন্‌ডেন ৫০, ম্যাক্‌লীন ৫০) ও ২০১ (এন্‌ডেন ৭৭, ওয়েট ৫৯। ডেভিডসন ৩৪ রানে ৬ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৬২ (আর বেনড ১২২, ম্যাক্‌ডোনাও ৭৫, সিম্পসন ৬০) ও ১৭২ (৩ উইকেটে। ম্যাক্‌কে ৬৫ নট আউট)

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডবলউ গ্রাউট দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংসে ৬টা ক্যাচ লুফে এক ইনিংসে সর্ব্বাধিক ক্যাচ নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রাউট এই প্রথম টেস্ট খেলছেন।

অষ্ট্রেলিয়া : ৪৪৯ (বার্ক ১৮৯, ম্যাকডোনাও ৯৯, ম্যাককে ৬৩।টেক্সিড ১২ রানে ৪ উইকেট)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২০৯ ও ৯৯ (বেনড ৪৯ রানে ৫, ক্লিনি ১৮ রানে ৩ উইকেট)

কেপটাউনে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় টেস্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৪১ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার লিন্ডসে ক্লিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংসের খেলার শেষ তিনটে উইকেট পান পর পর তিনটে বল করে।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৯৫৭ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফাইনালে হায়দরাবাদ পুলিস ২-১ গোলে গত বছরের ডুরাণ্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে। এই জয়লাভের ফলে হায়দরাবাদ পুলিস একই বছরে রোভার্স ও ডুরাণ্ড কাপ জয়লাভের কৃতিত্বলাভ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত বছরেও এই দুটি দল ফাইনালে খেলেছিলো।

হায়দরাবাদ পুলিস সেমি-ফাইনালের ২য় দিনের খেলার শেষ সময়ে পেনাল্টি গোলে ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ডলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল প্রথমদিন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে ২য় দিনের খেলার শেষ মুহূর্ত্তে গোল দিয়ে ৩-২ গোলে জয়ী হয়।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা ২৮শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ যেন অকাল বোধন! ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত ক'রে একই বছরে আই এফ এ শীল্ড এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ কাপ জয়ী হ'ল। এই নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৪ বার আই এফ এ শীল্ড পেল এবং ৩ বার একই বছরে আই এফ এ শীল্ড এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল কাপ পেল।

পোলো ঃ

রতনদা পোলো ক্লাব ১৯৫৭ সালের ইণ্ডিয়ান পোলো এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

ডেভিস কাপ টেনিস ঃ

১৯৫৭ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া ৩-২ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে উপর্যুপরি ৩ বার ডেভিস কাপ জয় লাভ করেছে। অষ্ট্রেলিয়া একক দেশ হিসাবে ১৯২৩ সাল থেকে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে তারা অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। অষ্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত ১৫ বার (অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার) ডেভিস কাপ পেয়েছে। আমেরিকা ডেভিস কাপ পেয়েছে ১৮ বার।

এ পর্যন্ত (১৯২৩-৫৭) অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকার সঙ্গে ১৩ বার খেলেছে এবং উভয় দেশই ৮ বার ক'রে জয়ী হয়েছে। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে ১৪ বার ডেভিস কাপ খেলা হয়েছে। বিশ্ব যুদ্ধের দরুণ ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) খেলা হয়নি। এই ১৪ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা—এই দুটি দেশ। জয়ী হয়েছে আমেরিকা ৬ বার এবং অষ্ট্রেলিয়া ৭ বার। বিশ্ব লন্ টেনিস খেলায় ১৯০৮ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা আধিপত্য বজায় রেখেছে।

১৯৫৭ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় প্রথম দিন অষ্ট্রেলিয়া ২টি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়। ২য় দিন ডাবলস খেলায় জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ জয় লাভ করে। ৩য় দিনের বাকি ২টি সিঙ্গলস খেলায় আমেরিকা জয়ী হয়। মোট ৫টি খেলায় ফলাফল দাঁড়ায়—অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৩ এবং আমেরিকার ২।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের লীগ খেলায় বাংলা শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ৫টি খেলায় বাংলা দল পুরো ২৬ পয়েণ্ট পেয়েছে। পূর্বাঞ্চলের লীগ প্রতিযোগিতায় ৫টি প্রদেশ যোগদান করেছিল—বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা।

বাংলা এক ইনিংস ও ৪৭ রানে আসামকে, এক ইনিংস ও ৯৯ রানে উড়িষ্যাকে এবং এক ইনিংস ও ২৬ রানে বিহারকে পরাজিত করে।

পূর্বাঞ্চলের লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েণ্ট
বাংলা	৩	৩	০	০	২৬
বিহার	৩	২	০	১	১৮
আসাম	৩	০	১	২	৫
উড়িষ্যা	৩	০	১	২	৩

জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস ঃ

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের দলগত বিভাগ (বার্ণবেলাক ট্রফি) : বোম্বাই ফাইনালে বাংলাকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৫বার জয়ী হয়েছে।

মহিলাদের দলগত বিভাগ (জয়লক্ষ্মী কাপ) : ফাইনালে বোম্বাই ৩-১ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু'বছর জয়ী হয়েছে।

জুনিয়ার বিভাগ (রাথমুজম ট্রফি) : ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী দিল্লী ৩-২ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত করে।

পুরুষদের সিঙ্গলস : জি, আর দিভন (বোম্বাই) ২১-১৮, ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৭ পয়েণ্টে বি এস কাম্বাটাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : আর জন (মাদ্রাজ) ১৭-২১, ২১-১৪, ২১-১৫, ১৭-১৬ পয়েণ্টে মীনা পারাণ্ডেকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ (বাংলা) ২১-১৮, ২১-১৬, ২১-১৫ পয়েণ্টে জে সি ভোরাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলসে জয়ী হ'ন বোম্বাইয়ের খ্যাকার্সে এবং জি আর দিভন।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশীপ ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য ও জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা : উত্তর প্রদেশ ৩-০ খেলায় বাঙ্গলাকে পরাজিত ক'রে এই প্রথম খেতাব লাভ করে।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫ ও ১৫-৮ পয়েন্টে বিক্রম ভাটকে পরাজিত করেন।

পি এস চাওলা (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫ ও ১৫-৮ পয়েন্টে বিক্রম ভাটকে পরাজিত করেন।

কুমারী মীনা সাহা (উত্তর প্রদেশ) ১১-১ ও ১১-৪ পয়েন্টে মিসেস নীলিমা ভিন্নকে পরাজিত করেন।

জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ঃ

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১নং খেলোয়াড় ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৭ ও ১৫-৩ পয়েন্টে অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী প্রেম পরাশর (বোম্বাই) ১১-৬ ও ১১-৭ পয়েন্টে শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : আর ডি ভিমরালা এবং ডি এন ডোঙ্গাডে ১৩-১৫, ১৮-১৩, ১৫-১১ পয়েন্টে পি এস চাওলা এবং এ এল দেওয়ানকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী প্রেম পরাশর এবং শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়া (বোম্বাই) কুমারী মীনা সাহা এবং কুমারী ভোসলেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়া এবং সি ডি দেওরাস ১৫-৭ ও ১৫-১০ পয়েন্টে শ্রীমতী প্রেম পরাশর এবং ডি এন ডোঙ্গাডেকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : সুরেশ গোয়েল (উত্তর প্রদেশ) ১৫-১১, ৯-১৫ ও ১৫-১০ পয়েন্টে ডি কে খানকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস : কুমারী বাসন্তী (দিল্লী) ১২-৯ ও ১১-৮ পয়েন্টে কুমারী সুনীলা আপ্তেকে (মধ্যপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

সাউথ—ইষ্ট এশিয়া বক্সিং চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত প্রথম সাউথ-ইষ্ট এশিয়া বক্সিং চ্যাম্পিয়ানসীপস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ মোট ৯টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৫টি অনুষ্ঠানের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভারতবর্ষ ৩টিতে জয়লাভ করে এবং দুটিতে হেরে যায়। মোট ৯টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে ভারতবর্ষ পায় ৩টি, অষ্ট্রেলিয়া ২টি, ব্রহ্মদেশ ২টি, ফিলিপাইন ১টি এবং জাপান ১টি।

ভারতবর্ষের জয়লাভ

লাইট ওয়েট বিভাগ : সুন্দর রাও পয়েন্টে টি সুগী-মোরীকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিডল ওয়েট বিভাগ : হরি সিং প্রথম রাউণ্ডে টিনোকে (ব্রহ্মদেশ) নক্ আউট করেন।

হেভী ওয়েট বিভাগ : মাঙ্গে রাম পয়েন্টে এস এস ওইকে (ব্রহ্মদেশ) পরাজিত করেন।

ফ্লাই ওয়েট বিভাগের ফাইনালে দেবদানম এবং লাইট মিডল ওয়েট বিভাগের ফাইনালে বি ডি' সুজা পরাজিত হ'ন।

জাতীয় লন্ টেনিস ঃ

জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : উল্ফ্ স্মিমিড (সুইডেন) ৬-৩, ৬-২, ৪-৬, ৪-৬, ৬-৩, গেমে আর কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী জে বি সিং ৬-২, ৬-৩, গেমে কুমারী এল পাঞ্জাবীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : নরেশকুমার এবং শ্রীমতী কে সিং ৫-৭, ৬-৪, ৬-২ গেমে ডবল্‌উ নাইট এবং শ্রীমতী জে বি সিংকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নরেশকুমার এবং আর কৃষ্ণান ৬-৪, ৬-৪, ৬-২ গেমে ডবলউ নাইট এবং জে পিকার্ডকে পরাজিত করেন।

রাজ্য এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার ফলাফল : দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপস : পুরুষবিভাগ—১ম ইস্টবেঙ্গল (৬৮ পয়েন্ট), ২য় ইস্টার্ণ রেলওয়ে (৪৬ পয়েন্ট), ৩য় সিটি এ. সি (৪০ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ—১ম রেঞ্জার্স (৪৯ পয়েন্ট), ২য় সিটি এ সি (৪৫ পয়েন্ট), ৩য় ২৪ পরগণা (১২ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপস : পুরুষ বিভাগ—গুলজার সিং (ইস্টার্ণ রেলওয়ে)। মহিলা বিভাগ—বারবারা এথনি (রেঞ্জার্স)।

সাহিত্য সংবাদ

রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত, সম্পাদনা : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁর হাতে যে বিষ্ণু-অবতার নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার হইবে না এটা আশা করা যেতে পারে। বিশেষতঃ তিনি বাল্মীকি রামায়ণ নিয়ে ঘাঁটেননি। কৃত্তিবাসের কীর্তিতেই কীর্তিমান হয়েছেন এবার। এক সময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ঘরে ঘরে পড়া হ'ত। সে বই ছোলো অক্ষরে ছাপা। দামও সস্তা। ধনী, দরিদ্র, সবার দুয়েই তার স্থান ছিল। আজ তার সেদিন নেই। আমাদের রুচি বদলেছে। বইয়ের ছাপা বইতে এখন আর মন ওঠে না। আমরা সৌখীন হয়ে উঠেছি। তাতেই প্রকাশকেরা মুখোপাধ্যায় সুসংস্কৃত একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের লোভন সংস্করণ প্রকাশ করে কৃত্তিবাস পাঠকের খুসী করেছেন। হরেকৃষ্ণবাবু প্রস্তাবনাতে কৃত্তিবাসের যথাসম্ভব-আদ্যপরিচয় দিয়ে কবির সঙ্গে পাঠকের অন্তরঙ্গতা স্থাপনে সাহায্য করেছেন। এই সুদৃশ্যিনাসুন্দর সুচীন গ্রন্থখণ্ডে আত্মপ্রকাশ রামায়ণখানি প্রথম দর্শনেই চক্ষুকে মুগ্ধ করে। উপরন্তু তাহাতে পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থে লিখিতেছেন ছুটীৎ ভূমিকা হইতে ও বৃহত্তর ভারতে রামায়ণের বিচিত্র রূপ ও তার প্রভাব নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সেইও এর একটি বিশিষ্ট সম্পদ। রামায়ণ-প্রবেশের সোনার চাবীটি তুলে দিয়েছেন তিনি আমাদের হাতে। বইখানিতে এক বর্ণ ও বহুবর্ণ মিলিয়ে মোট ছেষট্টিখানি ছবি আছে। ছবিগুলি একশিল্পী শ্রীযুক্ত রায়ের আঁকা। সবগুলিই সুচিত্রিত হয়েছে বলতে পারলে সুখী হতুম, কিন্তু তা হয়নি। প্রথম চিত্রেই মহর্ষি বাল্মীকির মধ্যে বেশ দেখা যায় ভক্ত কবিকুলগুরুর ছবিখানি চমৎকার বলা যেতে পারে। এর মধ্যে পল্লী বধূদের মতো বাস্তব ও কল্পনার দুটি বিভিন্ন রূপ এসে সংমিশ্রিত হয়েছে। কিন্তু আর না। চিত্র সমালোচনা করতে বসলে পুঁথি বেড়ে যাবে।

[প্রকাশক : সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা ১০৬, মূল্য ৯৲ টাকা]

নরেন্দ্র দেব

কর্মবীর রাসবিহারী : অধ্যাপক শ্রীবিনয়বিহারী বসু

লেখক খ্যাতনামা বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ছোট ভাই। প্রবর্তক সংঘের শ্রীঅরণচন্দ্র গুহ পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। রাসবিহারীবাবুর জীবন—বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ভারত হইতে পলাইয়া জাপানে চলিয়া যান—সেখানে বিবাহ করেন ও সারাজীবন বাস করেন—শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে আজাদহিন্দ বাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁহার জীবনেতিহাস জাপানের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিহাস। বিরাট পুস্তক, সে হিসাবে মূল্য সুলভ। রাসবিহারীর বন্ধু ও সহকর্মী উত্তরপাড়ানিবাসী সম্প্রতি-স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা সত্যই মূল্যবান। বাংলা দেশে এখনও রাসবিহারী বসুর কোন মূর্তিস্তম্ভ নির্মিত হয় নাই—তাঁহার দান লোক জানুক এবং তাহা জানিয়া একজন মহাপ্রাণ বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক—তবেই জাতিকে প্রকৃত স্বাধীন জাতি বলিয়া লোক মনে করিবে।

[প্রকাশিকা : শ্রীমতী ইলা বসু, গোবো, মানভূম। মূল্য ৫৲ টাকা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার প্রবাবন : মহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত, চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও ভক্ত। তাঁর লেখাতে যে অনেক নূতন কথা, ভাববার কথা পাওয়া যাবে তা বলা বাহুল্য। "প্রবাবন" অর্থাৎ প্রগতি। মহেন্দ্রবাবু বাংলা ভাষার প্রগতি অর্থাৎ উন্নতির কথা নানা দিক দিয়া চিন্তা করিয়াছেন।

টোলে যে ভাবে পড়ান হয় মহেন্দ্রবাবুর তাহার কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন। তিনি মনে করেন, টোলের ছাত্রগণের তুলনা-মূলক আলোচনা করিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। মৌলিক গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে উদ্বোধিত করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় অনেক সময় নূতন পারিভাষিক শব্দ প্রবর্তন করিতে হয়। যদি উপযুক্ত সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ না পাওয়া যায় তাহা হইলে অনেক সময় ইংরাজী শব্দ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। ইংরাজী শব্দ আত্মসাৎ করিবার যে নমনীয়তা বাংলা ভাষায় আছে। বৈজ্ঞানিক ও

কারিগরী বিদ্যার ইংরাজী বই হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার বিস্তৃত কার্য্য পড়িয়া আছে। এই কার্য্যে শৃঙ্খলার জন্য একটি অনুবাদ-সংস্থা করা প্রয়োজন। স্কুলে বাংলা ব্যাকরণ প্রচলন করিবার চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ভাল করিয়া পড়িলে ব্যাকরণের প্রয়োজন সাধিত হইবে। সকল ছাত্রের একটু সংস্কৃত জানা প্রয়োজন। নচেৎ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বাংলা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে সত্য। কিন্তু আরও অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হইবে।

গ্রন্থ-লিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সম্পাদক একটি টীপ্পিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এইরূপ টীপ্পিকার গবেষণার পথ সুগম হয়। সম্পাদক মানদাবাবুর প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুন্দর। এইরূপ বিতর্কমূলক বিষয় কি এবং পণ্ডিতগণের মতের বিভিন্নতার কারণ কি তাহা বুঝিতে সাধারণ পাঠকের কোনও অসুবিধা হইবে না। গবেষণাগুলি নীয় মতামতের দ্বারা ভারাক্রান্ত না করিয়া মানদাবাবু ভালই করিয়াছেন।

প্রকাশক : শ্রীমানদাপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক মহেন্দ্র পাবলিসিং কমিটি, মূল্য—২৲ টাকা এবং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৯

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রত্নম্ : জগদীশ সেন প্রণীত

সুদূরাতীত কাল থেকে মানব সমাজে রত্নধারণ প্রচলিত হয়ে আসছে। নির্ব্বাচন নির্দ্দোষ না হোলে রত্ন ধারণে বিপত্তিও ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাপারেও নির্ব্বাচন সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। গ্রহ কুপিত হোলে শান্তি করবার জন্যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট রত্ন ধারণ করলে ফল শুভ হয় কিন্তু সে রত্ন দোষযুক্ত হোলে বা সুনির্ব্বাচিত না হোলে দৈহিক মানসিক এমন কি বৈষয়িক বিপর্য্যয় পর্য্যন্ত ঘটে থাকে শেষ পর্য্যন্ত জীবন নাশও হয়। কতকগুলি ধাতু সমষ্টি দ্বারা আমাদের জৈব দেহ গঠিত, রত্নের উপাদানও ধাতব বস্তু। এজন্যে দেহের সঙ্গে রত্নের যোগসূত্র আছে। এর রশ্মিময় বিশেষ ক্রিয়া যখন ধারণকারীর দেহে প্রবেশ করে রাসায়নিক শক্তিক্রিয়া আনে, তখন তার দৈহিক বিকার প্রদর্শিত হয়। রত্নবিজ্ঞান সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে বহু গবেষণা হয়ে গেছে, বাংলাভাষায় দু'চারখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে নবরত্ন, উপরত্ন, রত্নধারণ-বিধি প্রভৃতি প্রসঙ্গে যেভাবে বিশদ আলোচনা আছে, তা প্রশংসার্হ। রত্ন সম্পর্কে বিদেশী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দুর্লভ নয় কিন্তু বাংলাভাষায় একান্ত দুর্লভ। গ্রন্থকার সেই অভাব দূর করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত মতবাদ গবেষণামূলকভাবে অভিব্যক্ত হওয়ায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। রত্ন-ব্যবসায়ী ও জ্যোতিষীরা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। আমরা গ্রন্থখানির প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স—৭১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩৲।]

উপানন্দ

আর এক দিন : আশাপূর্ণা দেবী

তেরটি গল্পের সংকলন 'আর এক দিন'। ছোট গল্প রচনায় বাঙলার লেখিকাগণ বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। প্রথাত লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তার ব্যতিক্রম। ছোট গল্প রচনায় তিনি কি রকম অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা যে তাঁর গল্প পড়ে নি তাঁকে বোঝান দুষ্কর। নারীর অন্তর এক রহস্যময় কুয়াশা জালে আচ্ছন্ন। তার পরিচয় কিন্তু প্রকাশ করেছেন লেখিকা। আহিম, অসতর্ক, আমায় ক্ষমা করো, কংকাবতীর ইতিকথা, প্রগল্ভা, উৎসব, পাপীর বালা, অমাচরে, এই কয়টি গল্পে নারী-হৃদয়ের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখিকা পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরেছেন তা সত্যই অসাধারণ। নারী মনো বিশ্লেষণে লেখিকা মোপাসার মত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এ-গল্প সংকলনের বিশেষ আদর হবে আশা করি।

[প্রকাশক : কে গুপ্ত, ৭৭ বেলতলা রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য ৩৲।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বহুরূপী : শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত (কৌতুক কাহিনী সংগ্রহ, কেবলমাত্র সাধারণদের জন্য)

আলোচ্য গ্রন্থে চৌদ্দটি কৌতুক-কাহিনী আছে। প্রত্যেকটি কাহিনী পড়তে পড়তে শুধু মন ভরপুর হয়ে ওঠে না, হাস্য সংবরণ করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। কৌতুক সাহিত্য রচনার ইতিপূর্ব্বেই গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মৌলিক রস-ঘাতসহ কাহিনী সমলিত 'বহুরূপী'র ভিতর গ্রন্থকারের নিখুঁতশৈলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয়। এরূপ অনাবিল আনন্দের মানসিক খোরাক চিত্তের প্রাণি দূর করার পক্ষে সহায়ক। শুধু শিশু সাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রন্থকারের প্রতিভা-রশ্মি বিকীর্ণ। তাঁর জয়ী অগ্রযাত্রাভাবেই চলেছে।

ছত্রকথার নায়ক শাদনীর ছাতা হারিয়ে গিয়ে কেমন করে রহস্যের একখানা ঘুড়ি হাতে ধরে গেল, সিনেমা দেখতে গিয়ে চিত্রতারকা হবার কল্পনায় বিভোর মিথিরাম ভৃত্য শেষে কেমন করে এ্যাডভেঞ্চারে চড়ে একদিনের জন্যেও অতুল সম্মানের অধিকারী হোলো, গালে পানতর্ত্তি নিরক্ষরী চৌধুরী গিন্নীর আদেশে কিভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেন পকেটকাটা সমিতিতে, পাড়ার গুলক খুড়ো গিন্নীকে ইলিশ মাছ খাওয়ানোর জন্যে বদ্ধ প্রতিজ্ঞ হয়ে বাগবাজার ঘাট থেকে ফেরার পথে কিভাবে বিপন্ন হ'য়ে পড়লেন, সিনেমার

যাওয়াটা কেন সম্ভবপরের মধ্যেই পড়ে, এবং তখন প্রযুক্তার সরলতাটুকুই উপভোগ করে ছাত্রজীবনের উৎসাহ-বিহ্বল চোখে আমরা যেমনি হাসিতে ভরে উঠতাম তখন উৎসাহিত করেছেন। এরকমের গল্প প্রেমের সম্বন্ধে সমাদৃত হয়ে থাকবেন অনাগতকালেও। উত্তরের উদ্বোধন, ফেরারি, ছায়ের মা, ফাগুনী, হাড়ি, প্রতিবেশিনী, মনস্তত্ত্বের মতকথা, চৌপ প্রভৃতি গল্প কৌতূহলোদ্দীপক। অবকাশের অবসরে, কলরাগাক্ষণে, দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের পরবর্তী নিস্তব্ধ মুহূর্তে, বাস্তবতা জগতের অবসরহারে দেহ ও মন যখন ভেঙে পড়ে, তখন অমিলবাবুর 'বহুরূপী' যে মৃতসঞ্জীবনী বা টনিকের কাজ করবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। নাবালক ও সাবালকদের জন্যে রচিত তাঁর বহু গ্রন্থ রসোত্তীর্ণ কথা ও সাহিত্যের নিদর্শন বহন করছে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার ; শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "মন্ত্র যদি মিথ্যা হয় টাকা"—১৲, "মীরকাশিম—মহারাণী ভবানীর জীবনপ্রভাত—রহস্যাকাশে" (২য় সং)—৩৲
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত নাটক "আনন্দী গার্লস্ স্কুল" (২০শ সং)—১৷৷০
আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত গল্পগ্রন্থ "পূর্ণপাত্র"—২৲
বিজয়লাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩য় সং)—২৷৷০
ঐ প্রণীত ইতিহাস-সম্বলিত বাংলা "যোধবাঈ চরিত"—১৸৲,
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রবীন্দ্র-সৃষ্টি"—৩৷৷০
ঐ প্রণীত ভট্টাচার্য্য-সম্বলিত "ইয়ার্স অব হি ঈ"—১৷৷০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পঙ্কজ"—৩৲
শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত "শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনচরিত"—৪৷৷০
রণজিৎকুমার সেন প্রণীত "নাল ফুলের সাড়ি"—৩৷৷০
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য "সুখী রাজপুত্র"—১৷২৷,
"আর্যদের বৈঠা"—১৷২৷
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত শিশুপাঠ্য "দুই বৈঠা"—১৷২৷,
"পাখোড়ার দেশে"—১৷২৷, "আমাদের গ্রামে"—১৷৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : প্রভাতেন্দু সরকার মজুমদার　　শেষ মিনতি　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

ভারতবর্ষ

ফাল্গুন—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

অরবিন্দ-কাব্যে প্রেম

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। কিন্তু বেশীভাগ লোকের কাছেই সেই পুরুষ—সত্তম, যোগী ও দার্শনিক অরবিন্দ, কর্মী ও তাপস অরবিন্দ। এর পিছনে ও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে যে এক আদি ও অকৃত্রিম কবি-অরবিন্দও বসে আছেন সে কথা আমাদের অনেকেরই মনে থাকেনা, কারণ তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের অপূর্ব কাব্যগুলির কথা আমরা ভুলতে বসেছি এবং ইদানীং কালের মহাকাব্য "সাবিত্রী"র নাম শুনলেও এবং কিছু কিছু উল্টেপাল্টে দেখলেও সে বিষয়ে আমাদের কোন সুষ্ঠু ধারণা নেই। অনেককেই ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করতে দেখেছি যে "সাবিত্রী" কাব্য নয়, সাহিত্য নয়, রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি নয়, রক্তমাংস কামকামনার বাইরে তামকাস্থিময়ী স্বপন-মায়ার উর্দ্ধে এ এক ঘনীভূত দর্শননির্যাস, শুষ্কগম্ভীর আধ্যাত্মিক মননের অতিকথন্। রূপ রস রং রেখার পূজারী, 'পাখন'-বিলাসী—সৌন্দর্য্যপিপাসু রসবেত্তা মানুষের পক্ষে এই ধরণের অতীন্দ্রিয়ধর্মী কাব্য দুর্বোধ্য, অনধিগম্য, দুরতিক্রমনীয়।

শ্রীঅরবিন্দের নিজের জীবনই (যেটুকু বাহিরে দেখা যায়) একটি মহাকাব্য। জন্ম হয়েছিল তাঁর শ্রীমতাং

গেছে, উৎকট ইংরাজী হাবভাব শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশে—যদিও আর এক ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবারের (পূজনীয় মাতামহের) স্পষ্ট ছাপ পড়েছিল তাঁর মনের উপরে। বাল্য ও কৈশোর কাটলো বিদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় উজ্জ্বল মোহে, যৌবন কাটলো বরোদার বাণীর সাধনায় অন্তরের ধ্যানের নির্দেশে। যৌবনোত্তর দিনে সেই ধ্যানের ভাষা নিবিড় হয়ে নামলো মনে, হলেন তিনি কর্মযোগী, ভাব-সমাহিত, ব্রহ্মবান্ধবের মানসসরোবরের অরবিন্দ, বহ্নির মত বহ্নিগর্ভ। কবির ভাষায় বলতে গেলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের রণক্ষেত্রে শুরু শুরু মেঘমন্দ্রে সংগ্রামের সংঘাত দিকে দিকে জেগে উঠেছিল। সেদিনের খর মধ্যাহ্নের তাপে তাঁকে একতারা ফেলে দিয়ে ভেরী নিতে হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রের ধর্মক্ষেত্রে সারথির মত রথ ছুটিয়ে যেতে হয়েছিল আলোড়িত তপ্তশ্বাস নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে জয়পরাজয়ের আবর্তে। সেদিনের বহ্নিমান যৌবনের অরবিন্দকেই প্রৌঢ়প্রহরের রবীন্দ্রনাথ 'লহ নমস্কার' বলে অর্ঘ্য দিয়েছিলেন, চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন এই সেই মানুষ—যাঁর কথা লোকে বলবে যুগযুগ পরেও। তারপর নামলো আরো গভীরতর ছায়া, কারাগারে দর্শন পেলেন তিনি তাঁর, যাঁর আবির্ভাবই হয়েছিল আর এক কারাগারে। বৃহত্তম পরিণতির জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন, গভীরতম অনুভূতির জন্য এবং সেই পথই তাঁর মর্ত্য জীবনের শেষ চল্লিশ বছরের পর্ব। এই সত্যসন্ধ মানুষই কিছুদিন আগে বলেছিলেন—The agnostic was in me, the atheist was in me, the sceptic was in me···সংশয়ী মন, বিরোধী মন, অবিশ্বাসী মন আমাকে তাড়া করে, কিন্তু আমার মনে এই বিশ্বাস ছিল—এই যে বেদ বেদান্ত গীতা, এই যে অপরূপ যোগ—এর মধ্যে কোথাও একটা প্রকাণ্ড সত্য আছে. তাই আমি ভগবানকে বললুম—হে আমার পরম দেবতা, যদি তুমি থাকো, আমার মনের কথা জানতেও তোমার বাকী নেই—আমি ত নিজের জন্য কিছু চাইছি না—ধন মান পুত্র পরিজন—যশ ঐশ্বর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি—আমায় তুমি শক্তি দাও—এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার শক্তি—এদের আমি ভালবাসি, এদের মধ্যেই কাজ করতে চাই।···

এই মহাজীবনের মহাসরণের একটি দিক হচ্ছে তাঁর কাব্য। সাধারণ পাঠকপাঠিকার পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ-কাব্য বোঝার যে কয়েকটি বিশেষ বাধা আছে তার সম্বন্ধে আমি আলোচনা করেছি শারদীয়া 'সংহতিতে' সম্প্রতি প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজিজ্ঞাসার রূপ" নামক প্রবন্ধে। সেইগুলির পুনরালোচনা না করেও একথা বলা যায় যে—প্রথম বাধাই হচ্ছে যে সেগুলি ইংরাজীতে লেখা এবং সেই ক্লাসিকাল রচনাশৈলী ও বাচনভঙ্গী আজকের দিনে ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে। তাছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষ করে গ্রীকো-লাতিন সাহিত্যের পরিবেশ. পরিচয় ও পরিভাষা দ্বারা অরবিন্দ-সাহিত্য প্রভাবিত। সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর কাব্যের যতটুকু প্রকাশ বাইরে, তার চেয়েও গভীরতা ভিতরে। উর্দ্ধতর ভাস্বর মানসের স্তরে যে কবি আসীন, তিনি জীবন সমস্যার প্রতি যেরূপে দৃষ্টিপাত করবেন সে দৃষ্টিপাত দৈবস্তর থেকে জীবনকে যিনি দেখছেন—সে কবির মূল্যবিচারে বিভিন্ন হবেই। তাই অধিকারী ভেদে যে কবি যে স্তর থেকে এই রূপবান জগৎ ও তার ঘটনাপঞ্জীকে দেখেন, তারই মূল্য তিনি দেন তার প্রকাশে। একদিকে সংখ্যা-গণনার জীবন (Quantitative), আর একদিকে মানসলোকের অন্তরঙ্গ রূপ (Qualitative)—এরই মাঝে কবির হৃদয় মনের বীণা যন্ত্রটি গান গেয়ে যাচ্ছে—এ যন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জড়যন্ত্র নয়, প্রাণবান। এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে—একে নিয়ে প্রত্যেক কবি তাঁর দর্শন ও অনুভূতি ভেদে নিজের জগৎ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন—সেই জগৎ স্থির হয়ে নেই, কোথাও গিয়ে সে থামে না—সে এগিয়ে যায়—সে ক্ষণে ক্ষণে নূতন জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করে, নব বিশ্বামিত্রের মত নূতন ভাবস্বর্গ।

সব যুগে সব দেশে সৃষ্টির আদিমতম দিন হতে নরনারীকে ঘিরেই তার প্রাণ-জিজ্ঞাসা, কাব্য-জিজ্ঞাসার রূপে ঝঙ্কার দিয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে যিনি এক, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত, তিনি বসলেন তপস্যায়—যুগযুগ ধরে কালকে অতিক্রম করে, সীমাকে লঙ্ঘন করে রূপ ও অরূপের বিরাম সমুদ্রতটে—মহাকালের সে তপস্যা; এই যে সর্বানুভূ—তাঁরও মনে একদিন ইচ্ছা জাগে আমি দুই হবো, খেলার সহচর চাই, লীলার

সঙ্গিনী চাই। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর যে শক্তি কাজ করে যাচ্ছে, নিঃশব্দে অলক্ষ্যে তাঁর যে কল্পনা রূপ নিচ্ছে, ছন্দায়িত হচ্ছে, তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি লীলায় রসবেন—যা ছিল অসীম তাকে মূর্তি দেবেন সীমায়—রূপ ও নামের বন্ধনে, যা ছিল মহৎ, বৃহৎ, ভূমা—তাকে তিনি একদিকে গুটিয়ে নেবেন অণুতে, আবার ছড়িয়ে দেবেন বিশ্বাতীতে। এই লীলাভিরাম এক থেকে হলো দুই, দুই থেকে হলো বহু। যা ছিল নিখিল বিশ্বের মাঝে সবিশেষ, অজ্ঞাতভুবন ভ্রূণ মাঝে সুপ্ত, সকল চেতনায় সুপ্ত, তাই বিশেষ হয়ে রূপ নিলে মাতৃ-জঠরের অন্ধকারে, পিতৃবীর্য্যে সিক্ত হয়ে, কামনায় বহ্নি-স্নাত হয়ে। ভূমিস্পর্শে সেই অঙ্কুর মধ্যে জেগে উঠলো বিশেষ দরদ, স্নেহ, প্রীতি-ভালবাসা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রীতি-ইচ্ছা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় দাঁড়ায়। প্রেম কাকে বলে, তার সংজ্ঞা কি, সে শুধু দেহের এণ্ডোক্রাইনের উচ্ছ্বাস, না Imbalance, না ব্যক্তিস্বরূপের এক অভাবনীয় রহস্য, না শঙ্কর-বেদান্তে'র ভাষায় 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত' ভাব ও ভাবনার জোড়াতালি, না মানসিক বৈকল্য—সে বিচার মুলতুবী রেখে এই কথাই বলা যায় যে কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়ই হচ্ছে প্রেম। রক্তে যখন প্রথম কোটালের বান ডাকে, কবির হৃদয়ের প্রথম তারুণ্যের বিস্ময়ে আধোচেনার আলোয় ভালোবাসার মাধুরী কাঁচাজীবনের পেলব রূপটি ধরিয়ে দেয়—তারপর প্রতিদিনের সংঘাতে সে আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তার ঘোমটা ঘুচিয়ে শক্ত ধরণীকে দেখে—তার স্বপ্ন হয়তো ছুটে যায়—অতি সৌভাগ্যবান কয়েকজন কবির কাছেই দেহের সীমানা পার হয়ে প্রেম হয়ে ওঠে প্রণাম। একেই আমরা সাধারণতঃ নামকরণ করেছি Platonic Love—অর্থাৎ প্লেটোর Eros তত্ত্ব যে প্রেমতীর্থের পরিক্রমার ছয়টি স্তরের কথা বলেছিলেন সেই বেদনাবিধুর আবেগ-মধুর স্তর পেরিয়ে যারা দেহ সৌন্দর্য্যকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রতীক রূপে গণ্য করে লীন হয়ে প্রেমের দিব্য অনুভূতিতে পৌঁচেছেন। পরমসুধী গ্রন্থের বন্ধু অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের মানস-লক্ষ্মীকেও বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের যে প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কার যে প্রেম, ক্রবাদুর প্রেম প্রভৃতির সহিত তুলনা করেছেন। প্লেটোর সিম্পোসিয়াম অবশ্য এই অতিমানুষী প্রেমকে "Union with the eternal and Supercosmic beauty" বলা হয়েছে। এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীই কীটসে পেয়েছে সমবেদনা, শেলীতে উচ্ছ্বাস, বাইরনে কামুকতা, ওয়ার্ডসওয়ার্থে প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য, রবীন্দ্রনাথে স্পর্শ ও স্পর্শাতীতের মাঝের রূপ, অরবিন্দে রূপান্তর। তাই অরবিন্দ কাব্যে এই প্রশ্নই ওঠে—

Many boons the new years make us
But the old world's gifts were three
Dove of Cypris, wine of Bacchus
Pan's sweet pipe in Sicily
Love, wine, song, the core of living
Sweetest, oldest, musicalest
If at end of forward Striving
Theselife's first also proved best.

সেই সুন্দরী সুরা, আর সুর, প্রেম, মদিরা আর গান জীবনের ঊর্ধ্ব অভীপ্সায় এই প্রথমগুলিই যদি শ্রেষ্ঠ হোত। তার পরের প্রশ্নই হচ্ছে—এইগুলিকে বদলে নেওয়া যায় কিনা—মায়ামনের যাদুদণ্ড স্পর্শে রূপান্তরিত সত্তায়। Platonic Loveএ আছে না পাওয়ার বেদনা এবং সেই বেদনাকে মানসলোকে ভোগ করা। কিন্তু অরবিন্দ প্রেম-কল্পনা বেদনাবোধের ঊর্ধ্বে রূপান্তরিত প্রেম।

তুমি যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন

এই ঋণ-শোধের দাবী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, মনের মাধুরী মিশায়ে তিনি প্রেমের কাব্য রচনা করে যাচ্ছেন, তাই বাস্তব জীবনে তাঁর প্রেমের কবিতা সংশয়ের দোলায় দুলছে—কখনো ঝুঁকছে অবাস্তবের দিকে—কখনো বাস্তবে। এর পরিপূর্ণ রূপ মহুয়ায়—রবীন্দ্র প্রেমের কাব্যে রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা—এই 'মায়া'কেই কবি নিবিড়-ভাবেই উপলব্ধি করেছেন—যে প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের alchemyতে বিশ্বাসী 'মূল্যহীনেরে

সোনা করিবার পরশ পাথর হাতে আছে তার'—এও রূপান্তর, কিন্তু এ রূপান্তর objectএর। অরবিন্দ কাব্যে প্রেমের যে রূপান্তর সেটি object ও subject দুইএর মিলিত রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের যে পাওয়া সেটা Emotionএর পাওয়া—দ্বিতীয় মানসপ্রতীকে পাওয়া নয়—অর্থাৎ বিশুদ্ধীকৃত ভাব (purified emotion) সেখানে অস্পষ্ট। বাড়িঘরের প্রচুর পরাগে, মাধবিকার সুরভিসোহাগে, নবজীবনের বিপুল ব্যথায় শ্যামাসুন্দরী জাগছেন। প্রেমের এই উন্মীলনের মাঝে উদ্‌গ্রীব দর্শনের চক্ষু থেকে অন্তরলোকের দিকে ছুটেছে—এর মধ্যে রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসি আছে, বিস্ময়ের জাগরণ আছে, শুরুতার তপোভঙ্গ আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে কাব্য-কুচেলির এক অস্পষ্টতা, পাওয়া না পাওয়ার এক বেদনা

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি

মাধবের জন্য মাধবীর দ্বিধা ঘুচছেনা, আমরা দেখছি

এখানে অতিথি আসে ভয়ে ভয়ে
ছায়ারূপে
এসেছে কম্পিত মোর দ্বারে
কতো রাতে চৈত্রমাসে
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
শঙ্কিত করেছে আসি আমার গুণ্ঠনখানি
কাঁদায়েছে সেতারের তার

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, অপরূপ কবি—নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত তাকে তিনি বাঁশীতে ধরছেন—তাই তার মধ্যে নৃত্যছন্দ আছে, বিচিত্র-ভঙ্গী আছে, আলোছায়া আছে, জোয়ার ভাঁটা আছে, পাওয়া না পাওয়ার দোলা আছে—প্রেমের ভ্রান্তী-স্থিতিতে মিলন নেই। অরবিন্দের প্রজ্ঞাদানলে প্রেমের যে প্রত্যয় উদ্ভাসিত সে প্রত্যয় স্থির—তিনি অসংশয়িত চিত্তে বলছেন—তুমি আছ, আমি আছি। তাঁর দৃষ্টি কবি ও সাধকের পিছনে পূর্ণবোধের মিলিত দৃষ্টি। এখানে 'হয়তো' নেই

বিস্মৃত প্রদোষে হয়তো দিবে সে জ্যোতি
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপনের মূরতি

রবীন্দ্রপ্রেম-কাব্যেও যে প্রেমের অপরিমিত প্রতীতি নেই তা নয়—ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না মেগেও তিনি নির্ভয়ের গান গাইছেন, পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে বাসরযাত্রি রচনার কল্পনা ত্যাগ করছেন—কিন্তু তাঁর অপূর্ব মাধুর্য ভাবের চাকচিক্যময় সম্মোহের মধ্যে কল্পনাপ্রসূত মন একটা অবাস্তব আধার (content) খুঁজে নিচ্ছে—তাকে জীবন-দেবতা বলি, বা মানসসুন্দরী বলি, বা গ্যয়টের ভাষায় The Eternal Faminine lead us on and upwords বলি তাতে কিছু যায় আসে না। প্রথম যুগে যখন তিনি 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ' 'অচ্ছোদ সরসী-তীরে রমণী যেদিন'··· এ সব কবিতা লিখলেন তখন তাঁর প্রেমকে দেহগত বলে তিরস্কৃত করা চলে, কিন্তু সে প্রেম বলিষ্ঠ, প্রকৃতির অনুগত। কিন্তু পরের যুগে এই বলিষ্ঠতা মাধুর্য্যের মধ্যে হারিয়ে গেলো। অরবিন্দ প্রেমকাব্য ভাব ও ভাষার বাহন হিসাবে অতো কারুকার্য্যময় না হলেও তার বলিষ্ঠরূপ হারায়নি—যা বলতে চেয়েছে স্পষ্ট করেই বলেছে। স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে দেহ ও দেহাতীতের মধ্যে যে রূপরেখা টানা হয়েছে সে ভেদ মূল্যায়নে ও রূপায়নে, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যবাদ দিয়ে নয়। তার মন্ত্র হচ্ছে—সর্বং খল্‌ ইদং—সব নিয়েই মানসের প্রকাশ—তার মূল্য প্রয়োগ নৈপুণ্যে, কারণ পরিপূর্ণ জীবনই যোগ—আর যোগ কর্মের কৌশল। সত্তার আবরণ হিসাবে দেহ নিন্দনীয় নয়, লজ্জার ত নয়ই। দেহের কৃত কর্তব্য কর্মগুলিও নিন্দনীয় হতে পারেনা—শুধু কর্মকে নিবেদন করে দিতে হয়, সত্তাকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি দিব্যের আধার এই বোধের জন্য সংযমের নিয়মের নিষ্ঠার প্রয়োজন—কিন্তু নারী নরকের দ্বার নয়, মোহের নয়, ত্রী ও হ্রীর প্রতীক্। নারী পুরুষের কাছে যা, নারীর কাছেও যে পুরুষ তাই—দুইএর মিলিত জীবনই যে প্রেমের পরিপূর্ণ মূর্তি, এখানে কামী ও কামিনী অবান্তর। তপঃপ্রেত সাধনার দ্বারা, সংযমিত মনের দ্বারা, আত্মনিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা তুমি নিজেকে বদলে নাও—তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, তোমাদের মিলিত জীবনে প্রত্যেক কর্মে ভাগবত জীবনের ছন্দ প্রকাশিত হোক্, ব্যাপ্ত হোক্। আর সেই মিলিত জীবনের রূপ কি হবে, তার প্রকাশ তোমার নিজের সত্য দৃষ্টিতে, নিজের বোধিদীপ্ত জীবনের অখণ্ড অনুভূতিতে।

আমাদের দেশে বিবাহের মন্ত্রে আছে তোমার জীবন আমার হোক, আমার জীবন তোমার হোক। দুইজনেরা তাতে যোগ দিয়েছেন—উভয়ের মিলিত জীবন ভগবানের হোক্। অরবিন্দ প্রেমতত্ত্ব এই সবশেষের প্রশ্ন নিয়েই আরম্ভ করলে—উভয়ের মিলিত জীবন ভগবানের —তার পরে, আমার ও তোমার—এটা হচ্ছে সোহং থেকে অহং এ আসা—এবং সে আমি বড় আমি। অয়মহং ভো: যিনি তিনিই ভূতে ভূতে বিভক্ত—কাকে বলবো, মায়া, স্বপ্ন, মরীচিকা, মিথ্যা, মতিভ্রম। মানুষের মন সব সময়েই অনঙ্গবাণ ব্রণ খিন্ন—শুধু মুখ ফেরালেই দেখা যায় যে যিনি মদন মোহিত তিনিই মদনমোহন, যিনি সবিশেষ তিনিই অবিশেষ।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্ত এই প্রেমা হইতে
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভগবতে

অরবিন্দ প্রেম-কাব্য প্রথম যুগে গতানুগতিক ভাবে মেদগত হলেও ঠিক দেহাতীত কাব্য নয়, তথাকথিত Platonic ও নয় বা রবীন্দ্রনাথের মত নাগরী, কামরী, পিয়ালী, দিয়ালীর রূপবর্ণনাও নয়। এ হচ্ছে প্রেমের মুক্ত রূপ, দেহকে সর্ব্বস্ব করে নয়, ছেড়ে দিয়েও নয়, রূপান্তরিত করে, যেখানে রক্ত তরঙ্গের মত কলরবে বাণী ভেসে যাবে না, আবার আসল জিনিষকে আড়াল করে আদলের বিকৃত স্বপন আকাঙ্ক্ষা মেটাবে না। ললিতগীতকলিত-কল্লোলে শিবশিবানী অর্দ্ধনারীশ্বররূপে দুর্বাসার রক্ত-চক্ষুকটাক্ষকে হেসে উড়িয়া দেবেন। অরবিন্দের প্রেমের কবিতায় বৈষ্ণব কবির সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সখী কি পুছসি অনুভব মোয়
সেই' পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়

এই তিলে তিলে নূতন হওয়াই রূপান্তরিত প্রেম সাধনার তাৎপর্য্য। রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা যতদিন না সত্তাকে রূপান্তরিত করে ততদিনই বিরহ। তাই অরবিন্দ-কাব্যে প্রথম যুগে প্রেমের কবিতাকে কৈশোরের শ্যামল রসে বেগ আর আবেগের মধ্যে যে ভাবে দেখি, যে রূপান্তরের বীজ তার মধ্যে সুপ্ত দেখি, পরিণত বয়সে সাবিত্রীর প্রেমে, মহামৌনের মিলন মন্দিরে তারই পরম প্রকাশ।

প্রথম যৌবনে তিনি যে প্রেমের কবিতা লিখলেন তার মধ্যে আছে Life's joy, warmth, Sensuousness—কিন্তু তিনি একদিকে যেমন স্থূল দেহবিলাসী কবি নন, তেমনি দেহাতীত অতীন্দ্রিয় অবোধও নেই; কারণ তাঁর কাছে Even the body shall remember God এবং every feeling a celestial thrill—ব্যক্তিগত কামনা নেই, ইন্দ্রিয়গত লালসা নেই, আছে সেখানে সর্বানুভূর অনুভূতি। তাঁর বিখ্যাত Songs to Myrtilla কাব্যে Night by the sea এবং Estelle কবিতা দুটি প্রথম প্রণয় পরশমুগ্ধ কবি মনের উচ্ছ্বাস।

তিনি তরুণী এডিথকে ডেকে বলছেন

Kiss me Edith……
In thy bosom's Snow while walls
Softly and Supremely housed
Shut my heart up.

তোমার ঐ তুষারধবল বক্ষে, সুন্দর কক্ষে আমার মনকে বন্দী করে রাখো।

আবার এস্তেলকে বলছেন

why do thy lucid eyes Survey
Estelle, their sisters in the milky way
Turn hither for felicity……
My body's Earth thy vernal power
declares

কি দেখছে তোমার চোখ, ঐ আকাশের সহোদরা তারাদের যদি তোমার পুষ্পিত যৌবনকে পুষ্টত্ব করতে চাও এসো এইখানে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে body's earth এর পিছনে

My spirit is a heaven of thousand stars

মন উর্দ্ধে উধাও। এইখানেই তার ভবিষৎ জীবনের ইঙ্গিত, কাব্য জিজ্ঞাসার রূপ—আমার হৃদয়কে তুমি নাও কিন্তু রাখবে কোথায়—close to all that life applauds. এই সময়েরই অন্য কবিতায় পড়ি

With the wind and the weather beating
round me
up to the hill and the moorland I go
Who will come with me ? who will
climb with me
Wade through the brook and tramp
through the snow.

ঝড়ঝঞ্ঝার সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমি উঠছি পাহাড়ে, কে আসবে আমার সাথে, কে করবে আরোহণ

Not in the petty circle of cities
Cramped by your doors and your walls,
dwell
Over me god is blue in the welkin
Against me the wind and the storm rebel

আমি ঐ তোমাদের ছোট্ট গণ্ডীদেরা সহরে থাকি না, আমার দুই পাশে কড় ও ঝঞ্ঝার প্রলয়
এ যেন কবির মনে

জাগে মহা ব্যাকুলতা
মোর সর্বব্যাপী হিয়া
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব মিলরে
আকাশের নীলিমায়

কে চাও বাঁচবার মত বাঁচতে—who would live largely, who would live freely—এই অনন্ত আহ্বানে কে দিবে সাড়া—তার প্রেমের কাব্যেরও এই আহ্বান—। তবনি

My soul arose at dawn

রাত্রি প্রভাতে রবিচ্ছবি উদিত—আমার আত্মারও ঘুম ভেঙেছে একটি solitary bird আমার কানের কাছে গুঞ্জন করলে, তার সুর কি।

A song not master of its note, a cry that preserved into eternity.

সে সুর অন্তলোকের সুর, সে কান্না অনন্তের কান্না। তাঁর কাছে জীবন মৃত্যু, মৃত্যু জীবন—

Life only is or death is life disguised
Life, a short death, until we are by
life surprised.

এই মর্ত্য জীবন হচ্ছে ক্ষণিক মৃত্যু—কারণ বৃহত্তম জীবনের সে ধার, সেই জন্যই 'Man the lover'কে God the Goal'এর স্তরে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু এইখানেই, এই দেহকে ছাড়িয়ে নয়, এই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়।

কবি বলেছেন—

O Basaba Dutta
When thy heart awakes
Thou shall obey the
Sovereign heart
Nor yield allegiance
To the clean eyed
Selfish gods.

যখন তোমার চিত্ত জেগে উঠবে সে চিত্ত যেন লোভী আত্ম-পরায়ণ দেবতাদের ভোগে না লাগে, তোমার অন্তরের দেবতাকেই যেন মানে। প্রেমের এই যে একমুখীব্যাপকতা, অরবিন্দ প্রেমকাব্যের এও একটা বৈশিষ্ট্য।

এই যে আস্পৃহা, এই যে সমরসা রতি, এই যে গভীরতম ব্যাকুলতা yearning of the One for the One তার কাব্যে ব্যাপৃত হয়ে আছে—সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। রুরু ও প্রিয়ম্বদার উপাখ্যানে, উর্বশীর কাহিনীতে, রাধার স্বপ্নে, সাবিত্রীর অভীপ্সায় প্রেমের এই মহতী বাণী রূপায়িত হয়েছে কবির কাব্যে। Urvasie, (উর্বশী) The Hero and the Nymph (কালিদাসের বিক্রমোর্বশী), Love and death (মৃত্যু ও প্রেম) Vasavadutta (বাসবদত্তা) প্রভৃতি কাব্য ও নাটকের বিচার পূর্বেই করেছি সেই জন্য তার বিশদ ব্যাখ্যা না করে প্রেমের কাব্য হিসাবে বলা যায় যে উর্বশী কবিতায় প্রেম প্রথমে অসার্থক হলো, বিচ্ছেদের বাধা হল দুস্তর। সে বাধা কাটিয়ে মনোময় প্রেম শেষে বিজয়ী হল। প্রেম ও মৃত্যু কবিতায় প্রেম সার্থকতার সন্ধান পাবার আগেই মৃত্যু টেনে দিলে ছেদ। নায়ক সুরুর প্রেম সে ছেদ মানেনি—সে চলে গেলো মৃত্যুর পুরীতে। পরিশেষে জীবনের অর্থ

দিয়ে সে জয়ী হলো, ফিরে পেলে তার প্রিয়াকে। শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ কালিদাসের উর্বশীকেই গ্রহণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কল্পনার সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ—সে মানুষী, সে প্রেমিকা, সে দুর্বৃত্ত হরণ করলে মূর্চ্ছা যায়, সে প্রিয়া, সে জায়া, সে জননী, সে স্বর্গের কামনাকেন্দ্রের নেত্রী নয়, সে অপ্সরা নয় "অনপ্সরেব মে প্রতিভাসি"। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন আর এক উর্বশীকে যে বিশ্বের প্রেয়সী, যে কন্যা নয়, বধূ নয়, মাতা নয়। আমি অন্যত্র বলেছি—অরবিন্দের কাছে উর্বশী সূর্য্যালোকের দীপ্তির মত, বিদ্যুতচমকের মত, অর্থাৎ যা কিছু অপূর্ব সুন্দর মনোমুগ্ধকর সে তাই। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী ফেরে না—অস্তাচলবাসিনী উর্বশী। কালিদাসের ও অরবিন্দের উর্বশী ফেরে।

So was a goddess won to mortal arms
He of her beauty world desired took joy

উর্বশী পুরুরবার মিলনের কথা কবি গাঢ়ভাবে রং দিয়েই বললেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে—

And all Earth's silent subime
spaces passed
Into his blood and grew a part of thought.

বিশ্বের নীরব মহিমান্বিত চেতনা তার রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গেলো এবং সেই প্রেম মানসমহিমার অঙ্গ হয়ে উঠলো। এই তো রূপান্তরের কথা। রুরুও

"With his young bride Priyambada
Opened her budded heart of crimson bloom

To love to Ruru সেখানে ছিল—a happy flood of passion. রুরুকে প্রেমের অনির্বচনীয়তায় ওঠবার জন্য দাম দিতে হয়েছিল—

A sole thing the Gods demand from all men living, sacrifice.

চাহে শুধু এক বস্তু দেবগণ জীবিত মানব কাছে—আত্মদান—মৃত্যু পরাস্ত হলো—রুরুর কাছে, নচিকেতার কাছে, সাবিত্রীর কাছে। সাবিত্রীতে এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম-সাধনা অপরূপ রূপ নিলে। পঞ্চম পর্বের তৃতীয় সর্গে সাবিত্রী আর সত্যবানের মিলনে যার উদ্যোগ দেখি Epilogueএ তারই পূর্ণ প্রকাশ।

সাবিত্রী বলছেন—দেহ মোর মুক্ত হবে আত্মার সমান—মৃত্যু আর অজ্ঞানকে অতিক্রম করে।

শেষে যখন সেই অতিক্রম হলো—যখন পরম দিব্য বললেন—All that thou art, shall to my hands belong তুমি যাহা, সবই আমার—

I will pour delight from thee as from a jar
I will whirl thee as my chariot through the ways
I will use thee as my sword, as my lyre.

তুমি আমার অমিয়সুধার পাত্র, আমার তরবার, আমার বীণা। তুমি হবে a channel for my timeless force.

কাল সীমায় অচিহ্নিত যে শক্তি তারই ধারক সত্যবান আর সাবিত্রী—তাই "a dual power of God in an ignorant world."—যিনি নিজেকে দুইএ ভাগ করেছিলেন তারই বিকাশ—এই যুক্ত প্রেমময় জীবনে—

You shall reveal to them the hidden eternities
The truth of infinitudes not yet revealed
Some rapture of the bliss that made the world
Some rush of the force of God's Omnipotence
Some beam of the Omniscient mystery.

তোমাদের সম্মিলিত জীবনে জানাবে সেই পরম সত্য, সেই চরম গুহ্য, সেই অপূর্ব গান, সেই অচিন্ত্যনীয়ের সুর, কারণ

God be born into the human clay.

স্বর্গকে জন্ম নিতে হবে বারে বারে মাটি-মায়ের কোলে—প্রেম হচ্ছে তারই দুয়ার।

সাবিত্রীর যখন যোগনিদ্রা ভাঙলো, যখন তিনি এই পৃথিবীতেই ফিরে পেলেন সত্যবানকে—

She pressed the living body of Satyavan

এই যে অপূর্ব মিলন—দুই মিলি এক রসাভিসার তাকে কবি চিত্রিত করেছেন এইখানে—

She bore the blissful burden of his head
Between her breasts warm labour of delight
The waking gladness of her members felt
The weight of heaven in his limbs, a touch

Summing the whole felicity of things,
And all her life was conscious of his life.

তাঁর পীনোন্নত আনন্দচঞ্চল বুকের উপর প্রিয়তমের মাথার ভার এলিয়ে পড়েছে। তাঁর সত্তার সুখভারাঙ্গরিত প্রতিটি অঙ্গ প্রতিটি অঙ্গ ভরে মিলনোৎসুক—প্রিয়তমের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের ভার—কেবল রসনিরমাণ—একের জীবনে আর এক জীবনের যে অনুভূতি—এই মূল্যায়ন নিরূপণ এই ত বিশুদ্ধ প্রেম, এখানে কামনার তাগিদ নেই, বাসনার হিংসা নেই, লালসার ক্লেদ নেই। কিন্তু দেহ আছে।

সত্যবান উঠলেন জেগে, নবজীবনপ্রাপ্ত হয়ে

When hast thou brought me Captive back,
Love chained to thee and Sun Light's wall,
O ! Golden beam and Casket of all
Sweetness, Savitri

কোথা থেকে তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলে সাবিত্রী, প্রেমের শিকলে বেঁধে হর্ষ করোজ্জ্বল ধরিত্রীতে—আমি কি ঘুমিয়েছিলাম—মনে হচ্ছে দূরে বহুদূরে, অনন্তের পথে আমি চলেছিলাম—সেই মহাশূন্যের মাঝে তুমি পিছনে পিছনে চলেছো আমার।

সাবিত্রী বললেন—Our parting was the dream. We are together. আমাদের বিচ্ছেদই স্বপ্ন—আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি না—মৃত্যুর রাত্রিকে পিছনে ফেলে এসেছি আমরা—রূপান্তরিত হয়েছি।

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলো হাতে হাত, মুখে মুখ—এই আমি আর তুমি—

Hung on each other in a silent look

তারপর সত্যবান বললে—তুমি বদলেছো

সাবিত্রী বললে—হ্যাঁ বদলেছি বটে, কিন্তু সব ঠিক আছে—

All now is Changed, Yet all is the Same
All that I was before, I am to thee still
Close comrade of thy thoughts and hopes
and toils.

আমি তোমার, তুমি আমার—এই বোধ রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমের সর্বগ্রাসীরূপে

কবি তাই বলছেন অপূর্ব ভাষায়—

I am thy Kingdom even as thou art mine
The soverign and the slave of my desire
The prone possessor, the sister of thy soul
The mother of thy wants ; thou art my world
The earth I need, the heaven my thoughts
desire
The world I inhabit and the God I adore.

সব কিছুই তুমি—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে, চিন্তায়, বেদনায় তুমিই আমার পৃথিবী, আমার স্বর্গ, আমার দেবতা।

They body is my body's counterpart
Whose every limb my answering limb
desire
Whose heart is the key to all my heart beats
This I am and thou to me.

প্রেমের এই সর্বময় রূপই কবি অরবিন্দের কল্পনায় ভেসেছে—দেহ বা দেহাতীত এ প্রশ্নই নেই—রূপান্তরিত সত্তা মাধুর্যে সিক্ত হয়ে চলেছে অনন্তের পথে—অগ্নিরথে তারা যাত্রী

Two powers from original ecstasy born
Pace near but parted in the life of man,
One leans to earth, the other yearns to the
Skies
Heaven in its rapture dreams of perfect Earth
Earth in its Sorrow dreams of perfect
Heaven.
Receive him into boundless Savitri
Lose thy self into Infinite Satyavan.

সেই এক অনাদি আনন্দের অনন্ত হিল্লোলে জেগে উঠলো দুই। একদিকে এই মাটির পৃথিবী, আর একদিকে অনন্ত-যৌবন আকাশ, এই দুই মিলিয়ে দুই নিয়েই দ্যাবাপৃথিবী আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই শ্বেত, এই অর্দ্ধনারীশ্বর, স্বর্গ ফিরে ফিরে চায় ধরণীর দিকে—যে ধরণী ক্লান্ত নয়, তপ্ত নয়, পূর্বের পূর্ণাভিসিঞ্চনে মধুময়—আর পৃথিবী চেয়ে থাকে স্বর্গের দিকে—ভরা মৃত্যু বিনষ্টির অতীত যে লোক। প্রেমের পট্টবাস পরে তপস্বী মানব চলবে স্বর্গের দিকে দীপশিখা হাতে—আর সেই আলো দেখে স্বর্গের দেবতা নামবেন মাটির পথে। কোন পাহাড়ের পারে কোন সাগরের ধারে কোন মানুষের বুকে দুয়ের হবে মিলন—তার অধীর প্রতীক্ষায় মানব মানবী দাঁড়িয়ে। শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সেই প্রেম কিশলয়েরই বারতা, আর পরিচয় দিয়ে আসছে, যে প্রেম ফুলে ফলে পল্লবে ঊর্দ্ধশির হয়ে উন্মোচিত সত্তার প্রতিটি অনুভূতিতে Inscribe the long romance of Thee and Me.

অগ্নি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল। কিছু দেরী হ'য়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় ব্যাচের জন্যে অপেক্ষা করছি। বিপিনবাবু পান চিবোতে চিবোতে এসে বললেন—কি মশায়? আপনার এত দেরী হ'ল যে?

বিপিনবাবু আমার চেয়ে বয়সে বড়। তবু আমাদের খুব মিল। আমার সঙ্গে সমাজনীতি, রাজনীতি আলোচনা না করলে তাঁর চলেনা।

যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ল। ভোজন শেষ করে এসে দেখি বিপিনবাবু তখনও বসে। বললাম—এখনও যান নি যে?

—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। চলুন কথা আছে।

বলে উঠে দাঁড়ালেন। দেখি বিপিনবাবুর চোখ দুটো কৌতুকে নাচছে। বুঝলাম সরস কিছু আছে।

নির্জ্জন পথ। চারদিক চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। পৃথিবীর বুকে একটা স্নিগ্ধ শান্তি। আমাদেরও মন প্রফুল্ল। সরস আলাপের উপযুক্ত সময় বটে। বিপিনবাবু বললেন—আপনার কথাই ঠিক মশায়। নরেনের কাণ্ডটা প্রবোধবাবুর স্ত্রীর সঙ্গেই।

—তাই নাকি? কি করে জানলেন?

—শুনলাম যে সবই আজ। ওঁদেরই পাশের বাড়ীতে থাকেন—নামটা আর করব না—তাঁর কাছেই শুনলাম যে। ওঁরা জানতেন সবই। দেখেওছেন অনেক কিছু।

—বটে? তারপর?

—তারপর আর কি? কিন্তু আপনি ধরেছিলেন কি করে বলুন দেখি? সবাই যখন বললে—মেয়ে, আপনি বল্লেন—মা। কি করে জানলেন বলুন দেখি?

—ও কিছু নয়। বলে উড়িয়ে দিলাম। তারপর চুপ করে রইলাম। সত্যিই চুপ করে থাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। পদস্খলন, ব্যভিচার ওসব জগতে কিছু নতুন নয়। কিন্তু এর ভেতর যেন আরো কিছু বেশী ছিল। বিশ বৎসর নিষ্কলঙ্ক বিবাহিত জীবনযাপনের পর যে পতন, তাতে মনে হয়—মানে কিছু আছে। কাউকে দোষ দিতে যাবার আগে আর একবার ভাল করে ভেবে দেখা উচিত।

মনে পড়ল একটি ক্ষুদ্র পরিবারের চিত্র। স্বামী, স্ত্রী ও একটি কন্যা। কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। প্রবোধবাবু আপিসে কাজ করেন। আজ পর্য্যন্ত কখন তাঁকে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুনিনি। এত বিশ্রী স্বাস্থ্য তাঁর। সদাই ঝুঁকছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য এই রকম। তাঁর গৃহলক্ষ্মীটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। একেবারে উদ্দাম প্রকৃতির। স্বাস্থ্য অটুট। রূপ ঝলসে পড়ছে। মুখে হাসি লেগেই আছে। আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়েছিল। মেয়ে নিয়ে মা স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের বাড়ী। মেয়ের হয়ে ওকালতীও করেছিলেন। বিয়ে হ'ল না অন্য কারণে, কিন্তু মহিলাটি রেখাপাত করেছিলেন মনের মধ্যে যথেষ্ট। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এত রূপ, এত বুদ্ধি, এত প্রাণচাঞ্চল্য দেখতে পাওয়া দৈবাতের কথা। প্রবোধবাবুকে জানতাম। তখনই কেমন মনে হয়েছিল—এতদিন যে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে না—সে বোধ করি সুযোগেরই অভাবে।

একদিন এঁরই এখানে চাকরী করতে এসে উঠল আমাদের বন্ধু নরেন। নরেন ২৫।২৬ বছরের অবিবাহিত যুবক। বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ চেহারা, সব বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব। যেন কঠিনতার প্রতিমূর্ত্তি। চাকরীও ভাল। উপরি-পাওনাও আছে। তারপর এক বৎসর হয়ে গেছে। নরেন আলাদা বাসা করে নি।

বিপিনবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে এই সব কথাই মনে পড়তে লাগল। আশ্চর্য্য!

বিপিনবাবু বলতে লাগলেন—এর ফল কিন্তু ভাল হবে না—দেখবেন। এও সেই অডিটারের মত হবে আর কি! সেই যে, যে ভদ্রলোক স্ত্রীকে খুন করেছিলেন। প্রবোধবাবু আছেন বটে চুপচাপ, কিন্তু একদিন হঠাৎ হয়ত খুনই করে ফেলবেন। কি বলেন?

—হ্যাঁ আশ্চর্য্য কি! বললাম অন্যমনস্কভাবে।

বিপিনবাবুর বাড়ী এসে পড়েছিলেন। তবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হতে লাগল। বিপিনবাবু বিশেষ উত্তেজিত। নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এই সংবাদ পেয়েছিলেন। এতবড় একটা চমকপ্রদ সংবাদ নিঃশব্দে হজম করতে পারছিলেন না। নেশার সঙ্গীর মত এরও সঙ্গী চাই।

চোখে পড়তে লাগল তাঁর শোবার ঘর। জানলার পরদা ভেদ করে আসছে আলো আর নারীকণ্ঠের স্বর। শিশুদের কাকলি। তাঁর স্ত্রী ছেলেদের ঘুম পাড়াচ্ছেন। বিপিনবাবুর ছটি পুত্র কন্যা। সুখী পরিবার। সুখী চিত্র। বিপিনবাবু রাগ করতে পারেন বটে।

তিনি বলেই চললেন—জানেন, আমাদের আত্মীয় এক ব্যারিষ্টারের এমনিই অবস্থা হয়েছিল। শেষে ও সুই-সাইডই করলে। কে জানে হয়ত প্রবোধবাবু একদিন সুই-সাইডই করতে পারেন। কি বলেন?

—হ্যাঁ আশ্চর্য্য কি?

—আর এক মজা জানেন। সেদিন এক ভদ্রলোক আমার এখানে এসে হাজির। মেয়ের বাপ। এসেছেন পাত্রের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। পাত্র কে জানেন? নরেনচন্দর? আমি দিলাম সব বলে। তবু তখন এতটা জানতাম না। বিয়ে গেল ভেঙ্গে। তা নয়ত কি? কিন্তু আশ্চর্য্য, শুনলাম ঠাকরুণই নাকি বিয়ে দেওয়াছিলেন। ভাবছিলেন আর কেন? সব ঝিনিবেরই ত শেষ আছে। কি বলেন?

—হ্যাঁ তাত বটেই।

বিপিনবাবু একটু লক্ষ্য করে দেখলেন—তারপর বললেন—কিন্তু আপনার হল কি? ক্রয়েডও আওড়াচ্ছেন না, সাইকো-অ্যানালিসিসও—করছেন না। হল কি?

—ও কিছু নয়—তারপর?

—তারপর আর কি! যাই বলুন—প্রবোধবাবুর জন্যে ভারী দুঃখ হয় কিন্তু। অবিশ্যি অভিভাবকদের ওঁর বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল না—তবু। যে ভদ্রলোকের কাছে সব শুনলাম—তিনি বলছিলেন—তিনি নাকি প্রবোধবাবুকে একদিন খুলে জিজ্ঞেসই করেছিলেন—কি মশায়, নরেনবাবু আপনার আত্মীয়ও নন একজাতও নন, উনি কেন আপনার বাসায় থাকেন?

—তারপর?

—তারপর আর কি! শুনে প্রবোধবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিল নাকি? শুধুন কথা। ওঁর শুধু ভয়, কেউ কিছু বলল কিনা। যেন আর কিছু দেখবার নেই। কি বলেন? এরকম না হলে এমন হয়? কিন্তু সে যাহোক। যেজন্যে আপনাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছি। শুনুন। কাল থেকে আমি উঠে পড়ে লাগব। ভীষণ গোলমাল করব। নরেনকে ও বাড়ী ছাড়াব, তবে ছাড়ব। এতদিন ভাল করে জানতাম না একরকম ছিল, কিন্তু এখন? এবে ব্যভিচার ছি ছি ছি। কাল থেকে ভীষণ গোলমাল আরম্ভ করব। আপনাকেও করতে হবে কিন্তু।

চোখে পড়তে লাগল বিপিনবাবুর শোবার ঘর। ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়েছে। এখুনি বিপিনবাবুও গিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোবেন।

বিপিনবাবু বললেন—কি ভাবছেন মশায়? করবেন ত আপনিও গোলমাল?

—আপনি পাগল হলেন নাকি?

—কেন? পাগল কিসের? সমাজের আপনিও একজন। রয়েছেন যখন এখানেই এতদিন। সমাজেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।

—না—নেই। এখন আর নেই। এখন কর্ত্তব্য শুধু চুপ করে থাকা। এ আগুনকে জলে শেষ হয়ে যেতে দেওয়া।

বিপিনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। বললেন—কি জানি মশায়—কি রকম আধুনিক আপনারা। আপনাদের মতিগতি দেখছি

বোঝাই শক্ত। আচ্ছা যাওয়া যাক্ রাত হল—বলে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

২

পৃথিবী পূর্ব্ববৎ চলছে। প্রবোধবাবুকে একদিন ক্লাবেও দেখলাম। কে বলবে তাঁর ওপর দিয়ে কিছু বয়ে যাচ্ছে। তেমনি নির্জ্জীব, তেমনি নিরীহ, তেমনি স্বল্পভাষী। কাকে একটা ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন—ঠিক করে দিয়েছি দাদা—আর লেট হবে না। নিন।

ভদ্রলোক খুসী হয়ে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ঘড়িটা নিলেন। প্রবোধবাবু চলে গেলে সেই ভদ্রলোকই চোখ টিপে বললেন—প্রবোধবাবু আজকাল ভারী সুন্দর ঘড়ি সারাতে পারেন—তা আপনারা জানেন কি? বলে সজোরে হেসে উঠলেন। সকলেই হেসে উঠল। রসিকতাটা সকলেই উপভোগ করল।

কি মনে হল, ক্লাব থেকে ফেরবার পথে একবার প্রবোধবাবুর বাসা না হয়ে কিছুতেই আসতে পারলাম না।

রাত প্রায় সাড়েনটা। বৈঠকখানা অন্ধকার। সমস্ত বাড়ী নিঝুম। এ পরিত্যক্ত বাড়ীতে লোক থাকে নাকি? সদর রাস্তা ছেড়ে পাশের গলিটায় এগিয়ে গেলাম। সামনেই শোবার ঘর। জানালা খোলা। ভেতর থেকে অস্ফুট কথাবার্ত্তা আসছে। ওর মধ্যে একটা স্বর প্রবোধবাবুর। আর একটা রমণীকণ্ঠ, বোঝা গেল পিতা ও কন্যার মধ্যে আলাপ হচ্ছে। কন্যা বিরক্ত হয়ে বলছে—মা এখনো এলোনা, দেখছ ত বাবা!

পিতা রাগতস্বরে বলল—অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে আজকাল। মেয়ে এসেছে দু'দিনের জন্যে, তাকে ফেলে সিনেমা দেখতে গেছেন।

সিনেমা না দেখলে কি যেন হয়—অভিমান করে বললে কন্যা।

—অসভ্য—অসভ্য হয়ে উঠেছে একেবারে।

—আর আমার বাপের বাড়ী আসা চলবে না দেখছি। এরকম হতে থাকলে কি করে আসব? আমারও ত একটা—

চলে আসছি এমন সময় সদর রাস্তায় একটা গাড়ী আসার শব্দ হল। পশ্চিমদেশের ভাড়াটে গাড়ী। গাড়ী থামলে দু'জন আরোহী ধীরে নেমে এলেন। একটু সরে দাঁড়ালাম, একজন মহিলা। অপরটি যুবক। মহিলাটি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলছেন—মেয়েটা কি করছে কে জানে! উনি হয়ত খাননি এখনও। মোটে ইচ্ছে ছিল না আমার। মিছিমিছি জোর করে—

যুবকটি কোন কথা বললে না। সে যে অত্যন্ত চিন্তিত তা স্পষ্ট বোঝা গেল। মহিলাটি সন্তর্পণে দরজায় আঘাত করলেন। এক মিনিট পরে দরজা খুলে গেল। যিনি খুলে দিলেন, তিনি খুলে দিয়েই চলে গেলেন। মহিলাটি প্রবেশ করলেন। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই রইল। তার গম্ভীর ভারাক্রান্ত মুখ অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দেখা যেতে লাগল।

নিঃশব্দে চলে এলাম।

কিছুদিন পরে শোনা গেল—নরেন অন্য বাসায় উঠে গেছে। সকলেই বাঁচল। বিপিনবাবু সবচেয়ে বেশী। আমায় কাছে এসে আস্ফালন করে বলতে লাগলেন—দেখলেন ত মশায়। তাড়ালাম কিনা! আপনারা শুধু মুখেই। কাজেরবেলা কিছু নন।

মরা-রূপকথা

দিলীপ দাশগুপ্ত

একটি পূর্ণাশা-ভাঙা জেগে ওঠা মিঠে রূপকথা
মনে পড়ে। মনে পড়ে শুক্লস্নান সেই ব্যাকুলতা
চটুল চপল হ'য়ে ধাম-ছোঁয়া আকাশের ঠোঁটে
চুমু দিয়ে সুরমুরি ফুল হ'য়ে চোখেমুখে ফোটে।
আহা সেই রূপকথা! আহা সেই হৃদয়চারিণী!!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ছিলো আজো তারে ভুলিতে পারিনি।
রাত জেগে পড়ে পড়ে ক্লান্ত হ'য়ে রবীন্দ্র-কবিতা
মরা-মন তবু একা। ঘুমভাঙা ভোরের সবিতা
আরতির প্রাক্‌ক্ষণে দাগ দিয়ে গেল অকস্মাৎ।
রূপকথা মুছে গেল। শিশির বুকেতে যে আঘাত
লেগেছে তা মনে পড়ে চেয়ে দেখি ফাগুনের দিনে
যদি মেঘমুক্ত হ'য়ে আসে এই পথখানি চিনে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ[১]

শ্রীনলিনীকান্ত সেন

১। ওঁ, এই অক্ষর অবিনাশী, ওঁই বিশ্বভুবন, এই তার ব্যাখ্যা-ভূত-ভবিষৎ-বর্তমান সবই ওঙ্কার এবং তা ছাড়া ত্রিকালের অতীত (২) যা আছে তাও ওঙ্কার।

২। এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্ম বই নয়। এই আত্মাও ব্রহ্ম, তার চার বিভাগ।

৩। জাগ্রত চেতনায় যাঁর স্থান, বাহ্য বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, যাঁর সাত অঙ্গ ও উনিশ দ্বার, যিনি স্থূল বিষয় অনুভব ও ভোগ করেন, সেই বিশ্বনর পুরুষ (বৈশ্বানর), প্রথম।(৩)

৪। স্বপ্ন যাঁর স্থান যিনি আন্তর বিষয়ে অভিজ্ঞ, যাঁর সাত অঙ্গ ও উনিশ দ্বার, যিনি সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব ও ভোগ করেন, সেই দীপ্ত অন্তর অধিবাসী, তৈজস পুরুষ, দ্বিতীয়।(৪)

৫। যে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলে লোকে কোন কামনা করে না বা স্বপ্ন দেখে না, সেই হল সুষুপ্তি। আর সেই সুষুপ্তিতে যাঁর স্থান, যিনি পরম একত্বে পরিণত হয়েছেন, যিনি ঘনীভূত প্রজ্ঞা, কেবলমাত্র আনন্দে যিনি গঠিত, কেবল আনন্দ যিনি আস্বাদন করেন, সজ্ঞান চিত্ত যাঁর দ্বার, সেই প্রাজ্ঞ পুরুষ, তৃতীয়।(৫)

৬। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সবার অন্তর্যামী, তিনি বিশ্বযোনি, সর্বভূতের তাঁর থেকে উদ্ভব হয়—তাঁতেই লয় হয়।

৭। যিনি আন্তর বিষয়ে আসক্ত নন বা বাহ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ নন, আন্তর-বাহ্য উভয়তঃ অভিজ্ঞও নন, যিনি ঘনীভূত প্রজ্ঞাঘনী নন, যিনি প্রাজ্ঞও নন অপ্রাজ্ঞও নন, যাঁকে কেহ দেখে নি, যাঁর সঙ্গে কোন আদান প্রদান চলে না, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, যার কোন লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না, যিনি অচিন্তনীয়, যাঁর কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যাঁর স্বরূপ হল একমাত্র আত্মার অস্তিত্ববোধ, যাঁর মধ্যে সমস্ত বাহ্যপ্রপঞ্চ বিলীন হয়, যিনি শান্ত-শিব—অদ্বৈত—তাঁকেই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বলে মনে করা হয়। সেই পরমাত্মা—তাঁকে জানতে হবে।

৮। সেই আত্মাই অক্ষরের মধ্যে ওঁ; মাত্রার মধ্যে—তাঁরই অংশ হল অ-উ-ম এই তিন মাত্রা, এই তিন মাত্রাই হল তাঁর অংশ।

৯। জাগরিত চেতনায় অধিষ্ঠিত বিশ্বময় পুরুষ হলেন অকার, প্রথম মাত্রা—আদিত্ব ও সর্বব্যাপিত্বের জন্য; এই বিভাগে যে তাঁকে জানে সে ব্যাপ্তি লাভ করে, তার সব কামনা পূর্ণ হয়, সে আদি, সর্ব প্রথম ও সর্ব-মূল হয়।

১০। স্বপ্নে অধিষ্ঠিত তৈজস পুরুষ উকার, দ্বিতীয় মাত্রা—উৎকর্ষ ও উভয়ত্বের জন্য, উৎকর্ষলাভ করেছে ও মূল-সূক্ষ্ম উভয়ের কেন্দ্রস্থিত বলে; এভাবে যে তাঁকে জানে তার জ্ঞানের প্রসার উৎকর্ষলাভ করে, ও পৃথগ্-বোধ অতিক্রম করে(৬), তার কুলে কেউ জন্মে না যে ব্রহ্মবিৎ নয়।

১১। সুষুপ্তিতে অধিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ মকার তৃতীয় মাত্রা—পরিমাপ ও লয়ত্বের জন্য; এভাবে যে তাঁকে জানে সে নিজেকে ঘিরে এই সব মাপে, ব্রহ্মে চরম গতিতে পরিণত হয়।(৭)

১২। মাত্রাহীন চতুর্থ (তুরীয়) বাক্যাতীত, প্রাতিভাসিক জগতের নিবৃত্তি স্থান, শিব, অদ্বৈত—এই হল ওঙ্কারের স্বরূপ; যে তাঁকে এভাবে জানে সে পরমাত্মাই, আত্মার দ্বারা সে পরমাত্মাতে প্রবেশ করে।

---

(১) শ্রীঅরবিন্দের Eight Upanisads-এর অন্তর্গত ইংরাজী প্রবন্ধখানি।

(২) ত্রিকালাতীত অর্থ প্রতিব্যক্তির উর্ধ্বে অবস্থিত। শ্বেতাশ্বতরেও আছে, (৩.৪) "পরস্মিন্কালাৎ অকলোপি দৃষ্টঃ।"

(৩) জাগ্রত অর্থে আমাদের স্বাভাবিক চেতনা। মুণ্ডক উপনিষদে (২।১।৪) বিরাটের সাত অঙ্গ বলা হয়েছে—অগ্নি মূর্ধা, চন্দ্রসূর্য চক্ষুদ্বয়, দিক্‌শ্রোত্র, বিবৃতবেদ বাক্, বায়ু প্রাণ, বিশ্বহৃদয়, পৃথিবীপাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে ভিন্নভাবের বর্ণনা আছে, তার সংখ্যা সাত। শঙ্কর তাই নিয়েছেন। তবে মুণ্ডক মাণ্ডুক্য উভয়ই অথর্ববেদ অন্তর্গত, সুতরাং মুণ্ডকের সংখ্যা গ্রহণ করাই বিধেয়।

তার উনিশ দ্বার বা প্রবেশের দ্বার হল দশ ইন্দ্রিয়,পঞ্চ প্রাণ, মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত।

(৪) স্বপ্ন বা মগ্ন চেতনা Subliminal Consciousness, মনঃপ্রাণময় লোকের সূক্ষ্ম চেতনা। তাইই বাহ্যের প্রকাশ হল জাগ্রচ্চেতনা। তৈজস ও বিরাট পুরুষের অঙ্গ ও মুখ একই প্রকার, স্থূল-সূক্ষ্ম এইমাত্র প্রভেদ।

(৫) অতি মানস চেতনা, Super consciousness।

(৬) মূলে আছে 'সমান।' শঙ্কর অর্থ করেছেন শত্রু মিত্রে সমদর্শী। অন্যান্য টীকাকারের মধ্যাতীত, বিশ্বের সমপরিমাণ, ব্রহ্মের সমধর্মী ইত্যাদি অর্থ ও করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, rises above differences—আমার সে মনে হয়। তৈজস উপলব্ধির সেই ফলই ঠিক।

(৭) মি (মা) ধাতুর ইয়ত্তা ও বিনাশ দুই অর্থই নেওয়া হয়েছে। একাত্মতার দ্বারা বিশ্বকে জানে—কারণ তার সত্তা বিশ্বপ্রসারী হয়। আবার 'অপীতি', লয়প্রাপ্তি বা ব্রহ্মে বিশ্ব-সংহরণও হয়,—অভিব্যক্ত সব বস্তুই লয়ে যেমন একত্ব হয় তেমনি যে মূল সত্য প্রত্যেকটি বস্তুতে প্রকাশিত হয় তার সঙ্গেও একত্ব হয়।

মন্তব্য

জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি চেতনার তিন স্তর। চতুর্থ স্তর বিদ্যাতীত অব্যক্ত চেতনা। এই চারিটি হল ব্রহ্মের অংশ। এই দৃশ্যমান বিশ্ব ও ব্রহ্ম, মিথ্যা নয়। সবই উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্ববর্জন বেদান্তের শিক্ষা নয়।

বেদেও চেতনার এই তিন স্তরের উল্লেখ আছে বিশ্বের তিন পরিক্ষেপের প্রতীক দিয়ে। প্রশ্নোপনিষদ, চতুর্থ প্রশ্নে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে রূপকের ভাষায়। এখানে পাই তার সুস্পষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য বর্ণনা। বর্তমান মনোবিজ্ঞান তার নিজস্ব বিশ্লেষণের ফলে এ সত্য নূতন আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভারতীয় মনোবিজ্ঞাতে এ সত্য চিরদিনই জানা ছিল।

সমাধিতে এই সব সূক্ষ্মতর চেতনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ On Yoga গ্রন্থে সমাধি প্রসঙ্গে এবিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। তার সারমর্ম এখানে দেওয়া হল।

বিশ্বের ও আমাদের নিজের অতি অল্প অংশই আমরা জানি বা কাজে লাগাই। বাকিটা মগ্ন চেতনার সব স্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। অবচেতনার গভীরতম গহন থেকে অতিচেতনের তুঙ্গতম শিখর অবধি তা বিস্তৃত, আমার আমাদের ক্ষুদ্র সংজ্ঞার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে তার ব্যাপক পারিপার্শ্বিক অস্তিত্ব। তবে তার অল্পে নির্দেশই আমরা করতে পারি। প্রাচীন ভারতের মনস্তত্ত্বে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে চেতনাকে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন ক্ষেত্রে ভাগ করে। প্রত্যেক মানুষেরই জাগ্রত-আত্মা, স্বপ্ন-আত্মা, সুষুপ্তি-আত্মা এই ত্রিবিধ সত্তা আছে। আর সবার উপরে পরম কেবল-সত্তাময় আত্মা চতুর্থ বা তুরীয়। তা থেকেই নিম্নতর ত্রিবিধ সত্তা উদ্ভূত হয়েছে জগতে আপেক্ষিক সম্বন্ধের রস গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে।

আমাদের দৈহিক জীবনের স্বাভাবিক বহিশ্চর চেতনাকে জাগ্রত বলা হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিশ্বকেই তা জানে, তাকে চালায় জড়ানুগ মন, জড়ের বাস্তবতাই যার কাছে সত্যের একমাত্র প্রমাণ। স্বপ্ন হল প্রাণ-মনের লোকের উপযোগী সূক্ষ্ম চেতনা। আমরা তার সন্ধান পাই বটে, কিন্তু তার অস্থির স্থূল জগতের মত দৃঢ় বাস্তব মনে হয় না। সুষুপ্ত হল অতিমানস লোকের বিজ্ঞানময় চেতনা। তা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, কেননা আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ বা কারণ দেহ এখনও যথেষ্ট পুষ্ট হয় নাই। সে লোকের স্পন্দন গ্রহণক্ষম বৃত্তি এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছে বলে তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্বপ্নহীন নিদ্রার মত। পরে তুরীয়, শুদ্ধ-সৎ-এর, আমাদের কেবল অস্তিত্বের চেতনা। তার সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। ক্বচিৎ কখনও স্বপ্ন বা জাগ্রত মনের উপর তার ছবি পড়ে। আর সুষুপ্তি অবস্থায় কি হয় আমরা মনে রাখতে পারি না। সত্তার এই চার ধাপ ধরে আমরা ভগবানের সান্নিধ্যে অধিরোহণ করি। আমাদের অভ্যস্ত বহিশ্চর চেতনা ছেড়ে, বাহ্যবিশ্বের অনুভব বর্জন ক'রে, তার পশ্চাতে ও অন্তরে প্রবেশ করতে না পারলে এই সব উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায় না। জড়ানুগ মনের ও জড়প্রকৃতির বেষ্টন অতিক্রম করবার জন্য সমাধির প্রয়োজন।

সমাধি ক্রমশঃ গাঢ়তর হয়; ক্রমশঃ জীব জাগ্রতের আবাহন থেকে দূরে উচ্চতর গভীরতর অবস্থাতে যায়। সমাধির লঘুতর অবস্থাতে বাহ্য অনুভব সাময়িকভাবে বর্জিত হ'লেও সহজেই অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু গভীর সমাধিতে অন্তর্লীন মনের নিস্তব্ধতা কোন বাহ্য অভিঘাতে বিচলিত হয় না। প্রথম স্বপ্নাবস্থা-তারও অনেক পর্যায় আছে। কিন্তু সাধারণ মনের স্বপ্ন ও নিদ্রা এবং যোগের স্বপ্ন ও সমাধির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটা হল প্রাকৃত মনের ব্যাপার, আর একটা হল প্রাকৃত মনের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত স্বপ্নে মনের কাজ। ঘুমের মধ্যে বুদ্ধির শাসন থাকে না। তাই, মস্তিষ্কে যে সব বোধের ছাপ থাকে—বাস্তব অনুভূতি, কল্পনা, বইএ পড়া শোনা কথা—সেই সব পাঁচমেশালি স্মৃতির টুকরো নিয়ে অবচেতন মন নানা অসংলগ্ন ছবি গড়ে। সেই হল সাধারণ স্বপ্ন। কিন্তু যোগের স্বপ্নে কোন অব্যবস্থিতি থাকে না, সাধারণ মনের শক্তি বেশী একাগ্র হয়ে কাজ করে, কিংবা উচ্চতর স্তরের বৃদ্ধি জেগে ওঠে। বাহ্য অনুভব থেকে তা দূরে সরে যায় বটে, কিন্তু বর্ণন-বিচার-মনন প্রভৃতি মনের নিজস্ব ক্রিয়া চলে বিশুদ্ধতর, পূর্ণতর ভাবে। এমন কি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে বাহ্য পরিবেশের নৈতিক, মানসিক শারীরিক পরিবর্তন অবধি স্থায়ীভাবে ঘটান যায়। উচ্চতর লোকের সঙ্গেও সে আত্মাত্মরীণ জাগরণের অবস্থাতে সংযোগ স্থাপন করা যায়, গুহ্যতর গুহাতে বা চিদাকাশে ও প্রবেশ করা যায়। তার ফলে দূরদর্শন দূরশ্রবণ প্রভৃতি অলৌকিক শক্তিলাভ হয়। তবে, সমাধির প্রধান উপযোগিতা হল যে তাতে মনন, ভাবাবেগ ও ইচ্ছা শক্তির সব উচ্চতর স্তর খুলে যায়, আত্মার প্রসার গভীরতা ও ঈপ্সিতা বেড়ে যায় এবং মানব আধার ভাগবত স্পর্শের জন্য প্রস্তুত হয়। অবশ্য সমাধিতে বাহ্য স্পর্শের উপদ্রব থাকে না বলেই এসব সাধিত হয়, সমাধি ভঙ্গে আবার সেই ছটফোটের মধ্যে পড়ে বিস্তৃত হতে হয়। কিন্তু বাহ্য সংস্রব ছেদও অবশ্য-প্রয়োজন নয়। চৈত্য সত্তা সুপরিণত হলে জাগ্রত অবস্থাতেও সমাধিলব্ধ অতিজ্ঞতায় স্মৃতি-সঞ্জীবিত রাখা যায়। আর ক্রমে বহিশ্চর চেতনাতেও সে সব সম্পদ-সুলভ হয় এবং সে সব শক্তি সাধারণ জীবনেও স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

সুষুপ্তি উপনীত হয় সত্তার আরও উচ্চতর বিভাবে—মনন অতিক্রম ক'রে শুদ্ধ চেতনাতে যায়, ভাবাবেগ অতিক্রম ক'রে শুদ্ধ আনন্দে যায়, সংকল্প অতিক্রম ক'রে শুদ্ধ ঈপ্সিতাতে যায়। "জন্মাদি অস্য যতঃ"—জগদ্ব্যাপারের উদ্ভব-লয় হয় সচ্চিদানন্দের যে পরম ভাব থেকে, তার—সঙ্গে মিলনের এই হল দ্বার। বাহ্য চেতনার অতীত বলে তার কাছে এ গভীর নিদ্রা, কিন্তু অন্তর চেতনার পক্ষে তা বহুতর জাগরণ। সুষুপ্তির নাম হল প্রাজ্ঞ; তার বিশেষণ হল সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্বভূতের উদ্ভব ও বিলয়ের কারণ, বিজ্ঞানময় পরমাত্মা। সাধারণ মনের গ্রহণ-সীমার বাইরে থেকে যা আসে তাই মনে হয় স্বপ্ন। আর তার প্রকৃতি যদি এত ভিন্ন হয়, এত অপরিচিত হয় যে তার কোন ধারণাই করা যায় না, তা মনে হয় যেন স্বপ্নহীন নিদ্রা। কিন্তু গ্রহণ ক্ষমতার পরিধি ক্রমশঃ প্রসারিত করা যায়, এ স্তরেও জাগ্রত থাকতে পারা যায়, আর তাতে অতিমানস জ্ঞান ও শক্তিলাভ হয়। আরও ঊর্ধ্বে, আনন্দময় সত্তাতেও প্রবেশ করা যায়, প্রবুদ্ধ আত্মা সমাধিতে তখা জাগতিক বোধে আনন্দময় সত্তাকে লাভ করতে পারে। আরও ঊর্ধ্বের সব স্তরেও যাওয়া যায়, সেখান থেকে "একটা অনির্বচনীয় আনন্দে মগ্ন ছিলাম"—এ ছাড়া আর কোন বোধ নিয়ে ফেরা যায় না। সত্তারও যেন কোন অস্তিত্ব থাকে না; বৌদ্ধ সাংকেতিক সংজ্ঞা "নির্বাণ" ছাড়া সে অবস্থা সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না।

সমাধিলব্ধ সম্পদের অনেক অংশই সমাধি বিরতি অর্জন করা যায়, তবে সবটা নয় বা এত সম্পূর্ণভাবে ও নয়। সমাধিতে যে সব পাওয়াও সহজ হয় এই হয় পূর্বযোগে সমাধির উপযোগিতা। তবে, সে আলোক ও শক্তি বাহ্য চেতনাতেও নামিয়ে আনতে হবে, সে সবকে ব্যষ্টি-মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি ও অভিজ্ঞতাতে পরিণত করতে হবে। তবেই দেহধারী আত্মার স্ব-স্বরূপে জাগরণ সম্পূর্ণ হবে, পৃথিবীতে দিব্য চেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ প্রস্তুত হবে। এই হল শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র যোগের উদ্দেশ্য।

বন্ধু

প্রশান্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিন অঞ্জলিদের বাড়ীতে গান শুনিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল বিজয় এবং রমেশের। নির্জন পথে ওরা টাঙ্গায় ফিরছে এখন।

বিজয়: এই টাঙ্গা, জোরসে চলো।—অনেক রাত হয়ে গেল, কি বল্ রমেশ?

রমেশ: হুঁ।

বিজয়: অঞ্জলিদের বাড়ীটাই অমনি। গেলে আর ছাড়তেই চায় না। তুই তো সম্পূর্ণ নতুন লোক; অথচ দেখলি তো—প্রথম দিনেই আজ তোর সঙ্গে কেমন আড্ডা জমিয়ে তুললেন অঞ্জলির বাবা আর মা?

রমেশ: হ্যাঁ। বেশ লোক ওঁরা। চমৎকার মানুষ।

বিজয়: আর ঐ ছেলেটা? ঐ বুল্টু? বেশ জলি, আর বেশ শার্প; কি বল্?

রমেশ: হ্যাঁ—বেশ ছেলেটি। বুদ্ধিমান।

বিজয়: (গলা চেপে অন্তরঙ্গতার সুরে) আর অঞ্জলি?—অঞ্জলিকে কেমন লাগল?—অত বড় বড় টানা চোখে সোনালী তারা দেখা যায় না; কি বল্? আর দেখেছিস, ঠিক যেন মনে হয়, চোখে কাজল দিয়েছে; তাই না?

রমেশ: হ্যাঁ।—(গুণগুণ্ করে ওঠে)

'দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন জেনে
তবুও তোমারি জন্যে
গান যে আমার পাখা হয় সুরে সুরে।
তোমার চোখের তারা দুটি যেন হাতছানি দেয় দূরে।'

বিজয়: তোর ঐ হিন্দী ঠুংরী গানটা কিন্তু আজ চমৎকার খুলেছিল অঞ্জলিদের বাড়ীতে। অঞ্জলির গলাটাও মন্দ নয়; কি বল্?

রমেশ: ভাল।—খুব ভাল।—তোমার চোখের তারাদুটি যেন হাতছানি দেয় দূরে।'

কয়েক পর। বেশ। বিজয়দের ঘর।

জনৈক বোর্ডার: আরে বিজয়বাবু, সেজেগুজে চললেন কোথায় মশাই?

বিজয়: এই একটু···

বোর্ডার: শরীর আজ কেমন?

বিজয়: আজকে সুস্থ লাগছে বেশ।

বোর্ডার: ওফ্! ধন্য মশাই আপনাদের বন্ধুত্ব। এমন খাঁটি ফ্রেণ্ডশিপ্ মশাই কল্পনাও করা যায় না। একসঙ্গে ওঠা-বসা খাওয়া-শোওয়ার বন্ধুত্ব দেখা যায়; কিন্তু একসঙ্গে রাত্তিরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একসঙ্গে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বিছানা নেওয়া সত্যিই অকল্পনীয়! এ-রকম বন্ধুত্ব ভূতারতে কেউ গাথেনি কোনদিন।—আপনারা কর্সিকান্ ব্রাদার্স'কেও ছুয়ো দিলেন মশাই!

বিজয়: একসঙ্গে ফিরলুম কিনা সেদিন দুজনে খোলা টাঙ্গায়—রাতও হয়েছিল বেশি—গরম জামাও ছিল না তেমন গায়ে—তাই ঠাণ্ডা লেগে—

বোর্ডার: তা লাগুক্; ঠাণ্ডাটা ঠিক একই রকম ওজনে দুজনকে ধাক্কা দিয়ে দুজনকেই ঠিক গুণেগুণে তিনদিন বিছানায় শুইয়ে রাখলে কি না—তাই বলছি। যাক্, আপনার সেই অতিমহদ্বয়টিকে দেখছি না যে?

বিজয়: রমেশ গেছে ডাক্তার দত্তর ডিস্‌পেন্সরীতে; একটা টনিক কিনতে। জানেনই তো—

বোর্ডার: খুব জানি—শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। শরীরের মায়া ওঁর ভয়ানক। তা' আপনি যাবেন কোন্‌দিকে?

বিজয়: লোদী রোডের দিকে।

বোর্ডার: ওঃ, আমি যাব করোলবাগের দিকে। তাহলে আমি এগোই।

বিজয়: আচ্ছা।

(বোর্ডারের প্রস্থান)

কিছুক্ষণ পর

বিজয়: আরে! অঞ্জলি তুমি!—এখানে!

অঞ্জলি: বলতে লজ্জা করছে না? সেই সেদিন রমেশবাবুকে নিয়ে গেছলে, তারপর তিনদিন আর পাত্তাই নেই বাবুর।

বিজয় : বা: ! অসুখ করেছিল যে।

অঞ্জলি : সাফাই হচ্ছে !

বিজয় : সত্যি বলছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা। দেখছ না, চুলে তেল নেই।

অঞ্জলি : সাবান দিলেও চুলে তেল থাকে না।

বিজয় : এই ভাখো, বিশ্বাস করে না।

অঞ্জলি : সেজেগুজে যাওয়া হচ্ছিল কোথায় ?

বিজয় : তোমাদের বাড়ীতেই তো যাচ্ছিলুম। তার আগেই তুমি এখানে ছুটে এসে আমাকে কী আশ্বাসই যে দিলে অঞ্জলি !

অঞ্জলি : আশ্বাস ?—কিসের ?

বিজয় : তোমার মনে আমার জায়গাটা যে কায়েমী হয়ে উঠেছে—তার প্রমাণটা আজ হাতে-নাতে পেয়ে গেলাম।

অঞ্জলি : আহা—যে-মানুষ রোজ আসে, সে তিন-দিন না এলে বুঝি খোঁজ নেয় না কেউ ?

বিজয় : হ্যাঁ।—প্রসাদ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী অঞ্জলি রায় খোঁজ নেন অখ্যাত বিজয় দাশগুপ্তের।

অঞ্জলি : আচ্ছা, রমেশবাবু কোথায় ? তাঁকে দেখছি না ?

বিজয় : সে বেরিয়েছে ডাক্তারখানার দিকে। চল অঞ্জলি, বেড়াতে বেড়াতে তোমাদের বাড়ীর দিকেই যাওয়া যাক্।

অঞ্জলি : আমাকে তোমাদের ঘর থেকে তাড়াতে চাও বুঝি ?

বিজয় : তোমাতে আমাতে একসঙ্গে বেড়াতে যাব বললুম ; তার মানে বুঝি তাড়ানো ?

অঞ্জলি : রসোই না বাপু একটু—দেখি তোমার ঘরটা একটু ঘুরে ফিরে।

বিজয় : কি আর দেখবে ? এই ত একটা নেয়ারের খাট, আর একটা টেবিল।

অঞ্জলি : আর আলমারীর কথাটা যে বাদ দিলে ? কিছু গোপনীয় আছে বুঝি ওর মধ্যে ?

বিজয় : হ্যাঁ, আছে বৈকি। একটি আইবুড়ো মেয়ের আঠারোখানা আঠারো রকমের ছবি আছে ওর মধ্যে। তার নাম অঞ্জলি।—বলবেই যখন, তখন ভাল করেই বোস—আমি নিচের চাকরটাকে বলে আসি গোটাকতক কাটলেট্ আনাতে। কদিনের জ্বরে মুখটা একেবারে বিস্বাদ হয়ে আছে।

অঞ্জলি : আচ্ছা, ওদিকের টেবলটা কার ?

বিজয় : ওটা রমেশের।

অঞ্জলি : ঠিক আছে।—তুমি এস। আমি ঠিক আছি।—

চলে গেল বিজয়। অঞ্জলি রমেশের টেবলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অঞ্জলি : বা: খাতার ওপরকার আঁকাটা তো ভারী সুন্দর।……রমেশ সেন…গানের খাতা…'বলাকা আসে ফিরে গগন ছেয়ে'……'মেঘলা দিনের গানের মালা'…'ভোরের আকাশ রাঙালো আজ'…'দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন কভু'—(পড়তে লাগলো)

দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন কভু,
তবু তোমারই মনে
গান যে আমার গাঁথা হত সুরে সুরে।
তোমার চোখের তারা দুটি যেন
হারখানি মেঘ ঘুরে
গানের আমার অঞ্জলি তাই
তোমারেই স্মরি……
গানের আমার অঞ্জলি…আমার অঞ্জলি…?

রমেশ প্রবেশ করল

রমেশ : অঞ্জলি দেবী !

অঞ্জলি : ও: ! রমেশবাবু !—এই এলেন বুঝি ? বিজয় একা বসিয়ে নিচে নেমে গেল কি না, তাই বসে বসে… আপনার গানের খাতাটা…শরীর ভাল আছে ?…বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

রমেশ : আ-আমি বরং নিচে গিয়ে দেখি বিজয়টা গেল কোথায় ?

অঞ্জলি : বসুন তো আপনি। আসছে ও' এখনি। আমি আজ গেস্ট্ কি না, তাই খাতির করে আমার জন্যে কাটলেট আনাতে গেছে।

রমেশ : ও:।

অঞ্জলি : কই, বসুন ?

রমেশ : হ্যাঁ। এই যে।

অঞ্জলি : সেই যে বন্ধুর সঙ্গে একদিন গেলেন আমাদের বাড়ীতে, আর তো ও-মুখোই হলেন না।

রমেশ : বিজয়ের মুখে শোনেন নি ? সেদিন রাত্রে ফিরে দুজনেরই যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

অঞ্জলি : শুনেছি।—বিজয়ের মুখটা শুকন দেখলুম। আপনাকেও কাহিল লাগছে একটু।

রমেশ : ও কিছু না।

অঞ্জলি : কবে যাবেন বলুন আমাদের বাড়ী ?

রমেশ : বিজয়ের সঙ্গে যাব এক দিন।

অঞ্জলি : কেন ? বিজয় সঙ্গে না থাকলে বুঝি ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাবে ?

রমেশ : বিজয়টা যে কী করছে এতক্ষণ···

অঞ্জলি : আপনার খাতাটা দেখছিলুম। শেষের কবিতাটা—ঐ যে—'দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন বলে,'—ওটার মাথায় অমন ক্রশ্‌ দিয়েছেন কেন ?

রমেশ : আমার কবিতায় বড্ড কাটাকুটি হয়। বদলাতে বদলাতে এক-একটা কবিতার একেবারে অন্য চেহারাই দাঁড়িয়ে যায়। ওটাও বদলে ফেলেছি কি না, তাই।

অঞ্জলি : যা ছিল, তা তো বেশ ছিল।

রমেশ : ঐ আমার বদরোগ। দিনের সঙ্গে আমার কোন কোন কবিতাও বদলে যায়।

অঞ্জলি : কোন্‌খানে বদল হল ?

রমেশ : সামান্য একটু।—লিখেছি—

'দেখেছি তোমায় ওগো স্বপ্নের বক্ষা
আমার গানের বক্ষা
তোমারে ভাসায়ে নিয়ে যাক্‌ সেই কূলে।
যেথা ফাল্গুনের হাসি ফুটে ওঠে
বিকশিত ফুলে ফুলে।

অঞ্জলি : অদেখার দেখা পাবার পর তো কাব্য ভেঙে যায় শুনেছি। ইয়্যারো আন্‌ভিজিটেড্‌, আর ইয়্যারো ভিজিটেড্‌-এর কথা মনে নেই ?

রমেশ : আমার জীবনে ঘটনা উলটো হয়ে গেল। দেখার পর অদেখা আরো গভীরতর ভাবে···

বিজয় ঢুকল

বিজয় : অঞ্জলি, নিজেই চলে গেলুম শেষ পর্যন্ত হোটেলে। এই রাখো—আরে! রমেশ এসে গেছিস! ভেরী গুড্‌। ভাবছিলাম, তোর কাটলেটটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বুঝি। ঠিক সময়েই এসে পড়েছিস। নে, টিপয়টা সরিয়ে - আন্‌,—এগুলো রাখি। রামভরসাকে চা করতে বলেছি।

দিন যায়। রমেশ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যায়, আসে, গান শোনায় অঞ্জলিকে। দিন যায়।

অঞ্জলির জন্মদিন। কিন্তু কারই বা মনে আছে সে কথা ? মনে রেখেছে কিন্তু বিজয়। একা এসেছে আজ তাই সে। নিভৃতে ডেকে নিয়েছে অঞ্জলিকে বসিবার ঘরটায়। তখন সন্ধ্যা। চাঁদ উঠেছে আকাশে।

বিজয় : অঞ্জলি—তোমার জন্মদিন এমনি নিভৃতে চুপিচুপি আসুক বারবার। হট্টগোল নয়—এমনি অনাবিল শান্তির মধ্যে। এই একটি দিন আমি স্বার্থপর হতে চাই অঞ্জলি। এ দিনটি শুধু থাক তোমার আর আমার। তার মাঝে আর কেউ নয়—কিছু নয়। তাই, রমেশকে জানাইও নি যে তোমার জন্মদিন আজ। ওকে না জানিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে একা। তোমার জন্মদিনের তারিখটি শুধু তোমার আমার ছাড়া আর কারুর না হয় নাই বা পড়ল মনে ; পৃথিবীর আর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে না হয় নাই হল জানানো।

টুন্টু এসে ঢোকে

টুন্টু : দিদি, দিদি,—আরে, তোমরা এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, আর আমি সব ঘর খুঁজছি।—এই নাও, রমেশবাবুর কাছ থেকে কে একজন সাইকেল কোরে তোমার একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

বিজয় : রমেশের ? কই কি লিখেছে দেখি ?

টুন্টু : এই নিন।—আমি চললুম দিদি।

টুন্টু চলে যায়

অঞ্জলি : চিঠিটা কিন্তু আমার।

বিজয় : (হেসে) লেখক কিন্তু রমেশ। কাজেই, আমার পড়তে বাধা থাকবার মত চিঠি এ নিশ্চয়ই নয়। চেঁচিয়েই পড়ি—"প্রিয় অঞ্জলি দেবী, আপনার জন্মদিনে নতুন গান শোনাতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু···" ওঃ! লেখক রমেশ হলেও এ-চিঠিটা সত্যি একান্তই তোমারই

অঞ্জলি। আমার চিঠিটা খোলা নিতান্তই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ভাবতে পারিনি যে···

চিঠিটা অঞ্জলির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বিজয় চুপ করে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা যেন অনুভব করবার চেষ্টা করে। অঞ্জলি নীরব। এক সময় কম্পিতকণ্ঠে বিজয় বলে—

বিজয়: অঞ্জলি—একটা আংটি এনেছিলুম ছোট—ভেবেছিলুম তোমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু না—জন্মদিনের উপহার। দেব কি পরিয়ে?

অঞ্জলি: দাও।

পরদিন সকালবেলাতেই বিজয় এসে হাজির অঞ্জলিদের বাড়ীতে

অঞ্জলি: তুমি!—সকালে! ব্যাপার কি? আপিস নেই?

বিজয়: আছে।—শোন অঞ্জলি, আজ একটা ভাল 'ছবি' এসেছে 'অডিয়ন্' সিনেমায়। যাবে আমার সঙ্গে?

অঞ্জলি: নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু—

বিজয়: তাহলে কথা রইল—আমি আপিস থেকে সোজা যাব সিনেমা হাউসে। তুমি ঠিক সময়ে যেয়ো কিন্তু।

অঞ্জলি: নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি এমন হাঁপাচ্ছ কেন?

বিজয়: আর অঞ্জলি—একটা কথা।—তোমার সেই মুর্শিদাবাদী সিল্কের চাঁপা শাড়ীটা পরে যেও আজ। সেই আমাদের প্রথম-দেখার দিনে যে-শাড়ীটা ছিল তোমার গায়ে—সেইটে। আর সেই লাল ভেল্‌ভেটের ব্লাউজ।

অঞ্জলি: (হেসে) আবার কি প্রথম থেকে সুরু করতে চাও নাকি?

বিজয়: না।—সেই প্রথম দিনের মতন করেই তোমাকে আবার আবিষ্কার করতে ইচ্ছে হচ্ছে নতুন করে।

অঞ্জলি: তাই হবে।

বিজয়: তাহলে সাড়ে পাঁচটার সময় সিনেমা হাউসের সামনে।

সিনেমার সন্ধী। ওয়ার্নিং-এর ঘন্টা বেজে বেজে থেমে গেছে। বিজয় তখনো একা দাঁড়িয়ে

জনৈক ব্যক্তি: কাকুর আসবার কথা বুঝি?

বিজয়: কেন বলুন তো?

ব্যক্তি: শো আরম্ভ হয়ে গেল, অথচ দাঁড়িয়ে আছেন—তাই—

বিজয়: ওঃ, হ্যাঁ।

ব্যক্তি: কিছু যদি মনে না করেন—আপনার টিকিট দুটো কাউন্টারে ফেরৎ না দিয়ে যদি আমাকে বিক্রি করেন তাহলে···মানে হাউস ফুল হয়ে গেছে কি না।—মেয়েদের নিয়ে এসেছি, মানে—

বিজয়: এই নিন।

ব্যক্তি: ওমশাই—আরে ও মশাই—দামটা? টিকিটের দামটা?

বিজয় ততক্ষণে টাঙ্গার টায়ে বসেছে

বিজয়: এই টাঙ্গা জোরসে চালাও।

বাইরের ঘরটায় বসে বুল্টু 'মেকানো'র সেট্ নিয়ে লোহার ব্রীজ তৈরী করছিল। ঝড়ের মত ঢুকল বিজয়

বিজয়: বুল্টু শোনো।

বুল্টু: (তন্ময়) একটু বিজয়দা—এই নাটটা লাগিয়ে নেই আগে—নৈলে—

বিজয়: দিদি কোথায়?

বুল্টু: বাবা-মা-দিদি সবাই কোথায় চা-পার্টিতে··· না না দিদি নয়, শুধু বাবা আর মা গেছেন। দিদি বোধ-হয় ভেতরেই আছে।

বিজয়: ওঃ।

বিজয় ভিতরে ঢুকে অঞ্জলির ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কান পাতল দরজায়। ঘরের ভিতর তখন অর্গ্যানটা টুংটাং করে বাজতে বাজতে থেমে গেল। শোনা গেল অঞ্জলির কণ্ঠস্বর—

অঞ্জলি: অপূর্ব্ব হয়েছে আপনার এ-গানটা।

রমেশ: আপনার জন্মদিনে নতুন গান শোনাতে পারিনি—তাই আজ নতুন গান তৈরী হতেই—

অঞ্জলি: কাল আরো একটা নতুন গান চাই কিন্তু। ওঃ, লাস্ট্ গানটা আপনার সত্যি অপূর্ব্ব হয়েছে—(গুণ গুণ করে)—'বরাকুলে গাঁথা মালাখানি মোর পরা গো গলে, ভিজায়ে এনেছি চোখের জলে'।—আচ্ছা, এসব গান কখন্ লেখেন? কখন্ সুর দেন?

রমেশ : আপিসের সময়টুকু ছাড়া সমস্ত দিন।—এই নিয়েই তো কাটে দিন। কোনদিন গান বাঁধি, ছবি আঁকি বা কোনদিন।

অঞ্জলি : এমন গান লেখেন, এমন সুর দেন—প্রচার করেন না কেন?

রমেশ : গান আমার খাতায় থাকে, সুর আমার মনে। শোনাব, এমন লোক পাইনি।

অঞ্জলি : যে লাজুক আর যে কুনো আপনি! পাবেন কোথায় শ্রোতা?

রমেশ : আর সকালে আপিস কামাই করে তিন-খানা গান বেঁধে ফেললুম। গান নিজের খেয়ালেই বেঁধেছি এতদিন, শ্রোতার কথা ভাবিনি। আজ কি জানি, গান বেঁধেই মনে হল, কাউকে না শোনালে যেন চলছে না। হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ে গেল তাই—

অঞ্জলি : এবার থেকে নতুন কোন গান বাঁধলেই আমাকে মনে পড়ে যাওয়া চাই কিন্তু। গান যে আমি কী ভালবাসি তা জানেন না তো।

দেয়াল ঘড়িতে সাড়ে ছটার ঘণ্টা বাজে

অঞ্জলি : (চমকে) ইস্! সাড়ে ছটা!—দেখেছেন—আপনার গানের ঝোঁকে এক জায়গায় যাবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যাব, কথা দেওয়া ছিল।

রমেশ : ছিছি—দেখুন তো—গান শোনাতে এসে আপনার কত ক্ষতি করে ফেললুম। আজ আমি উঠি।

অঞ্জলি : উঠবেন?—আচ্ছা।—কিন্তু মনে থাকে যেন, এবার থেকে আপনার প্রত্যেকটি নতুন গানের প্রথম শ্রোতা আমি।

রমেশ : নিশ্চয়ই মনে থাকবে। আচ্ছা—নমস্কার অঞ্জলি দেবী।

অঞ্জলি : নমস্কার।

চলে গেল রমেশ। অঞ্জলি চুপচাপ বসে রইল ঘরে। বিজয় এসে ঢুকল খানিকটা পরে

বিজয় : অঞ্জলি!

অঞ্জলি : (চমকে) বিজয়!—রাগ কোর না বিজয়, প্লীজ্! বাঃ রে, কথা বলছ না কেন? প্লীজ্, প্লীজ্ বিজয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে সিনেমায়? খুব রাগ হচ্ছিল তো?—আইস্‌ক্রীম্ আনব? মা চুপুরে তৈরী করেছেন কমলালেবু দিয়ে।—আমার দোষ কি বলো? কাপড়জামা বদলে তৈরীই তো ছিলুম, হঠাৎ···হঠাৎ···হঠাৎ তুলকমান রোডের বোসসিন্নীর মেয়েরা এসে পড়লেন···কাল অবধি আছে নিশ্চয়ই ছবিটা? কাল ঠিক যেতে হবে। কালকের টিকিট আমি কাটবো কিন্তু; হ্যাঁ?—দাড়াও আইসক্রীমটা আগে আনি।

বিজয় : আইস্‌ক্রীমের দরকার নেই।

অঞ্জলি : না। আইস্‌ক্রিম তোমায় খেতেই হবে। নৈলে বুঝব তুমি আমাকে ক্ষমা করনি।—বল তাহলে রাগ করনি?

বিজয় : বোসো অঞ্জলি, কথা আছে।

অঞ্জলি : তোমার গলার স্বর আজ যেন কেমন কেমন···কি কথা?

বিজয় : আমাদের বিয়ের তারিখটা আর ফেলে রাখা উচিত নয় অঞ্জলি। এবার—

অঞ্জলি : হাসালে তুমি! এত ব্যস্ত কেন? আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি? না, তুমিই পালিয়ে যাচ্ছ? পাগল কোথাকার! প্রোপোজ্যালটা আমাদের মুখ থেকে না বেরিয়ে বাবা-মার মুখ থেকে বেরলেই ভাল হয় না কি?—বোসো, আইস্‌ক্রীমটা আনি।

অঞ্জলিদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে বিজয় একা পথে পথে ঘুরল অনেকক্ষণ। তারপর, একটু রাত করেই ফিরল মেসে। রমেশ তখন তার নোংরা খাটিয়ায় মাথার তলায় দুটো হাত জড়ো করে শুয়ে আছে।

রমেশ : এই যে বিজয়, কোথায় গেছলি রে?

বিজয় : 'অডিয়নে' সিনেমা দেখতে।—তুই?

রমেশ : আমি···ঐ···

বিজয় : আচ্ছা রমেশ তোর প্রত্যেকটি নতুন গানের প্রথম শ্রোতা এতদিন আমিই ছিলুম, তাই না?

রমেশ : একথা কেন বলছিস?

বিজয় : এমনি।···খাওয়া হয়ে গেছে তোর?

রমেশ : তার মানে? দুজনে একসঙ্গে ছাড়া খেয়েছি কোনদিন?

বিজয় : একসঙ্গে?—আচ্ছা তাই হোক্।

রমেশ : কথাগুলো আজ যেন তোর কেমন···

বিজয় : রমেশ ?

রমেশ : বল্।

বিজয় : আমরা দুজনে কেমন যেন ক্রমেই তফাৎ হয়ে যাচ্ছি।

রমেশ : একথা কেন বলছিস বিজয় ?

বিজয় : কি জানি কেন, মনে হচ্ছে, দুজনে যেন দুজনকে কেবলই এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছি।—রমেশ ?

রমেশ : বল্।

বিজয় : অনেকদিন দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হয়নি। তাই না ?

রমেশ : সত্যি।—অনেকদিন।

বিজয় : কাল তো ছুটি ; চ'না দুজনে বেড়িয়ে আসি কোথাও।

রমেশ : অঞ্জলি দেবীকে বলবিনা ?

বিজয় : না। আগেকার মত শুধু তুই আর আমি। আর কেউ নয়।

রমেশ : বেশ তো। কোথায় যাবি বল্ ?

বিজয় : চ' কুতুবে যাই। ও-ধারটায় যাওয়া হয়নি বহুদিন।

রমেশ : কুতুব ?

বিজয় : ভয় নেই। তুই নাহয় নাই উঠবি উপরে। তাহলে তো আর আপত্তি নেই তোর।

রমেশ : সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার পর থেকে শরীরটা সত্যিই হয়ে আছে কি না···

বিজয় : ঠিক আছে।—তোকে উঠতে হবে না। তুই নিচেই থাকিস্।

কুতুবমিনারের শেষতলার বারান্দা। উড়ে যাওয়া ঘড় ফিরে এল আবার। তার সঙ্গে অতীত উড়ে গিয়ে ফিরে এল আবার। বিজয়ের চোখের ওপর থেকে ছ'মাস আগেকার ঘটনাগুলো মিলিয়ে গেল। আকাশ অন্ধকার। ঘড়ের যাওয়ার প্রথম ধাক্কার স্বাভাবিক নৈঃশব্দের পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে তখন। বিজয় বাইনোকুলারটা নামিয়ে নিল চোখ থেকে। আবার কে যেন ডেকে উঠল কানের কাছে—

মন : বিজয় ?

বিজয় : কে ?

মন : তোমারই মন।—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

বিজয় : কি চাও ? কি বলতে চাও তুমি ?

মন : ঐ যে ওধারে রেলিঙ্-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরোনো ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়েছে রমেশ বলে যুবকটি—ও তোমার কে ?

বিজয় : বন্ধু।

মন : যদি বলি শত্রু ?

বিজয় : না।

মন : আজ যদি রমেশ সেন বলে কেউ না থাকত দিল্লীতে—অঞ্জলি তার তাহলে আজ একান্তই শুধু বিজয় দাশগুপ্তের হতে পারত না কি ?

বিজয় : তুমি যাও, যাও, যাও।

মন : আজ অঞ্জলির জীবনে এসে গেছে দু-দুটি পুরুষ—রমেশ আর বিজয়। ছ' মাস আগেকার এঞ্জিনীয়ার বিজয় দাশগুপ্তর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আজ শিল্পী রমেশ সেন। কাকে বঞ্চিত করে কার গলায় মালা দেবে—আজ আর অঞ্জলি কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছে না।

বিজয় : কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলতে পারে ?—কতদিন আর অপেক্ষা করা চলে ?

মন : রমেশের সঙ্গে যদি তোমার বন্ধুত্ব না হোত কোনদিন, বেশ হোত তাহলে ;—তাই না ? তাহলে অঞ্জলির জীবনে তুমিই হতে পারতে একমাত্র পুরুষ। সত্যি,—রমেশ সেন বলে কেউ যদি না থাকত পৃথিবীতে !

বিজয় : সত্যি, রমেশ কেন এল পৃথিবীতে ?—এল যদি, দিল্লী ছাড়া আর কোথাও কি চাকরি পেল না ও' ?—উফ্ ! রমেশ বলে যদি কেউ না থাকত এই এই পৃথিবীতে !

মন : উঁহু-হু-হু ! বিজয়, উত্তেজনার বশে পাঁচিলের খুব ধারে এগিয়ে গেছ তুমি। মনে নেই নিচে গাইডের কথা ?—সরে দাঁড়াও ! পরশুদিনই তো একজন বারান্দা থেকে হঠাৎ আচম্‌কা···

বিজয় : আচম্‌কা !—সত্যি, আচম্‌কা পড়ে যেতেই তো পারে মানুষ। পরশুদিন গেছেও তো একজন পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শেষও হয়ে গেছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ! এখান থেকে আচম্‌কা পড়ে যাওয়াটা কি খুবই অস্বাভাবিক কিছু ?

মন : মোটেই না।

বিজয় : কিন্তু…

মন : বিজয়, পিছন ফিরে তাকাও একবার রমেশের দিকে। একমনে কি ভাবছে ও' বলত? অঞ্জলির কথা? নতুন কোন গানের সুর? রমেশের ঘাড়ের ওপরকার আঁচিলটা কর্সা রঙের ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—না?

বিজয় : হাঁ।

মন : আচ্ছা, ঐ যে রমেশ দাঁড়িয়ে আছে পাঁচিলের ধারে অন্যমনস্ক হয়ে—যদি আচমকা পড়ে যায়? এমনও তো হতে পারে—টাল সামলাতে না পেরে রমেশ পড়ে গেল এই উঁচু থেকে! খুব কি অস্বাভাবিক ব্যাপার রমেশের পড়ে যাওয়াটা?

বিজয় : না।

মন : তাহলে?—ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছে রমেশ অন্যমনস্কভাবে পাঁচিলে ঠেস্ দিয়ে। হঠাৎ যদি কারুর ছোট্ট একটু ধাক্কা লাগেই ওর পিঠে!…

বিজয় : না।—ও আমার বন্ধু।

মন : পৃথিবীর কেউ কোন দিন কল্পনাও করতে পারবে না সেকথা। জানতেও পারবে না, কুতুবমিনারের চূড়ো থেকে যে পড়ে গেল—তার গায়ে ধাক্কা দিয়েছিল কি না কেউ।

বিজয় : তারপর?

মন : অঞ্জলির জীবনে থাকবে শুধু একজন…শুধু একজন!…থাকতেই হবে…শুধু ছোট্ট একটা ধাক্কা… পারবে না তুমি ধাক্কা দিতে?…কেন পারবে না?… পারবে…পারবে…পারতেই হবে তোমাকে বিজয়…না পারলে তোমার চলবে না, তোমার চলবে না!!!… হাঁ, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও…এইবার…হাঁ…এইবার রমেশের পিঠের ওপর ছোট্ট একটু…

রমেশ : (চমকে) কে?—বিজয়?

বিজয় : না।—হ্যাঁ। আ—আ আমি।…একটু জল একটু জল দিবি রমেশ তোর জলের বোতলটা থেকে? …তোকে ডাকতে যাচ্ছিলুম পিঠে হাত দিয়ে—ডাকতে যাচ্ছিলুম…তুই চমকে উঠেছিলি বুঝি?

কোন কথা না বলে রমেশ জলের গেলাস এগিয়ে দেয় বিজয়ের দিকে

মন : বিজয়?

বিজয় : উঁ?

মন : রমেশ কি টের পেয়েছে কিছু? নৈলে ও' অমন করে তাকিয়ে আছে কেন তোমার দিকে? —ও' কি বুঝতে পেরেছে?—না, না, তা কেমন করে টের পাবে? এ কি ভাবা যায়? এতখানি সন্দেহ বন্ধু বন্ধুকে করবে কেমন করে?—কিন্তু তাহলে ও' কথা বলছে না কেন?—কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তোমার দিকে। ওর চোখ দুটোতে তাহলে কিসের ঐ অপার বিস্ময়ের চিহ্ন! বিজয়, দেখো না, দেখো না ওর দিকে, ওর চোখে চোখ পড়লে পাগল হয়ে যাবে তুমি! বড্ড হাঁপাচ্ছ তুমি বিজয়—জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও। পারছ না জল খেতে?—আচ্ছা রমেশ কি হাসছে? ওর মুখে ও-কিসের চিহ্ন ফুটে উঠছে তবে? হাসির না কান্নার? কি একটা লিখছে রমেশ কাগজে?—কি লিখছে? গান? —কাগজটা ও' দূরবীক্ষণের থলি-বাক্সে রেখে দিলে। আবার ও' সেই শব্দহীন অদ্ভুত হাসি হাসছে তোমার দিকে চেয়ে।—অসহ্য! অসহ্য! —এ হাসি অসহ্য! —কিন্তু রমেশ পাঁচিলে অমন ঠেস দিয়ে দাঁড়াচ্ছে কেন? অত ঝুঁকে কি দেখছে ও' নিচের দিকে!……

বিজয় : (আর্তনাদ কোরে ওঠে) রমে-এ-এ-এ-এ-শ

থানোগা এসেছেন

দারোগা : মৃতব্যক্তির নাম?

বিজয় : রমেশ সেন।

দারোগা : ওঁকে চিনতেন?

অবিনাশ : ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না।—পরম বন্ধু ছিলেন ওঁরা দুজনে।

দারোগা : আপনি?

অবিনাশ : আমার নাম অবিনাশ সেনগুপ্ত। আজই ঐ কুতুবের উপরেই ওঁদের সঙ্গে আলাপ।

দারোগা : উনি কি করে পড়ে গেলেন আপনি কিছু বলতে পারেন?

মালী : (অস্পষ্ট কণ্ঠ) আমি জানি।—পরশু-দিনের সেই অপঘাত মৃত্যুর আসা বাছাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

দারোগা : মৃতব্যক্তি কি আপনার কেউ হতেন?

অবিনাশ : আজ্ঞে না। উনি আমার মাসিমা।

মাসী : ওরে 'না' কি বলছিস?—ও যে আমায় মাসীমা বলে ডাকলে—বড়দির কোয়ার্টারের ঠিকানা নিলে—আমি যে ওকে—

দারোগা : ওঁকে একটু তফাতে নিয়ে যান।

অবিনাশ : মাসী—এসো এসো—একটু এদিকে এসে বোসো তো।

দারোগা : এবার বলুন তো আপনি বিজয়বাবু, উনি কেমন করে পড়ে গেলেন?

বিজয় : এই নিন।

দারোগা : দূরবীণের বাক্স?—কি হবে?

বিজয় : ওর ভেতরে কাগজ আছে—রমেশের হাতের লেখা! ওর শেষ হস্তাক্ষর। শেষমুহূর্তেও ওর হাতের লেখা কেমন মুক্তোর মতন পরিষ্কার দেখেছেন!

দারোগা : (কাগজ পড়ছেন) "আমি আত্মহত্যা করলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় পৃথিবীতে। শরীরটা সত্যিই সামান্য জিনিস; তার ওপর বেশি মায়া করা উচিত নয়। বিজয় ও অরুণি সুখী হোক, সুখী হোক ওরা। রমেশ সেন।"

বিজয় : (কেঁদে উঠল) মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!! যাবার সময় প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা লিখে গেছে ও'। ও' আত্মহত্যা করেনি ইন্‌স্‌পেক্টর—আমি বলছি ও আত্মহত্যা করেনি। শরীরকে ও' বড্ড ভালবাসতো, জীবনে ওর বড় মায়া! ও' আত্মহত্যা করেনি, ও' আত্মহত্যা করতে পারে না ইন্‌স্‌পেক্টর—আমি···আমি··আমিই ওকে মেরে ফেলেছি সার্জেন্ট্! তুমি আমাকে ছেড়ো না—আমাকে ছেড়ো না—আমাকে ছেড়ো না!·····

শিশু-পাঠ্য সাহিত্যের স্বরূপ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

অপাঠ্য সব পাঠ্য কিতাব সামনে আছে খোলা
কর্তৃজনের ভয়ে তাহা কুলুঙ্গিতে তোলা।

একটি বারো বৎসরের বালক অতি নিবিষ্ট মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়িতেছে। পড়িতেছে না যেন গোগ্রাসে গিলিতেছে! তার চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত আগ্রহ উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানা সে একটু সংগোপনেই পড়িতেছে, কারণ উহা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ বই। কর্তৃজনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াই তাহাকে এই দুষ্কর্ম সমাধা করিতে হইতেছে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ও একান্ত তন্ময়চিত্তে বালক এক অপরূপ রোমাঞ্চ-ঘন অনুভূতির আনন্দটুকু আকণ্ঠ পান করিতেছিল। এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নূতন জগতের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিতেছিল এই কাহিনীর মাধ্যমে। বালকটি নিঃসন্দেহই পড়িতেছিল, যদিও নিঃসঙ্গ পঠনের বয়স তখন পুরোপুরি তাহার হয় নাই।

এক অপূর্ব ভাষার ঝঙ্কার ও ভাব-ব্যঞ্জনায় বালকের মন অভিভূত। যাহা পড়িতেছিল তাহার বেশীর ভাগ কথার অর্থই সে জানে না। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পঠিত অংশটি একটি মনোহর কল্পলোকের আভাস আনিয়া দিতেছিল:

"× × × সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া × × আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। কেমন শ্রীল অনন্ত সমুদ্র। উচ্চ পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, তুষীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে জলে কেন-রেখা হেমকান্ত রৌদ্রতে শুভ্র হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলঙ্কারস্বরূপ। অস্তগামী দিনমণির দূরস্থ কিরণে নীলজলের একদেশ ত্রিধীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির লঘুস্রোত বেতসপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলবিহঙ্গের উড়িতেছিল।"

সেই লঘুগামী জাহাজটির সঙ্গে সঙ্গে বালকের কৌতূহলোদ্দীপ্ত মনটিও এক অজানা মহাদেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক পড়া বালকের পক্ষে মানা। যে কোন বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন অভিভাবকই এই নীতির সমর্থক—অতি সতর্কতার সঙ্গেই নাটক-অঞ্চলের ছুঁই ছোঁয়াচ হইতে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এই ঢাক-ঢাক-নীতির সুফল প্রয়োগের ফলেই আজ ছোটদের বঙ্কিম, ছোটদের শরৎচন্দ্র, ছোটদের সেক্সপীয়রে ছাওয়া দুধের-স্বাদ-ঘোলে-মেটানো সাহিত্যের এত ছড়াছড়ি। যে কোন সাহিত্যেই ক্লাসিক-পর্যায়ভুক্ত রচনা—যার মূল্য কালের নিকষে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, যে রচনা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ, সে শ্রেণীর রচনাকে নিছক

বয়সের অনুপাতে বা নীতির দোহাই দিয়া কিশোরপাঠ্যের পক্ষে "অনধিকার প্রবেশ" বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলে হিত অপেক্ষা অহিতের সম্ভাবনাই বেশী।

প্রত্নতত্ত্বে বিভিন্ন অনেকটা অজ্ঞাত মহাদেশ পর্যটনের মতোই বিস্ময়প্রদ এবং নব নব অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। কৃত্রিম বাধানিষেধে এই ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। বাংলা সাহিত্যে যেমন মাইকেল, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বিরাটপ্রতিভাকে বাদ দিয়া কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থাগার সংগঠন সম্ভব নহে, তেমনি ইংরাজীতে স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, জেন অস্টেন এবং পরবর্তী কিপ্লিং, উয়াল-হাডি, অস্কার ওয়াইল্ড, গলস্‌ওয়ার্দী প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাগণও অপরিহার্য। কিপ্লিং সাম্রাজ্যবাদী, ওস্কী মনোভাবাপন্ন লেখক—এই অজুহাতে অনেকে কিপ্লিং-পাঠের বিরোধী। দেখা যায় কোন একটা সময়ে ইংরাজ ছেলে-মেয়েরাই পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতে শিখিল। সুতরাং কিপ্লিং পাঠ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী বৃদ্ধি পাইয়াছে—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না।

যে কোন একখানা বিশেষ ধরণের গ্রন্থ একজন সাধারণ প্রবীণ ও প্রাপ্তবয়স্কের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, অনেক ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোর পাঠকের মনে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারে। প্রাজ্ঞ ও প্রবীণের ভাবাবেগের মাপকাঠিতে শিশুচিত্তের পরিমাপ সঙ্গত হয় না। প্রবীণ যে আশঙ্কায় বই বিশেষের সংস্পর্শ হইতে শিশুকে দূরে নিরাপদ রাখিতে চান, বাস্তবিক পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সেই আশঙ্কা অমূলক। স্যর ওয়ল্টার স্কটকৃত "আইভ্যান হো", "লেডী অফ দি লেক", ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কৃত "হ্রদবন্দের প্রেম," বায়রন সেক্সপীয়রটস কৃত "আরব্য পাইরেট" ইত্যাদি বই হাজারে হাজারে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘুরিতেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এই জাতীয় দুঃসাহসিক অভিযান অথবা বহুবাদের দুর্বৃত্তের (Noble Bandit) রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়িয়াই দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিবে এরূপ ভয় সত্যই অমূলক। কিন্তু এই আশঙ্কার যদি শিশুকে গ্রন্থ-জগতের বিচিত্র ও বিপুল ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যায় তবে তাহার একটা অপূরণীয় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। শিশু বড় হইয়া উঠিবে, কিন্তু গ্রন্থপাঠের প্রতি তাহার রুচি বা আগ্রহ সৃষ্টি হইবে না। গ্রন্থপাঠে কতো সংখ্যক শিশু বা কিশোর অহিতগ্রস্ত হইয়াছে—ইহার কোন সঠিক হিসাব নাই বটে, কিন্তু একথা ধ্রুব যে গ্রন্থপাঠ না করিয়া, অথবা গ্রন্থপাঠের সুযোগলাভে বঞ্চিত থাকিয়া যাহারা অহিতগ্রস্ত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদের তুলনায় গ্রন্থপাঠকের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য।

শিশুচিত্তকে গ্রন্থমুখী করিয়া তুলিবার প্রধান উপায় শিশুকে গ্রন্থাগারের অবাধ স্বাধীনতা (Freedom of the library) দান। নেতিবাচক বাধানিষেধ প্রত্যাহার করিলে তাহার অনিষ্টই সাধন করা হয়। শিশুর বেলাতেই হউক আর প্রাপ্তবয়স্কের বেলাতেই হউক—পাঠানুরাগ চমকিত করিবার বড় কৌশল পাঠককে বইয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া এবং পাঠককে বইয়ের সান্নিধ্যে লইয়া আসা। অযাচিত বইগুলি শিশু-পাঠক বা বয়স্ক-পাঠকের হাতে তুলিয়া না দিলেও কিছু কিছু অযাচিত বই আপনা আপনিই তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। বস্তুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাঠক নিজেই নিখুঁতভাবে উত্তম-অধমের বিচার সাধন করিয়া লয়। যোগ্যতমের উদ্বর্তন এক্ষেত্রেও স্বতঃসিদ্ধ।

যে সাহায্য শিশু-কিশোর পাঠককে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন তাহা হইল মূলতঃ শিশু-পাঠককে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার সহিত পরিচিত করিয়া তোলা।

কোন লেখকের পর কোন লেখকের লেখা বই পড়া সমীচীন, অথবা লেখক বিশেষের কোন বইখানা প্রথমে শুরু করা উচিত, কোন বইখানার পর কোন বই পড়িলে সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় এবং এলোমেলোভাবে কতকগুলি বই লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে অধিকতর সুফল অর্জন করা যাইতে পারে—ইত্যাদি বিষয়েও শিশু ও কিশোর পাঠককে নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক।

শিশু-পাঠককে তথাকথিত 'শিশু-সাহিত্যের' কৌতূহলের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখা একান্ত অসমীচীন। 'শিশু-সাহিত্যের' রচয়িতা শিশুরা নহে। 'শিশু-সাহিত্য' রচনা করেন বড়োরা। এ যেন অনেকটা শিশুরাজ্যে অনধিকার প্রবেশের মতো। শিশু কি চায় তাহা শিশুই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে জানে। শিশুর কাছে এই জগত এক অতি বৈচিত্র্যময় রূপেই প্রকটিত হয়। শিশু মন নিত্য নব নব অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহস্যের অনুসন্ধানের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।

আর সৌভাগ্যক্রমে জগতের বহু সাহিত্য সত্য, সুন্দর ও শাশ্বত সৃষ্টির সম্পদে এতো সমৃদ্ধ, যে উহাদের সাথে কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট উপাদানের অনু-প্রবেশ অপরিহার্য হইলেও তাহাতে আশঙ্কার হেতু কিছু নাই। আর সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ভিতর দিয়াই শিশুর কাছে বিশ্বরহস্যের দ্বার উন্মোচন ঘটে।

শিশুরা কি চায়? শিশুরা কি ভালবাসে? এই প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—শিশুরা চায় খেলা, শিশুরা ভালবাসে তামাসা-কৌতুক। শিশুর কল্পনারাজ্যে ভূতা উদ্ভট, আজগুবি, অসম্ভব ও অসম্ভবের ছড়াছড়ি। খেয়াল-রসের জিয়েনে জগতের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকেরা শিশুমনের উপযোগী যেসব অপূর্ব আহার্য তৈরি করিয়াছেন। খেয়াল-রসই শিশু-চিত্তের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

আয়রে খোকা খেয়াল খোকা
স্বপন দোলা দোলিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আয়োজ-আয়োজ
নয় মায়ের মাথিয়ে আয়।

পরলোকের রঙীন আকাশে উপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতোই শিশু-কল্পনা অবাধে বিচরণ করে। কল্পনার সাহায্যেই শিশু তার চতুর্দিকে এক সীমাহীন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া লয়—যার প্রকৃত খোঁজ-খবর প্রাজ্ঞ প্রবীণের অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরে। সেই অনন্তর ও অবাস্তব কল্পনা-রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষকেই একদিন ইতস্তত বিচরণ করিতে হয় বটে, কিন্তু কঠোর বাস্তব জীবনের নানা রূঢ় অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে সেই শৈশবদিনের কল্পনা রঙীন মুহূর্তগুলি কোথায় যেন হারাইয়া যায়। শিশু-মনস্তত্ত্ব ও সংবেদনশীল কবি ও শিল্পী ছাড়া বাস্তবধর্মী হাট-বাজারের পক্ষে শিশুমনের বিচিত্র খেয়ালগুলির খোঁজ খবর রাখা সম্ভব নহে। সেই কল্পনা-জগতের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির হিসাব রাখা আর-কাহারো সাধ্য নহে। সেই কল্পনা জগতেরই একটি চিত্র :

যেথায় রঙীন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ধরণী ভোলে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে,
রঙীন আকাশ রঙীন মন
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণ।

ঊর্বর কল্পনায় কতো অদ্ভুত, কতো উদ্ভট, কতো চমকপ্রদ, কতো খাপছাড়া কথাই না দানা বাঁধিয়া উঠে! আর সেই সৃষ্টি ছাড়া, অর্থহীন কথাগুলিই সুনিপুণ শিল্পীর হাতের গুণে এক অনবদ্য শিশু-সাহিত্যে পরিণত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে বিখ্যাত শিশু-গ্রন্থ "এ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" "(Alice in wonderland by Lewis Carroll)" এবং জে, এম্ ব্যারীর পিটার প্যান এণ্ড ওয়েণ্ডি (Piter Pan and Wendy by J. M. Barrie) এই জাতীয় সাহিত্য।

অর্থহীন আবোল-তাবোল কথার ছড়া শিশু, আর কেবল শিশু কেন, শিশুর বাবা-মা, কাকা-দাদা প্রভৃতির কাছেও কতো প্রিয়—সেকথা সুকুমার রায়ের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই জানেন।

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রুম্, শুনে লাগে খট্‌কা,
ফুল ফোটে? তাই বল। আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্ পন্, জ্বরে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?
ধর্ম্ম ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন মাচে শোন—থেই থেই বিদ্যা!

অথবা ইংরাজী ছড়া :—

Hey diddle diddle
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the Moon;
The little dog laughed
To see such sport,
And the dish ran away with the spoon.

নিছক কথার মারপ্যাঁচ, শব্দের অনুকৃতি! কিন্তু তাই কতো সুন্দর। অর্থ নাই—বা থাকুক! অনর্থক কথাগুলিই কি অনবদ্য!

ইংরাজের সব সেরা সাহিত্যেই নন্‌সেন্স ভার্স (Nonsense Verse) একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আমার এই নন্‌সেন্স ভার্সের ভিতর দিয়া কোন সমসাময়িক ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও বর্ষিত হইয়া থাকে।

'What Pitt is to Addington,
London is to Paddington.'

আঠারো শতকের প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিটের সহিত তুলনায় তাঁহার উত্তরবর্তী এ্যাডিংটনের নগণ্যতা বুঝাইয়া দিতেছে উপরোদ্ধৃত ছড়াটি। তৎকালীন লণ্ডনের পথে ঘাটে ছোকরা ছেলেরা মুখে মুখে এই ছড়া কাটিত।

বছর তিনেক পূর্বে প্রেসিডেণ্ট হুভারের (Hoover) আমলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাদক-বর্জন নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। মদ্য-পিপাসী ইয়াঙ্কীদের মনোভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নোক্ত ছড়ার ছন্দে। তৎকালীন বৃটিশ-রাজে পঙ্কর কর্ত নাকি এই ছড়াটি শুনিয়া ভারী আমোদ পাইতেন। পাইবার কথাই, কারণ পঙ্কর গর্ত ছিলেন সুরা-রসের একজন অকৃত্রিম সমঝদার।

"Four and twenty Yankees, feeling rather dry.
Slipped across to Canada to have a drop of rye.
When the rye was opened
The yanks began to sing
"Who the hell is Hoover?
God save the King!"

এই ধরণের ছড়া বাংলাতেও বিস্তর আছে। একটা নমুনা—

পুঁটুরাণীর বর

"দোলায় চড়ি আসার দিনে
চারটি দোলা কাঁধে নিয়ে
বর এসেছে পোষাক পরে সবুজ-পারা-কালো—
তা যাই বলো, পুঁটুরাণী বর পেয়েছে ভালো।
বলের মতো মুখখানা গোল, হোক্ না খাঁদা নাক,
হোক্ না ট্যারা চোখদুটি তার হোকনা মাথায় টাক
চার-চারটে পাশ দিয়েছে,
তার উপরে বিলেত গেছে,
বিলেত থেকে এনেছে এক মস্ত বড়ো ডাক্,
নিজেই বাজায় সকল সময়—টাক্-ডুমাডুম-টাক্।"

বিলাত-প্রত্যাগত পর্বতীত উন্নাসিকদের কাছে এ বিদ্রূপ একেবারেই অচল।

শিশুর মন সহজে লেখাপড়ার দিকে আকৃষ্ট হইতে চায় না

ছকের মাঝে শিশুর মনকে বোঝাইয়া দাও, মনের অবাধ গতি যেন কোনো দিকে বাধা না পায়। এদিক দিয়া রবিবাবুকে, যোগীন্দ্রনাথ, সুকুমার, সুনির্মল, সুখলতা এবং আরও অনেকে বাংলা সাহিত্যকে অনেক সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম, কল্পনা, বাস্তব, বন্ধুত্ব অনেক কিছুই ছন্দোময়ের অর্থ বিভিন্ন ছড়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এমনি একটি সুখপাঠ্য ছড়া :

হাতে-খড়ি

"আজ সকালে দাদাই মাকে খোকার হাতে-খড়ি
সবাই বলে, চলনা ছুটে পড়ি কি আই বলি !
কতো কালি লাগবে মেখে বলে কালো হাড়ি
কালিবীরই কালো জলে আমার মাতামাতি !
কিস্‌কিসিয়ে খোকার কানে বলে সাধু বেশ
আমি যেন সাধু কাগজ পরশ যেন বেশ !
মাখো কালি জড়ো করে আঙুলে তোমার টাঁই
লেখো খোকা ক-আ-ক-খ চিন্তা কিছুই নাই !
চাওনাকো তা আমি যেন কলম বড়ো লাগে
বোরেল কলে, গাইবো যে গান সুখি উঠার আগে !
বসতে উবু পড়িয়ে যেন খোকার জানে টিপ,
তোমাকিয়া থাকতে চাহে মনমোহনই দীপ।
খোকা বলে, চুপ করো সব কিসের হাতে-খড়ি?
মহাকাব্য লিখ্‌তি যবে আগে তা শেষ করি।"

কিছুদিন পূর্বেও শিশুসাহিত্যের বাজারে ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ কাহিনীর বেশ চড়াচড়ি ছিল। কল্পনাপ্রসূত এক ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা হইত গল্পের নায়ককে। নানা বিপদ-আপদ হয় চাতুর্যে, নয় অলৌকিকতার কাটাইয়া উঠিয়া সেই নায়ক-পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে—ইহাই এ জাতীয় গল্পের রীতি। আফ্রিকা অথবা আমেরিকার অথবা বোর্ণিওর অথবা অন্য কোন দেশের শ্বাপদ ও অগম্য জঙ্গলে নানা হিংস্র ও ক্রূরপ্রকৃতির জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে মানুষের লোমহর্ষক অভিযান কাহিনী? ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানার নানা আজগুবি গল্পই এই জাতীয় শিশু-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। এই শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যকে Horror Comics আখ্যা দেওয়া হয়।

আমেরিকার জঙ্গল-কাহিনী (Jungle-Stories) আর বাঙালী প্রকাশকদের ঘরের 'ভূতের খবর' এই শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না; তার কারণ, এগুলি লেখকের স্বকপোলকল্পিত একেবারে আজগুবি কাহিনী নহে, তার সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক বিচার ইহাদের মূল্য অস্বীকার্য। তথাকথিত হরর-কমিক্‌স্ (Horror Comics) বা ভয়-কাহিনীর বাজার এখন মন্দা। এই শ্রেণীর বইয়ের কু-প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। কিশোর পাঠকের মনে একটা অহেতুক ভীতি-সঞ্চার ছাড়া আর কোন প্রভাবই ইহা দ্বারা সঞ্চারিত হয় না। সস্তা গোয়েন্দা-উপন্যাস আর রোমাঞ্চ-রহস্য যেমন সাহিত্যপর্যায়ে পড়ে, তেমনি এই ভয়-কাহিনীগুলিও শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংজ্ঞালাভের অযোগ্য। দুঃখের বিষয় বাংলায় এই শ্রেণীর গল্প-কাহিনীর প্রচলন উপেক্ষা করিবার মতো নহে। অনেক প্রকাশক ও লেখক এই শ্রেণীর বইয়ের ব্যবসা করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন। এমন সাধারণ পাঠাগারে এবং স্কুল-লাইব্রেরীতে এই শ্রেণীর বই-ই শিশু-পাঠ্য বই হিসাবে সংগৃহীত এবং পঠিত হইতেছে।

হরর-কমিক্‌স্ হইতে কতক পরিমাণে আর এক শ্রেণীর শিশু-সাহিত্য সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে বলা হয় সচিত্র ক্লাসিক (Illustrated classics)। বাংলা দেশের কয়েকটি বহুপ্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের উদ্যমে এই শ্রেণীর রচনার প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে পুরাণ কাহিনী, বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ, নাটক বা নভেলের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়া কতকগুলি বর্ণাঢ্য ছবির সাহায্যে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে সেই সংক্ষিপ্তসারের মাধ্যমে মূল আখ্যানের সহিত পাঠকের পরিচয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। পাঠ্যাংশ অপেক্ষা বড়োরা ছবিগুলির দিকেই দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হয় এবং ছবিগুলির তাৎপর্য বুঝিবার জন্যই পাঠ্যাংশ পড়িবার কিছুটা গরজ জন্মায়।

রবিবারের 'যুগান্তর' পত্রিকাটি টেবিলের উপর রাখা মাত্রই বাড়ির ছোটছেলেমেয়েরা লাল-কালো রঙে আঁকা মহাভারত বা রামায়ণ কাহিনীর ছবিগুলি দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়ে। ছবিগুলির পরিচায়ক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যাংশটুকু না পড়া পর্যন্ত কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। ছবিগুলি যে মনোহারিণী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল যে—এই শ্রেণীর রচনার মূল বা মুখ্য উদ্দেশ্য কি? এই বিষয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক মহলে অনেক আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ইংলণ্ডের প্রবাসীর পরিদর্শক মিঃ ওয়েলস্‌কোট বলেন যে এই শ্রেণীর ছবি-বই শিশু-পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করে, কিন্তু তাহার কল্পনার ঊর্ধ্বলোকে খুব বেশী সাহায্য করেনা। সে দিক দিয়া এই শ্রেণীর ছবি-সাহিত্যের (Illustrated Comics) উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ মূল গ্রন্থ-পাঠে আগ্রহ-সৃষ্টি—বহুলাংশেই ব্যর্থ হইয়া যায়। চার্লস ল্যাম্ব Charles-Lamb প্রণীত "টেল্‌স্ ফ্রম্ শেক্সপীয়র" 'Tales from Shakespeare' যে পরিমাণে মূল শেক্সপীয়র পাঠে আগ্রহ জন্মায়, ছবি-সাহিত্য তাহার শতাংশের একাংশে আগ্রহও সৃষ্টি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। যে সকল কালজয়ী সাহিত্য-গ্রন্থ ছবি-বই (Illustrated classics) সম্বলিত হইতেছে, তাহার মধ্যে "বাইবেল", শেক্সপীয়রের "হ্যামলেট", ডিকেন্সের "ক্রিস্‌মাস ক্যারল," মুই ওয়ালেসের "এনিম ইন্ ওয়ার্ডার-ল্যাণ্ড", 'দি টলিসম্যান' ও "ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট" প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। ছবি-বইয়ের বহুল প্রচার সত্ত্বেও মূল গ্রন্থগুলির চাহিদা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। মূলগ্রন্থ পাঠে পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাক বা না পাক, অন্তত সাময়ে 'আত্মীকৃত করিয়াছি' এইরূপ একটা আত্মতুষ্টির ভাবই বৃদ্ধি পায়। এই আত্মতুষ্টি আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। ইহা শিশু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৃত্যুঞ্জয় লিখিত "পত্রিশ সিংহাসন", "হিতোপদেশ" ও "রাজাবলি" বই তিনটি ফোর্ট-উইলিয়ম প্রন্থমালার অন্তর্গত পাঠ্যপুস্তক প্রত্যক্ষভাবে। "বেদান্তচন্দ্রিকা" ও "প্রবোধচন্দ্রিকা" বই দুটিও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লেখা। পরোক্ষভাবে এদুটিও ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সাহিত্য প্রচেষ্টার অন্তর্গত। মৃত্যুঞ্জয়ের সব কটি বই-ই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লেখা। "পত্রিশ-সিংহাসন" বইটির একটি ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি প্যারি নগর থেকে Leon Feer কর্তৃক প্রচারিত হয়। লণ্ডন ও শ্রীরামপুর থেকেও এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তা থেকে বোঝা যায়, বৈদেশিকদের কাছে লেখকরূপে মৃত্যুঞ্জয় শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অথচ একথাও সত্য যে, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাবলী মৌলিক সাহিত্য তো নয়ই, এমনকি প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্যও নয়। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই অনুবাদ; অনূদিত গ্রন্থও পাঠ্যপুস্তকের পর্যায় ছাড়িয়ে কথাচিৎ অনুবাদ-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাঁর রচনার নমুনা থেকে বোঝা যাবে যে, তাঁর রচনার ভাষার জটিলতা, শব্দাড়ম্বরের আধিক্য এবং দুরান্বয়-দোষ অতি প্রবল ছিল। তবু তাঁকেই ১৮১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য-রচয়িতা বলা ছাড়া উপায় নেই।

মৃত্যুঞ্জয় যেমন সংস্কৃতানুগ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, রামরাম বসু তেমনি ফার্সিবহুল ভাষার অনুরাগী ছিলেন, এইরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু রামরাম বসু-র রচনা ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় তাঁর রচনায় ফার্সি শব্দ সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও মোটের উপর যুগ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর লেখাও সংস্কৃতপ্রধান বাংলা গদ্যরীতির ধারা অনুসরণ করেছে। এই যুগে একমাত্র তাঁর লেখায় সংস্কৃত ও ফার্সি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। অনুমান করা চলে যে, এই প্রচেষ্টা সজ্ঞানে হয়েছিল এবং রামরাম মুন্সি ভারতচন্দ্রের আদর্শে "যাবনীমিশাল" ভাষা সৃষ্টিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্যের যুগে রামরামের ভাষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও একথা মনে করলে ভুল হবে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় যে-পরিমাণে সংস্কৃত শব্দবাহুল্য দেখা যায়, রামরামের লেখাতেও সেই পরিমাণে ফার্সি শব্দের আধিক্য আছে। কোথাও রামরাম এমন সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যে, বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করবার জন্যেই বাধ্য হয়ে তাঁকে ফার্সি শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সে-ব্যাপারেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত সেই মহান্ পন্থার অনুসরণ করেছেন এবং করে ঠিকই করেছেন যে, বক্তব্য বিষয় বোঝাবার জন্যে যে-ভাষা সবচেয়ে বেশি উপযোগী, সে-ভাষাই ব্যবহার করা উচিত।

রামরাম ফার্সি শব্দের ব্যবহারে যেভাবে করেছেন তাতে কেউ কেউ তাঁকে এযুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মনে করতে উৎসাহিত হয়েছেন। আলোচনা করে দেখা যাক, তাঁর সাহিত্যিক যোগ্যতা এবং ভাষাসৃষ্টির কৃতিত্ব কতখানি।

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম জীবনীগ্রন্থ; তাছাড়া, এটি প্রথম বাঙালির লিখিত, বাংলায় রচিত ও বাংলা হরফে ছাপা বই; এই দুই কারণে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। "লিপিমালা" রচনার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে, আদর্শ চিঠিপত্র লিখতে শেখানোর উদ্দেশ্যে চিঠিপত্রের উপযুক্ত অপেক্ষাকৃত সরল এবং প্রায় কথ্যভাষার ব্যবহার। এই দুখানি বই থেকে রামরামের সাহিত্যিক যোগ্যতার যে পরিচয় পাই, তা অসাধারণ নয়। বরং তাঁর গদ্যভাষাগত কৃতিত্ব প্রশংসনীয় বলা যায়। ফার্সি শব্দাবলীর প্রয়োগ কোথায় কতখানি সঙ্গত বা অসঙ্গত হয়েছে, মোটামুটি তার বিচারই রামরামের গদ্যভাষার উৎকর্ষ নির্ণয়ের সেরা উপায়।

রামমোহনের প্রভাবে রামরামের ভাষা সংশোধিত হয়েছিল, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের অভিমত এই রকম। কিন্তু রামমোহন কোথায় কতখানি প্রভাব রামরামের উপর বিস্তার করেছিলেন, তা জানবার কোন উপায় নেই। তবে রামমোহন ও রামরামের ভাষার নিদর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করে একথা সহজে বোঝা যায় যে, রামমোহনের রচনায় যখন ফার্সি শব্দের বিরলতা এবং রামরামের লেখায় তার প্রাচুর্য দেখা যায় তখন রামমোহনের প্রভাবে রামরামের রচনা বেশি সংস্কৃতপন্থী হবার কথা। মোটের উপর, মুন্সি মহোদয়ের ভাষা সংস্কৃতানুগই বটে,

এখনকার অনেক লেখকের তুলনায় তাঁর ভাষায় ফার্সি শব্দ কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

"রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র" রচনার সময় রামরাম নিশ্চয়ই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের লেখাংশে প্রথম প্রতাপাদিত্য-বৃত্তান্তের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন; সে-যুগে ফার্সি-ফার্সি-পক্ষপাতী রামরামের পক্ষে ভারতচন্দ্রের মতো বিদ্যাই ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতি সম্পন্ন লেখকের অনুরূপ বিষয়ে পূর্ববর্তী রচনার প্রভাব একেবারে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবুও, রামরামের ভাষায় তৎসম শব্দের প্রচুর ব্যবহারে দেখে মনে হয়, ভারতচন্দ্র ও রামমোহন, দুজনেরই প্রভাব তাঁর লেখায় যথাক্রমে ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য এনে দিয়েছে। ঐ দুই থেকে দুরকমের দুটি নজির দেখা যাক। প্রথমে ফার্সি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :—

"তাহাই সকলের পরামর্শ হইল। সে-স্থানে লোক পাঠাইয়া ঘরোবস্ত করাইলেন ও নদীনালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নজর করিলেন।.....সকল মকসদ ক্রমে তিন চারি বেহরে প্রায়ই সকল তৈয়ার হইয়া দিবা আবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল।"

এই উদ্ধৃতিতে যে-সব ফার্সি শব্দ আছে সে-সব ব্যবহারের কারণ, প্রথমত, সে-যুগে লোকের কথাবার্তায় এখনকার চেয়ে বেশি ফার্সি ব্যবহৃত হত; দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয়ে ফার্সির প্রয়োগ কিছু বেশি হবার কথা; তৃতীয়ত, রামরাম নিজে ফার্সিনবিশ মুন্সি ছিলেন। চতুর্থত, ভারতচন্দ্রের রচনায় মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-বর্ণনায় একই রকমের ফার্সিবাহুল্য দেখা যায়—যার প্রভাব রামরামের লেখায় পড়েছে। ভারতচন্দ্র লিখছেন :—

এইরূপ কথোপ নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারিদিকে মুলুক করিয়া।
শিবাচারমত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেহি তলবার।
কিম্বা
হালাল না করি করে মারহ হালাক।
যত কাম তরে হিন্দু সকলি নাপাক।

রামরামের রচনায় ফার্সির ব্যবহার ভারতচন্দ্রের চেয়ে খুব বেশি নয়। তাঁর রচনা ভারতচন্দ্রের কাব্যের তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষা বেশি দুর্বোধ্যও নয়। তবে, মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়ে তাঁর গদ্য উন্নত কিংবা বেশি সরল, সেকথা বললে পক্ষপাতের পরিচয় দেওয়া হবে। রামরামের রচনার সংস্কৃত প্রধান অংশের আড়ষ্ট দুর্বোধ্যতা এই উদ্ধৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় :—

"তোমার এমত এমত আচরণে আমাদের ক্লেশের আর পরিসীমা ছিল না। এখন তোমার মুখ দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। তোমার মুখতাত, তোমার গমনাগমি ইহার মুখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ, কোন কার্যে আমহ নাই, ইহার পূর্বমত আহার নিদ্রা নাই, তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় ক্ষিতমান, আমি তোমাকে যত্নপূর্বক পাঠাইয়াছিলাম, ইহাতে ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ করেন না, এই পর্যন্ত শোকিত।"

এই অংশে "সীমাহ" শব্দটি রামরামের মনোজগতে ফার্সির প্রভাব নির্দেশ করে। রচনার ভাষায় মুন্সীয়ানা-ঘেঁষ দেখা যায়। ভাষায় যে যুগের বাংলা গদ্যের সাধারণ রীতিই দেখা যাচ্ছে যা সংস্কৃত গদ্যের রীতি-অনুসরণে গঠিত। ঐ সংস্কৃত প্রভাবের কারণ, প্রথমত, সংস্কৃত শব্দশ্রিয় কলেজের পণ্ডিতদের সাহচর্য, লাহিড়ী ও মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব; দ্বিতীয়ত, বৈষয়িক দরকারের ফার্সির বদলে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষাপ্রীতি; তৃতীয়ত, গ্রাম্য-যোহনের প্রভাব এবং সংশোধন। সংস্কৃতে জ্ঞান কম থাকায় তাঁর রচনায় বিদ্যালঙ্কারের রচনার গুরুতা ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়ের অনুকরণে লেখা না হলেও একই ধরণের রচনারীতি রামরামের লেখাতেও দেখা যায় :—

"গুরুকথানুসারে মহেশের পুরীর সমস্ত রাশিগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য আসন বস্ত্র, কেহ বা পট্ট বস্ত্র, কেহ বা কাঞ্চনাই, কেহ বা লক্ষ্মীবিলাস, কেহ বা সীতাম্বর, কেহ বা নীলাম্বর, নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহুবিধ সুগন্ধি মাতার প্রভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দোলে আরোহণে ভূমঘাটের পুরীতে আগমন করিতেছেন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় ফার্সি শব্দ খুব কম; কিন্তু তৎসম শব্দ ব্যবহারে রামরাম কার্পণ্য করেন নি। তাঁর "লিপিমালা"-র ভাষা সাধারণভাবে হলেও তাতে ফার্সির তুলনায় সংস্কৃত শব্দের প্রভাব অনেক বেশি দেখা যায়। "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন-এ সঙ্কলিত বাংলা পত্রাবলীর ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, রামরামের ভাষায় সে যুগের সাধারণ শিক্ষিতদের তুলনায় খুব বেশি ফার্সি প্রভাব ছিল না। তবে অল্প সংস্কৃতবিদ্যায় পণ্ডিতদের মনোভাব ফার্সি শব্দাবলীর উপর যেমন বিরূপ ছিল, তাঁর ঠিক তেমন ছিল না।

রামরাম বসু মৃত্যুঞ্জয়ের মতোই তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন :—

"এখন এদেশের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা। তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার দ্বারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্যক্ষমতা পন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমির ব্যবহার্য লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।"

কারও কারও মতে, রামরাম কথ্যভাষার প্রয়োগ তাঁর রচিত গদ্যে করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ কথ্যভাষা বলতে যা বুঝেছেন তার অনুরূপ কিছুই আমরা এ যুগে কারও লেখায় পাই না। মধুসূদন বা দীনবন্ধুর নাটকে ব্যবহৃত কথ্যভাষাও রামরামের অনায়ত্ত ছিল। বস্তুত কেরি বা রামরামের ব্যবহৃত বহুল বহুল চলমাংশও মোটেই চলতি ভাষার নয়। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের লোকের মুখের ভাষা তাঁদের গদ্যের অনুরূপ নয়। বাঙালির মুখের ভাষাকে অধিকৃতভাবে সাহিত্যে রূপদানের প্রয়াস উনিশ শতকের প্রথম পাদে আমরা দেখা যায় না। সেদিক থেকে কোন অনুসন্ধান বা গবেষণাও

সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রধান। কারণ, এই যুগের মর্মবাণীই ছিল একেবারে অন্যতম। সংস্কৃত গদ্যের আদর্শে মজবুত করে চালাই করা তৎসম শব্দের উপাধারে ভরা বাংলা গদ্যভাষাই ছিল এই সময়ের লক্ষ্য। স্বাভি প্রভাব দূর করে পণ্ডিতজনের অনুমোদিত সাধু গদ্যভাষা রচনার কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে, তার আলোচনাই এই যুগে রচিত বাংলা গদ্যের প্রকৃত বিচার।

কেরি, বিদ্যালঙ্কার ও রামরামের পর গোলোকনাথ, তারিণীচরণ, চণ্ডীচরণ, রাজীব লোচন ও হরপ্রসাদের রচনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। তাঁরা বাংলা গদ্যকে পূর্বোক্ত ত্রয়ীর মতো এগিয়ে নিতে পারেন নি। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে তাঁদের উদ্ভবের সার্থকতা শুধু ঐ তিনজনের ধারা অনুসরণে এবং কখনও কখনও সেই ধারা সংরক্ষণে। ভাষা, রীতি, শৈলী বা অভিনব সংযোজনা বলতে তাঁদের নিজস্ব কিছু ছিল না। গোলোকনাথের রচনা থেকে বোঝা যায়, সেযুগের লেখকেরা একটা তত্ত্ব বেশ বুঝতে পেরেছিলেন: সেটা এই যে, কথোপকথনের ভাষায় লোকের মুখের জবানিই প্রযুক্ত হওয়া দরকার। রচিত সাহিত্যে অবশ্য আভোপান্ত গুরুমুখী ভাষা ব্যবহার করে এই সব পণ্ডিতেরা কথোপকথনের বর্ণনা দেবার সময় বিভিন্ন চরিত্রের মুখে অপেক্ষাকৃত লঘু ও প্রচলিত শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন। এই বৈশিষ্ট্য মৃত্যুঞ্জয়, কেরি প্রভৃতি প্রায় সকলের লেখাতেই দেখা যায়। বাস্তব জগতে দুটি লোকের মধ্যে যেভাবে কথাবার্তা হয়, গদ্যভাষাতে কথোপকথন বর্ণনার সময় সেইভাবে নিছক মুখের ভাষায় মিললে ভালো হয়, সেটাই স্বাভাবিক, সঙ্গীব ও চিত্তাকর্ষক হয়, এই সত্য সেযুগের গদ্যস্রষ্টাদের মনেও জাগরূক ছিল। কিন্তু যথেষ্ট সংসাহসের অভাবে তাঁরা তখনও উপলব্ধ সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি।

কলিকাতা তখনও সারা বাংলার শিক্ষিত সমাজের একমাত্র প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর অঞ্চলের শিষ্ট সমাজের ব্যবহৃত কথ্যভাষা তখনই আদর্শ কথ্যভাষা বলে স্বীকৃত হয়েছে। চব্বিশপরগণা জেলার বৈশিষ্ট্য অভিপ্রকৃতি যুক্ত হয়ে সেই কথ্যভাষা খাঁটি 'কলকেতিয়া' কথ্যভাষা-রূপে সর্বজনপরিচিত হয়। কলিকাতায় সেই শিষ্ট চলতি-ভাষাই বর্তমানকালের আদর্শ চলতি ভাষার গদ্য গঠন করেছে। বাইরের প্রভাব সামান্য পরিমাণে এসে পড়লেও সাহিত্যের চলতিভাষা মোটামুটি কলিকাতার শুদ্ধসমাজের মৌখিক ভাষার উপর নির্ভরশীল। আর সেই ভাষা উনিশ শতকের প্রথম পাদেও সংস্কৃতির অংহায় পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। তবুও অতিরিক্ত সাধুভাষাপ্রিয় পণ্ডিতবর্গ সে-সময়ে চলতিভাষায় সাহিত্য বা পাঠ্য-পুস্তক রচনার চেষ্টা করতে বিরত থাকেন। তার ফলে ভারতচন্দ্র গদ্যের ভাষায় যা করেছিলেন, গদ্যে তার অনুরূপ অগ্রগতি তাঁর পর এক শতাব্দীর মধ্যেও হয় নি।

পূর্ববর্তী কোন কোন আলোচনায় যেখানেই একটু তৎসম শব্দবিরলতা দেখেছেন, সেখানেই কথ্যভাষা ও কথ্যরীতির অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের ঐ ধারণা নিতান্ত যুক্তিহীন। সহজ বা কম তৎসম শব্দ ব্যবহার করলেই কথ্যভাষার প্রয়োগ চলে, এমন বলা যায় না। ক্রিয়াপদ, সর্বনাম এবং তদ্ভব শব্দ বাহুল্যের যে অনায়াস, স্বচ্ছন্দ ও সর্বত্রচারী রীতিকে চলতি ভাষা বলা যায় তার প্রয়োগ কৌশল অবশ্যই হওয়া শিক্ষা ও সাধনা-সাপেক্ষ। সাহিত্যের চলতি ভাষা সাধু বা গ্রাম্য, কোন ভাষাই নয়। উপযুক্ত শিক্ষা সে যুগের পণ্ডিতদের ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তেমন কোন সাধনা তাঁদের চেতনার দূর দিগন্তেই ছিল। সর্বজনবোধ্য সুসমঞ্জস রচনারীতির আভাস তাঁরা পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের লেখায়, তাঁহারা—তাঁরা, করিলাম—করলুম, যা করলাম ছবরঙ্গম—স্পষ্ট বোঝা, এমন প্রয়োগ তাঁরা কখনও আনতেও পারেন নি। মৃত্যুঞ্জয় যে-ভাষাকে "সরল উদ্ভাবনা লৌকিক ভাষা" বলে গেছেন, সেই রামমোহন-বিরচিত ভাষাও আধুনিক কথ্য ভাষার গদ্য থেকে বহু দূরে। "শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" গ্রন্থের অতিচমৎকার গদ্যভাষাকে মৃত্যুঞ্জয় নিশ্চয় বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু তাঁকেও রঙ্গমঞ্চে বাবার মুখের ভাষায় প্রায় আধুনিক চলতি ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ ভাবে না হোক, তার দ্বারা পরোক্ষ ভাবে তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, রচনায় উল্লিখিত চরিত্রের মুখের ভাষা, যে যে শ্রেণীর লোক, সেই শ্রেণীর লোকের বাস্তব জগতে ব্যবহৃত ভাষার অনুরূপ হওয়া উচিত।

এখন বাংলা গদ্যের ক্রমিক রূপান্তরের ধারায় ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অন্তর্গত প্রত্যেক বইএর দান কতটুকু, সেবিষয়ে বই-ওয়ারি আলোচনা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে, কোন বই মৌলিক রচনা না হলেও ভালো এবং ভালো অনুবাদ হিসাবে সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে কিন্তু কোন কোন বই মৌলিক রচনা হলেও রসরূপের অভাবে প্রায়ই সাহিত্যস্বীকৃতি না পেতে। সুতরাং রামরাম মৌলিক গদ্য প্রবন্ধ লিখেছেন বলেই যে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হয়ে যাবেন এবং অনুবাদক বলেই মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় সাহিত্যগুণের ন্যূনতা পাবে, তা নয়, গদ্যভাষা সৃষ্টিতে কার কতটা বেশি তার বিচারই আমাদের কাছে আসল বিবেচনার বিষয়। আমরা সাধারণ ভাবে আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" থেকে "প্রবোধচন্দ্রিকা" পর্যন্ত ১৮০০—২৫ সালের মধ্যে লেখা সমস্ত গদ্যরচনার সাহিত্যমূল্য সামান্য। গ্রন্থাবলীর লেখকদের মধ্যে কে বড় সাহিত্যিক সে-আলোচনা এখনকার পাঠকের কাছে হাস্যকর ও অবান্তর বলে মনে হবে। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে সে-আলোচনা সেরে বেশি মনোযোগ দেব, গদ্যভাষার অগ্রগমনে, তা সে উন্নতির বা অবনতির যে পথেই হোক না কেন, কে কত খানি সাহায্য করেছেন তাঁর রচনার দ্বারা, তার বিশ্লেষণে।

প্রথম বই "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার এই সব কারণে তারকাচিহ্নিত হবার যোগ্য:—

(১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম বই;

(২) উনিশ শতকের প্রথম বাংলা ছাপানো বই;

(৩) বাংলাভাষার প্রথম জীবন-চরিত;

(৪) প্রথম বাঙালির ভাষায় লেখা ও বাংলা হরফে ছাপানো বই;

(৫) এই বইটিতে সর্বপ্রথম বাঙালি গ্রন্থকার বাংলা গদ্যভাষার

সংস্কৃত ও ফার্সি প্রভাবের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করে রাইটসন্‌ের "খাঁবনী বিশাল" গদ্যভাষার অনুরূপ উপায়ান্তরে গদ্যভাষা গঠনের কাজ সুরু করে দিয়েছেন :

(৩) বইটির ভাষা রামমোহন কর্তৃক সংশোধিত হলে ভাষা থেকে যা বোঝা যায়, রামমোহন তখন বাংলো গদ্যের উৎকর্ষ বিধানে ব্রতী ছিলেন।

বইটি পড়লে বোঝা যায়, সাহিত্য গুণে বইটি যেমনই হোক, বাংলা গদ্যভাষার সামঞ্জস্য-সূত্রটি এতেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে—যে-সূত্র ধরে চলতে থাকলে একদিন বাংলা গদ্যের ঠিকভাবে নিজের কাজে দেশি ও বিদেশি শব্দাবলীকে ব্যবহার করার কথা। রামরামের মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় নিকৃষ্ট গদ্য লিখেছেন বলার নেই কিন্তু তাঁর ভাষার মহৎ কৃতিত্ব এই যে, গদ্য তিনিই প্রথম আন্তরিক অনুরাগের সঙ্গে ভাষাকে দৃঢ়-টঙ্কার কাজে দেশীয় ও বৈদেশিক শব্দ সম্ভার অপক্ষপাতে ব্যবহার করেছেন। যে-নীতি একদেশে অনুসরণীয়, রাম রাম তা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ফার্সি শব্দাবলী একেবারে ছেঁটে বাদ দিয়ে নয়, তাকে ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তবে বাংলা গদ্য আত্মবিকাশের শ্রেষ্ঠ পথ খুঁজে পাবে, এই মূলনীতি খুঁজে বার করার মতো দূরদর্শিতা তাঁর ছিল। স্রষ্টা রূপে না হলেও স্রষ্টা হিসাবে তিনি এই কারণে মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন।

ভাষার একদেশের প্রয়োগের মূলনীতি আবিষ্কার করলে কি হবে, সেই নীতিকে ভাষার রূপ দিয়ে ভালো গদ্য রচনার ক্ষমতা বোধি সাহেবের মুন্সির ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় প্রকৃতিতে রক্ষণশীল হলেও বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতবহুল একটা ঘন ও বদ্ধ রূপ দান করে গেছেন। মোটের উপর গদ্যভাষা সেই গদ্য বেশি শুদ্ধ, সুসম ও ভাবপ্রকাশসমর্থ। রাম-রামের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল, সৃষ্টি অপকৃষ্ট ; মৃত্যুঞ্জয়ের দৃষ্টি পশ্চাৎগামী, সৃষ্টি সুসংহত। মৃত্যুঞ্জয়ের "রাজা শিংহাসন"-এ বিদ্যাসাগরের "বেতাল পঞ্চবিংশতি"-র সূত্র পূর্বাভাষে পাওয়া যায়। রামরামের গদ্যভাষার তেমন কোন বৃহৎ পরিণতি লাভ হয় নি। তার কারণ, পরবর্তী কালে ফার্সি প্রভাব একেবারে বর্জন করে মোটের উপর মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগরের ধারাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত অনুসৃত হয়। ছোট-বড় প্রায় সমস্ত লেখক সজ্ঞানে মৃত্যুঞ্জয়কেই যেন বিশেষভাবে রাম-রামকে উপেক্ষা করে। এইভাবে পথিকৃৎ হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় জয়লাভ করেছেন, উদ্যমের মনোবৃদ্ধি ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়েও রামরাম পথপ্রদর্শকরূপে তখনকার লেখক সমাজে পরিগৃহীত হন নি। অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র কতকাংশে এবং আরো অনেক পরে প্রমথ চৌধুরী সর্বাংশে রামরামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন করেন। রামরামের অব্যবহিত কাল পরে তাঁর ব্যাপারি প্রায় পরিত্যক্ত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য যেমন বিদ্যাসাগরের গদ্যে সার্থকতর উদ্ভবের লাভ করেছিল, দুর্ভাগ্য-বশত রামরামের গদ্য তেমন কোন শক্তিশালী পরবর্তী লেখকের সমর্থন পায় নি। এই জন্যে তিনি বিশেষভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। পরবর্তীকালে যখন সাধুভাষার গদ্য রচিত হল তখন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং প্রমথ চৌধুরী তাঁর কাছে কোন ভাষাগত সহায়তা পাননি কিম্বা রাম-রামের গদ্যভাষা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার কোন কারণও তখন আর বিদ্যমান ছিল না।

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" গ্রন্থেই রামরামের প্রধান দুর্বলতা পরিস্ফুট : তিনি সংস্কৃত ভালো না জানার জন্যে শুদ্ধ বাক্য গঠন করতে পারতেন না। এই বইটিতে আরবি-ফার্সির বহুল প্রয়োগে সংস্কৃত ভাষানুরাগী পাঠক বিরক্ত হবেই। তাঁকে কেবল ঐ কারণে কোন কোন সমালোচকের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। বৈদেশিক ভাষায় বর্ণনীয় বিষয় ব্যাখ্যা করার অনুরাগেও তাঁর সেই যুগে অত বেশি ফার্সি ব্যবহার সমর্থন করা চলে না। যুদ্ধ, রাস্তার কাজ, রাজ্য শাসন প্রভৃতি বিষয়ে তখনকার সমাজে ফার্সি শব্দের ব্যবহারে উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। ঐ সব ব্যাপারে সংস্কৃত না হোক, তদ্ভব ও দেশজ শব্দ আরো বেশি ব্যবহার করলে রামরাম সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। যাঁর ফার্সি ব্যবহারের সাহস ছিল তাঁর আরও বেশি প্রচলিত বাংলাভাষার নিজস্ব শব্দাবলী ব্যবহারে পরাঙ্মুখতার কারণ দুর্বোধ্য। মনে হয়, ফার্সির দিকে তাঁর একটু বেশি টান ছিল। সে-যুগে শিক্ষিত কায়স্থ মুন্সির পক্ষে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও সে-যুগের যুগধর্মী ছিল ঠিক বিপরীত। সুতরাং ঐতিহ্যাগত ফার্সি প্রভাবকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে একদিক থেকে তিনি যেন প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাই তাঁর উদ্যম মনোভাব প্রশংসনীয় হলেও নবাবি শাসনে বীতশ্রদ্ধ বাঙালির মন তখন দৃঢ়োদ্যমে ফার্সি প্রভাবকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। উনিশ শতকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলিম লেখকের লেখাতেও তাই ফার্সির প্রভাব ক্ষীণতর দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়গ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল হারানো স্বাদেশ—তথা ভারতীয়-সত্তা ফিরে পাওয়া। সংস্কৃতের মুক্ত-প্রতিষ্ঠা তাই অনিবার্য পরিণাম হয়ে দেখা দিল। ইংরেজ নিজ প্রয়োজনে ঐ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করে। রামরামও পরেও বই লেখার সময় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে থাকবেন। কেন-না, তাঁর পরের বই-এ ফার্সির প্রয়োগ খুব কমে গেছে।

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বই কেরি-র "কথোপকথন" আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। তিনি সাধু ভাষার কাঠামোর মধ্যে কষে-বেঁধে হলেও অন্তত চলতি ভাষাকে প্রথম বাংলাগদ্যে স্থান লাভের সুযোগ যেন। এই প্রয়াস কথ্যভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দেবার জন্যে নয়। বইটির ইংরেজি নামেই প্রকাশ যে, তার উদ্দেশ্য আদ্যন্তিক : "Dialogues intended to Facilitate the acquiring of the Bengali Language।" তবু, যে-যুগে বাঙালি বিদগ্ধ সমাজ গ্রন্থে কথ্যভাষার স্থানলাভ অমার্জনীয় ত্রুটি বলে গণ্য করতেন সে-যুগে কেরি যে খানিকটা চলতি বাংলাভাষাকে গদ্যের পরিবেশে উন্নীত করে পাঠ্যপুস্তকে আসন দিয়েছিলেন তাতে গদ্যভাষাসম্বন্ধী আশাতীত সন্ধানলাভ করেছিলেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থের তুলনায় "কথোপকথন" এর এই সব নিদর্শনের ভাষা বৈপ্লবিক ভাবে উন্নত :—

"সময়ই ভাগ্যের বলীভূত ; দেখ বিবি, তাঁহারা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন ? আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। তাঁহাদিগের পূর্ব বিষয় আমরা সমস্তই জানি, মাতাপিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না। এতক্ষণে বড় ঠাকুর কিছু দিতেন, তবেই সেদিন নির্বাহ হইত, বরঞ্চ হরিবল্লভ !"

এই অংশে দু একটি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সামান্য পরিবর্তন করলেই আধুনিক চলতি ভাষার গদ্য গড়ে উঠবে।

(ক্রমশঃ)

আচরণ-বিভ্রম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এর পর ত্রিবিধ ধৃতির বর্ণনা দিলেন নারায়ণ। বল্লেন—

"হে পার্থ, যে একাগ্রতার ঐকান্তিক ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদয় এক বিষয়ে নিবদ্ধ করা যায় সেই ধৃতি সাত্ত্বিক।

বলা বাহুল্য একাগ্রতার ফলেই মানুষের মনে প্রকৃত ভক্তি এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়। তন্ময়তা লাভ হয় —জ্ঞান-প্রদীপ শিখার সকল বিক্ষেপ বন্ধ রাখলে। ইতস্তত ধাবমান মতিকে এক স্রোতে না বহালে ধৃতি হয় নিরর্থক।

রাজসিক ধৃতি ধর্ম্ম, অর্থ, কামকে ধারণ করে সত্য, কিন্তু তার প্রত্যাশা সাফল্য লাভের। প্রত্যেক বিষয়ে মন সংযোগ করে রাজসিক প্রবৃত্তি কেবল ফলের আকাঙ্ক্ষায়। সে ধৃতির মূলে থাকে লোভ। সে ধৃতি লোভের রূপকে ধারণার বাইরে রাখতে পারে না।

দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতির সাহায্যে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ কদাচ পরিত্যাগ করেনা, তার নাম তামসী ধৃতি।

মানুষ ছোটে সুখের পশ্চাতে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম-পথে না বিচরণ করলে সে কি চরম সুখ লাভ করতে পারে? একই মনোবৃত্তির প্রেরণা এবং উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার ফলে প্রায় শক্তি নিয়োজিত হয় বিভিন্ন পথে। পরমহংসদেব বলেছিলেন, ব্যাকুলতা ভিন্ন ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর নয়। এ কথাও সত্য যে মান, যশ, অর্থ, সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল সাফল্যের মূলে থাকে ব্যাকুলতা। তাই পরমহংসদেব বলেছিলেন, সাংসারিক সাফল্যের জন্য যেমন চেষ্টা করে মানুষ, ঈশ্বর লাভের জন্য তেমন চেষ্টা করলে, তার শ্রম ও আকাঙ্ক্ষা বিফল হয়না।

মানুষ ছোটে সুখের সন্ধানে। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি, কোথায় তার বসতি, কোন্ কর্ম্মে প্রকৃত সুখ লভ্য, সে বিষয়ে মানব-সমাজ তো একমতি নয়। আলেয়ার আলোককেই ভাবে সুখের জ্যোতি। কারও সুখ কামিনী-কাঞ্চনে। কেহ হয় স্ফীত-শির, সুখের অনুসন্ধান করে পরের উৎপাদনে, অন্যের নিগ্রহে আপনার প্রাধান্য প্রমাণের উল্লেসে।

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ সুখেরও বর্ণনা দিলেন। তিনি বল্লেন—সাত্ত্বিক সুখ কথিত হয় সেই সুখ, যে প্রথমে বিষের মত, পরিণামে অমৃততুল্য। সে সুখে আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে।

আত্ম-বুদ্ধিতে মানব প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয়। আত্ম-জ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান। মানুষের আত্মা অবিনশ্বর, পরব্রহ্মের সূত্রে বিদ্যমান জীবে। সুতরাং মায়াময় এই পৃথিবীর অন্তরালে রয়েছে যে প্রকৃত শাশ্বত অমৃতময় জীবন—সে আনন্দময়। সে আনন্দধামের চিরানন্দের অনুভূতি সম্ভবপর কি এই মায়াময় জগতের ক্ষণিক সুখে? লোভ হতে মুক্ত করতে না পারলে প্রবৃত্তিকে, সে সুখের সন্ধান নিরর্থক। অথচ সে সন্ধানে আচরণকে প্রতি পদে করতে হয় সাত্ত্বিক। নিষ্কাম কর্ম, পরে কর্ম্মসন্ন্যাস। সে অবস্থায় যোগের অনুষ্ঠান—শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য —এ-সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে ক্লেশ। কিন্তু অন্তে সুখ। সেই সুখই আনন্দ। সে আনন্দ তুচ্ছ স্বার্থবোধে ক্ষণিক তুষ্টি নয়। সে সুখ ভূমায়—বিস্তারে। তাই সাত্ত্বিক সুখকে অগ্রে মনে হয় বিষের ন্যায়, অন্তে আত্মপ্রসাদ জন্মে সে সুখে।

রাজসিক সুখের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

যে সুখের উৎপত্তি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হ'তে, যে সুখ অগ্রে অমৃতের মত কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, সে সুখ রাজসিক।*

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আচরণের। বড় বড় সাম্রাজ্য জয়েও আকাঙ্ক্ষার প্রশমন হয়না। বীর যোদ্ধারা বীত-

* গীতা—১৮।৩৮

শ্রদ্ধ হয় পার্থিব সমৃদ্ধির প্রাচুর্যে। তাদের অসন্তোষ বিষময়। বলা বাহুল্য মনও একটি ইন্দ্রিয়। মনের বিষয় সংযোগ—ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগ। ভাণ্ডারগৃহ, রাজ্যজয়, কীর্তিগৃহ সবই মনে সন্তোষ আনে ক্ষণিক। উৎসাহ, উদ্যম, পরিশ্রম এবং উদ্দীপনা সকলই মনে হয় বৃথা যখন সাফল্যের সুখ তৃষ্ণা বাড়ায় এবং পরিণামকে করে তিক্ত। রাজসিক লোভের লাভের সন্তোষ তো সে সন্তোষ নয়, যার বিষয় কবি বলেছেন—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাম্ যৎসুখং শান্তচেতসাম।
কুতস্তদনুতানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম।

শান্ত-চিত্ত সন্তোষামৃত তৃপ্তজনের যে সুখ—সে সুখ কোথায় তার যে ধনের লোভে সদাই ইতস্ততঃ ধাবমান।

দৃষ্টে, ঘ্রাণে, ছন্দে, রসে ও স্পর্শে সুখ পায় জীব। সে সুখ নশ্বর। তাই ইন্দ্রিয় সুখ আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়—নিবৃত্তিঃ তৃপ্তি দান করতে পারেনা। কিন্তু তারা উপভোগ্য হয় অধিক যখন মন বোঝে সে এরা এক অনন্ত-সুখের আভাস। তখন চিত্ত ধায় প্রকৃত সুখের উৎসের সন্ধানে। রাজসিক সুখ নিজের ব্যর্থতা বোঝে। কর্মীর প্রাণে জাগায় প্রেরণা সুখাবৃত সন্ধানের। কিন্তু নিদ্রাতুর, অলস, দীর্ঘসূত্রীর অবসর নাই চিন্তার। মোহে আবৃত তার জ্ঞানবুদ্ধি। তার আত্মোপান্ত সুখ মূঢ়তার অনুপদ্ধিতে। তামসিক সুখের বর্ণনা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাই কুরুকুলচূড়ামণি সংবাদে।—

যে সুখ অন্তে পরিণামে বুদ্ধির মোহ জনক, নিদ্রা, আলস্য প্রমাদ হতে উত্থিত, সেই সুখের নাম তামস সুখ।

প্রমাদ মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে, তাই ভগবান বুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে ছিলেন জগৎকে অপ্রমাদ হ'তে।

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

অপ্রমাদ অমৃতপদ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্তের মৃত্যু নাই। কিন্তু প্রমত্ত মৃতের মতো।

ত্রিগুণের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ আহারেরও প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য শরীর ধারণের প্রধান প্রয়োজন আহার। কিন্তু মাত্র কি শরীর-ধারণের উদ্দেশ্যে জীব আহার্য্য গ্রহণ করে? ভোজনের তৃপ্তির কথা আলোচনা করলে বোঝা যায় আহারের বাসনা এবং তার পূরণের রূপ। ভোজন কেবল জিহ্বার প্রয়োজক নয়—তার সাথে মিশে থাকে গন্ধ ও স্পর্শের অনুভূতি। সুতরাং কোন্ খাদ্য কার প্রিয়, সে সমাচার লাভ করলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝতে পারে ভোজনকর্ত্তার মানসিক অভিরুচি। তাই আমরা শুনেছি—

সাত্ত্বিক আহার্য্য—আয়ুঃসত্ত্ব বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ, স্থির, হৃদ্য।*

রাজসিক লোকের ইষ্ট ভক্ষ্যবস্তু—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতিশয় প্রবাহকারী। এরা দুঃখ, শোক এবং রোগের জনক।

তামসপ্রিয় খাদ্য—বহুপূর্ব্বে পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্ব-দিনের রাঁধা উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র।

তুলনা করলে দেখা যায় এ শ্রেণীর ভোজ্য পূর্ব্ব দুই প্রকার আহার্যের বিরোধী। এবং রাজসিক ও তামসিক আহার হতে বিভিন্ন। সাত্ত্বিক আহার সরস। রাজসিক—অতিকটু, তামসিক গত রস। অতি উগ্র, স্থিরভাব-বিরোধী। অতি উষ্ণ—হৃদ্যত্বের বিরোধী, সাত্ত্বিক আহার সুখপ্রীতিবর্দ্ধক—রাজসিক দুঃখ শোকপ্রদ।

সাত্ত্বিক—আয়ুঃ সত্ত্ব বলবর্দ্ধক—রাজসিক আময়প্রদ, রোগের জনক। তামস আহারের তো কথাই নাই।

বিশ্বশক্তি মুগ্ধ করে জীবকে। তার ছদ্মবেশে নারায়ণের বাস কিন্তু জীব আত্মগুপ্ত। মায়ার খেলায় জগত তাঁকে সহজে চেনে না। সকল মানুষ বোঝে অস্তিত্ব এক শক্তির যার শক্তি অস্বীকার করবার উপায় নাই। প্রকৃত শক্তি-কেন্দ্রের স্থির অনুভূতি মোক্ষ পথ। কিন্তু মায়ার মোহে মানুষ দোলে সংশয়ের দোলায়। তার ফলে সে শ্রদ্ধা হারায়, যে শ্রদ্ধা তার সংস্কার, শ্রদ্ধা তাই ত্রিবিধ।

শ্রদ্ধানুরূপ উপলব্ধি মানুষের শক্তি সম্বন্ধে। এ সত্যও আমরা নিজ ও পরের অন্তঃকরণ বিচার করলে বুঝতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন সে যার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক সে দেবতাদের পূজা করেন। সেই দিব্য-জ্যোতিতে ক্রমশঃ মানুষ জানতে পারে সেই অনন্ত একেকে—যাঁর বিশ্বরূপের প্রথম ঝলকে অর্জুন দেখেছিলেন তাঁর দেব দেহে সকল

* গীতা—১৭।৮

দেবতাকে, দ্বাপর জন্ম সকল ভূতকে, কমলাসনস্থ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ব্রহ্মাকে সকল ঋষি এবং বাসুকি প্রভৃতি সকল সর্পকে।

রাজসিক ভাবাপন্ন লোক যজ্ঞনা করে যক্ষ ও রাক্ষসদের। কুবের যক্ষ। ধনপতি কুবের তাই যক্ষের পূজা করে ধনরত্নাদি ফলের আকাঙ্ক্ষায়। নৈঋতাদি রাক্ষস পার্থিব শক্তির কেন্দ্র, তাই রাক্ষস পূজা।

আর তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পূজা করে ভূতপ্রেতাদি।

তামসিক প্রবৃত্তিযুক্ত মানুষের তপস্যাও তাদৃশরূপ ধারণ করে। এরা দম্ভ ও অহঙ্কার সংকারে তপস্যা করে। অবিবেকী লোকের তপস্যায় শরীরের মধ্যে যে সব করণ আছে তাদের কৃশ করে। আত্মাকেও তারা কৃশ করে, কারণ প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ও ধারণা ক্রমশঃ হয় দুর্ব্বল। সত্যই তেমন পূজা পূজা নয়। তাদের তপস্যা আসুরিক।

পূজা ও যজ্ঞাদি সকল শাস্ত্রে বিহিত। যজ্ঞের দ্বারা মন হয় স্থির, জগদীশ্বরের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ কর্ম্ম-অর্ঘ্যে প্রকৃত পক্ষে উন্নত হয় মন। ভগবান বলেছেন—সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য—যখন প্রকৃত সন্ন্যাসের প্রবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত হয় সাধক। কিন্তু যাগ যজ্ঞ, যজন, পূজন ত্যাগ না করাই কর্ত্তব্য। পূজা বা যজ্ঞের দ্বারা মনের বেগ প্রশমিত করলে ধ্যান ও সমাধির পথ হয় পরিষ্কার। পরম-হংসদেব বলতেন, ভোজনে বসবার পূর্ব্বে যেমন হাততালি দিয়ে ঘরের পায়রা তাড়াতে হয়, তেমনি ধ্যানের পূর্ব্বে পূজার অনুষ্ঠান।

ভগবান বলেন—ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত-ব্যক্তি যজ্ঞ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম এই ধারণায় মন সমাধান করে, শাস্ত্রবিহিত উপায়ে যজ্ঞ করলে যজ্ঞ হয় সাত্ত্বিক।

ফল কামনা পূর্ব্বক এবং নিজের মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তেমন যজ্ঞকে জেনো রাজসিক যজ্ঞ।

শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত, অন্নদানবিহীন, যে যজ্ঞে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, দক্ষিণা নাই, শ্রদ্ধা নাই—তেমন যজ্ঞকে বলা হয় তামস।*

যাগ যজ্ঞের আজ অভাব নাই। কিন্তু বড়ই পরি-তাপের বিষয় আমরা পূজামণ্ডপে, মন্দিরে ও দেবগৃহে প্রকৃত-সাত্ত্বিক পূজা দেখি না। দেখি অবিধি, দম্ভ এবং রেষারেষির প্রতিযোগিতা। জপ, তপ, সকল অনুষ্ঠানে প্রতীয়মান হয়—ত্রিগুণময়ী মায়া দেবীর এক একটি গুণ। কেহ তপ করে সাত্ত্বিকভাবে—শ্রদ্ধার সহিত, অফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে। রাজসিকের তপে—দেখি দম্ভের বিকাশ। আর তামসিক-প্রকৃতি লোকের তপে স্পষ্ট উদ্দেশ্য দেদীপ্যমান—পরের উৎসাদনের জন্য নিজের দেহের পীড়া এবং মূঢ়তা।

দানের ও প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন নারায়ণ গীতায়! যে দান কেবল কর্ত্তব্যবোধে দেশ, কাল ও পাত্রের যোগ্যতা, বিচার করে দেওয়া হয়, যে দান প্রত্যাশা করে না প্রত্যুপ-কারের—সে দান সাত্ত্বিক।

ফল উদ্দেশ্যে বা প্রত্যুপকারের লোভে, ক্লেশক্লিষ্ট হয়ে যে দান করা হয় সে দান রাজসিক।

অনুপযুক্ত দেশে ও কালে, অপাত্রে সৎকার না করে অবজ্ঞা ক'রে সে দান প্রদত্ত হয় সে দান তামসিক।

অথচ আমরা প্রত্যেকে জানি যে দান চরিত্রকে করে উন্নত, পরকে করে আপন। বেদ হতে সকল শাস্ত্র হিন্দুর, বৌদ্ধনীতির বিশেষ শিক্ষা, প্রভু যীশু এবং হজরত মোহম্মদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ—দান। কিন্তু এর প্রকার-ভেদও স্পষ্ট। দান পরকে করতে পারে আপনার জন—যদি অন্তর হতে উদ্ভূত হয় প্রবৃত্তি। পরকে যে আপন করতে না পারে তার পক্ষে জগদীশ্বরের উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। কারণ মণিমালার তিনি সূত্র। প্রত্যেক জীব এক একটি মণি সে বিরাট মাল্যের।

লীলাময়ী প্রকৃতির খেলায় আমাদের নিত্যই বিস্মিত করে তাঁর ত্রিগুণ। ধীর শান্ত আকাশে ফুটে ওঠে চন্দ্র, সুষমা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। জ্যোৎস্না ধুইয়ে দেয় জল স্থল, মলিনতা হয় দূর পৃথিবীর দেহ হ'তে। সে আনন্দের লহরে সাড়া দেয় মানুষের মন। কে যেন হৃদয়কে টেনে নিয়ে যায় প্রকৃতির মাধুর্য্যময় লীলাকাননে। সৃষ্টিতে দেখে লোক শান্ত জগৎ। মানুষের চিত্তে প্রকৃতির লীলা-রঙ্গের প্রতিক্রিয়া সামান্য নয়। আবার ঝঞ্ঝা ওঠে, বায়ু বহে প্রচণ্ড মত্ততার তালে, কানন ভাঙ্গে—গাছ পালা,

* গীতা—১৭।১১।১২।১৩

শাক সবজী হয় উৎক্ষিপ্ত। বন্ধ হয় পাখীর গান, প্রাণ বিহ্বল হয়, আত্মরক্ষার তিয়া ওঠে, প্রাণ করে আহি আহি। প্রকৃতির এ রাজসিক চাঞ্চল্য চঞ্চল করে মাধবের চিত্ত। হয়তো সে ভগবানকে ডাকে, বলে—ত্রাণ কর হরি, প্রশমন কর তাণ্ডবলীলা, রক্ষা কর তোমার সৃষ্টি। সে প্রার্থনা রাজসিক। আবার যেদিন গ্রামে, তাপে পুড়িয়ে মারে প্রকৃত জীবনের সকল প্রেরণা, উদ্যম এবং কর্ম-শক্তি—দারুণ তামসিক ভাব আসে প্রাণে। জড়তা ঘুলিয়ে দেয় আমাদের চমৎকৃত সমৃদ্ধি, আমাদের ক্রীড়ার কর্মকেন্দ্র হয় বন্ধ।

সারা গীতার ঐতিহাসিক কাণ্ড কি ত্রিগুণের লীলার চমৎকার দৃষ্টান্ত নয়? তামসিক ভাব এসেছে। অর্জুনের হাতের গাণ্ডীব পড়ছে খসে। শুকাচ্ছে মুখ। দারুণ জড়তা, কিসের মুহ্যমান, কেন পরিশ্রম? প্রকৃত তামসিক সেভাব।

তখন তাঁর আচরণকে করতে হবে রাজসিক। চাপ্‌তে হবে ভয়ো। জাগাতে হবে কর্মক্ষমতা। বল্লেন কৃষ্ণ—ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ ন ত্বৈত্যুপপদ্যতে। ছিঃ ছিঃ বীরচূড়ামণির ক্লীবতা! বল্লেন—ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। ওঠ, জাগো, হৃদয়ের দুর্বলতা কর পরিহার।

এ শিক্ষা প্রতিদিনের, প্রতি জীবের জন্য, যে মনের একটা আচরণ তামসিক, তারই জন্য ব্যবহার রাজসিক। মনের শাসনে তার তিন দিকের যেদিক ইচ্ছা ভোগ করা যায়, তাকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দিলে তার আচরণের সীমা থাকে না।

গীতার দেখি প্রথমে তামসিক ভাবের চূড়ান্ত, তার পর রাজসিক ভাবের উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজসিক বৃত্তিকে বেগ দিয়ে তার মাধ্যমে দিচ্ছেন উপদেশ। বোঝালেন তিন প্রকার গুণের কথা। বিশ্বরূপ দেখালেন। সাত্ত্বিক আচরণের পরিচয় দিলেন। জীবকে শেখালেন—জীবই শিব। পরকে আপনার না করলে শান্তি নাই। অলস ভাবে যা হয় হক, এ আচরণে দুঃখসাগর পার হবার ভেলাটি অবধি পাওয়া অসম্ভব। কেবল ফল প্রত্যাশার কার্য্য করলে মুক্তি নাই। আনন্দ সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিতে। কিন্তু সেই প্রবৃত্তি অপর দুটির সাথে বাঁধা। কে জানে কখন পট হয় পরিবর্তন। তাই চরম শিক্ষা—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈ র্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।*

দেহোৎপত্তির কারণ এই তিন গুণ। দেহী এই তিন গুণকে অতিক্রম করলে জন্ম, মৃত্যু, জরা দুঃখ হতে বিমুক্ত হতে পারে। তখন সে লাভ করে অমৃত।

বড় রহস্যময় তত্ত্ব। তিন গুণ প্রকৃতি সম্ভব। এরা দেহীকে বাঁধে দেহে। সত্ত্ব নির্মল, প্রকাশক, আনন্দদান করে এবং উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান। একেও করতে হবে অতিক্রম। এর দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব রাজসিক প্রবৃত্তিকে সে উৎপন্ন করে তৃষ্ণা এবং আসক্তি। সে কর্মে বাঁধে জীবকে। সত্ত্বকে জাগাতে পারলে পারা যায় তার প্রভাব অতিক্রম করতে। রাজসিক গুণ উদ্বুদ্ধ ক'রে নষ্ট করা যায় সেই আচরণ যে অজ্ঞানজাত তাই সৃষ্টি করে ভ্রান্তি। সে বাঁধে জীবকে প্রমাদে, আলস্যে, নিদ্রায় মূঢ়তায়।

কিন্তু আসল মুক্তি এই তিন গুণের অতীত হলে, তার কী লক্ষণ? কিরূপ আচরণ করলে গুণাতীত হওয়া যায়। কী প্রকারেই বা তিন গুণ অতিক্রম করা যায়।

কেন হবে না? তবে শোন, বল্লেন সারথী গুরু।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে
গুণা বর্ত্তন্ত-ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।†

জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা মোহ উৎপন্ন হ'লে যিনি দ্বেষ করেন না এবং সেগুলি নিবৃত্ত থাকলেও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীন ভাবে স্থির থাকেন ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, যিনি গুণ তিনটি তো বিদ্যমান আছেই এ ভাব আয়ত্ত করে শান্তভাবে অবস্থান করেন তিনিই বিচলিত হন না।

এ অবস্থা গুণাতীত অবস্থা। পূর্ব্বে ভগবান বলেছেন চিত্তের সাত্ত্বিক অবস্থায় উদ্ভব হয় জ্ঞান। সে অবস্থায় মন বিচলিত হলে জগতের ভ্রান্তি তাণ্ডবের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়।

---

* গীতা—১৪।২০।

† গীতা—১৪।২২।২৩।

তখন ক্ষোভ হয় দুঃখ হয়। অমনি জ্ঞান পরিণত হয় রাজসিক জ্ঞানে—ক্ষোভ আসে, এমন কি জগতকে শিক্ষাদেবার লোভ আসে। কাজেই গুণ পাল্টে যায়, জাগে রাজসিক বৃত্তি।

রজো গুণ হ'তে জন্মে লোভ। সেই লোভের স্বপ্ন, লাভের আশা প্রমাদ আনে। সেই প্রমাদই মোহ। তাই রাজসিক প্রবৃত্তি ধরে তামসিক ভাব। এরা তিনটি পরিবর্তনশীল। সত্ত্বের সুখ তো চিরস্থায়ী নয়। জ্ঞানীরও মনে আসে কর্মপ্রবৃত্তি। কর্মীরও মনে আসে অবসাদ।

তাই গুণাতীত হবার বাসনা। বলা বাহুল্য সংযম ও সুচিন্তার সাধনা আবশ্যক; এ অবস্থা অভ্যাস করতে স্থির বিবেচনার ফলে বোঝা যায়, গীতার শিক্ষা কোনটি অন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন নয়। কর্ম জীবধর্ম, কিন্তু দুঃখ এড়াতে হলে নিষ্কাম ধর্ম আবশ্যক। নিষ্কাম কর্ম হ'তে বোঝা যায় জগতের কর্মের মূল—বৃথা আপনাকে গ্রন্থির পর গ্রন্থিতে জড়ানো সে চিন্তায় আসে সন্ন্যাস। কিন্তু শরণ ও ভক্তি না থাকলে সব বিড়ম্বনা। ধ্যানে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়। অথচ সকল কর্ম, সব চিন্তা, সব ধ্যান করতে হবে জীবকে যে তিনগুণে বাঁধা। এই প্রত্যেক অবস্থা একটি অঙ্গের সহায়ক, অভ্যাসে সবগুলি আয়ত্ত করলে হবে জীব—গুণাতীত। জ্ঞান, লোভ বা প্রমাদ তাকে বিচলিত করবে না—ঈশ্বরে শরণ তাকে দেখাবে চরম ও পরম পদ।

সংসারে গুণাতীত হবার মত চরিত্র অনুশীলনের স্পষ্ট উপায় দেখিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাদের আলোচনা করলে ঐ কথাই স্পষ্ট হবে প্রতীয়মান যে তাঁর বর্ণিত পতাকার তিন ভাগের একভাগ বাদ দিলে জয়যাত্রার নিশান উঠ্‌বেনা সাধকের হস্তে। ত্রিবেণীধামে মুক্তি—তিনটি স্রোত এক প্রবাহে মিলনে ভাগীরথী। গুণাতীত হ'তে হ'লে সুখদুঃখে হতে হবে সমজ্ঞান। নিজের যে প্রকৃত ভাব, আত্মা জীবন রথের রথী সে ভাবে বুদ্ধি স্থির রাখতে হবে। মনোরথের এলোমেলো ক্ষিপ্রগতি আনতে পারেনা সে অবস্থা। মাটি, পাথর বা সোনাকে দেখতে হবে সমদৃষ্টিতে। এরা কেহ পারবেনা যখন মলিনতা, কঠোরতা বা লোভের উদ্রেক করতে প্রাণে, তখন জীব হবে গুণাতীত। তেমন অবস্থায় থাকবেনা কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয়। সে মানুষ হবে ধীর—মন তো হারাবে বিক্ষেপ। নিন্দাস্তুতির উচ্চে উঠবে তখন চিত্ত। মানই তার কি, কী বা অপমান, কে তার মিত্র, কে তার অরি—যার সমদৃষ্টি সকল জীবে। এ অবস্থায় উঠলে তো আর কর্মপ্রবৃত্তি থাকবেনা। সে সন্ন্যাস কর্মত্যাগ হবে প্রকৃত সন্ন্যাস। এই ত গুণাতীত অবস্থা।*

কিন্তু এ অবস্থা আসতে পারেনা আত্মসমর্পণ ভিন্ন ভগবানে। তিনি নাহি দিলে দেখা—কেহ কী দেখিতে পায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ চরম বাণী শোনালেন এ প্রসঙ্গে।

"এবং যিনি অবিচলিত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি এই ত্রিগুণ অতিক্রমের ফলে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন।†

ত্রিগুণ প্রকৃতিগত। জীবন সমৃদ্ধ হয় সত্ত্বগুণ প্রবুদ্ধ করলে সকল কর্মে সকল ভাবে, জীবনের সকল অবস্থায়। কিন্তু তাতেও মুক্তি নাই, কারণ গুণ প্রকৃতিগত। তিনটির প্রত্যেকটির পাকে আবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তাই গুণাতীত হ'তে হবে সেই সাধককে—যে জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখের পেষণ হ'তে অমৃতধামে যাবার প্রয়াসী।

গীতার এই ত্রিগুণ তত্ত্ব পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। সেথা ব্রহ্মার স্তবে শুনি—

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী
কালরাত্রি মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।

তুমি সবার প্রকৃতি। সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের দ্বারা তোমার স্বরূপ বিভাবিত হয়। সেই ত্রিগুণ লয়ের পক্ষেও তুমি ভয়ঙ্করী। তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং মোহরাত্রি।

সেই গীতার কথা। প্রকৃতির অনুভব হয় সৃষ্টিতে ও জীবে তিনগুণে। কিন্তু মাত্র সেই তিনগুণেই তো প্রকৃতি বিশ্বকে বেঁধে রাখেন। তিনি এই নিজের সৃষ্টি বৈষ্ণবী-মায়ার লোপ করতেও পারেন। সেই তো সাধনা জীবনের। তিনি সৃষ্টি করেছেন গুণ। তিনি রেখেছেন তাদের প্রভাব বিশ্বসংসারে। আবার তাঁরই শরণে পরিত্রাণ—তিনি গুণাশ্রয় এবং গুণময়।

গুণাতীত হওয়ার কথা বলেন ব্রহ্মা। তুমি মোহা-

---

* গীতা—১৪।২৩।২৫

† মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ১৪,২৬

যোগ। প্রকৃতি মুক্ত করতে পারেন মোহ—তিনি মোহ-রাত্রি। মোহের প্রকাশ বন্ধ হয় রাত্রের দারুণ আঁধারে মোহ হারালে। সে রাত্রি প্রকৃতি স্বয়ং। তাঁর আশ্রয়ে তমোগুণাতীত হওয়া যায়। তাই তিনি মোহের জনয়িত্রী, আবার মোহের লোপসাধন করেন।

তিনি মহারাত্রি—মহতের বিকাশে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ। বিষয় সংযোগ ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় হয়। সেই মহতের প্রকাশ বন্ধ হয় মোহরাত্রে অর্থাৎ তার আলোক বর্তিকার নির্বাণে।

আর কালরাত্রি। কালের বিভাগ অনন্তের অনুভূতিকে করে খণ্ডিত। বিশ্বানুভূতি, অনন্তানুভূতি, শাশ্বত, নিত্যের জ্ঞান। সে জ্ঞান খণ্ডিত কালজ্ঞানে সম্ভব নয়। তাই কালকে নিমজ্জিত করতে হবে রাত্রের দারুণ আঁধারে। সে অনুভূতি গুণাতীত জ্ঞান। কালীর কৃষ্ণ মূর্তিতে ভেদাভেদ হয় লুপ্ত।

তাই ব্রহ্মা বলেন—তুমি প্রকৃতি গুণত্রয় বিভাবিনী। আবার তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি। পূর্বে তাকে স্তবে বলেছেন তিনি মহাদেবী, মহা—আসুরী। গীতা বলেছেন—জীবের দৈব এবং আসুর স্বভাব সম্পদ।

ব্রহ্মা বলেন—প্রকৃতিস্থক সর্বস্তু—সারা বিশ্ব-প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী।

সত্যইতো ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের বিভাগ—কাল-প্রতীতি অতি শুভমুহূর্তেও ত্যাগ করতে পারেনা জীব। কিন্তু তার রাত্রি না এলে কি প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত হওয়া সম্ভবপর। মহত্ত্ব বিলুপ্ত না হ'লে রাজসিক ভাব কখনই দূর হ'তে পারেনা কারণ কর্মই জীবের প্রকৃতি। জগতমোহ অনিত্য। সংসার সুখের মোহ এক অতি প্রবল বন্ধন। এ আচরণ উন্মুক্ত হলে তবে কর্মক্ষমতা আসে, সম্যক দৃষ্টি লাভ হয়।

যদি স্থিরমতি হ'য়ে মানুষ নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করে তা হ'লে সন্দেহ থাকবেনা স্বভাব আমাদের মোহ আনে, কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং আবার কল্যাণ করে সাত্ত্বিক-ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে। কিন্তু মানুষ তো প্রকৃতির খেলা সে দৃষ্টিতে দেখে না। স্পষ্টই ভগবান বলেছেন—

"প্রকৃতির গুণের দ্বারা সর্বপ্রকারে সকল কর্ম সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে—আমিই স্বয়ং কর্তা।"*

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে। ৩.২৭

অহঙ্কারবোধই মানুষকে পৃথক করে রাখে জগতে। তাই গুণাতীত হতে গেলে স্থিরবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত আবশ্যক যে গুণসমূহ গুণেতেই অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের কথা—

হে মহাবাহু, গুণকর্ম বিভাগের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ গুণসমূহ গুণেতেই বিদ্যমান—এই কথা বুঝে কর্তৃত্বাভিমান করেন না। প্রকৃতির গুণে বিমোহিত পুরুষ গুণ কর্মে আসক্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা আশার বাণী জাগে প্রাণের মাঝে। একটা মন্দ কাজ করে লোক, তার পর ভাবে আর তার উপায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, মুক্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ। স্থির-ভাবে, আত্মদর্শন করে যদি সে বুঝে, নিশ্চয় সে বুঝবে মোহের বশে, প্রাপ্ত রজোগুণের উদ্দীপনায় কৃত কর্মের ফল সংশোধন সম্ভব, সাবধানে ঐ দুটি গুণের প্ররোচনা অতিক্রম করলে। সতর্কতার কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর। সে ভাবশুদ্ধির জন্য শ্রীভগবানে কর্ম অর্পণ করলে, পরিতপ্ত হয়ে সাত্ত্বিক ভাবে চিত্তকে প্রবুদ্ধ করলে এবং তাঁর শরণ নিলে, এড়ানো যায় বৃথা চিন্তা যে—মানুষ চিরদুঃখী, চিরপাপী, চিরঅনুতাপী। গুণময়ী গুণাশ্রয়কে উদ্বুদ্ধ করবার স্তোত্র দেবতারা শিখিয়েছেন চণ্ডী পুরাণে—

শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমস্তুতে।

শরণাগত আর্তজনের তুমি পরিত্রাণ-পরায়ণা। তুমি যে গুণাশ্রয়ে, গুণময়ে, নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার করি।

পরাপ্রকৃতি পরব্রহ্মের স্বভাব। প্রকৃতি অবিকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় লয়ে। কিন্তু গুণের বিকার বৈষ্ণবী মায়া—মায়ার জগতের সৃষ্টি। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রকৃতির গুণ ভোগ করেন।

এ বিষয় বিশদ আলোচনা অন্যত্র আবশ্যক।

সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও পুরুষের রূপ এবং সম্বন্ধ বিচার করেছে। গীতা পুরুষও প্রকৃতিকে বলেছেন অনাদি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রকৃতিকে বন্দনা করেছে—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।

বিবিধ প্রজা (মহদাদিকার্য্য-প্রসূ) জনয়িত্রী লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণা (রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ স্বরূপা) অধিতীয় অজাকে (উৎপত্তি-রহিতা মূল প্রকৃতিকে) নমস্কার করি।

সমাজ-সংস্কারক রমেশ

শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল

শরৎ-সাহিত্যে ক্ষিষ্ণু পল্লীর সমাজ-শাসিত যান্ত্রিতা-লাঞ্ছিত জীবনের যে চিত্র সুপরিস্ফুট, পাক্-শরৎচন্দ্রীয় যুগের কোন কথা-সাহিত্যেই তাহার তুলনা মেলে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছোট গল্পে "ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা নিতান্তই সহজ সরল" কাহিনীর মধ্য দিয়া পল্লীজীবনের সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের ভাষা দিয়াছেন। তবুও তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে আসিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার সাহিত্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের কথাই মুখ্য। এক শরৎচন্দ্রেই মেলে সাধারণ মানুষের ভিড়। বাংলার পল্লীজীবনকে ঘেরিয়া যে অসংখ্য সমাজ জীবনকে জড়িয়েছে পড়িয়েছে, যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রস্তরকঠিন এই সমাজের নিপীড়িত মানবাত্মার বিকাশে বাধা জন্মাইতেছে, শরৎচন্দ্র তাহার নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন 'পল্লী-সমাজে'। পল্লীর যে সমস্ত সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অনাচার আমাদের সমাজদেহে দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাদের অস্তিত্বে সমাজ-জীবন ছারখার হইয়া পড়িতেছে, সেই সমস্যার উপরই তিনি নির্মমভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন।

পল্লীসমাজের নায়ক রমেশ শিক্ষিত হৃদয়বান আদর্শ যুবক। তিনি জাতিভেদ মানেননা, প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় বিভিন্ন সংস্কারেও আস্থাশীল নহেন। আবাল্য সহরে মানুষ। পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে ফিরিয়াছেন। পিতৃশ্রাদ্ধ কেন্দ্র করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের যড়যন্ত্রপরায়ণতা ও নীচাশয়তার যে-পরিচয় তিনি পাইলেন তাহাতে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল আজিকার পল্লী-বাংলার স্বরূপ। তাহাদের পিতৃশ্রাদ্ধপণ, মিথ্যা সাক্ষী, মামলা-মোকর্দ্দমা, জাল-জুয়াচুরি—এই সমস্তই যেন গ্রামগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। ঘুরে ফিরে বসিল পল্লীর নিরক্ষরতার, নিরন্নতার, নিঃস্বার্থ-পরতা, নিরুদ্যম, শাস্ত্রি-বন্ধনমন্থরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রমেশ এতদিন মশগুল ছিলেন। আকস্মিক পল্লীজীবনের রুক্ষতার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। বুঝিলেন "একি ভ্রান্তি! তাঁহার সহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এত পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই। তাই আমাদের জীর্ণপ্রায় পল্লীসমাজের দৈন্য দূর করিয়া তাহার সংস্কারের জন্য সমস্ত নীচতার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের ব্রত হইল স্কুলগৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরী, খানাডোবা পরিষ্কার। এই সমস্ত সৎকার্যও যখন গ্রামবাসীরা সন্দেহের চোখে দেখে, তাঁহার সরল উদ্যমে স্বার্থসিদ্ধির গন্ধ পায়, তখন তিনি তাহাদের উপর অভিমান করিয়া জন্মভূমি ত্যাগের সংকল্প করেন। কিন্তু ক্ষিপ্তবয়ীর মৃদু ভৎর্সনায় তাহার চৈতন্যোদয় হয়। বলেন, যাহারা এতই সংকীর্ণভাবে স্বার্থপর যে যথার্থ মঙ্গল কোথায় চোখ মেলিয়া দেখিতে পায় না, শিক্ষার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে কোনমতে প্রতিবেশীর মনস্কর করাটাকেই নিজেদের মনস্কষ্টের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না।"

-তাই অসমসাহসিক পরহিতব্রতী রমেশ আবার পল্লী উন্নয়নে সচেষ্ট হন। পরের জন্য প্রাণ যাহার কাঁদিয়া আকুল হইতেছে তিনি কি কখনও পরের দুঃখ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তাই দেখি, মৃত স্বামিক চক্রবর্তীর দশ এগার বছরের ছেলে যখন তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা চাহে তখন তিনি তাহার পিতার সৎকারের ব্যবস্থা করেন। যেখানে অন্যায় অবিচার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রজারা উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে, সেখানেই তিনি চলিয়াছেন অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া। গ্রামের পল্লীর মুসলমান প্রজারা বেণী ঘোষাল ও রমাইয়ের গয়রাতে জলমগ্ন জমির জলনিষ্কাষণের পথ করিয়া দিবার আবেদনে ব্যর্থ হইলে রমেশের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করে। রমেশের আবেদনেও যখন তাহাদের পাষাণ হৃদয় গলিল না, তখন তিনি নিজে গিয়া তাহাদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। কাহারও হৃদয় থাকিলে অনুতপ্ত হইত—কী মহতী প্রেরণায় তিনি সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সামাজিক নীচতা, হীনতা, কাপুরুষতা ও কৃতঘ্নতার একাধিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 'পল্লী-সমাজে'। এই নীচতার মূর্ত্ত বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর নাম সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে জাগে। চুরি, জুয়াচুরি, জাল, মিথ্যাসাক্ষ্য রটনা, রমণীর সর্ব্বনাশ—কোন রকম দুষ্কর্মেই তাহাদের বাধে না। বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী ষড়যন্ত্র করিয়া সত্য সাক্ষ্যদানের অপরাধে নিরপরাধ ভৈরব আগরীর সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। ইহারাই বেণীর মৃত্যুতে রাখালদাসের দশবৎ মৃত্যুতে ভৈরবের নামে মুখে আগুনে এগারশ বাহান্ন টাকা দাত আদায় ডিক্রী করিয়াছে এবং তাহার বাস্তুভিটাটা ক্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রী নহে। যথারীতি সমন বাহির হইয়াছে। কে তাহা ভৈরবের নামে দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং যার দিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার সব মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্ব্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্ব্বলের ধন-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে। কী ভয়ঙ্কর মনোবৃত্তির অব্যাহত অধঃপতন-চারিত্রিক, নির্লজ্জ স্বার্থসিদ্ধি ও হৃদয়হীনতা, কী পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও

নৈতিক হীনতা! কিন্তু ইহাই শেষ নহে, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ও মর্ম্মান্তিক পরিতাপের বিষয় এই যে এই সমাজপতিদের হাত হইতে রমেশ যে ভৈরব আচার্য্যকে রক্ষা করিল সেই ভৈরব আচার্য্যই আবার সমাজ-পতিদের দলে যোগ দিল। এই দৃষ্টান্ত প্রবৃত্তির বলে আজও বেণী ঘোষাল আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী সমাজপতি, আর রমেশরা একঘরে। কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ ইহা অপেক্ষা আর কী হইতে পারে।

কিন্তু ইহা যাক্। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা যেই বিস্মিত হই যখন দেখি আমাদের সমাজের নাগপাশ আমাদের জাতীয় জীবনকে শতপাকে জড়াইয়া এমনভাবে পঙ্গু করিয়াছে যে, রমাও শুধুমাত্র সমাজপতির ভয়ে আর তাহার মিথ্যা কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে ফেলে পাঠাইল। আবার যে রমা তাহার প্রেমাস্পদের এতবড় শত্রুতা সাধন করিল শুধু সমাজের ভয়ে, সেই রমাই আবার নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছে "যে সমাজের ভয়ে এত বড় গর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসিল সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি অল্পকয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্ষুদ্র হিংসার বাহিরে কোথাও কী তাহার অস্তিত্ব আছে?" আমরা জানি শতশত বেণী ঘোষাল আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রভৃতি ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষীর বাহিরে এই সমাজের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ইহারাই ত এখনও আমাদের সমাজের কর্ণধার। তাহাদের মুখে উপনীত বাংলার পল্লীসমাজের এতদিন হয়ত অবলুপ্তি ঘটিত যদি না ইহাদের পাশে থাকিত বাংলার জন্মাবধী জননী বিশ্বেশ্বরীরা। বেণী ঘোষাল আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী যেমন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শুধু বিষ ছড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, তেমনি বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি জননীরা তাহাদের স্নেহ-মায়া-প্রেম-প্রীতির কল্যাণ-কিরণ বিন্দুমাত্রে সেই সমাজকেই মধুময় করিয়াছে।

মাতৃঃ। সমাজের এই গ্লানি মোচনের জন্যই ত রমেশরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়। আমাদের এই ধরিত্রী খুঁজিয়া অতল অনড় সমাজ জীবনের অস্তিত্বের ভিত্তি নড়াইবার জন্য, তাহার অন্তরে প্রাণ সঞ্চেতনতা সঞ্চার করিবার জন্য রমেশ কারাবরণ করিয়া যে অমর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। হয়ত কোন অর্থ পূর্ণ মঙ্গলের জন্যই তাঁহার এই কারাবরণের প্রয়োজন ছিল। কেননা আপাত ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই তিনি সফলতার সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। তাই কবি হুইটম্যানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও গাহিব—

"Have you heard that it is good to gain the day?
I also say it is good to fall!"

কারাবরণ করিয়া যে আদর্শ তিনি দেখাইলেন, সেই আদর্শ ক্রমশঃ আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করিয়াছে। রমেশের অনির্ব্বাণ জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ তাহাদের জড়বুদ্ধিকে আঘাত করিয়া চিত্তের হীনতা ও সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চেতনাবোধের উদ্বোধন ঘটাইয়াছে। এখন তাহারা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়াছে, উদার আকাশে মাথা তুলিয়াছে, ছা-পোষা জীবনের মিথ্যা নৈমিত্তিকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, পিছু-হটা, মিলাইয়া পড়া সত্তা ছাড়িয়া নূতন জীবনের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। তাই এখন আর তাহারা অন্ধকূপের রুদ্ধশ্বাস অস্তিত্বে নিঃশেষিত-প্রায় পল্লী-সমাজের বৈন্নবিক সংস্কারের রঙ্গমঞ্চের নীরব দর্শকমাত্র নহে—ইহারাই এখন এই আন্দোলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

কবি-সঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ঔপনিষদিক অর্থে 'কবি' বলিতে সর্ব্বজ্ঞ বুঝায়। গীতায় সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীস্ দেশে stoicরা যে অর্থে 'The wise man' ব্যবহার করিতেন। ষ্টোয়িকরা এই সর্ব্বজ্ঞকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এখনকার কবি সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও তাঁহারা যে দূরদর্শী ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত।

যে সকল মনস্বী বিশ্বত কবিজনের সংস্পর্শ জীবনে লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি তাঁহাদের কথা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছি, আজ আবার যে সকল কবিজনের কথা বলিব, তাঁহারা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা বাদ দিলেও তিনি তাঁহার কবিতায় এমন এক অমর ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা চিরদিন তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। "সাগর সঙ্গীত" ও "মালঞ্চ" কবিতা সংগ্রহে তিনি তাঁহার অক্ষয় কবিপ্রতিভা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। 'নারায়ণ' নামে যে মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন তিনি করেন তাহাতে একজন লেখক হিসাবেও আমি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম। ১৯১৯ সালে আমাদের দেশ বটিকাবর্ত্তে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বটিকাবর্ত্ত বন্যার জেরার উপর দিয়া বহিয়া যায় ও আমাদের অঞ্চল একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। এই বটিকাবর্ত্তে দুর্দ্দশা-

গ্রস্ত নরনারীর সাহায্যার্থ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও এইচ, ডি, বোস প্রভৃতি এক সাইক্লোন-রিলিফ-ফাণ্ড (fund) স্থাপন করেন। আমি আমার অঞ্চলে কতকগুলি গ্রাম লইয়া সেবাকার্য্য আরম্ভ করি। সেই সূত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে।

আমি ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হইয়া আসি ; ঠিক সেই সময়ে বা তাহার কিছু পরে (ঠিক মনে নাই) মিঃ এম, ঘোষের সহিত আমার হৃদ্যতা হয়। তিনি ইংরাজীতে কবিতা লিখিতেন এবং পাশ্চাত্য দেশেও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দ বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি বটে, কিন্তু ১৯৩৯ সালে পণ্ডিচেরীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসিয়াছিলাম। তাঁহাদের এক ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারও একজন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী। এখন তিনি 'দৈনিক বসুমতীর' সম্পাদক। তাঁহাদের পিতা ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ খুলনার একজন নামকরা সিভিল-সার্জন ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ বাল্যকাল হইতেই বিলাতে ছিলেন। সেই জন্য তিনি ইংরাজীতে কথা কহিতেই বেশী অভ্যস্ত ছিলেন এবং ইংরাজীতেই কবিতা লিখিতেন। আমরাও তাঁহার সহিত ইংরাজীতেই কথা কহিতাম। একবার তিনি পুরীধামে গমন করেন, আমিও সে সময়ে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে পুরীতে বাস করিতেছিলাম। এমন সময়ে ফরিদপুরের পিতামহস্বরূপ অম্বিকাচরণ মজুমদারও পুরী গিয়াছিলেন। আমি ও মিঃ ঘোষ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। সমুদ্র তীরের বেলাভূমিতে। আমি মিঃ ঘোষকে ইংরাজী কথায় পরিচয় করিয়া দিলাম। কিন্তু, মজার কথা এই যে, মিঃ ঘোষ সেই দিন প্রথম বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং সেও যা'তা' বিষয় নহে —রাজনীতি বিষয়ের চর্চ্চা! আমি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম যে মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ রাজনীতিকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিঃ ঘোষের মিল ছিল। তখন মিঃ ঘোষের Love songs and Elegies এবং Songs of Love and Death নামক কবিতা বাহির হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে কবি ও বাগ্মী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম করিতে পারি। বিলাতে শিক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়া তিনিও ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার যে সব বক্তৃতা শুনিয়াছি, সেগুলি কবিতার মতই সরস ও সজীব। ১৯২৭ সালে যখন তিনি বোম্বাই তাজমহল হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের মূল সভাপতি (ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ) এবং আমরা বিভাগীয় সভাপতি কয়েকজন সেখানে চায়ে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেখানেও পরদিন উইলিংডন ক্লাবে আহূত হইয়া আমরা তাঁহার সৌজন্যে ও আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। নির্ঝরিণীর ধারার মতই তাহা সহজ ও সুন্দর ভাবে অনর্গল প্রবাহিত হইয়া যাইত। শ্রীমতী আনি বেসান্তের বক্তৃতাও আমি একাধিকবার শুনিয়াছি। কিন্তু সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা আরো সরস ও কবিত্বপূর্ণ। শ্রীমতী নাইডুর পিতা ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কেও আমি দেখিয়াছি। শিক্ষার জন্য তিনি অল্প বয়সেই শ্রীমতী নাইডুকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজীতে তিনি কয়েকখানি কবিতার বই রচনা করিয়া প্রভূত যশোলাভ করেন। তাহার মধ্যে "The Broken wing" ও "Golden Threshold" বিখ্যাত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক। বাল্যকাল হইতেই তিনি এই দুই বিষয়ের চর্চ্চায় মনোযোগ দিয়াছিলেন। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার কালেই তাঁহার সহিত পরিচিত হই। সে সময়ে হেমেন্দ্র-প্রসাদের বাসভবন সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" পত্রের কার্য্যালয়ের মতই ছিল এবং তাঁহার বৈঠকখানা সাহিত্যিকদের আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল। অনেক সাহিত্যসেবী ঐ বাড়ীতে গিয়া জুটিতেন। আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই 'সাহিত্যে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই হিসাবে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি 'অধঃপতন', 'বিপত্নীক' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া অল্প বয়সেই যশস্বী হইয়াছিলেন। এখন পরিণত বয়সে প্রবীণ সাংবাদিক হিসাবে অধিক পরিচিত।

রমণীমোহন ঘোষ কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিও হেমেন্দ্রপ্রসাদের বৈঠকে যোগ-দান করিতেন। তিনি পোষ্ট অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে

বাস করিতেন। তাঁহার স্বভাব যেমন মিষ্ট ছিল, তেমনি তাঁহার কবিতাগুলি সরস ও প্রফুল্লতাগুণে বিভূষিত থাকিত। "জীবন্ত" প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বসুকে ঐ আড্ডায় দেখিয়াছি। ইহারা কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ভ্রাতা ছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত সামাজিক ও কবিতা-রসপ্রিয় ছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে কেহ কেহ বলিত, ইহার এক ভাই জীব ও অপরজন জন্তু। নরেন্দ্রনাথ অমনি উত্তর করিতেন, বেশী চালাকি কর্‌বেন না। লোককে বলে দেব, তাঁর বইএ (জীবন্ত) আপনার ছবি ছাপিয়ে দেবেন। সে বইএ অনেক বানরের ছবি ছিল।

আর একজন কবির কথা মনে পড়িতেছে যাঁহার নাম বোধ হয় অনেকেই এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্নর বাড়ী ছিল রাণাঘাটে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন একজন উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন। তাঁহার "নদী" ও "অপূর্ণ কল্পনা" প্রভৃতি কবিতা এখনও লোকে ভোলে নাই। "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা" বলিয়া কলিকাতায় বলরাম দে ষ্ট্রীটে একটি প্রকাণ্ড স্কুল ছিল। তাহাতে প্রায় দুই হাজার ছেলে পড়িত। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং ঐ প্রসঙ্গেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Minto Professor) ও আমাকে এই স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন। সম্পাদকরূপে আমরা বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই ; কিন্তু দেবেন্দ্র নাথের বিনয় ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

গিরিজাপ্রসন্ন বসু ও তাঁহার সহধর্মিণী তমাললতা উভয়েই সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। গিরিজা-প্রসন্নের সরল ব্যবহার ও কবিতামাধুর্য্য আমার চিত্তে এখনও অঙ্কিত হইয়া আছে।

এখন এমন একজন কবির নাম করিব, যিনি হয়ত অনেকের নিকট তেমন সুপরিচিত নহেন।, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইণ্টারমিডিয়েটের বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। Tennysonএর In memorium ও Enoch Arden কবিতাদ্বয় তিনি অতি সুমিষ্ট ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেন। এরূপ সুন্দর ও সরল বঙ্গানুবাদ আমি ইহার পূর্ব্বে আর দেখি নাই। আমি যখন চুঁচুড়ার ইন্সপেক্টর ছিলাম, সেই সময়ে তিনি চন্দননগর হইতে আসিয়া তাঁহার ঐ দুইখানি বই আমাকে উপহার দিয়া গেলেন।

বিশ্বরূপ গোস্বামী একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁহার বৈষ্ণব কবিতা বর্ত্তমান যুগে যুগান্তর আনয়ন করে। হাওড়াসমাজ (নদের নিমাই) সম্পর্কে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই। গোস্বামী মহাশয় গৌরচন্দ্রের প্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার 'গৌরলীলা' ও অন্যান্য সঙ্গীতগুলি বহুলোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল।

"কাঁচা সোনার বরণ ধরেছে।
হলধরা তার রূপের বাহার চিনলি না তারে।"

প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। কয়েক-বৎসর পূর্ব্বে তিনি পূর্ণযৌবনে হঠাৎ দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিশ্বরূপ গোস্বামী "নদের নিমাই"কে অনেকগুলি গান দিয়াছিলেন। সেগুলি সুরে তালে অপূর্ব্ব।

ভারতে শিল্পের জাতীয়করণ

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজশক্তির উপর নির্ভরতা দেশভক্তির নিদর্শন, সহজয় ভারতবাসী বিদেশী সরকারকেও সে সম্মান হইতে বঞ্চিত করে নাই। তাহাদের বিশ্বাস ছিল সরকারের হাতে শাসন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা অবশ্যই সুপরিচালিত হইবে, সেইজন্য বৃটিশ আমলেই ভারতের বেশীর ভাগ রেলপথের জাতীয়করণ করা হয়—কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রচেষ্টা সে যুগে দেখা যায় নাই।

স্বাধীনতার অল্পদিন পরই ভারত নূতন শিল্পনীতি গ্রহণ করে আপন শিল্পের উন্নতির জন্য—ইহার সাহায্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত ও অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার একাধিকার গ্রহণ করে এবং Basic industry গুলি দশ বৎসরের মধ্যে জাতীয়করণ করা হইবে ইহা স্থির করা হয়। ১৯৫১ সালে শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় ও ১৯৫৩ সালে তাহা সংশোধিত হয়। এই আইনে সরকারের শিল্প নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধিপায়। এই আইনের বলে সরকার জাতীয়স্বার্থে কোনও শিল্প আপন হাতে লইতে পারেন এবং ইহার জন্য শিল্পপতিকে কোন কারণ প্রদর্শনের সময় পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর আসিল ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সঙ্গে আনিল সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা (socialistic pattern sector), ইহার ফলে সরকারি উদ্যোগ ক্ষেত্র (public sector) প্রসার লাভ করে। তাহার পর আসিল ১৯৫৬ সালের নূতন শিল্পনীতি, যাহার দ্বারা সরকার ১৭টি শিল্প বিকাশের সমগ্র দায়িত্ব নিজহাতে গ্রহণ করেন। এই সকলনীতি জাতীয়করণের পথকে প্রশস্ত করে।

১৯৫৩ সালে ভারতের বিমান কম্পানীগুলি (Airlines) জাতীয়করণ করা হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও কোলার স্বর্ণখনি আসে সরকারের পরিচালনাধীনে। সর্বশেষে ১৯৫৬ সালে জাতীয়করণ করা হয় ভারতের বীমাকম্পানীগুলি। বীমাকম্পানীগুলি জাতীয়করণের সময় সরকার এক নূতন নীতি অবলম্বন করেন—প্রথমে এই জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত থাকে সংগোপনে এবং তাহা রাষ্ট্রপতির বিশেষ অর্ডিন্যান্স দ্বারা সহসা গ্রহণ করা হয়।

এখন প্রশ্ন জাতীয়করণ আমরা সমর্থন করিতে পারি কিনা? জাতীয়করণ তখনই সমর্থন-যোগ্য যখন তাহা দেশের স্বার্থের অনুকূলে আসে ও তাহার সহিত আসে সুফলতা। জাতীয়করণ আর একটি ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য, যদি তাহা নিজস্ব শিল্পপতি অপেক্ষা মূল্য হ্রাস করিতে সমর্থ হয়।

জাতীয়করণের পক্ষে আমরা কয়েকটি কথা বলিতে পারি। প্রথমত জাতীয়করণ অসমান বণ্টনকে কিছুটা কমায়। বড় বড় শিল্পগুলি যদি শিল্পপতিদের হাতে থাকে, ফলে হয় ধনীর ধনবৃদ্ধি। সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষমতা সন্নিবেশিত হয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির করতলে। দ্বিতীয়ত জাতীয় স্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রয়োজন, যেমন উদাহরণ স্বরূপ ভারতের কয়লাখনিগুলি—প্রথমত জাতির ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উচ্চশ্রেণীর কয়লা সংরক্ষণ করিতে হইবে, দ্বিতীয়ত উহারা সুপরিচালিত নহে—অধিকাংশই আয়তনে ক্ষুদ্র ও সংখ্যায় বহু। জাতীয়করণের তৃতীয় কারণ বলা যাইতে পারে ভারতে কয়েকটি শিল্প সম্পূর্ণ বিদেশী মূলধনে ও পরিচালনায় আছে যেমন পাটশিল্প—ফলে প্রচুর লাভ বিদেশে চলিয়া যায়। চতুর্থ কথা ভারতের বর্তমান নীতি অনুসারে প্রধান প্রধান শিল্পগুলির জাতীয়করণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা জনসাধারণের মনে সঞ্চার করিয়াছে হতাশা। সরকারি মহলের আমোদীরা ইহা অবশ্যই সমর্থন করিবেন। প্রথমত সরকারি পরিচালনা আনে অথবা বিলম্ব ও অফিস ফাইল মনোবৃত্তি (red-tapism)। কর্মকুশলতাও হ্রাস পাইতে দেখা যাইতেছে। কোনও ব্যক্তিগত লাভের আশা না থাকায় কর্মপ্রেরণার অভাব দেখা যাইতেছে।

আবার জাতীয়করণ সফল করিতে হইলে যেরূপ কম্পানীর 'টেকনিকাল স্টাফ' প্রয়োজন তাহার একান্ত অভাব বর্তমান ভারতবর্ষে। বিশেষ করিয়া যাঁহাকে সর্বময়কর্তা (administrator) করা হইল তাঁহার হয়তো কোন ব্যবসা জ্ঞানই নাই। অনেকের মতে জাতীয়করণে যে অর্থব্যয় হইবে তাহা যদি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করা হয় তাহাতে শিল্প বিকাশের সহায়তা হইবে। নিজস্ব শিল্পপতির (private enterpriser) এর যে সকল দোষত্রুটি আছে তাহা করনীতি ও আইনদ্বারা সংশোধন করা যাইতে পারে যেমন অতিরিক্ত আয়কর ও শ্রমিক আইন।

এইবিষয়ে জমসাধাইএর অভিমত প্রণিধান যোগ্য, তাঁহার মতে অতিদ্রুত জাতীয়করণ বিপদের কারণ হইতে পারে। তিনি বীমাকম্পানীগুলি ও কোলার স্বর্ণখনি জাতীয়করণের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলেন, সরকারি পরিচালনায় যে দুর্নীতি ও কর্মকুশলতার অভাব দেখা গিয়াছে তাহাতে অধিক জাতীয়করণ দেশের স্বার্থবিরুদ্ধ। তিনি বিশেষক্ষেত্রে জাতীয়করণের discriminatory nationalisation এর পক্ষপাতী।

বীমাকম্পানীগুলির জাতীয়করণ সম্বন্ধে যত্ন আলোচনা প্রয়োজন। বীমাকম্পানীগুলি বৎসরে প্রায় ১২ কোটি টাকা লাভ করিত এবং জাতীয়করণের ফলে সেই অর্থ জাতীয় তহবিলে আসিল। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক সুবিধা হইবে। অবশ্য বীমাকম্পানী জাতীয়করণের অন্যকারণও ছিলো। বিগত ১০ বৎসরে প্রায় ২৫টি

বীমাকম্পানী উঠাইয়া দেওয়া ও আরো ২৫টির অবস্থা শোচনীয় হয়। সরকার মনে করেন জাতীয়করণের ফলে বীমাকম্পানীগুলি প্রসার করিবে ও গ্রাহকগণও বীমা করিবে এবং এইজন্য 'জনতা নীতি' janata policy গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এক বৎসর জাতীয়করণের ফলে দেখা যাইতেছে যে লাভের পরিমাণ কমিয়াছে, তবে আশা করা যায় আগামী বৎসর অবস্থার উন্নতি হইবে।

জীবনবীমার কাজে কয়েকটি এমন ধরণের প্রয়োজন যাহা সরকারি কর্মচারীর মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। যেমন মক্কেলকে প্রয়োজিত করা—তাহাকে আর্থিক উপদেশ দেওয়া এবং তাহাতে তাঁহার কার্যোদ্ধার হয় সেই চেষ্টা করা। তাহাছাড়া বীমা করিতে অত্যন্ত নম্র তাহাদের মনের প্রস্তুতিও প্রয়োজন। ইহাছাড়াও বীমাদের উপর পরিচালন ভার তাঁহারা মনে করেন কতি হইলে সরকারের হইবে তাঁহার নহে—ফলে কর্মপ্রেরণা ও উদ্দীপনার অভাব হয়।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে জাতীয়করণ ভারতের জনতার মনে আস্থা আনিতে পারে নাই এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে জাতীয়করণের পথ অপ্রশস্ত ও কণ্টকাকীর্ণ থাকিবে।

সার্থক প্রেম

শ্রীঅজয়কুমার

ওই ওরা যারা
রিক্ততার পাত্র হস্তে তৃষিত মরুতে
রাজপথে পথহারা।
ছিল অনন্ত স্পর্ধা
একদা তরুণের প্রেমের মন্দিরে
নিয়ম মাফিকের গণ্ডী ভেদি।
প্রেম তাদের করেছিল মহীয়ান
এঁকেছিল জয়টীকা প্রণত ললাটে,
স্বপন-কোষে তড়িত—সৃষ্টির টানে!

প্রেম দিয়েছিল কাছে কাছে
কত রাত কেটে গেছে তলে তলে
অতল পিয়ালা ভরিয়ে দিছে।
সহসা মেঘের আছাড়ে
মনাকাশ ঢাকি প্রলয়ের সাড়া
বসন্ত বিদায় নিল ধীরে।
অগ্নি সাগরের শুদ্ধতা,
প্রাণে দেয় তাণ্ডবের দোলা
জমে উঠে ব্যথা।
আকাশ মাটির আড়াআড়ি যাবে
প্রেমিকের জীবনে শান্তি এক
সার্থক ইহা প্রেমের কাজে।

বিষ্টি

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

মাথা কুটে মরে এলোমেলো হাওয়া, ছেঁড়াচুল মেঘে উড়ে,
চিমনীরা সব ডাকিনীর মত, ক্রেপ ডেকে উঠে দূরে,
বেলা পাঁচটার আঁচের ধোঁয়ায়, নগরীর মুখ ঢাকা
পথে পথে ছুটে বিশ্রামহীন অন্ধ আবেগে চাকা।
শ্রমেন্থরেপড়া আধমরা বাঁকা মেরুদণ্ডের পরে
সারা শূন্যের কান্নায় ভরি বিষ্টি-খোকারা ঝরে।
মিষ্টি গানের খোরাক তো নেই, দুষ্টুমি চাওয়া চোখে
ট্রাম টিকিটের দাম জুটেনাকো, ভিজে জামাটার শোকে
ঘন ঘন মুছি কপালের ঘাম; তবু তো রুমাল নীল!
রোদের নেশায় কেঁদেছে কখনও মাছ-ভুলে বেটে চিল?
মাতিছে তুফান মনের অতলে, খুলিছে খাঁচাটী বন্ধ
রুমালের বুকে লেগে আছে সেই সুর স্বপনিয়া গন্ধ।
ঝরা বকুলের বোবা সে বেদনা, কোটা বেলীটীর হর্ষ
কোন সন্ধ্যার নিরালা আঁধারে বুলুর নীরব স্পর্শ।
টাল টলমল মাতাল বাতাস, দোলে পার্কের বৃক্ষ
খুসীতে তিতিছে মাছরাঙা ঘাসে, করিছু সহসা লক্ষ্য।
দিনের শেষের কালো-মেয়ে ছায়া আবেশে পড়েছে ঝুঁকে
ঘুম ঘুম ঐ মাঠের সবুজে রুমু ঝুম ঝুম মুখে।
হেরি বৃষ্টির মাধুরী মেশানো এই বরিষন সন্ধ্যা
বন্ধন ছিল তাইতো ভুবন আঁধারে এমন বন্ধ্যা।
চেতনা কখন হারালো আমার চুপ চুপ ভেজা ঘাসে,
আগে তো দেখিনি কাঁচের কান্নায় রজনীগন্ধা হাসে।

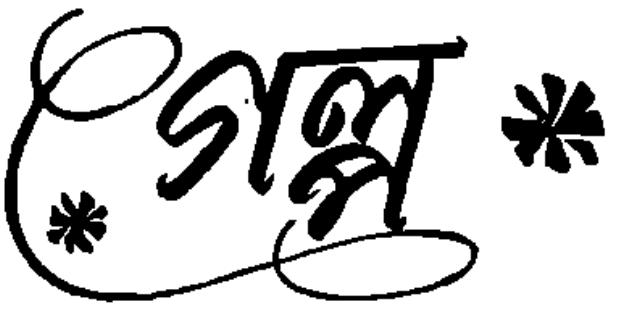

দুর্ব্বল-দুপুর

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

কঁ্যা-চ্-সি-স্-স্—যদি কোনো ভাঙা ষ্টেটবাসের ব্রেক কষার শব্দ শুনতে পাও, অমনি শুনতে পাবে এপাশের দোতালা বাড়ীটার ওপরের ঘরটায় দুকানে আঙুল চেপে আর্ত্তনাদ করে উঠছে সুমালা। না—না—না।

সি-আই-টি রোডের পিচ গালিয়ে দুপুর এগিয়ে চলে। যতবার ষ্টপেজে তেত্রিশ নম্বরের ভাঙা বাস ব্রেক করে, ততবারই পাগলের মত আতঙ্কে প্রায় চীৎকার করে ওঠে সুমালা। পাগল?

হ্যাঁ পাগলই তো। ডাঃ দাশাল নাকি ওঁকে বলেছেন—এমনি করে বেশ কিছুদিন একা থাকলে ও পাগল হয়ে যাবেই। কিন্তু একা থাকা ছাড়া উপায়ই বা কী! প্রশান্ত সরকারী অফিসের কেরাণী। অবশ্য সিনিয়র ডিভিশন। তাতে কী, অফিস তো সেই রোজকার দশটা-পাঁচটা। প্রশান্ত আর কতটুকু থাকতে পায় তার কাছে! বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছে, লেখা-পড়া শিখেছে। তেমনি প্রায় নিঃসঙ্গ ঘর থেকেই মামার-বাড়ী-কাটোয়ার মানুষ সুমালাকে ঘরে নিয়ে এসেছে। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, আর সবচেয়ে সুন্দর দুটি চোখের রূপে প্রশান্ত উজ্জ্বল হয়েছে। সে-বিয়ে প্রায় সৌরীদান-ই বলা যেতে পারে—বিয়ের পর আর মামারা তার খোঁজ নেয়নি; না নিক, সুখে কেটেছে কয়েকটা বছর। তারপর শাশুড়ী মারা গেছেন, ঠিক সেই সময়েই এ বাড়ীতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেছে প্রশান্তর মামার বাড়ীর দূরসম্পর্কীয় ভাই, অবিনাশ।

'কঁ্যা-চ্-সি-স্-স্।'

আবার ষ্টেটবাস। ওই—ওই! উঃ, কী বিশ্রী শব্দ ওই ভাঙা বাসের ব্রেকগুলোর। অল্পক্ষণের মধ্যেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল প্রশান্তর। তখন বিকেল হয়ে গেছে, অফিসের ছুটি হয়ে গেছে প্রশান্তর। এবার ফিরল। দরজা খুলে হাতের ফোলিওটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশান্ত জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলে, আজ কেমন আছো? ওষুধগুলো সব ঠিক-ঠিক খেয়েছিলে!

—হ্যাঁ! কিন্তু কতকগুলো বাসের অমন বিশ্রী আওয়াজ কেন বলতো! সারাতে পারেনা কেন! কাগজে এতো লেখা-লেখী হয়—

প্রশান্ত গলার টাইটা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করে—কেন?

—কেন কি! আমার ঘুম হয়না দুপুরে, বুকটা শুধু কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—দুপুরে মোতির মাকে আজ ঘরে শুতে দিয়েছিলে? প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চায় প্রশান্ত।

—নাঃ। ওকে বাইরে শুতে বলেছি। আমার ঘরে আমি একাই ভালো।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু বলে গেছেন তোমার দুপুরে একা-থাকা উচিত নয়!

—তবে তুমি থাকো। দরকার নেই চাকরীর। লক্ষ্মীটি দুপুরে তুমি যদি থাকো তো দেখবে সারাদুপুর আমি ঘুমোচ্ছি। ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফোলায় সুমালা।

প্রশান্ত বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলে ফেলে, তোমার সঙ্গে দেখছি আমাকেও পাগল হয়ে যেতে হবে।

—পাগল! না, না, বিশ্বাস করো। মোতির মায়ের কেমন বিশ্রী নাক ডাকে, মনে হয় যেন সাপের নিঃশ্বাস। আমি সহ্য করতে পারিনা, বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে।

হাঁফাতে থাকে সুমালা উত্তেজনায়।

বিকেল থেকে রাতটা ও ভালোই থাকে। পথের কোলাহলে ভাঙা বাসগুলোর ব্রেক কষার শব্দ চাপা পড়ে যায়। সুমালা উল বোনে। সেদিনও বুনছিল, প্রশান্তকে বুনতে বুনতেই বললে, দেখো, এটা আর তোমার বাপের

হোলোনা। এ পশমটা বাচ্চাদেরই মানায়। তাই বাচ্চার মাপেই করলাম। মোতির মাকে দিয়ে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেবো। বেশ ফর্সা মোটা-সোটা গোল-গাল ছেলের গায়ে বেশ মানাবে, তাই না?

প্রশান্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে হাসে।—হ্যাঁ, তাই দিও। অথচ সে এও জানে এই অসুখের পর থেকে সুমালা তার জন্যে একটা সোয়েটারও শেষ করতে পারেনি, আর কোনোদিনও পারবেনা। এ উলটাও সুমালার পোড়ায় পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু অনেক উলের মতই সে পছন্দ শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। ডাঃ সান্যাল বলেছেন তার স্বাধীন ইচ্ছের বাধা না দিতে। কোনোদিনই দেয়নি প্রশান্ত—এখন তো সে আরও উদার।

রাতেও সুমালা মাঝে মাঝে কেমন করে ওঠে। প্রশান্তর বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ভয়পাওয়া পাখীর মত কাঁপতে থাকে! —ওগো আমার ভয় করছে—ভীষণ ভয় করছে।

—কী হল? সদ্য ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে প্রশান্ত।

—ওই পুলিশটা কেমন বিশ্রী হাইস্ল্ দিল।

অথচ এমন ছিলনা সুমালা। কিন্তু যেদিন থেকে শোনা গেল সে মা হবে। সেই অসহ্য আনন্দের দিনে হঠাৎ প্রশান্তকে বলে বসলো, তোমার আর কী। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে, কিছুই পোষ রাখবেনা।

প্রশান্ত তার নরম গালটা টিপে দিয়ে উত্তর করলে, প্রত্যেক পুরুষকেই সারাদিন টো-টো করে ঘুরতে হয়, আর মেয়েদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারটিতে সব সময় খোঁজ রাখা একটা সামাজিক অপরাধ।

প্রশান্তর স্পষ্ট মনে আছে সেদিনটা ছিল দেওয়ালীর দিন। মা যাবার ঠিক দুমাস বাদেই। সেদিনই প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেল সুমালার। রাস্তায় একটা ছেলে হাইস্ল্ বাজী ছুঁড়েছিল, "হ-ই-স্-স্-স্" শব্দ করে বাজী আকাশে উড়ে গিয়েছিল, আর দারুণ ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে সুমালা হঠাৎ প্রশান্তর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলেছিল।

তারপর আর একটা অভিশপ্ত দিন। সেদিন অফিসে মোতিমা'র ফোন পেয়েই ট্যাক্সী নিয়ে ছুটে এসে দেখে অজ্ঞান অচৈতন্য সুমালা মেঝেতে পড়ে আছে। পূর্ণ গর্ভবতী তখন সে।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বল্লেন, ভয়ের কিছু নেই। পড়ে গিয়ে দারুণ শক্ পেয়েছেন। পেসেণ্ট ভালো হয়ে যাবেন, তবে যে-সব নিউরটিক রিএক্শন্ হবেন সেগুলো একটু কেয়ারফুলি ওয়াচ করে যাবেন, কারণ বাচ্চাটাকে তো বাঁচানো গেলনা। খানিক থেমে ডাক্তার গলার স্বর নামিয়ে বল্লেন, আই এ্যাম সরি মিঃ বোস্। ওঁর মা হবার আর কোনো সম্ভাবনাই রইল না জীবনে। প্রশান্তর জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাও যেন সেই মুহূর্তেই মিইয়ে এসেছিল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে গভীর ভালবাসার ছায়া দিয়ে সব সময়েই স্ত্রীকে ঢেকে রাখতে, সব সময়েই চোখে চোখে রাখতে সুরু করলে সে। কেবল ওই দুপুরের অফিস টাইমটি ছাড়া।

কেউ বললে মাইগ্রেন, কেউ ইনসোমিয়া, কেউ এক কথায় সেরে দিলে হিষ্টিরিয়া।

অবশেষে ডাঃ সান্যাল। প্রশান্তর কাছে কেসের হিষ্ট্রি শুনেই পাইপের ধোঁয়া উড়িয়ে বল্লেন, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই—ওই হাইস্ল্ শুনেই উনি ভয় পান। আচ্ছা আপনি ওঁকে এখানে নিয়ে আসুন, আমি একা ওঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই।

এলো সুমালা—ছিমছাম চেহারা, সুন্দর ফিগার, তার চেয়ে সুন্দর চোখ। কিন্তু সে চোখে—ডাঃ সান্যাল এক নিমেষ তাকিয়ে বুঝে নিলেন সে-দৃষ্টির ভাষা।

সুইচ্ টিপে কয়েকটা আলোর সামনে বসল সুমালা, সে আলোর দিকে চেয়েই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। ডাঃ সান্যালের গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে শুনতে পাওয়া লাউড-স্পিকারের প্রতিধ্বনি। পাইপের ধোঁয়া উড়িয়ে সান্যাল প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা সুমালা দেবী, আপনি স্বপ্ন দেখেন?

—ঘুমোই কখন?

—ধরুন যেদিন ঘুমোন, সেদিন?

—দেখি।

—কী দেখেন?

—দেখি—

সোজা হয়ে বসল সুমালা, সুন্দর চোখ দুটার রহস্যপীর মত বর্ণচ্ছটা বদলে গেল।

দেখি একই স্বপ্ন রোজ। একটা বেলুনওলা লাল রঙের একটা বেলুন ফোলাতে চাইছে,কিন্তু সেটা ফুলছেনা। শেষে একটা সাইকেলের পাম্প দিয়ে সে সেটাকে ফুলোতে গেল, আর অমনি দ্যাম্ করে সেটা ফেটে গেল।

—পাম্পটার শব্দ ছিলনা ?

—ছিল, হঠাৎ আতঙ্কে হাঁফাতে লাগলো। উঃ কী বিশ্রী শব্দ —উঃ।

—থাক, থাক্। আচ্ছা আপনি কী ফুল ভালবাসেন ?

—আমি ? বেল কুঁড়ি।—মৃদু হেসে কেমন যেন সলজ্জ-ভাবেই উত্তর করলে সুমালা।

—কুঁড়ি। ওঃ। সান্যাল পাইপটা খুঁচিয়ে অগ্নি-সংযোগ করলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পাশের কলিং বেলটা টিপলেন। নার্স এসে সুমালাকে বাইরে নিয়ে গেল।

প্রশান্ত সেদিন সুমালাকে ডাঃ সান্যালের মেন্টাল হোমে ভর্ত্তি করে এলো, তার ঠিক সাতদিন বাদেই এক সন্ধ্যায় ডাঃ সান্যাল আবার পাইপের ধোঁয়া উড়োলেন। সে ধোঁয়ার কটু গন্ধে বিষম খেলে প্রশান্ত। সান্যাল পাইপটা দাঁতে কামড়ে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা প্রশান্তবাবু, আপনি কি আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ !

—তার মানে ?

—আমি চরিত্র কথাটা কী অর্থে ব্যবহার করছি নিশ্চয়ই বুঝছেন !

—কী বলছেন ডাক্তার বাবু ?

—উত্তেজিত হবেন না। আমার কাছে আপনাকে ফ্র্যাঙ্ক হতে হবে। যা প্রশ্ন করবো তার যথাযথ উত্তরই আশা করবো। মিথ্যা দিয়ে ঢাকলে সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

—বলুন। স্থির হয়ে বসলো প্রশান্ত।

—আচ্ছা কোন বন্ধু বা আপনার স্ত্রীর অনুরাগী কেউ কি আসতেন আপনার বাড়ী ?

—কেউ না। আমরা আগে ছিলাম হাওড়ায়। তারপর অফিস লোনে সি, আই, টি রোডের বাড়ীটা করতে পেরে চলে এসেছি। হাওড়ায় এ্যাদ্দিন ছিলাম —তা তখনই কেউ বন্ধু ছিলনা, এখানেতো নতুন।

—আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনার স্ত্রীর বয় ফ্রেণ্ড কেউ ছিল কি না।

প্রশান্ত গলায় জোর দিয়ে বললে, আপনি ভুল করছেন ডাঃ সান্যাল, আমি বা আমার স্ত্রীর কেউই সে রকম আবহাওয়ায় মানুষ হইনি।

—ও আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে আর কে-কে থাকেন ?

—মা মারা যাবার পর থেকে আমি আর আমার স্ত্রী।

—ক' জন চাকর বাকর।

—একজন মাত্র ঝি। মোতির মা।

—কোনো আত্মীয়ও কি কখনও আসতেন না !

—কেউ-ই তেমন আত্মীয় আমাদের নেই ডাঃ সান্যাল। তবে অবিনাশ এসে মায়ের অসুখ থেকে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ এখানে কাটিয়ে গেছে।

—অবিনাশবাবু কে হন আপনার !

—আমার মামার বাড়ীর খুব দূর সম্পর্কের ভাই। বাগানের এ্যাসিটেন্ট ম্যানেজারের চাকরী করে। কোলকাতায় ছুটিতে বেড়াতে এসে হঠাৎ বহুদিন বাদে দেখা করতে এসেছিল, তখন মায়ের বাড়াবাড়ি। তাই ওকে থাকতে বলেছিলাম। থেকে গিয়েছিল কয়েকটা দিন।

—ও। ডাঃ সান্যাল হাতের বেল টিপলেন।

সেদিন মেন্টাল হোমে রাত আটটাতেই যেন বড় বেশী অন্ধকার নেমে এসেছে। সান্যালের ঘর থেকে এইমাত্র মোতির মা বেরিয়ে গেল। তারপর প্রশান্তর সঙ্গে বাগানের গেট দিয়ে সদর রাস্তায় এগিয়ে গেল। ডাঃ সান্যাল জানলার ফাঁক দিয়ে ওদের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষ ভাবে। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাইপটা আলিয়ে নিলেন।

সুমালাকে ঘরে নিয়ে এলো নার্স। ছিপছিপে চেহারা, সুন্দর ফিগার, তার চেয়ে সুন্দর চোখ, কিন্তু সে চোখে—

ডাঃ সান্যাল স্বাগত জানালেন : বসুন সুমালা দেবী।

সুমালা বসলে তাঁর হাতের ইসারায় ঘরের দরজাটা বন্ধ করে নার্স চলে গেল বাইরে। ঘরে একটা মৃদু নীলাভ আলো জ্বলছে। এক কোণে ফ্লাওয়ার ভাসে একথোকা রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধে সারা ঘরটা নেশাতুর স্বপ্নিল করে তুলেছে।

ডাঃ সান্যাল এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। চারদিক নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ।

সান্যাল আবার পাইপটা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে সেটা নতুন করে সাজিয়ে জ্বালালেন। বহুক্ষণ বাদে আবার সেই রহস্যময় গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা সুমালা দেবী অবিনাশ—

—কে? চমকে উঠলো সুমালা। অমনি একটা টিকটিকি কোত্থেকে ডেকে উঠলো।

—হাঁ, হাঁ, অবিনাশ ঘোষ। তার গা বাগানের গল্প আপনার কাছে করতো নিশ্চয়ই।

—হাঁ, দুপুরে মা তখন একটু ভালো, উনি আবার অফিস যাওয়া সুরু করেছেন। আচ্ছা, ডাক্তার-বাবু—অফিসের কী এতো আকর্ষণ? কেন ছাড়া যায় না?

—খুব সুন্দর গল্প করতো, নয়? সান্যাল আবার খেই ধরিয়ে দিলেন।

—হাঁ। কত মজার মজার, কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করতো ঠাকুরপো।

—আচ্ছা গল্প করতো—মা যখন রোগের যন্ত্রণায় কাতর তাঁর সামনেই।

—না উনি হয়তো একটু ঘুমোচ্ছেন। তখন এপাশের ঘরে চা খেতে খেতে আমি আর ঠাকুরপো—

—মানে আপনি আর অবিনাশ?

—হাঁ ঠাকুরপো। আবার অস্বাভাবিক হাঁকাতে সুরু করলে সুমালা।

—ওই হোলো। অবিনাশ-স্-স্ এবার 'শ'টা 'স'-এর মত টেনে উচ্চারণ করলেন ডাঃ সান্যাল।

—উঃ। আর্তনাদ করে উঠলো সুমালা।

—হাঁ, অবিনাশ-স্-স আপনার খুব স্বাচ্ছন্দ্য, আপনার সবকিছু মানে—

লাফিয়ে উঠে ডাক্তার সান্যাল ক্ষিপ্র হাতে আলমারী খুলে একটা লাল বেলুন সাইকেলের পাম্প দিয়ে ফোলাতে লাগলেন। সেটা ফুলতে লাগলো।

—ও কী করছেন?

উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকৃতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে সুমালা। তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে সান্যাল বলে চললেন, হাঁ এমনি করেই সে আপনার সাজানো সংসার, আপনার কামনা-বাসনা-কল্পনা, আপনার মান সম্ভ্রম, বোধ হয় আপনার সবকিছু, এমনকি আপনার সতীত্বও—ফ্যাস্ করে প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে গেল বেলুনটা।

—ওঃ না, না, না। আর্তনাদ করে ককিয়ে কেঁদে উঠলো সুমালা। ডাঃ সান্যালের হাতের পাম্পটা তখন সি-স্-স্ আওয়াজ করতে লাগলো, বলুন অবিনাশ আপনার কী করেছে? মনে পড়ছে—পাম্পের সি-স্-স্ শব্দটা যেন কার সুতীব্র শিশ হয়ে কানে লাগলো সুমালার।

—থামান, থামান। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে অবিনাশ শিশ দিয়ে—

আচ্ছন্নের মত চেয়ারে বসে পড়লো সুমালা। যেন অন্য সুমালা কথা করে উঠলো—সেই দুপুরেই তখন দরজা জানলা বন্ধ করে আগের দিন রাত জেগে একটু শুয়েছি। হঠাৎ দরজার শিশ দিয়ে উঠলো অবিনাশ।

—কী দিল, শিশ? এই পাম্পটার মতই শব্দ তার, না?

—হাঁ, দোহাই আপনার আমায় বলতে দিন। তা না হলে দম আটকে যাবে—আমি মরে যাবো—দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকেই আবার একটা শিশ দিল সে। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করতে লাগলো। তারপর সেই পশুটা—একটু দম নিয়ে ফিস্ফিস্ করে বললে সুমালা, কী যেন হল, চীৎকার করতে ভুলে গেলাম, বাধা দিতে ভুলে গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে ওই শিশটা তীক্ষ্ণ বর্শার ফলার মত বিঁধতে লাগলো। উঃ কী যন্ত্রণা। তারপর আমার যথাসর্বস্ব লুঠ করে শিশ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল পশুটা।

ডাঃ সান্যাল মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন, তারপর আপনি বুঝতে পারলেন আপনি মা হতে চলেছেন।

—হাঁ বুঝলাম, আমি মা হতে চলেছি। এ খবরটা পেয়ে উনি খুব খুশী হয়ে আমায় নতুন একটা পেণ্ডেণ্ট উপহার দিলেন। কিন্তু উনি জানলেন না যে সে ছেলে—

—হাঁ। সেইজন্যই আপনি প্রশান্তবাবুর উল্লাস দেখে বলেছিলেন, তোমার আর কী সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াবে কিছুই খোঁজ রাখবে না।

—হাঁ। ডাক্তারবাবু, সত্যি কথাটা তাঁকে কিছুতেই বলতে পারলাম না। অথচ নিজের ওপর অনুশোচনায় নিজেই অহরহ জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

—আর সেই জন্যেই—

—হাঁ। সেই জন্যেই, বলুন ডাক্তারবাবু এটা আমার অপরাধ, না অপরাধের শাস্তি? সেইজন্যেই তখন পূর্ণ-গর্ভবতী অবস্থায় ইচ্ছে করেই লাফিয়ে পড়লুম বাথরুমের কঠিন মেঝেতে।

—কিন্তু তখন ভাবেন নি—মা হওয়ার সম্ভাবনা চির-দিনের জন্যে লোপ পাবে?

—সেই তো আমার পাপ। ভবিষ্যতের আশার বর্তমানকে অস্বীকার করেছিলাম।

—কিন্তু ভবিষ্যত আপনার ওই লাল বেলুনটার মতই নিয়তির পাপ্পে চুরমার হয়ে ফেটে গেল।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুমালা।

ডাঃ সান্যাল তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

* * *

সেদিন ডাইরীতে ডাঃ সান্যাল লিখে রাখলেন—অবিনাশ চা বাগানে মানুষ, স্বভাবতঃই চরিত্রগত দুর্বল। কেসের সম্পূর্ণ বিবরণী শেষ করে পাইপটা জ্বালালেন সান্যাল! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে আনমনে ভাবতে লাগলেন, সুমালাকে ভালো করে তিনি ভালো করেন নি। না ভালো হলেও আর কিছু না হোক, বোধ হয় সত্যিকারের শাস্তি পেতো!

এ কথাটা অনেক কেসেতেই ডাঃ সান্যালকে ভাবতে হয়েছে।

স্বাস্থ্য-সাধনা

আয়রণম্যান শ্রীনীরদ সরকার

স্বাস্থ্য মানবজীবনের উন্নতির মূলাধার। যে যেরূপ কাজই করুক না কেন স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কর্ম জীবনে বিফলতা ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বপ্রকার উন্নতি ও সফলতার মূলেও হয় কুঠারাঘাত। অনেকে হয়ত প্রথম জীবনে লেখা-পড়ায়, কাজ-কর্মে খুবই উন্নত ও কর্মতৎপর থাকে; কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় ও যত্ন না নেওয়ায় কর্মজীবনে স্বাস্থ্যহীনতার জন্যই বিফলতা লাভ করে থাকে বেশী। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে দৈহিক কর্ম-পটুতা তো নষ্ট হয়ই, মানসিক উন্নত হওয়াও হয় সুদূরপরাহত। নীরোগ, কর্মঠ, কষ্ট-সহিষ্ণু ও দীর্ঘজীবী ব্যক্তিকেই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান বলা হয়। কিন্তু খানখলে মাছলসমুদ্দুস হলেই যেমন স্বাস্থ্যবান হয় না, তেমন অতি উগ্র-ব্যায়ামে-পটুর বিকৃত পেশী-যুক্ত আপাতঃ দেহীও যে স্বাস্থ্যবান—তা-ও কিন্তু নয়। পুষ্টিকর দেহ পদার্থ-যুক্ত খাদ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করলে যেমন কম-বেশী নাদুস-নুদুস-দেহী হতে পারে, তেমনি অধিক পরিমাণে উগ্রব্যায়াম করলেও কম-বেশী বিকৃত পেশীবহুল দেহ তৈরী হতে পারে। এইরূপ উভয় প্রকার দেহীই যৌবনান্তে অকেজো হয়ে থাকে। অধিক ভোজীরা যেমন বয়স, ক্ষুধা ও শ্রম অনুযায়ী না খেয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার্য গ্রহণ ক'রে দেহে অপ্রয়োজনীয় মেদ জমিয়ে অকেজো হয় এবং একটু বয়সে সাধারণ খাদ্য হতেও বঞ্চিত হয়; তেমনি অনেকে বয়স, দেহের সহনশীলতা না বুঝে দ্রুত উন্নতির জন্যে নিয়মের বশ বায়ু প্রতিকূল উগ্রব্যায়াম ক'রে বিকৃত পেশীযুক্ত দেহ গঠন ক'রে যৌবনান্তে দেহের বাহারতো হারায়ই, আয়ুও কমে এবং অকেজোও হয়ে থাকে বেশী। ব্যায়াম ক'রে দেহ যদি সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী কর্ম-তৎপর, কষ্ট-সহিষ্ণু ও নীরোগ না থাকে, তাহলে ব্যায়াম ক'রে লাভ কী? আহার্য গ্রহণ করা হয় ক্ষয়পূরণ এবং পুষ্টি-সাধন করার জন্য—আর ব্যায়াম করা হয় দেহের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা-বৃদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, কর্ম-তৎপরতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে। কিন্তু উগ্রব্যায়ামে স্নায়ু ও পেশীর ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় ও অধিক খাটুনীর জন্য উহারা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে স্নায়ুর ক্ষমতা ক'মে যায়, যার জন্যে মগজ চালনার ক্ষমতাও হ্রাস পায়—স্নায়ু-গ্রন্থি সবল না থাকলে কর্ম-তৎপর থাকা অসম্ভব।

স্নায়ু ও গ্রন্থি যার দুর্বল তার দৈহিক দৃঢ়তা, কর্ম-তৎপরতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও মগজ চালনার ক্ষমতা কিছুতেই পূর্ণভাবে থাকতে পারেনা। আমাদের জলবায়ুর প্রতিকূল উগ্রব্যায়াম পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে

করলে মানুষ তার অস্বাভাবিক ভাব পড়বেই। এতে যৌবনে বা যৌবনারম্ভে পেশীগুলো বিকৃত হয়ে বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতি এর দ্বারা সম্ভব নয়। পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে উদ্ব্যায়াম করলে তার সঙ্গে বিশ্রামও যেমন বেশী প্রয়োজন—খাদ্যাদি যাহাও তেমন বেশী গ্রহণ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইরূপ স্থলে পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে ব্যায়ামকারীর দেহ শুধু যে আকারী হয় তা নয়, দেহের ওপর একটা অস্বাভাবিক ভাব আসে, নিজের দেহ নিয়েই নিজে বেশী ব্যস্ত থাকে, আর অন্যদিকে তেমন উন্নত হতে পারেন না। তবে যারা শুধু দেহগঠন করে উদ্ব্যায়াদি করেন তাদের কথা ভিন্ন। সুগঠন দেহযুক্ত শক্তিহীন ব্যক্তির যৌবনারম্ভে দেহের উৎপাদিকা ধারায়, যদি সে স্নায়ুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু পেশী বৃদ্ধি ও বিকৃত করার জন্যে অধিক উদ্ব্যায়াম ক'রে থাকে। উদ্ব্যায়ামে দেহ বেশ পেশী বহুল হয়

বিভিন্ন প্রকার শক্তিপূর্ণ কৌশল আবিষ্কারক ও অভিনব ক্রীড়া-প্রদর্শক—লেখক

সন্দেহ নেই এবং দেহটি যৌবনান্তেও কর্ম-তৎপর থাকতে পারে, যদি বয়স ও দেহের গঠন বুঝে আমাদের দেশীয় ব্যায়াম দ্বারা দেহের ভিত স্থাপন করে নিয়ে তারপর আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্ব্যায়াম করা যায়। দেহে ভিতস্থাপন না ক'রে পেশী বাড়াবার জন্যে অধিক পরিমাণ উদ্ব্যায়াম করলে সকলেই দেহ উন্নত হবে বা সকলেই সুস্থ হবে তা নয়। বহুর মধ্যে দু'চার জনেরই উন্নতি হতে পারে। যে দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বাস্থ্যহীন, সে দেশে দু'চার জন খুব উন্নত ও খুব সুস্থ ব্যক্তি থাকায় লাভ কী? দু'একজন খুব সুন্দর দেহী থাক—সে আনন্দেরই কথা। কিন্তু বাকী স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিরা যাতে মোটামুটি সুস্থ কর্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু হয় সেটা দেশের পক্ষে বেশী কল্যাণকর নয়? সুগঠন, সুদর্শন, পেশীযুক্ত, কর্ম-তৎপর, কষ্টসহিষ্ণু, নমনীয় ও কমনীয় ক্ষিপ্র দেহীই হল আদর্শ দেহী। এইরূপ দেহ গঠন করতে হলে দেহের ভিত স্থাপন ক'রে বয়স বুঝে ব্যায়ামের গুরুত্ব বাড়াতে হয়। আর ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা বৃদ্ধি ব্যায়ামের সঙ্গে স্নায়ু গ্রন্থি ও হৃদয়-শক্তির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। নইলে দেহের মর্দনধারীই হতে পারে—সংসারের অন্য কোন কাজে তেমন ভাবে লাগেবে। আমাদের জলবায়ুর অনুকূল খাদ্য পরিমিতভাবে বয়স বুঝে গ্রহণ করলেই যেমন দীর্ঘদিন সুস্থ থাকার এবং রুগ্ন পুষ্টি ও পুষ্টি সাধনের প্রধান উপায়, তেমনি আমাদের জলবায়ুর অনুকূল ব্যায়ামেই দেহ তৈরী, সুস্থ, কর্মঠ, কর্ম-তৎপর হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। সাধারণ সরলপাচ্য খাদ্য-গ্রহণের সঙ্গে যেমন মাঝে মাঝে অতি পুষ্টিকর উদ্রগাঢ় যৌবনে কিছু কিছু গ্রহণ করা যায়, তেমন আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের সঙ্গেও যৌবনে কিছুটা উদ্ব্যায়ামও করা যেতে পারে—তবে স্নায়ুতে ও পেশীতে যেন অধিক চাপ না পড়ে। পেশীতে অধিক চাপ পড়লে স্নায়ুতেও অধিক চাপ পড়বে। ফলে একটু বয়সে ঐ স্নায়ুর দুর্বলতা আসবেই। আমাদের স্নায়ুগ্রন্থি ও হৃদয়শক্তি যদি সক্রিয়, সবল ও প্রবল থাকে তাহলে তার যৌবনও দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। মনে রাখতে হবে যৌবন বয়সে নয়, যৌবন কর্ম-তৎপরতায়। আরেকটি কথা, উদ্ব্যায়ামে যেসাধারণতঃ রোগ বা ত্রুটি দূর হয়না। মোটামুটি সুস্থ, গঠিত দেহীর পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য হলেও এর ব্যতিক্রম বেশী হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে যেরূপ অজ্ঞান খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তাতে অধিকাংশ ব্যক্তিই কম-বেশী রোগাক্রান্ত। তা বলতে কিন্তু শুধু অম্ল, পেট-খারাপ প্রভৃতিই নয়। যা যাই হ'ক সুঠাম রূপে হজম না হওয়া একটা মস্ত রোগ। খাদ্যবস্তু ঠিক ভাবে হজম না হলেই কোষ পরিষ্কার হয়না, সুষ্ঠু ভাবে রক্তও তৈরী হতে পারে না। যৌবনে উদ্ব্যায়াম করলে অভ্যাস বশতঃ হয়তো আহারও গ্রহণ করা হয়, আভ্যন্তরীণ ত্রুটি চাপা প'ড়ে দেহবৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু যৌবনান্তে বা কোন সময় ঐ রোগ প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশীয় ব্যায়ামে যে কোন প্রকার রোগ তো নিরাময় হয়ই, দেহের ভিতও চমৎকার রূপে স্থাপিত হয়—স্নায়ু গ্রন্থিও সক্রিয়, সবল ও প্রবল হয় এবং হৃদয়শক্তি স্বাভাবিক থাকে।

ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বৈদেশিক ধারায় উদ্ব্যায়াম মোটেই আমাদের দেশে কার্যকরী নয়। ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যোন্নতি কর্মতৎপর দীর্ঘস্থায়ী দেহ গঠনে আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের মত কার্যকরী আর কোন ব্যায়াম আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের মধ্যে আর্য ঋষি প্রবর্তিত বিজ্ঞান-সম্মত যোগব্যায়ামই ব্যাপক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে সর্ব-সাধারণের পক্ষে বিশেষ হিতকর ও ফল-প্রসূ। পুরাকালে আর্য ঋষিগণ দেহকে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম, নীরোগ রাখার ও করার জন্যে কতকগুলো বিজ্ঞান-সম্মত অঙ্গ-ভঙ্গির প্রচলন করেন। ঐ সমস্ত ভঙ্গি অভ্যাসে শুধু দেহটিই যে মজবুত হয় তা নয়, দেহ এত সুঁদরভাবে তৈরী হয় যে দীর্ঘদিন যোগ সাধনায় লিপ্ত হয়ে নানা কৃচ্ছ্র সাধনে দেহকে অটুট রাখা

সম্ভব। তাছাড়া দীর্ঘদিন সাধনার ফলে থেকে নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতাও অর্জন করতে পারা যায়। যে সমস্ত ভংগি অভ্যাসে শরীর দেহকে যোগ-সাধনের উপযোগী করতেন ও দেহাভ্যন্তরস্থ মনকে বৃহৎশক্তির সংগে যোগ করতেন, ঐ সমস্ত ভংগিকেই বলা হয় যোগ-ব্যায়াম। এই যোগ-ব্যায়ামই আসন নামে অভিহিত। যে সমস্ত ভংগি বা আসন অভ্যাস ক'রে সেযুগের আর্যঋষিগণ দেহকে মজবুত করে কৃচ্ছ্র-সাধনের উপযোগী ক'রে যোগ সাধনায় লিপ্ত হতেন সেই সমস্ত ভংগি বর্তমান স্বাস্থ্যহীনতার যুগে আমাদের যে কত হিতকর তা বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত ভংগি বা আসন দেহকে শুধু নীরোগ, কর্মঠই করেনা, নানাবিধ জটিল ব্যাধি তো দূর করেই—উপরন্তু অযথা পরিমাণে রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা, হজম-শক্তি প্রভৃতিকে বিশেষভাবে সক্রিয়, সবল ও প্রবল রূপে গড়ে তোলে। দেহকে দীর্ঘ-দিন কর্ম-চঞ্চল ও কষ্ট-সহিষ্ণু রাখতেও এই যোগ-ব্যায়াম অদ্বিতীয়।

ছোট-বড়, কিশোর-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই অল্প সময় ব্যয়ে সকাল-সন্ধ্যা নানা কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও ইহা অভ্যাস করতে পারেন এবং এর অভ্যাসে সুস্থ, সবল, কর্ম-ক্ষম, কষ্ট-সহিষ্ণু হয়ে দীর্ঘদিন সুখে কালাতি-পাত করতে পারেন। এতে হয়ত খাদ্যিক উন্নত, পেশী-স্ফীত না হতে পারে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কলকব্জা, স্নায়ু, প্রভৃতিকে অত্যন্ত সুন্দর মজবুত স্বাভাবিক রাখে।

এই আসনের উপকারিতা বর্তমানে সর্বদেশের দেহ-বিজ্ঞানীগণ অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছেন। এই কর্ম-ব্যস্ততা ও স্বাস্থ্যহীনতার যুগে বিনা ব্যয়ে, অল্প সময় ব্যয়ে দেহকে নীরোগ, সুস্থ, কর্মঠ, বলিষ্ঠ—স্নায়ু প্রন্থিকে সক্রিয়, সবল করার জন্যে আসনের মত আর অন্য কোন ব্যায়াম আছে বলে বিজ্ঞ দেহ-বিজ্ঞানীগণ মনে করেন না। ডাল-ভাত, তরী-তরকারী, শাক-সব্জী, দি-দুধ-ঘই, ফল-মূল, মাছ-মাংস, চিড়া-মুড়ি যেমন কমবেশী প্রত্যেকের পক্ষেই ক্ষয়-পূরণ ও পুষ্টি-সাধনের পক্ষে অনুকূল, আসনও ঠিক তাই। যারা উগ্র-ব্যায়াম করে তাদেরও ব্যায়ামের পর মোটামুটি বিশ্রাম ক'রে স্নায়ু গ্রন্থিকে সুস্থ-সবল রাখার জন্যে দু'চারটি আসন অবশ্য করণীয়। তবে বয়স, দেহের গঠন, রোগ-ত্রুটি, প্রভৃতি বুঝে যোগ্য গুরুর নিকট হতে নির্দেশ নিয়ে অথবা উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পুস্তক দেখে নিজ নিজ প্রয়োজনমত আসন করা উচিত। মনে রাখতে হবে, যে-ব্যায়ামে একের উন্নতি হয় সে-ব্যায়ামে অপরের উন্নতি নাও হতে পারে। তবে আসন যে যে-ভাবেই করুক অপকার হবেনা। তবে আসন করার সময় শ্বাস থাকবে স্বাভাবিক। এমন কোন লোমক পরা থাকবেনা যাতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হতে পারে। একটি আসনে সহজ-সাধ্যভাবে যে যতক্ষণ পারবে ততক্ষণ থেকে প্রতি আসনের পরই সুস্থ ভাবে রক্ত চলাচলের জন্যে শবাসন অবশ্যই করতে হবে। পুরাকালে আর্য-ঋষিগণ যে আসন যতক্ষণ করতেন বর্তমানে সে আসন ততক্ষণ করতে নেই। কারণ সেযুগের মানুষের যেরূপ সহনশক্তি ও দেহের গঠন ছিল এখন কিন্তু তা নেই। আর পূর্বতাপীরা যে আসন যে ভাবে যতক্ষণ করে, সুফলের কিন্তু সেভাবে সে ব্যবস্থা করতে নেই। কারণ উভয়েরই জীবনযাত্রা প্রণালী তফাৎ। আবার সুস্থ ব্যক্তি যে আসন যে ভাবে যতক্ষণ করবে রোগীদের সে ভাবে সে আসন ততক্ষণ করতে নেই। তেমনি কিশোর-যুবা, বৃদ্ধ ও ছোটদের মধ্যেও তারতম্য আছে। এছাড়া কতকগুলো আসন—ধ্যানাসন ধ্যানধারণার জন্যে—আর বাকীগুলো ব্যায়াসন—ব্যায়ের জন্যে। ব্যায়াসন স্থিতিতে করলেই হয় আসন, আর গতিতে করলেই হয় খালি হাতে ব্যায়াম।

আজকের দিনে এই আসনের উপকারিতা লক্ষ্য উপলব্ধি ক'রে অনেকেই অভ্যাস করছেন। আবার অনেকে যারা আসন সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান রাখেননা, তারা এর বিরুদ্ধে নানারূপ অভিমত ক'রে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ক'রে থাকেন। তেমনি আবার আসনের জনপ্রিয়তা দেখে অনেকে যারা কোনদিন আসন করেন নাই বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নাই তাদেরও অনেক শিক্ষককে দেখে দুর শিক্ষা দিয়ে জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার ক'রে থাকেন। উভয়ই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধু যে আসনের বেলাই এরূপ তা নয়—সত্যিকারের শক্তি

লেখকের বালক পুত্র—যোগ-ব্যায়ামের একটি ভঙ্গিতে

চর্চায় বেলায়ও তাই। অনেকে সত্যিকারের শক্তি চর্চার কৌশল অপকৌশলের সাহায্যে প্রদর্শন ক'রে সরলমতি জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ক'রে প্রকৃত শক্তিচর্চা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে থাকেন। এ-ও সমাজের পক্ষে সমান ক্ষতিকর।

একটা দেশ ও জাতি কতটুকু উন্নত তা বোঝা যায় সে দেশবাসীর স্বাস্থ্য দেখলে। আমাদের দেশ আজ যে স্বাস্থ্যহীনতার চরমে, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। ছাত্র সমাজের আজ শিক্ষার মান পর্যন্ত নিম্ন হতে নিম্নতরে চলে যাচ্ছে। আজ ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যহীনতা। যে দেশে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যহীনতা সে দেশে দু'চার জন খুব সুন্দর দেহী থাকার চেয়ে কি ঘরে প্রত্যেকের সুস্থ, সবল হওয়া সমীচীন নয়? এই স্বাস্থ্যহীনতার যুগে আজ বিনাব্যয়ে দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি করতে হলে আমাদের দেহীয় ব্যায়াম, আসন ও খেলা ধূলা যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা বোধহয় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। এই যোগব্যায়াম বা আসনে শুধু দেহটিই মজবুত হয়না, দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতশক্তি অর্জিত হয়। মনটি হয় স্বচ্ছ-স্বচ্ছ। একথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার অভাব হলেই হিংসা-দ্বেষ, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়। দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ছাড়া এরোগ দূর হওয়া সম্ভব নয়। দেশবাসী দৈহিক ও মানসিক সুস্থ হলে দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। এই মনীষীর দেশ, আদর্শদেশ আজ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্যে যে কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে তা বোধহয় আর বলতে হবেনা। সুস্থ দেহে সুস্থ মন গ'ড়ে উঠলেই—"আবার তুমিরে পারিজাত কুসুমে মোদের মাতৃভূমে।

উন্নত সারের কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গাছের পুষ্টির জন্যে উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন আছে। ফসল ফলাবার জন্যে জমিরও উপযুক্ত আহার দেবারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। জমির আহারকে আমরা সার বলে থাকি।

এক সময়ে আমাদের দেশে জমিতে যে-পরিমাণ ফসল ফলতো এখন আর সেই পরিমাণ ফসল ফলে না। এর অবশ্যই একটা কারণ আছে। তখন জমিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর জৈব এবং অজৈব সার মিলতো। বছরে বছরে ফসল নেবার ফলে জমিতে সারের পরিমাণ যাচ্ছে ক্রমাগত কমে। সে কারণে আগের মতো ফসল আর পাইনে। এজন্য পোষ্টাপিসে আমার একশো টাকা জমা আছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু পরিমাণ না রেখে ঐ সঞ্চয় থেকে যদি আমি মাসে মাসে দু'শ টাকা তুলে নিই, তবে শেষ পর্যন্ত জমার খাতে যা থাকবে তা হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড শূন্য। জমির সম্পর্কেও একই কথা। যদি তাকে নিয়মিতভাবে আহার না দিই অথচ তার কাছ থেকে বছরে বছরে ফসল আদায় ক'রে নিই, তবে জমির অবস্থাও নিশ্চয়ই শোচনীয় হয়ে উঠবে। সেই ক্ষেত্রে জমি শেষ পর্যন্ত আমাকে ভালো ফসল দিতে অস্বীকার করবে। সে রীতিমতো বেঁকে দাঁড়াবে।

এই জন্যেই জমি থেকে প্রচুর ফসল পেতে হ'লে তাকে উৎকৃষ্ট সার দিতে হবে প্রচুর। আর সারের নাম হচ্ছে পচা গোবর আর ছাই। আমাদের দেশে গোবরের কী নিদারুণ অপচয়! গোবর আমরা ঘালানি ক'রে পুড়িয়ে ফেলি। মাঠের গোবর মাঠে আর পড়ে থাকতে পায় না। যে গোবর অবশিষ্ট থাকে অজ্ঞতায় এবং অযত্নে তারও সারের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। গোবরকে ঘুঁটে করে পুড়িয়ে ফেললে জমিকে তার খোরাক থেকেই বঞ্চিত করা হয়, আর জমিকে যে উপোসী রেখে তার কাছ থেকে ভালো ফসল আশা করে দুনিয়ায় তার মতো নির্বোধ আর কে আছে? যে ডালে বসে আছি তাকে কাটলে মাটিতে পড়তেই হবে।

একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। সবই গোবর জমিতে চলে গেলে লোকে ঘালানি পাবে কোথা থেকে? এর সমুত্তর হচ্ছে ঘালানির জন্যে কী বৎসর ব্যবস্থা ইত্যাদি পরে আলোচনা—যা সহজে করা যায় এবং সহজেই যাচ্ছে।

গোবরকে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করার সহজ উপায় হচ্ছে, একটা অস্থায়ী গর্ত কেটে তার উপরে এমন একটা আচ্ছাদন ক'রে দেওয়া যাতে গোবর রৌদ্রে শুকিয়ে অথবা বৃষ্টিতে ধুয়ে না যায়। গোয়ালের পেছনেকে এরূপ ব্যবস্থা থাকাও উচিত।

মানুষের মলমূত্রও জমির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। জাপানী চাষীর গড়পড়তা জমির পরিমাণ তিন বিঘার কিছু বেশী। তবুও এই অল্প-পরিমাণ জমিকে আশ্রয় ক'রেই জাপানী চাষীরা গাওয়াপরায় একটা মোটামুটি ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছে। আমাদের দেশে তিন বিঘা জমির মালিকের কথা ধরে থাক, যারা তিন তিরিশে নয় বিঘা জমির মালিক তাদেরও ভাত-কাপড় জোটেনা। জাপানে বিঘা প্রতি ফসলের পরিমাণ আমাদের দেশের ফসলের অনুপাতে অনেক বেশী। এর কারণ হচ্ছে, জাপানী চাষীরা মানুষের মলমূত্রের একটুও অপচয় হতে দেয় না। সব জমিতে চলে যায় এবং সার হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে জমির ফসল বাড়ায়। একজন জাপানী চাষী তার ক্ষেত থেকে বছরে তিন বার ফসল আদায় করে নেয়।

আমাদের দেশে মলমূত্রের আশ্চর্যজনক অপচয় দেখলে দুঃখে কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করে। লোকে গ্রামের রাস্তাঘাটে, এমন কি নদীর পারে পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ করে এবং তার জন্যে কোন লজ্জা অনুভব করে না। এই মলমূত্রের দুর্গন্ধে বাতাস দূষিত হ'য়ে যায়। বাতাস দূষিত হ'লে গ্রামে রোগ ছড়াতে থাকে। জাপানী চাষীদের অনুকরণ ক'রে এই মলমূত্র সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা'হলে আমাদের জমির উর্বরাশক্তি নিশ্চয়ই বাড়বে এবং সেই সঙ্গে ফসলও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের দেশে অন্নকষ্ট এত বেশী যে এযুগে আমাদের জীবনের একটা মূলমন্ত্র হওয়া উচিত; অল্প বহু কুরবীত, ফসল ফলাও প্রচুর। আর প্রচুর ফসল ফলাতে হলে বিজ্ঞানের আশ্রয় আমাদিগকে নিতেই হবে। বুদ্ধি মানুষের একটা পরম সম্পদ। বুদ্ধিকে যদি আমরা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারি তবে আমাদের আশপাশের অনেক সহজলভ্য বস্তু উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়ে জমির ফসল বাড়াতে পারে।

যে কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ গোবরের সঙ্গে মিশে গিয়ে উৎকৃষ্ট সার তৈরী করার ক্ষমতা রাখে। জলের কচুরিপানা, মাঠের আগাছা, বনজঙ্গলের ঝরাপাতা—সবই সারের উৎকৃষ্ট উপাদান। এ ছাড়া যেখানে পাট বা মেস্তা আগ দেওয়া হয় সেখানকার বাটিও খুব জোরালো। যেখানে জমি বহুদিন সেখানে পুকুরের পচা পাঁকও উৎকৃষ্ট সার। আমার জমিতে বালির পরিমাণ বেশী হওয়ায় আম গাছগুলো বাড়তে পারছিলো না। তাদের চারদিকে পরিখা কেটে দিলাম—আধ হাত গভীর। পাট আগ দেওয়া হয়েছে এমন জায়গার মাটি এনে সেই মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলাম পরিখাগুলি। গাছগুলি পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিলো। এখন তাদের চেহারা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

জৈব সারের ভিতর সবুজ সারের মূল্যও বড়ো কম নয়। মটর, শোন, কলাই, বরবটি প্রভৃতি ফসলকে ঠিক ফুল ধরবার সময় হ'লেই লাঙল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সেগুলি পচে কিছুদিন বাদে উৎকৃষ্ট সারে

পরিণত হয়। কেবলমাত্র এই রকমের সমূহ সারের প্রয়োগেই জমির ফলন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

সার হিসাবে এ্যামোনিয়াম-সালফেট, সুপার-সালফেট প্রভৃতি কৃত্রিম সারও যথেষ্ট উপকার দেয়। গো মহিষের অস্থিচূর্ণও কি সার হিসাবে কম উপকারী? গ্রামে গ্রামে এই সব হাড় সংগ্রহ ক'রে যদি সহজলভ্য যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে চূর্ণ ক'রে গ্রামেই ব্যবহার করা যায় তবে সারের অভাব অনেকাংশে মিটতে পারে এবং বেকারসমস্যাও কিছুটা সমাধান হয়।

আমাদের দেশে যত রকমের সমস্যা আছে তাদের মধ্যে অন্নসমস্যাই যে মূলসমস্যা—এতে কি কোন সন্দেহ আছে? দেশে ব্যাপক আকারে অন্নাভাব থাকতে আর কোন উন্নতির কথা ভাবা সম্ভব নয়। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' খালি পেটে কি শুধু ধর্মই হয় না? পেট ভরার আগুন জ্বলতে থাকলে সাহিত্য দর্শন কিছুই হয় না। তাই সর্বাগ্রে অন্নের ফলন আমাদিগকে বাড়াতেই হবে। আর অন্নের ফলন বাড়াতে গেলে সারই আমাদের প্রধান সহায়। জমি তো রবার নয় যে টেনে-টুনে তাকে বাড়ানো যাবে। কিন্তু জমির ফলন বাড়ানো অবশ্যই সম্ভব, যদি বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে আমরা তার পরিচর্য্যা করি।

ইংরেজশাসন থেকে মুক্তি যেমন সহজ ছিল না, দেশ থেকে দারিদ্র্য-রাক্ষসীকে তাড়ানোও তেমনি সহজ হবার নয়। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি আসবে আমাদের নিজেদের মিলিত প্রচেষ্টায় রাস্তায়। চালাকির দ্বারা যেমন কোন বৃহৎ কাজই সম্ভব নয় তেমনি প্রচুর পরিমাণে অন্ন ফলানোও সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের মধ্যে। সেই জ্ঞান-তপস্যাকে আশ্রয় ক'রে যখন তারা কাজে পরিণত হবে তখনই গড়ে উঠবে ধরাতলে সেই স্বর্গভূমি যেখানে মানুষ মুক্তি পেয়েছে দারিদ্র্যের নিদারুণ দুঃখ থেকে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ও কুটীর শিল্প

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

বর্তমান যুগ শিল্প-বিজ্ঞানের প্রগতির যুগ। পৃথিবী আজ শিল্প-বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। দুর্গম ও দুরধিগম্য গৃহও আজ শিল্পবিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ আয়ত্ত করতে চলেছে। সেই শিল্প বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে, সেই স্পুটনিকের যুগে কুটীর শিল্পের কথা বলতে গেলেই হয়ত বা তথাকথিত প্রগতিবাদীর দল চীৎকার করে উঠবেন, সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে—বিমান ও রকেটের যুগকে গো-যানের যুগে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে। বর্তমান এই যন্ত্র সভ্যতার অচিন্তনীয় উন্নতির যুগে কুটীর শিল্পের প্রচলন ও বিকাশের আলোচনাকে আপাতদৃষ্টিতে সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়ার সামিল বলেই মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অধুনা ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও পটভূমিকায় সমস্যাটা একটু গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখতে পাব—দেশের বর্তমান অবস্থায় কুটীরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য—বিশেষ করে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সফল রূপায়নে কুটীর শিল্পের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটা কোনও ভাবাবেগের কথা নয়—পারিপার্শ্বিক বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সত্য। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত নারায়ণও "Our small scale Industries—Their important role" শীর্ষক প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন—"Small Scale Industries are not a matter of sentiment but of pure arithmetic and reality and the earlier this point is understood and appreciated by our economists and politicians, the better for them and the nation." [Major Industries in India—Annual 1955-56 (Vol. S)], বর্তমান প্রবন্ধে ভারতের অর্থনীতি, শিল্প ও বেকার সমস্যার বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে—দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কুটীর শিল্পের অবদান কেমন কতটা বৃহৎ, বিশেষ করে ভারী বা মূল-শিল্পের পরিপূরক হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসন ও শোষণের পূর্ব্বে এই উপমহাদেশ শিল্পোৎকর্ষে পৃথিবীর উন্নতদেশগুলির প্রথম সারিতে ছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন ভারতকে নিঃস্ব ও রিক্ত ক'রে কিরে ধাঁড় করাল অগতের অনুন্নত দেশগুলির প্রায় পেছনের সারিতে। ১৯০৮ সালে "ধাতুসম্পদ" সম্পর্কে দেয়া বিশেষজ্ঞ Sir Thomas Holland বলেছেন,—"এ দেশের তৈয়ারী লৌহের উৎকর্ষ, চীনদেশের ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য ইওরোপে অধুনা ব্যবহৃত রীতির পূর্ব্বাভাষ, তামা ও পিতলের জিনিষের শিল্পোৎকর্ষ ভারতকে যাবৎ শিল্প জগতে এক সময়ে এক বিশিষ্ট আসন দান করেছিল।" ["ভারতের ধাতু সম্পদ"—T. H. Holland's Report, 1908] ১৯১৮ সালের ভারতের শিল্প কমিশনের রিপোর্টেও ভারতের অতীত উৎকর্ষতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেই রিপোর্টের একাংশে বলা হয়েছে—"আধুনিক শিল্পব্যবস্থার জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপ যখন অসভ্যদের বাস-ভূমি, তখন ভারতের শাসকদের ঐশ্বর্য এবং তার শিল্পীদের শিল্প কৌশলের জন্য ভারত প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার অনেক পরে পাশ্চাত্যের বণিক ভাগ্যান্বেষীর দল যখন প্রথম ভারতে এসে হাজির হ'ল, তখনও

এদেশের শিল্প প্রকৃতি অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মতো বাঁধা ধরা ছিল না। (ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্ট—পৃঃ ৩) কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকদলের দু'শ বছরের নির্বিবেক শোষণ ও অপরিসীম অবহেলার ফলে সেই ভারত সর্বপ্রকার সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আজ অর্থনীতির দিক দিয়ে আছে অনেক পিছিয়ে। ১৯৩৩ সালে "Royal Empire Society"তে Sir Alfred Watsonএর বক্তৃতায় এই সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেছেন—"শিল্পের দিক দিয়ে ধরতে গেলে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে সুযোগ হারানো হয়েছে।...ইহার জন্য লোক বেশীর ভাগ বৃটিশদেরই।...শিল্প সমৃদ্ধির দিক দিয়ে যে অবস্থা ভারতের নিঃসন্দেহে হয়েছে, তার অগ্রগতির সমস্যাটা আমরা কোন কালেই যেমন করে মেটাবার চেষ্টা করি নাই।" [The Times—4th June 1933].

পরাধীনতার অভিশাপে শিল্প সমৃদ্ধিতে একদা অতীতকালের সেই ভারতের দুরবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে,—"গড়ে একজন ভারতীয়ের যায় আয় তাহাতে প্রতি তিন জন লোকের মধ্যে দুই জনের কোনও মতে খাওয়া চলতে পারে...তাহাও আবার নিকৃষ্টতম সর্বাপেক্ষা কম পুষ্টিকর খাদ্য যাহাতে তাহারা আর কিছুই চাহিবে না। [Shah and Khambata—"The wealth and taxable capacity of India" 1924, P-253].

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক জন-জাগরণের প্লাবনে ভারত পরাধীনতার নাগ পাশ থেকে মুক্তি পেল, পেল রাজনৈতিক স্বাধীনতা; কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি আজও তার সম্ভব হয়নি। খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, দেশ বিভাগজনিত নানা সমস্যায় তার অর্থনৈতিক জীবন ভারাক্রান্ত। কিন্তু সেই কালো মেঘের ভিতরও রৌদ্রের রূপালী আলো দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কাজ সুরু করেছেন আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, স্বাধীন সরকারের দায়িত্বশীল আসনে অধিষ্ঠিত আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফৎ। রাজনৈতিক জীবনে ভারত আজ জগৎ সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনেও যাহাতে জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি করে সে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তারই জন্য চলেছে আজ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। তাই রচিত হল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে। কিন্তু প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপায়নের পরে দেখা গেল—উৎপাদন বৃদ্ধি হল বটে, কিন্তু জীবিকা প্রসারের যা বেকার সমস্যার সুরাহা তাহাতে কিছুই হ'ল না, পরন্তু বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিই হ'ল। দায়িত্বশীল জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন যে পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জীবিকার প্রসারও প্রয়োজন—অন্যথায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। তাছাড়া জনগণ তাহ'লে সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়নকল্পে কোন অনুপ্রেরণা পাবে না। কমিশন ও বলেন,—"The employment position worsened to some extent during the period of the Plan (1st. five year plan), the number on the live registers of employment exchanges rising from 337 lakhs in March 51, to 5.22 lakhs in December 53 and further to 6.92 lakhs in December 55.....If plans of economic development are to evoke sufficient response, employment must be one of the central objectives." [A draft outline of 2nd. five year plan by Planning Commission, Govt. of India, 1956, P. 40.]

তাই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় রচিত হল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা মূল বা ভারী শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে; অবশ্য কৃষিকে উপেক্ষা করে নয়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে কোনও অনগ্রসর দেশকে বর্তমান দুনিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে চলতে হলে তার শিল্পোন্নয়নের অগ্রাধিকার প্রয়োজন এবং তার জন্য প্রথমেই তাকে ভারী বা মূল শিল্পের উপরে নজর দিতে হবে এবং বহুটা নজর দিবে দেশের সামর্থ্যের উপর নির্ভর ক'রে। মূল বা ভারী শিল্পের উন্নতি না হলে—কি কৃষি কি শিল্প কিছুরই আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয়। চিরদিন মূলশিল্পের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করা আর্থিক উন্নতিরও পরিপন্থী। তাছাড়া ভারী বা মূল শিল্প গড়ে না উঠলে কখনও কোনও দেশের শিল্পের বনিয়াদ পাকা হতে পারে না, তাই আমরা তুলনামূলকভাবে দেখতে পাই যে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমস্ত উন্নয়ন খাতে ৮৬ শতাংশ শিল্পের জন্য ব্যয়িত হয়েছিল, সেইখানে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য ব্যয়ের হার দ্বিগুণীকৃত হয়েছে ১৮৭ শতাংশে। (অবশ্য এখানে শিল্প বলতে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শিল্প উভয়কেই ধরা হয়েছে)। প্রত্যেক অনগ্রসর দেশের উন্নতির ধারা লক্ষ্য করলে একই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য ভারী বা মূল শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চীনের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র মহাচীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ-এন-লাই এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—

"The guiding principle of the plan, as is generally known is to concentrate our main efforts on the development of heavy industry as a foundation of the industrialisation of the country..." (Documents of the first session of the first National Peoples' Congress P. 78]. শিল্প বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র মার্কিনও একই সাক্ষ্য বহন করে। সেখানকার উন্নতির ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই, ভারী শিল্প বা মূল শিল্পের উপর প্রাধান্য দিয়ে তাদের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। অবশ্য মূল শিল্পের প্রসারের প্রথমাবস্থায় দেশবাসীর কিছুটা কষ্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার, দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির স্থায়ী বুনিয়াদ তৈরীর জন্য। মূল বা ভারীশিল্পপ্রধান পরিকল্পনায় বাস্তব রূপায়নের গোড়ার দিকে ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা প্রয়োজন অনুপাতে মেটানো সম্ভবপর নয়। পরিকল্পনা কমিশন ও বলেছেন—

"Investment in basic industries creates demand for consumer goods, but it does not enlarge the supply for consumer goods in the short run." [Draft outline of 2nd. five year plan—by Planning Commission, Govt. of India, 1956, P. 8]. কাজেই প্রয়োজন হল জোগানপত্রের চাহিদার সন্ধান। অন্যথায় দেশের পুঁজির একটি বড় অংশ যাহিত হয়ে যায় জোগানপত্র আমদানীর জন্য এবং তাহা ভারী বা মূলশিল্প গড়ে তোলবার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমানে অবস্থাও মোটেই আশাপ্রদ নয়। আমাদের মজুত বৈদেশিক মুদ্রা ১৯৫৬ সালের গোড়ায় ৭৩৫ কোটি টাকা ছিল, ১৯৫৭ সালের নভেম্বরের শেষে তাহা ৩৯৯ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। এই সব দিক বিচার করে আমাদের জোগানপত্রের আমদানীর উপর অত্যধিক ঝুঁকি খুব যুক্তিসঙ্গত এবং যুক্তিপূর্ণ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তবে এই সমস্যার সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সমাধান সম্ভব কুটীর শিল্পের বিকাশের দ্বারা; অর্থাৎ ভারী শিল্পের পরিপূরক হিসাবে পাশাপাশি কুটীর-শিল্প গড়ে তুলে। অন্যান্য দিক যথায় রেখে জীবিকার প্রসারের পথেও কুটীর-শিল্পের প্রসার বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সব দিক বিবেচনা করেই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কুটীর-শিল্পের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ হয়েছে ২০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার চেয়ে ১৭০ কোটি টাকা বেশী। [অবশ্য কমিশন বিবৃতে "Village & Small Scale Industries Committee," সুপারিশ করেছিলেন ২৩০ কোটি টাকা]। তাছাড়া কুটীর-শিল্প প্রসারের আরও একটা অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে—কুটীর শিল্প প্রসারের দ্বারা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনও কিছুটা সম্ভব—কুটীর শিল্পজ পণ্যের বিদেশে রপ্তানীর বন্দোবস্ত করে। এই প্রকারে আমরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থার খানিকটা উন্নতি করতে পারি।

বেকার সমস্যা সমাধান করে "কুটীর শিল্পের অবদান" প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশন কর্ত্তৃক নিয়োজিত "ষ্টাডি গ্রুপ" (Study Group) এর রিপোর্ট এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে,—"The existing programme would provide employment opportunities for about 14.4 lakhs of persons, whereas complete eradication of educated unemployment would require the creation of 2 million job opportunities during the second plan period." [Draft outline of 2nd five year plan, by Planning Commission, Govt of India, 1956. P-45] এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সেই "ষ্টাডি গ্রুপ" ও কুটীর শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের সুপারিশ করেছেন। এখন অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে—"বেকার সমস্যা সমাধানে বা জীবিকা প্রসারে কুটীর শিল্প কি উপায়ে সাহায্য করতে পারে?" কুটীর শিল্পে মূলধনের তুলনায় লোক লাগে অনেক বেশী। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে দেখা গেছে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কুটীর শিল্প ও অন্যান্য ছোট-শিল্পে আরও সাড়ে চার লক্ষ লোকের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হবে। [Draft outline of 2nd five year plan, by Planning Commission, Govt. of India, 1956. P-43]. কাজেই দেখা যায় কুটীর শিল্পের মাধ্যমে অন্যান্য উপায়কে যাচাই না করে জীবিকা সংস্থানের প্রসার সম্ভব। "Our Second Five year Plan—Diffusion of benefits of Industrialisation" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ মিশ্র, এম. পি., Deputy Minister for Planning (কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা উপমন্ত্রী) ঠিকই বলেছেন,—"In Indian conditions there perhaps could be no better device for raising the incomes of the unemployed and under-employed masses than through the role designed to the Village and Small Scale Industries" ["Major Industries in India"—Annual 1955-56 (Vol. 5)]. "The Karve Committee" এর রিপোর্টেও এই সমস্যার উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কুটীর শিল্পের প্রসারের কথা সুপারিশ করেছেন।

কুটীর শিল্পের প্রসার ও বিকাশে যে আমাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, এই মতবাদটা শুধু আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই পোষণ করেন না, শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের বিশেষজ্ঞগণেরও অনুরূপ অভিমত। "Ford Foundation Team" এর রিপোর্ট থেকেই তাহা প্রমাণিত হয়। ভারত সরকার, জাতীয়-পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকা সংস্থানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। সেই আন্তর্জাতিক দলটি "Ford Foundation Team" নামে পরিচিত কারণ, "Ford Foundation "এর সৌজন্যে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সেই আন্তর্জাতিক দলে ছিলেন—

(১) Mr. Sven Hugbeag, Vice—Principal and acting Principal of the Swedish Govt., Institute for Higher Education in Trades and Handicrafts.

(২) Mr. Grunstrom, Managing Director of Swedish federation of Small Industries and Crafts.

(৩) Mr. Ramy Alexander, a Consultant in the Development of Handicrafts and Specialised Small Industries.

(৪) Raymond W. Miller, a Leading authority of Co-operatives. এবং

(৫) Mr. C. Leigh Stevens, an expert on Industrial Management Engineering.

এই পাঁচজনের ভিতর প্রথম দুইজন সুইডেনবাসী, আর বাকী তিনজন বিশেষজ্ঞ আমেরিকাবাসী। তাঁহারা সকলেই আমাদের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক সমস্যা সমাধানে কুটীর-শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে গেছেন। প্রধানতঃ জাপান, জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং রাশিয়া প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশগুলিতেও বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে কুটীর শিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত লাভ করেছে।

পরিশেষে কুটীর-শিল্প-বিরোধী তথাকথিত প্রতিবাদীদের আমি বলতে চাই যে, কুটীর শিল্প দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে অন্তরায় ত' সৃষ্টি করেই না, পরন্তু মূল-শিল্প বিকাশের সহকে সুগম করে দিয়ে দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কারণ,

প্রথমতঃ, ভারী বা মূল শিল্পের জন্য সঞ্চিত পুঁজিতে হাত না দিয়ে জোগানপত্রের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে কুটীর শিল্প;

দ্বিতীয়তঃ, বেকার সমস্যারও আংশিক সমাধান সম্ভব কুটীর শিল্প দ্বারা; এবং,

তৃতীয়তঃ, কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জ্জন করা যায় কুটীর-শিল্পজ পণ্যের রপ্তানির ব্যবস্থা দ্বারা।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

কেবার চরের আয়তন প্রায় সাত হাজার একর—অনুমান একুশ হাজার বিঘা। বড়খাল বলতে একটা, তার থেকে আশে পাশে অনেক ছোট খাল বয়ে গেছে। তাদের অনেকেই ভিতর দিকে কিছু দূর গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। মাত্র বড় খালটি এদিকের সমুদ্র থেকে বার হয়ে অপর দিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং কাঠ বোঝাই খালি নৌকা সবই খালেই থাকে।

আমরাও ঢুকলাম এই খালে। বড়খার নৌবহর অর্থাৎ সত্তরটি বড় ছোট নৌকাগুলোর কাছাকাছি গিয়ে নোঙর ফেললাম। পাশেই বনবিভাগের কর্মীদের বোট, অফিস—খাওয়া দাওয়া সবই এই বোটে। তাতে কেউই থাকে না, সন্ধ্যার আগে যে যেখানে থাকে এসে নিজের নিজের বোটে বা নৌকায় আশ্রয় নেয়।

আগেই বলেছি—এবার কেবার ওয়েষ্টার্ন ব্লাক এইখানেই, যত কাঠ কাটাই হবে এই সময় সবগুলো কাঠই এই বন থেকে যাবে। দুটি বৎসর পর আবার এখানে কাটা হবে। ফেব্রু অফিস থেকে নৌকা পাশ করিয়ে এনে খালি নৌকা জমা হল এই খালে। বন বিভাগের লোক নৌকার 'পাস মেপে—তারাই সেই লাটাই গাছে 'মার্কা' দিয়ে আগেকার বনের ভিতর, নৌকায় কাটুরেরা সেই সব গাছ কেটে ফেলবে। বনবিভাগ আবার সেই সব গাছগুলো ঠিক কাটা হয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হলে, তবে নৌকা বোঝাই করতে পারবে মহাজন। বোঝাই নৌকা ছেড়ে আসবার আগে 'ফাইনাল চেক' করিয়ে পাশ নিয়ে তবে জমাবে পাড়ি। একথায় অনেক গোল। তবে বড় আঁটুনি কথাগোল। এখানে আইনের যত কড়াকড়ি, তাতে আশেরে বনবিভাগ কতটুকু লাভবান হয়েছে তা গবেষণার ব্যাপার, কিন্তু চর্মচক্ষে দেখে মনে হ'ল ওখানের কর্মচারীদের অনেকেই যেন তোলা আছেন। আইনের অনুশাসনে দুর্গম বনের মধ্যে··· অসহায় মহাজন, কাটুরে—বন ব্যবসায়ীদের যেকমভাবে রক্তশোষণ করেন—তাদিকে তার জন্য যদি কেউ মুখরোচকের 'Bug' বলেন—অন্যায় করবেন না। বাওলিয়াদের মুখে খোঁজ নিয়ে জানলাম—তাদের এলাকায় রেটও প্রায় অনুরূপ কালির আশরে বাঁধা আছে। যেমন একশো বন গেও কাঠের কবলায়—সরকারী রেভিনিউ ছাড়া, ওদের এলাকায় বাঁধা আছে। গরাণ খুঁটির বেলায় সরকারী রেভিনিউ ছাড়া ওদের এলাকায় বাঁধা আছে। বন প্রতি প্রত্যেক কাঠের বেলাতেই অমনি বাঁধা দর আছে।

না দিতে চাও—যেতেও না। কিন্তু আপনার হাজার বন নৌকা বোঝাই করতে এক মাস দুমাস তিন মাস কাঁদিয়ে রাখবে। আপনি ওদের হাতে, কোন অভিযোগ করতে গেলে চারদিন চার রাত পথেই কাটিয়ে আসতে। খেতেও তাই। মাঝি-মাল্লার মজুরী আছে, তারপর কি হবে আপনার অভিযোগের ফলাফল, তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। ওদিকে বনের মধ্যে আপনার লোকজন বসে আছে কাজ নাই; বাড়িতে খোরাকী, মাইনে দিতে হবে। যদিও আইন মাফিক আপনার কাটবার মত গাছ যাওলে দিতে হবে বনবিভাগকে, যেবার বেলায় সুরু করবেন ওরা গড়িমসি, পেলেন, বাঁকা বাগড়া গাছ। গাছ কাটার পর এমনি তুলে আনতে পারবেন না, বন বিভাগের সেই মার্কা থাকলে, তার জন্য দী করে বসে থাকুন কবে সেই শুভক্ষণ আসবে। অর্থাৎ আপনার হাজার বন কাঠ বোঝাই হতে তিন মাস কেটে যাবে, খেয়ে কূল পাবেন না, তাও সুন্দর-অরণ্যে ভোজন। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাদের খুশী করে কাজ করতে হয়। ওঁরাও বন বিভাগে বনবাদাড়ের চাকরীর সুদ্য সাধারণের ঘাড় দিয়ে যায় সুদ সমেত উশুল করে নেয়। এ সম্বন্ধে আইনতঃ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—তাই শাস্তির প্রশ্ন ওঠে না।

বনের রহস্য—বনেই সীমাবদ্ধ থাক। আমরা আপাততঃ এসে পৌঁছেছি, দিনকয়েক নিরাপদেই কাটবে, পথের দুশ্চিন্তা থেকে আপাততঃ মুক্তি পেলাম। জানবো—আগামি কিরবার সময়।

বড়খার 'ফুলস্টাফ' অর্থাৎ মাঝি-কাটুরে সবাই রয়েছে। তিনখানা নৌকা বাইরে ছিল তাদের মালপত্রও নিয়ে ফুটছে। একজনার 'নরক গুলজার'। তার উপরে গিয়ে হাজির হয়েছে আমার বন একটি গোলা লোক।

বাঘ—পথের মধ্যে চরমারা দীপের জঙ্গলে বাঘের ডাক না শুনি—কেমন হ'লো, ভয়ে যেন কাঠ। ছোট টাপুরী নৌকাতে উঠতি বাঘের পদাপদায় বাঁচা দিই ওঠে।

এ হেন লোক যে কেমন করে কোন সাহসে এই সমুদ্রের ভয়ে এল তাই নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা ও হয়ে গেছে।

সেদিন শুক্রবার। ওই দিন জঙ্গলের বাওলিয়াদের ছুটি, কেউ জঙ্গলে যায় না। হৈ চৈ করে; বিশ্রামের, সাতদিনের ময়লা কাপড় সোডাজলে সাবানটুকরো দিয়ে কেচে কর্সা করবার চেষ্টা করে। ডায়গাটায় লোকজনের মেলা মেলে।

কে অনুমান করবে, মাস তিনেক আগেও এখানে কোন মানুষের ঘোঁয়া পড়েনি। বিশ বৎসর ধরে এই বনভূমি নিঃশব্দে যে রহস্যজাল গড়ে তুলেছিল মানুষের কলরবে আজ তা ছিন্ন হয়ে গেছে, আমার ডায়াবাজীর মতই মিলিয়ে যাবে এই কোলাহল কয়েকদিন পরই। দক্ষিণে বাতাস উঠলেই সমুদ্র ফেপে উঠবে, কেবার চর হবে পরিত্যক্ত জনহীন। বৃষ্টি বৎসর ধরে এর কোন আনাচে কানাচে পড়বেনা খুন্তির আঘাত, উঠবে না মানুষের কণ্ঠস্বর, পড়বে না পায়ের ছাপ। এর সকাল সন্ধ্যা ঘুরে

হয়ে উঠবে হরিণের ডাকে, মাঝে মাঝে খালের ধারে এসে হাঁটু গেড়ে জোয়ারের শেষে বসে থাকবে রয়েল টাইগার, মাছের আশায়। ছ'ঙ ডালের দিকে সতর্ক নজরে চেয়ে থাকবে কোন মৌচাকের দিকে। বনভূমীর বন বনুষগোলা পড়ন্ত আলোর গায়ের ফাঁকে ফাঁকে ডাক শুনিয়ে কোন কোন ঘরছাড়া বাঙালির মনে ঘরের বেদা জাগিয়ে তুলবে। আমিও বনভূমি কুমারীর মত শুচি-পবিত্র অমীয়া হয়ে উঠবে।

বেতাই, ও বেতাই

ডাক শুনে চমকে উঠলাম। তুর খালের সেই বিতাই নাকি।—মাঝির ইসারা আমে সেই বাবটা। সেখান থেকে লক্ষে গাদনাবার, নরীর উপরই দাঁড়িয়ে আছে সমুজ আর লাখা এনাকেল ঘড়ির বাদগুলো, পাঞ্জাবী কমলাকটার চারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে লম্বা হাঁটুকুল পাঞ্জাবী পরে, কাঁধে ব্যাগটা। হাঁকছে থেকে থেকে—"স্ স্ লাম বাজা, স্ লামবাজা।"

কোলাহলমুখর কোলকাতা, একটু এগিয়েই সংস্কৃতি পরিষদের আড্ডা, কালীশবাবু—বিভূতিবা, আরও অনেক পরিচিত মুখ।

"খবরদার ওনাকে ডাকবি না।"

চেয়ে বেশি নরীক একজন বাউলিয়া ছোকরাকে শাসাচ্ছে। অর্থাৎ বিতাইএর চাকরীটা নিতে হয়েছে তাকে, তাই ওরাই বহাল করেছে ওই নাম।

জলিল নিজেদের নৌকায় বসে স্নান সেরে কয়েক গাদি গাড়িতে জট ছাড়াচ্ছিল ছোট আয়নাটা সামনে রেখে। শরিফের কথায় ঘেমে ওঠে।

ভারি তেজ হয়েছে তোর না, বাবুদের নৌকায় রয়েছিস কিনা তাই বেমাক, যেতে হবে না 'কোপে' ?

কোপ অর্থাৎ জঙ্গল মধ্যে কাঠ কাটতে। এখানে মাঝি কাটুনেতে কোন তফাৎ নাই। সকলকেই ওই কাজ করতে হয়। শরিফ বলে ওঠে—'আমি বেইমান নই, চুরি করে নৌকার কাঠও বেচি না, ধর্মের সাথে মিছি কথাও বলি না। কাজে ফাঁকি দোব কেন ?"

দুই মধ্য থেকে কথাগুলো শুনছি ওদের, কবে কে কি করেছে তারই হিসিবিত্তি বার হয়ে পড়ে ওদের কথায়। বড়দা ডিঙি নিয়ে কাঠের গাদার কাছে গেছেন। হঠাৎ দেখি জলিলও নৌকা থেকে লাফ দিয়ে এসে আমাদের পাটাতনে নেমে শরিফের টুঁটি টিপে ধরেছে। শরিফও ছাড়বার পাত্র নয়, ওর মাংসল দেহে বেবড়ক কিল ঘুসি বৃষ্টি করছে।

ব্যাপার কি, দুটোতে খুনোখুনিই হবে বোধ হয়। আমাকে দেখে সরে দাঁড়ালো তারা দুজনে দুদিকে, হাঁফাচ্ছে জলিল।—তুমি না রোজ সন্ধ্যে বেলায় পীরের নাম-দাও, ভালো বজবেশ হয়ে যাবে, এই তোমার কাজ !

শরীফ রাগে ফুলছে।

—যাও নিজের নৌকায় যাও জলিল, বয়স হয়েছে এখনও রাগ যায় নি। বাবু নাই, থাকলে দেখতে ব্যাপারখানা।"

জলিল চলে গেল। সর্দার মাঝি আলি সাহেব এখানকার হেড আর কি। তাকে বলা যেতে পারে যেন কমিটির সেক্রেটারী, ব্যবসারী ওদের পত্র কিছু কিছু আছে তার জিম্মায়—মেসাক্রিপ, ইন্সুরেন্স টাকলেট, সিবাজল, আইডিন ইত্যাদি। আলিসাহেব অনেক সময় বিনা ওষুধেই ডাক্তারি করে দেখলাম। একটি ছুটকেশে তার ওষুধ, বিড়ি, তামাক। চাল-চাল-ডালের হিসেব তার কাছে। একটু লিখতে পড়তে ও পারে। আলিসাহেব দূরের নৌকায় ছিল, ছইএর বাইরে এসে গলাগাল পাড়তে থাকে দুজনের উদ্দেশ্যে। এক হাতে তালিবাজে না, দুজনেই দোষী। ব্যাপারটা চাপা পড়লো তখনকার মত।

কয়েকজন বাওয়ালি ছোট ডিঙি বেয়ে বেপলা হাল দিয়ে মাছ ধরতে সুরু করেছে ভাঁটার সময়। আহা কি মাছ !

—তবু মাছের ওপর বাঙ্গালীর কাছে ওদের চেয়েও বেশী, মাছের প্রতি লোভ বাঙ্গালীর মজ্জাগত ! এমন মাছ কলকাতাতেও দেখিনি। ছোট খালের জল পেয়ে মরে, কাদার উপর লাফ মারছে ঝলোর মত ঝকঝকে পাকশে মাছ, এক একটা আধ হাত পরিমাণ হবে। আর চাওড়াও বেশ। এক হাঁটু কাদাতে বাবু চুপ্ থেতে খেতে ওরা প্রায় আধ টিন পারশে মাছ তুলে ফেল।

এরা জাল ফেলেছে ডিঙি থেকে, খোলে করা হচ্ছে ছোট ছোট ভেটকি, ভাঙন মাছ, পায়রাচেলি উঠেছে এক একটা বাবারি রুইর আকার।

কলকাতায় কথা মনে পড়ে, শিয়ালদহ বাজারে, বরফের তলা থেকে এরাই এদেরই জাতভাইরা-যখন যার হয় তখন কি এমনি লোলুপ বা খাদ থাকে ?

—থাক, ছেড়ে দে, এতেই হবে। সেদিনকার মত মাছধরা থামলো। ওদিকে ছোট ডিঙি নিয়ে ইসুফ গিয়েছিল সমুদ্রের ধারে জেলেডিঙ্গির সন্ধানে। ইলিশমায় উঠছে এই কোটালের ভাঁটিতে। এসেছে জেলেরা। ইসুফ ফিরলো—সঙ্গে এনেছে প্রায় সেরখানেক ইলিশ।

—"কত দাম নিলো ?"

আমার কথায় হাসে ইসুফ—'দাম কি বাবু, চাইলাম, ওরা খুশি দিলেলো।" চাইলেই—সেরখানেক ইলিশ প্রায় বিনামূল্যে মেরে দাও—এখানে খুশি পাওয়া যায় দেখলাম। জেলেডিঙ্গিওয়ালাদেরও সংসার আছে—কেউ চাইলে তারা 'না' বলেনা। শুধু হাতে প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিলে বাকি মাছও আর পাওয়া যাবেনা। অবশ্য প্রার্থীর যেখা সেখানে মেলেনা বলেই এত সবাবর মনে হ'ল।

তিরিশজন লোক, প্রায় পঁচিশসের মাছ। এত মাছে কে ? ইসুফ হুকুম করে 'পাকাবি'কে "একটা মাছ আমাকে ভাজি দিওতো, খাবো।"

বলকি ? একটা মোটা ইলিশ প্রায় সেরখানেক কি পাঁচপো হবে—একাই খাবে ?

—বাবু, দু'খানা হ'লে ভুনতে গেলে ভরতি হয়, জিরে 'তার' আসে।

দর্শনার্থ।

পাকানির গন্ধটা একটু কৌতূহলের, সেও মাছি-কাটুনে বাঙালির সবই, উপরন্তু ওই তিনিপয়সা লোকের মাল্লা জন্তুতে হয় তাকে। তাহলেও অবশ্য সে কয়েকটাকা বেশী পায়; বলিষ্ঠ জোয়ান চেহারা, চিবুকের নীচে ঘুরিয়ে আঁকা 'দুলহার অব সজনী'র মত এক চিমটে বুক কালো কুঁকড়ানো দাড়ীর, আগুনের তাপে পেশীগুলো চকচক করছে, গলাটাও বেশ পালিশকরা। একে দিয়ে রান্নার কাজ একেবারেই চলেনাব, ছুড়ুল-ছানাই এর ছাড়িয়ার। মাঝিদের অনেকেই বলে—চুরি করে খেতে পাকানির' ওমনি শরীর।

অবশ্য চুরি করবার মত খাদ্য কিছুই দেখলাম না, অনেক-দিন দেখানে দেখেছি ছাতের উপর তরকারী শুকতে ঐ ভাতই। আর ইন্দুরের কথায় বলে পাকানি।

—'তোমারে ভাগি দিব, আমি খামুনি?'

—'না,' আর একটা ইলিশমাছ তুলে দেয় ইদ্রিস। নিজেই কাটতে বসলো। ছোটো নয়—প্রেম ভাজাই খেতে খেতে টের পেল পরোটার ইলিশের মধ্যে দশটা। আমাদের জন্য একটা রাঁধা আগেই তুলে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের নৌকাতে, নাহলে তাও বোধ হয় জুটতো না।

কাল ক খাবি রে? আসীমাহেবের কথায় ইদ্রিস জবাব দেয়—কালের কথা কাল দেখা যাবে মামু, আজ ত' খাই নই।

বৈকালে বনবিভাগের বোটে গেলাম, ডিঙি লাগিয়ে চুকলাম ওঁদের বোটে। সেগুনকাঠের চমৎকার ছোটো বোট, একপাশে দুখানা ঘর করা, পিছনে পায়খানা; অন্যদিকে মাঝি বোটম্যানদের থাকবার কাছের ঘর, অন্যান্যের কোন ক্লট নাই। আগাগোড়া সেগুনকাঠের তৈরী।

—ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। একজন বাইরে গেছেন, অন্যজন ঘরের বোটে। আমাকে দেখে একটু চেয়ে থাকেন সন্দেহী দৃষ্টিতে। পরণে আমার ধুতি পাঞ্জাবী, একটা লংকোট। ক্যামেরাটা রয়েছে সঙ্গে। দেখে শুনে বেশ খুশী হলেন বলে বোধ হ'ল না। তাদের ব্যবহারে আমি বেশ কিছু অপ্রতিভ থাকি। আগে থেকেই বড়সাহেবকে লিখে করে গিয়েছিলাম—আমার আসল উদ্দেশ্যটা যাতে না প্রকাশ করতে, পরিচয়টুকুও যাতে না দিতে। কারণ অনেক জায়গায় বাস করে করে ওদের অনেকেই এমন একটা অবজ্ঞার শ্রেণীভেদের, যেখানে মানুষের সুকোমল বৃত্তির কোন প্রয়োজন বোধ থাকে না।

—"শিকারেট?"

—"আমি খাই না।" মুখখানাতে অসীম অবজ্ঞার বেশ পাকাপাকি ভাবে লেগে আছে। হাসতে দেখলাম না।

একটা কাজের ব্যাপারে গিয়েছিলাম, ভদ্রলোক বিরাজিরায় তার অবতার মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও ডেকিয়ে দিলেন

—'কুপ অফিসার যাহলে হবেনা।'

—আপনি ত এখন চার্জে?

ভদ্রলোক জবাব দেন না কথার।

কুপ অফিসার দেখেন মোটর কুপ খোলা হবে সেইখানে, সমুদ্রের গাড়ি পার হয়ে বড় নদীবার ঘণ্টাচারেক মুখের পথ, অর্থাৎ এক-জোয়ার—এক ভাঁটাতে যাতায়াত করা যাবে কিনা সন্দেহ, মধ্যে সমুদ্র এবং বড় পার।

সাধারণের প্রাণের, সময়ের কোন দামই নাই তাদের কাছে। তুচ্ছ একটা খাপারের জন্যও 'কুপ'ইস চার্জ টেকিয়ে যেন তার উপরওয়ালাকে;

—"কাল ভোরের জোয়ারেই চলে যান।"

কথাটা এমনভাবে বললেন ভদ্রলোক—যেন গ্রামযাত্রার থেকে কলেজ ষ্টীট যেতে বলছেন আমাকে। বার হয়ে এলাম, দেখি বাইরে একজন চৌধুরি নৌকার মালিক অপেক্ষা করছে। তার বোঝাই নৌকা পাশ করাতে হবে। সেই ভদ্রলোক বেশ রসকের সুরেই বলেন—'আট টাকা মাহলে ছাড়বো না।'

কথাটা তখন বুঝিনি, ভাবলাম সরকারী টাকা বোধ হয়, কিন্তু মহাজনের কাছেছিলাম পরে—আট টাকা, অর্থাৎ প্রতি একশো মণে ওঁদের প্রথামী। সেইটার জন্যই সময় করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি চৌধুরী নৌকার মালিককে। শেষ রফা অবধি হিলাম না।

এদের কাছে প্রায় সকলেই ওই বিদেশী চৌধুরী, উড়িয়া জেলের, না হয় বাঙালী মুসলমান, বা মাঝির। নিরক্ষর ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে ভাল করে কোপ মারেন। মাঝিকে কোপ মারা যায় না, ওদিকে লোকও জাইবের ঘেরে ঘেরে ঘোরঘোর করিয়ে বেড়। আগেই বলেছি সেখানে কোন খুঁত থাকলে এই ব্যাপারীর মালিক তারাই এবং তারা এই ছাড়িয়ে সাহায্য করবার পরিবর্তে জাল করিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। কারণ হাত পেতে তাদের কাছ থেকে টাকা নিতে তার হয়—এবং এঁদের তরফ থেকে টাকা নিতেও ঝিকে যাবে।

যাদের কাছ থেকে এমনি ভাবে টাকা আসে তাদেরও ছেড়ে কথা কয় না। কালে আসে একজন উড়িয়াবাসী এসে সুরু করেছে টাকা দিইছি যদা গাছ কাটিমু কাঁই? মোর টাকা কি যদা অছি? সাহেব মোর গোড় ধরি পাশ করিব।

বোধহয় বনবিভাগ যাদ্য প্রাপ্য মিটিয়ে তার গাছ কাটবার জন্য মার্কা দিয়ে এসেছিল যে সব গাছে তার অনেকগুলোই বাঁকা এবং খারাপ। তাই এসে সে রোয়া করছে—টাকা দিয়েছি, বাঁকা গাছ কেন কাটবো, আমার টাকা বাঁকা ছিল? তুমি না যাও তোমার সাহেব আমার পাশ করে নৌকা পাশ করে যেতে।

ফিরে এলাম। কাল ভোরেই বড়বা একদিনের জন্য বাইরে যাবেন।

—"যাবে নাকি?"

ওই অতুল সমুদ্র পাড়ি দেবেন উনি ভেড়েনবনি ডিঙিতে। আমার যাতে সইবে না। বড় ঢেউ জলকে উঠবে নৌকার উপরে, নাকাবে ছোট নৌকা। ও আমার মাথায় থাক।

আলি সাহেবের নৌকায় উঠলাম। বেশি একটা ছেলে মুসলমান বুড়ি বছর হবে বয়স, ঠায় বসে আছে। মুখ চোখ শীর্ণ, কাঁথাতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

—"খাবিনা কেন?"

—"খাতি মন চায় না। পরাণডা হু হু করতিছে।"

আমার দুচোখে নামে তুফান। আমাকে দেখে আলিসাহেব ওর বিছানাটা পেতে দেয়—'বসুন, বাবু।

—তিন দিন ধরে খায়নি দায়নি। ঠায় বসে আছে। বিপদ আপদ কার না হয়, তাই বলে জোয়ান ছেলে এমনি করে কাঁদবি তুই? এই নৌকাতেই বাড়ী চলে যাবি, সে কদিন ভাল করে মন ঠাণ্ডা করে থাক। সান্ত্বনা দেয় আলি সাহেব।

—"কি হয়েছে তোমার?"

আমার কথায় মুখ তুলে চাইল ছেলেটি। ডাগর দুটো চোখে খন খন করছে অশ্রু। ভেজা গলায় বলে।

—"ছোট এ'হান ডিঙ্গি ছিল বা'জানের সমুখে গেছেলো ছেলে ডিঙ্গি খনে মাছ আনতি, আর ফিরে এয়োলামা। কে জানে এহনও মাছ পাতিয়ে!

তিন দিন তিন রাত্রি উপাও হয়েছে সমুদ্রে ছোট একটা ডিঙ্গি নিয়ে, জল নাই খাবার নাই, শীতের আবরণও নাই। ওই তুফানের মধ্যে অকূল সমুদ্রে সে যে আর বেঁচে নাই—একথাটা আলোর মত সত্য। শুধু হয়ে চেয়ে থাকি ছেলেটার দিকে, বাপ বেটার এক সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল, ফিরবে সে একা, কোথায় রেখে গেল বাপ যাবাকে জানে না। কাঁদছে সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে।

(ক্রমশঃ)

সাংবাদিকতার সূচনা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯১৭ সালে আই-এ পাশ করি। ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করিয়া উত্তরপাড়া কলেজে প্রবিষ্ট হই ও তিনমাস বাড়ী হইতে হাঁটিয়া আরিয়াদহ খেয়াঘাটে গঙ্গাপার হইয়া উত্তরপাড়া কলেজে যাতায়াত করিতাম। মানাকারণে শরীর খারাপ হয়—১৯১৯ সালেই প্রথম আগড়পাড়া পারীবৈকণ্ঠ ঘাটের নিকট ভট্টাচার্য্য গৃহে বারোয়ারী দুর্গোৎসব হয়। সপরিজনে তাহাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হই। পূজার পরই আমি নিজে অসুস্থ হইলাম—মাতৃদেবীও স্বর্গারোহণ করিলেন। চারিদিক অন্ধকার—এমন সময়ে উত্তরপাড়ার জমীদার বংশের বিজয়কৃষ্ণবাবুর পৌত্র কালিদাসের গৃহে তাহার দুইটি ছোট ছোট বোন ও একটি ভাইকে পড়াইবার ভার পাইলাম। বাবা সকল দুঃখের কাণ্ডারী, তিনি পথ দেখাইলেন। আশ্রয় ও বাসস্থান মিলিল—জমীদার-বাড়ীর ছেলেমেয়ে, বেশী সময় পড়িত না—আমি নিজে পড়ার যথেষ্ট সময় পাইতাম। ১৯১৭ সালে পরীক্ষা দিবার পর কালিদাস-বাবুদের বাড়ী ত্যাগ করিলাম। বি-এ পড়ার সম্মতি নাই। কাঙ্গালের কাণ্ডারী এবারও উপায় করিয়া দিলেন। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে মাত্র ২৲ টাকা বেতন দিয়া বি-এ পড়ার ব্যবস্থা হইল। তৎসঙ্গে স্বর্গত পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহার কলিকাতা ১৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনস্থ বাসাবাড়ীতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। কুলদাবাবু ধর্মযাজক ছিলেন—বীরভূমি নামক মাসিকপত্র সম্পাদন করিতেন—খিদিরপুর সোসাইটির কর্মী ছিলেন—খিদিরপুর-ব্যাল সোসাইটীর মাসিক মুখপত্র ব্রহ্মবিদ্যায় লেখালেখিও করিতেন। তখন তাঁহার 'ভাগবৎধর্ম' পুস্তক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি বহুগ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁহার বাসাবাড়ীতে বেশ বড় পাঠাগার ছিল—ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় দর্শনের বহু পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কুলদাবাবুর কাছে থাকি—তাঁহার সকল কাজে সহায়তা করার চেষ্টা করি। প্রেসে যাতায়াত করিতে হয়—৺নং হিদারাম বাবুর লেনস্থ শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে তাঁহার বই ছাপা হইত। ক্রমে প্রুফ দেখিতে শিখিলাম। মাসিক কাগজের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ—প্রেসে দিবার পূর্বে তাঁহার নির্দেশমত পড়িয়া দেখি। ভুল পাইলে সংশোধন করি—অসঙ্গতি দেখিলে কুলদাবাবুকে দেখাইয়া লই। স্কুলের জীবন হইতে কবিতা পাঠ করিতে ভালবাসি—কবি না হইলেও কবিতা পড়িলেই তাহার দোষ চোখে ধরা পড়ে—সংশোধন করিয়া দিবার চেষ্টা করি। এইভাবে ধীরে ধীরে সাংবাদিকতা শিক্ষার সুরুয়া চলিতে থাকে। খিদিরপুর-নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পালের এক বন্ধু দৈনিক বসুমতীতে কাজ করিতেন—তিনি মধ্যস্থ হইয়া শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সেই সূত্রে দৈনিক বসুমতীতে সাংবাদিকতা শিক্ষার সুযোগ লাভ করিলাম। সংস্কৃত অনার্স পড়িতেছিলাম, পরীক্ষার সময় মামা সাংসারিক গণ্ডগোলে অনার্স পরীক্ষা দেওয়া হইল না—১৯২০ সালে বি-এ পাশ করিলাম। সেই বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পড়ানোর ব্যবস্থা হইল। তাহাতে ঢুকিয়া গেলাম। কলেজের বেতন লাগিবে না—অধিকন্তু মাসিক ১০টাকা বৃত্তি পাইব। আমার মত সহায়সম্বলহীন দরিদ্রের পক্ষে কম সুযোগ নহে।

দেশে তখন রাজনীতিক আন্দোলন প্রবল—বহুবার বন্ধের সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশের প্রায় তিনহাজার যুবক বিনা বিচারে আটক হইয়াছেন। সর্বত্র তাহার প্রতিবাদ চলিতেছে। স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিবাদের প্রথমাবস্থায় সরকারী অন্যায়ের নিন্দা করিতেছেন। ১৯১৭ সালে মান্দালয়ে শ্রীযুক্ত বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই সহকর্মী শ্রীযুক্ত জি-এস-আরাণ্ডেল ও শ্রীবি-পি-ওয়াদিয়াকে বিনা-বিচারে আটক করা হইয়াছিল—দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিলেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীযুক্তা বেসাণ্টকে সভানেত্রী করা হইল।

দেশে নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই দল রাজনীতিকের মধ্যে সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কে হইবেন, তাহা লইয়া গণ্ড-গোল ও মারামারি হইল। স্বর্গত সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মত লোকও তাহাতে যোগদান করিলেন—একজনের মতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না হইয়া নড়াইলের-নেতা বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেস চরমপন্থীদের দ্বারা অধিকৃত হইল। তাহার পরবর্তী ছয় বৎসরের কংগ্রেস-ইতিহাস সুপরিচিত। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসিলেন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড (তৎকালীন বড়লাট) শাসন সংস্কার ব্যবস্থা স্থির হইল—মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তখনকার চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হইল—সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন (তখনও দেশবন্ধু হন নাই) নূতন কথা—বাংলার কথা—বলিলেন।

সে যুগে প্রতিদিন কলিকাতার পার্কে পার্কে সভা হইত। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বক্তৃতা করিতেন। যে দিন মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট (ভবিষ্যৎ ভারত শাসন আইনের খসড়া) প্রকাশিত হইল, সেইদিনই বিপিনচন্দ্র তাহা in-adequate, unsatisfactory ও disappointing বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দৈনিক বেঙ্গলীপত্র রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পরি-চালিত হয়—তাহা ক্রমে ক্রমে নরমপন্থী হইয়া দেশের লোকের বিশ্বাস হারাইল—অমৃতবাজার পত্রিকা অপেক্ষাকৃত গরম, কাজেই তাহার প্রচার ও প্রসার বাড়িতে লাগিল। তখনও কোন বাংলা দৈনিক সকালে বাহির হইত না—ব্যতীত, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি সবই বিকালের কাগজ—খবর না কিনিয়া সকালের খবরের কাগজ দেখিয়া খবর প্রচার করা হইত। ১৯১৮ সাল হইতেই বসুমতী কার্যালয়ে আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলাম—১৯২০ সালের প্রথমে পাকা চাকরীতে বহাল হইলাম। তখন সবেমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়াছে—দৈনিক বসুমতী সম্পাদক প্রভৃতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সরকারী অতিথি হইয়া ইউরোপের ও ইংরাজের যুদ্ধ বল দেখিয়া আসিয়াছেন—লণ্ডনে বাকিংহাম-প্রাসাদে সম্রাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সম্রাটের সহিত করমর্দন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মত বহু গুণ-সম্পন্ন সম্পাদক ভারতে খুবই কম। তিনি বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারেন। তিনি ১৯০৫ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন, বহু কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা ও যশ অর্জন করিয়াছেন। তিনি ধনীর সন্তান, তাঁহার গৃহে বিরাট গ্রন্থাগার—এ সকল কারণে যেমন সকালে তাঁহার বাড়ীতে, তেমনই বিকালে তাঁহার অফিসে বহু বিদ্বজ্জনসমাগম হইত। সে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বের কথা—কাজেই আমার মত লোক তাঁহার পদতলে বসিয়া সাংবাদিকতা শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিলাম। তাঁহার মত স্মৃতিশক্তিও এ যুগে অতি অল্প লোকের মধ্যে দেখিয়াছি। তিনি তাঁহার স্মৃতিশক্তিকে প্রখর রাখার জন্য প্রত্যহ সংবাদপত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ সংগ্রহ করিয়া খাতায় আঁটিয়া রাখিতেন এবং একটা খাতা পূর্ণ হইলে তাহার সূচি প্রস্তুত করিতেন। এইভাবে তাঁহাকে সূচির সূচিও প্রস্তুত করিতে হইত। তিনি প্রতি মাসে বহু টাকার নূতন বই কিনিতেন, তাহা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্য যে সকল পুস্তক প্রেরিত হইত, তিনি সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিতেন। দৈনিক বসুমতীতে কাজ করার সময় ১৯২১ সালে কয়মাস ছুটী লইয়া বাংলা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা পাশ করিলাম। হেমেন্দ্রবাবুর বিরাট লাইব্রেরী হইতে পড়িবার জন্য বই লইয়া আসিতাম—বই ফেরত দেওয়ার সময় তাহা পড়িয়াছি কি না, তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। কাজেই বই না পড়িয়া ফেরত দিবার উপায় ছিল না। সে সময়ে বসুমতী কার্যালয়ে যাঁহাদের সহকর্মীরূপে পাইয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত সুধী, সাহিত্য মাসিকপত্রের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আমি যাওয়ার পর সুরেশবাবুকে মাত্র কয়েকমাস বসুমতীতে কাজ করিতে দেখিয়াছি—তাঁহার স্থান তখন জুড়িয়া বিরাজে—তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র ছিলেন এবং ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তা ও সাংবাদিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন—তাঁহার তীব্র সমালোচনার জন্য সে যুগের সকল লেখক তাঁহাকে ভয় করিত। স্বর্গত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সাংবাদিক জগতে খ্যাতিমান ও সুপরিচিত ছিলেন—তিনি বহু বৎসর বসু-মতীর সহিত যুক্ত ছিলেন—এবং অবসর গ্রহণের পর পেন্সন লইয়া নিজ গ্রামগ্রাম ২৪পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি অর্থনীতি ও রাজনীতিতে জ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ সেকালে লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। সে যুগে, আমার পরে, সত্যেন্দ্রকুমার বসু বসুমতীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু যৌবনারম্ভে ডাঃ জগবন্ধু বসু মহাশয়ের আত্মীয়পুত্র ছিলেন এবং যৌবনে বি-এ পাশ করিয়া দীর্ঘকাল বঙ্গবাসী কার্যালয়ে ইংরাজি টেলিগ্রাফ-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়া-ছিলেন এবং কয়েক বৎসর দাদা ভারতে ভ্রমণের পর 'ভারত ভ্রমণ' গ্রন্থ কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবনে বহু বৎসর

দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। তখনকার বসুমতী কার্য্যালয়ে এমন একজন ছিলেন, যিনি শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া নয়, নানা সদ্‌গুণের জন্য অফিসের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ২৪পরগণা হালিসহরের অধিবাসী স্বর্গত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র ৺শচীন্দ্রনাথও তাঁহারই সময়ে সাংবাদিকরূপে যশ অর্জন করেন ও দীর্ঘকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। প্রাক্তন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মরিনাথ এবং খ্যাতনামা কন্ট্রাক্টর নেতা ও এম-পি হীরেন্দ্রনাথ তিনকড়িবাবুর পৌত্র। তিনকড়িবাবু বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, সে জন্য অফিসের সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত জ্যেঠামহাশয় সম্বোধন করিত। তিনি শুধু সুলেখক ছিলেন না, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি শিখিবার বিষয় ছিল। ঈশ্বর, ধর্ম, কর্ম—সকল বস্তুতে তিনি ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট হইতে যথাসময়ে বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ বসুমতী কার্য্যালয়ে আগমন করিতেন। তাঁহার উপর যে কর্তব্যভার ন্যস্ত হইত, তিনি নিজে শুধু তাহা পালন করিতেন না, অপর সকলে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতেছেন কিনা, তিনি তাহা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিতেন। আমরা তাঁহাকে খুবই বৃদ্ধ অবস্থায় দেখিয়াছি—শুনিয়াছি, তিনি সারাজীবন ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। বসুমতী কার্য্যালয়ে অন্য সকলে যখন গল্পগুজবে সময় কাটাইত, শ্রদ্ধেয় তিনকড়িবাবু সে সময়ে নিজের বা অপরের কাজ করিয়া যাইতেন। ৺সতীশচন্দ্র সেন নামক একজন বৃদ্ধও সে সময়ে দৈনিক বসুমতীতে লেখক ছিলেন। আমার সে যুগের সহকর্মী শ্রদ্ধেয় সুর্গাচরণ ঘোষাল কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। সে যুগে বহু তরুণ বন্ধু দৈনিক বসুমতীতে কিছুকাল কাজ করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে কাটোয়া কড়ুই নিবাসী, বর্তমানে উকীল শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী এবং বর্তমানে চাকুরিয়া নিবাসী সুপ্রবাসী সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের নাম নানা কারণে সর্বদা মনে পড়ে। তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও তিনি তাঁহার পিতা উপেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকে বর্তমান রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার কর্মজীবনের প্রথম দিকে তাঁহাকে তাঁহার আহিরীটোলা মিত্রঘোষাদীর লেনস্থ বাড়ী হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে দিনে ২ বার বসুমতী কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। সকাল ৭টায় আসিয়া বেলা ১২টায় চলিয়া যাইতেন, আবার বিকাল ৪টায় আসিয়া রাত্রি ১১টায় ফিরিতেন। তাহার পর যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তিনি পুরাতন বসুমতী বাড়ীর দ্বিতলে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা বৌবাজার ষ্ট্রীটের ১৬৬নং বাড়ীটি ক্রয় করিয়াছিলেন, সতীশবাবু পরে ১৬৪ ও ১৬৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের ২টি পুরাতন বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করেন। ১৬৬ নম্বরের পুরাতন বাড়ীর পিছনে প্রকাণ্ড টিনের সেড ছিল, সেখানে ও এক নূতন গৃহ নির্মিত হয়। বাংলাদেশে বসুমতীর কর্তৃপক্ষই প্রথম বহু অর্থব্যয়ে রোটারী মুদ্রণ যন্ত্র ক্রয় করেন—প্রতি ঘণ্টায় তাহাতে ১৬ পৃষ্ঠা কাগজ ৪০ হাজার ছাপা হইত। তাহার পর ক্রমে সকল সংবাদপত্রই রোটারী যন্ত্র ক্রয় করিয়াছেন। সতীশবাবুর অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা ছিল। মাসিক বসুমতী প্রকাশের পূর্বে তিনি তাহার বিজ্ঞাপন বাবদ বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ফলে ৫ হাজার মাসিক বসুমতী (প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রীত হইয়া যায়—প্রথম সংখ্যা আবার ৫ হাজার ছাপিতে হয় ও দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে ১০ হাজার করিয়া মাসিক বসুমতী ছাপা হইত; সে সময়ে বসুমতীর গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য বিক্রীত হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কর্ম সুলভ হওয়ার প্রামের লোক যেমন হাড়িকেন লণ্ঠন (তাহার পূর্বে অন্য রকমের লণ্ঠন প্রচলিত ছিল), ঘরের টিন প্রভৃতি ক্রয় করিতে আরম্ভ করে, তেমনই লোকের ঘরে, কাগজ প্রভৃতি কেনার প্রবৃত্তি ও বাড়িয়া যায়। আমি আগড়পাড়া হইতে রেলে ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছিলাম—দেখিতাম, ট্রেণের প্রত্যেক মোছলা গাড়ী ফিরিবার পথে দৈনিক বসুমতী কিনিয়া পড়িতেছে। অনেক সময় রাত্রিতেও কাজ করিতে হইত—সকালে বাড়ী ফেরার সময় ঐ বৃদ্ধ মেথিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

বসুমতীর পুস্তক প্রকাশ বিভাগও ঐ সময়ে বিরাট ভাবে বিস্তার লাভ করে। রাজস্থান, হাজার জিনিষ প্রভৃতি পুস্তক প্রতি সংস্করণে ১০ হাজার করিয়া ছাপা হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৭।৮ খণ্ডে বিভক্ত হইলে ও প্রত্যেক খণ্ড ৫ হাজার করিয়া ছাপিতে হইত। সে সময়ে মাইকেল, দীনবন্ধু, দামোদর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থাবলীও অতি সুলভ মূল্যে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে বিক্রীত হইত—এবং সুলভ বলিয়াই হাজার হাজার ছাপিতে হইত। ঐ সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলীও সতীশ বাবু খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। শরৎচন্দ্র তখন এত জনপ্রিয় হইয়াছেন, যে কোন খণ্ড প্রকাশের পর কয়েক দিনের মধ্যেই নিঃশেষে বিক্রীত হইয়া যাইত। সতীশ-বাবুর কর্ম শক্তিও যেমন অসাধারণ ছিল, অদৃষ্টও তেমনই সুপ্রসন্ন ছিল। তাঁহার ব্যবসা ঐ সময়ে সকল দিক দিয়া অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। ফলে তাঁহার পক্ষে আহিরীটোলা হইতে যাতায়াত অসম্ভব হইয়া পড়ে।

দৈনিক বসুমতীর অপূর্ব সাফল্যের যুগেই ৺সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ৺প্রফুল্লকুমার সরকার ও শ্রীযাদবলাল সেন—৩জন কর্মী মিলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ পত্রের সম্পাদক হন। আনন্দবাজার পত্রিকা যখন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইল, তখনই দৈনিক বসুমতীর প্রভাব ও প্রচার ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের পৌত্র ৺সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত ও স্টর্লেন নিবাসী খ্যাতনামা লেখক ৺কবীন্দ্রনাথ পাল ঐ কুলে প্রথমে মুরারীপুকুর হইতে প্রভাকর নামে ও পরে বৌবাজারস্থ চেরী প্রেস হইতে বেঙ্গলী নামে ২খানা দৈনিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেগুলি অল্পকাল স্থায়ী ছিল এবং সেগুলির সহিত আমার কর্মিত সংযোগ হইয়াছিল। কয়েক মাস বসুমতীর কাজ ছাড়িয়া আমি প্রভাকরে

কাজ করিতে গিয়াছিলাম। পরে হেমেন্দ্রবাবুর অনুরোধে সে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসি। সন্ধ্যায় বসুমতীর কাজ করিয়া কয়েক মাস বেশবাবুর কাজও করিয়াছিলাম। অর্থাভাবে সে সকল কাগজ টিকে নাই। মৌলবী এ কে-এজলুল হক সাহেব ইংরেজ যে সময়ে নবনুর নামক মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন, তখন এক সাহেবের অনুরোধেও হেমেন্দ্রবাবুর নির্দেশে আমি কয়েক মাস সেখানে ও কাজ করিয়াছিলাম। সে সময়ে মলিত গুপ্ত মহাশয় ওয়েলিংটন স্কোয়ার মোড় হইতে হিন্দুস্থান নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশ করিতেন—সে কাগজখানি কয়েক বৎসর চলার পর বন্ধ হইয়া যায়। দৈনিক বসুমতী যখন দৈনিক সংবাদপত্র, তখন কলিকাতার নায়ক ও বাঙ্গালীর বেশ প্রভাব হইয়াছিল। স্বর্গত সুধী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল নায়কের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মত অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব লিখনভঙ্গী খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু তিনি গঠন অপেক্ষা ভাঙ্গনের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্পাদিত কাগজ শুধু গালাগালির মুখপত্রেই পর্য্যবসিত হয় এবং পাঠক সমাজে আদর বা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সুন্দর বনের মাঝি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সুন্দর কর্নের স্রোত বক্ষ বিশ্ব ব্যাপি হাহাকার
এখানে আসিয়া গেছে চতুর্দ্দিকে অথৈ পাথার
নিঃসঙ্গতা ভয়ঙ্কর পরিক্রমা শূন্য প্রান্তরের
এখানে হয়েছে শেষ ; অভিশপ্ত এই অরণ্যের
উদাসীন উপেক্ষার গ্লানি আজ তরঙ্গে গভীর
অতলে কোথায় যেন প্রাণমন উঠিছে অস্থির।
দ্বীপে দ্বীপে লতা গুল্ম শাখা-প্রশাখায়
স্তিমিত জীবন যেন দিবস রাত্রির সীমানায়
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে প্রবলত কল্লোলে,
জীবধাত্রী ধরিত্রীর কোলে
জীবন-মৃত্যুর দোলা অবিরাম দোলে
সমুদ্র-উৎক্ষিপ্ত-স্রোত নিয়মিত জোয়ার ভাটায়,
এ কূলের কৌতূহল অবিশ্রান্ত ওকূলে জাগায়।
নামহীন চিহ্নহীন কোনো এক দিগন্তের সনে
রয়ত রয়েছে কোনো গভীর রহস্য সুগোপনে।
কোনো দিন কোনো রাত্রি দিবেনাক সন্ধান তাহার
রয়ে আছে একাকার
জল-স্রোতে—অরণ্যে ও দ্বীপে।
তাহার সমীপে
ছোট ছোট নৌকাগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে তারার মতন
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, সহসা যখন
দক্ষিণ সমুদ্র হতে হাওয়া আর ঢেউ এসে লাগে
হয়ত তাদের মনে জাগে
অতীতের সুখস্মৃতি আবর্ত্তিত ফেনপুঞ্জময়
মুহূর্ত্তে উদ্ভব তার মুহূর্ত্তে বিলয়।

ছোট সেই গ্রামখানি, ছোট ছোট কুটির প্রাঙ্গণ
তারি কাছে লেগেছে তাঙন,
হয়ত বা সারাদিন গৃহকর্ম্মে ক্লান্ত মুখখানি
ভেসে ওঠে চিত্তপটে ; বিদায়ের বাণী—
ছিল না কিছুই তার সেদিন প্রভাতে
শুধু দুটি অশ্রুকণা ছিল আঁখিপাতে।
ছোট ছোট শিশুদের মলিন মুখের ছায়া পড়ে
তাদের নয়নে মনে : কত আশা ভাঙে আর গড়ে।
সুন্দর বনের মাঝি বাঘের বাসার কাছ দিয়ে
উদয়াস্ত হাল টানে, ছোট তার নৌকাখানি নিয়ে।
জানেনাক ভয় কারে বলে
আসন্ন সন্ধ্যার পানে নৌকা তার হেলে-দুলে চলে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সাহেবগঞ্জে মামা বেশ পশার জমাইয়াছিলেন। প্রত্যহ অনেক রোগী তাঁহার ডিস্‌পেনসারিতে আসিত। তিনিও প্রায় প্রত্যহ বাহিরে রোগী দেখিতে যাইতেন, কখনও মিরজাচৌকিতে, কখনও পীরপৈতিতে, কখনও সকরিগলিতে। গঙ্গার ওপরেও তাঁহার নাম ডাক হইয়াছিল, সেখানকার অনেক গ্রাম হইতেও তাঁহাকে ডাকিতে আসিত! নৌকা করিয়া যাইতেন, কখনও কখনও একাধিক দিন তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। মোট কথা, তিনি ওঅঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম তখন মামা ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নূতন বাড়ি কিনিলেন। সেই বাড়ীতে আমরা উঠিয়া গেলাম। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করিয়া অনেক লোক খাওয়ানো হইয়াছিল। সেই সময় সাহেবগঞ্জের বাঙালী পরিবারের অনেককে দেখিলাম, অনেকের সহিত পরিচয়ও হইল।

সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বরদাবাবু সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র আনন্দ, মন্মথ এবং বসন্ত। মন্মথ আমার সমবয়সী ছিল। যখন দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হইলাম তখন দেখিলাম সে আমার সহপাঠীও। বসন্তর তখন সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে। আনন্দ-দা পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়াছেন। ঘটক পরিবারের এবং বাগচী পরিবারের সকলেও আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরথবাবুও সে উৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিভাবকের মতো তিনি আসিয়া সব দেখাশোনা করিতেছিলেন। বস্তুত, তাঁহারই আনুকূল্যে মামার পশার এত শীঘ্র বাড়িয়াছিল। মামার নূতন বাড়িটিও তিনি চেষ্টা করিয়া সস্তায় কিনাইয়া দিয়াছিলেন। ইহারা ছাড়া সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কর্মচারীরা, পোস্টমাস্টারবাবু, থানার দারোগা ও কনেস্টেবলগণ, মামার রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা, স্কুলের পাঠশালার শিক্ষকেরা, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দে উৎসবে সমস্ত বাড়িটা যেন গমগম করিতেছিল।

সেই সময়ই দীনুপণ্ডিতকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ও রকম বোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত লম্বা লোক আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই। তিনি বারন্দার একধারে একটি বেঞ্চির উপর বহুক্ষণ আগেই আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং শহরের কোনও গণ্যমান্য লোক আসিলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে কোনও জামা ছিল না। কাঁধে একটি সাধারণ চাদর, পরণে খান কাপড় এবং পায়ে একজোড়া লাল চটি-জুতা। বাঁ হাতে কনুইয়ের ঠিক উপরে কালো সুতা দিয়া একটি মাদুলি বাঁধা ছিল, মাথায় টিকিও ছিল। মাথার চুল করম ছাঁট। দীনু পণ্ডিতকে এই বেশেই বরাবর দেখিয়াছি। তাঁহার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে পাদা পিচুটি জমিয়া থাকিত। তিনি কেন যে তাহা পরিষ্কার করিতেন না, জানি না। সেকালে অনেকে দাড়ি কামাইত, কিন্তু যুগপৎ গোঁফ-দাড়ি কামানো প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর অবশ্য শ্রাদ্ধের সময় সকলে মাথার

চুলের সহিত গোঁফ-দাড়িও কামাইয়া ফেলিত, কিন্তু নিয়মিতভাবে ক্লিন-শেভড্ হইবার আগ্রহ কাহারও তেমন ছিলনা: দীনু পণ্ডিতের মুখে গোঁফ-দাড়ি না দেখিয়া আমি ভাবিলাম—সম্ভবত উঁহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই জানিতে পারিলাম, তিনি নাকুল এবং জাতিতে কৈবর্ত্ত। দীনু পণ্ডিতের বর্ণনা একটু বিশদ করিয়া দিলাম, কারণ তাঁহার স্মৃতিটা এখনও মনের মধ্যে ঝলমল করিতেছে। শৈশবে তাঁহার হাতে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি; দিদিও দিদিমা আমার সহায় ছিলেন, তবু তাঁহার প্রবল প্রকোপ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল, কেহই পাইত না। সেইদিনই বরদাবাবুর মেজছেলে মন্মথর সহিত আমার আলাপ হইল। আলাপ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইতে বেশী দেরি হইল না। সেই আমাকে আড়ালে ডাকিয়া দীনু পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিল, "ওই লোকটিকে চিনে রাখ। কিছুদিনের মধ্যেই ওর গপ্ পরে পড়তে হবে তোমাকে"

"উনি কে—"

"দীনু পণ্ডিত। এখানকার পাঠশালায় পড়ায়"

"গোঁফদাড়ি কামানো কেন"

"শালা নাকুল, জাতে কৈবর্ত্ত"

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'শালা' বলিতেছে। দীনু পণ্ডিতের সঙ্গে পরে যখন বন্ধিতর পরিচয় হইল তখন এই বিস্ময়ভাবটা আর রহিল না। অনেকে তাহাকে আরও অশ্লীলভাষায় গালাগালি দিত। সত্যই লোকটি নর-রূপী পশু ছিল। ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্যই শিক্ষকেরা শাস্তি দেন। দীনু পণ্ডিত কিন্তু শাস্তি দিতেন বড়লোকদের খোশামোদ করিবার জন্য; কথাটা অদ্ভুত শুনাইতেছে, কিন্তু কথাটা সত্য। সাধারণত বড় গভর্ণমেণ্ট অফিসার বা রেলওয়ে অফিসারদের খোশামোদ করিতেন তিনি। রেলি কোম্পানীর বড়বাবু মুকুন্দবাবুকেও এবং থানার দারোগা কার্ত্তিকবাবুকেও করিতেন। তখন এস-ডি-ও ছিলেন সুধাকান্ত সেন এবং ডি-টি-এস আপিসের বড়বাবু ছিলেন রসময় রায়। দীনু পণ্ডিত ইঁহাদের গোলাম ছিলেন। কোনও কারণে ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি শহরের কাহারও উপর অপ্রসন্ন হইতেন দীনু পণ্ডিত তাহার শোধ তুলিতেন তাহাদের ছেলেদের পিঠের উপর! অর্থাৎ বড় অফিসারদের শত্রু দীনু পণ্ডিতেরও শত্রু স্থানীয় ছিল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের শাসন করিবার ক্ষমতা দীনু পণ্ডিতের ছিল না, তিনি নির্য্যাতন করিতেন তাঁহাদের ছেলেদের। মন্মথর বাবা বরদাবাবু মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বলিয়া দীনু পণ্ডিত তাঁহাকে খোশামোদ করিতেন। সুতরাং মন্মথ এবং বসন্ত তাঁহার বেত্রাঘাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। মন্মথ কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চিনিত, কারণ চেয়ারম্যান হইবার পূর্ব্বে বরদাবাবুর সহিত কার্ত্তিকবাবুর ঝগড়া হয়। বরদাবাবু তেজস্বী লোক ছিলেন। কার্ত্তিক-বাবু একটি লোককে অন্যায়ভাবে গ্রেফ্তার করাতে বরদাবাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। এই লইয়া শহরে কিছুদিন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বরদাবাবু সেই লোকটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া মকোর্দ্দমা পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন এবং মকোর্দ্দমায় জয়লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য বেচারা মন্মথকে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রত্যহ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দীনু পণ্ডিত যে বড়লোকদের খোশামোদ করিতেন তাহার একটা সঙ্গত কারণও ছিল। অপোগণ্ড পাঁচটি পুত্র ছিল তাঁহার। একটিও উচ্চশিক্ষা লাভ করে নাই। তাহাদের কোথাও কোনও কাজে ঢুকাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একজন আবগারি কমিশনারকে খোশামোদ করিয়া বড় ছেলেটিকে আবগারি বিভাগে ঢুকাইতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শামুক আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহারও লেখাপড়ায় তেমন মাথা ছিলনা, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। সে খুব ভালো ম্যাজিক দেখাইতে পারিত। ক্যারিকেচার করিবার ক্ষমতাও ছিল তাহার। পরবর্ত্তী জীবনে এই সব করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিত সে।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আমার সমবয়সী অনেক বাঙালী ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মন্মথর সহিত বন্ধুত্বটা একদিনেই যেন জমিয়া গেল। এ বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

সেদিনের আর একটি ঘটনাও আমার স্মৃতি-পথে এখনও জাগরূক আছে। আমার বিবাহের ঘটক শিবু ঘটকের দাদা মধু ঘটক সাহেবগঞ্জে গোলাদারি কারবার করিতেন

ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারই পরামর্শে মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসিয়াছিলেন, কিছুদিন ইঁহার বাড়িতেও ছিলেন। এই মধু ঘটককে সেদিন আমি প্রথম দেখিলাম এবং তাঁহার চরিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মধু ঘটকের চেহারা ছিল পাতলা ছিপছিপে লম্বা ধরণের। পরণে হাতকাটা লংক্লথের ফতুয়া এবং আদা থান। কানে খড়কে গোঁজা। মাথার চুলগুলি ঘনবিবদ্ধ নয়, যে গুলি আছে তাহাও পাকা, কিন্তু সুবিন্যস্ত। পাকা সরু গোঁফটিও সুরক্ষিত। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, চোখের তারা নীল, চোখের দৃষ্টি খুব উজ্জ্বল এবং মর্ম্মভেদী। মুখটিও ছোট, কিন্তু মুখের ভাব বেশ গম্ভীর। সর্ব্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছেন, দুনিয়াটাকে সর্ব্বদাই যেন ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। মন্মথই সেদিন দূর হইতে মধু ঘটককেও চিনাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওই ঘটক মশাই। লোক খুব সাঁচ্চা, কিন্তু বড় তিরিক্ষে। ওর কাছে পারতপক্ষে আমরা ঘেঁসি না। দেখা হলেই পড়া জিগ্যেস করেন, না পারলে বকেন। ব্যাকরণ-ট্যাকরণ এখনও সব মুখস্থ—"।

একটু পরেই শুনিতে পাইলাম পাশের ঘরে মামার সহিত মধু ঘটক কথা বলিতেছেন।

"রান্না বান্না কি সব রাঁধুনী বামুনই করছে"—মধু ঘটক মামাকে প্রশ্ন করিলেন।

"কোলকাতা থেকে চার জন রাঁধুনী আনিয়েছি। এখানকার জন দুই আছে। উমেশ আর দুনিয়ালাল"

"এত হৈ হৈ না করলেই পারতে। বৌমা চারটি শাকান্ন রেঁধে দিলে আমরা তৃপ্তি করে' খেতাম। আচ্ছা, আমি এখন উঠি তাহলে। কাল আবার আসব"

"আপনি খেয়ে যাবেন না?"

"না, আমি রাঁধুনী বামুনের হাতে খাই না। থাক্, আমার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি তো ঘরের লোক"

"না, না, সে কি হয়। আজকের দিনে আপনি না খেয়ে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে যে। খেতে হবে আপনাকে—"

"নিতান্তই যদি না ছাড় তাহলে বৌমাকে একটু আলাদা করে' চারটি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে বল। বেশী কিছু হাঙ্গামা কোরো না যেন—"

তাহাই হইল। উৎসবের দিন মামীমা নৌতুন কাপড় পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মামার আদেশে তাঁহাকে সে সব ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে হইল। মামা নিজে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রান্নাঘরটি গোবর এবং গঙ্গাজল দ্বারা পরিশুদ্ধ করাইলেন। মামীমাকে সেই সাঁতসেঁতে রান্নাঘরে বসিয়া ঘটক মহাশয়ের জন্য নিরামিষ পঞ্চ ব্যঞ্জন ও মিহি আতপ চালের ভাত রান্না করিতে হইল। আমার মা অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মা-ই অনায়াসে সব রাঁধিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ঘটক মহাশয় যখন মামীমার নাম করিয়া বলিয়াছেন তখন মামীমাকেই রাঁধিতে হইল। রান্না তত ভাল হয় নাই, কিন্তু ঘটক মহাশয় অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে আহার করিলেন। ঘটক মহাশয়ের চারিত্রিক অনমনীয়তার আরও পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তিনি লোক খুব ভালো ছিলেন। নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চাহিতেন, কোনও কারণেই তাঁহাকে শমতের বিরুদ্ধে লওয়া যাইত না।

সেদিন আরও দুইটি অদ্ভুত ধরণের চরিত্র দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। দুইজনেই স্ত্রীলোক। একজন ভৈরবী-মা, আর একজন সিপাহী-ঠাকরুণ। ভৈরবী-মা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, মামার সহিত তাঁহার কি সূত্রে পরিচয় তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শুধু আমি কেন, অনেকেই। সে চেহারার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। টক্‌টকে গৌরবর্ণ মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, হাতে ত্রিশূল, পরিধানে গৈরিক, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের টিপ। সম্ভবত পূর্ব্বে নাকছাবি পরিতেন, ডান নাকের পাতায় একটি ছিদ্র ছিল। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে কোনরূপ অলংকার বা বিলাসের কোন নিদর্শন ছিল না। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। পরে তিনি আমার জীবনে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনের সেই বিস্ময়ভাব কখনও কাটে নাই। তিনি আজও আমার নিকট প্রহে-

শিকার মতো রহস্যপূর্ণ। তিনি একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন, ডান পায়ের কয়েকটি আঙুল বাঁকা ছিল, শুনিয়াছিলাম কেদার-বদরি তীর্থ করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফলেই আঙুলগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্যও সেদিন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি সর্ব্বদা আকাশের তলায় থাকিতেন। ঘরে, এমন কি তাঁবু বারান্দাতেও থাকিতেন না। গ্রীষ্মকালের দিনে গাছের ছায়ায় থাকিতেন, শীতকালে রাত্রে ছোট একটু ধুনী জ্বালাইয়া লইতেন। খাওয়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও রান্না জিনিস খাইতেন না। সাধারণত ফল মূল কাঁচা দুধই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র আহার করিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল।

মামা আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এইটি আমার ভাগ্‌না"

"ও, কেদারের ছেলে ?'

"হাঁ"

মামার আদেশে তাঁহাকে আমি প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্তটি অনেকক্ষণ রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার পর বলিলেন, "এ লক্ষণযুক্ত ছেলে, উন্নতি করবে"

মামা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখ, এঁর জন্যে ফল আনা হয়েছে কি না"

তাঁহার জন্য নানাবিধ ফল আসিয়াছিল। সেগুলি একটি ছোট ঝুড়ি করিয়া লইয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম মামা বলিতেছেন, "জামাইবাবু কোথায় যে চলে গেলেন আবার। একটা চিঠি পর্য্যন্ত লেখেন নি"

ভৈরবী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও তো সংসারে থাকবার লোক নয়। তবে আসবে আবার। ওর ভোগ কিছুদিন আছে এখনও"

মামা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যাও"

আমি পুনরায় চলিয়া গেলাম। মামা ভৈরবী মায়ের সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল ভৈরবী মা বাবাকে যখন চেনেন তখন হয়তো তাঁহার সহিত নিগূঢ় কোন যোগাযোগও আছে। কিন্তু কি প্রকার যোগাযোগ তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

সিপাহী ঠাকুরুণের সহিতও সেদিন কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল। মন্মথই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

"ওই দেখ, সিপাহী ঠাকুরুণ। জানিস, ও মেয়ে-মানুষ—"

"মেয়েমানুষ! তাই না কি"

"হাঁ, লুকিয়ে পুলিশে কাজ করত, ধরা পড়ে' গেছে"

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া লোকটিকে মেয়েমানুষ বলিয়া মনে করা সত্যই শক্ত। পোষাকও পুরুষের পোষাক, ফিতা-হাতা গেরুয়া-রঙের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি, মাথায় হনুমদ্রঙের প্রকাণ্ড পাগড়ি। পাগড়ির লেজটি বেণীর মতো পিঠের উপর ঝুলিতেছে। পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটি বেঁটে মোটা লাঠি, লাঠির প্রত্যেকটি গাঁটে পিতলের তার-জড়ানো, চোখে গগলস্। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ না কি পুরুষের ছদ্মবেশে মিলিটারিতে ভরতি হইয়াছিল, ভরতি হইবার সময় কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তাহার পর কোথায় যেন যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে উরুতে গুলি লাগিয়া সিপাহী ঠাকুরুণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। স্ট্রেচারে করিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে বোঝা গেল যে তিনি স্ত্রীলোক। তাঁহার বীরত্বে সাহেব-জেনারেল খুব খুশী হইয়া ছিলেন, তাঁহার একটা মোটা রকম পেন্‌সন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই পেনসন লইয়া সিপাহী ঠাকুরুণ এখানকার থানার জমাদার পাঁড়েজির বাসায় থাকেন। পাঁড়েজি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকুরুণ কনেষ্টেবলদের সঙ্গে রাত্রে রোঁদও দেন। কিছুদিন আগে একটা চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, কিন্তু ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসেন।

বাংলাও বলিতে পারেন, মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথাও বলেন। ড্যাম, স্টুপিড, ভেরী গুড—এই তিনটি কথা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যায়। আর একটা আশ্চর্য্যজনক কথাও মন্মথ সেদিন বলিয়া ছিল।

"ওই দীনু পণ্ডিতও ওঁকে ভয় খায়। বদ্রু বলে' একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। তাকে দীনু পণ্ডিত খুব মেরেছিল, অথচ বেচারার তেমন কোন দোষ ছিল না।

বহু বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাচ্ছিল, রাস্তায় সিপাহী ঠাকরুণের সঙ্গে তার দেখা। সিপাহী-ঠাকরুণ সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তার কান আর পিঠ দেখলেন। কান রক্তাক্ত পিঠে বেতের দাগ। তখন কিচ্ছু বললেন না। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই তিনি হাজির হয়েছিলেন দীনু পণ্ডিতের বাসায়। দীনু পণ্ডিতকে কান ধরে পঁচিশবার উঠবোস করিয়ে ছিলেন।"

মন্মথর এ উক্তি কতদূর সত্য তাহা জানি না। মন্মথর কথা বাড়াইয়া বলিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পরে পাইয়াছি। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিল সে। কিন্তু দীনু পণ্ডিত যে সিপাহী-ঠাকরুণকে ভয় করিতেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের পাঠশালা ভিজিটও করিতেন, অর্থাৎ সহসা কোন কোন দিন পাঠশালার সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া পাঠশালার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। সিপাহী ঠাকরুণকে ওই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে দীনু পণ্ডিতের ভাবান্তর হইত, মুখভাব অবর্ণনীয় হইয়া উঠিত। মুখে একটা ভয়-ভয় অথচ হাসি-হাসি ভাব ফুটাইয়া তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতেন—'মন দিয়ে লেখা-পড় কর বাবারা, আখেরে তোমাদেরই ভাল হবে।' বলিতেন এবং আড়চোখে সিপাহীঠাকরুণের দিকে চাহিতেন।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আরও তিনটি লোক দেখিয়াছিলাম, যাহাদের কথা এখনও ভুলি নাই। প্রথম লোকটি কেষ্টু পুরুত। থলথলে চেহারার লোকটি। মুখটি হাঁড়ির মতো বড়, চোখ দুটি ঈষৎ কটা এবং টানা টানা। মুখটি ফোলা-ফোলা। দুই গালে এবং চিবুকের তলায় মাংস থলথল করিতেছে, সামান্য উত্তেজনাতেই সেগুলি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে সেগুলির ভিতরে জীবন্ত যেন কিছু আছে। তিনি ঘটক মহাশয়ের সমস্ত ব্যাপারীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মামার অনুরোধে অঘোরবাবু কেষ্টু পুরোহিতকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। খাইতে বসিয়া কেষ্টু পুরুত তাক লাগাইয়া দিলেন সকলকে। মামার এক জেলে রোগী অনেক তিতল মাছ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল। প্রায় তিন চার মণ। কেষ্টু পুরোহিত পুরা আহারের পর একুশখানি তিতলমাছের পেটি উদরস্থ করিলেন! যে পংক্তিতে তিনি বসিয়াছিলেন সে পংক্তির লোকেরা তাঁহার খাওয়া দেখিয়া খুব খুশী হইলেন, 'আরও খান', 'আরও খান' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।··· পরদিন প্রভাতে দেখিলাম চার পাঁচজন লোক উঠানে বসিয়া পা ধুইতেছে, তাহাদের পায়ে প্রচুর কাদা। শুনিলাম উহারা কেষ্টু পুরুতকে পুঁছাইয়া ফিরিয়াছে। আহারের ঘণ্টাখানেক পর হইতেই কেষ্টুর বমি-বমি শুরু হয়। ভোর হইতে না হইতে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শঙ্খ-মামা। একটি ছোট ন'হাতি কাপড় পরিয়া, কপালে নিজের পৈতাটি কষকসে করিয়া বাঁধিয়া তিনি বাড়ির ভিতর বারান্দার এক কোণে একটি মোড়ার উপর বসিয়া 'ওঃ' 'ওঃ' শব্দ করিতেছিলেন। মুখময় খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি, নাসারন্ধ্র হইতে চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে, কপালে রগে সাদা সাদা কি একটা লাগাইয়াছেন। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। মামা একবার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"শেঁকো। তুই এমনভাবে এখানে বসে' কোঁতাচ্ছিস কেন। মাথা ধরেছে তো শুয়ে পড়গে যা না—"

শঙ্খমামা কোনও জবাব দিলেন না, আরও বার দুই 'ওঁ' 'ওঁ' শব্দ করিলেন কেবল। মামা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্খমামা তখন নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া মামীমাকে বলিলেন—"ওঁ বৌদি দাদা শুঁতে বললে আমাকে। যেঁতে দাও, শেঁয়ে শুঁয়ে পড়ি"। একটু পরেই মামীমা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। দেখিলাম মাথা-ধরার জন্য তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হয় নাই। প্রচুর আহার করিলেন। তাহার পর কোঁথাইতে কোঁথাইতে গিয়া একটা ঘরে শুইয়া পড়িলেন। শঙ্খমামাকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, ঠিক ওই এক চেহারা, এক ধরণ। কোনও ভোজবাড়ির নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু ভোজ-বাড়িতে গিয়া পাছে কোনও কাজ করিতে হয় তাই মাথা-ধরার ভান করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং মাথায়

পৈতা বাঁধিয়া, কপালে চন্দন লাগাইয়া 'ওঁ' 'ওঁ' শব্দ করিতেন।

তৃতীয় যে লোকটি সেদিন আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে সকলে দালাল মশায়' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আসল নাম দেবেন ভট্টাচার্য্য। বহু ঘটকের যে ব্যবসায় ছিল, তাহাতে তিনি পাটের দালালি করিতেন। দীর্ঘ ঋজু-দেহ, গৌরবর্ণ। ভীড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নাকটি বেশ বড় ও সুচাগ্র, চক্ষু বুদ্ধি-দীপ্ত, পাতলা ঠোঁটে চাপা হাসি। সেদিন ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে শেষের দিকে একটা জায়গা খালি ছিল। কে একজন বলিল, 'বংশীবাবু আপনি বসে পড়ুন ওখানে।' বংশীবাবু একজন প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি' কোন-এক জমিদারের নায়েব তিনি, দালাল মহাশয়কে পাটসংগ্রহ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার এলাকায় যাইতে হয়। বংশীবাবুকে খুশী রাখিলে তাঁহারই সুবিধা। কিন্তু দালাল মশাই ইহাতে আপত্তি করিলেন।

"বংশীবাবু, ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে বসবেন কি করে'। উনি যে বস্তি—"বংশীবাবুর স্তাবক হরিহর বলিলেন, "কিন্তু সমাজে বস্তিরা আজকাল ব্রাহ্মণ বলে' স্বীকৃত হয়েছেন, বংশীবাবু আচারে ব্যবহারে প্রকৃত ব্রাহ্মণও, তাঁর পৈতে আছে, অত গোঁড়ামি আজকাল অচল—"

দালাল মশায় ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যদি স্যাকরাকে দিয়ে একটা সোনার মুকুট তৈরি করিয়ে মাথায় পরে' বেড়ান, আপনাকে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে দেবে?"

হরিহর যে লোকটি কুৎসিৎ-দর্শন এবং বেঁটে। তিনি মাথায় সোনার মুকুট পরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত এক টেবিলে খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বংশীবাবু মানী ব্যক্তি, তিনিও ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন একটু, কিন্তু সামলাইয়া লইলেন।

"না, না, দালাল মশাই ঠিকই বলেছেন, আমি আলাদাই বসব।

সামাজিক ব্যাপারে সাবেক প্রথা মেনে চলাই নিরাপদ"

হরিহর যে-কে মৃদুকণ্ঠে বলিতে শোনা গেল—"এই জন্যেই তো দলে দলে ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছে সব"

পঙ্‌ক্তি ভোজন সম্বন্ধে এই ধরণের কড়াকড়ি আজকাল কেহ ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু সে যুগে ইহা সকলে মানিয়া চলিত। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্য্যাদা ছিল তখন। এখনও সেই সাবেক-প্রথা চালু আছে, কিন্তু ভিন্নরূপে। এখন কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ধনীরা এখন এক পঙ্‌ক্তিতে বসে, এক সঙ্গে আহার-বিহার করে, গরীবদের সেখানে স্থান নাই। দালাল মহাশয় পঙ্‌ক্তির ব্যাপারে সেদিন ওই কাণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভিন্নজাতের লোকেদের যে ঘৃণা করিতেন না ইহাও আমি পরে দেখিয়াছি, এমন কি অনেক মেথরকে তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন, তাহাদের সহিত তাঁহার মেয়ের সম্বন্ধও ছিল। কিন্তু কোন-প্রকার বাহাদুরি বা চালিয়াতির গন্ধ পাইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নিজের গ্রামে তিনি এই কাণ্ডটি করিয়াছিলেন। তখন ট্যাঁক-ঘড়ি নামে এক প্রকার ঘড়ির খুব প্রচলন হইয়াছিল। ছোট-ঘড়ি, ডালা বন্ধ, ঘড়ির মাথার কাছে একটু চাপ দিলেই ডালাটা লাফাইয়া ওঠে। ঘড়িটি সাধারণত ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখা হইত। দালাল মশাই নিজের গ্রামে একদিন সকালে আকাশের দিকে চাহিয়া সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। গ্রামের তপু নাপিতের ছেলে ঝপু আসিয়া উপস্থিত হইল। তপু নাপিত হইলেও গরীব ছিল না। জমিজমা কিছু ছিল, একটি মনিহারি দোকানও ছিল। ঝপু কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় গিয়া কোনও সদাগরি আপিসে একটি চাকরিও জোগাড় করিয়াছিল। তাহার দিকে একনজর চাহিয়াই দালাল মশায় চটিয়া গেলেন। দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাটা, গলায় ফুলদার কম্‌ফর্টার, পায়ে মোজা ও বুট জুতা।

"আকাশে কি দেখছেন দালাল মশাই"

"বেলা কত হল তাই ঠিক করছি"

"এই যে দেখে নিন"

ঝপু ট্যাঁক হইতে ট্যাঁক-ঘড়ি বাহির করিয়া দালাল মহাশয়ের প্রায় নাকের কাছে তাহা লইয়া গেল। স্প্রিং টিপিতেই ডালাটা লাফাইয়া উঠিল। দালাল মশাই

চমকাইয়া উঠিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শালা, আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছিস তুই—"

ঝপু দালাল মহাশয়কে চিনিত। সে প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দালাল মশাইও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাইল ছুটিয়া ঝপুকে তিনি ধরিলেন এবং কান মলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন···

গগনের ডাক শুনিয়া কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিল।

"দাদুকে পরীক্ষা করে' দেখলুম। দাদুর রক্তটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় লোক পাঠাতে হবে। এখানে হবে না"

"সিভিল সার্জন তো সে কথা বললেন না কিছু"

"বলা উচিত ছিল"

"কাটিহারে বাবার রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছিল একবার। ব্লাড শুগারও দেখেছিল। তুই দেখেছিস রিপোর্টগুলো ?"

"দেখেছি। আমি W. R. করাতে চাই—"

"সেটা আবার কি"

"রক্তে সিফিলিসের কোন বিষ আছে কিনা সেটা দেখা দরকার"

কুমার অবাক হইয়া গেল।

"সিফিলিসের বিষ ? পাগল না কি তুই"

"খুব সম্ভবত কিছু নেই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে ওটা দেখে নেওয়া উচিত। ওটা একটা রুটিনের মধ্যে। আমি রক্ত নিয়ে সিরাম বার করে' দিচ্ছি—কেউ নিয়ে চলে' যাক্। যাবার মতো লোক নেই কেউ ?"

"লোক আছে। চল দেখি, বাবা আবার কিছু মনে করবেন না তো"

কথাটা শুনিয়া সূর্য্যসুন্দর কিন্তু খুব খুশী হইলেন।

"গগন ঠিকই বলেছে। W. R. করা উচিত। একবার একটা রোগীর বিউবো কাটতে গিয়ে আমার আঙুলের কোনে ছুরির খোঁচা লাগে। বগলের গ্ল্যাণ্ড-গুলো খুব ফুলে ওঠে, জ্বর হয়। তখনকার দিনে এর যা চিকিৎসা ছিল তা করেছিলাম, তবু দেখে নেওয়া ভালো। দাদু আমার বুদ্ধিমান ডাক্তার হয়েছে দেখছি—"

সেই দিনই রক্ত লইয়া একজন লোক কলিকাতা চলিয়া গেল। ক্রমশঃ

কবিকঙ্কণে বৈষ্ণববাদ

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চৈতন্যদেবের পরে বাংলাকাব্যের যে যুগ আসে, ঐতিহাসিকেরা তার নাম দিয়েছেন 'সংস্কার-যুগ' ; কিন্তু, মনে হয় এই যুগকে প্রাচীন হিন্দু ভাব-ধারার পুনরুত্থান যুগ বলাই সঙ্গত।···

চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রভাবে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এক অভিনব প্রাণ-শক্তির সঞ্চার হয়েছিল।—মনসা, শিব, সূর্য্য প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবীগণের মঙ্গল বা পাঁচালী, রামায়ণ ও অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ-কাব্য, অথবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বৈচিত্র্য অবলম্বনে পদাবলী রচনা করা ছাড়াও যে আধুনিক কালের মনুষ্যগণের প্রত্যক্ষ জীবন-চরিতও বিশাল কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ হতে পারে—এ জিনিষটা তার আগে কারো ধারণা বা বিশ্বাসের যোগ্য না থাকলেও, চৈতন্যদেবের চরণ স্পর্শে বঙ্গসাহিত্যের সেই নিরুদ্ধস্রোত নবজীবনের স্পন্দনসহ প্রবাহিত হয়—যার ফলে, পঞ্চদশের লৌকিক ধর্ম্ম-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য যেন ভেসে যায়! এবং, চৈতন্য-চরিতা-মৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি কেবলমাত্র চৈতন্যদেবের জীবনালেখ্যই নয়, নরোত্তম প্রভৃতি তাঁর বহু শিষ্যপ্রশিষ্যের জীবনাখ্যানও এই সময় বঙ্গসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত করে দেয়! বস্তুত, রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীতও যে মহৎ মনুষ্য-চরিত্র গঠিত হতে পারে এই সত্য আমাদের জীবনে সু-প্রতিষ্ঠিত হয়!··

কিন্তু এ'র অব্যবহিত পরবর্ত্তী-যুগেই হল আবার তার প্রতিক্রিয়া। কারণ, নতুনের প্রতিষ্ঠা হ'লেও প্রাচীন একেবারে বিলুপ্ত হবার জিনিষ নয়। সে-টুকু ভাল, সমাজে বা সাহিত্যে সাময়িকভাবে তা বিস্মৃত বা উপেক্ষিত হলেও, তা লুপ্ত হয় না—পুনঃ পুনঃ তা'র সৌরভ ও সত্তা

প্রকটিত হবার সুযোগ গ্রহণ করে।...বৈষ্ণবযুগের অবসানে বঙ্গসাহিত্যে আবার রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতির নতুন সংস্করণ লিখিত হ'ল। গ্রাম্য শক্তিদেবতার মঙ্গলগুলি কাব্যে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হল। আর, এই উপলক্ষে বাংলা-কাব্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের এমন কতকগুলি খাঁটি ছবি—সুন্দর ও বিষদাকীর্ণ ছবিও অঙ্কিত হ'ল, যা' বৈষ্ণব চরিত-কাব্যেও প্রতিফলিত দেখা যায় না।—কোন মহৎ বা আদর্শ চরিত্র নয়,—অতি-সাধারণ, পরিচিত সরল ও স্বাভাবিক জীবনই হচ্ছে তা'দের উপাদান।...

এই 'সংস্কার' বা 'পুনরুত্থান'-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরামরচিত চণ্ডীমঙ্গলই সর্বোত্তম।—কলিঙ্গ দেবী চণ্ডিকা স্বপ্নে এই কাব্য রচনা করতে আদেশ দেন এবং ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের আনুকূল্যে কবি এই কাব্য সমাপ্ত করেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়—বৈষ্ণবধর্মের যে প্রতিক্রিয়া প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক সূচিত হয়েছিল, সেই নব-জাগ্রত শক্তিপূজার মাহাত্ম্য-কীর্তন করবার জন্যই কবিকঙ্কণ লেখনী ধারণ করেছিলেন;—কিন্তু যে অপূর্ব মানুষটিকে ঘেরে বঙ্গের জাতীয়-জীবনে গভীর বিস্ময় ও ব্যাকুলতা জন্মেছিল,—যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকারী ব্রাহ্মণে ও সর্বনিম্ন অবহেলিত চণ্ডালে সমভাবে নবচেতনার প্রীতি ঢালিয়ে দিয়েছিলেন,—যাঁর গৌর-কান্তিতে বৈষ্ণব-প্রতিভার বিকাশ ও সরল-চক্ষে আশ্চর্য ভক্তির প্রভা,—সেই বাঙ্গালীর হৃদয়-অমৃত-মথন-জাত, অলৌকিক, উচ্ছ্বাসময়, ভাব-দেহ অনুষ্ঠান নরদেবতার প্রভাব অতিক্রম করা অতি নিকটবর্তী সময়ের—মাত্র কয়েক দশক অন্তরের কোনও কবির পক্ষেই অসম্ভব। মুকুন্দরামের মত মহাকবির হৃদয়ে সে-ছবি তো বিশেষ উজ্জ্বল থাকবেই! তাই আমরা দেখি—একটু অসম্ভব বা আশ্চর্য মনে হ'লেও—শক্তিপূজা-প্রচার-কারণে কাব্য রচনা করলেও, দেবী মাহাত্ম্য-বর্ণনা উদ্দেশ্য হলেও, —মুকুন্দরামের কাব্যে বৈষ্ণবত্ব অর্থাৎ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রচারিত প্রেম-ধর্মের প্রভাব, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা—তাঁর জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক—বিজড়িত হ'য়ে রয়েছে! কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যখানি তাঁর অন্তরের সেই গোপন আকুলতার কথাটি মনে রেখে, সযত্নে পাঠ করলেই তাতে এমন অনেক কিছু পাওয়া যাবে—কবি-মানসের ভাব-বৈশিষ্ট্য যেখানে প্রচ্ছন্ন থাকে নি!...

—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে দুটি উপাখ্যান আছে,—প্রথমটি কালকেতু নামক ব্যাধের উপাখ্যান—অপরটি শ্রীমন্ত সদাগরের। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র কালকেতুর উপাখ্যানটি অনুসরণ ক'রেই কবিকঙ্কণের চৈতন্য-ভক্তির তথা বৈষ্ণব-প্রীতির পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে!—

তৎকালীন প্রথামত কবি কাব্যারম্ভের প্রথমে গণেশ দেবতার বন্দনা ক'রেছেন। এই গণেশ-বন্দনাতেই কবি লিখছেন—

...গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।...

সুতরাং, একটু আশ্চর্য হ'য়েই এখানে লক্ষ্য করতে হয় যে চণ্ডীর মহিমা-কীর্তনের উপলক্ষে কবি গোবিন্দ-ভক্তি প্রার্থনা করছেন!

গণেশ-বন্দনার পর কবি করেছেন শ্রীচৈতন্য-বন্দনা। কিন্তু চণ্ডীকাব্য রচনার সংকল্প করে চৈতন্যদেবকে বন্দনা করবার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে, তা' বুঝতে পারা যায় না; তবে সেই কমলকুলের মত প্রেম-রোমাঞ্চিত-দেহ নবদ্বীপের যে গৌরবরণ ছেলেটির রূপে গুণে কবি মোহিত, তাঁর প্রশস্তি না গেয়ে কবি হয়ত তাঁর কাব্য সুরুই করতে পারেন না! তাই লিখছেন—

...অবনীতে অবতরি শ্রীচৈতন্য নাম ধরি—
বন্দিব সহচরী চূড়ামণি,
সঙ্গে লঞা নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ কন্দ
পতিতেরে দণ্ডদাও পরশি;...

কাব্যের সর্বত্রই দেখা যায়—চণ্ডীর গুণ লিখতে গেলেই কবির কৃষ্ণের মহিমা মনে এসে যায় এবং দুর্গা অপেক্ষা কৃষ্ণ-কথাই যেন বেশী বলে ফেলেন। কাব্যের ৩১ পৃষ্ঠায় কলিঙ্গরাজ ভগবতীর আদেশ পেয়ে দেবীকে করজোড়ে স্তব করছেন—

নানা অবতারে তুমি বিষ্ণু-সহায়িনী
দুরিত-হারিণী মাতা দুর্গতি-নাশিনী

অর্থাৎ চণ্ডীর সর্বচেয়ে বড় মাহাত্ম্য এই যে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিষ্ণুকে সাহায্য করেছিলেন!—কবি নিজের বৈষ্ণবত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন এই স্তবের নিম্নের দুটি লাইনে—

যেই জন নাহি করে তোমার সেবন,
সে জন কি হয় হরি-সেবায় ভাজন;

—যে তোমার পূজা করে না, সে হরিকে পূজা করবার উপযুক্ত গুণ-লাভ করে না। চণ্ডী-পূজা যেন হরি-পূজার অধিকারী হবার প্রাথমিক সাধনা!...

কালকেতু রাজা হওয়ার পর বিশ্বকর্মা এবং হনুমান দু'জনে মিলে তার জন্য গুজরাট-নগর নির্মাণ ক'রেছিলেন। গুজরাট-নগর-নির্মাণ বর্ণনায় (৭৪ পৃষ্ঠায়) কবি বলছেন—

...আওয়াসের পূর্বদিশে বিচিত্র কদম বৈসে
বিরচিল বিষ্ণুর যেউল।
দিয়া হীরা নীলপত্ত বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ড
অমল বিজলী ঝলমল।...

—ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, চণ্ডীর অনুগ্রহেই কালকেতু ব্যাধের ঐশ্বর্য-সম্পন্ন হ'লেও, সে তার নব-নির্মিত রাজধানীতে আগে চণ্ডীর যেউল না তুলে 'বিরচিল বিষ্ণুর যেউল'। কারণ আর কিছুই নয়—কবির অন্তর যে বৈষ্ণবভাবে পূর্ণ!—এই নগর বর্ণনায় কবি আরও লিখেছেন—

কাঠ আনে তার ধোনা কুমারে পোড়ায় পাতা
নানা স্থান করায় নির্ম্মাণ।
দিল হীরা নীলপড়ি নির্ম্মাইল ধোলা পিঁড়ি
কমল-কানন সন্নিধান।...

—অর্থাৎ চণ্ডীর কৃপায় অনুপ্রাণিত ব্যাধ কুকের স্ত্রি কমলকাননের নিকটে ধোলসক নির্ম্মাণ করালে।—শেষ অবধি বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান সেই 'মারকা-মসান' পুরীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করলেন, তখন 'পুরী যেমি বীরের পুরিল অভিলাষ'; এবং ব্যাধের প্রতিষ্ঠিত সেই নগর যে শ্রীকুকের রাজধানী দ্বারকার ঠিক সমানই হ'ল—এতে কবিও হয়ত অতিশয় আনন্দ পেলেন!...এরপর রাজধানীর অধিবাসীদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি সপ্রশংস-ভাবে লিখেছেন—

...প্রতি বাড়ী যেমতন বৈষ্ণবের আচরণ
দুই সন্ধ্যা হরি-সঙ্কীর্ত্তন।.....

—চণ্ডীর কৃপায় চণ্ডীর সেবক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুজরাট সহরের প্রায় সবাই বৈষ্ণব,—'মাধব', 'মুকুন্দ' প্রভৃতি বৈষ্ণব নামই তা'রা গ্রহণ ক'রেছে, এবং সেখানকার নাগরিকগণের 'চখনে চর্চ্চিত তনু'!—এর কারণ, চৈতন্যদেব প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা।

তারপর, কালকেতু যখন 'ব্যাধ' রাজা হ'য়ে গুজরাটে রাজত্ব করছেন, তখন তিনি—

বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
শুনেন কুকের গুণ হ'য়ে সাবধান॥ (পৃ. ১০৭)

—তা' তিনি শুনুন, কিন্তু চণ্ডীদেবীর কথা মনে পড়লে আমাদের দুঃখ হয় এই ভেবে যে নিজের পূজা প্রচারের জন্য এত কাণ্ড করবার পরও,—ব্যাধজন্মকে সামান্য অবস্থা থেকে, নানাবিধ অনুগ্রহ-প্রাচুর্য্যে, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেও,—কবির কাব্যারম্ভক কালকেতু চণ্ডীকে পূজা না ক'রে সকাল সন্ধ্যায় অবহিতচিত্তে কৃষ্ণ-নরিংহা-কীর্ত্তনই প্রবণ করছে!—এ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য যে শক্তিদেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য-প্রচার, হরি-ভক্তি প্রমাণ করা নয়,—চৈতন্য-প্রভাব-মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত কবি সে কথা যেন একেবারেই ভুলে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী-চৌধুরাণী প্রচারধর্মী ও শিল্পধর্মী কি না

শ্রীমঞ্জুলা মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" একটি সর্বজনপ্রিয় উপন্যাস। বাংলা-দেশের শিক্ষিত সুধী সম্প্রদায় থেকে শুরু করে অক্ষর-পরিচয়জ্ঞান-সম্পন্না গৃহবধূ—সকলের কাছেই এর সমাদর ঘটেছে। গুজরাট দেশের সঙ্গে সুমধুর মাধুর্য এই উপন্যাসখানিকে এক আশ্চর্য সুষমা দান করেছে।

"দেবী চৌধুরাণী"র সর্বজনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে এর মধ্যে কোনো শিল্প উপাদান এবং প্রচারধর্মিতা বিদ্যমান আছে কিনা। এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হলে, এর জনপ্রিয়তার কারণ সম্বন্ধেই নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

সাহিত্যে শিল্পের স্থান অত্যুচ্চে। কোনো রচনার বর্ণনাভঙ্গী তথা রচনাশৈলী যদি মনোজ্ঞ হয়, তাহলেই তা যথার্থ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। অবশ্য রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনেরও একটি বড় স্থান আছে। এ সম্বন্ধে ইংরাজ রসজ্ঞের উক্তি, 'There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all."—অর্থাৎ স্টাইলই সাহিত্যের সবচেয়ে বড় উপাদান একথা সর্বত্র স্বীকার্য। এই স্টাইল আর কাহিনীর সৌন্দর্য যখন একাত্মীভূত হয়, তখনই বৃহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি।

সাহিত্যের শিল্পমহত্ত্বকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক হচ্ছে, বর্ণনার সৌন্দর্য, অপরটি কাহিনীর সৌন্দর্য।

অনেকের বর্ণনা রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এবং "দেবী চৌধুরাণী"র অধিকাংশ বর্ণনা সৌন্দর্যপূর্ণ। তাঁর বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রেই সুপরিস্ফুট ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ প্রফুল্লের বর্ণনার মাধ্যমেই লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্লের দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপ বর্ণনার সময়ে তিনি নিপুণ শিল্পীর মত মাত্র কয়েকটি রেখার মাধ্যমে তার সৌন্দর্য ও অসহায় অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন—

"এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দরদর ধারা বহিতেছে।"

একটুখানি মাত্র আভাস দিয়েই লেখক এখানে চুপ করে গিয়ে পাঠককে কল্পনা করে নেবার অবকাশ দিয়েছেন।

প্রফুল্লের বর্ণনার সময়ে যেমন অনাড়ম্বর ভাষা তিনি গ্রহণ করেছেন, দেবীর নৌকা ও তার বর্ণনার সময়ে তিনি তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। আর এই বর্ণনার পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য রাত্রির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও অনুকরণীয়:—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নহে, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত।"

এরপর তাদের পরিমার্জিত রাজকীয় পোষাক তিনি সৃষ্টি করেছেন। নৌকার বর্ণনার পরতিনি লিখছেন, "সাদিগের উপর বসিয়া এক স্ত্রীলোক।

তাহার বয়স অনুমান করা যায়—পঁচিশ বৎসরের নিচে তেমন পূর্ণতার ছেদ দেখা যায় না, পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের সাধনা কোথাও পাওয়া যায় না।.....বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্বত্র যৌবনকে সম্পূর্ণ—আজি ফিরোজা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে ইহার শরীরও তেমনি কূলে কূলে পূরিয়াছে।.....কিন্তু জল কূলে কূলে ভরিয়া টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে—বিস্তার। সাধনা চঞ্চল, কিন্তু সাধনাময়ী চঞ্চল নহে—নিশ্চিকার। সে শান্ত গম্ভীর মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুরূপিণী।"

উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে দেবী চৌধুরাণীর শুধু দৈহিক নয়, তার মানসিক রূপেরও পরিচয় ফুটে উঠেছে। সে শুধু সাধনাময়ীই নয়, সে নিশ্চিকার গম্ভীরও। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র grandeur and grace এর সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় শৌকর বর্ণনার কথা ছেড়ে দিয়ে কাহিনীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিচার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

"দেবী চৌধুরাণী"র কাহিনীর মধ্যে দুটি রসের অবতারণা ঘটেছে—করুণ ও মধুর। দেবী হওয়ার পূর্বে প্রফুল্লের কাহিনী করুণ আবেদনে—ভরা। প্রফুল্ল তখন নিতান্ত সমাজনিপীড়িতা ধরিত্রী প্রায়বালিকা মাত্র; তাকে অনাদরে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হয়, তার স্বামীর স্বজন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে বঞ্চিতা। তার দুরবস্থা দেখে তার পাগড়ী অর্থাৎ ব্রজেশ্বরের মাতারও চিত্ত দ্রবীভূত হয়েছিল।

সাগরের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের কলহ ও তার সমাধানের কাহিনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মধুর মাধুর্যের অবতারণা করেছেন। এই মধু আখ্যানটীরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। এরই পরিণতি হোলো ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দেবীর পুনর্মিলন। তাছাড়া এই আখ্যানভাগের পরবর্তী অংশে দেবীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সঙ্গে রসধারা রক্ষা করবার জন্যেও এর দরকার ছিল।

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণে এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আছে সেই অধ্যায়ে—যেখানে দেবীর মনের রূপান্তর ঘটলো। দেবী উপলব্ধি করলে—রাণী হওয়াই জীবনের চরম কাম্য ও লক্ষ্য নয়—তার বাহিরেও জগৎ আছে তারজন্যে। সে নিজের স্বরূপকে আবিষ্কার করলে জ্ঞান বা যুক্তির মধ্যে নয়,—প্রেমের মধ্যে।

কাহিনীর শেষভাগে যদিও দেবীকে এবং তার সন্তানদের অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে, শুধু এর পরিণতি ট্র্যাজিডিতে পরিণত হয়নি—কমেডিই হয়েছে। যদিও এই কমেডির পথে অনেক ত্যাগ, অনেক বেদনার অবকাশ ঘটেছে তবু এর পরিণাম হয়েছে সকলের আনন্দ ও সন্তোষবিধান। দেবী নিজের রাজকীয় জীবনের সমস্ত উপকরণ এক মুহূর্তে ফেলে দিয়ে সংকীর্ণ গৃহাঙ্গনে ফিরে এসেছে; এখানে তার সাহিত্যে সকলে আনন্দ পেয়েছে, পরিতৃপ্তি পেয়েছে, সকলের ক্ষোভ দূর হয়েছে—তার জীবনের একমাত্র আদর্শ নিষ্কাম কর্মযোগ এখানে তার সম্পূর্ণ রূপপ্রকাশ করেছে,তাই এখানে কমেডির মধ্যে দিয়েই লেখক উপসংহার টেনেছেন। লেখক তাকেই শুধু বড় করেননি শিল্পকেও উঁচু করেছেন—দুয়েরই সুসংগত সমন্বয় ঘটেছে। কাহিনীর পরিণতির মধ্যে "সারপ্রাইজে"র অবকাশ ঘটিয়ে কেবলমাত্র তত্ত্ব শুধু শিল্পকে বড় করতে গিয়ে লেখক সমগ্র উপন্যাসখানিকে ছোট করেননি—এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব।

কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা বঙ্কিম সাহিত্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সুসংগত সমন্বয়রূপে কৃষ্ণচরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই মতবাদকে আরও আইডিয়ালরূপে "দেবী-চৌধুরাণী" নামে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিক গুরুত্বের আলোচনা বিশ্লেষণ-জটিল বয়সে আলোচ্য কাহিনীতে পাঠক পেলেন এক সুমধুর কাহিনীর অবতারণা, অথচ এর অন্তরালে ফুলের মালার আড়ালে থাকা সুতোটার মত লেখক তাঁর যে তত্ত্বটি প্রকাশ করলেন তা সন্ধানী পাঠক যাচাই করলের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। তবের গুরুভারে কাহিনীর স্রোত এখানে একবারও বাহিত হয়নি; এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক শিল্পী।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমজীবনে Mill এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে Comteএর Poritino Philosophyর সমাজ কল্যাণবাদ গ্রহণ করেছিলেন। "দেবী চৌধুরাণী"তে তাঁর জীবনের এই উল্লেখযোগ্য পর্বগুলির ছায়াপাত ঘটেছে।

পরবর্তী জীবনে দেবী চৌধুরাণী সমাজবাদ ছেড়ে ব্যক্তিবাদেই ফিরে এসেছে।

দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমের মানসকন্যা। তার চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জীবনাদর্শকেই প্রচার করেছেন। প্রথম প্রফুল্ল প্রথমে ছিল ভক্তিবাদী; ভবানী পাঠকের সংস্পর্শে এসে সে জ্ঞান ও কর্মযোগ শিক্ষা করে এই ত্রিবাদের সমন্বয় ঘটালে।

দেবী চৌধুরাণীতে চরিত্র অঙ্কন করবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবন-দর্শনের মধ্যকার Ethicsকেও বড় স্থান দিয়েছেন। সত্যাশ্রয়ের ফেরে দেবীর চরিত্র আরও পরিমার্জিত। তাই সত্যাশ্রয় Ethical code এর Ways and means are Corrolative-এ তত্ত্ব ফুলে দিয়েছিলেন বলে ডাকাতির মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন। অপরপক্ষে দেবী চৌধুরাণী তার বিপুল সম্পত্তি কৃষ্ণেরপায়ে অর্পণ করে ঘরিহমন-সেবার মধ্যে জীবনের পরিণতির পথ খুঁজে পেলে।

কাহিনীর শেষভাগে দেবী চৌধুরাণী তার তত্ত্বের বা আদর্শবাদের সঙ্গে জীবনের সুসংগত সমন্বয় ঘটাতে পারলে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম-যোগের সংগে সে নিজের আত্মোপলব্ধির দ্বারা গীতার নিষ্কাম কর্ম-যোগ ও মিলনের ব্যক্তিনির্ভর মানবকল্যাণবাদের Synthesisএর প্রতীক হয়ে রইল।

আলোচ্য উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে এর মধ্যে শিল্প ও তত্ত্ব দুয়েরই বিশ্লেষসাধন ঘটেছে। শিল্পের অঙ্গে তত্ত্ব চাপা পড়েনি এবং তত্ত্বের তলায় শিল্পও ডুবে যায়নি। এই অর্থেই এখানে বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস সার্থক হয়ে উঠেছে।

(পূর্বানুবৃত্ত)

লালদেদ ও কাশ্মীরের ঋষিসম্প্রদায়

ত্রয়োদশ—চতুর্দশের যোগিনী কবি লাল দেদ্। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ব্রাহ্মণের মেয়ে; ছেলেবেলা থেকেই নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক পিতার শিবপূজা মন দিয়ে লক্ষ্য করেছে; শিবমন্ত্রটি পান পেয়েছে। দেখেছে পিতার ভিক্ষার পাত্র যতো কত সমাদরে গ্রহণ করে শিবের ঝোলা ভরে দিয়েছেন। সঞ্চয় নেই, বিলাসিতা নেই। শিবসূত্রম সংসারের মতো সুস্থে পরিপূর্ণ সংসার। বৈরাগ্য বিলাসেই বিলাস।

শিবের ধ্যান করে কিশোরী লাল দেদ্; শিবের ধ্যান, শিবের পূজা। মাকে দেখে, বাপের সেবা করেন সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে। মনে মনে ভাবে—লালদেদ যদি শিবকে স্বামীরূপে পান্ এমনি করে সেবা করবেন, ভিক্ষার অন্নে সন্তোষ, বিভূতিতে ঐশ্বর্য, রিক্ততার প্রাচুর্যে স্ফীত হবেন অনায়াসে।

কিন্তু মা মারা গেল লালদেদের। বাপের আর বন্ধন নেই সংসারে; কাজেই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের হাতে পায়ে ধরে বিয়ে দিলেন তার ছেলের সঙ্গে।

কিন্তু সে তো লৌকিক বিবাহ। লালদেদের বিবাহ তো হয়ে গিয়েছে তার আগেই। সেই স্বামীর কথা বলে লালদেদ, শিবানী, ত্রিশূলী, বিশ্বম্ভরের সেই নীললোহিত মূর্তি। তার গান গায়ে। তবু খাশুড়ী যাচিয়ে নিয়েছিলো এই প্রতিবার মতো বৌটিকে। কিন্তু বিপদ ঘটালেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সেই শ্বশুর। লালদেদের অচলা নিষ্ঠা তো কৈ তিনি এতকালের পুরার্চনায় পান্ নি। কথায় কথায় স্ত্রীকে সূত্রকে অনুশাসন দিতেন,—"সাধারণী নয় ও মেয়ে। গিরিশের পার্থিব-প্রার্থিনী কন্যাকুমারিকা ও!" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লালদেদকে দেবীজ্ঞানে প্রায় পূজা করতে লাগলেন।

এ সহ্য হবে কেন ব্রাহ্মণীর? পুত্রবধূ পূজা? কবে কে এই অনাচার সয়েছে ভূভারতে? আরও বেশী কাজ চাপাতে লাগলেন তিনি, আরও অনাদর, আরও অপমান। দৈহিক নিষ্পীড়ন, নিগ্রহ, অত্যাচার।

বিরাগিণী লালদেদ 'শিব' 'শিব' বলে গৃহত্যাগ করে গেলো। লালদেদ হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে গুরুর সন্ধানে ফেরেন। অবশেষে দেখা পান শৈব সন্ন্যাসী সিদ্ধযোগাচার্যের। তিনি ত্রিক্-মর্গনের পথে যোগাভ্যাস করে ষটচক্রভেদ করেছিলেন। অতোবড় যোগীর সাহচর্য মেলা সহজ কথা নয়। লালদেদ তাঁর বাঞ্ছিত পথ পেলেন। বৎসরের পর বৎসর চললো কঠিন যোগাভ্যাস্। কঠিন, কঠিনতর, কঠিনতম। অবশেষে বুঝি লালদেদের তার যৌবনপাত্রে দেখা দেলো ঘটিচেতন। লালদেদ গান গাইলো—

স্বনের পরে বনের বেড়া পেরুই ভেসে ভেসে
ছয়টী বনের পারে তারে পেলাম অবশেষে।
সেথায় কিছু নেইকো কালো
ছড়িয়ে আছে তারের আলো
গিরিচূড়ার ধবল শিবের তরঙ্গহীন বেশে
শান্ত শিব সুন্দরেতে মিললো অবশেষে।
দুখন বীণা বন্ধ এখন, শান্ত বেদের গান,
আমার প্রেমের হোমানলে অনন্ত আকাশ।
সেই আলোতে দেখি তারে
আহার লাগি যারে যারে,
মেলেছি দুই বাহুতারা অধীর নিরুদ্দেশে,
শান্ত আমার শিবের দেখা মিললো অবশেষে।

লালদেদ দেহ তত্ত্বের রহস্য ভেদ করে তাঁর উপলব্ধিকে পেলেন। অধীর আনন্দে দেহতত্ত্বের নানা কথা নিয়ে তরাট গান গেয়েছেন তিনি। কিন্তু দিন যায়, জরা আসে; চোখের সেই পূর্ণানন্দময়ী যেন একটা নিষ্করুণ রুক্ষতা মেখেন তিনি। পূর্ণানন্দের বৈরাগ্য, চিত্তার সম্মীকরণ তাঁর চিত্তকে ঊষর করে তোলে। তাঁর শিব সুন্দরং তো অবলম্বন রজত গিরিনিভ চিদাকাশের অভিধান পেয়ে। এত রুক্ষ, এতো কঠোর কেন তাঁর স্বরূপ? আসায় লালদেদ গান ধরেন। এবার আর তত্ত্ব নয়, প্রচার নয়, নীতি নয়। এবার ভক্তি আর প্রেম। প্রেমিকা মাতোহারা ঘটিচেতন প্রেমে। অক্ষয় হয়ে আছে কাশ্মীরের প্রান্তরে, গিরিতে, জলে, আকাশে লালদেদের এই প্রেমসিক্ত গীতিবাণী। পাঁচশো বছর কেটে গেছে, তবু লালদেদের এইসব গান বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আত্মবিস্মৃতির ইতিহাসে এই গানে। শুধু ফুল হয়ে ফুটে অহঙ্কার হোলো; কিন্তু সকল সফল করার বেদনা আমায় ঘিরে ধরলেন, ঘুরলেন, পাকে পাকে মাড়ালেন, বাঁটি দিয়ে কাটলেন;—বীণা করলেন। তবে হোলো তাঁর মাথার উপরে।

'লাল' বাগিচাতে ফুটলো কাপাস ফুল
তাহাই গর্বে সমাকুল।
ধুনরীরা ধুনে দিলো বাড়লো পাটে পাটে
চরখা সুতীর পাকে পাকে আমার হলো কাটে

ধোবার পাটে আছড়ে যতো ময়লা তোলো দূর
মাটী সাথীর মোহের মেঘে পথ হোলো চুর
শেষ হোলো কি এবার প্রভু, হোলো কি এইবারে?
কাঁচা দিয়ে চুরমার করে কাটলে যারে যারে?
এতোর পরে দুকলো মনের ভুল
লাল বাগিচায় ফুটেছিলো অহঙ্কারের ফুল।

লালদ্যদের কথা ভাবতে ভাবতে অমিতের কথা ভুলেছিলাম। সমস্ত পথটা সে নেই। সারা গায়ে কাদামাটি মেখে একপাল শাদা-গালা, খেঁকড়-খাকড় হয়ে এসেছে খলিতে করে। মুখখানা খুশীতে উদ্ভাসিত। গানগুলা পান, চোখ আর জ্ঞ নাচছে,—"ওঃ আসতে ইচ্ছে করে না। বহুৎ স্পেসিমেন, বহুৎ। থ্রাও ভাইগা।"

ডেকীর কাজ যান জানা, স্বর্গে গেলেও জানবে। আমি লরিদের কাছ থেকে যান সংগ্রহ করবো; মৌকা পেলেই বক্তৃতা করবো; অমিত বসে সেখানে যাবে—স্থানের উৎকর্ষ, কালের ব্যবহার, পাত্রের উপযোগিতা বিচার করবে স্পেসিমেন নিয়ে; বেণু দেখবে সাথীর কাছার কাঁস আইটেম বাড়লো, চায়ের সময় বয়ে গেলো কিনা, তার মালার গন্ধ, ছোপনের কোনও বাধা বিঘ্ন হচ্ছে কি না,—এরই ওপর গায়ের সাদলা-অসাদলা নির্ভর করবে।

"নোংরা করলে তো চমৎকার পার্টটা"! বললে বেণু।

"আচ্ছা বেণুদি আপনি নিতান্তই বেরসিক। বেণুন দেখুন, বেগুনের এটা কি? ইউফোরবিয়া—তরসোনিয়ানা, চুল ধুতে কাজে লাগে। এটা শুধু, হাজোসিয়াস্, এটা বার্বারিস্, এটা ডিল্ল, পিপার-মিন্টের মতো খেতে। এটা দেখুন উইকা, এটা ইচক্লাস্—কতো গুণ এই বনে।"

ওর আনন্দে ও মত্ত।

আমার চিন্তায় আমি।

লালদ্যদের কথা···। সুফীদের সঙ্গে শৈব সম্বন্ধের কথা। কাশ্মীরের 'ঋষি' সম্প্রদায় আর হিন্দু-বৌদ্ধের বিলিত তীর্থের কথা। এই লালদ্যদের সাধনার প্রত্যক্ষ ফল কাশ্মীরের 'ঋষি' সম্প্রদায়। 'ঋষি'দের কথা বলার অবসরে এই তত্ত্বটা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

সুফীদের ঘিরে কাশ্মীরে একটা নব পর্যায় আরম্ভ হয়। সারা ভারতের ইতিহাসে এর নজীর নেই আর। আর কাশ্মীরে ঠিক পৌরাণিক প্রথায় নানা পূজার ভিতটা গজায় হয়ে যেতে পারেনি। তিব্বতের সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকায় শৈব ধর্মটাই একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে এখানে বাসা বাঁধলো। মাঝে মাঝে তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান অভিচার ইত্যাদি যোগ দিয়েছে, তবে বীরাচারের বিশেষ পরিচয় নেই। ফলে প্রথম যখন ইসলাম এলো তখনই মীর সৈয়দ আলি হমদানীর মতো একজন সুফীর মাধ্যমে এলো। তিনি এসেই এদেশের নাড়ীর খবর বুঝতে পারলেন। শৈব ধর্ম আর সুফী ধর্মের মধ্যে ঐক্য দেখতে পেয়ে মাঝে মাঝে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু ঠিক তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা লালদ্যদের। শুনে তিনি অবাক। উলঙ্গ নারী পথ দিয়ে হাঁটে, অথচ সকলে তার পূজা করে। শুনে তিনি অবাক—যে লোকে যখন তাঁকে বলে "লালা, পুরুষের সামনে উলঙ্গ হও, লজ্জা, ভয়, ডর—কিছু কি নেই তোমার?" লালা মাকি জবাব দিয়েছে,—"পুরুষ? কাশ্মীরে পুরুষ কই? তোরা যদি পুরুষ হোস তবে আমোদার আত্মা?" এই লালাকেই একদিন দেখা গেল পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলেছে। "দেখছি, আজ পুরুষ দেখছি!"

সকলে অবাক্! কে এই পুরুষ? আর কেউ নয়। ঐ মীর সৈয়দ আলি! লালাকে দেখে তিনি বলেন,—"না, না, উলঙ্গ মেয়ে-মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আমি নারাজ।"

দালদে মস্তবড় উনুনে কি গরম হচ্ছিল। সেই সময়ে কে বিরাট ডেকচিটা নামিয়েছে। লালা টপ্ করে উঠে সেই উনুনে ঢুকে পড়েন। উনুনের চার ধারে ধোঁয়া। তাঁর নগ্নতা ঢাকা হোলো। ধোঁয়ার থেকে আগুনের শিখা। সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তির সামনে সেই যে মীর সৈয়দ আলি থামা মোয়ালেন, সেই থেকে লালা তাঁর গুরু। সেই থেকে দুজনের কতো দিনের তত্ত্ব আলোচনা। আজও তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে—"লালা বাক্যাণি" সংগ্রহে।

বিজবিহারের সন্নিকট জামাসজিদের কাছে এক সমাধি আছে। লোকে বলে লালদ্যদের মর্ত্য-দেহ এইখানেই আছে। শত শত ভক্ত এখানেই এই যোগিনীর উদ্দেশে বলো দিয়ে থাকে। লালদ্যদের গান থাকিয়া গায়—

কাঁচা ঘুতো, পাক পড়েনি, তাই ঘিরে এই ভয় চারা!
প্রভু তুমি শুনবে কি ডাক, পার কি আমায় করতে দা?
কাঁচা মাটির পাত্রে রাখা জলের মতো শুকিয়ে যাই
পরাণ আমার অধীর হোলো, দেখে যেন তোমায় পাই।

গান—

যে পথে এসেছি সে পথ ভুলেছি
ফিরতে না পারি হায় রে
বাঁধের জলেতে আটক পড়েছি
বেলা হোলো আঁধিয়ার রে
পারানির কড়ি একটিও নেই
ভেবে সারা নাহি পায় রে।

এই লালার উত্তরসাধক এলেন সুফীদীন। বাল্যে গৃহত্যাগ করে আসেন তিনি। বহুসাধনার পর সিদ্ধিলাভ করে যাত হন। তখন তাঁর মা তাঁকে নিতে এসে বলেন "এতো দুধ খাইয়েছি, সে শোধ তবি কিসে?" সুফীদীন মার দিকে চেয়ে হেসে বলেন—নাও দুধ যতো চাই। পাহাড় কেটে দুধের ফোয়ারা বোয়লো। মা ছেলের পথের পথিক হলেন।

লালার সঙ্গে সুফীদীনের দেখা। দেখতেই লালার তন থেকে দুধ ক্ষরিত হতে থাকলো। সুফীদীন সাক্ষাৎ জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করলেন লালার মধ্যে। এই সুফীদীন পেলেন ঋষি আখ্যা। কাশ্মীরে বিখ্যাত

ঋষি সম্প্রদায়ের পত্তন হোলো। মুসলমানের সুযোগ্য শিষ্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হোলো—নাসিরুদ্দীন, বাহ্‌উদ্দীন, জয়নুদ্দীন, নাসিরুদ্দীন। একেশ্বরবাদের সমন্বয়ে মিশিয়ে নিলো ইসলামের সুফীবাদ, আর হিন্দুর বৈষম্যবাদকে। এই অপরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ে কাশ্মীরে প্রথাগত মসজিদ আর সমাধিমন্দিরগুলি হিন্দুর তীর্থ হয়ে যেমন আজও জীবন্ত, ঠিক তেমনি হিন্দুর তীর্থগুলিতে মুসলমানের পূজা অবশ্যই বর্জিত হয়েছে।

মুসলীমকে কাশ্মীরের আত্মার প্রতীক বলা যায়। সুফী আর বৈষ্ণবের এমন সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গত আচরণের বিষয়টি ভারতবর্ষে আর নেই।

মুসলীম বা নব ঋষির শিষ্যদের মধ্যে প্রথ্যাত ঋষি পীর পাসনা। পারমহংসী ও সিদ্ধপুরুষ! এই সন্ন্যাসী বিবাহই করা করতেন। খাটাতেনও না করেছে, কাউকে খাটাতে দিতেনও না। অথচ এর সম্বন্ধেই কতোকগুলি বিস্ময়কর বিভূতির কাহিনী আছে। ইনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক। মুসলমান হিন্দু সবলের চিত্তে অবশ্য অধিকার। লোকে বলতো মুস্কিল আসান বলে। ঐ ছিলো জনগণের চিত্তে, আজও ওঁর অধিষ্ঠান। উনি বিভূতি দেখাতেন আর অন্য এক সিদ্ধ মহাপুরুষ ছলাভবানী বিভূতি প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা করতেন। লালদিঘেরও বিভূতির প্রতি অবজ্ঞা ও বিরক্তি ছিল। ছলাভবানী লালদিঘের নজীর দেখিয়ে পীর পাসনার বিভূতি প্রদর্শনের নিন্দাই করতেন। কিন্তু পীর পাসনা বিভূতি দেখাতেন অনেক বারে। আওরঙ্গজেবের প্রথম যৌবনীরা জবরদস্তি মুসলমানী করণের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। পীর পাসনা ধর্মের নামে জুলুমবাজী অত্যন্ত হেয় বলে মনে করতেন। এই মুসলমানী-করণের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন এবং এই সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে বিভূতি দেখান। ফলে ঋষি পীর কাশ্মীরের জনসাধারণের চোখে দেবতার মূর্ত বিগ্রহ। বাদশাহ ঋষি পীরকে দমন করতে কৃতসংকল্প। হুকুম দেন পীরকে বেঁধে হাজির করা হোক দিল্লিতে। যাতে আওরঙ্গজেব চোখ মেলে কথা ক'ন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা তো বাহিল করলেনই, সমন্ত পাঠালেন বীকার করে যে পীর ঋষি নিরক্ষরতেই পাত্‌শাহ্‌। যারা গুকোর গুরু আনন্দমুন্না সাহেব, সুফী ঋষি পীরকে বিবস্ত্র করেন জোরে। বিরাট জোর। গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন জোরে। আনন্দ মুন্নাকে খুশী করবার জন্য ঋষি পীর গেছেন জোরে। অর্থে দীর্ঘ পরিচয়। সুফীরা এই দীর্ঘ কথা পরিচিত ফিকারীকে জোর সভায় প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। পীর ফিরে গেলেন। চন্দ্রকার বেশভূষা পরে এলেন। দারপাল এবার বাধা দিলে না। জোরে ঢুকে তিনি পোষাকের ওপর থাক রেখে বলেন, "পোষাক তুই খা!" আনন্দমুন্না স্তম্ভিত। "এ আবার কি বিভূতি?" টাট্টা করে বোঝা। "যেমন ব্যবস্থা তোমাদের। আমি এলাম; আমায় প্রবেশ করতে দাওনি। পোষাক এলো তাকে দিলে। কাজেই পোষাকী নিরক্ষরের জোর পোষাক-ই খাবে। খাও পোষাক, খাও। "মোল্লার মাথা নীচু। উনি মাংস খেতেন না। একবার মুন্না ওঁকে নিমন্ত্রণ করেন। গামলায় ঢাকা মুর্গমুসল্লম—আস্ত মুর্গী। পীরের সামনে গামলা নিয়ে হাজির। বিবিবাসে পীর ঢাকা খুললেন। একটা জীবন্ত মুর্গী ডানা

বিরোজপুর বালা

ঝাড়তে ঝাড়তে গামলা থেকে নেমে গেল। গামলা খালি। পীর হাসলেন। মুন্না মাথা হেঁট করলেন। পীর 'ঠক্করসি' আর 'লোহর' স্থানে আল্লা রাখের গুণে মোল্লা একদিন আলোচনায় অবতীর্ণ হন। পীরের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁকে ফিরতে হয়েছিলো। পীর বলতেন, ধর্মের প্রথম সোপান পরিপূর্ণ জীবন। তাঁর একটী বাক্য আজকাল মনে রাখবার মতো—

'সিংহ যারা পথের পরে,
ধর্ম কি তার? শুরু কি তার? ধর্ম বহুতো তাদের তরে।
তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে
কেড়ে খান, ঘাসের কুটীর, শাকুর ডুঁড়ি শুধুই ঘাড়ে॥'

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের প্রখ্যাত মুসলিম তীর্থগুলির বর্ণনা দেওয়া ভালো।

এদের ঐতিহ্যও প্রাচীন এবং এদের আবেদন আজও কাশ্মীর জনগণের হৃদয়ছোঁয়। একথা এতো স্পষ্ট করে বলার দরকার আর কখনো সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের মোহিনী ছায়া সংঘাত থেকে সংঘাতে আমরা কাঁপিয়ে পড়ে ইতিহাস সংগ্রহ করছি। কাশ্মীরেই, একমাত্র কাশ্মীরেই জনসমুদ্রের এমন অপরূপ নির্দর্শন পাই। মানুষ যদি মানুষের মনের দরজায় মানুষকে দরদে ডেকে নিতো। এই দরদ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হোতো। কিন্তু তার দিলো হাজারবর্ষী রাজনীতিবিদী স্বার্থান্বেষীরা।

সে কথা যাক। মুস্লিম তীর্থের কথা বলি।

কাশ্মীরের নরপতি হিন্দুন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সুলতান শা ছিলেন হিন্দুনের গুরু। এর প্রকৃত নাম ছৈয়দ বিলাল শা। সুলতানের রাজত্বের সময়ে (১৩০০—১৩১০ খৃঃ অঃ) ইনি কাশ্মীরে আসেন। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীনগরে বিতস্তার তীরে বুলবুল-লঙ্কার নামক মসজিদ নির্মাণ করান হিন্দুন ১৩২৩ খৃঃ। কাশ্মীরের প্রথম মসজিদ। চীন পদ্ধতির এই রাজবর মসজিদ পরে কাশ্মীরী মসজিদের স্থাপত্যরীতি প্রবর্তিত করে। কিন্তু হিন্দুপদ্ধতিতে এর মাথায় থাকে কলস ও ছত্র। ঐতিহাসিক ধারার পরিচয় মাত্র এর ভিতরের স্থাপত্যিক পদ্ধতিতে লিখিত ছাদি ও কাজের মধ্যেই পাওয়া যায়। খয়াই-মৌলা শেখ হামজার মসজিদের নাম। এরও বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে আছে। শ্রীনগরের পাঁচ মাইল পূর্বে দালের কিনারায় আছে হজরতবল মসজিদ। এ মসজিদে রক্ষিত হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ নিয়েই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পরম আরাধ্য বস্তু। এই কেশ কি করে কাশ্মীরে এলো তার কাহিনীটী চিত্তাকর্ষক।

মক্কা পয়গম্বরের এই কেশ মদিনার সৈয়দ আবদুল্লার কাছে আসে। শেখের সুলতানকে এই কেশের গুরু সৈয়দ আবদুল্লাকে তলব করতে কেশ দিয়ে তিনি ১০৮৬ হিজরিতে বিজাপুর পাঠিয়ে এসে ২০ বৎসর বাস করেন। কেশ পান তাঁর ছেলে সৈয়দ হামিদ। কেশ ছাড়া আরও দুটী মুসলমান জিনিস ছিল তাঁর কাছে। হজরত আলির ঘোড়ার রেকাব এবং তাঁরই পাগড়ী। ১১০৪ হিজরিতে আওরঙ্গজেব বিজাপুর জয় করার পর হামিদ পালিয়ে যান আহমদাবাদে। সেই দুঃখ দৈন্যের সময় এক ধনী ব্যবসাদী পাল্লা মুস্তফীন অপরিচিত তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। একদিন মুস্তফীন হামিদের কাছে ভিক্ষা করেন ঐ তিনটী পূত-স্মৃতির একটী। ভিক্ষা তিনি পাননা। স্বপ্ন দেখেন হামিদ। স্বয়ং পয়গম্বর তাঁকে বলেন মুস্তফীনের ইষ্ট পূরণ করতে। পরের দিনই হামিদ মুস্তফীনকে বলেন তিনটী স্মৃতির মধ্যে যে কোনও একটী তিনি নিয়ে নিতে পারেন। মুস্তফীন ঐ কেশটী নেন। কেশ নিয়ে মুস্তফীন কাশ্মীরে চলেন। পথে আওরঙ্গজেবের চরেরা তাঁকে ধরে ফেলে ও আওরঙ্গজেব ঐ কেশ জুলুম করে কেড়ে রাখেন আজমীঢ় পরিদর্শনে রাখার অভিলাষে। কেশ আজমীঢ়ে চলে যায়। দুঃখে শোকে মুস্তফীন প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অভিলাষ জানালেন যেন তাঁর কবর ঐ কেশের নিকটে দেওয়া হয়। আওরঙ্গজেব কেশ রাখতে চান আজমীঢ়ে, মুস্তফীন যায়া থান লাহোরে। এই ভাবে লাহোরের জনসাধারণ চাইলো মুস্তফীনের কবরের কাছে কেশ রাখতে, আজমীঢ়ের জনসাধারণ চাইলো সম্রাটের ইচ্ছা পূরণ করতে, আর খাজা মুস্তফীনের ছেলে খাজা মহাবীন প্রার্থনা করেন পাদশাহের কাছে। হঠাৎ আওরঙ্গজেব তলব করেন মহাবীনকে। বলেন যে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট, কেশ মহাবীনকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। কেশ ও মুস্তফীনের শব কাশ্মীরে প্রেরিত হোলো। মহম্মদের স্মরণে কেশ সংরক্ষিত হোলো। এতো ভীড় হোতো এই কেশ দেখার জন্য যে ভীড়ে বহুলোক মারা যেতো। ফলে বড় মসজিদের ওজায় হোতে লাগলো। হজরতবল শাজাহানের নির্দিষ্ট বিরাট সৌধ। এই সৌধে কেশ ও মুস্তফীনের সমাধি স্থানান্তরিত হোলো। সেই থেকে হজরতবল তীর্থ হয়ে গেল।

কাশ্মীরে আরও চারটী তীর্থে পয়গম্বরের কেশ আছে বলে শোনা যায়। মেলাও হয় প্রতিবৎসর। সেগুলোর নাম—কলসপুরা, অন্দরওয়ালা, গৌরা ও ডাঙ্গরপুরা। নবী পয়গম্বরের জিয়ারতে যে চুল দেখানে হয় সেটা আসি সত্যই পয়গম্বরের চুল। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমান ভক্তিতে যায়। ছোট ছোট্টা এসব তীর্থে।

হরিপর্বতের নিকটস্থ আসি মসজিদ কাশ্মীরের বৃহত্তম উপাসনাস্থান। সুলতান সিকন্দর (১৩৯০—১৪১৪ খৃঃ অঃ) এই মসজিদ তৈরী করার পর বহুবার এটা ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে, বারবার রাজার পর রাজার সাহায্যে পুনর্নির্মিত হতে হতে বর্তমান আকার পেয়েছে। এ মসজিদে বহু হিন্দুর অজস্র দান আছে।

শ্রীনগরের মখদিমসাহেব মসজিদ, আলি মসজিদ, পাথর মসজিদ, অপও মুল্লা মসজিদ এগুলোও দেখবার মতো।

এই যে পীরদের বা ঋষিদের সমভাবে কাশ্মীরীরা পূজা করে এসেছে এজন্য বিদেশে ইসলাম সমাজে কাশ্মীরীদের 'পীর-পরস্ত' বলে উপহাস করা হয়। গোঁড়া মুসলমান কাশ্মীরী মুসলমানকে এজন্যে পাকেটি মুসলমান মনে করতে সঙ্কুচিত হয়। ওরা মাথা নীচু করে প্রণাম করে, খালি পায়ে তীর্থ যাত্রা করে, তীর্থ ধূলি মাথায় অঙ্গে মাখে! ওরা কোনও তীর্থভূমির সামনে দিয়েও কোনও যানে চড়ে এমনকি ঘোড়ায় চড়েও যায়না। Walter Lawrance এর Valley of Kashmir এ সম্বন্ধে চমৎকার দেখা একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। এক বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল এক তীর্থস্থানের সামনে দিয়ে। সবাই যান থেকে নেমে পথ চলতে লাগলো। বর আর তার বাপ সেলনা। ঘোড়ায় চড়ে রইল। ওরা সব সেতু পার হচ্ছিল। সেতুর অপর তীরে সেই মসজিদ। যারা নেমে চলছিল পার হয়ে গেল। বর আর তার বাপ সেতু পার হবার সময়ে সেতু ভেঙে জলে পড়ে যায়। কেউ ওদের বাঁচাবার চেষ্টা অবধি করেনা। লরেন্স নিজে ওদের বাঁচান।

এই ৭৮টির মধ্যে ৪২ জন কেবল মুস্তফীনেরই শিষ্য-প্রশিষ্য। এদের শুদ্ধ চরিত সম্বন্ধে আইন-ই আকবরিতে লিখিত আছে—

"The most respectable people of this country

are the Rishis who, although they do not suffer themselves to be fettered by traditions, are doubtless true worshippers of God. They revile not any other sect and ask nothing of any one; they plant the roads with fruit trees to furnish the travellers with refreshments; they abstain from flesh and have no intercourse with the other sex. There are near two thousand of this sect in Kashmir."···Ain-I-Akbari.

চারার শরিফের দুর্গমস্থানে সুলতানীনের সমাধিতে বৎসরে একবার লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একত্র হয়ে তুমার গুণকীর্তন করে থাকে। লীমারের মুখে, পহালগামের পথে আরেসমকান তীর্থও এই ঋষিদের তীর্থ। এই সঙ্ঘে অনুচরেরা মাথায় অদ্ভুত পাগড়ী পরে। তাতে নানা চিত্র বিচিত্র। এরূপ শিরস্ত্রাণের ব্যবহার সম্বন্ধে কাহিনী আছে। কাশ্মীরের এক মহারাজার একবার বাঁধ নির্মাণ করার কাজে প্রমিক ধরবার হোলো। জোর করে প্রমিক ধরতে গিয়ে এই সঙ্ঘের কয়েক-জনকে ধরে খাটানো হোতে লাগলো। নিরিরোধী এই মহাত্মারা কাজ করতে লাগলেন। এদিকে রাজ্য কুপিত হলেন। লীমারের জল শুকিয়ে গেল। হাহাকার উঠলো। রাজা খোঁজ নিয়ে ব্যাপার শুনে সাধুদের মুক্তি তো দিলেনই; অনুরোধ করলেন, এখন থেকে তাঁরা যেন বিশিষ্ট উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করেন, যাতে অনুরূপ ভ্রম আর না হয়।

এ সব তীর্থের বেলা কাশ্মীর জন জীবনে এক সুখালয়। এ সময়ে তারা প্রাণ খুলে মেলামেশা করে। অন্ধা বলে এমনি একটা মেলা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম।

শাঙ্গীগ্রামে সৈয়দ বদরুদ্দীনের নামে জিয়ারাত আছে। শাঙ্গীগ্রী মাঝিদের কাছে বদরুদ্দীন এক প্রসিদ্ধ পীর। তারা বিপদে পড়ে 'বদর' 'বদর' না বলে—বলে "ইয়া পীর বদরুদ্দীন!"

গুলমার্গ থেকে তনমার্গ! একটী বাঁকের পর সামনে পাওয়া যায় তুষারস্রাব বিস্তার—গভীর তলদেশে বয়ে নিয়ে সমতল ভেদ করে বিসর্পে মিশেছে। এই বিখ্যাত একযোজনপুথ মালার ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন যেখে শেষ হয়না, পুরোনো হয় না, ফুরিয়ে যায় না।

গুলমার্গ থেকে নেমে এসেছি।

নীচে নেমে চায়ের দোকানে বেশ করে হাত পা মুখ ধুয়ে চা খেতে বসলাম। প্রসাদ গণলো অদিত—পান নেই এ বাজারে। প্রতি দোকানীর কাছে কি কাতর সনির্বন্ধ অনুরোধ। কিন্তু ফলং টু-টু। আদি সিগারেটে মুখ দিয়ে দেখে অদিত আরও বিরক্ত।

বাইরে আসতেই এক বিভ্রাট।

একটী বছর আঠারোর ছেলে হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে আমার চালের মাথায় চিৎকার করলো—"এ ঘোড়াটার মালিক কে?" বেশ পুলিশ-সুলভ কণ্ঠস্বর।

"কেন বলোতো?—আমি। কোনও অপরাধ করেছি কি?"

"অপরাধ?···অনেক বেশী তার চেয়ে। ফিরীতে গিয়ে এর জন্য আপনাকে জবাব দিহি করতে হবে।"

ছেলেটার রকমসকম আর উৎকট ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিই। কিন্তু ঐ কর্মটি শিক্ষক-জীবনে সর্বথা পরিবর্জ্য, তাই পরিপাক করছিলাম। অল্প কিছু কৌতুক-বোধও জাগ্রত ছিল।

"আপনাদের দলের কয়েকটি ছেলে আমাদের ঘাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে এই গুলমার্গ ও ফিলানমার্গের পথে আমাদেরকে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি এদের শাস্তি দিতে চাই। এখানে না পারি, ফিরীতে হবে।

"অতি চমৎকার পরিকল্পনা আ-পরিহোষাহ্—ন সাধু মন্যে;—শাস্তির বিধানটায় যেন খবর পাই।"

"কিন্তু আপনি মনে রাখবেন—"

ইতিমধ্যে ভগবান দাসজী এসে ছোঁ মেরে ছেলেটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

সকলে হেসে উঠলো জোরে। আমি নিশ্চিন্ত মনে বাসে বসে সইসদের জীবন আর লালদিদের গানের কথা ভাবছি।

একটী ছেলে বলে— ওরা দিল্লীর সি, বি, পি, এর কেউ। ভীষণ ক্ষমতাশালী কেউ। ভগবানদাসজী ভাবিয়ে তুলছেন ওর বাবাকে—ওঁর ছাত্র কিনা, তাই রক্ষে। নৈলে—

"ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলেন? তোমার নামও জড়িয়েছে ছেলেটার"

ধনেশ বলে,—"কিছুই হয়নি। আমরা সব ঘোড়া নিয়ে বিরেছি এই ওদের দোষ। ওরা সব কজন ঘোড়া পায়নি, তাই পালাপালি করে ওদের চড়তে হচ্ছিল। যারারা যেই পেছিয়ে পড়ছিলো, মেয়েরা তখন আমাদের সঙ্গে আর আমাদের দলের মেয়েদের সঙ্গেও ঘোড়দৌড়ের রেস খেলছিলো পাহাড়ি পথে। আমাদের মেয়েরা যেই কখনও হারবার মতো হয়েছে, আমরা ঘোড়া নিয়ে যাবার সৃষ্টি করেছি। কেবল খেলা করতে করতেই গিয়েছি, আর কিছু নয়।"

আমি দ্বিরুক্তি না করে ভগবানদাসজীর বাসে গেলাম। আসবার সময় ঐ বাসেই এসেছি। যাবার সময় বাস বদলাবার ইচ্ছা ছিল। তা হোলো না। গিয়ে কথাটা পাড়তেই ভগবানদাসজী বললেন—অত্যন্ত বদমেজাজী এবং ক্ষমতাপন্ন লোকের দল। বুঝিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে।

"কি বুঝিয়েছেন শুনি?"

"যেতে দিন। ওর বাবা আমার ছাত্র। মানিয়ে নিয়েছি।"

চটে গেলাম। "মানিয়েছেন, কি মানিয়েছেন? আমাদের ছেলেদের কি দোষ হয়েছে যে ওদের মানিয়েছেন? এটা কাশ্মীরে বেড়াতে আসা, স্কুলের পেকনিক নয়। ছেলেরা কোনও অভদ্রতা করেনি। স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে খেলেছে। যাঁদের এসব সহ্য হয় না তাঁদের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে এতটা পথ ঘেঁষ খেলেন কেন?"

ইতিমধ্যে ওঁরা এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট মেয়ের দল, ওদেরি বোনেরা

হাতে, তোমরা বড় বাড়ী, বড়ো বড় আয়োজন, মাথে ভারী আরও, চাহিতে হাসছে। তোমরাও হাসছে।

ধমক—"কেউ কোথাও বড় পদস্থ আছেন এই সূত্রে তব ও তব আত্মীয়তার আর তোদ বাড়াবি চলবে না, আমি বাঁচায় করি না ওই ঘণ্টে। যদি ছেলেরা অপরাধ করে থাকে পুলিশ তার ব্যবস্থা করুক, কোর্ট থাক্ মানলা, ধরের কাগজে উঠুক এই ছেলেদের সঙ্গে অমুকদের ছেলেদের গুণ্ডামির সঙ্গে পড়াশোনা হচ্ছে। তা বলে এই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ কেন করলেন আপনি? কেন ছেলেদের মাথা হেঁট করলেন?

"আর বাড়ুন মশাই, যেতে দিন। আপনিও আস্তা মাথা পাগলা।"

"ঠিক বলেছেন, আমি একটু পাগল আছি। তাই আমি বেরে ও আমাদের ধরের বাইরের কয়েকটি ছেলে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করায় তাদের ছিন। হুযোগ সুবিধা হয়নি বলে চেটো চাপ দিয়ে আপনার কাছ থেকে আপোষের ফয়সালা নিয়ে চলে নিয়ে ঐ দেখুন কেমন হাসছে।"

বড়সাহেব তিনটি মুখে রুমাল দিয়ে হাসছে। দেখে ওয়ারলেস চটে গিয়ে বাসগুলোকে বললেন—"বাস ছাড়ো।"

(ক্রমশঃ)

রিপোর্টারের ডায়েরী

চৈতন্য

—দুই—

সন্দনের হাওড়াই জাহাজের ঘাঁটিতে হাওড়াই বাজীর মত রোজ ঘনেরই না আগমন হয়। টাজা-টমটম্ মোটর রেলের চাইতে গতিবাদের এই যুগে বিমানের কৌলিন্য যথেষ্ট বেশী। তাই কুলীন বিমানের সামান্য মানভঞ্জনেও খেসারত দিতে হয় অনেক বেশী। মধ্যবিত্ত ঘরে ধনীর দুলালীকে বধূরূপে এনে স্বামীটিকে বেচারা হতে হয়, শ্বশুর শাশুড়ীকে তাঁবেদারী করতে হয়, ঝি-চাকরদের তটস্থ থাকতে হয়। এক বৌ'এর চিন্তায় সবার মাথাব্যথা। কয়েক হাজার যাত্রী বোঝাই দশ সনেরখানা বগির একখানা ট্রেণ চালাতে দু' চারজন লোক যথেষ্ট হ'লেও বিমানের বেলায় তা নয়। ধনীর দুলালীর মতন বিমানের তাঁবেদারী ও মানভঞ্জনে অসংখ্য লোকবল ও অথণ্ড সময়ের প্রয়োজন।

ব্রিটিশ লেবার পার্টির এক সরকারী প্রতিনিধিদল মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলীর নেতৃত্বে ক্রেমলিনের আতিথ্য উপভোগ করলেন প্রায় এক পক্ষকাল। লেবার পার্টি ডেলিগেশন্ পরে এলেন পিকিঙ্। মাও সেতুঙ্-চৌএন্ লাই—মার্শাল চো-তুঙ্কে পাশে নিয়ে এটলী-বিভান্ মরিসনরা অপেরার বিখ্যাত লোটাস্-ডান্স দেখলেন; ঘুরলেন সাংহাই, নান্‌কিঙ। আরো কত জায়গা। নয়া চীনে লেবার পার্টি ডেলিগেশনের সফর উপলক্ষে পৃথিবীর প্রায় সব সংবাদ-পত্রই যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। কলকাতার পথে তাঁদের দেশ প্রত্যাবর্তনের কথা। তাই কলকাতার সাংবাদিককুল চাতকের মতন লেবার পার্টি ডেলিগেশনের আগমন প্রত্যাশা করছিলেন। নিজস্ব কুলীন বিমান প্রতিষ্ঠান বি-ও-এ-সি'র তুল্য কুলীন ও অভিমানী বিমান-পোতটি হংকংএর রাত্রিক গোলযোগের ছলে ধর্ম্মঘট ক'রে ব'সল। ধর্ম্মঘটে যে সব সাংবাদিক হা হুতাশ ক'রে বলেছিলেন, তাঁরা কিন্তু 'অধর্ম্মঘট' ক'রতে পারেন নি। অপরাহ্ণ থেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মহাউৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করেছিলেন।

বসে বসে নানান কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ব্রিটিশ জাতটাই বিচিত্র। এশিয়া, আফ্রিকা বা পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কলোনীতে কলোনীতে ইংরেজ এক-হাতে ক্রৈন্‌গান, আর একহাতে সেক্‌স্‌পিয়ার-জনসন্—ত্রি-বি-এস নিয়ে শাসন ও শোষণ চালায়। নিজের দেশের পুণ্যতীর্থ কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডে শোষিত জনগণের মুক্তিমন্ত্রের বাণী প্রচার করে। পৃথিবীর নানান দেশের মুক্তিকামী গণ-দেবতার বিজয় অভিযান সাফল্যলাভ ক'রেছে সার্থক ইংরেজশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের দৌলতে। ব্যারিষ্টার গান্ধী, হ্যারো'র নেহরু ও আই-সি-এস সুভাষ বোস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ অধীনস্থ দেশের নেতারা ইংরেজ

রাজত্বের বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতির সমর্থন কামনায় বিলাত সফর করেন। হাউড পার্কে এমনি কত জনসভা হয় ইংরেজ-শ্রোতা নিয়ে। শুধু তাই নয়, আন্দোলন চালাবার জন্য কৃপণ ইংরেজ পর্যন্ত কিছু না কিছু আর্থিক সাহায্য ক'রতে কার্পণ্য দেখাবে না। এক কথায় ইংরেজ হচ্ছে ব্রাহ্মণের জাত। তার রাগও আছে, ঔদার্য্যও আছে; শিক্ষাও আছে, সহানুভূতিও রয়েছে। ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা ক'রছে বেদ-উপনিষদের অনুশাসন। বিলাতে ইংরেজের রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করছে লেবার পার্টি। সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন লেবার পার্টির ধুরন্ধর নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট দেশ ও চীন মুল্লুক ঘুরে এসে কি মন্তব্য করেন, তারই জন্য আমরা রিপোর্টারের দল নোট্‌বই পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত।

মিঃ এট্‌লী অসুস্থ স্ত্রী সন্দর্শনের জন্য হংকং থেকে সিঙ্গাপুর গেলেন। দমদমে প্লেন থেকে প্রথম বেরিয়ে এলেন মিঃ অ্যাণ্ডুরিন্ বিভান। দুটি হাত প্যাণ্টের পকেটে গুঁজে হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দু' কদম এগিয়ে এলেন। সারা চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ। সমুদ্রের মত গভীরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দুইই বিভানের ভূষণ। এককালের দিন-মজুর ও নিকট ভবিষ্যতের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। মিঃ বিভান, মিঃ মরিসন ও দলের অন্যান্য সদস্যরা ট্রান্‌সিট্ লাউঞ্জে আসতেই আমরা তাঁদের ঘিরে ধরলাম। প্রায় সকলেই সমস্বরে উদ্দেশ্য জানালাম। ডেলিগেশনের সবাই ঘরের দরজা আটকে এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। বিবেচ্য বিষয়, সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দেওয়া হবে কি না। এক মিনিটের মধ্যে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন সবাই। লেবার-পার্টি-সেক্রেটারী ডেলিগেশনের মুখপাত্র হয়ে সাংবাদিকদের কাছে কিছু বলতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন; 'এনি মিং উই সে হিয়ার টুডে, ইট্ উইল্ ট্রাইক্ দি হেড লাইন্‌স্ অফ্ দি ব্রিটিশ প্রেস টুমরো। সো, প্লিজ্ এক্‌স্‌কিউজ।'

বিভান মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসেই খালাস। একটি কথাও ব'ললেন না। তারপর ওঁরা সবাই হুইস্কির গেলাস নিয়ে আমাদের সাথে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা বলতে লাগ্‌লেন। হংকং'এ প্লেনের যান্ত্রিক গোলাযোগের কথা, আকাশ থেকে রাতের দমদমের দৃশ্য, কলকাতার চেহারা, এমনি আরো কত নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়। বিভান আমার কাছে জানতে চাইলেন, কলকাতার বস্তু পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। অতি দুঃখেও হেসে উঠলাম। নোট-বই পেন্‌সিলকে বেকার করে যত আজে-বাজে বিষয়ের আলোচনা। বিভান আমার মনঃকষ্টের কারণ উপলব্ধি করলেন। কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন; 'কাম্ টু মাই হোম্ মাই বয়, আই উইল্ স্যাটিস্‌ফাই ইউ।'

বলা বাহুল্য, বিভান গৃহে আমার যাওয়া হয় নি। এককালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নবীন দলের কর্ণধার ছিলেন সুভাষ—নেহরু। আজকের দিনে ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রবীণত্বে নবীনের ছোঁয়াচ দিয়ে রেখেছেন এ্যাণ্ডুরিন বিভান। দূরদর্শিতার অভাব আছে ব'লে অনেক সমালোচক বিভান-বিরোধী সমালোচনা ক'রে আত্মসন্তোষ লাভ করেন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ব্যক্তিগত মাধুর্য্যে ও স্বকীয়তায় বিভান চিরস্মরণীয় হয়ে রইবেন। এদিকে আমাদের রামমনোহর লোহিয়া বিভানের সমগোত্রীয়। আজকে নয়, জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামশীল দিনগুলির ঐতিহাসিক ক্ষণে নবাযুবক রামমনোহরকে জাতীয় কংগ্রেসের সদ্যসৃষ্ট পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ ক'রতে আহ্বান জানান হয়েছিল। জুলিয়াস সিজারের মতন তিনবার ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, পরে গ্রহণ করেন। লোহিয়াকে 'সেটিংষ্টার' ব'লে ধ'রে নেওয়া হলেও তাঁর স্বকীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা আজও নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয়।

আর একদিন খর রৌদ্রের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে এয়ার পোর্টে এক বারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রত্যাশা করছিলাম এক কূটনীতিবিদের শুভাগমন। আই-সি-এস রত্ন-গোষ্ঠীর এক উজ্জ্বল মণি হলেন রাজন নেহরু। আর, কে, নেহরু নামেই খ্যাতি। দূর থেকেই প্লেনের নামা-ওঠা দেখছিলাম। আমার প্রত্যাশিত বিমানটি পৌঁছতে তখনও সামান্য বিলম্ব। আশেপাশেই আরো কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ বা সদ্য-আগত, কেউ বা অভীপ্সিত ব্যক্তির প্রতীক্ষায় আমারই মত অপেক্ষমান। দৃষ্টিটা সুদূরপ্রসারী ছিল। এক বিমানের ক্যাপ্টেনকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ঠিক পাশের ভদ্রলোককে বললেন; 'ইওর এক্‌সেলেন্‌সি, হিয়ার ইজ্ ইওর চাইনীজ্

ক্যাপ্‌।' 'ইওর এক্সেলেন্সি' শুনতেই একটু চমক লাগল। লক্ষ্য করে দেখি, নেহরু সাহেব পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাঁর ট্রেন পৌঁচেছে। ভুল করে ট্রেনের মধ্যে নিজের চাইনাজ্‌ ক্যাপটি ফেলে এসেছিলেন, ক্যাপ্টেন তাই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। নিজের পরিচয় দিতেই হাসিমুখে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণভাবে করমর্দ্দন করলেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ নেহরু। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত-চীনের সম্পর্ক দিনে দিনে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন হচ্ছে, তাই পররাষ্ট্র দপ্তরের একটু অসুবিধা হলেও রাজন নেহরুকে পিকিঙে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করা হয়। নয়াদিল্লী থেকে পিকিঙ যাবার পথেই তাঁর কলকাতা আগমন। যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে যৌতুকের মধ্যে জীবন কাটিয়ে বোধ করি জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাই নেহরু-ভ্রাতা প্রৌঢ়ত্বের বিদায় বেলায় সম্প্রতি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন এক হাকসার নাতনীর সঙ্গে। কলকাতায় মাত্র কয়েকঘণ্টা রইবেন। এখানেও তাঁর এক নিকট-আত্মীয় আছেন। তাঁরা হচ্ছেন মিঃ এবং মিসেস হাকসার। রাজভবনের পরিবর্ত্তে হাকসার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রকে অগ্রাহ্য ক'রে ধমধম্‌ এসেছি কিছু সংবাদ সংগ্রহের আশায়। মিঃ নেহরু নানান কথার জালে আমার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রে দিলেন। তবে ভদ্রতার কার্পণ্য ক'রলেন না। গাড়ীতে লিফ্‌ট্‌ দিলেন। সিগারেট অফার করে নিজের হাতে লাইটার জ্বেলে দিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে নানান কথা জানতে চাইলেন। স্বল্প বয়সে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন জানালেন। এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে নেমে গেলাম। গাড়ী থেকে নামার পূর্ব্বে অপরাহ্নে হাকসার গৃহে চায়ের মজলিসে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। ব'ললেন: 'প্লিজ্‌, ডোণ্ট্‌ ফেল্‌, মাই ফ্রেণ্ড!'

হাকসার গৃহের দ্বারদেশে যখন উপস্থিত হলাম, চারটে বাজতে তখনও মিনিট চারেক। একটু পায়চারী ক'রে মিনিট তিনেক কাটিয়ে উপরে উঠে গেলাম। দরজা নক্‌ ক'রতেই একটি মেয়ে হাজির হলেন। নেহরু সাহেবের কথা বলতেই ড্রয়িংরুমে নিয়ে এক সোফায় বসিয়ে দিলেন। সুবিস্তীর্ণ ঘর। চরণযুগলের তলে মূল্যবান কার্পেট। তিনদিকে পাঁচটি সোফা। অপর একদিকে বেটেখাটো তক্তাপোষের উপর রুচি ও আভিজাত্যসম্মত একটি সতরঞ্চি ও তাকিয়া। তার উপর হেমিংওয়ের কি যেন একখানা বই ও এ্যালান ব্লেয়ার অনুদিত নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত 'ব্যারাব্বাস।' ঘরের চারদিকে মূল্যবান কয়েকখানা অয়েল ও ওয়াটার কলার পেন্টিং। তার অন্যতমটি হ'ল যামিনী রায়ের অতি পরিচিত গণেশ চিত্রটি। নানান সেল্‌ফে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল্যবান রত্নাবলী। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্মৃতিনিয়। দু'এক মিনিটের মধ্যেই ভিতর ঘর থেকে ভারী পর্দ্দা সরিয়ে মিঃ নেহরু ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন। 'হাউ ইন্‌ টাইম্‌! গ্লাড্‌স্‌ লাইক্‌ এ টু আর্নালিষ্ট!' আদর করে কি যেন একটা নাম ধরে ডাক দিলেন। পূর্ব্বতন মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাকসার-নন্দিনী ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ নেহরু।

জোড়হাতে শ্রীমতী বলে উঠলেন: 'নমস্তে, ভাই সাব।'

সামাজিক প্রতিপত্তি ও আর্থিক প্রাচুর্য্য থাকলে হৃদয়-প্রাচুর্য্যের অভাব ঘটে। এতদিন এই কথাই বিশ্বাস করে এসেছি। শ্রীমতীর মাতামহ ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। পিতামহ ছিলেন কাশ্মীরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট এবং পরবর্ত্তীকালের কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী। পিতা ব্যবসা-বাণিজ্যে দুনিয়ার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। মাতাঠাকুরাণী সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশ করেছেন সমাজ-সেবিকারূপে। তাই প্রারম্ভিক পরিচয়ে এর কাছ থেকে এমন হৃদ্য সম্বোধন প্রত্যাশা করিনি। নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লাম: 'নমস্তে, দিদিভাই।'

হাকসার দম্পতি গৃহে ছিলেন না। একমাত্র পুত্র করেন্‌ সাহিবের গৌরবোজ্জ্বল তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। অপর এক কন্যা নয়াদিল্লীতে মাতামহ সন্দর্শনে। অতিথি আপ্যায়নের ভার তাই 'দিদিভাই'এর উপরই ন্যস্ত হয়েছিল।

বাক্‌-চাতুর্য্যে রাজন নেহরুর খ্যাতি আছে নয়াদিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী মহলে। অতিথি আপ্যায়নের আসর-বাসরে তাঁর উপস্থিতি সর্ব্বজনকাম্য, সর্ব্বজনধন্যও বটে। সৌভাগ্যের চূড়ায় চূড়ায় তাঁর নিত্য চলাফেরা।

তবুও মুখের হাসির অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনে বিন্দুমাত্রও। হাকসার-বিহীন হাকসার গৃহও তাই একটুও ম্লান লাগল না। ঘণ্টাদিককাল স্নেহস্পর্শ উপভোগ করলাম সর্ব্বান্তঃকরণে।

মধ্যরাত্রির বিমানেই পিকিঙের পথে হংকং রওনা হবার স্থির ছিল মিঃ নেহরুর। দমদমের লাউঞ্জের এক-পাশে দেখলাম 'দি হাকসার' পরিবৃত নেহরুকে। কাছে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিলেন মিঃ নেহরু। পরিচয় করিয়ে দিলেন হাকসার দম্পতির সাথে।

'রাজন ভাই ইজ প্রাউড টু প্রেজেণ্ট হিজ ইয়ং ফ্রেণ্ড্।'

হাসিমুখে আদর ক'রে পাশে বসালেন হাকসার-জায়া। এলাহাবাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা শুনে উল্লসিত হলেন। আমন্ত্রণ জানালেন পরদিন অপরাহ্ণ-কালীন চায়ের আসরে। লজ্জা পেয়েছিলাম এমন অকস্মাৎ স্নেহস্পর্শে। কথা না ব'লে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের গুরুত্ব স্বীকার ক'রেছেন বীরযোদ্ধা নেপোলিয়ন, গণতন্ত্রের অমরসাধক এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন। Lords Spiritual, Lords Temporal ও Commons এর পরেই 'ফোর্থ এষ্টেট্' হিসাবে সংবাদপত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বার্ক। সাংবাদিকদের 'True kings and clergy' বলেছিলেন দার্শনিকপ্রবর কার্লাইল্। ভারতবর্ষে 'প্রফেশনাল্' পলিটিশিয়নরা কিছুটা প্রাণের টানে, কিছুটা স্বার্থের খাতিরে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সমাদর ক'রলেও, বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীতে অপাংক্তেয় ছিলেন সাংবাদিকরা দীর্ঘকাল। কৌলীন্য ও কৃতিত্ব প্রচারেই এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ব্যবহার হয় সর্ব্বাধিক। সমাজের সঙ্গে পাড়ার মুদি বা বীমা-প্রতিষ্ঠানের দালালদের চাইতে সাংবাদিকদের যোগাযোগটা একটু বেশী ক্ষীণ। বিশেষতঃ সমাজের যে অংশ পেচক-বাহিতার আশীর্ব্বাদধন্য, তাদের সঙ্গে সংবাদপত্র ও সাংবা-দিকদের কোন যোগসূত্র নেই বললেই চলে। হাকসার পরিবারের খ্যাতি উভয়তঃ। লক্ষ্মী-সরস্বতীর যৌথ আশীর্ব্বাদপুত পরিবার এটি। সে জন্য হাকসার গৃহিণীর স্নেহ-প্রীতি স্পর্শ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মুগ্ধ হ'য়ে যে অন্যায় করি নি, তার প্রমাণ পেলাম পরদিন অপরাহ্ণে। আদর আপ্যায়নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ক'রলেন না। শুধু তাই নয়। স্নেহময় মাতৃত্বের অধিকার দান করলেন। তাও তাও বাংলায় বললেন; 'তুমি আমাকে মা বলবে, কেমন!'

কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম। প্রণাম ক'রে সেদিনের মতন বিদায় নিলাম। আই-সি-এস্ সম্বর্শনে এসে দাঁড়ালাম। আই-সি-এস্ সান্নিধ্যে আর একটা সুখকর অভিজ্ঞতাও হয়েছিল।

আই-সি-এস্ তিলকাঙ্কিত ভাগ্যবানেরাও যে মানুষ, বা তাঁদের সুখ-দুঃখের অনুভূতিটা যে আমাদেরই মতন, এ কথা অসংখ্য খদ্দরধারী মাত্র সেদিন পর্য্যন্তও বিশ্বাস ক'রতেন না। এদের সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরের একটা অদৃশ্য-আত্মীয়তা কল্পনা করতেন অনেকেই। আই-সি-এস্দের সম্পর্কে আমার এমন কোনো গোঁড়ামি কোনো কালেই ছিলনা, বোধকরি সম্ভবও নয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টা-রের দায়িত্ব পালন ক'রতে গিয়ে যে দু-চারজন আই-সি-এস এর সান্নিধ্যে এসে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি পেয়েছি, মিঃ বি-আর-সেন তাঁদের অন্যতম। দেশ স্বাধীন হবার পর যে ক'জন বঙ্গজ সন্তান তাঁদের প্রশস্ত ললাটে আই-সি-এস্ এর জয়তিলক ধারণ ক'রে জনচিত্ত ও অদৃষ্ট সোপানে সোপানে জয় করেছেন, বিনয়রঞ্জন তাঁদেরই একজন।

অগ্নিক্ষরা ১৯৪২ সাল! আগষ্ট মাসের বোম্বাই কংগ্রেসে মহাত্মাজী স্বয়ং 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আকাশ বাতাস মুখরিত ক'রে চারদিক থেকে মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠেছিল। ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কচ্ছ থেকে কামরূপ, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা বিস্তৃত ভারতবর্ষের দিকে দিকে সুরু হ'ল ইংরেজ-বিতাড়ন যজ্ঞ। ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন। বাংলা দেশের মেদিনীপুরে স্বদেশী-রাজই গ'ড়ে উঠ্ল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এন্, এম খান নিজের বাংলোয় শুধু পায়চারী ক'রে কাটিয়েছিলেন রাতের পর রাত। তন্দ্রাচ্ছন্ন শেষ রাত্রিতে 'তেরঙ্গা' আর 'বন্দেমাতরম্' এর দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় ক'রে উঠতেন। 'শয়তান'দের শায়েস্তা করবার নেশায় মশগুল হয়ে উঠেছিলেন এই খাঁ সাহেব।

অক্টোবরে হ'ল এক মহা 'সাইক্লোন্'। সারা মেদিনী-পুরই প্রায় এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল। ঘাটের খান,

ঘরের চাল উড়ে গেল। প'ড়ে রইল নারী-পুরুষ গরু-ছাগলের মৃতদেহ। প্রকৃতির খেয়ালে মেদিনীপুরবাসীদের এই নির্মম নিগ্রহে চারিদিকে উঠেছিল কান্নার রোল। রোম-সম্রাট নীরোর মতন এন-এম-খান দেশবাসীর এমনি দুঃখের দিনে বাঁশি বাজিয়েছিলেন। সারা দেশে হাহাকার রব উঠলেও, খাঁ সাহেবের হৃদয়ে তার বিন্দুমাত্র ঢেউ লাগেনি। তিনদিন বাদে বাংলা সরকারের হেড কোয়ার্টার্স রাইটার্স বিল্ডিংসে সে খবর গেলেছিলেন। খবর পাঠিয়ে তলায় একটু ছোট্ট মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন খাঁ সাহেব। লিখেছিলেন: মেদিনীপুরের লোকজনকে জব্দ করার এই মহত্তম সুযোগ। সুতরাং সাইক্লোন্ বিধ্বস্ত রাইট্রোটী মেদিনীপুরবাসীদের কোনো সাহায্য না দেওয়াই একান্ত সমীচীন হবে।

তদানীন্তন লীগ মন্ত্রিসভার সদস্যদের আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন খাঁ সাহেব। এর গায়ের রং ছিল দুধে-আলতায়। মাথায় ছিল না চুলের বালাই, চোখেও লজ্জার বালাই ছিল না। তাই তিনি একথা লিখেছিলেন।

বি-আর-সেন তখন বাংলা সরকারের রাজস্ব দপ্তরের সেক্রেটারী; সাহায্য দপ্তরও তাঁরই অধীনে ছিল। তিনদিন বাদে সাইক্লোনের খবর পেয়ে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। খবরে শেষে খাঁ সাহেবের মন্তব্য দেখে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। খাঁ সাহেবের যথেচ্ছাচারে অনেকেরই ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছিল। বি-আর-সেনও অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছিলেন। এর ঔদাসীন্য বাংলা দেশের কত নরনারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হ'য়েছিল। বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর প্রতি এমন নির্মম ঔদাসীন্য বরদাস্ত করতে পারেন নি সেন সাহেব। 'বাজার' বাজিয়ে পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট অমর মুখার্জীকে ডাক দিয়েছিলেন। ব'লেছিলেন: নোট্ ডাউন!...'Crown is above all. Crown can not differenciate between one citizen and another, specially in their distress'...আরো কত কি! সে তো কোনো আমলাতান্ত্রিক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নোট নয়, অনাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনসেবকের বিজয় অভিযান। ফাইলের স্তূপ নিয়ে লীগ মন্ত্রীপুঙ্গবদের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি তুলে ধরেননি মিঃ সেন, সরাসরি লাটসাহেবের বাড়ী হানা দিয়েছিলেন। লাটসাহেবকে দিয়ে মেদিনীপুরে সাহায্য পাঠাবার আদেশ লিখিয়েই রাইটার্স বিল্ডিংস্ ফিরেছিলেন।

লীগ মন্ত্রীসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্গত মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল সরকারী সাহায্য।

সাহায্য দানের ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথমে পরিচালিত করবার জন্য সেন সাহেব মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরলেন। প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ নিতাই পাঠাচ্ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে। লীগ-পুঙ্গবদের বলে বলীয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট সে সব প্রায় উপেক্ষাই ক'রছিলেন। এন-এম-খানকে সাহায্য-কার্য্য ঠিক মতন পরিচালিত করতে বাধ্য করবার জন্য সেন সাহেব লাট সাহেবকে দিয়ে 'অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী'র এক পদসৃষ্টি ক'রলেন। নিজেই সে পদে হ'লেন বহাল; বাংলা দেশের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত অন্য কেউ অতিরিক্ত চীফ্ সেক্রেটারী হ'ন নি। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। এবার দিতে লাগলেন অর্ডারের পর অর্ডার। খাঁ সাহেব নিঃশব্দে শিরোনাম স্বরূপ ক'রে সেন সাহেবের অর্ডার পালন ক'রতে লাগলেন। ধুতি-পাঞ্জাবী না প'রে, চরকা না কেটে, বাংলা কথা না বলেও যে দেশের সেবা করা যায় এবং দেশবাসীকে ভালোবাসা যায়, বি-আর-সেন তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। বোধকরি সরকারী নথিপত্রে আজও এই সব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

সেন সাহেব বাহ্যিক আচরণে যতটা সাহেবীয়ানা দেখান, ভিতরে ভিতরে ঠিক ততটাই তিনি বাঙ্গালী, ভারতবাসী। নিজের কনিষ্ঠা কন্যার নাম উর্ম্মিলা রেখেও তা প্রমাণ করেছেন।

স্যার জন হার্ব্বার্ট—তখন বাংলা দেশের লাটসাহেব। দেহটা লম্বা-চওড়ায় বিরাট হ'লেও হৃৎপিণ্ডটা বোধকরি তত বড় ছিল না। তাই বি-আর-সেনের প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। মিঃ সেনও সে কথা জানতেন। লীগ মন্ত্রিসভা ও ইংরেজ লাটসাহেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দিল্লীর সদনদে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিলেন বি-আর-সেন।

দেশটা দু'টুকরা হবার পর এন-এম-খানেরও অদৃষ্টের সিংহদ্বার খুলেছিল। অতীত জীবনে সৃষ্ট কঙ্কালস্তূপের উপর ব'সে খাঁ সাহেব পূর্ব্ব বাংলার চীফ সেক্রেটারী হয়ে-

ছিলেন। পূর্ব বাংলাকে রসাতলে দেবার জন্য যোড়শোপচারে যাগ-যজ্ঞ ক'রেছিলেন। ফজলুল হক মন্ত্রি-সভাকে পদচ্যুত ও ইস্কান্দার মীর্জাকে ঢাকাই নবাবী পদে নিয়োগ ক'রতে খাঁ সাহেব অসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ব'লেও তাঁর সুনাম আছে। কবর ফুঁড়ে জিন্নাই বোধহয় খাঁ সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অথবা খাঁ সাহেবের প্রতি সুবিচার করবার জন্য জিন্না করাচীর কর্তাদের স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। নচেৎ, খাঁ সাহেব প্ল্যানচেটে জিন্নাকে টেনে এনে নিজের দরখাস্তের উপর 'strongly recommended' লিখিয়ে নিয়েছিলেন। মিথ্যা কথা ব'লব না, দয়ার্দ্রচিত্ত করাচীর মহাপ্রভুরাও খাঁ সাহেবের প্রতি অবিচার করেন নি, বরং একটু অতিরিক্ত সুবিচারই ক'রেছেন।

জওহরলালজী পাকা জহরী। বুঝতে পেরেছিলেন, বিনয়রঞ্জন একটি রত্নমুখী নীলা। সে জন্য তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতেও কার্পণ্য করেন নি। ওয়াশিংটনে প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ক'রেছিলেন। খাদ্যসঙ্কটের মহাদুর্দিনে স্বদেশে টেনে এনে ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার অর্পণ করেছিলেন। পরে আবার রাষ্ট্র-দূতের গুরুদায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন রোমে, টোকিওতে। মিঃ সেন টোকিও থেকে আবার গিয়েছেন রোমে। তবে এবার আর রাষ্ট্রদূত হ'য়ে নয়; সারা বিশ্বের কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারীর নিত্যকার গ্রাসাচ্ছাদনের মহান ও পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে। ইউনাইটেড নেশনস্'এর অন্যতম প্রধান সংস্থা হ'চ্ছে—আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। প্রতিটি দেশের প্রতিটি নরনারীর অন্ন যোগাবার গুরুদায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। আমাদের সৌভাগ্য, বি-আর-সেন এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সর্বময় প্রধান। ডাইরেক্টর জেনারেল। এশিয়াবাসীর মধ্যে ইনিই প্রথম এই পদ অলঙ্কৃত ক'রলেন। মাদাম বিজয়লক্ষ্মী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভানেত্রী হ'য়ে নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন। এফ-এ-ও'র ডাইরেক্টর জেনারেল হ'য়ে বি আর-সেন ভারতবাসীর মর্যাদা আর একবার বিশ্ব-সভায় প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, একথাও সর্বজনস্বীকৃত। তা ছাড়া বাঙালীর কাছে আর একটা কথা স্মরণযোগ্য। বিদেশে যত বাঙালী আছেন, বি-আর-সেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত ব্যক্তি।

রোম থেকে চ'লেছেন টোকিও। দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার এক আভিজাত্য পল্লীর ভ্রাতৃনিবাসে রইবেন ক'দিন। একটা টেলিফোন ক'রলাম। মহিলাকণ্ঠে শুনলাম—'ইয়েস্, ইয়েস্, আর ইউ এ রিপোর্টার?' আপনি একজন রিপোর্টার? চোস্ত ইংরেজি। আমি কিন্তু বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্মরণ ক'রে নিতান্ত শুদ্ধ বাংলায়ই ব'ললাম: হ্যাঁ, আমি একজন রিপোর্টার।

—ওয়াট্, এ মিনিট, প্লিজ্, হোল্ড-অন্—একটু ধরুন।

অনুমান ক'রলাম রাষ্ট্রদূত-কন্যা বা তদীয় ভ্রাতৃনন্দিনী আবার রাষ্ট্রদূত সেন সাহেবের অনুমতি নিতে গেলেন। একটা মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এলেন।

—ক্যান্ ইউ কাম্ রাইট নাউ? এক্ষুণি আসতে পারেন?

—নিশ্চয়ই।

—মাইণ্ড্ স্যাট। সাতটার সময় একটা পার্টি আছে, প্লিজ রিমেমবার!

কালক্ষেপ না ক'রেই রওনা হ'লাম। সেন কুঠীতে যখন হাজির হলাম, তখন সূর্য ডুবু ডুবু। শীতকাল। পাম গাছের চূড়ায় চূড়ায় বিদায়ী সূর্যরশ্মির শেষ আভা। দরজার সামনে ছোট্ট একটি মোটর। আকারে ছোট হ'লেও অগৌরবের নয়; গৌরবময় ভিপ্লোমাটিকে নাম্বার প্লেটের তিলক তার ললাটে। বাইরে থেকে বাটাম প্রেস করলাম, অভ্যাগতের আগমনবার্তার সঙ্কেত বাজল ভিতরে। একটি 'তন্বী শ্যামা অধরা বদনা' দরজা খুললেন। স্তাপ্ করা স্ফীতকায় ও খর্বাকৃতি কুন্তলরাশি তার সারা মুখমণ্ডলে ব্যাপ্ত। সযত্নে দুটি আঙুলের সাহায্যে অবাধ্য কুন্তল-রাশিকে একটু মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। টানা টানা চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার দিকে প্রসারিত করতেই, আমি মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই জানালাম। ঝড়ের বেগে বাঁক ফিরে ঘরে ঢুকতে যেয়ে হঠাৎ পিছন ফিরলেন।

—আপনার নাম?

আমি শুধু হিন্দুই নই, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। পিতৃপুরুষ যজন যাজন করতেন। বন্ধুমণ্ডলে এখনও চাল-কলার সাথে অকারণ আমার নাম একত্রে উচ্চারিত হয়। পূর্ব পুরুষকে যজন-যাজন করতে আমি দেখিনি। তবে তার প্রমাণ সংসারের সর্বত্র পেয়েছি। আমার নামকরণেও তার

প্রমাণ আছে। যেন আমার জন্ম হ'য়েছে, অথচ আমার মনের জন্ম হয় নি, বিবেচনা শক্তির উদ্বোধন হয় নি—তখন পিতৃবন্ধু আমার সারা জীবনের পরিচয় পত্রে একটি দেবতার নাম—লিখে দিয়েছিলেন। কণ্ঠস্বরে জড়তা আসলেও, সে নামটি জানালাম। নাম শুনে মেয়েটি হেসেই আটখান।

নক্সা করা মাইসোর সিল্কের শাড়ীর প্রলম্বিত আঁচল উড়িয়ে এসে ভিতরে ডাক দিলেন। আমি ভিতরে গেলে মিঃ সেন এসুনি উপর থেকে নীচে আসছেন জানিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী পাশের ঘরের মজলিশে যোগ দিলেন।

মিঃ সেন ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। একটা ঘর পেরিয়ে পাশের এক বারান্দায় আমরা বসলাম। সামনে লন। আশে পাশে পেরুভিয়ান লিলি, ক্রিসানথিমাম আরো কি কি যেন ফুলের বর্ণাঢ্য সম্ভার—কথায় কথায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানান খবর জানালেন। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা ব'ললাম। তিনিও তাই। অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা হ'ল। সাতটার পার্টির সময় উত্তরে গেল। কাজের কথার ফাঁকে ফাঁকে গুটিকতক ব্যক্তিগত প্রশ্নও জানাতে চাইলেন। সানন্দে আমিও জানাই। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে তাঁর দরদী মনের স্পর্শ পেয়ে তৃপ্তি পাই। বিদায় নেবার জন্য দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, নমস্কার জানিয়ে বাইরের দিকে এক পা বাড়িয়েছি, এমন সময় মিঃ সেন হঠাৎ আমার হাতটাকে চেপে ধরলেন। ব'ললেন: 'শরীরটা ভালো কর। হেল্‌থ ইজ্‌ ইয়োর বেষ্ট্‌ ফ্রেণ্ড্‌। তা ছাড়া—হোয়াই নট এনি ওয়ার্ম ক্লোথিং-গরম জামা-কাপড় কিছু গায়ে নেই কেন?'

আমাদের দু'জনকে ঘিরে বাড়ীর কয়েক জন নারী-পুরুষের জমায়েত। তার মধ্যে 'তিনিও' আছেন। সলজ্জ-ভাবে জানালাম, স্বাস্থ্য আর ভালো ক'রব কেমন ক'রে বলুন। আর গরম জামা কাপড় আমার বিশেষ নেই।'

'—দ্যাট্‌ ইজ্‌ মাষ্ট হ্যাভ্‌, সারলি: ইউ মাষ্ট প্রোটেক্ট ইওর্‌ বডি এগেন্‌ষ্ট কোল্ড—'

—সে তো নিশ্চয়ই।

আমার পিঠে দুটি চাপড় মারলেন। ব'সলেন: দি দি এগেন।

হাত এগিয়ে দিলেন, হ্যাণ্ড্‌ শেক করলেন—অভিভূত মনে ফিরে এলাম।

ইণ্টারভিউ-এর খবরটি টেলিপ্রিণ্টার-এ সব কাগজের অফিসে ছড়িয়ে পড়েছিল। যথারীতি ছাপাও হ'য়েছিল। আমিও ক'দিন পর আবার গিয়েছিলাম। এবার আর একতলার বারান্দায় নয়। দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। অভিজাত জাপানী পরিবারের ঘরের মত এ ঘরের গৃহসজ্জা। বেয়ারা চা দিল, খাবার দিল, মিঠাই দিল। মিঃ সেনও নিলেন। একটু দূরে পরিবারের আরো ক'জন অপরাহ্ণ-কালীন চায়ের টেবিলে। সঙ্কোচে একটি দু'টি খাবার খেলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। অতিথি সৎকারক তাতেও সন্তুষ্ট নন'। ফরম্যালিটিতে আস্থা নেই মিঃ সেনের।

—গো অন্‌ মাই বয়, লজ্জা কি?

তারপর কতবার গিয়েছি দেখা ক'রতে। কত কথা বলেছি, কত গল্পকাহিনী শুনেছি। জাপান বা রোম থেকে কলকাতা এলেই দেখা হ'য়েছে। সঙ্কোচে দু' একবার প্রয়োজনের সহযোগিতা বা পরামর্শ কামনা ক'রেছি। ব্যর্থ হইনি।

পারিবারিক জীবনেও দেখেছি কত না আনন্দ ক'রতে। ফটো তোলা মিঃ সেনের 'হবি'। রীলের পর রীল নাতনীর ছবি তোলেন। নাতনীকে কোলে নিয়ে প্রজেক্টারে ফেলে সেই ছবি দেখে হো হো ক'রে হেসে ওঠেন। মনে হয়েছে, এই হাসিরই কাঙাল উনি। জনে জনের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলাই ওঁর জীবনের সাধনা। আর এই কথা ভেবে ভেবে আমিও কতই না তৃপ্তি পেয়েছি, পেয়েছি ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা!

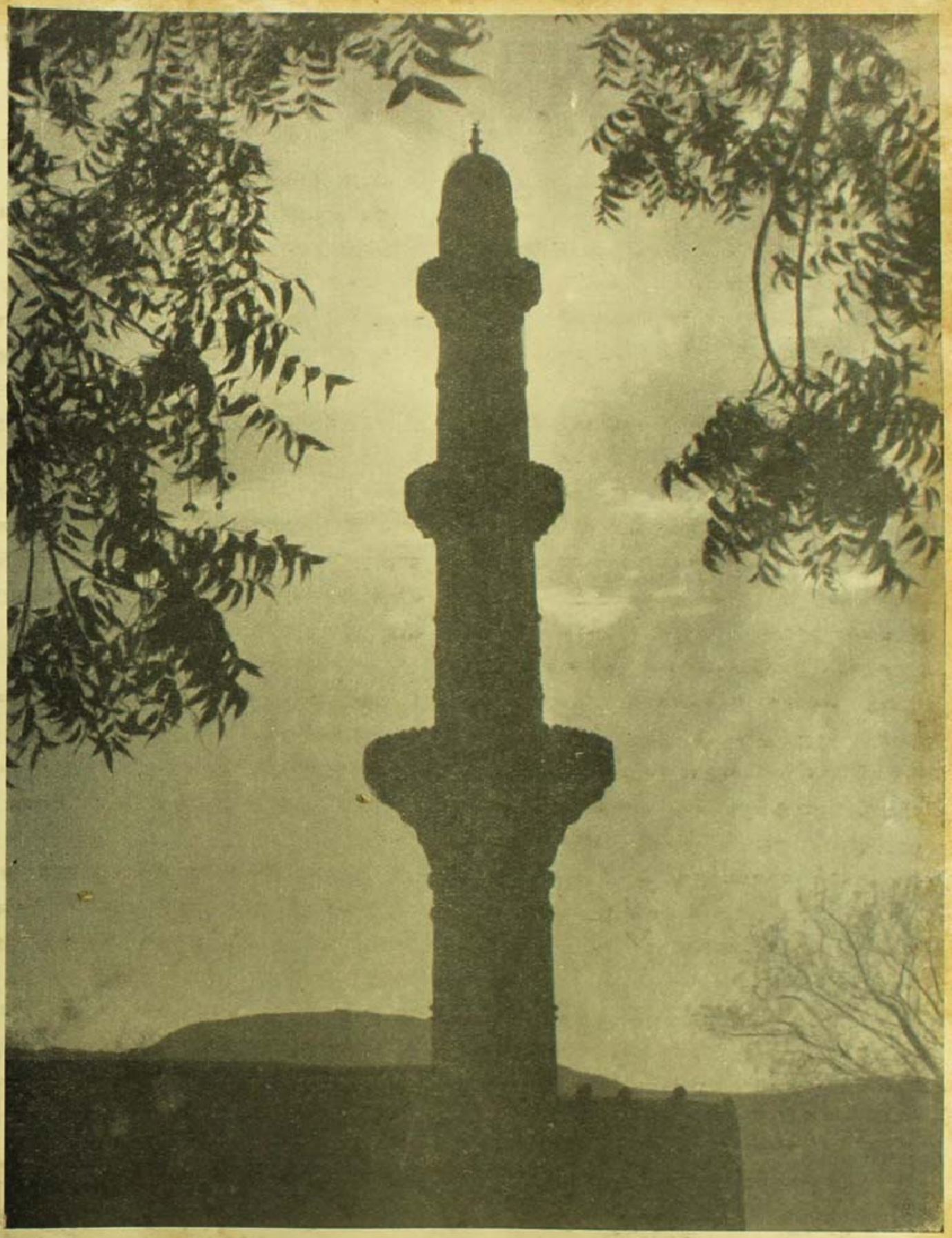

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

রাতের প্রহরী
(চাঁদ মিনার—হায়দরাবাদ)

ফটো : সুনীল ঘোষ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কুতবের স্বপ্ন

ফটো : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ফাগুন দিনের কথা

উপানন্দ

ফাল্গুন মাস। আবার এসেছে বসন্ত। গন্ধ বিধুর সমীরণে জেগে উঠেছে প্রান্তর বন। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উদ্ভিদ শিশু। হোলি উৎসব সমারোহে আবর্তিত হচ্ছে অন্তরের আনন্দ। মনে আর বনে চলেছে নানা রঙের খেলা। কবিগুরু বলেছেন—'আজি খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো, আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো। এই সংগীত মুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।' আজ যে ফুলটি ফুটে উঠছে তার অমর জীবনবিন্দু যাঁরে সঞ্চিত ছিল, তার অণুতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার জীবনোচ্ছ্বাস। রঙে বাউল সেজে কবি প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে বলে উঠলেন—'মন-রাঙা ওগো মনের রাঙাল! এমু কি তোমারি বেশে? চাঁপা নদীর কিনারে কিনারে ফাগুনী হাওয়ার ভেসে?'

প্রকৃতির রাজ্যে নূতন চেতনা হয়েছে সঞ্চারিত। চূত-মুকুলের সৌরভে ছুটে আসছে অলিদল—বিহঙ্গের বিচিত্র কলকাকলী, কোকিলের কুহুধ্বনি, নদীর কল্লোল বাঙ্গালীর ভাবজীবনের পটভূমিকায় এনেছে প্রাণের কেতার বাহিনী ধারা—পুষ্পপত্রের নবীনতায় যে অপূর্ব রূপ প্রত্যক্ষ হচ্ছে তা'তে আমাদের নয়ন মন বিমুগ্ধ—বিভিন্নরূপের বিচিত্র পরিবেশ মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন দিনেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হ'য়েছিল চারিশত একাত্তর বছর আগে। তিনি ভগবানের অবতার। বৈষ্ণব বলীয়ান্ কৃষ্ণকান্তা বালক চৈতন্য পাঠশালায় যা একবার শুনতেন, তা আর ভুলতেন না। ছেলেবেলাতেই তিনি একজন মহাপণ্ডিত হয়েছিলেন। আপনার অলৌকিক প্রতিভাগুণে চৈতন্যদেব সাহিত্য, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার অসাধারণ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তদানীন্তন বিদ্বিষ্ণী পণ্ডিতও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁর করুণার ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে অসাধারণ জ্ঞানগত ও সারস্বত শক্তিলাভ করেছিলেন। ছেলে বেলা থেকেই তিনি সর্বজীবের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন—আর যথাসাধ্য পরিব দুঃখী প্রতিপালন, সাধু সন্ন্যাসী ফকির ও উদাসীকে সেবা করেছিলেন, অতিথিসৎকারেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। চৈতন্যদেবের দুই বিবাহ। কথিত আছে, তাঁর ধর্মপরায়ণা প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে। যতদিন তিনি গৃহীছিলেন ততদিন সংসার থেকেও আসক্তিমুক্ত বৈরাগী ছিলেন। গয়াক্ষেত্রে ঈশ্বরপুরী নামক একজন ব্রহ্মচারীর কাছে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন, তদবধি তাঁর হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হওয়ায় কেবল হরিধ্বনি, হরিজ্ঞান, রাধাকৃষ্ণের ভজনই ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। নবদ্বীপে ফিরে এসে আর সংসারে তিনি মনোনিবেশ করতে পারতেন না, কোন কাজে কর্তৃত্ব তাঁর ভালো লাগতো না।

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সভ্যতাও সংস্কৃতি তাঁর পরিশেষ সমগ্রভাবেরই আদর্শস্থল হয়েছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্পকলা সবকিছুই তাঁর আবির্ভাবে উন্নত স্তরে উঠেছিল। ধর্মজগতে তিনি নূতন ভাবধারা প্রবর্তন করেছিলেন, বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীতের ওপর তিনি নূতন আলোক সম্পাত করে গেছেন—তাঁরই আনুকূল্যে আমাদের সমাজবোধ হয়েছে, গণচেতনা সঞ্চারিত হয়েছে, আর সঙ্ঘ-উপাসনা করার পদ্ধতি পাওয়া গেছে। পতিতপাবন ভগবানই যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বাঙ্গালাদেশে এই সত্য উপলব্ধি হয়েছে। ন্যূনাধিক পঁচিশবর্ষ বয়সে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন, সেই থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিহিত হন। আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর তিরোভাব হয়। তিনি হিন্দুজাতির সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করে গেছেন। হরিজনকেও তিনি পরিত্রাণ করে নিয়েছিলেন।

তিনি যে ভগবান স্বয়ং, একথা শুধু অবধূত নিত্যানন্দই জানতে পারেননি, উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী রায় রামানন্দও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যাঁর নামে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভরে প্রকম্পিত হয়ে উঠতো সেই উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তাঁর পরম নিধে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়েছিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে হাজার বছর

আগে উল্লিখিত হয়েছে। এই বাগানে পৌষ পূর্ণিমায় তাঁর উদ্দেশে তোমরা প্রতি-অন্ন দিয়ে তাঁর মহাজীবন অনুধ্যান করবে। তাঁরই লীলা-সহচর অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা মাহাত্ম্য প্রচার করার উদ্দেশ্যে এ ফুল শ্রীশ্রীবৎ রাঘবদাস বাবাজীরূপে এই বাগানে অবতরণ করেছিলেন। হৈকুণ্ঠনাথ রামদাস বাবাজী নামকীর্তনের মাধ্যমে জাতির অন্তরে ভাবরসশক্তি সঞ্চারিত করে গেছেন। এস, আমরা তাঁরও উদ্দেশে আমাদের প্রাণের প্রণাম জানাই।

যুগাবতার ভগবান পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এই বাগানের শুভাধিষ্ঠাতা। তিনি এক মুহূর্ত অবতরণ করেছিলেন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষুদিরাম ও তাঁর পিতৃপুরুষদের বাসস্থান ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামে। একবার সেখানকার জমিদার এক মিথ্যা মকদ্দমার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহভাবে মোকর্দমা উপস্থিত করে ক্ষুদিরামকে তাঁর পক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করেন। জমিদার জানতেন, ক্ষুদিরামের সত্যনিষ্ঠার প্রতি জনসাধারণের এমনই গভীর শ্রদ্ধা যে, তিনি মুখ ফিরে যা বলবেন, তাই সকলে বিশ্বাস করবে। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ক্ষুদিরাম দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করলেন। জমিদার বিরক্ত না হয়ে তাঁকে অর্থের প্রলোভন দেখালেন, অবশেষে জাতি প্রহর্ষনও করলেন; তেজস্বী ব্রাহ্মণ এতেও ধর্মপথ ত্যাগ করলেন না। পরিণামে এই হোলো যে, দুর্দান্ত জমিদারের কোপে পৈতৃক বাস্তুভিটা, প্রায় দেড়শত বিঘা ভূমি ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে ক্ষুদিরামকে দলপতিবারে পথে এসে দাঁড়াতে হোলো—নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন অবস্থায়। তবুও সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলেন না। ভগবান সহায় হোলেন, কামারপুকুরনিবাসী জনৈক বন্ধু ক্ষুদিরামের এইরূপ বিপদে বিচলিত হয়ে তাঁকে ভূমি ও অর্থদানে সপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এইরকম আদর্শ পরিবারেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর মাও আদর্শ মহিলা ছিলেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ধনেশ্বরী।

গয়াধামে ক্ষুদিরামের অবস্থানকালে তিনি এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করেন,—শঙ্খচক্র-গদা পদ্মধারী নারায়ণ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে বলেছিলেন—'আমি পুত্ররূপে তোমার ঘরে যাবো।'

রামকৃষ্ণ ছেলেবেলা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। ছেলে-বেলা থেকেই—তাঁর ঠাকুর দেবতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। তিনি নিজের হাতে মাটির ঠাকুর গড়িয়ে পূজা করতেন এবং সময়ে সময়ে ভাবে অচেতন হয়ে পড়তেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাঁর জ্যেষ্ঠের স্কন্ধের ওপর পড়লো। মেধাবী রামকুমার যৌবনের প্রারম্ভেই ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হোলেন, তাঁর উপার্জনে সংসারের অভাব অনেকাংশে মোচন করলো। এই রামকুমার দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর প্রথম পূজক হ'য়েছিলেন। প্রভু গদাধর এখানে বেদব্রহ্মরূপে বিমুক্ত হ'য়েছিলেন।

তাঁকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণেশ্বর তপোভূমিতে নবযুগ অভ্যুদয়ের 'জাগৃহি' মন্ত্র উদার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল—তাঁরই মাতৃত্বময় হৃদয় থেকে আগত প্রণাম শিরে ধারণ করে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে আগত প্রণাম শিরে ধারণ করে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে আগত প্রণাম শিরে ধারণ করে সত্যানুভূতির বাণী গুলিরে গেছেন। পরমপুরুষ পরমহংসদেব সর্বধর্মের সাধনা করে বলে গেছেন—'যত মত তত পথ।' দক্ষিণেশ্বরকে তিনি করে গেছেন চিরতীর্থ, বিশ্বমানবের মিলন মন্দির। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা বহু মত ও বহু পথ সকল ধর্ম ভেদ বিভেদ ভুলে এই তীর্থে এসে মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলনের মহাতাপসমূহ ঠাকুর ঘর।

তিনি বলেছেন—'ভগবান লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।' মত—পথ, সকল ধর্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। ধর্ম কিন্তু ঈশ্বর নয়। কিন্তু ভিন্ন ধর্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। নদী সব নানাদিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।' ...তিনি জগজ্জননী মহাশক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাঁর নিত্যসঙ্গীনীকে ঘিরিয়ে দেছেন। ভগবানকে যে প্রত্যক্ষ করা যায় একথা তিনিই আমাদের কাছে প্রথম শুনিয়ে গেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ঘাড়ুবাবুকে পরাভক্ত ভগবৎ দর্শন করিয়েছেন এমনই ছিল তাঁর অসাধারণশক্তি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট মহাসমাধিতে তিনি মর্ত্যকায়া ত্যাগ করেন। তাঁর জন্মোৎসবে তোমরা সকলে মিলিত হয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করো। তাঁর পূজায় আত্মসমাহিত হও।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

(ধর্মঘট)

বীরু চট্টোপাধ্যায়

এখানকার একটি বড় প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘট নিয়ে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছিল।

গড়গড়ার শেষ টান দিয়ে গড়গড়া গাঙ্গুলী-মশায় বললেন :

তাঁর বক্তব্য শোনবার পূর্বে তাঁকেই আগে জানা প্রয়োজন। পিতৃদত্ত নাম তাঁর একটা নিশ্চয়ই ছিল এবং এখনও আছে একথা ঠিক, তবে সে নাম লোকে বেমালুম ভুলে গেছে। আজ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ঐ গড়গড়া গাঙ্গুলী নামেই জানে, এ নামটি কে বা কারা প্রথমে রেখেছিল সেটা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। তবে তাঁর অত্যধিক গড়গড়া-প্রিয়তাই যে এ নামের আদি উৎস, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ভীষণ তামাকপ্রিয়। যেখানেই তিনি যাবেন, নলহীন একটি লিলিপুট গড়গড়া তাঁর

যাহাতে থাকবেই। গড়গড়াহীন গাঙ্গুলী মশায়কে কল্পনা করা যায় না, তা কলকেতে আগুন থাকুক, চাই নাই থাকুক। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবচেয়ে বড়কথা তিনি সর্বজ্ঞ, অন্তত নিজেকে তাই তিনি মনে করেন। আধুনিক পৌরাণিক যে কোন আলোচনা করো না কেন, তিনি ঠিক তাতে ফোঁড়ন দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার (?) ঝুলি থেকে কিছু না কিছু শোনাবেনই। বাধা দিতে গেলে প্রচণ্ড রেগে যাবেন। কথা বলেন খই ফোটার মত অতি দ্রুত লয়ে। কণ্ঠ থেকে সাতটা পর্দাই সমস্বরে বাজে—এক কথায় স্বরভঙ্গ।

এ হেন গাঙ্গুলী মশায় বললেন :

—তবে শোন্ আমাদের সময়কার এক ধর্মঘটের কাহিনী। অবশ্য আজকের সংজ্ঞায় তাকে যদি আদৌ ধর্মঘটরূপে অভিহিত করা যায়। কেননা তাতে কোন ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল ছিলনা, হয়নি কোন মিটিং মহুমেণ্টের তলায়, কিংবা কোন ফেষ্টুন বা আবেদন নিবেদনের কোন কোন পোষ্টারও দেওয়ালে দেওয়ালে পড়েনি।

'ধর্মঘটি' বলতে ছিল মাত্র দুটি প্রাণী।

আমার পিসেমশাই ছিলেন মেজর। প্রথম মহাযুদ্ধে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করে মেসোপটামিয়া প্রভৃতি স্থান ঘুরে অবশেষে অক্ষত শরীরে ফিরে এলেন দেশে। তারপর পুরুলিয়ায় একটি বাংলো কিনে সেখানেই স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করলেন। বয়েস তখন তাঁর অনেক, প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে—বাড়ীর বাগানে ফুল ও ফলের, গাছও আগাছার বিচিত্র সব চাষ করে দিন কাটাতেন।

বাড়ীতে ছিল মাত্র চারটি প্রাণী।

পিসিমা, পিসেমশায়। আর রান্না ও বাসন মাজার জন্যে পিসিমার পেয়ারের ঝি খেন্তিদাসী। আর বাগানের মালী + চাকর + দরোয়ান + ঘোড়ার গাড়ির চালক ও সহীসরূপী প্রৌঢ় রামদাস কুর্মী। এই রামদাস যুদ্ধের সময় পিসেমশায়ের ব্যক্তিগত সেপাই বা আরদালী ছিল। সৈন্য বিভাগ ছাড়বার পর পিসেমশায় ওকে এনে নিজের কাজে বহাল করেছেন। পিসেমশায়ের উদ্ভট উদ্ভট সব পাগলামী ও কার্য্যকলাপের ও ছিল নিত্য সঙ্গী ও নিত্যসহচর। সর্বোপরি ছিল কুকুরের চেয়েও বেশী প্রভুভক্ত।

সোজা কথায় বাড়ীতে দুটি দল বিরাজিত ছিল।

পিসিমা ও তাঁর খেন্তিদাসী এবং পিসেমশায় ও তাঁর রামদাস।

মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়তো পুরুলিয়ায়। কয়েক-দিন সেখানে থেকে পিসিমার আদর খেয়ে,আর পিসেমশায়ের পাগলামি অসহ্য হবার দাখিল হলেই কেটে পড়তাম।

একবার গেছি। সেবারেই ঘটনা। বেশ কাটছিল দিন গুলো। সহসা একদিন কথা নয় বার্তা নয়, দুম্ করে দুজনেই নোটিশ দিয়ে বসলো।

প্রথমে এলো খেন্তিদাসী।

সকালে ডিমের আধ ডজন করে পোচ্ এবং মাখন রুটি আর কয়েকটা সিঙ্গাপুরী কলা দিয়ে চা সহযোগে আমরা প্রাতরাশ সারছি, পিসিমা পাশে বসে তদারকি করছেন, এমন সময় ধীরপদক্ষেপে সেখানে খেন্তিদাসীর আগমন হল। সজল চক্ষে সে এগিয়ে এল। খেন্তিদাসীর অবশ্য সর্বদাই চোখ সজল থাকতো। চোখে কি একটা রোগ যেন ছিল। এসে শাড়ির আঁচলটা নাকে লাগিয়ে অকারণে ফ্যাচ' করে নাক ঝাড়তেই পত্রিকা পাঠরত পিসে মশাই চমকে চাইলেন, তারপর বিরক্তিতে তাঁর পাকা ভ্রূযুগল কুঁচকে এলো, সদ্দি-বসাকণ্ঠে খিচিয়ে উঠলেন তিনি,
—যতসব নোংরা স্ত্রীলোকের কাজে বাড়ীতে টেকা যাবে না দেখছি।

অবশ্য স্বগতভাবেই বললেন কথাটা। স্বগতভাবে বললেন এই জন্যে যে—পিসিমার কানে যদি ঐলাইনটি যেত তাহলে তুল কালাম কিছু একটা হবার আশঙ্কা ছিল। পিসিমাকে পিসেমশায় একটু সমীহ করেই চলতেন। তাঁর পেয়ারের ঝি সম্বন্ধে তিনি কোন কটূক্তি বরদাস্ত করতে কখনোই রাজী ছিলেন না।

পুরো এক মিনিট, বিনাকাজে, নাক চাপা দেওয়া অবস্থায় খেন্তিদাসীকে দণ্ডায়মান দেখে অবশেষে পিসিমাই কোমল কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, কিছু বলবি নেত্তু?

খেন্তিদাসী যে কণ্ঠে এর প্রত্যুত্তরে বললে, আমায় বিদায় দিন মা। আমি আজই আমার দেশে চলে যাব। আমার—

ওরকম কাঁপানো রুদ্ধ কণ্ঠ সিনেমা থিয়েটারের করুণ দৃশ্যেই শোনা যায়।

পিসিমা ওর কথা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, বলিস

কি খেতু। এই তো গত মাসে তিনদিন ছুটি নিয়েছিল। তা ছাড়া কাল চোত সংক্রান্তি, বরদোর ঝাড় পোঁছ করতে হবে। এসময় তুই গেলে চলবে কি করে?

খেত্তিদাসী তেমনি করুণ 'পোজ'এ ও তেমনি করুণ কাঁপানো কণ্ঠে বললে, আমি যাবই মা। আপনারা জানেন আমার মত 'সহিমানী' মনিষ্যি পিরথীমিতে কমই পাবেন। কিন্তুকমা সে 'সহির ও একটা সীমে আছে জেনে রাখবেন।

পিসিমা কিছু না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। মুখভাবটা অনেকটা করে রইলেন 'তুমি যা বলেছ তা যথার্থ। সহ্যের নিশ্চয়ই একটা সীমা আছে'—গোছের।

—কিন্তু, খেত্তিদাসী বলে চলে, সে সহ্যির সীমা ও লোকটা ছাড়িয়ে গেছে মা।

এবার পিসিমা নড়ে-চড়ে বসলেন, বললেন, দোহাই তোর খেতু, খুলে বল্। আমি তো কিছুই মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছিনে। কে লোকটা কোন্ লোকটা—কার কথা বলছিস।

—ঐ লোকটা আমায় যাচ্ছেতাই বলে অপমান করেছে। খেত্তি দাসী তেমনি রহস্যময় রেখেই কথাটা চলে চলে।

পিসেমশায় পত্রিকা পাঠে মগ্ন থাকলেও দু'একবার বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূ উঁচিয়ে চাওয়াতে পিসিমা উঠে খেত্তিকে নিয়ে বারান্দায় গেলেন।

আমি দরজার পাশে বসেছিলাম, তাই ওদের কথাবার্তা যা কানে এল তা বলছি।

খেত্তিদাসী এবার রহস্য উদ্ঘাটন করলে, বললে, আপনাদের মেনিমুখো, রামদাস আমায় অপমান করেছে।

—রামদাস, পিসিমার বিস্মিতকণ্ঠ শুনলাম, কারণটা কি? খামোকা সে তোকে অপমানইবা করতে গেল কেন? খুলে বল্ খেত্তি, আর আমায় জ্বালাস্ নে।

—সে আমি বলতে পারবো না মা, খেত্তিদাসী রুদ্ধকণ্ঠে বললে, ওর মত বজ্জাত লোক যে বাড়ীতে থাকে তার চৌহদ্দির মধ্যে খেত্তিদাসী থাকবে না। দয়া করে আমায় বিদায় দিন। আমি আর কাজ করব নি। আমার যা পাওনা তা মিটিয়ে দিন।

—কি সেরোয় পড়লাম বল দিকি। পোড়ারমুখী খুলে বল্ কি হয়েছে।

তদুত্তরে খেত্তিদাসী কি বললে শুনতে পেলাম না, সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলেন পিসেমশায়। তারপর কাশির দমক কমলে আমাকে বললেন, বৎস, চল একবার বাগানটা দেখে আসি। ঢেঁড়স গাছগুলো কি রকম হল দেখা যাক। ওহো—আজ তো গ্যাদাল চারা লাগাবার কথা ছিল। আগে গিয়ে তুমি দেখ তো রেমো ব্যাটা কি করছে। তাকে বাগানে যেতে বল। আমি কাগজে শেয়ারের দরগুলো দেখেই যাচ্ছি।

উঠে গেলাম। বাগান পেরিয়ে বাড়ীর উত্তর সীমান্তে একটা টালির ঘরে রামদাসের কোয়ার্টার।

গিয়ে দেখি সে দরজার দিকে পেছন ফিরে একটা চটের থলে দিয়ে কি একটা বস্তুকে বাঁধতে ব্যস্ত। পাশে পড়ে রয়েছে রং-চটা তোবড়ানো, কিম্ভূত কিমাকার এক সুটকেস। তার পাশে পেতলের কানা উঁচু ছাতু মাখবার থালা, একটা খালি ছিলিমের কলকে ও ত্রিভঙ্গ এক গড়গড়া।

বললাম, রামদাস, পিসেমশায় তোমায় বাগানে যেতে বলেছেন, তিনি এক্ষুণি আসছেন।

না দিল কথার উত্তর, না চাইল মুখ ফিরে, তেমনি-ভাবেই সে বস্তা বাঁধতে ব্যস্ত রইল। একটা জিনিষ দেখে অবাক হলাম। সেটা ওর রাজবেশ। পোষাকী পোষাক পরণে ওর। চিরকাল দেখে এসেছি হ্যাফপ্যাণ্ট, আর নীলচে গেঞ্জি পরতে। আজ দেখলাম একটা হলহলে প্যাণ্ট পরণে (পিসেমশায়ের যৌবনে পরিত্যক্ত), খাকী বুশ সার্ট (তাও বোধ করি মেসোপটামিয়ার পিসেমশায়ের ছোট হয়ে যাওয়া মিলিটারী কুর্ত্তা), মাথায় বিরাট এক পাগড়ি (পিসিমার পরিত্যক্ত বহুদিনকার রঙিণ শান্তিপুরী শাড়ির ছিন্নাবশেষ), কাঁধে যথারীতি তেলচিটে এক গামছা, পায়ে কাদা মাখা তালি দেওয়া বুট (বোধ করি লড়াইএর সময়কার)। এ যে অপরূপ দরবারি পোষাক। ব্যাপার-খানা কী?

এমন সময় বাঁধা-ছাদা শেষ হল এবং ফিরে তাকালো।

এবং তখনই দেখলাম—দেখলাম আর বুঝলাম বিরাট পাগড়ি কেন বাঁধা হয়েছে। ডান চোখের ওপরটির যে রকম চেহারা দেখলাম তাতে তুলনা দিতে গেলে বলতে হয় ঠিক যেন একটি কয়েৎ বেলের সাইজের কালো আম

যেন উঁচু হয়ে উঠেছে। সমস্ত চোখটি ফুলে-কেঁপে ঢাকা পড়ে গেছে। নাকটা যেন চ্যাপ্টা মেরে গেছে। কাল-শিরে ও আঘাতের চিহ্নে মুখের ডান দিকটা লোমহর্ষক।

কি বলবো ভেবে পাচ্ছিনা, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং পিশেমশায়। এসে বাইফোকাল চশমা ও ভুরুর ফাঁক দিয়ে প্রথমে নিরীক্ষণ করলেন রাম-দাসের পোষাক—তারপর চাইলেন সুটকেস, থালা, গড়্গড়া ও রাস্তার দিকে—পুনরায় পোষাকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাণী ছাড়লেন—কি ব্যাপার হে হাবিলদার রামদাস (ওকে তিনি ক্রুদ্ধ হলে মিলিটারী পদবীতেই সম্বোধন করেন), পোষাকটি দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন বিদেশ বিভূঁয়ে যাচ্ছ?

তারপর বুঝি সহসা দৃষ্টি পড়লো রামদাসের চোখের দিকে।

—এ্যা—ওকি—ওকি করেছ চোখের। হাবিলদার রামদাস, মারপিট করেছ নাকি?

—না হুজুর। আমি মারিনি, আমায় মেরেছে।

—মেরেছে! তোমায়? পিশেমশায়ের ক্ষীণ চেহারা যেন ত্রিং করে খাড়া হয়ে উঠলো—কে? কোন্ ব্যাটার এত সাহস যে আমার অর্ডারলির ওপর হামলা চালিয়েছে। বল, বল—

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভগ্ন কণ্ঠে রামদাস বললে, হুজুর, আমি আর এক মিনিট এখানে থাকবো না। আমার তলবটা আজই মিটিয়ে দিন মেহেরবাণী করে।

—ননসেন্স! পিশেমশায়ের পাকা ভ্রু ক্রোধে কেঁপে গেল; পালাবে, পেছু হটবে, সারভেসফুল রিট্রিট আমি জীবিত থাকতে হবে না। আসল কথা খুলে বল হাবিলদার রামদাস। কে মেরেছে জানাও। তারপর আমি দেখবো সে ব্যাটার ধড়ে কটা মাথা—শুধু নামটা বল।

—ব্যাটা নয়, হুজুর, বেটি।

—বেটি, পিশেমশায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন, কে বেটি?

—যদি বলতেই হয় মেজরসাব তাহলে শুনুন, ঐ ডাইনীটা যে বাড়ীতে থাকবে তার শ' মাইলের মধ্যে হাবি রামদাস থাকবো না—একদিন ভি নেহি, এক রাতভি নেহি)

—আরে আহাম্মক ডাইনীটা কে?

—ঐ খেন্তিদাসী হুজুর!

—খেন্তি!! প্রথমে বিরক্তিতে পিশেমশায়ের মুখ যেন নিমবেগুন ভাজার মত হয়ে গেল। পরমুহূর্তে ক্রোধে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো তাঁর। গোঁফটা পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে গেল, কে—খেন্তি মেরেছে তোমাকে। কালে কালে হল কি? মেয়েছেলে হয়ে পুরুষ মানুষকে মারলে। এত বড় পালোয়ান হয়ে উঠেছে আজকাল খেন্তি। একটা নিরীহ ভাল মানুষের গায়ে হাত তোলা। আচ্ছা দেখছি। কিন্তু হাবিলদার রামদাস আগে তো আমার মারবার কারণটা জানা দরকার।

—খেন্তি হর-রোজ মাছভাজি চুরি করে নিয়ে যেত হুজুর। আমি একদিন ধরে ফেলে বলেছিলাম একথা মেজর সাবকে বলেদেবো—তাই—

অহ, শুধু ডাকাত নয় চোরও বটে। শোন হাবিলদার রামদাস, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এখান থেকে এক পা-ও নড়বেনা। মালুম।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, চল বৎস, এর একটা হেস্ত নেস্ত করা দরকার। বিচার করে আসি।

আমরা প্রায় মার্চকরে দুজন গিয়ে উপস্থিত হলাম রান্নাঘরে।

গিয়ে দেখি খেন্তিদাসী মেঝেতে হাত বালিশ করে শুয়ে আছে। কোলের কাছে বসে তার বোধল কুৎকুৎ মার্কা বেড়ালটা কি যেন খাচ্ছে। ঘরে এঁটো বাসন পত্র যেমন কে তেমন ছড়ানো পড়ে আছে, ছোঁয় নি কিছু।

পিশেমশাই আর আমি ঘরে ঢুকতেই খেন্তিদাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলো।

হাতের ছোট ছড়িটাকে সাঁই সাঁই করে ঘুরে আস্ফালন করে পিশেমশায় মারমুখী কণ্ঠে বলে উঠলেন, কী ভেবেছ খ্যান্তমণি। কাজকম্ম না করে এ ভাবে শুয়ে থাকবার জন্যে কি মাইনে গোনা হয়। উত্তর দাও, শুয়ে ছিলে কেন?

—আজ্ঞে মা ঠাকরুণের মুখে তো শুনেছেন বোধ হয়, কি রকম অপমান আমায় করেছে হাড়হাবাতে লোকটা। সেই অপমানে মনটা খারাপ হওয়ায় শরীলটেও খারাপ হয়েছিল, তাই একটু—

—অপমান। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন পিশেমশাই, শুনছ বৎস, একটা নিরীহ, নিরিরোধী, নিরস্ত্র ভালমানুষের ওপর জঘন্য আক্রমণ চালিয়ে এখন কি রকম ভিজে বেড়ালের মত বলছে—অপমানে শরীর খারাপ হয়েছে—হাঁকা!

খেত্তিদাসীর সজল চোখ আরো সজল হয়ে এলো।

বজ্রকণ্ঠে পিশেমশাই জিগ্যেস করলেন, কী এমন ব্যাপার হয়েছিল যে রামদাসের চোখটাকে ওরকম তালের মত ফুলিয়ে দিয়েছ?

আত্মরক্ষার জন্যে আজ্ঞে। ও লোকটা আমাকে মারবে বলেছিল।

—আর সে জন্যে তুমি এমন ভাবে মারলে যে একটা সুশ্রী-মুখ (রামদাসের অতিবড় মিত্রও তার মুখকে সুশ্রী-ভাবতে পারবে না—কিন্তু পিশেমশায় অনায়াসে বলে গেলেন সুশ্রীমুখ') চিরকালের জন্যে কদাকার হয়ে গেল। ভাল কথা, তুমি নাকি মাছ চুরি কর?

—ভগবানের দিব্যিদিয়ে বলছি আজ্ঞে, খেত্তিদাসী হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, ওটা মিছে কথা আজ্ঞে। ঐ মিন্‌সেই বরং রোজ রোজ আমাকে বলে—'খেত্তি আমায় রোজ তিন চারটে করে মাছ দিতে হবে। মেজরসাব ও মিলিটারী আমিও মিলিটারী'—একথায় আজ্ঞে আমি রাজী হইনি। তাইতে আমায় ভয় দেখালে যে আমি নাকি মাছ চুরি করি। তার জবাবে আমি দুটো কটু কথা শোনাতে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে—তখন আজ্ঞে প্রাণ বাঁচাতে এই বেলুন চাকিটা দিয়ে—

—শুনছ শুনছ বৎস, এদের নষ্টামির কথা, পিশেমশায় সূত্রের ওপর ছড়িটা আবার সাঁই সাঁই করে ঘোরালেন, অগ্নিদৃষ্টি সহ খেত্তিদাসীকে বললেন, তাখো, কে কি জাতের মানুষ তা আমার নখ দর্পণে। তুমি আর সাধু সেজনা। সামান্য ব্যাপার নিয়ে হুলুস্থুল বাধানোই তোমার চিরকেলে স্বভাব। ফের যদি মাছ চুরি-টুরির কথা আমি শুনি—জানো তো আমি মেজর, শুধু মেজর নয়, মেসোপটামিয়া ফেরৎ মেজর, কলমের একটি খোঁচায় থানা, দ্বিতীয় খোঁচায় আদালত এবং সর্বশেষ খোঁচায় জেলে পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয়ই রামদাসকে বাগমা তুলে গালাগাল দিয়েছিলে—নয়ত অমন ধর্মভীরু, দেবতুল্য, মাটির মানুষ তোমার মত হা-ঘরে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে যেতনা। ছিছি অমন একটা নিরীহ ভাললোকের ওপর কি জঘন্য বর্বর আক্রমণ। মুখটা একেবারে থুলেথেঁপে সাঁতরাগাছির গুল-এর মত হয়ে গেছে। যাও—ওঠ—এই মুহূর্তে বাসন মাজতে যাও। ফের যদি ওরকম কিছু শুনি তাহলে তোমায় তৎক্ষণাৎ মাইনে দিয়ে বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব।

এতেই কাজ হল। মাথা নিচু করে খেত্তিদাসী বাসনের পাঁজা তুলে নিয়ে কুয়োতলার দিকে চলে গেল।

আবার আমরা মার্চকরে টালির ঘরের দিকে এলাম। সেখানে রামদাস তখনও গালে হাতদিয়ে বসেছিল। মুখের ডান দিকটা আরো ফুলে যেন বাতাবী লেবুর আকার ধারণ করেছে।

তৃতীয় বারের মত পিশেমশায়ের লাঠি শূন্যে আন্দোলিত হল।

—রাইটলি সাভড্। ঠিক হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল, পিশেমশায় সগর্জনে বললেন, সত্যি কথা বল হাবিলদার রামদাস। তুমি নাকি আমার মত তিন চারটে করে মাছখেতে চেয়েছিলে?

—নেহি হুজুর। কভি নেহি মেজর সাব।

—চোপরাও! ফের মিছে কথা, পিশেমশায় হুঙ্কার ছাড়লেন, খেত্তির মত ঠাণ্ডা ভালমানুষ মেয়ে দুটি হয় না। তার মত নিরীহ শান্ত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিলে—শুওর কোথাকার—বদতমিজ! তুমি তোমার রেজিমেন্টের নাম ডুবিয়েছ।

বিশবছর আগে রেজিমেন্ট ছেড়ে আসা রামদাস অধোবদনে রইল।

পিশেমশায়ের শিরদাঁড়া উঁচু হয়ে উঠলো, মনে হল মেসোপটামিয়ার কোন রণক্ষেত্রে সৈন্যদলকে যেন তিনি আদেশ দিচ্ছেন।

—হাবিলদার রামদাস! এ্যাটেন্‌সন্!!

বিদ্যুৎগতিতে রামদাস উঠে দাঁড়ালো। তারপর কাঠের মত ছুটে পা তালিমারা জুতোয় সঙ্কুচিত করে এনে খটাস্ খট্ শব্দে 'এ্যাটেনসন' হল।

—প্রথমে তোমার ঐ যাত্রাদলের ভাঁড়ের পোষাক খুলে এস। এক্ষুণি।

—জি সাব।

—তারপর হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে গিয়ে বাগানে গ্যাদাল চারা পোত।

—জি মেজর সাব।

—আজ থেকে বারদিনের কোয়াটার গার্ড শাস্তি দিলাম তোমাকে। নিজের ঘরে বন্দী থাকবে। ঘর আর বাগান—বাগান আর ঘর—এই তোমার এলাকা। রান্না-ঘরের দিকে কদাচ যাবে না। খেন্তি গিয়ে তোমার খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর—আর, পিসেমশায় ছড়িটাকে ওর নাকের ডগায় ঘুরিয়ে বললেন, বলি বুড়ো বয়সে খুব নোলা বেড়েছে, না? মাছ—মছলি। বেশ, তাই হবে, হাবিলদার রামদাস, কত মাছ তুমি খেতে পার তাই আমি দেখব। যাও—এ্যাবাউট টার্ণ, ডবল আপ।

রামদাস খটাখট ঘুরলো, তারপর দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল।

আমরা আবার মার্চ করে বাংলোর দিকে এলাম।

এ পর্য্যন্ত বলে গাঙ্গুলীমশাই গড়গড়ায় টান দিতে থাকলেন গুড়ুক-গুড়ুক।

আমাদের তরুণ আমার কানে কানে ফিস ফিসিয়ে বলে, আরেকটি বিলেতী-গল্প নিজের বলে চালালে।

আমি সভয়ে ওর মুখ চেপে ধরলাম, পাছে একথা গাঙ্গুলী মশায়ের কানে যায়।

ফাল্গুন

শ্রীমঞ্জুষ দাসগুপ্ত

এলো মধু ফাল্গুন
পলাশেরা হেসে খুন,
মৌমাছি গুণ গুণ; গান ঐ গায়;
মুকুল আকুল শাখে
কোকিল কেবল ডাকে—
প্রজাপতি রঙ মাখে রঙীণ পাখায়।
বক ঐ ছুটে চলে—
মরালেরা দলে দলে
কর্ণফুলীর জলে আনন্দে ধায়;
মলয় বাতাস বয়,
টিয়া শুধু কথা কয়,
জাগে নব কিশলয় রিক্ত শাখায়।
শিমুলের ফুলে ফুলে
কে দিয়েছে রঙ গুলে!
ওঠে আজ মন দুলে মধুর আশায়;
নীলাকাশে চেয়ে চেয়ে
রাঙা চিল যায় ধেয়ে,
পিউ কাঁহা চলে গেয়ে খুশীর নেশায়।

বাগ্‌দি রাজা

অশোককুমার গুপ্ত

প্রায় বারশ বছর আগেকার কথা। হয়ত আরও কিছু বেশীও হতে পারে। একদিন একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক পাশাপাশি চলেছে তীর্থযাত্রী হয়ে পথব্রজে। গন্তব্য স্থল তাঁদের পুরীধাম। কি তাদের নাম, কি জাত সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, তবে তারা দু'টিতে স্বামীস্ত্রী সে কথা জানা গেছে। স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। পথ-শ্রমে ক্লান্ত, পা আর চলে না। বাঁকুড়ার আট ক্রোশ দূরে লাউগ্রামে এসে পৌঁছেই প্রসব করলেন তিনি একটি পুত্র সন্তান। তীর্থ লোভাতুর স্বামী সদ্যজাতকেই একটি বাগ্‌দি বাড়িতে শিশুসহ স্ত্রীকে তুলে দিয়ে চলে গেলেন পুরীর পথে, আর কোনো দিন ফিরে এলেন না। হয়ত মরে গেছেন কিম্বা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেছেন চিরতরে, এই অনেকের ধারণা।

বাগদি বাড়িতে একটু একটু করে বড় হতে লাগল শিশুটি। বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে। যেমন রূপ তেমনি কান্তি। রাজপুত্র বলে ভ্রম হয়। নিজের কুল হারিয়ে বাগদি বলেই পরিচিত হোলো সে সকলের কাছে। বাগদি-বাড়ির কর্ত্তা একদিন তাকে রেখে এলো এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ তাকে নিয়োগ করলেন গরু চরাবার কাজে। একদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত গরু নিয়ে ফিরছে না দেখে ব্রাহ্মণ নিজেই মাঠে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন—ছেলেটি একটি গাছের নীচে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে আর একটি সাপ ফণা তুলে রোদ আড়াল করে আছে। ব্রাহ্মণ তো দেখে একেবারে হতবাক্। ব্রাহ্মণকে দেখে সাপ আস্তে আস্তে চলে গেলে ব্রাহ্মণ ছেলেটির ঘুম ভাঙিয়ে বাসায় নিয়ে এলেন। কোনো কথাই তাকে বলেন না, কেবল স্ত্রীর

কাছে ঘটনাটা চুপি চুপি প্রকাশ করলেন। তারপর থেকে ছেলেটিকে আর শক্ত চোখের কাজ করতে দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পর লাউগ্রামের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ হোলো ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ছেলেটিও গেল রাজবাড়িতে ভোজ খেতে। উপস্থিত ব্রাহ্মণ সকলে খাওয়ায় বসেছেন, আর ছেলেটি বসেছে উঠানে। হঠাৎ বৃষ্টি এলো সেই সময়ে। ছেলেটি ভিজতে লাগল। কেউ তার দিকে দৃক্‌পাতও কোরল না। সাহস করে ছেলেটিও উঠে আসতে পারল না খাওয়ার ওপরে। এমন সময়ে রাজা এলেন স্বয়ং, তাল পাতার ছাতা ধরলেন ছেলেটির মাথায়। আহা! ছেলেটি যে ভিজে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণেরা চেঁচিয়ে উঠলেন। একি করলেন মহারাজ! রাজা যার মাথায় ছাতা ধরে সেও যে রাজা হয়। রাজা বুদ্ধিমানের উত্তর কোরলেন, রাজা না হোক সেনাপতি হতে দোষ কি? আহা আর রূপে ও যে সেনাপতি হবারই যোগ্য। সেইদিন থেকে রাজা ছেলেটিকে রাজ সেনাপতি পদে বহাল করলেন। এই ছেলেটির নাম হোলো রঘুনাথ। ঐতিহাসিক মল্লবংশের আদি যদু, মল্লভূমের স্রষ্টা।

তখনকার দিনে প্রায় প্রতিগ্রামেই বিত্তশালী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে রাজা বলা হোতো। লাউগ্রামের আশে পাশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে রঘু-সেনাপতি তাদের লাউগ্রামের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করেছিল। ফলে লাউগ্রামের আয়তন বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। সেনাপতি পদ থেকেই লাউগ্রামের রাজসিংহাসনে উন্নীত হয়েছিল একদিন রঘুনাথ। তাঁর এই রাজা হওয়া নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ, প্রাচীন বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন—লাউগ্রামের শেষ রাজা ছিলেন অপুত্রক। তাঁর পাট হাতি রঘুনাথকে মাথায় করে এনে বৃদ্ধ রাজার শূন্য সিংহাসনে বসায়। আবার কেউ কেউ বলেন—রঘুনাথ রাজকন্যাকে বিয়ে করে সিংহাসন লাভ করে। যাঁরা এর কোনটাই মানেন না তাঁরা বলেন, রঘুনাথ বিশ্বাসঘাতকতা করে সিংহাসনে বসে। প্রমাণাভাবে এর কোন্‌টা সত্যি সেটা বলা শক্ত। সে যাই হোক্ না কেন, রঘুনাথ যে রাজা হয়েছিল সেটা সুনিশ্চিত, আর রঘুনাথের সিংহাসন লাভের অল্পকালেই সে সুদৃঢ় বিষ্ণুপুরের স্থায়ী ঐতিহাসিকতা অন্তর্নিহিত ছিল এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই। মল্লবংশের স্রষ্টা এই রঘুনাথ বাংলার ইতিহাসকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করতে কতখানি সাহায্য করেছিলেন, মল্লবংশের বংশধরেরা তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন বিষ্ণুপুরের মাধ্যমে।

বহু কীর্তিবিজড়িত প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে কোনো কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই বিষ্ণুপুরের নামটির উৎপত্তির মূল কারণ জানবার স্বাভাবিক একটা কৌতূহল পাঠক মাত্রেরই থাকা সম্ভব। বাংলার সংস্কৃতির দিক থেকে বিষ্ণুপুর যে একটি সুমহান আসন দখল করে বসে আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে যারা একটু নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরাই হয়ত জানেন শিল্পে, সাহিত্যে ও সংগীতে বিষ্ণুপুরের অবদান কত গভীর, কত ব্যাপক।

রঘুনাথের পর মল্লবংশধরদের ক'একজন রাজা লাউগ্রামেই রাজত্ব করেছিলেন। আনুমানিক ৯৯৩ খৃঃ। জগৎমল্লের সময় রাজধানী লাউগ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। এর একটি সুন্দর কারণও আছে। একদিন রাজা জগৎমল্ল শিকার করতে বেরিয়ে লাউগ্রাম থেকে অনেক দূরে একটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন একটি বক্ একটি বাজপাখীকে তাড়া করছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ বাজপাখী বক্‌কে তাড়া করে থাকে। জগৎ মল্লের বুঝ বাকী রইলো না, স্থানটির নিশ্চয়ই কোনো মাহাত্ম্য আছে। তাই তিনি পূর্বপুরুষদের রাজধানী লাউগ্রাম থেকে স্থানান্তরিত করে আনলেন সেই জঙ্গলে এবং জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে শহর বসালেন। লাউগ্রামের রাজাদের কুলদেবতা বাসুদেব বা বিষ্ণুর নামেই রাজধানীর নামকরণ করা হোলো বিষ্ণুপুর।

লাউগ্রামের নাম আজ আর জনসাধারণের জানবার কথা নয়। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় সে লুকিয়ে আছে। রঘুনাথের রক্তপ্রবাহে পুষ্ট অতীত বিষ্ণুপুর কিন্তু আজও বেঁচে আছে তাঁর বংশধরদের শতবিধ স্মৃতি নিয়ে বাংলার সৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীকরূপে।

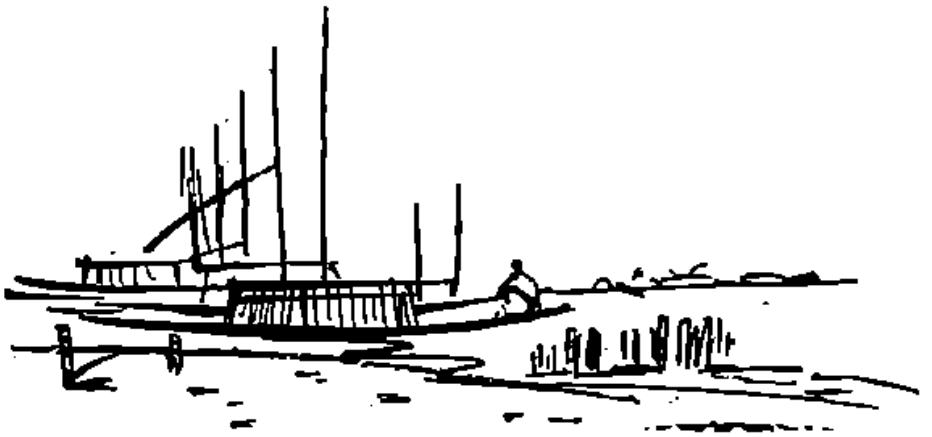

রাজা মারা গেছেন, রাজা দীর্ঘজীবী হোন

অনুবাদক : শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[মেরি এলিজাবেথ কোলরিজ (Mary Eligabeth Coleridge) উনবিংশ শতকের সাহিত্যগগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ইনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই পার্থিব জগতের বন্ধন কাটিয়ে পরপারের দেশে চলে যান। এই স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে তিনি সাহিত্যাকাশকে আলোকিত করে গেছেন। এঁর প্রথম উপন্যাস "The Seven Sleepers of Ephesus" তদানীন্তন-কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী R. L. Stevenson কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। এঁর রচনার মধ্যে "The King with Two Faces," "Poems, Old and New" এবং "The Gathered Leaves" সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। রচনার ধারণীয়তা, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এঁর প্রত্যেকটী লেখাই মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

বর্তমান গল্পটি তাঁর একটী বিশিষ্ট গল্প "The King is dead, long live the King" এর অনুবাদ। লেখিকার নিপুণ হাতের তুলিকায় মার্যাদার মায়ুর ও আত্মকেন্দ্রিক জগতের বিচিত্র ইতিহাসের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।]

মৃত্যু তার কালো পাখনা মেলে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে আসছে রাজাকে, ঘরের আবহাওয়া শান্তির প্রতিকূল। লোকজন অতি সাবধানে যাওয়া আসা করছে, চুপি চুপি কথা বলার শব্দ আসছে। সকলেই যথাসম্ভব কম গোল-মাল করবার চেষ্টা করছে এবং তার ফলে এমন একটা ছট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে, যা রুগ্ন রোগীর পক্ষে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু এতে কি কিছু আসে যায়? কারণ ডাক্তারেরা জানিয়ে দিয়েছেন যে রাজার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল। প্রকৃত-পক্ষেই তার আর কোন কার্যকরী ক্ষমতা নেই। যদি থাকতো তাহলে তাঁর পরমাসুন্দরী যুবতী পত্নীর চাপা ক্রন্দন শুনে তিনি কিছুতেই অবিচলিত থাকতে পারতেন না।

কয়েকদিন ধরে আলোগুলিতে চাকনা পরানো হয়েছিল, কিন্তু এখন নানারূপ ব্যস্ততার মধ্যে জানালার পর্দাগুলো পর্যন্ত টেনে রাখবার কথা কারও মনে হয়নি। কিন্তু এতেই বা কি আসে যায়? কারণ ডাক্তার জানিয়েছেন যে দেখবার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

কয়েকদিন পূর্বেও রাজার পরিচারকেরা ছাড়া অন্য কাউকেও তাঁর কাছে আসতে দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন সেখানে সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার। কিন্তু তাতে কি আর আসে যায়? ডাক্তার বলেছেন যে তিনি আর কাউকে চিনতে পারবেন না।

রাজা এইভাবে অনেকক্ষণ পড়ে আছেন। তাঁর এক-খানা হাত লেপের উপর ফেলা রয়েছে, মনে হচ্ছে তিনি যেন কাউকে চাইছেন। রাণী ধীরে ধীরে তাঁর হাতখানা নিজের কাছে টেনে নিলেন, কিন্তু রাজার দিক হতে কোন প্রত্যুত্তর নেই। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ, মুখ বন্ধ হয়ে এলো এবং ক্রমে হৃৎস্পন্দনও গেল থেমে। লোকজনের ভিতর হতে একজন চুপি চুপি বলে উঠলো—"রাজাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে।"

যখন আবার তাঁর চেতনা ফিরে এলো, দেখলেন চার-দিক নিঃঝুম। এই নীরবতা যেমন আকাঙ্ক্ষিত, তেমনি আনন্দদায়ক।

চারদিকের কালো জমাট বাঁধা অন্ধকার তাঁর খুব শান্তিপূর্ণ মনে হলো। এই সুন্দর, স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে মনে হলো তিনি স্বর্গে এসেছেন। ফুলের সৌরভে সারা ঘর মাতোয়ারা, প্রাণ-মাতানো সুমধুর বাতাস প্রবেশ করছে ঘরে। তিনি একাকী শয্যায় শুয়ে আছেন, একটী ভেল-ভেটের আবরণে তাঁর সারা শরীর আবৃত। পায়ের কাছে জ্বলছে দুটো মোমবাতি, তার স্নিগ্ধ আলোয় সারা ঘর পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। চার পাঁচজন প্রহরী তাঁর চারধারে বসে রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই ঘুমে অচেতন।

সারা শরীরে আমোদের এক অপূর্ব শিহরণ খেলে গেলো রাজার। এপাশ ওপাশ করতেও তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল না। রাজবাড়ীর বড় ঘড়িটাতে এগারোটা না বাজা পর্যন্ত তিনি একটুও নড়লেন না। পরে একটু হেসে তিনি উঠে বসলেন। জ্ঞান হারাবার আগেকার কথা তাঁর মুহূর্তে ভেসে উঠলো। যে অন্যায় ও অবিচারের ফলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে তাঁকে এই পৃথিবী হতে সরানো হচ্ছিলো, তার বিরুদ্ধে প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই সময় কে যেন তাঁকে বললো, "মৃত্যুর পর একঘণ্টা সময় তুমি পাবে। তার মধ্যে তোমার জীবন আকাঙ্ক্ষা করে এমন তিনজন লোক যদি খুঁজে পাও, তাহলে তোমার জীবন আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"

এবার এসেছে সেই একঘণ্টা অবকাশ। কতকটা সময় এর মধ্যেই নষ্ট হয়েছে। তিনি আদর্শ রাজা, প্রজার মঙ্গল-সাধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। অতএব তিনি এখন নির্ভয়। জীবন তাঁর কাছে এখন আনন্দপূর্ণ মনে হলো। স্বার্থপরতা মোটেই স্থান রাখতে পারে নি তাঁর মধ্যে। নিষ্ঠুরের বিধানে যে কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন তা অসম্পূর্ণ রেখে যেতে হচ্ছে বলেই তাঁর দুঃখ। ঘুমে আচ্ছন্ন প্রহরীরা ঘুম থেকে উঠে যখন বেরিয়ে গেলো তখন তিনি কতকটা পরিবর্তন বোধ করলেন। অন্যায়ের গ্লানিও তিনি ভুলে গেলেন। চিন্তা করে দেখলেন, যা তিনি করেছেন তা অতি তুচ্ছ। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর চেয়েও যোগ্য লোক এই পৃথিবীতে আছে। সমস্ত পৃথিবী তাঁর কাছে অতি বিস্তৃত মনে হলো। সবই যেন বড় হয়ে গেছে। নিজের দেশকে তিনি প্রকৃতই ভালবাসতেন। মনে হয়েছিলো মরণের সঙ্গে সবই হবে বিলুপ্ত। এখন তাঁর মনে হলো, পৃথিবী ঠিকই আছে।

ঘর হতে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি ভেবে নিলেন —কোথায় তিনি আগে যাবেন। রাণীর কাছে নিশ্চয়ই নয়, কেননা রাণীর এখন সেই বিষাদগ্রস্ত মুখ মনে করতেও তিনি অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করলেন। সবশেষে তিনি যাবেন রাণীর কাছে। তখন রাণী তাঁকে ফিরে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলবে। আর তো মাত্র একঘণ্টা। কেল্লার ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরে পাবেন তাঁর জীবন। সবই স্বপ্নের মত মনে হয়। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর। খানিকটা কি চিন্তা করলেন।

মরণের সময়ের কথা মনে হতেই তাঁর মনে হলো আবার এই যন্ত্রণা তাঁকে একদিন ভোগ করতে হবে। তাঁর আবার মনে হলো ফিরে গেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। আবার ভাবলেন, "আমি তো কখনও ভয়ে কাপুরুষের মতো চিৎকার করি নি।" সর্পের কথা মনে পড়তেই তাঁর হাসি এলো। জ্যোৎস্নায় সারা শহরটা ধব্‌ধব্‌ করছে সেখান হতে।

রাজা আপন মনে বলে উঠলেন —"তিনজন লোক কেন, তিন হাজার লোক খুঁজতেও বেশী দেরী হবে না। এ রাজ্যে সবাই তো আমার বন্ধু।" রাজবাড়ীর ফটক পেরিয়ে যাবার সময় দেখলেন একটি শিশু সিঁড়িতে বসে কাঁদছে। প্রহরী ঘাচ্ছিলো পেরিয়ে। সে জিজ্ঞাসা করলো—"কি বাপু, কাঁদছো কেন?" শিশুটী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো—"রাজা মারা যাচ্ছেন শুনে আমার মা, বাবা, দুজনেই গেছেন রাজবাড়ী। তাঁরা এখনও ফিরে আসেন নি। খিদে-তেষ্টায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। এর ওপর আমার খেলার পুতুলটাও গেছে ভেঙে। এ সময় রাজা বেঁচে উঠলে কি আনন্দই না হতো।"

কথা শেষ হতেই শিশুটা আবার কেঁদে উঠলো। রাজা বেশ কৌতুকবোধ করলেন। তিনি বললেন—"আমাকে চায় এরকম প্রজা তো এখনই মিললো।" তাঁর নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না। মনে হলো শিশুকে একটু সান্ত্বনা, একটু আশ্বাস দেন, কিন্তু এখন অনেক জায়গা যেতে হবে। সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। বন্ধুর সেই দুঃখক্লিষ্ট চেহারার কথা কল্পনা করতেও রাজার মনে একটা কৌতুকের ও দুষ্টামির ভাব হলো।

বন্ধুর দুরবস্থার কথা ভেবে রাজা বলে উঠলেন, "হায় হতভাগ্য বন্ধু অধিয়াস্! এমন অবস্থায় পড়লে আমি কি করতুম। ভাগ্যিস্ তোমার বিয়োগ-ব্যথা আমাকে উপলব্ধি করতে হয়নি। সে কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হতো।"

বন্ধুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে রাজা দেখলেন—সেখানে মহা ব্যস্ততার ভাব। লোকজন ছুটাছুটি করছে আলো নিয়ে, ঘোড়াগুলোয় জিন পরানো হচ্ছে। কিন্তু প্রিয় বন্ধুটির

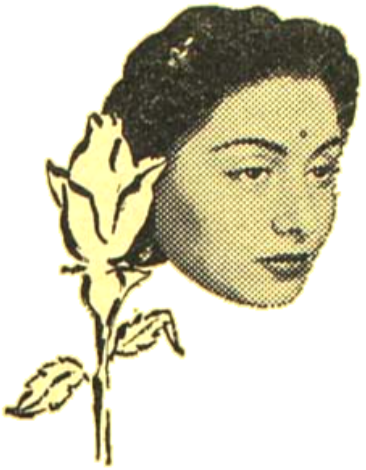

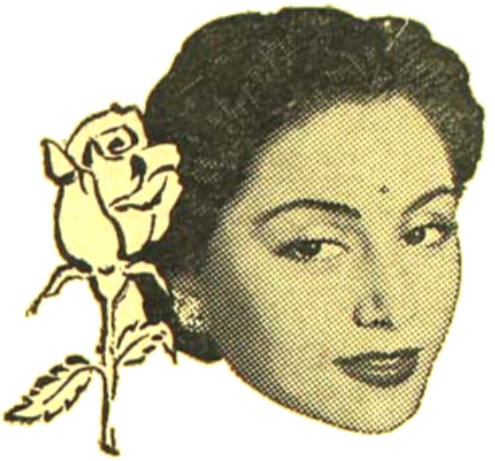

ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য **রেক্সোনা**

ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।
রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

B.P. 146-X52 BO

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড'এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

দেখা তিনি পেলেন না। খোলা দরজা দিয়ে রাজা ভিতরে ঢুকলেন। মনে করলেন বড় ঘরটিতে বন্ধু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে সেখানেও নেই। বৃথাই তিনি ঘরের পর ঘর খুঁজতে লাগলেন। সব ঘরই খালি। হঠাৎ রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তাঁর মৃত্যুর শোকে বন্ধুটি মারা যায়নি তো? রাজা অতঃপর একটি নিরালা কক্ষে ঢুকলেন। এই জায়গায় তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কতদিন কত আমোদপূর্ণ মুহূর্ত অতিবাহিত করেছেন। বন্ধুটি এ ঘরেও নেই। সমস্ত দেখে শুনে মনে হয়, সে কিছুক্ষণ আগে এখান হতে বেরিয়ে গেছে। চারদিকে বই, কাগজপত্র অগোছালো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। মেঝের উপর ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে ভাঙা কাচের খণ্ড। মেঝের উপর হতে একখানা ছবি কুড়িয়ে রাজা দেখলেন সেটা তাঁর নিজেরই ছবি। ছবিটির ফ্রেম ভেঙে গিয়েছে মেঝের পড়ে। আগুন স্পর্শ করলে যেমন জ্বালাবোধ হয়, রাজার মনে তেমনি জ্বালা হতে লাগলো। ছবিটাকে তিনি মেঝের উপর ছুঁড়ে দিলেন। উনুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিলো আগুন, পাশেই পড়ে রয়েছে একটী অর্দ্ধ দগ্ধ চিঠি। চিঠিটী তাঁরই লেখা—বন্ধুকে এই চিঠিটি তিনি শেষে লিখেছিলেন। বিস্তৃত পরিকল্পনার সমস্ত তথ্য এই চিঠিতে ছিল। রাজা চিঠিটাকে দিলেন আগুনে ফেলে। সেই সময় এক ভদ্রলোক একটী মহিলাকে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। সাজ-পোষাক দেখে মনে হয় ভদ্রলোক আসছেন বহুদূর হতে!

ভদ্রলোক বললেন—"অমিয়াস্ কোথায়?"

মহিলাটী উত্তর দিলেন—"আর কোথায়? আমাদের নূতনরাজারদরবারে। বড়ই বুদ্ধিলেপড়া গেছে। নূতন রাজার মাথায় পুরানো রাজার যত অলীক খেয়াল,উদ্ভট কল্পনা নেই। একজন আর একজনকে দেখতে পারতেন না। পুরানো রাজা অমিয়াসকে খুবই স্নেহ করতেন। সেজন্য নূতন রাজার রাজসভায় প্রতিপত্তি বাড়াতে একটু বেগ পেতে হবে। তবে নূতন রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতেও অমিয়াস্‌কে বেশী কষ্ট পেতে হবে না। পুরানো রাজার সেই—খামখেয়ালীপনা সে মোটেই পছন্দ করতো না। নিরুপায় হয়ে তাকে সায় দিতে হতো। পুরানো রাজা সত্যিই ওকে ভালবাসতো, কিন্তু কি করা যাবে? নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হবে তো। আমাদের মত লোকের ভাব-প্রবণতা থাকলে তো চলবে না। পুরানো রাজার অন্তিমদর্শন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও নূতন রাজার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। আমি ওর অনুচরদের পাঠাচ্ছি।"

ভদ্রলোক (রাজা দেখে বুঝলেন তাঁরই একজন রাজদূত) উত্তর দিলেন—"যথার্থই বলেছেন। আমিও ঐ একই পথ অনুসরণ করবো। সত্যি বলতে কি, পুরানো রাজার অভাবে দেশের কোনই ক্ষতি হবে না। কূটনীতি সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান ছিলো না। তিনি আমাকে দিয়ে জোর করে এমন একটা সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টা করেছিলেন যার পরিণাম দেশের পক্ষে হোত অত্যন্ত অশুভ। আমার কপাল ভালো, যুদ্ধ এখন অনিবার্য্য। পুরানো রাজা থাকলে সৈন্যবিভাগে উন্নতির আশাও আকাশ কুসুমে পরিণত হোত।"

রাজার আর এরপর শুনবার কোন আগ্রহ রইলো না। তিনি ওখান হতে চলে এলেন।

এবার স্থির করলেন তিনি প্রজাদের কাছে যাবেন। তারা নিশ্চয়ই নূতন রাজাকে ভালবাসবে না। কেন না, তিনি তাদের মঙ্গলের জন্য যে সব কাজ করেছেন, নূতন রাজা তা করবেন না।

ঘড়ির শব্দে রাজা বুঝলেন, পনেরো মিনিট অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বাস্তবিকই আদর্শ রাজা ছিলেন। রাজ্যের গরীবদুঃখীদের খুটিনাটি খবর তিনি রাখতেন। অনেকবার ছদ্মবেশে তিনি নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রজাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য। গরীবদুঃখীদের অবস্থা দেখে তিনি এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে তাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন। রাজবাড়ীর কোন লোকই ঘুণাক্ষরে জানেনি কি করে তিনি ভয়ানক রোগের হাতে পড়লেন। এই রোগের ফলেই তাঁর মৃত্যু। সন্দেহ নিরসনের জন্য সেদিকে পা বাড়ালেন।

রাজা আপনমনে হেসে বললেন, "রোগ এখন আর আমার কিছু করতে পারবে না।" রাজবাড়ীর যেমন ভয় চেহারা, লোকজনের অবস্থাও তদ্রূপ। লোকগুলো এখানে ওখানে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইছে। তাঁর কথাই সবার মুখে। তাঁর রোগের ব্যাপার, কবে হবে তাঁর সমাধি, এসব বিষয়ে আলোচনা চলছে।

পাঁচ ছয় জন লোক একটা নোংরা গুড়ীখানায় বসে ঘটনা করছিল। রাজা তাদের আলোচনা শুনবার জন্য এসে দাঁড়ালেন।

একজন জানাশোনা লোক বলছে—"গেছে আপদ গেছে। যে রাজার হাত হতে একটী পয়সা বেশী বেরোয় না, সে রাজায় কি প্রয়োজন? ও রকম রাজার আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কি সম্ভব? নূতন রাজাটী অতি ভালো। দেখবে কত-মঙ্গলজনক কাজে উনি হাত দেবেন।"

অন্য একটী লোক বলে উঠলো—"ঠিক বলেছ। তাঁর সবেতেই বাহাদুরী আর মুরুব্বিয়ানা দেখানোই ছিল অভ্যাস। ঘরদোর পরিষ্কার রাখার জন্য কি কম নাগে হাল করতেন? তাঁর কি অধিকার ছিল এসকল করবার?"

অপর একটী লোক বললো—"আমার মতে সব রাজাই উচ্ছন্ন যাক্। তবে এমন একটী রাজা দরকার যিনি স্ত্রীর ভয়ে মূর্চ্ছা যাবেন না, আর পোর্ট প্রভৃতির কি প্রভেদ বুঝতে পারেন।"

চতুর্থ লোকটী আরম্ভ করলো "পুরানো রাজা বন্দীদের প্রাণদণ্ড রহিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তার কি ব্যাপার জানো? কয়েদীদের বেশী পরিশ্রম করিয়ে বেশী কাজ আদায় করা। ঐ রকম কোন দুরভিসন্ধি তার মধ্যে ছিল। প্রজাদের জন্য চিন্তা করে তার আর ঘুম আসছিলো না।"

সকলেই এ কথায় সম্মতি দিলো। রাজা চলে এলেন সেখান হতে। ঘড়িটা থেকে আবার শব্দ হলো। রাজার মনে হলো তাঁর সব চেয়ে ঘৃণা শত্রুও যদি তাঁকে যথেচ্ছা কটূক্তি করতো, তাও এর চেয়ে সুখকর হতো! যেখানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীরা আছে তিনি সেখানে এলেন। কয়েদীদের প্রাণদণ্ড মকুব করা হয়নি বলে তিনি আনন্দ বোধ করলেন।

ঘরের মধ্যে ছিল কদাকার এক বন্দী। অতি তৎপরতার সঙ্গে সে হাঁটুর উপর কি সব লিখছে। লোকটার সঙ্গে রাজা পরিচিত ছিলেন। আগ্রহভরে রাজা তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কারাগারের মালিক ঘরে ঢুকলেন সেই সময়। সঙ্গে ছিলেন একজন মন্ত্রী, যে মন্ত্রীকে তিনি প্রাণভরে ভালবাসতেন। বন্দী তাঁদের দিকে তাকালো।

বন্দী বলে উঠলো—"কালকের আগে আমার নিশ্চয়ই ফাঁসী হবে না।" কথাটা বলে ভীরুতা প্রকাশ হোল মনে করে বললো—"অবশ্য সর্ব্বদাই আমি তৈরী। দয়া করে আমার এই চিঠিটী আমার প্রিয় পত্নীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

মন্ত্রী গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন—"রাজা মারা গেছেন! নূতন রাজার মতামত সবই শুভ। আপনাকে ক্ষমা করা হয়েছে। আগামী কালই আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে।"

আকাশ থেকে পড়ার মত অতি বিস্মিতভাবে বন্দী বলে উঠলো—"রাজা মারা গেছেন।"

মন্ত্রী বললেন—"হাঁ, তিনি মারা গেছেন।"

লোকটী তখন বিষাদক্লিষ্ট মুখে কপালে করাঘাত করে বললো—"আজ্ঞে, আমি পুরানো রাজাকে খুব ভক্তি করতাম। কেননা, তিনি অতবড় রাজা হয়েও আমাকে ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্মান দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। তাঁরও তো পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী আছে। তিনি বেঁচে থাকলে খুবই সুখকর হোত।" বলেই লোকটি চোখের জল মুছলে।

জেলখানা হতে বেরিয়ে আসবার সময় ঘড়ি শব্দ করে জানিয়ে দিলো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। নিজেকে অতি অপমানিত বোধ করলেন রাজা। বন্ধুর ঘৃণা যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু শত্রুর দয়া সহ্য করা অসম্ভব। তিনি সহস্রবার মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত, তবু এ রকম লোকের কাছে ঋণী থাকতে প্রস্তুত নন সামান্য জীবনের জন্য। তিনি নিজে মহৎ তাই অন্যের মহত্ব দেখে আনন্দ অনুভব না করে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, যা কিছু করেছেন সবই বৃথা। অতৃপ্ত মনে নিজের কাজগুলো যাচাই করে দেখতে লাগলেন। যাদিকে ভালবেসে তিনি নিজের মত মনে করেছেন তাদের সবাইকে আজ মিথ্যা স্বপ্নের মত মনে হলো। যাদের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তারা কেউ তার যোগ্য হতে পারে নি। একটী নির্ব্বোধ শিশু আর স-হৃদয় শত্রু—এরাই হলো তার যথার্থ বন্ধু। বেঁচে থাকার আর কি প্রয়োজনীয়তা আছে? এখন নিশ্চিহ্নিলি মৃত্যুর কোলে ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। চরম শিক্ষা তিনি আজ লাভ করেছেন। সুতরাং চিরবাঞ্ছিত

শান্তিপূর্ণ মরণের কোলে আশ্রয় নেওয়া যাক। শাশ্বত সনাতন শক্তির বিধানকেই আজ চরম ও পরম সত্য বলে মনে হলো। প্রতিটি মানুষই অমানুষ হলেও কি আসে যায়? সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে সরল দৃষ্টি নিয়ে তিনি সব কিছু দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেলো। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত বোধ হতে লাগলো। সহসা এক নিঃসঙ্গতার উপলব্ধিতে তাঁর মন নিরুৎসাহ হয়ে এলো। তাঁর জন্য ব্যথিত হয়, চিন্তা করে, দুঃখ অনুভব করে এমন কি কেউ নেই? একটু ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টি কিংবা সমবেদনা-পূর্ণ কথার জন্য তিনি সব কিছু দিতে রাজী। সত্যিকারের একটুখানি স্নেহের জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করতে লাগলো। আর অতি সামান্য সময় বাকী আছে। তিনি এতটা সময় অসীম অপেক্ষায় কি করে কাটালেন? এই তাঁর একমাত্র আশা, পৃথিবীতে এই তাঁর আশ্বাসভরা ভরসা। মনে হতেই মনে একটু সান্ত্বনা, একটু প্রফুল্লতা ফিরে এলো। সব কিছুকে তিনি ক্ষমা করেছেন, সব কিছু তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু পত্নীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াতে তাঁর মনটা দমে গেল। তিনি ভাবলেন, যদি এখানেও সবই অলীক হয়ে দাঁড়ায়? সেই মিথ্যা, সেই অলীকতার রূপ দেখবার আগে ফিরে যাওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয়? কিন্তু তার পরেই মনে মনে বলে উঠলেন—"আমি তো কখনও ভয়ে পিছাইনি।"

চুল্লীর কাছে বসে আছে রাণী। মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সুন্দর লম্বা চুলগুলো মুখটাকে আবৃত করে রেখেছে। স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই রাজা অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করলেন। এমন স্ত্রীকে কি সন্দেহ করতে পারা যায়? যে আংটিটি রাজা তাকে দিয়েছিলেন সেইটাই পরে আছে রাণী। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আংটিটি চক্ চক্ করছে।

রাজার মনে হলো রাণীকে একটু আশ্বাস দিলে ভাল হয়। রাণীর সঙ্গিনীরা কোথায় গেল তাকে একলা ফেলে? দুঃখের এই প্রথম রাত্রে তাদের রাণীর কাছে থাকা খুবই উচিত ছিল। রাণীকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রাজার মনে হলো হয়তো রাণীর মুখ হতে কোন দুঃখভরা কথা, রাজার নাম কিছু শোনা যাবে। কিন্তু না:, রাণী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

একটু শব্দে রাজা চমকে উঠলেন। দেওয়ালের ভিতর বসানো একটা দরজা খুলে গেলো। এ দরজাটা তিনি আর রাণী ছাড়া কেউ জানতো না। একজন লোক দরজাটার ভিতর দিয়ে এসে রাণীর সামনে উপস্থিত হলো। রাণী তাকে ঠোঁটে আঙুল রেখে কোন শব্দ করতে মানা করলো। বললো—"যাক, তুমি এসেছ। বাঁচলাম, মরবার সময় তার হাতটা ধরেছিলাম তাই খুব ভয় লাগছিল। ভেবেছিলাম তার প্রেতাত্মা বোধ হয় আমার সামনে উপস্থিত হবে। এখন আর সে ভয় নেই। আমরা দুজনে এখন বেশ সুখে থাকতে পারবো।" কথাটা বলে রাণী হাত হতে আংটিটা খুলে একবার চুমো খেলো, তারপর সেটা পরিয়ে দিলো লোকটীর হাতে।

মধ্যরাত্রের ঘণ্টাটা পড়তেই প্রহরীরা ছুটে এসে দেখলো রাজা তেমনি শক্তভাবে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। তবে তাঁর মুখ-চোখের চেহারা অনেক বদলে গেছে। মরবার সময় যে আনন্দময় প্রশান্ত মুখ ছিলো এখন আর তা নেই। মুখের চেহারা হয়ে গেছে শুকনো, কদাকার ও বিশ্রী। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "এই চেহারা আর রাণীকে দেখানো হবে না।"

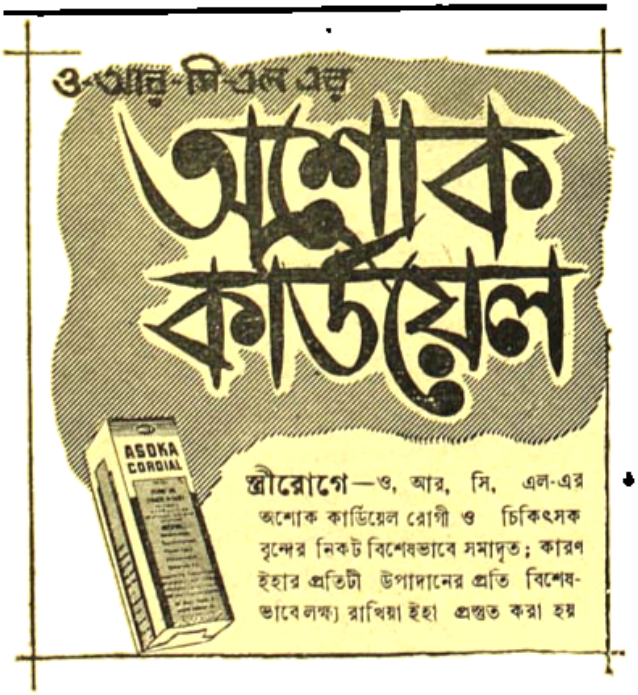

॥ শিল্পকলা ॥

নাগপুর কেন্দ্রীয় যাদুঘরে রক্ষিত প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ বরাহ শিকারের একটি সুপ্রাচীন দৃশ্য

নাগপুরের এই কেন্দ্রীয় যাদুঘরটি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১৮৬৩ সালে এটি সংস্থাপিত হয়। এই যাদুঘরটি চারটি শাখায় বিভক্ত :—কলা, বৃত্তত্ত্ব, প্রাকৃতিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব। কলা বিভাগে আছে ভারতীয় চারু ও কারুশিল্পের বিশেষ নিদর্শন। বৃত্তত্ত্ব শাখাটিতে বৃত্তত্ত্ব এবং আদিবাসীদের শাখা এবং গোন্দ ও করকুদের মত স্থানীয় আদিবাসীদের হাতের কাজ সংরক্ষিত আছে। এগুলি ছাড়াও এই যাদুঘরে দেখা যায় নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি। আর আছে বহু বিচিত্র মূর্তিপ্রস্তর। এই সব প্রস্তরে রাজার শোভাযাত্রা, যুদ্ধ বা শিকার, বিজয় অভিযান প্রভৃতি চিত্র খোদাই করা আছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের শাখাটিতে পাখী, সাপ, পশু ও কীটপতঙ্গগুলি সুন্দরভাবে সাজান আছে। পুরাতত্ত্বের শাখায় বাকাটক থেকে গুপ্তোত্তরযুগে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের তাম্রের বস্তুপাতি ও রূপার পয়সা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা এই সংগ্রহশালাটিকে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত করেছে।

খাদ্যাভাব—

দেশে খাদ্যাভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পৌষ মাঘ মাসে নূতন ধান কাটার পর সাধারণতঃ চাউলের দাম কমিয়া যাইত—১৩৬৪ সালে তাহা হইল না। কলিকাতায় ৩০ টাকা মণের কমে ভাল চাল পাওয়া যায় না। ১৭৩০ মণের যে চাল রেশন দোকানে পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশ স্থলে অখাদ্য—তাহার পরিমাণ এত কম যে লাইনে দাঁড়াইয়াও শতকরা ৬০ জনকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়—কাজেই বাজারে ৩০ টাকা মণের চাল কেনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিছু কাল ৯ আনা সেরের আমেরিকান আতপ চাল পাওয়া যাইতেছিল—লোক তাহা স্বাদহীন জানিয়াও কিনিয়া খাইত, তাহাও আর রেশনের দোকানে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র-প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সকল দেশ-নায়কই অধিক খাদ্য উৎপাদনের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় কৃষক সরকারের নিকট কোন সাহায্য বা সহযোগিতা পায় না। এখনও সার বিলির ভাল ব্যবস্থা হয় নাই, চাষের সময় চলিয়া যাওয়ার পর সরকারী বীজ যাইয়া পৌঁছে, সেচের ব্যবস্থা ভাল নহে—যে সময় জল দরকার সে সময়ে জল না দিয়া অসময়ে প্রচুর জল দিবার ব্যবস্থা করা হয়—মোটের উপর কৃষি বিভাগে ছোট বড় নূতন নূতন বহু রকমের বহু কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে বটে, তাহাদের অধিকাংশই বেতন লইয়া সন্তুষ্ট, কাজ হইল কি না, সে বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন না। ফলে কোথাও অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয় না। যে পরিমাণে অধিক খাদ্য উৎপাদন করা প্রয়োজন, তাহার চেষ্টা দেখা যায় না। শিক্ষিত, অর্থবান ব্যক্তিরা এখনও কৃষি-কার্যকে অন্যতম পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সরকারী মৎস্যচাষ বিভাগ কৃষি বিভাগ অপেক্ষা অধিক নিষ্ক্রিয়—কাজেই বাজারে মাছের দর কমে না—একদল অসাধু ব্যবসায়ী এখনও মাছের বাজারে আধিপত্য করিতেছে—মাছের দর কমাইবার জন্য সরকারী কোন চেষ্টা দেখা যায় না। কয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় সমুদ্রের মাছ আসার কথা শুনা যায়—কিন্তু তাহা আসে কি না বা কি পরিমাণ আসে, তাহা বাজারে যাইয়া কেহ বুঝিতে পারে না। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ফলের চাষে কাহারও কোন উৎসাহ দেখা যায় না। আম, নারিকেল, কাঁঠাল, কলা, পেপে, চীনাবাদাম, কাজুবাদাম প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হইলে তাহা খাইয়া সাধারণ মানুষ উদর পূর্ণ করিতে পারে। একবার শুনা গিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গে নারি-কেল চাষ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক সরকারী চেষ্টা হইবে, কিন্তু কার্যতঃ তাহার কিছুই দেখা যায় না। মানুষ অতি সহজে ও বিনা পরিশ্রমে ধনী হইবার জন্য ব্যস্ত, দীর্ঘ-মেয়াদী ফলের চাষ করিয়া ধীরে ধীরে অর্থবৃদ্ধির কথা চিন্তাও করে না। তরিতরকারীর চাষে সাধারণ মানুষের আগ্রহ নাই—যতদিন না প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার প্রয়োজনীয় তরি-তরকারী বা ফল নিজে উৎপাদনে মনোযোগী হইবে, ততদিন পর্যন্ত ঐ সকল জিনিষের মূল্য কমিবে না। এ বৎসর কয়েক দিনের জন্য মূলা, বেগুন, পালম-শাক প্রভৃতির দাম কমিয়াছিল, কিন্তু বাজারে মুনাফা-খোরদের আবির্ভাবে তাহা স্থায়ী হয় নাই। হয় ত উৎপাদনকারী সুলভ মূল্যে তরকারী বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ তাহা সুলভ মূল্যে পায় নাই—মধ্যপথে একদল ফড়িয়া তাহা সুলভে কিনিয়া বেশী দামে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়াছে। পুলিস বা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। যতদিন না কঠোর হস্তে এই সকল মুনাফা-খোরদিগকে বাজার হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে, ততদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের বাঁচিবার কোন উপায় হইবে না। চালের বদলে সকলকে বেশী করিয়া গম ব্যবহার করিতে বলা হইতেছে—কিন্তু পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মানুষই গম খাইতে

অত্যন্ত নহে—না খাইয়া বা কম খাইয়া থাকিবে, সে ও ভাল—তবু গম খাইবে না। অন্ন ও বস্ত্র সুলভ করিতে না পারিলে দেশবাসীকে স্বাধীনতার কথা বুঝানো যাইবে না। কেন যে সরকার-পক্ষ এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হন না, তাহা বুঝা যায় না। আমরা এ বিষয়ে দেশবাসী সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি। ১৯৫৮ সালে যাহাতে ভারতের আবার দুর্ভিক্ষ না হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের এখন হইতে কঠোরভাবে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

রামদাস স্মৃতি মন্দির—

খ্যাতনামা নাম-প্রচারক ও বৈষ্ণবভক্ত শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় সারা জীবন ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া হরি-নাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা সহরের উত্তরাংশে কাশীপুর এলাকায় অবস্থিত সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্মীরা গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে ঐ অঞ্চলে শ্রীরামদাস স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রবীণ ভক্ত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি-ভাগীরথী মহাশয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উৎসবে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। সিঁথিতেই বাবাজী মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য স্বর্গত বিপিনবিহারী দাসকে দীক্ষাদান উপলক্ষে বিরাট নামযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং বিপিনবাবুর পুত্র, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাসের চেষ্টায় সেখানে শ্রীরামদাস স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। বর্তমান ধর্মহীন দেশে ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বাবাজী মহাশয় যাহা করিয়া গিয়াছেন, সে জন্য তিনি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রধান কীর্তি ছিল—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের স্মৃতিবিজড়িত ধর্মস্থানগুলির সংস্কার, সেগুলিকে পুনর্জীবন দান ও বৈষ্ণবতীর্থগুলির স্থায়ী ভাবে সুপরিচালনার ব্যবস্থা করা! তিনি শুধু বরাহনগর পাট-বাড়ীর উন্নতি বিধান করেন নাই বা ললিতাসখীর সহযোগিতায় নবদ্বীপে সমাজবাড়ীকে নূতন রূপ দান করেন নাই—বাংলার গ্রামে গ্রামে লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবতীর্থগুলির পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নূতন বিভাগ খুলিয়া দেশের ধর্মস্থানগুলির সংস্কার ও সেগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন, শুনা যাইতেছে বাবাজী মহাশয় একাই অদম্য উৎসাহে কাজ করিয়া সে জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, সিঁথির ন্যায় আরও বহু স্থানে তাঁহার স্মৃতির সহিত জড়িত বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার কার্য্যকে দেশবাসীর মনে সদা জাগরূক রাখার ব্যবস্থা হইবে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের দুরবস্থা—

সমগ্র পূর্ববঙ্গে ডাকাতি লুঠতরাজ, নারীহরণ, অন্যায় ভাবে আটক রাখা প্রভৃতি অনাচার ব্যাপক হওয়ায় সেখানে হিন্দুদের পক্ষে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে—অথচ বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া আসাও সহজসাধ্য নাই। সে জন্য সারা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে মানসম্ভ্রম ও টাকাকড়ি লইয়া বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর হইয়াছে। কাশ্মীর দখলের চেষ্টায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যত অধিক বিফল হইতেছে, পাকিস্তান-বাসী হিন্দুদের উপর অত্যাচার ততই বাড়িয়া যাইতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে একদল পাকিস্থানী ভারতীয় এলাকায় গোপনে প্রবেশ করিয়া সীমান্তবর্তী গ্রামসমূহে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। আমেরিকার অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট বহু অস্ত্রশস্ত্রের বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহা লইয়া ভারতের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়াছে। আটক অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের পর কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার কথাবার্তা হইতেও তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। তিনি ভারতের সহিত পাকিস্থানের যুদ্ধ বাধাইবার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। এ অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা কখনই উচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যদিও ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন প্রতি-আক্রমণের কথা বলিয়াছেন—কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথায় প্রতি-আক্রমণের কথা—এমন কি আক্রমণে বাধা দেওয়ার কথা শুনা যায় নাই। ভারতবাসী অস্ত্রশস্ত্রেও সেভাবে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে নাই। পাকিস্থান-ভারত বিরোধ শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসী নিজেকে বিব্রত বোধ করিতেছে।

আসামের ২ জননায়কের মৃত্যু—

আসামের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও গৌহাটী মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ হেম বড়ুয়া গত ২৭শে জানুয়ারী ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কাছাড়ের ১১০ বৎসর বয়স্ক ধর্মনেতা মৌলানা মহম্মদ ইয়াকুব জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরলোক গমন করিয়াছেন—তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি—

গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতার মেয়র কলিকাতা কর্পোরেশনের সকল প্রকার দুর্নীতি ও গলদ দূর করিয়া ভাল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১৪টি ছোট ছোট কমিটী গঠন করিয়াছেন—কমিটীগুলি তদন্তের পর তাহাদের সিদ্ধান্ত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে মেয়রকে জানাইবেন। প্রত্যেক বিভাগের অধিকর্তা এই কমিটীতে আছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন বিরাট প্রতিষ্ঠান—তাহার শাসন ব্যাপারে বর্ত্তমানে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি হইতেছে। মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণা সেন আজীবন শিক্ষাব্রতী—বর্ত্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটার—তাঁহার এই সাধু চেষ্টা ফলবতী হউক—সকলে ইহাই কামনা করেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা লইয়া কাজ করিলে অবশ্যই এ চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ—

গত ২৮শে জানুয়ারী সকালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ১২৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। রাজ্যপাল শ্রীযুতা পদ্মজা নাইডু সভাপতিত্ব করেন এবং কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার সুধীরচন্দ্র বসু ভাষণে বলেন —কলেজে রোগী ও ছাত্র দুই কমানো দরকার হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট রোগীর সংখ্যা ৮১৩—কিন্তু ১৬০০ রোগী কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়। বৎসরে কলেজে নূতন ১৩১ ছাত্র না লইয়া ১০০ ছাত্র লইলে পড়ার উন্নতি হইতে পারে। যদি এই ভাবে রোগী ও ছাত্রের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে চিকিৎসকগণকে অতিরিক্ত কাজ করিতে হয় বলিয়া চিকিৎসার মান কমিয়া গিয়াছে। রাজ্যপালও তাঁহার ভাষণে কলেজ ও হাসপাতালের উন্নতি বিধানে সকলকে যত্নবান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমানে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান গলদে পূর্ণ হইয়াছে। যাহাতে গলদগুলি দূর করা যায়, তাহার ব্যবস্থায় সকলে মনোযোগী হইলেই প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব করা সার্থক হইবে।

ইতিহাস সংকলন সমিতি—

গত ২৭শে জানুয়ারী সোমবার ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস সংকলনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে মজিলপুর গ্রামে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয়ের বাস গৃহ সুরেন্দ্র-ভবনের দ্বিতলস্থ হলঘরে এক সম্মিলন হইয়াছিল। সম্মিলনে প্রবীণ ও খ্যাতিমান ঐতিহাসিক আচার্য্য শ্রীরাধা-কুমুদ মুখোপাধ্যায় এম-পি, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম-পি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক প্রত্নিতত্ত্বশ্রী শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া ইতিহাস সংকলন সমিতির সদস্যগণকে ইতিহাস রচনার প্রণালী ও কৌশল সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের প্রবীণ ব্যবহারাজীবী শ্রীব্রজনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন সমিতির সভাপতি শ্রীকমীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করার পর কালিদাসবাবু এক মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন ও পরে তিনজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। সাপ্তাহিক ২৪ পরগণা পত্রের সম্পাদক খ্যাতিমান কর্মী শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় শতাধিক গুণী ব্যক্তি সম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলেন। কালিদাসবাবু ও তাঁহার কৃতী পুত্রগণ অতিথিগণকে সাদর অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। সম্মিলনে সমিতি পুনর্গঠিত করিয়া একদল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য করা হইয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে এক বা ততোধিক কর্মী গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের উপর সেই সেই গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা এ পর্য্যন্ত ২৪ পরগণা জেলার কোন পূর্ণ ইতিহাস সংকলিত হয় নাই। এখন কর্মীরা উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে অচিরে ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করা সম্ভব হইবে।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধুলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু, যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা ঝরঝরে বোধ করবেন। **প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।**

হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রদত্ত

সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

গত ২২া ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকান্ত ভট্টাচার্য্যের গৃহে রবিবাসরের এক সভায় প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, খ্যাতনামা লেখক শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা না করিলে যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া যায় না, এ কথা লোক আজ ভুলিয়া যাইতেছে। এমন কি, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত এখন আর সংস্কৃতকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্য্যন্ত অবশ্য পাঠ্য বিষয় করিয়া রাখেন নাই। তাহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন আর সংস্কৃত শিক্ষা করে না এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সম্যকভাবে তাহাদের পরিচয় লাভও ঘটে না। ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিলে অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীশ্রীভাব ন্যায়তীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় ৺কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা অতি সহজ, সরল ও সুললিত সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘ ভাষণ দিয়া বিষয়টি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজি ও হিন্দী কোন ভাষা বর্ত্তমানে রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইবে—এ সমস্যা যখন ভারতবাসী সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির বিচারের বিষয়, সে সময়ে সংস্কৃত ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা যায় কিনা—তাহাও সভায় আলোচিত হইয়াছিল। সহজ ও সরল সংস্কৃত ভাষা সারা ভারতের লোক অতি সহজেই শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করেন। যখন ১৪টি প্রাদেশিক ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষারূপে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে ঐ সকল আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা ও রাজকার্য্যের বাহন করা হইতেছে, তখন সকল ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা সংস্কৃত ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা অবশ্যই অসম্ভব বা অলৌকিক হইবে না। কি উত্তর ভারত, কি দক্ষিণ ভারত—সর্বত্রই সংস্কৃত ভাষার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আছে এবং অল্পসংখ্যক হইলেও একদল শিক্ষিত মানুষ সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী। ইতিপূর্বেও ভারতের বর্তমান যুগের বহু মনীষী সংস্কৃত ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবও করিয়াছেন। এমন কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বহু মনীষীও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহশীল এবং আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জার্মানীতে বহু লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়া থাকেন। সভায় পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় যেরূপ সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিয়াছিলেন, নানা স্থানে ঐ ভাবে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দেওয়া হইলে সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে সাধারণের ভয় দূরীভূত হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যাহাতে অধিকসংখ্যক লোক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, আমরা দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে প্রার্থনা জানাই।

উদ্বাস্তু সমস্যার উপায়—

গত ২২শে জানুয়ারী কলিকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে ৬টি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এক সম্মিলনে সমবেত হন—তথায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মহিশূর, উড়িষ্যা ও রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুত মেহের চাঁদ খান্না ছাড়াও বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিম-বঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন এবং কেন্দ্রের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর নস্কর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের আর স্থান না থাকায় বিভিন্ন রাজ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য এক লক্ষ একর জমী পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ক্যাম্পে বাসকারী উদ্বাস্তুদের বাংলার বাহিরে অন্য রাজ্যে লইয়া যাওয়া হইবে। বর্তমানে সাড়ে ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বাস করে—তাহাদের দুই তৃতীয়াংশ কৃষিজীবী ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসনের ব্যয় ভার বহন করিবেন। উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পে যে ভাবে আছে, ঐ ভাবে আর ও কিছু কাল থাকিলে সকলেই মারা যাইবে, সে জন্য নূতন ব্যবস্থা স্বরান্বিত করার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনমাস কাজ করার পর মে মাসে মন্ত্রীরা আবার মিলিত হইয়া কাজের হিসাব পর্যালোচনা করিবেন।

ছোট শিল্প উন্নতির ব্যবস্থা—

জাপান গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ও জাপানী প্রথায় ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতির জন্য কলিকাতায় একটি 'ছোটশিল্প উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করা হইবে। গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় ছোট শিল্প বোর্ডের এক সভায় কেন্দ্রিয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীখাণ্ডুভাই সাহা এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বোর্ডের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, পশ্চিম জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় দিল্লীর নিকট ওখলা শিল্প কেন্দ্রে একটি কারখানায় যন্ত্রের অংশ প্রস্তুতের আয়োজন হইতেছে। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় ছোট শিল্পের উন্নতির জন্য মাত্র ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে—দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ পর্য্যন্ত ৭২০টি স্থানে ছোটশিল্প উন্নয়নের জন্য সাড়ে ৪ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া বারে গন্ত ক্রয় করার জন্য ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাড়ে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট শিল্প অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইবে। বেকার সমস্যা আজ সমাজকে ও দেশকে ধ্বংস করিতেছে। কতদিনে এ সমস্যার সমাধান হইবে তাহা সকলকে চিন্তিত করিয়াছে।

একাডেমী পুরস্কার—

সঙ্গীত নাটক একাডেমী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে নাটকে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও সঙ্গীতে শ্রীশচীন দেববর্মন পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা উভয়কেই এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পাশপোর্ট লইয়া জুয়াচুরি—

পাকিস্তানী মুসলমানরা মিথ্যা করিয়া নিজেদের ভারতীয় অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া পাশপোর্ট লইয়া পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছে—গত ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় পুলিস ঐরূপ ৭ হাজার পাশপোর্ট ধরিয়া ফেলিয়াছে। এক সঙ্গে হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানে এ জন্য খানাতল্লাস চলিয়াছিল। ৬জন পুলিস অফিসার, হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিজস্ব কেরাণী, অন্যান্য ৩জন কেরাণী, ৬জন মোক্তার ও দালাল সমেত ১৬জনকে এ জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কলিকাতা ওয়াটগঞ্জে একটি আড্ডা খুলিয়া এই সকল ব্যাপারে সাহায্য করা হইত; গত ১৮ই জানুয়ারী হুগলী আদালতে এ বিষয়ে এক মামলা আরম্ভ হইয়াছে। মামলার তদন্তে আরও বহু তথ্য প্রকাশ পাইবে।

রাষ্ট্রশক্তির সম্মান দান—

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবার (১৯৫৮) ভারতের ৩৬জন গুণী ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়াছেন। একজন ভারতরত্ন, ১৬জন পদ্মভূষণ ও ১৯জন পদ্মশ্রী উপাধি পাইয়াছেন—পদ্মবিভূষণ উপাধি (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। পুণা নিবাসী ৯৯ বৎসর-বয়স্ক সমাজ-সেবক ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ডাঃ ডি-কে-কার্ভে 'ভারতরত্ন' হইয়াছেন। ইতিপূর্বে রাজাগোপাচারী, রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ রামন, ভগবান দাস, বিশ্বেশ্বরায়া, প্রধান মন্ত্রী নেহরু ও পণ্ডিত পন্থ—৭ জন ভারতরত্ন হইয়াছেন। ৫ জন নারী এবার উপাধি পাইয়াছেন—তন্মধ্যে কুমারী নার্গিস ও শ্রীমতী দেবিকারাণী পদ্মশ্রী হইয়াছেন। চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় ও চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীদেবকীকুমার বসু পদ্মশ্রী হইয়াছেন। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর, ভারতবর্ষের সহিত দীর্ঘ-কালের সংশ্লিষ্ট শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমরা ৩ জন বাঙ্গালীর সম্মান লাভে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বাঙ্গালী লেখক সম্মানিত—

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্য পুস্তক রচনা প্রতিযোগিতায় এবার বাংলা ভাষায় 'কোথায় নরা' নামক পুস্তক লিখিয়া শ্রীঅমরনাথ রায় ভারত সরকারের প্রদত্ত ৫০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জনপ্রিয় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সাল হইতে এই পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১০টি বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের জন্য ৫০০ টাকা করিয়া ও ১৫টি পুস্তকের জন্য হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রতিটি পুস্তকের হাজার কপি সরকার ক্রয় করিয়াছেন। আমরা লেখককে এই গৌরব লাভের জন্য সাধুবাদ জানাই।

কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত—

কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত গত ২রা মাঘ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। তিনি কিছুকাল দৌলতপুর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ও পরে দীর্ঘকাল কলিকাতায় কবিরাজী চিকিৎসা করিয়াও খ্যাতিলাভ করেন। বৈদ্যধর্ম প্রচারে তিনি নিজেকে সারাজীবন নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং ধর্মবক্তা হিসাবেও জনপ্রিয় ছিলেন।

মেদিনীপুরে অষ্ট-শহীদ স্মৃতি সৌধ—

মেদিনীপুর সহরে অষ্ট সহীদ (১) ক্ষুদিরাম (২) সত্যেন (৩) প্রদ্যোৎ (৪) অনাথ (৫) নৃপেন (৬) ব্রজকিশোর (৭) রামকৃষ্ণ (৮) নির্মলজীবন—মুক্তি সংগ্রামে জীবনদান করেন। তাঁহাদের ৮ জনের স্মৃতিতে একটি সৌধ নির্মাণ করা হইবে। গত ২৬শে জানুয়ারী সহরের নিমতলায় চক্রে স্মৃতি সৌধের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। বিপ্লবীদের সহরে এই ভাবে স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সুভাষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

২০শে জানুয়ারী আসাম কংগ্রেসের ১৩ তম অধিবেশনের পর নূতন সভাপতি শ্রীইউ-এন-ধেবর নিম্নলিখিতরূপে নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—উচ্চতম সমিতি-গঠন করিয়াছেন—(১) শ্রীজহরলাল নেহরু (২) মৌলানা আবুল-কালাম আজাদ (৩) পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (৪) ডাঃ নারায়ণী দেশাই (৫) ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (৬) শ্রীজগজীবন রাম (৭) শ্রীকামরাজ নাদার (৮) শ্রীখান্দুভাই দেশাই (৯) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (১০) সরদার প্রতাপ সিংহ কৈরন (১১) শেঠ গোবিন্দ দাস (১২) শ্রীওয়াই-বি-চাবন (১৩) শ্রীশ্রীমন্ নারায়ণ (১৪) শ্রীকে-পি-মাধবন নায়ার (১৫) শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী। পরে (১৬) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সদস্য হইতে সম্মত হইয়াছেন—প্রথমে তিনি অসুস্থতা বশতঃ সদস্য হইতে চান নাই। (১৭) শ্রীসত্যনারায়ণ রাজু ও (১৮) সভাপতি শ্রীধেবর। উড়িষ্যা হইতে একজনকে ও একজন খ্যাতনামা মহিলাকে পরে গ্রহণ করা হইবে। শ্রীমন্ নারায়ণ ও শ্রীরাজু সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীরাজু অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ ত্যাগ করিবেন। পরে আরও একজনকে সাধারণ সম্পাদক করা হইবে। পূর্ব ওয়ার্কিং কমিটীর ৭ জন সদস্যকে বাদ দিয়া নূতন লোক লওয়া হইয়াছে। সভাপতিকে লইয়া পূর্বের কমিটীতেও ২০ জন সদস্য ছিলেন।

পরলোকে নির্মলচন্দ্র ঘোষ—

খ্যাতনামা সাংবাদিক, অমৃতবাজার পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক নির্মলচন্দ্র ঘোষ গত ২৩শে জানুয়ারী রাত্রি ১১টার সময় তাঁহার দমদমস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সন্ধ্যায় থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন ও ৬ ঘণ্টার পর মারা যান। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এক সময়ে ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটীর সভাপতি হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত ছিলেন।

আমেরিকার ঋণ দান—

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৪ মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিবেন। ঐ অর্থ বন্দর উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। চলতি বৎসরে ঐ টাকায় কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের উন্নয়ন করা হইবে। ইতিপূর্বে মার্কিণ সরকার ভারতবর্ষকে ২৯ কোটি ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারত ৬০ কোটি ডলার ঋণ চাহিয়াছিল—তন্মধ্যে ৪০ কোটি ডলার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মাদ্রাজে নূতন রাজ্যপাল—

আসামের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বিষ্ণু রাম মেধী গত ২৪শে জানুয়ারী মাদ্রাজের নূতন রাজ্যপালরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মাদ্রাজের পঞ্চম রাজ্যপাল। শ্রীমেধী শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য কিছুদিন পূর্বে আসামের প্রধান মন্ত্রীর কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন—

গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার ও শনিবার কলিকাতা বাণীগৃহ সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বা বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শেষ দিনে দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বিশেষ বক্তা হিসাবে সমাবর্তন ভাষণ দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও

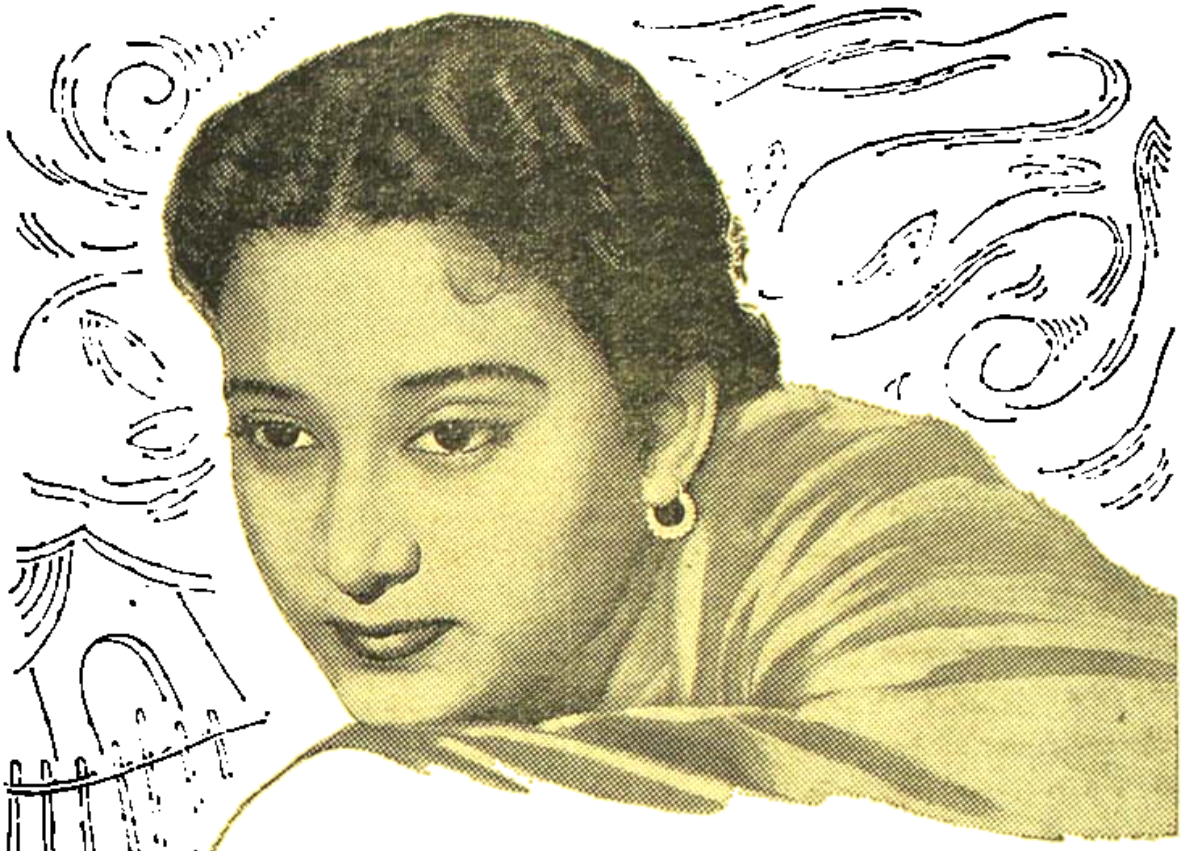

সবিতা চ্যাটার্জ্জী

বলেন "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এমন একটি বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবান!"

সবিতা এখন বাংলা দেশে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের অন্যতম। কিন্তু শুধু তাঁর অভিনয় নয়, তাঁর সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ব লাবণ্যও চিত্রামোদীদের মুগ্ধ করেছে। এই লাবণ্যের ঘরে তিনি নেন মোলায়েম লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে। আপনিও বিশুদ্ধ, শুভ্রলাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ওকের ঘরে নিন। সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে বড় সাইজের সাবান কিনুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 539-X52 BO

হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও দ্বিতীয় দিনে তাঁহার ভাষণ দেন। উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত উভয় দিনই উৎসবে ভাষণ দেন, দ্বিতীয় দিনে ৩ জন ডি-এস্‌সি, ৪ জন এম-ডি, ৩ জন এম-এস, ২ জন এম-ও, ১৫ জন আর্টসে ডি-ফিল, ৪৬ জন বিজ্ঞানে ডি-ফিল ও ৭ জন চিকিৎসা বিদ্যায় ডি-ফিল উপাধি পান। বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী স্বর্ণপদক, অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী স্যার আশুতোষ মুখার্জি স্বর্ণপদক, কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 'ভগত্তারিণী স্বর্ণপদক', শ্রীবিধানবিহারী মজুমদার 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক', কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি স্বর্ণপদক', ডাঃ পি-সি-সেনগুপ্ত 'কোটস্ স্বর্ণপদক', আবদুস সোভান খান 'জয় নাল আবেদিন স্বর্ণপদক', ও প্রাণগোবিন্দ ঘোষ 'মহারাজা জে-এম-ঠাকুর স্বর্ণপদক' লাভ করেন। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ২৩ জন ছাত্রী সমেত মোট ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়। শ্রীফুলচাঁদ ও শ্রীহরিকুমার ভট্টাচার্য্য স্বর্ণাঙ্কিত রৌপ্যপদক লাভ করেন। পূর্বদিন শুক্রবার ৬৫টি কলেজ হইতে পাসকোর্সে বি-এ, বি-এসসি ও বি-কম্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (দ্বিতীয় বিভাগে) ২১১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে খাতক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ দিন উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত বক্তৃতা করেন।

॥ শিক্ষিতের ভবিষ্যৎ ॥

—পাস করে ডিগ্রী পেলে···এবার সামনে বিরাট কর্মক্ষেত্র !···
দেখছো, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল···

—আজ্ঞে, এতকাল উজ্জ্বল দেখছিলুম···কিন্তু এখন···দেখছি, সামনে ভীষণ অন্ধকার !

শিল্পী—পৃথ্বী বেরেশ্‌গী

—বোলো—

পাশের বাড়ীতে নতুন রেডিয়ো কেনা হয়েছে একটা। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সেটা বাজে। গান-বাজনা-বক্তৃতা-ইংরেজি-বাংলা-হিন্দী-তামিল। ভল্যুম একেবারে শেষ পর্দায় তোলা। নতুন রেডিয়ো কেনবার আনন্দে বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভুলে গেছে—ওটা কেবল নিজেদেরই শোনবার জন্যে, সমস্ত পাড়াকে শোনাবার জন্যে নয়।

পূরবীর যন্ত্রণাই হয়েছে সব চাইতে বেশি। রেডিয়োটা রাখা হয়েছে একতলার ঘরে—প্রায় তার জানালাটার মুখো-মুখি। দিনরাত ওই ধ্বনি-তরঙ্গ এসে সোজাসুজি তাকেই আক্রমণ করে। জানালা বন্ধ করেও নিস্তার নেই।

আজও বই খুলে চুপ করে বসেছিল পূরবী। সামনে বইয়ের পাতা খোলা—একটা লাইনও পড়া যাচ্ছে না। পুরোনো বাল্‌বটার আলোর রঙ হলদে হয়ে গেছে—ছোট ছোট হরফ পড়তে এমনিতেই কষ্ট হয়, মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জড়িয়ে যেতে চায় অক্ষরগুলো। তার ওপরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তরঙ্গ—নাঃ, অসম্ভব।

সুরটা বসন্ত—পরজ-বসন্ত। অসীম বিরক্তি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে গানের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল মনটা। আঃ—আর একটু কমিয়ে দেয় না কেন—আরো ভালো লাগত। বেশ গাইছে মেয়েটি—চমৎকার সঙ্গত হচ্ছে তবলায়। বাবার এক সময়ে তবলা বাজিয়ে হিসেবে বেশ নাম ছিল, ছেলে-বেলা থেকেই তবলার ভালো-মন্দ অল্প-বিস্তর সে বোঝে। গানের চর্চাও কিছু কিছু সে শুরু করেছিল, কিন্তু পড়ার তাগিদে তানপুরাকে বিসর্জন দিয়েছে। বাবা সংসার চালাতে পারেন না, দাদার কাছ থেকেও বিশেষ কোনো ভরসা নেই। সে যদি পাশ করে একটা চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে, তা হলে সবাই অন্তত দু'বেলার দু'মুঠোর জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

মনে গান ছিল—গলাও খুব খারাপ ছিলনা। তবু গানকে তার বিদায় দিতে হয়েছে। এই জন্যেই কখনো কোনো ভাল গান শুনলে কেমন যন্ত্রণা বোধ করে সে—যেন সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, তারই জিনিস কেড়ে নিয়ে কারা যেন সেইটে তার চোখের সামনে এনে ধরছে বার বার।

তার ক্লাসের হাসি দুখানা রেকর্ড করেছে—রেডিয়োতে গানও করে মধ্যে মধ্যে। হাসির বাবা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টে চাকরি করেন—অনেক টাকা মাইনে পান। বাইরে থেকে বড় বড় ওস্তাদেরা কলকাতায় এলে অনেক সময় বাড়ীতে জলসা বসান। হাসি সগর্বে নিমন্ত্রণ করে তার বন্ধুদের। অবশ্য পূরবীকে কখনও বলে না:—আর বললেও সে যেত না।

পরজ-বসন্ত জমে উঠেছে। তবলার সঙ্গে সঙ্গে পূরবীর আঙুলগুলো নিজের অজান্তেই বেজে চলেছে তবলার ওপর। হঠাৎ কে মাঝখানে রেডিয়োটাকে বন্ধ করে দিলে। চমকে উঠল পূরবী। ঠিক যেন কে একটি সুন্দরী মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলল।

পয়সা আছে—দামি রেডিও কিনেছে। ইচ্ছে মতো যখন খুসি বাজাবে। তাই বলে গান বুঝতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। পূরবী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

এখন শান্তি। এবার পড়ায় মন দেওয়া যেতে পারে।

তবু মন বসল না। বাল্‌বটার হলদে আলো আরো

বিবর্ণ হয়ে উঠেছে যেন। বইয়ের হরফগুলো পাশে-পাশে এসে মিশেছে, প্রত্যেকটা লাইন যেন এক-একটা সরল রেখায় পরিণত হয়ে গেছে। আবার নিঃশ্বাস ফেলল পূরবী। চশমা খুলে শাড়ীর আঁচলে পরিষ্কার করতে লাগল কাচ দুটো।

মা এলেন।

—পাশের বাড়ীর মাসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। ডালটা চাপিয়ে দিয়েছি, যদি আসতে দেরী হয় একটু দেখিস।

—আচ্ছা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মা আবার থেমে দাঁড়ালেন।

—সত্যর তো এই সপ্তাহে একবার আসবার কথা ছিল। এলো না তো।

—বাস্ত লোক মা—বোধ হয় সময় পাননি। তা ছাড়া ওঁকেও হয়তো টিউশন করতে হয়।

—টিউশন করতে হবে কেন? অত বড় বাড়ীর ছেলে—ওদের টাকার অভাব কী?—মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

পূরবী জবাব দিল না। জবাব তার জানা নেই। তা ছাড়া এ-কথা কোনোদিন সে ভাবেও নি।

মা চলে গেলেন।

সত্যজিৎ। ওই আর একটা অবস্থিকর চিন্তা। সেই একা ক্লাশ করতে যাওয়া। ক্লাসের—শুধু ক্লাসেরই নয়, গোটা কলেজেরই সব মেয়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে। বীথি বক্তৃতা দিচ্ছে পুবদিকের সিঁড়ির তলায়।

: একটা দিন ক্লাসে না গেলে আপনাদের পড়াশুনোর কোনো মারাত্মক ক্ষতি হবে না। কিন্তু এর ফলে শিক্ষকেরা তাঁদের সংগ্রামে জোর পাবেন, তাঁদের দাবি আরো জোরালো হয়ে উঠবে—তাঁরা···

তবু ক্লাসে গিয়েছিল পূরবী।

কলেজ-স্টাইপেণ্ড, প্লাস বলে? কিন্তু তার মতো আরো অনেকেই তো স্টাইপেণ্ড পায়। তারা তো আসেনি। তবু একা সে ক্লাসে কেন গিয়েছিল?

ক্লাসের জন্যে নয়—সত্যজিতের জন্যে?

পূরবীর হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। এ কী হচ্ছে তার—কেন এমন হচ্ছে? এমন অসম্ভব কল্পনা তার কেন আসে—কোথা থেকেই বা আসে? জানতে দেবেনা, অবস্থায় মেলে না, বয়েসের দূরত্বও কম নয়। তা ছাড়া সে নিজে যা খুশি ভাবুক—এমন অসম্ভব কথা শুনলে সত্যজিৎ—

লজ্জায় মরে গেল পূরবী। কেন এমন হল? এ-সব চিন্তাকে সে নিজেও তো কখনো প্রশ্রয় দিতে চায়নি। অথচ এরা কখন নিঃশব্দে এসেছে—অসহায় হরিণের শরীরে যেমন করে পাকে পাকে জড়ায় অজগর, তেমনি করে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে তাকে। যখন সজাগ হয়ে উঠেছে, তখন আর মুক্তির উপায় নেই।

ক্লাসের মেয়েরা বোধ হয় সবাই বোঝে। তাই যত রাগ করেছে, ঠাট্টা করেছে তার চাইতে বেশি।

একজন তো স্পষ্টই বলেছে. ওর কথা ছেড়ে দাও। প্রোফেসার মুখার্জির ক্লাসের জন্যে ওর আলাদা রকমের আকর্ষণ আছে।

পূরবী কোনো জবাব দেয়নি। এমনিতেই সে বেশি কথা বলতে জানে না, শুধু মুখ লাল করে উঠে গেছে সামনে থেকে।

তারপর বীথি যখন জামিন নিয়ে কলেজে এল—সেদিন কমন-রুমে তার কী অভ্যর্থনা! একজন আবার প্রস্তাব করেছিল, এই উপলক্ষে থার্ড ইয়ারের পূরবী দত্তের কা থেকে কিছু শুনতে চাই আমরা।

বীথিই রক্ষা করেছিল অবশ্য। বলেছিল, এ-সব তোমাদের ভারি অন্যায়। কেন মিথ্যে ডিস্টার্ব করছ ওকে?

কিন্তু অপমান নিশ্চয়ই করতে পারে ওরা—সে অধিকার ওদের আছে। কিন্তু পূরবী কী করে অস্বীকার করবে—অধ্যাপক সত্যজিৎ সম্পর্কে যে-কথা সে ভাবে, সে-সব ভাবা উচিত নয়? তার নিজের চাইতে কে আর বেশি করে জানে, সত্যজিতের পড়োনোর চাইতেও সে তার গলার আওয়াজ বেশি করে শোনে—চোখ তুললেই দেখতে পায়, সত্যজিতের হাতে লাল পাথরের আংটিটা একটা আশ্চর্য সংকেতের মতো ঝলমল করছে?

একটা কান্নার মতো কী যেন উঠে আসতে চাইল তার বুকের ভেতর। এ ভাবে চললে হয়তো আসছে পরীক্ষায় সে ফেল করবে। হয়তো সত্যজিতের পেপারেই ফেল করবে।

পাশের বাড়িতে আবার রেডিয়োটা খুলে দিয়েছে।

বীভৎস মোটা গলায় কে যেন বক্তৃতা শুরু করেছে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সম্বন্ধে কতগুলো কটমটে কথা এক একটা করে হাতুড়ির ঘায়ের মতো লাগছে।

সত্যজিৎ এ-সপ্তাহে আসবে বলেছিল, আসেনি। সেদিন সে একা হ্লাসে গিয়েছিল বলেই কি ঘৃণা হয়েছে তার ওপর? ভেবেছে, মেয়েটা কী নির্লজ্জ হৃদয়হীন।

পূরবী নিষ্ঠুরভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। যেমন করে হোক—থার্ড ইয়ার শেষ হলেই এ কলেজ থেকে সে ট্রান্‌স্ফার নেবে। এখানে আর তার পড়া চলেনা।

রান্নাঘর থেকে একটা তীব্র পোড়া গন্ধ ভেসে এল। ডালের জল উথ্‌লে বোধ হয় উনুনে পড়েছে। চমকে উঠে পড়ল পূরবী। কিন্তু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেও তার মনে হল, সত্যজিৎ আসতে পারে। আজ, এখনই এসে পড়তে পারে হয়তো।

সত্যজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল কার্জন পার্কের পাশে। রেলিঙে হেলান দিয়ে।

দূরে ধর্মঘটী শিক্ষকেরা বসে আছেন পথের ওপর। স্থির, শান্ত, নির্বিকার কয়েকটি মানুষ। স্পষ্ট করে কাউকে চেনা যাচ্ছেনা। হয়তো অনন্ত সেনগুপ্ত আছেন—সেই মানুষটিও আছেন: আধপেটা খেয়ে যিনি এই সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত ছাত্র পড়িয়ে চলেছেন। এখান থেকে কাউকে চিনতে পারছেনা। সত্যজিৎ—মনে হচ্ছে কয়েকটা পাথরের মূর্তিকে পথের ওপর কেউ সাজিয়ে রেখেছে। পুজো-পার্বণের মুখে যেমন ভাবে কুমারটুলীর দাওয়ায় সাদা রঙের এক-মেটে মূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সে উদ্দীপনা যেন আর নেই। ধর্মঘটীদের সংখ্যা কমে আসছে। সাধারণ মানুষের মনেও আন্দোলনটা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে—সব মিলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে যেন। বিষণ্ণ ব্যথিত চোখ মেলে সত্যজিৎ তাকিয়ে রইল। একটা মীমাংসার কথাবার্তা চলছে বলেই কি? অথবা—

—হ্যালো মুখার্জি!

পরিতোষ মৈত্র এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। একদা সহকর্মী ছিল। বছর খানেক আগে বড় গোছের একটা সরকারী চাকরি পেয়েছে। চুলের ছাঁচ থেকে পায়ের জুতোর পালিস পর্যন্ত বদলে গেছে পরিতোষের। যে কালের যা ধরণ। সত্যজিতের একটা আকস্মিক খেয়ালের মতো মনে হল, পরিতোষের হাতে টার্কিশ সিগারেটের একটা টিন নেই কেন।

পরিতোষ বললে, কী মনে হচ্ছে স্ট্রাইকের অবস্থা?

—দেখতেই পাচ্ছ।—সত্যজিৎ মৃদু হাসল।

—র‍্যাদার ডিজ্‌র‍্যাপহেটিং—এ?—কলেজ জীবনে একটা-ছাত্র আন্দোলনের পাণ্ডা পরিতোষ বললে, এরকম হেষ্টি স্ট্রাইক-ডিসিসন নেওয়া খুব অন্যায়। একটা অল্-আউট কিছু করবার আগে নিজেদের শক্তি—স্ট্যামিনা—সব ভালো করে যাচাই করা দরকার। নইলে শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়ায়।

—কত অসহ্য হলে এ মানুষগুলোকে এমন করে পথে নামতে হয়, সে-কথা ভেবে দেখো পরিতোষ।

—এগ্‌জাক্‌ট্‌লি। কিন্তু মোরেল্' যদি ঠিক না থাকে—তা হলে কী মানে হয় এ-সবের—পরিতোষ বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল: আরে—সবাই কি দেবার যে কথায়-কথায় অল্ আউট স্ট্রাইক চালিয়ে যেতে পারে? মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট—সেন্স অব প্রেস্‌টিজ—এ-সব যাবে কোথায়? খাঁটি হাড্ নট্ না হতে পারলে মন্ত্রীরা হওয়া যায়না। আমার কী মনে হয়, জানো? মিড্‌ল-ক্লাসের পক্ষে একটা পীস্‌ফুল সেটলমেন্টই হচ্ছে সব চাইতে ভালো উপায়। সংগ্রামে নামবার আগে আমাদের অন্তত: দশবার ভেবে দেখা উচিত।

—কিন্তু তুমি তো জানো, পীস্‌ফুল সেট্‌লমেন্টের জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

—বাট্ ইউ শুড্ ট্রাই এগেন। তা ছাড়া—এইবার বড় ঘরের সরকারী চাকুরে পরিতোষ মৈত্র কথা কইল: প্রেসার দেওয়ার আগে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে গবর্ণমেন্টের হাতে এখন অনেক বড় বড় প্ল্যান—বিস্তর টাকা সে জন্যে খরচ করতে হবে। টীচারদের যখন এত-দিন সহ্য হচ্ছিল, তখন আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরলে কোনো ক্ষতি ছিল না।

সত্যজিৎ হাসল। তর্ক করা যায়। কিন্তু কার সঙ্গে? পরিতোষ বদলে গেছে—মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো

পথের তার অন্য রকম হয়ে গেছে। একেবারে আলাদা দৃষ্টি, আলাদা মন নিয়ে সব কিছু দেখছে সে।

পরিতোষ বললে, আচ্ছা, আসি তবে। অনেকদিন পরে দেখা হল। সো গ্লাড্ টু মীট্ ইউ।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল। এগিয়ে গেল পরিতোষ।

হয়তো কিছু সত্যি থাকতে পারে ওর কথায়। হয়তো নিজেদের শক্তিকে ঠিক মতো যাচাই করে দেখা হয়নি। কিন্তু কেবল তত্ত্ব আর তর্কটাই কি আসল কথা? অভাবটা তো মিথ্যে নয়। প্রতিদিনের সুধাকে তো তর্ক দিয়ে মিথ্যে করা চলে না। এই দুঃসময়ের বাজারে যখন অন্তত তিনশো টাকার কমে একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার চলতে চায় না—তখন এই সব নিচের তলার শিক্ষকেরা কেমন করে বেঁচে আছেন—কী করে যে তাঁদের দু-বেলার সংস্থান হচ্ছে—সে রহস্যের কোনো মীমাংসা তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

একেবারে সর্বনাশের মুখে পা না দিলে কি এঁরা এমন ভাবে এসে এই পথের ওপর আশ্রয় নিতেন? আধপেটা খেয়েও যাঁরা এতদিন নিজেদের মনকে আঁকড়ে রেখেছিলেন—একেবারে অনাহারের বিভীষিকা না দেখলে তাঁরা কি আসন পাততেন ধুলোর ওপর?

হারু বুনো রামনাথ। তাঁকে সম্ভবত পঁয়ত্রিশ টাকা মণের চাল কিনতে হত না। আর এ-কথাও তিনি কোনো দিন ভাবতে পেরেছিলেন, তেঁতুল পাতা কিনতেও পয়সা খরচ করতে হয়?

ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সত্যজিৎ। বনশ্রীর বইটা দেখে রাখতে হবে। কালকেই অন্তত তার কিছুটা অংশ নেবার জন্যে লোক এসে হানা দেবে।

শ্লথ গতিতে দক্ষিণের দিকে চলতে গিয়ে হঠাৎ সত্যজিৎ থমকে গেল। একটু দূরেই একটা ট্যাক্সি থাক নিচ্ছে ময়দানের দিকে। সেই গাড়িতে রীতেন দি গ্রেট্। সেই বিচিত্র দাড়ি—বিচিত্র চাওয়াই সার্ট।

আর রীতেনের পাশে যে বসে আছে সে প্রীতি। প্রীতি ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রীতির সন্ধ্যায় রেডিয়ো প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু গার্ডনীন্ প্রেস্ থেকে মুখার্জি ভিলায় ফিরে যাওয়ার রাস্তাটা ময়দানের কেন্দ্র দিয়ে নয়।

মাঠের অন্ধকারে গাড়ির পেছনের লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে এখনো। সত্যজিৎ ভুরু কুঁচকে ওই আলোটার দিকেই তাকিয়ে রইল। রাত্রির ময়দান থেকে এক ঝলক অন্ধকার এসে তারও মনের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। বীথির সঙ্গে তার কোনোদিন কোনো দুর্ভাবনা হয়না—কিন্তু প্রীতিকে বিশ্বাস নেই।

মুখার্জি ভিলাকে এখনো অনেক ঋণ শোধ করতে হবে। এখনো তার অনেক দেনা বাকি। কিন্তু তাই বলে রীতেন?

অন্ধকারমাখা মন নিয়ে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সত্যজিৎ। তারপর নিয়নের কুশ্রী আত্ম-ঘোষণাগুলো যখন তার চোখে পিনের মতো খোঁচা দিতে লাগল, তখন সামনে যে বাসটা সে পেলো, লাফিয়ে উঠল তারই ওপরে।

ক্রমশঃ

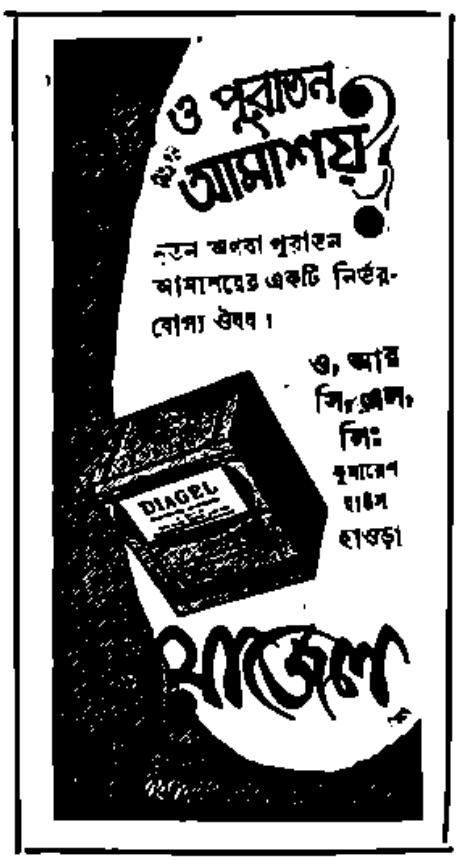

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে একটা ধমথমে ভাব চলিতেছে। এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন্ বোমার পর এখন এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে যে অস্ত্র নিক্ষেপের প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং পরিস্থিতি এখন নূতনতর। এই নূতন পরিস্থিতিতে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আপোষ মীমাংসার জন্য আর একবার সচেষ্ট হইবার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ বিশেষভাবে বোধ করিতেছে। এই মনোভাব গত ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে "গ্লাটো" সম্মেলনে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য শিবিরের রাষ্ট্রনায়কগণ রাষ্ট্রপ্রধানের পর্যায়ে আলোচনা করিতে সম্মত নন; প্রথমে পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যে আলোচনার দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে এই আলোচনা অর্থহীন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কিন্তু জনমতের এই আপোষকামী মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের সুস্পষ্ট প্রস্তাবসম্বলিত পত্র মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনায়কগণ এই সব প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইতেছেন না।

সোভিয়েট প্রস্তাব ও মার্কিণ উত্তর—

গত ৯ই জানুয়ারী বৃটেন, আমেরিকার এবং আরও সতরটি রাষ্ট্রের নিকট চিঠি লিখিয়া মার্শাল বুলগ্যানিন্ জানান যে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসের জন্য পরবর্তী দুই তিন মাসের মধ্যে তাঁহারা রাষ্ট্রপ্রধানদের এক সম্মেলন আহ্বান করিতে চান। এই চিঠিতে রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের আলোচ্য রূপে দুই পক্ষের সমরায়োজনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের দুই পাশে বিমানের সাহায্যে পাঁচ শত মাইল পর্যন্ত স্থানের ফটো লইবার, এবং রেল জংসনে, বৃহৎ বন্দরে ও বড় বড় রাস্তায় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, ইহা ছাড়া আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আপাততঃ দুই তিন বৎসর পর্যন্ত আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার, তথা ইউরোপকে আণবিক অস্ত্র হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য পোলিশ পরিকল্পনার (র‍্যাপাটস্কি পরিকল্পনার) এবং তথা প্রাচ্যের প্রতিরক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলিকে চুক্তিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করা হয়। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে আমেরিকা, বৃটেন্ ও রুশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তির এবং আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করিবার এক প্রস্তাবও করা হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই।

সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাবের উত্তরে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে সর্তাবলী উত্থাপন করেন, তাহা হেয় করিয়া প্রত্যক্ষ আলোচনার পথ সুগম হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনাক্রমণ চুক্তি এবং আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার চুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, জাতি-সঙ্ঘের সনদের স্বাক্ষরকারী হিসাবে সকলেই সমর আক্রমণে বিরত থাকিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তখন এই ধরণের চুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু, প্রশ্ন হইতে পারে, জাতি-সঙ্ঘের সনদে স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের গলা টিপিবার জন্য যদি এই বিপুল আয়োজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে সনদের মর্যাদা কী এমন বৃদ্ধি পাইবে? অনাক্রমণ-চুক্তির দ্বারা যে আক্রমণ নিবারিত হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসে আছে সত্য। তবে, অনাক্রমণ-চুক্তির দ্বারা অন্ততঃ সাময়িকভাবে সমরোদ্যোগ হ্রাস হইতে পারে। এই সম্পর্কে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"One of the chief reasons for the present state of tention in international relations, and for all that is meant by 'cold war' is the abnormal character of the relations between the Soviet Union and the United States of America. অনাক্রমণ-চুক্তির দ্বারা এই abnormal relation কতকটা normal হইলে শান্ত অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা অগ্রসর হইতে পারে। আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দুই তিন বৎসরের জন্য বন্ধ রাখিবার সোভিয়েট প্রস্তাব সম্বন্ধে আইসেনহাওয়ারের উত্তর—আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করাই প্রকৃত সমস্যা। কিন্তু পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিয়া আণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করিয়া যাইবার স্বাধীনতা লাভই কি সোভিয়েট প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ, বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা অস্ত্র-নির্মাণ বন্ধ রাখিবার প্রথম সোপান। বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিলে নির্মাণ-প্রচেষ্টার তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। দুই তিন বৎসরের জন্য বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিয়া অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ রাখিবার প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার উত্তরে এমন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, যাহার আপাততঃ সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার ব্যতীত অন্য কোনও গুরুত্ব নাই। তিনি জাতি-সঙ্ঘের স্থায়ী সদস্যদের "ভিটো" অধিকার ত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভিটোর অধিকার যে মূলতঃ গণতন্ত্রবিরোধী, সে বিষয়ে দ্বিমতের নাই। কিন্তু জাতি-সঙ্ঘে মার্কিণ আমেরিকার বাইশটি ভোট বহু দিন মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের পকেটে, "গ্লাটোর" পনরটি শক্তির এবং বাগদাদ চুক্তির ও "সিয়াটোর" শক্তিগুলির রাজনৈতিক টিকি আমেরিকার হাতে, এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ জাতি-সঙ্ঘে শোচনীয়ভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ,

হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে "ভিটোর" অধিকার ত্যাগের অর্থ রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ, যাহা সে কখনই করিতে পারে না। জাতি-সঙ্ঘে বর্ত্তমানে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সত্য। কিন্তু যতদিন এই প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইবে, জাতি-সঙ্ঘের যাবতীয় অর্থনৈতিক সাহায্য বন্টনের ব্যবস্থা না হইবে, এবং আন্তর্জাতিক সমর জোটগুলি না ভাঙ্গিবে, ততদিন "ভিটোর" অধিকারের প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় "ভিটোর" অধিকার বর্জ্জিত হইলে পরস্পরিক আলাপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না,—জাতি-সঙ্ঘে আনৈক্যের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। বস্তুতঃ, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মার্শাল বুলগানিনের প্রস্তাবের উত্তরে যে সব পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে রাষ্ট্রপ্রধানের পর্য্যায়ে আলোচনার সম্ভাবনা বর্জ্জিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বরং, বলা চলে—সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন কর্ণধারগণ আমেরিকা যে ভাত নহে, এবং তাহার পূর্ব্ব নীতি বর্জ্জন করিলে যে মোটেই প্রস্তুত নয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের লিপিতে। সেই সঙ্গে আর আছে—বর্ত্তমান অনুকূল অবস্থার সুযোগ সোভিয়েট রুশিয়াকে বাড়া করিবার প্রয়াস।

বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক—

আগষ্টমাসীর শেষের দিকে আঙ্কারায় বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে "প্যাক্টোর" রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের এই বৈঠক। "প্যাক্টোর" অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করা এবং তিন বৎসর পরে (আমেরিকার মাকারি পারার ক্ষেপণাস্ত্র তৈয়ারী হইলে) ঐ সব দেশে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপন করা প্যারিস সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। "প্যাক্টো" এবং বাগদাদ্ চুক্তি—চক্রের সত্যরূপে তুরস্ক পশ্চিম ও দূরপ্রাচ্যের এই দুই সামরিক প্রতিষ্ঠানের যৌগসূত্র। প্যারিস বৈঠকে ডুলেসের পরে একমাত্র তুরস্কই তাহার রাজ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাব নির্দ্বিধায়ে মানিয়া লইয়াছিল। ইহার পর বাগদাদ্ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাজ্যেও এইরূপ ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। রুশিয়ার আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে আমেরিকাকে রক্ষা করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট রাজ্যগুলির নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে আণবিক অস্ত্র উদ্যত রাখিবার এবং মাকারি পারার ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি বসাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রয়োজনের দিক হইতে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক-ইরাণ, এমন কি পাকিস্থানের ভৌগোলিক গুরুত্ব পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি অপেক্ষা কম নহে। তুরস্কের ন্যায় ইরাকও সোভিয়েট ইউনিয়নের একেবারে নিকটে। অবশ্য, আঙ্কারায় মার্কিন প্রতিনিধিবর্গের মুখপাত্র বলেন যে, বাগদাদ্ চুক্তির সভ্যরাষ্ট্রগুলিকে "এখনই" ক্ষেপণাস্ত্র দিবার ইচ্ছা আমেরিকার নাই; কারণ "প্যাক্টোর" রাজ্যগুলিকে সর্ব্বাগ্রে এই অস্ত্র প্রদান করিতে আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "এখনই" বাগদাদ চুক্তির রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রদানের প্রশ্ন তোলা-তুলেই ওঠে না: ইহার প্রথম কারণ—এখনও আমেরিকার এই অস্ত্র তৈয়ারী হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—দূরবর্তী অঞ্চলে নিক্ষেপের প্রক্রিয়া হইতে যে অস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হইবে তাহা আণবিক অস্ত্র; আমেরিকার "ম্যাক্ মাহন" আইন অনুসারে এই অস্ত্র অন্য শক্তির হাতে দেওয়া নিষিদ্ধ। আমেরিকা যদি বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সভ্য হয়, এবং এই চুক্তি সংস্থায় সম্মিলিত কমাণ্ড গঠিত হইবার পর সর্ব্বাধিনায়কের পদে এক জন মার্কিণ সামরিক কর্ম্মচারী যদি নিযুক্ত হন, এক মাত্র তাহা হইলেই সেই সামরিক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলের রাজ্যসমূহে মার্কিণ আণবিক অস্ত্র প্রদান করা আইনানুগ হইতে পারে। এইভাবেই "ম্যাক্মাহন আইন" বাঁচাইয়া "প্যাক্টোর" সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল নর্ম্যাডের তত্ত্বাবধানে ঐ সংস্থার রাজ্যগুলিকে আণবিক অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে আঙ্কারায় কোনও সিদ্ধান্ত না হইলেও এই সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা সেখানে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জনমত প্রস্তুত করিবার নির্দ্দেশ হয়ত সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্টগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকা বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সভ্য না হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ডালেসের আঙ্কারায় ছুটিয়া আসিবার কারণ হয়ত ইহাই।

বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ও স্বার্থবুদ্ধির বিভিন্নতা যথেষ্ট। ইহাদের মধ্যে তুরস্ক ও ইরাণের সোভিয়েট-ভীতি কতকটা প্রকৃত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালীন ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এই দুইটি রাষ্ট্রের বর্ত্তমান শাসকবৃন্দের মনে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম্ তথা সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্তে—সীরিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তুরস্ক আরও বেশী অস্বস্তি বোধ করিতেছে। সুতরাং, সোভিয়েট-বিরোধী ও কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সকল প্রকার ব্যবস্থার তুরস্কের উৎসাহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই সম্পর্কে ইরাণের বর্ত্তমান শাসকবৃন্দও নিরুৎসাহ নহেন। কিন্তু ইরাক্ ও পাকিস্থানের ব্যাপার আলাদা। বাগদাদ্ চুক্তির চারিটি মুসলীম রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র আরব রাষ্ট্র হইল ইরাক। কম্যুনিষ্ট আশ্যা বিরোধী দেশের বামপন্থী শক্তিকে দমন করিবার জন্য এবং নিজেদের বাম শক্তিগুলি করিবার প্রয়োজনে ইরাকের বর্ত্তমান শাসকবৃন্দের কম্যুনিষ্ট-বিরোধী বিবিধে যাইবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার কোনরূপ আচরণে প্রত্যক্ষভাবে আতঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ তাহার নাই; কম্যুনিষ্ট-বিরোধী নীতি ইরাকী জনসাধারণের মনে রেখা পাত করে কম। বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রচারের সহিত আরব রাষ্ট্র সীরিয়া ও মিশরের বিরুদ্ধে প্রচার একত্রিত হওয়ায় তাহাদের মনে সন্দেহ জাগে। আরব জগতের বুকের উপর জোর করিয়া ইস্রাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে অন্যান্য আরবদের মত ইরাকীরাও বিক্ষুব্ধ। সেই ইস্রাইলের পৃষ্ঠপোষক পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সহিত এক সূত্রে কম্যুনিষ্ট বিরোধী শিবিরে মিলিত হইতে তাহাদের অনিচ্ছা খুবই। ইরাকী জনসাধারণের এই মনোভাবের জন্যই আঙ্কারা বৈঠকে ইরাকের প্রতিনিধি, সীরিয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রভাব অপেক্ষা ইস্রাইল সম্পর্কে বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাহার পর পাকিস্থান। কম্যুনিষ্ট আক্রমণের

আশঙ্কা, অথবা ইস্রাইল ইহার সমস্যা নহে। এই রাষ্ট্রটি একমাত্র তাহার প্রতিবেশী ভারতকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিয়াছে; সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইলে তাহার শক্তিত হইবে, পাকাত্য শিবিরে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিলে কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার সমর্থক জুটিবে—ইহাই তাহার আশা। ইহা ছাড়া, প্রগতিশীল ঐতিহ্যবিরোধী পাকিস্থানী রাষ্ট্রনায়কগণ নিরপেক্ষ নীতির মর্যাদা উপলব্ধি করিতে অক্ষম; আন্তর্জাতিক সমর-জোটে ভিড়িয়া গেলেই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে স্বীয় ও মধুর বহিয়া বহিয়া চলিবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিলে ভারতের সহযোগিতা পাইতে হইতে পারে বলিয়াও তাঁহাদের আশঙ্কা। আফগানিস্থান কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের সমর্থক জুটিয়াছিল ইরাক, কারণ এই প্রশ্নের সহিত আরব জগতের কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা কূটনৈতিক কারণে কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনও পক্ষ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় এই প্রশ্ন আফ্রো-এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাবে স্থান পায় নাই। ইহার জন্য বৃটেন ও তুরস্ককে সাইপ্রাস সম্পর্কিত দাবী ছাড়িতে হইয়াছে। পাকাত্য শক্তিবর্গের আশ্বাসে পাকিস্থান প্রথমতঃ বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের প্রস্তাবে বাদ সাধিয়াছে। সীরিয়ার প্রতি আমেরিকা অত্যন্ত বিরূপ। তাই, হয়ত ইরাকের আপত্তি সত্ত্বেও, সীরিয়ার বিরুদ্ধে একটি ইঙ্গিত প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। ইঙ্গিতটি এইরূপ—কেবল "কমুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ" নহে, "কমুনিষ্ট প্ররোচিত সর্বপ্রকার প্রভুত্বের" বিরুদ্ধেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। "ন্যাটো" এবং বাগদাদ চুক্তির মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। "ন্যাটোর" অধিকাংশ সভ্য রাষ্ট্রগুলিতে কমুনিষ্ট আতঙ্ক প্রকৃত। যেভাবেই হউক, এই সব দেশে এই আতঙ্ক সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের সাধারণ মিলনের ক্ষেত্র সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়। বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির এই স্বাভাবিক মিলনের ক্ষেত্র নাই। এখানে কয়েকটি রাষ্ট্রের কমুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিরক্ষার কথা বাহিরের যুক্তিসঙ্গত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তির সাহায্যে তাহারা নিজেদের অন্য স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চায়। সুতরাং, বাগদাদ চুক্তিকে ন্যাটোর আদর্শে গড়িয়া তোলা সহজ নয়।

২।২।৫৮

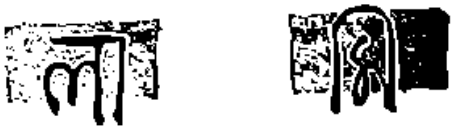

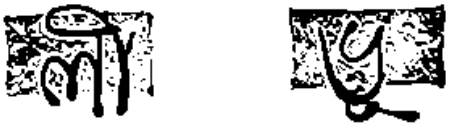

গিরীন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উঠে দাঁড়াতে পা দুটো এখনও টলে। মাথাটা ঝিমঝিম করে। তবুও অতসী দুপুর-ফাঁকে কখন চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, নিবারণ টেরও পায় না। এখন আর সে ঘরে তালা দিয়ে যায় না। কানেস্তারার কপাটটা আস্তে আস্তে টেনে, নিঃশব্দে মরচে-ধরা স্প্রিংয়ের শিকলটা আটকে দেয়।

কি-ই বা আছে ওর, যে চোরে চুরি করবে! দু'খানা ভাঙা শানকি, একটা মেটে হাঁড়ি, জলের কলসী, ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর, আর তেলচিট-ধরা বালিশটা। যায়—যাবে। ...কিন্তু দীনু যদি এসে ফিরে যায়!...ঘর খোলা না পেলে, সে নিশ্চয়ই যাবে চলে। একতিলও সবুর সইবে না তার। সে হয়তো কোনদিনই জানতে চায়নি অতসীর মনটাকে। কিন্তু অতসী যে চিনেছে তাকে। দিনের পর দিন না খেয়ে যে মানুষ কোম্পানী-বাগানের একটী কোণে পড়ে থাকে, মনের খেয়ালে আচমকা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ঘোড়ার মতন দোতলা বাস গাড়ীর সামনে—অপঘাত মরবে ব'লে, তাকে চিনতে কি অতসীর আজও বাকী আছে!...হয়তো সে আবার তেমনি করে ঝাঁপ দিয়েছে গাড়ীর তলায়, না-হয় চাবড়ার পুল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মা-গঙ্গার জলে। মরেছে! হয়তো মনের খেয়ায় জীবনটাকে তুলিয়ে দিয়েছে গাড়ীর চাকায়, না-হয় জলের তলায়।

দোষ তার নাই। দোষ অতসীর অদৃষ্টের। কপাল ওর পোড়া। অমনি পোড়া কপাল নিয়েই সে জন্মেছে। নইলে, অমন জল-জ্যান্ত মা-ভাই-বাপ দিনের পর দিন উপোস করে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে কেন! অন্ধ বাপও যখন গেল, তখন আর অতসীর কোন সম্বলই ছিল না। তবুও সে বেঁচে ছিল খোকা আর দীনুর মুখ তাকিয়ে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দু-মুঠো চাল আর দু-পণ্ডা পয়সা নেবে এনে কোন রকমে দিন গুজরাণ করেছে। ওর বুকের দুধ খেয়েই খোকা এতকাল বেঁচে ছিল। কিন্তু দীনু! দীনু পারতো না গিলতে পাঁচ-মিশালি চালের জলা-পাকানো ভাতগুলো। সে-অভ্যেস তো ছিল না কোনদিন। ভালো ঘরেই জন্মেছিল। অদৃষ্টের বিপাকে এসে জুটেছিল ওদের ওই আস্তানায়। আস্তানা তো নয়, ধ্বান্ত মানুষের ভাগাড়। তাও কি সে এসে জুটতো? না-খেয়ে না-মেয়ে ঘাটে-বাটে ঘুটপাতে কোম্পানীর বাগানেই কাটাতো দিন-রাত। অতসী জোর করে তাকে টেনে এনেছিল ওই একটুখানি খাপরা-চালার ছাউনির তলায়।

কিন্তু তাও ওই গয়লাকাটি সইতে পারে নি। হিংসেয় বিষিয়ে উঠেছিল। কাটা ঠোঁটখানা বাঁকিয়ে, চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেছিল: গাঁটছড়া দিয়ে এ-আবার কাকে বেঁধে আনলি লো?... কপাল ভা-লো।

শুনে গা-টা সিস্‌সিস্ করে উঠেছিল। তবুও মুখে-ফুটে সে কোন কথা বলেনি, পাছে গয়লাকাটি খিস্তি-খেউড়ে সারা বস্তি মাথায় করে বসে।

ওর চুপ করে থাকাটাও যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল—কুড়নো সোনা ছেঁড়া কাপড়ের খোঁটে গাঁট-বেঁধে শুধু আনলেই হয় না, পথভিকিরীর কপালে সইলে হয়!

অতসী চমকে উঠেছিল: ভিকিরী! সত্যি ওরা ভিকিরী আজ। কিন্তু এমনি পথ-ভিকিরী যে ছিল না ওরা, সে কথা কি পদ্মদিদি জানে না!...জানে, নিশ্চয়ই জানে। কতবার শুনেছে ওর কাছে। কিন্তু বিশ্বাস হয়তো করে না সে।...করবেই বা কেন!

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছিল। বুকের ভিতরটা শিউরে উঠেছিল আতঙ্কে, অজানা আশঙ্কায়। বারবার শুধু আপন

মনে বিড়বিড় করে বলেছিল : কপালে সইবে বলে তো আনি নি ডেকে।···কেন যে ডেকে এনেছিলাম, তা পদ্ম-দিদি বুঝবে না। ওদের মত গরীব তো সে নয়। দু-বেলা দু-মুঠো পেটের ভাতের জন্যে হাত পাতে না কারো কাছে। পরণে একখানা কাপড়ও জোটে।···দিনে যেমন গতর খাটায়, রাতে তেমনি আদরও খায়।

ছিঃ!···পর মুহূর্তেই মনটা ধিক্কারে ভরে উঠেছিল : কেন ভাবতে গেল সে ওর কথা! নিজের ভাতেই যার ছাই, পরের কথা ভেবে তার লাভ কি? অতসী যেন নিজের কাছেই সংকোচে জড়সড় হয়ে পড়েছিল।

ফলেছে। পদ্মদিদি যা বলেছিল, তার সবই তো ফলেছে ওর কপাল গুণে। দীনু আবার ছিটকে পালিয়েছে! মটরের ধাক্কায় মুখে রক্ত উঠে ও যখন বিছানায় পড়েছিল, সেদিন সেই যে রাতের বেলায় হাতড়ে হাতড়ে কেরোসিনের ডিবেটা জেলে, মাথার কাছে খানিকক্ষণ বসে থেকে দীনু ঝড়ের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আজও গেল—কালও গেল। আর ফিরলো না।

একরত্তি চিহ্ন ছিল খোকা। কাঙালের কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক! সেও কোল থেকে ছিটকে পড়েছিল সেই গাড়ীর ধাক্কায়। তুলতুলে নরম শরীর, পান বাঁধানো পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে খোকা চীৎকার করে উঠেছিল ভয়ে। ভয়ে নয়, হয়তো চোট লেগেছিল মাথায়। মুখে তো তার কথা ফোটে নি তখনও, তাই মুখ ফুটে বলতে পারে নি কিছু। কিন্তু ব্যথা তার লেগেছিল। মা হয়ে অতসী কি আর বোঝেনি সে কথা।···বুকে তুলে নিয়ে কেমন করে যে অতসী বস্তিতে ফিরে এসেছিল, সে কথা আজ সে ভাবতেও পারে না।

নিবারণবাবু বলেছে, খোকাকে হাসপাতালে দিয়েছে। মিছে কথা। অতসী ঠিক জানে হাসপাতালে নেয়নি তাকে।···মরেছে, নিশ্চয়ই মরেছে সে। দিনের পর দিন যখন ও বেঘোরে পড়েছিল বিছানায়, বুকে একফোঁটা দুধও ছিলনা, খোকা মরেছে তিল তিল করে শুকিয়ে। চীৎকার করে হয়তো কেঁদেছে সারাটা দিন-রাত।···শেষে! শেষে মরা ছেলেটাকে নিবারণবাবু বুকের ভিতর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে, জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে নিমতলার ঘাটে।

চোখ দুটো ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে। ওর পাথর-চাপা বুকের রুদ্ধ ব্যথা গুমরে গুমরে ওঠে। মনে হয় কান্নার আবেগে কপালের শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে যাবে। শীর্ণ শিরা-উপশিরায় ক্ষয় প্রবাহিত ক্ষীণ রক্তস্রোত যেন হঠাৎ জোয়ারের চাপে ফুলে ফুলে ওঠে।

চোখে জল করে। কিন্তু ঠোঁট দুটো ওর কাঁপে না। দাঁতে দাঁত চেপে অতসী কান্নার বেগ সামলে নেয়।

কি সই, আজকাল যে ভুবুরের ফুল হয়ে উঠেছ!

অতসীর চিন্তায় বাধা পড়ে। চমকে পিছন ফিরে চায়।

মুহূর্তে এলোমেলো মনটা উত্তাপে বিবিয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় সামনের পথে।

···বিড়ির দোকানের সেই ছোঁড়াটা! ছোঁড়াটা যে কখন ওর পিছু নিয়েছে, অতসী তা বুঝতেও পারে নি।

সিস দিয়ে ছোঁড়াটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। দু-পা এগিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে ফিরে তাকায় ওর মুখপানে। একটু পিছিয়ে, গলাটা লম্বা করে সুর টেনে বলে—কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরিয়ে কেললে যে! আমদি হয়ে গেল সব।

অতসী বিব্রত হয়ে পড়ে। ইচ্ছে করে, ছুটে পালায়। কিন্তু পারে না। একটু ইতস্তত করে বলে—পথ ছাড়ো।

তা তো ছাড়বোই। কিন্তু দেহটাকে যে মেটিয়ে ফেলেছ। পেটের দায়ে বাছ-বিচার আর করনি বুঝি?

না : অতসী আর অপেক্ষা করে না। ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। পথটা পার হয়ে, হনহন্ করে গিয়ে ওঠে ও-পাশের ফুটপাতে।

ছোঁড়াটা সিস দিতে-দিতে সামনের পথে এগিয়ে চলে, আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে।

অতসী মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবুও যেন নিষ্কৃতি পায় না।—ছোঁড়াটা মাথায় কুলেল তেল মেখেছে। তার উৎকট গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে, নাকের সামনে ঘুরঘুর করে। মগজে জ্বালা ধরে যায়।

ছোঁড়াটা সমান তালে পা ফেলে চলেছে।

অতসী মোড় ফিরলো।

অনেক দিন পরে আজ সে পথে বেরিয়েছে। মাসের পর মাস না হেঁটে, পায়ের পেশিগুলো যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হাঁটু-দুটোয় খিল ধরে। তবুও থামে না, ঝিমিয়ে-পড়া দেহটাকে অতসী মনের জোরে টেনে নিয়ে যায় পথের স্রোতে। অবসন্ন নিষ্প্রভ চোখ দুটো চঞ্চল গতিতে কি খুঁজে মরে পথের আনাচে-কানাচে।

চলে। আরও এগিয়ে চলে।

ধর্মতলার কোণে, পুরানো বই-এর দোকানটার ওপাশে চীনেবাদাম-ভাজা যেখানে কালচুন আর বাদাম ভাজা নিয়ে বসে থাকে, সেইখানে ভাঙা রাধাচূড়া গাছটার তলায়, ফুট-পাতের কোণটিতে বসে আছে সেই কানা পাগলিটা। আগেও ঠিক এই জায়গাটাতেই বসে থাকতো সে। আপন-মনে পিকপিক করে হাসতো আর মাথা চুলকাতো। তেল-জল না-পেয়ে মাথার চুলগুলো গাঙশালিকের বাসার মত জট পাকিয়ে উঠেছে। সাতপুরু চামড়ায় ময়লার রঙ ধরেছে। সারাগায়ে জন্তুলের মত চাকাচাকা ময়লার দাগে ভরে উঠেছে, দিনের পর দিন ধুলো আর ঘাম ব'সে। চোখ নাই, তবু বেঁচেছে ঘেন্নার হাত থেকে।

লজ্জা ওর সেদিনও ছিল না, আজও নাই। খালি

গায়ে বসে থাকে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম—সমানে ঠাই বসে থাকে এই খানটিতে। কোমরে শতছিন্ন একখানি নেকড়া জড়ানো। বয়সের মাথা খেলেও যৌবনের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এঁ্যা!

অতসী হঠাৎ চমকে ওঠে। ভ্রূযুগল কুঁচকে, চোখের দৃষ্টিটা ধারাল করে নিয়ে, দু'পা এগিয়ে যায় অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায়: খোকা!···

থমকে দাঁড়ায়। পাদুটো চলে না। আকস্মিক আবেগে থর থর করে কেঁপে ওঠে ওর সর্বশরীর। মনে হয়, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে পাথরের ধাপে।

খোকা?···ওর খোকাকে চুরি করে এনেছে কানা পাগলিটা?

রক্তপিণ্ডের গতি যেন রেলগাড়ীর এঞ্জিনের মত দ্রুত হয়ে ওঠে। মগজটা টনটন করে ক্ষিপ্ত রক্তপ্রবাহে।··· খোকা!···খোকা!

না—না—না। আচম্বিতে চোখে পড়লো ছেলেটার চেপ্টা নাক আর গুলগুলে চোখদুটো।

অতসী হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ওর রুদ্ধপ্রায় শ্বাসযন্ত্র যেন এতক্ষণে সক্রিয় হয়ে আসে।···খোকা নয়। খোকার চোখ-মুখ-নাক! সে কি যে-সে ছেলের আছে?···চুরি কেউ করে নি। সে মরেছে। মটর গাড়ীর ধাক্কায় শান-বাঁধানো পথে ছিটকে পড়েছিল। হয়তো ভেঙে গিয়েছিল পাঁজরার কচি হাড়-ক'খানা। তারপর, দিনের পর দিন এক ফোঁটাও দুধ পায় নি। শুকনো চামড়ার বোঁটাটা টেনে টেনে চোয়াল-দুটোয় খিল ধরে গিয়েছিল। নইলে, কে নেবে ভিকিরীর ছেলে চুরি করে! নিয়ে কি লাভই বা হবে তার!

অবসন্ন শরীরটা টেনে নিয়ে গিয়ে অতসী রাধাচূড়া গাছটার ঠেস দিয়ে একটু দাঁড়ায়।

তবে?

এই কানা পাগলিটাও ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আবর্জনার স্তূপের মত বসে থাকে তার যৌবনের বাসাই নিয়ে। গায়ের বোট্‌কা গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। সর্বাঙ্গে থিকথিক করে ঘামের ওপর জমাট-বাঁধা পলিমাটি। তাও পেয়েছে কোলে একটা ছেলে!··· হয় কোন ঝাঁকামুটে, না-হয় ফুটপাত-সড়ানো দুলো ভিকিরী কেউ করেছে এই অসীম দয়া।···হায় ওর অদৃষ্ট! ছেলেটা যে কি-কপাল নিয়ে জন্মেছে, তা বিধাতাপুরুষই জানে। কেন মরলো না পেটে!

অতসী চোখদুটো বন্ধ করে কাদামাটির পিণ্ডের মত শিথিল দেহে দাঁড়িয়ে থাকে গাছটার পিঠ দিয়ে। মাথার ভিতর কতকগুলো পোকা যেন শিলশিল করে। মস্তিষ্কে হয়তো রক্ত বইতে সুরু করেছে।

ছেলেটা চুকচুক করে মায়ের দুধ টানে। ওর কানে সেই অস্পষ্ট শব্দটা ভেসে আসে। উদগ্র শিরা-উপশিরায় অবসাদের স্রোত বয়ে যায়। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে অতসী প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

মহানগরীর শ্রান্ত দুপুর। খর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করে। পথে লোকচলাচল কমে এসেছে। এখন আর গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় নাই। পায়ের নীচে উত্তপ্ত ফুটপাত। গরম বাতাসে ঝলসানো পিচের গন্ধ।

অতসী চোখদুলে আকাশের দিকে চায়। কলকব্জার ধোঁয়ায় পূবের আকাশটা তামাটে হয়ে উঠেছে। ঘুরে কর্মব্যস্তগুলোর ওপর অসংখ্য চিল ডানামেলে পা ঢেলে দিয়েছে আকাশে। কোনটা বা বাঁকের কোল কাটিয়ে কাৎ হয়ে নামবার চেষ্টা করে ছোঁ মারবার চেষ্টায়। তারা মাংসের গন্ধে হয়তো টনক নড়েছে।

অনেকদিন পর অতসী আজ পথে বেরিয়েছে। তাই পথ চলতে পায়ে-পায়ে কেমন বাধা ঠেকে। এই ক'মাসে যেন অনেক বদলে গিয়েছে পথগুলো। কেমন নিরিবিলি নিঃসঙ্গ!

কি হলো হঠাৎ? একদিন এইসব পথে কাতারে-কাতারে ভিকিরী গড়িয়ে বেড়াতো। কানা-খোঁড়া, দুলো, অন্ধ-কুঠে! কোথায় গেল তারা? এ-পথে অতসী তো আজ নতুন আসছে না। দিনের পর দিন ওর অন্ধ বাপের হাত ধরে ঘুরেছে এই পথে। কিন্তু—এমন ফাঁকা পথ তো ছিল না কোনদিন!

ফাঁকা! সত্যি ফাঁকা। সবই যেন ফাঁকা মনে হয় আজ। ওর হাত ফাঁকা, কোল ফাঁকা, মন ফাঁকা। তবুও অতসী এগিয়ে চলে। ফাগুনের বড়ো বাতাসের মত গলির মোড়ে-মোড়ে ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে যায় নিরালম্ব উদাস মনে। পথের টানেই পা বাড়ায়। কেন যে আজ বেরিয়েছে পথে, সে-কথা ও নিজেও জানে না।

পথের দক্ষিণ পাশ ঘেঁসে দৈত্যের মত একখানা দোতলা বাস মাটি কাঁপিয়ে ছুটে গেল। ফুটপাতটা কাঁপে। পায়ের তলার শানটাও যেন ঝিন্‌ঝিন্ করে কেঁপে ওঠে।

আচম্বিতে মাথার কেমন একটা দোলা লাগে চঞ্চল রক্তস্রোতের।···গাড়ী তো নয়, মানুষ মারবার ফাঁতা কল।

মাথাটা ঘুরে ওঠে। হঠাৎ অতসী থমকে দাঁড়ায়। চোখদুটো রগড়ে ভালো করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে।

হাঁ।···ঠিক।···ঠিক সেই জায়গাটা।···ফুটপাতের কিনারায় পাথর খানার গায়ে যেন এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে! এই পাথরটার ওপরেই দীনু হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বাসচাপা সে পড়েনি। কিন্তু পাথরে চোট লেগে, কপালটা কি কম কেটেছিল! চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত পড়েছিল সারাটা রাত।

অতসী যখন নেকড়া পুড়িয়ে গরম গরম পলস্তারা লাগিয়ে দিয়েছিল, দীন শুধু একটুখানি হেসেছিল। ক্লান্ত চোখদুটো তুলে একবার তাকিয়েছিল অতসীর মুখপানে।

কতক্ষণই বা! সে কিন্তু সেই এক নিমিষের একটুখানি অতসীর বুকের তলা পর্যন্ত পৌঁচেছিল।···পথ ভিকিরী, পথের কাঙাল মেয়ে। হাতের কাছে যেন স্বর্গ নেমে এসেছিল।

হায় অদৃষ্ট!···বুকের ভিতর সেই চোখদুটো আজও জলজল করে। সেট চোখই তো পেয়েছিল খোকা।

কখন ওর স্তিমিত সংবিৎ আবার ফিরে এসেছে, কখন আবার সামনের পথে এগিয়ে অতখানি পথ ছাড়িয়ে গড় ময়দানের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে-খেয়ালও ছিল না অতসীর।

রাস্তা পার হতে গিয়ে আচমকা একখানা মটর গাড়ীর হর্ন শুনে ওর চমক ভাঙলো। সামনে, একবার নিতান্ত সামনে এসে পড়েছে ট্যাক্সিখানা। তাড়াতাড়ি আগে বাড়ানো পাটা পিছিয়ে নিয়ে, হকচকিয়ে থেমে গেল মাঝ রাস্তায়।

গাড়ীখানা তখন ব্রেক করেছে।

ড্রাইভারটা ধমক দিয়ে ওঠে: আঁখ নেই হ্যায়?

আঁখ! আঁখ!···না।···দেখিনি: অতসী কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। কথা সরে না মুখে।

না, ছিল না। সত্যি আঁখ ওর ছিল না এতক্ষণ। আপনমনে চলেছিল দম-দেওয়া কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে পা ফেলে। ড্রাইভারটার ধমক খেয়ে চোখ তুলে চায়: ম্লান, নিষ্প্রভ, বিহ্বল দৃষ্টি।

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো: কে!···নন্দা! ···হাঁ, হাঁ, নন্দাই তো বটে।

নিবারণবাবুকে ফেলে অমন করে পালিয়ে গেলে?

ভ্রূদুটো কুঁচকে চোখের নিমিষে আরোহিণী মুখখানা ফিরিয়ে নেয়। পাশের ভদ্রলোকটীর আঙুলগুলো হাতের মুঠোর চেপে ধরে বলে: চলো।···মাথা খারাপ।

সংযাত্রীর বিস্ময় কাটবার আগেই গাড়ীখানা টপ গিয়ারে বেরিয়ে গেল।

ক্ষণকাল স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে অতসী এগিয়ে যায় সামনের ফুটপাতের দিকে। মনটা ভারি হয়ে ওঠে। কেমন একটা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে ওর অন্তরের সব অনুভূতিগুলো।

আবার! আবার দমকা ঝড়ের ঝাপটা লাগে মগজে। শিরশির করে ওঠে সারা গা: বিড়ির দোকানের সেই ছোঁড়াটা তখনও ওর সঙ্গ ছাড়ে নি। কোমরে একখানা নীল রঙের নতুন লুঙ্গি জড়িয়ে, ফুটপাতের কোনে দাঁড়িয়ে সিস দেয়, আর ওর দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে!

অতসী তাকায় না। পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। ওর পাশ কাটিয়ে রাস্তার বাঁক ফেরে।

ছোঁড়াটা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। লোকজন মানামানি নাই। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে সুর টানে:

ঘাটে ডিঙা লাগায়ে বঁধু পান খেয়ে যেও—

অতসী কর্ণপাত করে না। তবুও কান ওর ঝিন্‌ঝিন্ করে ছোঁড়াটার কচ-কাটা গানের ইঙ্গিতে। (ক্রমশঃ)

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

আজকাল দেখা যাচ্ছে বাংলা ছবির প্রযোজক ও পরিচালকরা বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন —এটা অত্যন্ত আশার কথা। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের অপটুতা এবং সেজন্য বহির্দৃশ্য যথাসম্ভব বাদ দিয়ে শুধু গৃহাভ্যন্তরের চিত্রগ্রহণের উপর দিয়েই ছবি শেষ করার দিকে সাধারণতঃ পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানদের ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রের এই আধুনিক যুগে সব চিত্রকেই শুধু গৃহাভ্যন্তরের কথোপকথনের উপর নির্ভরশীল করে রাখা আর চলে না। বিশেষ বিশেষ চিত্রের সাফল্য শুধু বহির্দৃশ্যের ক্যামেরার কাজের উপরই নির্ভর করে এবং এর জন্য কুশলী ক্যামেরাম্যান্, যথোপযোগী সাজসরঞ্জাম ও উপযুক্ত পরিচালকের এবং বিশেষ করে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। আশা করি বাংলার চিত্রনির্মাতারা ও ক্যামেরার কাজে পারদর্শিতা দেখাতে ইচ্ছুক তরুণ ক্যামেরা-শিল্পীরা এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বাংলার চিত্র জগতের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবেন।

• • • •

'অবধূত' রচিত রোমাঞ্চিক ভ্রমণ-কাহিনী "মরুতীর্থ হিংলাজ"-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রযোজক-পরিচালক শ্রীবিকাশ রায়। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন। দীঘার বালুময় প্রান্তরে ও সমুদ্র সৈকতে এখন এর চিত্রগ্রহণ চলছে। আশা করি পরিচালক শ্রীরায় ছবিটির বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে চিত্রটিকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করবেন।

• • • •

'গ্রেস্ পিক্চার্স'-এর প্রথম চিত্র "শশীবাবুর সংসার"-এর চিত্রগ্রহণ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন। পরিচালক শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই বিহার প্রদেশের কয়েকটি স্থানের চিত্রগ্রহণের জন্য তাঁর দলবল নিয়ে যাত্রা করবেন।

• • • •

প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস "যৌতুক" সম্প্রতি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। "চন্দ্রনাথ"-এর বিশেষ সাফল্যের পর 'স্টীন্ ক্লাসিক্স্' তাঁদের এই দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্যের কাজ সুরু করেছেন। পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীজীবন গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীবিমল মিত্র এবং প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও সুমিত্রা দেবী। অন্যান্য ভূমিকাতেও বহু নামকরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছেন, আর চিত্রগ্রহণও দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে।

• • •

গত ডিসেম্বর মাসে তিন দিন ব্যাপী হাওড়া "নৃত্যম"-এর তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হাওড়া টি. আর. রঙ্গমঞ্চে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ রমেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ বসু। শ্রীগুরুদেবকুমার, শ্রীচন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের এবং দাশরথি গোবের সৃষ্ট, পরিচালনায় শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়; বিশেষ করে মণিপুরী এবং নাগা নৃত্যটি দর্শকদের মধ্যে খুবই সমাদর লাভ করে।

• • • •

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ২৩, রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুর ভবনে কুমার শচীনদেব বর্মণকে গ্রামোফোন কোম্পানি এক সভায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, ই, ডর্জ শ্রীযুত বর্মণকে একটি সুন্দর "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" টেব্‌ল রেডিওগ্রাম্ উপহার দেন। মিঃ ডর্জ শ্রীযুত বর্মণের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রীযুত পি-কে সেন কুমার শচীনদেব বর্মণের শিল্পী-জীবনের অসামান্য সাফল্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন—লোক সংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীতেই তিনি প্রথম জনপ্রিয় হন। পরে ফিল্মের সংগীত-পরিচালকরূপে সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এবৎসর সংগীত নাটক একাডেমী তাঁকে ১৯৫৭ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসাবে নির্বাচন ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করেছেন।

শিল্পী শচীন গুপ্ত শিল্পীদের পক্ষ থেকে শ্রীযুত বর্মণকে অভিনন্দন জানান।

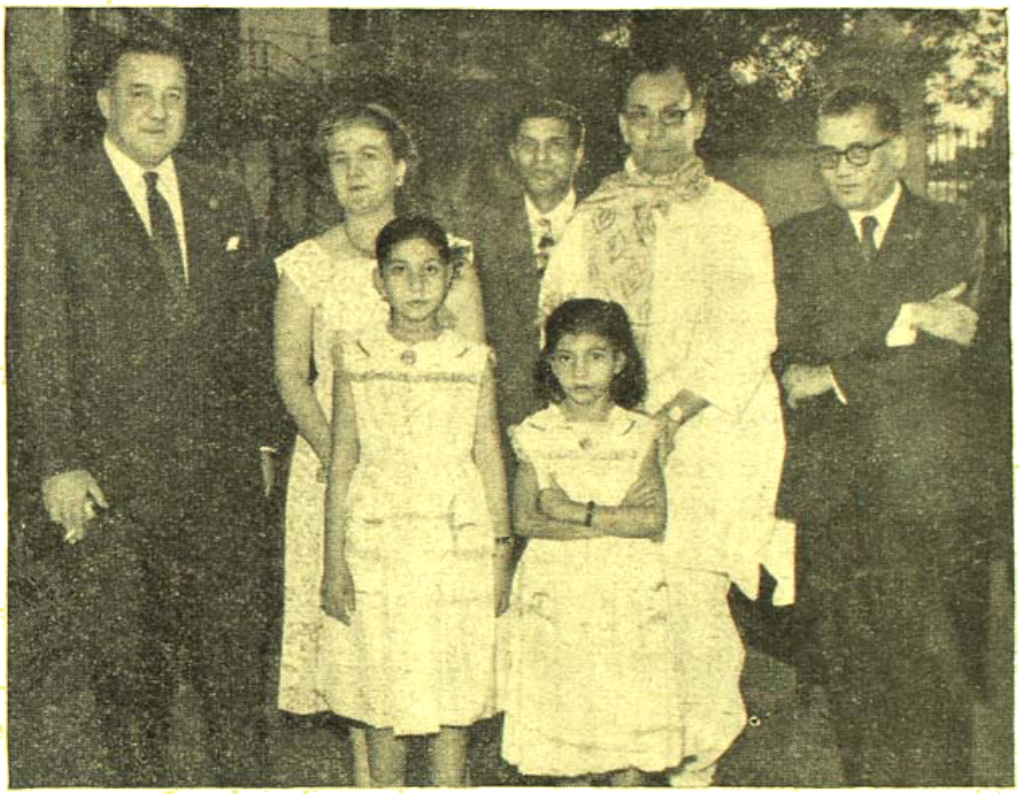

শ্রীশচীনদেব বর্মণের সম্বর্ধনা সভায় গ্রামোফোন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ডর্জ, মিসেস্ ডর্জ, সহকারী অধিকর্তা শ্রী কে, চাটার্জী, শ্রীশচীনদেব বর্মন এবং রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রী পি, কে, সেন প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

উত্তর দান কালে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শ্রীযুত বর্মণ বলেন—গ্রামোফন্ রেকর্ড বহু নতুন শিল্পীকে লোক-লোচনের সম্মুখে আনে। তাঁর গানও জনপ্রিয় হয়েছে গ্রামোফোন্ রেকর্ডের সহায়তায়।

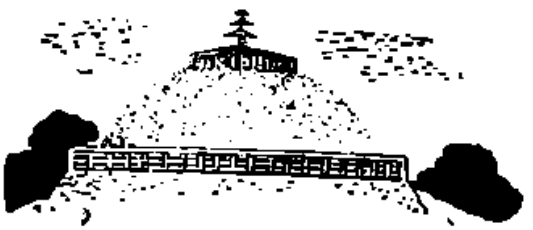

একটি খুনের কাহিনী

প্রফুল্ল রায়

সন্ধ্যা নামছে। এখন পশ্চিম আকাশের কোথাও সূর্যটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যতদূর দেখা যায়, সব আবছা, অস্পষ্ট।

ওপরে ক্লান্ত ডানায় আকাশ মাপতে মাপতে এক ঝাঁক চন্দনপিদি অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীচে মেঘনা সমানে দুলতে থাকে, দুলতে থাকে। তার একটানা গর্জনের বিরাম নেই।

ইলসা ডিঙিগুলি ফুলপলাশীর বন্দরের দিকে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। এখন চতুর্দিকে নিঃসীম, অথৈ মেঘনা। নাওলা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আজমের দু-মাল্লাই ডিঙিটা শুধু দোল খায়।

সামনের গলুইতে বসে রয়েছে মেঘনাদ। হাতের মুঠিতে ইলসা জালের দড়ি। মেঘনার পাঁচ বাঁও জলের নীচে জালের মুখ হাঁ হয়ে আছে। মেঘনাদের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান এখন হাতের দড়িতে। চল্লিশ হাত জলতল থেকে একটি মাত্র ইঙ্গিত; অভ্যস্ত হাতের মুঠিতে দড়িটা নড়ে উঠবে; বোঝা যাবে জালের প্রাণের ভেতর ইলিসের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাত্র টানে মেঘনার রুপালী ফসল নৌকায় উঠে আসবে।

পা দুটো পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে আজম। পেছনের গলুইতে বসে হালের বৈঠাটা কঠিন থাবায় চেপে ধরেছে। চারদিকে চনমন করে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল একবার। নিঃসন্দেহ হল। কোথাও একটা ডিঙির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুধু পাহাড়-প্রমাণ ঢেউগুলি তাদের ছোট নৌকাটাকে এলোপাথাড়ি ঝাঁকাচ্ছে।

ডিঙিটার মাঝখানে সামান্য একটু ছই। পিছনের গলুই থেকে মেঘনাদের চওড়া পেশল পিঠটা দেখা যাচ্ছে।

দুদিন ধরে ঠিক এই সময়টা দৃষ্টিটাকে পাটাতনের নীচে সরিয়ে আনে আজম। আজও আনলো। কোঁচের ধারাল ফলাগুলো ঝকমক করছে। একবার চোখ বুঁজল আজম। দাঁতে দাঁত চাপল। চোয়াল কঠিন হল। রক্তের কণায় কণায় শির শির করে কি যেন ছোটাছুটি শুরু করল। বুকটা দুরু দুরু কাঁপল। একটু ক্ষণ কাটল। তারপরেই ডান হাতটা কোঁচের ফলাগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল আজম। ভাবল, একটি মাত্র নির্ভুল আঘাত। সঙ্গে সঙ্গেই ডিঙিটা লাল্কা হয়ে যাবে। মেঘনার রাশি রাশি ঢেউয়ের ঘা খেয়ে খেয়ে মেঘনাদের দেহটা কোথায় কোন দিকে ভেসে যাবে, তার হদিসই মিলবে না। মেঘনার জলে সে রক্তাক্ত অপরাধের কোন চিহ্নই লেগে থাকবে না। ভাবল, কিন্তু হাত সরল না। শরীরটা অবশ, অসাড় হয়েই রইল।

একটু পর কোঁচের বাঁটুতে ডান হাতটা রেখে চোখ বুঁজে বড় পাইকার সোনা মিঞার কথাগুলি ভাববার চেষ্টা করল আজম। কানের ভেতর মুখটা গুঁজে বিশ্রী গলায় সোনা মিঞা বলেছিল—'হাঁ, হাঁ, একটা কোঁচের ঘা মারবি। তা হইলেই হইয়া যাইব। আমি নিজের চোখে দেখছি, মেঘনাদ তোর বউর লগে জবর মাখামাখি করে, রসরঙ্গের কথা কয়। তলে তলে কত কি হইছে, মালুম পাই।'

আসার সময় পঞ্চাশটা কাঁচা টাকাও দিয়েছিল সোনা মিঞা। কোমরের সৌখীন চৌখুপি গেঞ্জিতে সেই টাকাগুলি বাঁধা রয়েছে। নৌকার দোলানির সঙ্গে ঝম ঝম করে বাজছে।

মাছের পাইকার সোনামিঞা আরো বলেছিল, 'কাফেরের লগে কোন পিরীত! যে শয়তান ঘরের জরুর দিকে খারাপ নজর দেয়, তারে শেষ কইর‍্যা ফেলাই ভাল। পঞ্চাশটা টাকা, এই ডিঙি আর জাল তোরে আমি দিয়া দিমু। একমাস চরমেঘনায় লুকাইয়া থাকবি। তা না হইলে চৌকিদার পুলিশের ঝামেলা আছে। আজ সন্ধ্যায় কাজ কিন্তু খতম করবি।'

তার নতুন বিবির দিকে মেঘনাদের কুনজর—চোখের তারা দুটো উপড়ে ফেলবে না আজম! জগতে ভাল সৎ মানুষের বড় অভাব। নিরীহ বোকা বোকা চেহারার মেঘনাদকে দেখে কোন সন্দেহই জাগে না। এতকাল নিষ্পাট পয়গম্বর সেজে লোকটা তাকে নিদারুণ ঠকিয়েছে। প্রতিহিংসাও আজম সাঙ্ঘাতিক ভাবেই নেবে।

খোদা বড় মেহেরবান। তা নইলে কি সোনা মিঞার মত দোস্ত জুটত! সত্যিই তো ঘিক রাত্তিরে ইলসাডিঙি নিয়ে মেঘনায় পাড়ি জমাতে হয়। একা একা ঘরে থাকে কুলসম। সেই সুযোগে মেঘনাদ—। ভাবল, কিন্তু

কোঁচটাকে যে কিছুতেই বাগিয়ে ধরতে পারছে না আজম। হাতের থর থর ভাবটাই যে কাটে না।

কুলসমের সঙ্গে মেঘনাদ পিরীত জমিয়েছে। ভাবতে ভাবতে একঝলক রক্ত সরাসরি তালুতে এসে চড়ল আজমের। নাঃ, কাফেরের কিছুতেই বিশ্বাস নেই।

এর মধ্যে ইলসা জালটা শেষ বারের মত দশ বাঁও জলতল থেকে ডোরায় তুলে এনেছে মেঘনাদ। ঘুরে মুখোমুখি বসেছে। রূপালী ইলিশের দাপাদাপিতে ছোট ডিঙিটা দুলছে।

কি আশ্চর্য! ঠিক এই সময়টা যখন সব ডিঙি বন্দরে ফেরে, মেঘনা ফাঁকা হয়ে যায়—ঘুরে মুখোমুখি বসে মেঘনাদ। তার মতলব টের পায় নাকি!

ছইয়ের এপাশ থেকে খুশি খুশি গলায় মেঘনাদ বলল, 'আজ জবর মাছ পড়ছে আজম। এইবার চল্; গঞ্জে ফিরি। কাইল সকালে আবার আসা যাইব। বাদাম তোল।'

চমকে উঠল আজম। ডান হাতের পাবা থেকে কোঁচটা পড়ে গেল। সমস্ত দেহটা কেমন যেন থর থর করে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সে। চতুষ্কোণ মুখখানায় একটা কঠিন ভঙ্গি ফুটে রইল।

দুদিন ধরে সমানে কোঁচের ঘা মারবার চেষ্টা করছে আজম। পারছে না। বুকের কাঁপনই যে থামতে চায় না। হাতেই জোর পায় না। কঠিন-পেশী বিরাট শরীরটা এত থর থর করে কেন, কে জানে?

শেষ ক্ষেপের মাছগুলো নৌকার ডোরায় রেখে পাটাতন টেনে দিল মেঘনাদ। তারপর ইলসা জালটা গোছাতে গোছাতে বলল, 'কি রে আজম, কথা কইস না ক্যান? নয়া বিবির জন্যে মনটা বুঝি উথাল পাথাল হয়। তা তো হওনের কথাই। কোন আন্ধার রাইতে বাইর হইয়া আসিস মেঘনায়, ঘরে ফিরতে ফিরতে আর এক আন্ধার রাইত আইস্যা পড়ে।'

আজম জবাব দেয় না। আশ্চর্য! এই দুদিনে মেঘনায় সন্ধ্যা নামবার সঙ্গে সঙ্গে যখনই সে কোঁচের ঘা মারার চেষ্টা করেছে, ঠিক তখনই ঘুরে বসেছে মেঘনাদ। সে কি মনের কথা পড়তে পারে না কি?

আজ অজস্র মাছ পাওয়া গিয়েছে। মেঘনা অকৃপণ ভাবে তার জাল ভরে দিয়েছে। খুশিতে মনটা টইটম্বুর। সে বলল, 'একটা গীত গাই, শোন আজম।'

আজম এবারও কথা বলল না।

মেঘনাদ গান ধরল।

'মেঘনা গাঙের মাঝি আমি
মধুপক্ষি নাইয়া,
তোমার ঘাটে যামু বন্ধু
উজানী সোত বাইয়া।
তোমার জন্যে আনুম বন্ধু, আসমানের ঐ তারা,
রঙীন ফিতা আইন্যা দিমু, চুড়ি আয়নার পারা।
মেঘনা গাঙের মাঝি…'

এর মধ্যে আজম বাদাম টাঙিয়ে দিয়েছে। উজানী বাতাসের খেয়ালে ঢেউ কেটে কেটে ছোট ডিঙিটা ফুলপলাশীর বন্দরের দিকে ছুটেছে।

ইলসা হাটার অসংখ্য ডেলেডিঙি এসে ভিড়েছে। নৌকায় নৌকায় হারিকেন জ্বলছে। দূর থেকে আলোর বিন্দুগুলিকে বড় খুবসুরৎ দেখায়।

এইমাত্র আজমদের নৌকাটা এসে 'পারা' পুঁতল।

ওপরে নরম মাটিতে সারি সারি হোগলার চালা। এটা পাইকারদের এলাকা। সামনে মাছ টাল দিয়ে রাখা হয়েছে। হারিকেনের আলোতে ইলিশের সাদা আঁশগুলি, চোখের নীল মণিগুলি চকচক করে। আঁশটে উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

পাইকারের গোমস্তারা মাছ গুণে গুণে স্তূপাকার করে রাখছে।

'এই যে রমজান মাঝি, তোমার হইল সাত কুড়ি।'

'আই জলধর, তোমার তের কুড়ি পাঁচ।'

দরাদরি, হিসাব, টাকার লেনদেন—নানা জাতের শব্দ মিলে মাছ হাটাটা মৌচাকের মত ভন ভন করছে।

সোনা মিঞা বড় পাইকার। কানে সুগন্ধি আতর দেয়; চুলে কি রঙ যেন মাখে, চোখে সুর্মা টানে। জরিদার তাজ, রেশমী কুর্তা আর খুশি থেকে উগ্র খুসবু বেরোয়।

সোনা মিঞার মাছ চালান যায় বড় বড় শহরে বন্দরে। পরলের পর পরল বরফের মধ্যে শুয়ে মেঘনার ইলিশ চাটগাঁয় কলকাতায় গিয়ে ওঠে। জেলেদের কাছ থেকে নগদ দামে অজস্র মাছ কেনে সোনা মিঞা। অন্য সব পাইকারদের তুলনায় দর অনেক ভাল দেয় সে।

মাছ চালান দিয়ে না কি লাল হয়ে গিয়েছে সোনা মিঞা। সিন্দুকে নাকি টাকা ধরে না। এ সব ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহল নেই আজমের। মাঝে মাঝে সোনা মিঞা তাকে ডিঙি জাল টাকা ধার দেয়। সেটাই নগদ লাভ।

সোনা মিঞা আজমের ডিঙিটার সামনে এসে দাঁড়াল। হারিকেন হাতে দুটো গোমস্তা এল পিছন পিছন।

পাটাতনের তলা থেকে মাছের বড় বড় দুটো চাঙাড়ি বের করল মেঘনাদ।

মেঘনাদকে দেখতে দেখতে কুটিল সন্দেহে সোনা মিঞার মনটা আচ্ছন্ন হ'ল, রোমশ ভুরু দুটো কুঁকড়ে গেল।

ছোকরা গোমস্তা দুটো মাছ গুণতে শুরু করল।

মেঘনাদের মুখখানা টসটস করছে; চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ যে জ্বরটা এসে হঠাৎই আবার ছেড়ে যায়, সেটাই যেন আসছে। অল্প অল্প কাঁপুনি ধরছে।

মাছ গুণে গুণে টাকা দাবাচ্ছে সোনাগুা দুটো। আর হাঁ হাঁ করে উঠছে মেঘনাদ, এই 'এই এতিম, দুটো মাছ বেশি নিলি যে সোনাই ?'

সোনাগুটা ভ্রূক্ষেপই করল না। নির্বিকার গলায় বলল, 'গুণতে অমন দু একটা যায়ই।'

'মাছ মারতে তো তেল লাগে না! দুইখান মাছ মাগনা নিবা। আরে আমার রসের নাগর! দে, মাছ দুখান দে এইদিকে।' মেঘনাদ খিঁচিয়ে উঠে।

অল্প ক্ষণের মধ্যে শরীরের তাপ বাড়ল, হি-হি কাঁপুনি ধরল, হাঁটু দুটো ঠক ঠক ক'রতে শুরু করল। কাঁপা কাঁপা গলায় মেঘনাদ বলল, 'শরীরটা জবর কাতর করছে। জ্বরটা আবার বুকি আইলই রে আজম, আর খাড়াইয়া (দাঁড়িয়ে) থাকতে পারি না। আমি যাই।'

বন্দরের পশ্চিমে সমতল জমিটার দিকে চলে গেল মেঘনাদ। ওখান থেকে জেলা বোর্ডের সড়ক শুরু। পাকা মাইল খানেক পথ ভাঙলে তাদের সোনারঙ গ্রাম মিলবে।

মেঘনাদ সড়কের দিকে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আজমের কানে মুখ গুঁজল সোনা মিঞা। শাসানি, গর্জন এবং হিংস্রতে তার গলাটা অদ্ভুত শোনায়, কি কইছিলাম তোরে! পঞ্চাশটা টাকা আগাবও দিলাম। এই ডিঙি এই জাল সব দিছি তোরে। কাফেরের লগে অত পিরীত ক্যান? মোল্লারা এই খবর জানলে তোরে গেরাম ছাড়া করবে। একটা কোঁচের ঘা দিতে পারলি না? একটু ছেদ। তারপর মোলায়েম স্বরে সোনা মিঞা বলল 'দুই একটা মাস চরমেঘনায় লুকাইয়া থাকবি। আমি চৌকিদার পুলিশ সামাল দিমু। তোর ভালর জন্যেই বলি আজম। তোরে আমি কি চোখে যে দেখি, খোদা-তাল্লাই জানে।'

ভাঙা গলায় আজম বলল, 'কোঁচটা হাতে নিছিলাম মিঞা সায়েব, কিন্তুক পারলাম না।'

তীব্র গলায় চেপে চেপে সোনা মিঞা বলল, 'পারতেই হইব।'

এ অঞ্চলে সোনা মিঞার অবাধ প্রতাপ। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তাগদ অনেক। তার হুকুম অগ্রাহ্য করার সাধ্য সামান্য 'ইলদা' জেলের নেই।

আজম বলে, 'কিন্তুক মেঘুরে মারুম ক্যামনে? ও আর আমি এক মায়ের দুধ ভাগাভাগি কইরা খাইছি। সুখদুখ ভাগ কইরা ভোগ করছি। এক সাথে এতগুলি বছর কাটাইছি।'

সোনা মিঞা গর্জে উঠল, 'এক সাথে এতগুলি বছর কাটাইছিস! সুখদুখ, মায়ের দুধ ভাগাভাগি কইরা নিছিস। বেশ তো, জবর খুশের কথা। এইবার বউটারে ভাগ কইরা নে!'

'এই সব কি কথা কইতে আছেন মিঞা সায়েব! এগুলি গুণাহের কথা।' আজমের গলা বড় কাহিল শোনায়।

'গুণাহের কথা, একশ বার গুণাহের কথা। কিন্তুক খোদার নামে কসম খাইয়া বলি, একেবারে সাচা কথা। ইট্টুও মিছা না। আমি নিজের চোখে দেখছি, তোর বিবির লগে মেঘুর বড় মাখামাখি। মেঘু হইল কাফের, ইবলিশ। ওরে নিয়া ঘর করা, আর সাপ নিয়া ঘর করা এক কথা। ইলাম সোজা জিনিস না! খুব সাবধান আজম।'

উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফালাফি শুরু করেছে। একহাতে বুক চেপে আজম বলল, 'সত্য কয়েন, আপনি নিজের চোখে দেখছেন?'

'তবে কি আর মিছা বলি না কি? নিজের চোখে দেখেই কইছি। তোরে ভালবাসি, তাই সইতে পারি নাই। তা না হইলে আমার কি লাভ? হে—হে—'

বড় নির্লিপ্ত, বড় নিরাসক্ত দেখাল সোনা মিঞাকে। মুখটাকে আজমের কানের মধ্যে আরো একটু গুঁজে দিল সে। ফিস ফিস, ভয়ানক অথচ নরম গলায় বলল, 'আরো পঞ্চাশটা টাকা দিমু; তুই আজ রাত্রেই কাফেরটাকে নিকাশ করবি।'

শরীরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা কাঁটা-পায়ে শিরায় শিরায় হাঁটতে লাগল। আলো আলো বন্দরটা দেখতে পাচ্ছে না আজম। জমজমে মাছহাটার শোরগোল শুনতে পাচ্ছে না। সামনের মেঘনা, ফুলপলাশীর বন্দর, সোনা মিঞা—সব, সব কিছু যেন নিরাকার হয়ে যাচ্ছে।

সোনা মিঞা আবার বলল, 'আরো পঞ্চাশটা টাকা, ডিঙি জাল—বেবাক তোরে দিমু।' বুঝলি? কথাটা মনে আছে তো? আজ রাত্রেই—

আপনা থেকেই মাথাটা দুলল আজমের। এখন দেহমনের ওপর নিজের কোন ইচ্ছাই ক্রিয়া করছে না।

কখন যে সোনা মিঞা মাছের হিসাব মিটিয়ে দিয়েছিল, আর কখন যে একটা ঘোরের মধ্যে জেলা বোর্ডের সড়কটা ধরে সোজা মেঘনাদের দোচালা ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে খেয়াল নেই আজমের।

শ্বাস চেপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আজম। পাশের আবছা কচুবনে নীল নীল জোনাকি জ্বলে। ত্রিভঙ্গ কুরূপ চেহারার নিমগাছটায় পেঁচা ডেকে ওঠে।

আজম ডাকল, 'মেঘু, অই মেঘু—'

নিরালোক ঘুপচুপটি ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা দুর্বল গলার উত্তর ভেসে এল, 'কে, আজম? আয় ভাই। টাকা আনছিস তো হিসাব কইরা?'

চাপা বীভৎস গলায় আজম বলল, 'আনছি। হিসাব কইরাই আনছি।'

ক্যাচা বাঁশের ঝাঁপ খুলল মেঘনাদ। কুপী জ্বালল। বলল, 'আয় ভাই, ভিতরে আয়। জ্বর জ্বর আইছে।'

'সোহাগের কাম নাই।' আজম বলল, 'জ্বর আইছে; তা রাইতে মাছ মারতে যাবি না?'

'শরীলটা বড় কাহিল লাগে আজম। আজ যামু না। তুই ওসমানরে নিয়া যা।'

'তোর মতলব আমি বুঝি মেঘু। কিন্তুক যা ভাবছিস, তা হইব না। আমার লগে মেঘনায় যাবি। নিচ্চয় যাবি।' আজমের গলা কঠিন শোনায়।

'কি কইতে আছিস?'

'যা কইতে আছি, তুই তো বেবাকই বুঝিস। তোরে আমি ভাইয়ের লাখান (মত) ভালবাসছি মেঘু, আর তুই কিনা আমার লগে বিশ্বাসঘাতী কাম করলি!' একটু থেমে শ্বাস টেনে টেনে আজম বলতে থাকে, 'তুই আমার মায়ের দুধ খাইয়া বাঁচছিস; আর কি না—'

অদ্ভুত শব্দ করে হাসল মেঘনাদ। কথা বলল না।

আজম আবার বলল, 'রাতে ক্যান মেঘনায় যাইতে চাইস না? তোর বেবাক মতলব আমি বুঝি।'

ঠাণ্ডা গলায় মেঘনাদ বলল, 'বুঝিস?'

'নিচ্চয় বুঝি। আমি মেঘনায় গেলে তোর তো সুবিধা হয়।' আজম সমানে ফুঁসতে থাকে, 'তুই আমার লগে যাবি মেঘু। আমি খাইয়া অখনই আসতে আছি।'

'দুইজনে একলগে গেলে ল্যাঠা আছে। রাইতে এক জনের বাড়িতে থাকন দরকার। বড় শিয়াল আসে, বুঝলি? তোর বউ বড় ডরায়।' অদ্ভুত গলায় বলে মেঘনাদ, 'আমার শরীলটা জবর খারাপ। আর আর জাল বাইতে পারুম না।'

'তবে কবে পারবি?'

'এট্টু দেইখ্যা শুইন্যা নেই।'

'আইচ্ছা।'

দাঁতে দাঁতে ঘষে আজম। রাত্রে বাড়িতে থেকে কি মতলব হাঁসিল করতে চায় মেঘনাদ, তা বোঝার মত বুদ্ধিটুকু ধরে সে। মাস দুই আগে কফিলদ্দি মিঞার ছোট বোনটাকে সাদী করে এনেছে। মাজা শ্যামল রঙ, দীঘল দেহ; চিকণ কোমরের ওপর সুন্দর দেহ কুলসমের। তার রক্তে রক্তে, দিবারাত্রির খুয়াবে নেশা ধরায় কুলসম; মনটাকে গুলজার করে রাখে। আর সেই কুলসমের দিকেই কিনা থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে মেঘনাদ! উচিত প্রতিফলই সে পাবে।

পাশের চৌচালাখানা আজমের। মাঝখানে কটিকারীর ঝোপ। সেটা পেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরল আজম।

আর্দ্র নিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমারে ভাতছালুন দে কুলসম।'

বাঁশের মাচার কাঁথাকানির স্তূপ। তার মধ্য থেকে উঠে বসল কুলসম। বলল, 'আগে এট্টু ফিরাও মাঝি। এত রাত হইল ক্যান? আমি ভেবে ভেবে মরি।'

'থাউক, অমন আলগা পিরিতে কাম নাই।' আজম খেঁকিয়ে ওঠে, 'তোর মিঠা মিঠা কথায় বিষ আছে হারামজাদীর ছাও।'

কেরাসিনের কুপীটা আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বিতরণ করছে বেশী। আজমকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

কুলসম ভাবল, দুটো দিন ধরে কি যেন হয়েছে মাঝির। চড়া মেজাজটার মহিমা বোঝা ভার। আগে নদী থেকে ফিরে বিশাল চওড়া বুকে তার নধর নরম শরীরটা দলে পিষে সোহাগে সোহাগে মাতিয়ে তুলত। রসের কথায় মন মজাত। তার সর্বাঙ্গ ঘেঁসটে গন্ধ মাখিয়ে মেছো আজব অদ্ভুত পিরিত জমাত। আবার সেই গন্ধ ঘোচাবার জন্য ফুলপনাছুঁইর বন্দর থেকে গন্ধসাবান এনে দিত। দুটো দিন ধরে সেই মানুষটার যে কি হল, ভেবে দিশাহারা হয়ে যায় কুলসম।

আজম বিড় বিড় করে বকে, 'মাগী কুচরিত্তির।'

ভয়াতুর গলায় কুলসম বলে, 'এই সব কি কইতে আছ মাঝি!'

'চুপ মাগী। বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর করবি তো ঠ্যাং দু'খান ধইরা ফাইড়া ফেলুম। মনে করিস, দুটা দিয়া জল খাবি, আর আর আমি টের পামু না।' বলতে বলতে সামনে এগিয়ে এল আজম।

মাটির সানকিতে ভাত এবং ছালুন সাজিয়ে দিয়েছে কুলসম। হঠাৎ সানকিটা তুলে কুলসমের মুখে ছুঁড়ে মারল আজম। তার গলায় সাপের হিসানির মত শব্দ হ'ল, 'ইবলিশের বাচ্চা, বেজাত মাগী, আমারে দিয়া হয় না! শরীলের জ্বালা আরো মরণ না হইলে নিবে না! তোর রসের নাগররে আমি শেষ করুম।'

কোন জবাব দিল না কুলসম। দুহাতের পাতায় মুখখানা গুঁজে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

দিন দুই পর মেঘনাদকে নিয়ে এ'ল আজম। আসতে বলা-মাত্র রাজী হয়ে গেল মেঘনাদ। শরীরটা যেন তারই বড় বেশী। বলল, 'সব দেখাশুনা হইছে, এইবার আমার নদীতে যাইতে আপত্ত (আপত্তি) নাই।'

এখন ইলিশ মাছের মরশুম। কাছে দূরে, যত দূরে নজর যায় ছোট ছোট ইলশাড়িগুলি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খায়। গাঙচিলগুলি ছোঁ দিয়ে পড়ে।

সারা দিন অবিরাম জাল বেয়েছে মেঘনাদ। আর হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে নিষ্পলক কঠিন চোখে

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আজম। ভাববার চেষ্টা করেছে, মেঘনাদের মা মেঘনাদকে জন্ম দিয়েই মরেছিল। সূতিকাঘরের মরণ-হিম থেকে তুলে এনে নিজের বুকের উষ্ণ মমতায় তাকে আশ্রয় দিয়েছিল আজমের মা। সম্পর্কটা তাদের একই মায়ের জঠরের নয়, কিন্তু একই বুকের সুধার।

একটু একটু করে আজমের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে মেঘনাদ।

তারপর কত দিন যে চলে গেল, তার কি হিসাব আছে? সেই বড় কাইতালের (বড়) বার আজমের মা মরল। তা-ও পাঁচ বছর পেরিয়ে গিয়েছে।

আজকাল মাছের পাইকার সোনা মিঞার কাছ থেকে ডিঙি-জাল কর্জ নিয়ে ভাগে মাছের কারবার করে আজম। ইলসা জেলে ওসমান রায়েবালি কি জলধরকে 'ভাগিদার' নেয়। মেঘনাদ কামলা খাটে। দুরদেশ নয় মাঝে মাঝে আজমের সঙ্গে জাল বাইতে যায়।

আশ্চর্য! যে মেঘনাদ তার মায়ের বুক শুষে বাঁচল, একসঙ্গে পাশাপাশি বাড়ল, সে-ই কি না তার বুকে ছোরা হানে?

পিছনের গলুইতে চুপচাপ বসে থাকে আজম। একটুও শব্দ করে না। শুধু চোখদুটো ধক ধক জ্বলতে থাকে।

নিয়মের দুনিয়ায় ব্যতিক্রম ঘটে না। যথারীতি সন্ধ্যা নামে। জেলেডিঙিগুলি একে একে কুলপলাশীর বন্দরের দিকে অদৃশ্য হতে থাকে। বিপুলা নদী শূন্য হয়ে যায়। নিরালোক আবছা আঁধারে মেঘনাকে নিরানন্দ, শ্রীহীন মনে হয়।

চারদিকে তাকায় আজম। তার বুক কাঁপে। রক্তে রক্তে শির শির করে কি যেন ছোটাছুটি করে। পাটাতনের নীচে কোঁচের থাবাল ফলাগুলো আবছা অন্ধকারেও ঝকমক করতে থাকে। ডান হাতের হিংস্র থাবাটা সেদিকে বাড়িয়ে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে জাল তুলে আগের গলুইতে ঘুরে বসে মেঘনাদ।

আজম চমকে ওঠে। এই নিয়ে তিনদিন। আজ আসার সময় সোনা মিঞার সঙ্গে কথা হয়েছিল। মেঘনাদ চলে মেঘনাদের লাসটা ভাসিয়ে দে চরমেঘনার পাড়ি জমাবে। যে কটা দিন এখানে থাকবে না, সে কটা দিন কুলসমকে দেখাশুনা করার ভার নিয়েছে সোনা মিঞা স্বয়ং। রাত্রে তার কাছে শোবার জন্য ওসমানের নানীকে পাঠিয়ে দেবে। চৌকিদার পুলিসের কামেলা মিটিয়ে সোনা মিঞাই তাকে খবর দেবে। যে কাফের সাদী-করা জরুর দিকে কুনজর দেয়, তাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়াই নাকি ইসলামের বিধান। সোনা মিঞার এতে কি-ই বা লাভ? নেহাতই সে আজমের হিত চায়!

ইসলাম-কাফের-জরু—সহজ সরল আজমের মাথায় শব্দগুলি একাকার হয়ে সমানে গোল পাকায়।

আশ্চর্য! তিনটে দিন ঠিক এই সময়টা জাল গুটিয়ে মুখোমুখি বসে মেঘনাদ। তবে কি সব টের পায়? বুকের ধরধরানি থামে না আজমের।

হঠাৎ মেঘনাদ বলল, 'আমি আর এখানে থাকুম না আজম। ভাটির দেশে চইল্যা যামু।'

আজম জবাব দেয় না।

মেঘনাদ আবার বলে, 'কালই চইল্যা যামু আজম।'

ঘোর ঘোর গলায় ফস করে আজম বলে বসে, 'ক্যান যাবি?'

'মন যেখানে ভাঙে, যেখানে খালি সন্দ আর সন্দ, সেখানে থাকতে নাই আজম ভাই।' মেঘনাদের গলা কেমন যেন শোনায়। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। চোখে পলক পড়ে না।

অনেকটা সময় কাটে। অন্ধকার আরো ঘন হয়, উথল পাথল নদী অবিরাম দুলতে থাকে। আসমান-ছোঁয়া বিরাট বিরাট ঢেউগুলি ছোট ডিঙিটাকে নিজের খেয়ালে দোলায়।

মেঘনাদ আবার বলে, 'মনে গোসা রাখিস না আজম। আর কোনদিন তোর লগে আমার দেখা না হওয়াই ভাল; ভগমানের এই বোধ হয় মর্জি।'

স্নায়ুগুলো ঝিম ঝিম করে। তালুটা শুকিয়ে এক-রাশ কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। বিচিত্র এক ভয় এই রাত্রির মত চারপাশ থেকে আজমকে ঘিরে ধরে। তবে কি সব বুঝতে পেরেছে মেঘনাদ? আজম চেঁচিয়ে উঠতে যায়। কিন্তু স্বর ফোটে না। একটা মোটা রোধন খাবা যেন গলাটাকে চেপে ধরেছে। শরীরটা অবশ অবশ লাগে। হাতের মুঠি থেকে হালের বৈঠাটা আলগা হয়ে খসে পড়ে। নৌকাটা পাক খেয়ে উজানের দিকে ঘুরে যায়।

লাফিয়ে পিছনের গলুইতে এসে আজমকে ঠেলে পাটাতনে সরিয়ে দেয় মেঘনাদ। বৈঠার কারসাজিতে নৌকাটাকে আবার ভাটির দিকে ঘোরায়। বলে, 'এই কি রে আজম, পাকা মাঝি তুই। তোর হাত থিকা হালের বৈঠা কেমনে খসে?'

আজম বড় বড় শ্বাস টানে। কথা বলে না। একটু আগেও যে কাফেরের কোঁচের ফলাগুলো দেখতে দেখতে যে প্রতিজ্ঞাটা হিংস্র হয়ে উঠেছিল, এই মুহূর্তে মনের কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরাট দেহটা শুধু কাঁপে। নিজের ওপর নিজের কোন ইচ্ছাই ক্রিয়া করে না।

একসময় কুলপলাশীর বন্দর পাশে রেখে আঁকাবাঁকা সোনারঙের খালে ছোট নৌকাটা নিয়ে আসে মেঘনাদ।

নিশি পাওয়া আজম গলায় আজম বলে, 'নাও কোথায় নিয়া যাইস মেঘু?'

'গেরামে।'

'মাছ বেচবি না?'

'বেচুম। গেরাম থিকা মাছ-হাটায় ফিরা আসুম।'

'গেরামে থাবি ক্যান?'

'কাম আছে।'

খানিকটা পর কেয়াবনের পাশে নৌকা ভিড়িয়ে মেঘনাদ বলে, 'রাইতে বড় শিয়াল আসে; তোর ঘরের চারপাশে ঘোরে। তুই তো জানিস না। আমি তারে দেখছি। তুই আমি কেউ নাই বাড়িতে, এই কিন্তুক বড় শিয়াল আসার সময়।' একটু ছেদ, আবার, 'আমি এই নৌকায় বসতে আছি। তুই একবার তোর ঘর দেইখ্যা আয়। বড় শিয়াল আসলেও আসতে পারে।'

কি যেন ভাববার চেষ্টা করে আজম। তারপর নিঃশব্দে কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ায়।

মেঘনাদ বলে, 'যা যা, ঘরে গিয়া যা দেখবি, আমারে আইসা বলিস।'

পাকের ঘরের পাশে থনথনে মানকচুর ঝোপ। সেখানে এসে থমকে দাঁড়াল আজম। দুটি গলা পরিষ্কার শোনা যায়। কান দুটো শিউরে ওঠে আজমের।

ভয়ার্ত গলায় কুলসম বলে, 'না না, এই সব কি কুকথা ক'ন মিঞা সায়েব! মাঝি আসলে সব কইয়া দিমু।'

সোনা মিঞা খুক খুক করে হাসে। শয়তানী গলায় বলে, 'তোমার মাঝি আর কোনদিন আসব না। শুনলাম, চরমেঘনায় এক ডানাকাটা হরীর খোঁজ পাইয়া সে গেছে গিয়া। তারেই নাকি নিকা করব।'

'না না, এ হয় না।' কুলসম চিৎকার করে ওঠে।

'হয় না? তা হইলে বোধ হয় মেঘুরে খুন কইরাই চৌকিদারের ডরে পলাইছে।'

'না না—'

'তোমার সব কিছুতেই খালি না। হাঁ-টা কিসে?' একটু দম নিয়ে সোনা মিঞা আবার বলে, 'তোমারে যেদিন পয়লা দেখছি, সেইদিন থিকা দিনে রাইতে সমানে তোমার খুয়াব দেখছি। মিছা না, খোদার নামে কসম খাইয়া সাচা কথাই কই।'

'এমুন গুণাহর কথা কইতে নাই মিঞা সায়েব। আপনে আমার ধর্মের বাজান।' দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদে কুলসম।

'আমি কি তোমার বাজান হইতে চাই ডানাকাটা হরী, তোমার ছেলের বাজান হইতে চাই।'

'না না।' প্রবলভাবে মাথা নাড়ে কুলসম।

'আবার না না! মেয়েমানুষের দিলের কথা সব বুঝি। মুখে যখন না কও, মনে তখন হ কও। হে হে—সারা জনমে কম মেয়েমানুষ তো দেখলাম না?'

মেয়েমানুষের দিলের কথা বোঝার কৃতিত্বে ধূর্ত চোখে হাসল সোনা মিঞা। বলল, 'কাল সকালে বুছুলি পাঠাইয়া দিমু। মোহারানার কাগজ নিয়া আসব একেবারে। পরশু তোমারে নিকাহ্ করুম।'

'না না এ গুণাহ্, এ পাপ—'

সোনা মিঞা জবাব দিল না। বাইরে বেরিয়ে সামনের ঘন অন্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বাঁশের মাচানে মুখ গুঁজে আলুথালু হয়ে কাঁদতে লাগল কুলসম। 'তুমি কোথায় গেলা মাঝি?'

এতক্ষণ নিথর নিঝুম দাঁড়িয়েছিল আজম। দেহে যেন সাড় ছিল না, বোধ ছিল না। বিস্ময়, আতঙ্ক, রাগ—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে সে কাঁপছিল।

ধীর পায়ে ঘরে এ'ল আজম। শান্ত আবেগময় গলায় ডাকল, 'বউ—'

'কে, মাঝি!' বাঁশের মাচান থেকে উঠে আজমের চওড়া বিশাল বুকে পড়ল কুলসম। বলল, বড় ডর লাগে; আমারে অন্য কোনখানে নিয়া যাও। না হইলে গলায় রশি দিমু।'

অনেকগুলি নিঃশব্দ মুহূর্ত কাটল। একটু পর আজম বলল, 'হ বউ, তোরে নিতেই তো আসলাম। নে, কাঁথাকানি বাসনগুলি গোছগাছ কইরা নে। আজ অখনই আমরা মেঘুর লগে ভাটির দেশে পাড়ি জমামু। এই দোজখে (নরকে আর কোনদিন ফিরুম না।

মাটির সানকি, ডেগ আর কুলকাটা টিনের তোরঙ্গ, কাঁথাকানি—সমস্ত কিছু নিয়ে বাইরে এ'ল দু'জনে।

কেয়াবনটার কাছে এসে আজম ডাকল, 'মেঘু—'

ডিঙি থেকে মেঘনাদ বলল, 'কিরে আজম, ঘরে গিয়া কি দেখলি?'

'বড় শিয়াল দেখলাম।' ছুটে এসে মেঘনাদের দুটো হাত চেপে ধরল আজম। কাঁদ কাঁদ ভাঙা গলায় বলল, 'অবর গুণাহ্ করছি তোর কাছে। আমারে মাপ কর মেঘু।'

'আমার কাছে আবার কি গুণাহ্ করলি?'

'সে কথা জিগাইস (জিজ্ঞাসা করিস) না। খালি বল—তুই আমারে মাপ করলি।'

'হাত ছাড়!' সস্নেহ গলায় মেঘনাদ বলল, 'তোর দোষই আমি ধরি নাই। তা মাকের কথা আসে কিসে?'

আজম হাত ছাড়ল না। তার হাতের মধ্য দিয়ে মেঘনাদের হাতে কান্না এবং বেদনাহত্তর একটি হৃদয়ের অনুতাপ পৌঁছে গেল।

অনেকটা সময় কাটল।

গাঢ় গলায় আজম বলল, 'বউরে নিয়া আসছি মেঘু ভাই।'

'ভাল করছিস।'

'তোর লগে ভাটির দেশেই চইলা যামু।'

এক সময় সোনারঙের আঁকা-বাঁকা খাল ধরে ছোট নৌকাটা কুলপলাশির বন্দরে এসে পড়ল। সামনেই মেঘনা।

আজম বলল, 'নৌকা ভিড়া মেঘু।'

'ক্যান?'

'সোনামিঞার লগে শেষ মুলাকাতটা কইরা আসি। এই জনমে তো এমুন লোকের দেখা আর পামু না।'

নৌকা ভিড়ল। পারের মাটিতে নামল আজম।

কুলপলাশির বন্দরের পাশেই সোনামিঞার টিনের দোতলা।

আজম ডাকল, 'মিঞা সাহেব—'

বাইরের ঘরেই বসে ছিল সোনা মিঞা। চালানী মালের হিসাব করছিল। বলল, 'কে?'

'আমি আজম।'

লাফিয়ে উঠে পড়ল সোনা মিঞা। চতুর্দিকে চনমন চোখে তাকিয়ে কিস ফিস ব্যস্ত গলায় বলল, 'আয়, ঘরে আয়—'

ধীর শান্ত পায়ে ঘরে ঢুকল আজম।

অনেকক্ষণ আজমের দিকে তাকিয়ে রইল সোনা মিঞা। যেন ভূত দেখল। এমন ঘরপড়ন্ত সোনা মিঞা, যার দাপটে সমস্ত এলাকাটা তটস্থ, তার গলাও কাঁপল, 'কি রে, শয়তানটারে নিকা করছিস?'

আজম হাসল। বলল, 'মিঞাসাহেব, এই কয় দিন আমার দিলের মধ্যে একটা শয়তান ঢুকছিল, তারে নিকাশ করছি।' একটু থেমে, আবার, 'এখনই মেঘু বউ আর আমি ভাটির দেশে যামু গিয়া। নৌকা ভিড়াইয়া আপনের লগে শেষ মুলাকাত করতে আসলাম।'

সোনা মিঞা জবাব দিল না।

গেঞ্জি থেকে একশ'টা টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল আজম। আবার বলল, 'আপনের টাকা ফিরত দিলাম। পাপের দাম কাছে রাইখা দুনিয়ার কোনখানে গিয়া শান্তি পামু না।'

একটু থামল আজম। অদ্ভুত গলায় বলল, 'খোদার মর্জিতে দিলের শয়তানটারেই খুন করলাম মিঞাসাহেব; মেঘুরে খুন করতে পারলাম কই?'

আজম বেরিয়ে গেল।

আগামী সংখ্যায়

বিমল মিত্রের বড় গল্প

বাদামতলার গল্প

স্মৃতি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

বহে মৃদু গন্ধবহ, ভেসে আসে হারানো সে বাণী,
কুসুমের গন্ধ সাথে প্রিয়ার অলক গন্ধখানি।
ফাল্গুনে অলস দিনে বন্ধনাহ প্রিয়মুখগুলি,
রৌদ্র-দীপ্ত সমুজ্জ্বল স্মৃতিপটে তুলিছে আকুলি।

পাশে রহে, নিত্য দ্বন্দ্ব সংসারের শত প্রয়োজনে,
তিক্ত হয়ে উঠে চিত্ত, ক্ষুব্ধ হয় প্রিয়া অকারণে।
দূরে রহি স্মৃতিপটে, সজল নয়ন ম্লান মুখ,
অনন্ত মাধুর্য ভরে দুরু দুরু করে স্মরি বুক।

নিকটে সুদূরে রহে, সুদূরে নিকটে টানে নিতি
নিত্য দ্বন্দ্ব-কলহের বৃন্তে ফোটা প্রীতিময়ী স্মৃতি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হুগাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৫৭৯ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হাণ্ট ১৪২, উইকস ১২৭, স্মিথ ৭৮। মামুদ হোসেন ১৫৩ রানে ৪, ফজল ১৪৫ রানে ৩ উইকেট) ও ২৮ (কোন উইকেট না পড়ে)

পাকিস্তান ঃ ১০৬ (সিলক্রায়েষ্ট ৩২ রানে ৪, স্মিথ ২৩ রানে ৩ উইকেট) ও ৬৫৭ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হানিফ মহম্মদ ৩৩৭, ইমতাজ আমেদ ৯১, সৈয়দ আমেদ ৬৫)

ত্রিনি টাউনে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিন ২ উইকেট পড়ে ২৬৬ রান ওঠে। হাণ্ট সেঞ্চুরী (১৪২) করেন।

২য় দিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৯ উইকেটে ৫৭৯ রান তুলে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। উইস ১২৭ রান করেন। কোন উইকেট না পড়ে পাকিস্তানের ৬ রান ওঠে।

৩য় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস মাত্র ১০৬ রানে শেষ হয়। প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪৮ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। ৪৭৩ রান পেছনে পড়ে পাকিস্তান ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। দিনের শেষে এক উইকেট পড়ে পাকিস্তানের ২ ইনিংসে ১৬২ রান ওঠে—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ৩১১ রান কম।

৪র্থ দিনে দেখা গেল পাকিস্তানের রান দাঁড়িয়েছে ৩৩৯, ২টো উইকেট পড়ে। হানিফ মহম্মদ নট আউট ১৬১ রান ক'রে দলকে লড়াইয়ের জন্যে জিইয়ে রাখলেন। পাকিস্তান অত্যন্ত মন্থর গতিতে রান করে। ৪র্থ দিনের ৫ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ১১৭ রান ওঠে।

৫ম দিনে রান দাঁড়াল ৫২৫, ৩ উইকেটে। হানিফ মহম্মদ ২৭০ রান ক'রে নট আউট রইলেন। পঞ্চম দিনের খেলার পর দেখা গেল পাকিস্তান ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের ৫৭৯ রানের থেকে ৫২ রান এগিয়ে গেছে। পাকিস্তানের হাতে তখনও ৭টা উইকেট, খেলা শেষ হতে একদিন বাকি। পাকিস্তানের সৈয়দ আমেদ সুদীর্ঘ ২৬৩ মিনিট কাল খেলে ৬৫ রান ক'রে মন্থর গতিতে রান করার বিশ্ব রেকর্ড করেন।

টেষ্ট খেলার ৬ষ্ঠ দিনে পাকিস্তান ৮ উইকেটে ৬৫৭ ক'রে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ২৮ রান করে। খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

পতনের মুখ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা এবং শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি ড্র করার কৃতিত্ব হানিফ মহম্মদের। হানিফ মহম্মদ ৩৩৭ রান করেন। লেন হাটনের বিশ্ব রেকর্ডের থেকে তিনি মাত্র ২৮ রান কম করেন। লেন হাটনের ৩৬৪ রান করতে সময় লেগেছিল ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট। হানিফ ৩৩৭ তুলতে সময় নিয়েছিলেন ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। ফলে হানিফ উইকেটে সর্ব্বাধিক সময় থাকার বিশ্বরেকর্ড করেন।

১৯৩৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ডের লেন হাটন

৩৬৪ রান ক'রে টেষ্টের এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক রান করার বিশ্ব রেকর্ড করেন। সেন হাটনের ৩৬৪ রানের পরই হানিফের ৩৩১ রান ২য় স্থান পেল। ৩য় স্থানে আছে ইংলণ্ডের ওয়ান্টার হ্যামণ্ডের ৩১৬ (১৯৩৩ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্য্যন্ত এই পাঁচ জন টেষ্ট খেলোয়াড় তিন শতাধিক রান করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

৩৬৪ রান—লেন হাটন (ইংলণ্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালে (১৯৩৮ সাল)—সময় ১৩ ঘণ্টা ২৭ মিনিট। (রান সংখ্যার দিক থেকে বিশ্ব রেকর্ড)

৩৩১ রান—হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ব্রিজ টাউনে (১৯৫৮)—সময় ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট (সময়ের দিক থেকে বিশ্ব রেকর্ড)

৩১৬ রান—ওয়ান্টার হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড), নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে অকল্যাণ্ডে (১৯৩২—৩৩)

৩০৩ রান—ডন্ ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), ইংলণ্ডের বিপক্ষে, লিডসে (১৯৩০ সাল)

৩২৪ রান—এ, স্যাণ্ডহাম (ইংলণ্ড), ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, কিংষ্টোনে (১৯২৯—৩০)

৩০৪ রান—ডন্ ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), ইংলণ্ডের বিপক্ষে, লিডসে (১৯৩৪ সাল)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১ম টেষ্টের ১ম ইনিংসের খেলায় পাকিস্তানের ৪টি ঘুটিতে শতাধিক রান ওঠে। এবং এই ৪টি ঘুটিতেই হানিফের সংযোগিতা ছিল। পতনের মুখে পাকিস্তান যে ধৈর্য্যের প্রমাণ দিয়েছে তা টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বহুকাল লোকের স্মরণ থাকবে।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

অষ্ট্রেলিয়া : ১৬৩ (ক্রেগ ৫২ এবং ৪৩ রানে ৬ উইকেট) ও ২৯৭ (৭ উইকেটে বার্ক ৮৩, হার্ভে ৬৮, ম্যাক্‌কে ৫২)।

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩৮৪ (ম্যাকম্‌ ১০৭, ওয়েট ১০৪। বেনড ১১৪ রানে ৫ উইকেটে)

ডার্বানে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে। ১ম দিন ৬ উইকেট পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার ১৫৫ রান ওঠে। ২য় দিনে ১৬৩ রানে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ২ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে। ৩য় দিন দক্ষিণ আফ্রিকার রান দাঁড়ায় ৩১৮, ৫টা উইকেট পড়ে। ৪র্থ দিনে ৩৮৪ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার ১ম ইনিংস শেষ হয়। ঐ দিন অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের খেলায় ১ উইকেট পড়ে ১১৭ রান ওঠে। ৫দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ২৯৭ রান ওঠে ৭ উইকেটে।

চতুর্থ টেষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া : ৪০১ (বেনড ১০০, বার্ক ৮১, ম্যাককে নট আউট ৮৩, ডেভিডসন ৬২। হিনি ২৬ রানে ৬ উইকেট) ও ১ (কোন উইকেট না পড়ে)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২০৩ (ফানস্টোন ৭০) ও ১৯৮ (ম্যাকম্‌ ৭০, ফানস্টোন ৬৪। বেনড ৮৪ রানে ৫ উই)

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৪র্থ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করে।

পঞ্চমীয় টেষ্ট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৩২৫ (কানহাই ৯৬, উইকস ৭৮, সোবার্স ৫২) ও ৩৯২ (সোবার্স ৮০, আলেকজাণ্ডার ৫৭, স্মিথ ৫১)

পাকিস্তান : ২৮২ (ম্যাথিয়াস ৭২, ফজল মাহমুদ ৬০) ও ২৩৫ (হানিফ মহম্মদ ৮১, সৈয়দ আমেদ ৬৪)

পোর্ট অফ্ স্পেনে অনুষ্ঠিত ২য় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১২০ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

অষ্টাদশ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান :

কটকের বারো বাটি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মোট ১৪টি প্রদেশ যোগদান করে।

নতুন রেকর্ডের প্রতিযোগিতা

পুরুষ বিভাগ

ডিসকাস থ্রো : প্রদ্যুম্ন সিং (সার্ভিসেস)—দূরত্ব ১৫৩ ফিট ৬½ (এশিয়ান এবং ভারতীয় রেকর্ড)

পোলভল্ট : এ রামচন্দ্রন (মাদ্রাজ)—উচ্চতা ১২ ফিট ৫ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

৫০০০ মিটার দৌড় : নায়েক অর্জুন সিং (সার্ভিসেস) —সময় ১৪মিঃ ৫৭.২ সেঃ (এশিয়া ও ভারতীয় রেকর্ড)

হ্যামার থ্রো : হাভিলদার দেবী দয়াল (সার্ভিসেস) দূরত্ব—১৬৬ ফিট ৯ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

২০,০০০ মিটার ভ্রমণ : নায়েক জোরা সিং (সার্ভিসেস)—সময় ১ ঘণ্টা ৩৮মিঃ ৪২.২ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

২০০ মিটার দৌড় : নায়েক মিলখা সিং (সার্ভিসেস) —সময় ২১.২ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

৪০০ মিটার দৌড় : হাভিলদার মিলখা সিং (সার্ভিসেস) সময় ৪৬.৬ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

৪০০ মিটার হার্ডলস : জগদেব সিং (পাঞ্জাব) সময় ৫২.৫ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড ও এশিয়ান রেকর্ড)

১১০ হার্ডলস : শ্রীচাঁদ (সার্ভিসেস) সময় ১৪.৫ সেঃ (এশিয়া ও ভারতীয় রেকর্ড)

ম্যারাথন রেস : গুরুজারা সিং (পশ্চিম বাংলা) সময় ২ ঘণ্টা ২৩ মিঃ ৫৮.৪ সেঃ (ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ড)

৩০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ : পানসিংহ (সার্ভিসেস) সময় ৯ মিঃ ১২.৪ সেঃ (ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ড)

৪×১০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস দল—সময় ৪২.৬ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

৪×৪০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস দল, সময় ৩মিঃ ১৫.১ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

জাভেলিন থ্রো : বক্সি সিং (পাঞ্জাব) ১৯৯ ফিট ৪ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

মহিলা বিভাগ

৮০ মিটার হার্ডলস : মেরী লীলারাও (বোম্বাই) ১১.৫ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

ডিসকাস থ্রো : মিস সি ও' কোনেল (মাদ্রাজ) দূরত্ব ১১৪ ফিট (ভারতীয় রেকর্ড)

৪×৪০০ মিটার রীলে : বোম্বাই দল ; সময় ৪৯.৫ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

জাভেলিন থ্রো : মিস ডেভেনপোর্ট (রাজস্থান) দূরত্ব ১২৯ ফিট ৭½ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা ঃ

পুরুষ বিভাগ : ফাইনালে বাংলা ৩৮—১১ পয়েন্টে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : বোম্বাই ৪৯—৭ পয়েন্টে কোলাপুরকে পরাজিত করে।

সংক্ষিপ্ত খবর

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী পুণা বিশ্ববিদ্যালয় ২—০ গোলে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

* * *

জাতীয় বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে চন্দ্র হিরজী (বাংলা) গতবারের বিজয়ী উইলসন জোন্সকে (বোম্বাই) পরাজিত ক'রে ৪র্থবার খেতাব লাভ করেছেন। জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাইয়ের উইলসন জোন্স বাংলার চন্দ্র হিরজীকে ৬—৫ ফ্রেমে পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ফাইনালে গতবছরের যুগ্ম বিজয়ী বোম্বাই দল ১১ পয়েন্ট পেয়ে এবছরও চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফি -১৯৫৭

কালিফোর্ণিয়ার 'হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফি বোর্ড' নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ১৯৫৭ সালের খ্যাতনামা অপেশাদার স্পোর্টসম্যান হিসাবে হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফি দান করেছে। (১) সাঁতারের জন্য টাকাসি ইশিমোতো (জাপান), (২) রোয়িংয়ের জন্য স্টুয়ার্ট মাকেঞ্জি (অষ্ট্রেলিয়া) ; ট্র্যাক এণ্ড ফিল্ডের জন্য রণ ডিলনে (আয়ারল্যাণ্ড) এবং রবার্ট গুটোস্কি (আমেরিকা) এবং টেনিসের জন্য লুই আয়ালা (চিলি)।

সাহিত্য সংবাদ

গান্ধী ও মার্কস : [কপোতলাল মলকওয়ালা রচিত ও শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

গান্ধীবাদের সুপণ্ডিত ভাষ্যকার হলেন স্বর্গত কিশোরলাল মশরুওয়ালা, আর মার্কসবাদেরও যে তিনি একজন সাম্প্রতিযুক্ত পণ্ডিত ছিলেন এ গ্রন্থই তার পরিচায়ক। গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদ সম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই, আর পশ্চিমাগত মতবাদের প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করেন বেশির ভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ; কিন্তু এই গ্রন্থে গান্ধীবাদ গ্রন্থকার কর্তৃক যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাতে অনেকেরই অনেক ভুল ধারণা দূরীভূত হবে বলেই আশা করি। তাছাড়া শৈলেনবাবুর অনুবাদও হয়েছে সুসংকার। এরূপ গ্রন্থের ভারতের অন্ত সকল ভাষাতেও অনূদিত হয়ে সারা দেশের প্রচারিত হলে জনগণের মনকে গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট করা হবে এবং তাতে দেশেরও মঙ্গল হবে।

[প্রকাশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। কলিকাতা—১২ মূল্য ৩৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি : শ্রীসুবোধ রায়মার

শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পর প্রায় সাড়ে তিন শো বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু আজও তাঁর খ্যাতি এতটুকু ম্লান হয়নি। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজও তিনি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর নাটকগুলির আবেদন দেশ ও কাল নিরপেক্ষ। সর্বদেশের সর্বকালের পাঠকই তাঁর রচনা পড়ে পরম তৃপ্তি লাভ করবে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শেক্সপীয়রের ছ'খানি প্রসিদ্ধ বিয়োগান্ত নাটকের আখ্যান বস্তু বিশ্লেষণ মনের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। লেখকের বর্ণনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক এবং তাঁর ভাষাও সহজ ও সাবলীল। নাটকগুলির কাহিনী অনুসরণে এদেশের ছেলে মেয়েদের মনে কোন অসুবিধা না ঘটে সেদিকে লেখকের সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়। জুলিয়াস সীজারের কাহিনী বর্ণন প্রসঙ্গে তৎকালীন রোমক সমাজের রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের তিনি যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তা ঘটনাবলীর অনুধাবনে কিশোর পাঠকের সহায়তা করবে। এ গ্রন্থ পাঠের পর শেক্সপীয়রের রচনার প্রতি এদেশের কিশোরদের যে আগ্রহ জাগবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থের পুরোভাগে সংযোজিত শেক্সপীয়রের জীবনের পরিচিতি সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর। গ্রন্থের মধ্যে দু'এক স্থানে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তবে তা মার্জনীয়। কিন্তু একটি ত্রুটির উল্লেখ না করে পারছি না। শেক্সপীয়রের নামের বানানে 'প'র পরিবর্তে 'ফ' কেন ব্যবহার করা হল তা দুর্বোধ্য। এ ছাড়া শেক্সপীয়রের নাটকের পাত্র-পাত্রীর নামের অনুলেখনে ত্রুটি দেখা যায়। জুলিয়াস সীজার নাটকে 'ক্যাসিয়াস'এর স্থলে 'ক্যাসাস' অসঙ্গত।

[প্রকাশক : আর. এন. চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৷৷০]

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

ভ্রষ্ট কুসুম : শ্রীদীনেন্দ্রনাথ সাহা

গল্পগুলি ভালই লাগল। আমাদের আটপৌরে জীবনের অতি-পরিচিত ঘটনাগুলি অনেকটা গল্পে বেশ রসিয়ে উঠেছে। ছেলে-ভোলা জীবনের ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়গুলির প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে পাঠকচিত্তে বেশ একটি বৈরাগ্যমিশ্রিত ভোগানন্দের সৃষ্টি করে।

[প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ : মূল্য ২৲ টাকা]

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য প্রণীত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "বিপ্রদাস"—১৷৷০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পথের দাবী" (১৮শ সং)—৩৲

বিনিতাভ বসু রায় প্রণীত নাটক "দেবদাসেরী" (২২শ সং)—২৷৷০

পূর্ণদাস দেবী প্রণীত উপন্যাস "জলসাঘরে এলো জীবনে"—২৲

শ্রীমধুসূদন বসুমল্লার প্রণীত "প্রাণায়ন"—১৷২৫

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "কালিদাসের কুমার-সম্ভব"—৷৷৮২

শ্রীসুষমা সেন প্রণীত ছড়াগোপকথায় "এ যুগের ছড়োপদেশ"—১৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মনের মতো বউ"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : সুজা সেন

বিষ্ণুপ্রিয়া

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

চৈত্র—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বেদ ও উপনিষদ্

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

প্রাচীন যুগে পৃথিবীর নানাস্থানে বিভিন্ন সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৈদিক সভ্যতা ভিন্ন অপর সকল সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, এশিরিয়া, গ্রীস, রোমের ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি এখন বিদ্যমান নাই। তাহারা যে সকল দেবদেবীর পূজা করিত এখন সে সকল দেবদেবী পূজিত হন না। অধিকাংশ ভাষাই লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। কেবল গ্রীক ও রোমান ভাষার চর্চ্চা কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও হয়। গ্রীস ও রোমের কতকগুলি কাব্য অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা পঠিত হয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য। অপরপক্ষে বৈদিক সভ্যতা এখনও জীবন্ত। বেদ এখনও অনেকের কণ্ঠস্থ, প্রত্যহ বহু সহস্র ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করেন। মন্দিরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করা হয়। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে গৃহে গৃহে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়। হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোক বেদকেই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া থাকে। বেদের আলোচনা পৃথিবীতে ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, ভারতের বাহিরেও বহু বিদ্বান বেদের চর্চ্চাতেই তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলা যায়। ইহা সত্য ভারতে

বর্ত্তমানকালে প্রচলিত ধর্ম্মে পুরাণের প্রভাব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু সকল পুরাণেই বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাও বহু ধর্ম্মগ্রন্থে বলা হইয়াছে এবং সকল আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে বেদের ব্যাখ্যা করিবার জন্যই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অনেকস্থলে মনে হইতে পারে যে পুরাণের সহিত বেদের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু বাস্তবতঃ এরূপ বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলেও পুরাণ ও বেদের মধ্যে একটা অন্তর্নিগূঢ় ঐক্য বিদ্যমান আছে। অন্ততঃপক্ষে আচার্য্যগণের ইহাই মত। বীজের সহিত বৃক্ষের ফল-ফুলের সাদৃশ্য বাহিরে দেখিতে না পাওয়া গেলেও জ্ঞানী-ব্যক্তিগণ জানেন যে বীজ ও বৃক্ষ একই বস্তু। সেইরূপ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত বেদের সাদৃশ্য বাহ্য-দৃষ্টিতে প্রতীত না হইলেও উহাদের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্য বিদ্যমান, ইহা হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন ও আধুনিক সকল আচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল কারণে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বৈদিক সভ্যতা এখনও জীবন্ত। বৈদিক সভ্যতার যে আশ্চর্য্য জীবনীশক্তি আছে তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন।

বৈদিক সভ্যতা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদের শ্রেষ্ঠ অংশের নাম উপনিষদ্। ইহা বেদের শেষে সন্নিবিষ্ট বলিয়া ইহার আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্য অংশ বিভিন্ন দেবতার স্তবস্তুতি এবং যজ্ঞের কথায় পরিপূর্ণ। বেদের এই সকল অংশে পরমেশ্বরের কথাও আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানে। উপনিষদ পরমেশ্বর বা পরব্রহ্মের কথায় পরিপূর্ণ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাঁহাকে কি ভাবে পাওয়া যায়, জীবের স্বরূপ কি, ব্রহ্মকে লাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়, কিরূপে জগৎ সৃষ্টি হইল, এই সকল কথা উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে এবং সে আলোচনা এত সুন্দরভাবে করা হইয়াছে যে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ উচ্ছ্বসিত-ভাবে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক শোপনহোয়ার উপনিষদকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। এই গ্রন্থ সর্ব্বদা তাঁহার টেবিলের উপর থাকিত, রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রত্যহ ইহাকে প্রণাম করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"উপনিষদ পাঠ করিয়া যে উপকার লাভ করা যায়, ইহা যে প্রকার মানসিক উন্নতি বিধান করে, সমগ্র জগতে আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেরূপ উপকার বা উন্নতি পাওয়া যায় না, ইহা আমার জীবনে শান্তি প্রদান করিবে।" (১) শোপনহোয়ার মূল উপনিষদ পড়েন নাই। সাজাহানের পুত্র দারা শাকো যে পার্শি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার ফরাসী অনুবাদ পড়িয়াছিলেন। মোক্ষমূলর শোপনহোয়ারের এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "শোপনহোয়ারের এই উক্তির যদি কোনও সমর্থন করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে স্বেচ্ছায় ইহা সমর্থন করিব।(২)

পুনশ্চ শোপানহোয়ার উপনিষদে উল্লিখিত তত্ত্বসম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে এই ধারণাগুলিকে "অতিমানুষিক ধারণা বলা যায়। যাঁহারা এরূপ ধারণা করিয়াছিলেন তাঁহারা যে মানুষ ছিলেন ইহা মনে করা যায় না।"(৩)

ডয়সেন লিখিয়াছেন যে বহুকাল পরে কাণ্ট এবং শোপনহোয়ার যাহা বলিয়াছেন বহু পূর্ব্বে উপনিষদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। "আত্ম-জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ করা যায় এই কথা উপনিষদে যেরূপ চমৎভাবে ও চমৎকারভাবে বলা হইয়াছে শাশ্বত দার্শনিক সত্য আর কোথাও সেভাবে বলা হয় নাই।"(৪) পুনশ্চ তিনি বলিয়াছেন, যে উপনিষদের মধ্যে এরূপ দার্শনিক ধারণা পাওয়া যায়, "যাহার তুলনা শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতে আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।(৫)

ম্যাকডোনেল লিখিয়াছেন, "মানব-চিন্তার ইতিহাসে

(১) "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the upanishads. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death."

(২) "If these words of Schopenhauer required any endorsement I should willingly give it as the result of my own experience."

"Origin of the Vedanta."

(৩) Almost superhuman conceptions whose originators can hardly be regarded as mere men."

(৪) "Eternal Philosophical truth has seldom found more decisive and striking expression than in the doctrine of the emancipating knowledge of the Atman."

(Philosophy of the Upanishads)

(৫) ".....There are Philosophical conceptions unequalled in India, or perhaps any where else in the world."

সর্বপ্রথম বৃহদারণ্যক উপনিষদেই দেশকালাতীত বস্তুর (ব্রহ্মের) ধারণা সঠিক ভাবে করা হইয়াছে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।" (৬)

ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুঁজো লিখিয়াছেন, "যখন আমরা প্রাচ্যের এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কবিত্বপূর্ণ এবং দার্শনিক কীর্তিসমূহ পাঠ করি, আমরা সেখানে এরূপ গভীর সত্যসমূহ আবিষ্কার করি এবং য়ুরোপীয় প্রতিভা যে স্থলে বিরত হইয়াছে তাহার সহিত এরূপ পার্থক্য দেখিতে পাই যে প্রাচ্যের দর্শনের নিকট আমরা নতজানু হইতে বাধ্য হয়।" (৭)

জার্মান লেখক এবং পণ্ডিত ফ্রেডারিক শ্লেগেল লিখিয়াছেন, "য়ুরোপের উচ্চতম দর্শনকে যদি প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে য়ুরোপীয় দর্শনকে সমগ্র জগদুদ্ভাসক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে হয়।" (৮)

বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী হইয়াছে। বেদের শ্রেষ্ঠ অংশ উপনিষদ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণ স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা রচিত বা প্রচারিত বলিয়াছেন এবং বিদেশী পণ্ডিতগণও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। এজন্য আমাদের দেশের এই অমূল্যনিধি উপনিষদ সম্পর্কে আমাদের যত্নপূর্বক আলোচনা করা উচিত। হিন্দুর ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সকলই বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদের চরম সত্যসকল উপনিষদে পাওয়া যায়। এজন্য বলা যায় যে হিন্দু সংস্কৃতি বুঝিতে হইলে উপনিষদের আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা সত্য যে বেদ-বিশ্বাসী ঋষিগণ ছয়টি দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। ইহাও সত্য যে এই সকল দর্শনে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ আছে। আচার্য্যগণ ইহার মীমাংসা এইভাবে করিয়াছেন। চরম-সিদ্ধান্ত সকল উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রধানতঃ উপনিষদের বাক্যসকল আলোচনা করিয়া এই উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন রচিত হইয়াছে। যদি অন্য দর্শনের কোন সিদ্ধান্ত বেদান্তের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাজ্য। যাহা বেদান্তবিরোধী নহে, তাহা গ্রহণীয়। ঋষিগণ অন্য যে পাঁচটি দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে যাহারা বিষয়সুখে আসক্ত, যাহাদিগকে একেবারে বিষয়-ভোগহীন ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিয়া আকৃষ্ট করিতে পারা যাইবে না, তাহাদিগকে ঐহিক বিষয়-ভোগের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ক্রমশঃ বেদান্তের চরম সত্যের পথ দেখাইয়া দেওয়া। এজন্য এই সকল দর্শনে এমন কথা মধ্যে মধ্যে বলা হইয়াছে যাহা বেদান্তের সহিত সামঞ্জস্যহীন। ঐ সকল বাক্যের দ্বারা ইহজীবনের সুখভোগাকাংক্ষা হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব বলিয়া তাঁহারা ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। ইহজীবনের সুখ-ভোগাকাংক্ষা হইতে নিবৃত্ত না হইলে বেদান্তের সত্য সকল উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হয় না।

"নহিতে মুনয়োভ্রান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বাৎ তেষাম্।
কিন্তু বহির্বিষয় শ্রবণানাম্ আপাততঃ পরমপুরুষার্থ প্রবেশো ন ভবতি ইতি নাস্তিক্য নিবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। (মধুসূদন সরস্বতী)।"

অনুবাদ—এই সকল মুনিগণ (যাঁহারা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ ও পূর্বমীমাংসা দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন) তাঁহারা ভ্রান্ত নহেন। কারণ তাঁহারা সর্বজ্ঞ। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বাহ্যবিষয় ভোগে আকৃষ্ট থাকে তাহারা সেই অবস্থায় পরমার্থ (ব্রহ্ম) বিষয়ে ধারণা করিতে পারে না, এজন্য তাহাদের নাস্তিক্যবুদ্ধি দূর করিবার জন্য তাঁহারা অন্য কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পূর্বমীমাংসা দর্শনে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ করা উচিত, কারণ যজ্ঞ করিলে স্বর্গে যাওয়া যায় এবং সেখানে প্রচুর বিষয় সুখভোগ করা যায়। এই বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহলোকের বিষয় ভোগের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করা। পরলোকের সুখ-ভোগের আকাংক্ষাকে জীবনের উদ্দেশ্য করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। পরলোকের সুখভোগের আকাংক্ষা দ্বারা ইহলোকের সুখ ভোগের আকাংক্ষা নিবৃত্ত করা যায় বলিয়া পরলোকের সুখ ভোগের কথা বেশী বলা হইয়াছে। ইহ-লোকের সুখ ভোগের আকাংক্ষা নিবৃত্ত হইলে তাহার পর স্বর্গ সুখের আকাংক্ষাও নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্ম উপলব্ধির আকাংক্ষা জাগ্রত করিতে হইবে ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

---

(৬) "Brahmun or the absolute is grasped and definitely expressed, for the first time in the history of human thought, in the Brihadaranyaka upanishad" India's past p—46.

(৭) "When we read the poetical and philosophical monuments of the east, above all those of India, we discover there many truths so profound and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East. (Quoted by Maxmuller in his "Origin of the Vedanta."

(৮) "Even the loftiest philosophy of the Europeans appears in comparison with the abundant light of the oriental idealism life a feeble promethean spark in the full flood of the heavenly glory of the noon daysun, faltering and feeble, and ever ready to be extinguished." (Quoted by Maxmuller in his origin of the Vedanta.)

সামান্য একটা খবর

সুভাষ সমাজদার

নিশি রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে করছে দুর্লভপুরের সীমান্ত এলাকায়। সীমান্ত-রক্ষীদের বিকালের তাঁবুগুলোকে দূর থেকে মনে হয় যেন এক একটা হিংস্র জন্তু থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। সাঁ সাঁ করে বাতাসের কান্না বাজছে রেলের টেলিগ্রাফের তারে তারে। রেললাইনের ওপারে হাওয়ায় ওড়ে পাকিস্তানের পতাকা। আর এপারে দুর্লভপুর গ্রামের সীমানায় উঁচু বাঁশের মাথায় লোলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। সুখে দুঃখে একই জলে হাওয়ায় বেড়ে ওঠা পাশাপাশি দুটো গ্রামের লোকরা রেললাইনটার দিকে অপলক দুটো বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে বেদনার নিশ্বাস ফেলে। চকচকে ঐ লোহার রেললাইনটা যেন একটা ছোরার মত বিঁধে গেছে তাদের পাঁজরে। ওপারের ঝলঝলিয়াগঞ্জের বৃহস্পতিবারের হাটে যেতে পারবে না দুর্লভপুরের মানুষ।

দুর্লভপুরের রাসের মেলায়, পৌষসংক্রান্তির মেলায় পুরানো দিনের মত বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেতে আর আসতে পারবে না ঝলঝলিয়ার লোক। রেললাইনের দুধারে বসে দুটো দেশের মানুষ বিরহকাতর চাতক-চাতকীর মত চিরকাল বিচ্ছেদের কান্না কাঁদবে, আর কোনদিন তারা মিলবে না···সীমান্তরক্ষী গোকুলের পাঁজরের ভেতর থেকে ভাঙা ভাঙা একটা বেদনার নিশ্বাস রাতের বাতাসে মিলিয়ে যায়। হিন্দুস্থানী রক্ষী জগমোহন বিড়িতে একটা টান দিয়ে গোকুলের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এত ভাবতেছিস কেয়া রে গোকলা ?

—না কিছু নয়। এমনি মন মেজাজ ভাল না—হো হো করে হেসে উঠল জগমোহন। তার তীক্ষ্ণ হাসি অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে বয়ে গেল লহরে লহরে। বলল—তিরিশ বয়সকা জোয়ান আদমী তুই গোকুল, তোর মন মেজাজ কেনে, আচ্ছা নেই ; ও হাম সমঝাতে পারি—স্নিগ্ধ কৌতুকে তার ছোট ছোট চোখদুটো জোনাকীর মত জ্বলে উঠল। গোকুলের চোখে ঝিকিয়ে উঠল আগুন। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—তুই কি বলতে চাস সরস্বতীর জন্য আমার মন খারাপ হয়েছে ?

—জরুর। ওই ইস্কুল-পড়া মেড়কী তোর আঁখমে রঙ ধরিয়েছে—বলল হবিলদার শিউচরণ। থমকে দাঁড়াল গোকুলের হৃদস্পন্দন। তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তিতে জ্বলে যেতে লাগল মাথার ভেতরটা। তাহলে কি হাবিলদার সাহেবও জানে ব্যাপারটা! সে রেললাইনের এপাশে দুর্লভপুরের সীমানার ঘন অন্ধকারে ঢাকা পাটের ক্ষেতের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিল। আলাদরা চিন্তার বুদ্বুদ ফুটল তার মনে: শেষরাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে গেলেই ঐ পাটক্ষেতের পাশে মরা শকুনীর খালের পাড়ে কুরিনামা বট গাছের নীচে অসংখ্য ছায়ামূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠবে। ফিস ফাস, চাপা গলার কথার গুঞ্জন উঠবে। তারপর সবাই ঐ চকচকে রেললাইনটা ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে। কারো কাঁধে বিড়ির পাতার বস্তা, কেউ নিয়েছে চিনি, কেউ লবণ, কেউ মশলাপাতি। ওপারে নিয়ে যেতে পারলেই তিনগুণ বেশী দাম হবে এসব জিনিসের। ওখানে ঝলঝলিয়ার কাপড়া তেঁতুলগাছের নীচে শিকারী জন্তুর মত দুচোখের দৃষ্টি জ্বালিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে পাকিস্থানের মহাজন। ওপারের দুর্লভপুর, বক্সীগঞ্জ, কি হিলির মহাজনরা তখন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমে অচেতন, কিম্বা গীতাপাঠে বিভোর। তারা জানে, সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে কুলীরা ঠিক ওপারে তাদের জিনিস পৌঁছে দেবে। এই সীমান্ত এলাকায় ওদের কুলী বলে না। ওরা 'চোলাইদার'। এপারে নিরাপদে ফিরে এসে চকচকে কয়েকটা রূপালী মুদ্রার মজুরীতে ওদের শীর্ণ মুখে হাসির ঝিকিমিকি

ফোটে। । হিংস্র দারিদ্র্যের জ্বালায় মরিয়া হয়ে একাজে নেমেছে বাস্তুত্যাগীদের দল। সাত থেকে সাতাশ বছরের মেয়েপুরুষ আছে এই চোলাইদারদের দলে। শুধু পদ্মা-মেঘনার ওপার থেকে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আসা বাস্তু-হারারা নয়। দুর্লভপুর, হালিয়াদীঘি, বক্সীগঞ্জ, হিলির বিড়ির দোকানদার, মোটর বাসের অ্যাসিট্যাণ্ট ড্রাইভার, দারিদ্র্যজীর্ণ স্থানীয় সাধারণ গৃহস্থের দল থেকে সুরু করে এপারের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত নেমেছে এই চোলাই-দারের কাজে! আশ্চর্য! এ অঞ্চলে মিল নেই, ফ্যাক্টরী নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও খুব খারাপ। তাই অন্নসংস্থানের চেষ্টায়, অভাবের দায়ে একটা গোটা জাত 'স্মাগলার' হয়ে উঠেছে। ম্যাট্রিক-পাস সীমান্তরক্ষী গোকুলের চোখে ব্যাথার ছায়া নামে। ভারী হয়ে ওঠে তার বুকটা। কী দুর্গ্রহের অভিশাপ যে নিয়ে এসেছে এই দেশভাগ! চোখের সামনে ভেসে উঠল টুকরো টুকরো সোনা-মোড়া স্মৃতি। বগুড়ার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মহাদেব-পুরে ভূতকুঁড়ির পুকুরের পাড়ে হয়তো এই গাঢ় অন্ধকারে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাটির দোতালা বাড়ী। নক্ষত্রের আলো আর এই অন্ধকার বুকে নিয়ে ভূতকুঁড়ির জল ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছে। আছে—আছে, সব আছে! শুধু মানুষগুলোই নেই! সব হারিয়ে এখানে এসে রাত-চরা জন্তুর মত এই জীবিকার অর্থে বুড়ী-মা ভাই-বোন নিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু দেশটা ভাগ না হলে কি মহাদেবপুর হাইস্কুলের কৃতী ছাত্রকে কখনো নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের জ্বালায় বর্ডার গার্ড হতে হতো! মনের মধ্যে একটা নিদারুণ যন্ত্রণা শতমুখ দিয়ে যেন বিদীর্ণ করতে লাগল তাকে। কতবার তার মনে হয়েছে—সে ছেড়ে দেবে এই চাকরী। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরে যেন আর্তনাদ করে ওঠে বুড়ীমা, ছোট ছোট ভাইবোনদের অসহায় করুণ দৃষ্টি, অর্দ্ধাহার···অনাহার—না; আর ভাবতে পারে না সে। নিশিরাতের অন্ধকারে দুই দেশের সীমানার পাহারা-রত সশস্ত্র সীমান্ত রক্ষী, গোকুলের চোখ ফেটে জল আসে। জগমোহন বলে, গোকলা বিড়ি খাওগে কি নেই!

নিস্পৃহ গলায় গোকুল বলল—দাও একটা—হঠাৎ দুর্লভপুরের দিকে কালো অন্ধকার দিগন্তে একটা গো গো শব্দ বেজে উঠল। সতর্ক হয়ে উঠল প্রতিটি রক্ষী চোখের দৃষ্টি। বুকে ভয়ের ধুকপুকু শব্দ। হেঁকে উঠল হাবিলদার শিউচরণ—সব এ্যাটেনশন হো যাও। অন্ধকারে চকচক করে রক্ষীদের বন্দুকের সঙ্গীণগুলো। চারিদিকের নিথর স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে বুটের শব্দ উঠল—ঠক-ঠক-ঠক। দূরে হিলি বক্সীগঞ্জের পীচ-বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে আসছে একটা জীপ। বর্ডার মিলিটারী পেট্রোলিং পার্টি। হাবিলদারের শরীরের ভেতরটা শির শির করছে। সারপ্রাইজ ভিজিট! অর্থাৎ হঠাৎ পরিদর্শন করতে আসছেন বর্ডার মিলিটারী অফিসার নিখিলেশ সেন। দুই দেশের সীমান্ত এলাকায় চোরাই মালের ব্যবসা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এত বেশী যে দুর্লভপুর হিলি অঞ্চলেই অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে চিনি, লবণ, কাপড়। তাই সরকার বর্ডার-মিলিটারী অফিসারকে পাঠিয়েছেন এই অঞ্চলে। অল্পদিন হলো এসেছেন। মাঝে মাঝে তিনি আসেন; সীমান্ত এলাকায় আসেন রাতের প্রথম প্রহরে। আজ এই শেষ রাতের তরল অন্ধকারে কেন! পাংশু হয়ে গেল গোকুলের মুখ। হৃদপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এসেছে। রক্তে রক্তে তীব্র একটা ভয় চমকে উঠল। তবে কি—তবে কি তিনি জানতে পেরেছেন, শেষরাতের অন্ধকারেই···ক্যাচ শব্দ করে ব্রেক কষে যেন একটা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল জীপ। না। বর্ডার-মিলিটারী-অফিসার নিখিলেশ সেন আসেন নি। সদর থানা থেকে খবর নিয়ে এসেছেন একজন জমাদার—মিঃ সেন আসবেন, নতুন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজি-ষ্ট্রেটের সঙ্গে। তাঁরা রওনা হয়েছেন। এখুনি তাঁরা এসে পড়লেন বলে। সীমান্ত এলাকার চোরাই ব্যবসা শক্ত হাতে তিনি থামিয়ে দেবেন। এটা তাঁর প্রাথমিক কাজ। অতএব সাবধান।

সাবধান! গোকুলের নিদারুণ আশঙ্কাটা যেন তীব্র একটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। আজও যদি সরস্বতী আসে, তাহলে সে কেমন করে তাকে সাবধান করবে! কেমন করে তাকে—

সরস্বতী গোকুলের সীমান্ত রক্ষীর পাঁচ বছরের চাকরীর জীবনে একটা অতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ। সেদিনও ঐ ঘয়া শকুনীর খালের পাড়ে অশথ্ গাছের মাথায় শেষ

রাতের আবছায়া অন্ধকার দুলছিল। গাছের ডালে ডালে খড়কুটোর বাসায় ভেতরে কাকের কলরব রেখে উঠেছিল। পাকড়া—পাকড়া উঠে—চেঁচিয়ে উঠেছিল হঠাৎ জগমোহন। চোখের পলকে ছায়ামূর্তির মত পাটক্ষেতের নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল চোলাইদারদের সবাই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল গোকুল, ছুটেছিল জগমোহন। যেমন করে হোক অন্তত একটাকে ধরতে হবে। তারা সীমান্ত এলাকার রক্ষী বলে দুর্নাম আর প্রচলিত কুখ্যাতি সেদিন তাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তীর বেগে ছুটে গেছে ঠিক ঐ ধরা-শকুনীর খালের পাড়ে লোহার প্লেটের মত কঠোর দুটো হাতের বেড় দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছিল—একটা জীর্ণ মলিন শাড়ির উড়ন্ত আঁচল। থরোথরো রোগা একটা মেয়ে উপুড় হয়ে পড়েছিল তার পায়ের কাছে। জ্বলে উঠে গোকুল বলেছিল—দেখে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের মেয়ে! তুমি 'স্মাগল' করছো! আশ্চর্য!

জলভরা চোখের করুণ দৃষ্টিটা সে গোকুলের দিকে তুলে ধরে বলেছিল—হ্যাঁ। ভদ্রলোকের মেয়ে বলেই করছি। আমার বাবার 'প্যারালিসিস' রোগ। সাত-সাতটা ভাইবোন। আমি লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে—

—ঐ চিনি আর লবণের পুঁটলী কোমরের কাপড়ে বেঁধে নিয়ে পাকিস্তানে বিক্রী করে বুঝি নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছ?

—না।—কান্না-ভরা গলায় আকুলিত আবেদন ঝরে পড়ল। বলল—দেখুন স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা পাস করতে পারলে একটা চাকরী পেয়ে যাবো। না হলে বাবা মা—ভাইবোন সমস্ত সংসার—

—বাজে কথা বলো না। থানায় চলো—সীমান্ত-রক্ষী গোকুলের গলায় আদেশের কঠিন সুর ঝনঝন করে বেজে উঠল—স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার সঙ্গে তোমার এই 'স্মাগল' করার সম্বন্ধ কি?

—বিশ্বাস করুন। আমি টেস্ট পরীক্ষায় পাস করেছি—চারিদিকের তরল অন্ধকারে তার কথাগুলোকে কাতরকান্নার মত মনে হল। বলল—আজ দুই সপ্তাহ হলো চোলাইদারের কাজ করে আমি পঁচিশ টাকা পেয়েছি। আরও পাঁচটাকা বড় দরকার—

—কেন? রোগা বাপের জন্য ওষুধ?

—না।

—তবে? যেন একটা কুয়াশার ধাঁধায় পড়ে ছটফট করতে থাকে গোকুলের চোখদুটো। কি—কি বলতে চায় লেখাপড়াজানা এই ভদ্রলোকের মেয়ে চোলাইদারটা। চীৎকার করে বলল—কোন খাতির নেই। তোমাকে থানায় যেতে হবে। চল—

—বিশ্বাস করুন। আরও পাঁচটাকা হলে আমি স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফি দিতে পারবো। টাকা দেওয়ার মত কেউ নেই আমার—

হিম হয়ে যায় গোকুলের বুকের রক্ত। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফি! তার জন্য স্মাগলিং? তার রাইফেল-ধরা শক্ত হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল। চিন চিন করে জ্বলে যেতে লাগল তার দেহটা। হঠাৎ অসহ্য একটা যন্ত্রণায় যেন পাগলের মত চীৎকার করে উঠল—যাও—যাও—চলে যাও তুমি? দাঁড়িয়ে কি দেখছো! চোখের পলকে হাওয়ার মত মিলিয়ে গিয়েছিল সরযূবতী। হাসেনার মত টেনে টেনে হেসে উঠেছিল জগমোহন, হাবিলদার শিউচরণ, সবাই। জগমোহন কপাল চাপড়ে বলেছিল—কেয়া তাজ্জব কি বাত! পরীক্ষাকা ফিসকে লিয়ে স্মাগলিং! বাঙ্গালা দেশ কি লেড়কী সব কুছ পারে—

অতলান্ত অন্ধকারে যেন তলিয়ে গিয়েছিল গোকুলের চেতনা। কেমন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রিয়গুলো। কে কি বলছে, কিছুই তার কানে আসছে না। তারপরে একে একে তিনটি দিন কেটেছে। আধরাতের প্রহর পার হয়ে, এসেছে শেষরাতের পাখী ডাকা, শুকতারার স্নিগ্ধ আলোর শেষপ্রহর। সীমান্ত-রক্ষী গোকুল, জগমোহন কাঠের পুতুলের মত রেল লাইনের তারের এপারে দাঁড়িয়ে থেকেছে নিষ্প্রাণ, শিলীভূত মূর্তির মত। আর তাদের চোখের সামনে ছবির পর ছবি ফুটেছে—

ঐ যে অস্তমান চাঁদের আলো বাঁকা হয়ে পড়েছে ধরা শকুনীর খালের ঘোলা জলে, সেই খালেরই পাড়ে নিঃশব্দ পায়ে এসে এতক্ষণ নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছে সরযূবতী। তার করুণকরুণ মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছে। উত্তেজনায় উদ্বেগে নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছে দ্রুততম। ও জানে না—

গোকুল যাবে না, জগমোহন যাবে না—হাবিলদারও যাবে না—বিশেষ করে ঐ একটি ঢোলাইদারকে ধরতে। ওপার থেকে মজুরী নিয়ে আঁচলে বেঁধে ফেরার সময় সরস্বতী যখন দেখে অন্য ঢোলাইদারের ওপরে সিংহের মত বিক্রম নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিশ্চয়ই তখন তীব্র খুশীর একটা বিস্ময়ে চমকে চমকে ওঠে সরস্বতীর বুকের নিশ্বাসগুলো। হয়তো গাঢ় কৃতজ্ঞতায় ভরা অগাধ দুটো চোখের কোমল দৃষ্টি সে ভাসিয়ে দেয় দূরে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষীদের দিকে। কিন্তু তারা তখন ব্যস্ত। পূবের আকাশে রক্তপলাশের রঙ ধরে। অন্ধকার পুঁজতে গিয়ে জোনাকীরা ঐ ভাওড়াগাছের ওপরে স্বর্ণলতার ঝোপে ঝিকঝিক্ করে। হাবিলদার চেঁচিয়ে ওঠে—আজ কয়ঠো পাখা জালমে গিয়েছে রে জগমোহন ?

—বাইশঠো হুজুর।

—লে চল গারদমে—

রেললাইনের পাশেই 'চেকপোষ্টে'র ঘরের গা ঘেঁসে 'স্মাগলারদে'র জন্য অস্থায়ী গারদ ঘরের দিকে ঢোলাইদারদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে যেতে চাপাগলায় বলেছে গোকুল সরস্বতীকে—সেই প্রথম ধরার দিন থেকে আজ কয়দিন হলো রে জগমোহন ?

—তিন রোজ। তিন রূপেয়া কামায় লিয়েছে সরস্বতীয়া—

—হাঁ। আরো দুটাকা বাকী—আরো দুই দিন !

আরো দুইদিন—আরও দুই টাকা। সূচীমুখ যন্ত্রণায় জলে যাচ্ছে গোকুলের মাথার ভেতরটা। গায়ে পিঠে, রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। আজ সে কেমন করে সরস্বতীকে—

আসছে—আসছে রে ! চাপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল জমাদার। কৃষ্ণারাত্রির ছদ্মপিণ্ডের ধ্বনির মতই যেন আবার চাপা গোঁ গোঁ শব্দ উঠল হিলি-বস্তীগঞ্জের পীচ-বাঁধানো রাস্তায়। তীব্র হেডলাইটের আলোয় দুপাশের দিগবিকীর্ণ ধানের ক্ষেত ঝলসে দিয়ে তীরবেগে আসছে মিলিটারী ভ্যান। ফিসফিসিয়ে জগমোহন বলল—আজ খুব সামাল হো যা গোকলা !

—হাঁ, গোকলা—তর্জনী তুলে রক্তাভ দুটো চোখ পাকিয়ে বলল হাবিলদার শিউরেণ—সরস্বতীয়া-উরস্বতীয়া কো—কিসিকো মাত ছোড়ো। নোকরী খতম হো যায়গা। গোকুলের চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে মরা-শকুনীর পাড়ে। ঐ অশ্বত্থগাছের আড়ালে কোন ছায়া শরীর কি দুলছে ! চারিদিকের ঝিঁঝিঁগুলো যেন তার রক্তের ভেতরে বাজছে। হা ভগবান ! আজ যেন সরস্বতী না আসে। না—ভুল হয়েছে, মস্ত ভুল হয়ে গেছে ! গতকাল কি পরশুদিন যখন সে তাকে বলেছিল—বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আসতে ভয় করে না তোমার ?

ভয় ! ক্ষীণ তনু দুলিয়ে দুলিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল সরস্বতী। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠেছিল তার চোখের দৃষ্টি। বলেছিল—আত্মীয় স্বজন বন্ধু সকলের কাছেই হাত পেতেছিলাম। সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে। গরীব মানুষের ভয় থাকলে চলে না—

—বাদবাকী অল্প কয়েকটা টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি নাও। পরীক্ষা দাও। পাস কর—বলতে চেয়েছিল গোকুল। কিন্তু কে যেন সাঁড়াশী দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছিল। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বংশানুক্রম সংস্কার। যদি ও কিছু মনে করে ! কিন্তু সেদিনই জোর করে, নিজের মর্য্যাদাকে অগ্রাহ্য করেও ওকে কয়েকটা টাকা দেওয়া উচিত ছিল। কে জানে, নতুন ডি-এম এসেই—শেষরাতের অন্ধকার-ঢাকা সীমান্ত এলাকার ছায়া মূর্তিদের রোমাঞ্চকর বাণিজ্যের খেলা দেখতে আসবেন নিজের চোখে ?

এ্যাটেনশান ! নিথর স্তব্ধতা কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠল হাবিলদার শিউচরণ। মুহূর্তে প্রতিটি সীমান্তরক্ষীর রাইফেল ঘাড়ের ওপরে উঠে এল, রাইফেলের চকচকে সঙ্গীণের ফলায় ঝকমক করে উঠল নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরোয়ানা, রক্ষীদের পাথুরে মুখে কঠিন নির্লিপ্ততা, মরা শকুনীর থালের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখের মণিগুলো বাঘের মত কপিশ আলোয় জল জল করছে। আজ তাদের অলক্ষ্য দৃষ্টির সীমানায় কেউ পড়লে আর রক্ষে নেই। আগুন ঝলসে উঠবে রাইফেলের মুখে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে জগমোহনের কপালে। তারও মনের ভেতরে একটা আকুল আবেদন মাথা কুটছে—সরস্বতী যেন না আসে। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে সেই অতিকায়

'ভানো'র শব্দ। হিলির যমুনা নদীর ব্রীজের ওপর দিয়ে সাঁ করে ছুটে চলে আসছে এখুনি। হঠাৎ চমকে উঠল গোকুলের চোখের দৃষ্টি। প্রচণ্ড একটা আশঙ্কায় শিথিল হয়ে এল জগমোহনের বুকের পেশীগুলো। ছায়া-ছায়া অন্ধকার নড়াচড়া করছে মরা শকুনীর খালের পাড়ে ঝাঁকড়া বটগাছের নীচে। এসে পড়েছে চোলাইদারদের দল।

খস্—ব্রেক্ কষে ভ্যান থেকে লাফিয়ে নামলেন মিঃ সেন, নতুন ডি-এম মিঃ ব্যানার্জি, হাবিলদার জমাদার প্রতিটি রক্ষী তাঁদের অভিবাদন জানাল। শিউচরণ বট-গাছটার দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল—হল্ট! হু গোজ দেয়ার—উত্তেজিত হয়ে মিলিটারী অফিসার বললেন ডি-এমকে—হাট সি! হোয়াট ইজ গোয়িং অন এ্যাকচুয়েলি ইন্ দিস বর্ডার—দাঁতের কোনায় চুরুট চেপে ধরে রক্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে অর্ডার দিলেন ডি-এম সেন্টি—এ্যারেষ্ট—এ্যারেষ্ট দেম—যাও-যাও পাকড়ো—বিদ্যুতবেগে ছুটল প্রতিটি সীমান্তরক্ষী ঐ ছায়া-ছায়া শরীরগুলোকে লক্ষ্য করে:

চোলাইদারদের দলের ভেতরে তীব্র হাহাকার পড়ে গেল—ধরতে আসছে রে—ধরতে আসছে—পালা-পালা—

পড়ে নিস্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে গেল তাদের আর্ত-কলরব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের হাল্কা শরীর নিয়ে ছুটে ওপারে বনকলিয়াগঞ্জের আবছায়া অন্ধকারে মিশে গেল। বুড়োবুড়ীরা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল এপারের সীমানায়। ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তাদের কারো বিড়ির পাতা, কারো মসলার মোড়ক—রক্ষীদের বলিষ্ঠ হাতের থাবা এগিয়ে এল তাদের গলার কাছে। আর জোয়ান ছেলে-মেয়েরা যে যে দিকে পারল ছুটল, কেউ ঘন নিবিড় পাটের জঙ্গলে, কেউ সাঁইবাসের ঝোপের ভেতরে। কিন্তু আজ রক্ষীরা মরিয়া। তারা মত্ত হস্তীর আক্রোশ নিয়ে কাঁপিয়ে পড়ল পাটক্ষেতের ভেতরে, সাঁইবাসের জঙ্গলে, বনকুলদীর আর কন্টিখরী-ঘুতরার ঝোপের ভেতরে। টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে এল এক একটা চোলাইদারকে। উত্তে-জনায় গোকুলেরও মাথার ব্রহ্মতালুটা দপ দপ করছে। ক্ষুধ মত একটা বিশাল অতিকায় জন্তুর মত এক একটা শিকারের ঝুঁটি চেপে ধরে নিয়ে এসে ফেলছে ডি-এম এর পায়ের কাছে। আর মনের ভেতরে বিপুল একটা আনন্দ সুরভিত হয়ে গলে গলে পড়ছে—সরস্বতী আসে নি! লেখা-পড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে! ঠিক রাতের অন্ধকারে হয়তো এদিকে কয়েক পা এসেই আবার দুর্লভপুরের দিকেই ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে—তার ঠোঁটের কোনায় কোনায় পরমী হাসির রেখা ফুটল। যেন সরস্বতীর না আসাটা তারই কৃতিত্ব! বর্ডার মিলিটারী অফিসার মিঃ সেন আর ডি-এম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আসামীদের নিয়ে। ডি-এম বিরক্ত হয়ে বললেন—মাত্র এই কয়জন ধরা পড়ল! একটু থেমে আবার হেঁকে বললেন—সেন্টি, ঠিকসে পাকড়ো—পাটকা ক্ষেতমে দেখ—হরএক আউর হ্যায়—হঠাৎ মিঃ সেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, কতগুলো ভয়ঙ্কর কথা। চমকে উঠলেন মিঃ সেন। বললেন—আপনার সন্দেহ হয়? বেশ তো সার্চ করা যাবে—হাবিলদার শিউচরণ পাগলের মত চোলাইদারদের ধরছে। হঠাৎ দূরে পাটক্ষেতের পাশে আল-পথের ওপর দিয়ে বাতাসের বেগে ছুটে যাওয়া একটা মূর্তির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—জগমোহন—পাকড়ো—আউর একঠো ভাগতা হ্যায়—ক্ষ্যাপা বুনো মোষের মত ছুটল জগমোহন। তবে কি সরস্বতী! থমকে দাঁড়াল গোকুলের হৃৎস্পন্দন। সেও ছুটল সেইদিকে। শিউচরণ আবার নতুন উদ্যমে চোলাই-দার শিকার করতে লাগল। আর জগমোহন শক্ত হাত বাড়িয়ে সরস্বতীর সরু গলাটা চেপে ধরে ফেলল। চাপা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল—আঃ তু সরস্বতীয়া! হা ভগমান! সরস্বতীর বেণী ছেঁড়ে, ছড়িয়ে পড়েছে চুল। কাঁটায় কাপড় ছিঁড়েছে। মরা সাপের মত দুলছে তার শ্রোচল। ভয়ে উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আজ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে! বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও। তোমার পায়ে পড়ি। মাতলা একটা ষাঁড়ের মত ছুটে এসে গোকুল বলল—জগমোহন ওকে ছেড়ে দে—কৈ কৈ—কি মাল আছে দেখি! বলেই সরস্বতীর হাত থেকে ছোঁ দিয়ে মসলার ঠোঙাটা নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে পুরে ফেলল।

জগমোহন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—উহুঁ—উহুঁ চোরাই মাল পকেটমে রাখিস না—বর্ডার গার্ডকে কেউ সন্দেহ করবে না—গোকুলের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে

চলেছে। ধক ধক করছে হৃদপিণ্ডটা। ফিরে এসে জগমোহন, গোকুল দুইজনই বলল—শালাকে ধরতে পারা গেল না—কার কথা কে শোনে! সীমান্ত এলাকা জুড়ে যেন আর্ত চীৎকার, চাহাকার আর কান্নার প্রলয় নেমেছে। প্রাণের ভয়ে সরস্বতী তখন হিন্দুর নিরাপদ এলাকার দিকে ছুটে চলেছে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে আবার উঠে ছুটছে। কিন্তু—

কিন্তু হাবিলদার আচমকা হেঁকে উঠল—এ্যাটেনশান! মিঃ সেন বললেন ডি-এমকে—তাহলে কি ওদের—

ডেফিনিটলি! আমার 'কনফিডেনশিয়াল' রিপোর্ট যা, তাতে মনে হয় কোথাও ফাঁকি আছে।

—হ্যাঁ। দৈনিক কাগজগুলো লিখছে, কনষ্টেবলরাও ওদের এজেন্ট।

—ইয়েস্। সার্চ দেম!

তারপরের কথা খুব সংক্ষিপ্ত। খবরের কাগজের মফঃস্বল সংবাদের ভেতরে ছোট একটা খবর ছাপা হয়েছিল, "সীমান্ত এলাকায় এক বাঙালী সীমান্ত-রক্ষীর পকেটে কয়েকটি মসলার ঠোঙা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, রক্ষীদের ভেতরেও কী ব্যাপক দুর্নীতি চলিতেছে।" রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিকের আকাশ অভিযান আরো হাজারো আন্তর্জাতিক সংবাদের ভীড়ে কত তুচ্ছ আর সামান্য একটা খবর।

আমেরিকার একটি কৃষক পরিবারে কয়েকদিন

শ্রীহিরণ্ময় গুপ্ত

গত বৎসরে মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময়ে আমাকে নেব্রাস্কা রাজ্যের একটি কৃষক পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমেরিকার কৃষকেরা যন্ত্র সাহায্যে কিভাবে কৃষিকার্য করিয়া থাকে তাহার বহু বিবরণ ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিলাম। এই সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। শুধু তাহা নহে, মার্কিণ কৃষকের জীবনযাত্রাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিবার একটি চমৎকার সুযোগও আমার ঘটিয়াছিল।

নেব্রাস্কার যে গ্রামে আমি গিয়াছিলাম তাহার নাম ডরচেষ্টার। নেব্রাস্কা কৃষিপ্রধান রাজ্য। ডরচেষ্টার গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। আমি যে কৃষকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম তাঁহার নাম ডেলমার ফিকেন। ফিকেন একটি কৃষি-খামারের মালিক।

নবেম্বর মাসের এক সকালে আমি ডরচেষ্টারে আসিয়া পৌঁছিলাম পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে ফিকেন-বাস ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। আমি পৌঁছিয়ামাত্রই আমাকে লইয়া তাহার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। দুই পার্শে বিস্তৃতবিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। কিন্তু রাস্তায় কাদা একরকম ছিলই না। বেশীর ভাগ রাস্তাই পীচের। একটি স্বাভাবিক ছিমছাম বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। ফিকেন-গৃহিণী স্মিতহাস্যে আসিয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া বিকালের দিকে ফিকেন-পরিবারের কুশল প্রশ্ন করিতে করিতে আসিয়া বসিলাম। নানারকম আলাপ আলোচনা সুরু হইল।

ডরচেষ্টার গ্রামে যে সকল কৃষক বাস করে তাহাদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষ হয় জার্মান, না হয় চেক। বৃদ্ধদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ জার্মান ভাষা জানেন। ফিকেনের পূর্বপুরুষও ছিলেন জার্মান। তাহার পিতার ১৬০ একর জমি ছিল। ২০,০০০ ডলার মূল্য দিয়া পিতার নিকট হইতে ফিকেন তাহা ক্রয় করে। ফিকেন পিতার জমি ভাগে চাষ করিত; ফসলের দুই-পঞ্চমাংশ পিতাকে দিতে হইত, তিন-পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রাখিত। এই ভাবে কয়েক বৎসর ধরিয়া ফিকেন ১০০০০ ডলার পরিশোধ করিয়া দেয়। পিতার মৃত্যু হইয়াছে ১০ বৎসর, এখনও তাহাকে ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করিতে হইতেছে।

ফিকেনের আরও ২ ভাই এক বোন আছে। ফিকেন পিতাকে জমির মূল্য বাবদ যাহা দেন তাহা হইতে ফিকেনের পিতা নিজের জন্য কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। অন্যান্য সন্তানেরা পিতার যে সকল জমি ক্রয় করে তাহার মূল্যের একটা অংশ ফিকেনও ভাগে পায়। ছেলেদের কাছে জমিজমা বিক্রয় করিয়া ফিকেনের পিতামাতা নগদ অর্থ লইয়া নিকটবর্তী ক্রীট নামক সহরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেখানে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং ফিকেনের পিতা আসিয়া ফিকেনের সঙ্গেই বাস করিতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্বে ৪ বৎসর ফিকেনের পিতা তাহার কাছেই ছিলেন।

ফিকেনের মোট জমির পরিমাণ ১৬০ একর (প্রায় ৪৩৮ বিঘা)। নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে একলাই এই জমি চাষ করিয়া থাকে, তবে চাষের মরশুমে তাহার অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র টেরেন্স অনেক সময়ে তাহার সঙ্গে কাজ করে, সময়ে সময়ে তাহার স্ত্রীও তাহাকে সাহায্য করে। আমেরিকায় মজুরী বেশী, কৃষিকার্যে বিদ্যুতের নিয়োগ

করিলে যাহা অতিরিক্ত বেশী পড়ে, তাহাতেই পারিবারিক খরচের কোন বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করেন। তবে সময়ে সময়ে পারিবারিক সাহায্য হিসাবে একে অন্যের ছেলে দিয়া কাজ করিয়া দিয়া থাকে।

১৪৯ একরের মধ্যে কিকেন একসঙ্গে সব জমি চাষ করে না। পোড় হিসাবে ১৫ একর জমি ফেলিয়া রাখে এবং অবশিষ্ট জমির প্রায় সবটাই প্রতি বছর চাষে লাগায়। প্রায় ৪২ একর জমিতে সে ভুট্টা লাগায়। তাহা ছাড়া ৩১ একর জমিতে গম, ১৮ একর জমিতে যই, ৩ একর জমিতে যব, ১০ একরে মাইলো, ৪ একরে রাই ও ৮ একরে আলফালফা ঘাস (পশুখাদ্যের জন্য) চাষ করিয়া থাকে। কিছুটা জমিতে বাগানও করিয়াছে।

ছেলেরা কিকেন পশুপালনও করিয়া থাকে। তাহার ৮টি গরু, ১০টি শূকর ও প্রায় ২০০টি মুরগী আছে। ৮টি গরুর মধ্যে ৭টি গরু দুধ দেয়, দিনে প্রতি প্রায় ১০ গ্যালন—প্রায় ১ মণ দুধ হয়, ডিম পাওয়া যায় দৈনিক প্রায় ১০০টি।

জমি হইতে কিকেন প্রতি বৎসর প্রায় ৬৫০ বুশেল গম (১ বুশেল প্রায় ৯৷৷ সের), ৫০০ বুশেল যই, ৬০০ বুশেল মাইলো, ২৭০০ বুশেল ভুট্টা, ১০০ বুশেল রাই ও ৫০ বুশেল রাই পাইয়া থাকে; ভুট্টা, মাইলো, রাই যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেকটা এবং যই ও যবের সবটা পশুখাদ্যের জন্য রাখিয়া উৎপন্ন শস্যের অবশিষ্টাংশ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। দুধ হইতে যাহা ক্রিম তোলা হয় এবং ঐ ক্রিম বিক্রয় করা হয়। ক্রিম তোলার পরে যে পাতলা দুধ পড়িয়া থাকে তাহা শূকরকে খাওয়ান হয়। উৎপন্ন গরু, দুধ, ডিম, শূকর প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বৎসরে কিকেনের প্রায় ৯০০০ ডলার আয় হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেটির জন্য সাময়িক বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের মারফত বিক্রয় করা হয়, সুবিধামত কখনও কখনও পৃথকভাবেও বিক্রয় করা হয়। সার, বীজপ্রভৃতির জন্য বৎসরে তাহার ব্যয় হইয়া থাকে প্রায় ২০০ ডলার।

আমেরিকার কৃষি প্রধানতঃ যন্ত্রনির্ভর। কিকেন তাহার কৃষিকার্যে সাধারণতঃ ট্রাক্টর, কম্বাইন, কর্ণপিকার, কর্ণ স্যাকার, কাঁটিভেটর, হারো, গ্রেন ড্রিল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। উহার মধ্যে ট্রাক্টরই মূল যন্ত্র, উহাই অন্য যন্ত্রগুলিকে চালাইয়া নেয়। উহার সহিত অন্যান্য যন্ত্রাদি জুড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজ করা হয়। ট্রাক্টরের সঙ্গে লাঙ্গল জুড়িয়া জমি চাষ করা হয়, কালটিভেটার জুড়িয়া জমি নিড়ান হয়, হারো জুড়িয়া জমি পাট করা হয়, ম্যানিওর স্প্রেডার জুড়িয়া জমিতে সার দেওয়া হয়, কর্ণ স্যাকার, গ্রেন ড্রিল জুড়িয়া বীজ বপন করা হয়। ফসল কাটিবার সময় হইলে পুনরায় ট্রাক্টরের সঙ্গে মোয়ার প্রভৃতি যন্ত্র জুড়িয়া দেওয়া হয়। কর্ণ-পিকার জুড়িয়া দিলে ভুট্টা গাছ হইতে ভুট্টা ছাড়াইয়া লওয়া যায়। আর গম, যব প্রভৃতি শস্য ঝাড়াইবার জন্য কম্বাইন যন্ত্রটি ব্যবহার হয়।

ইহার পর খড় আঁটি করিয়া বাঁধিয়া গাদা করিয়া রাখিবার জন্য হে-লোডার, এলিভেটার যন্ত্র দুইটির ব্যবহার হয়।

কিকেন তাহার চাষের কাজে এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই সকল যন্ত্রাদির মোট মূল্য কত হইতে পারে। সে বলিল, নতুন কিনিতে গেলে প্রায় ৮০০০ ডলার লাগিবে। তবে সে বেশীর ভাগ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড যন্ত্রপাতি কিনিয়াছে, উহাতে খরচ অনেক কম পড়ে; অনেক সময়ে প্রায় নতুনের এক-তৃতীয়াংশ দামে কেনা যায়, কাজও খারাপ হয় না। বর্ত্তমানে তাহার চাষের যন্ত্রপাতির মোট মূল্য হইবে (ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়া)—প্রায় ১৫০০ ডলার।

ইহা ছাড়া জমিতে জল দিবার জন্য কিকেনের একটি পাম্প ও কতকগুলি এলুমিনিয়ামের পাইপ আছে। পাইপগুলি খুব হালকা, ইচ্ছা মত একটার গায়ে আর একটা লাগাইয়া বহুদূরে খুশী জল লইয়া যাওয়া যায়।

প্রয়োজনমত উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার জন্য কিকেনের একটি ট্রাক ও দুটি ওয়াগন আছে।

ট্রাক্টর প্রভৃতি চালাইবার জন্য কিকেন গ্রোপেন নামক এক প্রকার পেট্রোলের উপজাত ব্যবহার করিয়া থাকে। উহা পেট্রোল হইতে দামে সস্তা। ট্যাঙ্কে এই তরল পদার্থটি জমা করা থাকে। গ্রোপেন-কিক্রেতা মাঝে মাঝে আসিয়া ট্যাঙ্কটি ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যায়।

কিছুক্ষণ আলাপ চলিবার পর কিকেন-পত্নী আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ। এতক্ষণ তিনি তাঁহার রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন।

মিসেস কিকেনের রান্নাঘরটি সাজান গোছান, সুন্দর! একটু উঁচু পথা টেবিলের উপর কয়েকটি গ্যাসের উনুন—একপাশে বাসনপত্র ধোয়ার জায়গা ও কল।

আর এক পাশে রেফ্রিজারেটর। টেবিলের তলায় তাকে নানারকম খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য তৈজসাদি সাজান। টেবিলের উপর গ্যাস-উনুনের মিটার বসানো—উপরের একটি তাকে ছোট একটি রেডিও বসানো। মিসেস কিকেনের দুইটি ছোট ছেলে আছে। স্বামী ও তিনটি ছেলে লইয়া তাঁহার সংসার। তাঁহাকে নিজের হাতেই সংসারের যাবতীয় কাজ করিতে হয়। তাঁহার একটি ওয়াশিং মেশিন আছে। তাহার সাহায্যেই তিনি সকলের জামাকাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকেন। সংসারের কাজ হইতে অবসর পাইলে তিনি ছোট ছেলেদের জন্য জামা তৈরী করেন, কখনও বা তাহাদের পড়ান। মাঝে মাঝে স্বামীর চাষের কাজেও তাহাকে সাহায্য করিতে হয়, বিশেষ করিয়া কৃষি-মরশুমে। তখন তিনি সাধারণতঃ ট্রাক্টর চালান। তিনি অনেক দিন স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করিয়াছেন, এখনও ইচ্ছা করিলে স্কুল-মাষ্টারী করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে করেন স্বামীর পাশেই তাঁহার স্থান, তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সংসারের সব কাজ একা করিয়া আপনার কি বিশ্রাম সময় থাকে? উত্তরে কিকেন-পত্নী বলিলেন—অনেক সময় থাকে।

স্বামী ও বড় ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তাছাড়া অনেক সময়ে এরাও আমাকে সাহায্য করে।

মিসেস ফিকেনের পূর্বপুরুষ চেক। পাশের গ্রামেই তাঁহার পিত্রালয়। তাঁহার পিতার ১২০ একর জমি ছিল, তাঁহার ভাই সেই জমি চাষ করে, ফসলের তিন-পঞ্চমাংশ নিজে রাখে, দুই-পঞ্চমাংশ তাঁহার পিতাকে দেয়। তাঁহার পিতা ও মাতা এখনও সেই জমির উপর নির্ভর করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে পৃথকভাবে বাস করেন। স্বামী, স্ত্রী ও তিন চারিটি সন্তানসহ একটি কৃষক পরিবারের ২১০ একর জমির কমে চলে না, মিসেস ফিকেন জানাইলেন।

কথায় কথায় মিসেস ফিকেন তাঁহার শিক্ষিকা-জীবন সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, ২০ বৎসর পূর্বে হাই স্কুল হইতে পাশ করিয়া তিনি যখন এই গ্রামেই শিক্ষিকা হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার বেতন ছিল মাসে ৬০ ডলার। তাঁহার পিতার জোরে করিয়া তিনি স্কুলে আসিতেন এজন্য তাঁহাকে মাসে ৫ ডলার করিয়া ভাড়া দিতে হইত। বর্তমানে গ্রামের ছোট এক কামরা-ওয়ালা স্কুলটিতে যে শিক্ষিত্রী আছেন তাঁহার বেতন মাসে ২৬০ ডলার, বছরে ৯ মাস তিনি ঐ বেতন পান। আর তিন মাস ছুটি, ঐ সময়ের জন্য কোনও বেতন দেওয়া হয় না।

এই কথার মধ্যে ফিকেন বলিয়া উঠিলেন—কুড়ি বৎসর পূর্বের ঘটনা, কিন্তু মনে হয় যেন সেদিনের ব্যাপার। একদিন শুনিলাম আমাদের গ্রামে এক নূতন শিক্ষিত্রী আসিয়াছেন, শুনিয়া কয়েক বন্ধু মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। সেইখানেই মিসেস ফিকেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ফিকেনের কথায় মিসেস ফিকেনের মুখে একটু মধুর হাসি খেলা দিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল।

পূর্বের কথার সূত্র ধরিয়া মিসেস ফিকেন বলিতে লাগিলেন—কুড়ি বৎসরে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তখন সব খামারে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইত না। টেলিভিসনটি দেখাইয়া বলিলেন, ইহার কথাও আমরা তখন ভাবিতে পারিতাম না। সিনেমা দেখিতে গেলে নিকটবর্তী সহরে যাইতে হইত। এখন ঘরে বসিয়াই টেলিভিসনের কৃপায় অনেক কিছু দেখা যায়।

রাত্রে খাবার সময় হইল। মিসেস ফিকেন তাহারই বন্দোবস্ত করিতে উঠিয়া গেলেন।

আমাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল দ্বিতলের একটি ঘরে। তাহার জানালা দিয়া দেখিলাম—বাহিরে তুষার বর্ষণ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে সে রকম ঠাণ্ডা বোধ করিলাম না।

ফিকেনের বাড়ীটি কাঠের। উপরে নীচে মিলাইয়া আট নয়খানি ঘর। নীচে বৈঠকখানা, খাবার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম ও শয়নঘর। উপরে আরও কয়েকখানি শয়নঘর ও ভাঁড়ার। যদিও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষি-এলাকায় বাড়ীখানি অবস্থিত এবং অন্ততঃ মাইলের মধ্যে আর কোনও বাড়ী নাই—তবুও বাড়ীতে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের বিশেষ কোনও অভাব নাই। হীটারে বাড়ীটি গরম হইয়া থাকে। পোষাক, সেট, টেলিভিসনে বৈঠকখানাটি সজ্জিত।

মেঝেতে কার্পেট পাতা। শীতের রাতে সেখানে বসিয়া গল্প করিতে করিতে আমার বহুবার ঘুম আসিয়াছে, আমি সত্য সত্যই নেব্রাস্কার একটি কৃষক পরিবারের সঙ্গে বাস করিতেছি কিনা। ফিকেন সিটীর তারাবাটি আধুনিক সাচ্ছন্দ্যভাবে সজ্জিত, বাথরুমে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে গরম জলও পাওয়া যায়। সেখানে কোন রকম মিউনিসিপ্যালিটি নাই, যে গ্রামের অধিবাসী-সংখ্যা নিতান্তই অল্প—সেখানে বাথরুমে কি করিয়া গরমজল পাওয়া যায় তাহা আমার পক্ষে বিশেষ কৌতূহলের বিষয় ছিল। ফিকেনের পুত্র টেরেন্সের কাছে একথা বলিলে সে আমাকে বেসমেন্টে, একতলার নীচে বাটীর তলার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিলাম প্রোপেনের সাহায্যে জল গরম হইতেছে, সেই জলই বাথরুমে চালান করা হইতেছে। আর ঠাণ্ডা জল আসিতেছে বাড়ীর উপরের ট্যাঙ্ক হইতে।

পরদিন ফিকেনের খামার দেখিতে যাইব ঠিকানায়। দূর হইতে ফিকেনের বাড়ীটি দেখিয়া মনটা বেশ বড়ই মধে হইল, আমাদের দেশের কৃষকের কুটীরের সঙ্গে তাহাকে কোনও মতে তুলনা করা চলে না। আশেপাশে আরো কয়েকটি কাঠের ঘর, কোনটিতে গবাদি পশুর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি ঘর আছে। তার পাশে একটি পবন-চক্র (windmill), হাওয়ায় চাকা ঘুরিতেছে, আর তাহারই সাহায্যে নীচের কুয়ার জল উঠিয়া বাড়ীর উপরের ট্যাঙ্কে জমিতেছে। সেখান হইতে পাইপ যোগে যাইতেছে রান্নাঘরে, বাথরুমে। কুয়াটি আবৃত। তাহার জলই খাওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কুয়ার জল ভাল কি খারাপ কি করিয়া জানা যায়। আমার সঙ্গী টেরেন্স উত্তর করিল, মাঝে মাঝে জলের নমুনা আমরা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠাই, বিনা খরচে জল পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হয়।

তুষার বর্ষণের ফলে রাস্তায় কিছু কিছু বাধা হইয়াছিল। তাহার মধ্য দিয়াই আমরা সন্তর্পণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। গরু ও শূয়োরের খোঁয়াড়ের নিকট গিয়া টেরেন্স মুখে একটি অদ্ভুত শব্দ করিল, চারিপাশ হইতে বাকশক্তিহীন পশুগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। সঙ্গের কুকুরটিকে ইসারা করা মাত্র সেটি আবার সেগুলিকে তাড়াইয়া মাঠে লইয়া গেল। আমাকে দেখাইবার জন্য টেরেন্স আবার মুখে আর একটা আওয়াজ করিল। কুকুরটি আবার সেগুলিকে তাড়াইয়া আনিয়া খোঁয়াড়ে পুরিল।

চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। মাঝে মাঝে এক একখানি বাড়ী। মনে হইল যেন সমুদ্রের মধ্যে এক একটি দ্বীপ। ফিকেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার নিকটতম প্রতিবেশী কতদূরে থাকে। উত্তর দিয়াছিল, আধ মাইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ বিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকিতে অসুবিধা হয় না? উত্তরে বলিল, তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেই টেলিফোনে কথা বলি, কয়েক লেকেণ্ডের মধ্যে কথোপকথন পাওয়া যায়। আর গাড়ীতে আধঘণ্টায় যাইতে আর কত সময় লাগে।

তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই টেলিফোন আছে, গাড়ীও আছে সকলের। আরাম বিলাসের নানা উপকরণ থাকিলেও চাষের জন্য কিকেনকে কম পরিশ্রম করিতে হয় না। সেই সময়ে টেরেসও তাঁহার সঙ্গে খাটে। সকাল ৬টায় উঠিয়া তাহারা কাজে বাহির হয়, কখনও কখনও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কাজ করে।

যে লোকটি কার্পেট-মোড়া ড্রয়িংরুমে বসিয়া গল্প করিতেছে ও মাঝে মাঝে টেলিভিসনের ছবি দেখিতেছে, মাঠে গিয়া সে কিভাবে কাজ করে তাহা একবার দেখিবার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। সে সুযোগ বিশেষ না পাইলেও কাজ হইতে ফেরার পর একদিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, ওভার-অল ও ওভার-বুট পরা, সারা গায়ে কাদা মাখা। তাহার পর বাথরুম হইতে যখন বাহির হইল তখন তাহার বেশ একেবারে পাল্টাইয়া গিয়াছে।

কিকেন সাধারণতঃ দুইটার মধ্যে কাজ করে না।

কিকেনের পিতা চাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাইদের মধ্যে সকলেই চাষী নহে, এক ভাই অধ্যাপক। কিকেনের বড় ছেলে বাইশের বৎসর পার করিয়া বাহির হইবে, তারপর তাহার ইচ্ছা সে বেড়াইতে যাইবে। তবে কিকেনের ধারণা—তাহার তিন ছেলের মধ্যে অন্ততঃ একজন চাষবাস লইয়া থাকিবে।

গ্রামে একটি ছোট স্কুল আছে, ছাত্রসংখ্যা ২০।২৫ জন। সকলে এক ক্লাসে পড়ে না। স্কুলে একটি মাত্র ঘর ও একজন শিক্ষয়িত্রী। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য পৃথক পৃথক ডেস্ক আছে, সেখানেই তাহাদের বইখাতা থাকে। একটি ঘরে বিভিন্ন বেঞ্চে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রেরা বসিয়া পড়াশুনা করে—অনেকটা আমাদের দেশের পাঠশালার মত। কিকেনের ছোট ছেলে দুইটি এই স্কুলে পড়ে, স্কুলটি প্রায় দুই মাইল দূরে, রোজ গাড়ী করিয়া ছেলে দুইটিকে দিয়া আসিতে হয় ও লইয়া আসিতে হয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই এইভাবে স্কুলে আসে। কিকেন নিজেও স্কুল কমিটির একজন সদস্য।

ডরচেস্টার গ্রামের পার্শ্ববর্তী সহরের নাম ক্রীট। ডরচেস্টার হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন কিকেনের সঙ্গে সহরটি দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে রাস্তাঘাট চমৎকার। বড় বড় দোকান, স্কুল, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, বিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি সবই আছে। একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও এখান হইতে প্রকাশিত হয়। দেখিলাম ক্রীটের বহু লোকের সঙ্গে কিকেনের পরিচয় ও হৃদ্যতা; ফিরিবার সময়ে প্রশ্ন করিলাম, সহরের লোকসংখ্যা কত, কিকেন বলিল ৩।০০০—সাড়ে তিন হাজার? মানে সাড়ে তিন হাজার? কিকেন বলিল, হাঁ সাড়ে তিন হাজার। কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। পরে বুঝিলাম সাড়ে তিন হাজার লোকবিশিষ্ট গ্রামটিই একটি ছোট সুন্দর সহরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিকেন বলিল, এইরূপ সহর অসংখ্য আছে।

এরূপ সহর যে অসংখ্য আছে সেকথা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিলাম ডরচেস্টার গ্রামটি ঘুরিয়া দেখিয়া। ডরচেস্টার একটি ছোট গ্রাম, মাত্র পাঁচশত লোকের বাস, তাও আবার একটি বাড়ী আর একটি বাড়ী হইতে অনেক দূর। কিন্তু গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বাড়ীঘর, দোকান পসার দেখিয়া মনে হয়, ইহা বুঝি একটি ছোট সহরেরই একটি অংশ।

কিন্তু আমার জন্য আর একটি বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছিল তাহা অনুধাবন করিতে পারি নাই। গ্রামের লোক গ্রামের হাইস্কুলে আমাদের জন্য একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করিয়াছিল। সম্বর্ধনার শেষে আমাদের স্কুলটি ঘুরাইয়া দেখান হইল। স্কুলটি বেশ বড়, বিতল। ক্লাস রুম, লাইব্রেরী প্রভৃতি। ক্লাসরুমগুলি নানা প্রকার পুস্তক, ছত্রপাতি প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। আমাদের দেশের যে কোনও বড় স্কুলের সঙ্গে উহাকে তুলনা করা চলে। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত, উত্তর হইল ৫৩। মনে হইল ভুল শুনিয়াছি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া সেই একই উত্তর পাইলাম। হেডমাষ্টারকে ভাল করিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, স্কুলে নবম হইতে যদেপ গ্রেড এই উপরের চারি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী পড়ে মাত্র। এই চারি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৩'র অধিক নহে। আশে পাশে যে সকল ছোট ছোট স্কুল আছে সেখান হইতে পাশ করিয়া ছেলে মেয়েরা এখানে পড়িতে আসে।

এই স্কুলের হেড মাষ্টার একজন এম-এড।

আমি যেমন স্থানীয় কৃষক ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতাম, কিকেন তদ্রূপই তাহারও কৃষকদের সম্বন্ধে সেইরূপ নানা কথা জিজ্ঞাসা করিত। একদিন রাত্রে ড্রয়িংরুমে বসিয়া এইরূপ নানা কথা হইতেছে, এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। খানিক পরে কিকেন আসিয়া বলিল, তাহার ছোট বোন ফোন করিয়াছে, ক্রীটের হাসপাতালে তাহার খশুর কিছু অসুস্থ, কিকেন যেন আজই একবার তাহাকে দেখিয়া আসে। এই বলিয়া কিকেন ও তাহার স্ত্রী উদ্বিগ্নভাবে বাহির হইয়া গেল। কিকেনের খেত এখান হইতে প্রায় হাজার মাইল দূরে থাকে। আগে এখানেই থাকিত।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তাহারা ফিরিয়া আসিল। শ্বশুরের অবস্থা এখনই আশঙ্কাজনক। কিকেন সেকথা আমায় ফোন করিয়া বেনেক জানাইয়া দিল। টেলিফোন মার্কিন কৃষকদের জীবনে যে কতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইলাম।

কয়েকদিন এই কৃষি পরিবারের সঙ্গে কাটাইয়া ডরচেস্টার পরিত্যাগ করিলাম; যাত্রার সময়ে হঠাৎ খেয়াল হইল—আমি যে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে বাস করিতেছি এই কয়দিন তাহা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতে লাগিল কিকেনের ছোট ছেলে দুইটির কথা। এই কয়দিনেই তাহারা আমাকে তাহাদেরই একজন করিয়া লইয়াছিল।

ডরচেস্টার ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। ঘুরে ঘুরে এক একটি বাড়ী। আমি ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি এই কয়দিন আমি একটি কৃষক পরিবারে কাটাইয়া আসিলাম? এই যে ক্রীট সহরের রাস্তায় মোড়ে মোড়ে অটোমেটিক ট্রাফিক সিগন্যাল বসান, তার লোকসংখ্যা সত্যই কি সাড়ে তিন হাজার?

ছিন্নবাধা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অনাথের সঙ্গে কারখানায় গেল অভয়। আগেই নিশ্চয় অনাথ আসর তৈরী ক'রে রেখেছিল। কারখানার মতো একটি অপরিচিত জায়গায় এসেও কোনো অসুবিধা হ'ল না তার। প্রথম দিনই আলাপ হয়ে গেল অনেকের সঙ্গে।

মেশিন ঘরে ঢুকে বলল অনাথ, কেমন লাগছে ?

কথা শুনতে পেল না অভয়। মেশিনের তীব্র শব্দে কানে তালা লেগে যায়। এখানে ইসারায় কথা হয়। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল অনাথ, কেমন বুঝছ ?

হেসে ঘাড় নাড়ল অভয়। এখনো কিছুই বোঝেনি সে।

অভয়ের নাকে যেন কেরোসিন তেলের গন্ধ লাগছে। মেঝেতেও পড়েছে তেল আর কেঁসোর আস্তরণ। হাজিরা-বাবুর কাছ থেকে কাগজ নিয়ে লেবার অফিস ঘুরে এল অনাথ অভয়কে নিয়ে। হরি মিস্তিরির 'বয়' হিসেবে কাজ পেল অভয়। মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে, কালে পাকা মিস্তিরি হ'য়ে উঠতে পারবে।

বুড়ো হরি মিস্তিরি অভয়ের ঘাড়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ঘুষ দিতে হবে কিন্তু।

অনাথ বলল, কী রকম ঘুষ, সেটা ব'লে দাও।

হরি বলল, গান। গান শোনাতে হবে কিন্তু আমাকে।

আরো কয়েকজন এল এদিক ওদিক থেকে। সভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দু' তিনজন মেয়েমানুষও এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে একজনই বাঙালী মেয়ে। মুখে পান, বয়স প্রায় ভামিনীর মতোই।

হরি তাকে উদ্দেশ করে বলল, নে, দেখে রাখ। এখনো ভাল আছে, চেষ্টা চরিত্তির ক'রে রাখ্, খারাপ করা যায় কিনা।

তারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে ঠাট্টা তামাসা সুরু করল। সে-সব ঠাট্টা তামাসার কথা শুনলে, কান কাঁ কা করে। একজন তো সেই মেয়েমানুষটির গায়ে চিমটি কেটেই দিল। অনাথ ব'লে উঠল, এই দেখ, এখুনি সায়েব আসবে কি ওভারসিয়ার এসে পড়বে, এরা সব মেলা লাগিয়ে দিল। যা যা, সব কাজে যা। হরিদা, তা' হ'লে রইল তোমার সাকরেদ। নিজের মতনটি ক'রে নিও।

নিজের মতনটিই করে নিল হরি। ভাল ক'রে হাতে ঘড়ি দিল প্রথম কাজের। এটাকে কি বলে ? স্ক্রু। এটা ? হাফর। ওটা ? শাফ্ট। (শ্যাফ্ট) মাপবে কি দিয়ে ? গজ দিয়ে। গজ চেনায় হরি অভয়কে। অর্থাৎ স্কেল। নইলে কোনোদিন পাকা মিস্তিরি হ'তে পারবে না। গান বাঁধতে হ'লে, কথার মিল চাই, মাত্রা চাই সুরের, নয় ? এও সেইরকম। গোঁজামিলের ঠাঁই নেই এখানে। গানে গোঁজামিল দিলে কী হয় ? কাঁকি হয়।

রোজ বোঝায় হরি। দুয়ে দুয়ে কত হয় ?

চার।

উহুঁ। চার নয়। ছেলেবয়সে যখন কড় গুণবে, তখন চার, তারপরে পাঁচ। কেন ? না, এত মাপ-জোক নিক্তির ওজন ক'রে, কী করলে ? পয়দা করলে। অর্থাৎ কি না, পাঁচ নম্বর এল তোমার হাতে। মাপ-জোক গোণাগাঁথা কি আর মিছিমিছি হয় ? তা নয়, কলের জন্যে হয়। নইলে বুঝতে হবে, গোঁজামিল

আছে। দেহের ওইটি কাচ, মানুষের মত। মানুষের একে আর একে কত হয়? তিন হয়। তবে, সেটা হল তত্ত্বের কথা। ছেপে যাও সে কথা। দুয়ে আর দুয়ের মিলটা খাঁটি একের আগে, তবে তুমি পাকা মিস্তিরি। করতে পারলে, পাঁচ নম্বরের কল আপনি হাতে এসে পড়বে। তাই রাগ ক'রে বলতে হয়, হাতের পাঁচ বুঝি? মানে কথা হল গিয়ে, হাতের পাঁচ হাতেই আছে বটে, কিন্তু পাওয়া কি সহজ কথা?

অভয় অবাক মানে। মন্ত্রের কথা, শুনে মনে হয়, এখানে গান শোনাবে ঠাট্টার মত। কিন্তু হরি মিস্তিরি যা বলে, সেও জীবনের তত্ত্ব। গানের মতই তার ছাঁদ ছন্দ আছে। গান বাঁধলেই হয়।

হরি মিস্তিরিও বোঝে, ছেলে চুপক। ঠিক জিনিষটি দিলেই টেনে নিতে পারে। হরি গজ মেপে দেখিয়ে বলে, একে বলে ডাইমেটার (ডায়ামেটার), ওকে বলে, ডাইমেন (ডাইমেনশন)। এক ইঞ্চিকে একশো ভাগে ভাগ বোঝায়। হাজার ভাগও বোঝায়। বোঝায় নক্‌শা দেখিয়ে দেখিয়ে। বুঝিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেমন বুঝলে?

অভয় বলে, বুঝলুম, বে-হিসেবী মরে।

বুড়ো হরি মিস্তিরির মুখের ভাঁজে ভাঁজে চাপা হাসি খেলে যায়। বলে, কী রকম?

অভয় বলে, কানি কাপড়ে কোঁচা হয় না। করতে গেলে, পরীলে বেড় পাইনা, দিগম্বর হ'তে হয়।

—আচ্ছা?

—নিয়মের লাজলজ্জা নেই। একটুখানি এদিক ওদিক হলে সব ভণ্ডুল ক'রে দেয়।

—হাঁ।

—ইঞ্চির যখন হাজার ভাগ হয়, তখন—

ভুবনের কোথাও ফাঁক নাই গো
যারে বলে শূন্য
তার মধ্যেও আছেন গণ্য
'বিন্দু' মহাশয় গো।

হরি মিস্তিরি বলে মাথা দুলিয়ে, বহুত আচ্ছা ব্যাটা।

অভয় আবার গায়,

অভয় যেন সমঝে চলে।
ভাল মন্দ যা আছে তার
কিছুতে কিছু পাবে না সার
ফেলা কিছুই যাবে না গো।

হরি তার মেশিন-খাঁটা খাবার অভয়কে চাপড়ে বলে, আরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌!

তাদের চীৎকার শুনে এদিক ওদিকের লোকেরাও ছুটে আসে। আসে মেয়ে পুরুষ, ছুই-ই। ডিপার্টমেণ্টের সর্দারও আসে খেঁকিয়ে, এই শালারা কাজে ফাঁকি দিচ্ছিস্।

কিন্তু সেও নেমে যায়। অভয় তাদের নতুন আকর্ষণ হয়েছে।

অভয় ভেবে খুশি, সংসারে সব ভাল, সবাই ভাল। একদল মিস্তিরি ধরে বসে, তাদের আখড়ায় নিয়ে যাবে। যাত্রার দলের আখড়া। বিবেকের পার্টটা নিতে হবে অভয়কে। কেউ বলে এসে, কবি গানের আসর করবে। অভয়কে গাইতে হবে।

জবাব দেয় হরি, নয় তো অনাথ; এখন নয়। দু'দিন থাক।

ভোরবেলা আসে অভয়। বেলা এগারোটায় খেতে যায়। আবার আসে একটায়।

ওদিকে শৈলবালা আর সুরীন দিন ক্ষণ নিয়ে বড় ব্যস্ত। বিয়ের দিন। তবে পাকা মানুষ সুরীন। শৈল-বালাকে বলেছে, বিয়ের আগেই শৈলদিদি মিনির নামে বাড়ি-ঘর লিখে পড়ে দিক। কেন না, মানুষের মন। কখন কোন্‌দিকে যায়, বলা যায় না।

আপত্তি করে নি শৈল। মেয়েকে সব লিখে-পড়ে দিয়ে, অভয়কে এসে বলেছে, বাবা, সব তোমাদের জন্যে রেখে গেলুম। ম'লে দুটি কাঠ দিয়ে আমাকে একটু পুড়িও, আর কিছু চাই নে।

ভামিনী শুধু দেখছে। তার হাঁ নেই, নাও নেই। সুবালার কাছে অভয়কে নিয়ে যাওয়ার বড় সাধ তার। কিন্তু সুযোগ পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা যখন অভয় ফিরে আসে, তখন সুরীনেরা ফিরে আসার সময়। সুরীনের কারখানা দূরে, আসতে তার দেরী হয়। দেরীটুকু বড় অসহ্য সময়। ভামিনী বলে অভয়কে, 'সুবালাদের ওখেনে একটু যেও, অনেক ক'রে বলেছে। তোমার গান শুনবে একটু।'

কথা একেবারে মিথ্যে নয়, সুবালা বলেছে। এমনি, ভাল মনে বলেছে। ভামিনী তাকে তার মনের কথা বলতে পারে নি। কোন্‌খান দিয়ে কী কথা বেরিয়ে পড়বে, সুরীন আর আস্ত রাখবে না। তবে এ সংসারের কোথায় ফাঁক, তার খবর একটু-আধটু জানা আছে ভামিনীর। তাই সুবালাকে গিয়ে বলেছে, আমার ভাসুর-পো'কে নিয়ে হয়েছে জ্বালা।

কেন ?

না, সুবালাকে দেখে গিয়ে অবধি, ছেলেটার নাকি মন ফস্‌ফস্‌ করছে। বলে, খুড়ি, মেয়েটি দেখতে খাসা, গলাটি আরো খাসা।

অকপটে মিথ্যে ব'লে, খিলখিল ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ার ফাঁকে সুবালার মুখ দেখে নেয়। বেন্তা হলেও, মেয়েমানুষের মন। যোয়ান পুরুষের প্রশংসায় মনে একটু ছোপ লাগে বৈকি।

সুবালা চোখ ঘুরিয়ে বলে, পছন্দ যখন হয়েছে, আসতে ব'লো একদিন।

ভামিনী আরো রং চড়ায়, বলে, তোর সঙ্গে বসে নাকি তবলা সঙ্গত করতে ইচ্ছে করে। আর খালি বলে, তোমাদের সুবালা নিমির চেয়ে দেখতে ভাল, কী বল খুড়ি ?

হাসতে হাসতে আবার বলে, বুঝেছ তো, ছেলের আমার কোপায় ঘুন্ ধরেছে ?

নিমির নিন্দে সুবালার কতখানি ভাল লেগেছে, বোঝা যায় না। হেসে বলে, নিমিরটা নিমিরই থাক্, মেয়েটা ভাল।

ভামিনী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, তুই আর বেন্না ধরাস নি বাপু। পাড়ার কোন্ ছোঁড়াকে বাকী রেখেছে, তা তো জানি নে।

সুবালা বলে, তা' হোক্‌গে দিদি, ও-কথায় কাজ কী ?

—না, এমনি। তুই বললি। আর ছোঁড়া দিন-রাত তোর কথা বলে।

সুবালা বলে, তা এখেনে দরজা আগলে তো বসে নেই কেউ, এলেই তো পারে। লোকটার গলা কিন্তু ভালই।

ভামিনী মনে মনে হেসেছে। বিনা পয়সায় রঙ্গ করা যাদের ধাতে নেই, সেই মেয়েও যখন সরাসরি আসতে বলে, তখন কিছু না হোক, খেলা করবার ইচ্ছে একটু আছে। বলে, মুখপোড়া বলেই খারাপ, সময় পেলে তো আসবে। কাজ হয়েছে যে।

সুবালা বলে, রাতে তো আর কাজ করে না।

—তোর যে তখন কাজের সময় ? মাসী বিরক্ত হবে।

ঠোঁট কুঁচকে বলে সুবালা, তবে এসে কাজ নেই বাপু।

ভামিনী ভয় পেয়ে হেসে বলে, তাই না বটে ! উঠি আজ।

উঠে পড়ে। একদিনের কথা তো নয়। প্রায়ই বলে থেকে থেকে। যে জ্বালা ভামিনীর জুড়োবার নয়, সিদ্ধি-লাভের আশা নেই, অনর্থক পুড়ে মরে সেই আগুনে। সর্বনাশের মতো, তার কাঁপি থেকে ছেড়ে দেওয়া সাপ যে কোনখান দিয়ে কোথায় হাজির হতে পারে, নিজেও জানে না।

তারপর কথায় কথায় সুবালাকে বলেই ফেলে, একদিন গেলেও তো পারিস দুকুরের ঘোরে। ওই ছোঁড়ার জন্যে বলছি নে তা' বলে। এমনি। এই তো কাপা।

সুবালা বলে, ঠোঁট উল্টে, ঘেন্না করে বড্ডো, কিছু মনে ক'রো না। গেরস্থদের সহ্য হয়, তারা গেরস্থ, তোমাদের পাড়ার হাক-গেরস্থদের মত নজর কটকটানি সহ্য হয় না।

ভামিনী বলে, ক্যাঁটা মারো অমন নজরের মুখে। নজর করবে তো করবে, ইদ্দে দেখিয়ে চলে যাবি।

একদিন আসে সত্যি সত্যি সুবালা। কিন্তু তখন অভয় বেরিয়ে গেছে কারখানায়। ভামিনী যেন আশা পায়।

সুবালা বলে, কই, আমার পছন্দ করা নাগর কোথায় গো ?

—আ পোড়াকপাল, সে যে বেরিয়ে গেল।

সুবালা বলে, ভালই হয়েছে। সন্ধেবেলায় যেতে ব'লো। দু'ফেরতা না হয় বাঁয়া তবলায় হাত চালিয়ে আসবে। তাতে তো আর মাসীর ক্ষতি নেই ?

কারখানা থেকে ফিরে এসে অভয়ের মন কেমন করে, শৈলবালার বাড়ী যায়, নিমিকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু লজ্জা হয়, হট্ ক'রে গিয়ে উঠতে পারে না।

ভামিনী খুড়ির অনুরোধে পা' বাড়ায় মাঝে মাঝে

সুবালাদের বাড়ির দিকে। নিজের মনকে তো ফাঁকি দিয়ে আজ নেই। সুবালার গান শোনার বড় ইচ্ছে হয়।

কিন্তু মনটা আনচান করে নিমির জন্যেই বেশী। কিছু না হোক, বাড়ির কাছ দিয়ে একটু ঘুরে আসতেও যেন ভাল লাগে। ওই বাড়ির কাছেই, পাড়ার পুরুষদের যাত্রাগানের মহড়া দেবার ঘর। সেখানেও উঁকিঝুঁকি মারে অভয়। দু'একজন বাদ দিলে, সবাই হেঁকে ডেকে ওঠে, আরে এস এস, জামাই এস।

দু' একজনের মধ্যে বিশু আর তার সাঙ্গপাঙ্গ। ঘরে ঢুকলেও, বিশু কথা বলে না। বরং ধমকে ওঠে সবাইকে, নাও, এখন হবুজামাইকে নিয়ে হ্যালা কর, এদিকে সব প'ড়ে থাক। যত সব উট্‌কো বামেলা এসে হাজির।

বিশুর ওজন আছে আখড়ায়। গলা কাঁপিয়ে পাটও বলতে পারে ভাল, আর বড় বড় পার্ট করে। কিন্তু অভয়কে আমল দেয় না একেবারে। শৈলবালার বাড়িতে লোকটির অবাধ গতি। নিমির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাও বলতে দেখেছে।

ওখানে গেলে সবাই গান গাইতে বলে। ইচ্ছে থাকলেও গায় না। বিশুর সামনে গলা খুলতে চায়না তার। যে-আশায় তবু যায় উঁকিঝুঁকি মারতে, তার উদ্দেশ্য আলাদা। মনে বেজায় রং লেগে গেছে, নিমিকে একবারটি দেখতে ইচ্ছে করে।

দেখা যে না হয় একেবারে, তা নয়। কিন্তু নিমি যেন তেমন নজর করে না।

কিন্তু নজর না করার দিনও শেষ হ'য়ে এল। আর দেরী নেই।

তার আগেই, ভামিনীর কাছে সুবালার আসার খবর পেয়ে অভয় গেল দেখা করতে। সন্ধ্যার ঝোঁক তখন, সবে সাঝাগোঝা শেষ হয়েছে। ক্রমশঃ

দাশু রায়

রামেন্দ্রনাথ মল্লিক

আজকে আমার মন, ছোঁয় শুধু ছোঁয়
কথাকলি নাচে নাচে যেখানে আলোয়
মেতে ওঠে মন আর হৃদয়ে হৃদয়
একটু সুখের কুঁড়ি ফুল যদি হয়।

চকল ছায়ার ছবি রূপালী রঙিন্
সেখানে জীবন দেখি আমরা গ্রামীণ,
প্রাচীন বটের নীচে পাচালীর গান
গায় দাশরথি সুরে বৃদ্ধেরই প্রাণ।
কত না বিগত দিন সে সুরে হারানো
কত না জীবন আর কামনা ভরানো
ধানের মাটিই ছুঁয়ে ভাব সমরায়
কথকের ভাষ আর ভাষা মিলে যায়।

আমরা এসেছি দিনে সোনালী রোদের,
কত কথা চাপা পড়ে শরীরে বীজের
সবটুকু বলা নয় ঘোমটা আড়ালে
ভাবের কাকলি শুনি ভোরের নাগালে!

পাচালী চামরে তবে যে কথা মধুর
ধ্বনির লাবণ্য নিয়ে হৃদয়ে সুদূর
সুরের আবেশ রসে মন করে ভার,
সে ভার আমার হাতে আজকে অপার।

আজকে অনেক সুর জটলা পাকায়,
একটি সুরের রেশে দাশরথি রায়
অজস্র ভাবের ভাবি রোয় বীজ রোয়,
তাইতো আমার মন ছোঁয় শুধু ছোঁয়।

আলবেয়ার কামু ও আঁদ্রে জাইড

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৫৭ সালে আকাদেমীর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক আলবেয়ার কামু। কামুর বর্তমান বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর; এত অল্প বয়সে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিকই এমন বিশ্ববিশ্রুত সম্মানের অধিকারী হন নি। কামুর সাহিত্যসৃষ্টি আশ্চর্য মানবতাবোধের অনন্য দৃষ্টান্ত। মানুষের মনের মামুলি, বিচিত্র সব অনুভূতি তিনি অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার কারণ এমন নিখুঁতভাবে জীবনকে তাঁর মতো আর কেউ উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ! আলজিরিয়ার এক অতি দরিদ্র পরিবারে কামুর জন্ম হয়, তাঁর বাবা ছিলেন সামান্য কৃষক—অন্যের খামারে কাজ করতেন। মা ছিলেন স্পেন দেশীয়। শৈশব থেকেই কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তিনি মানুষ হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়, তখন তিনি সকল দিক থেকে নিতান্ত অসহায় হ'য়ে পড়েন। তারপর খাঁর চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে কামু পড়াশুনা করতে থাকেন, ১৯৩৬ সালে আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর আরম্ভ হয় তাঁর জীবন সংগ্রাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে দর্শন-শাস্ত্র ছিল তাঁর অতি প্রিয় বিষয়, পরবর্তী কালের রচনায় দর্শনবাদের বিভিন্ন স্তরের ছায়া তিনি প্রভাবিত হয়েছেন দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে বেরিয়ে কামু কিছুদিন আলজিয়ার্স শহরের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিশেষ ক'রে নাট্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি একটি থিয়েটার সেন্টারের পরিচালনা ভার পেয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক বিখ্যাত নাট্যকারের নাটক ফরাসীতে অনুবাদ করেন, ফরাসী ভাষায় অনূদিত তাঁর নাটকের মধ্যে ইস্কাইলাসের প্রমিথিউসের ফরাসী অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনয় শিল্পে তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুদক্ষ অভিনেতা, যদিও তিনি নিয়মিত রূপে মঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে অভিনয় করেন নি। এর পর কামু সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন, বহু পত্র পত্রিকার সঙ্গে তিনি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিছুদিন স্কুলের শিক্ষকতাও করেন। পরে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ নেন, সেখানেও তাঁর কাজ ছিল মূলতঃ সাংবাদিকতা ঘেঁষা। প্রথম জীবনেই কামু একবার কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ডাক্তার এসে অভিমত দিলেন যে, তাঁর যক্ষ্মারোগ হয়েছে। অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন তিনি, আর জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হ'য়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছে। বহুদিন ধরে চিকিৎসার পরে তিনি অবশ্য বেঁচে উঠলেন, কিন্তু নতুন ক'রে আবার জীবনে আর এক বীভৎস ও করুণ দিকের পরিচয় পেলেন। প্রথম জীবনে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে ও পরবর্তী জীবনে নানাভাবে হতাশা, ব্যর্থতা ও মৃত্যুতুল্য ব্যাধির নিষ্ঠুরতা কামুকে স্বভাবতই দুঃখবাদী ক'রে তোলে। জীবনের প্রতি তাঁর এই বিতৃষ্ণা ও গ্লানিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় কামুর লেখা 'দী মিথ্ অব্ সিসিফাস' গ্রন্থে। গ্রীক পুরাণের পটভূমিকায় লেখা তাঁর এই বই। করিন্থের রাজা সিসিফাসের উপরে দেবতা রুষ্ট হ'য়ে অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত সিসিফাস একটি বিরাট আকারের পাথর পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তুলতে থাকে, চূড়ার কাছাকাছিতে গিয়ে পাথরটী আবার গড়িয়ে পড়ে যায়। সিসিফাস তখন পাথরটি টেনে তোলার জন্য পাথরটির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। পাথরটিকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা, পাথরটি গড়িয়ে পড়ার সময় আবার তার পেছন পেছন ছোটা, এই রকম ছুটোছুটি ও বার বার বৃথা চেষ্টায় সিসিফাস ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কামু দেখাতে চেয়েছেন মানুষের জীবনও তো এমনি ব্যর্থ চেষ্টায় ধারা বিড়ম্বিত। কয়জন মানুষ তার অভীষ্ট ফল লাভ করতে সক্ষম হয়? কামুর জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর লেখা বহুসংখ্যক উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের সংকলনে। প্রথম যুদ্ধের পরে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইয়োরোপের সমাজ জীবনের অপরূপ চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনেক রচনায়, আর এই দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী পর্যায়ের রাজনৈতিক ভাবধারা ও প্রগতিশীল মতবাদ তিনি এমন নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী, রাষ্ট্রের বিরাট কর্মযজ্ঞশালায় মানুষ কত নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর তা তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা সমস্ত পৃথিবীর সকল স্তরের সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে একেবারেই দ্বিতীয় রহিত। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি বই-ও এই কারণেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কামুর উপন্যাসগুলোর অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা বলতে গেলে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর "দি প্লেগ" নামক উপন্যাসের। দ্বিতীয়মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালে "দি প্লেগ" উপন্যাস প্রকাশিত হয়, আর একমাত্র ফরাসী দেশেই এ বই সওয়া লক্ষ কপি বিক্রী হয়। যুদ্ধপরবর্তী ইয়োরোপের সাহিত্যে "দি প্লেগ" একটি বিশিষ্টধরণের প্রতীক উপন্যাস, ইয়োরোপের সকল অঞ্চলেই প্রচুর উদ্দীপনার সঙ্গে এই উপন্যাস সমাদৃত হয়েছে। এক ডাক্তার এই উপন্যাসের নায়ক। আলজিরিয়ার ওরা বন্দরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। মানবতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ডাক্তার দলে দলে সবাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে কি ক'রে রোগের প্রকোপকে তারা হ্রাস ক'রে দিল, দারুণ বিপদের দিনেও মানুষ তার স্বীয় শক্তিকে জাগ্রত ক'রে, কঠিন সংকটের মধ্যে ও দৃঢ়প্রত্যয়ের বলে মানুষ কি

কাজে হয় ছকম ছুতো যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার নিজের পায়ে ঠাইয়ের পায়ের আঙুল কর্তনা হয়েছে কামুর এ বইয়ে। কামু নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর সর্বশেষ সাহিত্য-কীর্তি "দি ফল" নামক উপন্যাস ও তাঁর পূর্ব সাহিত্য "দি এক্সাইল এণ্ড দি কিংডম" এই দুইখানা বইয়ের জন্য। কামুর "দি ফল" উপন্যাসও মানব-মনের আজন্ম সংবেদনশীলতা ও অনুভূতির এক অবর্ণনীয় প্রতিফলনে উজ্জীবিত। এক উদাহরণস্বরূপ, পেরোসকারী ও আরব নাবিকের পর পর দুইটি ঘটনার ভাবে হয়ের একজন এক আকস্মিক মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন যে এতদিন তিনি দুরাই আদর্শবাদের মায়ে ভাঁওতা দিয়ে এসেছেন, তাঁর জীবনের সব কিছুই নিরাশ্রয় বেকী, সবটাই ফাঁকীতে ঠাসা। নিজের কাছে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে করতে লাগলেন, প্রতি মুহূর্তে বিবেক-দংশনের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠতে লাগলেন। কোথায় শান্তি পাওয়া যেতে? কি ক'রে তাঁর অতিযন্ত্রণী মনের সংশোধন হতে পারে? পরপর দুটো বেড়ালো-ক্যাপার মতো তিনি বেশে বেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; এক বেশ থেকে আর এক বেশে যান, কোথাও তৃপ্তি পান না, যেখানেই তিনি যান—যে কোনো লোককে ধরে ধরে তাঁর দুঃখের কাহিনী শোনাতে থাকেন। কিন্তু তবু কি মন সান্ত্বনা পায়? এমনি-ভাবেই অতিযন্ত্রণী মনের অনুতাপ আর গ্লানিতে আমরাও কি জ্বলে মরি না? কামুর রচনার আশ্চর্য বর্ণনাভঙ্গীর গুণে এই উপন্যাসের নায়কের অনুভূতি, তাঁর দুঃখবোধ ও বিচিত্র ভাবাবেগ যেন পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়। যেন আমরা এ কাহিনী পড়তে পড়তে এই উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করে যাই: নিজের লেখকের কল্পনার মূর্ত প্রতীক ব'লে আমরা যাকে ধরে নিই, আর আমরা সত্যিসত্যিই স্বীকার করতে বাধ্য হই যে "দি ফল" হ'ল এমন আটটি এক কথাশিল্প—যা সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যের মোড় ফিরিয়েছে, যা মানুষের মনের দিগন্তে এতদিনকার এক রুদ্ধ দ্বার নতুন ক'রে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। এই উপন্যাসের জন্যই কামু ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। কিন্তু আলবেয়ার কামু এখনো যদিও নবীন, তাঁর অনুপম সাহিত্যসৃষ্টি পরিণত স্তরে এসে উন্নীত হ'লেও পরিণতির মাঝামাঝি পর্যায়েও রয়েছে এখনো তা আসে নি। তাঁর নিকট থেকে সারা পৃথিবীর সাহিত্য রসিক পাঠক সমাজ আরোও অনেক কিছু আশা করেন। এখনো তিনি আরো অনেক নতুন জিনিস সৃষ্টি করবেন, সাহিত্য-জগতে অনেক স্বর্গের টিকানা তিনি হয়তো আরো জানিয়ে যেতে পারেন।

আলবেয়ার কামুর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই আর একজন প্রখ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিকের কথা মনে আসে, তিনি হলেন আঁদ্রে জাইড। বস্তুতঃ আঁদ্রে জাইডকে না জানলে আলবেয়ার কামুর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না, আর আলবেয়ার কামুকে বুঝতে হ'লে, কামুর সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করতে হ'লে, আঁদ্রে জাইডের রচনা অবশ্যই পড়তে হবে। এই দুইজনের সাহিত্য-কৃতীর মধ্যে আশ্চর্য সংগতি বিদ্যমান্। জীবদ্দশায়ের মধ্যানুভূতির দুইজনই সার্থকভাবে জীবন্ত, আর মনে হয় একজন যেন আর একজনের সার্থক পরিপূরক। ফরাসী সাহিত্যে আঁদ্রে জাইডের স্থান অসামান্য। সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যেও তিনি অনেক নতুন সৃষ্টি সংযোজন করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে আঁদ্রে জাইড অন্যতম।

আঁদ্রে জাইড আর ইহলোকে নেই। গত ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আঁদ্রে জাইড ১৮৬৯ সালে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আইনজ্ঞ, বাড়ি ইংলেন্ড, তাঁর মা ছিলেন নরম্যান্ডির মহিলা, প্রথমে রোমান ক্যাথলিক পরে প্রোটেস্টান্ট হন। চিরদিনের সংস্কার-পন্থী মনির ম্যারেল, জাইডকে তাঁর ডেয়ারিপেপ পুস্তকে অভিযুক্ত করেছিলেন। ম্যারেলকে জাইড এরপরও জবাব দিয়েছিলেন, তা শুধু জাইডের আত্ম-বিশ্লেষণই মাত্র নয়, তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যুত্তরের বিশেষ প্রকাশও বটে।

জাইড তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে তাঁর বাল্যকালের কথা বলেছেন। তাঁর আত্মজীবনী—সীলে প্রেন মেমোর্ট—ডরথী বুসী ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। জাইড তাঁর 'ফর্গাল'এর বিভিন্ন অংশে, তাঁর প্রথম বই আঁদ্রে ওয়াল্টার-এর ডায়েরীতে ও তাঁর কয়েকটি গল্পে, বিশেষ ক'রে 'ইম্মরালিস্ট' কাহিনীতে নিজের কথা আরও সামাজ্যে ব্যক্ত করেছেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন—জাইডের পরিকল্পিত অনেক নায়কের চরিত্র-চিত্রণই যেন লেখকের বিবিধ রূপায়ন। কথাটার অর্থ উল্টো শোনালেও বলা চলে, যতই আমরা তাঁর সম্পর্কে পড়ি, ততই তাঁর বিষয়ে কম উপলব্ধি করা যায়। এই দিক থেকে তাঁর সমসাময়িক মারসেল প্রাউস্টের সঙ্গে জাইডের রয়েছে আশ্চর্য রকম বৈষম্য। প্রাউস্টের 'রিমেমব্রেন্স অব থিংস্ পাস্ট' পড়লে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে প্রাউস্ট তাঁর জীবনের ঘটনাগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক'রে সেখানে প্রকৃত চেষ্টা করেছিলেন, জাইডের পুস্তকসমূহ আমাদের মনে অন্যরকম ধারণা এনে দেয়। তিনি আমাদের যত নিকটে এসেছেন বলে মনে হয়, আসলে তিনি যেন ততই দূরে চলে গিয়েছেন। মারসেল প্রাউস্টের শিল্প-মন্ত্রে প্রকাশধর্মক, আর আঁদ্রে জাইডের শিল্প কাহিনীর অন্তরালে নিহিত।

জাইড ছাত্র হিসেবে মোটেই ভালো ছিলেন না, প্রায় বরাবরই তিনি ক্লাসে সকলের শেষে থাকতেন, অথবা তিনি কোন না কোন সাহিত্য-গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট থাকতেন। তাঁর জীবনের বাইরের ঘটনাবলী, শুধুমাত্র তাঁর ভ্রমণের ব্যাপার ছাড়া, খুব বেশি উল্লেখযোগ্য নয়। জাইডের ব্যক্তির কোনও প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি।

আজকে বুঝতে চাইলে মনে রাখতে হবে যে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বিদকে উপলব্ধির কথা মনে হচ্ছে এবং সেই ব্যক্তিত্ব এই প্রবল যে তিনি আসলে যা, তাই তাঁর সার্থক স্বরূপ এবং তিনি যা হতে চান না—সীলে প্রেসকমেন্ট—গ্রন্থে জাইড নিজেই তাঁর নীতির কথা ব্যক্ত করেছেন।

"আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথিবীতে এমন কোন কাজ করতে হয়, যে কাজ আর কারও কাজের মত নয়। সুতরাং সাধারণ নিয়মে আবদ্ধ থাকায় সকল প্রচেষ্টাই আমার মতে শুধু প্রচারণার

নামান্তর, তাঁ, আর প্রচারণা এবং যে আত্মা কখনো মানুষকে ক্ষমা করে না আর যা ব্যক্তিত্বের প্রতি মহাপাপ তুল্য।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা স্বাধীন মূল্য আছে—এ নীতিতে যিনি আস্থাশীল, তাঁর মতে কোনো মানুষকে বীর ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাঁকে কোন এক গোষ্ঠীতে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টার নামান্তর এবং সেই ব্যক্তি বিশেষে যে একমত বা সে মতের পরিপোষক, তা প্রমাণ করা শুধুমাত্র সময়ের অপচয় নয়, তা সকল প্রকার বিচার বিবেচনার মিথ্যা বিরুপণ। সংঘ ও ধর্মমত থেকে বন্ধনহীনতা জাইড সম্পর্কে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয়। তাঁর একজন সমালোচক যেমন একথা মন্তব্য করেছিলেন :

'জাইডের সকল প্রচেষ্টা হ'ল মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেওয়া—আত্মকেন্দ্র থেকে মুক্তি, নিয়মানুবর্তিতা, সংস্কার, স্বভাব ও রীতি নীতি, সকল কিছুর বন্ধন থেকে মুক্তি ; চিরতরে মুক্তি—অনির্দিষ্ট না-জানা পথে মোক্ষাকর যাত্রা। সমস্তকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হবে, প্রতি মুহূর্তেই মন যেন থাকে আনন্দের উল্লাসে ভরপুর। বিনা দ্বিধায় ও বিনা সঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতে হবে পৃথিবীর পথে। ফলের কথা মনে না করে, কাজ ক'রে যেতে হবে। শুধু কাজের উপলক্ষেই, শুধু আনন্দের উদ্দেশ্যেই কাজ ক'রে যেতে হবে। এই হ'ল আঁদ্রে জাইডের নীতির মূল্য কথা।'

জাইডের মতবাদ ও নীতি সম্পর্কে অনেক ভুল আলোচনা, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তাঁর আন্তরিকতা, তাঁর বীর ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করার সাধু প্রচেষ্টা, তাঁর আত্মপ্রকাশের সততা এ যুগের পক্ষে কষ্টকল্পিত মনে হয়েছে, যে যুগে এলিয়টের কথায় বলতে গেলে—আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে পলায়নীবৃত্তিই প্রবল।

জাইডের প্রথম গ্রন্থ হ'ল 'দি ডায়েরীস্ অব্ আর্সে-ওয়ালটার।' গ্রন্থকারের অতৃপ্তির কাহিনী প্রায় উপন্যাসের মত করে ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, লেনো রীটারস্ টেরেস্ট্রেস্ (দি ফ্রুট্স্ অব্ দি আর্থ) কে বলা চলে তাঁর সমস্ত গ্রন্থমালার প্রাথমিক ভূমিকা হিসেবে। এই গ্রন্থে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে বিস্ময়কর সম্ভাবনা রয়েছে তারই প্রকাশ ব্যক্ত করেছেন। সকল নিয়মকে তিনি এখানে অস্বীকার করেছেন, বৌদ্ধ'আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আবেগ ও উচ্ছ্বাস যার ভিত্তি নয়, সে সকলকে অনায়াসে নিঃশেষিত হওয়ার কথা বলেছেন।

আবেগের উদ্দেশ্যে এই যে আবেগের প্রেরণা' তাও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ইম্মরেলিষ্ট'-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। জাইডের মতে এ যেন মরুভূমি অঞ্চলের আপেল, যা তিক্ত, আর যা তৃষিতকে পীড়া দেয় কঠিনভাবে। 'সোনালী বাগুচরে তারা নয় সুষমাবিহীন।'

১৯০৭ সালে মেরেটুর দ্য এল-এক্সেপ্ট্ প্রভীন (দি রিটার্ন অব প্রডিগ্যাল সান) প্রকাশিত হয়, এ পুস্তককে বলা চলে 'ফ্রুট্স্ অব দি আর্থ' গ্রন্থেরই পরিপূরক অংশ। জাইডের মতে, 'প্রথম আরম্ভেই এ সকলকে উপলক্ষ ক'রে আমি যা ব্যক্ত করতে চেয়েছি তাও আমার আদর্শের অনুপাতে যথেষ্ট নয়।

জীবন ও ধর্মের মধ্যে যে সংঘর্ষ তা ব্যক্ত হয়েছে 'প্যাস্-টোরেল সিম্ফনি' গ্রন্থে। 'দি কেভস্ অব্ দি ভ্যাটিকান' অধিকতর ভাবগভীর। বৈরাগ্যের আতিশয্যে নৈতিক ব্যাখ্যা এতে ব্যক্ত হয়েছে। জাইডের পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, 'দি কয়নারস্' ও 'দি কর্পাল্স্'। নিখুঁত শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে পূর্ণতর সম্ভবতঃ বর্তমান শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। মেটের কনভারসেশন্স্, উইথ এক্সারম্যান ও মন্টেগের রচনার আন্দ্রিন ও' ব্রাইয়েন কৃত ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে কর্পাল্স্-এর তুলনা করা হয়েছে। এগুলো হ'ল জাইডের সর্বশেষ অভীপ্সা ও মতবাদের পরিচায়ক।

ফরাসী দেশের সাধারণ শিল্পীকুল যেমন-তেমন নগরে বসবাস করতেন। মলিয়ের, রেসিন, ভলতেয়ার, হিগো প্রভৃতি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তা কার্যকরীভাবে মনোলোক থেকে বেরিয়ে আসার ও সেই জগতে প্রবেশ করার উদ্যম পথই বন্ধ রেখেছিল। এমন কি আনাতোল ফ্রান্সের শিল্প-সৃষ্টির মধ্যেও বাইরের জগতের ছায়াপাত কম। আঁদ্রে জাইডই প্রথম অতীতের ব্যাপক পরিসরে রেখাপাত করেন। আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর সব বই, তাঁর সৃষ্ট গ্রীক কাহিনীর পুনরুজ্জীবন, নীটশে সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় পাঠ, তাঁর কৃত ব্লেক, কনরাড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবিধ রচনার অনুবাদ ফরাসী সাহিত্যের ধরাবাঁধা, চিরাচরিত পথ থেকে নতুনতর বিষয়ের সূত্রপাত করেছে।

প্রায় বয়ঃপ্রাপ্তির হয়েই তিনি অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে নানা জ্বালাময়ী নিবন্ধ রচনা না ক'রে, নানাভাবে প্রচারকার্য না চালিয়ে, আধুনিক সভ্যতার মূল ভাবগত বিষয় সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি করে আঁদ্রে জাইড মানুষের সার্বজনীনতা বিষয়ে মূলগত তথ্যাদির সন্ধান দেবেছিলেন। বিস্কয়ার আরবজাতি, কঙ্গোর নীগ্রো সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের হিন্দু, আমেরিকাবাসী, ইংরেজ, গ্রীক, জার্মান এঁরা সকলেই আঁদ্রের দৃষ্টিতে ছিলেন সারা বিশ্বের ব্যাপক পরিবেশে একসূত্রে গ্রথিত। এই ব্যাপকতা থেকে কেউ একজন ব্যতিক্রম হ'লে সমস্ত সমন্বয়টুকুই হবে ব্যাহত, এই ছিল তাঁর বদ্ধমূল ধারণা।

বর্তমানে ফরাসী সাহিত্য, ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়ে যা ছিল, তার তুলনায়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। জাইডই সর্বপ্রথম বিভেদের প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

'কয়নারস' গ্রন্থে জাইড বলেছেন—উপন্যাসকে একটি সার্থক সংগীতের মতো ক'রে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাসমূহের বিন্যাস করতে হবে নিপুণভাবে সকল দিকের সংগতি অক্ষুণ্ণ রেখে। জাইড-সম্পর্কে বলতে গেলে না ভেবে আমি পারি না যে তিনি নিজেই যেন ছিলেন একটি পরিপূর্ণ শিল্পের প্রতীক। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমনি সব বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আকস্মিকতা থেকে সহসা কখনো উদ্ভূত হয় না। তাঁর চিন্তাধারার ছিল সুসমঞ্জস সংগতি, যা মনগড়া নয়, সম্পূর্ণভাবে জীবন্ত। কিন্তু তাঁর ধর্মমতের জন্য তাঁকে হয়তো অন্য কিছু বলা যেতে পারে ; তাঁর ব্যাপকতা, তাঁর তীব্রতা, তাঁর প্রবল চিন্তাধারার প্রভাবগুণে তিনি চিরদিন শক্তিমান্ ও অসাধারণ কাব্যধারার সার্থক বাহক।

ছন্দ-চতুর্দ্দশীর কবি মোহিতলাল

প্রশান্তকুমার রায়

'ছন্দ-চতুর্দ্দশী' মোহিতলাল মজুমদারের বিভিন্ন সময়ে বিরচিত সনেটগুলির একটি সংকলন গ্রন্থ। কবির প্রথম জীবনের প্রথমতম কাব্যগ্রন্থ 'কোরক-মঞ্জরী'ও গুটি কয়েক সনেটের সংকলন। সে গ্রন্থ বিশেষ প্রচারিত হয়নি বলে সাধারণ পাঠকের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। এই প্রবন্ধে কবি মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী' গ্রন্থের আলোচনা করবার আগে সনেটের রূপ ও প্রকার ভেদ সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

বাংলাভাষায় সনেটের প্রথম রূপকার কবি শ্রীমধুসূদন। মধুসূদনের ইংরেজী-ভাষা প্রীতিই মধুস্রাক্ষরের মত সনেট রচনাতেও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—এ অতি পরিচিত কথা। কেবলমাত্র একটা নতুন কিছু আমদানী করবার মোহেই নয়, সনেটের প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে মধুসূদনের কবি-মানসের একটা গভীর-যুক্ত সম্বন্ধ ছিল। তা যেমন শিল্পিক উপাদানকে শাসন করে এবং ভাব ও ভাবনাকে সংহত, ঘনীভূত করে গড়ে তুলবার সহায়ক হয়, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত গঠন-কৌশলের জন্যটিও কম আকর্ষণীয় নয়। 'A sonnet is a moments' monument' ; সেই moments monument' গড়বার মূলে কবি-কর্ম্মের পেছনে চিন্তাভাবনার কারী-গরী বিশেষই মধুসূদনকে সনেট রচনায় আকৃষ্ট করেছে বটে, কিন্তু বিচিত্র ভাব ও কল্পনার উপাদান হাতে নিয়েও তিনি সার্থক সনেট-কবি হতে পারেননি ; পরিমিত হিসাবে এক্ষেত্রে বঞ্চিত হ'য়ে রইলেন। সনেটের নিখুঁত আঙ্গিক রচনা করা তখন সম্ভবও ছিল না। মধুসূদনের সামনে বাংলা সনেট বলতেও যেমন কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, তেমনি সনেট রচনার প্রাথমিক লক্ষণ যে পদবন্ধ রচনা—মূল অর্থে স্তবক গঠন—তারও কোন যথার্থ নিদর্শন ছিল না। পয়ার ছন্দে চালাও বর্ণনার উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যেই সে যুগের কবি-কর্ম্মের লক্ষণ। মধুসূদন ঐ উচ্ছ্বাসকে সংযত করলেন বটে, কিন্তু সনেট রচনার আরেকটি যে বিশেষ প্রেরণা প্রয়োজন, সেই আবেগের প্রচণ্ডতা, তাঁর রচনাকে ঘনসংবদ্ধ করে তুলতে পারেনি। আবেগহীনতায় ঘাঁকে কোন কিছু দিয়েই পূরণ করা যায় না। মধুসূদনের প্রচণ্ড আবেগের সেই তীব্রতা যেন মেঘনাদবধ কাব্যেই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। 'বীরাঙ্গনা'তে অবশ্যই তীব্রতা আছে, কিন্তু সেখানে সংগীতগুণাশ্রিত আবেগের রসরূপ—যা সনেটে প্রাণসঞ্চার করে তার নিদর্শন নেই ; নাটকীয় কাহিনীর চমৎকারিত্বই সেখানে পরিস্ফুট। সনেট রচনার ব্যাপারে মধুসূদনকে এক রকম পাথরভাঙ্গা থেকে ইমারৎ তৈরীর সব কাজগুলিই একাকী করতে হয়েছে। ফলে ইতালিয়ান বা সেক্সপীরীয় সনেট বা উভয়ের বিভক্তরেখা কোনটিই তাঁর সনেটে পূর্ণাঙ্গ রূপ-রূপ পায়নি। কেবল বহিরঙ্গরূপ সনেটের একটা আদল বা স্থূলরূপ তিনি বাঙ্গালী পাঠকের চোখের সামনে খাড়া করলেন এবং ওরই সাহায্যে বাঙ্গালীর কাছে একজাতীয় অভ্রান্তপূর্ব নতুন ধ্বনি বাহিনে শোনালেন। মধুসূদন বাংলা কাব্যে সনেটের রূপ-বৈভবের সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সুর ও ধ্বনির বিশিষ্ট ঝঙ্কারটি আনবার দিকে তেমন উৎসুক ছিলেন না ; ফলে আমি বা ইতালিয়ান সনেটের অন্তর-ব্যঞ্জনার রহস্যটি ভুলে যাওয়া সম্ভব হলনা। মধুসূদন তাঁর সনেটগুলির নামকরণ করেছিলেন 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' ; এই নাম নির্ব্বাচনের মধ্যেই আপাততঃ যে অর্থ প্রকাশমান, সেই অর্থেই অর্থাৎ ঐ চৌদ্দ অক্ষর ও চৌদ্দটি লাইনের কথা-বুনোটের মধ্যেই তাঁর কবিতার জন্ম ও পরিণতির পরিচয় আছে কিন্তু ভাববিকাশের তেমন কোন অবকাশ নেই।

সনেটের আত্মা স্বতন্ত্র। গঠন কাঠামোটি ঐ চৌদ্দ অক্ষর ও চৌদ্দ লাইনেরই বটে কিন্তু এটা রীতি মাত্র। এই রীতিকেই বড় করে দেখার ফলে সনেটের বাংলা নাম 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' করা হয়েছে। সে দিক থেকে এই পরিচয়—এই নাম নির্ব্বাচন—অসঙ্গত নয়। কিন্তু রীতিও আত্মা এক জিনিস নয় ; রীতিকে বাদ দিলেও সনেটের আত্মার ছন্দ-বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না ; এই জন্যে ঐ জাতীয় কবিতায় ব্যঞ্জনাসৃষ্টির ব্যাপারে যে সংগীতধর্ম্ম প্রধান হ'য়ে ওঠে 'সনেট' নামটি—তার যথার্থ পরিচয় বহন করে বলেই আধুনিক কালে ঐ নামটিই বাংলাভাষায় পদ্য ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু সনেটের ঐ আত্মাটি কি পদার্থ? এবং সেই আত্মার বিকাশের ব্যাপারটাই বা কেমন? যে রীতির কথা বলা হইয়াছে সেই রীতির সঙ্গে আত্মার মিলন প্রক্রিয়ার স্বরূপটিই বা কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই খাঁটি সনেটের গঠনধর্ম্ম ও প্রাণধর্ম্মের পরিচয় নিহিত।

যে-কোন বস্তু বা ভাবই সনেটের উপাদান হতে পারে। এ জাতীয় কবিতায় সুখদুঃখ আনন্দব্যথার যে-কোন ভাববস্তুই স্থান পেতে পারে। তেমন রচনা অর্থাৎ যে-কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে সনেট রচনার নিদর্শন অথৈই আছে। বিষয়কে বিশেষ দৃষ্টিতে অন্তরঙ্গভাবে দেখার উপরেই রচনার গুরুত্ব নির্ভর করে। তবে একথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে ঘটনা প্রধান বিষয়বস্তু সনেটের গুরুত্বকে লঘু ক'রে তোলে ; অন্ততঃ সে আশংকা প্রায় ক্ষেত্রেই সত্য হয়ে দেখা দেবার সম্ভাবনাই প্রবল। ঘটনার সংঘাতে ভাব বিচ্ছিন্ন হতে পারে, অথবা ঘটনার নিজস্ব চমৎকারিত্বে ভাব ম্লান হতে পারে। ভাবের গাঢ়ত্বই সনেটের প্রাণধর্ম্মের পরিচায়ক। এই জন্যে সনেটে কাহিনীর স্থান গৌণ। কাহিনী যেখানে উপলক্ষ্য সেখানে কাহিনীর রূপও স্বতন্ত্র, সঙ্গীত রস থেকে তা আলাদা ; অথচ সনেটের মধ্যে ঐ সঙ্গীত গুণধর্ম্মটি থাকা না থাকলে চলে না। সনেটের আদি উৎস সঙ্গীতই বটে—প্রেম সঙ্গীত। এমন কিছু ভাব মানুষের কল্পনায় আসে না যা বস্তু-নিরপেক্ষ। নিরালম্ব ভাব বলে কোন

কিছু ধারণায় আসে না। কিন্তু বস্তুকে বা ঘটনাকে প্রাধান্য দিলে সনেট-কারের মূল উদ্দেশ্য যে ব্যাহত হয়, তা ই অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে; এমন কি কখনো কখনো অতি উৎকৃষ্ট ভাব সম্বন্ধ সনেট ব্যর্থ হয়ে যায়। কবিতা হিসাবে তা যতই মনোরম হোক, সনেট হিসাবে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবেই। বিশেষ একটি ভাবকে গভীর করে তুলতে গেলে অন্যান্য সহকারীভাবেরও উপস্থিতি প্রয়োজন অর্থাৎ ভাবের দিক থেকে একটা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রয়োজন আছেই। তা না হলে কোন ব্যঞ্জনাই গাঢ়তর হয় না। আশা, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা ইত্যাদি ভাবগুলির মধ্যে কবি যেটিকে বেছে নেবেন তার দ্বন্দ্বস্তরের সেইটি হবে মূল সুর। অন্যান্য ভাবগুলির কোনটিকেই স্বতন্ত্র করে চেনা যাবেনা। তারা কেবল মূল ভাবের বিকাশে সহায়তা করে। ভাবের এই বিকাশের এ পর্যন্ত মোট দুটি প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে—ইতালিয়ান ও সেকস্‌পীরীয় এবং এই দুয়ের কতগুলি মিশ্ররূপ।

সনেটের প্রথম আটটি চরণে যে কোন ভাবের উদ্বোধন, শেষ ছটি চরণে ঐ ভাবের পরিণাম। কেহ কেহ এই দুই পদবন্ধকে যথাক্রমে আসক্তি ও মুক্তি নামে পরিচিত করাবার চেষ্টা করছেন। এই নাম ভাবের অর্থজ্ঞাপক মাত্র। এই ভাবপ্রকাশের রকম ফের অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করতে পারে। কখনো তা একটা বর্ণনা মাত্র, কখনো সংবোধ, কখনো মন্তব্য মাত্র, কখনো বা একটা কিছু সম্পর্কে গভীর প্রতিতি মাত্র হ'তে পারে। মোহিতলালের একটি সনেটের প্রথম লাইন এই রকম :—

'হৃদয় আবেগে যদি কিছু কর জীবনের কোন পরম ক্ষণে
দুঃখ যে তার সহিতেই হয় নিত্যদিনের সহজ মনে।'

নিছক ব্যঞ্জনার দিক থেকেও ভাবের আসক্তি ও মুক্তি এই রকম ভাগ করা কঠিন। বরং বলা যেতে পারে ভাবের উত্থাপন ও ভাবের উপসংহার। সে উত্থাপনের সঙ্গে আসক্তির যোগ থাকলেও পারে, নাও থাকতে পারে এবং ভাবের আকাঙ্ক্ষার মুক্তি বা নিবৃত্তির লক্ষণও যেমন থাকতে পারে, অতৃপ্তি বা হতাশা বেদনাও মধুরতর গভীরতর রসের সৃষ্টি করতে পারে। আসক্তি ও মুক্তির তত্ত্বটি সনেটের কোন মূল প্রকৃতির পরিচয় বহন করে না।

এই যে অষ্টক ও ষট্‌কের কথা বলা হল এর মধ্যেও সূক্ষ্ম ভাগ আছে —অষ্টকের দুটি চতুষ্ক, ষট্‌কের তিন লাইনের দুটি ভাগ। এই ভাগগুলির প্রতি পর্য্যায়ে যথাক্রমে ভাবের উত্থাপন, বিস্তার, প্রসাদ ও প্রতিষ্ঠার ধারা আছে। মোট কথা, এই ভাগগুলির প্রয়োজন ভাবকে বিভিন্ন স্তর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গভীর থেকে গভীরে নিয়ে যাওয়া, আদি পেত্রার্কীয় সনেটের রীতিই এই। সেকস্‌পীয়র সনেটের এই কাঠামোটি গ্রহণ করেননি। আট ছত্রের ভাগও মানেন নি। অবশ্য তিনিও মোটা প্রধান ভাগ স্বীকার করেছেন,—প্রথম ভাগে বারো ও শেষ ভাগে বাকী দুটি মিলিস চরণ। পেত্রার্কা ও সেকস্‌পীয়রের কতগুলি মিশ্ররূপ পাওয়া যাবে ইংলণ্ডের বহু প্রসিদ্ধ সনেটকারের রচনায়। মিল-বিন্যাসের রীতিও বিভিন্ন। সনেট রচনার পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য একই—ঐ বিশিষ্ট ভাবের গভীরতা সকার সংশ্লিষ্ট রসের অভিব্যক্তি।

কবিতার ক্ষেত্রে সনেটের যে স্থান, গদ্য কথা-সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের কলপ্রতিও অনেকটা তাই; তফাৎ শুধু এই যে ছোটগল্পের গল্পবিন্যাসের তারল্য বা লঘুতা, চাপল্য বা দ্রুততা সনেটে অনুপস্থিত। কিন্তু ছোটগল্পের সেই চারুত্ব, সংক্ষিপ্ত পরিবেশে পূর্ণতার স্বাদ, moment৪ monument সৃষ্টির মহিমা, ভাবসঙ্গতি ও পরিণামে ব্যঞ্জনার অনুরণন সনেটধর্ম্মীই বটে।

মাইকেল বাংলা পয়ার ছন্দকেই সনেটের উপযুক্ত বাহন মনে করেছিলেন। এই নির্বাচন অতি সুসঙ্গত হয়েছে। চৌদ্দ মাত্রার এই ছন্দে একদিকে যেমন সঙ্গীতগুণ বর্ত্তমান, অন্যদিকে ধ্বনি-সাম্যার্থের স্বাভাবিকতায় ভাবের গুরুত্বকে প্রকাশ করতে সক্ষম। বাংলা বাক্‌বিধিতে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, সেই অভাব পূরণ করেছে সুরের মাধুর্য। বস্তুতই প্রাচীন পয়ারের বাংলা কাব্য সুরাশ্রিত গেয়-কাব্য বলেই পরিচিত। পয়ার ছন্দের সঙ্গীতগুণ এমনিই যে চৌদ্দমাত্রার পয়ারকে ১৬, ১৮ কিম্বা আরো বেশী মাত্রায় বাড়িয়ে তুললেও পয়ারের প্রাণহানি ঘটেনা। তা না ঘটুক, অক্ষরসম মাত্রাধিক্যের মত সনেটে পয়ারের মাত্রাধিক্যও অনেক সময়ই ভাবকে উচ্ছ্বাসপ্রবণ করে তোলে। সে অবস্থায় সনেটের গাঢ়বন্ধতা লিরিক উচ্ছ্বাসে শিথিল হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

মধুসূদনের পরবর্তী বাংলা কাব্য সাহিত্যে সনেট-কবি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল, প্রমথ চৌধুরী এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের কেহই খাঁটি সনেট-কবি নন। কেউ সনেটের কাঠামোটি যথাযথ রেখেছেন, কেউ ভাববন্ধকে বজায় রাখতে গিয়ে রীতিকে বিসৃষ্ট হয়েছেন। তবে, সনেট নামে কথিত ঠাদের অধিকাংশ রচনাই লিরিকগুণসমন্বিত উৎকৃষ্ট কবিতা হিসাবে সার্থক হয়েছে। অবশ্য অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন অন্ততঃ কয়েকটি যথার্থ সনেট রচনা করে থাকবেন। রীতির দিক থেকে যেমনই হোক, প্রমথ চৌধুরীর সনেটে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধির মারপ্যাঁচই সমধিক আকর্ষণীয়। সেখানে ব্যঞ্জনার কোন বালাই নাই। রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলিকে সনেট না বলে সনেটকল্প বলাই ঠিক। তিনি চৌদ্দ লাইন ও প্রতি লাইনে চৌদ্দ অক্ষর সাজিয়ে যে কবিতাগুলি রচনা করেছেন তাতে ভাবের চারুত্ব আছে এবং তা অনিন্দ্যসুন্দর হলেও তাতে সনেটের কারিগরিও যেমন নেই, ভাবের দ্বন্দ্ব এবং ভাবের ঐক্য বা প্রতিষ্ঠা অনুপস্থিতই থেকে গেছে। বাংলার আদি সনেটের সার্থক রূপকার মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর 'দ্বন্দ্ব-চতুর্দ্দশী'র সনেট-গুলি এমন একটা পরিচ্ছন্নতায়, মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত যা তাঁর পূর্ব্ব-সূরীদের সনেটে পাওয়া যাবেনা। সনেট রচনার ব্যাপারে মোহিত-লাল তাঁর আত্মীয় দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেটগুলি থেকে সাক্ষাৎ প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। মোহিতলালের সনেট সংখ্যারও যেমন বহু, বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যও বিস্তর। প্রকৃতি ও প্রেমের ভাববস্তু, প্রসিদ্ধ কোন

ঘটনা বা কাহিনীর কি দৃঢ় প্রতিষ্ঠারই মানুষ তাঁর সনেটের উপাদান : আবার কখনো বর্তমান ইতিহাস পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন, কখনো আত্মগত বেদনা বা প্রেমের বস্তুসত্যকে জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রসিদ্ধ বিদেশী সনেট-রচয়িতার বহু সনেটের তিনি এমন সুপরিকল্পিত কবিত্বময় ভাষান্তর করিয়াছেন যে অনুবাদ অপেক্ষা রচনার সৌন্দর্য সেখানে মৌলিক বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই অনুবাদের ফলে একটা বড় কাজ হ'য়েছে এই যে, বিদেশী সনেটের উচ্চ আসনের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে বাংলা সনেটের সমাবস্থীতার পৌরে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে এবং বাংলা ও বিদেশী সনেটের তুলনামূলক একটা বিচার বোধও আমাদের জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সনেট রচনার ক্ষেত্রে মোহিতলাল আরেকটি কাজ করলেন—ইংরেজীতে যাকে Sonnet sequence বলে, বাংলায় 'সনেট-পঞ্চাশৎ' নামে সেই বিদেশী রীতির আমদানী করলেন। মূল ভেবনা একটিই এবং সেই ভেবনাকে একাধিক সনেটের সহায়তায় ভাবের একটা সুডৌল মূর্তি দেবার কৌশল এই জাতীয় সনেটে লক্ষ্য করবার বিষয়। আলাদা-ভাবে পড়লে এক একটি সনেট একরকমভাবেই পূর্ণ ; আবার সনেট পঞ্চাশৎগুলি অনুধাবন করলেও সবগুলির মধ্যে দিয়ে একটি মাত্র ভাবের জোরনাই বড় হয়ে যাবে। এই সনেট-পঞ্চাশৎ রচনায় কবিকে সংযম ও নিষ্ঠার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। ভাবের কিছুমাত্র শৈথিল্য ঘটলেই বা একাধিক ভাব প্রধান হয়ে উঠলেই সনেট তার পরম ঐশ্বর্যে মাধুর্য এবং বলা বাহুল্য সে অবস্থায় পাঠকের মনেও কোন রসসঞ্চার উদ্দীপ্ত হতে পারেনা। অতি সতর্কতার দিনাবেষাকিক যথার্থ বলি যোজনা না করলে রচনা প্রায় ক্ষেত্রেই শ্লথতা হারিয়ে ব্যর্থ হতে পারে। এই সনেট-পঞ্চাশৎ রচনায় মোহিতলাল যথেষ্টরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চতুর্দশপদী কবিতা-চতুষ্টয়ের মধ্যে রচনা সনেট-পঞ্চাশৎ ভঙ্গীতে বিভক্ত—দ্রৌপদী, দুর্গোৎসব, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্কিমচন্দ্র, ডন্সাট ক্রুক, কবি-মাতা, এক আশা, বঙ্গ-নন্দিনী, নির্ঝর ও যাত্রাশেষে। দ্রৌপদী নামীয় সনেটের বিশ্লেষণে এই আলোচনার সহায়ক হতে পারে।

দ্রৌপদী মহাভারতের বহু আলোচিত চরিত্র—পঞ্চসতীর একজন। নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পৌরাণিক একটি সংস্কার পাঠকের মনে জেগে ওঠে। কবি প্রথমেই সে সংস্কারের মূলে নাড়া দিলেন :

তোমায় স্মরিলে লাজে মরি যে, পাঞ্চালি !
পঞ্চস্বামী-গর্ব যার সে কি আর সতী !
তবু 'পরে মম চিত্ত—সকলেই পতি,
নির্দ্বিকার—সমভাব—সতীত্বের ডালি :—

এ এক বিস্ময়। যে একনিষ্ঠতার আদর্শ সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ভজনায় সে আদর্শ প্রহেলিকার মতই মূল্যহীন :

তাই সে ভারত-কাব্যে পৌরব প্রশ্নালি'
উত্থাপিলে বীরমুখে নায়িকা-বুদ্ধি।'—

দ্রৌপদীর পক্ষে যে কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল, কবি অবশ্যই তার একটা যাথার্থও উপস্থিত করেছেন :

নর-নারী, প্রেম তোমা করেছে প্রণতি
দূর হ'তে—তুমি তারে তর্জ্জনী সঙ্কেতি'
করেছ বিদায়। ধীরের সহধর্ম্মিণী
তুমি শুধু—নারী-ধর্ম প্রেম সে কোথায় ?

যে সংশয় কবিতার প্রথমেই রেখা বিরেছিল, ক্রমেই তা যুক্তি ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ভজনার মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব যেহেতু নারী-ধর্ম যে-প্রেমকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে দ্রৌপদীতে তা ছিলনা। কিন্তু দ্রৌপদীর মনে যদি তেমনি ভালবাসার জোয়ার যদি আসতো, বাধা ছিল কি তা হলে—:

তা' হলে পারিতে তবু হে বরবর্ণিনি,
লভিতে সতীত্ব-খ্যাতি—দুখ্যাতির প্রায় ?—

কবি এখানে নিঃসংশয় হয়েছেন—দ্রৌপদী প্রকৃতপক্ষে কাউকেই ভালবাসেনি :

কারে বাসনি ভালো হে পঞ্চবহ্নিনী,
তোমার সতীত্ব সে যে কেবলি বৃথায় ;

এর পরে সনেটের দ্বিতীয় পর্যায়। দ্রৌপদী যে মূলে নারী এবং পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জুনের প্রতি তাঁর দুর্বলতা যে কিছু বেশী ছিল কবি মাত্র সেই সূত্রটুকু অবলম্বন করেই দ্রৌপদী চরিত্রের সত্য ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন :

তবু কবি—সত্যদর্শী ঋষি-সুত যিনি,
ব্যাস যে বিশ্বাসবুদ্ধি, প্রণমি তাঁহারে—
একটু কলঙ্ক ঢালি' সতীত্ব-প্রভায়
করিলা তোমারে তবে মানব মোহিনী ;—

এই ভাবনাটিকে প্রমাণ দেবার পেছনে নিশ্চয়ই কবির প্রমাণ আছে :

বেদনা কাব্যময়ী মানব-গেহিনী।
অর্জ্জুনের ভালবাসা—পাপ-পঙ্কিলায়
টানিতে চরণ চলে স্বরূপ-সীমায়—
সেইটুকু সত্য তব জীবন-কাহিনী।—

কিন্তু এই প্রমাণ জীবন সত্যের এক পিঠ, অন্য পিঠে—

পার্থ ফিরে' চেয়েছিল বক্ষে তুলিবারে—
মৃত্যু পরাহত সেও, মনটা দুর্ব্বল।
কৃষ্ণ-সখা ! শীতা বস্ত্র তুলি' একবারে
লভিলে এ কি এ গতি ?—সকলি বিফল।
এ কি চিত্র—বঙ্গ কবি ! স্বর্গের দুয়ারে
কেমনে মুছিল অশ্রু !—মানব হিয়ার।

সনেট পঞ্চাশৎ

দুটি পর্যায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল। নারী ও প্রেম এবং নারী প্রেমের সৌন্দর্য সনেটের ভাববস্তু। যিল বিন্যাসের কৌশলটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে ই ও ঈ-কারও শব্দ ছাড়া আর যাত্র একটি যিল আছে 'আর' ভাগান্ত। দ্বিতীয় ভাগে সে ছাড়া আরও একটি যিল—

দুর্বল, বিকল এবং বিহ্বল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সনেটের মিলে সমধ্বন্যাত্মক যা হলন্ত মিল যেমন ঘরণে মর্মান্তিক ছায়ায় তেমনি দুবাদিক মিলে মিলগুলি খুব স্পষ্ট ও যথার্থ না হলে প্রয়োগের সার্থকতা নষ্ট হয়। অবশ্যই—যুক্ত ব্যঞ্জনের মিলে—ভাবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেতে পারে। সে যা হোক উদ্ধৃত সনেটে বক্তব্যের স্পষ্টতা যেমন আছে, ভাবানুসারী আবেগের ছন্দ রীতিটিও সঙ্গীতগুণে মণ্ডিত। যৌক্ত মাত্রার পয়ারে আট ছয়ের পর্ব ভাগটি স্পষ্ট, কেবল অষ্টম লাইনে আট ছয়ের বদলে ছয় আটের ব্যতিক্রম দেখা যায়—'করেছ বিদায়। বীরের সহধর্মিণী'। মোহিতলালের সনেটে কোন কোন স্থানে এই ব্যতিক্রম দেখা যাবে। এর উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। ভাব, অর্থ ও ধ্বনিকে কানে ও প্রাণে বাজিয়ে তুলবার জন্য এও একটি কৌশল বিশেষ। বিরাম চিহ্নগুলি ও অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সনেটের ঐ সব অংশ পাঠ করলেই ব্যতিক্রমের উপযোগিতা বোঝা যাবে। সনেট ও লিরিকের গোত্র আলাদা, সুতরাং সনেট পাঠের সময় মনকে উচ্ছ্বাসকে সংযত রাখার শিক্ষা চাই। অনেকে, এমন কি যারা কবিতা রচনা করেন তাদেরও পাঠকরা নয়ই জন, কবিতা পাঠ করবার উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন না। 'স্বপ্ন-সঙ্গিনী' সনেট থেকে অষ্টকের অন্তর্গত ঐ জাতীয় আরেকটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা যেতে পারে :

হে অপ্সরী! একদিন ছন্দের টঙারে
স্বপ্ন-ধনু ভঙ্গ করি,' বেগবশে জিনি'
লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বিনী
স্বয়ংবর-মালা ; কি রহস্য কব কারে?—
স্বর্গ নটী হল বধূ! আকুল খুঙ্কারে—
সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
না ফুরাতে মন্ত্রপাঠ কেন কেন বুঝিনি—
কার লাগি পুষ্পসম ঝরিলে ভূঙ্গারে!—প্রতি লাইনে

আট ও ছয়ের পর্ব ভাগ, কেবল চতুর্থ লাইনে ব্যতিক্রম—ছয় ও আট। এই রক্ষিত ব্যতিক্রম ছন্দের গাঢ়ত্ব ও সৌন্দর্য সঞ্চারের সহায়ক। পয়ারে এই জাতীয় ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথে দুর্লভ নয়।

গিয়াছে আশ্বিন। পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিস-পত্র বড়বড়ি করে—
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে, ও ঘরে। (যেতে নাহি দিব)

'দিদি' সনেটে :...ছয় ঘট লয়ে মাথে,

বাম কক্ষে থালি, যার বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর। জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

'কাব্য' সনেটে : তবু কি ছিলনা তব সুখ দুঃখ যত

আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আঘাতেরি মত
হে অমর কবি? ছিল না কি অনুক্ষণ

রাজসভা-ষড়যন্ত্র, আপনার গোপন?—উদাহরণের উদ্দেশ্য এই যে পয়ারে পরারাদিই অসল কথা এবং সে ভাগও ছন্দ-স্পন্দ রচনা (রীতি কবিতার নির্দিষ্ট পর্বভাগে যেমনটি হয়) না করে অর্থানুসারী ছেদের সীমা নির্দেশ করে মাত্র।

মোহিতলালের সনেটের বাক্‌বিধির মধ্যে এক জাতীয় নাটকীয়তা চোখে পড়বে। এই ভঙ্গী তার অন্যান্য ছোট বা বড় কবিতাতেও আছে। প্রকৃতপক্ষে মোহিতলাল ক্লাসিক-ধর্মী কবি—সনেটের রচনাতেই হোক, রীতিকবিতা রচনাতেই হোক—তাঁর সে পরিচয় অতি স্পষ্ট। বর্ণনা ঘটনা ও ভাবের সংঘাত যেমন প্রবল তেমনি একটি সুকুমার পেলব বাঞ্ছাময় ব্যাকুলতা কবিহৃদয়কে আদ্যন্ত জুড়ে আছে অথচ দুই সমাগ। প্রবল মমতা ভাবের এবং বিশেষ করে মোহিতলালের সনেটে সেই মমতাটা তীব্র, অথচ সংযম রক্ষিত আবেগে কায়া প্রদৃষ্টি পরিগ্রহ করেছে। কবি-আত্মা সনেটে যেমন বিশুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠাত হয় লিরিকের বিলাস-কলা-কুতূহলে তেমনটা সম্ভব নয়। কিন্তু অতিরিক্ত সংযমতার বিপদও আছে। কবির মুক্ত বাধিত আত্মা সংযত সংহত ঘনীভূত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ভাবকে একটা চরমান্তে উপস্থিত করতে পারে এবং পাঠকের ভাবনার উপরে সে তত্ত্বের স্বরূপ বোঝার মত ভারী দু'রে রস প্রস্ফুটনে বাধা সঞ্চার করতে পারে। এই অবস্থায় অনেক সনেটের শেষ দুটি লাইন বর্ণনার ও ভাবের স্বাভাবিক বিস্তারকে পরিষ্কার করে নীতিকথা বা দর্শনের স্তরে নিষ্প্রভ-কৌলুকী হয়ে ওঠে। মোহিতলালের কাণ এত সজাগ যে সে রকম কোন বিপদপাত তাঁর কবিকর্মে ঘটেনি। তিনি সনেটের সুরসঞ্চারী মূল ধর্মটি ভাল করে ধরতে পেরেছিলেন।

এবারে তাঁর সনেটের কাব্য সৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। অংশ বিশেষ তুলে কাব্য সৌন্দর্যের উদ্ঘাটন সম্ভব নয়, কারণ সনেটের কোন অংশই যেমন পৃথক নয়, পদে পদে চরণে চরণে পৃথগ্‌ভাবের তেমনি মিল বিন্যাসের ক্রিয়া কাওটি সমগ্র চৌদ্দলাইনের মধ্যে এমন ভাবেই পরস্পর নির্ভরশীল যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলে কাণে কিছুতেই সঙ্গীতগুণ ধ্বনিত হতে পারেনা, ভাবও প্রাণকে স্বভাবতই ফাঁকী দেবে। তবুও অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে ভাবের ও মিলবিন্যাসের ব্যবধান থাকায় যে কোন একটি ভাগকে অর্থগত সৌন্দর্যের উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা সম্ভব।

সনেটের মধ্যে কবি মোহিতলালের প্রাণপুরুষের যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা যেমন খাঁটি ও অকৃত্রিক—তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ ব্যর্থতার একান্ত পরিচায়ক অন্যান্য কবিতার তেমন নয়। আত্মগত ভাবাবেগ ছন্দের কঠিনতর রীতি-নিগড়ে—সনেটে—এমনই দৃঢ়বদ্ধ যে কবি-আত্মার দীর্ঘ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত পাঠক শুনতে পান। লিরিকে আবেগের উচ্ছ্বাসে ছন্দঝঙ্কারে তরঙ্গায়িত ছন্দ স্পন্দের সমকে ঠমকে অনেকাংশেই সেই আত্মগত পরিচয়টি মধুময় বা মনোরম হতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক সত্য

রূপ পায়না, সুরের মত শোনায়না। প্রেমকে অবলম্বন করেই আধি সনেটের জন্ম; মোহিতলালের সনেট প্রেরণার মূলেও ঐ প্রেম, ভালবাসাই প্রধান। তাঁর সমগ্র কবি জীবনের মূল চেতনা ঐ প্রেমের সাধনা: ভালবাসি ভালবাসা—তোমারে ত নয়!

তোমারে বাসিলে ভাল হইত অমর
জীবনের সুধাভাণ্ড মৃত্যুক্ষিত মুখে
মূর্ত্তিমান পূর্ণা যেন পরাইত বুকে

মোহিতলালের কবিতার একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের পরিচয় আছে। যে কোন শ্রেষ্ঠের কবির কাব্য প্রেরণার পেছনেই বিশিষ্ট দর্শন বর্তমান। ঐ দর্শন রস রূপের মধ্য দিয়ে পাঠকের উপলব্ধিতে পৌঁছায়। মোহিতলালের অন্যান্য কাব্যে যৌবন, নারী সৌন্দর্যও ভালবাসার সমন্বয়ে কবিমানসের যে রূপ ফুটে উঠেছে সনেটে তার অনেক খানি স্পর্শ থাকাই স্বাভাবিক। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে নারী তার রূপ-রস-রঙ নিয়ে একদিকে যেমন মানব দেহিনী মূর্ত্তিতে উপস্থিত অন্যদিকে সে-নারী যে মানবের দেহ প্রাণবিনীও তার পরিচয়ও স্পষ্ট। সনেটে নারী সত্তা তাৎপর্যময়ী। দেহ রূপ ও প্রেম কবিমানসের যে পরিমণ্ডল গঠন করেছে সনেটে তার প্রকাশ কেমন?—

নারি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি।
যে চাহে বুঝিতে শুধু বহুলের রীতি,
নাই প্রেম, আছে শুধু নিরর্থ-জিজ্ঞাসা—
সেই হয় সে যে বৃথা বেহুলার বধূ! (এক আশা—২)

মোহিতলাল একথা বলেছেন—যেহেই অমৃত-ঘট আত্মা তাঁর কেন অভিমানু। কিন্তু সে আত্মার আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি নিছক দেহ-কেন্দ্রিক নয়:

পরশ-পিয়াসে মোর নিশি-জোছনায়ী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে—খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপ লক্ষ্মী! নয়ন-পথুরে
সে লাবণ্য নিমু সব এক কালে শুষে!
যে-অমৃত পিপাসায় করিনি লুণ্ঠন—
হেরিব, গোপন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি'!

* * *

আমার কামনা-দূরে হয়নি ত' ম্লান
তোমার অলক গোড়ী মদিরা-মদুরী
তবু তব ওষ্ঠে নাই আবেশে শিহরী'—
উন্মাদ-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান;
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান
সেচিতে ও রূপানল সাদা বিভাবরী! (ঐ—৩)

সৌন্দর্যকে স্বামী দেখবার আকাঙ্ক্ষা যৌবনের ধর্ম, কিন্তু অধির বিদ্রূপের মতই যৌবন বেইমানের নয় এবং বলেই তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র। মোহিতলাল যৌবন-স্বামী রূপস্রষ্টারিক কবি। অন্যান্য কবিতায় তার সে পরিচয় উগ্র মধুর কিন্তু সনেটে কোমলতায় স্নিগ্ধতায় গভীর:

হায় নয়! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন!
উর্ব্বশী চাহেনা প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে যে তপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন!

উদ্ধৃতিগুলি থেকে কবির রূপমুগ্ধতা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাবে। প্রেম ও সৌন্দর্য ছাড়াও জীবন জিজ্ঞাসার অন্য দিক আছে। মোহিতলালের সনেটে সে সবের সমাবেশেও কিছু কম নেই। কিন্তু সব ছাপিয়ে তার রূপস্রষ্টারিকতা। যখন তাঁর উদ্ধৃতম স্বরে পাঠকের অনুভূতিতে প্রতিফলিত হয়। নির্ব্বেদ সনেটটি উপলব্ধির কাছে লাগানো ছেড়ে পারে। এই সনেট পরম্পরাটির পর্যায় ক্রম ভিন্ন। প্রথম পর্যায়টি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে তৃতীয় স্তবের ষট্‌ক মাত্র উপহার দেওয়া হচ্ছে। কবির প্রেমে যে দেহ আত্মার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর তার পরিপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তর এখানেই পাওয়া যাবে। মোহিতলালের কবি-মানস পরিক্রমার এই 'নির্ব্বেদ সনেট-পরম্পরাটি অন্যতম প্রধান অবলম্বন বলে ধরে নেওয়া যায়। সনেটটির আংশিক উদ্ধৃতি এই—

তুমি চলে' গেছ, তবু বসন্তে আজিও
বিরহ জাগে না আর; মুকুল মুকুলা
পুনর্ণবা বনবীথি করেনা উতলা
সে দিনের মত। নয়নের এ পানীয়,
এত রঙ, এত রূপ পিও, পিও, পিও—
স্নেহের কোকিল সাধে; ইঙ্গিত-চপলা
মাধব-সন্ধ্যার ছায়া জাগে সত ছলা,
ব্যর্থ সবই—তৃষাহীনে কি করে অমিয়?
তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি;
প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তা'রি সাথে!
চাঁদ নাই জ্যোৎস্না আসে!—অন্ধ অমা রাতে
বিরহ-ব্যাকুল রহে ঘরে অবগাহি'!
সে বিরহ নাই মোর, মৃত্যু-পথ বাহি'
চলে গেছি প্রিয়া বেলা—কি আছে আমাতে?

এবার সেই তৃতীয় স্তবের ষট্‌ক:

একদা যাচিনু তোমা যৌবনের সখে—
আজ করি ক্ষুব্ধ আয়ু ক্রুদ্ধ ক্ষোভে তার;
চুম্বন করেছি লভি' মৃত্যুর প্রাকার
তব ওষ্ঠ বহ্নিময়, ধূম্র-অবসথে!
ছোক দেহ ভস্ম-শেষ আজি হেন মতে—
কামের অজ্যোষ্টি-অগ্নি পুত সে আমার!

যৌবনবাদী কবির কাব্যচেতনার মূল নির্যাস এই বাণীগ্রন্থে বিধৃত। এর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

সাহিত্য-সাধক অমরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত

সকলেই জানেন কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক ১৯১৩ সালে 'ভারতবর্ষ'-মাসিকপত্রটির সৃষ্টিসম্ভাবনা পরিকল্পিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার প্রথম সংখ্যাটিও দেখিয়া যাইবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। তবে 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যাটি কবি-লিখিত যে সূচনার বাণী লইয়া সর্ব-সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ছিল এই কয়েকটি অমূল্য কথা—

"আমরা যেন আত্মসম্মানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া, সাহিত্যের সুপ্রশস্ত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে আমাদের আর জগতের দ্বারে সম্মান ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সম্মান দ্বারে আপনি আসিয়া পৌঁছিবে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল পরিকল্পিত সেই 'ভারতবর্ষে'ই অমরেন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে'র জন্য আমরা এককালে অতি আগ্রহের সহিত উন্মুখ হইয়া থাকিতাম। আজ মনে হইতেছে দ্বিজেন্দ্রলালের উপরি-উদ্ধৃত কথা-গুলি বাস্তবিকই যেন অমরেন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যজীবনে সর্বতোভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সাহিত্যকে কেহ বা পেটের জন্য পেশা হিসাবে, কেহ বা সখের জন্য নেশা হিসাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহিত্যকে জীবনের ব্রত হিসাবে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে বাস্তবে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ একালের সুবিধাবাদী কর্মকুশল চতুরগণের চোখে তো 'ব্রত' বা 'ধর্ম' প্রভৃতি শব্দগুলি উপহাসের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন যেমন রাজনীতিকে তাঁহার ধর্মের অঙ্গ-রূপেই অবলম্বন করিয়া দেশের হিসাবী মানুষদের কাছে 'ভাবপ্রবণ' আখ্যা পাইয়াছিলেন, অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাতেও কতকটা ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাবপ্রবণতা যদি তাঁহার না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আজ যথেষ্ট বিত্তশালী হইয়া উঠিতে পারিতেন ও সাহিত্যের একজন ধুরন্ধর কর্ণধার বলিয়া গণ্য হইতেন। কারণ, নিজেরা দরিদ্র হইলেও মনের মাপকাঠিতেই আমরা গুণের মর্যাদা দিয়া থাকি।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া 'ভারতবর্ষে'র সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকর', রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ,' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন,' দ্বিজেন্দ্রনাথের 'ভারতী,' রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা,' সমাজপতির 'সাহিত্য' ও চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' প্রভৃতি—ইহাদের প্রত্যেকের জন্ম ইতিহাসের মূলে একই উদ্দেশ্যের উদ্দীপনা দেখিতে পাওয়া যায়। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'বাণী,' 'মানসী,' 'প্রবাহিনী,' 'মুকুলদর্পণ' ও 'সুবর্ণ,' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং সমালোচন-সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই কথাই দেশকে বারংবার স্মরণ করাইয়া গিয়াছেন। 'বাঙ্গালী,' 'বাঙ্গক' ও 'হিন্দুস্থান' প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনেও ঐ আদর্শই তিনি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। যেখানেই কোন অসঙ্গতি, স্ব-বিরোধিতা, অসামঞ্জস্য, দুর্নীতি বা আদর্শচ্যুতি তাঁহার নজরে পড়িয়াছে, তা সে সাহিত্যেই হৌক বা সমাজেই হৌক, সেখানেই দেখিতে পাই তিনি সেই বিষয়ে ও মিঃসঙ্কোচে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—এ নীতি তিনি কোন দিনই মানিয়া চলিতে পারেন নাই।

বাঙ্গলার দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীমদ্দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পুলকসিংহ আশুতোষকে একসময়ে কারণে-অকারণে দেশের কোন কোন শক্তি-শালী দলবিশেষের হস্তে কম নিগ্রহাদিত হইতে হয় নাই। চিত্তরঞ্জনের কোন এক সুবিখ্যাত অভিভাষণ লইয়া বাঙ্গলার কোন কোন সাময়িকপত্র এমন কি তাঁহাকে চৌর্যাপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। সেদিন এই 'ভারতবর্ষে'ই পৃষ্ঠায় অমরেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের কোথাকার কোথা হইতে যাহা যাহা কতকগুলি একই জাতীয় সুভাষিত-সংগ্রহ যদি লোকলোচনের সম্মুখে আনিয়া না ধরিতেন, তাহা হইলে মনে হয় চিত্তরঞ্জন বিনাদোষেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি ও চিন্তানায়কদের রচনার সহিত অমরেন্দ্রনাথের যতখানি পরিচয় ছিল, সাহিত্য-আলোচনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ততখানি পরিচয় আর কাহারও দেখায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সেই কারণেই 'বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ,' 'সমালোচনাসংগ্রহ,' 'বাঙ্গালা রচনাভিধান,' 'বিচিত্র চিত্রসংগ্রহ,' প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্কলন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সেই জন্যই অনেক বিদেশী মনীষাসম্পন্ন লেখকেরও প্রমাণক উক্তির ভুল ত্রুটি তিনি সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশ সমাজপতির গোষ্ঠিভুক্ত হইলেও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা ও সুবোধদর্শনই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি যেভাবে 'বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ প্রেম ও জাতীপ্রীতি' অথবা 'শিখিল নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' লিখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার সমালোচন-সাহিত্যে তাহার তুলনা মিলিবে না। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে দেশীয় মনীষীগণের বিভিন্ন মতবাদ যাচাই অনুসরণ করিয়া, সেগুলির ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইয়া সেগুলির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিতে করিতে তাঁহার স্বকীয় বিচারভঙ্গী অতি সরল ও সরসভাবে সত্য-নির্ধারণের পথে অগ্রসর হইত।

বাঙ্গলা ভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহাই যে বাঙ্গলা সাহিত্য—একথা তিনি স্বীকার করিতেন না। আর সাহিত্যে যদি দেশীয় বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বিশ্বসাহিত্যে

তাহার যে স্থান থাকিবে না—এমন অদ্ভুত ধারণাও তিনি পোষণ করিতেন না। কারা দুর্ভেদ্য বা অবোধ্য হইলে যে উহাদের হইতে হইবে—একথা তিনি স্বতঃসিদ্ধবৎ মানিতেন না। বস্তুতন্ত্রের মানে যা দলস্থ বিশ্লেষণের অনুযায়ে কুশাগ্র-তীক্ষ্ণদৃক কারণে, তাই তাহার রচনারীতির নিখুঁত ছোঁক না কেন, তিনি কুশাগ্র ছাড়া আর কিছুই আঁকিতে পারিতেন না। মানব-জীবনের নিখুঁতত্বের আদর্শের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ ছিল বেশী। তাই প্রেমের মর্ম ও মনস্তত্ত্বগত অন্যান্য আদর্শের যাহা কিছু বিপরীত, তাহার প্রতি তাঁহার ঘৃণাও ছিল অত্যন্ত প্রবল।

আমাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, আমাদের সৌহার্দ্যের ধারাবাহিকতা যাহাতে বিলুপ্ত হইয়া না যায়, অমলেন্দুবাবুর সাহিত্যসাধনার ইহাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। অনেক 'লুপ্ত রত্ন' উদ্ধারে, 'প্রবাসের', 'চণ্ডীদাস নির্ণয়ে' ও 'ইন্দ্রাণী গুপ্তের সম্বন্ধোদ্ধারে, 'পাঠশালাবলী'র সম্পাদনায় ঐ লক্ষ্যই ছিল তাঁহার মূল প্রেরণা। অনুরূপ প্রেরণার বশেই তিনি বর্তমান যুগের বহু কবি ও মনীষী এবং স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের জীবন কথা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিকভাবে 'মণীষা মন্দিরে' নামক গ্রন্থাবলীর সপ্তখণ্ডে 'সপ্তর্ষিনিলয়ে' রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অমলেন্দুবাবু প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন সমালোচক। তাঁহার রচনার উজ্জ্বল-অপেক্ষা বিচার-বিশ্লেষণের মাত্রাই থাকিত বেশী। অন্য তাহাতে শুষ্কতা, জটিলতা, যান্ত্রিকতা, মূলবিলাস বা সাহিত্য-প্রকাশের চেষ্টা কোথাও থাকিতনা। সুস্পষ্ট-চিন্তা পরিমিত ও সুনির্বাচিত শব্দের সাহায্যে অতিযাত্ত্ব হইয়া অপরূপ প্রসাদগুণে তাঁহার রচনাকে সাহিত্য-রসিক করিয়া তুলিত। তাঁহার রচনায় তাঁহার প্রকৃতিই প্রতিফলিত হইত।

বহুকাল পূর্ব হইতে 'অর্চনা' বলিয়া একটি মাসিক সাহিত্যপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি এবং তাঁহার অগ্রজ ৺কবি কালীপ্রসন্ন রায় 'অর্চনা'র লেখকমণ্ডলীর অন্যতম নিয়ামক রূপে ছিলেন। মনে পড়ে এক ইতিহাসবাবুর সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে দিয়াই তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূচনা। বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের বহু প্রতিষ্ঠিতযশা লেখকদের সমাগমে তাঁহাদের বাসার বৈঠকখানা একরূপ মুখরিত হইয়া থাকিত। তাঁহার সাহিত্যসাধনা ও সমগ্র জীবনের ক্ষেত্র আজো প্রসারিত হইয়া উঠিলেও, এবং চিরচেনা জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে আঘাত ও বিসর্জনের বহু দুঃখময় পালা অভিনীত হইয়া থাকিলেও, তাঁহার সাহিত্য জীবনের আদিকালের সেই স্মৃতিকথা বঙ্গসাহিত্যের পুরাতন লেখকগণের অন্তরে মনে হয় কাহারও কাহারও মন হইতে আজো মুছিয়া যায় নাই।

আর কিছু নয় অনামিকা মোর

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

নীলমায়া-ঘেরা দূর দিগন্ত, সোনালী রোদ,
শিশির-মেশানো শুড়শুড়ি-দেওয়া উতুরে লঘু হাওয়া।
শান্ত, উদার, সুনীল আকাশ—কী অনুরোধ,
চেয়ে থাকা শুধু, কাঙাল নয়ন—শুধু চাওয়া, শুধু চাওয়া।

হেমন্তিকার কনকাঞ্চল রয়েছে পাতা,
শিউলিঝরা মাঠ নীরব, নিথর, সুপ্ত, স্বপনাতুর;
সূর্য্য-কিরণে আশিস্-স্নাতা বসুধা মাতা,
আকাশে-বাতাসে দিগ্‌দিগন্তে শান্তি ইমন-সুর।

ভালো লাগে এই সোনালীর মায়া একাকী বসি,
শ্যামা জননীর শ্যামল স্নেহটি সোনার ঘানাতে বাঁধে;
রাখালিয়া বেণু পুলক আনিছে শ্রবণে পশি',
নব পউষের পটের লিখাতে বিগত অতীত কাঁদে।

জীবনে আমার নব রূপায়ণ হঠাৎ একি!
আমার স্বপন সোনায় ফলে যে মাটির ছেলের মত,
জীবনের এই নতুন লেখাটি আজিকে দেখি,
সোনায় পউষ, নতুন জীবন—পতবল শত শত।

নতুন দুটিটি প্রকৃতির পটে, আমারো তাই,
সোনায় ফসলে ভরিল যে আশা, অপরূপ—অভিনব।
এই আনন্দ, কাঙালের ধন—আর কি চাই,
আর কিছু নয় অনামিকা মোর, মধুর হাসিটি তব।

যুদ্ধোত্তর জাপান

শ্রীঅমলকুমার ঘোষ

সুযোগের দেশ জাপান। এই দেশ শিক্ষাদীক্ষায় শিল্প-বাণিজ্যে ও সামরিক শক্তিতে প্রাচ্যে ভূমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলে পরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই জাপানের নৌশক্তি পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রেছিল। পূর্ব-এশিয়ার হঙ্কাইডো, হনশু, শিকোকু ও কিউশু এই প্রধান চারিটি দ্বীপ সমেত মোট ১৩০৯টি দ্বীপ নিয়ে জাপান সাম্রাজ্য। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে জাপানের লোকসংখ্যা ৭৩ কোটি ৮১ লক্ষ; এরই মধ্যে দেশের অধিবাসী হ'য়ে তাই জাপানকে জানবার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সুযোগ এলো। আমরা দেখলাম, বিভিন্ন বঙ্গ সাময়িক পত্র সঙ্ঘ, জাপান প্রত্যাগত শ্রীঅমিয়কুমার বসু, বার-এট-ল, মহাশয়ের রাজনৈতিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও পূর্ব ভারতে নেতাজীর প্রভাব সম্পর্কে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশিদের সভায় বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পক্ষে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্যোক্তা "সাপ্তাহিক বিশ্বভারতী" কর্তৃপক্ষ কলিকাতার এ, টি, ফিল্ড ইনষ্টিটিউশন ভবনের দ্বিতলে একটি প্রশস্ত কক্ষে সভার আয়োজন করেছিলেন।

শান্ত পরিবেশ। শ্রোতৃবৃন্দ বেশ মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনেছেন। বক্তা সুপণ্ডিত ও অভিজ্ঞতাবান ব্যক্তি। সুপুরুষ, সৌম্যমূর্তি, চোখে মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ব্যক্তিত্ব ফুটে রয়েছে—যেন পারিবারিক ধারাকে পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আজকের পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকাই হ'চ্ছে সব চেয়ে বড় সমস্যা। স্বাধীনতা-উত্তরযুগে ভারতবাসী যেখানে অন্নসমস্যাকে বহুলাংশে সমাধান করতে সমর্থ হয়নি, সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমরের বড় ও চরম আঘাত পেয়েও এই স্বল্পকালের মধ্যে জাপানবাসীরা তাদের অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে। শ্রীবসু বলেন, আমি অন্নতঃ স্বচক্ষে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে যেখানে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত সবার জোটে না, এমন কি সপ্তাহে একদিন মাছ খাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে বা আদৌ মাছের স্বাদ উপলব্ধি করেনি, এরূপ শিশুর সংখ্যা যেখানে বহুল—সেক্ষেত্রে জাপানের প্রত্যেক অধিবাসী গড়ে আনুমানিক চার আউন্সের মত মাছ আহার করে। কারণ জাপানীরা পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় মাংস আহার করে না, ঐ মাছ থেকেই তারা তাদের প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জাপানীরা আমাদেরই মত ভাত খায় এবং জাপানে ধান্য উৎপাদন প্রচুর হ'য়ে থাকে। জাপানের উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এবং জাপানের প্রায় ২০ লক্ষ লোক মৎস্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। তারা স্থলে হ'তে মাছ ধ'রে এনে জাপানের বাজারে মাত্র আট আনা সের দরে ঐ মাছ বিক্রয় করে।

জাপানে পোষাকের প্রাচুর্য আছে। জাপানের ঢাকাঘাটে, অফিস আদালতে—এককথায় পারিবারিক জীবনের বাহিরে প্রায় সব পাশ্চাত্য রীতির চূড়ান্ত প্রচলন। পথে ঘাটে কোন জাপানী মহিলা বা পুরুষের বেশভূষার পারিপাট্য দেখে পশ্চিমের কোন দেশ হলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে জাপানের রাজধানী টোকিও নগরে। বলতে গেলে টোকিও নগর একটি "কসমোপলিটন্ সিটি"। কিন্তু এই বহিঃপ্রকাশ জাপানীদের সত্যকারের রূপ নয়। আর্যরা জীবনে জাপানীরা তাদের রীতি পুরোপুরি রক্ষা করেছে। আজও প্রত্যেক জাপানী গৃহে প্রবেশ করতে গেলে, জুতো খুলে মসৃণকে, বড় জোর একজোড়া চটী পরে প্রবেশ করতে হয়। প্রত্যেক জাপানীরা আজও ঘুমিয়েই শয্যা গ্রহণ করে থাকে। চেয়ার-টেবিল, খাট-পালঙ্কের প্রচলন নেই বললেই হয়। এখানে একটা কথা না বলে পারছি না, দেশিদের সভায় কিন্তু যেখানে সভরঞ্জি পেতে আমাদের বসার ব্যবস্থা হ'য়েছিল এবং অনেকেই মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তিবোধ করছিলেন। সেটা যে চেয়ার-টেবিলে বসে অভ্যাসের সমস্ত কাজ করার অভ্যাসে—একথা অবশ্য সভার শেষে দু-একজন প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর জাপানী বাসস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীবসু বললেন, এই বিষয়টায় ওদের একটা সমস্যা রয়েছে। জাপানী বাড়ীগুলি অত্যন্ত ছোট ছোট, এগুলি ভূকম্পনের হাত হ'তে রক্ষার জন্য কাঠ বা পিচ্‌বোর্ড দিয়ে তৈরী হয়। আমাদের যে ঘরে সভানুষ্ঠান হ'য়েছিল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সেটি ১৩'×১২' ফুট (আনুমানিক) হবে। ঐ ঘরটি চারিটি জাপানী ঘরের সমান। সুতরাং এই উপমা থেকেই জাপানের স্থান সমস্যা উপলব্ধি করা যায়।

এরপর জাপানকে জানতে হ'লে, জাপানের "কিয়োটো" শহর পরিদর্শন করা দরকার। "কিয়োটো" শহরের সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক শোভার জন্য ইহাকে প্রাচ্যের "রোম" বলা হয়। তিনি বলেন, এখানে একশত বৌদ্ধ মন্দির আছে, এবং প্রত্যেকটি দেবমন্দির সংলগ্ন একটি করিয়া সুন্দর পুষ্পোদ্যান রহিয়াছে। জাপানীদের সৌন্দর্যপ্রীতি ও রুচিবোধ কতখানি তা এখানে দেখা যায়।

জাপানীরা মূলতঃ জাতীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাপানবাসীই স্বীকার করে যে, তাঁহারা ধর্মগ্রহণ করিয়াছে ভারতের নিকট হইতে এবং কৃষ্টি লইয়াছে চীন হইতে—সুতরাং এই দুই দেশবাসীর সহিত জাপানবাসীর অন্তরের যোগ রহিয়াছে।

জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পরীক্ষা পর্যন্ত জাপানী ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশের মত ইংরাজী-প্রীতি উহাদের নাই, জাপানে সর্বাপেক্ষা প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রটী

—জাপানী জাহাজেই প্রচারিত হইয়া থাকে এবং উহাই সর্বাপেক্ষা প্রচারশীল পত্রিকা। উহারই একটী ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় মুখ্যতঃ বিদেশীদের জন্য এবং উহার প্রচার সংখ্যা মাত্র ৩০ হাজার।

অধিকাংশ জাপানবাসী ভারতবাসীর নামের সহিত মোটামুটি ভাবে পরিচিত। তাঁহারা জানেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ রাধাকিষাণ পাল ও চন্দ্র বোস (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জাপান-বাসীদের নিকট শ্রীচন্দ্র বোস নামেই অধিক পরিচিত)। তবে পণ্ডিত নেহরুর জাপান-ভ্রমণের পর কিছু জাপানবাসীর মুখে তাঁর নামও শোনা যায়।

এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম 'নোবেল প্রাইজ' পুরস্কৃত হওয়ায় এবং তদ্ভিন্নতর দু-দুবার জাপান ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথকে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অন্যতম বিচারকরূপে জাপানীদের পক্ষে রায় দেওয়ার ও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের আপবিক বোমার বিরুদ্ধে "হিরোসিমা" ও নাগাসাকির নিরস্ত্র নরনারীদের আত্মার শান্তি কামনায় ও তদ্বিরুদ্ধে ঐরূপ বুলেটের প্রতিবাদে প্রতিবৎসর যে শান্তি সম্মেলন আহূত হয় তাহাতে ভারতের প্রতিনিধিরূপে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কয়েকবার যোগদান করায় তাঁহাকে জাপানবাসীরা অন্তরে আসীন করিয়াছে। তাছাড়াও কোরিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের নেতা নেতাজী সুভাষকে তাঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। জাপানে সামরিক বিভাগেও নেতাজীকে দেশপ্রেম এবং সৈনিক জীবনের আদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে বরণ করা হয়। ভারতবাসীদের পক্ষে এখন পর্যন্তও নেতাজীর যেখানে উপযুক্ত মূর্তিস্থাপনার ব্যবস্থা হয় নাই সেক্ষেত্রে জাপানে তাঁহার মূর্তিস্থাপনার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। ইহা আমাদের লজ্জার কথা। আমরা বরঞ্চ শান্তির বাণী প্রচার করিয়া ফেরা, জাপানীরা যে এশিয়ার সংস্কৃতি রক্ষায় আমাদের চেয়ে কর্মতৎপর এরূপ বহু প্রমাণই "শ্রীবসু" লক্ষ্য করিয়াছেন।

আজকের জাপান শিল্পোন্নতিতে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয়স্থানীয়। প্রকৃতপক্ষে জাপানে কুটীর শিল্প এত সমৃদ্ধ ও প্রসার লাভ ক'রেছে যে, তাতে জাপান—যদি শিল্প ঐ সকল উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে জাপানে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসতে পারে। আপার কথা, ভারত, জাপানের সহিত শিল্প ও বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়েছে এবং ভারতের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকটী "লোকোমটিভ" ইঞ্জিন এবং চাটা উল কোম্পানীতে একটী ওয়ারহেড,দেশ জাপান থেকে সরবরাহ করা হ'য়েছে।

জাপানে চুরিট অফিসের কার্যের তিনি খুব প্রশংসা করেন। জাপান সরকার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনেকগুলি অমলাল বক্তৃতার টেপ-রেকর্ড "শ্রীবসু"কে বিদায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

জাপানে, মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে। জাপানের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সমাজতান্ত্রিকদল ঐ নির্বাচনে জয়ী হ'তে পারে বলে আশা করা যায়। জাপানে ছাত্র আন্দোলন খুব সুসংগঠিত এবং তার প্রভাবও খুব। জাপান প্রতিরোধী সামরীকে সমর্থন করে।

নেতাজী জীবিত আছেন কি? এ প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর দিতে "শ্রীবসু" অস্বীকার করেন। তবে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত "নেতাজী অনুসন্ধান কমিশন" ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, যে কারণেই হোক—বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করেন নাই।

পরিশেষে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই এশিয়ায় সংহতি ও ঐক্য পরিপালী করা প্রয়োজন। তাই আজকে এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানবার দিন এসেছে।

এর পর অন্যান্য নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়, বক্তার সঙ্গে। বক্তার এইরূপ নিরপেক্ষ ভাষণে সকলেই প্রীত হইয়া উচ্চ প্রশংসা করেন। বিদায়কালে কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা খুশী মনে সেদিনকার মত বিদায় নিলাম। মনে মনে বলিলাম —মহাপ্রভু জাপান তোমাদের সাথে গলায় গলা মিলিয়ে আমরাও আওয়াজ তুলি, এশিয়া শুধু "এশিয়াবাসীর জন্য।"

গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনা

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা করিতে হইলে প্রথমতঃ তিনটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সেই তিন তিনটী হইল কর্মপন্থা, অর্থ সংগতি ও পরিকল্পনাকে রূপ দান করিবার জন্য সরকারের ও জনসাধারণের সহায়তা।

আমাদের দেশ পল্লীর মধ্যে কতক বৈশাদৃশ্য থাকাতে কোন একটি বিশেষ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব না হইলেও গ্রাম উন্নয়নের জন্য একটি সাধারণ কর্মপন্থা নির্ধারিত করিয়া সেই সঙ্গে কোন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য তাহা স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা কোন গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সে সম্পর্কে তথায় সমালোচনা করিয়া সে সম্পর্কে তথায় সমাজ ব্যবস্থার কি কি ফলল বর্তমান, তাহাদের কারণ নির্ধারণ ও প্রতিকারের উপায় বিবেচনা করা কর্তব্য।

কৃষিকার্য সকল শিল্পের মূল, এবং জীবিকা রূপেও ইহা আদিম ও

লাভজনক। কৃষি শুধু আমাদের আহার্যই যোগায়, পশু বা শিল্পদ্রব্যও যোগায়। শস্য উৎপাদনের উপকারিতা সম্পর্কে কোনও অত্যুক্তি খাটে না—কারণ আমরা প্রথমে বাঁচিব পরে সুস্থভাবে বাঁচিতে শিখিব। যখন আমরা খাদ্য অপরিমাণ উৎপাদন করিব, তখন আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমে চোখে পড়ে ধনী সম্প্রদায়ের সমযে বসতি এবং পল্লীবাসীর দারিদ্র্য। পল্লীর দুর্দশা যে এই দুই-এরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং বাংলাদেশের পল্লীকে পুনর্গঠিত করিতে হইলে পল্লীর মরাগাঙে জীবনের সমৃদ্ধির স্রোত বহাইতে হইবে ও জনসাধারণকে পল্লীর মাঝে মাটীর বুকে ফিরিবারে মহামন্ত্রেই দীক্ষিত করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতি কল্পের নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমাদের কৃষক সাধারণের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সামান্য কতকগুলি উপায় নিম্নে বর্ণিত হইল। যেগুলি স্বল্প প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগীতাতে সফল হইতে পারে।

উৎকৃষ্ট বীজ

উৎকৃষ্ট বীজ বপনের সুফল সম্বন্ধে কৃষকমাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু অন্যদেশের কৃষিজীবীদের ন্যায় আমাদের কৃষকেরা ইহা জানিয়াও এ বিষয়ে যথারীতি যত্নবান নহেন। উৎকৃষ্ট বীজে অন্যান্য সকল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলেও সাধারণ বীজ অপেক্ষা দ্বিগুণপ্রতি ফসল অধিক হয়। অন্যান্য দেশে এই প্রকার গুণ সম্পন্ন বীজের ঘর ও চাহিদা অধিক।

তথায় এই বীজ বিশেষ যত্নের সহিত উৎপন্ন করা হয়, যাহাতে মিশ্রণের ফলে হীন গুণ না হইয়া পড়ে এবং বিক্রয়কালে এই বীজ নির্ভেজাল বপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যাইবে। এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হয়। আমাদের দেশের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পৃথকভাবে আমাদের জন্য যথেষ্ট জমি পাওয়া না গেলে বীজ ক্রয় বিক্রয় এক সমিতির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ইহার সভ্যেরা তাঁহাদের জমির একাংশে যে সর্বোৎকৃষ্ট ফসল তথায় জন্মায় তাহার বীজই উৎপন্ন করিতে পারেন, এইভাবে স্থানীয় বীজ সহজেই সকলে পাইতে পারিবে। তাহাতে একদিকে যেমন খরচ কমিবে অন্যদিকে চাষের সুবিধাও থাকিবে।

সার

কৃষির উন্নতির পক্ষে উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার যেমন একটি উপায় তেমনই অপর একটি উপায় উন্নততর সার প্রয়োগ। ইহা ছাড়া বর্তমান গো-মহিষাদির গোবরের নানাপ্রকার অব্যবস্থায় কৃষি কার্যে প্রয়োগের জন্য সারই পাওয়া যায়। সুতরাং ফসলের খাদ্য বা ইহার যথেষ্ট ব্যবহার হইতে পারে না। ফলে যে সকল ফসল আমরা নিতান্তই প্রয়োজনীয় জ্ঞান করি, যেমন ধান, পাট সরিষা ইত্যাদি শুধু তাহাদের ক্ষেত্রেই কিছুমাত্র সার প্রযুক্ত হয়। এইভাবে বহু জমিতে কেবল সারের অভাবে ফলন নিম্নতম অঙ্কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতএব ক্রমান্বয়ে ফসল উৎপাদন করিয়া যে সকল জমির খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া ফলন কমিয়া গিয়াছে তাহাদের পুনরুজ্জীবিত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখা কর্তব্য। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সার প্রয়োগ করিয়া যে তাহা করিবে এমন স্বচ্ছলতা আমাদের কৃষকের নাই। সুতরাং এজন্যে কাজে নামিতে হইবে—এবং তাহা হইতে পারে সমবায় কৃষক সমিতির মাধ্যমে।

অন্যতম আমাদের একটি প্রধান অন্তরায়। জমিতে যাহা কিছু জন্মায় তাহাই জমি হইতে আহার্য সংগ্রহ করে এবং ক্রমেই জমির খাদ্যভাণ্ডার সার না পাইয়া নষ্ট হইতেছে। আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থাতে সর্বত্র পাম্প প্রভৃতি যন্ত্রাদির বহুল ব্যবহার প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। তবে সমবায় সমিতির মাধ্যমে জলসেচনের জন্য জলাশয় খনন ইত্যাদি কার্যে হস্তক্ষেপ করা চলিতে পারে। এ বিষয়ে পল্লী অঞ্চলের জলসরবরাহের সম্পর্কীয় কর্মিদের নিকট হইতে আমরা সহায়তা লাভ করিতে পারি। এই জলাশয় সকল হইতে পানীয় ও সেচনের জল গ্রহণ করা যাইবে। এমনকি ইহাতে লাভজনক মৎস্য ব্যবসায়েরও সূচনা হইতে পারিবে।

আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষিত্র হলচালনা ইত্যাদি কার্যে প্রধানতঃ বলদই ব্যবহৃত হয়, ইহাদের চালনা বা আকর্ষণ শক্তির বৃদ্ধির জন্য গো-মহিষাদির উন্নতি করা প্রয়োজন। দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্যও গো জাতির উন্নতি কর্তব্য। দুগ্ধদান শক্তি বৈশৃঙ্খল পরম্পরায় গাভী লাভ করে সুতরাং গোজাতির উন্নতির জন্য জনক বৃষের প্রয়োজন।

গ্রামে প্রজনন কার্যের জন্য মহিষা যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে উৎকৃষ্ট জনক বৃষের পরিপোষণ চলেনা কিন্তু ইহারা যে কত মূল্যবান ও ইহাদের অভাব যে দুরূহ প্রসারী তাহা নিঃসন্দেহ।

অবাঞ্ছিত আগাছাগুলি নির্মূলন করিয়া অন্য কোথায় বিনষ্ট করা অপেক্ষা সুবিধাজনক ভাবে কম্পোষ্ট সাররূপে জমিকেই ফিরাইয়া দেওয়া লাভজনক। ইহা এক পক্ষে যেমন বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ নহে অন্যদিকে তেমন ব্যয়াধিক্যের আশঙ্কাও বিশেষ নাই। বরঞ্চ ইহাতে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, সমাজ সেবা সমিতি প্রভৃতির কর্মীবিগের সহায়তাই হইবে। বৃহদাকার ও কণ্টকিকাও বৃক্ষগুলি যাবে গাছ, গাছড়া ও উদ্ভিদ আবর্জনা পাতা সারে পরিণত করিয়া লাভজনক ভাবে কৃষিকার্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই প্রথায় অর্থনীতি এবং কৃষি উভয়ই রক্ষিত হয় ইহা চীন জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বহুল প্রচলিত। তথায় ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অত্যাধিক হইলেও বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয় না। তাহারা শুধু যে এইভাবে সার প্রয়োগ করে তাহাই নহে উপরন্তু একই জমিতে একাধিক বার ফসল উৎপাদন করে।

যে কোনও উপায়েই হউক কৃষির উর্বরতা যত দূর সম্ভব বাড়াইয়া সর্বাধিক ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহার জন্য কোথাও জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোথাও জলনিষ্কাশের, কোথাও বা উভয়েরই।

আমাদের সুবিবেচিত অভিমত এই যে প্রত্যেক কৃষকের উচিত তাঁহাদের কৃষিলব্ধ আয়কে অন্য কোনও শিল্প বা বৃত্তির সাহায্যে বর্দ্ধিত করা। ইহাতে একদিকে যেমন তাহাদেরও আর্থিক অবস্থা উন্নত হইতে পারিবে তেমন গ্রাম উন্নয়নের পথও প্রশস্ত হইবে। এইরূপে তাহারা সুতা কাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি আরম্ভ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া সম্মিলিত ভাবে অন্যান্য সহায়তার মধ্যে কল, তেলের কল ইত্যাদি স্থাপনের কথাও চিন্তা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে যুক্তি দ্বারা সাংখ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, ভাগবত মত খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে প্রথম হইতে ১১ সূত্রে সৃষ্টি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পঞ্চভূত হইতে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্নির পূর্ব্বে আকাশ সৃষ্টির কথা না থাকিলেও এবং বৃহৎ-আরণ্যকে আকাশকে অমৃত (সুতরাং অজ) বলা হইলেও তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে আকাশ সমুদ্ভূত হইয়াছিল ইহা আছে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু যদি না থাকে, তবেই ছান্দোগ্য, বৃহৎ-আরণ্যক ও মুণ্ডকের "ব্রহ্মকে জানিলে সকলই জানা হয়", এই উক্তি সার্থক হয়। আকাশ যখন ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ হইতে ভিন্ন প্রতীত হয়, তখন তাহাকে অজ বস্তুর বিকার বলিতে হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা আত্মাও তো আকাশ হইতে পৃথক। তথাপি আত্মা কোনও বস্তুর বিকার নহে। আত্মাকে নিত্য বলিলে তাহাকে বৌদ্ধদিগের মত শূন্যের বিকার বলিতে হয়। কিন্তু 'সৎ' আত্মার উৎপত্তি অসম্ভব। ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি রূপে অবিদ্যা হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ভ্রমের বিপরীত জ্ঞানে প্রলয় হয়।

১১ সূত্রে জীবের বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু নাই বলা হইয়াছে। আত্মা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আত্মা নিত্য। জীবাত্মার অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ (২।৩।১৭-১৮)। ১৯ হইতে ২৯ শ্লোকে আত্মা অণু-পরিমাণ, ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে। যেমে জীবাত্মার উৎক্রান্তি (শরীর হইতে গমন) এবং গতির (আগমন) কথা আছে। অনন্তের উৎক্রান্তি ও গতি অসম্ভব। জীবের পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন এবং দেহের সমান, ইহাও কল্পনা করা যায় না। সুতরাং জীব অণুপরিমাণ। শ্রুতিতে যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে, সেখানে পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। মুণ্ডকে (৩.১।৯) আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে জীবকে "বালাগ্র-শত ভাগের শত ভাগ" (৫।৯) বলা হইয়াছে। এক বিন্দু চন্দন দেহের এক ভাগে লিপ্ত হইলে যেমন সকল দেহে তৃপ্তির অনুভব হয়, তেমনি অণু-পরিমাণ আত্মার অস্তিত্ব সকল দেহে অনুভূত হয়। আত্মার অবস্থিতি হৃদয়ে। আত্মার অংশ নাই বটে, কিন্তু তাহার গুণ চৈতন্য সকল দেহে ব্যাপ্ত হয়, যেমন আলোক প্রবাহিত হইয়া সকল গৃহ আলোকিত করে। আত্মা সকল দেহে ব্যাপ্ত না হইলেও তাহার গুণ চৈতন্যের সকল দেহে থাকিবার বাধা নাই। যেমন সুগন্ধ দ্রব্য যেখানে পুষ্প নাই, সেখানেও থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে হৃদয়ে আশ্রিত অণু-পরিমাণ আত্মা লোম এবং নখ পর্য্যন্ত সকল দেহ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আত্মা এবং চৈতন্য যে পৃথক, তাহা কৌষীতকি উপনিষদের "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (৩।৩) এই উক্তি হইতে (জীবাত্মা প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে আরোহণ করে) বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (শঙ্করের মতে) জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মের মতই অনন্ত। আত্মা সংসারী হইলে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণ তাহার নাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহারা বুদ্ধির গুণ। বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে আছে বালাগ্র শতভাগের শত ভাগ জীব মোক্ষে অনন্ত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অণু পরিমাণ হইলে জীব মোক্ষে অনন্তত্ব পাইতে পারিত না। বুদ্ধিগুণ উপাধিযুক্ত আত্মাই অণু-পরিমাণ। প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকেও "হৃদয়ে ঘং, যথাৎ বা অনীয়ান্ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩) বলা হইয়াছে। ইহা উপাসনার জন্য।

১৩ হইতে ৩২ সূত্রে জীবের কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুদ্ধিরূপ উপাধি যোগে ব্রহ্ম জীবে পরিণত হন। যতদিন জীবত্ব থাকে, ততদিন এই সংযোগ থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তখন জীব আর থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়। (২।৩।৩০) সুষুপ্তির সময়ও বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু বালকের পুংস্কত্বের ন্যায় তাহা অনভিব্যক্ত থাকে। বুদ্ধির অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-যোগে যে সর্ব্বদাই বিষয়ের উপলব্ধি হইত, অথবা কখনও হইত না। বুদ্ধি আছে, এবং কখনও তাহা বিষয়ে সংযুক্ত হয়, কখনও বা হয় না। তাই কখনও উপলব্ধি কখনো অনুপলব্ধি হয়। অন্তঃকরণই বুদ্ধি বা মন। যখন সংশয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম মন। যখন নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ। জীবই কর্ত্তা। শরীরের মধ্যে আত্মা অবস্থান বিচরণ করে (বৃ. আর, ২।১।১৪) জীব ইন্দ্রিয়গণকে উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে (বৃঃ আ ২।১।১৮) তৈত্তিরীয়ে (২।৬।১) আছে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" বিজ্ঞানে (জীব) যজ্ঞ করে, "বিজ্ঞানেন যজ্ঞং তনুতে" বিজ্ঞান দ্বারা যজ্ঞ করে, ইহা নাই। জীব কর্ত্তা হইলেও সকল সময়ে নিজের হিতকর কর্ম্ম করে না। ইহার কারণ এমন কোনও নিয়ম নাই যে জীবকে হিতকর কর্ম্ম করিতেই হইবে। প্রতিকূল অবস্থায় জীব অহিতকর কর্ম্ম করে। জীব উপলব্ধি বা জ্ঞানের কর্ত্তা হইলেও যেমন তাহার দুঃখের জ্ঞানও হয় সেইরূপ। জীব কর্ত্তা না হইয়া বুদ্ধি যদি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে শক্তি-বিপর্য্যয় হইত অর্থাৎ বুদ্ধির করণ শক্তি থাকিত না। বুদ্ধি তাহা হইলে ভোক্তা হইত। জীব যদি কর্ত্তা না হইত, তাহা হইলে সমাধি হইতে পারিত না। "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন", এই প্রত্যয়ই সমাধির অবলম্বন। বুদ্ধি প্রকৃতির অবলম্বন। তাহার

এই প্রশ্ন হইতে পারে না। তবে যা সুকৃতের মত জীব কখনও কাজ করে, কখনও করে না। জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে। উপাধি-জাত। স্বাভাবিক হইলে এই কর্তৃত্ব কখনও অপগত হইত না। জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত। কৌষীতকিতে (৩,৮) আছে ইনি যাহাকে উপরে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম, এবং যাহাকে নীচে নামাইতে চাহেন তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম করান। ঈশ্বর জীবের "কৃতপ্রযত্নের" (সফলের চেষ্টা) অপেক্ষা-করেন। অর্থাৎ তাহার অর্জিত ধর্মাধর্মের অনুরূপ কর্ম তাহাদ্বারা করান। সাধ্যে কতকগুলি কর্ম বিহিত এবং কতকগুলি প্রতিষিদ্ধ আছে। এই বিধান যাহাতে অর্থহীন না হয়, সেজন্য এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

৪০ সূত্র হইতে ৪৭ সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উপনিষদে কোথাও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কোথাও বলা হইয়াছে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। বেদের মন্ত্র ভাগ হইতেও জানা যায় যে জীব ব্রহ্মের অংশ (পুরুষসূক্ত)। গীতাতেও জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। সূর্য্যের আলোকে অঙ্গুলি বাঁকাইলে সূর্য্যালোক বক্র বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ সেই বক্রতা যেমন আলোককে স্পর্শ করে না, তেমনি জীবের দুঃখ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না।

৪৮ সূত্র হইতে ৫০ সূত্রে (পাদশেষ) জীবাত্মার কর্মফল ভোগের কথা আছে। এক জীবাত্মার একাধিক দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া একজনের কর্মফল অপরকে ভোগ করিতে হয় না। এক জলাশয়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কাঁপিলে, অপর জলাশয়ের প্রতিবিম্ব কাঁপে না। সেই রূপ এক জীবাত্মা নিজ কর্মফল ভোগ করিলে অপর জীবাত্মা তাহা ভোগ করে না। কিন্তু সাংখ্য-মতে যখন জীবাত্মা বহু এবং তাহাদের প্রত্যেকেই সর্ব্বব্যাপী, তখন প্রত্যেক দেহের সহিত সকল আত্মাই সমভাবে সংযুক্ত। সুতরাং এক দেহের অর্জিত পাপপুণ্য সকল আত্মাই ভোগ করিবে না কেন, তাহার কারণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন আত্মার সংযোগ বিভিন্ন বলা যায় না। কারণ সকল আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন সকল সংযোগই প্রত্যেক আত্মার। আত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী তখন প্রত্যেক দেহ কর্তৃক আত্মার যে প্রদেশ অবচ্ছিন্ন, তদনুসারে বিভিন্ন জীবের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ সকল প্রদেশই সকল আত্মার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়দিগের কার্য্যের ব্যাখ্যা আছে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে উপনিষদে প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কোথাও ইহাদিগের উৎপত্তির কথা আছে, আবার কোথাও বা সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল, ইহা বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য, ঘ্রাণ প্রভৃতি লোকের ন্যায় প্রাণদিগেরও উৎপত্তি হইয়াছিল (তৈ সু তথাপ্রাণাঃ ২।১।৩) অগ্নি, জল ও পৃথিবী সৃষ্টির পরে বাক্ (বাক্যের) সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাণ সাতটি। যেখানে প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী বলা হইয়াছে, সেখানে এক একটি ইন্দ্রিয়ের একাধিক বৃত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মেন্দ্রিয়ও প্রাণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে ধরিয়া প্রাণের সংখ্যা এগারো। প্রাণগুলি অণু-পরিমাণ, মৃত্যুর সময় যখন প্রাণ বাহির হয়, কেহ দেখিতে পায় না। প্রাণ (মুখ্য প্রাণ) প্রথমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া প্রাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্বে ইন্দ্রিয় পরে জন্মে। প্রাণ বায়ু নহে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও নহে। (প্রাণের) বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে পৃথক ভাবে উপদেশ আছে। চক্ষুরাদি যেমন জীবের অধীন এবং ভোগ-সম্পাদক, প্রাণও তেমনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ আলোচনা উপনিষদে আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন প্রাণ শরীর ও ইন্দ্রিয়দিগকে ধারণ করে। জীবের স্থিতি ও উৎপত্তি প্রাণের কাজ। চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় প্রাণ কোনও বিষয় গ্রহণ করে না; কিন্তু তাই বলিয়া নিষ্ক্রিয় নহে। মনের ন্যায় (দর্শন গ্রহণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ ও আস্বাদন মনের বৃত্তি) প্রাণেরও পাঁচ বৃত্তি—নিশ্বাস গ্রহণ (প্রাণ), নিশ্বাস ত্যাগ (অপান), গ্রহণ করা রাখিয়া মধ্যবর্তী কার্য্য করা (ব্যান), উৎক্রমণ (উদান) ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক (সমান)। প্রাণ পরিচ্ছিন্ন (বিভু নহে) ও দ্রষ্টা। শ্রুতি বলেন জ্যোতিঃ (অগ্নি) আদি দেবতাগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ নিজ কার্য্য করে। যদিও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তথাপি জীবের সহিতই প্রাণের সম্বন্ধ; দেবতাদের সহিত নহে। দেবতা পাপপুণ্যের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য, জীবকেই পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয়—দেবতাদিগকে নহে। মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণগুলি (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয়; প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়দিগের ভেদ উক্ত হইয়াছে। মুখ্যপ্রাণের সহিত অন্যান্য প্রাণের বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ ও রূপকরণ, যিনি ত্রিবৃৎ করিয়াছেন, তাহারই কৃত। উপনিষদে আছে, যে পরমাত্মা অগ্নি, বায়ু ও জল এই তিনটি পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া নানা বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই ত্রিবিৎ করণ। যেরূপ বাক্ হইয়াছে সেইরূপ মাংসাদি ভূমি হইতে, রক্ত জল হইতে এবং অস্থি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে যেমন, তেমনি জল ও অগ্নির মধ্যেও পৃথিবী, জল ও অগ্নি, তিনটিই আছে। পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবী অংশ বেশী, জলের মধ্যে জলের অংশ বেশী এবং অগ্নির মধ্যে অগ্নির অংশ বেশী।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে মৃত্যুর পরে জীবাত্মার গতি বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।৩) প্রবাহণ শ্বেতকেতু সংবাদে এই বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবাহণ বলিয়াছিলেন অগ্নি হোমাদি কর্ম্মে শ্রদ্ধার সহিত যে জল ব্যবহৃত হয়, তাহা ধূমরূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া দিবাদেহে পরিণত হয়, মানুষ মৃত্যুর পরে সেই দেহ প্রাপ্ত হয়। ধূমযান শেষ হইলে সেই দেহ যেরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া বৃষ্টিতে পরিণত হয়। বৃষ্টি পৃথিবীরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া অন্নে পরিণত হয়। অন্ন পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া শুক্রে পরিণত হয়। শুক্র রমণীরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া গর্ভে পরিণত হয়। এইরূপে

সকল আহুতি পুরুষরূপে পরিণত হয়। ইহাই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। জলের মধ্যে স্নিগ্ধ, অম্ল ও ভেদ আছে। এই সূক্ষ্মভূত প্রাণের আশ্রয়। প্রাণের সহিত তাহারা পরলোকে গমন করে। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার সহিত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সহ পঞ্চবিধং দেহের উপাদান সূক্ষ্মভূতও পরলোক গমন করে। প্রতিতে আছে যাহারা গ্রামে থাকিয়া যজ্ঞ, পুষ্করিণী আদি প্রতিষ্ঠা ও দান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমের সহিত গমন করে, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া উত্তম দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে উপভোগের দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অনুক্রমে (কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্ম্মের) সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ, অবতরণের সময় তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অন্তবিধ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম অবতরণের সময় জীবে সংশ্লিষ্ট থাকে। শুভ কর্ম্মের ফলে উৎকৃষ্ট যোনি এবং অশুভ কর্ম্মের ফলে নিকৃষ্ট যোনিপ্রাপ্তি ঘটে। "রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিং, কপূয় চরণাঃ কপূয়াং যোনিং আপদ্যন্তে" এখানে চরণ শব্দের অর্থ শীল বা আচরণ নহে, কর্ম্ম (বৈদিক কর্ম্ম)। শ্লোকের মূলা এই যে যাহাদের শীল উৎকৃষ্ট, তাহারাই কর্ম্মে অধিকারী, এবং যাহাদের শীল যত উৎকৃষ্ট, তাহাদের কর্ম্মের ফলও তত উৎকৃষ্ট হয়। যাহারা জ্যোতি কর্ম্ম করে না, তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে না। বেদে সংযমনের (যমলোকে যাতনার) উল্লেখ আছে। স্মৃতিতেও পাপীর নরক গমনের উল্লেখ আছে। যাহাদের চন্দ্রলোকে গমনের অধিকার হইয়াছে, তাহারাই তথায় গমন করে। যাহারা দেবযানে ব্রহ্মলোকে এবং পিতৃযানে পিতৃলোকে যায় না, তাহারা যায় বার বার হয়ও না। এই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। সত্যবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাত্রয়ে পরিবর্ত্তন ইচ্ছ ইচ্ছ হয়। কিন্তু সত্যভাব হইতে জীবের ভ্রষ্ট পতিতে ইওয়া সহজ নহে। অতএব জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল সত্য হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণকারী জীব কিছু কালের জন্য সেই শরীরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে মাত্র। তখন কোনও ভোগ হয় না।

পরলোকে উক্ত হইয়াছে যে বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ বলিয়া শরীর-প্রাপ্তি তাহার ফল নহে। বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ হইতে পারে না। কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম অধর্ম্ম, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। বেদে কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না বলিয়াও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে পশুবধের বিধি দিয়াছেন। ইহা বিশেষ নিয়ম। শাস্ত্রে যেখানে পশু-বধের বিধান আছে, সেখানে পশু বধ দোষের নহে। যে পশুকে বধ করা যায়, সে স্বর্গে গমন করে। ইহা চিকিৎসকবৃন্দ রোগীর আরোগ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট কর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্ম সবিশেষ অথবা নির্বিশেষ অথবা সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয়ই, এই বিষয়ে আলোচনা আছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ইহাই মীমাংসা। রামানুজের মতে ব্রহ্ম নির্দ্দোষ অর্থাৎ বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বীজিঘৎস, অপিপাস, আবার তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, সকল কল্যাণ গুণের আধার, ইহাই বেদান্তের মীমাংসা।

সেখানে রথ নাই, রথযোগ নাই, রথের পথ নাই, অথচ রথ রথযোগ ও পথের সৃষ্টি করে বলিয়া মনে হইতে পারে ঈশ্বর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল নির্ম্মাণ করেন, এবং তাহারা জাগ্রৎ কালে দৃষ্ট বস্তুর মতই সত্য। কিন্তু তাহারা মায়ামাত্র—সত্য নহে। সত্যবস্তুতে যেমন, কাল, নিমিত্ত এবং বাধার অভাব, এই সকল ধর্ম্ম থাকে। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে এইসকল থাকে না। স্বপ্নে রথ চলিতে দেখা যায়; কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য রথের স্থান ও পথ নাই। স্বপ্ন দ্রষ্টা নানা বস্তু দেখে আর তাহার চক্ষু মুদ্রিত থাকে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, নিদ্রাভঙ্গে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্বপ্ন মায়ামাত্র। কিন্তু বেদে আছে এবং স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ভবিষ্যতের শুভাশুভের সূচক। জীব ঈশ্বরের অংশ, সুতরাং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান তাহার থাকা উচিত, এবং জীব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিতে সমর্থ, ইহা বলা যায় না, কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান তিরোহিত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাহার বন্ধ ও মোক্ষ হয়। দেহের সহিত জীবের যোগবশতঃ এবং দেহের সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে বলিয়া তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয়। সুষুপ্তি কালে জীব নাড়ীতে অথবা পুরীততে (হৃদয়দেশের মর্ম্মের মধ্যে) অথবা হৃদয়াকাশে অথবা ব্রহ্মে থাকে, ইহা উপনিষদে আছে। জীব হৃদ্-পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, সেই জন্য তখন স্বপ্ন দর্শন হয় না। যখন সুষুপ্তি হইতে জাগ্রৎ হয়, তখন জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয়। এরূপ বেদে আছে। তাহার অনুস্মৃতি ও কর্ম্ম দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বে অসমাপ্ত কর্ম্ম সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া জীবে করে। ইহা দ্বারা অসমাপ্ত কর্ম্ম সেই যে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা প্রতীত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বে দৃষ্ট বস্তু সুষুপ্তির পরে স্মরণ পথে আসে। এই অনুস্মৃতিও এক প্রমাণ। শাস্ত্রে আছে জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে। সুষুপ্তির পরে যদি সুষুপ্তি-পূর্ব্ব জীবের আবির্ভাব না হইত, তবে এই শাস্ত্রবচন ব্যর্থ হইত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু অবস্থা হইতে মূর্চ্ছা ভিন্ন। ইন্দ্রিয় সকল মূর্চ্ছাবস্থায় আংশিক ভাবে বিলীন হয়।

উপনিষদে ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং অবিশেষ উভয়রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু উপাধিযোগেও ব্রহ্মের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষতাই ব্রহ্মের রূপ, উপাধিযোগে তাহাকে সবিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়। যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা। যে সকল বাক্যে তাহাকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা প্রণালী প্রদর্শন করা। সূর্য্যালোক সমস্ত আকাশ ব্যাপী হইলেও, যখন অঙ্গুলি বক্র হয়, তখন সেই আলোক বক্র বলিয়া প্রতীত হয়। সেই রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধিযোগে সেই সেইরূপ আকারযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম চন্দ্রমান্—চৈতন্যবান্। স্মৃতিও তাহাই বলেন। বিভিন্ন জলাশয়ে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও বিভিন্ন উপাধিযোগে ভিন্ন প্রতীত হন। অবশ্য জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মের তুলনা সর্ব্বাংশে সংগত হয় না, কেননা

জল মূর্ত, আর জীবাত্মা অমূর্ত। কিন্তু জলের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে জলগত প্রতিবিম্বের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, জল কম্পিত হইলে বিম্ব কম্পিত হয়, বাস্তবিক সূর্যের বৃদ্ধি হ্রাস বা কম্পন হয় না ; জলের ধর্ম সূর্যে আরোপিত হয় ; সেইরূপ উপাধির ধর্ম ব্রহ্মে আরোপিত হওয়ায় ভ্রম হয়। দৃষ্টান্তের সহিত এই সাদৃশ্য আছে। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম দেহাদি উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। অতএব জলমধ্যগত সূর্যপ্রতিবিম্বের সহিত তুলনা হইতে পারে। শ্রুতিতে ইহাও আছে যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় লিঙ্গযুক্ত হইতে পারেন না।

উপনিষদে ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত, স্থির ও গতিমান্, স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ রূপের কথা বলিলেও "নেতি নেতি" বলিয়া তাহার প্রতিষেধও করিয়াছেন। "নেতি" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মের দুই রূপ সত্য নহে। ব্রহ্মকে শ্রুতি অবাঙ্ মনসগোচর বলিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন সংযোগের (ধ্যানের দ্বারা) ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আলোকের কোনও রূপ না থাকিলেও যেমন আলোক আলোকে স্থিত রূপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উপাসনার সময় ব্রহ্ম রূপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই বলিয়া মোক্ষে জীব অবশ্য ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় ইহা উপনিষদে আছে। এইজন্য একই সর্প যেমন কখনও কুণ্ডলাকারে দৃষ্ট হয়, কখনও ঋজু আকারে দৃষ্ট হয়—সেইরূপ ব্রহ্মও কখন জগৎরূপ, কখনও জগৎ হইতে ভিন্ন, ইহা বলা যায়। অথবা সূর্যের প্রকাশ এবং সূর্য উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। অথবা রূপহীন আলোক যে বস্তুর উপর পড়ে, আলোকও সেই বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে সবিশেষ রূপে প্রতীত হন। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীব নাই—এইরূপ প্রতিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব অভেদ। কিন্তু ব্রহ্মকে সেতু (যে আত্মা স সেতুঃ বিধৃতিঃ), বলা হইয়াছে। তাহার উদ্ধারের (নির্দিষ্ট পরিমাণ) সম্বন্ধ ও ভেদের কথা আছে। ইহা হইতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে ; যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তর এই যে এ সকল দৃষ্টান্ত সাদৃশ্যবাচক। ব্রহ্ম জগৎ ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া তিনি সেতু বিধৃতিঃ। সেতুর অপর পার আছে বলিয়া ব্রহ্মের পরেও অন্য কিছু আছে, ইহা নহে। ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ, ষোড়শকলাযুক্ত বলা হইয়াছে উপাসনার সুবিধার জন্য, বাস্তবিক তাহার পাদ বা কলা নাই। যে উপাধিতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পরিমিত বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, সুষুপ্তি কালে জীব "স্বম্ অপীতো ভবতি" অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে ব্রহ্ম ও জীব যে অভিন্ন তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রুতিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা এবং তিনি সর্বগত প্রভৃতি ব্যাপিত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তাহার সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।

ব্রহ্ম হইতেই কর্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা শ্রুতিতে আছে। "তিনি অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃ, আ, ৬।৪।২০)

জৈমিনি বলেন বটে, যে কর্মই (কর্মবিশেষ) কর্মফলের দাতা ; কিন্তু বাদরায়ণের মতে কর্ম নিজ হইতে ফল দান করে না, ঈশ্বরই ফলদান করেন। "যাহাকে তিনি উর্ধ্বলোকে উন্নীত করিতে চাহেন, তাহা দ্বারা তিনি সাধু কর্ম করান, যাহাকে নামাইতে চাহেন তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম করান" এই সৎ ও অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি দান জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল। ঈশ্বরই তাহা দান করেন।

ভুলি নাই তোমা ভগবান

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভুলি নাই তোমা ভগবান্ !—
জানি তোমা বিনা অর্থবিহান
অর্থবিত্ত ধনমান !
তব সৃষ্টির লীলা-আনন্দ
কোটায় আমার ছন্দোস্পন্দ,
চির সুষমার উৎস তুমি হে,
ভুলিতে কি তোমা পারে প্রাণ !

ভুলি নাই প্রভু, ভুলি নাই,—
দুখ-দারিদ্র্য ব্যথা-লাঞ্ছনা
করিয়াছি চিরসাথী তাই।
ভালবেসে যত করিছ মোচন
একে একে মোর সব বন্ধন—
পিঞ্জর-ভাঙা পাখীর মতন
তত মন খুলে গান গাই !
ভুলি নাই তোমা দয়াময়,
ধূলো খেলা নিয়ে থাকে শিশু তবু
পিতারে কি তার ভুলিয়া রয় ?
ঐ মতো করি, সংসার খেলা
যদিও কাটিছে মোর সারাবেলা,
তবু তার ফাঁকে সারা প্রাণ মোর
গাহিছে কেবল তব জয় !

গল্প

পুরস্কার

শ্রীপ্রভা দত্ত

অসহ্য বেদনায় আমার অন্তর জ্বলছে অহোরাত্র। সংসারের কঠিন বেড়াজালে পড়ে আমার অন্তরের উজাড় করা ভালবাসা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। 'রূপ আর টাকা' —এই নিয়েই সংসার চলছে। অন্তরের কষ্টিপাথরে যাচাই করে এ দুটো জিনিস।

সুনন্দাদি, তুমি ত জান এ দুটোর কোনটাই আমার ছিল না। এক সাধারণ গরীব মোক্তারের মেয়ে আমি, পড়তাম ছিল তোমাদের টিচার্স বোর্ডিং, ছোট বেলায় তোমার সঙ্গে আলাপের পর আরম্ভ হয় আমার লেখাপড়া ও গানবাজনা শেখা। স্কুলের খরচ বহনের অবস্থা ছিল না বাবার, তা জেনেও, তুমি তখন ইচ্ছে করে এগিয়ে এসেছিলে—আমার জীবনের গ্লানিমা আর সমস্ত ব্যর্থতা তোমার স্নেহ করস্পর্শে মুছে দিতে। বলেছিলে—মানুষের ঐকান্তিক সাধনা কখনও ব্যর্থ হয়না। তোমার সাহচর্যে এসে আমার সাধনা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু তোমার দেখে পর্যন্ত, তোমার মত শিক্ষয়িত্রী-জীবন-যাপনের যে আশা আমি গোপন মনে পোষণ করতাম তা পূর্ণ হয়নি।

হঠাৎ একদিন ভোরে ওঠে শুনলাম বড়-বৌদির মুখে—বাবার নাকি কে একজন ধনী বড় মক্কেল এসেছেন, তাই বাড়ীর সবাই ব্যস্ত। বড়-বৌদিই বাড়ীর কর্ত্রী, মা আমার জন্মের পরই মারা যান। কাজেই মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানিনা। বাড়ীতে ছিলেন বুড়ো বাবা—তিনি তাঁর কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আর দাদা বৌদিরা নিজেদের ছেলে মেয়ে ও সংসার নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ীতে আমার কথা চিন্তা করার কারো অবসর নেই।

দিন কেটে যায়। আমার এই অসহায় মনটী পড়ে থাকত তোমার কাছে। তখন তুমিই ছিলে আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা।

বাড়ীতে বসে বসে সেদিন একমনে একখানা ভজন গাইছিলাম, ঘরের জানালার পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে, শুনতে পেলাম—বাবাকে, কে যেন বলছেন—"করুণাবাবু, আপনার বাড়ীতে কে গান গাইছে বলুনত? ভারী মিষ্টি গলা!" বাবা তার উত্তর দিয়ে আমাকে ডাকলেন। বেরিয়ে দেখলাম—এক সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন—"কি নাম মা তোমার?" নাম বললাম এবং তাঁকে প্রণাম করলাম। তার ফল যে এমন দাঁড়াবে আগে তা বুঝতেও পারিনি!

দিনকয়েক পরে বাড়ীতে শুনতে পেলাম—বাবার সেই ধনী বৃদ্ধ ভদ্রলোক মক্কেলটী নাকি আমার গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।—কোন দাবী-দাওয়া নেই—অথচ এক ধনী ঘরে বিয়ে হচ্ছে। এটা একটা সাধারণ মোক্তারের মেয়ের পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার বই কি! এত দিনে যেন সবার আমার দিকে নজর পড়ল। বড়দা একদিন রাত্রে বললেন—'যাই বল তোমরা—যমুনার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেও, চেহারায় লক্ষ্মীশ্রী আছে—ইত্যাদি। যাই হউক খবরটা তোমার কাছেও গোপন না করে বলেই ফেললাম। তার উত্তরে তুমি বলেছিলে—ভগবান তোমায় সুখী করুন।"

তারপর?

তারপরে এলো আমার বিবাহের দিন। উৎসবের রাত—হৈ-হল্লোড়ের মধ্যে কেটে গেল। আমি আমার স্বামীকে দেখলাম প্রথম—ফুল শয্যা রাতে। উৎসবের কোলাহল থেমে গেছে। গভীর রাত—চারিদিক নিস্তব্ধ। দেখলাম স্বামী আমার আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করছেন। ভরসা করে চেয়ে দেখলাম—সুন্দর, সুঠাম চেহারা। ঠোঁটের কোনে হাসির ছাপ লেগে আছে। কি তার মিষ্টি চেহারা! —অজানা আমার বুক আমার দুরু দুরু কাঁপছে। চিরন্তন

অধিকারের দাবী নিয়ে স্বামী আমার কাছে এসে দাঁড়াল—দু হাতে টেনে নিলো বুকের পরে, তার পর—নিবিড় অনুরাগভরে কম্পিত ওষ্ঠে এঁকে দিল প্রথম চুম্বন রেখা। কেটে গেল কয়েকটী নীরব অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত! আমি আমার অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা উজাড় করে অর্পণ করে দিলাম হৃদয় দেবতার পদমূলে।

কোথা দিয়ে তারপর কেটে গেল তিনটী বছর—এক স্বপ্নময় অনুভূতির মধ্য দিয়ে বুঝতেও পারিনি। সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে দেখে যেতাম আমার প্রিয়তমকে। সে শুধু আমার স্বামী তো নয়—'সর্ব্বস্ব'। এই পৃথিবীতে এত সুখ—এত তৃপ্তি থাকতে পারে জানা ছিল না। এই স্বপ্ন রাজ্যে এসে ভুলে গেলাম আমার অতীতকে। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, এত সুখ সইবে কেন?—সহসা একদিন বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল—শ্বশুর মারা গেলেন। আর শাশুড়ী ধরলেন রণচণ্ডী মূর্ত্তি। তিনি যে আমাকে পছন্দ করেন না তা জানা ছিল না।

সংসারে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। রূপহীন বলে শাশুড়ীর কাছে পেতে আরম্ভ করলাম বাক্যযন্ত্রণা। আর ধীরে ধীরে স্বামীও যেন আমার কাছ থেকে সরে যেতে আরম্ভ করেছে মনে হ'তে লাগল। শাশুড়ীর কথা হ'ল—পটের বিবি হয়েতো আর সংসার চলে না। কর্ত্তা দেখে এমন বৌ নিয়ে এলো—যে সংসারের না হ'ল কোন বাড়বাড়ন্ত, না হ'লো কিছু! এই রকম অনাদরে অপমানে আর বাক্যযন্ত্রণায় আমার কেটে গেল আরও তিনটী বছর। ক্রমশঃ দিনান্তে স্বামীর দর্শন পাওয়া ভার হ'য়ে উঠল। কিন্তু কেন এ পরিবর্ত্তন? কিছুই বুঝতে পারিনা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কেটে যায়, আর নীরব লাঞ্ছনায় ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। কচিৎ দেখা হয়ে গেলে জমিদারীর কাজের অজুহাতে সে বেরিয়ে যায়। বুঝতে পারি—তার মনেও শাশুড়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার এ ব্যথা কে বুঝবে বল! কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম—এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি?

সুনন্দাদি, দয়া মায়া সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে শাশুড়ীর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে মনস্থ করেছে। যাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তার প্রতিদান বৈ কী? এত বিষয়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী চাইনা! আমার শ্বশুরের প্রতিবেশী এক জমিদারের একমাত্র মেয়েকে বৌ করে আনার সাধ শাশুড়ীর অনেক দিনের ছিল—শুধু শ্বশুর বাধা ছিলেন, আজ সে বাধা সরে গেছে। এবার নতুন বৌ হয়ে সে আসছে—রূপের সঙ্গে রূপোও আনছে। যারা এতদিন আমাদের বিয়ের পর হিংসার চোখে দেখে এসেছে, এখন তারাই আমাকে বাঙ্গের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। এ আমার অদৃষ্টের লিখন! এ নীরব লাঞ্ছনা সহ্য করে বাচ্ছিলাম যার মুখ চেয়ে, দেখলাম তার কোন বিবেকের বালাই নেই। তুমিই বল। সুনন্দাদি, কেউ যদি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে সহজে কি তার ঘুম ভাঙ্গান যায়? এ বাড়ীর প্রতি লোকের মধ্যে সেই বিষ ছড়িয়ে গেছে। তাদের ঘুম ভাঙ্গান সহজসাধ্য নয়। নতুন বৌ নিয়ে সেদিন ফিরেও এল, আমি কি করলাম জান সুনন্দাদি। যে ঘর বেঁধেছিলাম ঢিল ঢিল ঘরে—সে ঘর নিজের হাতে ভেঙ্গে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এক অনির্দ্দিষ্ট পথে। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু আনতে পারতাম সঙ্গে, পারিনি—বিশ্বাস কর—তা পারলাম না। বড় ঘৃণা হল।

তোমার স্নেহের ছায়ায় আমার আশ্রয় মিলবে। ভুলে যাওয়া অতীতকে আবার নতুন করে মনে করছি। বাবা গত হয়েছেন। দাদারা—যে যার কর্ম্মস্থলে। সমাজ সংসার ঠাঁই না দিলেও—তুমি দেবে আমায় আশ্রয়, এ আমি জানতাম।

তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তাই সেই গভীর রাতে একটুও লজ্জা হয়নি। তুমি আমায় বুকে টেনে নিলে, শুধু তাই নয়, চোখের কোণ বেয়ে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আর বল্লে—"এ রকম হবে তুমি জানতে—অসম্ভব কি সম্ভব হয়?" জিজ্ঞেস করলাম—কেন সুনন্দাদি? উত্তর দিয়েছিলে 'বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, সব হয় সমানে, কাজেই এখানে মিশতে পারেনা।'

বললাম সুনন্দাদি—একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দাও, না হলে খাব কি? তুমি বলেছিলে কোথাও টিচারী করতে গেলে চাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ। কাজেই ওরাস্তা আমার বন্ধ। এক রাস্তা আমার খোলা আছে—সেলাই ফোঁড়াই করে দিন গুজরান করা। তুমি আনবে অর্ডার—আর আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কঠোর পরিশ্রম করে

গ্রাসাচ্ছাদনের খোরাক জোগাড় করব। শেষ পর্য্যন্ত তাই আরম্ভ হ'ল। উদারান্নের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম। তুমি কত বকেছ, কত বলেছ—এ ভাবে শরীর ভেঙে যাবে। কিন্তু সুনন্দাদি এ ভাবে বেঁচে থাকারই বা সার্থকতা কি! যার জীবন ছেয়ে গেছে নিরাশায়—সেকি এই অভিশপ্ত জীবনের ভার বইতে চায়? চায় না। চায় কি জান! তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে।

একদিন তুমিই আমার শীর্ণ, শ্রীহীন চেহারা দেখে জোর করে ডাক্তার দেখালে। চেষ্টা তোমাদের ব্যর্থ করে-দিয়ে জ্বর এক ভাবেই বেড়ে যেতে লাগলো। তুমি নিয়ে এলে কলকাতায়, তারপর ভর্ত্তি করে দিয়ে গেলে—হাসপাতালের, কাজার ওয়ার্ডে। কলের মত অর্থব্যয় করেছ আমার জন্যে; কিন্তু সুনন্দাদি—কি পেলে আমার কাছ থেকে তুমি?

এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন আমি অনেক দূরে চলে যাব। আমার হয়ে ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা জানিও—যেন পরজন্মে নারী জীবন আমার এমনি করে ব্যর্থ না হয়ে যায়।

বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে, এই আমার জীবনের শেষ বর্ষা। আজ কয়দিন ধরে চেষ্টা করে তোমার প্রশ্নের জবাব, সামান্যত লিখতে পেরেছি বলে মনে হয়। এখনি নার্স দেখতে পেলে রাগারাগি করবে। তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে। আর তোমার সুনন্দাদি, শনিবার হলেই ষ্টেশনরোড তাগিদ থাকবে না। যে কটা দিন তোমার স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিলাম—আমার জীবন মধুময় হয়ে উঠেছিল। কর্ম্মময় জীবনের ফাঁকে ফাঁকে দিনান্তে আমার কথা তোমার মনে উঁকি দেবে কি? এবার বিদায়। আজ যাবার দিনে আর একজনকে মনে পড়ছে। যে আমার জীবনে একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল—চিরন্তনের বাণী নিয়ে। যে তোমার যমুনাকে দিয়েছে চরণ পুরস্কার।

মেয়েটি

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

মেয়েটি। আকাশ-নীল শাড়ি। ট্রাম স্টপ। দেখা হয় প্রায়।
কখনো কখনো একট্রাম। চোখেচোখ।—বাঁকা চোখে চায়,
তখন দুটোমি বুঝি কা'রো পিছনে লুকিয়ে প্রতীক্ষায়।
হয়ত ভিতেও হার হয়। তবু সুখ।—আমাকেই চায়
দু'টি সন্ধ্যাতারা আহা আহা!—এখানে অনেক দামী দামী
হয় আর যায়। তার মাঝে আমি শুধু, আমি শুধু—আমি।

বিদেয়। আকাশ। মাটি। ফুল। পরতে কাশের বনে ঢেউ।
এখানে দাঁড়িয়ে একা আমি। এ'কথা জানেনা আর কেউ।
কাকে বলি? আহা কাকে বলি। হে পৃথিবী শোনো
আছে বেলা।
যদিও আকাশে পথে ঘরে: সেই এক, এক সেই খেলা:
ফাগুন-সকাল: সোনা রোদ। শ্রবণ-আকাশ
ছলো ছলো।
তবু এ' হাসির দিকে তাকো: দু'টি পদ্মকুঁড়ি টলোমলো।

ভ্রষ্ট লগ্ন

সুনীল বসু

আমার জন্ম আর আলেয়ার আঁচলের টানে
মরে না ঘৃণা-দগ্ধ কামনার মরুভূমি মাঝে।
সহস্র বিস্মৃতি দিয়ে আবৃত এ অভিশপ্ত প্রাণে
আকাঙ্ক্ষারা ব্যভিচারে সংসারের কৃচ্ছ্রতম কাজে।
প্রেমের কস্তুরী বাস, স্বপ্নঘন বাসনা অপার,
মুগ্ধ প্রতীক্ষার দীপ নিভৃতির রাত্রিকক্ষ কোণ
অর্থহীন মনে হয়। ছায়াচ্ছন্ন নামে অন্ধকার
গ্লানির পুঞ্জীভূত পটে বেদনার তীব্র সম্মোহন।

আজ আর কিছু নেই। রিক্ত—শূন্য—তির্যক গতায়ু
সর্পিল স্বার্থের গর্ত্ত প্রতিটি মুহূর্তে খুঁড়ে চলি।
হিংসার চোরাল ছেঁড়ে নগ্ন শব। বিষাক্ত উদায়ু
জীবনের শুকুকোণে সমাবৃত প্রৌঢ় নামাবলী।
শেষ যবনিকা টানি। লক্ষভ্রষ্ট প্রণয়ের পাপ,—
আজন্ম সমুদ্রে ভেসে মোছে শুধু দেহের উত্তাপ।

রিপোর্টারের ডায়েরী

চৈতন্য

—তিন—

রাজনীতিজ্ঞ হয়েও রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা হওয়া সাংবাদিকদের শোভন হয় না। তবু দিবা-রাত্রি রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সাংবাদিকদের কারবার চালাতে হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের একটা অদৃশ্য আত্মীয়তার বন্ধনও তাই থেকে গড়ে ওঠে। সে আত্মীয়তা কোথাও স্বার্থের খাতিরে, কোথাও হৃদয়-মাধুর্য্য অবলম্বন করে। সত্যানন্দদার পাল্লায় পড়ে দু'একবার লোহিয়ার আড্ডায় গেছি। আলাপে-ব্যবহারে তাঁর প্রতি কেমন একটা দুর্ব্বলতাও অনুভব করেছি। সে দুর্ব্বলতার অবশ্য কারণ—গান্ধীজির 'কুইট ইণ্ডিয়া'র উদাত্ত আহ্বান জয়প্রকাশ-লোহিয়াকে উন্মাদ করেছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন। বিয়াল্লিশের সেই আন্দোলনের পটভূমিকায় লোহিয়ার প্রতি দুর্ব্বলতা থাকা অকৃতজ্ঞ না হলে বোধকরি নিতান্তই স্বাভাবিক।

বয়সে তরুণ হয়েও কর্মক্ষেত্রে প্রবীণতা দেখিয়েছেন লোহিয়া। জন্ম তাঁর ১৯১০ সালে। মাত্র ১২ বছর বয়সে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৫ বছর বয়সে বোম্বাই থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন; বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে আই-এ পাশ করেন মদনমোহন মালব্যের কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৯২৯ সালে ১৯ বছর বয়সে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে 'অনার্স' নিয়ে বি-এ পাশ করেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মৌলিক গবেষণা করে 'ডক্টরেট' লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ইতিহাসে যারা ডক্টরেট পেয়ে আজকের দিনে আসর মাৎ করছেন, রামমনোহর তেমনি ফাটকাবাজির 'ডক্টরেট' পাননি। স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি স্বরূপই বার্লিনের ডক্টরেট পাওয়া যায়, অন্যথায় নয়। গান্ধীজি তাই রামমনোহরকে 'লার্নেড ডক্টর' বলতেন। বার্লিনে পাঠরত অবস্থাতেই জেনেভাতে লীগ অফ্ নেশনস্'এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে তিনি এক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। সেবার বিকানীরের মহারাজাকে ভারত সরকার ভারতের প্রতিনিধিরূপে লীগ অফ্ নেশনস্'এ পাঠান। ভারতবাসী বিকানীরের মহারাজাকে তাদের মুখপাত্র হবার অধিকার দেয়নি এবং দিতে পারেনা, লোহিয়া একথা মুক্তকণ্ঠে লীগ অফ্ নেশনস্কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। গ্যালারী থেকে চীৎকার করে বক্তৃতা করেন, পুস্তিকা ছাপিয়ে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনও করেন। রামমনোহরের সে উদ্যম সার্থক না হলেও, সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাঁর সুপ্ত চৈতন্যের প্রথম প্রকাশে আশঙ্কিত হয়েছিল।

১৯৩৩ সালে হের হিটলার জার্মানীর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন এবং সে বছরই লোহিয়া দেশে ফিরে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই এক মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। আই-সি-এস রুণু গুপ্ত তখন ছিলেন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁরই আদালতে লোহিয়ার বিচার হয়। কৃতবিদ্য সরকারী আইনজ্ঞের বিরুদ্ধে নিজের পক্ষ নিজেই সমর্থন করেন লোহিয়া ও মুক্তি পান। মুক্তিদানের আদেশ দিয়ে রুণু গুপ্ত লোহিয়ার আইনজ্ঞানের তারিফ করেছিলেন, সাধুবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর যৌক্তিকতাপূর্ণ যুক্তি-তর্কের জন্য। শেষে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ব্যারিষ্টার হলেও লোহিয়া বশম্বী হতেন।

১৯৩৪ সালে পাটনায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির জন্ম হয়। লোহিয়ার বয়স তখন মাত্র ২৪। তাছাড়া বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন মাত্র বছর খানেক আগে। তবুও এরই মধ্যে তিনি সর্বভারতীয় নেতারূপে পরিচিতি লাভ করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ, মীনু মাসানী প্রভৃতির সঙ্গে লোহিয়াও

ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তরের গুরুভারও যুবা লোহিয়াই বহন করেন। জয়প্রকাশ-লোহিয়া ছিলেন ৪২'এর আন্দোলনের নায়ক। গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাণী তাঁর প্রাণে আগুন জ্বেলেছিল। তাঁদেরই বৃটিশ রাজভক্তদের ভুঁড়ি মেরে কলকাতা ও বোম্বাইতে বেআইনী রেডিও ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন। সে বেতারে আন্দোলনের গতিপথ নির্দ্দেশ করা হতো। সেই সঙ্গে প্রকাশ করলেন Do and die' পত্রিকা। আন্দোলনের এক পরম লগ্নে পুলিশ জয়প্রকাশকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে হাজারিবাগ জেলে রাখা হয়। বন্ধুদের সহায়তায় জয়প্রকাশ জেল কর্তৃপক্ষের রক্ত-চক্ষু ও শাস্ত্রীদের শাণিত অস্ত্রকে ফাঁকি দিয়ে একদিন গহন রাতে কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নেপালের রসুয়ান নগরে লোহিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দুজনে মিলে গড়ে তুললেন এক অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষায়তন। আন্দোলনের সৈনিকরা এখানে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছিলেন। অকস্মাৎ একদিন নেপাল সরকার জয়প্রকাশ, লোহিয়া ও আরো অনেককে গ্রেপ্তার করেন। ইংরেজ সরকারের অনুরোধে তাঁদের সবাইকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাখা হয়। কদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন নিশুতি রাতে মৌনী হিমালয়ের প্রশান্ত পরি-বেশকে বিদীর্ণ করে বেজে ওঠল জেলখানার পাগলা ঘণ্টা। বন্দীশালার লৌহ কপাট খুলে গেল, পাষাণ গাঁথা পাথরের দেওয়াল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। মুক্তিসঙ্ঘের অনন্ত যোদ্ধারা আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে জয়প্রকাশ গ্রেপ্তার হন। লোহিয়ার হাতে হাতকড়া পড়ল ৪৪'র জানুয়ারী মাসে বোম্বাই'এর এক বেতার কেন্দ্রে। লোহিয়া সম্পর্কে ইংরেজের আতঙ্কের সীমা ছিল না। লোহিয়াকে জেলখানায় রাখতে তারা সাহস পায়নি। হাতে হাতকড়া দিয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে লাহোর ও আগ্রা ফোর্টের অন্ধকার কক্ষে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর উপর নানা অকথ্য অত্যাচার চালান হয়। দীর্ঘ ছ'মাসকালের মধ্যে তাঁকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও ঘুমুতে দেওয়া হয়নি। এসব সত্ত্বেও ৪৬ সালের গোড়াতেই হাসিমুখে লোহিয়া জেলখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ক্যাবিনেট মিশনের আগমন প্রাক্কালে এই সময় প্রায় সব নেতৃবৃন্দকেই ইংরেজ মুক্তি দেয়।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের পাঁচতলা বাড়ীর তিন তলায় সোজা উঠে গেলাম। আস্তানাটির মালিক বালকৃষ্ণ গুপ্ত—ডাক্তার সাহেবের ছাত্রজীবনের বন্ধু, রাজনৈতিক জীবনের সহচর এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত জীবনের পরম হিতৈষী। নাতিবিস্তীর্ণ ঘরখানির অর্দ্ধেকেরও বেশী জায়গা জুড়ে রয়েছে ডজন খানেক তাকিয়া বিস্তৃত গদী। বাঙ্গালীর ঘরে এমন গদী-তাকিয়ার সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। তবু ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙ্গালীর বিবাহ বাসরের সঙ্গে এই দৃশ্যের সাদৃশ্য অনেকখানি। বৃহদাকার তাকিয়া হেলান দিয়ে সভার মধ্যমণি ডাক্তার সাহেব বসে রয়েছেন। ঘরের দরজাতে উপস্থিত হতেই অভ্যর্থনা জানালেন। কাছে ডাক দিলেন। বল্লেন: আও আও, আরাম-সে বৈঠ্ যাও।

সত্যানন্দদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। নমস্কার বিনিময় হলো। ডাক্তার সাহেব সামনের এক বৃদ্ধা মহিলাকে বল্লেন: কিউ মাইজি, আভি তক্ খাড়া রহা। রিপোর্টারকে লিয়ে কফি ভেজো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুপ্ত পরিবারের একজন 'সেবার মিনিষ্টার' ট্রে ভর্ত্তি আট-দশ কাপ কফি নিয়ে এলো। পাশে এক তাকিয়া জড়িয়ে সতার মতন লুটিয়ে ছিলেন গৃহকর্ত্তা। তাঁকে এক খোঁচা মেরে ডাক্তার বল্লেন: দেখো ভাই, কফি বোলা তো ব্রেক কফি ভেজা। কফিকো সাথ সাথ কুচ্ কুড়মুড় তো চাইয়ে।

প্লেট ভর্ত্তি কুড়মুড় অর্থাৎ চানাচুর এলো, এলো সেই সাথে রকমারী বিস্কুট। সেকেণ্ডের কাঁটা তখনও পুরো এক পাক ঘোরেনি। আবার আদেশ হলো: আরে ভাই, সিগ্‌রেট ছোড়ো। নিজে না খেলেও বালকৃষ্ণজীর সিগরেটের প্যাকেট জনে জনের সামনে ধরলেন ডাক্তার।

কথায় কথায় আমার কর্ম ও গৃহজীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনলেন। বাংলা দেশের রাজনীতি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হলো। বুঝলাম, যারা নিজের স্ত্রীকে 'মোবাইল জুরেলারী শপ' করে কমিউনিজমের বুলি

ছড়ান, যারা মধুমেহের পাদদেশের দয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে সন্তাদরের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে সন্ধ্যার স্বল্পালোকে অন্ধকারে পরিণত হন এবং কয়েক হাজার শ্রমিকের স্বার্থকে জলাই করে নিজের মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা করেন, তাদের ডাক্তার সহ্য করতে পারেন না। তাঁর মতে এরাই দেশের বড় শত্রু।

লোহিয়ার 'এ্যাসিড টাঙ্গ' কেউ কেউ পছন্দ করেন না, অনেকেই সহ্য করেন না। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই; দৃষ্টিভঙ্গীর দূরদর্শিতা সম্পর্কেও বহুজনের মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোহিয়ার অপবাদ আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। তাঁর যা নেই বাবা নেই, ভাই-বোন নেই, নিজস্ব জমি-জমা ঘরবাড়ী নেই; সহায় থাকলেও সম্পদ বলে কিছু নেই। ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে জনপদে যেসব বালকৃষ্ণ গুপ্ত ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরাই ডাক্তারের নিত্যকার গ্রাসাচ্ছাদন ও লজ্জা-নিবারণের ব্যবস্থা করেন।

নিদারুণ অসুখ ভোগের পর ডাক্তার একবার কলকাতা এলেন। শীতকাল। নিজের অসুস্থ শরীর উপেক্ষা করে আসবার পথে একজন কর্মীকে সব গরম জামাকাপড় নিয়ে এসেছিলেন। গুপ্ত পরিবার তাঁর জামা-কাপড় দিলেন, সেবা যত্নে শরীরটাকেও ঠিক করে দিলেন। যাবার দিন ঠিক বিদায় প্রাক্কালে 'বালকৃষ্ণ-জননী তাঁর 'অবাধ্য ও আদুরে' সন্তান ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরে অঘোরে কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন: বেটা, যখন যেখানেই থাক না কেন, ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া করবে। শরীরটাকে ঠিক রাখবে।

ডাক্তার কোনমতে বৃদ্ধার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি নিলেন। ঠিক পাশের দরজায় বালকৃষ্ণজীর সদ্য-বিবাহিতা কন্যা দাঁড়িয়েছিল। দুটি চোখ দিয়ে তার অবিশ্রান্ত ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বল্লো: বাবুজি, তুমি এই সোয়েটারটা পরবে। বাবুজি, তুম্ ঠিকসে খানা-পিনা করনা। মেয়েটির চোখের জল ডাক্তারকে বিচলিত করল। চোখের জল মুছিয়ে দিলেন, মাথায় মুখে হাত দিয়ে আদর করলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ডাক্তার আমাদের বল্লেন: আচ্ছা ভাই বল ত, এরা সব আমার মতন অপদার্থের জন্য কাঁদে কেন?

ভাবছিলাম কাঁদে কেন, তা তুমি বুঝবে কি! যারা ভালবাসার ফাঁদে পা বাড়িয়েছে, তারাই জানে এর কি যন্ত্রণা, কি অসহ্য বেদনা। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ডাক্তারের বিচলিত ভাব কেটে গেল। ট্রেনে পৌঁছতেই সে সব তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করুক, লোহিয়া সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করেন। সংসার ও সাংসারিকদের প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা নেই, কিন্তু নেই আসক্তি। আরো অনেক রাজনৈতিক নেতাকে দেখেছি, ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাঁদের প্রতি মাথা নত হয়। কিন্তু এমন বিবাগী বিশেষ কাউকে দেখিনি।

মনে হয়, লোহিয়ার স্বভাবের এই মাধুর্যই গান্ধীজি ও জওহরলালকে মুগ্ধ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দিনগুলির অধিকাংশই লোহিয়া এলাহাবাদে নেহরু পরিবারের আনন্দ ভবনে কাটিয়েছেন। জওহর-লালজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুজনে বিপরীতধর্মী হয়েও সে সম্পর্ক তিক্ত হয়নি।

জওহরলাল তখন অন্তবর্ত্তীকালীন সরকারে যোগদান করেছেন। তাঁর সে কাজে লোহিয়ার সমর্থন ছিল না। তবু জওহরলাল তাঁকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যুক্তি-তর্ক দিয়ে। পাচতলার সিঁড়ি ভেঙে নেহরুজী দিল্লীর 'জনতা' পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলেন। লোহিয়াকে পাকড়াও করে সোজা আর-কে-নেহরুর বাড়ী এনেছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলেছিল যুক্তি-তর্ক আলাপ-আলোচনা। সে আলোচনা ব্যর্থ হয়। লোহিয়া সরে দাঁড়িয়েছিলেন, নেহরুজীও 'ক্ষেত্র কর্ম বিধিয়তে, নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এর পর আর দুই বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি। গান্ধীজি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন দুজনের মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তারপর আর হয়নি।

ইন্দিরার সঙ্গেও লোহিয়ার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লোহিয়ার জীবনের বহু স্মরণীয় দিনের সাক্ষী ইন্দিরা। 'আজ পিতার সঙ্গে লোহিয়ার মতবিরোধ থাকলেও, কন্যা ইন্দিরা সে প্রীতির সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করেন না। জওহরলালজী তখন স্বাধীন ভারতের প্রধান-মন্ত্রী হয়েছেন। নেপালের রাণা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে লোহিয়া

নয়া-দিল্লীর নেপালের দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। নেপাল—ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে লোহিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইন্দিরা নেহরুজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ও, এম, মথাইকে দিয়ে লোহিয়ার উদ্দেশে জেলখানায় আম পাঠিয়েছিলেন। সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্র দুনিয়ায় এই খবর ছাপা হয়েছিল। আর একবার মণিপুর সফরকালে লোহিয়া রকমারী উপঢৌকন পান। ডাক্তার সে সব উপঢৌকন এক বস্তু যোগে নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে পাঠিয়েছিলেন ইন্দিরার উদ্দেশে।

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজেও লোহিয়া গান্ধীজি ও জওহরলালের অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্র ছিলেন। ভারত সরকারের অতিথিরূপে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতে এসে নেহরুজীর সঙ্গে বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করেন। নেহরুজী চেয়েছিলেন গান্ধীজির সঙ্গেও চিয়াং-এর আলাপ আলোচনা হোক। গান্ধীজি তখন তাঁর গুর্দ্ধা আশ্রমে ছিলেন; চিয়াং'কে সেখানেই তিনি আসতে জানিয়েছিলেন। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো চিয়াংকে গুর্দ্ধা যেতে দিতে নারাজ ছিলেন। গান্ধীজি এই লিনলিথগোর মত পরিবর্তন করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বড়লাটের এক গুঁয়েমিতে গান্ধীজি বড় বিরক্ত হয়েছিলেন। নেহরুজী ভারত-চীনের ভবিষ্যত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য কায়দনবাকো চিয়াং-গান্ধীর একটা বৈঠক হোক চাইছিলেন। লোহিয়ার হাতে নেহরুজী এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দিয়ে তাঁকে ওয়ার্দ্ধায় পাঠাইলেন। লোহিয়ার চেষ্টা সফল হয়। গান্ধীজি কলকাতা আসতে স্বীকৃত হলেন। ওয়েলসলি রোডের বিড়লা পার্কে গান্ধী-চিয়াং কাইশেকের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয়।

গান্ধীজির নীতিকে গ্রহণ না করলেও, লোহিয়া তাঁকে ভক্তি করতেন, ভালবাসতেন। ৪৬ সালের দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতার অবস্থা লোহিয়ার প্রচেষ্টাতেই শান্ত হয় এবং গান্ধীজি তাঁর অনশন ত্যাগ করেন।

নাচে-গানে কাব্যে-সাহিত্যে ডাক্তারের অসীম অনুরাগ। বই পড়াতে কোন বাচ-বিচার নেই। কখনও হাতে দেখেছি উইল ডুরাণ্টের The Story of Philosophy, কখনও বার্ণাড শ'র Plays Plasant, কখনও বা জেমস জীনস্'এর The stars and their courses' বা রবীন্দ্রনাথের পোষ্ট অফিস (ডাকঘর)। সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পত্র-পত্রিকাগুলির নিয়মিত পাঠক তিনি। নেশা বলতে, কফি খাওয়া আর জেলে যাওয়া। হিন্দি, উর্দু, বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী ভাষার উপর তাঁর অধিকার যথেষ্ট। জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণে গেছেন কয়েকবার। বিদেশেও তাঁর বহু বন্ধু আছেন। টিউনিসিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরাবা লোহিয়ার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বুর্গীবা লোহিয়ার ব্যক্তিগত অতিথিরূপেই কলকাতায় কদিন কাটান। পরে ডাঃ কাটজু দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল পেয়ে রাজভবনে নিয়ে যান। বার্মার উপ-প্রধান-মন্ত্রী উ বা সোয়েও যুগোস্লাভিয়ার প্রাক্তণ উপ-প্রধান-মন্ত্রী মিলো ওয়ান জিলাসও তাঁর বিশেষ বন্ধু।

লোহিয়া সহ্য করতে পারেন সবাইকে। পারেন না শুধু মৃদু ও প্রিয়ভাষিণীদের। এদের এড়িয়ে চলেছেন সারা জীবন। একবার অরুণা আসফ আলির সহোদরা পূর্ণিমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের উপক্রম হয়েছিল। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর প্রায় সমকক্ষ ও সমকালীন আইনজীবী প্যারীলাল ব্যানার্জীর পুত্রের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তারপর ইনি রামমনোহরকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। লোহিয়ার ঔদাসীন্যে তা সম্ভব হয়নি। পূর্ণিমা ব্যানার্জী উত্তর প্রদেশের একজন অন্যতম খ্যাতিমান মহিলা-কংগ্রেসী ছিলেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও সরোজিনী নাইডুর মতন রূপসিনী না হলেও, ইনি স্বনামধন্যা ছিলেন। পূর্ণিমা ব্যানার্জী এম, এল, এ এবং এম, পি'ও হয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে ইনি পরলোকগমন করেছেন।

আজকে লোহিয়ার অনুচরের সংখ্যা যত নগণ্যই হোক না কেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য যোদ্ধা বলে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রইবে। সেই বিগত দিনের চিত্তহরণীয় কাহিনীর অন্যতম নেতা-রূপেই তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং সাংবাদিক জীবনে তাঁর সান্নিধ্যে এসে সে জন্যই আনন্দ পেয়েছি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭

বাহিরে তিনটি বড় বড় আটচালা প্রস্তুত হইয়াছিল, আর সেগুলিতে আড্ডা জমাইয়াছিল তিন শ্রেণীর লোক। এক নম্বর আটচালায় জুটিয়াছিলেন বিভিন্ন গ্রামের বৃদ্ধগণ। ইঁহারা অনেকেই সূর্য্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী। শুধু ডাক্তার হিসাবেই নয়, নানাভাবে ইহাদের সুখ-দুঃখের সহিত সূর্য্যসুন্দর জড়িত হইয়া আছেন। প্রকৃত আত্মীয় বলিতে যাহা বুঝায় ইঁহারা তাহাই। হিন্দু-মুসলমান-বিহারী-মাড়োয়ারি বাঙালী আধা-বাঙালী সব রকম লোকই আছেন ইঁহাদের মধ্যে। হিন্দিতেই গল্প চলিতেছে। আমরা অবশ্য তাহার মর্ম্ম বাংলাতেই ব্যক্ত করিব।

প্রবীণ সুবাতালী তহশিলদার খুব ভোরেই নিজের ঘোড়াটিতে চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়াটি সাধারণ দেশীয় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে জিনও নাই। চামড়ার লাগামও নাই। লাগামের বদলে আছে রঙীণ পাটের দড়ি। জিনের বদলে একটি গদি। সাধারণ সতরঞ্চি ও কম্বল পাট করিয়া এবং তাহার উপর একটি ছিটের কাপড় বিছাইয়া ছোটখাটো একটি গদির মতো করা হইয়াছে। সেই গদিতে বসিয়া সুবাতালী তহশিলদার সারাজীবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেদের বড় বড় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে দামী জিন, দামী সাজ, সুবাতালী কিন্তু ওই ছোট দেশী ঘোড়ার উপর দেশী বিছানা পাতিয়া চড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার পরিধানে একটি সাদা লংক্লথের মেরজাই, পায়ে দেশী মুচির তৈরি জুতা এবং মাথায় পাতলা-কাপড়ে তৈরি মুসলমানী টুপি। তিনি একটি জড়ির খাটে বসিয়া জমাইয়াছেন। সূর্য্যসুন্দরের বিষয়েই গল্প হইতেছে।

সুবাতালী বলিতেছেন, "আমাদের ডাক্তারবাবু মানুষ নন, বিরাট একটা বটগাছ। কত আজব ধরণের চিঁড়িয়া যে ওর ডালে এসে বাসা বেঁধেছে তার আর ঠিক নেই। কেশ মশাইকে মনে আছে রমেশ?"

স্থানীয় জমিদারি সেরেস্তার প্রবীণ গোমস্তা রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "খুব আছে। কেশ মশাইকে ভোলা যায় না কি। আপনি যে তার চাকরি করে' দিয়েছিলেন, তা-ও মনে আছে"

রমেশ গদগদ দৃষ্টিতে সুবাতালীর দিকে চাহিলেন, যেন কেশমশাইকে চাকরি দিয়া সুবাতালী রমেশেরই ব্যক্তিগত কোন উপকার করিয়াছেন। একটু মিহি খোশামোদ করা রমেশবাবুর স্বভাব।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুর খাতিরে? কিন্তু সে কি চাকরি করত? আফিংই খেত তিনবার করে'—সকালে, দুপুরে আর রাত্রে। যখনই সেরেস্তায় গেছি তখনই দেখেছি ঢুলছে বসে'। তবু ডাক্তারবাবুর খাতিরে রেখেছিলাম তাকে, কিন্তু নিজেই সে চাকরি ছেড়ে দিলে একদিন। বললে সেরেস্তার চৌকিতে না কি এত ছারপোকা যে বসা যায় না—"

রমেশ মন্তব্য করিলেন, "আয়েসী লোক ছিলেন তো। ঘুমের ব্যাঘাত হ'ত"

একটা হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

"না, না হাসির কথা নয়। কেউ খাস্ত-রসিক থাকে,

কেউ সাহিত্য-রসিক থাকে, তেমনি উনি ছিলেন ঘুষ-রসিক"

চোখ বড় বড় করিয়া সুধাতালী বলিলেন, "লোকটা ওণী ছিল কিন্তু। আমার আপনারের বিয়ের সময় নেচে গেয়ে বাড়িয়ে একাই জমিয়ে তুলেছিল লোকটা—"

"ওই জন্যেই তো ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডাক্তার-বাবু। আর একটা খবর আপনারা কেউ বোধহয় জানেন না, এই যে এখানকার হাই-স্কুল—এর প্রথম ভিৎ পত্তন করেন ডাক্তারবাবু। দুর্গাস্থানে প্রথমে খোলা হল লোয়ার প্রাইমারি স্কুল, আর সে ইস্কুলের প্রথম পণ্ডিত ওই কেশ-মশাই—"

সুধাতালী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তারপর পণ্ডিতই তো ওই পাঠশালাটা চালাতেন"

"সে পরে। প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই। ওর মাইনেটা মাসে দু'টাকা হয়ে যায় তার জন্যেই ওই পাঠশালাটা বসিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু এক ইনেস্-পেক্টার সাহেবকে ধরে'। সেকালে বড় বড় বাঙালী অফিসাররা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উঠিতেন, ডাক-বাংলা তো ছিল না। একবার এক ইনেস্পেক্টার অতিথি হয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। পাঠশালার কথা শুনে তিনি বললেন, বেশ আমি মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে' দেব। আজ আমি পাঠশালাটা দেখি একবার। তারপর আপনার দরখাস্ত দিলেই হবে যাবে। ইনেস্পেক্টার নাম-মাত্র দেখলেন একবার গিয়ে, পাঠশালাটার সামনে মিনিট পাঁচেকও দাঁড়িয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, ডাক্তারবাবু গ্রামের পাঁচজনকে দিয়ে সই করিয়ে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। তারপর থেকে মাসে পাঁচ টাকা করে' পেতে লাগলেন কেশমশাই। কিন্তু মজার কথা কি জানেন, কেশ মশাই প্রথমে এতে রাজি হন নি। তিনি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন, 'আপনি ভুল করলেন ডাক্তার-বাবু। ছাত্রেরা যে যা দিত তাতেই আমার বেশ চলে' যাচ্ছিল। এখন এই ইনেস্পেক্টার টিনেস্পেক্টার এসে রোজই একটা না একটা ঝঞ্ঝাট বাধাবে দেখবেন। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলো আঠারো ঘা। ওরা বাঘ'। ডাক্তার-বাবু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আরে না না। কোন ভয় নেই। আপনি যেমন কাজ করছেন করে' যান না। কি করবে আপনার ইনেস্পেক্টার। যদি করে তখন দেখা যাবে। ভাল করে' কাজ করলে এইটেই পরে আমার প্রাইমারি স্কুল হ'য়ে যাবে। আপনার মাইনেও বাড়বে তখন।' কেশমশাই কিন্তু বললেন না, চুপ করে' রইলেন।

সুধাতালী হাই তুলিয়া বলিলেন, "এক নম্বর কোঁড় ছিল লোকটা"

কোঁড় মানে কুঁড়ে।

"তারপর কি হল ?"

"মাস ছয়েক বেশ চলল। তারপরেই হল মজার কাণ্ড একটি। সেই ইনেস্পেক্টারটি বদলি হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বদলে নূতন আর একজন এসেছিলেন, তিনিও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু একেবারে অচেনা লোক, এ অঞ্চলে আসেন নি কখনও। তিনি যেদিন ইস্কুল ভিজিট করতে এলেন সেদিন ভুবুল বর্ষা। ট্রেন থেকে নেবেই বুঝতে পারলেন, এত বর্ষায় স্টেশন থেকে বেরুনো যাবে না। আর তখন এখানকার পথ-ঘাট যা ছিল তা তো জানেনই। ইনেস্-পেক্টার কি করবেন ভেবে না পেয়ে শেষকালে নিজের চাপরাশিটাকে পাঠালেন স্কুলটা খুঁজে বার করতে, আর সম্ভব চলে স্কুলের পণ্ডিতকে খবর দিতে। তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, চারিদিকে ঘুটঘুটি অন্ধকার। কেশমশাই তখন আপিঙের নেশায় মশগুল হ'য়ে স্কুল ঘরেই। তিনিও বেরুতে পারেন নি ইস্কুল থেকে। খানিকক্ষণ পরে সেই চাপরাশি জিগ্যেস করতে করতে হাজির হ'ল এসে তাঁর কাছে। দরজা ঠেলাঠেলি করতেই কেশমশাই জিগ্যেস করলেন—"কে—"

"আমি ইনেস্পেক্টারের চাপরাশি—"

"এখানে কি চাই"

"আপনিই কি পণ্ডিতজী"

"হ্যাঁ, কেন"

"ইনেস্পেক্টার সাহেব এসেছেন, স্টেশনে বসে' আছেন"

"তা আমি কি করব"

"তিনি আপনার ইস্কুল দেখতে এসেছেন"

"কাল বেলা দশটার সময় আসতে বোলো"

চাপরাশি এরকম জবাব শুনবে প্রত্যাশা করে নি।

অবাক হ'য়ে চলে' গেল সে। খবরটা শুনে ইনেস্‌পেক্টার সাহেবও উদ্বিগ্ন হলেন। রাত্রে থাকবেন কোথা। ডাক-বাংলা নেই, স্টেশনে ওয়েটিং রুমও নেই। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু ছিলেন তখন। তিনি পরামর্শ দিলেন ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে চলে' যান, সেখানে খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা হবে, আপনার কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। জলটা একটু ধরতেই এক কুলির সঙ্গে স্টেশনের এক-চোখো আলোর সাহায্যে ইনেস্‌পেক্টার সাহেব ছপ ছপ করে' ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গানের মজলিশ বসত। সাহেবগঞ্জ থেকে মন্মথবাবু যেদিন আসতেন সেদিন খুব জমত। অন্য রকম আবহাওয়াই ছিল তখন এ বাড়ির। আমি সুদ্ধ গান গাইতাম তখন। তবলা বাজাত কানা কার্তিক। তবলা বাজাতে তার কানা চোখটাও ফাঁক হয়ে যেত। ইনেস্‌পেক্টার আসতেই ডাক্তারবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। তারপর চা এল, নিমকি এল। ইনেস্‌পেক্টার সাহেবও গানের মজলিশে জমে গেলেন বেশ। কেশমশাই তখনও এসে পৌঁছন নি। তিনি না আসাতে মজলিশটা জমেও যেন জমছিল না তেমন। তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন তো। তবলা, বাঁশী, বেয়ালা, হার্মোনিয়াম সব বাজাতে পারতেন, গানের গলাও খুব মিষ্টি ছিল, নাচতেনও চমৎকার। ওঁর এই সব গুণের জন্যই না ডাক্তারবাবু ওঁকে খাতির করতেন এত। ওঁর একটা যাত্রার দলই ছিল না কি এককালে। শোনা যায় উনি কিমেল পার্ট করতেন, আর মদও খেতেন, কিন্তু পয়সার অভাবে—"

তহশিলদার সাহেব একটু অধীর হ'য়ে পড়েছিলেন রমেশের গল্পের দৈর্ঘ্যে।

বললেন, "আগে বড়ো না ভাই। পহলে গপ্ খতম্ করো—"

"হ্যাঁ। তারপর গান-বাজনা যখন জমে' উঠেছে, তখন কেশমশাইয়ের গলা শোনা গেল বাইরে। বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে তিনি বলছেন, "ডাক্তারবাবু, এক শালা ইনেস্‌পেক্টার এসে হাজির হয়েছে। তখনই বলেছিলুম আপনাকে, বখেড়া হবে। চাপরাশি পাঠিয়েছে আমার কাছে। উদ্দেশ্যটা যাতে তাঁকে আমি জামাই আদরে ডেকে এনে অভ্যর্থনা করি—বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। ঢুকতেই ডাক্তারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনিই আপনার ইনেস্‌পেক্টার। অচেনা জায়গা, জলে বৃষ্টিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন বলেই লোক পাঠিয়ে-ছিলেন আপনার কাছে। নিন আলাপ করুন'। ইনেস্‌-পেক্টার মৃদু মৃদু হাসছেন। কেশমশাই তো স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। নমস্কার করে' করজোড়ে বললেন, ধর্মাবতার, আপনি এখানে আছেন জানলে কক্ষনো আমি এসব কথা বলতুম না। তবে একটা কথা আপনাকে বলব, আমার মতো বহু গরীব পণ্ডিতদের মনের কথা আজ আপনি শুনে ফেললেন আমার মুখ দিয়ে। এখন আমাকে ক্ষমা করা না করা হুজুরের ইচ্ছে। জানি না ভগবানের মনে কি আছে। এমনভাবে মুখ কাচুমাচু করে' বললেন কথাগুলো যে সবাই হেসে উঠল।

ইনেস্‌পেক্টার সাহেব বললেন, "না, না, তাতে কি হয়েছে, আমি কিছু মনে করি নি। আপনি ঠিকই বলেছেন। বসুন—"

কেশমশাই বসলেন একধারে। ডাক্তারবাবু তখন আসল পরিচয়টি দিলেন কেশমশাইয়ের। বললেন "ইনি গান-বাজনাতেও খুব গুণী লোক। আপনি সে পরিচয়ও পাবেন"। তারপর কেশমশাই নেচে গেয়ে আর বেয়ালা বাজিয়ে এমন জমিয়ে তুললেন যে ইনেস্‌পেক্টার তাঁর বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট তো লিখলেনই না, উপরন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। গুণী ছিল লোকটা—

সুবাতালী বললেন, "বেশক্। আব্ উসব জমানা গিয়া ভাই। ওরকম কেশমশাইও আর হোবে না, নিস্-পিটরও হোবে না।"

নবাবগঞ্জের গোবিন্দ মণ্ডল ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, সীয়া রাম, সীয়া রাম, সীয়া রাম—বলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিলেন। গোবিন্দলাল মণ্ডল একজন জমিদার, কিন্তু তাঁহার বেশ-বাস হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি আসিয়াই কুমারকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইশত টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, এটা রাখিয়া দাও। কুমার ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। প্রশ্ন করিয়াছিল, 'কোথায় রেখে দেব

'পোস্টাপিসে রেখে দাও। আমার ঘরে টাকা চুরি

হয়ে যায়। এটা তোমার নামে জমা থাক—"

কুমার তবু ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছিল। তাহার ইতস্তত ভাব দেখিয়া মণ্ডল মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার টাকা আমার কাছে থাকাও যা, তোমার কাছে থাকাও তা। তোমার কাছেই থাক—"

"যদি খরচ করে' ফেলি—"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ মণ্ডলের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "ফেল। খুব খুশী হব তাহলে। সেই জন্যেই তো আনলাম। খরচ তো হচ্ছে চারিদিকে—"

কুমার অবশেষে টাকাটা লইয়া চলিয়া গেল। মণ্ডল মহাশয় আটচালার এক কোণে গিয়া বসিলেন, তখন হইতে বসিয়াই আছেন এবং মাঝে মাঝে "সীতারাম, সীতারাম" বলিতেছেন।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহও আসিয়াছেন। চমক লাগাইবার মতোই চেহারা তাঁহার। প্রকাণ্ড পাকানো গোঁফ এবং জুলফি, দুইই পাকা। সিংহ মহাশয়ের বর্ণ ঘোর কালো বলিয়া পাকা গোঁফ এবং জুলফি বেশ মানাইয়াছে। চক্ষু দুইটি বেশ টানাটানা এবং লাল। তিনি একধারে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে স্থানীয় গোলাদার মহাজন ওস্তাজির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ওস্তাজির চেহারাও দেখিবার মতো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। প্রকাণ্ড টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। গায়ে জামা নাই। কাঁধে গামছা, গলায় পৈতা, বুক ও পিঠ-ভরা লোম, আজানুলম্বিত বাহু। চাকরবাকরদের সহিত ক্রমাগত চেঁচামেচি করিতে হয় বলিয়া গলার স্বরটা একটু ভাঙা-ভাঙা। প্রচুর চীৎকার করিতে হয় তাঁহাকে। কারণ তিনি শুধু গোলাদারি কারবারই করেন না, রেলের কুলি-কন্ট্র্যাক্টারিও করেন। প্রত্যহ প্রায় দুইশত কুলিকে খাটাইতে হয়। চমকলাল ওস্তাজির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন একটি হারের জন্য। চমকলাল ডাক্তারবাবুর নাত-বৌয়ের সাধ-উপলক্ষে বধূকে একটি সোনার হার উপহার দিতে চান এবং এ খবরটি গোবিন্দ মণ্ডলের নিকট হইতে গোপনও রাখিতে চান। তিনি ওস্তাজিকে অনুরোধ করিতেছেন যাহাতে তিনি কলিকাতায় কোনও বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া আনাইয়া দেন। এখানে হার করাইতে গেলে ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইতে পারে। ওস্তাজির মুনিমজি (ম্যানেজার) বিশ্বাসী লোক, সমঝদারও। ওস্তাজির রেলের পাশ আছে, ওস্তাজি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার এ কাজটি করাইয়া দিতে পারেন। ওস্তাজি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন দিবেন, যদি টি-আই না আসেন। টি-আই আসিলে মুনিমজিকে এখানেই থাকিতে হইবে। তখন তিনি অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই আলোচনাই চলিতেছিল এমন সময় নিখিলবাবু প্রবেশ করাতে সুবাতালী ছাড়া আর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"আরে বস, বস, দাঁড়াচ্ছ কেন—

নিখিলবাবুও একধারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার। বাংলাদেশে তাঁহার নিজেরও ছোট-খাটো জমিদারি আছে একটা। বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি। এখানেও কার্যত তিনি জমিদার। আসল জমিদার কলিকাতা-বাসী। সবাই নিখিলবাবুকে খাতির করেন। সুবাতালী বয়োবৃদ্ধ বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। সুবাতালীও স্নেহ করেন তাঁহাকে। নিখিলবাবুর দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সুবাতালী প্রশ্ন করিলেন, "কি নিখিলবাবু, কি 'পিলান' করলেন?" পিলান মানে, প্ল্যান।

"এই যে সব লিখে এনেছি কাগজে। মেয়েদের উপর কোন ভার থাকবে না। এমন কি পান পর্য্যন্ত সাজবে মহাদেব বাঙ্কই। দুনিয়ালাল মাংস রান্না করবে কুঠিতে। এ বাড়ীতে মাংস এলে চন্দরবাবু খুঁত খুঁত করবেন। মুখপকে বলে' দিয়েছি যে খাসী নিয়ে কুঠিতেই যাবে। ওইখানেই সব হবে। আর আমিষ হবে ওদিকের চোয়ারীতে—"

নিখিলবাবু একটি লম্বা কাগজ বাহির করিয়া সুবাতালীর হাতে দিলেন। সুবাতালী মিরজাইয়ের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং কাগজটির প্রতি ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন! তাহার পর সেটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "কুছ নেহি সমঝা। অংরেজি পড়তে পারি না"

নিখিলবাবু মৃদু হাসিয়া কাগজটি পকেটে পুরিলেন।

বলিলেন, "আপনার সমঝাবার কোন দরকার

নেই। আপনার রাখানে ক'টার সময় দুধ দোয়া হবে বলুন"

"ভোর তিন্ বাজে। দু'মণ দুধ এখানে আসবে আমি বলে' দিয়েছি"

"আমি রামটহলকে দুধ আনতে পাঠাব। কয়েকটা পরিষ্কার পিতলের হাঁড়ি নিয়ে যাবে সে। আপনার গোয়ালাদের বলে' দেবেন তারা যেন দুধটা পিতলের হাঁড়িতে দোয়, কারণ ওদের কেঁড়েতে দুইলে এমন ধোঁয়া-গন্ধ হবে যে পায়েস মাটি হয়ে যাবে—"

সুবাতালী স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর হাত দুইটি উলটাইয়া বলিলেন, "বেশ তাই হোবে।

আমার উপর আর কোনও হুকুমাদেস আছে—?"

"আপনি কেবল আসর জমিয়ে বসে' থাকবেন, আপনি আর মোড়লজি। আর কিছু করতে হবে না। গল্প করবেন খালি—"

গোবিন্দ মণ্ডল "সীতারাম সীতারাম" বলিয়া মস্তকে হাত বুলাইলেন। অর্থাৎ সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

চমকলাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিজের গোঁফে তা দিলেন একবার, তাহার পর আড়-চোখে নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। ভাবটা, আমার উপর কি কোনও ভারই দিবেন না? আমি কি কোনও কিছুরই যোগ্য নই? নিখিলবাবু তাঁহার দৃষ্টির ভাবার্থ বুঝিলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন "চমকলাল, তোমার উপর খুব একটা শক্ত কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে কি না বল—"

"হুকুম করুন"

"তোমাকে মশলা-বাটার ভারটা দিতে চাই। তার মানে, মশলাগুলি বাছিয়ে, ধুইয়ে, বাটিয়ে রাখতে হবে সকাল দশটার মধ্যে। ভোর চারটে থেকে কাজ শুরু করতে হবে। মোটা দশেক জোয়ান গোয়ালা চাই। শিল-নোড়ার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার তো অনেক গোয়ালা প্রজা আছে, তোমার পক্ষে দশটা লোক জোগাড় করা শক্ত হবে না—"

"দশ বিশ যেত্না কহিয়ে—"

"তুমি তাহলে তোমার গোয়ালাদের নিয়ে সন্ধ্যের সময় এখানেই চলে এস। তুমি নিজে মোতায়েন থাকলে কাজ ভাল হবে, ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা এলার্ম ঘড়ি দিয়ে দেব, চারটে থেকে উঠে কাজ শুরু করে' দিও"

"হাঁ হাঁ—ই কোন্ বড়ি বাত্ হুয়"

"তাহলে তোমার সঙ্গে ওই কথা রইল"

নিখিলবাবু তারপর ওস্তাজির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি ওস্তাজি কুলি সাপ্লাই করবেন। বাড়ু দেওয়া, সামিয়ানা টাঙানো, জল-তোলা—এসব আপনার কুলিদের দিয়ে আপনাকেই করাতে হবে। আমার কাছে চারটে বড় বড় ড্রাম্ আছে, আপনার কাছে কটা আছে—"

"দশঠো—"

"আরও গোটা পাঁচ ছয় চাই। বড় বড় কলসীও আনিয়ে রেখেছি আমি কিছু। সব জল ভরাতে হবে। অনেক কুলি চাই, এই তারগুলো আপনি নিন—"

হাত-জোড় করিয়া ওস্তাজি বলিলেন, "লেঙ্গে—"

"আর রমেশ—"

নিখিলবাবু রমেশবাবুর দিকে ফিরিলেন।

"বলুন—"

"তোমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছি। আমিষ আর নিরামিষ তিন্‌টে ব্যাচ্ তিনজায়গায় খাবে। যারা খালি নিরামিষ তারা একঘরে, যারা মাছ আর নিরামিষ তারা একঘরে, আর যারা সব খাবে তারা আর এক ঘরে। মাছ-মাংসের ব্যাপারটা চোয়ারিতে ব্যবস্থা করলে ভালো হয়—"

"তার মানে তিন ব্যাচ্ ছোকরা চাই—"

"ছ' ব্যাচ্ চাই। তিন ব্যাচ পরিবেশন করবে, আর তিন ব্যাচ্ রান্না ঘর থেকে ওদের হাতে জিনিস তুলে দেবে"

রমেশবাবু একটু ভাঁড় প্রকৃতির লোক। চেহারাও ভাঁড়ের মতো। বেশ মোটা-মোটা, মুখখানিও গোল-গাল। নিখিলবাবুর কথা শুনিয়া চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিলেন, তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"কি, পারবেন না?"

"পারব না বললে চলবে কেন, পারতেই হবে। আমি

ভাবছি ছেঁড়াডলোর কথা জানেনই তো, আজকাল ছোঁড়াদের ব্যাপার। উত্তর দিকে হেতে বললে দক্ষিণে যাবে, পুবে যাবে পশ্চিমে যাবে, কিন্তু উত্তর দিকটিতে কিছুতে যাবে না। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে তো, তাই ভাবনায় পড়ে গেছি—"

"কেন, জন্তু, বঙ্কিম, বাজন, তোমার নাতি মুন্নো, এরা তো ছেলে খারাপ নয়—"

"আজ্ঞে, ওই ওপর-ওপরই ভালো। প্রত্যেকটির ঘাঁটিতে টক। সেদিন জানচাঁদের ছেলে রাত্রে হাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে গল্প করছিল, আমাকে দেখে বিড়িটি ফেলে দিলে অবশ্য, এ খাতিরটুকু এখনও করে, কিন্তু তাকে যেই বললাম, বাবা এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে, বাড়ি যাও। উত্তরে কি বললে জানেন, আজকাল ডাক্তারেরা বলে ওপরে পয়ীর ভাল থাকে। তখন আমাকে বলতে হল, ও হাঁ হাঁ—আমারই ভুল হয়েছে, রঘুসিংহের নিমোনিয়া হয়েছে শুনলাম। সত্যিই তো, তার নাক দিয়ে পামল্ করে' সর্দ্দি ঝোকানো হয়েছিল, মনে ছিল না কথাটা আমার—"

একটু থামিয়া গোপ বড় বড় করিয়া তাহার পর মিনমিনে কণ্ঠে বলিলেন—"প্রত্যেকটি ভেঁপো—"

গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিলেন—"সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম—"

নিখিলবাবু স্মিত মুখে বলিলেন, "তোমাদেরই বংশধর তো সব"

সুবাতালী হাসিয়া ফোড়ন দিলেন, "আপনা আপনা তোয়ানি ইয়াদ করো ভাই"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। রাধানাথ গোপ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি খাতা। তিনি খাতা হইতে সূর্য্যসুন্দরের অবস্থা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এটিও নিখিলবাবুর বন্দোবস্ত। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারেই রাধানাথ গোপ প্রতিদিন ডাক্তারের রিপোর্ট লিখিয়া রাখেন। এই ব্যবস্থা করিয়া নিখিলবাবু এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন। প্রথমত যাহারা দলে দলে আসিয়া ডাক্তারবাবুর খবর লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, তাহাদের স্নেহের অত্যাচার হইতে ডাক্তারবাবুকে বাঁচানো হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, রাধানাথ গোপকে একটা কাজ দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাবুর ধারণা তাঁহাকে কাজ না দিলে তিনি অকাজের সৃষ্টি করিবেন।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া রাধানাথ বলিলেন, "অনেক ভাল আছেন আজ ডাক্তারবাবু। হয়তো এ যাত্রা সামলেও যেতে পারেন পীর-বাবার কৃপায়। সুবাতালী তসিলদার উপরে হাত তুলিয়া বলিলেন, "খোদা কি মরজি—"

নিখিলবাবু রাধানাথ গোপকে পুনরায় মনে করাইয়া দিলেন, "তোমাকে কলা-পাতার ভার দিয়েছি, মনে থাকে যেন। এক হাজার কলাপাতা চাই"

"খুব মনে আছে। ব্যবস্থাও করেছি। এতো আমাদেরই নাড়ি-বোয়ের সাধ। এ কথা মনে থাকবে না? আচ্ছা, আমি চলি—"

তিনি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

উবার বড় ছেলে 'এক' আসিয়া খবর দিয়া গেল—"দাদুর চান খাওয়া সব হ'য়ে গেছে। আপনাদের ডাকছেন—"

"আমি একাই একবার দেখা করে' আসি আগে। এক সঙ্গে গিয়ে ভীড় করা ঠিক হবে না"

"তাই যান"

নিখিলবাবু উঠিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" আর "কথোপকথন"-এর প্রকাশ-কালের মধ্যে মাত্র মাসখানেকের ব্যবধান, কিন্তু তার মধ্যেই ইংরেজ ধর্মযাজক ও সরকারী কর্মচারী বিদেশবাসী কেরি সাহেবের হস্তক্ষেপের ফলে বাংলা গদ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে। রামরামের জীবনী পুস্তকটির সাহিত্য হিসাবে সামান্য কিছু মূল্য আছে—যা কেরির বইএর নেই। কিন্তু রামরামের অনভ্যস্ত সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা গদ্য কালির দিক্‌পে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা সত্ত্বেও শেষ হিসাবে বহুখানি উৎকর্ষ দাবি করতে পারে, কেরির ভাষা তার চেয়ে ঢের বেশি সম্ভাবনাময় এবং মনোভাব প্রকাশের বেশি উপযোগী।

সাহিত্য হিসাবেও প্রতাপ-জীবনী ঠিক ঘরোয়া প্রবন্ধ বা তরুণ-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এঁকে পাঠ্যপুস্তক তথা জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধগ্রন্থের বলাই শোভন : "লিপিমালা" একেবারেই সাহিত্য পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং রামরাম মৌলিক গ্রন্থের লেখক হলেও প্রকৃত সাহিত্যিক ছিলেন না। মৃত্যুঞ্জয় অপেক্ষাকৃত যাজিত গদ্যে সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন এবং অনুবাদে মূল সাহিত্যের রস কিছু পরিমাণে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাই অনুবাদক হলেও যখন তাঁর রচনায় সাহিত্য রস বিশেষত পূর্বাঞ্চ ও পরিহাস গল্প পড়ার আনন্দ পাওয়া যায় তখন তাঁকেই বড় সাহিত্যিক বলতে হবে।

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় বই গোলোকনাথের "হিতোপদেশ"—লেখকের গোচরীয় যাথার্থ্যের নিদর্শন। তিনি সংস্কৃত ভালো জানতেন কিনা সন্দেহ : "অর্থাৎ ক্ষীণেষু বিত্তেষু", এই অংশের বঙ্গানুবাদ তিনি করেছেন, "ধাবা ক্ষীণে ও সম্পত্তিতে !" তাঁর ভাষাও অসংবদ্ধ, পদান্বয়জ্ঞান-বিরহিত এবং ভ্রান্তির নিদর্শনে পরিপূর্ণ। বেদ চিকের উপযুক্ত ব্যবহার বিদ্যাসাগরের আগে কেউই ঠিকভাবে করতে পারেন নি। কিন্তু এ ব্যাপারে গোলোকনাথের অজ্ঞতা বা অসতর্কতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো তিনিও পালাপালির ভাষা রচনা করেছেন এবং সেই ভাষায় মাঝে মাঝে কথ্যভঙ্গি সঞ্চারিত করেছেন। সেই ভঙ্গিমার মধ্যে মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় প্রভাবের আবির্ভাব ঘটেছে। সম্ভাষণ ও সম্বোধনের ভাষায় "তুই, তুমি ও আপনি"-র প্রয়োগে বাঙ্ময় বিপর্যয় দেখা যায়। ঐ সর্বনামত্রয়ের প্রয়োগবিধি সম্ভবত তিনি জানতেন না। সম্ভাষণজ্ঞাপক সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদের পারস্পরিক সম্বন্ধও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। বিষয়বস্তুর দিক্‌পে তাঁর বই একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলে গণ্য করা চলে। ছেদ চিহ্ন দিয়ে ও বাক্যের ক্রম ভাগ দিয়ে তাঁর রচনার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :—

"সেখানে সর্ববন্ধী গুণাগোত্ত নৃবর্ধন নামে এক রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কারণ মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন। তাহার অর্থ এই। প্রাণ সকলের লোভন। অতএব, যে প্রাণ না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবেক—ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ ; সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়।

যোশ্ আন্তোনিও-র বই ৯ কালি অল্প হলেও মাত্র পনর বছর ব্যবধানের মধ্যে বাংলা ভাষার কালির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আনুষ্ঠানিক গদ্য-রচনায় তার প্রাবল্য দেখা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ঔরংজেবের প্রসাদে সমগ্র ভারতে ইসলামি আদর্শ-লনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তার অনিবার্য পরিণামে উত্তর ভারতের দেশীয় ভাষাগুলিতে কালি উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যায়। আমার, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় যে অধিকাংশ খ্রীষ্টান হয়েছে তার সেরা নজির ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধানাধ্যাপক চতুর্থ বই "লিপিমালা"। এই বইটি হচ্ছে বাংলায় Letter writing বা চিঠি লেখা বিষয়ক বই। কিন্তু এতে সমসাময়িককালের চিঠিপত্রের ভাষার উৎকট কালিবাহুল্য সম্বন্ধে বর্জন করা হয়েছে। রামরামের মতো কালিপ্রিয় মানুষ ইংরেজ কর্মচারীদের জন্যে লেখাপড়া শিখবার বই লিখতে বসে রাতারাতি প্রতাপ-জীবনীর ভাষা থেকে "লিপিমালা"-র ভাষায় পৌঁছে গেলেন কি করে, সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে সেকালের ইংরেজ পাদরিদের কালি ভাষার বিরুদ্ধে গোপন-কথা গভীর বিতৃষ্ণার মধ্যে। বাঙালির চিঠিপত্র, হিসাব নিকাশ, সামাজিক সংস্কার ও ধারণার উৎসমূলক কাহিনীগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে যে বই লেখা, তা থেকে কালি শব্দাবলী ও জমজির ইসলামি কেচ্ছা-কাহিনী একেবারে বাদ দেওয়া উচিত হয়নি। রামরাম যে নির্বিচারে সে-কাজ করেছেন, তার কারণ, প্রথম বইটি লেখার অব্যবহিত পরেই তাঁকে প্রভুদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতে

হয়েছিল। বিশেষত, কেরির সংস্কৃতানুরাগ তাঁকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল।

"লিপিমালা"-র ছাঁচে ঢালাই লোকশিক্ষার গল্প বা পৌরাণিক কাহিনীর উপর লেখাও আমরা একে সাহিত্য-গ্রন্থ বলব না। ইংরেজি essays and letters যেমন সাহিত্য-গ্রন্থ নয়, মাত্র পড়ার বই, এও তাই। "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন"-এর সঙ্গে "লিপিমালা"-র ভাষার তুলনা করলে সহজেই বোঝা যাবে, প্রবল ফার্সি প্রভাবকে কি বিদ্যুৎ-গতি ক্রিয়ায় বিতাড়িত করা হয়েছিল। আমরা রামরামের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের রহস্য অনুধাবন করলে দেখতে পাই যে, প্রয়োজনে কুড়িয়ে ও অনাবশ্যক ফার্সির কুঠারাঘাতে খুলে ফেলতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। ফার্সি যদি অপরিহার্য হত, তাহলে তার প্রভাবের সঙ্গে বঙ্গ-ভাষার সম্পর্ক হত দেহের সঙ্গে ত্বকের মতো।

হঠাৎ ফার্সির শব্দভাণ্ডার একেবারে পরিত্যাগ করলেও রামরামের রচনার ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয়নি। তার প্রমাণ "লিপিমালা"-র এই ধরণের সহ চিঠির ভাষায় :—

"তাহার কুলদরোধা এক শত টাকা দিতে হইবেক। এ সম্বন্ধ ভালো বটে কিন্তু টাকার সাংঘাতিক বৃহৎ ব্যাপার। এক্ষণে তাহার সংস্থান কি? এক শত টাকা পণ দিতে হইবেক, তদ্ভিন্ন আপনাদের ব্যয় তিন চারি শত টাকা ন্যূন হইতে পারিবেক না। তাহার সকল সম্পত্তি এই ক্ষণে হইতে পারিবেক না। আমার এখান হইতে এক শত টাকার সুদার হইতে পারিবেক। ইহার অধিক কদাপি হইবে না।"

এখানে ভাষার যে সজীবতা এবং বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গির যে দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে তা অনুরূপ বিষয়ে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভাষা রামরাম-কথিত "চলন ভাষা" না হোক, একেবারে ফার্সিবিহীন। অর্থাৎ, আনুষ্ঠানিক-এর পর আরো সত্তর বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যভাষার আধার শব্দ উপাদানের পরিবর্তন ঘটে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম বই "বত্রিশ সিংহাসন"-এর ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও তৎসম শব্দাবলীর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা গেল। ঐ প্রভাব অচিরে আতিশয্যে পরিণত হয়। "বত্রিশ সিংহাসন"-এর ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ের অন্য বইগুলির ভাষার মতো একই ধরণের দোষ ও গুণ-সম্পন্ন। এর গল্পগুলির সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যথা-রীতি আখ্যান সংস্থাপন ও ছেদচিহ্ন স্থাপনের পর এর ভাষার নিদর্শন এইরকম :—

"পরে রাজা সেই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া, পণ্ডিতলোকের-দিগকে আনাইল, শুভক্ষণ বিবেচনা করিয়া, ঋত্বিগ্বর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া, পৃথি, দূর্বা, চন্দন, পুষ্প, অগোর, কুঙ্কুম, গোরোচনা, ক্ষীর, ঘৃতাদি, চামর, মযূরপুচ্ছ, ছত্রদণ্ড, পতিপুত্রবতী স্ত্রীলোকের হস্তেতে ধর্মপাদি অধিবাস সামগ্রী, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্রচর্ম, এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপর শ্রীভোজরাজা গুরু-পুরোহিত-প্রতি-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ-মন্ত্রিপাত্র-সৈন্যসেনাপতি পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন।"

এই ভাষা, রামরামের ভাষার তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি থাকলেও দৃঢ়তা সম্পাদনের ক্ষমতা বেশি হওয়ায়, একটা বলিষ্ঠ ভাব-প্রকাশের বেশি উপযোগী হয়ে উঠেছে। একটু বুদ্ধিযোগ থাকলেও বাক্যগঠনের শৃঙ্খলবিধানে কৌশল মৃত্যুঞ্জয় সবচেয়ে বেশি জানতেন। তাঁর ভাষার অর্থ বোঝা অন্যের ভাষার তুলনায় সহজসাধ্য।

প্রবোধচন্দ্রের নবম গ্রন্থ "রাজাবলি"-তে কিছু ফার্সি শব্দের ব্যবহার আছে। উপযুক্ত প্রসঙ্গের অবতারণায় তিনিও ফার্সি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। মুসলিম শাসনের বর্ণনাকালে তিনিও "যবনদেবের সহকারে করিলেন" ধরণের ফার্সিমিশ্র বাক্য রচনা করেছেন। সুতরাং এই বইএ বাংলা কথাভাষার অনুকূল শব্দাবলীর সঙ্গে ফার্সি ও সংস্কৃত, দুই ভাষার শব্দসমূহের সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছে। এটা বোঝা যায় যে, প্রসঙ্গানুযায়ী ভাষাবিধানের আবশ্যকতা তিনিও জানতেন। কিন্তু তা হলেও "রাজাবলি" কোন সাহিত্য বা সাময়িকের সন্ধান এনে দিতে পারেনি।

"বত্রিশ সিংহাসন"-এর পরে প্রকাশিত তারিণীচরণের "ঈসপের গল্প" বইটিতে ইংরেজি ধরণে বাংলা বাক্য গঠনের নমুনা প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। হোম্ আন্তোনিও আর আনুষ্ঠানিক-এর পরে তারিণীচরণ ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব বাংলাভাষায় এনেছেন। কিন্তু ইংরেজি ভাষার বাক্য গঠন প্রণালী আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করায় তাঁর বিদেশি প্রভাব কিছুমাত্র কাজের হয়নি। পরবর্তীকালে বহু গদ্যলেখক বাংলাভাষায় ইংরেজি বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন। বাংলা গদ্যে ছেদচিহ্ন স্থাপনের রীতি, উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রয়োগের কৌশল, সংলাপ বর্ণনাকালে বক্তার দুই বাক্যাংশের মাঝখানে লেখকের বক্তব্যসম্বলিত বর্ণনা দেওয়ার বৈচিত্র্যময় প্রণালী, সবই পাশ্চাত্যভাষার প্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু তারিণীচরণ পরবর্তীদের মতো পাশ্চাত্য প্রভাব সুকৌশলে বিদেশি ভাষার সহজাত বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ করে দেবার নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাই ইংরেজি, ফার্সি আর উর্দু ভাষায় ওয়াকিবহাল হলেও তিনি বাংলা গদ্যে কোন অভিনব রীতি প্রবর্তন করতে পারেন নি। মাতৃভাষা ভালো করে জানা না থাকায় তাঁর বিদেশি ভাষার জ্ঞান কোন কাজে আসে নি। বিদেশি ভাষার অভিজ্ঞতার জন্যেই তাঁকে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে থাকবেন। "A bit of cheese."-এর অনুবাদ যে "একটুকরা পনীরের" নয়, তা না জানার জন্যে বেচারী তারিণীচরণ আচার্য সুকুমার সেনের দ্বারা উপহসিত হয়েছেন। ঐ রকম দু একটি ভুলের কথা বাদ দিলে তারিণীচরণের ভাষা মোটামুটি সন্তোষজনক। লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি অপেক্ষাকৃত সরল ও কথ্যভঙ্গির গদ্য রচনা করেছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দ কম ব্যবহার করেছেন। হয়ত তিনি ভালো সংস্কৃত জানতেন না। কিন্তু কারণ যাই হোক, তৎসম শব্দের আধিক্যবিহীন তাঁর রচনা মোটের উপর মন্দ নয়। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র

যাত্রার গদ্য রচনা করেছেন। এক জায়গায় তাঁর দুরূহবোধ্য ভাষা ইংরেজি রচনাশৈলীকে যেমনভাবে অনুসরণ করেছে :—

"তোমার সুন্দর মূর্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতি। যদি অনুগ্রহপূর্বক তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে, তবে নিঃসন্দেহে জানিতাম যে, তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে। * * * ঐ কাককে অবসরক্রমে আপন মিথ্যা পরিমায় শেষ করিতে রাখিয়া গেল।"

এখানে শেষ বাক্যটি ইংরেজি রচনারীতির হুবহু অনুবাদ বটে, কিন্তু সার্থক অনুবাদ। অন্যত্র তাঁর রচনায় কর্তৃপদবিহীন বাক্য দেখা গেছে। তাতে মানে বুঝতে অসুবিধা হয় না। সংস্কৃত বা ইংরেজি-ভঙ্গির বাক্যে এ ধরণের প্রয়োগ অকল্পনীয় :—

কহিলেক, "হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

এইভাবে কর্তৃপদের ব্যবহার না করে বাক্যরচনা করা কথাভাষার বৈশিষ্ট্য। ইতালীয় ভাষাতেও ঐভাবে কর্তৃপদ অনুক্ত রেখে বাক্য গঠন করা হয়। বোঝা যায় যে, চলতি ভাষায় কথা বলার সময় আমরা যেভাবে মাঝে মাঝে কর্তা-র উল্লেখ করি না, মিত্র মহাশয়ও সেই ধারা গ্রহণ করেছেন। মৌলিক গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলে তিনি সম্ভবত অভিনব রীতি খুঁজে পেতেন। তাঁর আর কোন রচনা পাওয়া যায় না।

সপ্তম গ্রন্থ চণ্ডীচরণের লেখা, ফার্সিনবিসের বাংলার নিদর্শন হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য বই। রামরাম বসুর ভাষার চেয়ে তারিণীচরণ ও চণ্ডীচরণের তৈরি গদ্যভাষা কোন অংশে খারাপ নয়। সংস্কৃত "শুকসপ্ততি" বা শুকপাখির মুখ দিয়ে বলানো সত্তরটি গল্পের এক সংকলনের ফার্সি অনুবাদ "তুতিনামা"-র যিনি অনুবাদ "তোতা কাহানী"-র বাংলা অনুবাদ "তোতা ইতিহাস" বা "তোতা ইতিকাল"-এর ভাষা রামরাম ও কেরির রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত। চণ্ডীচরণ ছিলেন মুন্সি অর্থাৎ ফার্সিতে পারদর্শী; কিন্তু তাঁর রচনায় ফার্সির উপদ্রব নেই। তাঁর ভাষাও সংস্কৃত-ভঙ্গির দৃঢ় কাঠামোয় স্থাপিত। গোলোকনাথ ও মৃত্যুঞ্জয়ের মতো রামরাম রামরাম কথাভঙ্গির অসমঞ্জস প্রয়োগ না থাকায় তারিণীচরণ, রাজীবলোচন ও হরপ্রসাদের মতো তাঁর লেখাতেও একটা স্থিরতার ভাব আছে। এই গুণে সে-যুগে হটন ও ইয়েট্‌স্ সাহেবদের বাংলা রচনাসংগ্রহে তাঁর রচনাংশ বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান লাভ করে। চণ্ডীচরণের রচনার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির অনুসৃত বাংলা গদ্যের ধারা অতিক্রমের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কি ফার্সি কি তৎসম, কোনরকম শব্দাড়ম্বরকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। বহুপরিচিত ভিন্ন অন্য ধরণের সংস্কৃত শব্দ তাঁর রচনায় কমই দেখা যায়। তাঁর ভাষার নিদর্শনে দেখা যায়, দুরূহতা বা দুর্বোধ্যতা খুব সামান্য :—

"অতএব, আমি তাঁহার চাকুরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ হেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকুরি করিতে আসিয়াছি। মহারাজ হেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদরবারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্মে নিযুক্ত কর, পরে কর্মকর্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকুরিতে নিযুক্ত করিলেন।"

এই অংশ কিংবা পূর্বোদ্ধৃত তারিণীচরণের ভাষা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা ঐ গদ্যভাষা এখনকার সাধু ভাষার মতো হয়ে উঠতে পারে। আজকের দিনের "আনন্দবাজার" "যুগান্তর" প্রভৃতি সংবাদপত্রে ব্যবহৃত গদ্যভাষার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত অংশের কোন মৌল প্রভেদ নেই। উনিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা গদ্যের অবস্থা, বিশেষ করে ফার্সি ও সংস্কৃত প্রভাবের পারস্পরিক বিরুদ্ধতা আর পণ্ডিতি বাংলা ভাষার কথা বিবেচনা করলে চণ্ডীচরণ প্রভৃতির কৃতিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

রাজীবলোচনের বই "History of Raja Krishna Chandra Roy বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্রং" রামরামের লেখা প্রতাপাদিত্য-জীবনীর আদর্শে রচিত হলেও এর ভাষা অনেক বেশি সরল। অনেক পরিমাণে ইতিহাসাশ্রিত এই জীবনী গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখক শুধু কেরির নির্দেশ অনুযায়ী সংস্কৃতপ্রভাবিত সাধু গদ্যই রচনা করেন নি, ইংরেজ আতিরও অনেক সুখ্যাতি করেছেন এবং মৃত্যুঞ্জয়ের মতোই স্পষ্টভাষায় ইসলামি শাসন ও শাসক সম্প্রদায়ের নিন্দা করেছেন। এই বইটির ভাষা সম্বন্ধে আচার্যযুগল হুকুমার সেন ও মনোমোহন ঘোষ অনেক সুখ্যাতি করেছেন। এর ভাষা "বত্রিশ সিংহাসন"-এর চেয়ে বেশি এগোতে পারে নি। নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু দেখলে সে-কথা বোঝা যাবে : —

"জগৎ শেঠ প্রভৃতি কহিলেন, এমন কে, তাহা বিস্তারিয়া কহ। রাজা কহিলেন, বিলাতে নিবাস, জাত ইঙ্গরাজ, কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন। যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন, তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন, তাঁহাদিগের কি কি গুণ আছে? * * * রাজ সমাচার পুস্তকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন, বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক, আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন।"

এই অংশে "হবেক" ক্রিয়াপদটি লক্ষণীয়; এই কথা রূপ নিতান্ত আকস্মিক।

এর পরে প্রকাশিত "হিতোপদেশ"-এর অনুবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। বত্রিশ-সিংহাসন ও রাজাবলি তুলনায় উন্নততর গ্রন্থ। সংস্কৃত অনুবাদেও তিনি গোলোকনাথের মতো ভুল অন্তত এক জায়গায় করেছেন, "শ্রীযুত দেবপাণানাম্"-এর অনুবাদ তিনি করেছেন, "শ্রীযুক্ত মহারাজার পায়ের!" কথ্যভাষার বিমধুর প্রয়োগ গোলোকনাথের মতো তাঁরও একটি দোষ। গালাগালি ও উপহাসের ভাষায় ব্যতীত কথ্যভাষার প্রয়োগ যেন মোটামুটি দুজনেরই এই মনোভাব দেখা যায়। রাজাবলির ভাষা অবশ্য উন্নততর; সে-কথা আগে আলোচিত হয়েছে। রাজাবলির একটি শ্রেষ্ঠ অংশ মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার চমৎকারিত্ব দেখাবার জন্যে তুলে দেওয়া হল :—

"কান্যকুব্জ দেশের রাজা গাধিচন্দ্র রাঠোর মহাবলপরাক্রম ছিলেন এবং

বড় রসী ছিলেন। কাহাকে বলেছে, কাহাকে শ্রীহিতে, এইরূপে তিনি কুমারিকাখণ্ডের সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যারত্নটী নামে অপূর্বসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে যে বর উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা একদিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত করি, সে তোমার মনোনীত হয় না। ইহাতে তোমার মনস্থ কি, তাহা আমাকে কহ, আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করি।"

"প্রবোধচন্দ্রিকা"-র মৃত্যুঞ্জয় কথ্যভাষার ব্যবহার মাঝে মাঝে করেছেন বটে কিন্তু তার প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়; ১৮১৩ সালে রচিত এই বইটির ভাষাই উনিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা গদ্যে কথ্যভাষার স্থান নির্ণয় করে। সে-স্থান মর্যাদাব্যঞ্জক নয়।

প্রহ্বালার একাদশ গ্রন্থ "ইতিহাসমালা" কেরির লেখা হোক বা না হোক, বেশ পরিমার্জিত ভাষায়; এটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মৌলিক গল্পসংগ্রহ। "বত্রিশ সিংহাসন" ও "হিতোপদেশ"-এর অনুবাদগুলিকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম অনূদিত গল্পসংগ্রহ বলা যায়। "লিপিমালা"-তেও গল্পের আভাস আছে। কিন্তু প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক গল্পের দেখা পাই "ইতিহাসমালা" গ্রন্থে। এর গল্পগুলি অনুবাদ নয়, কেচ্ছা বা কিংবদন্তীর নীরস গল্পরূপ নয়, আবার এর সব গল্প ইতিহাসানুসারীও নয়। প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেন, এই বইটিই এই গ্রন্থমালার শ্রেষ্ঠ বই। সুকুমার সেন মনে করেন, বইটি হয়ত মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা। তা যদি হয়, তাহলে মৃত্যুঞ্জয়কে এগুলির শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক বলে মনে করতে আপত্তির কোন কারণ নেই। এই বইটি বিদ্যালঙ্কার ব্রহ্মণের রীতিতে রচিত এবং এটিই গ্রন্থমালার শ্রেষ্ঠ বই, অন্তত এই দুটি ব্যাপারে যখন আচার্য সুকুমার সেনও একমত, তখন মৃত্যুঞ্জয়ের রচনারীতিই যে উনিশ শতকের প্রথম পাদের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনারীতি, এবিষয়ে দ্বিমত হতে পারে না। আচার্য সেন যদিও লিখেছেন, "কেরির সংশ্লিষ্ট লেখকদিগের মধ্যে রামরাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ," তবুও তিনিই আবার স্বীকার করেছেন, "ইতিহাসমালার রচনা-ভঙ্গি সংস্কৃতঘেঁষা; এগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রীতিতে রচিত; ইতিহাসমালা রচনাভঙ্গির দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ।" সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত গল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এ বইটির সাহায্যে দৃঢ়তর হচ্ছে।

"ইতিহাসমালা"-য় কেরির তথা ইংরেজি বাগভঙ্গি বা বচন-প্রয়োগের কিছু প্রভাব আছেই। কোন বাঙালি লেখক বাংলায় বই লিখতে বসে 'ঘটক কাকে বলে তা বোঝাতে অন্য কোন মুহূর্তে গদ্য ব্যবহার করবে না। অথচ এক জায়গায় লেখা হয়েছে "ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক!" এই "বিবাহের যোজক" ব্যাখ্যাটি ইংরেজি Match-maker শব্দের অনুবাদ। এই ইংরেজের বোঝার জন্যে দরকার হতে পারে, কিন্তু বাঙালির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ পাঠকের বোধ-সৌকর্যার্থে ঐ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাজ যদি কেরি করেছেন বা তাঁর সংশোধনে কি তত্ত্বাবধানে হয়েছে। যে ১৩৮টি গল্প এতে সংগৃহীত হয়েছে তিনি কেবল সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, এমন না হতেও পারে।

হরপ্রসাদ রায়ের "পুরুষ পরীক্ষা"-র ভাষায় দেখা যাচ্ছে যে, মৃত্যুঞ্জয়-প্রবর্তিত রচনারীতি স্থায়ী স্থপতাভ করে নির্দিষ্ট মানে উপনীত হয়েছে। হরপ্রসাদের ভাষায় চাঞ্চল্য বা অসংযম নেই; শব্দাড়ম্বর, কাদি বা সংস্কৃত ভাষার আতিশয্যময় প্রভাব, রাজকর সরকারের আশার কথ্যভাষার বিকৃত প্রয়োগ প্রভৃতি দোষদুষ্টের অভাব তাঁর লেখায় নেই। তিনি সেকেলে গদ্যভাষার দীর্ঘ ও অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াপদ লিখে গেছেন, নতুন কিছু করতে না পারলেও। তাঁর রচনার একাংশ থেকে তাঁর গদ্যের উৎকর্ষ দেখানো হল :—

অনন্তর নরপতি নিবেদন করিলেন, "হে কমলে! যদি তুমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা কর, তবে কোন্ ব্যক্তি তোমার গমন বারণ করিতে পারিবে? যে স্থানে তোমার ইচ্ছা হয়, সেই স্থানে যাও। কিন্তু আমি এক বর প্রার্থনা করি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সেই বর দেও।" লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, "তুমি যদি আমার গমনের নিষেধ না কর, তবে তোমার যে বর প্রার্থনীয় হয়, তাহা চাহ। আমার অন্যত্র গমনের বারণ ভিন্ন যে যে বর চাহিবা, আমি তাহাই দিব।" রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "হে ভগবতি! আমার গৃহে পরিজনদের কখনও অনৈক্য না হয়, তুমি এই বর আমাকে দেও।" লক্ষ্মী রাজার এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, "হে রাজন্! যদি তোমার গৃহে পরিজনদের অনৈক্য না হয়, তবে কি প্রকারে আমার অন্য স্থানে গমন হইবে? আমি নদীর ন্যায় নীচগা এবং বিদ্যুতের ন্যায় অস্থিরা; কিন্তু আমি যেমত রামচন্দ্রের প্রিয়তমা হইয়া তাঁহার নিকটে চিরকাল আছি, সেই মত নীতিশালী রাজার অতিপ্রিয়তমা হইয়া তাহার নিকটে দীর্ঘকাল থাকি এবং অনীতি কিম্বা কলহ, এই দুই ব্যক্তিরেকে তাহার নিকট হইতে গমন করি না। অতএব, আমি অন্যত্র যাইতে পারিলাম না।" ইহা কহিয়া লক্ষ্মী নরপতিকে ঐ বর দিয়া রাজার গৃহে চিরকাল স্থিরতরা হইয়া থাকিলেন।"

এই গল্পের স্বাধীনতা ও সৌষ্ঠব মৃত্যুঞ্জয়েরও ঈর্ষার যোগ্য হওয়া উচিত ছিল। তাঁর গদ্য রচনাশৈলীর চরমোৎকর্ষ দেখা গেছে উপরের উদ্ধৃতিতে। সমস্ত বইটির ভাষাই একই রকম অবাধ, সরল ও প্রয়াসশূন্য লিপিকুশলতার সুখপাঠ্য নিদর্শন। পরে যাঁরা বিদ্যাসাগর এই রকমের গদ্য রচনা করেছেন। অক্ষয়কুমারও এর চেয়ে খুব বেশি উন্নত গদ্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। আর রামমোহনের পক্ষে এত ভালো গদ্য লেখা অকল্পনীয় ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অনুবৃত্তি হিসাবে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের লেখা "বেদান্ত চন্দ্রিকা" এবং "প্রবোধ চন্দ্রিকা"-র আলোচনা করতে পারি। এই বই দুখানি প্রকাশিত হবার আগেই বাংলা গদ্যরচনার জগতে ভাষা ও সাহিত্য দুদিক থেকে অভিনবত্বের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল। "বেদান্ত চন্দ্রিকা" ১৮১৭ সালে প্রকাশিত

৩য় রামমোহনের ১৮১৫ সালে প্রকাশিত বৈষয়িক রচনার প্রতিবাদে। বেদান্ত চন্দ্রিকার ভাষার কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। বাংলা গদ্যে রামমোহনের প্রধান দান যুক্তিতর্ক ও বিতর্ক পরিচালনার কাজে যুক্তিপ্রাণ প্রবন্ধের মাধ্যমে গদ্যভাষার ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধন। তাঁর সেই প্রয়াসের ফলে প্রকাশ্যে অসহযোগিতা ঘোষণা করল "বেদান্ত চন্দ্রিকা"। এই গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয় লৌকিক ভাষায় বেদান্তচর্চার নিন্দা করেন। বইটি যে তাঁর লেখা, তার কোন অকাট্য প্রমাণ সে-যুগে ছিল না। সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে তাঁকেই লেখক বলে ধরা হয়। প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১৩ সালের রচনা হলেও তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। মার্শম্যানের লিখিত ভূমিকা-সংযুক্ত এই বইটিই অনেকের মতে, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

"প্রবোধচন্দ্রিকা"-র গতি ভাষা যে কেবল তিক্ততার, উপহাস ও কটূক্তির ভারে ভারাক্রান্ত হয়েছে এটা সুবুদ্ধি বা সুবিচারের অভাব নির্দেশ করে। মার্শম্যানও এতে একটু বিচলিত হয়ে বলেছেন :—

"The writer, anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders."

ঐ নিকৃষ্ট চলতি ভাষার বেশি নমুনা দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। সেরিক থেকে মোক্ষোকমাথের অপকৃষ্ট রচির অনুসরনই করা হয়েছিল। সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণে গঠিত বইটির গদ্যভাষা ১৮১৪ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যের অগ্রগতির পরিমাণ নির্দেশ করে। এর ভাষা নিঃসংশয় সংস্কৃত প্রাধান্য সূচিত করে। নানা শাস্ত্র ও বিদ্যার আলোচনা এবং মূল্যবান্ ব্যাখ্যার জন্যে বইটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ; তেমন কোন সাহিত্যগুণ এর নেই।

এই যুগে লেখা বইগুলির মধ্যে মৌলিক গদ্যসাহিত্য হিসাবে একমাত্র "ইতিহাসমালা" এবং অনূদিত গদ্যসাহিত্য হিসাবে "পুরুষপরীক্ষা" উল্লেখযোগ্য। অন্যত্র সামান্য সাহিত্যগুণ আছে, প্রকৃত সাহিত্যরস একেবারে নেই। "বত্রিশ সিংহাসন" এবং "প্রবোধচন্দ্রিকা"-র মৃত্যুঞ্জয় তাঁর রচনাগুলির চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন যদিও "পুরুষ পরীক্ষা"-র সংযত রচনাশৈলী হরপ্রসাদ রায়ের হাতে তাঁর গুলির অধিকতর উন্নতি প্রমাণিত করে।

১৮১৪ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন ও তার মুদ্রাযন্ত্রের কীর্তিকাহিনীও সমাপ্ত। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার পর শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকদের প্রয়াস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ও প্রধান কর্মকাহিনী ১৮১৮ সালে লেখা দেশ : সমাচার-দর্পণ। কিন্তু তার আগেও তাঁরা অনেক কাজ করেছেন। সে-প্রসঙ্গে সতর্ক আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষত, কারো কারো ধারণা এই যে, শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকেরা বাংলা গদ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন যা না বললে বাংলা গদ্যের কিছুই হত না ; আবার অনেকের মতে, যা করার সব রামমোহন একাই করে গেছিলেন, মিশনারীরা একটা উল্লেখক কারণ মাত্র। দুই ধারণাই একদেশদর্শী।

প্রথমে একথা বলে রাখা ভালো যে, শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকেরা এমন কোন আকাশ-ছোঁয়া গদ্য রচনা করে যাননি যার জন্যে পুলকিত হবার কোন কারণ আছে। তাঁরা গদ্যভাষা রচনা ও সংগঠনের কাজে যেটুকু উপকারে লেগেছিলেন তার পরিমাণ ব্যাখ্যাতিক ধর্মযাজকদের চেয়ে অনেক বেশি। পোর্তুগীজ পাদ্রিদের তুলনায় প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রিদের দান অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের রচিত গদ্য মোটের উপর অপকৃষ্ট, একথা বলতেই হবে। তাঁদের রচনাগুলি বাঙালি গদ্যলেখক কোনদিন অনুসরণ করেনি। অন্যদিকে একথাও ঠিক যে, মিশনের মুদ্রাযন্ত্রে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের যে অতুলনীয় সাহায্য করেছিল, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরস্মরণীয়। গদ্য রচনার তুলনায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার কাজের দাম অনেক বেশি। ১৮১৪ সালের পরবর্তী দশকে বাংলা গদ্যে নতুন যুগ প্রবর্তন ও সেই যুগকে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের প্রয়াস অসামান্য কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁরা চিরদিন বাঙালি জাতির শ্রদ্ধাদানের পাত্র হয়ে থাকবেন। ১৮১৪ সালের মধ্যে তাঁরা বাংলা গদ্যের জন্যে কি করেছিলেন, এবার তার হিসেব দেওয়া যেতে পারে।

১৮০০ সালে কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি কয়েকজনের উদ্যোগে বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম প্রায় সমস্ত বাংলা বই এই মুদ্রাযন্ত্র থেকে ছাপা হয়েছিল। খালি বাংলা গদ্যের জন্যে নয়, ঐ ছাপাখানার দান বাংলাদেশের সমগ্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দিক থেকে খুব বেশি। শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকগণ এর পর বাইবেলের বঙ্গানুবাদ বার করতে উদ্যোগী হলেন। নয় বছরের চেষ্টায় ১৮০৯ সালে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮১০ সালেই সামান্য অংশ প্রথম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়। কমল

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৈকালে ছুটে গেছে। সূর্যাস্তের আগে সমুদ্রের তীরে পৌঁছাতে না পারলে একটা দৃশ্য দেখতে পাবো না, সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত। দ্বীপের পূর্ব-পশ্চিম দুইদিকেই সমুদ্র, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই যেন দেখা যায়।

বড় ডিঙিতে চারখানা দাঁড় একটা হাল খাটিয়ে টলাম। মালী সাহেব, ইয়াকুব, শরিফ—আরও দুজন দাঁড়ি, আমরা দুজন, মাইল দেড়েক ঠেলে গিয়ে পড়লাম খাল ছাড়িয়ে সমুদ্রের চরে। ভাঁটা চলেছে তখনও। প্রশস্ত বালিয়াড়ির বুক চিরে গেছে, ঢেউএর আলপনার ফাঁক ফাঁকা তার অঙ্গরাগ। দূরে কেঁও-গাছের কালোপাতার বুকে সাদা ফুলের মত গুঁড়ি-গুলো জোড়া হয়ে উঠেছে। বড় বড় গাছ গুলো অনেক জোড়ে চুরে দুমড়ে পড়ে রয়েছে মাটিতে, চরভূমি বিধ্বস্ত, মনে হয় শত শত মত্তহাতী যেন রব না করে বিরেছে ওই বনভূমিকে,...সমুদ্রের তুফান—ঝড়ের হিংস্র আঁকা আছে ওদের বুকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে দুর্ধর্ষবেগে হাঁকে হাওয়া, লাখ লাখ মাথায় করে ঢেউগুলো ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে, তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে ঘাসা গাছগুলোকে ঝড়ের ঝোপ।

আজ বড়ই শান্ত—স্থির। দূরে বনভূমির প্রান্তদেশে লুটিয়ে পড়ছে একটার পর একটা ঢেউ ; আবছা করে গান শোনাচ্ছে। আবার ওই সমুদ্রই একদিন মাতাল হয়ে তাণ্ডব তোলে ওর বুকে। নির্জন পৃথিবীর কোণে সমুদ্র রমণীর এই ভালোবাসা—অভিসারের পালা দেখতে মানুষ সেদিন আসে না। নিভৃত আকাশের নীচে চলে ওদের বিনারাত্রির আলাপন।

দূরে ঝোড়াঝিঁ ঝোলাকুমিরে, শিয়ুক, ছোট শঙ্খমাতীর জীব, সমুদ্রের ফেণা কুড়াচ্ছি। সঙ্গে যারিয়া সকলেই মেয়েছে, কারুর হাতে ছেঁচে, ছুড়ুল, বা ইত্যাদি। কাছেই বন, চরের মাথায় মিঠা জলের ঢুলো আছে, সুতরাং বন থেকে অল্প জন্তু তো আসেই, বাঘের পায়ের ছাপও দেখা যায় ; পোষাক—অর্থাৎ সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরা ছেড়ে দিয়েছি। ইস্ত্রির পাট তুলে দিয়েছি। সাদা পাটভাঙ্গা জামা কাপড় পরে বেরুলে বাঘিনী ছেয়ে ফেলে, ঘুরে ঘুরে খাকে। বহু মূর্তির সামনে নিজেকে সঙ্কুচিত মনে করি। পোষাকের সাম্যতা রক্ষা করা সভ্যসমাজের কিছুটা প্রয়োজন, কিন্তু এখানেও পোষাক পরা দেখবার কেউ নাই। পরেছি একখানা পুঙ্গি, গেঞ্জি, সঙ্গে একটা পাঞ্জাবীর উপর একটা পুরোহাতা সোয়েটার।

জায়গাটা দেখে খুবকে দাঁড়ালাম। বালিয়াড়ির বুকে জন্মেছে আকন্দগাছের বন, আশপাশের জঙ্গল ; যেন অতল বহুরাশী তীরের চরের উপর জঙ্গল। এইখানে বাওয়ালিরা চুঁয়ো খুঁড়ে মিঠে জল নিয়ে যায়। জোয়ারের জল ওঠে না এখানে, উঠলে সব নোনা হয়ে যেত। সুন্দরবনের প্রায় সব অংশেই জোয়ারের জলে ডুবে যায়। ভাঁটায় জেগে ওঠে কাদা ভর্তি হয়ে।

সমস্ত সুন্দর বনভূমি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দশ থেকে পনেরো ফিট নীচে ; জোয়ারের সময় নোনা জল প্রায় সমস্ত বনভূমিকে ঢেকে ফেলে, উঁচু গাঁই গাঁচারটা ছাড়া। তখন বাঘ—হরিণ প্রভৃতি জন্তুরা এই সময় জলেই দাঁড়িয়ে থাকে, হরিণ-পাল গাছের ডালে বাধা আটকে ভাঁটার অপেক্ষা করে ; এই জায়গাটুকু দেখলাম যেন উঁচু, আলিসাহেবও সাবধান করে দেন।

সন্ধ্যার আগেই দেখে আসুন বাবু ওখান থেকে, জোয়ার সুরু হয়েছে। জল প্রাবোয়ারের কথা বলা যায় না।

পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা জোয়াকাটা কি! খুব ছোট মত। লাফ দিয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসেছি। মৌড় মারবো কিনা ভাবছি।

একজন মাঝি বৈঠার আঘাতে শেষ করে দেয় ওটাকে। একটা বনবিড়ালের বাচ্চা—বড়বা বলে ওঠেন।

"কখনো পালাবার চেষ্টা করোনা, বাঘই যদি হয় মৌড়বার চেষ্টা করা মাত্র আক্রমণ করবে। সামনে পড়েই যদি যাও—মৃত্যুতো নিশ্চিত, তবু দাঁড়িয়ে পড়াই ভালো। আর যে বাঘ তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে, তাকে তুমি দেখতে পাবে না। সামনে থেকে না—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয় এখানে পিছন থেকে, না হয় পাশ থেকে।"

কাশবন ছেড়ে যায় ছয়ে এলাম চরে। জোয়ার এসেছে। পশ্চিমে আকাশ—সমুদ্র লাল হয়ে উঠেছে, দুরন্ত শিশু যেন মায়ের কপালের সিন্দুর টিপটা তার সাদা মুখে চোখে লেপে দিয়েছে। জলের নীচে মিলিয়ে গেছে আধখানা সূর্য্য, আধখানা যাই যাই করেও রয়ে গেছে, যেন সাদা শুভ্রের উপরিভাগ রঞ্জিত হয়ে উঠেছে লাল আবীরের রংএ। শোঁ শোঁ গর্জন শোনা যায়, সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে আসছে এক একটা ঢেউ, আছড়ে পড়ছে বালির বুকে—ফেণায় ভরে উঠছে বালির বুক, ফিরে ফিরে আবার এসে পড়ছে। তালে তালে—ছন্দবদ্ধগতিতে।

সব রঙ টুকু মিলিয়ে গেল, কেমন সমুদ্র একটা আভা তখনও তার সবাঙ্গির উপর ছিরে রয়েছে, ধীরে ধীরে বেগুনে থেকে ঘন কালো রংএ চড়ান পড়লো।...

নৌকা মাঝিরা ঠেকে গেছে। একজন দাঁড়ি অপেক্ষা করছে একটা ঢেউ আসছে—ফেঁপে ফুলে মত আকারে আসছে ঢেউটা, ঠিক,

তার মাথার উপর ডিঙিটাকে ঠেলে দিয়ে লাফ মেরে চড়ে বসল। খালাসী মাঝির মত ডিঙিটা একটা ঢেউ থেকে আর একটা ঢেউয়ের উপর লাফ দিয়ে চললো। বাঁ হাতে আমাদের খাল ;···মোহানার টানে নৌকা দিয়ে ঢুকলো ভরা পালে,।

দুপাশে বনভূমিতে মেখেছে কালো আঁধার। রাতের শুরু অন্ধকার ভয়ে ওঠে হরিণের ডাকে। এমন চমৎকার প্রাণীর এমন উদ্ভট ডাক যেন বিশ্রী লাগে। টর্চের আলোয় দেখা যায়—দু'একটা দাঁড়িয়ে আছে খালের ধারে—কালো চোখে ঠিকরে পড়ে নীল আলো ; পলকহীনের হাতের তীরের মত লাফ দিয়ে সোঁ করে বনের গভীরে চলে যায়। ইসুফ এক-সের পাঁচপো ইলিশ খেয়েও খুশী হয় নি। আপশোষ করে—একটা যদি পেতাম আলিসাহেব, তিরিশ পঁয়ত্রিশ সের গোপত নির্ঘাৎ। 'ইস্—মওকা ফিলে গেল। খালের মধ্যে আর একখানা গুজরাতীর নৌকা রয়েছে ; মালিকদের দেখা পেলাম না, তাঁরা বাকি রাত ঘুমুচ্ছেন। পেলে তবু একটু আলাপ সালাপ করা যেত, কাটতো সন্ধ্যাটা।

নৌকায় ফিরে দেখি—ভদ্রলোক দুজন আমাদের জন্যেই বসে রয়েছেন। একজন ব্যবসায়ী, অন্যজন আমারই মত এসেছেন সুন্দরবন দেখতে, বিলে বাঁয় তো শিকারও করবেন। আমি বৈকল্প—ভদ্রলোক দেখলাম শাক্ত।···ইতিপূর্বে অনেক বিশেষ শিকার করেছেন। ডাক নাম শুনলাম রাঙ্গাবাবু—বেশ মিশুক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নামলাম 'রাঙ্গাদা' ডাকে। গা—ভিঁড়ে ভাজা সিগারেট আর আড্ডা। সাগরদ্বীপের জঙ্গলে ভদ্রলোক একবার একটা 'ম্যানইটার' মেরেছিলেন—তাঁরই রোমহর্ষক গল্প সুরু করলেন ; রাঙ্গাদার গল্প বলবার অফুরান আগ্রহ ; চারিদিকে নেমে এসেছে রাত্রির অন্ধকার,···খালের ধারে বসে শোনা যায় হরিণের ডাক, দূর থেকে ভেসে আসছে নদুরের গর্জন।

রাঙ্গাদা বলে চলেছেন,—বারিওদার ওপাশে গহন জঙ্গলের মধ্যে গাছের উপর বসে আছি, সামনে পড়ে আছে একটা আধ খাওয়া মোষের দেহ। সকালে মরে এনেছিল, সেইটাকে 'কিল' রেখে বসে আছি বাঘের আশায়। রাত্রি গভীরতর হয়ে ওঠে। ঝরাপাতায় ছেয়ে ওঠে চাপা শব্দ। রাত্রির অন্ধকারে দুটো ভাঁটা জ্বলছে ধক্ ধক্ করে।

একটু মুহূর্ত !···ওই জ্বলন্ত দুটো ভাঁটার মাঝ বরাবর বারুদ ভরলাম। একটা গর্জন—তারপরেই পতন। বিটুইন দি টু আই, এক বুলেটেই শেষ। প্রায় এগারো ফিট লম্বা একটা বাঘ।

সিগারেট ধরিয়ে আবার সুরু করেন—কুশী নদীর ওপারে তরাইএর বনে এক ম্যানইটার'কে নিয়ে।

ইসুফ শুনছে, বাঘ ভালুকের গল্প তার ভালো লাগে না, বাঘতো অনেক দেখেছে বাওয়ালির কাজে এসে। বাধা দেয়—'বাবু ভালো রাত আপনারে, চলুন হরিণ শিকারে, বদুখালির বনে চরে বেড়ায় গরুর পালের মত। যত পারেন মারতি।'

হরিণ মারার কথা শুনে রাঙ্গাদার—পুরুষকারে একটু যেন বাধে। —'থাৎ, হরিণ মারা ওতো 'লেডিস গেম'। আমি এসেছি যদি 'বিগ গেম, মানে বড়ো বাঘ টাঘ মেলে।

কথাটা ইসুফের মনঃপুত হলো না—'উ হুজো রাজোয়ার মারি কি করবেন? খাতি পারবেন? খামোকাই—তার চেয়ে চলেন হরিণ মারবেন, টাটকা গোশত। উঃ অনেকদিন জোটেনি বাবু।

ইসুফের লোভায় জল এসে পড়েছে। একটা হরিণের চামড়া বা শিঙ্গল যদি হয়—পিঃ ফোড়াটার উপর আবার লোভ আছে, যদি এই মৌকায় জুটে যায়—তাই বলে উঠি—'চেষ্টা করে দেখুন না রাঙ্গাদা, আপনি বললে নির্ঘাৎ।

—তা হয় নাকি ! আচ্ছা আপনি বলছেন যখন বলবো কাল ভোরে। তবে ছোট শিকার করে বড় শিকার ফসকাতে যাবে কিনা। হোকগে খাওয়াবো হরিণের মাংস।

কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল ইসুফের সঙ্গে। কাল ভোরে ইসুফ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ছোট ডিঙিতে, সূর্য উঠবার আগে মধুখালির বনে গাছে উঠে বসে থাকবেন। হরিণের বল ওই সময় বার হয়।

বন্ধুকেও ওপারে যেতে হবে কাল ভোরে, খাওয়া-খাওয়ার পর তিনি শুয়ে পড়েছেন। রাঙ্গাদা বিদায় নিয়ে গেলেন, মেঘলি ইসুফ তখনও ওর লঙ্গ ছাড়েনি।

ভোর বেলাতেই যার ঘুম ভেঙেছে বড়দা। ডিঙিতে চারখানা দাঁড়—একটা হাল, কিছু খাবার জল—চিঁড়ে। মাঝিরা নিজেরে গাঙ্গা ভাত, হুকা তামাক—এক মালসা অঙ্গার, তামাক খেতে হবে ঘন ঘন। ইসুফ তার অনেক আগে বার হয়ে গেছে রাঙ্গাদার সন্ধানে। বড়দা নিষেধ করে যান—' তুমি যাচ্ছ নাকি ?

···'না, কাল চরে দুটো বাঘিনী মেরে এনেছি, তাই শেষ হয়নি, ও গায়ে চড়ে মাশিত্যেস করে বসে থাকবার ধৈর্য্য আর নাই।

তাছাড়া আজে খুবে খুবে ধরার মত একরকম পোকা, কামড়ালে আরশোলা ফুলে ওঠে আমবাতের মত, তেমনি জ্বালাও করে। বড় বিশ্রী লাগে। বড়দা সাবধান করে দেয়,—'কোতলিজন, এ সময় হরিণ মারলে ওরা গোলমাল বাধাবে।

···নৌকাতে রইলাম একা।

সকাল বেলায় বাওয়ালিদের কাজ সুরু হচ্ছে। প্রত্যেকেই দেখলাম স্নান করে বনের মধ্যে ঢোকে।

আলিসাহেব বলে 'বনবিবির আস্তানা বাবু···সেখানে শুচি হয়ে না ঢুকলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ? কাঠ কাটি, মৌতা যাই, দিনরাত তো পাপ করছি তার মাটিতে, তবু সিনান করে বনবিবিকে সালাম করলে সব 'গোনা' মকুব হয়ে যায়।

জোর চারটে থেকে 'পাকানি' সেই 'সুলতান আর গজনী' উঠে চুলো ধরিয়েছে। মিনিট একটা হাঁড়িতে তিরিশ জনের ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। সকালে বার হবার আগে ভাত খেয়ে—সঙ্গে দুপুরের জন্য ভাত নিয়ে যাবে। বেঁধেলে ডুলে 'পাকানি'ও যাবে দুটুল কাঁধে ; খেতে বসেছে সবাই, ইসুফ তখনও ফেরেনি, রাঙ্গাদাকে নিয়ে শিকারে বসেছে। নৌকায় বাওয়ালিরা তার আশায় বসে আছে—যদি জুটে যায় শিকার, আজ রাত্রে তাহলে জমবে ভালো।

সেই আর কল্পনা করেই হাত পাচ্ছে ওরা। লাভকি দমার ভাগো জোটেনি, মাছির মত মরে গেল, তাতেই খোটা খোটা ভাত আর একমাত্র করে পিয়াজ—দু'একটা আলুর টিল, আর লঙ্কা দিয়ে ঝোল; যার পয়সাকড়ি থেকে চলেছে। মানুষের বাঁচবার পক্ষে এর চেয়ে সামান্যতর প্রয়োজন আর কি হতে পারে? দেশে বোধহয় এও জোটেনা; ফুটলে স্ত্রী পুত্র পরিবার, নিজের বাড়ী ছেড়ে অকূল সমুদ্রে, এই পরম অহংকো প্রাণ হাতে করে কেউ আসতো বলে মনে হয় না।

একজন বুড়ো লোককে দেখি আমাদের নৌকায় পাটাতনে—ওদের দলের মধ্য থেকে বার হয়ে এসে একলা বসে আছে। পাশে ছোট একটা এলুমিনিয়মের ঘটিতে রয়েছে জল। আমাকে দেখে আধ-পাওয়া করেই উইয়ে, বাংলা দিই—"খাও—খাও—ঠিক আছে।"

আলিসাহেব ভেডমাকি, পরম লোক। তার খাওয়ার বোধহয় সেপাল যাবার আছে। সে বলে ওঠে—"সর্দার;—ব্যাডড়াদের মধ্যি বসেনা।"

—নীরবে খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে এগিয়ে আসে সর্দার আমার দিকে, কি যেন বলতে চায়! বুঝতে পারি প্রয়োজনটা। আরও কয়েকজন বাঙালিও ছিল। এক প্যাকেট বিড়ি বার করে দিলাম—"নাও, ভাগ করে নাও তোমরা।"

যেখানে একজন একটার বেশী মিল না, ঠিক ভাগ করেই নিল তারা; কারো বাদ হয়ে গেছে সকলেই। নৌকায় শুধু আলিসাহেব, সর্দার আর আমি। পাকানি হাড়িকুড়ি মেজে ধুয়ে রাখে। এমন সময় দেখি ঈসুফের ডিঙ্গি খালের মাথায়। রাঙ্গাদা বসে আছেন ওর ভেতর; ভেতো ডিঙ্গির খোলে পড়ে আছে হরিণের দেহটা—কতবড় কে জানে?

এগিয়ে আসতে দেখি রাঙ্গাদার কাপড় জামা ভিজে, ঈসুফের অবস্থাও তাই। একটু আশ্চর্য হই,—"কি হলো রাঙ্গাদা।"

রাঙ্গাদা জবাব দিলেন না, ঈসুফ তাঁদের নৌকায় রাঙ্গাদাকে তুলে দিয়ে এসে ডিঙ্গিতে বসেই বালতি বালতি জল ছাঁচতে থাকে হড় হড় করে।

—"কি হল ঈসুফ মিঞা, হরিণ কোথায়?"

—"তোওরা, তোওরা" ঈসুফ তখনও জল ছাঁচছে। ঘটনাটা শুনেছিলাম পরে ঈসুফের মুখেই।

—কেওড়া গাছের উপর ডালে বসে রাঙ্গাদা, নীচের ডালে ঈসুফ। হরিণের পথ চেয়ে আছে দুজনে। নীরব বনের বুকে খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়, এগিয়ে আসছে শব্দটা। হঠাৎ অনুভব করে ঈসুফ তার টাক মাথার উপর টোপ টোপ করে কি পড়ছে! উপরের দিকে চেয়ে দেখতে পায়—হঠাৎ কপালে এসে পড়লো খানিকটা দুর্গন্ধময় পদার্থ—তার পর আরও খানিকটা। চীৎকার করে ওঠে ঈসুফ চোখ মুখ বন্ধ অবস্থাতেই। রাঙ্গাদার বন্দুক হাত থেকে পড়ে গেছে নীচে, দুহাতে গাছের ডাল ধরে অসাড় আসার চীৎকার সুরু করেছে—আ-আ-ও—"

কোন কিছুর ঠিক নাই। ঈসুফ ওই অবস্থাতেই পড়ি কি মরি গোছের অবস্থায় নিয়ে নেমেছে খালের জলে, মুখ চোখ ধুয়েও দুর্গন্ধ যায়না। রাঙ্গাদাকে তখনও চীৎকার করে চলেছেন।

—"ভাবলাম বীর পুরুষির গাছের আগায় 'খুদি'ই চলি যাই, সন্ধ্যাবেলাতেই একেবারে মুখেই ও কম্ম শেষ করি দিলো। গাছ আশ পাছির উপর থাকি মাথালাম, ঈসুফ খুঁড়ি যায় করি টানি তোললাম ডিঙ্গিতে। খুব হরিণ খাতি চেয়েলাম। তোওরা-তোওরা।"

—"কি দেখেছিলে? হরিণ না বাঘ?"

—"ঘোড়ার ডিম। কতো বুড়া বাঁদর—মাটিতে 'ঘিয়ালো' করছিল।"

রাঙ্গাদাকে আর সেদিন এমুখো হতে দেখলাম না। হয়তো লজ্জা পেয়েছিলেন।

বড়দা এ ক'টার দিনতে পারলেন না, সেই রাত্রি শেষে পাড়ি জমালেন, নাহর কাল দুপুরে। খাওয়াদাওয়ার পর শুয়েছি মশার মধ্যে, আলিসাহেব, ঈসুফ, আর দু' জন মাঝির সঙ্গে। ডিঙ্গি বাধে বেঁধে তীরে উঠলাম। সুন্দরি গাছের বের পায় হয়ে চুকলাম গভীর বনে, আশে পাশে ছুচারটে গোলপাতার গাছ, তাও বলতে বিশেষ নাই—গোড়া থেকেই উঠেছে লম্বা লম্বা বারফোল পাতার মত পাতা। খেজুরের কাঁদির মত ফুল ধরেছে, ওর থেকে ফল হয় ছোট ছোট তালের মত। নীরব বিস্তৃত সুন্দর বনে কেউ যদি কোনদিন হারিয়ে যায়, বাঁচবার মত খাদ্য সে কোন গাছ থেকেই পাবেনা। মানকুল—বাঁকুড়া—সিংকুলের বন অঞ্চলে ঘুরেছি, সেখানে বনের ফল কিছু কিছু হয়, যেমন বনকুল, বেল, আতা, আমলকী, পিয়াল, ভুড়ুর, বইচি, ভালাই-মালা কেঁদ, ইত্যাদি। করমচা মাঝে মাঝে আছে। দু'একটা দিন সে অনায়াসেই কাটাতে পারে, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বনে একটা ফলও নাই যা মানুষে খেতে পারে, জল চারিদিকে, কিন্তু অসম্ভব লোনা, মুখে দিলে জিব জ্বালা করে। একমাত্র গোলে গাছের ফলের মধ্যেই একটু শাঁস থাকে—যা তখন-তখন্য। কিন্তু তাও সবসময় পাওয়া যায় না। আর আছে কেওড়া ফল; এতো টক যে কোন বাঘ ভুল করে চেটে ফেলে—বনময় ছুটে বেড়াবে সে। মানুষকে তার নিজস্ব লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দিতে প্রকৃতি নারাজ, তাই এমনি ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে সে পদে পদে।

নিবিড় অরণ্য, নীচে পায়ের তলে মাটি কাদায় পরিণত হয়ে আছে। সন্তর্পণে চলেছি। মাঝে মাঝে নীচু হয়ে চলতে হয়, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল আলীসাহেব থমকে। সামনে একটু ফাঁকা জায়গাতে চরছিল কয়েকটা হরিণ, আলপনা আঁকা গা, একঝলক রোদ পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে, কিসের যেন গন্ধ পেয়েছে ওরা, চকিতের মধ্যে দাক দিয়ে হলুদ পাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু একটা হরিণের বাচ্চা, কালো ডাগর দুটো চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে শুধুলেশহীন চাহনিতে। অপরূপ মায়াময়ী সে চোখ। কত যেন পরিচিত—নীরব প্রেমে ভরে রয়েছে। বন্দুক তুলেছিলাম,

কেন জানিনা বাহির নিলাম। এইটুকু বাচ্চা—ওকে মারতে মন চায় না। কি ভেবে ছোট একটা লাফ দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে।

—'আয়ার' করলেই নির্ঘাৎ পড়তো বাবু, ছেড়ে দিলেন?

ইস্থকের ফিসফিসানি পড়ছে যেন। সকালের ঘোর আমার মনে পড়ে।

—"আপনাদের দ্বারা শিকার হবে না।"

…"খুট…উ…উ।"

দূর বনের মধ্য থেকে আসছে ডাকটা।…উৎকর্ণ হয়ে শুনে ইস্থক দুহাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে—বিকট শব্দে, "খু উ উ"

বাঁ পাশের বন থেকে ভেসে আসে আর একটা ধ্বনি। কি দিয়ে আতঙ্ক ফুটে ওঠে ওদের বিচিত্র স্বরে। আলি সাহেব বলে ওঠে—মৌথালির দিক থেকে আসছে শব্দটা, ডিঙ্গিয়ে উঠে চল একবার তল্লাস দিয়ে আসি।

মিনিট পনের ঘুরে খাল থেকে নিচে পড়লাম মুহূর্তের আহাকাড়ি ছোট একটা খালে। সূর্য পশ্চিম গগন সীমায় পৌঁছতে আর দেরী নাই। …গাছের প্রহরায় স্তিমিত হয়ে গেছে তার ম্লান আলো। খালের ধারে গোটাকতক ডিঙি এসে হাজির হয়েছে। এসে উপস্থিত হয়েছে সেই ছেলেটা, বাঘার শোকে মুহ্যমান হয়েছিল, আজ সেই পশু পেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসেছে লতিফ হাতে একটা ল্যাজা। চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে, যেন অন্য মানুষ। কারাকাটি হৈ চৈ করছে কয়েকজন লোক। রাজোয়াও দেখি গিয়ে জুটেছেন। হাতে ঝকঝক করছে আই-ভ্যান রোল্ডসের ডবল ব্যারেল রিভালভার।

…একজন কাঠুরেকে বাঘে ছোট করেছে।

আমরা গিয়ে জুটতে বলে বেশ কয়েকজনই হ'ল। আলী সাহেব ইস্থক দুজনেই অসীমসাহসী। বলে ওঠে—"লাশ আনতে হবে, বেচীদের দিয়ে তো পারেনি। ওরিকেই বাঘ, জোয়ারের জলে লাশ নিয়ে পার হতে পারবে না।"

কিন্তু কে যাবে রক্তপিপাসী বাঘের সামনে, রক্তের স্বাদ পেয়ে সে মেতে উঠেছে, সামনে যে যাবে সে আর ফিরে আসবে না।—"সঙ্গে চারটে বন্দুক আছে, এতগুলো লোক আমরা—দেখাই যাক না চেষ্টা করে।"

চমকে উঠি, কি দুর্ভোগ! হাতে বন্দুক নিয়ে কি পাকাশিকারী হয়ে গেছি।…দেখতে দেখতে গোটা বিশেক মশাল তৈরী হয়ে গেল; আগুনের কাছে আসবে না। তারপর আছে বন্দুক! রাজোয়ার মত অবস্থা কি শেষকালে আমার হবে? লোকজনগুলো চীৎকার করছে! তৈরী হয়ে ঢুকলাম বনে। চারটে বন্দুক চারদিকে নজর রাখলে এবং মাঝে মাঝে হুঁয়ার করবে। বৈকালের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে, সেখে আসছে বনভূমিতে হালকা অন্ধকারের আস্তরণ, কি এক নিবিড় রহস্য বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে বনভূমি। একটা জায়গায় পড়ে আছে কাপড়খানা, রক্তের দাগ ছিটিয়ে রয়েছে চারিদিকে! বড় বড় থাবার দাগ নরম কাদায় তখনও মিলিয়ে যায় নি।

সুরু হ'ল চীৎকার, হৈ হৈ! জ্বলে উঠলো মশালগুলো, বনভূমির গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়ে আলো, একসঙ্গে গর্জে উঠল চারটে বন্দুক।

—খবরদার কেউ পিছবে না, পিছলেই বিপদ। হুঁসিয়ার

—হা রা রা রা রা রা দুম' গুড়ুম গুড়ুম! বনভূমি কেঁপে ওঠে বীভৎস চীৎকার। একটি মুহূর্ত! সমস্ত চীৎকার ছাপিয়ে ওঠে…একটা ক্রুদ্ধ গর্জন! হাত কাঁপছে। বন্দুকটা ফেলে ধরে উঁয়ার টানলাম। বাঘ মারতে আসিনি, তাড়াতে এসেছি; একসঙ্গে চারটে বন্দুকের গর্জনে লাফ দিয়ে কি যেন ছায়ার মত সরে গেল সামনে থেকে। অদূরে পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহটা। ঘাড় জেড়ে ফেলেছে তার, দেহের নরম মাংসগুলো প্রায় খুবলে তোলা হয়েছে, চেয়ে দেখা যায় না। কি এক নারকীয় শ্রিভীষিকা আঁকা রয়েছে হতভাগ্যের দেহে।

…কেঁপে ওঠে বনভূমি! কাঁপছে গাছের পাতা! ভীত মানুষের দল প্রাণপণে চীৎকার করে হা রা রা রা। গর্জে ওঠে বন্দুকগুলো।

মৃতদেহ নিয়ে ফিরছি। অন্ধকার জমবার আগেই বার হয়ে আসতে হবে বনের ভিতর থেকে। অনুভব করি আগে পাশেই রয়েছে ওই হিংস্র নরখাদকের অস্তিত্ব। মশালগুলো নিভে আসছে। চীৎকার করে ওরা, বন্দুকগুলোও তাদের চীৎকারে সাড়া দেয়।

খালের ধারে ডাঙ্গায় এসে দেখা যায় খালের ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। মুখে গোঁফে তার রক্ত লেগে, চোখ দুটো সূর্যের মিলিয়ে যাওয়া আলোটার দিকে শেষ চাওয়া চেয়ে আছে। রাজোয়ার বন্দুকের দুটো বারেল থেকে গর্জে ওঠে—লাফ দিয়ে ধরে গেল সে ক্রুদ্ধ গর্জনে বনভূমি কাঁপিয়ে। (ক্রমশঃ)

চৌপদী

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

চরণের তলে উপল-খণ্ড অনেকই রয়েছে পড়ি,
তোরণের তলে রত্ন কখনো যায়নাক গড়াগড়ি।
উপলের মতো রত্ন চরণ করেনাক সন্ধান।
অনেক খুঁজিয়া কচিৎ কখনো পায় তা ভাগ্যবান।

(২)

ক্ষীরসর লুচি-চিনি পলান্নের সাথে যিনি
দিয়াছেন অরুচি জিহ্বায়,
দিয়াছেন তিনি সুধা শাকান্নের সাথে ক্ষুধা।
অবিচারী বলো না তাঁহায়।

(৩)

যে বুঝে স্বাস্থ্যের মর্ম সুখাদ্যও খায় না সে
অনিবার্য না হইলে ক্ষুধা,
যে বুঝে সত্যের মর্ম সুবচনও বলে না সে
না রহিলে তার সত্য-সুধা।

(৪)

মাধুর্য হইয়া যাহা জাগে এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে
আবেশ হইয়া তাই চায় রূপ কবিদের চিতে।
আবেগ হইয়া তাই জাগে রসে, রূপে, ছন্দে, গানে,
আনন্দ হইয়া তাই উচ্ছলিত রসজ্ঞের প্রাণে।

(৫)

আলোর ভরঙ্গ দেখে একদিকে হিংসা করে লোকে,
তিন দিকে অন্ধকার পারাবার পড়েনাক চোখে।
দেখিত তাকায়ে যদি স্থলে জলে সব দিক পানে
পাইত হিংসার ক্ষতে অনায়াসে প্রলেপ পরাণে।

(৬)

ধনীরে কেন হিংসা করো, তাহার মতো অভাগা কে ?
চলিয়া যাবে, পড়িয়া র'বে সকলি তার পিছুতে।
তোমাকে যবে যাইতে হবে, চলিয়া যাবে এক ডাকে,
চাবে না পিছে, হবে না ক্ষোভ রবে না মায়া কিছুতে।

(৭)

দারা-পুত্র পরিবার লয়ে করে যে সংসার
দুঃখী দেখে স্বাধীনতা ভোগ্য নয় তার।
নাই যার পিছু টান সে স্বাধীন ভাগ্যবান
রজকের গিগহর প্রায় কভু ধায় ?

(৮)

শূন্য পেলেই ভরি মোরা যত কল্প-সৃষ্টি দিয়া,
মৃত্যু হলেই সকল মানুষে সেইখানে দিই ঠাঁই।
অসীম শূন্য কি দিয়া ভরিব ? স্বপ্নেরে সাজাইয়া
কত না স্বরগ, কত না নরক, মায়ালোক রচি তাই।

(৯)

দিনে আমি ফসল ফলাই রাতে ফুটাই ফুল।
ধূলায় ভরা দিবস, রাতি সুবাসে মশগুল।
লক্ষ্মী আসেন দিনের বেলায় ঘর্মরিয়া রথে,
সরস্বতী রাতের বেলায় নামেন ছায়াপথে।

(১০)

একালের মেঘদূত ও দেশের বার্তা বহে
এ দেশের কানে
সে কালের মেঘদূত যুগ হতে যুগান্তরে
বার্তা বহি আনে।

(১১)

বৃথা এ রচনা জানি, জানি এর আয়ুটুকু কত,
নিশান্তে ঝরিয়া যাবে নিতান্তই শেফালির মত।
মিথ্যা এর অভিমান বাঁচিবার আশা এ ধরার,
মিথ্যা নয়, এক পলও যে আনন্দ দিয়াছে আমার।

(১২)

পল্লবই বাড়িয়া যায় অবিশ্রান্ত রসের যোগানে,
কুসুম ফুটে না সেই পরোৎসবে মনের বাগানে।
প্রাচুর্যের অবসানে পত্রসজ্জা হয় অপ্রতুল।
সে রস সঞ্চিত রয় মূলে তরু, তাই ফুটে ফুল।

শ্রীশ্রীগৌরীমাতা শতবার্ষিকী জয়ন্তী

উপানন্দ

সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শতবার্ষিকী ত্রয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হোলো—কতুলের বর্ণপরিচয়ের শুরে শুরে পরমপুরুষ যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই মানস-দুহিতা ও দীক্ষিতা শিষ্যা বৈদিক যুগের বৈদুষী চিরব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মবিদ্যা তপস্বিনী জননীর আবির্ভাব তিথিকে কেন্দ্র করে ঘিরে ঘিরে যেরূপভাবে স্মৃতি-পূজার প্রস্তাবগুলি হোতো হোলো, বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলাময় পূত চরিত্রের কথা যেরূপভাবে আলোচিত হোলো, তা'তে আজ যন-বিশ্লেষণের দিনে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হচ্ছে যে, ভারত তার উজ্জয়িনী জননীকে আজও প্রাণের বিগ্রহ করে রেখেছে'—আজও তোলেনি তার আরাধ্যা মাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মাকে দেশের পথে প্রান্তরে অরণ্যে কান্তারে পর্বতের উপকূলে সন্ধান করেছিলেন, যে মায়ের উদ্দেশে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র রচনা করেছিলেন, সেই দেশমাতৃকার মূর্ত বিগ্রহরূপে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার আবির্ভাব হয়েছিল আজি হতে শতবর্ষ আগে। সমগ্র বৎসর ধরে যে শতবার্ষিকী উৎসব হোলো, সেটি মাত্র অনুষ্ঠান নয়—পরম্পরা। এই অনুষ্ঠানের মর্মকাহিনী—'শিবস্বেহরং পাথি যাং যাং প্রপদ্য।' যন্ত্র-সভ্যতার আসুরিক জড়তাবাপন্ন স্নেহ বুভুক্ষাকে পরিহার করে আর যখন ও সমাজ শ্রীশ্রীগৌরীমার অবতরণ মাহাত্ম্য অনুধ্যান করতে করতে স্নেহ পদ্মকে আশ্রয় ও অঙ্গীকার করতে চেয়েছে—এই শুভবুদ্ধি, এই সঙ্কল্পই আত্মহনন, যাতে করে আত্মোপলব্ধি হয়, আর ভাগবতজীবন গঠিত হয়ে স্বামী তারতে আবার মহত্তম আদর্শের উষর ভারতীয় আলোক-পরিকীর্ণ হয়—অতিমানবের উপনিবেশ গঠিত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরীমার জীবনী পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই মহাকবি ভবভূতির সেই কথাটি মনে পড়ে—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি' মায়ের চরিত্রে যে লোকোত্তর কোমলতা ও কঠিনতার সমন্বয় ঘটেছিল, তা থেকে প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়, তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব করে, অসাধারণত্ব থেকে নেমে এসেছেন মানুষটির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশে বৈদীসন্ধ্যা বিতরণ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পরাজয়ী এই ভারতের মহামানবের সাধারণীকরণ যে সময়ে প্রথমে এসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপর্যয় আনলো, আর পরাধীনী বিদ্যাতির পরাধীনতায় প্রথাগত পথে গঠিত হয়ে দেশ জননী ও তাঁর সন্তানেরা বিশেষতঃ ভারতমাতার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়ে, মানুষকে বিকৃতিতে ও বিপন্ন হোলো, সে সময়ে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চরিত্রবান দেশহিতৈষী সন্ন্যাসীদের যে গুপ্ত সম্মেলন হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তারই কর্মধারার বিভিন্ন অভিব্যক্তি আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাসে সেই সব কর্মধারার কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ আমরা অনুধাবন করেছি। সেদিনের সন্ন্যাসীদের পুঞ্জীভূত প্রত্যাশাগুলি, যা ইতিহাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে, দেশের বাড়ীতে বাড়ীতে সঞ্চারিত হয়েছিল, তা থেকেই ভগবানের অবতরণ হয়েছিল কামারপুকুরে। ভক্তিপথের তাঁরই তপস্যার যজ্ঞশালায় যাঁরা হোতা ও হোত্রী হয়ে তাঁর অন্তিক মন্ত্রে আহুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরীমাতা সর্বোত্তম। সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকে আজ সন্ধ্যা যুগে যুগে পৃথিবীতে যত ধর্মাচার্য, দার্শনিক, সাধুসন্ত, অবতার ও ধর্মপ্রবর্তকগণ সাধনার যত বাণী শুনিয়ে গেছেন, যত পথ দেখিয়ে গেছেন, যত মত ব্যক্ত করে গেছেন, তাঁর প্রত্যেকটি নিজের জীবনে অনুশীলন করে ভগবান পরমহংস মহামন্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকটী গুরুর সাধনা সিদ্ধ হয়ে ব্যক্ত করে গেছেন—প্রত্যেকটী ঠিক, কোনটার চেয়েই ভ্রান্তি নেই—আছে চরম সত্য। তিনি বলে গেলেন—'যত মত তত পথ—'

এই পরমহংসদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীশ্রীগৌরীমাতা সাধনার অনুচ্ছ শিখরে আরোহণ করে অধ্যাত্মজগতের মানস-সরোবরে অবগাহন করেছিলেন আর বলেছিলেন—'দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন

করা যায়, এই প্রকার চিত্রের দ্বারা দর্শনে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা সকল সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না।—তাঁকে পেতে হলে মনের মতন চাই। মানুষ চায় তাঁকে দিয়ে 'যেমনিতে পেতে' পায় হোতে—তা কি কখনো হয়? সবটা মন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসলে, একেবারে মানুষের মতই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়।' শ্রীশ্রীগৌরীমার মধ্যে ছিল অসাধারণ বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য ও সংগঠন শক্তি।

পঞ্চবর্ষ পূর্ব্বে ১২৮৪ সালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুভ জন্মতিথি মাঘী-শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, গৌরী মা মহানগরী কলিকাতার বুকে ভবানীপুর পল্লীতে এক সাধনসমৃদ্ধ আধিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম মৃড়ানী, ডাক নাম কড়ানী। তাঁর পিতা স্বর্গীয়ঈশান চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তেজস্বী ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। মাতা বিদুষী সাধিকা গিরিবালা দেবী ছিলেন সুগায়িকা ও কবি এবং বাংলা, সংস্কৃত, পারসী ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সে যুগে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচলন ছিল না, অথচ এই অন্তঃপুরচারিণী এতগুলি ভাষায় কি ভাবে সুপণ্ডিতার করেছিলেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। তাঁর রচিত 'নামসার' এবং 'ইয়াসা সঙ্গীতমালা' বহুকাল পূর্ব্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরকোটির সাধিকা ও পরমহংসদেবের কৃপাধন্যা ছিলেন।

এই পবিত্র পরিবারের উর্ব্বরক্ষেত্রেই মহাশক্তির বীজ পতিত হয়েছিল, যার ফলে ভগবানের মর্ত্ত্য লীলাকে প্রকট করবার জন্যে তাঁর বিশিষ্ট বিভূতি শ্রীশ্রীগৌরীমার আবির্ভাব কালিকাক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী-চরণের নিবাস হাওড়া জেলায় শিবপুরে। গিরিবালা দেবীর ভ্রাতাদ্বয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপক ধনবান, তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন শ্রীশ্রীগৌরীমাতার জননী। এইসূত্রে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ভবানীপুরে যাপন করতেন, আর মৃড়ানী (ভবিষ্যৎ গৌরীমাতা) বাল্যাবধি সেখানে বর্দ্ধিত হয়েছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁর ছয় বছরের শাসনকালে কলিকাতার বিশপ বিখ্যাত মিলম্যান ও তাঁর ভগ্নী কুমারী ক্যাথিন মেরিয়ন মিলম্যানের চেষ্টায় উচ্চবর্ণের হিন্দু বালিকাদের জন্য ভবানীপুরে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধানা-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন একজন ইংরাজ মহিলা—কুমারী হারবোর্ট। এখানে মৃড়ানী প্রথম বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতেন। বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ ছাত্রী হওয়ার জন্যে ভবানীচরণ লাইসাহেবের পত্নী তাঁকে একটি সুদৃশ্যখচিত পেন্সিল পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল উচ্চশিক্ষায় লেখাপড়া শেখানোর জন্য, কিন্তু সেকালের যথাসম্ভব ব্রাহ্মণ ভক্তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

তিনটিবছর মধ্যে মিশনারীদের সঙ্গে মৃড়ানীর ধর্ম বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এর পর আর তাঁর পক্ষে বেশি-দিন বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় নি। তাঁর প্রবল ধর্মানুরাগ ও খ্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজের বিধিনিষেধ—প্রথমতঃ এই দুই কারণে তাঁর বিদ্যা-লয়ে যাওয়া বন্ধ হয়। কিন্তু এই বয়সের মধ্যেই তিনি বহু মেম মেমীর স্তোত্র, চণ্ডী, গীতা, বুদ্ধদেব আকবর প্রভৃতি গ্রন্থের বহু অংশ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ছেলে বেলা থেকে তিনি বেখিয়েছেন—চিত্তের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও আত্মিক বস্তুতে অনাসক্তি। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি ছিল ভগবৎমুখী। কালীর প্রতি যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেবের প্রতিও তেমনই, তাঁর ভক্তি ছিল। কনক চাঁপার মত তাঁর গায়ের রঙ, দেহতেও অপূর্ব্ব সুষমা,—ছেলেবেলায় যখন পুষ্পার্চ্চনায় যোগ দিতেন, তখন মনে হতো সাক্ষাৎ গৌরী। উত্তরকালে হিমালয়ে অবস্থানকালে পাহাড়িয়ারা তাঁকে গৌরী মাঈ বলে ডাকতো—তারা যেন তাঁকে সাক্ষাৎ গৌরীরূপে।

শরৎকাল। ভবানীপুরের এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত বালক-বালিকাদের অদূরে ভাব-বিভোরা বালিকা আত্মমগ্ন মনে ছুটছেন। বৈষ্ণব-লক্ষণযুক্ত পথিক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এসে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন—'সবাই খেলছে, আর তুমি যে বড় একলাটী চুপ্‌চাপ করে বসে আছ?'

'—ও সব খেলা আমার ভালো লাগে না—'

প্রণাম করতেই ব্রাহ্মণ মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন—'কৃষ্ণ ভক্তি হোক্—'

কিছুদিন পরে যান পূর্ণিমায় দিনে দক্ষিণেশ্বরের কাছে নিমতে-লোলার বাগানে ব্রাহ্মণের নিভৃত সাধন কুটীরে মৃড়ানীর তীর্থলাভ হোলো। এই ব্রাহ্মণই ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

বৃন্দাবন থেকে ভবানীপুরে মৃড়ানীদের বাড়ী একজন ব্রজবাসী আসেন। ইনি একটী সুদর্শন নারায়ণ শিলা মৃড়ানীকে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। এই শিলা নারায়ণশিলা 'রাধা-দামোদর'কে মৃড়ানী আজীবন পরম নিষ্ঠা, ভক্তি, ও স্নেহের সঙ্গে সেবাপূজা করেছেন। সংসারের খেলা-ঘরে এই শিলাই কায়ারূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে রাত্রিদিন খেলা করেছেন। ছোট্টো বয়স বয়স। বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত। মৃড়ানী চণ্ডাণী মূর্ত্তি ধারণ করে বললেন—'তেমন যাকেই দিয়ে করবে যে তখন মরে যা।' গিন্নিমাতা বললেন—'মা', তোর যদি বৈরাগ্যের ভূত সত্যিই ছুটে থাকে, আমি বাবা দেবো মা'—বর ফিরে গেল, মৃড়ানী বিয়ের রাত্রে মায়ের সঙ্গে 'পালিয়ে ফেলেন। এরপর অমৃতের সন্ধান পেলেন আঠারো বছর বয়সে। গঙ্গাসাগর তীর্থ দর্শনে গিয়ে আত্মীয় পরিজনের অজ্ঞাতে, একদিন মৃড়ানী সংসার চিরদিন ছিন্ন করে একবস্ত্র পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে হরিদ্বারের দিকে চলে গেলেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের সকল তীর্থস্থানে তিনি গেলেন। হিমালয় সাধকের সাধনভূমি, দেবতার লীলাভূমি, আর গৌরীর তপোভূমি, একথা তিনি বাল্যকাল থেকে তাঁর চণ্ডীমায়ের কাছে শুনে এসেছেন। এই হিমালয়ের সুমহান্ পরিবেশে কঠোর তপস্যা সুরু করলেন, পরমাত্মস্বামী ভেবে—চেতনা বিস্মৃত করে দেহের সমে-প্রমেণ তপস্যায় আত্মসমাহিত হোলেন। এই সব সাধনাই হোলো তাঁর পরিচয়। তীর্থযাত্রীর পথে গৌরীমা যে সময়ে উত্তরকাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে অর্চ্চনারতা, সে সময়ে পূর্বতন ভারতবর্ষ-সম্রাটক প্রলয় দাদা তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

—"এরকম দুর্গম স্থানে (বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে) একাকিনী এক বাঙালী ব্রহ্মচারিণীকে দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলুম। গৌরীমা তখন মন্দির মধ্যে নিবিষ্টমনে স্তব কীর্তন করছিলেন। ব্রহ্মচর্যের নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতেন। যেন তেজস্বিতা, পবিত্রতা, ও সৌন্দর্যের মূর্তি।" তিনি হিমালয়ের বহু দুর্গম প্রদেশে একে দুর্লভের কৃপা পেয়েছিলেন। বীরার মতই তিনি ভাবোন্মাদিনী হয়েছিলেন। অবশেষে গৌরীমা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হয়ে বৃন্দাবনে এসে রইলেন। তাঁর জামাইবাবাজী হঠাৎ বৃন্দাবনে দেখতে পেয়ে তাঁকে বাড়ী নিয়ে এলেন, কিন্তু সে সময়ে পিতা ও মাতামহীর লোকান্তর ঘটেছে। অল্পকাল মায়ের কাছে থেকে তিনি চলে গেলেন শ্রীক্ষেত্রে। এখানেই তাঁর পূর্বপরিচিত গুরু জমিদার রাধামোহন বসু ও তাঁর ছেলে বলরাম বসুর সঙ্গে দেখা হয়। ১২৮৯ সাল। গৌরীমার বয়স তখন পঁচিশ। বলরাম বসুদের সঙ্গে কলকাতায় এসে বসু ভবনে তাঁর আবাসে হয়। এরপরই দুঃখহীর্ষ বিশ্বেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁকে আসা ছোলে তাঁর পূর্ব স্মৃতি সব মনে পড়ে গেল এখানে এসে তিনি ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সেবা আরম্ভ করলেন। শ্রীমাকে ঠাকুর বললেন—ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এলো'—ঠাকুর বলতেন—'গৌরী মহাতপস্বিনী, মহাভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী।' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দও গৌরীমাকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা এবং জগন্মাতাজ্ঞানে নারী সেবার ব্রতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। গৌরীমাকে একদিন ঠাকুর বললেন—'দেখ গৌরী! আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।... সাধনভজন ঢের হয়েছে এবার এ তপস্যাপূত জীবনটা মানুষের সেবায় লাগবে। ওদের বড় কষ্ট।' গৌরীমা হিমালয়ে কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে অধ্যাত্ম সাধনার সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্য জানালে ঠাকুর বললেন—'না গো না, এ টাউনে বসে কাজ করতে হবে'—এরপর ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় গৌরীমা উপস্থিত ছিলেন না। বৃন্দাবনের গহন প্রদেশে তপস্যা করছিলেন। পরে সংবাদ পেয়ে তিনি দেহত্যাগ করতে উদ্যত হোলে ঠাকুর স্বপনীতে এসে বাধা দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন করে গৌরীমা মাতৃজাতির কল্যাণে ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথমে বাগবাজারে পরে কাশীতীরে হোলো প্রতিষ্ঠা। তারপর স্থায়ীভাবে ১৩০১ সালে বেলুড়কুমারী ষ্ট্রীট নিজস্ব ভিটেয় বাড়ি আশ্রম স্থানান্তরিত হোলো। এই মহাসভাতে মূল হোলো 'আত্মো জগদ্ধিতায়' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মহাশক্তিতে পরিণত করতে। বর্তমানে এই আত্মশক্তি চিরব্রহ্মচারিণী শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী। বাস্তুসঙ্ঘের ইনিই পরিচালিকা। এঁরও অধ্যাত্ম জীবনের বহু রহস্য একদিন তোমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হবে—সেদিন তোমরাও বিস্মিত হবে এই ভেবে, কাছে যে প্রদীপ জ্বলছে তার শিখা দিয়ে আমাদের দীপ জ্বালানো হোলো না—সূর্যের আলো দেখে আমরা ছুটেছি বৃথা সময় অপচয় করে। গৌরী মা বলে গেছেন—'বাবা সকল, মানুষ হতে জন্মেছ, এমনভাবে চলো মা—যাতে প্রকৃত মানুষ হবার পথে বাধা পড়ে। সংযম শিক্ষা করবার এই তো সময়? তোমরা সংযমী হও। সংযম না থাকলে, অন্য কোন ভূমিকা দাঁড়াবে না। দেশের আশাভরসা তোমরা, তোমরা যদি মানুষ না হও, তবে দেশের আশা কোথায়?"—১২ই কার্তিক সন ১৩৬৪ সাল মঙ্গলবার তিনি মর্ত্যলীলা ত্যাগ করে ব্রহ্মসমাধিতে নিমগ্ন হন। আমরা এবার কাশীপুরের শ্মশানে তাঁর সমাধি সমীপে অর্ঘ্য রচনা করে প্রাণের প্রণাম জানিয়ে এলাম। পাবক আনন্দময় লোকে চলেছে তাঁর নিত্যলীলা। তিনি দেশের সন্তানদের কৃপা করুন।

ওঁ অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়। ওঁ

অহঙ্কারী রাজা

(মালব দেশের উপকথা)

শ্রীমতী উষাবতী দেবী

অনেক অনেক দিন আগে মালব দেশে, অবন্তী নগরে এক রাজা রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন এবং তাঁহার এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য প্রজারা কষ্ট পাইত। তাঁহার রাজ্যে কোনও প্রজার গৌরব বা সম্মান থাকিত না। ধার্মিক লোক সাধু-সন্তরাও ভয়ে ভয়ে থাকিত, রাজদ্বারে অপমানের ভয়ে সকলে সশঙ্কিত থাকিত।

রাজার এইরূপ বিশ্বাস ছিল—তিনিই একমাত্র বুদ্ধিমান ও সকলের সম্মানের পাত্র। তাঁহার আর একটি দোষ ছিল—তিনি কাহারও কোনও ভালো জিনিষ দেখিলে, তাহা লইয়া গিয়া নিজ ভাণ্ডারে রাখিতেন। কাহারও একটি সুন্দর ফুলের গাছ বা একটি চমৎকার সিল-দেওয়া পাখা—সবই রাজা কাড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিতেন। এইজন্য প্রজারাও অসুখী হইয়া রাজার নানাবিধ সমালোচনা করিত আড়ালে।

সেদিন কি এক পুণ্যতিথি ছিলো। খুব ভোরবেলা সূর্য যখন আকাশে উঠিতে চাহিতেছেন, আর পূর্বাকাশ সিন্দুর বর্ণ হইয়া ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, তখন অবন্তী-বাসী একটি গরীব ব্রাহ্মণ অবন্তী দেশ-বাহিনী পুণ্যতোয়া শিপ্রানদীতে স্নান সারিয়া নবউদিত সূর্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান

করিতেছেন। এমন সময়ে পাশ দিয়া স্রোতের টানে একখানি বৃহদাকার শুক্তি ভাসিয়া যাইতে দেখিলেন। ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া শুক্তি খানিকে সংগ্রহ করিলেন। তাহার ভিতর উজ্জ্বলবর্ণ সুন্দর একটি মুক্তা ছিল। মুক্তাটির নিটোল গঠন ও অতি সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণ-সমাবেশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহা ভগবানের দান বলিয়া ভগবানকে প্রণাম জানাইলেন।'

শ্রিরঙ্গমে সেদিন পুণ্যার্থী স্নানার্থীর ভিড়। সকলেই ব্রাহ্মণের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া একবার করিয়া সেই মুক্তাটিকে দেখিতে চাহিতেছিল। ক্রমে এই সংবাদ রাজার নিকটেও পৌঁছিয়া গেল। তিনি তখনই সিপাহী পাঠাইলেন—মুক্তাসহ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া যাইতে। ব্রাহ্মণ তখনও নিজ কুটিরে ফিরিতে পারেন নাই। স্নানান্তে তিনি গণেশজীকে দর্শন ও পূজা করিয়া তবে আপন কুটিরে ফিরিতেন। আজও গণেশজীর পূজা ও দর্শন সমাপনান্তে নিজ ছিন্ন গামছা খানিতে সযত্নে বাঁধা শুক্তিসহ মুক্তাটি লইয়া এক বটি জল হাতে, সবে গণেশজীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া, ভগবানের স্তব-গান করিতে করিতে আপন পর্ণ-কুটিরের পানে চলিয়াছেন এমন সময়ে রাজার পাইক আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া কহিল—"ঠাকুর মশাই! রাজার হুকুম এখনই আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।" নিরুপায় ব্রাহ্মণ সেই অবস্থায় অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল মনে পাইকের সঙ্গে রাজ-দরবারে পঁহুছিলেন।

রাজা কহিলেন—"ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি নাকি আজ সুন্দর একটি মুক্তা পেয়েছ—কই দেখি?" ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার ছেঁড়া গামছা খুলিয়া শুক্তিসহ মুক্তাটি রাজার হাতে সমর্পণ করিলেন। রাজা মুক্তাটি দেখিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ সুন্দর তো! ওহে বৃদ্ধ! আমার রাজ কোষে এমন জিনিষ নেই।—আর তুমি তো বেশ লোক! আমায় না জানিয়ে জিনিষটি লুকিয়ে নিজের বলে নিয়ে চলেছ। এ আর তুমি পাবে না—যাও—এখন বাড়ী যেতে পারো—তুমি কি জানো না যে সব ভালো জিনিষ শুধু রাজার জন্য?" ব্রাহ্মণ নতশিরে—"মহারাজের মঙ্গল হউক" বলিয়া দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মুক্তাটি অন্ততঃ ব্রাহ্মণীকে দেখাইবেন বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন—মনে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ গৃহে না ফিরিয়া আবার গণেশজীর মন্দির চত্বরের পাশে ফুল বাগানের একধারে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এখন ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন ঠিক চাপাগাছটিরই তলে এবং একজোড়া দোয়েল-দোয়েলী ঐ গাছের ঘন পত্র-পল্লবের মাঝখানে কিছুদিন হইতে একটি সুন্দর নীড় তৈয়ারী করিয়া বাস করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ফুল তুলিতেন, স্তব পাঠের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন—দোয়েল-দম্পতি ঐ ভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণটিকে খুবই ভক্তি করিত। তখনকার দিনে সারা জীব-জগতেই ছিল প্রাণের ঐক্য এবং পরস্পর প্রীতির অটুট ডোর। এমন কি তখনকার দিনে পাখীরাও মানুষের ভাষা বলিতে এবং বুঝিতে পারিত। বলাবাহুল্য, আমাদের এই দোয়েল-দম্পতিও সে শক্তি রাখিত। তাহারা দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও ভারী সুন্দর ও অতি চমৎকার শিস্ দিয়ে গান গাহিতে পারিত।

ব্রাহ্মণের ঐ রূপ মনোকষ্টের অবস্থা দেখিয়া পাখা দুইটিও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কাতর ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া গেলে দোয়েল-দোয়েলীকে ডাকিয়া বলিল—"শুধু দোয়েলি। রাজাকে আর কেউ কিছু বলতে সাহস না করলেও আমি এক উপায় স্থির করেছি রাজাকে জব্দ করবার—তোরও সাহায্য চাই কিন্তু।"

পরের দিন রাজা সমারোহে তাঁহার মণিমুক্তার কারু-কার্যকরা সোনার অপরূপ চতুর্দোলায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ষোলো জন বেহারা ধীরে ধীরে রাজাকে বহন করিয়া চলিতেছে। দশজন অতি সুন্দর কিশোর পরিচারক তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছে। সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ-পদ্ম ও রজনীগন্ধার মালা থরে থরে দুলিতেছে—তার সাথে সুরভি ধূপের ধোঁয়া ও বহুমূল্য আতরের সুবাস মিশিয়া চতুর্দিকের বাতাস ভারী করিয়াছে। পাইকেরা পথ ঘিরিয়া চলিয়াছে। প্রজা-পরিজন দলে-দলে জয়ধ্বনি দিতেছে রাজ-দর্শনের আনন্দে। মহারাজা বড়ই আনন্দে প্রসন্ন মুখে রত্নখচিত সুখাসনে বসিয়া আছেন।

এমন সময়ে দোয়েল পাখা দুইটি মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে রাজার শিবিকার উত্তর পাশে উড়িতে

লাগিল। রাজা বিস্ময়-ভরে তাহাদের পানে চাহিতেই উভয়ে সমস্বরে শিস্ দিয়া গাহিয়া, উঠিল—

"হায় হায়! রাজ ভণ্ডারমে দমড়ি নেহী
নেহী রাজ ভণ্ডারমে মোতী
গরীব কা ধন লেকর বন্‌তা
রাজা কি দুধ-রোটী!—হায়রে…।"

[হায়! রাজ ভাণ্ডারে নেই কানাকড়ি
নেই কো মণি রতন-হার
গরীবের ধন কেড়ে হয়
রাজার ক্ষীর-সর।]

পাখীর গান ও তার অর্থ রাজার কানে বেশ স্পষ্টভাবেই পৌঁছিল এবং তৎক্ষণাৎ মহারাগে বিচলিত হইয়া বলিলেন—"এই কে আছিস—শীঘ্র ঐ লক্ষ্মীছাড়া পাখী দুটোকে ধরে কেটে ফ্যাল।" চারদিকে "ধরধর" শব্দ শুরু হইল। কিন্তু দোয়েলরা এজন্য প্রস্তুত ছিল—তাহারা একবার বহু উচ্চে উড়িয়া যায়, আবার ক্ষিপ্রবেগে—নামিয়া আসিয়াই সমস্বরে গান গাহিতে থাকে। পথে জনতার ভিড়ে চাপা হাসি শোনা যায়। রাজার প্রমোদ-ভ্রমণ একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া একেবারে শয়ন-মহলে দ্বার রুদ্ধ করিলেন

পরদিন রাজা ভ্রমণে বাহির হইলেন অন্য পথে। রাজ-হস্তীর পিঠে রাজা মুক্তার ঝালর-ঝোলানো হাওদায় বসিয়াছেন—মাথার উপর সোনার সূক্ষ্ম কাজ-করা শুভ্র চন্দ্রাতপ। বেশ অনেকটা পথ চলিয়াছেন—পাখীর কথা আর মনেই নাই। এমনসময় শোনা গেলো তীক্ষ্ণ শিসের সহিত গান—

"হায় হায়! রাজ ভণ্ডারমে দমড়ী নেহী
নেহী রাজ ভণ্ডারমে মোতী
গরীব কা ধন লে কর্ বন্‌তা
রাজা কি দুধ-রোটী!—হায়রে…!"

রাজাও আজ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ছিলেন লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। মনেমনে আগুন হইয়া রাজা পাশে-রাখা ধনুর্বাণ হাতে তুলিলেন—পাখী দুইটিও সে সময় রাজার খুব কাছে। দেখিলেন খুবই ছোট পাখী দুইটি, এখনই প্রাণ হারাইবে। মনেমনে হাসিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে একটি পাখীর ঠোঁট হইতে রাজার কোলে পড়িল একটি ছোট দামড়ী মুদ্রা। দোয়েলী ঐটি মন্দির অঙ্গনে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। রাজার আর তীর ছোড়া হইল না। ক্ষুদ্র মুদ্রাটি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মন কোন প্রকারে বিকল হইয়া গেল। রাজা মানুষ—সোনার মোহরই সর্বদা দেখেন—বাস্তবিক দামড়ি পয়সা হাতে লইলেন এই প্রথম। পাখীর গান আর রাজার কাণে গেলনা—তিনি মাহুতকে প্রাসাদে ফিরিবার ইঙ্গিত করিলেন। শয়ন-মহলে একাকী রাজা বহু চিন্তা করিতে লাগিলেন—"ছি ছি। প্রকাশ্য স্থানে ছোট্ট পাখী দুটি এমন ব্যঙ্গ করছে, প্রজাদেরও কি এইটা মনের কথা? দূর ছাই—ব্রাহ্মণের মুক্তাটি না হয় ফিরিয়ে দিই—।" রাজা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে মুক্তাটি লইয়া অনেক ক্ষণ দেখিলেন—"দিয়ে দেবো—না না এমন জিনিস হাতছাড়া করবো? দিনের পর দিন পাখীর বিদ্রূপ—প্রজারা আড়ালে হাসছে।…" এইসব চিন্তায় রাজার রাত্রি ভোর হইল।

…ভোরের তন্দ্রাটুকু রাজার ভাঙ্গিল দোয়েলের মধুর শিসে—সেই গান আবার তাহারা গাহিতেছে। প্রাসাদের বিস্তৃত গবাক্ষে বসিয়া তাহাদের সুন্দর ক্ষুদ্র কিশলয়-দেহে পূর্বাচল হইতে অরুণ আলোর স্রোত কলমল করিতেছে। রাজার মনে এতোটুকু রাগ অভিমান অহঙ্কার আর নাই—বিমল শান্তি ও আনন্দভরা মনে উঠিলেন।

…অল্পসময় পরেই বিরাট রাজসভায় দলে দলে প্রজা-সাধারণ আসিতে লাগিল। প্রত্যেকের যাহা রাজভাণ্ডারে গিয়াছিল, দশগুণ রাজা ফিরাইয়া দিলেন—তাহা ছাড়া সদাব্রত দান করিলেন। ব্রাহ্মণকে মহাসম্মানে আনিয়া মুক্তাটি তো দিলেনই এবং তাঁহার যাবজ্জীবন পরম সুখে থাকার ব্যবস্থাও করিতে ভুলিলেন না। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতায় মুক্তা আবার রাজাকে দান করায় তিনি সেইটী গণেশজীর গলায় হারে পরাইয়া দিলেন। আজও সেই মুক্তা গণেশজীর বক্ষস্থানে পরম গৌরবে বিরাজমান। সেই দোয়েল দম্পতিকে রাজা আপন রাজোদ্যানে নীড় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেদিনের সেই বিপুল আনন্দময় মহারাজের জয়ধ্বনির মধ্যে দোয়েল-দম্পতির মধুর ধ্বনি সবার উপরে বাজিয়াছিল।

—

গির-অরণ্য

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

মরুময় ভূমি ধূধূ বালু মাটী পাদপাদপহীন,
শুধু কাঁটাবন চীনা বাদামের লাগিতে বাবুল গাছ।
কথা বলে শুধু, কথা বলে আর, রাত্রি-আঁধারে লীন
কাঁদে শুধু কাঁদে কাঁটায় বালুতে দেখেছি জলের আঁচ।
তারই মস্তকে পর্বত চূড়ে পাল্লার উষ্ণীষ,
শ্যাম বনময় মধুরমা-ভরা গির-অরণ্য রাজে
সিংহের দেশ, শক্তের দেশ, মাটীতে ধানের শীষ
হরিণীর চোখে মহুয়ের নাচে মন ছুটে যায় কাছে।
দূর বিস্তৃত চলেছে গিরের আরণ্য অভিসার,
নীল গুণ্ঠনে কি যে রহস্য আকাশে সুবিস্তার!
সিংহের দেশ মরুদের দেশ গির-অরণ্য দেখে
মনে হয় তার আছে কি মমতা? মরু বুকে মুখ রেখে!

প্রতিধ্বনি

অশোক মুখোপাধ্যায়

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যগ্র করে
ধ্বনি কাছে ধরা দে যে পাছে ধরা পড়ে।"
(রবীন্দ্রনাথ)

কবির এই উক্তির মধ্যে নিহিত আছে শব্দের বৈজ্ঞানিক সত্য। কায়া ছাড়া যেমন ছায়া হয় না, ফুল ছাড়া যেমন পাওয়া যায় না ফুলের সুবাস, তেমনি ধ্বনি না হলে প্রতিধ্বনির অস্তিত্বই সম্ভব হত না। প্রতিধ্বনি তো ধ্বনিরই রূপান্তর মাত্র। দুইয়ের সামান্য যা তফাৎ, তা মানুষ এবং মানুষের ছায়ার মধ্যেকার তফাৎ থেকে একটুও বেশী নয়।

শব্দ কেমন করে শুনি—

আমরা কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অদৃশ্য হাওয়ায় সমুদ্রে ঢেউ জেগে ওঠে। এই ঢেউ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায় সামনে থেকে দূরে। পুকুরের আয়নার মত শান্ত জলের মধ্যে একটা ঢিল ফেললে যেমন ঢিলকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—অনেকটা তেমনি।

ব্যাপারটা আরও সহজ করে বুঝিয়ে বলি। মনে করা যাক, আমি একটি শব্দ উচ্চারণ করলুম। আমাকে চারপাশে ঘিরে রয়েছে বাতাসের অদৃশ্য কণিকারা। শব্দটা বলা মাত্র মুখের সামনের হাওয়ার একস্তর তাদের ওপর তা করবে আঘাত। ফলে এণাকারা অণুগুলো একটু এগিয়ে যাবে এবং ধাক্কাধাক্কি হয়ে আসবে। অবশ্য নিজেদের জায়গা ছেড়ে বেশী দূর যাবে না তারা। শব্দের যে কম্পন তাদের কাছাকাছি ঘিরে আসে, সেটা তারা পাশের অণুগুলোকে পৌঁছে দিয়েই আবার ফিরে আসবে নিজ নিজ জায়গায়। তখন কি হবে? তখন প্রথম অণুস্তরের অণুরা হয়ে যাবে ফাঁক ফাঁক, আর দ্বিতীয় অণুস্তরের অণুরা ধাক্কাধাক্কি। এইভাবে এক অণুস্তর থেকে পাশের অণুস্তর, সেখান থেকে তার পাশেরটায়—এমনি করে করে কম্পন পৌঁছে যাবে কান থেকে দূরে। তারপর শ্রোতার কানের পর্দায় তা গিয়ে করবে আঘাত। সেই আঘাতই সৃষ্টি করবে শব্দের সংস্কার।

তাহলে বোঝাই, শব্দ যে পথ অতিক্রম করে চলে, সে পথের হাওয়ার অণুস্তরগুলো একবার ঘনীভূত এবং তার অব্যবহিত পরের বার প্রসারিত হয়। প্রত্যেক অণুস্তরের এমনি ঘনীভবন এবং প্রসারণ ঘটে সেকেণ্ডে সহস্রাধিক বার। কিন্তু অণুগুলো আলাদা আলাদা ভাবে কখনোই বেশী দূর এগিয়ে যায় না। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত তারা নিজ নিজ স্থানের এদিক ওদিক সামান্য নড়াচড়া করে মাত্র।

এটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, আমি যত জোরে বা যত আস্তে কথা বলব, হাওয়ার কাঁপন ও চেউয়ের তত তফাৎ হবে। চিকন গলা এবং মোটা গলা হিসেবেও তার রকমফের হবে। তাই শ্রোতা শব্দের কথাগুলো শুনতে পাবে অবিকল—ঠিকঠাক।

প্রতিধ্বনির সৃষ্টি—

এখন কাছাকাছি যদি কোন খিরেট দেয়াল বা পাহাড় থাকে, তবে আমার চেঁচিয়ে বলা কথা হাওয়ার ঢেউ করে সেখানে পৌঁছে যেতে যাবে বাধা পেয়ে। কিন্তু থেমে স্থির হয়ে থাকবে না। ফিরে আসবে আমারই দিকে। কায়রো থেকে রিয়াদ, মাঝে খুঁটি বা ট্রাইকার দেওয়াতে বোর্ডের কিনারের দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসে—সেভাবে।

ফল কি হবে? আমার বলা কথা কিছুক্ষণ পর আমার সেখানে দাঁড়িয়েই শোনা যাবে। একেই বলা হয় প্রতিধ্বনি। আস্তে কথা বললে সে শব্দ ফিরে ফিরে আসতে আসতে অনেক ক্ষুদ্র হয়ে যায় বলে প্রতিধ্বনি ভালো বোঝা যায় না কিন্তু জোরে চিৎকার করলে তা প্রতিধ্বনিত হবে বেশ বোঝবার মতোই।

একটা জিনিষ সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, খোলা জায়গায় দিনের পর দিন ধরে চেঁচিয়ে মরলেও প্রতিধ্বনি শুনতে পাব না। কারণ খানিক প্রতিধ্বনি হতে হলে কোন কিছুর গায়ে বাধা পেয়ে ফিরে আসতেই হবে। সেজন্যেই সাধারণতঃ কোন পাহাড়ী জায়গায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে দেখা যায় যে চীৎকার অন্য পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে ফিরে আসে এবং স্পষ্ট প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। আর যত

চলার বা পাহাড়ের গুহায় অত্যন্তরে চিৎকার করলে তাহলে থেকে তা প্রতিধ্বনিত হয় এবং ফলে সেটাকে পরপর আওয়াজের মতন করে।

অবাক কাণ্ড—

অনেক সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটে। মজাটা কি, বুঝিয়ে বলছি।

শব্দের গতিবেগ বাতাসে সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। অর্থাৎ শ্রোতা বক্তার কাছ থেকে ১১২০ ফুট দূরে থাকলে প্রতিটি কথা বলার ঠিক ১ সেকেণ্ড পর সে শুনতে পাবে। আবার দুটি শব্দ যদি ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের কানে এসে পৌঁছোয়, তাহলে তাদের আমরা আলাদা আলাদা করে শুনতে পাব না। তারা একত্র মিলে যাবে এবং ফলে একটা লোমশমেলে আওয়াজ শুনতে পাব শুধু। এখন ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডে শব্দ যেতে পারে ১১২ ফুট। আমার শব্দ খানিকটা দূর গিয়ে কোন কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঠিক ততটা পথ ফিরে এলেই তবে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। কাজেই মেঘশ্রে পাচ্ছি, যাতে বাধা পাবে সেই বস্তুটি যদি হয় ৫৬ ফুটেরও বেশী দূরে, একমাত্র তবেই শব্দ মুখ থেকে বেরুবার ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের বেশী সময় পর প্রতিধ্বনিরূপে ফিরে আসবে। সে অবস্থায় বেশ যাবে বক্তা একটা শেষ করে অন্য কথা বলতে গিয়ে আগেকার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে নিজে নিজেই চমকে উঠছে। এমনিতে ঘরে বসে আমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতিধ্বনি সর্বদাই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু তারা ফিরে ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের সময়ের মধ্যেই আমাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, সেজন্য তাদের আলাদা করে ধরতে পারিনে।

একটি গল্প—

এ গেল প্রতিধ্বনির সত্যিকার ঘর কথা। এবার যদি একটি গল্প। গল্পটি গ্রীক উপকথার। কেমন করে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হল, তাই এর বিষয়বস্তু।

অনেক—অনেকদিন আগে গ্রামদেশে ছিল একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল 'ইকো' (যার বাংলা প্রতিশব্দ হল 'প্রতিধ্বনি')। ইকো বনের সমুখ পাহাড়ীয়ার গায়ের ছায়ায় নদীয়ের সঙ্গে ফুল তুলে, গান গেয়ে দিন কাটায়। একটি গুণ ছিল তার। বড় সুন্দর গল্প বলতে পারত সে।

কোনকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাকদেবতা 'জুনো' তার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিলেন। সেদিন থেকে ইকো'র আর সুখের সীমা রইল না। সে শুধু তখন অন্যের বলা কথার শেষ অংশটাই পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারত মাত্র।

একদিন হয়েছে কি, 'নার্সিসাস' নামে একটি ফুলের মত সুন্দর কিশোর সেই বনে এসে পথ হারিয়ে ফেলল। নার্সিসাসের মতন ছিল

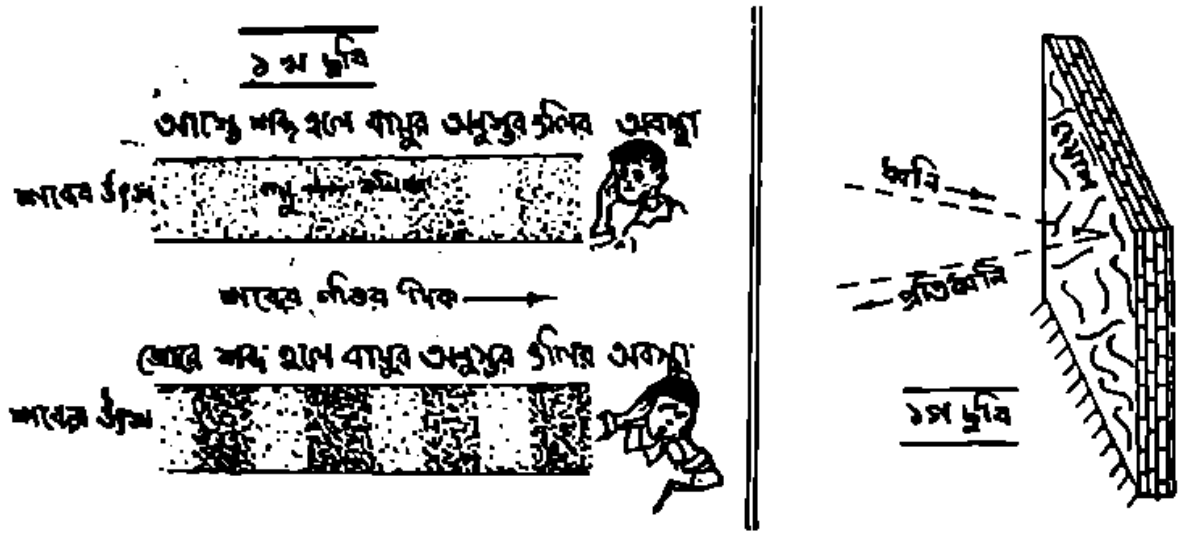

খানিকটা দূর গিয়ে কোন কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঠিক ততটা পথ ফিরে এলেই তবে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। কাজেই মেঘশ্রে পাচ্ছি, যাতে বাধা পাবে সেই বস্তুটি যদি হয় ৫৬ ফুটেরও বেশী দূরে, একমাত্র তবেই শব্দ মুখ থেকে বেরুবার ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের বেশী সময় পর প্রতিধ্বনিরূপে ফিরে আসবে। সে অবস্থায় বেশ যাবে বক্তা একটা শেষ করে অন্য কথা বলতে গিয়ে আগেকার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে নিজে নিজেই চমকে উঠছে। এমনিতে ঘরে বসে আমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতিধ্বনি সর্বদাই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু তারা ফিরে ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের সময়ের মধ্যেই আমাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, সেজন্য তাদের আলাদা করে ধরতে পারিনে।

একটি গল্প—

এ গেল প্রতিধ্বনির সত্যিকার ঘর কথা। এবার যদি একটি গল্প। গল্পটি গ্রীক উপকথার। কেমন করে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হল, তাই এর বিষয়বস্তু।

অনেক—অনেকদিন আগে গ্রামদেশে ছিল একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল 'ইকো' (যার বাংলা প্রতিশব্দ হল 'প্রতিধ্বনি')। ইকো বনের সমুখ পাহাড়ীয়ার গায়ের ছায়ায় নদীয়ের সঙ্গে ফুল তুলে, গান গেয়ে দিন কাটায়। একটি গুণ ছিল তার। বড় সুন্দর গল্প বলতে পারত সে।

কোনকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাকদেবতা 'জুনো' তার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিলেন। সেদিন থেকে ইকো'র আর সুখের সীমা রইল না। সে শুধু তখন অন্যের বলা কথার শেষ অংশটাই পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারত মাত্র।

একদিন হয়েছে কি, 'নার্সিসাস' নামে একটি ফুলের মত সুন্দর কিশোর সেই বনে এসে পথ হারিয়ে ফেলল। নার্সিসাসের মতন ছিল

খানিকটা দূর গিয়ে কোন কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঠিক ততটা পথ ফিরে এলেই তবে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। কাজেই মেঘশ্রে পাচ্ছি, যাতে বাধা পাবে সেই বস্তুটি যদি হয় ৫৬ ফুটেরও বেশী দূরে, একমাত্র তবেই শব্দ মুখ থেকে বেরুবার ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের বেশী সময় পর প্রতিধ্বনিরূপে ফিরে আসবে। সে অবস্থায় বেশ যাবে বক্তা একটা শেষ করে অন্য কথা বলতে গিয়ে আগেকার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে নিজে নিজেই চমকে উঠছে। এমনিতে ঘরে বসে আমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতিধ্বনি সর্বদাই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু তারা ফিরে ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের সময়ের মধ্যেই আমাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, সেজন্য তাদের আলাদা করে ধরতে পারিনে।

একটি গল্প—

এ গেল প্রতিধ্বনির সত্যিকার ঘর কথা। এবার যদি একটি গল্প। গল্পটি গ্রীক উপকথার। কেমন করে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হল, তাই এর বিষয়বস্তু।

অনেক—অনেকদিন আগে গ্রামদেশে ছিল একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল 'ইকো' (যার বাংলা প্রতিশব্দ হল 'প্রতিধ্বনি')। ইকো বনের সমুখ পাহাড়ীয়ার গায়ের ছায়ায় নদীয়ের সঙ্গে ফুল তুলে, গান গেয়ে দিন কাটায়। একটি গুণ ছিল তার। বড় সুন্দর গল্প বলতে পারত সে।

কোনকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাকদেবতা 'জুনো' তার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিলেন। সেদিন থেকে ইকো'র আর সুখের সীমা রইল না। সে শুধু তখন অন্যের বলা কথার শেষ অংশটাই পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারত মাত্র।

একদিন হয়েছে কি, 'নার্সিসাস' নামে একটি ফুলের মত সুন্দর কিশোর সেই বনে এসে পথ হারিয়ে ফেলল। নার্সিসাসের মতন ছিল বস্তুত নিষ্ঠুর। পৃথিবীতে একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে সইতে পারত না। ইকো তো সেকথা জানত না! তাকে দেখামাত্র বড় ভালবেসে ফেলল সে। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলার শক্তি যে তার হারিয়ে গেছে। তাই কতক্ষিত চরণে সে নার্সিসাসের পিছু পিছু যেতে লাগল নীরবে।

হঠাৎ নার্সিসাস বুঝতে পারল সে পথ হারিয়েছে। চীৎকণ্ঠে চীৎকার করে বলতে সে, এখানে কেউ আছে?

তার শেষ শব্দটির পুনরাবৃত্তি করে ইকো উত্তর দিল,—আছে।

নার্সিসাস্ চমকে ফিরে তাকাল। কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। তখন সে আবার বলল; তাহলে আমার কাছে এস।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর শুনতে পেল,—এস।

ইকো গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল নিজেকে, পাছে তাকে দেখে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাই নার্সিসাসে তাকে দেখতে না পেয়ে

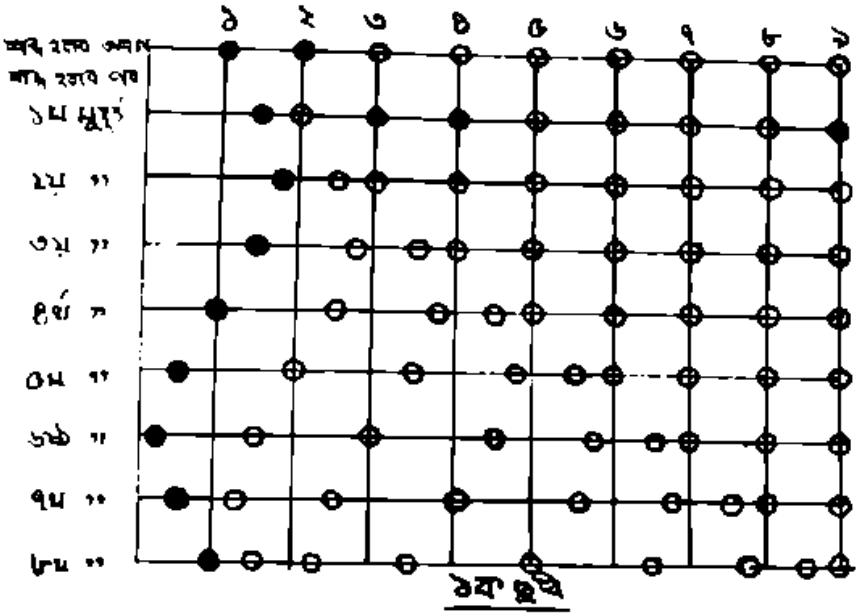

১ম ছবি

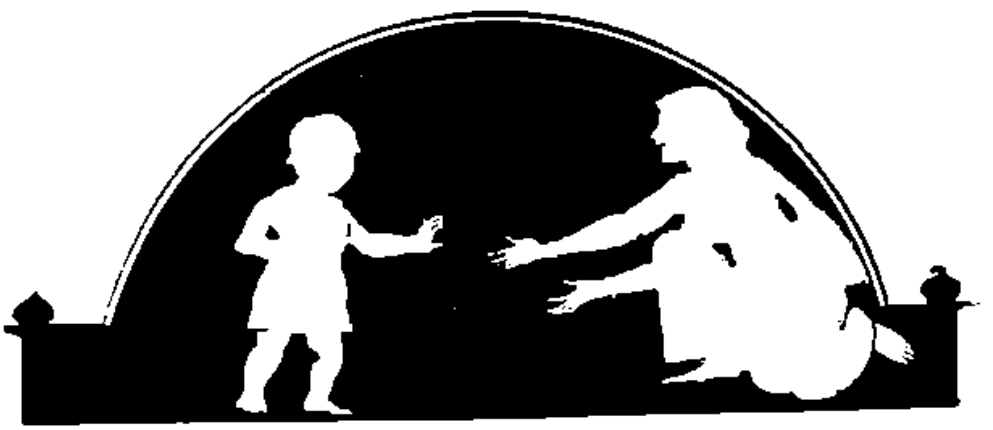

"সাগর জলে সিনান করি—"

ফটো : উৎপলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থির

ফটো : দিব্যেন্দু গোস্বামী

মৃত্যু

দিব্যেন্দু পালিত

বন্ধুদের চোখের তারাগুলো ছটফট করছিল। একে একে এগিয়ে এল তারা; কাছে, আরো কাছে। তারপর কানে কানে গোপন কথা বলার মতন ঝিমে ঝিমে রুদ্ধ-প্রায় গলায় তাদের মনের কথাগুলি বলল তাকে।

কান পেতে সবটা শুনল সে। নিথর ঠোঁট দুটো মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু কথা ফুটল না। আরো খানিকটা সময় তখনো ছিল। স স ক'রে অদ্ভুত একটা শব্দ করছিল ইঞ্জিনটা, পুরণো মাথার মত ককিয়ে ককিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল চিমনির কালো ধোঁয়াগুলো। শূন্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিল সে, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথা মনে পড়ছিল তার।

বন্ধুদের একজন তার হাতটা তীব্র আবেগে আঁকড়ে ধরেছিল। তার মনে হচ্ছিল, হাতের আঙুলগুলো এবার ছিঁড়ে খ'সে পড়বে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিলনা।

তার চোখের পাতায় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত নতুন এক রোমাঞ্চে সেই রাত্রিটা নেমে আসছিল। মালয়ের রবার বনের মাথায় হঠাৎ কলকব্জা অকেজো হয়ে ভেঙে পড়েছে প্লেনটা! তারা ছিল তিনজন। কানের পাশে খুব কাছেই কোথাও বুনোর প্রচণ্ড অট্টহাসি শুনতে পেল যেন। কুড়ি ফুট পঁচিশ ফুট কী তার চেয়ে আরো দীর্ঘ, কদর্য হয়ে কতগুলি উলঙ্গ অস্থির বিভীষিকার ছায়া নাচানাচি করছিল চোখের সম্মুখে। সেই চরম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তার মস্তিষ্কে একটি ধ্রুবনক্ষত্র তখনো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। স্পষ্ট জানত সে যে, সে আর বাঁচবেনা। কয়েক শো গজ নিচের নিটল শূন্যের অঙ্ক স্পর্শ করতে না করতেই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হাত পা অঙ্গ-অবয়বের সমস্ত যন্ত্রণা মুছে নিয়ে কালো গভীর হয়ে নিষ্করুণ রাত্রি নামবে। আর তারও অনেক বছর পর—

কিন্তু সে মরল না। মরেও বেঁচে গেল। তার মনে হল, সে যেন সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীতে নতুন ক'রে জন্ম নিয়েছে। আনন্দে চীৎকার করতে গেল সে; গলা চিরে রক্ত বেরুবার মত হল, তবু একটি শব্দ বেরুল না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, চোখের সামনে বীভৎস একটা বিভূতের মত পড়ে রয়েছে তার সহকর্মীর খেঁতলে কলসে যাওয়া ভয়ঙ্কর মুখ! দাঁতের সারি আর দাঁতগুলো সব আলগা আলগা হয়ে ঝুলে রয়েছে বাইরে; চোখের মণি দুটো ফেটে গিয়ে ঘিয়ের মত কেমন একটা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে!

আর সহ্য হল না। দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে গিয়ে সহসা যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠল সে। বাঁ হাতটা তার ভোজবাজির মত কব্জির কাছ থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে; সমস্ত শরীর রক্তে ভেসে গিয়েছে। ডান চোখটা অসহ্য যন্ত্রণায় টনটন ক'রে আলা ক'রে উঠল; মাথার সমস্ত শিরাগুলো যেন এক সঙ্গে পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে গেল। অবশ অবসাদে সর্বাঙ্গ ঝিমিয়ে পড়ছিল তার। অন্ধকারে সে আর কিছুই দেখতে পেল না।

কিন্তু তার ভাগ্য ভাল। কারণ, এবারও সে বেঁচে গেল। সে শুনেছে, তিন দিন আর আর তিন রাত্রির পর তার ঘুম ভেঙেছিল। ঘনবদ্ধ রবার বনানীর পাতা-ডালের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে প্রখর সূর্যের ক্ষীণ আলো এসে লুটিয়ে পড়েছিল তার মুখের উপর। নরম রঙের ছোট্ট একটা প্রজাপতি ফরফর করছিল তার চোখের সম্মুখে। অবাক বিস্ময়ে চার পাশে তাকাল সে এবং আরো চারটে জন্তু, শুষ্ক করুণ অসহায় মুখ তার চোখে পড়ল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' প্রায় নিঃশব্দ স্বরে তারা বলল, 'তোমার জ্ঞান ফিরেছে। এই তিন দিন আমরা আহার নিদ্রা ছেড়ে শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।'

সে চোখ বন্ধ করল, আবার খুলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কে ?'

তারা হাসল নীরবে। মধুর মুগ্ধ আনন্দের হাসি। আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা বন্ধু।' আজ প্রায় একমাস এইভাবে এই বনের মধ্যে পড়ে আছি। সে এক মহাভারতের কাহিনী। যাক্। তোমাকে সুস্থ দেখে আমরা নিশ্চিন্ত। এই তিনদিন আমরা ঘুমাতে পারিনি, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি, আর প্রার্থনা করেছি।

'তোমরা মহৎ' কষ্ট ক'রে সে বলল, 'তোমরা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ। তোমাদের ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে।' তারা বলল, তারপর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে একটু সরব আর একটু সতর্ক হয়ে বললো, 'আজ থেকে আমরা বন্ধু। উই আর ফ্রেণ্ডস।'

বনের বনস্পতীর দুর্ভেদ্য পাতার অরণ্যে সূর্যের হাসিটা তখন একটু একটু ক'রে অনেকখানি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। উষ্ণ কোমল একটা স্পর্শের অনুভূতি ছিল সর্বাঙ্গে। আর বিচিত্র শব্দে মাঝে মাঝে একটা পাখী ডাকছিল। তারা চারজন এবং আরো একজন, পাঁচজনে সেই দুরোধ্য ডাকের একটা অর্থ খুঁজে বার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।

তারপর সে তার কাহিনী বলে গিয়েছিল।

সে বলেছিল, সে একজন সৈনিক হলেও মৃত্যুকে তার অস্বাভাবিক ভয়। মরতে সে চায়না, বাঁচতে চায়। সুস্থ সহজ সুন্দর ও মনোরম জীবনের দ্রৌহায় মধুর হয়ে যেতে চায়। শুধু মাত্র দিয়ে দিয়ে আর নিয়ে নিয়েই যে জীবনের আনন্দ, সেই আনন্দের জীবনের স্বাদ বর্ণ ও গন্ধ নিয়ে বেঁচে থাকবার আশ্বাসটুকুই সে শুধু চায়। চেয়েছে।

তার মনে পড়েছে, এই পৃথিবীর অনেক অসংখ্য সুন্দর দিনের মত একটি দিনে তার জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্নের সেই শুভ মুহূর্তে আনন্দ-ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়নি, বাতাসও কেঁপে ওঠেনি। কিন্তু সেদিনও আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ছিল। সে শুনেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় আচ্ছন্ন সেই অপরূপ রাতে গাছের পাতারা হীরের সাজ পরেছিল ; নদীর জলে রূপো ঝরে পড়েছিল ; নীল একখণ্ড মেঘ স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল আকাশের মাঝখানে। যেন চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে একটা নতুন রহস্যের দুরন্ত খেলা দেখছিল। আর জোনাকিরা লুকোচুরির মাঝায় দিয়ে গিয়ে জোড়া পাখে তালি বাজিয়ে বিশ্বচরাচরের আরো এক সুন্দরের জন্ম ঘোষণা করছিল।

তারপর সে বড় হল। শুকসারীর মত একটে জড়িয়ে, অন্যকে নির্ভর ক'রে। ভালবাসার মধ্যে ছড়িয়ে দিল, হারিয়ে দিল—আর খেলে ধরল নিজেকে। ভালবাসতে শিখল।

জীবনের রূপ তখন তার চোখে একটু একটু ক'রে বদলে যাচ্ছে। আরো সুন্দর হয়েছে সব ; সুন্দর হয়ে ক'রে যাচ্ছে ক্রমশ। তার বাবা তাকে পৃথিবীর নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'সত্যকে গ্রহণ করো, ভালবাসো। তবেই প্রতিদানে ভালবাসা পাবে। তার চেয়ে মহৎ উজ্জ্বল ও পবিত্র আর কিছুই নেই।'

'ভালবাসা কী ?'

বাবা বললেন, 'অন্যকে ভালবাসলেই তা ভালবাসা হয় না! সে হল অখণ্ড, অপূর্ণ। কারুর মুখে যদি খুশির হাসি ফোটাতে পার, তৃপ্তির সুষমা—সেখানেই তুমি সার্থক, তোমার ভালবাসা সার্থক।

তারপর দেখতে দেখতে একটা শকুনের ডানায় ভর ক'রে যেন অন্ধকার নেমে এল। গহন গাঢ় অন্ধকারে সত্যের পথ-চিহ্ন গেল মুছে। যুদ্ধ শুরু হল। বাবা যুদ্ধে গেলেন, আর ফিরলেন না।

তাদের সেই ছোট অনটনের সংসার আরো ক্ষীণ হয়েছে তখন। শুটি শুটি ক'রে আরো পাঁচজন এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। তাদের চোখে স্বপ্ন, মুখে সুধা এবং বুকে জ্বালা। হ্যাঁ, সেই সবুজ অবুঝ বয়সেই তাদের ফুল-কোমল বুকগুলিতে একটা গভীর সন্দেহের জ্বালা ধুকপুক্ করছিল। বিশ্বাসের বাঁধন গিয়েছিল আলগা হয়ে।

সে তবু বিশ্বাস হারায়নি। দুর্যোগের কালো মেঘ তার সম্মুখে, শকুনের বীভৎস ডানার ছায়া তার মাথার উপর। সে তবু নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, নিটুট।

'মা, আমি যুদ্ধে যাবো।' মাকে বলল সে।

বাবার মৃত্যু-সংবাদ তখনো মা'র কানে যায়নি। অথচ আশঙ্কায় ব্যাকুল বিহ্বল মা শুধালেন, 'কেন ?'

'বাঁচার জন্যে।' সে বলল, 'আমাদের বাঁচতে হবে,

মা ; বাঁচার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে অনেক টাকা, অনেক প্রতিপত্তি।' ভবিষ্যতের রামধনু কল্পনায় ঝক্‌ঝক্ করছিল তার চোখের দৃষ্টি, থরথর করছিল গলা। সে বলল, 'আমি বড়লোক হয়ে ফিরে আসব! কিছুদিন তো মাত্র। আমাকে যেতে দাও, মা।'

'কিন্তু সেখানে গেলে যে আর ফেরে না!' বাবার কথাটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন মা।

'অনেকে ফেরে', সে বলল, 'আমরা ফিরব, আমি নিশ্চয় ফিরব।' উত্তেজনায় ফাঁক-ফাঁক নিঃশ্বাস পড়ছিল তার, গলা কাঁপছিল, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, তারা কোনদিন পরাজিত হয় না, মা। আমাদের জয় অনিবার্য্য।'

সে যা শুনেছিল, তাই বলল। এর বেশি অন্য কিছু, নতুন কোন কথা তার জানা ছিল না।

যাবার আগে সে তার বোন দু'টিকে আদর করল, ভাই দু'টিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। মাকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ণ অথচ শান্ত স্নিগ্ধ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে। মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, গালে গাল চেপে সমস্ত উষ্ণতার উত্তাপটুকু মেখে নিয়ে, অবোধ শিশুর মত মার বুকে মুখ গুঁজল, গলায় কপালে চুমু খেল। পথভ্রষ্ট অন্ধ হরিণশিশু গন্ধের আকর্ষণে হঠাৎ যেন তার মা'কে খুঁজে পেয়েছে।

'মা, আমি আবার ফিরে আসব।' সে বলল।

মা অশ্রু-সিক্ত রুদ্ধ গলায় বললেন, 'আসবি, আসবি। আমার মাতৃত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে তুই অক্ষত দেহে আবার আমার বুকে ফিরে আসবি।'

'মা!' সে চীৎকার ক'রে উঠল, কাঁদল ; তারপর আস্তে আস্তে পুরনো নোনা-ধরা জীর্ণ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। কাপসা চোখে বাড়ীটাকে দেখল একবার। ভাবল, এই জীর্ণ ঘরের ধরা সৌন্দর্য্যে আবার যৌবন ডাকবে। উদ্দাম অস্থির অস্তি চপল এবং অস্তি দুরন্ত হবে সেই যৌবনের চেহারা। দরজার বাইরে কবিখনসার কাঁটা-গাছে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল সে। কাঁটা ফুটে রক্ত বেরুল। টকটকে, লাল, উজ্জ্বল। সে ভাবছিল, এই কাঁটাও একদিন ফুল হবে ; রক্তের মত লাল ফুলের রাশি রাশি স্তবক সুন্দরের স্বপ্ন হয়ে ফুটবে, হাসবে।

এইসব ভেবে পথে পা দিল সে।

'তারপর, দেখছো, আজও আমার ঘরে ফেরা হয়নি।'

বন্ধুরা এতক্ষণ অপলক চোখে স্ফুরিত অধরে সব শুনছিল। রৌদ্রের আভায় তাদের তামাটে শরীরে কেমন এক ধরণের হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে ; কপালের রেখাগুলো আরো ঘন ও পুরু হয়ে জড়াজড়ি করছে, ভ্রূরেখা কাঁপছে, সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হচ্ছে।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারা বলল, 'ঠিক এই রকম না হলেও, অনেকটা এই ধরণের, হ্যাঁ, অদ্ভুত জীবন্ত এক জীবনের প্রবল আকর্ষণে আমরা যুদ্ধে সৈনিক হয়েছি। শুনেছি, এ-যুদ্ধ মৈত্রীর যুদ্ধ, সাম্যের যুদ্ধ, ভবিষ্যতের স্বচ্ছন্দ সাবলীল সম্ভাবনার স্বপক্ষে, বর্তমানের অনিশ্চিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে আগামী দিনের যুদ্ধ। কিন্তু, আমরা কী পেলাম!

তাদের নিঃশ্বাসের শব্দগুলি একসঙ্গে কোলাহল ক'রে বেজে উঠল। তাদের বুকের বেদনাগুলি প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল না ; কিন্তু নিটোল অশ্রুতে বাষ্পের আর ধ্বনিময় হয়ে উঠল।

সে বলল, 'আমারও সেই কথা মনে হচ্ছে আজ। আমাদের আশা ছিল অনেক, কিন্তু সেই আশার পাওনার কতটুকু আমরা পেলাম! তবু, তবু আমি বিশ্বাস হারাইনি।' নিজের বিকলাঙ্গ জর-তপ্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে সে বলল, 'বন্ধু, তোমরা দেখ, আমার এই পঙ্গু, ভগ্ন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার বাস্তবিক কোন অর্থ হয়না। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল। কিন্তু আমি মরিনি, মরেও বেঁচে গেছি। আমার মায়ের আশীর্বাদ আমাকে বাঁচিয়েছে ; আমার ছোট ছোট ভাই-গুলি আর বোনগুলির শুভেচ্ছা আমাকে রক্ষা করেছে। তারা আমার পথ চেয়ে আছে, দিনের পর দিন আমার প্রতীক্ষা করছে। তাদের কাছে ফিরে না-যাওয়া পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু হবেনা।'

মাথার উপর ভ্রমর গুঞ্জনের মত অদ্ভুত বোমারু গুঞ্জন ক'রে গেল। ভয়চকিত বিবর্ণ হয়ে তারা শুনল, তারপর ফিসফিস প্রায় বাতাসের মত নিঃশব্দ গলায় বলল, 'শত্রু শত্রু। আমাদের চারিদিকে শত্রু। হা ঈশ্বর!'

'তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।' সে বলল, 'আমরা আবার ফিরে যাব। নিশ্চয় যাব। সুযোগ

আমি আরও পেয়েছিলাম, কিন্তু যাইনি। নিঃসম্বল হয়ে শূন্য হাতে শুধুমাত্র একটা বিকলাঙ্গ অক্ষম দেহের মত অস্তিত্ব নিয়ে তাদের কাছে আমি ফিরে যেতে পারব না। তাদের জন্য আমি সাঁচার আশ্বাস নিয়ে যাব, সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাদের আমি উপহার দেব। উঃ, তখন তাদের, এবং আমারও, কী আনন্দ যে হবে, তা আমি কল্পনা করতে পারছি না!'

মালয় থেকে টেনাসেরিম। সেখান থেকে মার্গুই, মৌলমিন হয়ে রেঙ্গুন। তারপর—

এইবার তার চোখ ফেটে জল নামল। কাপ্‌সা চোখে এল দৃষ্টি। ইঞ্জিনের মলিন ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আজ এতদিন পরে এইসব ঘটনার স্মৃতিগুলো তার মনে ভিড় ক'রে আসছিল। বুকের চাপ-চাপ জমাট বেদনা-গুলো গ'লে জল হয়ে গলার কাছে কাঁপছিল। বন্ধুদের দিকে সে আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। সে বেশ বুঝছে, তার এখন জোরে চেঁচিয়ে কাঁদা উচিত; কাঁদতে পারলে অন্তত খানিকটা শান্তি পেত সে। কিন্তু ট্রেনের যাত্রীরা আর আশে পাশে আনাচে কানাচে যারা ছিল, তারা নেহাত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখছে আর হাসছে।

'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছেনা, তোমাদের কাছ থেকে আমি আলাদা হয়ে যাব। আচ্ছা, তোমরা ভাবতে পার! সে আস্তে আস্তে, মৃদু ভগ্ন রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'প্রায় তিনবছর কী তারও কিছু বেশি দিন আমরা একসঙ্গে একাত্ম ও একপ্রাণ হয়ে ছিলাম। সুখেই ছিলাম, আনন্দে সুখে এবং শান্তিতে। কোন কোন সময় আমার মনে হয়েছে, সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর অরণ্যের নির্জনতায় আমাদের নতুন ক'রে জন্ম হয়েছিল। কিন্তু—'

সত্যিসত্যিই এবার সে কেঁদে ফেলল এবং ঠোঁট কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে ফেলল। ডানদিকের ছানি-পড়া নিষ্প্রভ চোখে আর পুড়ে-যাওয়া বদাকার উঁচু-নিচু মাংসল গালে তাকে কেমন অদ্ভুত আরণ্যক, হিংস্র অথচ মিষ্টি মমতায় আশ্চর্য্য করুণ দেখাচ্ছিল।

বন্ধুরা তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল, 'তুমি তোমার মায়ের কাছে, ভাইয়ের কাছে আর বোনের কাছে ফিরে যাচ্ছ; এর চেয়ে শান্তির কথা আমাদের কাছে আর কী হ'তে পারে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। কামরার দরজায় হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে রইল পিছনের দিকে। তারাও তাকে দেখছিল, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল। বাঁ হাতটা পঙ্গু না হলে সেও বন্ধুদের শেষ সম্ভাষণ জানাতে পারত! কালো নিশ্চল কতগুলি বিন্দুর মত হয়ে ক্রমশ তারা দৃষ্টির নেপথ্যে হারিয়ে গেল।

ফিরে এসে সে তার নিজের আসনে বসল। কেমন নিঃসঙ্গ নিরায়ু মনে হচ্ছে নিজেকে। এমন কি, স্বদেশে স্বজনের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাটুকুও হঠাৎ যেন হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে হল, তার শরীরের আরো কয়েকটা হাত-পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অন্য কোথাও ফেলে রেখে এসেছে!

অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিল সে। একটি শিশু তাকে দেখে হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠে তার মা'র বুকে মুখ লুকালো। তিন বছর, দুর্ভেদ্য গহন অরণ্যে সেই আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনার পর আজ পর্য্যন্ত, আয়নায় নিজের মুখ দেখেনি সে। ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের বিবরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। বুঝতে পারে না সে, ধারণাও করতে পারে না, তার মুখের চেহারা একটা পিশাচের চেয়েও জঘ্য আর বীভৎস হয়েছে। অনুভবও করতে পারে, কিন্তু মুখোমুখি হ'তে পারেনা। মনে হয়, সেই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে তার মৃত্যু ভাল। অথচ সে মৃত্যু চায়না এবং একদিন সত্যিই সে সুন্দর সহজ ও প্রিয় ছিল, ভালবাসার মানুষ ছিল! যুদ্ধ তাকে একটা ভয়ের মানুষ তৈরী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে!

মা কী আমায় চিনতে পারবে? আজ আটবছর পরে আমি দেশে ফিরছি!

জানালার বাইরে তাকিয়ে সে ভাবছিল। ঠিক চিন্তা নয়; ভয়, একধরণের ভয়ও ছিল তার মনে। যাদের কাছে সে যাচ্ছে, তার নিজের এতদিনের আশা ভরসা, দুঃখ ও যন্ত্রণা এবং জ্বালার বেদনা নিয়ে, তারা যদি তাকে, না চেনে, কিংবা চিনেও ভুল করে! না, তা হয় না। তা হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। মা অন্তত তাকে চিনবেন, ছোট ছোট ভাই বোনগুলিও নিশ্চয় তাকে

চিনতে পারবে। তাদের মুখগুলি সে কল্পনা করতে পারছে। আজ তারা অনেক বড় হয়েছে; ছোট বয়সের সেই চপলতা আর চঞ্চলতার হাল্কা নিঃশ্বাসগুলো হারিয়ে বয়সের ভারে বেশ গম্ভীর হয়েছে! তারা ভাল হোক, বড় হোক, মহৎ হোক্, মনে মনে সে প্রার্থনা জানালো।

হঠাৎ গিয়ে সে নিশ্চয় সকলকে খুব অবাক ক'রে দেবে। জীর্ণ বাড়ীটা এখন আরো জীর্ণ হয়েছে, ফনি-মনসার জঙ্গল আরো ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। চতুর্দিকে কেমন একটা থমথমে নিস্তব্ধ ভাব। ধীরে ধীরে গিয়ে সে দরজার কড়া নাড়বে। তার ছোটবোন, যাকে সে খুব ভালবাসত, এসে দরজা খুলে দেবে এবং তার বিকৃত মুখ ও চেহারার রূপ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে আঁতকে উঠে ছুটে পালাবে। সে তবু হাসবে; হাসতে হাসতেই ঘরের ভিতরে ঢুকবে। ভয়ে সঙ্কোচে দ্বিধায় তারপর একে একে সকলেই আসবে, আর ভিড় করবে তাকে ঘিরে।

'আমাকে চিনতে পারছ না! আমি—' পরিচয় দিতে গিয়েও সে চুপ ক'রে যাবে। কারণ, ততক্ষণে তার মা এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। অপলকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মা-কে দেখবে সে। তারপর ডাকবে, 'মা!' মা একটু কেঁপে উঠবেন, তার বিশ্বাসের সিংহাসন-টাই সহসা দুলে উঠেছে যেন। সে আবার ডাকবে, 'মা, আমাকে চিনতে পারছ না!'

এক মুহূর্তে থম্‌কে থেমে মা ছুটে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন তাকে। 'সত্যিই তুই ফিরে এসেছিস, বাবা! আমি ভেবেছিলাম—'

'তুমি যে আমায় আশীর্বাদ করেছিলে, মা। তোমার আশীর্বাদ আমাকে সব সময় ঘিরে ছিল।'

সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠবেন, 'কিন্তু, এ তুই কী রূপ নিয়ে ফিরে এলি, বাবা!' মা'র বুকের পাঁজর আর পাঁজরের হাড়গুলো যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

'আমি যে আবার তোমার বুকে ফিরে এসেছি, তাই কী যথেষ্ট নয়, মা।' অনর্থক হলেও মাকে সান্ত্বনা দিতে চাইবে সে।

এতক্ষণ যারা দূরে দূরে ছিল, তারা এবার কাছে আসবে; চোখের কোণে ব্যথার বিন্দুগুলিকে হাসিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে। মা, ক্লান্ত খুশির হাসি হেসে বলবেন, 'ওরে, শাঁখটা কেউ বাজা, আজ আমার বড় আনন্দের দিন।'

সে আর ভাবতে পারছিল না। আনন্দে তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। ক্রান্তে বন্ধুরা জল ভ'রে দিয়েছিল, ইচ্ছা করলেই সে খেতে পারত। কিন্তু সে স্পর্শ করল না পর্য্যন্ত। ঘরে পা দিয়েই সে তার পিপাসা মেটাবে। মা বুঝবেন, বেচারা ছেলেটার কত ছোটাই না পেয়েছিল। কিন্তু সে জানবে, জলের পিপাসা নয়, এ অন্য কিছু, নতুন কিছু। এ হল অমৃতের তৃষা, বাসনার রাঙা জীবনের তৃষ্ণা। যে তৃষ্ণার জ্বালা নীলকণ্ঠ হলেও বুঝি মেটেনা।

কতগুলি স্টেশন এল আর গেল, তার খেয়াল হল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত মনের গুহায় ক্রমাগত আঁচড় কাটছিল সে। তবে অনেকটা সময় যে সে ভেবে ভেবেই কাটিয়ে দিল, অনায়াসে এখন তা বুঝতে পারা যায়। এরপর কী করবে ভাবতে ভাবতে সে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোক প্রথমে তাকে আমল দিলেন না। তাঁর মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হল, এই ধরণের কুদর্শন বিভীষিকার মুখগুলির জন্য তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা আর আতঙ্ক রয়েছে। কিন্তু নেহাত শিশুর মতন যখন সে তার করুণ কাহিনী বলে গেল, ভদ্রলোক নির্বাক হয়ে শুনলেন, শুনে করুণা হল তাঁর।

সৃষ্ট কামরায় তারা দু'জনই শুধু যাত্রী। ভদ্রলোক বললেন, 'আট বছরে তো সমস্ত পৃথিবীটাই ওলট-পালট হয়ে গিয়ে নতুন ক'রে সেজেছে। আপনি কী সব চিনতে পারবেন?'

'কী বলছেন!' সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'আমার নিজের দেশ, নিজের বাড়ী আমি চিনতে পারব না! কোথায় কোন গাছটি আছে। তা পর্য্যন্ত আমি বলে দিতে পারি।

ভদ্রলোক নীরবে হাসলেন।

পাগলের মত সহসা বাঙ্কের উপর থেকে সে তার পুরনো স্যুটকেশটা টেনে নামাল। তারপর ভদ্রলোকের সম্মুখে খুলে ধ'রে একে একে জিনিস গুলো বার করতে করতে বলল, 'দেখুন, এই জিনিসগুলো আমি তাদের

জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। এগুলি আমার মায়ের জন্যে, আর ওগুলি আমার ভাইবোনের জন্যে। অবশ্য মূল্যের অনুপাতে এগুলি কিছুই নয়। তবু, এই সামান্য জিনিস-গুলো জোগাড় করতেই আমাকে পুরো দু'বছর প্রাণ-পণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, আমার এই পঙ্গু শরীরে এর বেশি আর সামর্থ্য ছিলনা, দামও ছিল না। কিন্তু তারা কী আমার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেনা? আপনি বলুন?'

ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে তার চোখ দু'টি আচ্ছন্ন হয়ে ছলছল করতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন—আপনি অত বিচলিত হচ্ছেন কেন! আসলে আপনার ওইসব ভাবনার কোন অর্থই হয় না।

আমারও তাই মনে হয়।' সে একটু হেসে বলল, আমার ছোট বোনটির কথা তো আপনাকে বলিনি। একবার কী হয়েছিল জানেন—'

সন্ধ্যার সময় সে ট্রেন থেকে নামল। নেমেই একটু হতভম্ব হল। এ কোথায় এল সে! স্টেশনের নামে অবশ্য সেই নামই চিহ্নিত আছে; কিন্তু সেই পুরনো নামের কাঁচা অক্ষরগুলো সবই নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। কাঁচা মাটির প্ল্যাটফর্ম আর নেই। যেন এই আটবছরের মধ্যেই একটা বিরাট পরিবর্তন এসে মাটির নমতাকে ভেঙেচুরে কংক্রীটের কঠিন সাজ পরিয়ে দিয়েছে! দু'টি প্ল্যাটফর্মের যোগসূত্র হিসাবে গ'ড়ে উঠেছে ইস্পাতের সুদীর্ঘ সেতু। অসংখ্য বাতীর কোলাহলে আর ফ্লুরোসেন্ট লাইটের উজ্জ্বল ধাঁধায় চোখ আর মন বলসে গেল তার। অনেকেই তার দিকে তাকালো; কেউ হাসে, কেউ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তীব্র, অস্বস্তি জানায়। কাটা হাতটাকে আস্তিনে ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে কেঁচোর মতন একটা তীক্ষ্ণ দেহের সতর্ক যন্ত্রতা নিয়ে চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল সে। হড়োহুড়ি ক'রে ভিড়ের কোলাহলটা স্তব্ধ হয়ে শান্ত হয়ে গেলে মন্থর পায়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

এতটা আশা করেনি সে। কেমন যেন অচেনা অজানা মনে হয়। একটাও পরিচিত মুখ অনেক খুঁজেও তার চোখে পড়ল না। বহুপরিচিত পুরনো দিনের সেইসব নয়নরম্য দৃশ্যগুলিও ছন্ন সালের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! এবার সত্যি সত্যিই তার ভয় করছিল; এবং বিস্ময় ও সন্দেহ। একজন পুলিশের লোককে তারই দিকে আসতে দেখে অকারণেই সে সন্দিগ্ধভাবে দ্রুত পায়ে সরে গেল।

হঠাৎ একটা মিষ্টির দোকানে চোখ পড়তেই সে চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টেশনে ঢোকবার মুখে ঘটগাছের ছায়ায় ব'সে যে লোকটা বরফ বিক্রী করত, সেই লোক-টাকে সে দেখেছে এবং দেখেই নির্ভুল চিনে ফেলেছে। তার চোখের বিস্মিত তারা দুটো একটু নরম হয়ে হেসে ফেলল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে গিয়ে দোকানটার সম্মুখে দাঁড়াল। বিমূঢ়ভাবে, টেরিয়ে টেরিয়ে লোকটা তাকে দেখল কিছুক্ষণ; তারপর দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। কয়েকটা কুকুর পিছু পিছু চেঁচাতে চেঁচাতে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে। কাটা হাতটা তুলেই সে একবার বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে একটা তীব্র জ্বালার ঘোরে সোজা এগিয়ে চলল।

ধাঁ ক'রে একটা চকচকে মোটর ছুটে বেরিয়ে গেল তার পাশ দিয়ে। পড়তে পড়তে সে সামলে নিল নিজেকে। অনেকদিন পরে আবার তার চোখদুটো ব্যথার করকর করছিল।

আচ্ছন্নের মত পথের দু' পাশে তাকাতে তাকাতে চলছিল সে। অচেনা মানুষ, অচেনা পরিবেশের চিহ্ন-গুলোও বড়ই অচেনা! যুদ্ধের সেই উদ্দাম অস্থির কল-রোলের ঢেউগুলি যেন এখানেও আঁছড়ে পড়ছে!

আবার একটা বাঁক ঘুরল এবং চম্‌কে উঠল সে। আরো একজন চেনা মানুষকে চিনতে পেরেছে। অন্তত এই দ্বিতীয় জন; মন্মথ, যে তার একান্ত অন্তরঙ্গ আর মধুর ছন্নের বন্ধু ছিল, নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে এই বিশ্বাসে একেবারে তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমায় চিনতে পার, মন্মথ?'

'কে!' সভয়ে পিছনে স'রে যায় মন্মথ।

'আমি, তোমার বন্ধু। সেই আট বছর আগে এক-দিন যুদ্ধে গিয়েছিলাম, মনে নেই? যাবার আগে তুমি কত মানা করেছিলে, কত অনুনয় করেছিলে, ভুলে গিয়েছ!' মন্মথ, আজ এইমাত্র আমি দেশে ফিরছি।'

'ও, হ্যাঁ, কিন্তু'—আশার-মস্তক তাকে নিরীক্ষণ ক'রে

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মন্মথ বলল, 'ও, মনে পড়েছে। বেশ, এইমাত্র এলে বুঝি! আচ্ছা, পরে দেখা হবে।'

পিছন দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সে নির্বাক পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য! কেউ তাকে চিনতে পারছে না! অথবা, চিনেও ভুলে যেতে চাইছে! তার বিশ্বাসের গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে ভেঙে পড়ছিল ক্রমশ।

তবু সে শান্ত হল, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল আবার। দূরের মন্দিরটা আর মন্দিরের পাশের সেই খয়ের গাছটা দেখেই সে বুঝে নিয়েছে যে, তার বড় আদরের পুরনো জীর্ণ বাড়ীটাও আর বেশী দূরে নেই। ওই তো বাঁকের পাশ দিয়ে যে পথটা ঘুরছে, সেই পথের উপরেই তার বাড়ী।

কিন্তু বাঁকের পথ ঘুরেই তার চোখের দৃষ্টি যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল। স্পষ্ট দেখছে সে, তার চোখের সম্মুখে সেই বাড়ী আর নেই, বাড়ীর বাইরে সেই ফণি মনসার জঙ্গলও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে! অথচ, বাড়ীর পাশে সেই দেবদারুর গাছটা ঠিক তেমনিই আছে। শুধু বাড়ীটাই বদলে গিয়েছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে দেখল, জীর্ণ পুরানো চেহারার বাড়ীটার কঙ্কালটাকে পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে দোতলা সুদৃশ্য ও সুবিশাল হর্ম্য উঠেছে সেখানে। কাঁটার খোসা ছাড়িয়ে অজস্র ফুলে ফুলে বাগান ভ'রে গিয়েছে। বিরাট লোহার ফটকের বাইরে অপেক্ষমান ঝকঝকে মোটর গাড়ীটার পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সে এইসব দেখতে লাগল। দেখতে তার ভালই লাগছিল। সেও এই রকম ছবির মতন যৌবন-পুষ্ট আনন্দের পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল! সে-স্বপ্ন তার আগেই সার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে! এবং আট বছর পরে সে ফিরে এসেছে, সেই আনন্দে স্বপ্নের কুঁড়িগুলি এবার ফুল হয়ে ফুটবে, গন্ধ ছড়াবে। সে ভাবল।

ভাবতে ভাবতে সে এই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজছিল। সহসা তার মুগ্ধতাকে ভেঙে দিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে একটি যুবক আর একটি যুবতী বেরিয়ে এল, পথের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

এই তো আমার বোন! আমার সেই ছোট এতটুকু বোনটি আজ কত বড় হয়েছে! সে ভাবল। আর এখন ফুলের মতন রূপ, দুধের মতন রঙ, কলমলে পোষাকে পরীর মতন আশ্চর্য সুন্দর! সে ঠিক চিনেছে। তার ইচ্ছা করছিল, তার ছোট আদরের বোনটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। তবু সেই অচেনা পুরুষটিকে দেখে সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ফটকের বাইরে এসে যুবক-যুবতী মোটরে উঠতে যাচ্ছিল। সে বেশ বুঝতে পারল, এখুনি স্টার্ট দিয়ে মোটরটা তাকে না চিনেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে সমস্ত আবহাওয়াটাই তার কেমন অসহ্য মনে হল; তার মস্তিষ্কের সমস্ত বুদ্ধি আর বোধগুলি অচেতন হবার আগে হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে সে দেখল—তার গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। আচ্ছন্ন অস্ফুট কণ্ঠে সে তবু ডাকল, 'পূর্বি, পূর্বি!'

শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় মেয়েটি। তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে খুঁজছেন আপনি। কার নাম ডাকলেন!'

অসহিষ্ণু গলায় ব্যস্ত ভাবে সে বলল, 'সে কী! তুমিও আমাকে—' এই পর্যন্ত ব'লে সে থেমে গেল। তারপর অন্যায় ভাবে তার পরিচয় দিতে চাইল।

'তোমার মনে পড়ে, আট বছর আগে তোমার এক দাদা যুদ্ধে গিয়েছিল, তারপর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'হ্যাঁ', অবিচল কণ্ঠে মেয়েটি বলল, 'তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' কাতর অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করল সে।

মেয়েটি অল্প একটু হেসে, যেন তার মুখের উপর একটা করুণার স্পর্শ বুলিয়ে মোটরে গিয়ে বসল এবং মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হল।

সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিশাল বাড়ীটার ভিতর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হল, তার মাকে সে দেখতে পেয়েছে। মা, মা! মনে মনে চেঁচিয়ে উঠে উর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে গিয়ে সে দেখল, তার চোখের সম্মুখে কখন দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরপর সাজানো অনেকগুলি দরজার কোনটি দিয়ে গেলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে, তা বুঝতে পারল না।

তার ভয়ঙ্কর মুখটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ফেটে পড়ল, কঠিন চোখ দুটো গ'লে গিয়ে অন্ধ হয়ে ঝ'রে পড়ল।

মন্দিরের চূড়াগুলো এক একটেই টেনে টেনে উঠে গেছে। তাদের আগে আগে শঙ্খিত পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে পথের পাশের ঝাঁকড়া গাছের সারি। মন্দিরের বেদী যেন এগিয়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তল।

মন্দিরের আরতি তখন শেষ হল, আকাশে চাঁদ উঠল। তখন তখন তখনও চাঁদ এবং তারা। জোৎস্নায় বিভাস তখন একটু একটু। সে তোলে করল না। দিবে শুধু দৃষ্টি মেলে সে শুধু তার সম্মুখের অবিশ্বাস্য রূপের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, তার চোখের সম্মুখে দাড়িটা ক্রমশ প্রসন্ন হচ্ছে, এবং শীর্ষ হয়ে আকাশের দিকে অঙ্কিত হাত বাড়িয়েছে। দাড়িটার ছায়ার আড়ালে তখন সব হারিয়ে যাচ্ছে। জোৎস্নার মাধুর্যটুকুও অবশেষে তার চোখের সম্মুখে অন্ধ হয়ে হারিয়ে গেল।

সেই রাতেই তার মৃত্যু হল।

অর্থনীতির দুচার কথা

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

বাহিরের ঘটনার চাপে প্রয়োজনের তাগিদে, অথবা ভিতরে আদর্শের পরিবর্তনে ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তি ও অভ্যাস যেমন বদলায়, জাতির চরিত্রেও তেমন পরিবর্তন ঘটিতে পারে। মৎস্যমাংসাশক শাক্তকে নিরামিষাশী পরম বৈষ্ণব হইতে দেখা গিয়াছে। নবদ্বীপের টোল চতুষ্পাঠীতে যাঁহারা শাস্ত্রচর্চায় নিরত থাকিতেন, সেই গুরুগম্ভীর পণ্ডিতগণই নগর-কীর্তনে খোল-করতাল লইয়া নাচিয়া কাঁদিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বীর-প্রসবিনী রাজপুতানার সন্তানগণ অদ্যি রসনেন্দ্রিয় তুলিয়া আজ মুহ্যমান রসনেন্দ্রিয়ে মুগ্ধ। ইংলণ্ডের প্রথম এলিজাবেথের ও দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রজাদের মধ্যে কত না প্রভেদ! এমন কি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যবধানে ইংরাজ-চরিত্রে গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। জাতীয় চরিত্র কিছু পদার্থের অপরিবর্তনীয় চিত্রলিপি K নয়। বাহিরের ঘটনার চাপে এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তাহার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে।

বাঙ্গালীর ধাতে ধন-বিজ্ঞান যেন সয় না, মিশ খায় না এমন মনে হইতে পারে। বাঙ্গালী-প্রকৃতির রসনীয়তা, কমনীয়তা, কল্পনা-প্রবণতা, ভাবপ্রতা, আবেগাতিরেক ও উচ্ছ্বাস-পরায়ণতা এবং উৎসঙ্গে শ্রমকুণ্ঠা ও বাস্তব-নিষ্ঠার অভাব আমাদিগকে ধন-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দিতেছে না এরূপ ধারণা একেবারে অমূলক নয়। তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, মননশক্তি ও কল্পনা-সুলভতাকে দীর্ঘকাল অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে ও বারংবার সংহতভাবে ধন-বিজ্ঞান-অনুশীলনের খাতে প্রবাহিত করিতে পারিলে অচীরেই ফললাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রাষ্ট্রিক ও আর্থিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গালী চরিত্র পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। দেশ-বিভাগের ফলে বাঙ্গালীর এক অংশের মধ্যে যে চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করা যায়। ভূমার-নদের তীরে যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু তালুকদার অবসর-প্রাচুর্যের মধ্যে 'নৈমিত্তিক' খোল-দুর্গোৎসব এবং 'বিঠা' বৈঠকখানার মজলিস লইয়া কাল কাটাইতেন, তাঁহার পুত্রকন্যারা এখন কলিকাতার কল-কারখানায় উদরান্ন যাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। বারমাসে তের পার্বণ, যে কোন উপলক্ষে ও অনুহাতে ভোজের আয়োজন, লোক-লৌকিকতা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। সকালে পড়িমসি, দুপুরে নিদ্রা, অপরাহ্নে তাসপাশা, রাত্রে গল্প-গুজব বা গান-বাজনা —এই বিলুপ্ততার পুনরাবৃত্তি আর পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। নিষ্করুণ জীবন-সংগ্রামে জীবিকার্জনের জন্য প্রত্যেকটী মুহূর্ত কঠোর-ভাবে নিয়ন্ত্রিত—ঘরাঘরায়, বাধা বাধ্যতায়, সামাজিকতার অবকাশ নাই। এইভাবে কিছুদিন চলিলে ক্রমশঃ বাঙ্গালী চরিত্রের রূপ বদলাইয়া যাইবে। বাক্‌সর্বস্ব, বাক্‌-বিলাসী, বাতাল বাঙ্গালী ক্রমশঃ বাক্‌-বশ, বাক্‌-কুণ্ঠ কর্মকুশল বস্তু-নিষ্ঠ "কাজের মানুষ" হইয়া উঠিবে। জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন অবশ্যই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে। আর সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলিতে পারে। কবিতা-গল্প-উপন্যাস ও হাল্কা রচনার সাবিত বাংলা সাহিত্য বস্তু-নিষ্ঠ 'কাঠ-খোট্টা' ভাষা-ভোগা ধন-বিজ্ঞানের সবুজ হইতে থাকিবে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে Economics বা ধন-বিজ্ঞান একান্তই পাশ্চাত্য বিদ্যা যাহার উৎসমূলে আছেন ইউরোপের যখন পণ্ডিত আরিস্তটল। Economics বলিতে আমরা যোগায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঠিক তাহা নয়, যদিও Political Economy র উপাখ্যান আছে "অর্থশাস্ত্রে"। ধন-বিজ্ঞানের যেমন মানবসভ্যতা কিছু কিছু মহা-ভারতের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো নাই কি? তবে সেগুলি দ্বারা যাঁহারা আত্মিক রূপ গ্রহণ করিতে বা বিজ্ঞানের সমগ্রতা লাভ করিতে পারে নাই।

অর্থতত্ত্বের ধারাকে যদি গঙ্গা-প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে পাশ্চাত্য ধন-বিজ্ঞানের গঙ্গোত্রীতে বা গোমুখীতে আদি-বিজ্ঞান আরিস্তটলের দর্শন মিলে। অর্থতত্ত্ব-ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিয়া আমরা উৎস-মূলে ক্ষুদ্র ক্ষীণ ধৈর্য রজতসূত্রের মত যে জলধারা দেখি তাহার মধ্যে, অপরিণত অবয়বে রহিয়াছে আরিস্তটলের রাজস্ব-তত্ত্ব, মূল্য-তত্ত্ব ইত্যাদি। তারপর ক্রমশঃ মন্দাকিনীর ধারা বহিয়া আমরা গঙ্গোত্তরে বা হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছি এবং সাক্ষাৎ পাই অ্যাডাম স্মিথের যাহাকে বলা হইয়াছে 'অর্থশাস্ত্রের জনক'। এখন আর রজতসূত্রবৎ ক্ষীণধারা নয়, নীল স্নিগ্ধ প্রাণপ্লব প্রবল সলিল-প্রবাহ—পানে ও অবগাহনে পরমা তৃপ্তি। বলাই বাহুল্য যে চাতাল্ স্মিথই অর্থ-শাস্ত্রের একটা মজবুত কাঠামো ও পরিচ্ছন্ন রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার মানসপটে শাস্ত্রের একটা সমগ্র চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—উহা ছিন্নপত্র বা বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত সন্দর্ভ নয়। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম সংক্ষেপে Wealth of Nations (দুনিয়ার ধন-দৌলত)—পুরা নাম An Enquiry into the Nature and causes of wealth of nations. নামের মধ্যে গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গীর এবং উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর পরিচয় পরে যথাস্থানে দেওয়া হইবে। হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়া বহু জলস্রোতস্বতী দেখিতে দেখিতে প্রয়াগের পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে আসিয়া উপনীত হই। তারপর পরমতীর্থ কাশী—সেখানে কত পথিক মঠ-মন্দির, দণ্ডায়মেধ ও মণি-কর্ণিকার ঘাট, কত সাধু সন্ত যোগী সন্ন্যাসীর সমাবেশ! এমনভাবে পাটনা কলিকাতার মত জনাকীর্ণ শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ কেন্দ্র অতিক্রম

করিয়া অবশেষে বিংশশতাব্দীর মাঝ-সমুদ্রে—গ্রহণ করছ জনবাণিজ্য সম্মুখীন হইয়াছে। সেখানে কত ঝড়ঝাপটের কল-গর্জন, কত তাপ-তরঙ্গের উত্থান-পতন-কত সূত্র, সংহিতা ও পরিকল্পনার ঘাত-প্রতিঘাত! মনের ও সমাজের বিভিন্নতায়, বৈচিত্র্যে ও বৈষম্যে প্রত্যেককে দিশাহারা হইতে হয়।

অর্থ-শাস্ত্র বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এবং ধন-বিজ্ঞান নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই বিবর্তনের ইতিহাস আছে। আরিস্ততলের Politics গ্রন্থে এই বিদ্যাকে ভ্রূণ-অবস্থায় দেখিতে পাই। তারপরে ইউরোপের বুকের উপর নামে মধ্যযুগের গাঢ় তমিস্রা। সেই অমানিশার মধ্যে অর্থনীতির কোন আলোকাভাস দেখা যায় নাই। মধ্যযুগীয় খীষ্টধর্মের অবসানের পরে উহার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় Mercantilist (বাণিজ্যিক-পন্থী) এবং Physiocrat (প্রকৃতি-তন্ত্রবাদী) দের আলোচনায় ও রচনায়।

পাশ্চাত্য আর্থিক চিন্তার ইতিহাসে Political Economy র নামকরণ গ্রহণ করার তাৎপর্যপূর্ণ। কেমন করিয়া Economics অর্থাৎ political Economy-র নাম গ্রহণ করিল? ইহা শুধু নামান্তর নয়, ইহার দ্বারা শাস্ত্র যেন গোত্রান্তরিত বা ধর্মান্তরিত হইয়াছে। এতদিনের মাতৃভূমি তাহার মাতৃত্বের মোচন করিয়া যাচ্ছে হইল। শুঁড়ি-দোকে হইতে হইল প্রজাপতি, পুত্র বিক্রয়নামা করিল। এক কথায় ধর্মের দোহন এবং নীতির দুহনের ছাড়িয়া অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞানের জন্ম ও স্বত্ব গ্রহণ করিল। এ সম্পর্কে জেভন্সের কথা মনে পড়িবেই। পূর্ব-পুরিষদ যাহা পারেন নাই জেভন্স তাহা সম্পন্ন করিলেন। ধন-বিজ্ঞান-চিন্তাধারে তিনি বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের ভাব ও বিষয়-বিন্যাস প্রবর্তন করিলেন। তিনি না ছিলেন নীতি-ঘাইপ ধার্মিক, না অন্যের প্রাপ্ত সংবাদের, না কর্তৃপক্ষের ব্যবহারজীবী, না অভ্যুৎসাহী সমাজ-সংস্কারক। তিনি ছিলেন 'সমাজ-বিজ্ঞানী'। আর্থিক ব্যাপার ও ঘটনাবলীকে সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। খোলাখুলিভাবেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তাত্ত্বিক। মূলগত নীতির অন্বেষণে যাহির হইয়া তিনি সোজা সরল পথে যেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন (তাহা স্বর্গই হউক আর নরকই হউক) সেখানেই আশ্রয় লইয়াছেন। অনুসন্ধানের ফল ভিন্ন, ক্ষয়ী, অস্থ, মধুর যাহাই হউক না কেন, তিনি অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তথ্যানুসন্ধানের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন ও যে প্রক্রিয়া তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত। বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্রেই যে কোন বৈজ্ঞানিক উন্নততর প্রণালী বা প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বিলাতে জেভন্স ধন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ধার্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে আদি-বিদ্বান্ কপিল মুনির মধ্যে ও তেমনটী দেখিতে পাওয়া যায়। জেভন্স ভোগকে উৎপাদন ও বণ্টনের অগ্রে স্থান দিয়াছেন—এ বিষয়ে তিনি মিল ও ক্লাসিকাল (Classical) অর্থশাস্ত্রীদের অনুসৃত পথ হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। তত্ত্ব রচনায় তিনি অঙ্কশাস্ত্র ও গাণিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞানের বেইটে উঠিতে পারে এবং সেই বেইটেই তাহার অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের স্তরে তুলিতে হইলে গাণিতিক পদ্ধতি অপরিহার্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ধন-বিজ্ঞান এখনও একটী স্বাধীন স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইতে পারে নাই। দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও তত্ত্ব-বিদ্যার সঙ্গে অর্থনীতির যে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল তাহা খুলিতে বহুযুগ কাটিয়াছে। অর্থ-বিদ্যার জনক অ্যাডাম্ স্মিথের আমলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই বিদ্যার স্থান কোথায় ছিল তাহা শুনিলে কৌতুক বোধ হইবে। স্মিথ ছিলেন গ্রীকলাতিন ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। প্রথম তাঁহাকে অলঙ্কার-শাস্ত্র ও রম্য-রচনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়। তারপর তিনি গ্লাসগো'তে ছাত্রের ও ধর্মের অধ্যাপক হ'ন। চতুর্দশ বৎসরের কিশোর স্মিথ্ যখন ছাত্ররূপে গ্লাসগো'তে যা'ন, তখন হাচেসন ধর্মের এক শাখা-বিশেষের অধীনে অর্থ-নৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছিলেন।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—কি ধন-বিজ্ঞান কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানের সকল শাখাই অল্পাধিক পরিমাণে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ও তাহার কাছে ঋণী। অর্থশাস্ত্রের আদিবিদ্বান্ আরিস্ততল মূলতঃ ধার্মিক। তাঁহার মধ্যে যত বিচার, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখারই মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়—তাঁহার সকল চিন্তাতেই ধার্মিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। অগস্ত কোঁতের মতে অর্থনীতি সমাজ-বিজ্ঞানেরই শাখামাত্র—বিদ্যা হিসাবে তাহার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তখনকার দিনে সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মনের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তত্ত্ব-বিদ্যা, মনো-বিজ্ঞান, নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি ধার্মিক চিন্তার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে অর্থনীতির যোগ ছিল এবং এখনও কিছুটা আছে। ধার্মিক চিন্তা-পদ্ধতি ও ধার্মিক সিদ্ধান্তের উপরই যে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থনীতি—অতীতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সাধারণভাবে বোধ হয় একথা বলা চলে, যে অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তা-ভাবনা, কোঁক ও প্রবণতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ও লক্ষ্য তাঁহার ধার্মিক মতবাদ দ্বারা অনুরঞ্জিত অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রী মূলতঃ ধার্মিক (ইহার ব্যতিক্রম যে থাকিতে পারে না বা নাই এমন কথা বলা হইতেছে না)। অ্যাডাম স্মিথের বেলায় একথা যেমন খাটে, কার্লমার্ক্সের সম্বন্ধেও ইহা তেমনই প্রযোজ্য। বিশেষতঃ, যাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব লইয়াই মত্ত থাকেন, পরস্ত সমাজের রূপান্তরে বিশ্বাসী এবং রূপান্তর ঘটাইতে আগ্রহান্বিত তাঁহাদের আদর্শ, উদ্বেগ ও মূল্যবোধের মধ্যে ধার্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অর্থনীতির পটভূমিতে আছে যে ধর্মন তাহার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। অর্থনৈতিক তত্ত্বের পশ্চাতে আছে যে ধার্মিক মতবাদ-মন সেই-ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে। সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া সেখান হইতে নীচেকার সূত্রগুলির উপর দৃষ্টি

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধূলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধূলোই বলুন বা কায়কর্মই বলুন ধূলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধূলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন। এতে আপনার শরীর ঝরঝরে করে তুলবে।

L. 266-X52 BG

হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

নিক্ষেপ করিলে তাহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের মধ্যে মূল্য সঠিক বোঝা যায়। এই সমাজ দর্শন বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে প্রত্যাশিত। মূল্য, প্রতিযোগিতা, আরদামা, অবধি (margin), নিরপেক্ষ রেখা (indifference curve) প্রভৃতির স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ধারণা করার জন্যই তত্ত্ব ও সূত্র-প্রণেতা অর্থশাস্ত্রীর দার্শনিক মতবাদ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী জানতে হবে। প্রত্যেকটী বৃক্ষ তাহার বাষ্টি-সত্তা দ্বারা যেন বনানীকে আড়াল করিয়া না রেখে। নিঃসন্দেহ মূলতঃ দার্শনিক এবং অর্থনীতিতে তাঁহার প্রধান দান হইল তাঁর নীতি-শাস্ত্র। কেম্ব্রিজের অর্থশাস্ত্রী-গোষ্ঠীর, বিশেষতঃ পিগুর উপর তাঁহার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মার্শালের কথাই বলুন বা কেন? মার্শাল ছিলেন দর্শনের ও গণিতের ছাত্র। তাঁহার বিশ্লেষণ ও সূত্র-রচনার, বিশেষতঃ তদঙ্কিত রেখাগুলিতে, গণিতের প্রভাব লক্ষণীয় এবং চিন্তার পটভূমিতে দার্শনিক মনের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। মার্ক্সের অর্থনীতি ভালরূপে বুঝিতে গেলে হেগেলের দর্শন বুঝিতে হয়। দ্বান্দ্বিক (Dialectic) পদ্ধতির সুস্পষ্ট ধারণা না লইয়া মার্ক্সীয় তত্ত্বের গহন-অরণ্য বা শোষক-শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। ডঃ ক্যাপিটালের (Das Capital) মধ্যে প্রত্যেকটার দার্শনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যা শ্রেণী-সংগ্রাম, মূলধনের বিবর্তন, উদ্বৃত্ত মূল্য প্রভৃতির বিশ্লেষণের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানের এক অভিনব ব্যাখ্যা মিলে। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহাকে বলা যায় হেগেলের শিষ্য। অর্জুন যেমন দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিখিয়া সেই বিদ্যার সাহায্যেই গুরুকে নিপাত করিয়াছিলেন মার্ক্স ও তেমনই হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সহায়তায় হেগেলের মতবাদকে পর্যুদস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পিরামিডের পীঠে সুড়াইয়া অধোমুখ করিয়া দিলে ভিত্তিভূমি আকাশের দিকে উঠিয়া যায়। এরূপ উল্টানোর ফলে উপর যায় নীচে। নীচটা যায় উপরে। গুরুশিষ্যের মধ্যে তাত্ত্বিক দৃষ্টির এই বৈপরীত্য প্রাকৃত জনের চোখে প্রভাবান্তরে 'গুরুমারা' বিদ্যা বই আর কিছু নয়।

এইভাবে আমরা দেখাইতে পারি যে অতীতে ধন-বিজ্ঞানের মূল উৎস ছিল দর্শন এবং অনেক ক্ষেত্রেই আলোচনার ও অনুসন্ধানের পদ্ধতিও ছিল দার্শনিক পদ্ধতি। সে সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমানা সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয় নাই—এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে আনাগোনা তখন ছিল অব্যাহত। দর্শনের শাখা হিসাবেই ধন-বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত ধন-বিজ্ঞানকে নীতির পরিচারিকা (hand-maid of Ethics) রূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

দর্শন ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে ধন-বিজ্ঞানের অনেক সময় লাগিয়াছে। এখনও ইহা একটী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইতে পারিয়াছে কিনা বলা কঠিন। দর্শন ও নীতির বন্ধন খুলিয়া এখন ইহা গণিতের ও পরিসংখ্যানের (Statistics) দিকে ঝুঁকিয়াছে। অর্থনীতির অনেক তত্ত্বই এখন গণিতের টেবিলে পরিবেশিত হইতেছে। আর্থিক সূত্রগুলি গাণিতিক ফরমুলায় গাঁথা হইতেছে। অর্থনীতির ছাত্রের পক্ষে গণিতের জ্ঞান এখন অত্যাবশ্যক। এমন অনেক বই ও বিষয় আছে যাহা গণিতজ্ঞ ছাড়া অপরে ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে অর্থ-নৈতিক তত্ত্বকে বা সূত্রকে গাণিতিক সমীকরণে পরিণত করা মানেই নূতন জ্ঞানদান নয়। ইহা একহিসাবে পুনরুক্তি বা ভাষান্তর। মার্শাল ভাষায় লিখিত কোন আর্থিক তত্ত্ব ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হইলে যেমন আমরা বলিতে পারি না যে ধন-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন রত্ন সঞ্চিত হইল, তেমন কোন সূত্র বা তত্ত্ব যদি গাণিতিক চিহ্নে প্রকাশিত হয় তাহাকে নূতন অর্জ্জন বলা যায় না। আর অর্থনীতি কখনও একান্ত-ভাবে গাণিতিক বিদ্যা হইতে পারে না। মানবিক সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানবিক সম্পর্কের বাহিরে এবং মানবিক মূল্যমানের ঊর্দ্ধে তাহাকে বিচার করা যায় না। সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক মূল্যমান বর্জ্জন করিয়া একটা নৈর্ব্যক্তিক ও নির্বস্তুক ভাবমাত্রে (Abstraction) পর্য্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে এই অতিরিক্ত পরিসংখ্যানানুরাগ এবং গাণিতিক প্রবণতার মধ্যে—অতীতে যেমন দার্শনিকতার দিকে বেশী ঝোঁক থেকে বস্তু-নিরপেক্ষ নিরালম্ব বায়বীয় ভাবুকতার উদ্ভব হইয়াছিল। এই দুই প্রান্তের অতিশয়াই বর্জ্জনীয়। মানব-সমাজ লইয়া ধন-বিজ্ঞান—সুতরাং তাহাতে মানবিক মূল্যমান অতএব তাত্ত্বি-কতার প্রশ্ন থাকিবেই। তবে সে তাত্ত্বিকতা বাস্তবানুগ ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া চাই। ধন-বিজ্ঞানে এমন কল্পনা-বিলাস বা স্বপ্নবিলাস চলিবে না যাহার সঙ্গে বস্তু জগতের যোগ বা মিল নাই। পক্ষান্তরে রক্তমাংসে গঠিত সুখ দুঃখে সংবেদনশীল সদসদ্‌বিবেকসম্পন্ন মানুষকে নিছক একটা গাণিতিক চিহ্ন (যেমন রক্ত-করবীর "ক") বা মানব-সমাজকে পরিসংখ্যানের একটা যোগফল মাত্র বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অর্থনীতি ক্রমশঃ বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিতেছে এবং হয়ত কিছুকাল পরে ইহা কলা-গোষ্ঠীর বাহিরে গিয়া বিজ্ঞান-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অর্থশাস্ত্রের মধ্যে আছে দুইটী অংশ, (১) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও (২) ফলিত বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষায় বলা যায় জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা তত্ত্ব উচ্চস্তরের জিনিষ—সেই স্তরে আরোহণ করা সকলের পক্ষে সহজ বা সম্ভব নয়। সু-উচ্চ তত্ত্বলোক হইতে ধন-বিজ্ঞান লোক-সেবার ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। সোবিয়েৎ রাশিয়ায়, মহাচীনে, ধনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে এবং কল্যাণব্রতী যুক্তরাজ্যে ধন-বিজ্ঞান 'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' আত্ম-নিয়োগ করিতেছে।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

—'সবারে করি আহ্বান·····

···আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে

বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান,

সুস্বরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে

সেথা পাবে স্থান।

কল্যাণদীপ জ্বালা পুণ্যতোয়া সবরমতীর পবিত্র তীরে সে গানের আহ্বানে সাড়া দিল সবাকার মন, মহাগুর্জরের অতি-প্রাচীন সেই সমৃদ্ধ নগরীর বুকে সুস্বরের পাদপীঠতলে মিলনতীর্থ রচিত হ'ল পূর্ব ও পশ্চিমের···ভারতের দুই প্রান্তিক ভাবার অতি পুরাতন সংযোগের নতুনতর ভাব-বিনিময়ের সুযোগ সূচিত হ'ল।

বিস্মৃতপ্রায় এক অতীত যুগের পট-যবনিকা উত্তোলিত হ'ল এক অপূর্ব সুরমূর্ছনায়।

আমেদাবাদ! একপ্রান্তে তার শিল্পকেন্দ্র বোম্বাই, বরোদা ও সুরাট, অন্যপ্রান্তে মহাতীর্থ দ্বারকা ও সোমনাথ। গান্ধীজীর স্মৃতিপূত ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নরঙ্গ এই শিল্পনগরী। কর্মসাধনা ও মর্মপ্রেরণায় এক অতি আশ্চর্য অন্তরঙ্গতা!

মহাগুর্জরাটের প্রধান শহর এই আমেদাবাদ। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যুগের বহু মনীষীর চরণরজ এই গুজরাট। মরীচি, কৃষ্ণ থেকে সর্দার প্যাটেল ও গান্ধীজী পর্যন্ত এই গুজরাটেরই সন্তান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকা ও বৈদিক যুগের অতি পবিত্র শিবতীর্থ প্রভাস—এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-বণিকের কর্মচঞ্চল প্রসিদ্ধ বন্দর সোমনাথ—কাব্যে ও বস্তুশিল্প সভ্যতার অভ্যুত্থান-নগরী এই গুজরাট।

এই আমেদাবাদেরই বুকে জাতির জনক গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আশ্রম জীবনযাপন সুরু করেন, এখানেই তিনি উপলব্ধি করেন অহিংসার মহামন্ত্র! আবার এখানেই সুদূর বঙ্গদেশ থেকে বিশ্বকবি আসেন তাঁর 'সুচিত্রা পাণ্ডার' গল্পের প্রেরণা নিতে, যেমন তার আগে সত্যেন্দ্রনাথের বাসায় থেকে বহু গান রচনা করে তিনি এখানে বসেই তাতে সুরযোজনা করেন।

বাংলা ও গুজরাটের আত্মিক সংযোগ তাই বড় প্রাচীন। বাণিজ্য ও সংস্কৃতিতে, ধর্ম ও অধ্যাত্মপ্রেরণায় এই দুই প্রান্ত-উপকূল অতি নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা। তাই স্বভাবতঃই এখানের সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যের গভীর যোগাযোগ ঘটেছে। এখানের প্রসিদ্ধ কবি নরসিংধাস মেহতার মধ্যে উদ্ভব হ'য়েছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পুণ্যবাণী, বাংলার বৈষ্ণব কবিদের রসমূর্ছনার আবেশ পাই ভক্তকবি ভালনের কণ্ঠে, ভক্তিমতী মীরাবাঈয়ের ভজন গানে।

সেই পুরাতন প্রেমে তাই আর একবার উজ্জীবিত হ'য়ে উঠল নব-প্রেমছন্দে।

উনিশশো সাতাত্তর আটাশে ডিসেম্বরের পুণ্য প্রভাত! শুধু বঙ্গদেশ থেকে নয়, আসাম-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-উড়িষ্যা-মাদ্রাজ-দিল্লী-রাজস্থান—ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে বাঙালী এসেছে এই সবরমতীর পূত-বারি-ধৌত ঐতিহাসিক নগরীতে এখানকার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে, নিবিড় সাহচর্যে ও অন্তরের আদানপ্রদান করতে এখানকার মানুষদের মধ্যে, সুযোগ পেতে কিছু অন্তরঙ্গ ভাব-বিনিময়ের।

নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-যুবক-যুবতী-বাঙালী ও গুজরাটিতে জমজমাট 'অখণ্ড-আনন্দ হল'। সেখানেই—সেই নিশিপ্ত নীল আকাশের রৌদ্র-করোজ্জ্বল পৌষালী প্রভাতে নারী-পুরুষের মৈতকণ্ঠের আহ্বান-বাণী প্রচারিত হল! প্রকৃত শিল্পীর নিপুণ-দরদ সুরে কবিগুরুর সেই অনবদ্য সঙ্গীত-মূর্ছনায় আবিষ্ট হ'ল প্রতিনিধিবৃন্দ—

'আকাশে আকাশে বনে বনে, তোমাদের মনে,

বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।

সেই গানেই এবারের নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রি-ত্রিংশৎ অধিবেশনের সুরু।

আসল গ্রন্থের মূল কাহিনী আরম্ভের পূর্বে ভূমিকার মত সম্মেলনেও হয় অধিবেশনের পূর্বে শিল্প ও কলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন। তবে এবারের এ প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সবখানিই ঘিরে আছে শুধু আমেদাবাদবাসীদেরই বিভিন্নমুখী শিল্প প্রতিভা-নৈপুণ্যের বিকাশ! বলিষ্ঠ নিপুণ হাতের সেই প্রদর্শনীর বাঙালী, গুজরাটি ও রাজস্থানী রেখাচিত্র ও ফটোগ্রাফীর সমাবেশ খুবই প্রশংসনীয় হয়েছিল। বিশেষ করে কয়েকটি তিন-চারি শতাব্দী পূর্বেকার প্রাচীন পুঁথির মধ্যে পাতায় পাতায় যে লিপিকুশলতা ও চিত্র-বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের সমারোহ চোখে পড়েছিল, সত্যিই তা অপূর্ব!

গুজরাট যে এক অতিপ্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যার ধারাবাহক ও শিল্প-প্রতিভার ঐতিহ্যসম্পন্ন—তার যেন নতুন করে পরিচয় মিলল। শিল্পীদের মধ্যে রবিশঙ্কর রাওল, রসিকলাল পারেখ, বিদ্যাবেন পারেখ, শিবকুমার পাণ্ডা, পূর্ণেন্দু পাল, ত্রিসুরেশ মুখার্জী ও দেবনাথ মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। সরাফৎ হোসেন, চি-এক-গোট, খোপকার প্রভৃতির ফটোচিত্রগুলিও প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রসিদ্ধ শিল্পপতি শেঠ মধনমোহন মঙ্গলদাস। তাঁর অঙ্গ যে পরিচয়ই থাক, অতি সুঠাম, সুন্দর ও শ্রীমন্ত দেহসুষমার অধিকারী তিনি—শিল্প-কলা প্রদর্শনীরই যোগ্য

উদ্বোধক বটে। তিনিও বাংলার সঙ্গে গুজরাটের আত্মিক যোগাযোগের কথাই বললেন। বললেন, শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না। এই ধরণের সম্মেলনের কথা দিয়েই প্রাদেশিক মালিন্য ঘুচে যায়। বাংলার বহু গুজরাটি নানা ভাষা থেকে রসসম্পদ আহরণ করে আজ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে গুজরাটি সাহিত্যে। বাংলার দানও কম নয়।

তাই তিনি জানালেন, শুধু রাজনীতিক দিকে নয়, সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ভারতের পথিকৃৎ।

—সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা নাই এবং অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার অগ্রগতি বেশখানিকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতে হইবে।—বাংলা ভাষার প্রতি আর একবার শ্রদ্ধিনমন ব্যক্ত উচ্চারিত এই মূল অধিবেশনের উদ্বোধক বিশ্বাসে রাষ্ট্রনৈতিক নেতা ও সুপণ্ডিত শ্রীকে. এম. মুন্সীর ভাষণে।

পর প্রাতে সুসজ্জিত টাউন হলে অধিবেশনের আয়োজন হ'য়েছে। প্রচুর বিজয়ন্তির মধ্য ও বর্ণাঢ্য প্রেক্ষাগৃহে সম্মেলনের মূল অধিবেশনের শুরু। বিভিন্ন স্থান থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশ, তৎসহ স্থানীয় গুজরাটি কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ। বেশ জমজমাট অধিবেশন।

দুর্ভিক্ষের উদ্বোধনী ভাষণের পর মেয়র শ্রীবিদ্যুলাই চিমনলাল স্বাগত অভিভাষণ জানালেন সমাগত অতিথিবৃন্দকে। তিনিও ঐ একই সুরে জোর করেন গুজরাটি সাহিত্যে বাংলার প্রভাবের কথা। ঐতিহ্য-ঐক্যবোধ ও বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুজরাটি জনসাধারণের সঙ্গে সচেতনা সহযোগের কথা।

এটা এবার আমরাও প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলা সাহিত্য যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে গুজরাটিদের মধ্যে, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই ভূরি ভূরি বাংলা উপন্যাস ও নাটকের গুজরাটি ভাষায় অনুবাদে। তদুপরিচয়ে সেই বইগুলির মাফিক তুলনা নেই। একজনের কাছে শুনলাম, যে শরৎচন্দ্রের প্রায় কাছাকাছি মাফিক আঠারখানা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, একটা ঘটনার কথা জানাই। সম্মেলনের শেষে আমরা নাল ছাড়া ঘুরে যাই আবুপাহাড়ে। সেখানে এক পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখতে গিয়ে আলাপ হয় এক গুজরাটি-ভদ্রলোকের সাথে। কথায় কথায় সাহিত্যের কথা উঠল। গুজরাটি জানালেন, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের কথা, আরো কত বাঙালী লেখকলেখিকার কথা—যাঁদের সমস্ত বই তিনি সেট করেছেন।

সম্মেলনে-সমাগত গুজরাটি বন্ধুদের কাছেও এর পরিচয় পেলাম। আলাপ হ'ল তরুণ সাহিত্যিক শ্রীকান্ত ত্রিপাঠীর সঙ্গে। অদ্ভুত অনুরাগ তাঁর বঙ্গসাহিত্যের প্রতি। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসেছি তার প্রমাণ। নূতন ও পুরাতন সমস্ত প্রকাশিত বাংলা বই তাঁর ঘরে আছে। অনেক বাংলা বই—আমরাও যার খোঁজ রাখিনি—তিনি তাও সংগ্রহ ক'রে আমাদের দেখতে দিয়েছেন। বহু বাংলা বই ইতিমধ্যে অনুবাদও করেছেন তিনি।

সেই পূর্ণ সভাগৃহে মূল সভাপতি অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন। প্রকৃতপক্ষে, সমকালীন ভাষায় এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য-বিশ্লেষণ ও যথার্থ অনুরাগী সমালোচকের দৃষ্টিতে বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির সমালোচন হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সবচেয়ে প্রশংসার কথা, তিনি যে বাস্তব সমস্যার সমালোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ এক অভিজ্ঞ রসিকের দৃষ্টিতে, অতি স্নিগ্ধজনসুলভ সহানুভূতির ভঙ্গীতে, ভাববিলাসিতার আভাস দুষ্ট অথবা বিদগ্ধজনের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে তিনি কাকেও অবজ্ঞা করেননি। পরিচ্ছন্ন ও প্রবুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির পথে যে সমস্যার অন্তরায় আজ বাধা দাড়া দিয়েছে, অত্যন্ত নিপুণভাবে তিনি তার প্রতিই সকলের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমেঘেন দাস তাঁর কবিসুলভ সুললিত ভাষায় বাংলা ও গুজরাটের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা ব্যাখ্যা করে গুজরাটবাসীর প্রতি তাঁর অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁর অভিভাষণের সবচেয়ে প্রণিধানীয় বিষয় তার বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত রূপ;—প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও তিনি ব্যবহার করেননি। অথচ তাঁর কথাই ঘন ও গুর্জরের সামগ্রিক সম্বন্ধের অনুশীলন করেছেন। তারই মিষ্টি সুরে উদাহরণ সহযোগে তিনি প্রশ্ন জানালেন দুই প্রান্তিক কবিগুরুদের চরণকমলে—সাধনা এবং সংগ্রামের আত্মিক যোগসূত্র। আর একবার ঘোষিত হ'ল, শান্তিনিকেতন আর নবজীবন—দুইয়েরই সাধনা এক, মন্ত্র এক।

তারপর 'কবি-সম্মেলন'—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সভাপতি। উদ্বোধক গুজরাটি কবি নিরঞ্জন ভগৎ। বাঙালী ও গুজরাটি কবিদের এই অন্তরঙ্গ সম্মেলনে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের বেশ একটা পরিচ্ছন্ন সুযোগ ছিল। ছুটিয়ে-বাড়িয়ে টেনে-টুনে শুধু বাঙালী কবিদের সংখ্যাটা একটু গুরুগোছের ঘাঁড় করানো গিয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া কবিদের মধ্যে ছিলেন দীনেশ দাশ, হাসিরাশি দেবী, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি। প্রবন্ধলেখক স্বয়ংও সে গোষ্ঠিভুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল বাংলাসাহিত্য, গুজরাটি সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং কলাপাথার অধিবেশন।

বাংলাসাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রধানতঃ ছাত্রদলের ভাতারী। বিশেষ করে তাঁর কাছে আমরা কিছু সরস সম্ভাষণ আশা করেছিলাম; কিন্তু ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে তিনি যে গাম্ভীর্যের অবতারণা করলেন, তার মধ্যে আর যাই থাক, হাস্য-কৌতুক রসের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। তিনি আমাদের নিতান্তই হতাশ করেছেন।

এ কথা আগেও বলেছি, পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হলেও আবার বলি যে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বক্তৃতা দেলে অভিভাষণ যত পাণ্ডিত্য-

মীনা কুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন

লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন

বিয়োগান্ত করুণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্র তারকাদের অন্যতম।

তিনি কিন্তু শুধু কৃতী অভিনেত্রীই নন, তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের সময় গরম আর্কল্যাম্পের তাতেও তাঁর ত্বক থাকে মসৃণ ও লাবণ্যময়! অবশ্য লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার একটি গোপন উপায় তাঁর জানা আছে। "আমি সর্বদা বিশুদ্ধ, শুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধি সাবান।" নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে উঠছে!

কমল
মনোরঞ্জনীর 'আকাশ'
চিত্রের তারকা

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

HLL. 544-X62 BG

হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

পূর্ণই হ'ক না কেন তা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন, যদি না তার মধ্যে থাকে রসের কোনকিছু আয়োজন।

এ বিষয়ে সঙ্গীত ও কলাশাখার সভাপতি শ্রীরাজেশ্বর মিত্র কিছু সুরাস অর্জন করেছেন। তাঁর তাদের ফাঁকে ফাঁকে স্বকণ্ঠ প্রচারিত কিছু সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা ছিল, তাই তাঁর আবেদন এত সহজ হ'য়ে সকলের হৃদয় জয় করেছে।

কিন্তু সেদিনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল মেয়েদের সনাগত প্রতিনিধিদের নাগরিক সম্বর্দ্ধনা। এ একেবারে সম্পূর্ণ অভিনব। আর কোথাও কোন সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিদের এ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়েছে ব'লে শুনিনি। অবশ্য এই সম্বর্দ্ধনার কথা সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হওয়ার পর অপর এক সম্মেলনে এর ব্যবস্থা হওয়ার কথা শুনেছি, কিন্তু আয়োজনের দিক থেকে এখানেই এর সূচনা।

তাই হোক, সবরমতীর তীরবর্ত্তী এক অতি মনোহর উদ্যানে বৈকালিক চা-পানসহ সম্বর্দ্ধনার আয়োজন। পৌরসভার সমস্ত সদস্য সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত বাগান ঘিরে পুষ্পলতা ও কুঞ্জবীথির আশেপাশে ছোট ছোট টেবিল। প্রতি টেবিলেই কিছু স্থানীয় সভ্য ও কিছু সম্মেলনের প্রতিনিধি। পারস্পরিক আলাপ-আলাপনের মধ্য দিয়ে ভাব-বিনিময়ের নিবিড় সুযোগ। গুজরাটি মানুষের কিছু পরিচয় এর মধ্যে নিয়ে থাক্ সুদূর বাংলার, কিছু নিয়ে যাক্ বাঙালীর মর্ম্ম কথা। সভাটা নিবিড় হ'য়ে উঠুক।

আর তা নিবিড়তর করার প্রয়াসী হ'লেন মেয়েরা নিজে মশাই। মেয়েদের স্বাভাবিক সম্ভাষণের অভাবে যে ভাবে তিনি সম্মেলনে সমাগত উল্লেখযোগ্য বাঙালী প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন গুজরাটি বন্ধুদের সাথে, তা সত্যিই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে এবং সমস্ত অনুষ্ঠানটিকেও অতি সরস করে তুলেছিল।

এই সরসতার অভাবে মেয়র মশাইও যে মধুময় পরিবেশ করলেন তাও অপূর্ব্ব। চা-এর সহযোগিতায় নত তাঁর কথাগুলিও উপাদেয়।

পর দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল দুটি শাখা-অধিবেশন। ইতিমধ্যেই প্রতিনিধিদের 'যা-চাকা' সুরু হ'য়ে গেছে। কেউ পাড়ি জমিয়েছেন আবু পাহাড়ে, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যা কিছু দেখা সারা যায়, আবার কেউ আগামীকালের পথর-পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা না রেখেই বেরিয়ে পড়েছেন। আমেদাবাদের মিল-এলাকা ছিল মোটা একটা দলের লক্ষ্য।

সেই ভাঙা হাটেই সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি শ্রীযদিশারঞ্জন বসু তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। অনেকের কাছেই এই শাখা অধিবেশনটি সম্বন্ধে অভিযোগ শুনলুম। এটির আদৌ যৌক্তিকতা আছে কিনা সেটাই তর্কের বিষয়।

শেষ অধিবেশন শিশু-সাহিত্য শাখায়। তখন একটু বেলা হয়েছে, তাঁরা হাটে আরো কিছু সমাবেশ হয়েছে প্রতিনিধির। অনেকেই আবার এই শাখা-অধিবেশনটিতেই বিশেষ ভাবে যোগ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরেছেন।

তবু ভাল! সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের চেয়ে তাঁরা যে শিশু-মন-গঠনের কথা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা বেশী বুঝেছেন, এতেও কিছু আশ্বস্ত হওয়া যায়! অন্ততঃ ত দেখেছি এই শাখাটির প্রতি সকলের আকর্ষণের ঝোঁক!

এই শাখার সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার। তাঁর ভাষণ অত্যন্ত মামুলী হ'লেও সর্ব্বতোভাবে প্রণিধানযোগ্য! শিশু-সাহিত্যের যে সমস্যার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তা পুরাতন হ'লেও চির-সত্য! শিশুদের জন্যে তাঁর মরমী চিন্তার আভাস এই ভাষণে মেলে।

তবু মনে, অভিভাষণের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ নামোল্লেখের ব্যাপারে আরো কিছু সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন ছিল। প্রতিষ্ঠাবানদের বাদ দিয়ে কিন্তু অখ্যাতনামার উল্লেখ সত্যিই বড় বিসদৃশ ঠেকে।

শিশুশাখায় উপস্থিত শিশুদের মনোরঞ্জনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। প্রবন্ধ-লেখক তাদের জন্যে কয়েকটি ছড়ার ছড়া পরিবেশন করলেন। তার সঙ্গে যোগ দিলেন শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ।

বৈকালিক সাধারণ সভা পতাকানুষ্ঠানিক। মামুলী বক্তব্যে প্রধান ও কার্য্যকরী সমিতি গঠন।

বক্তব্য প্রধানের ব্যবস্থাটা মামুলী হলেও বক্তব্যগুলি যেওয়া হয়েছে আন্তরিকতাবেই। সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তাদের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ, তবু তাঁরা যেভাবে আমাদের সুখ-সুবিধার জন্যে আপ্রাণ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়!

আরও একটা ব্যবস্থা অভিনব এবং আনন্দজনক। বাইরে যাঁরা ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনে ব্রতী আছেন, তাঁদেরই পুত্র-কন্যা করলেন আমাদের সেবা, আর অন্তরালে তাঁদেরই সহধর্ম্মিণীরা আমাদের এই বিরাট যজ্ঞটির জন্যে প্রস্তুত করলেন আহার্য্য।

সুতরাং বাড়ী থেকে দেড় হাজার মাইল দূরেও যে আমরা অনাথ হয়ে পড়িনি, তার ছেড়েও যে অনেক পরিবেশে বাস করতে পেরেছি এর জন্যে প্রত্যেকেই খুব খুশী। তাই আনুষঙ্গিক অনেক ত্রুটিই সকলে হাসি-মুখে সয়েছেন।

স্ত্রী-শিশু মিলিয়ে যেখানে প্রায় হাজার খানেক বাঙালীর বাস, সেখানে এ ধরণের বিরাট ব্যবস্থার অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভব হ'ত না যদি না তাঁরা পেতেন স্থানীয় গুজরাটিদের সাহায্য! এক এক সময় কোথাও কেউ মনে রাখেনি বাঙালী ও গুজরাটির মধ্যে।

ব্যবস্থার আরো কিছু অভিনবত্ব ছিল। তা এই যে, সম্মেলনের অধিবেশনের মধ্যেও এ ধরণের একীকৃত হওয়া বিস্ময়কর। গুজরাটি সাহিত্য শাখার অধিবেশনটাও নিতান্তই ছিল আনুষ্ঠানিক। গুজরাটী সাহিত্যরস প্রতিদিনই আমরা পেয়েছি প্রতিটি অধিবেশনে। সমস্ত শাখা অধিবেশনেরই উদ্বোধক ছিলেন স্থানীয় সাহিত্যিক ও গুণীজন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও কবি শ্রীউমাশঙ্কর যোশী, রবিশঙ্কর রাওল, রমিকলাল পারেখ, বিরঞ্জন ভগৎ, মণিলাল পারেখ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলাভাষায়

সুপণ্ডিত। ওরুণো দলিলদাস পারেখ মশাই বহু বাংলা বই গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বহু গুজরাটি কবিতা বা বক্তৃতা তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্যে বাংলায় তর্জমা করে শুনিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি শান্তিনিকেতনেই শিক্ষাপ্রাপ্ত।

প্রতিদিনের আনন্দ বিতরণের জন্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিও কম আকর্ষণীয় ছিল না। বিশেষ করে স্বামীজী সরলা ও রামকৃষ্ণের অনুষ্ঠানটি অপূর্ব মনে হয়েছে। যেমন বিরাট মন, তেমনি সাজপোষাকের অভিনবত্ব, সঙ্গীতেরও তেমনি ছন্দ, তেমনি সুন্দর পরিকল্পনা। সকলেরই চিত্ত সিক্ত প্রশংসা অর্জন করেছে এই অনুষ্ঠানটি।

আরো একটি অনুষ্ঠান সকলকে রীতিমত বিস্মিত করেছে, তা হ'ল পরমহংসের 'বিদায়' নাটকের গুজরাটি অভিনয়। অনুবাদ কেমন হ'য়েছে তা ঠিক বলার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু অভিনয় ও তাবাবেগ প্রকাশে যে অপূর্ব দক্ষতা দেখেছি, তা সহজে ভোলার নয়। সম্পূর্ণ গুজরাটী ব্যবসায়ীরা যে কিরকম গুরুভাবে প্রবণ ও পরিবেশন করেছেন—না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বলতে দ্বিধা নেই কোন সৌখীন বাঙালী নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক এই নাটকের এমন সঙ্গীতসুন্দর অভিনয় দেখিনি।

শেষ দিন ছিল বিদায়পরিক্রমার ব্যবস্থা। প্রাচীন দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখবার আয়োজন।

তারপরই শুরু হ'ল পাড়ি দেওয়া। একদলকেই ফিরলেন বাড়ীর পথে, আমী মনটাই পাড়ি জমালেন আরকা-সোমনাথ-দ্বিপরাজ্যে। এত কাছে এসেও চতুর্ধামের একতম ধামে না গেলে যে জীবন ব্যর্থ।—সুতরাং আরকাতীর্থে যেতেই হবে?

মন তৈরীই ছিল, সেই রাতেই আমরা পাড়ি জমালুম পশ্চিমের শেষ প্রান্তিক সীমানার উদ্দেশ্যে।

জীবে প্রেম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

জীব শিব—এ সৃষ্টি ভারতের। জীবকে উপেক্ষা ক'রে শিবত্বলাভ হয় না। জীবে প্রেম বিরাটের সাগরসৈকতের মাত্র ক্ষুদ্র বালুকণার প্রতি শ্রদ্ধা। সমষ্টির উপলব্ধিতে সত্যের সন্ধান লাভ হয়। কিন্তু অনিত্যকে না বুঝলে নিত্যের বোধ অসম্ভব। তাই কোনো বালুকণা উপেক্ষণীয় নয়—সমজ্ঞানের অনুসন্ধানে। বজ্রকণ্ঠে কহেছিলেন ঠাকুরের পরম-প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এ ধ্বনি উপদেশের নির্দেশ নয়। স্বামীজির মন-প্রাণ ভরপুর ছিল পূর্বদের রসে। সে অমৃতধারা বর্ষিত হয়েছিল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, কে জানে কত যুগ পূর্বে। জনসেবা, মাত্র চিত্তের করুণার বিকাশ নয়—আপনার গুরুদেবের উপলব্ধিতে। এ সাধনার কারণ দিয়েছেন স্বামীজি। হিন্দু শাস্ত্রের এক মূল কথা সে বিবৃতিতে শোনা যায়।

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন-প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে এ-সবার পায়।

কবি রামপ্রসাদের স্পষ্ট ভাষা—যা বিরাজেন সর্বঘটে।

কবি রবীন্দ্রনাথও হ'তেন কঠিন, যখন ব্যথিত হ'তেন তিনি মূঢ়তার ঘন-তোলানো প্রলোভনে। বলেছিলেন ঐরূপ—

হরেব তৈ ভিত্তঃ স্বর্গ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

সমদর্শীর বিজিত বিশ্বের এক স্তর তো এই প্রাণ-বহুল সংসার ধাম। দেব-লোকে বাস করার লোভে সবাই তো ইহলোককে নরক নীচধাম ভাবা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ নয়। তাই কবি বলেছিলেন—

"দেবলোক নিজেকে অতি বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে। সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মত মলিন মর্ত্যের মধ্যে তাকে প্রবাহিত ক'রে দিলে তবে তার বন্ধন মোচন হবে। মলিনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।"

মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্মের প্রথম মন্ত্র—জীবে দয়া, নামে রুচি। এ-দয়া ও রুচি এক অন্যের সাপেক্ষ। জীবে দয়া না হ'লে কী নামে রুচি হয়? কারণ নামীর কৃপা যে জগত ব্যাপ্ত। আবার নামে রুচি হ'লে নামীর পাওয়া

যায় সন্ধান—তখন ঐ সত্যই হয় দেখা দেয়মান। জীব যে তাঁর গড়া। বিদ্যা, অবিদ্যা কেহ তো স্বাধীন নয়—নারীর বিরাট সত্তাতে।

মনকে অনাসক্ত করা জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু জীব বাদ দিয়ে কঠোর তপস্যায় মন লয় করবার আয়োজন কি সম্ভবপর? সংসারের ভালো-মন্দ মলিন-অমলিনের ওত-প্রোত মিলনের রহস্যকথার সম্যক জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। সে রহস্যের সমাধান দেখায় শুদ্ধি মার্গ। কারণ পরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর শ্রীচরণে অর্ঘ্য দান, পরের সেবা। জীব মাত্রেই সেই বিরাটের এক টুকরা। পূর্ণের সন্ধানে প্রতি টুকরার প্রতি আত্মীয়তা-বোধ অপরিহার্য্য। মনকে শুদ্ধ করতে গেলে—পরের মনের কাতরতা দূর করতে হয়—যেমন দেহের এক অঙ্গের অসুস্থতায় সারা দেহের নিরাময়তা সম্ভব নয়।

অন্তর শুদ্ধির প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেছিলেন—

কিং তে জটাহি দুম্মেধ কিং তে অজিন সাটিয়া।
অব্ভন্তরং তে গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি।

—হে নির্ব্বোধ, তোমার জটাই বা কি করবে আর মৃগচর্ম্ম সজ্জাই বা করবে কী? অন্তরের গহন। তুমি বাহির পরিমার্জ্জিত করছ।

তাই ব্রাহ্মণের এক বিশিষ্টতা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—যিনি দুর্ব্বল এবং সবল উভয়বিধ প্রাণীর প্রতি অহিংস, যিনি প্রাণবধে বিরত, যিনি কাহাকেও আঘাত করেন না তিনিই ব্রাহ্মণ।

মোট কথা—পরকে উপেক্ষা ক'রে, আপনাকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়—স্বার্থান্বেষণ। তাতে মুক্তি নাই।

হিন্দু ঘরের প্রত্যেক প্রার্থনা প্রত্যহ শেখায় সর্ব্বভূতের হিতে রতি। জগন্মাতা—সর্ব্বমঙ্গলা, সবার মঙ্গল করেন তিনি। তিনি সর্ব্বার্থসাধিকা—সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন তিনি।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শত্রু বধের শিক্ষার মাঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিখিয়েছেন প্রেম-ধর্ম্ম। তিনি জীবকে অবজ্ঞা করতে শিক্ষা দেননি কোনো দিন। কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগের শেষেও তিনি উপদেশ দিয়েছেন—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যাঁর সংযত, যাঁর ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিগত, তেমন মোক্ষপরায়ণ মুনি সদা মুক্ত। যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর সর্ব্বভূতের সুহৃদরূপে আমাকে তিনি জেনে শান্তি পান।*

সর্ব্বভূতে তাঁর মিত্রতার জ্ঞানকে বাদ দিলে মানুষের মুক্তি নাই, শান্তি নাই। কারণ মুনিকে বিশিষ্টরূপে জানতে হয় যে ঈশ্বর সকল ভূতের সুহৃদ। সে সন্ধান শান্তির এক দৃঢ় ভূমি। এ শিক্ষা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ব্বত্র।

তাঁর অবতার-পরিচয়ে তিনি অবতরণের কারণ দিয়েছেন। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ। এর অর্থ নয় কি—সাধুভাবের পোষণ, দুষ্কৃত ভাবের অপনোদন? জগাই মাধাইয়ের অসাধুতা বিনাশ করেছিলেন মহাপ্রভু প্রেমে। আঘাতের বিনিময়ে প্রেম বিতরণে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন সাধুর পরিত্রাণের আয়োজনে ঐশ-শক্তি নিয়োগ করেছিলেন মানুষের কী কর্ত্তব্য নয় পরোপকার?

মানুষের এ সম্পর্কে কী কর্ত্তব্য সে কথা স্পষ্ট বুঝিয়েছেন অবতার বহু স্থলে। সেগুলি একত্র ক'রে সংশ্লিষ্ট ভাবে বুঝলে সন্দেহ থাকে না যে—পৃথিবীর সকল জীবকে উপেক্ষা ক'রে মাত্র নিজের মোক্ষের অভিলাষে বৈরাগ্য সাধন কোনো সাধককে মুক্ত করতে পারে না। সাধনায় ব্রাহ্মী-স্থিতি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয়। সে স্থিতি আপনাকে মুছে ফেলা, অহংকারের লোপ। নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কারের আত্মভাব নাই, পর-ভাব থাকবে কেমন ক'রে। তার পক্ষে আত্মপর সব সমান। সে শান্তি পরকে ভুলে আসে না। আসে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-বাসনা ভুলে—সকল কামনা-নদীকে আত্মা-সমুদ্রে প্রবাহিত ক'রে।

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।৫।৭।

সর্ব্বভূতের আত্মায় নিজের আত্মা দর্শন করেন যিনি, তিনি কর্ম্ম করলেও নির্লিপ্ত। তিনি সম্যক দর্শী। সমদর্শন বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের এক মার্গ। পরকে পর না ভাবাই কর্ম্মত্যাগের উপায়, কর্ম্মের ঘূর্ণাকে বিপর্য্যস্ত না হবার কৌশল।

সম-দৃষ্টিতে প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী-কর্ম্মী বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর সকলেতেই সমদর্শী হন। তেমন ব্যক্তিই পণ্ডিত। এমন মানুষই সংসার সমর ক্ষেত্রে হন বিজয়ী। এমন বিজয়ী বীরের

* গীতা

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

অতিরিক্ত ফেণার দরুণই এ সম্ভব হয়

সানলাইট সাবান

জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

8, 849-X52 BG

হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

লক্ষ্য থাকে অনাদি নির্গুণ ব্রহ্মে। কারণ ব্রহ্মে ভেদাভেদ নাই।

নিষ্পাপ, সংশয়রহিত, একাগ্রচিত্ত সর্ব্বভূতহিতেরত ঋষিরা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যিনি সমাকর্ষণী তিনি ঋষি। তাই সর্ব্বভূতহিতেরত তিনি।*

এ নির্দ্দেশ স্পষ্ট যে সর্ব্বভূতের কল্যাণ-কামীর লক্ষ্য নির্ব্বাণ, অবশ্য অন্যান্য গুণও যাঁর অর্জ্জিত। সর্ব্বভূতহিতে রতি না থাকলে সাধক পেতে পারেনা নির্ব্বাণ।

ঈশোপনিষদের শিক্ষা ঐ তাকেই প্রকাশ করেছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।৬।

যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা আপনার আত্মার মাঝে দর্শন করেন এবং সকল আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কাকেও ঘৃণা করেন না।

যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।৭।

যিনি একাত্মদর্শী সকল ভূতকে (একই) আত্মা বলে জানেন—তাঁর মোহই বা কোথা, আর শোকই বা কোথা? কারণ মোহ এবং শোক আসে অন্যের বিরুদ্ধ কর্ম হতে।

এইটুকু উপনিষদ নির্য্যাস। এই ভাব গীতার এক উপায়ের উপদেশ। তাই শান্তি লাভের শিক্ষায় গীতা বললেন—

"মহেশ্বর আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকল লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ জেনে শান্তি-লাভ করে।"†

সর্ব্বজীবের যিনি সুহৃদ তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ এবং তপস্যার মাঝে কি শান্তিকামী সাধক কোনো জীবের বৈরিতা করতে পারে? জগদীশ্বরে ভক্তি থাকলেই তিনি যাদের সুহৃদ, তাদের সাথে সৌহৃদ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভগবান ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রকারে সাধনার উপদেশ দিয়েছেন, কর্ম্মে পর-সেবা, জ্ঞানে পরসৌহৃদ্য। যোগের ফল তো সাধনার পরম লাভ। কিন্তু তার পূর্ব্বে আবশ্যক চরিত্র গঠন। আবশ্যক সমবুদ্ধি হওয়া। পরকে ভালবাসা। মাত্র নিরপরাধ পরের সাথে দুর্ব্যবহার নয়। যে হিংসা করবে তার প্রতি প্রেম। বললেন—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য সাধু পাপী প্রত্যেকের প্রতি যিনি সমজ্ঞান—তিনি শ্রেষ্ঠ ‡

তারপর যোগের শিক্ষা দিলেন—কিরূপে অত্যন্ত সুখে মানুষ ব্রহ্ম-সংস্পর্শ লাভ করতে পারে, সে যোগের শিক্ষা দিয়ে বুঝি বা বুঝলেন নারায়ণ—মানুষ সেই সুখের কল্পনায় সাংসারিক কর্ত্তব্য-পথ ভ্রষ্ট হতে পারে। আর সে ব্রাহ্মী-স্থিতিও তো বিশ্বের কোনও আংশিক তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুখ নয়। ব্রহ্মস্থিতি যে শাশ্বত অনন্তের আনন্দে স্থিতি। তাই সাধককে সাবধান ক'রে দিয়ে সেই সনাতন নীতি বিবৃত করলেন, যা ভারতের ভাবধারাকে করেছিল শুদ্ধ, সমারূঢ় করেছিল তাকে উচ্চাসনে। আবার দিলেন তিনি সেই সমদর্শনের উপদেশ। বললেন—"সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগনিরত পুরুষ, আত্মাকে সর্ব্বভূতে স্থিত এবং সর্ব্বভূতকে নিজের আত্মায় দর্শন করেন। †

সেই মঙ্গলময় শিক্ষা ঈশোপনিষদের। আপন-পরে ভোলাতেন নাই। আরও বুঝিয়ে বললেন—ভক্ত তুমি, জ্ঞানী তুমি, যোগী তুমি। তুমি তো চাও আমি যেন সদা থাকি তোমার আঁখির মাঝে, তুমি যেন না থাক আমার দৃষ্টির অন্তরালে। শুভ সংকল্প। শোন উপায়, যে আমায় দেখে সর্ব্বত্র, আর সবাইকে দেখে আমার মাঝে, সে তো হয়না আমার পরোক্ষ, আমিও যাই না তার দৃষ্টির বাহিরে। ‡

আরও বললেন—সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে অভিন্নরূপে উপলব্ধি ক'রে সেই যোগীপুরুষ সকল প্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান থেকেও আমাতেই অবস্থিতি করেন। হে অর্জ্জুন যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে নিজের উপমায় সুখ দুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। §

---

* গীতা—৫।২৫

† গীতা ৫।২৯

‡ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।৬।৩০

§ সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ। ৬।৩১।৩২

যে অবস্থায়ই দেখি পরকে হতশ্রদ্ধা ক'রে কেহ পারে না পরমও চরম সুখ লাভ করতে। যোগী দিনরাত ঈশ্বরের উপাধিতে মিলে থাকতে পারে না। "সুখমত্যন্তিকং" উপভোগ করতে পারে পূর্ণলয়ে দেহ ধ্বংস না হ'লে। যতদিন দেহ বিদ্যমান যোগীর মনকে সংসারে নামতেই হয়। চিত্তকে বিশুদ্ধ রেখে চিত্তবৃত্তি নিরোধের চেষ্টায় যোগীকে তপস্যাচরণ করতে হয়। তার একটা উপায় চিত্তের সম্প্রসারণ। স্বয়ং নিজ পরাবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্—বলেছেন কবি। এ আপনার, এ পর—এ গণনা লঘুচিত্ত ব্যক্তির। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্। যে উদার-চরিত সারা বিশ্ব তার কুটুম্বে পূর্ণ। পরের কষ্টে যোগীর মনে কষ্ট হয়, পরের সুখে সুখ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—কুল-কুণ্ডলিনী জাগিয়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎমাত্র যোগীর করণীয় নয়। তাকে অভ্যাস করতে হবে দিবারাত্র শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আত্ম-সম্প্রসারণের ফলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। শীতকাতরের কাঁপুনিতে কাঁপতে হবে আপনাকে, বস্তুক্ষুর ক্ষুধার অগ্নির প্রদাহ সহ্য করতে হবে জঠরে। যদি পরব্রহ্মে লীন হতে চায় মানুষ, তা'হলে বিশ্বের কোনো টুকরাকে তো ব্রহ্ম-ছাড়া ভাবলে চলবে না।

সত্যইতো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা উপলব্ধি করি আত্ম-প্রসারের প্রকৃষ্ট ফল। পরকে আপন করলে বেড়ে যায় জীব। কূপ-মুণ্ডুক তো কূপের বাহিরে যে জগত বিদ্যমান, তার উপলব্ধি করতে পারে না।

পুনঃ পুনঃ ভগবান বলেছেন তিনি সর্ব্বব্যাপী। সকলই তাঁহাতে, তিনি সর্ব্বত্র। তাই তিনি বোঝালেন অর্জুনকে—হে ধনঞ্জয়, আমা হ'তে অন্য শ্রেষ্ঠ কারণ তো জগতের নাই। আমি তো মাত্র কারণ নই। জগত আমাতে স্থিত। মণিমালার মণিগুলি যেমন গাঁথা থাকে সূত্রে, তেমনি সমগ্র জগত তো গাঁথা আমাতে। জগতের কিছু ঘৃণ্য নয়, সবই মণি। যা' ভগবান-সূত্রে গাঁথা, তা কি অস্পৃশ্য ঘৃণ্য হতে পারে? সকল জীবই মণি। তিনিই কারণ সৃষ্টির। সবারই ভগবানে স্থিতি—তাই সবই পবিত্র। অবিদ্যার ফলে জীব দেখে ভেদ। বিদ্যায় সব অলীক—মাত্র দৃষ্ট হবে—আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

জগৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাবে আচ্ছন্ন। এই তিনভাবে জগৎ মোহিত। তাই যাঁর সৃষ্টি এই ত্রিগুণ, তাঁকে চিনতে পারে না বিশ্ব। অথচ তিনি বিশ্বব্যাপী।

কিন্তু অবিদ্যার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কি একভক্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানীরই সহজে হয়? বলেন ভগবান—বহুজন্মের অন্তে জ্ঞানবান আমাকে লাভ করে। জ্ঞানবান উপলব্ধি করে সমস্ত জগৎ বাসুদেবময়। অবশ্য তেমন মহাত্মা সুদুর্লভ।*

সেই বীজমন্ত্র—বাসুদেব সর্ব্বমিতি—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে তাঁর সূত্র।

তিনি ভগবানের স্বরূপ যেভাবে বর্ণনা করেছেন গীতায়। মহাবায়ু সর্ব্বত্র গমনশীল অথচ আকাশে তাঁর স্থিতি যেমনি ভূত সকল তাঁর মাঝেই অবস্থিত।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ।৯।৬

এ ধারণা না হ'লে প্রকৃত ধারণা হ'বে না ভগবানের। আর এ ধারণার মূল নির্দ্দেশ যে সকল ভূতের অবস্থিতি তাঁর অনন্ত পূর্ণতায়। সমগ্রে মতি সম্ভবপর নয়, কোনো অংশকে হীন বিবেচনা করলে।

এখন কথা উঠতে পারে—সবই তো অনিত্য। জগৎ যখন মায়াময়, তখন এ জগতের কোনও ভাব বা পদার্থকে সপ্রেম দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়োজন কোথা। সত্য কথা। কিন্তু এ প্রশ্ন তখন ওঠে যখন দ্রষ্টা অবস্থিত হয় যে দৃষ্টিও অলীক, দর্শনও অস্তিত্বহীন এবং দ্রষ্টারও অস্তিত্ব নাই। যতক্ষণ এ বোধ না আসে, জীবকে সাধনা করতে হয় পরম জ্ঞান লাভ করবার জন্য। সে জ্ঞান আসে প্রেমে। স্রষ্টাকে বুঝতে গেলে—বিদ্বেষ বৈরিতা ঈর্ষা ঘৃণা ও ভয় হয় পরিপন্থী দিব্য-জ্ঞানের। অথচ এ লীলা তাঁর। সৃষ্টি স্রষ্টার এক লীলার বিকাশ, এ প্রতীতি উদ্রত করে জীবকে, প্রসার করে তার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিই বুঝিয়ে দেয় অবিদ্যার রূপ বিদ্যার বলে। সুতরাং জীবে দয়া, বিশ্ব-প্রেম নিঃসন্দিগ্ধ সর্ব্ব-ভূতে, বিশিষ্ট সোপান কল্যাণপথের। মা মা হিংসী—তাই বৈদিক শিক্ষা।

শেষ উপলব্ধি তো সহজে আসে না। তাই দেখি

* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।৭।১৯

প্রত্যেক উচ্চ সোপানের কথা বিবৃত ক'রে আবার ভগবান সেই জীব-প্রেম নীতির অংশকতার কথা বুঝিয়েছেন। তাই মনে হয় জীবে প্রেম গীতার এক মূল উপদেশ।

আমি এ বিষয় যতই আলোচনা করি, ততই চমৎকৃত হই। শ্রীহরির দয়ার কথা আমাদের মত দীনহীন সংসারীর প্রীতিকর। বিশ্বরূপ দর্শন এক বিরাট সৌভাগ্য ঘটেছিল পার্থের মত গুণী, জ্ঞানী, ভক্ত শ্রেষ্ঠীর পক্ষে। তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল হতে উত্থিত হয়েছিল স্তুতিগান—যা বিশ্ব-প্রেমে ব্যাসদেব বিশ্বকে শুনিয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং অর্জ্জুনও সে উচ্চ ভূমিতে থাকতে পারলেন না চিরতরে। এ-ভব ভবনে তাঁর তখন কর্ম্মের অবসান হয়নি। অর্জ্জুনের মত মহা-পুরুষও সে উচ্চ ভূমিতে তখন আপনাকে উপযোগী ভাবতে পারলেন না। মায়ার বাঁধন টুটল না। তিনি ভক্ত। তিনি চতুর্ভুজের ভজনা করেন। সেই রূপেই তাঁর সুখ। চতুর্ভুজ নারায়ণের বিমোহন রূপই তাঁর মনপ্রাণ নিঙড়ে আনন্দের রস বার করে। সহস্রবাহু তাঁর প্রাণে ভীতি-সঞ্চার করলেন। তিনি বলেন—যা পূর্ব্বে দেখিনি এমন তোমার রূপ দেখে হর্ষ হচ্ছে সত্য। কিন্তু প্রভু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে সে হর্ষের ভার সহ্য হচ্ছে না। সত্য কথা বলি। যেমন হর্ষ হচ্ছে তেমনি ভয়েতেও আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে। তুমি দেবেশ, কিন্তু তুমি জগন্নিবাস। তুমি সে পুরাণো রূপ দেখাও প্রভু হে।

বলতে হ'ল বীরচূড়ামণিকে—তবুও ভ প্রব্যথিতং মনোমে। বলতে হ'ল—তুমি অনন্ত দেবেশ হ'লেও জগন্নিবাস। জগতের লোক চতুর্ভুজ নারায়ণ পূজা ক'রে ধন্য হয়।

ভগবান ভক্ত-বৎসল। ভক্তের ভূমিতে নামলেন। জগতে যোগী যায় এমন রূপ দেখালেন। কিন্তু বোঝালেন যে জগতে বাস করতে হলে যে সব গুণ আবশ্যক তাদের ত্যাগ করতে পারবে না। সংসারীর আদর্শ কর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত করলেন।

বললেন—কর্ম্ম কর কিন্তু আমার অনুমোদিত বর্ণিত পথে কর্ম্ম কর নিরাসক্ত ভাবে। আমার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান হও। হও আমার ভক্ত।

তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে কেমন ভাবে জীবন যাপন করতে হবে—এ নির্দ্দেশ হ'ল সে প্রসঙ্গে।

কিন্তু তিনি ভুললেন না সেই কথা—জীবে জীবে কেমন ব্যবহার আদর্শ আচরণ, সে কথার পুনরুক্তি করলেন। বললেন—হ'তে হবে নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতে।

তারপর ফল বর্ণনা করলেন। বল্লেন—এমন হ'লে আমায় পাবে!

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ

নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ১১।৫৫

একটু স্থির হ'য়ে ভাবলে সন্দেহ থাকে না যে "নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু" এক উচ্চাঙ্গের আচরণের নির্দ্দেশ। এ আচরণ অবশ্য আচরণীয় কর্ত্তব্য। মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমো, মদ্ভক্ত হবার নির্দ্দেশের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের সমতুল্য নির্ব্বৈর হবার ব্যবস্থা। একটি প্রত্যাহার করলে সাফল্য লাভ হবে না পবিত্র পথের যাত্রায়। যেমন নিরাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করতে হবে তেমনি নির্ব্বৈর হতে হবে। মাত্র অনাসক্তি বা মাত্র অহিংসা এগিয়ে দেবেনা সাধন মার্গে। পথকে আলোকিত করবে ভক্তি। পথকে বুঝিয়ে দেবে সেই জ্ঞান যে উপলব্ধি করিয়ে দেবে যে বিশ্ববিধাতা পরম। কিন্তু সৃষ্টির অবহেলায় স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। দেখি বার বার একই সতর্কতা। এর কারণও স্পষ্ট। উর্দ্ধবৃত্তি শেখায় মানুষকে নিম্নস্তরের অবহেলা। কারণ প্রেম ও ঈর্ষা মনুষ্য জীবনের সংস্কার। ইচ্ছা এবং দ্বেষকে অপসারিত না করলে উন্নতি অসম্ভব। প্রেমকেও শেষে পরিত্যাগ করতে হবে, যদি প্রেম বাধে প্রাণকে ক্ষুদ্র স্বার্থে। কিন্তু হিংসাকে সমূলে চিত্ত হ'তে নিবৃত্ত না করলে, কোনো সম্ভাবনা নাই উচ্চভূমিতে আরোহণের। এ কথা গৃহস্থ মাত্রেই জানে। কিন্তু তার স্বার্থ এবং আত্মম্ভরিতা মানুষকে হিংসার পথ দিয়ে টেনে জাল-জঞ্জালের মাঝে নিয়ে যায়।

বিশ্বরূপদর্শনের পর অর্জ্জুনকে বোঝালেন নারায়ণ বিভিন্ন পথের বিশেষত্ব। তাঁর বর্ণিত সকল পথই উন্নতির মার্গ। তিনি তারপর স্পষ্ট ক'রে মানুষের এক একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ ক'রে বোঝালেন। যে সব আচরণের সাধনায় চরিত্র গঠন করলে তাঁর প্রিয়ত্ব লাভ করা যায়—সে সব সাধনার কথা বিবৃত করলেন। আমি অন্যত্র এ বিষয় আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে মাত্র সেই কয়েকটি গুণের উল্লেখ করব—যেগুলি অবশ্য আচরণীয় সবার পক্ষে। কারণ সকল বিকাশের সাথে তারা ওতপ্রোত-

ভাবে মণ্ডিত তার চরিত্রে যার প্রাণের উচ্ছ্বসিত ভক্তি শ্রীহরির চরণে নিবেদিত।

তিনি এ সম্পর্কে বল্লেন—এই সব ভক্ত আমার প্রিয়।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতেষু—যিনি সকল ভূতের প্রতি বিদ্বেষ-রহিত। দ্বেষ করে মানুষ তার প্রতি যাকে কোনো বিষয়ে আপনা হতে উত্তম বলে মনে করে—বুদ্ধিতে, ভোগে, সৌভাগ্যে। ভগবান বল্লেন—কোনো লোকের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হয়োনা। আর মৈত্র। মানুষ নিজের সমান অবস্থার লোকের সঙ্গে মিত্রতা করে। তিনি বোঝালেন, বেশ যদি সমান রুচি, সমান ভাগ্য, সমান সুখী বা সমান দুঃখী কোনো লোক বিবেচিত হয়, তাকে উপেক্ষা ক'রনা। সবার সাথে মিত্রতা করবে। হিংসা বা ঘৃণা তো কাকেও করবে না এমন কি উপেক্ষাও নয়। মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করবে। আর করবে করুণা। যদি কাকেও তার দুর্ভাগ্য, যদি বোঝ তার অবস্থা হীন, তার প্রতি করবে দয়া। এ সাধনা প্রতিদিনের, এ আচরণ ভুললে চলবে না। আর হ'বে নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমী।

বলা বাহুল্য এ নির্দ্দেশ প্রত্যেকটিই পরের সহিত ব্যবহার করবার সম্বন্ধে প্রদত্ত। কূপমণ্ডুক হলে বিস্তার নাই। বিস্তার না থাকলেও নিস্তার নাই।

আবার স্পষ্ট ক'রে বল্লেন—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।*

যার দ্বারা কোনো লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়না এবং যে লোকও অন্য কাহারও দ্বারা উদ্বেজিত হয়না, যিনি হর্ষ অসহিষ্ণুতা ভয় ও উদ্বেগ হ'তে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়।

বলা বাহুল্য—যে কেহ ঈশ্বর মানে, সে ভগবানের প্রীতি লাভ করতে চায়, কিন্তু সে সৌভাগ্য হয়না পরকে বেগ দিয়ে বা পরকে ভয় করে কিম্বা কারও সান্নিধ্য অসহনীয় ভাবলে।

অন্যান্য আরও গুণের মধ্যে তিনি বল্লেন—আমার প্রিয়তা অর্জ্জন করতে হ'লে এসব গুণগুলিও চাই। যথা শত্রু এবং মিত্রে সমজ্ঞান। বলেছেন তুমি সবার সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থেকো। তবু কেহ যদি তোমার শত্রুতা করে, তাকে মিত্রের সমান জ্ঞান করবে। তুমি সব ভাবে শিব দেখবে, তোমার তো মান নাই। যদি কেহ তোমার অপমান করে তাহ'লে তাকে মানের সঙ্গে সমান মানে গ্রহণ করবে। আর মানুষের বা অন্য জীবেরই বা কথা কেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশে শীত বা উষ্ণতার যন্ত্রণায় উদ্বেলিত হলে চরিত্র চর্চ্চা আহত হবে। নিন্দাতে ব্যথিত হলে প্রিয়তা অর্জ্জন করতে পারবে না আমার। আবার স্তুতিতে বিগলিত হ'লেও চলবে না।

এইরূপ শিক্ষা গীতায় প্রচুর। এ হ'তে এক কথাই প্রতিপন্ন হয় যে মানুষকে ভাবতে হবে বিশ্ব-মিতালীর কথা!

আমি সাত্ত্বিক গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে ভাবের পরিচয় দিয়েছি, সেই শ্লোক উদ্ধৃত করছি।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।* ১৮।২০

যিনি সর্ব্বভূতে একই অব্যয়ের বিকাশ দর্শন করেন, যিনি বহুভাবে বিভক্ত জগতে একত্বের সন্ধান পান, তাঁরই জ্ঞান সাত্ত্বিক।

এ বিষয়ে ভারতের সকল অবতার মহাপুরুষ ও পরম-পুরুষের অভিমত এক। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, পরেশনাথ, মহাপ্রভু, গুরু নানক, তুকারাম, পরমহংসদেব প্রভৃতি সবাই শিক্ষা দিয়েছেন পরকে আপন করতে—হৃদয় হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশ করতে।

প্রভু যীশু 'সরমন অন দি মাউন্টে' অতি সরল ভাষায় বলেছেন—জীবে দয়া, অহিংসা ও প্রেমের কথা। তিনি বলেন—তারাই ধন্য এবং করুণা লাভ করবে যারা করুণাময়। Blessed are the merciful for they shall obtain mercy তিনি বলেছেন পূজার অর্ঘ নিয়ে বেদীতে গমন কর না—প্রাণ হ'তে বিদ্বেষ দমন না ক'রে।

সেকালে কেহ অপরের চোখ উপড়ে নিলে বা কোনো অঙ্গহানি করলে, আহতের অধিকার ছিল আততায়ীর চক্ষু উপড়াবার বা অঙ্গহানি করবার। করুণাময় প্রভু যীশু বল্লেন—এমন দ্বন্দ্বের প্রতিরোধ ক'রনা। বরং যে তোমার দক্ষিণ গালে প্রহার করবে তাকে পেতে দাও অন্য গাল।

তিনি বলেছেন—যে তোমাকে এক মাইল জোর করে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে দু'মাইল যাও।

* গীতা ১২।১৫

* গীতা ১৮।২০

খৃষ্টের প্রসিদ্ধ উপদেশ—তোমরা এ কথা শুনেছ যে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এবং তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা শত্রুদের ভালবাস, যারা তোমাকে অভিসম্পাত দেয় তাদের আশীর্বাদ কর, তাদের মঙ্গল কর যারা তোমাকে ঘৃণা করে এবং প্রার্থনা কর তার জন্য যার ব্যবহার তোমার প্রতি ঈর্ষাময় এবং যে তোমাকে উৎপীড়ন করে।

এই প্রেমের তিনি যে কারণ দেখালেন সে কারণ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনার সঙ্গে মূলে এক—কিন্তু ভারতের ও খৃষ্টীয় জগতের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্যের জন্য মনে হয় পৃথক। ভারতের মতে ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, প্রভু যীশুর মতে সকল মানব একই ঈশ্বরের সন্তান। তাই এই মানব-প্রেম-সাধনার কারণ বিবৃত ক'রে বললেন তিনি—এমন ব্যবহারে তুমি সন্তান হবে (সন্তানের মত আচরণ করবে) তোমার পিতার—যিনি বিরাজ করেন স্বর্গে। কারণ তিনি তাঁর সূর্যকে উদিত করেন মন্দের উপর এবং উত্তমের উপর, এবং বৃষ্টির বারি বর্ষণ করেন ন্যায়-নিষ্ঠের উপর এবং অন্যায় কর্মীর উপর। যে তোমাকে ভালবাসে, তাকে ভালবেসে কী উপহার পাবে তুমি? পাব্লিকানরাও কি তেমন আচরণ করে না? তুমি যদি তোমার ভাইদের অভিবাদন কর মাত্র, অন্যের অপেক্ষা তুমি অধিক কী করলে? এমন কি পাব্লিকানেরাও কি তেমন করে না?

পাব্লিকান বলা হ'ত সেই রোমক কর্মচারীদের যারা য়িহুদীর নিকট হতে কর আদায় করত। নিশ্চয়ই তাদের কর্ম পদ্ধতি অপ্রিয় ছিল দেশে।

তারপর প্রভু যে কারণ দিলেন জীব প্রেমের, তা' শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত কারণের সমতুল। তিনি বললেন—অতএব তোমরা হও পূর্ণ perfect, সেই ভাবে, যে ভাবে তোমাদের স্বর্গে বিরাজিত পিতা পূর্ণ।

মানুষের পূর্ণতা লাভ হয়না প্রেম বিনা।

বুদ্ধদেবের কথা আবার স্মরণ হয়—

অক্কোধেন জিনে কোধং সাধেন অসাধবাদিনং

জিনে কদরীয়ং দানেন, জল্লধুং সাধুনা জিনে।

অক্রোধের দ্বারা জয় করে ক্রোধ, সত্যের দ্বারা বিজিত হয় মিথ্যাভাষী, কদর্য (কৃপণ) পরাজিত হয় দানের দ্বারা এবং অসাধু সাধু উপায়ে।

শরীরচর্চা-শিক্ষা পরিকল্পনা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙালী ভীরু, বাঙালী শক্তিহীন, যে কাজে শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন বাঙালী সে কাজ করিতে ভয় পায়—এই সাধারণ অপবাদের কথা আমরা সারা জীবন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব-স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সে জন্য বাংলাদেশে স্থানে স্থানে শরীরচর্চার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। অধিকাংশ স্থলেই বিপ্লবপন্থী গুপ্ত-সমিতির দল ঐ সকল শরীরচর্চা কেন্দ্রের পরিচালক হইতেন এবং ঐ সকল কেন্দ্র হইতে বিপ্লবপন্থী সংগ্রহ করা হইত। অবশ্য তাহার যে ব্যতিক্রম ছিল না—এমন নহে। স্থানে স্থানে নীতি ও ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে শরীরচর্চা শিক্ষাদান করা হইত। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম আরম্ভ হইয়াছে। স্বামীজির উদাত্তমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের তরুণের দল ত্যাগ ও সেবার মহৎ প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। শরীরচর্চা কেন্দ্র ও সেবার প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সে প্রভাব কম দেখা যাইত না। নানা ভাবে, নানা দিক দিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শরীরচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হইলেও ইহারা শাসকসম্প্রদায় ও তাহাদের পুলিস মনে করিত, তাহার ইহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা এ-দেশস্থ বৃটিশ কর্মচারীদিগকে হত্যা করার জন্যই ঐ সকল শরীরচর্চা কেন্দ্র কাজ করিয়া থাকে। তাহেই যখন নীতি প্রবল হইলে ঐ সকল কেন্দ্রের উপর কড়া নজর দেওয়া হইত এবং কেন্দ্রগুলির পরিচালকদিগকে নিয়াতন ভোগ করিতে হইত। আমরা আমাদের গ্রামে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যে কেন্দ্র হইতে অর্ডিনারি যোগের স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছিল বা যে কেন্দ্রের যুবকগণ বর্তমান বন্যায় ত্রাণ কার্য করিতে গিয়াছিল, তাহার উপরই সর্বপ্রথম পুলিসের কোপ দৃষ্টি পতিত হইল ও ক্রমে তাহা বিনষ্ট করা হইল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অহিংসা-অসহযোগ আন্দোলন শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলিকে প্রথমে উৎসাহ দান করে নাই। কিন্তু গান্ধীজি যখন বলিলেন যে, শক্তিহীনের পক্ষে অহিংস হওয়া সম্ভব নহে—তখন আবার যুবকের দল নূতন করিয়া

শরীরচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইল। তাহার পরও বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারে দেশবাসী আংশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিয়াছিল—সেই অধিকারে যেমন সাধারণ শিক্ষার সহিত কারিগরী শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ বাড়িয়াছিল, তেমনই স্কুল কলেজে শরীরচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থাও বর্দ্ধিত হইল। স্কাউট, ক্যাব, ব্রতচারী প্রভৃতি আন্দোলন সরকারী সাহায্যে আরম্ভ হওয়ায় মানুষের মন ক্রমে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। স্কুলে বা কলেজে শরীরচর্চার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। সর্ব্বত্র—কোথাও প্রকৃত আগ্রহশীল ব্যক্তি, কোথাও বা নামমাত্র শরীরচর্চা-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ২০।২৫ বৎসর অতীত হইলে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১০ বৎসর অতীত হইয়াছে। শরীরচর্চা বিষয়ে স্কুল-কলেজে যতটা কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। সৈন্য-বিভাগের নানা ক্ষেত্রে, মাইকেল প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে সামান্য মাত্র চেষ্টা আরম্ভ হইলেও শরীরচর্চা ব্যবস্থার কোন ব্যাপক কার্য্য-পদ্ধতি স্থির হয় নাই বা দেখা যায় নাই।

বাঁকুড়াপুর-মণিরামপুরনিবাসী, বর্ত্তমানে কলিকাতা ৩৮ বালুচা জেলের অধিবাসী শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায় বাল্যকাল হইতে নিজে শরীরচর্চা করিয়াছেন এবং যখন যেখানে থাকিয়াছেন, সেখানে স্থানীয় ব্যক্তিদিগকে শরীরচর্চা বিষয়ে মনোযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাসী কলেজের শরীরচর্চা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্ত্তমানে কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (প্রাক্তন রিপণ কলেজ) শরীরচর্চার অধ্যাপক হিসাবে কাজ করিতেছেন। তিনি গত প্রায় ৩০ বৎসর কাল নিজ ব্যক্তিগত শরীরচর্চার অভিজ্ঞতা ও ছাত্রগণকে এ বিষয়ে শিক্ষাদানের সময়ে অর্জিত জ্ঞান লইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে শরীরচর্চা শিক্ষাদান সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা সরকারী ও বেসরকারী সকল মহলের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধীনে একটি নামেমাত্র শরীর-চর্চা বিভাগ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মীর সংখ্যা বা প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ এত কম যে—সে বিভাগে প্রায় কোন কাজ হয় না বলিলেই চলে। কিন্তু শরীরচর্চা বিষয়ের প্রয়োজনের কথা কেহই কোন সময়ে অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত তারাচরণের পরিকল্পনায় শুধু স্কুলকলেজে শরীরচর্চাশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার কথা নাই—সকল অফিস, কারখানা, ক্লাব, সমিতি প্রভৃতিতেও কর্ম্মীরা যাহাতে প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে কিছু সময়ের জন্য শরীরচর্চা করে, তাহার ব্যবস্থা আছে। শরীরচর্চার অর্থে তিনি শুধু দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির কথাই চিন্তা করেন নাই। দৈহিক শক্তির সহিত মানুষের যাহাতে নৈতিক শক্তিও বর্দ্ধিত হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দানের কথাও বলিয়াছেন। আমাদের মধ্যে নৈতিকশক্তি কমিয়া গিয়াছে—বিদ্যালয় সমূহে নীতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন শিক্ষা প্রদান করা হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার কথা বার বার বলিয়া গিয়াছেন—স্বাধীনতা লাভ করিলে যা বৎসরে একবার স্বাধীনতা দিবসে উৎসব করিলেও আমরা স্বাধীনতা সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার কথা একবারও চিন্তা করি না। মন নৈতিকশক্তি না হইলে শরীর কখনও কার্য্যক্ষম হইতে পারে না—একথা চিন্তা করিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সেজন্য শ্রীযুক্ত তারাচরণ শরীরচর্চার সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া সকলের মন নৈতিকশক্তির কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

কি সরকারী, কি বেসরকারী সকল মহলে তারাচরণের প্রণীত পরিকল্পনা আলোচিত হউক ও তাহার ফলে জনগণের পক্ষ হইতে বিরাট দাবীর চাপে যাহাতে সরকার গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যবস্থা করেন, সে জন্য সরকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হউক, আমরা সকলের নিকট এই প্রার্থনা জানাইব। এদেশে সর্ব্বার্থসাধক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে—কাজেই তাহার সঙ্গে যদি ব্যাপক শরীরচর্চা ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অন্য শিক্ষা দ্বারা কোন সুফল লাভ করা সম্ভব হইবে না।

বাংলাদেশে বহু শক্তিশালী যুবক তাহাদের শক্তি নানা অন্যায় কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। শরীরচর্চা ক্ষেত্রে তাহাদের একত্র করিয়া

শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায় (১৮ বৎসর বয়সে)

উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাদান করিলে তাহারা উপযুক্ত শরীরচর্চা-শিক্ষকে পরিণত হইবে এবং তাহাদের দৈহিক শক্তি সুপ্রযুক্ত হইয়া দেশবাসীর কল্যাণসাধন করিবে।

শ্রীযুক্ত তারাচরণ যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা অনুযায়ে কার্য্যারম্ভ করিলে পরে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে পরিকল্পনার ছোটখাট ত্রুটি-গুলি সংশোধিত হইয়া উহা দেশবাসীর সকলপ্রকার মঙ্গল উৎসাদন করিবে। তিনি তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে দেশপ্রেম শিক্ষা, পরোপকার-প্রবৃত্তির অনুশীলন, মানবতা-বোধের উন্মেষণ, নাগরিকের কর্ত্তব্যপালন প্রভৃতি বহু সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষার কথা অবতারণা করিয়া-ছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ আমরা ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে বা নাগরিক জীবনে যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, শরীরচর্চার মাধ্যমে সেগুলি ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণতাদান করাই তাঁহার পরিকল্পনার প্রধান ও প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্বাস, চিন্তাশীল দেশবাসীরা এই পরিকল্পনা পাঠ করিয়া—

কি ভাবে উহা কার্য্যকরী করা যায়, সে বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিতে অগ্রসর হইবেন। আমরা এই পরিকল্পনা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি এবং শুনিয়াছি, শিক্ষামন্ত্রী, কলিকাতার মেয়র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতির মত বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এই পরিকল্পনা পাঠ করিয়া ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে বহু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে—সেখানে অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা বিনামূল্যে শিক্ষালাভ করে। সে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধু কৃতবিদ্য নহে, শিক্ষক হইবার যোগ্যতা লাভের জন্য শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শরীরচর্চ্চার উপায় ও তাহার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দান করিলে কলিকাতার বহু সহস্র বালকবালিকা প্রথম জীবন হইতে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির সহিত শরীরচর্চ্চা শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যত জীবন উপযুক্তভাবে গঠন করিতে সমর্থ হইবে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল প্রাক্-বুনিয়াদি বা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শিক্ষকের যোগ্যতা লাভের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে—সে সকল শিক্ষণ-বিদ্যালয়েও শরীরচর্চ্চা অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় হওয়া প্রয়োজন। মোটের উপর পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা করা আজ যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়াছে, একদল ছাত্র-ছাত্রীকে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দান যেমন আমরা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তেমনই শরীরচর্চ্চা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করাও একান্ত প্রয়োজন। তাহার ফলে বাঙ্গালীর দেহে বল সঞ্চার হইবে ও বাঙ্গালীর শ্রম-বিমুখতার অপবাদ ক্রমশ কমিয়া যাইবে। কৃষক ও শ্রমিকের কাজে ভবিষ্যতে আমরা অধিকতর সংখ্যায় বাঙ্গালী লাভ করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইব। সে জন্য শ্রীমান তারাচরণের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য বঙ্গবাসী সকল মানুষকে আমরা বার বার আমাদের বিনীত নিবেদন জ্ঞাপন করি।

উদ্বোধন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ক্ষুদ্র যে তব মহাগর্ব্বের নন্দনভূমি স্বর্গে,
হেলেতে তোমরা ছিলে যে দীপ্ত সূর্য্যের মহাভর্গে।
আভিজাত্যে সবারি উর্দ্ধে ব্রহ্মের মহা অংশ।
উরুতনির তোমরা মহীর দেবতার মহাবংশ।
তোমরাই যে গো করেছ গঠন প্রথম মানব-কৃষ্টি,
মহাস্রষ্টার তোমরাই আদি সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি।
তেজে ও ধৈর্য্যে তোমাদের নারী ধন্যা,
দুর্গতিহরা স্বয়ং দুর্গা সে যে তোমাদেরি কন্যা।
মহারুদ্রের ডমরুর মহাসঙ্গীত যে গো তোমরা,
শ্রীহরিচরণ-পদ্মের তুমি নরূপী ওরে তোমরা।
বাজালেন বাঁশী কৃষ্ণ তোদেরি সঙ্গে,
তোদেরি মহান শ্রীরামচন্দ্র সাগর বাঁধিলা রঙ্গে?
সেই সিন্ধুকে তোমরা একদা মৌর্য্যে করেছ মন্থন,
আজো এ মর্ত্তে উঠিতেছে তারি গৌরবে অভিনন্দন।
কেন তবে হলে আজ ভাই কোন্ হতাশায় তুমি মগ্ন,
কোন শংকায় কোন্ অবসাদে হলে আজ মনোভগ্ন?
মাতা যাহাদের স্বয়ং দুর্গা পিতা যাহাদের রুদ্র,
কোন্ শংকায় হতাশায় তারা কেন হবে ওরে ক্ষুদ্র?
ঝেড়ে ফেলো সব দৈন্যের ধূলা মনে রেখ তুমি ধন্যা,
যাহা খুশী পার করিতে এখনি চাহিবে তোমার মন্ যা।
বিদ্যুৎসম তেজ তব আজ চমকাক্,
পাপ-তাপ গ্লানি ধ্বংসের লাগি মৃত্যুর মত ধমকাক্।
গর্জ্জিয়া ওঠো সব দুর্দ্দশা করিতে আবার ধ্বংস,
চিত্তের তেজে হও দুর্বার দেবতার মহাবংশ।
প্রলয়াগ্নিতে জ্বলে ওঠো দেখি ধক্‌ধক্,
সয়তানদের উদ্ধতফণা করে যাহা বিষে লক্‌লক্—
সেই সব ফণা মুচড়িয়ে দিয়ে করো তারে শতছিন্ন,
মর্ত্ত হইতে সব দুর্নীতি করে যাও নিশ্চিহ্ন।
জাতিরে আবার করো পবিত্র মর্ত্তে আসুক শান্তি,
দুঃখময়ী এ রুক্ষ ধরণী ফিরে পাক পুনঃ কান্তি।
তব তেজ দেখি ওগো দেবতার সন্তান,
সারা পৃথ্বীর আসুরি শক্তি গাক্ পুনঃ তব জয়গান।

ওঠো দুর্জ্জয় পায়ে দলো সব শংকা,
সর্ব্ব ধরায় বাজুক আবার তোমার বিজয় ডংকা।

একটি ঘটনা

(রাশিয়ান লেখক : আন্তন্ চেখভের একটি গল্পের অনুবাদ)

অনুবাদক—শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

সুপ্রভাত হয়েছে। সূর্য্যের আলো জানালার শার্শির তুষার জাল ফুঁড়ে নার্সারি ঘরে এসে ঢুকেছে।

ডানা হচ্ছে একটা ছ-বছরের ছেলে। তার মাথার চুল ছোট করে কাটা, আর বোতামের মত নাক। তার বোন নিনার বয়স চার বছর। সে বেঁটে, মাথার চুল কোঁকড়ান। আর বোবা গোছের। তারা ঘুম থেকে জেগে উঠল। বিছানার রেলিংএর ফাঁক দিয়ে আড় চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

তাদের নার্স এলো গজগজ করতে করতে। যারা ভাল লোক তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল এতক্ষণে। আর তোমরা এখনও চোখই খুলতে পারলে না। দুষ্টু কোথাকার!

প্রফুল্ল সূর্য্যালোক কম্বলের উপর এসে পড়েছে। আর এসে পড়েছে দেয়ালের গায়ে, দাইদের পোষাকের প্রান্তে। মনে হচ্ছে যে সূর্য্যের আলো ছেলেদের ডাকছে, তাদের খেলায় যোগ দিতে। কিন্তু ছেলেদের সেদিকে নজরই নেই। তারা বদ্ মেজাজে বিছানা থেকে উঠেছে। নিনা গাল ফুলিয়ে এবং মুখ ভঙ্গি করে বায়না জুড়ে দিয়েছে—"জল-খা-আ-বার, আমার জল-খাবার।"

এদিকে ডানা কুঁচকিরে চিন্তা করছে, কোন ওজর দেখিয়ে চেঁচামেচি শুরু করা যায়। সে ইতিমধ্যেই চোখ ডলতে শুরু করেছে এবং হাঁ করে ফেলেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বৈঠকখানা থেকে মায়ের গলা শোনা গেল। মা বলছিলেন, "বেড়ালটাকে দুধ দিতে ভুলো না যেন, তার আবার বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে কিনা।

শিশুদের কোঁচকান মুখ আবার সমান হয়ে এল। কেননা তারা আশ্চর্য্য হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারা তক্ষুণি চ্যাচাতে শুরু করে দিল, আর খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তাদের ভীষণ চীৎকারে চারদিক ভরে উঠল। তারা খালি পায়ে আর খালি কাপড় গায়েই রান্নাঘরের দিকে ছুট দিল—

—বেড়ালটার বাচ্চা হয়েছে, বেড়ালটার বাচ্চা হ'য়েছে।

রান্নাঘরের বেঞ্চের নিচে ছিল একটা বাক্স, টিপান উনান জ্বালানর সময় এই বাক্সতে কয়লা এনে রাখ্‌ত। এই বাক্স থেকে বেড়ালটা উঁকি দিচ্ছিল। তার পাণ্ডুর মুখে ছিল একটা ভয়ের আভাস। আর তার নীল চোখে ও ছোট্ট দুটো কাল তারায় মাখান ক্লান্ত আর করুণ দৃষ্টি।

তার মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তার একটা মাত্রই অসুবিধে আছে এবং এটার জন্যই সে পুরোপুরি খুশি হ'তে পারছে না। সেটা হচ্ছে বাচ্চা বেড়ালগুলোর বাবা সেই মন্দা বেড়ালটার উপস্থিতি। আর সেই মন্দাটার কাছেই সে বেচারা অসতর্ক অবস্থায় ধরা দিয়েছিল। সে মিউ মিউ করে ডাকবার জন্যে তার মুখও খুলেছিল। কিন্তু একটু হিস্ হিস্ শব্দ ছাড়া সে মুখ থেকে আর কিছুই বের করতে পারল না। বেড়ালছানাগুলো কিন্তু চীৎকার ক'রে যাচ্ছিল।

তখন ভাই-বোনে হাঁটু গেড়ে বাক্সটার সামনে এসে বসল। তারা নড়া-চড়া না করে রুদ্ধ নিশ্বাসে বেড়াল দেখতে লাগল। তারা খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল, আর ভালও লাগছিল খুব। এদিকে গজ গজ করে দাই তাদের

ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সেদিকে তারা কানই দিচ্ছিল না। অত্যন্ত আনন্দে তাদের দুজনেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

গৃহপালিত পশুরা যখন খেলাধূলো করে তখন খুব কম সময়েই তাদের লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিশুদের জীবনে কিংবা তাদের লেখাপড়ায়, এদের একটা প্রভাব আছে। আমাদের মধ্যে কে না জানে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের কর্কশকণ্ঠ কুকুরের কথা, ক্ষুদে ক্ষুদে অথচ বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের কুকুরগুলোর কথা। খাঁচার মধ্যে থাকে যেসব পাখী, নির্দ্বোষ অথচ বেশ চালিয়াৎ গোছের যেরু পাখী, কিংবা ধর বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের বড় সড় নাদুস-নুদুস বেড়ালের কথাই বা আমরা কেনা জানি—

যখন মজা করবার জন্যে আমরা এদের ল্যাজ ধরে টানাটানি করি কিংবা যন্ত্রণা দি, তখন তো এরা আমাদের ক্ষমা করে। এরা যেমন চট্ করে ভুলে যায়, তেমনই ধৈর্য্যশীল, বিশ্বস্ত আর অনুগত। এগুলো গৃহপালিত প্রাণীদের গুণ। এবং একটা শিশু মনে এই সমস্ত গুণের একটা প্রবল ও সুনির্দ্দিষ্ট প্রভাব আছে। কার্ল কার্লভিচ্ কালো মুখ করে কটিগোট্টা উপদেশ দেয়, কিংবা কোন শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষা করে হয়তো বোঝান যে জল জিনিষটা অম্লজান আর উদ্জান গ্যাসে তৈরী। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে, এদের চেয়ে গৃহপালিত পশুর প্রভাব শিশু মনের উপর অনেক বেশি।

নিনা বড় বড় চোখ করে আর হাসিতে ফেটে পড়ে বলে উঠল, "ইস্ বাচ্চাগুলো কি ছোট, ঠিক ইঁদুরের মত দেখতে।"

ডানা এদিকে গুণতে শুরু করেছে—এক, দুই, তিন—তিনটে বাচ্চা মোটমাট। কাজেই একটা তোমার, একটা আমার, আর একটা অন্য কারুর হবে।

মিঁউ-মিঁউ-মিঁউ—মা বেড়ালটা তাদের দেখে খোসা-মুদে হরে উঠ্‌ল।

বাচ্চাগুলোকে এইভাবে লক্ষ্য করার পর ভাই-বোনে তাদের মায়ের বুকের তলা থেকে তুলে নিল। তারপর তাদের হাতে চলতে লাগল এবং তাতেও খুশি না হয়ে রাত্রের পোষাকের প্রান্তে বাচ্চাগুলোকে তুলে নিল। তারপর আর একটা ঘরের দিকে ছুট লাগাল।—চ্যাচাতে লাগল—মা বেড়ালটার বাচ্চা হয়েছে।

মা তখন একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সাথে বৈঠকখানায় বসে। তিনি দেখলেন যে ছেলেরা হাত মুখ ধোয়নি, জামা কাপড় ছাড়েনি, আর বাসি জামা তুলে ধরে আছে। তিনি রেগে গেলেন এবং ঘন ঘন ছেলে-মেয়ের দিকে তাকাতে লাগলেন।

শিগ্‌গির তোমাদের বাসি জামা নামাও—অসভ্য ছেলে কোথাকার? আর একুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নৈলে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে—তিনি বলে উঠলেন।

কিন্তু শিশুরা মায়ের বকুনি কানেই নিল না। আর সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির উপস্থিতিও বুঝল না। তারা বাচ্চাগুলোকে কার্পেটের উপর ফেলে একাগ্রভাবে তাদের লাগল। মা-বেড়ালটা তাদের চারপাশে ঘুরতে লাগল, আর মিনতির সুরে মিঁউ মিঁউ করতে লাগল।

এর একটু পরেই শিশুদের নার্সারিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হোল। তাদের পোষাক পরান হোল, প্রার্থনা করান হোল। আর জলখাবার দেওয়া হোল। কিন্তু তাদের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এই সব এক ঘেয়ে কাজ থেকে ছাড়া পেতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রান্না ঘরের দিকে দৌড় লাগাতে।

তাদের অভ্যস্ত চাল-চলনের প্রবৃত্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যেন।

বেড়াল ছানাগুলো পৃথিবীতে এসে সব কিছুই অলীক প্রতিপন্ন করে দিয়েছে। তারাই ছিল সারাদিনের সব থেকে বড় আকর্ষণ। যদি প্রতিটি বাচ্চার বদলে চল্লিশ পাউণ্ড মিষ্টি কিংবা দশ হাজার মুদ্রা ডানা কিংবা নিনাকে দেওয়া হোত, তবে তারা একটুও ইতস্ততঃ না করে এ হেন প্রস্তাব বাতিল করে দিত। দাই এবং রাধুনির তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভাই-বোনে রান্না-ঘরে বেড়াল ছানার বাক্সের কাছে ঠায় বসে রইল। আর দুপুরে খাবার সময় পর্য্যন্ত বেড়াল ছানাগুলো নিয়ে ব্যস্ত রইল। তাদের মুখে আগ্রহ, ভাবনা এবং উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠল। তারা বর্ত্তমান নিয়ে তত মাথা ঘামাচ্ছিল না। বেড়াল ছানাগুলোর ভবিষ্যৎ পরিণাম কি সেটাই ছিল তাদের চিন্তার বিষয়। তারা ঠিক করল একটা বাচ্চা এখানেই মায়ের কাছে থাকবে। মা'কে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। আর

একটা ধারে তাদের গ্রীষ্মকালীন বাগান বাড়ীতে। তৃতীয়টাকে রাখা হবে মাটির নীচের ঘরে। সেখানে সব সময়েই অনেক ইঁদুর থাকে।

—কিন্তু বেড়াল ছানাগুলো আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না কেন, ওদের চোখ কি ভিখিরীদের মত অন্ধ? নিনা অনুযোগ করে।

বিষয়টা ডানাকেও ভাবিত করে তুলল। সে একটা বাচ্চার চোখ খোলবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ধরে কঠোর চেষ্টায় সে গলদ ঘর্ম হয়ে উঠল। কিন্তু পেরে উঠল না। তা ছাড়া বাচ্চাগুলোকে যে সব দুধ আর মাংস দেওয়া হোল তার কিছুই তারা খেল না। এতে তারা ভারি মনক্ষুণ্ণ হোল। তাদের মুখের সামনে ঘাই-ই দেওয়া হোক্ না কেন—সব তাদের ধাত্রী মা'টা খেয়ে নেয়।

ডানা প্রস্তাব করল—আমরা এখন ওদের জন্যে ছোট ছোট ঘর তৈরী করব। ওরা সব আলাদা বাড়ীতে থাকবে, আর ওদের মা ওদের কাছে বেড়াতে আসবে। সিডবোর্ডের তৈরী টুপি রাখার বাক্সগুলো রান্নাঘরের এক এক জায়গায় পাতা হোল। তারপর বেড়াল ছানাগুলোকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হোল। মা বেড়ালটার মুখে তখনও একটা কাতর আর আর্ত্ত ভাব ছিল। সে সব কটা বাক্সর কাছে গিয়ে তার ছানাগুলোকে আবার আগের মত জড় করল। তাই এই ভাবে আলাদা আলাদা করে কোনই লাভ হোল না।

ডানা বল্ল, "আচ্ছা, এই বেড়ালটা না হয় ওদের মা, কিন্তু বাবা কে?

—"নিশ্চয়ই তো, বাবা কে হবে?" নিনাও সমর্থন করে।

—"ওদের একটা বাবা তো থাকা উচিত।"

ডানা এবং নিনা অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল যে কাকে বাচ্চা গুলোর বাবা করা যায়। অবশেষে তারা নির্ব্বাচন করল একটা ঘন লাল রঙের ঘোড়াকে। ঘোড়াটার ল্যাজ নেই, আর সেটা পড়েছিল সিঁড়ির নীচে ভাঁড়ার ঘরে। ঘোড়াটার সাথে আরো অনেক পরিত্যক্ত খেলনা পড়েছিল। পরমাণু শেষ হয়ে যাওয়ায় খেলনাগুলো এই ভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। তারা ঘোড়াটাকে টেনে এনে বাক্সটার গায়ে দাঁড় করাল—"এখন সোন"—তারা ঘোড়াটাকে হুঁশিয়ার করে দিল, "এখানে ঠিক হয়ে দাঁড়াও—আর লক্ষ্য রাখ ওদের ব্যবহারটা ঠিক মত হচ্ছে কিনা।"

এই সমস্ত বলা এবং করা তারা শেষ করল গাম্ভীর্য্য সহকারে। তাদের মুখে চিন্তার ছাপ। ওদের কাছে এখন এই বেড়াল-ছানা আর বাক্সটা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বই জানা নেই। আর ওদের আনন্দেরও কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু খুব খারাপ এবং বিশ্রী সময়ও আসছিল ওদের বরাতে। এই রকম সময়ও ওদের কাটাতে হবে।

ঠিক খাবারের সময়ের আগের ব্যাপার। ডানা তার বাবার পড়ার জায়গায় বসেছিল টেবিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। একটা বেড়াল-ছানা কতকগুলো মার্কা দেওয়া কাগজের উপর আলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডানা ওর ঘোরাফেরা লক্ষ্য করছিল। আর একটা পেন্সিল, তারপর একটা দেশলাই তার ছোট্ট মুখে গুজে দিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আকস্মিকভাবে তার বাবা টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সে মেঝে থেকে ছিটকে উঠে পড়ল।

ডানা তার ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনতে পেল—কি হচ্ছে এসব?

—এটা, মানে—মানে—এটা একটা বেড়াল ছানা, বাবা।

—দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা, বাঁদর ছেলে কোথাকার! দেখেছিস্ কি করেছিস্ তুই। সমস্ত কাগজ-পত্র নোংরা করে দিয়েছিস্।

ডানা ভয়ংকর অবাক হয়ে গেল। তার বাবা তার মত বেড়ালটার প্রতি পক্ষপাত দেখালেন না। তার খুব একটা কিছু আনন্দও হোল না।

উপরন্তু তিনি ডানার কান ধরে চীৎকার করে উঠলেন, —হেপান এই হতভাগা বাচ্চাটাকে নিয়ে যা তো।

খাবার সময়েও এমনি একটা কাণ্ড ঘটল। যখন দ্বিতীয়বার পরিবেশন করা হচ্ছে তখন হঠাৎ একটা তীব্র মিঁউ মিঁউ শব্দ শোনা গেল। সকলে আসল ব্যাপারটার সন্ধান করতে লাগল। তারপর নিনার জামার তলে একটা বেড়াল বাচ্চাকে পাওয়া গেল।

—নিনা টেবিল ছেড়ে চলে যাও—তার বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"বেড়াল বাচ্চাগুলোকে তাগাড়ে

ফেলে দাও। আমি এই হতভাগা জানোয়ারগুলোকে বাড়ীতে থাকতে দেব না।"

ডানা এবং নিনা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। শেষে নিষ্ঠুরভাবে ভাগাড়ে মেরে ফেলা হবে বাচ্চাগুলোকে। তা ছাড়া আরো ভয় দেখান হোল যে বেড়ালটাকে আর কাঠের ঘোড়াটাকে জোর করে সরিয়ে নেওয়া হবে বাচ্চাগুলোর কাছ থেকে। তারপর বেড়ালের বাক্সটা নষ্ট করে ফেলা হবে।

অদূর ভবিষ্যতের জন্যে তাদের কত পরিকল্পনা ছিল। একটা বাচ্চা থাকবে মায়ের কাছে, বুড়ো মাকে সান্ত্বনা দিতে। আর একটা থাকবে বাগানে, আর তৃতীয়টা মাটির নীচের ঘরে ইঁদুর ধরবে। কিন্তু তাদের এ সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট করে দেওয়া হবে। তারা বেড়াল ছানাগুলোকে ছেড়ে দেবার জন্যে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, আর কান্না জুড়ে দিল। তাদের বাবা শেষে রাজী হলেন। কিন্তু এক সর্ত্তে, সেটা হচ্ছে তারা কেউ রান্না ঘরে যেতে পাবেনা, আর বেড়াল ছানার গায়েও হাত দিতে পাবে না।

খাওয়া দাওয়ার পর ক্ষুব্ধ হয়ে ডানা ও নিনা ঘর দুটোর চারদিকে হেঁটে মাথায় ঘুরতে লাগল। রান্না ঘরে যাওয়া নিষেধ হয়ে যাওয়ায় তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ল। তারা মিষ্টি-টিষ্টি কিছু খেল না। আর দুষ্টুমি করে মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করল। সন্ধ্যাবেলায় যখন তাদের কাকা পেট্রো এল, তাকে তারা এক পাশে টেনে নিয়ে গেল। তার কাছে তারা বাবার নামে নালিশ করে দিল। বাবাই তো বেড়ালছানাগুলোকে ভাগাড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।

—"কাকা মা'কে একটু বল না, বেড়ালছানাগুলোকে যেন নার্সারিতে নিয়ে যাওয়া হয়"—কাকার কাছে তারা মিনতি করল—বলই না একটুখানি।

—কাকা তাদের সরিয়ে দিয়ে বল্ল—"ওঃ, এই ব্যাপার। ঠিক আছে—ঠিক আছে সব।"

কাকা পেট্রো সাধারণতঃ একা আসেন না, একটা মস্ত বড় কাল কুকুর নীরো তার সঙ্গে আসে। সে দিনেমার জাতীয় কুকুর। কানগুলো ঝোলা-ঝোলা, আর তার ল্যাজটা লাঠির মতন শক্ত। কুকুরটা চুপ-চাপ থাকে। তার ভাবিভিকি চাল চলন। আর সে বদ মেজাজী।

ভাই-বোনের দৃষ্টির প্রতি কোন নজরই সে দেয় না। আর যখন সে ভাই-বোনের পাশ দিয়ে যায় সে তাদের গায়ে ল্যাজের ঝাপ্টা মারে, যেন তারা সব চেয়ার আর কি। ভাই-বোনে তাই তাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাস্তব বুদ্ধি প্রয়োগ করে তারা তাদের সে অনুভূতি সরিয়ে দিল।

—ডানা চোখ বড় বড় করে বল্ল—শোন্ নিনা, আমি বলি কি ঘোড়াটার বদলে নীরোকেই ওদের বাবা বানান যাক্। ঘোড়াটা তো মরে গেছে, কিন্তু দেখছিস্ নীরো কি রকম জ্যান্ত।

তারা সারাটা সন্ধ্যা অপেক্ষা করতে লাগল—কখন তাদের বাবা তাস নিয়ে বসেন। তখন বেশ নীরোকে নিয়ে রান্না ঘরে ঢোকা যাবে। কেউ দেখতে পাবে না। অবশেষে বাবা তাস নিয়ে বসলেন। মা স্যামোভার (samover) নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিশুদের উপর কেউ নজর রাখছিল না।

তাদের মজার সময় এসে গেল শেষকালে।

—"এই শিগ্‌গির আয়"—ডানা ফিস্ ফিস্ করে তার বোনকে বল্ল। কিন্তু ঠিক সেই সময় ষ্টিপান এসে হাজির। সে হাসি-খুশির সাথে বল্ল—নীরো বেড়াল ছানাগুলোকে মেরে ফেলেছে মা। ডানা আর নিনার মুখ শুকিয়ে গেল। তার ভীষণ ভয় পেয়ে ষ্টিপানের দিকে তাকাল।

—সত্যি, কুকুরটা সত্যিই মেরে ফেলেছে মা—ষ্টিপান হাসতে হাসতে বল্লো—"কুকুরটা বাক্সটার কাছে গিয়ে সবটাকে গোগ্রাসে—"

শিশুরা আশা করল যে এইবারে বাড়ীশুদ্ধ লোক বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং দুরাত্মা নীরোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু সকলে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই যে যার জায়গায় বসে রইল। কেবল অতবড় কুকুরটার ভোজন-প্রবৃত্তির ব্যাপারে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করল। বাবা আর মা হাসতে লাগলেন। নীরো টেবিলের ধারে ঘুর ঘুর করতে লাগল, ল্যাজ নাড়াতে লাগল। আর বেশ আরামের সাথে ঠোঁট চাটতে লাগল। কেবলমাত্র মা বেড়ালটাকেই অসুবিধায় পড়তে দেখা গেল। সে বেচারা তার ল্যাজ খাড়া করে ঘরের চারদিকে ঘুরতে লাগল। ঘরের লোকদের দিকে

সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল এবং অত্যন্ত করুণ-ভাবে মিঁউ মিঁউ করতে লাগল।

মা বলেন—"ন'টা বেজে গেছে, এখন তোমাদের ঘুমুবার সময় হয়েছে।"

ডানা আর নিনা শুতে গেল, তারা কাঁদতে লাগল। আর অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল আহত বেড়ালটার কথা, আর সেই নির্দয়, দুরাত্মা, শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া নীরোর কথা।

॥ অভিযান ॥

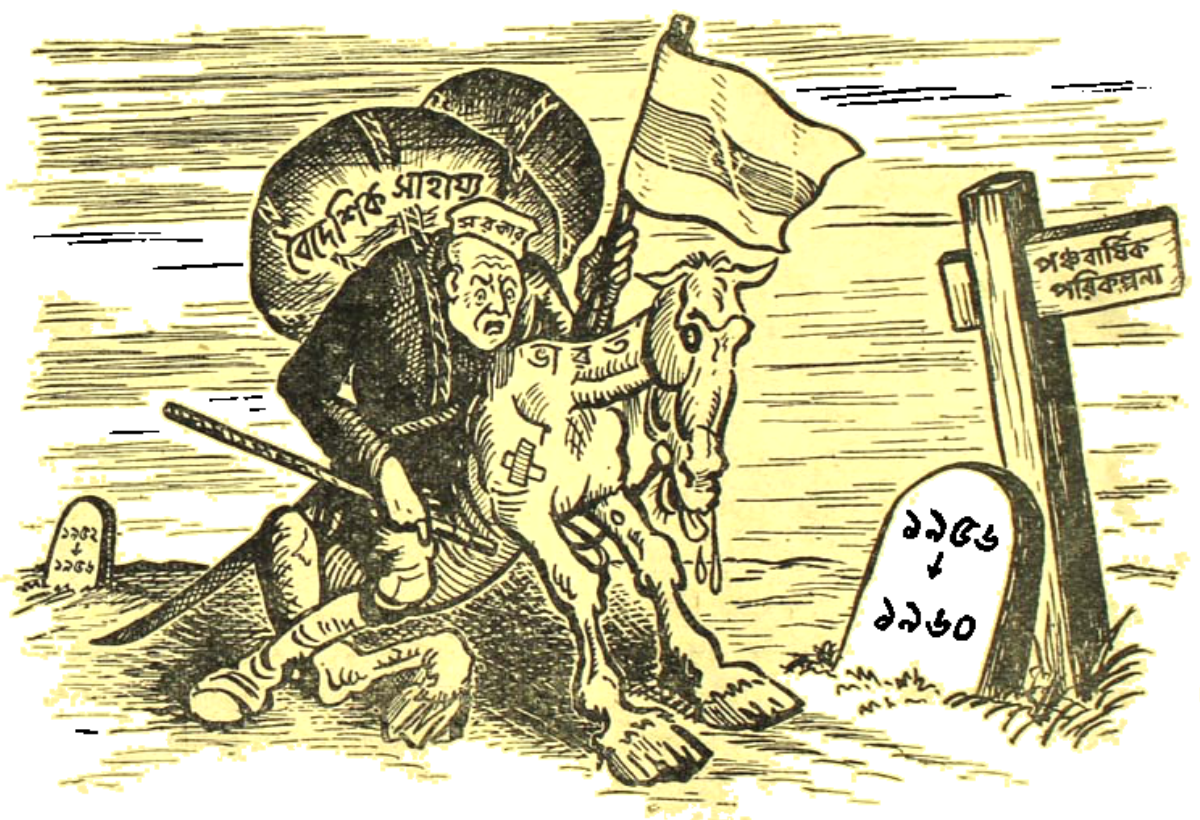

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

মেয়েদের কথা

আদর্শের রূপান্তর

আশাবরী দেবী বি-এ

দিনরাত্রির আবর্তনের মতোই এ জগৎ ও জীবনের আলোক ও অন্ধকার দুই দিকই অস্বীকার করার উপায় নেই। একদিকে জীবন, একদিকে মৃত্যু—একদিকে ঐশ্বর্য, একদিকে দারিদ্র্য—বিশুদ্ধ জ্ঞান আর চরম অজ্ঞানতা—পুণ্যের জ্যোতি আর পাপের বীভৎসতার অপরূপ জটিল গ্রন্থি দিয়েই রচিত হয়েছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের বিরাট প্রহেলিকা। উপনিষদের ঋষিরা কণ্ঠে উচ্চারিত—'তমসো মা জ্যোতির্গময়।'—এই বাণীই মানব-চৈতন্যের পরম আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক-রূপে চিরকাল ধ্বনিত হয়েছে এবং মর্মে মর্মে অভিমুখে।

যুগে যুগে ঘটে আদর্শের রূপান্তর সমাজ ও সংসারে। কালের রথের অনোঘ গতিচক্রে নিয়ম ও নীতির নিগড় কেবলই ভেঙে পড়ে সমাজ সংসারের। কিন্তু মানবাত্মার চিরসাধনার ধন 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' চিরদিনই তার অন্তরে আদর্শ-রূপে বিরাজ করবে। বিশাল বিশ্ব-সংসারে কতো বিচিত্র বেশ সমাজ ও জাতির জীবন-কল্লোলে তরঙ্গ তুলছে—কে তার হিসাব রাখে। দেশ-বিদেশের কথা যা সাত সাগরের ঢেউ-খেলানো জল যার ঘিরে সারা ভারতের অলি-গলিরই কি খবর কেউ রাখে? নাগা-সাহাড়ে, খাসি-পাহাড়ে আর ভারতের আরও, কতো বিচিত্র জাতির জীবন ও সমাজের কতোটুকু সত্য-জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিচয়ের মধ্যে পৌঁছায়? বাস্তবিক আমাদের এই আজন্ম-পরিচিত বাঙালী-সমাজেরই কতোটুকুই বা জানতে পারি? ঐ বঙ্গী-সমাজের জীবন ও সমাজকে অহরহই নিষ্পেষিত করছে যে দারিদ্র্য, পঙ্কিলতা, অশিক্ষা আর তার মূল পাপ ও ক্লেদ-বিষ্ণুরের অজগর—তার চিত্র, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত বা অন্য কোনও সৃষ্টি তলায় সাধ্য নেই ফোটাবার। যদিও সেখানেও প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি-রাগ সবই আছে এবং উঁচুতলার চাইতে ঢের বেশী জীবন্ত ভাবেই তার প্রকাশ। পাঁকের মধ্যে পদ্মফুল যে তলদেশেরই লীলা। আলোক অন্ধকার তো পড়েই দুই দিক। তাই বলে মানুষ চায় না অন্ধকারে কানমলা খেতে। জীব-জগতের অপর প্রান্তী হ'তে এই খানেই তার হুমায়ুন—এইখানেই তার প্রেরণা। বিধির অপূর্ব দেওয়া-নেওয়ার বলে মানবাত্মা আপনাকে কতোবার ফিরেছে পরমাত্মার অংশ বলে—সৌর-সম্রাটকে আপন জেনে বলেছে—'হে আদিত্য—ঐ আলোর আবরণ উন্মোচন করে যেথাও তোমার স্বরূপ।'

আদর্শের রূপান্তর ঘটতে পারে তবে তার স্বরূপ চিরন্তন। আর্য-সভ্যতা কিংবা গ্রীক্-সভ্যতার ঘটেছিলো মানুষের মহৎ তপস্যার পূর্ণ বিকাশ—তাই আজও আধুনিক জগৎ-সাহিত্যে শিল্পে সেই রসাস্বাদনে তৃপ্ত।

দুই মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব-নীতির বেসুরো ঝনঝন্ শব্দে জেগে পড়ছে প্রত্যহ। চাকা ও পাখার গতিবেগ বিশ্ব-জীবনে এনেছে অদ্ভুত চাঞ্চল্য। স্পুটনিকের আবর্তনে সারা জগতে লেগেছে দোলা। কিন্তু বিশ্ব-সভ্যতা-সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র ছিটমহল বাঙালী সমাজে এই প্রচণ্ড দোলা কি কেবল ভাঙনেরই সৃষ্টি করবে?—'সত্য বেদুকাদ্। কি বিচিত্র এই দেশ!' বিদেশীর এ উক্তি আজও সত্য আমাদের দেশে। এমন ভিক্ষুকের দেশে এমন রাজরাই কাণ্ড ক'টা কোথায় দেখেছে চিরস্বাধীন দেশের স্বাধিকার বঞ্চিতরায় বলিষ্ঠ মানুষ? হিউয়েনসাং সম্রাট হর্ষবর্ধনের অতুলনীয় দানের পরিমাণে অথবা ভিক্ষুকের অপরূপতায় বিস্মিত হ'য়েছিলেন তা ইতিহাসের ছেলেরাই জানেন।

ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানা যায়—নদীমাতৃক সুফলা বাংলার মানুষ অতীতে ক্ষুধার অন্ন, পরণের বস্ত্রের সঙ্গে মনের সাংস্কৃতিক আনন্দের অভাবও বোধ করেনি। আজ খণ্ডিত বাংলা হয়েছে ভিক্ষুকের দেশ। এই অবরুদ্ধ জীবনের তলানিটুকু কেবলই বাঁচার ক্ষেত্র হ'তে সরে আসছে। তার বিকীর্ণ দিন জলে কোথায় সেই প্রাণ ও কর্মের চাঞ্চল্য—যা চাকা ও পাখার সঙ্গে তাল দিয়ে এগিয়ে চলেছে সারা বিশ্ব। কই সেই জীবনী-শক্তির প্রস্ফুরিত স্ফুলিঙ্গ—যা চাঁদ তৈরী করে আকাশে ছোটে। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'ওরা বিশাল বট-বৃক্ষের মতো—ক্রটির সঙ্গে আছে পুষ্ট।' আমাদের জন্ম জন্ম পরাধীনতার দুরারোগ্য রোগে পাণ্ডুর দেহকে কে দেবে উপযুক্ত পথ্য এই সব রোগ-মুক্তির সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে? বাংলাকে আজ বর্জন করতে হবে ভুলনা ও অনুকরণের বিষ্ঠা আত্মপ্রসঙ্গ। পরম জননীর বাণীবন্দনের জন্য ছুটে-ছিলেন অমৃতের সন্ধানে। সেই অমৃতময় নবসমাজ গড়বার দায়িত্ব ভারতের বিশেষতঃ বাংলার মেয়েদেরই। ভারতীয় আলোকপ্রাপ্ত নারী আজ আত্মবিস্মৃত—ইঙ্গ-লিপ্‌স্টিক শিফন নাইলন আর পার্টি সিনেমার মোহে আচ্ছন্ন সব। বাঙালী মেয়েও কি মেতে আসবে তাদের অনুসরণে? বাংলা আজ 'সুন্দরবন কাঙালিনী মেয়ের' দেশ—সেখানে কি মাস্ক্-ফ্যাক্টর বা এলিজাবেথ আর্ডেনের চর্চা বাড়কাকের মধুপুচ্ছের মতোই নয়? পতাকার নবনবীনতা আর আত্মানুশীলনের যেন আয়তন—তার সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল বাংলার সংস্কৃতি। এর উত্তরাধিকার বাঙালে

কেন বাংলার মেয়ে? সেই প্রাচীন সংস্কৃতির তরঙ্গ আজও বাঙালী সমাজের নীড় হতে ওপর পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে। লক্ষ ভাঙা-কুঁড়ের খড়ের ঘর আগলে আজও রাখে শত দুঃখে। কে ভুলবে বাঙালী কবির সেই গভীর আত্মবিচারের বাণী—'আপনার হৃদয়ে ভুলি…' আর তাঁর সেই শেষ নিবেদন—'রেখো মা দাসেরে মনে!' এর পেছনে রয়েছে দুঃখ-লক্ষিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। বাংলার মেয়েরা যদি বাহিরের সেই চেতনা বহনীয়তার বিপুল বলে আবার জাগিয়ে না তুলতে পারে তো বাঙালীকে কে বাঁচাবে?

সমাজ ও সংসার চায় নারী—কেবল নায়িকাকে নয়। চৌষট্টি কলা প্রাণ-শক্তিতে ভরা জীবন-তরঙ্গেই ফুল হয়ে ফোটে। কর্মের মধ্যেই যেমন অবসর মূল্যবান—তেমনই বাহ্য ছাড়া সৌন্দর্য ফোটে না—মঙ্গল ছাড়া সৌন্দর্যে দেখে না স্বর্গের সুষমা। প্রাণময়, কর্মময়, বহনীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতি গড়তে চায় অনুরূপ সমাজ। সংসারই সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূল ভিত্তি, আর সমাজ-বন্ধনের প্রথম কারিগর হলো মেয়েরা।

আজ এই সীমানা-ভাঙার যুগে আদর্শেরও রূপান্তর ঘটবে, এ স্বাভাবিক। বাহিরের দিকে আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন অন্তর-প্রকৃতিকেও স্পর্শ করে। মেয়েদের যে-প্রকৃতি বহু সংসারের উপযোগী ছিলো এতোদিন—সে তো আর জড়পদার্থ নয়। যুক্ত সংসারে তা অচল হয়ে থাকতে পারে না। জীবনের বিস্তৃততর ভূমিকায় আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য তার বিশেষ বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও রুচি-চর্চার একান্ত আবশ্যক। ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাঙালী মেয়ে বহুদিন হলো এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—বিশ্বমানবী হবার পথে। এখানে কোলাহল আছে—উত্তাপও আছে—কিন্তু এই বৃহৎ বিশ্বসংসারের গ্রন্থি-বন্ধন করার যোগ্য যোগাযোগের মহান আদর্শের দীপটি আজও জ্বালেনি। বাঙালী মেয়ের সকল বৈভব—বাক্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব আর আনন্দের অভাব-মোচনের সঙ্গে জেগে উঠুক অন্তরের আলো। সেই দীপ হ'তেই ভারতের সকল ঘরে ঘরে উঠবে দীপাবলী উৎসব। ঐ উৎসবের আলোর শিখা লাগবে বিশ্বসংসারে। বাংলার মেয়ের পথ নয় বিশ্বের আধুনিকার যান্ত্রিক প্রগতির প্রদক্ষিণ পথ—তার যাত্রা শুরু হোক প্রাণের আত্মপ্রসার ও সমৃদ্ধির পথে।

সৌন্দর্য্যানুশীলনে মেয়েরা

শ্রীসুলোচনা দত্ত

"ভারতবর্ষের ১৩৬২র গত মাঘ সংখ্যায় শ্রীযুতী অনামিকা দেবীর "সাজসজ্জায় শালীনতা" প্রবন্ধটি পড়লাম—তাঁর কথাগুলি ভাল, কিন্তু সব বিষয়ে আমি এক মত হতে পারলাম না। পোষাক-পরিচ্ছদ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, নিঃসন্দেহে তা মূল্যবান।

তিনি বর্ত্তমানের যে অন্তর্বাসের লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা বলেছেন তা পরিমার্জিত রুচিসম্পন্না মেয়েদের কাছে সত্যিই বেদনাদায়ক, তারপর ব্লাউজের সম্মুখ ভাগের সব-টুকু অংশ আঁচল দিয়ে না ঢাকার উগ্র আধুনিকতাও অসহ্য। কিন্তু তিনি কাজল বা সুর্মা, নখ ও ওষ্ঠাধর-রঞ্জিকা ইত্যাদি বস্তুগুলিকে উক্ত আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কেন করেছেন তা বুঝলাম না; আর আপাতদৃষ্টিতে এটি পাশ্চাত্যানুকরণ বলে মনে হলেও আসলে অন্যান্য জিনিষের মতো পুরাতনের প্রত্যাবর্ত্তনও হতে পারে—কারণ প্রাচীন বরললনাদেরও অধর অলক্তক-রঞ্জিত হতো এবং তা জানতে পারা যায় সাঞ্চীধরের স্তোক থেকে। যাই হোক, নিজের দেহকেই বলুন, আর গৃহ ও পরিবেশকেই বলুন—সুন্দর করে তোলা কি অপরাধ?

নারীর নিজ দেহ প্রদর্শনের ঘৃণ্য প্রয়াসের মতো এ-গুলি তো বিসদৃশ নয়, শুধু সুন্দর হওয়ার বা সুরুচির প্রকাশ মাত্র।

এ-গুলি, যেমন:—ওষ্ঠাধর ও নখরঞ্জিকা, সুর্মা বা কাজল ইত্যাদি ব্যবহারে যদি পুরুষের লালসায় ইন্ধন যোগানো হয়, তাহলে আমি বলবো, আমাদের এতদিনের সভ্যতা ও শ্রমসাধ্য শিক্ষা ব্যর্থ, এতে শুধু মুখোসটি হয়েছে সুকঠিন, ভেতর রয়েছে যথাপূর্ব্বং তথা পরং।

বিশ্বস্রষ্টা বিধাতাও সৌন্দর্য্যসাধক, তাই তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতিকে দেখে জাগ্রত হয়েছে আমাদের সুরুচিবোধ; সেই জন্য, সৌন্দর্য্যসাধনা নিন্দনীয় নয়; আর এর পেছনে কোনো কদর্য্যতা ও কোনো কুৎসিত উদ্দেশ্যও থাকে না।

লাউ ব্যাস্‌রা

উপকরণ—লাউ, মৌরি, সরিষা, তেজপাতা, পরিমাণ মত লবণ, সামান্য চিনি বা গুড়, সরিষার তৈল, অল্প ঘি, এক কুড়ি মত) ও মটরডালের বড়ি অভাবে মটরডালের বড়া হলেও চলবে।

প্রথমে খোসের চাটনির খোপে-কুচির মত সরু সরু করে লাউটিকে কুটে নিতে হবে। তারপর কড়াতে তেল দিয়ে বড়ি বা বড়াগুলি ভেজে তুলে রাখুন। তারপর সেই তেলে লঙ্কা তেজপাতা সরিষা মৌরি ফোড়ন দিয়ে লাউগুলি ঢেলে দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাকুন, লাউগুলি খানিকটা কমে গেলে অল্প হলুদ-মৌরি-সরিষা বাটা এবং নুন, মিষ্টি ও ভাজা বড়িগুলি ভেঙে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। হয়ে গেলে সামান্য আটা ছড়িয়ে দিয়ে ও একটু ঘি দিয়ে নামিয়ে নেবেন। লাউ ব্যাস্‌রা যেন শুক্‌নো শুক্‌নো না হয়, একটু বেশ গা-মাখা মাখা থাকিতে নামিয়ে নেবেন।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্ত্তী

প্যাটার্ণ—

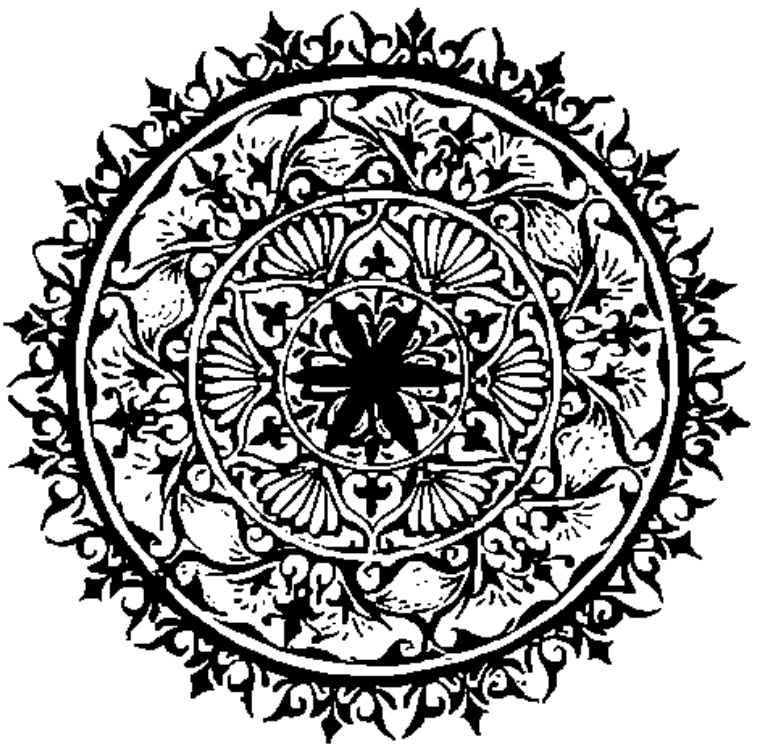

শিল্পী : কানাইলাল চক্রবর্ত্তী

সাময়িকী

অতুল দত্ত

মধ্যপ্রাচ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যাবার ঘড়ের মত কাজ করতেছে, তাহাদের অধিকাংশেরই সীমানা কৃত্রিম। ইহাদের অনেকের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এবং সে অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়া আসিতেছে সাম্রাজ্যবাদীর প্রয়োজনে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তুরস্ক সাগরের পূর্বদক্ষিণকূলবর্তী আরবরা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পাইয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহারা স্বাধীনতা লাভের পরিবর্তে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বুটের নীচে নিষ্পিষ্ট হইল, এবং ঐক্যবদ্ধ আরব জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিবর্তে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। "...virtually all Arabs...believe that Britain and France double-crossed them after the First World War, when instead of the united empire of their dreams they were given a set of arbitrary frontiers and—for the most part—not even independence.—(Manchester Guardian. 1-1-58) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরব জগতে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরব জনগণের মনে স্বজাতীয়দের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার আগ্রহ স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসকশ্রেণী এবং তাহাদের পাশ্চাত্য অনুগ্রাহকরা আরবদের এই আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। গত বৎসর এপ্রিল মাসে জর্ডানের রাজা হুসেন্ তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন তাহার রাজ্যে আরব ঐক্যের আন্দোলন উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে; গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার এই স্বেরাচারী আঘাত আমেরিকা সমর্থন করিয়াছিল।...The slogan of the Nebulsi Government—the first in Jordan to be elected by popular vote—was 'Jordan's destiny is to disappear', and Nebulsi's proposals for educational union with Syria were one of the main causes of the royal coup d' etat last April. (New Statesman. 8-2-58).

মিশর-সিরিয়া মিলন—

ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আরব জনগণের এই আগ্রহ গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লইয়াছে সিরিয়া ও মিশরের মিলনে। সমগ্র আরব জগতে এই দুইটি সাধারণতন্ত্রই অত্যন্ত প্রগতিশীল। বস্তুতঃ, সাম্প্রতিক কালে মিশরের রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন বুদ্ধিজীবী আরব যুবকদিগকে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সিরিয়াতে সম্প্রতি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিশর ও সিরিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এক নৌকিক সংযুক্ত রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে; নূতন রাষ্ট্রের নামকরণ হইয়াছে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। গত ১৯৫৬ সালে মিশর যখন বৃটেন, ফরাসী ও ইস্রাইল কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সিরিয়ার ও মিশরের সেনাবাহিনীর সম্মিলিত কমাণ্ড গঠিত হইয়াছিল। এখন দুইটি রাজ্যের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক সত্তা বিলুপ্ত হইল। সম্প্রতি ইয়েমেন্ সংযুক্ত-আরবরাষ্ট্র যোগ দিয়াছে; প্রস্তাবিত সাধারণতন্ত্র দুইটির মিলনে উহার সংযুক্ত রাষ্ট্রটির সহিত সামন্ত-তান্ত্রিক ইয়েমেনের মিলন কোন্ ভিত্তিতে হইবে, তাহা এখনও অস্পষ্ট।

সিরিয়া ও মিশর সম-সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র নহে, ইয়েমেন্ আরও দূরবর্তী। সুতরাং, বাস্তব রাজনীতির বিচারে এই মিলন কৃত্রিম মনে হইবে। কিন্তু আরবদের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সহিত ইহার নৈতিক যোগ প্রগাঢ়, এবং ইহা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী বিশাল আরব সংযুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার সূচনা। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আরব জনগণের অক্ষুণ্ণ একতা-বোধ এবং নবোদ্বুদ্ধ আরব বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা। সিরিয়া ও মিশরের মিলনকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে দেখিলে ইহার প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে না,—ইহা সমগ্র আরব জাতির স্বাভাবিক প্রবণতার প্রথম অভিব্যক্তি, কৃত্রিম রাষ্ট্রের সীমানাগুলির প্রতিক্রিয়া চক্রান্তের বিরুদ্ধে ইহা প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জ।

এই চ্যালেঞ্জের উত্তরেই প্রতিক্রিয়াশীল ওতাদ্ নূরি তৎপরতার সহিত পার্শ্ববর্তী ইরাকের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য লাফাইয়া পড়েন এবং ইহারই ফলে ইরাক ও জর্ডানের আনুষ্ঠানিক মিলন সাধিত হইয়াছে। আরব জাতির মিলিত হইবার স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের অধীনে এইভাবে রাষ্ট্রনৈতিক রূপ দিবার চেষ্টা হইতেছে। আগ্রহী আরব জনগণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হইতে মুক্তি চায়, সামন্ততান্ত্রিকতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চায়, এবং বিদেশের প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া আরব জাতির রাষ্ট্রনৈতিক মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। বাগদাদ চুক্তির সভ্য ইরাকের সহিত আইসেনহাওয়ার নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত জর্ডানের মিলনে আরব জনগণের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা জনশক্তির মিলন নহে,—আগ্রহী জনশক্তির বিরুদ্ধে রুখিবার জন্য প্রতিক্রিয়া শক্তির মিলন। তবে, আরব জনগণের ঐক্যবদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা কত প্রবল, তাহা রাজা হুসেনের উদ্যোগ এবং উহার তৎপরতার প্রতিফলন হইয়াছে। এখন কি সুদূরবর্তী মরক্কোর নৃপতিও ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী আরব রাজ্যগুলির মিলনের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৌদী—আরবের সহিত নিকটবর্তী তেল-রাজ্যগুলির মিলনের কথাও উঠিয়াছে, বস্তুতঃ, ভবিষ্যতে ভিউনিসের দক্ষিণ হইতে পারস্যোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আরব

সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য, তাহার পূর্বে বিভিন্ন আরব রাজ্যের অভ্যন্তরে বহু মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক হইবে।

ফরাসী বর্বরতা—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে টিউনিসিয়ার সীমান্তে সাকিয়েৎ-সিদি-ইউসুফ নামক সম্পূর্ণ অরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ফরাসী বিমানপক্ষ এক ঘণ্টারও অধিক সময়ের অবস্থার উপর পৈশাচিক ভাবে বোমা বর্ষণ করে। 'মিডি ফ্রেঞ্চ টাইম্‌স' এই বোমা বর্ষণের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "Three waves of French aircraft bombed and strafed this little Tunisian town. The crowds were an easy target···The school building was hit and the roof fell in on a class room. There were still books and little brief cases there tonight···outside were blood-stained doors that had been used as stretchers. এই আকস্মিক আক্রমণে নারী ও শিশুসহ অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতে পতিত হইয়া মারা গিয়াছে। এই বর্বরোচিত অত্যাচারের পর টিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বরগুইবা বলিয়াছেন যে, অতঃপর টিউনিসিয়ার ফরাসী সৈন্যের অবস্থান তাঁহারা আর সহ্য করিবেন না। ১৯৫৫-৫৬ সালের ফ্রান্স-টিউনিসিয়া চুক্তি অনুসারে এই রাজ্যে মাত্র ১৫০০ ফরাসী সৈন্য অবস্থান করিতে পারে, এবং বিজার্টার নৌঘাঁটি ফ্রান্সের হাতে রহিয়াছে। প্রেসিডেন্ট বরগুইবা বলেন, "It is no longer possible for an army which allows itself to tread on our dignity to remain in Tunisia. The struggle to have that army withdrawal has begun. We demand that this withdrawal be complete, including the area of Bizerta. We can no longer trust a army which has given us bloody lesson." তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সাকিয়েৎ-সিদি আল্‌জিরিয়ান্ বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ছিল; সুতরাং, এই গ্রামে বোমা বর্ষণে কোনও অপরাধ হয় নাই। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ গাইয়ার দাবী করিয়াছেন যে, টিউনিসিয়া যদি (আল্‌জেরিয়ান্ বিদ্রোহীদের সহিত) এই "সহযোগিতার" নীতি ত্যাগ না করে, তাহা হইলে ফ্রান্সে তাহার "প্রতিক্রিয়া" হইবেই থাকিবে। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে, টিউনিসিয়া-আল্‌জেরিয়া সীমান্তে আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার যে প্রস্তাব বরগুইবা করিয়াছিলেন, ফরাসী গভর্নমেন্ট তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। এমন কি এস্-আর-পি (ও-গলের দল) কংগ্রেস সীমান্ত অঞ্চলে পরিদর্শনচ্ছলে ফরাসী ও টিউনিসিয়ার সৈন্যের পেট্রলের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। আল্‌জেরিয়ার বিদ্রোহীরা যে সময় সময় টিউনিসিয়ার অভ্যন্তরে আসিয়া তাহাদের স্বজাতীয়দের নিকট আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সীমান্ত উন্মুক্ত থাকিলে মুক্তিকামী আল্‌জেরিয়াবাসীর প্রতি টিউনিসিয়াবাসীর সহানুভূতির এই সক্রিয় অভিব্যক্তি রোধ করা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ফরাসী গভর্নমেন্টের অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে কষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন যে, আল্‌জেরিয়ান্ বিদ্রোহীরা এক সপ্তাহ পূর্বে সাকিয়েৎ-সিদি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের পরিত্যক্ত আশ্রয়স্থলগুলিতে ফরাসী বিমান একটি বোমাও নিক্ষেপ করে নাই। টিউনিসিয়া সীমান্তের বেসামরিক অধিবাসীদিগের মনে ত্রাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই বাছিয়া বাছিয়া ঘাঁটিবার সময়ের অবস্থার উপর বোমা বর্ষণ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, এই অত্যাচারকে ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগে পুলিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের সহিত তুলনা করা চলে।

উহার অর্থনৈতিক চুক্তি সংস্কার (রাটিফাই) সম্রাজ্যে ফ্রান্স যে সামরিক সাহায্য পায়, তাহা সে তাহার সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয় বলিয়া বহু অভিযোগ হইয়াছে। কিন্তু তাহার সামরিক জোটগুলি তাহাকে বর্ণপাত করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। সাকিয়েৎ-সিদিতে যে বিমানটি বিমান বোমাবর্ষণ করিয়াছিল, তাহা সরবরাহ মার্কিন বিমান। এই সম্পর্কে 'মিডি ফ্রেঞ্চ্‌ম্যানের' নিম্নলিখিত মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত: "The majority of the aircraft used were supplied by America under N.A.T.O.···What is worse, the attack was launched less than a week after Washington accorded France a further loan of $650 Million, which both parties were fully aware would be used to prolong the war. Must we be surprised, then, if the uncommitted nations regard the western alliance—and especially N. A. T. O.—as a system of outdoor relief for indigent imperialists"

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেন্ট—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্য সুমাত্রার বিদ্রোহী নেতা কর্ণেল হুসেন্ ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা মধ্য সুমাত্রায় ইন্দোনেশিয়ার নূতন কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৎপূর্বে তিনি আর্কার্তায় কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে দাবী দিয়াছিলেন যে, সুমাত্রা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে, প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো এই মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁহার সমর্থন প্রত্যাহার করিবেন, এবং তাইপ্ প্রেসিডেন্ট ডাঃ হাট্টা ও জোগ্‌জাকর্তার সুলতানকে লইয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে নূতন জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠিত হইবে। এই দাবী অগ্রাহ্য হওয়াতেই কর্ণেল হুসেনের এই ঘোষণা।

কর্ণেল হুসেন, মধ্য সুমাত্রার ভূতপূর্ব সেনাপতি কর্ণেল সিম্বোলিন প্রভৃতি সামরিক নেতারা বাটাক বিদ্রোহী দলে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব বলের অন্যতম নেতা ডাঃ হুকুদীন ও ডাঃ সুমিত্রোর নাম উল্লেখযোগ্য। দুইজনই খৃষ্টধর্মাবলম্বী; ডাঃ সুকুদীন ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের

প্রাক্তন গভর্নর, এবং ডাঃ সুদিয়ো প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। ডাঃ নসুশীন বিদ্রোহী গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন। গত ১৯৫৯ সালে ডিসেম্বর মাসে সুমাত্রায় যে সামরিক বিদ্রোহ দেখা দেয়, বিদ্রোহীদের প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেন্ট তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি। ডাঃ সোয়েকার্ণোর নীতির বিরোধী রাজনীতিকদের সমর্থনে গত এক বৎসরে বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৬ সালের বিদ্রোহের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে দায়ী করিয়া বাসমুমি সমেত সাম্প্রদায়িক দলটি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন, ইহার ফলে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যায়। ডাঃ সোয়েকার্ণো তখন শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া সম্মিলিতভাবে শাসনকার্য পরিচালনার এবং এক পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। এই পরিকল্পনায় দেশের প্রধান দলগুলিকে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলা হয় এবং দেশের কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী শ্রেণি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ডাঃ সোয়েকার্ণো বলেন যে, গভর্নমেন্টের উচ্ছেদের জন্য বিরোধী পক্ষের যে সমালোচনা, তাহা ইন্দোনেশিয়ার প্রকৃতিবিরুদ্ধ··· "Indonesia should be governed in a spirit of 'gotong-rojong', mutual assistance : the essence of family life and the purest reflection of the Indonesian soul". সমস্ত বৃহৎ দলকে (কম্যুনিষ্ট দল সহ) এক মন্ত্রিসভায় সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, "I ask you in the calmest possible manner : Can we afford to continue to ignore a group which in the general elections won six million votes (communists) ?··· to me there is no such words as 'left' and 'right.' I only warn the Indonesian nation to become united." রাজনৈতিক সঙ্কট দূর করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে সাম্প্রদায়িক দলগুলি ; কম্যুনিষ্টদের সহিত একাসনে বসিতে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হয় না। সাম্প্রদায়িক দলগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও ডাঃ সোয়েকার্ণো তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি সাম্প্রদায়িক-দলোদ্ভূত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া সাময়িকভাবে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। তাহার পর, গত বৎসর এপ্রিল মাসে ডাঃ জুয়ান্দার নেতৃত্বে "বিশেষজ্ঞদের" লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের আস্থাভার বাহিরে,—শাসনতন্ত্রের সহিতও সঙ্গতিবিহীন। বাসমুমি, নাহাতাবুল-উলেমা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলগুলি জুয়ান্দা-মন্ত্রিমণ্ডলকে সমর্থন করে নাই। বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের সহিত সাম্প্রদায়িকতাপন্থী কম্যুনিষ্ট-বিরোধী রাজনীতিকদের এক অংশের মিলনেই ইন্দোনেশিয়ার এই প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেন্টের উদ্ভব।

ডাঃ সোয়েকার্ণো শাসনতান্ত্রিক অন্তর্বর্তীকালে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেড় মাস পরে তিনি এই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে দেশে ফিরিয়াছেন জাকার্তায় ডাঃ জুয়ান্দার মন্ত্রিমণ্ডলকে সমর্থন জানাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কতকগুলি বৈদেশিক শক্তি ইন্দোনেশিয়াকে অথবা তাহার কতকাংশকে "শক্তি ব্লকের" অন্তর্ভুক্ত করাইবার জন্য চাপ দিতেছে। ডাঃ সোয়েকার্ণোর উক্তির সমর্থনে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নাই। তবে, লোকে বলে, গত বৎসর মে মাসে ওয়াশিংটনে মার্কিন-বিরোধী হাঙ্গামার সময় প্রাপ্ত একখানি গোপন দলিলে জানা গিয়াছিল যে, সুমাত্রায় ইন্দোনেশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। সম্প্রতি সুমাত্রার পাল্টা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, বিদ্রোহী নেতা মেজর পাকট্‌রের গতিবিধি গোপন রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও জানা গিয়াছে যে, তিনি এখন ওয়াশিংটনে অবস্থান করিতেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—ওয়াশিংটনের চিন্তা-চক্র আমেরিকার আশ্রিত ; এই কীর্তিও একটি মার্কিন কীর্তি। দ্বিতীয়তঃ, সোয়েকার্ণোর যে সুলতানকে লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের বার্তা কর্ণেল ডেন জানাইয়াছিলেন, তিনি ঠিক এই সময় মার্কিন মুলুকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন—ইন্দোনেশিয়া এখন একটি দেশ যেখানে কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক বিস্তার করিয়া জাতীয়তাবাদী ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের একত্র করা এবং তাহাদের সে মিলনকে বৈদেশিক শক্তিজোটের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। "কম্যুনিষ্ট"রা এখানে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীদের সহিত ঐক্যবদ্ধ ; ডাঃ সোয়েকার্ণোর ন্যায় রক্ষণশীলদেরও তাহারা বিচ্ছিন্ন করিবার বিরোধী। কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক ছড়াইয়া বিভেদ সৃষ্টি করা যে সব বৈদেশিক শক্তির স্বার্থ, তাহাদের নৈতিক যোগ ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রদায়িক দলগুলির সহিত। প্রধান জাতীয় নেতাদের মধ্যে ডাঃ হাতা কম্যুনিষ্ট-বিরোধী। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সাম্প্রদায়িক দল এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দল যদি ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলেই এই রাজ্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক শক্তির অভীপ্সিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ইন্দোনেশিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থায় (সিয়াটো) অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়া তাহারা সঙ্গতভাবেই আশা করিতে পারে। ৭।৩।৭৮

(১)

—শিকারা—

আমাদের বলটা বেশ বড়। যেখানে যাচ্ছি, তাই সুদ্ধ বলটা নিচ্ছিনা। কাশ্মীরের দিকে দিকে যাওয়াটা আমরা চারটে দলে ভাগ হয়ে করছি। এক এক দল এক একটা ডায়েরীর দায়িত্ব নিয়েছে এক একদিন। এমনি ভাগাভাগিতে সব দলেরই ঈপ্সিতস্থানের আগে পাশের সব জায়গা দেখা হয়ে যাবে, অথচ একটা জায়গায় একসঙ্গে বেশী ভীড় হবে না।

কিন্তু যাবে তারিখে প্রোগ্রাম ছিল সকলে মিলে। পুরো বলটা প্রায় তুলে নিয়ে একসঙ্গে শ্রীনগরের থেকে ছেড়ে সাত-পুল

কাশ্মীর সেক্রেটারিয়েটে আমাদের শিকারা

পরিক্রমা করে ফিরবে। এই আগে এই পরিক্রমা আমরা করেছি। কাজেই পরিক্রমা করার কোনও উৎসুক্য ছিল না। আগ্রহ ছিল সমগ্র দলের সঙ্গে যোগ দেবার। দুশো নৌকা নওয়ায় পাতায়, বিপাশে, ঝরার বেলুনে সাজিয়ে গান বাজনার ব্যবস্থা নিয়ে একসঙ্গে ঝিলমের বুক ছেয়ে ফেলবে। ছেলে মেয়ে, তরুণ তরুণী, যুবক যুবতী একেবারে গা ঢেলে দেবে প্রকৃতির পরিবেশে বন্ধুর নিতালীর সুরে, কল্পনা করবে একরকম,

তাই চোখে দেখবো ; শিটরিটানদের মন্ত্রাপত খিওরিকে চোখের ওপরে এক্সপেরিমেন্ট করা হবে ; একটা অভিনব উত্তেজনা।

সকাল বেলায় সেই যে বাইতে গেলাম রাম ধরিয়ে, তারপর আর শিকারা ছাড়িনি। জানতাম দেরী হবে আমাদের। ওরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে সকালে, হেঁটে মীরাকদল যাবে, সেখান থেকে শিকারায় চড়বে। বেশ দেরী হবে। আমরা তিনজন আলাদা শিকারায় ঝিলমের পালে দিবে, চিনার বাগের পাশ দিয়ে লোকা দিয়ে পড়বো মীরাকদলের পালে কাশ্মীর সেক্রেটারিয়েটের ঠিক উল্টো দিকে। অপর তীরে সারি সারি শিকারা সাজানো আছে। ছোটো ছোটো শিকারাগুলো আরও ছোটো মনে হচ্ছে। সাজানোর ফলে একটা কলক লেগেছে ওপারে। এপার থেকে অসিত ছবি নিলে। পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ হতেই একসঙ্গে সব শিকারা ছেড়েছিল। যে যাতে পেরে উঠে ঝিলমের বুক ভরে গেল শিকারায়। সে এক অদ্ভুত উৎসব লেগে গেল। কাশ্মীরে কেউ কখনও এই ধরণের উৎসব দেখেনি। কোনও শিকারায় গান, কোনও টাঙে বাজনা, কল-কল্লোল উঠলো ঝিলমের বুকভরে। ওয়াতের নবনাগরিক আজ বাসন্তী পরবে আরতি করলো ঝিলমকে, কাশ্মীরকে। "বাতায়ন খুলে যায় ঘরে" ধরে ঝিলমের দুই তীরে দুইচক্ষ বাসগৃহগুলির বাতায়ন খুলে যায়। শত শত সহস্র সহস্র চক্ষু পলক ফিরতে চেয়ে থাকে এই দৃশ্যের পানে। ঘাটে ঘাটে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, নারী, দর্শার ভীড়। কী অপরূপ লজ্জায় শত শত কিশোর-কিশোরী চলেছে ঝিলমের বুকে।

ওরা জানতে রাজধানীর ছেলেমেয়েরা নিয়ে এসেছে প্রাণের বন্যা ; জীবনের তুফান। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক-বোধ ও রাষ্ট্রিক-বোধ একত্রে সক্রিয়শিখা হলে কি অঘটন ঘটাতে পারে, কি শোভায় সুষমামণ্ডিত করতে পারে ভাতির জীব

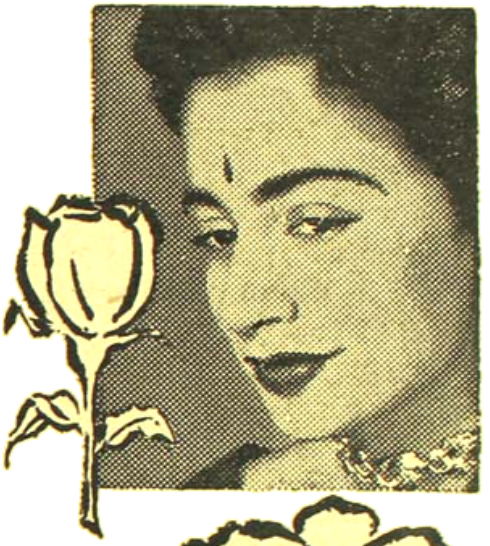

ফুলের মত
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের
জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

HP. 148-X58-BG

রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে, পক্ষে হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

সমাজকে এ যেন ওরা বিদ্রূপের তীব্র শরে রক্তাক্তকলায় প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছে।

আমি দেখেছি এই ভূস্বর্গের দুয়ারের ঘাটে ঘাটে ঘোরা ফেরা দেবদেবীর সস্তিত নরের দৃষ্টি; আমি দেখেছি প্রাচীন সংস্কৃতির বাহক সেই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের অবগুণ্ঠনবতী কিশোরী চোখের আলোয় ঝিকমিক করছে। আমি দেখেছি উনত্ত কাশ্মীরী শিশু স্নান ভুলে চেয়ে আছে সচ্ছিত্ত নৌকার দিকে। আর দেখেছি ক্ষুধা, ঈর্ষা, জ্বালা নেই চোখে। এতো আলো, এতো হাসি, এতো প্রাচুর্য, এতো ফুর্তি নিয়ে যারা আজ দেশের হাল কি এই ছেলেরই ছেলে মেয়ে? দুঃখ দৈন্য অত্যাচার, শোষণ আর অবহেলার মধ্যে থেকে কাশ্মীরের জনসাধারণ আজ চঞ্চলা, হাসিখুশি, আর শিক্ষাদীক্ষায় যেসেদিনার উপরিষ্ট। কাশ্মীরে শৈশব দেখেছি

সম্রাট কণিষ্ক

যুক্তি দেখিনি, তারুণ্য দেখেছি উচ্ছলতা দেখিনি, যৌবন দেখেছি দাম্ভ দেখিনি, বার্দ্ধক্য দেখেছি বিশ্রাম দেখিনি। সাধারণ চোখ দিয়ে সাধারণ ভাবে কথা এ নয়, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে এবং থাকবেও। কিন্তু পল্লীর মধ্য দিয়ে হেঁটেছি যাতে সহজ একটা খেলা, সহজ আনন্দের এক টুকরো ছবি, একটু অবসর বিলাস, একটু কৌতুক কলহ এমন কি একটা জোয়ালো ঝগড়া মারামারি চোখে পড়ে। তা পড়েনি, তার্থ হয়েছি। কোথায় যেন একটা অভাবগ্রস্ত জীবন ছন্দের মধ্যে বিচ্যুতি। যেন ঘাস চেঁছে উঠেছে একটা চাপা পাথরের আর পাশ দিয়ে ছোটে, সভ্য স্বাভাবিক পথের বিভাস নেই।

একটি বিভাস দেখেছি; সেটি ভিক্ষা। বৃন্দাবনের পথে ভিক্ষার একটা বৈদিক রূপ দেখেছি; সেখানে ভিক্ষা উপজীবিকা; জীবনযাত্র। কাশীর বিশ্বনাথ গলিতে ভিক্ষা দেখেছি যেন সামাজিক একটা স্তর, কিন্তু কাশ্মীরে ভিক্ষুকের ভিক্ষার রূপ অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণ করতে আমার সময় লেগেছিল। এরা যেন ভিক্ষাকে পেয়েছে ওদের জীবনধর্মের পথে পাথেয় হিসাবে অধীকার করে। যেমন পাথেয় অধীকার করা হল কাশ্মীরের ভরসা হয়ে কাশ্মীরের জীবনকে একটা সুষমা দিয়েছে, তেমনই যেন শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের ঘুঁটি খেলার ঘাতে ঘাতে ছেয়ে এদের রক্তের মধ্যে "দাও গো দাও" ধ্বনি বেরিয়ে এসে কাশ্মীরী সমাজের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষা দাও বলতে পারে না এরা, বলে "বখশিস দাও।" দীর্ঘপথ উনত্ত কিশোর যৌবনমুগ্ধ মুখ তুলি "বখশিস দাও।" চলে যাচ্ছে সোনালিমী মাখায় করে সুখের ঘট।

নাগার্জুন—তাঁসি লাম্পো গুহায় রক্ষিত আলেখ্যের প্রতিলিপি

তার হাতে ধরা ছেলেটাকে সে ছেড়ে দেয়, ফলে 'বখশিস।' এই চাওয়ার মধ্যে কোথা একটা বিনয়, একটা অনভ্যস্ত হীনতা, তার কণাটা আমি বোঝাতে পারবো না, তার কখনও কোথাও দেখিনি। এদের professional beggars বলবো না, বলবো cultural বা sociological beggars. ইংরেজরা কাশ্মীরী ভিক্ষুকদের প্রসঙ্গে কাশ্মীরীদের লোভ ও দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক কথা তাদের লিখেছে। ওরা কখনও কোনও দিন হাত দিয়ে তো আমাদের কথা বোঝার চেষ্টা করেনি। তাই ওদের মুখ শাস্তি পুরোপুরি না হলেই ওরা চিকিচিকিয়ে উঠেছে। সাহেব সিগারেট টানছে, মেম ঐঁচেন, পরে ঘোড়ায় চলেছে, পথ ছাড়া নিবিড়, মুগ্ধ কুয়ার জলের মতো থেকে, যদি ঘোড়া ছেলেটা এসে বলে 'বখশিস'—সাহেব বিরক্ত হবেনই। মৈলে এদের এই দুঃখ

দুর্ঘশার কথার এতোটুকু সহানুভূতি না দেখিয়ে এ কথা লেখে কি করে? "The people of Kashmir are described as good looking, easy and fickle in manner, effiminate and cowardly in disposition, and naturaliy prone to artifice and deceit. This character they still bear; and to it I may add that they are the dartiest and most immoral race in India.

যে সে লোকের কথা নয়; স্বয়ং বার্নিয়ের ক্যানিংহামের উক্তি।" কাশ্মীরী সুন্দর; সহজে হাসে, আর রীতি সম্বন্ধে বেশি খুঁৎখুঁৎ করার ধার ধারে না। কাশ্মীরীদের মধ্যে পুরুষ থাকলেও নামেই, কাপুরুষই বেশি—আর তারী পুষ্টি হল মোক্ষোরী করে কিছু গাঁও মারার। আজও তারা সেই-কে-সেই, অধিকন্তু বলা যায় অমন মোংরা আর হিনাল আর দুনিয়াতে দ্বিতীয়টী নেই। সুন্দর ওরা, রীতি নেই, হিনাল চরম—সাহেব লিখলেন। কিন্তু কাশ্মীরে সাহেবরা যুগ যুগ থেকেছেন। তাদের প্রাচুর্যের বিনিময়ে ওদের ক্ষুধার অন্ন যুগিয়েছেন, ওদের সৌন্দর্য্য আর কাপুরুষতার মাধ্যমে। মূলধন-বিহীন একটী এই ব্যবসায় কাশ্মীরী করেছে কতো বিলকার অরকে বীকার করে তা সাহেব জানতে চাননি। আমার ইচ্ছা করে, জানতে ইচ্ছা করে Anglo, Goths, Vikinge আর রোম্যান্সের আদলের ইংরেজের বৈষ্ণিক পরিপুষ্টি কতটা ছিল।

হরবনমুখ—পর্বতের ঢেরে ঘেরা মনোহর

অথচ বেনীবিনোর কথা নয়। জাহাঙ্গীর নিজে তাঁর রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন—"They do not loosen their tongue of calumny against those not of their faith, nor beg, nor importune. They employ themeelves". কাশ্মীরীরা বিধর্মীদের সম্বন্ধে কটুক্তি করেনি কখনও, ভিক্ষা জানেনা, অনুগ্রহের প্রত্যাশী ছিল না। খাটতো খেতো—এই তাদের জীবন। স্বয়ং সম্রাট এই কথা লিখেছেন। অথচ জাহাঙ্গীর থেকে ক্যানিংহামের মধ্যে কী প্রভেদ! হবে না কেন? আফগানরা লুঠের পর লুঠ করেছে, শিখেরা লুঠ করেছে, ডোগ্‌রারা লুঠ করেছে, মোগলও গেল, কাশ্মীরও গেল চিরকালের অত্যাচারের কবলে। মানুষকে এই অত্যাচার নিকৃষ্ট জীব করে তুললো। তারপর এলো বিদ্রোহ, কাশ্মীরের জনজাগরণ। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগ। নবজাগরণ রচনার প্রথমে কাশ্মীরের স্থান এখন অনেক উঁচুতে। কাশ্মীর অতীতকে ভেঙেছে, ভবিষ্যতের পানে তার আগ্রহ।

এখন কাশ্মীর জাগছে। জনতা এখন সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ, শিল্পবাণিজ্যে মনোযোগ দিচ্ছে। কাশ্মীর ভারতভুক্তির পর একটা নতুন উদ্দীপনা দেখা গেছে। কিন্তু সেই উদ্দীপনা পুরানো অন্ধকারকে একদিনে, একযুগে দূর করতে পারেনা, পারেনি। আজ কিনারের বুকে ডাঙ্গার এই চমক লাগানো উল্লাস প্রত্যক্ষ করতে ওরা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছে কিনারের দুই তীরভূমিতে, গাছের ছায়ায়। ওদের চোখে যেন নতুন দেশের নতুন খবর, নতুন আশার বাণী। ছোট বাচ্চাটী মার বুক থেকে দুধ খাচ্ছে, একটা চোখ ঢাকা, একটা চোখ খুলিয়ে দেখছে আমাদের। মা শিশুকে বুকে যখন চেপে ধরেছে তখন কি ভাবেনি একদিন গঙ্গার বুকে, গোদাবরীর বুকে এমনি করে ভেসেওছে গান গাইতে গাইতে যাবে?'

গান গাইছিলো প্রায় প্রতি নৌকাতেই। একটা নৌকার গান ভেসে আসছে সামনে চলে যাইছিলে, তুফান তারী, ঢেউ তুফান: মাঝি ধরিয়া পাড়ি এটা, অতো জোরে বেওনা।' এরা ছেলের দল। সামনে পাশা দিয়ে এইমাত্র মেয়েদের একটা নৌকা বেরিয়ে গেল। গান আরও জোরে চলছে। ও নৌকা থেকে গান এলো—"পাশা দিয়ে পিছিয়ে পড়ে কাঁদলে কি লাভ বল! ঝড় এসেছে, ঢেউ উঠেছে, দুরন্ত চঞ্চল! ভীরু যারা থাকবে পিছে, ঝড়ের ভয়ে শুধুই মিছে, শুধু শুধু বাঁচা বাওয়া

হোর মিথ্যা এ কৌতুক। জীবন-নদী হোকনা যদি মৃত্যুসাগরের দিকে, এগিয়ে যাবো কতদূরে তার দেখবো চমৎকার। দিগন্তের পানে সব দিকীতে যাইছে। ডগডীবনের নৌকো বাহে,—"দেখো অসিত, কারবারটা দেখে—মনে ইজ্জৎ রাখলোনা। এই সব পান, গাইতে গাইতে চলার ধরণ দেখো। ভারতবর্ষের পান্ দেখো, মান দেখো। কোলম্বাসী, গুরুর!"

অসিত মুখ চোখ পাকিয়ে বলে,—যখন মা বোন সকলকে নিয়ে শহরের সিনেমাহলে এ সব শোনো তখন? কি করছে ওরা সন্ধ্যায়। নদীর বুকে গান গাইছে। অন্যায় কি?

এসে গেলো বুড়ো ডগবানদীর নৌকো, "কি যাবো কি দেখতো, কেমন দেখছে? এমনটা দেখেছো কখনও। ওওহরলালজীর শোভাযাত্রাও এতো শ্রাবণময় হয়নি।"

"আপনারই যথা সার্থক" বলাম আমি।

এসে গেলো লালজী আর পতিরামের নৌকো। "পতিরাম ওর হোক তো! বেড়ে শোভাযাত্রা চালালি। জীবনভর মনে রাখবে।"

চার পা দুঁড়ে পতিরাম বলে—"বলিস না, বলিস না—মেয়ে বাঙালী। নেহাতোর দেশের জলদ মেয়ে তুই। অর্গানাইজ করতে পারলিনা এমন প্রোসেসনটা। পিছল ছোঁড়ার আগেই সব বেরিয়ে পড়লো। সব মাটি হোলো, মাটী হোলো।"

লালজী বলে,—"ডিসর্গানাইজড্, গার্ডেড্ লি ডিসিপিন্ড্—একটু ভদ্রভাবে হওয়ায় কেমন প্রাণস্পর্শী হয়েছে দেখলে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের এমন এ চোখে কখনও দেখিনি।"

সন্ধ্যা আসি মন্দিরে যায়। বেণু আর অসিত আগে গেছে। একাদশী আজ। সন্ধ্যার জন্য দুধ সাগো সাবুদিয়ে উপবাস করে। ওরা তাই আগে সাবার জন্য বিবাহাদের ডগবার সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে।

আমি কিন্তু মন্দিরের ঘাটের গাতালে জল ভেঙে অল্প কিছু ভাবছি। সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হোলো। ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে। শাদা জগদীশ শিলাস্তরে মোড়া মন্দির চূড়ায় চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয়েছে। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে। বড় আঠবোঝাই নৌকা চলেছে নদীর স্রোতে। ছপ্ ছপ্ করে নদি চুমছে চলে, বিস্তার জল। এক চাঁদ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আবার টুকরো টুকরো চাঁদের মন এক জোট হয়ে একখানি চাঁদ হোলো। টুকরো টুকরো চিন্তা যখন এক হোলো তখন বেশি সান্ত্বনার সেই স্থান দুর্ব। আজ মেয়ে নয়—আমার মনে একটা জীবন, একটা প্রাণ। ওর উপলব্ধিকে খুব অবোধ নয়। তাই ওর ভেতরে একটা স্থিরতার আছে, একটা বল আছে।

হঠাৎ সামনে গাছের ওপারে একটা ছায়া—দেখি গভীর চিন্তার ভরায় আছা আর একটী ছেলে। ওরা জলের ধারে বসলো। আমি চুপ করে বসে সব দেখছি। হঠাৎ আছার কোলে ছেলেটী মাথা গুঁজে দিলো। আছা মাথাটা বুকে চেপে ধরলো।

আমার একা মনের দরজা গেল। ঘন্টির দিয়ে আরতি দেখলাম। প্রণাম সেরাম। সেরার পথে আমার বিশেষ শর্মা বললেন—"অমর-নাথের যুগল সন্ধান করুন। আমি তো দেখছি ত্রিনয়ন মেয়ে যেতে রাজী।"

"তাই নাকি! আচ্ছা দেখবো।"

নিজেদের নৌকোয় এসে চুকলাম।

(১৮)

—বাদশাহী স্বপ্ন—

আমার সেই ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ। ঘুম ভেঙে গেছে। সকাল সতেজ মন।

বেণুর এই ফুলে-পাওয়া-রোগ আমার পাগল করবে। আমার স্নায়ুকুণ্ডলীর মধ্যে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে নানা ব্যাধি। একটু পাওয়ার অনেক দরজা উপরে ফুড়ে ছুরছর, মন, অঞ্জলি; আমার বিষজোড়া পাওয়ার পরও মুক্তচা মেটেনা এমনটাও হয়েছে। বন্ধু হাসে রোমান্টিক বলে; প্রতিপক্ষ করে বিদ্রূপ 'ভং-বাবী' বলে, নিজেকে নিজে করি তিরস্কার অসংযমী বলে।

একটুখানি ঘুম এই ম্যাগনোলিয়া, আমার ঘুম ভাঙিয়ে যেত। শিশুদের বুকে ঘামশীর চাঁদের বিরহ। পাশে বিছানায় বেণু ঘুমুচ্ছে কিউড়ি মেয়ের মতোয় ঘুম। আদিত আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে আমার পায়ের দিকে লম্বা শুয়ে আছে। ওর পাশে এক বিছানাতেই ডগবীবন আর গুপ্তা। বিহারীলাল ব্যাঙের হিসেব মেয়ে ফিরেছে অনেক রাতে। ঘুমুচ্ছিল। আমার সাড়া পেয়ে বললো, "ঘুম আসছে না নাকি? সিগারেট খেবো?"

আমি উঠে বসলাম। একটা জানালা খুলে দিতেই ঐশ্বর্যের মতো আলোর বন্যা এসে সমস্ত ঘোটটাকে স্বর্ণময় করে দিলো। আমি পাউন চাপাচ্ছি দেখে বিহারীলাল বলে, বেরুবেন নাকি?

"ঘুম তো আছেই বিহারীলালজী। কিন্তু এই চাঁদের আলো, দিলুম আর কোথায় পাবো কোথায়? তা ছাড়া গাছেদের গন্ধ?"

বিহারীলাল বললে, "ঐ কথাই হচ্ছিল ড্যাপের ঘরে। পতিরাম আর লালজী বলছিলো বেণু তো শুধু ওর বোন্ নয়, সকলের বোন্। সকাল বেলায় চুপিসাড়ে সব তৈয়ারক করে। পরিচ্ছন্ন অথচ সজ্জা নেই। বাঙালী মেয়ে বেকোথায় অন্য মেয়ে থেকে আলাদা—বেণুকে দেখলে বোঝা যায়। এর মধ্যে ওর একমাত্র দুর্বলতা দেখা যায় ঐ ফুলে।"

"কিন্তু বেণু আমার বোন নয় বিহারীলাল।"

"বোন নয়? বোন নয় তো কে?"

"বেণু আমার ভাই। ভগবান ওকে মেয়ে করে পাঠিয়েছেন, সেটা ওর অভিশাপ। এমন একটা ভাই যদি আমার পাশে থাকতো বিহারী-লাল, আমার বন্ধু, আমার সখা, আমার দুঃখসুখের ভাগী, আমি অন্য কিছু হতাম। যেমন ঐ অসিত।"

"হ্যাঁ ও-ও আমাদের এক ভাগ্নের! কোনও অন্যায়ের সঙ্গে তার সাসপিসেটর—"

"চুপ অন্ধকারী, রাত্রি কান পেতে থাকে। যদি শোনে, বড় কষ্ট পাবে।"

ঘোড়ে ঘুরে উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি প্রতিটী ঘোড় ঝলমল করছে। চিনারের তলায় ছোয়ার পাতা। ঘিরে বসেছি। এখনও নাকে সেই মাদকোলিয়ার গন্ধ। আমরি মনে হলো—এই চিনার-বাগে আওরঙ্গজেব হারিয়েছিল তার পঞ্চদশবর্ষী ওরঙ্গী। উদীপুরী বেগম ওরুনেয়ার বৃদ্ধ আওরঙ্গজেবকে পরাজিত করে যৌবন পাবে। এই সেই চিনার বাগ। এরই কাছাকাছি ছিল আওরঙ্গজেবের ঘোট। তারমধ্যে ওরুনেয়ার আলমগীরকে স্ত্রীড়নকের মতো নিয়ে খেলা করেছে। সেদিনের চাঁদ এমনিই হেসেছিল। এই চাঁদের আলোতেই দারার আর হাজা ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে প্রাণ প্রিয়ের সন্ধানে। চিনার তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে।

ঐরেন্দ্রনের বাগানে জলাশয় ট্রাউটের চাষ

আমার ইংরেজদের আমলে এই চিনারবাগ ছিল অবিবাহিত সৈনিক আর অফিসারদের থাকার আড্ডা। তখনও এই দ্বীপ ছুটোতে মেমের ভীড়, বিলাসের ভীড়। শত শত কাশ্মীরী বধূ ভক্তরাজের ছোবে ইহকালকে পুড়িয়ে গেছে এই চিনার বাগে। চিনার বাগের পাতারা রাতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

পাশে এসে দাঁড়ালো রমলা।

"উদাস মনে হচ্ছে বাবুজী?"

"তোর হচ্ছে?" না ফেরে কথা বলেছি।

রমলা বলে "ওর বাপ মারে। বাপ মরে গেল যখন তখন ছুটো ঘোট একটা চুলা। আমার চলে যেতো বেশ। বিয়ে করলাম ছেলে বেলায়, কি সুখের ছিল বৌ কি বলবো। হাঙ্গামা এলো। ভয়ে ভয়ে দাঙ্গা হলায়। হিন্দু-মুসলমান বলে জানতাম না, কাশ্মীরী-ডোগ্‌রা বলে জানতাম না। কেন হাঙ্গামা হোলো কে জানে। রাজার আমলে লোকজন বেড়াতে আসতো, বেশ চলে যেতো। এরা এসে সব গোড়াতো লাগলো। আমাদের মেহেদের ঘরে ঘরে ফিরে গেল। আর সে বছর কি বরফ বাবুজী। এই চিনার বাগের জলে ছেলেরা বল খেলেছে। যাত্রী আসা যাওয়া বন্ধ। এক বছর, দু বছর, তিন বছর। ঘরে ধান না খেয়ে। পেট বছর আর এ বছর লোকজন আসা আরম্ভ হয়েছে। খেতে পাচ্ছি। আমার এখন কেবল মনে হয়—ছেলে ছুটোকে যদি পড়াতে পারি, যদি ওরা তকরীর (বক্তৃতা) করতে শেখে। বাপ আমার নৌকো দিয়ে গেছে। আমি পারবোনা ওদের হাতে নৌকো দিয়ে যেতে। আমার বৌও বলে ফিকে করবো ছেলেদের পড়াবো।"

আমার ভাল লাগে না রমলার কথা। উঠে হাঁটতে থাকি। কনট্রাক্টরদের নৌকোর কাছে গিয়ে চাপা একটা কলহ শুনি। খানিকটা পরে মনে মনে ধিক্কার হয়, কেন আমি শুনি অপরের কথা। মরুক কান্না।

কাল রাতে কাশ্মীরের শেষ মাকর্ষণ বিশ্বাত বাদিগ্রহণার। বিশ্বাত, শালামার এরা যেন বেশভিবেশপ্রথাত শেকোনিয়ার আর কুলিনার। দূরের থেকে কাশ্মীর যারা দেখতে আসেন তাঁদের মনে এ বাগগুলি যেন ওপন্যাস। আমার খুব আকর্ষণ ছিলো সেই ছুই-

ঐরেন্দ্রনের বাগানে জলাশয় ট্রাউটের চাষ

বিলাসঘর্ষিত উপবনদের সমর্ধনা জানাতে। এদের পশ্চাতে নেই কোনও মহিমা, কোনও জনজাগৃতি জনকল্যাণের স্পর্শ। শাসকের খেয়ালে কতো বিগ্রহ, কতো নির্যাতনের মূল্যে এই বিলাস সম্ভার।

তবু তাদের মূল্য দিয়েছে ইতিহাস কালের যাত্রাপথে মানুষের রুচি বিকাশের সাক্ষ্য হিসাবে। ভূগোলের বালচিত্রের সীমারেখা অচল নয়। কিন্তু এই চলমান ভাগ্যবিবর্তনের আকাশের মাঝে মাঝে এক একটা বরফুখর, মাদুরার মন্দির, কুতবমীনার, তাজমহল—এক একটা কালের স্বাক্ষা। সে মূল্য দিতেই হয়। এইসব অনিনয়র ধূলিমুষ্টিই মানুষের মনের ঐশ্বর্যকে কালের সমকক্ষ করে রেখেছে। সে হিসেবেও এর মূল্য আছে।

কিন্তু অজন্তা, রোমের সেন্টপল্ সিঙ্গ, পাঁতীর স্তূপ, এরা যেন তবু

যে মানুষের বাস, বহুকালের চিহ্নের সাক্ষ্য। তেমনটা নেই সিংহলে, কলোম্বোয়, পেগুতে বা তেওয়ান্-ই-খাসের আবহমে। একটা যেমন আর্কিটেক্টনিক, রাইজেক্টনিক, ডেকরেটিভ, অন্যটা তেমনি ইঞ্জিনেক্টনিক, আর্কেলজিক্যাল, ফাইন্ডেক্টনিক।

চতু আমরা দেখেছি, অর্থাৎ আমাদের ৩ নম্বর বন দেখেছি, তেমনি সকলে এই বন দেখেছে।

প্রত্যেকে দেখেছে বহুবন ভুবে। বহুবনের কথা আগেই বলেছি। বহুবন পর্যটকের কাছে সেই সুদূর ভূগর্ভের ইতিহাস। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বহুবন বনের বিস্তার বৌদ্ধ মহাসভার ইতিহাস। এই ভূগর্ভ বন খুঁজতে আজ প্রত্নতাত্ত্বিকের Solomon Mines Captain Blood এর চোখে জাহাজের ডুবুরি দেখব; আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে, ভূমিকম্পে, ঝড়ে, অবশ্য; হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস্ দেশের ঘটনা, এরা যেমন পাথর জিনিসের ভূগর্ভকে আকৃষ্ট করে রেখেছে, তেমনি মাটির তলে রেখেছে বহুবিহারের অন্তরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মহাসভার ইতিহাস-শাসনের সংগ্রহ। ফিউয়েন্ সাং এই তাম্রশাসনের উল্লেখ করে গেছেন; সম্রাট কনিষ্ক চীনদেশে, সেখানে তাঁর পক্ষের সংগ্রাম জয়লাভ করার পর মহাবৌদ্ধ সম্মেলনের আহ্বানে কাশ্মীরে। কাশ্মীরে তাঁর সভাপতি হন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধ অনুশাসনগুলির একটা সুসংবদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিলিপি করা হয়। সেগুলি অনেকগুলি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করে কোনও স্তূপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। প্রত্নতত্ত্বের মহানুসার একটি স্তূপ এই তাম্রশাসনগুলিকে সংগ্রহ করে। বহুবিহারে খোঁজ এখনও থেমে যায়নি। কে জানে কবে মিলবে সেই তাম্রশাসন!

বহুবন যে জায়গাটায় সেটার আশে পাশে অনেক ক্ষেত খামার। সব ধানী জমি ছিল। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ঝরনা ছিল। পানিয়ার থেকে মাইল দুই দূরে। চমৎকার এই ভূমিটির কাছেই [illegible] এখন খাঁ নেই। জায়গাটা সংরক্ষিত। জীবনধারণের জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা এখান থেকেই। এই ভূমির চারদিকে যেন বনানীর শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে। অথচ খানিকটা জায়গায় কোনও চাষবাসের চিহ্ন পাওয়া গেল, এমন কি ঘাস পাতাও নয়। অদ্ভুত, ভীষণ। ছোটো ছোটো ঘাস হয়ে হয়েও হয়নি। কথ্য ভাষায় তাই চাষের নাম দিয়েছে "কিত্তুর-গ-হাত্", "সোনার ক্ষেত" অর্থাৎ ক্ষেতে হয় সোনাফলি। কথাটা প্রত্নতাত্ত্বিকদের কানে বড় অর্থপূর্ণ। বহাকালের বহুবিহারে সাঞ্চী, প্রথেপ, কার্লেজ, সারনাথ, নালন্দা, বিক্রমশীলে, মাটীর তলাতে মিলেছিল। দান মিলেছিল; খাসমি পোড়া-মাটীর টুকরো, সোনার কুচি। ভূমির জলে যা ভুল ওরা বাহিরে এসে বলে যেন 'আমি যে রাজত্বের বাসিন্দা সে রাজত্বে পুঁজিয়ে আছে এইখানে মাটীর তলায়।' তাই পোড়া মাটীর ক্ষেতের ফসল প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে মহার্ঘ। চাষারা জানতো ওখানে সাঞ্চল দিতে নেই। সাঞ্চল দিলেই ফসল নাশ হবে। ঐ ক্ষেতে বড় বড় সব ঈগলেরা ঘোরাফেরা করে। সবই সত্য। খোঁড়ার পর যেখা যেখা ক্ষেতের মালিক, অর্থাৎ বাদশাহ। তীন অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসের স্থানও ঘটে, আর মন্দিরে সাঞ্চল দিলে ফসলাদের ভয় করে বৈকি! এইসব কিম্বদন্তী আজ আর থেকেই বহুবনের আবিষ্কার। কুশাণযুগের সময়ের বহু কথা এই বহুবন থেকে পাওয়া গেছে। এই বহুবন বনের আবিষ্কার কাহিনী মহেঞ্জদরোর আবিষ্কার কাহিনীর মতোই মনোরম।

সেকালের সেই ভূমি আজও সেকালের পাহাড়ের ছায়া বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। ভুবে পড়েছে সেই ভামল গম্ভীর শান্ত পর্বতের ছায়া। পর্বতের ঢেউ ছায়া মনোহর; প্রত্যেকের ঢেউ ছায়া মনোহর। এর জন্য কেঁচে কেঁচে কাশ্মীরের অন্যতম সম্পদ টাউট্ মাংসের চাষ হচ্ছে। আট টাকা পাউণ্ডের মাছ অর্থাৎ একটাকায় একপাউণ্ড মাছ। মাছের চাষ কত বড় করতে কাশ্মীর সরকার এই এক জায়গায় নয়, বহুস্থানে।

ভ্রমণ

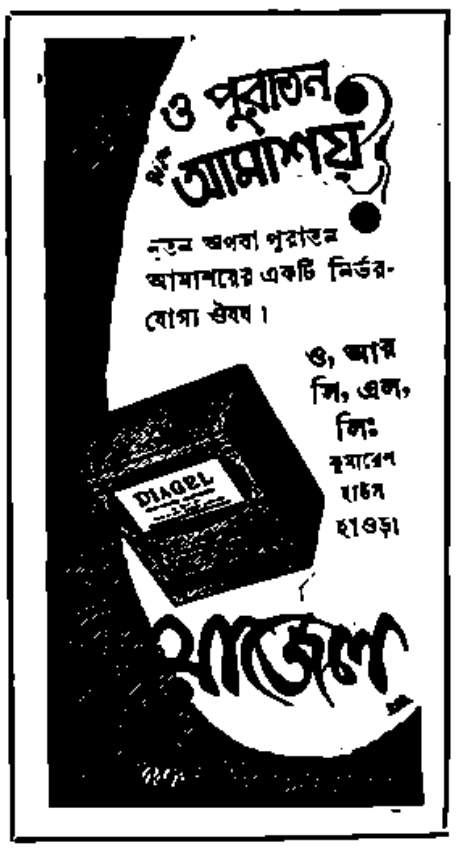

কাকদ্বীপে কৃষক সম্মিলন—

গত ১লা মার্চ হইতে ৩ দিন ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত কাকদ্বীপে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার, রেল ও বাস উভয় যানের ব্যবস্থা আছে—ডায়মণ্ডহারবার হইতে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত নব-নির্মিত পথে বাসে যাওয়া যায়। কাকদ্বীপ হইতে নামখানা পর্য্যন্ত পথও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, নামখানা হইতে সমুদ্র তীরস্থ ফ্রেজারগঞ্জ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। ১লা মার্চ সেখানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো একটি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅতিতপ্রসাদ জৈন কৃষক সম্মিলনে বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানাইলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভাপতিত্বে কৃষক সম্মেলন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন ধেবর সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দূর হয় নাই। বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন সকলের অগ্রণী হইয়াছিল, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূরীকরণেও তাহাকে সেইরূপ অগ্রণী হইতে হইবে। সংগ্রামের দ্বারা দেশবাসীকে তাহাদের প্রার্থিত জিনিষ লাভ করিতে হইবে। দেশের কৃষক সম্প্রদায় আজ ভাবিতে শিখিয়াছে যে কংগ্রেসই তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। পূর্বদিনও ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে অকালে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে সম্মেলনে আশানুরূপ লোক সমাগম হয় নাই। শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে—ভারতের জন সংখ্যার ৮০ জন কৃষি-জীবী। ভারতে জমীরও অভাব নাই। কিন্তু কৃষকরা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এ দেশে পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করিতে পারে না। সকল সভ্য দেশের মত ভারতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির ব্যবস্থা হইলে এ দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১০।১৪ গুণ বাড়িয়া যাইবে। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন—কৃষকদের চেষ্টা সত্ত্বেও এদেশে খাদ্যাভাব দূর হয় নাই। বাঙ্গালী কৃষকরা পাট চাষ করিয়া বৎসরে ৩৪ কোটি টাকা উপার্জন করে। বহু ধানের জমীতে পাট হইতেছে। খাদ্য উৎপাদন বাড়িলেও চাহিদার তুলনায় তাহা কম। সে জন্য এ দেশে আরও অধিক খাদ্য উৎপাদনে সকলের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কৃষি ব্যবস্থায় সরকারী ত্রুটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। সমবায় বিভাগের কর্মীরা দেশের জনসাধারণকে সমবায়প্রথা শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন না! সমবায় প্রথায় সর্বত্র চাষ করিতে বলা হয়, কিন্তু সরকার পক্ষ সে বিষয়ে কৃষক-দিগকে কোন শিক্ষা বা উৎসাহ দান করেন না। পল্লীতে যে সকল কৃষি-কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাহারা না জানে কৃষি কার্য্য, না বুঝে সমবায়। সত্বর এ সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ২রা মার্চের সভায় একটি প্রস্তাবে সত্বর ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। বলা হয় যে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের উপর সমগ্র পশ্চিম বাংলার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। তাহা ছাড়া সম্মিলনে কৃষি, খাদ্য, ভূমি বণ্টন, ভূদান আন্দোলন, সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সেচ মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে সরকার কি করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া সম্মিলনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন জেলার ১৬ জন কৃষি-পণ্ডিতকে একখানি করিয়া খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দিয়া কৃষি-মন্ত্রী ডাক্তার আর আমেদ তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এক একর জমীতে ২৩৪ মণ আলু উৎপাদনকারী হুগলী জেলার শ্রীসুবলচন্দ্র

পাছুই, এক একরে ২৫ মণ ২ সের ধান উৎপাদনকারী নবীন কৃষ্ণ মণ্ডল, গদ, আখ প্রভৃতি উৎপাদনকারী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল, শ্রীশ্যামাপদ মুখার্জি, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষাল, শ্রীসত্যসাধন রায়চৌধুরী, শ্রীসুধীরকুমার বসু, শ্রীমণীন্দ্রকুমার সান্যাল প্রভৃতি তাঁহাদের অন্যতম। কৃষক সম্মিলনে সারা বাংলার কৃতী চাষীদের পুরস্কার দেওয়া হইল—পরে প্রতি জেলা ও প্রতি মহকুমার কৃতী চাষী দিগকে ঐ ভাবে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীধেবর সকলের অলক্ষিতে রবিবার ভোর ৪টায় সম্মিলন স্থান হইতে পলবন্ধে বাহির হইয়া ৪ ঘণ্টা কাল কয়েকটি গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কৃষক, মৎস্যজীবী, নৌকাচালক প্রভৃতি নানা জাতীয় অধিবাসীদের গৃহে গৃহে যাইয়া নিজে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। কৃষক সম্মিলনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকগণের এক সভা হইয়াছিল—তাহাতে প্রায় ৫ শত মণ্ডল-সভাপতি ও মণ্ডল-সম্পাদক সমবেত হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই শত বিধান-সভা-সদস্য-নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রত্যেকটি ৫।৬টি করিয়া মণ্ডলে-বিভক্ত করা হইয়াছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডল-কংগ্রেসের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। যাহাতে প্রতি মণ্ডলের কর্মকর্তারা নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন, সে জন্য এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ৩রা মার্চ সোমবার কাকদ্বীপে এক বিরাট মহিলা-সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীমতী কুলরেণু গুহ তাহাতে সভানেত্রী হন ও শ্রীমতী মায়াদেবী ছত্রী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মহিলা সম্মিলনে এক প্রস্তাবে গ্রামাঞ্চলে ঢেঁকী ও অম্বর চরকার প্রবর্তন দ্বারা মহিলাদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থায় সরকারকে মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছে। বিবাহে পণ গ্রহণকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে বলা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে স্কুল ফাইনাল পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা অবৈতনিক করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার একটি গ্রাম—কাকদ্বীপে এই সম্মিলন হওয়ায় দেশের সর্বত্র একটা নবজাগরণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আবুল কালাম আজাদ—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও জ্ঞানী, জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৬৯ বৎসর বয়সে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ২টার পর দিল্লীর বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৩ দিন তিনি রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে ইসলামের আদিভূমি মক্কায় তাঁহার জন্ম হয়—তাঁহার পুরা নাম ছিল আবুল কালাম মহিউদ্দীন আহম্মদ আজাদ। তাঁহার পিতা ভারতবর্ষের লোক—১৮৫৭ সালে সিপাই যুদ্ধের সময় মক্কায় চলিয়া যান—তাঁহার নাম খইরুদ্দীন। ১৮৭২ সালে তিনি ভারতস্থ শিষ্যগণের নিকট হইতে ১১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া মক্কায় জল সরবরাহের জন্য একটি খাল সংস্কার করিয়াছিলেন।

মৌলানা আবুল কালাম ১৫ বৎসর বয়স হইতেই সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজ সরকার প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় তাঁহাকে রাঁচীতে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। মৌলানা আজাদ অতি অল্প-বয়সে কলিকাতায় আসেন ও তাহার পর দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও খেলাফৎ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা করেন। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। জীবনের ১১ বৎসর কাল তাঁহাকে জেলে কাটাইতে হয়। ১৯৩০ সালের ও ১৯৪২ সালের আন্দোলনেও তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১০ বৎসরেরও অধিককাল তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীরূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা ভারতীয় হইলেও মাতা আরব দেশীয় মুসলমান ছিলেন—তিনি প্রথম বয়সে ভারতের বাহিরে থাকিয়া আরবী, পার্শী প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষিত হন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিও কর্মশক্তি সারা-জীবন তাঁহাকে সকল কার্যে সাফল্য দান করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া সকল সময়ে ভারতের মুখপাত্ররূপে তিনি আজাদকে সম্মুখে রাখিতেন। অসাধারণ সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান মৌলানা আজাদ সর্বদা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন—সারা জীবন তিনি ভারতে যে নেতার স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ জীবনে

মানুষের পক্ষে তাহা সহজলভ্য নহে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞের অভাব হইল।

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ—

আমরা রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৬ পর্য্যন্ত ১২ বৎসরের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। হাওড়া বেলুড়ে সারদাপীঠের কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় বর্ত্তমানে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে—(১) বিদ্যামন্দির বা কলেজ (২) শিল্পমন্দির বা কারিগরী শিক্ষালয় (৩) তত্ত্বমন্দির—ইহার অধীনে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় হইবে (৪) জন শিক্ষামন্দির—সমাজ সেবা শিক্ষা কেন্দ্র। ৪টি প্রধান প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ফটোগ্রাফী, গোপালন, কৃষি, পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি বিভাগেও কর্মীদের শিক্ষাদান করা হয়। বেলুড়ের বাহিরে মিশনের অধীনে ২৪ পরগণা জেলার বেলঘরিয়া, মনসাদ্বীপ, রহড়া, নরেন্দ্রপুর, টাকী, সরিষা বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে, দেওঘরে, কলিকাতা নিবেদিতা লেনে, ১১১ রসা রোডে, আসানসোল প্রভৃতি বহু স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। বেলুড়স্থ কেন্দ্রে গত ১২ বৎসরে মোট ৪২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বেলুড় সারদাপীঠের সম্পত্তি প্রভৃতির মোট মূল্য ৪৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। সারদাপীঠকে সম্পূর্ণ করিতে আরও ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মিশনের কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন, অর্থের অভাবে তাঁহাদের কার্য্যের অগ্রগতি বন্ধ হইবে না, সহৃদয় জন সাধারণ ও সরকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রয়োজনীয় অর্থদান করিয়া মিশনের এই বিরাট শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবেন।

সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়—

হাওড়া, বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সারদাপীঠের কর্তৃপক্ষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মঠের নিকট গঙ্গাতীরে এক বিস্তীর্ণ জমীর উপর একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার ব্রতী হইয়াছেন। সে জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হইবে। জমি ক্রয় বাবদ—৩ লক্ষ, কলেজ গৃহের জন্য ১ লক্ষ, কার্য্যালয় প্রভৃতির জন্য ২ লক্ষ, পাঠাগার—৩ লক্ষ, মিউজিয়াম ২ লক্ষ, একশত ছাত্রের জন্য ছাত্রাবাস—৪ লক্ষ, কর্মীদের বাসগৃহ দেড় লক্ষ ও অতিথিশালার জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া—আসবাব পত্রের জন্য ৫ লক্ষ, পুস্তকাদির জন্য ৫ লক্ষ টাকা ও স্থায়ী খরচের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। আচার্য্য ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে সভাপতি ও সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আচার্য্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি কমিটির সদস্য। প্রাচীন আদর্শে নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলার আদর্শে নূতন মহাবিদ্যালয় গঠন করা হইবে। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা দান করা হইবে। আজ সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিবেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীদের এই শুভ প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগীতার অভাব হইবে না—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। পশ্চিমবঙ্গ এই কার্য্যে অগ্রণী হইলে সারা ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন বলিয়াছেন—ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক্ উপলব্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য্য এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে সংস্কৃতকে সুপ্রতিষ্ঠা করার জন্য স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করিতে হইবে। মধ্য বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রকে মাতৃভাষা ও ইংরাজির সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রিয় করার জন্য (১) প্রাইভেট ক্লাসের ব্যবস্থা (২) ষ্টাডি গ্রুপ (৩) প্রাইভেট পরীক্ষা (৪) জনপ্রিয় সংস্কৃত পুস্তক রচনা (৫) সংস্কৃত সভা সমিতি (৬) সংস্কৃত লেখক ও রচনাবলীর স্মারক দিবস উদ্‌যাপন (৭) সুলভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ (৮) সরল ভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান (৯) সংস্কৃত ভাষার লেখকগণকে উৎসাহ দান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা দরকার। সংস্কৃত সঙ্গীত গান ও

সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের দ্বারা জনগণকে সংস্কৃত শিখানো সহজ হইবে। আমাদের বিশ্বাস, অধিক লোক সংস্কৃত শিখিলে সংস্কৃতই ভারতের সার্বজনীন ভাষায় পরিণত হইবে।

সত্য কথা—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী এক বক্তৃতায় খাদ্য ও ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি খাঁটি সত্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—বাংলাদেশের লোক যদি কাজ করিতে চাহিত, তাহা হইলে এ রাজ্যে এত বেকার সমস্যা থাকিত না। বাঙ্গালী শ্রমসাধ্য কোন কাজ করে না বলিয়াই অন্যান্য রাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া কাজ পাইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশই কায়িক শ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে। সে জন্য প্রতি মাসে প্রায় ১০ কোটি টাকা মোকাল মনিঅর্ডারে পশ্চিমবঙ্গ হইতে রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বহু বৎসর পূর্বে স্বর্গত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহা প্রাদেশিকতা বা হিংসার কথা নহে—বাঙ্গালীর শ্রম বিমুখতার কথা। দেশের সর্বত্র এই কথাটি আলোচিত হইলে, হয় ত একদল শ্রমবিমুখ মানুষ শ্রমনিষ্ঠা কর্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে। ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের যত উপকারই করিয়া থাক না কেন, আমাদের মধ্যে শ্রমবিমুখতা আনিয়া দিয়াছে। সে জন্য গান্ধীজি প্রথম জীবন হইতেই শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা দিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার কার্যক্রম স্থির করিয়াছিলেন। মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু দেশে ব্যাপকভাবে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচলনে উদ্যোগী হইলে দেশ অবশ্যই উপকৃত হইবে।

সত্য গোপন চেষ্টা—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে দেশে ভবিষ্যতে খাদ্য-সংকটের সম্ভাবনা নাই; প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেও বৎসরে এদেশে ব্রহ্ম হইতে ৩ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে হইত। একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে মাঘ ফাল্গুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের চাউলের দাম কমিয়া যায়, সে সময়ে এখানে লোককে ৩০ টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করিতে হইতেছে। সরকার ৯ হাজার দোকান খুলিয়া কম মূল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল দোকানে প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম পরিমাণে চাউল সরবরাহ করা হয়। লোক ২।৩ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত শুধু হাতে ঘরে ফিরিতে বাধ্য হয়—এই ত দোকানগুলির অবস্থা। সাড়ে ১৭ টাকা মণের চাউল ত পাওয়া যায় না—সাড়ে ২২ টাকা মণের আমেরিকান আতপ চাউল—যাহা অধিকাংশ লোকের খাইতে কষ্ট পাইতে হয়—তাহার পরিমাণও পর্য্যাপ্ত নহে—সবদিন তাহাও পাওয়া যায় না। একে ত সপ্তাহে মাথা পিছু ১সের চাউলে লোকের অভাব মেটে না—তাহারও এইরূপ অবস্থা। কাজেই লোককে খোলা বাজারে ৩০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হয়। মানুষের অর্থনৈতিক সংকট কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা—যাঁহারা মন্ত্রীর গদীতে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে বোঝা বোধ হয়, সম্ভব হয় না। শাসকবর্গ এ দেশে কাপড়ের দাম কমাইতে সমর্থ হন নাই। শীতের সময় সরকারীর দাম কিছু কমিয়াছিল, তাহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাল, তেল, কয়লা, চিনি, মসলা প্রভৃতির দাম—যাহা একবার বাড়ে, তাহা আর কমে না। এ সকল সামান্য জিনিষ দেখিবার লোক নাই। সাধারণ দরিদ্র মানুষ—বড় বড় পরিকল্পনার কথা শুনিয়া শুনিয়া হায়রাণ হইয়াছে—পরিকল্পনার ফল এখনও তাহাদের কাজে আসে নাই—দারিদ্র্য তাহাদের দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—এ অবস্থায় 'দেশে খাদ্যের অবস্থা শঙ্কাজনক নহে' বলিলে লোক নিশ্চিন্ত হইবে না। কি করিলে দেশের লোক সুলভে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পায়—সে ব্যবস্থার কথা বলিলে মানুষ আশ্বস্ত হইতে পারে। অধিক খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে সরকারী চেষ্টা সাফল্যলাভ করে নাই—সে চেষ্টা আরও ব্যাপক ও আন্তরিকতাপূর্ণ করার চেষ্টায় কেহই মনোযোগী নহেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে—বিশেষ করিয়া খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমরা সে কথা চিন্তা করিয়া নূতন কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আবেদন জানাই।

দণ্ডকারণ্য সংবাদ—

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কৃষি ও লোক বসবাসের জমি না থাকায় সরকার দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পাঠাইতে বাধ্য হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার

অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যাইয়া দণ্ডকারণ্য দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তিনি যে বিবরণ সরকারে পেশ করিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুও দণ্ডকারণ্য দেখিয়া আসিতে সম্মত হইয়াছেন। তথায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল পতিত জমী আছে—তন্মধ্যে ২০ হাজার বর্গ মাইলের উন্নতি সাধন করা হইলে তথায় ৮০ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন করা সম্ভব হইবে। সেখানে অনেক ভাল নদী আছে এবং স্থানে স্থানে বৎসরে ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। দণ্ডকারণ্যে যাইবার জন্য বিধান সভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট এক হাজার আবেদন আসিয়াছে। এই সকল তথ্য গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সরকারী প্রচার বিভাগের ব্যাপক প্রচার কার্য্য পরিচালন করা কর্ত্তব্য।

আনন্দ পুরস্কার ১৩৬৪—

১৯৫৭ সালের ২০শে এপ্রিল কলিকাতায় সাহিত্যিকদের এক প্রীতিসম্মিলনে আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীঅশোককুমার সরকার ঘোষণা করেন—প্রতি বৎসর বাংলা সাহিত্যসেবীদের তিনি দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত পুরস্কার দুই হাজার টাকা মূল্যের হইবে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটীর উপর বিচার ভার দেওয়া হইবে এবং বর্ত্তমান ১৩৬৪ সালের বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একটি ও তরুণ কথাসাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসু তাঁহার 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য অপর পুরস্কার লাভ করিবেন। উভয়েই ভারতবর্ষের লেখক—আমরা তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষও এইভাবে কাজ করিয়া বাংলার লেখক-সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম-এ (ট্রিপল্) সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের দৌহিত্র ও ডক্টর শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এস্‌সি মহাশয়ের পুত্র শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্রডার্ণ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজেস্'-এর "কম্বাইণ্ড কোর্স"-বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁহাকে 'চন্দ্রনাথ-শ্রীনাথ কুণ্ডু' স্বর্ণপদক ও 'দুর্গামণি দেবী' স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৫৩ সালে তৎকালীন রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নূতন বিষয়টি এম-এ পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার পর হইতে একমাত্র শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়-ই এই বিষয়ে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনিই "কম্বাইণ্ড কোর্সে" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-এ। ইহার পূর্বে তিনি ১৯৫৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ অনার্সে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া যথাক্রমে ইংরাজিতে এম-এ এবং এল্ এল্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শরৎ বসু একাডেমী—

১৯৫৮ নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা ৩৮.২ এলগিন রোডস্থ নেতাজী ভবন হইতে ব্যারিষ্টার শ্রীএস-কে-মুখার্জির সম্পাদনায় শরৎ বসু একাডেমী নামে এক-খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গত দেশ-নেতা শরৎচন্দ্র বসুর স্মৃতিতে ১৯৫২ সালে এই অ-রাজনীতিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে—শ্রীসুরেন নিয়োগী ও শ্রীঅমিয়নাথ বসু প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। এই পুস্তকে বহু সুমুদ্রিত চিত্র ও সুলিখিত প্রবন্ধ আছে। ১৯৪৭

সালে গান্ধীজি নেতাজী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রধান-মন্ত্রী উ-নুও নেতাজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার কথা ইহাতে বিভিন্ন লেখকের লেখায় আলোচিত হইয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অগ্রজ শরৎচন্দ্রের দান দেশবাসী কখনও ভুলিবে না। তাঁহাদের কথা এই একাডেমীর আলোচনা ও তৎকর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের মধ্য দিয়া অধিক প্রচারিত হইলে দেশবাসী তদ্বারা লাভবান হইবে।

আসানসোলে খনি দুর্ঘটনা—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০টার সময় আসানসোল হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে চিনাকুড়ি কয়লার খনিতে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের ফলে ১৮২ জন লোক মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে ৭৯ জন খনি গর্তে চাপা পড়িয়া মারা যায় ও ১৭ জনকে উপরে আনিয়া হাসপাতালে দেওয়ার পর ৩ জন মারা যায়। খনিটি বেঙ্গল কোল কোম্পানীর—মেসার্স এণ্ড্রু ইউল কোম্পানী উহার ম্যানেজিং এজেণ্ট। ঐ স্থানই ধানবাদ হইতে ১২ মাইল দূরে সেণ্ট্রাল ভাওড়া কয়লা খনিতে ৫০ ফিট জলের তলায় ২৩ জন শ্রমিক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। খনির মধ্যে হঠাৎ জলের স্রোত আসে—ঐ জল তুলিতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগিবে। চারিদিক নানা প্রকারের দুর্ঘটনা এখন যান্ত্রিক যুগের পরিচয় দান করিতেছে।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ—

দিল্লীস্থ ভারত সরকারের সংবাদ ও প্রচার বিভাগের প্রকাশিত ৬খানা বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তিকা আমরা সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। (১) শিল্প ব্যবস্থা—(২) পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ—(৩) দুঃখ থেকে সম্পদ—(৪) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা—(৫) নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের পথে—(৬) খাদ্য ও কৃষি। প্রত্যেকখানির মূল্য দুই আনা। পুস্তকগুলি শিক্ষাপ্রদ ও সুলিখিত, সুমুদ্রিত। বাংলা ভাষায় লিখিত হইলেও এগুলি কেন পশ্চিমবঙ্গে অধিক প্রচারিত হয় নাই—জানি না। দেখা গেল, এইরূপ আরও বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী প্রচার বিভাগ এই সকল পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মধ্যে অল্প মূল্যে বিতরণ করিলে দেশবাসী সেগুলি পাঠ করিয়া লাভবান হইবে।

সুষ্ঠুভাবে বর্ষ-গণনা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ষ-গণনা হয়—১লা এপ্রিল হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। ভবিষ্যতে যাহাতে ১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর বর্ষ-গণনা করা যায়—সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান-চন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। বিধান সভা ও বিধান পরিষদে বার্ষিক আয় ব্যয়ের আলোচনার জন্য সদস্যদিগকে মার্চ মাসে কলিকাতায় থাকিতে হয়—সে সময়ে শীত কমিয়া যায়, পথে কাদা থাকে না—সে সময়টাই গ্রামে ঘুরিবার পক্ষে প্রশস্ত সময়—সদস্যরা সে সময়ে ছুটী পাইলে নির্বাচন-কেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন। আগষ্ট সেপ্টেম্বরে বর্ষার সময় লোক ঘরে আটক থাকিতে বাধ্য হয়—সে সময়ে বিধান সভা বা পরিষদের অধিবেশন হইলে সদস্যদের কোন অসুবিধা হইবে না। নানা দিক দিয়া সুবিধার কথা আলোচনা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছেন।

—

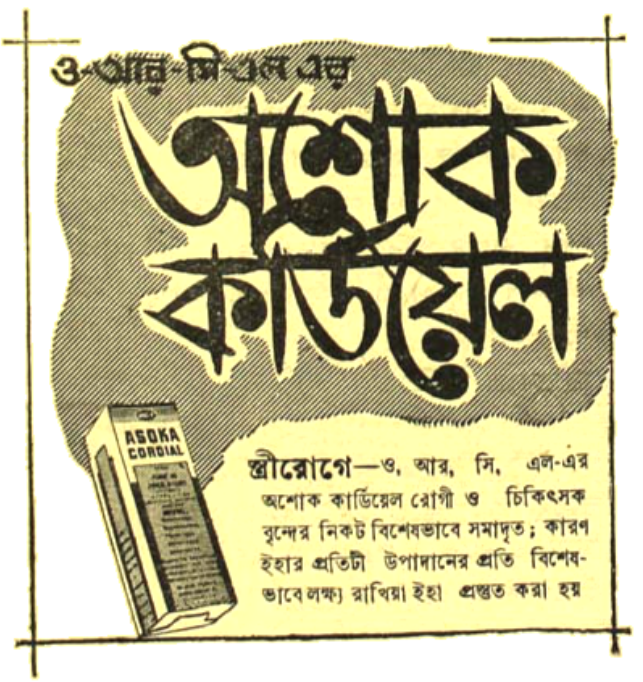

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চৌরঙ্গী টেরাসে ওরা নতুন করে উদ্বোধন করেছে চেরি-ব্লাবের। নিভাব মৃতকল্প মানস-চেরি আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে নতুন রঙে। ওদের মনের কোণে নিরালা ধূসর প্রান্তর আবার সবুজ হয়ে উঠেছে। সুরেখা করেছে জল-সিঞ্চন, শিপ্রা দিয়েছে অনুকূল বাতাস।···সুরেখার টাকা, শিপ্রার অনুপ্রেরণা।

দিনের পর দিন জীবনের একঘেয়েমি সুরে শিপ্রা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তাই সুরেখার হাতে কুলপি-বিরারের কেনিল গেলাসটা তুলে দিয়ে বলেছিল, চকা হরিণীর মত সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে আর ভালো লাগে না, সুরেখাদি।

ঘর বাঁধো।···নির্বিকারভাবে সুরেখা উত্তর দিয়েছিল।

ঘর!···শিপ্রা হেসেছিল। ঝকঝকে দাঁতগুলোর মাঝায় মাঝায় লেগেছিল রূপালি হাসির রঙ।

হাসলে যে? আকাশ-ধরা চোখদুটো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেখা মেলে ধরেছিল শিপ্রার মুখপানে। শিপ্রাকে সে কম জানে না। তবুও যেন শিপাসিন ঝিলমিল করে উঠেছিল হঠাৎ ওর কথা শুনে।

হাসিটুকু মুহূর্তে ঠোঁটের কোল বেয়ে মুছে নিয়ে শিপ্রা বলেছিল—তার চেয়ে মরফিন্ ইন্‌জেকশান নিয়ে শুয়ে থাকা অনেক ভালো।

মানে?···এবার সুরেখা সত্যি বিস্মিত হয়েছিল।

কিন্তু তার সে বিস্ময় কাটতে দেরী লাগে নি। পর-ক্ষণেই শিপ্রা নিতান্ত সহজ কণ্ঠে কথাটা তরল করে দিয়ে বলেছিল—ঘরে আর কারাগারে তফাৎ কি খুব বেশী সুরেখাদি? মনকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে, হা-পিত্যেস করে উদ্ধারকর্তার মুখপানে চেয়ে থাকার চেয়ে, ভাঙা নৌকায় উঠে পদ্মার স্রোতে ভেসে যাওয়াও ভালো।··· মরবার আগে তিল তিল করে মরতে আমি পারবো না।

সুরেখা হেসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে মুখ টিপে-টিপে হেসে শিপ্রাকে অনুভব করেছিল মনের সবটুকু প্রসন্নতা নিয়ে। টোল-খাওয়া দুটি গালে উপচে উঠেছিল কন্দর্পের মধুপর্ক।

রেখাদি!

বলো।

হাসির রেশটুকু থামিয়ে দিয়ে শিপ্রা জিজ্ঞেস করেছিল —জয়ন্ত চাটার্জীকে তোমার মনে আছে?

আছে।···কেন?

সাময়িক অন্যমনস্কতাটুকু নিমেষে ঝেড়ে ফেলে সুরেখা বলেছিল—অদ্ভুত মানুষ। বুঝি না, কি সে চায় জীবনে! প্রতিভা আছে, সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হলে যে কৌশলের প্রয়োজন, সে-কৌশল সে কোনদিনও আয়ত্ত করতে পারবে না। মানুষ তো শুধু প্রতিভায় বড় হয় না। বড় হয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার কৌশলে। পাঁচসিকার কেরিওয়ালাও শেঠজি হয়ে ওঠে। কাদের ওস্তাদ বলতেন, শুধু এক চামচের প্যাঁচেই শাহান-শা হওয়া যায়।

চামচের প্যাঁচ মানে?

মানে, সুকৌশলে কাজ হাসিল করবার কলা—নৈপুণ্য।

কলা কি সব জায়গায় খাটে রেখাদি? তা হলে জয়ন্ত চাটার্জী—

সুরেখা চমকে উঠেছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল শিপ্রার মুখপানে। ধারাল চোখদুটো দিয়ে ওর মর্মমূল পর্যন্ত দেখে নেবার জন্যে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল!

হয় বলাতে ওর ঘেরী লাগে না, লাগেও নি। হেসে বলেছিল—তুমি? তুমিও তো হার মেনেছ।

ভুল, রেখাদি! ভুল। হাতের নাগালে যা পাওয়া যায় না, শিপ্রা তার পিছনে ছোটে না কোনদিন। সে জানে, মাকড়সার জালে প্রজাপতি ধরা যায়, হরাল টাইগার আটকানো যায় না। এক্সপেরিমেণ্ট করতে শিপ্রা ছাড়ে নি।

জানি।…লুক্রেসিয়া তার নেই। সংকোচকে সে ঘৃণা করে। চিত্তজয়ের যাদু সে জানে। তবুও ভিজে শাড়ি পরে, রাতের অন্ধকারে তাকে বরানগর থেকে ম্যানডেভিলায় ফিরে যেতে হয় নিউমোনিয়ার ভয়কে উপেক্ষা ক'রে।

শিপ্রার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছাৎ করে উঠেছিল। প্রয়োজন মত নিজেকে সামলে নেবার কৌশল পুরোপুরি জানলেও, আচমকা ঝাঁকানিটা সামলে নিতে শিপ্রার কম সময় লাগেনি। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে যেন ভূত দেখে তার স্নায়ুগুলো কেমন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল।…জানে! সেকথাও গোপন নেই। সব জানে রেখাদি!

তবুও সামলে নিয়েছিল। সুরেখার অলক্ষ্যে দুটো চোক গিলে নীচু গলায় শিপ্রা বলেছিল—কি যে বলো সুরেখাদি! অদ্ভুত তোমার কল্পনা শক্তি! ডাক্তারি না শিখে, উপন্যাস লিখতে শুরু করলে ভালো করতে।

তা-ই।…যাক গে, ডায়েরির ছেঁড়া পাতাটা খুঁজে পেলে, জয়ন্তকে একদিন চায়ের নেমন্তন্ন করতাম। সত্যিকারের একটা হিরো!

থাক।…শিপ্রা কম্পমান চোখদুটো নামিয়ে নিয়েছিল: আসবো না আর তোমার বাড়ীতে।

সুরেখা খিল খিল করে হেসে শিপ্রার হাতখানা তুলে নিয়ে চেপে ধরেছিল দুই চোখের ওপর। তারপর আলগোচে ঠোঁটের কাছে নামিয়ে এনে, আলতো চাপে কামড়ে ধরেছিল মাঝের আঙুলটা: শিপারিন!

ঘর সে বাঁধেনি। তবে জলসা-ঘর বাঁধলো চৌরঙ্গী টেরাসের নিরালা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। নতুন করে উদ্বোধন হলো চেরি ব্লাথের। টাকার তো অভাব ছিল না সুরেখার, নেইও। ওর ঘষেমেজে পা ফেলার নূপুর-নিক্কণে টাকার ফনটুন্ শব্দ ম্লান হয়ে যায়। বাণবিদ্ধ রাজহংসের মত পায়ের কাছে লুটোপুটি করে পুরুষের মন। সুরেখা হাত বাড়ায় না কোনদিন। টাকা যেন হাত বাড়িয়ে ওর হাল্কা শাড়ির আঁচলটা ধরবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বাইরে শিপ্রা বেশ সহজ হয়ে এলো। কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন চোর-কাঁটার একটা শুক্‌নো ফুল থেকে গেল। চলতে-ফিরতে, ছোট্ট একটা কাঁটার মত বুকের তলায় খচখচ করে।

ওদের চেরি-ব্লাথের সায়ন্তনী বৈঠক নিয়মিত বসে চৌরঙ্গী টেরাসের জলসা ঘরে। আড্ডা জমে গান-গল্প-দাবা-ব্লাশের। এ পাশের ঘরে যখন ব্লাশের আসর জমে ওঠে, লীনা চৌধুরীকে নিয়ে বিভোর সেন উঠে যায় পাশের ঘরে। নিরিবিলি বসে দাবার চাল শেখায় লীনাকে। মনের অগোচরে ঘড়ির কাঁটা সন্ধ্যার ঘণ্টা ছাড়িয়ে রাতের কোঠায় পা বাড়ায়।

হঠাৎ দাবার ছকে বোড়েটা টিপে, নতুন একটা কিস্তি দিয়ে, বিভোর সেন হেসে বলে—রাত হলো যে!

তা হোক।…লীনা হাসে।

নাম ওর লীনা নয়। নাম ছিল রহিমা বেগম। বিভোর সেন আদর করে বলে লীনা।…বিয়ের আগে যে নামটা ছিল, ডিভোর্সের পর সেটা আর মানায় না। নতুন করে বার্থিশ না করলে, দামী মেহগিও পুরণো মনে হয়। নয় কি? কথাটা বলে বিভোর আত্মপ্রসাদের ঠাণ্ডা একটু হাসির আমেজ টেনে আনে প্রশংসমান চোখদুটোয়।

হা-ল্-লো!

ওদের আমেজটা আচমকা ভেঙে দিয়ে, শিপ্রা এসে ঘরে ঢোকে বালকৃষ্ণণের হাতখানা ধরে।

আসুন শিপ্রাদি!…সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে রহিমার মুখে। বিভোরের সঙ্গে ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিয়ে সরে বসে।

ঘরে ঢোকা হয় না। শিপ্রা পিছিয়ে আসে। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে মিঠে গলায় বলে: দাবার চেয়ে পাশা অনেক ভালো। নেয়া-দেয়ার সুবিধে বেশী।

ছিল্‌ছিল্ করে ভেসে যায় লীনার চোখেমুখে এক

ঝলক বিদ্যুতের মত হাসি : অবের কি আর-কিছু আছে, শিপ্রাদি ?

জানি। বিভোর কিছু চাইলে, তুমি না বলতে পারো না।

তাই : লীনার মুখখানা লালচে আভায় ভরে ওঠে।

লজ্জা পায় বিভোর সেন। ও জানে, লীনা ওর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না কোনদিন। বিমুখ করতে সে জানে না, তা নয়। বিমুখ সে করবে না ওকে।

ঘন পদক্ষেপে ঘাই ও'র কাঠের হিলছুটো মোজাইক-করা মেঝেয় শব্দিত করে শিপ্রা বালকৃষ্ণণকে টেনে নিয়ে যায় করিডোর পার হয়ে। বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়।

কৃষ্ণ !

ইয়েস।

বড় টেণ্ডার তুমি।

বালকৃষ্ণণ হাসে। নরম মিষ্টি হাসি। বাঙলা সে ভালো বলতে পারে না, কিন্তু বেশ বোঝে। শিপ্রা ওর মনের প্রবাহটাকে উজ্জ্বল করে দেখার উদ্দেশ্যেই ইংরাজী-বাঙলার ককটেইল করে কথার পেয়ালা তুলে ধরে ওর ঠোঁটের কাছে। বালকৃষ্ণণ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শিপ্রার মুখপানে। ওকে টেনে নিয়ে শিপ্রা বারান্দার একটী কোণে গিয়ে দাঁড়ায় পাশাপাশি ঘনিয়ে।

বাইরে কৃষ্ণচূড়ার বড় গাছটায় এলোমেলো বাতাস দোল দিয়ে যায়। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে বারান্দাটার ঝিলমিলি আর রেলিঙের গায়ে। রেলিঙের ওপর একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে শিপ্রা গায়ে বুলিয়ে নেয় চাঁদের খানিকটা স্পর্শ।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় জয়ন্তর কথা। গাছপালার অন্তরালে, আলোছায়ার ঘোমটা-ঢেরা, স্বপনপুরীর রূপ-কুমারীর মত জোয়ারদার-ভিলার শাদা পাথর-ঘেরা বাংলোটা !···শুধু জয়ন্তকেই যেন মানায় ওই নির্জন বাংলোতে।···কিন্তু জয়ন্ত !

জয়ন্ত কেমন করে বললে সুরেখাদির কাছে ? ও যে সবার অলক্ষ্যে গিয়ে হাজির হয়েছিল তার নির্জন-বাসের আস্তানায়, সে-কথা ভাববার মত বুদ্ধি যে জয়ন্তর ছিল না, তা নয়। হীরের ধারের মত ঝকঝকে বুদ্ধি তার। অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ! কিন্তু সুরেখার কাছে নিজেকে এমন ছোট করতে এতটুকুও বাধলো না তার ? কেমন করে মেনে নিয়েছে এতবড় পরাজয় !···সুরেখা তাহলে জয় করেছে জয়ন্তকে !

ভাবতে ওর ভালো লাগে না। চিন্তার সূত্রগুলোয় কেমন জট পাকিয়ে যায়।···বলেছে ! জয়ন্ত বলেছে সব কথা সুরেখাদির কাছে ?···ভিজে শাড়ি প'রে বরানগর থেকে ম্যানডেভিলায় ফিরলে, কাল তার নিউ-মোনিয়া হবে, একথা তো জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ শোনেনি ওর মুখ থেকে !

ওর আকস্মিক মৌনতায় বালকৃষ্ণণ কেমন অস্বস্তি বোধ করে। একটু ইতস্তত করে বলে—মিস্ শিপার ! বাইরে চলবেন ?—মেমোরিয়াল ময়দানে ?

চলো।

নিমেষে শিপ্রা সচেতন হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে হালকা হাসির একটু ঝিন্‌কি ছড়িয়ে বলে—জানো ? লীনা ডিভোর্স করেছে তার স্বামীকে প্রোফেসর সেনের নেশায়। ওর ধারণা, সেন নিশ্চয়ই বিয়ে করবে ওকে।

তাই ? বিস্মিত দৃষ্টিতে বালকৃষ্ণণ চেয়ে থাকে।

আবার শিপ্রার মুখে ফুটে ওঠে একঝলক হাসি। অদ্ভুত মাধুর্যভরা হাসির দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে চোখ-দুটো। একটু থেমে, বিলম্বিত সুরে বলে—লীনা কি বলে, জানো ?

না।

ওই যে শুনলে তখন। বলে—বিভোর কিছু চাইলে, না বলতে পারবে না কোনদিন।

ভাট্‌স নাইস অব হার !

তাই নাকি ! তাহলে বোঝ তুমি নারীমনের রহস্য ?··· কিন্তু কই, তুমি তো কোনদিন চাও না কিছু !···শিপ্রা খিলখিল করে হেসে ওঠে। বালকৃষ্ণণের আকস্মিক জড়তাটুকু কাটিয়ে দিয়ে, হাতখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে, মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—চলো, পর্যাপ্ত চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে মেমোরিয়ালের ময়দানে।

স্পর্শমুগ্ধ আরশুলার মত কৃষ্ণ বেরিয়ে যায় কাঁচ-পোকার পিছু পিছু। তন্বী-শ্যামা-কীর্ণকটি-সুদর্শনা শিপ্রা নাইলনের হালকা আঁচল কাঁপিয়ে আগে আগে চলে : ইউ আর রিয়ালি সুইট, কৃষ্ণ ! বড় সুন্দর তুমি !

চাঁদের আলোয় রবার গাছের অন্ধকার ছায়াগুলো যেন ফিসফিস করে ডাকে।

ওরা রোসকোর্সের দিকে এগিয়ে যায়।

ওদের টেবিলটেনিস প্রতিযোগিতায় সুরেখা আর শিপ্রা হয়েছে বিজয়িনী। শিপ্রা ও সুরেখার মাঝখানে যে কাঁটাতারের বেড়াটা গড়ে উঠেছিল জয়ন্তকে কেন্দ্র করে, সেটা যেন আবার অলক্ষ্যে শিথিল হয়ে গেল। সুরেখার মনে ঠাঁই না পেলেও শিপ্রার মনে যেন অনেকখানি রেখাপাত করেছিল সেদিনের সেই আকস্মিক উক্তি। অনেক চেষ্টা করেও শিপ্রা আবিষ্কার করতে পারেনি, কেমন করে সুরেখা জেনেছিল ওর নির্জন মুহূর্তের দুর্বলতার কথা !

শনিবার বিকেলে ছোটখাটো পান-ভোজনের পার্টি প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতো চেয়ারম্যানের জলসা ঘরে। কোন-

দিন খরচ যোগাত বিজোর সেন, কোনদিন খাণ্ডেলওয়াল, কোনদিন বা সুরেখা নিজে। চোপরা অনেকবার সুযোগ খুঁজেছে ক্লাবের দৌলাছিলের খুশী করবার। কিন্তু কুইন বী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মিষ্টি একটু হেসে বলেছেন—ধন্যবাদ! সদস্য ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু নেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। ক্লেরিক্লাবের আইন-কানুন মেনে চলতে হয় প্রত্যেক সদস্যকে।

বেশ তো। সদস্য করে নিলেই মিটে যায়! বাধা কি?

বাধা আছে বলেই তো।···চোখে চিন্তার ঘোমটা টেনে দিয়ে সুরেখা দৃষ্টিটা অবনত করেছে।

রাষ্ট্রী বাহির রাজনীতি চোপরা ভেদ করতে পারেনি, কিন্তু শিপ্রার অসুবিধা হয়নি নিমেষে তার অর্থ অনুধাবন করে নিতে।

চোপরার দিকে তলচোখে একনজর চেয়ে; চোখ দুটো সুরেখার দিকে ফিরিয়ে সে বলেছে: বাধা আর এমন কি, সুরেখাদি?

নামটা প্রোপোজ করবে কে, শুনি?

তুমি।

আমি?···সুরেখা চমকে উঠেছে। ফিকে এক ফালি হাসি ঠোঁট দিয়ে কেটে বলেছে—কেমন করে সম্ভব?··· পরিচয় তো মাত্র কয়েক মাসের। ক্লাবের নিয়ম-হলো—

অন্তত এক বছরের জানাশোনা হওয়া চাই, এই তো!···কিন্তু সে আইন কি সুরেখা খাণ্ডেলওয়ালের পক্ষেও প্রযোজ্য।

কেন নয়?···সুরেখার কণ্ঠস্বর হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠেছে। পর মুহূর্তেই চোপরার দিকে চেয়ে মিষ্টিহাসির বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে বলেছে—ওর বন্ধুর মনে যদি লাগ পড়ে?···বিচিত্র তো নয় কিছু! পুরুষের মন অরণ্যের চেয়েও দুর্ভেদ্য।

হাই, সত্যি তাই সুরেখাদি।

বুকের ভিতরটা চমকে উঠেছে, তবুও হাসিতে ভেঙে পড়বার নিখুঁত অভিনয় করেছে শিপ্রা।

চোপরার চোখদুটো চকচক করে উঠেছে সুরেখার দুর্গম মনের অন্তরালে পায়ে চলার পথরেখা দেখে।··· সত্যি সুরেখা সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর সুরেখার সহজ মন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চোপরা দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থেকেছে।

লীলায়িত দেহভঙ্গীর সঙ্গে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সুরেখা বলেছে—লাকি! তুমি সত্যি লাকি, মিস্টার চোপরা!

নিমেষে চোপরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গিয়েছে।

সদস্যের তালিকায় উঠলো চোপরার নাম। তবে প্রস্তাবটা সুরেখা করেনি, করেছে শিপ্রা। যদিও শিপ্রার সঙ্গে পরিচয় তার ছিল না কোনদিন। সুরেখার সান্নিধ্যে হয়েছে শুধু মুখচেনা।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চোপরা বারবার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিপ্রা তার উত্তরে একটীবার মাত্র ঘাড় কেলিয়ে হেসেছে, কথা বলে নি।

ওর অবস্থাটা চোপরা না বুঝলেও সুরেখা বুঝেছিল। চোপরার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, শিপ্রার দিকে চেয়ে সে বলেছে—দেখলে তো! এক নজরের পরিচয়ও বন্ধুরকে ছাপিয়ে যায়, যদি মনের দরজা খোলা থাকে।

মুহূর্তে শিপ্রার মৌনতা ভেঙে গিয়েছে: কি যে বলো, রেখাদি! তোমার জন্যেই তো—

থাক। চলুন মিস্টার চোপরা, শিপারিনকে পৌঁছে দিয়ে যাই ম্যানডেভিলায়।

শিপ্রা রাজী না-থাকলেও, জোর করে সুরেখা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে চোপরার গাড়ীতে। ওর বদ্‌কানিতে নতুন নেশার আমেজ ধরেছে চোপরার মগজে।

পথে যেতে-যেতে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে চোপরা হঠাৎ টাল-খাওয়া বাঙলায় শিপ্রাকে বলে ফেলেছে—আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনি চিনেন না আমাকে।

কেমন করে চিনলেন আপনি?···শিপ্রা চমকে উঠেছে।

সুরেখা খেয়াল করেনি। হয়তো ইচ্ছা করেই অন্য-মনস্ক হয়েছিল গাড়ীখানা স্টার্ট দেওয়ার পরেই।

শিপ্রার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে অজ্ঞাত আশঙ্কায়।···না-জানি কি বলবে চোপরা!···কোথায়, কেমন করে চিনলো সে ওকে?

একটু থেমে, নিজেকে সামলে নিয়ে, অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছে—কোথায় দেখেছেন, বলুন তো?

মুচকি হেসে চোপরা ঘাড় কাঁপিয়ে বলেছে—বরানগর বাস-স্ট্যাণ্ডে।···সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন: ফর্সা— লম্বা।

বরানগর বাস্-স্ট্যাণ্ডে!···আচম্বিতে শিপ্রার বুকের ওপর থেকে একটা জগদ্দল পাথর নেমে গিয়েছে। মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তিতে। সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলেছে—বেড়িয়ে ফিরছিলেন বুঝি?···মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল ছিলেন সঙ্গে!

ঠিক।···দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরসে।

আর কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি শিপ্রা। মনের কোণেও ওর ছিল না দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন। নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসে মনটা হালকা করে নিয়ে তাকিয়ে ছিল দূর আকাশের দিকে।···তাহলে জয়ন্ত বলেনি সে-কথা। নিভৃত মুহূর্তে জয়ন্তর সঙ্গে হয়নি সুরেখার মনোবিনিময়। ওরই মুখের কথা শুনেছে সে, বাস্-স্ট্যাণ্ডের পাশ কাটিয়ে যখন ওদের গাড়ীখানা মন্থর গতিতে বেরিয়ে এসেছে। ক্রমশঃ

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

"চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয়-সম্মান উৎসব কমিটি" 'পদ্মশ্রী' ও 'সঙ্গীত নাটক আকাদামী' পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালকগণের সম্মানে সপ্তাহব্যাপী এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। গত মার্চ তারিখে সকাল বেলায় 'রাধা' চিত্রগৃহে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান্ ষ্টুডিওতে বেঙ্গল মোশান্ পিক্‌চার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীমতী দেবিকারাণী, শ্রীঅহিন্দ্র চৌধুরী, শ্রীসত্যজিৎ রায় ও শ্রীদেবকী বসু এই চারজন রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শ্রীমতী দেবিকারাণী—First lady of the Indian Screen—অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে নিজের দেশের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসেন। তাঁর উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানগুলিতে শুধু প্রাণসঞ্চারই করেনি—একে মাধুর্য্য-মণ্ডিতও করে তুলেছিল। আমরা 'চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় সম্মান উৎসব' কমিটিকে এই সময়োচিত অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পিগণকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

• • • •

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বজনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী নার্গিস উদীয়মান চিত্র তারকা শ্রীসুনীল দত্তর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে "মাদার ইণ্ডিয়া" চিত্রে এঁরা দু'জনে মাতা ও সন্তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অগ্রগামী পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' চিত্রে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

হয়েছিলেন। শ্রীমতী নার্গিস ১৯২৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে ফতিমা রসিদ। তাঁর মাতা জদন বাই ছিলেন বিখ্যাত গায়িকা। 'তালাশ-ই-হক' চিত্রে শ্রীমতী নার্গিস পাঁচ বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন। শ্রীসুনীল দত্তর প্রকৃত নাম হচ্ছে বলরাজ। ইনি ১৯৩০ সালে পাঞ্জাবের বিলাস্ রেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রেডিও সিলন-এর ঘোষক রূপে ও পরে "রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম" চিত্রে অভিনয় করে ইনি খ্যাতিলাভ করেন।

• • • •

আর একটি বিবাহের খবর হচ্ছে—বিখ্যাত গায়ক শ্রীএ, কানন ও সুগায়িকা শ্রীমতী মালবিকা রায়-এর বিবাহ অনুষ্ঠান গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সঙ্গীত জগতের বহু শিল্পী সমাবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

• • • •

প্রযোজক পরিচালক শ্রীবিমল রায় তাঁর "মধুমতী" চিত্রের কাজ বেশ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। একটি উৎসব নৃত্য ও একটি সাঁওতাল নৃত্যের চিত্র ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। চিত্রটিতে তিনটি নৃত্য দৃশ্য থাকবে এবং তিনজন নৃত্য পরিচালক—সচিনশঙ্কর, সত্যনারায়ণ ও মোহনলাল—এই নৃত্য দৃশ্যগুলি পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত করবেন, আর চিত্রটিতে গান থাকবে দশটি। কুমায়ুন পাহাড়ের দৃশ্যাবলীর মধ্যে এখন এর চিত্রগ্রহণ চলছে। এতে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, জনিওয়াকার প্রভৃতি।

• • • •

কাঁচা ফিল্ম ও ফটোগ্রাফির অন্যান্য দ্রব্য নির্মাণের জন্য একটি 'প্ল্যান্ট' শীঘ্রই ভারতে নির্মিত হবে বলে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লোকসভায় জানিয়েছেন। এই সম্পর্কে একটি বৈদেশিক দল এ দেশে আসছেন এবং দক্ষিণ ভারতের শৈলনিবাস উটাকামণ্ড-এর নিকট একটি স্থান এই 'প্ল্যান্ট' নির্মাণের পক্ষে উপযোগী হতে পারে বলে জানা গেছে।

• • • •

নিউইয়র্ক-এর চলচ্চিত্র সমালোচকগণ "The Bridge on the River Kwai" চিত্রটিকে ১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে নির্বাচিত করেছেন। এই সমালোচকগণ অভিনেত্রী Deborah Kerrকে "Heaven Knows, Mr. Allison" এই চিত্রে Sister Angela-র ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য ১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে নির্বাচিত করেছেন। আর ফরাসী ছবি "Gervaise" শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রের সম্মান পেয়েছে।

• • • •

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা সিনেমা দেখার অভ্যাস ক্রমশই কমিয়ে ফেলছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা মাত্র পনের জন লোক সপ্তাহে একদিন করে সিনেমা দেখে থাকেন। ওখানকার সিনেমা সম্বন্ধে দর্শকগণকে নানা প্রশ্ন করা হয় এবং তার উত্তরে বেশির ভাগ দর্শকরা জানিয়েছেন যে টেলিভিসনের আকর্ষণ তাঁদের গৃহে আটকে রাখে বলে তাঁরা আজকাল কম সিনেমা দেখে থাকেন। শতকরা মাত্র চারজন জানিয়েছেন যে তাঁরা খরচ কুলিয়ে উঠতে পারেন না বলে কম সিনেমা দেখছেন, আর শতকরা তিনজন জানিয়েছেন যে তাঁরা মনে করেন এখনকার চিত্রগুলি আগেকার তুলনায় নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং সেজন্য তাঁরা আজকাল আর তত সিনেমা দেখার পক্ষপাতি নন। চিত্র নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ওখানকার দর্শকরা জানিয়েছেন যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের উপরই তাঁরা বেশী নির্ভর করেন। তবে আগত চিত্রের 'ট্রেলার' ও টেলিভিসনে চিত্রের বিজ্ঞাপনও তাঁদের চিত্র নির্বাচনে সাহায্য করে।

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে…

সন্তোষকুমার দে

বড়াল বাড়ির খ্যাতি শুধু বাংলাদেশে নয় সারা ভারতে—শুধু বড়ো বাড়ি বলে নয়, বড়ো বড়ো মানুষের গতিবিধি ও অবস্থিতির জন্যই এই ভারত জোড়া খ্যাতি। সারা ভারতের সেরা গুণী গায়ক ওস্তাদ যন্ত্রী সবাই আসেন যান, কলকাতায় এসেছেন অথচ বড়াল বাড়ি আসেন নি—এমন ঘটনা ঘটে না কোনো ওস্তাদের ভাগ্যে। লালচাঁদ বড়াল নিজেই ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গুণী গায়ক; তার চেয়েও মহৎ গুণ ছিল তাঁর—প্রকৃত গুণী ব্যক্তির সমাদরে তিনি

ছিলেন মুক্তহস্ত। আজও বড়াল বাড়ির চিত্রশালায় ভারতীয় সঙ্গীত-সাধকদের যে সব দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র আছে সমগ্র ভারতের খুব কম সংগ্রহে তা পাওয়া যায়।

এই সুপ্রাচীন সংগীত সাধক বংশের ঐতিহ্যপুষ্ট আর এক বিরাট পুরুষ—রাইচাঁদ। ভারতের সেরা চিত্র-গায়কদের শিক্ষাগুরু হিসেবে যে মানুষটি সমগ্র বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি এই রাইচাঁদ। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে নব নব শিল্পী সৃজনে। তাঁর শিষ্য শিষ্যারা এক একজন দিকপাল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি কুন্দনলাল সাইগলের নাম। সাইগলকে তিনিই জনসমাজে পরিচিত করিয়ে ছিলেন।

বড়াল বাড়ির আসরে বহু গুণী ব্যক্তির আসা যাওয়া ছিল। তাদের মধ্যে একজন সন্ধান দিলেন জলন্ধারের এক তরুণ চাকুরের—কলকাতার একটি টাইপরাইটার কোম্পানীর সেলস্‌ম্যান সে। চমৎকার ভরাট দরাজ গলা ছেলেটির। রাইবাবু বললেন—নিয়ে আসুন, শোনা যাক্।

গান ভালোই গায় বলতে হবে, কিন্তু তালিম দরকার, ওস্তাদি গানে সহবৎ দরকার।

নিউ থিয়েটার্সে নিয়ে গেলেন রাইচাঁদ, কিন্তু কোন পরিচালক পছন্দ করলেন না ছেলেটিকে। চেহারায় এমন কিছু নেই যাতে কেউ লুফে নেবে। একমাত্র সম্বল গলা। তা গলাটি মিষ্টি বটে। কিন্তু বাংলা বলতে যে পারে না, উচ্চারণে জড়তা থাকতে তাকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়াতে রাজি হয় না কেউ।

সাইড-রোলের সামান্য কাজ জোটানো গেল নেহাৎ রাইচাঁদের খাতিরে। টাইপরাইটার বিক্রি ছেড়ে সে ষ্টুডিওতে এসে ভিড়ল।

তখন বড়ুয়া 'দেবদাস' তুলছেন। গানে সুর দিচ্ছেন রাইচাঁদ। একদিন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-তে তিনি একমনে বসে গানে সুর দিচ্ছেন। ক্রমে রাত হয়ে এলো। পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি সহকর্মীরা যে-যার ঘরে গেলেন, রাইবাবু তখনও উঠছেন না। তাঁর মনে তখন সুর আসছে—তিনি সুর তুলছেন—"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি।"

চন্দ্রমুখীর আসরে দেবদাস ও তার বন্ধু গিয়েছে; সেখানে এই গানটি গাইবে দেবদাসের বন্ধু। গানটিতে সুর বসিয়ে রাইচাঁদ ভাবছেন—কাকে শোনাই, কেউ তো কাছে নেই, সবাই চলে গেছে!

যখন তিনি এমন ইতস্ততঃ কাউকে খুঁজছেন সেই মহামুহূর্তে সেখানে বিধিনির্বন্ধে হাজির হলেন জলন্ধারের সেই যুবকটি—কুন্দনলাল সাইগল। বাংলা বুলি তখনও তার মুখে রপ্ত হয়নি।

রাইচাঁদ বল্লেন—আমি হয়ত সুরটা ভুলে যাবো ভায়া, তুমি শিখে নাও, কাল সকালে ষ্টুডিওতে এসে তুমি শোনাবে।

সাইগল গাইলেন—"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে···। একবার নয়, বার বার, গানটিতে তার অধিকার এলো।

পরদিন পঙ্কজবাবু রাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবদাসের' কোনও গানে সুর দেওয়া হল কিনা।

রাইচাঁদ সাইগলকে দিয়ে গাইয়ে শোনালেন "গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে···"

উচ্চারণ তখনও অশুদ্ধ, কিন্তু সুললালিত্য তো অস্বীকার করা যায় না। পঙ্কজবাবু কানে কানে বললেন—খাসা গেয়েছে কিন্তু!

কিন্তু বড়ুয়া প্রথমে বেঁকে বসলেন—তিনি চান—পঙ্কজবাবু গাইবেন গানটা। পঙ্কজবাবু নিয়ে বিপরীত রায় দিয়ে বসে আছেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বীরেন সরকার মশাইএর মধ্যস্থতায় মিটে গেল। আরো তালিম দিয়ে সাইগলই নির্ভুলভাবে ছবিতে গানটি গাইলেন—"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে···"

"দেবদাস" ছবিটি 'হিট' করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে 'হিট' করল সাইগলের গলায় বাংলা গান, লোকে কাড়াকাড়ি করে ছবি দেখে, রেকর্ড কেনে। সোজাকথা সাইগল আর 'সাই' (Shy) রইল না, তার দরদভরা কণ্ঠে এর পর অনেক মধুবর্ষণ করেছে এবং প্রায় সর্বত্রই রাইচাঁদের সুর। রাইচাঁদের অনন্য করুণীয় সুর সৃষ্টির সঙ্গে সাইগলের মোহময় কণ্ঠধ্বনির কত গোলাপই না ফুটে উঠেছিল!

আজ সাইগল নেই, রাইচাঁদ আছেন। বাঙ্গালীর বহুভাগ্য—তিনি এখনও সমান উৎসাহে সৃষ্টি করে চলেছেন নিত্য নব সুরব্যঞ্জনা। ভগবান তাঁকে নীরোগ দীর্ঘজীবন দিন—যাতে তিনি আরো বহুদিন সুরভারতীর সাধনা করতে পারেন।

—সতের—

"I cried for madder music and for
stronger wine.
But when the feast is finished and the
lamps expire.
Then falls thy shadow, Cynara—"

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছে। গিলে। নয়—ডাউসন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের জীবনে কি কোনোদিন এসেছিল সাইনারা? সত্যজিতের জানা নেই! মত্ততর সঙ্গীত আর তীব্রতর সুরার উৎসবে—দুটি চুম্বনবিহ্বল ওষ্ঠের মাঝখানে কোনোদিন কি কারো অপচ্ছায়া নেমেছিল? আদর্শ ভালো ছেলে ইন্দ্রজিৎ তা কোনদিন পায়নি—আজকে বিকৃত বুদ্ধি আর বিশৃঙ্খল চেতনা নিয়ে সেই অবদমনেরই দরজা সে খুলে দিয়েছে। নিজের ওপরে আজ তার শাসন নেই, তাই শিবশঙ্করের রক্ত কথা কইছে তার মধ্যে।

উত্তরাধিকার!

কয়েক মিনিটের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে সত্যজিৎ আপের সামনের কাগজগুলোর মধ্যে চোখ নামালো। সকালে বনশ্রী ফোন করেছিল। একটু পরেই রীতেন আসবে—নোট বইটার ঘটা দেখা হয়েছে সে যেন রীতেনের হাতে পাঠিয়ে দেয়। আরো জানতে চেয়েছিল, আজ রবিবার—বিকেলে একবার তার আসবার সময় হবে কিনা। সত্যজিৎ বলেছিল, না। বনশ্রী রাগ করল কিনা কে জানে, টেলিফোনে মুখ দেখতে পাওয়া যায়না।

ব্যবসায়িক সম্পর্কই থাক।

"And I am desolate and sick of an old passion"—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইনটা বার বার আবৃত্তি করছে ইন্দ্রজিৎ—একটা 'ফিক্সেশন'-এর মতো ওটা যেন তার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে। কিন্তু বনশ্রী সম্বন্ধে সত্যজিতের "old passion"-এর শিরা আর অসাড় নেই—বনশ্রীরও কি আছে? এখন স্মৃতি কেবল খানিকটা অস্বস্তি বয়ে আনে। দেওয়ালের গায়ে সেই পুরোনো হরিণের সিং, সেই বুড়ো ওয়াল্‌নাটটা, হলদে হয়ে আসা সেই বহু চেনা ছবিগুলো এখন কেবল সাময়িক বিভ্রান্তি জাগায়—একটা অর্থহীন পিছুটানে মনকে ক্লান্ত করে তোলে। ওই বাড়ীটা থেকে দূরে থাকাই ভালো। এখন বীরেনের ওখানে দেখা হওয়াই সব চাইতে নিরাপদ। দেওয়ালে ছায়াপোকার রক্তচিহ্ন, দড়িতে ঝোলানো ময়লা গেঞ্জী আর রং-চটা লুঙ্গি, একঠোঙা জিলিপি আর ঠাণ্ডা হয়ে আসা দুধরোর মতো গন্ধওলা কালো রঙের চা—এরই মধ্যে বসে বনশ্রীর সঙ্গে সে স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পারে। রেট—কর্ষা—পার্সেন্টের র‍্যাদটি—

বীথি এল।

—আমার এই লেখাটা একটু দেখে দেবে ছোট্‌দা?

—কী লিখেছিস? সাব্‌স্ট্যান্স্, না এসে?—বনশ্রীর একটা দীর্ঘ প্যারাগ্রাফকে সংক্ষিপ্ত করতে করতে চোখ না তুলেই সত্যজিৎ জিজ্ঞাসা করল।

—খালি মাস্টারি ছাড়া আর কিছু বুঝি মনে আসেনা ছোট্‌দা?

ব্লটিং প্যাডের ওপর কলমটা ঝেড়ে নিয়ে সত্যজিৎ বললে, কী করে মনে আসবে? বি-এ পড়ছিস, তবু লিখবি টু দেয়ারস্ অব আইজ্—

—আমরা তো আর ইংরেজির প্রোফেসার হতে যাচ্ছি না—ভাবপ্রকাশ করতে পারলেই হল। আর বিক্‌পাল প্রফেসাররাই সবাই বুঝি নির্ভুল লেখে? নামের আগে ডক্টর লিখে পরে যখন পি এইচ্-ডি লেখে তখন সেটা বুঝি শুদ্ধ ইংরেজি হয় দাদা? নাকি ওকে আর্ষ প্রয়োগ বলে?

পাকামো করতে হবে না তোকে—সত্যজিৎ হেসে ফেলল: এখন কাজ করছি, পরে আসিস। দেখে দেব সাব্‌স্ট্যান্স্।

—সাব স্ট্যানড্ নয়—একটা অ্যাপীল। ঠিক করে যাও না একটু। পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।

—আচ্ছা ঠিক আধঘণ্টা পরে আসিস। এটা এক্ষুণি না দেখে রাখলেই নয়। রীতেন নিতে আসবে ন'টার পর।

—ওঃ—রীতেন বাবু।—মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বনশ্রী বললে, তোমাকে ডিস্টার্ব করতে চাইনা ছোট্‌দা—কিন্তু একটা কথা বোধ হয় বলা দরকার। রীতেনবাবুর সঙ্গে দিদির মেলামেশা বোধ হয় একটু কন্‌ট্রোল করা দরকার।

পরশু সন্ধ্যায় রীতেনের সঙ্গে প্রীতিকে ট্যাক্সি করে গড়ের মাঠের দিকে যেতে দেখার পর থেকেই এই কথাটা সত্যজিৎকেও পীড়ন করছিল। সেদিন যখন প্রোগ্রাম হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে প্রীতি বাড়ীতে ফিরল, সেদিন প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সে পারেনি—কেমন একটা সংকোচ এসে বাধা দিলে। আজ বীথি আবার সেইটেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বীথির সামনে জিনিসটা সে হালকা করে দিতে চাইল। মুখার্জি ভিলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে-সাপেরা এসে বাসা বেঁধেছে তাদের কাছ থেকে বীথি দূরেই থাক। এই বাড়ীতে ও-ই সব চাইতে সচেতন, সব চেয়ে সুস্থ—ওরই কপালে সূর্যের আলো পড়েছে। কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বীথি যখন বক্তৃতা করছিল, তখনই সে আলোটা দেখতে পেয়েছে সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ হাসল।

—তুই তো প্রোগ্রেসিভ। এ সব ব্যাপারে তোর এমন ছোঁয়াচে ভাব কেন?

—প্রোগ্রেসিভ্ কথাটার অন্য মানে আছে ছোট্‌দা। রীতেনবাবু—মানে, লোকটা এক নম্বরের বাঁদর।

—ট্রু, স্ট্রং ল্যাংগুয়েজ।—সত্যজিৎ হাসতে চেষ্টা করল: তা ছাড়া প্রীতি ছেলেমানুষ নয়। নিজের ভালোমন্দ সে বোঝে।

—না ছোট্‌দা—বোঝে না। গান ছাড়া আর কিছুই ও বুঝতে পারে না। একটু স্টেপ নেওয়া উচিত বোধ হয়।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুই এখন যা দেখি, আমাকে হাতের কাজটা শেষ করতে দে।

বীথি ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কথা বোধ হয় তার শেষ হয়নি। খুব সম্ভব আরো কিছু বলতে চেয়েছিল।

কিন্তু বীথি থাক। এ-সবের মধ্যে ওর আসবার দরকার নেই। মুখার্জি ভিলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাপেরা বাসা বেঁধেছে, কিন্তু এরই মধ্যে একটি ফুলের মত ফুটেছে বীথি। ও ওর মতো করেই থাকুক—এখানকার কোনো গ্লানি যেন ওকে স্পর্শ না করে।

সংশয় সত্যজিতের নিজের।

বাইরে আলোর খবর সেও যে জানে না তা নয়। যখন কলেজে পড়ত, তখন অনেক সোডাওয়াটার তাকেও আগে আগে চলতে হয়েছে, আকাশে মুঠো তুলে ধরে সে-ও গর্জন করেছে নতুন জীবনের প্রোগ্রাম। তারপর চাকরি হল কলেজে। তখন মনে হল, পুরোনো ধরনের মহাজন পথ দিয়ে সে চলবে না। নতুন কথা বলবে, নতুন আলোয় ব্যাখ্যা করবে সাহিত্যকে—মাথু আর্নল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নয়—রোমান্টিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য—শ্রমিকের সংগ্রামে শেলী-কীটস্—বায়রনের আসল ভূমিকা সে এনে ধরবে ছাত্র ছাত্রীর সামনে।

কিন্তু।

কিন্তু আশ্চর্য একটা নিয়ম আছে জীবনের। ঠিক নিবে আসে সমস্ত। আকাশ পৃথিবী-সমাজ—সব কিছু মিলে যেন একটা বিরাট পাকযন্ত্র। নিঃশব্দে জীর্ণ করে নিচ্ছে সব। সকলকেই। কেউ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়—কারো দেরি হয় একটু। এর বেশি কোন তফাৎ নেই।

পেসিমিজম্? হয়তো তাই। এই কুলটাই পেসিমিজমের। পৌরানিক গল্পের অভিশপ্ত আত্মা। একটা ভারী পাথরকে ঠেলে ঠেলে তুলছে পাহাড়ের চূড়োয়। কিন্তু পাথরটা সেখানে দাঁড়াবেনা—গড়িয়ে নেবে আসবে আবার ঠেলে তুলতে হবে। এই চলছে, এই চলবে। সব স্বপ্ন, সব চেষ্টা, সব মননের এই-ই পরিণাম।

কিন্তু এ-সব কী ভাবছে সত্যজিৎ? এ তার নিজের কথা নয়। তার মধ্যে লুকোনো মুখার্জি ভিলার আত্মার কণ্ঠস্বর শুনছে সে। যে আত্মা ক্লান্ত, যে আত্মা নিজের জীর্ণতার ভার আর বইতে পারছে না, এই বাড়ীর ঘরে ঘরে জমানো ছায়ায় আর বারান্দার অন্ধিতে কাঁপা কাঁপা কঙ্কাল আঙুলে যে আত্মার অন্তিম আর্তি।

যে ফুরিয়ে গেছে, সে নিশ্চিন্ত; যে বাঁচতে চলেছে তার পথ পুবের দিকে। একজন নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে তিল-তিল করে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, আর এক-জনের আকাশ আশার রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সত্য-জিতের মতো যারা দাঁড়িয়ে আছে সীমান্ত রেখায়—যাদের দিনের আকর্ষণ আছে অথচ রাত্রির মোহ কাটেনি—তারাই সব চেয়ে বিপন্ন। আজ পৃথিবীতে কেবল সত্যজিৎ নয়—তার মতো অসংখ্য মানুষ এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রহর গুণছে। মোহ ভেঙেছে অথচ বিশ্বাস আসেনি, অথবা বিশ্বাস করতে গিয়েও জোর পাচ্ছে না।

ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে একা সত্যজিৎ নয়—তার মতো অগণিত বুদ্ধিজীবী। এ যুগ তাদেরই।

সিঁড়ির নিচের ঘড়িটায় বিকৃত শব্দ করে ন'টা বাজল। সর্বনাশ—কী হচ্ছে সত্যজিতের। এখনই যে রীতেন আসবে!

সত্যজিৎ লেখায় চোখ নামালো। অন্তত আরো চার পাঁচটা পাতা শেষ করে দেওয়া দরকার।

রীতেন এল আধঘণ্টা পরে।

দুষুর কাছ থেকে খবর পেয়ে সত্যজিৎ কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল মিনিট দশেকের মধ্যেই। সিঁড়িতেই বীথির সঙ্গে দেখা। দাঁড়িয়েছিল চুপ করে।

—তাখো গে যাও। দিদিকে মুগ্ধ করবার জন্যে রীতেনবাবু—

সত্যজিৎ ধমক দিয়ে বললে, তোকে আর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না—নিজের কাজে যা।

বীথির মুখ লাল হয়ে উঠল।

—মিথ্যেই আমার গাল দিলে ছোড়দা। ভালো কথাই বলতে চেয়েছিলুম।—বীথি সশব্দে ওপরে উঠে গেল।

নিচের ঘরে প্রীতি তেমনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে—হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে রীতেন।

—ডার্লিং কে—হাউ ইউ সীন ডার্লিং কে? আহ—হি ইজ সামথিং—

সত্যজিৎ ঘরে পা দিলে। রীতেন থামল।

একটা শক্ত কথা মুখে এসেছিল, সত্যজিৎ নিজেকে সংযত করলে। তারপর রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে, দাড়ি কামিয়েছ নাকি হে?

রীতেন লজ্জা পেলো।

—ইয়ে, মানে সত্যদা—একটু বোধ হয় কমিক্যাল দেখাচ্ছিল—

—বেটার লেট দ্যান নেভার রীতেন—সত্যজিৎ কঠিন ভঙ্গিতে হাসল: কিন্তু কেবল দাড়ি নয়, তোমার আরো অনেক কিছুই কমিক্যাল। যাই হোক—এখন আর তার কে-র মহিমা বর্ণনা করতে হবে না—এই লেখাটা নিয়ে চটপট চলে যাও। বেলা দশটার মধ্যে প্রেসে পাঠাতে হবে। বনশ্রী বলেছে, এরই জন্যে আজ প্রেস খোলা থাকবে।

রীতেনের মুখ কালো হয়ে উঠল! শুধু তাড়াতাড়ি লেখাটা নিয়ে যেতে বলাই নয়—সত্যজিতের কথার মধ্যে আরো একটা ইঙ্গিত আছে।

রীতেন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। মুখের রক্ত শাদা হয়ে আবার কালো হল। তারপর জোর করে হেসে বললে, অল রাইট সত্যদা, আমি যাচ্ছি।

লেখাগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল রীতেন, যাওয়ার আগে পেছন ফিরে আর তাকালো না। মিনিট খানিকের মধ্যেই বাইরে খট্ খট্ করে আওয়াজ উঠল—গ্লোব ট্রটার রীতেন দি গ্রেটের মোটর সাইকেলটা নেমে গেল রাস্তায়।

সত্যজিৎ আবার ফিরে চলল সিঁড়ির দিকে। প্রীতি বসে ছিল চুপ করে। সত্যজিতের কথার অর্থ বুঝেছে কি না কে জানে—কিন্তু প্রীতির মুখের দিকে একবার সে তাকিয়েও দেখল না।

মা এসে বললেন, কোথায় বেরুচ্ছিস?

দেওয়ালের পেরেক থেকে পুরোনো চামড়ার ব্যাগটা নামাচ্ছিল পূরবী। বললে, টিউশনিতে।

—আজ রবিবারে আবার কিসের টিউশনি?

—সামনে পরীক্ষা আছে মা। বিশেষ করে যেতে বলেছে।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, বিশেষ করে যেতে বললেই যেতে হবে? অত বড় লোক, ঘণ্টায় পাঁচদিন করে যেতে হয়, অথচ মাইনে দেবে মোটে কুড়ি টাকা। যেতে হবে না আজ।

পূরবী হাসল, জবাব দিলনা। ব্যাগটা হাতড়ে পরীক্ষা করতে লাগল, ট্রামে যাওয়ার খুচরো পয়সা আছে কিনা।

—এত কষ্ট করে এ ভাবে তোকে আর পড়তে হবে না। উনি একটি ছেলের খোঁজ পেয়েছেন।—মা উল্লসিত গলায় বললেন, ছেলেটি এবার এম কম পাস করেছে। বাপের ব্যবসা আছে, অবস্থা ভালো। বলেছে মেয়ে পছন্দ হলে টাকা পয়সা—

পূরবী বিরক্তিতে জ্বলে উঠল হঠাৎ।

—কী বকছ মা পাগলের মতো?

মা বললেন, পাগলের মতো আবার কী হল? ভালো ছেলে—

—চুলোয় যাক ভালো ছেলে। সরো, আমি বেরুব—

কিন্তু মুখ ফিরিয়েই পূরবী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দোর গোড়ায় সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ বিচিত্র হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে বললে, ওভারহিয়ার করে ফেলেছি। কিন্তু কাকিমার প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবার মতো।

হাতের ব্যাগটা সামনের টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পূরবী পাশের ঘরে পালিয়ে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় .

হুমায়ুনশেখর চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তানঃ ৩২৮ (ইনতিয়াজ আমেদ ১২১, মেধিয়াস ৭৭, সৈয়দ আমেদ ৫২। এ্যাটকিনসন ৪২ রানে ৫ উইকেট) ও ২৮৮ (ওয়াজির মহম্মদ ১০৬, কারদার ৫৭)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজঃ ৭৯০ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হাণ্ট ২৬০, সোবার্স নট আউট ৩৬৪, ওল্লালকট নট আউট ৮৮)

কিংষ্টোনে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৭৪ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে।

খেলার ২য় দিনে লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভের কিছু পরেই পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩২৮ রানে শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসের খেলায় ১ উইকেটে ১১৭ রান করে। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য ফাষ্ট বোলার মামুদ হোসেন মাত্র ৫টা বল করার পরই উরুর মাংস পেশী সঙ্কোচনের দরুণ মাঠ থেকে বরাবরের জন্যে বিদায় নেন্। পাকিস্তানের অধিনায়ক এবং স্পিন ফাষ্টা বোলার কারদার ভাঙ্গা আঙ্গুল নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন এবং সে অবস্থাতেই ৩য় দিন ২২ ওভার বল দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রধানতঃ ফজল মামুদ, খান মহম্মদ এবং ১৬ বছরের তরুণ লেগ স্পিন বোলার নাসিমুল গণির উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল পাকিস্তানের এই দুর্ব্বলতার যথেষ্ট সুযোগ নিয়ে মনের সুখে খেলেছিল।

খেলার ৩য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপুল ৭০১ রান ওঠে, এক উইকেট পড়ে। সি হাণ্ট এবং গারফিল্ড সোবার্স ২য় উইকেটের জুটিতে ৫১৭ ক'রে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ২য় উইকেটের জুটিতে নতুন টেষ্ট রেকর্ড করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ২৯৫ রান। হাণ্ট (২৪২ রান) এবং সোবার্স (২২৮ রান) নট আউট থাকেন।

খেলার ৪র্থ দিনে ৩ উইকেটে ৭৯০ রান উঠলে পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ডাঁটা খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স নট আউট ৩৬৪ রান ক'রে এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক রানের বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল লেন হাটনের ৩৬৪ রান। ইংলণ্ডের লেন হাটন ১৯৩৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই ৩৬৪ রান করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন।

কোনার্ড হাণ্ট এবং গারফিল্ড সোবার্স ২য় উইকেটের জুটিতে ৪৪৬ রান করেন। তাঁরা প্রায় আর একটি বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

২য় উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড হ'ল ব্রাডম্যান এবং পোন্সফোর্ডের জুটিতে ৫৪১ রান; সুতরাং বিশ্ব রেকর্ড ভাঙ্গতে মাত্র ৭ রান বাকি ছিল। ওপনিং ব্যাটস-ম্যান হাণ্ট ২৬০ রানে রান আউট হ'লে প্রায় রগ ঘেঁসেই হাণ্ট এবং সোবার্স লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'ন।

সোবার্স নিজস্ব ৩৬৪ রানের মাথায় ফজল মামুদের বলে একরান নেন এবং ৩৬৫ রান ক'রে বিশ্ব রেকর্ড করেন। শেষ পর্য্যন্ত সোবার্স নট আউট থেকে যান। এই ৩৬৫ রান তুলতে সোবার্সকে ১০ ঘণ্টা ৮ মিনিট ব্যাট করতে হয়েছিল। অপর দিকে হাটন ৩৬৫ রান করতে ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় নিয়েছিলেন।

খেলার ১ম দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের থেকে ৬৪২ রানের বাবধানে থেকে পাকিস্তান ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে ৭ উইকেটে হারিয়ে ৫১১ করে। ইনিংস পরাজয় থেকে রেহাই পেতে তখনও তাদের ১৮১ রানের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২৮৮ রানে শেষ হ'লে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ ইনিংস ও ১৭৪ রানে জয়ী হয়। হানিফ মোহম্মদ এবং নসীমুল গনি আহত থাকায় ব্যাট করেন নি।

পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ১ম টেষ্ট ড্র গেছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ও ৩য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়েছে। এখনও ৪র্থ ও ৫ম টেষ্ট খেলা বাকি। এ অবস্থায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে টেষ্ট সিরিজে হার স্বীকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং তাদের জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পোর্ট এলিজাবেথে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে পরাজিত করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে ১ম ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার ২১৬ রান ওঠে। ঐ দিন অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করার সময় ছিল না।

২য় দিন ৬ উইকেট পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার ২০৮ রান ওঠে। ৩য় দিন অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৯১ রানে শেষ হয়। ৪র্থ দিন চা-পানের কিছুক্ষণ পরেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংস মাত্র ১১২ রানে শেষ হয়। ২য় ইনিংসে ২ উইকেট পড়ে ৬৮ রান উঠলে পর অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২১৪ (টেফিল্ড ৬৬ ; ফ্রিম্যান ৩৩ রানে ৫ এবং ভেন্টিডসন ৬৪ রানে ৪ উইকেট পান) ও ১৪৪ (ভেন্টিডসন ৩৮ রানে ৫ এবং সেনড ৮৪ রানে ৫ উইকেট পান)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৯১ (ম্যাকডোনাল্ড ৫৮) ও ৬৮ (২ উইকেটে)।

সন্তোষ ট্রফি ঃ

১৯৫৭ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী হায়দ্রাবাদ ৩—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত ক'রে 'সন্তোষ ট্রফি' লাভ করেছে। ১৯৫৭ সালের প্রতিযোগিতা ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়। হায়দ্রাবাদ সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ২—১ গোলে বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করে। সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুই দল সার্ভিসেস ও বাঙ্গলা দলের মধ্যে যে খেলা হয় সে খেলায় সার্ভিসেস দল ১—০ গোলে বাঙ্গলাকে পরাজিত ক'রে সান্ত্বনা কাপ জয়ী হয়। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দল ৮ বার, বোম্বাইদল ১ বার এবং হায়দ্রাবাদদল ২ বার সন্তোষ ট্রফি জয় লাভ করেছে।

ইণ্টইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন

চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

রবি ষ্টেডিয়ামের 'ইনডোর ষ্টেডিয়ামে' অনুষ্ঠিত ইষ্টইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : ভান ওয়াই হক্ (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১০, ১৫—৯ পয়েণ্টে এডিট ইন্দুককে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : গজানন হেমাড়া এবং বিক্রম ভাট (বাংলা) ১৫—১১, ১৫—৯ পয়েণ্টে অমৃতলাল সেওয়ান এবং শামসেদ আলীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : অমৃতলাল সেওয়ান এবং মিস এম সুইনী ১৫—৭, ১৫—৪ পয়েণ্টে বিক্রম ভাট এবং মিস এইচ সুইনীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিসেস নীলিমা ঠিক্ ১১-২, ১২-১০ পয়েণ্টে মিসেস মীরা দাসকে পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার-ফাইনালে বাংলা ১০ উইকেটে হায়দ্রাবাদকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে ওঠে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল : **বাংলা ঃ** ৩১০ (আর সান্যাল ৭৩, দি রায় ৫৩) ও ৪ (কোন উইকেট না পড়ে)

হায়দ্রাবাদ ঃ ১২২ (কাদকার ৩৩ রানে ৩ এবং কে মিত্র ১৯ রানে ৩ উইকেট পান) ও ১৮৮ (কাদকার ৭৭ রানে ৫, এস বসু ১৯ রানে ৩ উইকেট পান)

আগা খান হকি ঃ

আগা খান হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে বোম্বাইয়ের যাঁধা-সেল স্পোর্টস ক্লাব ২-১ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ক্লাবকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় কোন পক্ষই গোল দিতে পারে নি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

অনিবার্য্যকারণে এই সংখ্যায় শ্রীবিমল মিত্রের পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত গল্পটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না —আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

—ভাঃ সঃ

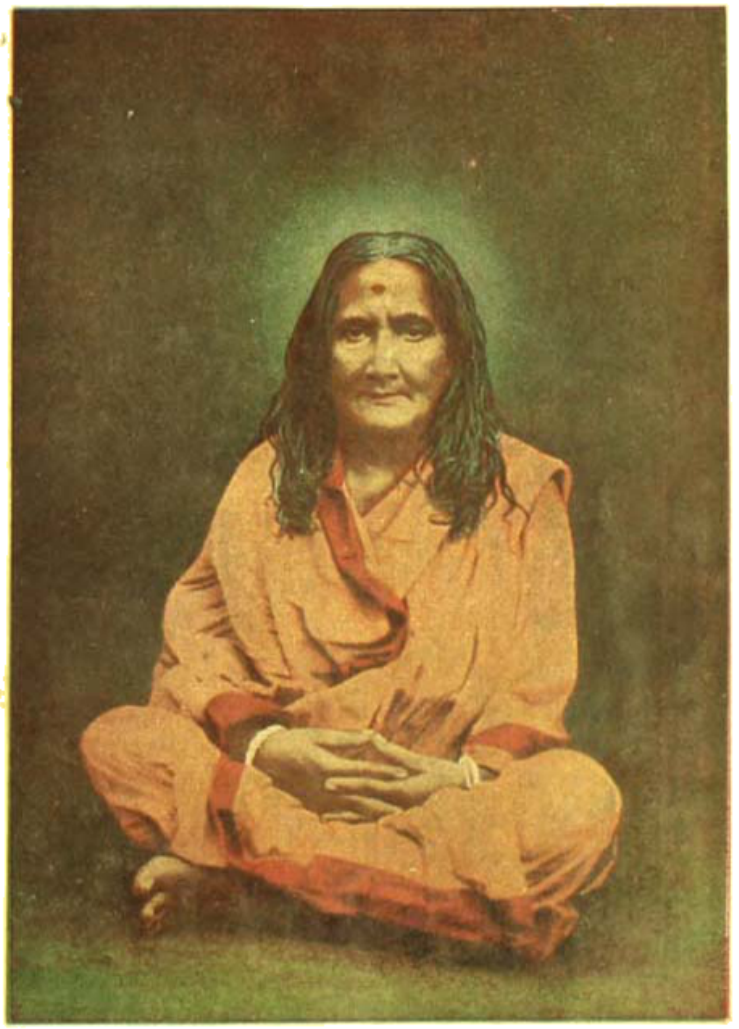

তপস্বিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIV

ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বেদ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক মত

শ্রীঅরবিন্দ

বেদের আক্ষরিক ব্যাখ্যাকেই চরম সত্য বলে সায়ন তাঁর ভাষ্যে যে অমোঘ প্রামাণ্যতার মোহর এঁটে দিয়েছিলেন তা ভাঙা হল বহু শতাব্দী পরে, এক বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসার ফলে। সনাতন শ্রুতি এবার পড়ল যে পণ্ডিতদের হাতে, প্রচুর তাদের শ্রমশীলতা ও উদ্ভাবনপটুত্ব এবং নিঃসঙ্কোচ আলোচনার ও ব্যাপক সিদ্ধান্ত অনুমানের সাহস; নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিমত ন্যায়-নিষ্ঠতাও তাদের কম নয়। কিন্তু পুরাকালের আত্মদ্রষ্টা হৃৎ-কমল-মধুমত্ত মিস্টিক কবিদের রূপক-প্রতীকের ভাব বুঝতে তারা একেবারেই অক্ষম। কারণ, প্রাক্তন মনোবৃত্তির সঙ্গে কোন সহানুভূতি তাদের নাই, আর বেদে রূপক কাহিনীর দরুণ আচ্ছাদিত সত্যের রহস্য ভেদের কোন সূত্র তারা তাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে পায় নাই। ফল হয়েছে দু-রকমের—একদিকে বেদের ব্যাখ্যা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে আরও স্বাধীন; অন্যদিকে আবার আপাতবোধ্য জড়বাদী তাৎপর্যকেই চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বেদের প্রকৃত আধ্যাত্মরীতি সত্য চাপা পড়ে গেছে।

কিন্তু কল্পনার এমন সাহস ও উদ্ভাবন আবিষ্কারের এমন

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত সেন

স্বাধীনতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বেদচর্চা কোথাও সায়ন ভাষ্যে লক্ষিত চিরাগত উপাদানের ভিত্তির বাইরে যায়নি, এ সম্ভার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করবার কোন চেষ্টা করে নি। ব্রাহ্মণে ও সায়ন ভাষ্যে যা পেয়েছে, আধুনিক জ্ঞান ও সংস্কারের আলোকে তারই বিস্তার করেছে। হাতে সামান্য যা তথ্য আছে—তা থেকে অথবা নিপুণ কল্পনার সাহায্যে তাকে প্রসারিত ক'রে, সুচতুর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং এখানে ওখানে যে নির্দেশ সব পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করেছে; পরে, সে সব নিয়ে, ইতিহাস-দেবতাতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতিতে প্রযোজ্য তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিতে, বৈদিক ইতিহাস ও বৈদিক সভ্যতার একটা সম্পূর্ণ চিত্র অনুমান ক'রে নিয়েছে। তার সুস্থ বর্ণনা ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা আমাদের মুগ্ধ করে এবং তার পদ্ধতির আপাতনিশ্চয়তার নীচে প্রকৃত সত্য ঢাকা পড়ে যায় যে, এই চোখ ধাঁধান ইমারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, বেশীর ভাগ, কল্পনার চোরাবালির উপর।

বেদ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের গোড়ায় একটা সংস্কার রয়েছে যে, বেদ হল এক আদিম মানবগোষ্টির পূজা-অর্চনার শুরুসোপান, সে জাতি তখন বহুলাংশে অসভ্য ছিল, নীতি-ধর্ম সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল অমার্জিত, সমাজ-গঠন ছিল অসংহিত এবং চারিদিকের বিশ্ব-সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল একেবারেই বালোচিত। এ সংস্কারের জন্য দায়ী সায়ন; তবে তিনি সে সবকে দিব্যজ্ঞানের অঙ্গ ব'লে মেনে নিতেন, তার অতিপ্রাকৃত ফলপ্রসূতায় বিশ্বাস করতেন, আর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে এসব হল প্রাকৃতন অসভ্যদের পূজাপার্বণের অনুবৃত্তি। আদিম মানব মনে করত যে, প্রবল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সব সত্তা আছেন, পূজা পেলে তাঁরা সদয় হন এবং না পেলে অপকার করেন এবং সেই সব কাল্পনিক দেবতাদের তুষ্ট রাখবার জন্য নানা বলি-পূজা দিত। বৈদিক অনুষ্ঠান সব তারই বিবৃতি। সায়নের মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান যা কিছু আছে তা লুকে নিয়ে, সব গাথার নূতন অনুবাদ দিয়ে ও পরোক্ষ ইঙ্গিতের নূতন অর্থ বার ক'রে, সে সবকে পল্লবিত ক'রে, পরম আগ্রহে বর্বর জাতির আদিম ইতিহাস, সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র-নীতি বিষয়ে সব তথ্য আবিষ্কার করতে লেগে গেল। সায়নের নিসর্গমূলক উপাদান আদর পেল আরও বেশী। কোন কোন বৈদিক দেবতার বাহ্যবিভবের সঙ্গে কোন কোন নিসর্গশক্তির অভেদ সুস্পষ্ট, তা থেকে হল আর্যজাতির দেবতাতত্ত্বের তুলনামূলক অধ্যয়নের আরম্ভ। আর কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত দেবতার সঙ্গে কোন কোন সৌরশক্তির মিলের কিছু আভাস পেয়ে, সে অদ্ভুত সাদৃশ্যকে আদি যুগে দেবতাতত্ত্ব গঠনপ্রণালীর সাধারণ নির্দেশ ব'লে ধরে নেওয়া হল। সেই ভিত্তির উপর নির্মিত হল তুলনামূলক দেবতাতত্ত্বের অধীভূত সৌর ও নাক্ষত্র কাহিনীর বিশাল প্রকল্প, (theory) এই নূতন অনুষ্ঠানের আলোকে মহনীয় বেদ-গাথার মধ্যে কতকগুলির ব্যাখ্যা করা হল নৈসর্গিক ঘটনার অর্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্ধরূপক কবিতারূপে, আর বেশ কতকগুলিতে জ্যোতিষিক তথ্য পাওয়া গেল, বাকী যা—তার কতকটা সম-সাময়িক ইতিহাস, কতকটা যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্র ও বিধি—অপরোক্ষ জ্ঞান নয়, শুধু অনুন্নত বর্বর জাতির কুসংস্কার।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সমাজে আদিম মানব-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত ছিল; তার একটা হল যে, বর্বর জাতি থেকে বর্তমান সভ্য মানব আবির্ভূত হয়েছে সম্প্রতি। এ ধারণা এখনও প্রবল রয়েছে এবং তারই অনুগামী হল বেদের এই ব্যাখ্যা। কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে, অল্প তথ্যের উপর স্থাপিত এই সব ক্ষিপ্র ও প্রাথমিক সাধারণ সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি টলে গেছে। এখন আমরা জানি যে চীন-মিশর-কালদিয়া-আসিরিয়াতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, আর এখন প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে যে, এসিয়ার ও ভূমধ্যসাগর-তীরের জাতিগুলির মত উন্নত সংস্কৃতি গ্রীসে এবং ভারতেও ছিল। তবে, সে উন্নত সভ্যতার গৌরব বৈদিক ভারতীয়দের দেওয়া হয়নি। তার কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রবর্তিত ও এখনও প্রচলিত আর একটা ধারণা যে, বৈদিক ভারতীয়েরা তথাকথিত আর্যজাতীয়, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল যে স্তরের, তার রূপ আমরা দেখি হোমারের কবিতায়—প্রাচীন আর্যজাতীয় গ্রীক, কেল্ট ও জার্মানদের বর্ণনাতে, প্রাচীন নরোয়ের (saga) সৌরাণিক গাথাতে, রোমক সাহিত্যে প্রাচীন গল ও টিউটনদের বর্ণনাতে। আর এই অনুমানের উপর স্থাপিত হয়েছে অপর এক সিদ্ধান্ত যে, আর্যেরা ছিল উত্তর মেরুর বর্বর জাতি এবং শীতপ্রধান বাসভূমি থেকে

তারা ভেঙে পড়েছে ভূমধ্যসাগরপারের ও দ্রাবিড় ভারতের সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতার উপর।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর্য আক্রমণের সপক্ষে বেদ থেকে যে সব নির্দেশ উদ্ধৃত হয়েছে তার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং তার তাৎপর্য অনিশ্চিত। কোথাও সাক্ষাৎভাবে এ অভিযানের উল্লেখ নাই। নির্ভর করা হয়েছে আর্য-আর্যে প্রভেদের উপর, কিন্তু সর্বসাকল্যে প্রমাণগুলি দেখলে মনে হয় যে সে পার্থক্য সাংস্কৃতিক, জাতিগত নয়(১)। বেদের ভাষা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আর্য্য বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন হল তার নিজস্ব পূজা ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—আলোকের ও আলোকের শক্তির পূজা ও 'সত্যম্' এর অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্ম-সংযমন শিক্ষা এবং অমৃতত্বের অভীপ্সা—'ঋতম্' ও অমৃতম্। জাতিগত প্রভেদের কোন নির্ভরযোগ্য উল্লেখ নাই। অসম্ভব ও নয়ই যে, ভারতের বর্তমান অধিবাসীদের বেশীর ভাগ উত্তরদেশ থেকে আগত, এমনকি, টিলক যেমন বলেছেন হয়ত: সুমেরুপ্রদেশ থেকে আগত কোন নূতন জাতির বংশধর; কিন্তু বেদে, অথবা দেশের বর্তমান অধিবাসীদের দেহগঠন বা আকৃতিতে এমন কিছু নাই—যা থেকে প্রমাণ হয় যে বেদরচনার সমকালে এই অবতরণ হয়েছিল বা গৌরবর্ণ কোন বর্বর জাতির ছোট ছোট দল সুসভ্য দ্রাবিড় অধ্যুষিত এই উপদ্বীপে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল (২)।

আর যদি ধ'রেও নেওয়া হয় যে, কেল্ট, টিউটন, গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা এক সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতির নমুনা, তাহলে আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে—তাথেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সে-আর্য সংস্কৃতি অপুষ্ট বা অমার্জিত ছিল। আর্য জাতির বৈশিষ্ট্য হল বাহ্যজীবন যাত্রাতে ও তার ব্যবহারে একটা পবিত্র, উন্নত সরলতা, পূজার দেবতাদের ধারণাতে একটা ব্যাপ্ততা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধে একটা জীবন্ত মানবীয় অন্তরঙ্গতা। অন্যদিকে, মিশরীয় ও কালদীয় সভ্যতা ছিল ভোগবহুল, চাকচিক্যময় ও জড়বাদী এবং তাদের ধর্ম ছিল সমারোহপূর্ণ, রহস্যময়। এই ছিল তাদের পার্থক্য। কিন্তু আর্যদের প্রকৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্যই উন্নত আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতির পরিপন্থী নয়; বরং অনেকস্থলে আমরা মহৎ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ পাই, যা প্রচলিত মত-বাদের প্রতিকূল। প্রাচীন কেল্টিক জাতিদের মধ্যে উচ্চতম দার্শনিক ধারণাই অনেকগুলিই ছিল, এবং এখনও বেশ বুঝা যায় যে, আধ্যাত্মিক অনুভব ও বোধিদীপ্তি থেকে সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছিল; আর দীর্ঘকালের সাধনায় ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে অতিশয় সুপরিণত না হলে সে-আধ্যাত্মিকতার ছাপ এতদিন স্থায়ী হত না। গ্রীসেও খুব সম্ভব সেই প্রণালীতেই Orphens দেবের ও Elensis দেবের গুপ্তসাধনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হেলেনীয় আদর্শের বিশিষ্ট রূপ গড়ে উঠেছিল, এবং গ্রীক দেবতা-কাহিনী আমরা যে-আকারে পাই তাতে মনস্তত্ত্বের এমন সব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে তাও মনে হয় Orphic গুহ্য বিদ্যা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর এই সাধারণ প্রগতিধারার অনুযায়ী হয় সে তথ্য—যখন আমরা দেখি যে, বৈদিক পিতৃপুরুষেরা আমাদের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা ও চিন্তা ভাবনার যে বীজ বপন করে গিয়েছেন, ভারত সভ্যতাতে আবহমানকাল তারই পরম্পরাক্রমে

---

(১) বলা হয় যে, বেদের বর্ণনাতে দস্যুদের কৃষ্ণবর্ণ ও নাসিকাহীন এবং আর্যদের গৌরবর্ণ ও সুনাসিক বলে উল্লেখের প্রয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণবৈষম্য উল্লেখ করা হয়েছে শুধু আর্যদেবতা ও দাসশত্রুদের সম্বন্ধে আলো-অন্ধকার অর্থে, এবং 'অনাস' শব্দের অর্থ নাসিকাহীন নয়। তা যদি হত, তাহলে দ্রাবিড় জাতি সম্বন্ধে সে বিশেষণ মোটেই প্রয়োগ করা যেত না; কারণ ঋষিদের নাসিকা উত্তরের যে কোন আর্য নাসিকার সঙ্গে তুলনায় স্পর্ধা রাখে।

[আর, প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, মহাভারতের কৃষ্ণ-অর্জুন-দ্রৌপদী, বেদব্যাস-কৃপ-দ্রোণ, সবাই কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। এবং 'অনাস' শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে মাত্র একবার আছে, (৫।২৯।১০)। সায়ন তার অর্থ করেছেন "আস্যরহিত,—আস্য অর্থে শস্য,—অন্নভুক্।" আর গ্রিফিথ অনুবাদ করেছেন They have no force of Divine breath or mouth to speak it. (On the Veda, পৃঃ ২৬৮)।

(২) ভারতবর্ষে আমরা সচরাচর আনি বিভিন্ন ভারতীয় জাতির

সাধারণ প্রভেদ এবং তা থেকে প্রথম অনুমানসব সব সাধারণ নিয়মের উপর স্থাপিত রিজলি সাহেবের নানা আলোচনা ও বাহ্যিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরিণতির নৃতত্ত্ব সে সব তাত্ত্বিক প্রমাণ অগ্রাহ্য করেছে এবং বলেছে এই সিদ্ধান্তের দিকে যে, সমস্ত ভারতে এক সমগোষ্ঠী জাতি বাস করে।

বিকাশ হয়েছে। মানব জাতির শৈশবের এই সব প্রাথমিক সাংস্কৃতির প্রভাবে আধুনিক মানবের সব প্রধান আদর্শ, তার চরিত্রের সব মূল উপাদান এবং ধর্ম-চিন্তা—শিল্প-কলার সব শ্রেষ্ঠ ধারা আজও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; এত প্রবল যার প্রাণশক্তি, আদিম বর্বরতা থেকে যে সংস্কৃতির উদ্ভব হতে পারে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গভীর যোগাযোগ বিকাশের ফল সেসব।

মানবপ্রগতির এই অপরিহার্য অবস্থা স্বীকার না ক'রে তুলনামূলক দেবতাতত্ত্ব (Comparative Mythology) আদিম মানবের সব পৌরাণিক কাহিনীর তাৎপর্য বিকৃত ক'রে ফেলেছে। তার ব্যাখ্যা স্থগিত হয়েছে যে প্রকল্পের উপর—তাতে আদিম অসভ্য মানব এবং প্রেটো বা উপনিষদের যুগে আর কিছুই দেখেনি, ধরে নিয়েছে যে, পুরাকালের সব ধর্মের মূলে রয়েছে আদিম মানবের বিস্ময়: হঠাৎ চোখ মেলে সে দেখল উষা, রাত্রি, সূর্য, এই সব অদ্ভুত পদার্থের অস্তিত্ব, সে সব আশ্চর্য ব্যাপারের যে ব্যাখ্যা করল তার অমার্জিত বর্বর কল্পনার সাহায্যে, তা থেকেই হল তার ধর্মবোধের উদ্ভব। আর সেই শিশুসুলভ বিস্ময় থেকে এক পদক্ষেপে আমরা গ্রীক-দর্শনের ও যৌক্তিক কবিদের গভীর তত্ত্ববাদে উপনীত হয়েছি। এই তুলনামূলক দেবতাতত্ত্ব সৃষ্ট হয়েছে গ্রীস-ভক্তদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গ্রীসের বাইরের সব ব্যাপার ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা থেকে; কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে গ্রীক মনোবৃত্তির যে ধারণা রয়েছে তা ভ্রান্তিমূলক। ধৈর্যহীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়, এ-দেবতা-তত্ত্বের পদ্ধতি হল কবিসুলভ কল্পনাবিলাস।

সে পদ্ধতির ফলে যা গড়ে উঠেছে দেখি তার সব চিত্র ও চিত্রের ব্যাখ্যা অদ্ভুত রকম বিশৃঙ্খল ও জট-পাকান, কোথাও কোন পারম্পর্য বা সামঞ্জস্য নাই। দেখি তুচ্ছ সব বিচ্ছিন্ন তথ্যের স্তূপ, পরস্পর মিশে যাচ্ছে, খণ্ডিত করছে, বিরোধ সত্ত্বেও গাঁট বেঁধে আছে, প্রমাণের জন্য সর্বক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করছে—সেই হল তার জ্ঞানের একমাত্র পথ। অসংলগ্নতাকেই আবার সত্যের মানদণ্ড ব'লে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কারণ বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা গম্ভীরভাবেই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অপর কোন পদ্ধতিতে এর চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত ও সুবিন্যস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পূর্বাপর সামঞ্জস্যই তার দোষ হত—আর সেইজন্যই তা অপ্রামাণ্য ও অবিশ্বাস্য হত; কারণ, মানতেই হবে যে, সুসংলগ্ন চিন্তার অভাবই হল আদিকালের দেবকাহিনী সৃজন প্রতিভার প্রকৃতিগত ধর্ম। তা যদি হয়, তবে ত তুলনামূলক দেবতাতত্ত্বের কোন সিদ্ধান্তই অবশ্যগ্রাহ্য হতে পারে না, সব অনুমানই তুলমূল্য, কারণ অসংলগ্নতার একটা স্তূপ ভিত্তিভাবে সাজান আর একটা স্তূপের চেয়ে বেশী প্রামাণ্যতা দাবী করতে পারে না।

তুলনামূলক দেবতাতত্ত্বে আলোচনার মধ্যে ব্যবহার যোগ্য অনেক কিছু আছে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত মোটের উপর নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হতে হলে তার গবেষণার পদ্ধতিতে আরও ধৈর্য ও সুসংলগ্নতা চাই, বৈজ্ঞানিক ধর্মতত্ত্বের, Science of Religions-এর অঙ্গরূপে তাকে সুবিন্যস্ত করা চাই। মানতে হবে যে, প্রাচীন ধর্মের সব অঙ্গগুলিই সুসম্বদ্ধ ছিল, তাদের মূলে যেসব সংস্কার ছিল তা বর্তমান ধর্মবিশ্বাসের মূলগত সংস্কারের চেয়ে অন্ততঃ বেশী অসংলগ্ন ছিল না। আরও মানতে হবে যে, আদিম যুগের বিশ্বাস ও চিন্তা থেকে সহজবোধ্য ক্রমবিকাশের ফলেই এসেছে পরের যুগের ধর্ম ও দর্শন। আমাদের হাতে যেসব তথ্য আছে সেসব এই প্রত্যয় নিয়ে, ব্যাপক ও গভীরভাবে বিচার ক'রে মানবের চিন্তার ও বিশ্বাসের ক্রমপরিণতির সূত্র আবিষ্কার করতে হবে; তবেই আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারব। কেবলমাত্র গ্রীক ও সংস্কৃত নামের অভিন্নতা নির্ণয় অথবা সুচতুর সব উদ্ভাবন—যেমন হীরাক্লিসের চিতা অস্তগামী সূর্যের প্রতীক, আর পারিস ও হেলেন বৈদিক পণি ও সরমার বিকৃতি—এসবে কল্পনাপ্রবণ মনের কৌতূহল বিনোদন হতে পারে বটে তবে, যথার্থ ব'লে প্রমাণিত হলেও, সেসব থেকে সত্যকার কোন লাভ হয় না। আর, সেসবের যাথার্থ্যও মোটেই নিঃসংশয় নয়; কারণ বিচ্ছিন্ন সব ছোটখাট তথ্য নিয়ে কল্পনাবহুল আলোচনার যে পদ্ধতিতে নক্ষত্রও সূর্য সম্বন্ধীয় সব কাহিনীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে—তাকে যেকোন চিরাগত কাহিনী, এমনকি ঐতিহাসিক ঘটনার উপরও সমান সহজে প্রয়োগ ক'রে সমান প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া

যেতে পারে (৩)। এ পদ্ধতিতে কখনই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না যে প্রকৃত সত্য ধরা পড়ছে—না শুধু কল্পনার জালই বোনা হচ্ছে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের, Comparative Philology-র, সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু বর্তমানে সে শাস্ত্রের যে অবস্থা তাতে তাথেকে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তের আশা করা যায় না। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আমাদের যে জ্ঞান ছিল তা থেকে সে বিদ্যা এখন অনেক এগিয়েছে। নিছক কল্পনার স্থলে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী প্রবর্তিত হয়েছে, ভাষার রূপ গড়ে উঠেছে কি ক'রে এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার ক'রে কি জানা সম্ভব নয় সে সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল নির্দেশ পাওয়া গেছে! ভাষার ক্ষয় বা অপভ্রংশ হয় যেভাবে তার কয়েকটা সূত্র নির্ণীত হয়েছে এবং পৃথক অথচ সমগোষ্ঠীর ভাষাতে একই শব্দ বা একই গোত্রের শব্দ চিনে নেবার সঙ্কেত বার করা হয়েছে। তবে, এই হল তার কৃতিত্বের অবধি। যখন তার জন্ম হল, তার কাছ থেকে কত আশা করা হয়েছিল, কিন্তু বড় হয়ে কোন আশাই সে সফল করেনি; ভাষা-বিজ্ঞান সৃষ্টির চেষ্টা বিফল হয়েছে। একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্, বহুবর্ষব্যাপী ঐকান্তিক প্রয়াসের পরে, তাঁর প্রিয় গবেষণার ত্রুটি স্বীকার ক'রে তার আখ্যা দিয়েছিলেন "আন্দাজি বিজ্ঞান"। এখনও আমরা তাই বলতে বাধ্য। কিন্তু 'আন্দাজি বিজ্ঞান' বিজ্ঞানই নয়। সুতরাং, যারা জ্ঞানের সূক্ষ্মতর অনুসন্ধান ও বিশুদ্ধতর রূপ চায়, ভাষাতত্ত্বকে তারা বিজ্ঞান নামে অভিহিত করতেই চায় না, ভাষা-বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা অবধি তারা অস্বীকার করে।

বাস্তবিকই, ভাষাতত্ত্ব আজপর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার কোনটাই প্রকৃতপক্ষে নিঃসংশয়, সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে প্রয়োজ্য দুএকটি সাধারণ নিয়ম ছাড়া আর কিছুরই ভিত্তি দৃঢ় নয়। কাল আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে বরুণ ও Ouranos, গ্রীক নভস্তল অভিন্ন, আজ সে সিদ্ধান্তকে ভাষাতাত্ত্বিক ভ্রম বলে দোষ দেওয়া হচ্ছে। আগামী কাল হয়ত আবার তাকে আদর করা হবে। বেদের একটা পদ পরমে ব্যোমন্, আমরা প্রায় সবাই তার অর্থ বুঝি উচ্চতম নভস্তল; কিন্তু পরমশিব আয়ার তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বিস্ময়কর গ্রন্থ,the riks-এ তার অর্থ বলেছেন নিম্নতম গহ্বরের তলে; কারণ, ব্যোমন শব্দের অর্থ ছেদ, ফাটল, আক্ষরিক অর্থ হল রক্ষার জন্য আবরণের অভাব (উষা)। তাঁর যুক্তি আধুনিক পণ্ডিতদের পদ্ধতির এমন অনুযায়ী যে, কোন ভাষাতাত্ত্বিকই তাঁর প্রতিবাদে বলতে পারবেন না যে, 'রক্ষার জন্য আবরণের অভাব' অর্থে ছেদ বা ফাটল হয় না, সে নিয়মে মানুষের ভাষা তৈরি হয় নি। কারণ ভাষানির্মাণের নিয়ম বরং বলা উচিত, তার অঙ্গ সংস্থান নিরূপণের উপায়, ভাষাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারে নি; অথচ, পুরাকালের নিপুণ কল্পনার অবাধ স্বৈরাচার যথেষ্ট পরিমাণে চলে আসছে ব'লে এই রকম অনিশ্চিত চোখ ধাঁধান অনুমানে তা ভরা রয়েছে। অতএব অবস্থা দাঁড়াল, বেদে পরমে ব্যোমন্-এর অর্থ উচ্চে নভস্তলে না গভীর গহ্বরে তা নির্ণয় করবার কোন সাহায্য ভাষাতত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, এমন অসম্পূর্ণ শাস্ত্র থেকে দুএকটা চমকপ্রদ দিশা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বেদের তাৎপর্যের উপর কখনই তা সুনিশ্চিত আলোকপাত করতে পারে না।

মানতেই হবে যে, পাশ্চাত্য বেদবিদ্যাকে আমরা অবধা মর্যাদা দিয়েছি। তার কারণ, সাধারণ মনে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে, কি বিরাট ব্যবধান অটলধৈর্যে ও কঠোর বিচারে নির্ধারিত ভ্রমপ্রমাদহীন সব বিজ্ঞান এবং এই সব চাকচিক্যময় অথচ অপরিণত শাস্ত্রের মধ্যে বেদবিদ্যা যার উপর নির্ভর করছে। বিজ্ঞানের ভিত্তি নির্মিত হয়েছে পরম যত্নে, সাধারণ নিয়ম সব স্থাপিত হয়েছে ধীরে সুস্থে, দীর্ঘ পরীক্ষার ফলে, সিদ্ধান্ত সব নিশ্চিন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু এগুলিতে বাধা হয়ে বিরল তথ্যের উপর ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়েছে, নিশ্চিত নির্দেশের অভাব পূর্ণ করা হয়েছে কল্পনা অনুমানের বাহুল্য দিয়ে। সূচনাতে সে সবের উদ্দেশ্যে সবার চোখ ঝলসে গিয়েছিল, কিন্তু কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে

(৩) যেমন, একজন বিখ্যাত লেখক আমাদের বুঝিয়েছেন যে, বিশ্বামিত্র ও তাঁর আদর্শ পার্থিব সূর্য ও বায়ুমণ্ডলের প্রতীক। নেপোলিয়নের ইতিহাস-পড়নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাঙ্গসুন্দর সৌরকাহিনী ইতিহাসে বা কিম্বদন্তীতে কোথাও নাই।

তার কোনটাই পারে নি। সে সব হল বিজ্ঞানের সূত্রপাতে প্রথম একটা মোটামুটি কাঠামো, এখনও আসল বিজ্ঞান নয়।

অতএব, বেদব্যাখ্যার সমগ্র সমস্যাই এখনও সম্পূর্ণ অমীমাংসিত আছে। এক্ষেত্রে সমস্যার উপর আলোকপাতের জন্য যে কোন সাহায্যই আদরণীয়। এদিকে ভারতীয় পণ্ডিতদের তিনটি প্রচেষ্টা আছে। দুটিতে পাশ্চাত্য গবেষণার পদ্ধতি বা পথ অনুসৃত হয়েছে; তবে তাতে যে সব নূতন অনুমানের পথ খোলা হয়েছে সে সব প্রমাণিত হলে বেদের বাহ্য অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হবে। লোকমান্য টিলক তাঁর Arctic Home of the Vedas গ্রন্থে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সব সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু বেদে ঊষার বর্ণনা, সোমের রূপক চিত্র ও ঋকের জ্যোতিষিক তথ্য নূতন ক'রে পরীক্ষা ক'রে, প্রমাণ না হ'ক, অন্ততঃ একটা প্রবল সম্ভাবনা দেখিয়েছেন যে আর্যজাতি হিমযুগে সুমেরু প্রদেশ থেকে নেমে এসেছে। শ্রীঅরবিন্দ আরও দুঃসাহসিক; তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সমগ্র ঋগ্বেদ হল রূপক চিত্রে ভূতাত্ত্বিক বর্ণনা, ক্রমবিবর্তনে হিমযুগের তুষারতলে দীর্ঘকাল ম'রে থাকবার পর পৃথিবীর নবজন্মের কাহিনী। তাঁর যুক্তি বা সিদ্ধান্ত মোটের উপর গ্রহণ করা কঠিন, তবে অন্ততঃ অভিনব ও সপ্রসিদ্ধ যুক্তি, ঋগ্বেদের এই দুই কাহিনীর উপর তিনি নূতন আলোকপাত করেছেন। মূলের ভাষা থেকে প্রচলিত মতবাদের স্বপক্ষে ত কোন সমর্থনই পাওয়া যায় না; তার চেয়ে বরং এই ব্যাখ্যা অনেক বেশী সুসম ও সম্ভাবনীয়। এই দুই ব্যাখ্যা একত্র মিলে হয়ত: এই প্রাচীন শ্রুতির নূতন একটা বাহ্য অর্থের পথ পাওয়া যেতে পারে, আর তাতে হয়ত: এখন যা দুর্বোধ্য আছে তা অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে। প্রাচীন আর্য জগতের দৈহিক উদ্ভব এমনকি হয়ত: তার বাস্তব পার্থিব পরিবেশ নূতন ক'রে গড়ে তোলা যেতে পারবে।

ভারতীয় পাণ্ডিত্যের তৃতীয় প্রয়াস এই দুয়ের পূর্বকালীন, কিন্তু আমার বর্তমান উদ্দেশ্যের নিকটতর। সে হল আর্যসমাজের স্থাপয়িতা স্বামী দয়ানন্দের দ্বারা বেদকে জীবন্ত ধর্মগ্রন্থরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার বিরাট প্রচেষ্টা। নিরুক্তে দেওয়া ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগের উপর তাঁর ব্যাখ্যা স্থাপিত। সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত তিনি তাঁর উপাদান আশ্চর্য ক্ষমতা-সাতন্ত্র্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর হাতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে "শ্লেষ" প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার যে বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে ভাল বর্ণনা হ'ল সায়নের কথায়, ধাতুর নানার্থ প্রতিপাদকত্ব। দেখব যে, বেদের ঋষিদের ভাব প্রকাশের বিশেষ পদ্ধতি বুঝতে হলে এই সূত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করা কত প্রয়োজন।

দয়ানন্দের বেদব্যাখ্যা নিরূপিত হচ্ছে এই ধারণার দ্বারা যে, ধর্ম নীতি জড়বিজ্ঞান ইত্যাদি সর্ববিষয়ে সমগ্র সত্যের পূর্ণ অভিব্যঞ্জক ভাগবত প্রত্যাদেশ নিবদ্ধ হয়েছে বেদে। ধর্মবিষয়ে তাঁর শিক্ষা হল একেশ্বরবাদ, বেদের দেবতারা এক পরমদেবের বর্ণনাত্মক বিভিন্ন নাম; তাঁরাই আবার, বিশ্বে আমরা পরমের যে সব শক্তিকে কাজ করতে দেখি, তার দ্যোতক; এবং বেদের অর্থ ঠিক বুঝতে পারলে আমরা বর্তমান কালের গবেষণায় আবিষ্কৃত সব বৈজ্ঞানিক সত্যই জানতে পারব।

এরকম সিদ্ধান্ত স্থাপন করা কঠিন, বলা বাহুল্য। ঋগ্বেদেই আছে (১-১৬৪) যে দেবতার স্বরূপতঃ বিশ্বাতীত এক বিশ্বময় সত্তার বিভিন্ন নাম ও বিভূতি মাত্র; কিন্তু ঋক্ মন্ত্রের ভাষাথেকেই আমরা অনুভব করতে বাধ্য হই দেবতারা কেবলমাত্র বিভিন্ন নাম নন, তাঁর বিভিন্ন রূপ, শক্তি ও ব্যক্তিত্বেরও বিগ্রহ। বিশ্বসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদের সর্বদেববাদের—এমনকি বহুদেববাদের মতও বেদের একেশ্বরবাদের অন্তর্ভুক্ত, আধুনিক ঈশ্বরবাদের চেয়ে কঠোর ও সরল তা মোটেই নয়। মূলের ভাষার উপর ভীষণ অত্যাচার না ক'রে অপেক্ষাকৃত কম জটিলতা তাতে আরোপ করা যায় না।

পদার্থ বিজ্ঞানে প্রাচীন জাতিরা—আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ছিল। এখন জেনেছি, মিশরে ও কালদিয়াতে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল যা বর্তমান বিজ্ঞান নূতন ক'রে আবিষ্কার করেনি। প্রাচীন ভারতীয়েরা জ্যোতির্বিদ্যায় ন্যূন ছিলেন না এবং চিকিৎসায় চিরদিনই নিপুণ ছিলেন, রসায়ন ও ধৈষজ্য বিদ্যায়ও তাঁরা পুরাকালে বেশ উন্নত ছিলেন। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ যে বলেছেন, সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁরা

তাদের প্রত্যাদেশ থেকে লাভ করেছিলেন, তা প্রমাণ করা কষ্ট সাধ্য।

আমার অনুসন্ধান চলবে এই অনুমানের উপর যে, বেদের দুই প্রতিপাদ্য আছে এবং সে দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট হলেও, তাদের পৃথক রাখতে হবে। এই দুই অর্থ, যেন সমান্তরাল রেখায় প্রকাশের যে রীতিতে ঋষিরা তাঁদের বক্তব্য বিন্যস্ত করেছেন, তাতে দেবতারা যুগপৎ বিশ্ব-প্রকৃতির বাহ্য ও আন্তর শক্তি। আর, যুগ্ম তাৎপর্যের একটা দৃঢ় নির্দিষ্ট বিধানের ব্যবস্থা ক'রে, ঋষিরা তাঁদের যুগ্ম প্রকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। ফলে, একই বাক্যে দেবতাদের দু-ভাবের পূজাই ব্যক্ত হত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যই প্রধান, স্থূল বাহ্য অর্থ থেকে বেশী ব্যাপক, সুসংহত ও সুসম্বদ্ধ। বেদের প্রথম উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক উল্লাসন ও আত্ম-অনুশীলন। সুতরাং সেই তাৎপর্যই প্রথমে উদ্ধার করতে হবে।

এই কাজে, প্রাচীন ও আধুনিক, প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা-প্রচেষ্টা নিজস্ব প্রণালীতে অপরিহার্য সাহায্য দেয়। সায়ন ও যাস্কে পাই বাহ্য সঙ্কেতের আনুষ্ঠানিক কাঠাম ও সে সবের চিরাগত সাক্ষাৎ ও আনুষঙ্গিক তাৎপর্য ও অভি-ব্যঞ্জনার বিরাট ভাণ্ডার। উপনিষদ থেকে পাই পুরাকালের ঋষিদের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তার সূত্র, তা থেকেই পরম্পরাক্রমে এসেছে তাঁদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও সম্বোধির আলোক অর্জনের প্রণালি। পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্য দিয়েছে তুলনামূলক গবেষণার ও সমালোচনার পদ্ধতি; এখন তার ত্রুটি ও অপূর্ণতা দূর করতে হবে, কিন্তু তা থেকে হাতের মাল-মশলা প্রচুর বাড়ান যেতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্যই তা থেকে বেদ ব্যাখ্যার বিজ্ঞান সম্মত নিশ্চয়তা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ভিত্তি পাওয়া যাবে। এখনও তার বড়ই অভাব। স্বামী দয়ানন্দ দিয়েছেন ভাগবত রহস্য উদ্ঘাটনের সূত্র এবং নূতন ক'রে জোর দিয়েছেন বৈদিক ধর্মের কেন্দ্র-স্থিত এই বিশ্বাসের উপর যে পরমসত্তা অদ্বিতীয়, দেবতারা সব অসংখ্য নামরূপে প্রকাশ করছে তাঁকে তাঁর একত্ব বহুমুখী।

অন্তর্বর্তী অতীত থেকে এতটা সাহায্য পাওয়া গেছে, এখন হয়ত সুদূর অতীতের চিত্র আবার অঙ্কিত করা যাবে এবং বেদের ভাষা দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক প্রজার ভাবজগৎ ও বাস্তব লোকে আবার প্রবেশ করা যেতে পারবে।

রাত-জাগা

আশা দেবী

ঘুমাতে দিল না আজ
রাত-জাগা পূর্ণিমার চাঁদ
পলাতকা বলাকা—পাখায়
কেড়ে নিলো তন্দ্রাটুকু
দ্বারে দ্বারে নাম ধরে ডেকে;
যেমন ডাকিতে তুমি ভোরের বেলায়
খোলা জানালার পাশে
আয়ো ঘুম আধো জাগা প্রভাতী-তন্দ্রায়
ভোরের আকাশে চেয়ে
খুঁজেছি তোমায়।

ঘুমাতে দেবে না আজ
রাত-জাগা পূর্ণিমার চাঁদ।
জানি কেড়ে নেবে ঘুম
রাত-জাগা ভোরের মতন
তোমার প্রেমের মত মুছে যাবে চোখের কাজল
মুছে যাবে তন্দ্রাহীন প্রহর-যাপন
কৌটা কৌটা নয়নের নীরে
শুধু আমি জেগে রব
ঘুমা-ঘেরা সাগরের পারে।

ঘুমাতে দেবে না জানি
বহু রাত্রি বহুদিন ধরে
তারপর একদিন পাব হবে সময়ের সীমা
অস্থির ক্ষণিক বায়ু
উত্তপ্ত নিবিল তনু
ধীরে ধীরে পড়িবে এলায়ে
আনত পল্লব ভরে ঘনাবে শেষের অন্ধকার
তোমার নয়ন বুঝি তখুনি মুছিয়ে নেবে
আমার মনে।

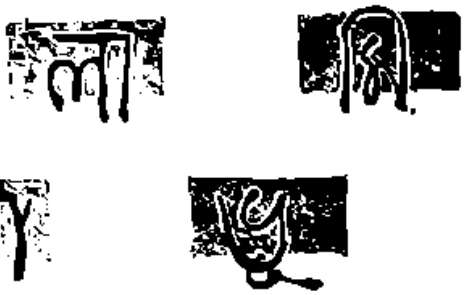

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ওদের বিজয়োৎসবের আয়োজন হলো বিপুল সমারোহে। ফেয়ারিলাবের সান্ধ্যভোজ, পানাগার ও অনেক-অনুষ্ঠানের ভঙ্গে চোপরা দিয়েছে মোটা টাকার চেক লিখে সুরেখার হাতে।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছে সুরেখা।

খাণ্ডেলওয়াল তখনো খায়নি। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে, অবসন্ন দেহটা ডেক চেয়ারে ছড়িয়ে, সুরেখার অপেক্ষাতেই বসে ছিল।

ওর চমক ভাঙালো, যখন সুরেখা ফিরলো উল্লাসের ফিনকি ছড়িয়ে : এখনো খাওনি বুঝি ?

না : বেশী কথা বলবার মত মনের অবস্থা বোধহয় ছিল না খাণ্ডেলওয়ালের। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে উঠে বসেছিল।

ওর মনের অবস্থাটা বুঝে নিতে সুরেখার এক মুহূর্তও দেরী হয়নি। তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে, দু' আঙুলে কাঁচি করে চেকখানা তুলে ধরেছিল চোখের সামনে। হাল্কা হাসির ঢেউ তুলে লীলায়িত সুরের রেশ টেনে বলেছিল—তোমার বন্ধু।···সত্যি, মেয়েদের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী বোকা পুরুষ জাতটা।

তাই : খাণ্ডেলওয়াল আর অপেক্ষা করেনি। স্লিপার জোড়াটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে নীরবে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। সুরেখার অজ্ঞাতসারে তার শুষ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস রাতের বাতাসে মিলিয়ে গেল।

পাশাপাশি নয়। খেতে বসেছিল দু'জনে মুখোমুখি একই টেবিলে। তবুও দীর্ঘক্ষণ খাণ্ডেলওয়ালের নীরবতা ভাঙলো না দেখে, সুরেখা কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। একটু থেমে, কিঞ্চিৎ হাসির সঙ্গে বলেছিল—কথা বলছো না যে ?

এমনি।···ঘাড় নীচু করে খাণ্ডেলওয়াল চামচেটা নামিয়ে রেখেছিল প্লেটের কিনারায়।

ওকি !···সুরেখা চমকে উঠেছিল। আর সে নির্বিকার থাকতে পারেনি। কণ্ঠস্বরে সর্বাঙ্গ মমতা এনে বলেছিল —শরীর কি ভালো নেই ?

না : খাণ্ডেলওয়াল ডলের বাটিতে আঙুলগুলো ডুবিয়ে নিয়ে তোয়ালেটা হাতে করে উঠে গিয়েছিল টেবিল থেকে।

খাওয়া শুধু তারই হয়নি, তাই নয় ! সুরেখাও উঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল তাড়াতাড়ি দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে।

নিঃশব্দে রাতের গভীরতা নেমে এসেছে মহা-নগরীর বুকে নিথর ডানা মেলে। সাময়িক উত্তেজনার তরঙ্গ পার হয়ে সুরেখা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেও জানে না। কিন্তু খাণ্ডেলওয়ালের চোখে এক মুহূর্তের জন্যেও লাগেনি ঘুমের স্পর্শ। দুশ্চিন্তায় মগজে ঝড় বয়ে গিয়েছে গভীর রাতের স্তব্ধতাকে আলোড়িত করে।··· চোপরা ! চোপরা দিয়েছে চার হাজার টাকার চেক ! ওদের ফেয়ারিলাবের উৎসব হবে, শিপ্রা আর সুরেখা টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়েছে বলে।···ওদের ডিনার পার্টি···নাচগান আনন্দ-অনুষ্ঠান মুখরিত হয়ে উঠবে চোপরার প্রশংসা শুঞ্জনে। সুরেখা হাত ধরে নিয়ে যাবে সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সামনে। চোপরাকে ইন্‌ট্রোডিউস্ করে দেবে সকলের সঙ্গে। ধাপে ধাপে উঠবে দুজনে। আরও ঘনিষ্ঠ হবে ওদের পরিচয়। সুরেখা জানে, কেমন করে পুরুষের মন জয় করতে হয়।

আচমকা সুরেখার ঘুম ভেঙে গিয়েছে হিমেল হাওয়ার ঝলক লেগে। চাদরখানা গায়ে টেনে নিতে গিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে, মাথার কাছে দরজাটা খোলা। বাইরে

থেকে ল্যাম্প-পোষ্টের আলো খানিকটা ছিটকে এসে পড়েছে ঘরের ভিতর।

বেড-সুইচটা টিপে সুরেখা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখেছে। খাণ্ডেলওয়ালের বিছানাটা খালি। কখন বিছানা ছেড়ে সে বেরিয়ে গিয়েছে ঘর থেকে, সুরেখা টেরও পায়নি।

আর সে শুয়ে থাকতে পারেনি। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখদুটো রগড়ে ভালো করে চেয়ে দেখেছে এ-পাশ-ওপাশে।···রেলিঙে মাথাটা দিয়ে চেয়ারের ওপর খাণ্ডেলওয়াল নিস্পন্দ বসে আছে বারান্দার একটী কোণে।

ডার্লিং!···নিমেষে কেটে গিয়েছে সুরেখার সবটুকু ঘুমের জড়তা। নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছে খাণ্ডেলওয়ালের গা-ঘেঁসে। মাথাটা টেনে নিয়েছে বুকের ভিতর।

খাণ্ডেলওয়াল কথা বলেনি। বাধা দেবার চেষ্টাও করেনি বিন্দুমাত্র।

মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়ে সুরেখা বলেছে—ছিঃ! এমনি করে সারাটা রাত নিজেকে কষ্ট দিয়েছ! নিতান্ত অকারণ—

তাই: একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে খাণ্ডেলওয়ালের শরীরটা কেঁপে উঠেছে।

সুরেখা আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। মৃদু ভিজে গলায় সুর টেনে বলেছে—না-না, না-গো, না।··· এত দুর্বল তুমি?···এতদিনেও চিনলে না রেখাকে!

মুহূর্তে খাণ্ডেলওয়ালের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠেছে সুরেখার যাদুস্পর্শে। অসাড় হয়ে এসেছে ওর বাক্‌শক্তি!

সুরেখা মুখর হয়ে উঠেছে। অভিমানের চাপা কান্না মিশিয়ে বারবার বলেছে—আমায় বিশ্বাস করো না তুমি? যে-জীবন উজাড় করে দিয়েছি তোমার হাতে, সে-জীবন রেখে তবে লাভ কি আমার?···অবিশ্বাস যদি সত্যি আসে কোনদিন, আমায় মেরে ফেলো বিষ দিয়ে। তিলতিল করে বেঁচে থেকে মরতে আমি পারবো না।

নিমেষে ভেঙে গিয়েছে খাণ্ডেলওয়ালের সব ধৈর্যের বাঁধ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুরেখার মুখপানে চেয়ে চঞ্চল আবেগে বলে উঠেছে—রেখা, মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল, মাপ কর···

মাপ! মাপ চাচ্ছ তুমি আমার কাছে? জীবনের সে দিনগুলো কি ভুলে গেছ খাণ্ডেলওয়াল?···পুরুষ-মানুষ কিনা, তাই অতীতকে তোমরা অত সহজে ভুলতে পারো। কিন্তু মেয়েরা পারে না। পারে না তাদের অতীত জীবনের কোন স্মৃতি ভুলতে। একটি মধুময় সন্ধ্যাও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে নারীর জীবনে।

সুরেখা হেসেছে। কালো আকাশের কোলে শুক্লা দ্বিতীয়ার এক্‌ফালি চাঁদের মত ভেসে উঠেছে ওর বিষণ্ণ মুখে মাধুর্যের হাসি। লম্বা আঙুলের আলতো স্পর্শে খাণ্ডেলওয়ালের কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছে—ডার্লিং!···রাত্রি!

খাণ্ডেলওয়াল পারেনি আর নিজেকে ধরে রাখতে। পরিতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছে সারা অন্তর। সুরেখার হাতদুটো দু-হাতের মুঠোয় চেপে ধরে নিমেষে উদগ্র হয়ে উঠেছে তার স্তিমিত পৌরুষ: রেখা! আমায় ভুল বুঝো না।···এত না মিঠা—

পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, তবুও যেন খাণ্ডেলওয়ালের চোখের পাতা আবার ভারি হয়ে এসেছে ঘুমে। সুরেখাকে অবলম্বন করে টলতে টলতে ফিরে এসেছে ঘরে।

উৎসবের পূর্ণাহুতি হলো নিউ-এম্পায়ারে সুরেখার নৃত্য-অনুষ্ঠানে। শুধু চেম্ব্রিজাবের সদস্যেরা নয়, আরও অনেক সম্ভ্রান্ত অতিথি এলেন আমন্ত্রিত হয়ে। চোপরার আমন্ত্রণে এলেন তার প্র্যাগটিক ইন্‌ডাষ্ট্রির জেনারেল-ম্যানেজার মিস্টার ওয়ালেস ও তাঁর পত্নী। আইরণ ফাউণ্ড্রির চীফ-এঞ্জিনিয়র মিস্টার দেশাই, টেক্‌নিসিয়ান মিস্টার ক্লিটন, গ্রেহাম ও আরও অনেকে।

ভারতীয় নৃত্যকলার অসামান্য নৈপুণ্যে সুরেখা যেন মায়াজাল ছড়িয়ে দিল সারা প্রেক্ষাগৃহে। দর্শকেরা মন্ত্র-মুগ্ধের মত চেয়ে রইল।

উর্বশী! নৃত্যপরা উর্বশী মেঘলোক থেকে নেমে এলো পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকায়। নূপুর-নিক্কনে পুষ্পিত হলো লতাবিতান—মানুষের মানসকুঞ্জ।

উদ্‌ভ্রান্ত পুরুরবা। নিমেষে হস্তচ্যুত হলো তার রাজ-দণ্ড। এগিয়ে এলো দু-চোখে অতৃপ্ত কামনার পুষ্পাঞ্জলি

নিয়ে :- নয় মাতা, নয় কন্যা, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী! এসো, ধন্য করো জীবন।

অপ্সরীর অপরূপ লীলালাস্যে মোহগ্রস্ত সম্রাট দিল আত্মাহুতি। উর্বশী ধরা দিল তার বাহু-বন্ধনে।…কিন্তু সে বাঁধন শিথিল হয়ে গেল চোখের পলকে।

পুরুরবা চেয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। নিঃশেষে শুকিয়ে গেল তার চোখের সবটুকু সজীবতা।

বিলোল ভঙ্গীতে নৃত্যপটিয়সী সুরেখা নাচে। লীলায়িত হয় অলোকসামান্য তনুশ্রী।

নারীর প্রেমে বিশ্বাস করো তুমি?…উর্বশী হাসে। সে হাসিতে যেন আগুনের ফুল্‌কি ঝরে পড়ে।

হায়েনার মত রমণীর অন্তর। লক্-লক্ করে তার লালিত জিব পুরুষের রক্ত পিপাসায়।…আবার হাসে সেই রহস্যময়ী নারী।

বাতাসে উড়ে যায় পুরুরবার রাজছত্র। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে পৃথিবীর রাজার স্বর্ণ-সিংহাসন।

মেঘলোকের মায়া আবার মিলিয়ে যায় আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘে।…উর্বশী নয়, সুরেখা। সুরেখা হাসে। উচ্ছল যৌবনের তীক্ষ্ণ ধারাল হাসি ফুটে ওঠে সুরেখার ঠোঁটে। আগুনের শিখা যেন লিক্‌লিক্ করে পাতলা ঠোঁট দুটোর কানায় কানায়। টোল-খাওয়া দুটি গালে ছাপিয়ে ওঠে কামনার মধুপর্ক!…মৃদুগুঞ্জন ওঠে সারা প্রেক্ষাগৃহে।

উইংসের পাশে গিয়ে শিপ্রা দাঁড়ায়। উল্লসিত হয়ে সুরেখাকে অভিনন্দিত করে: রেখাদি! সত্যি উর্বশী তুমি—এ পৃথিবীর মেয়ে নও।

করতালি-মুখর প্রেক্ষাগৃহ নীরব হয়ে আসে। মিস্টার ওয়ালেস চোপরার হাতখানা হাতের ভিতর নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—ইটস্ রিয়ালি সুপেন্‌ডিড মিস্টার চোপরা।… উইশ ইউ গুড লাক্!

আরও অনেক রাতে ফিরলো সুরেখা চোপরার গাড়ীতে। খাণ্ডেলওয়ালের গাড়ীটা ভাল ছিল না, তাই সে আগেই বাড়ী ফিরেছে।

পিচ-ঢালা পথে হালকা পালকের মত ভাওয়ায় ভেসে চলে চোপরার নতুন গাড়ীখানা। গভীর রাতের হিমেল বাতাস লাগে সুরেখার উষ্ণ কপালে। মাঠের পথে যেতে যেতে গাড়ীখানা যখন গীয়ার চেঞ্জ করে, সুরেখার মাথাটা আচমকিতে গড়িয়ে পড়ে চোপরার ঘাড়ে।

আচমকা যেন সুরেখার ঘুমের আবেশ ভাঙে। মৃদু হাসির সঙ্গে কানের কাছে মুখটা নিয়ে বলে—ধন-কুবের! প্রিন্স।

একটা হিমপ্রবাহ বয়ে যায় চোপরার সর্বাঙ্গে অবসাদের স্পর্শ দিয়ে।

পরদিন কাগজে বড় বড় হরফে ছাপানো হলো সুরেখার অপরূপ নৃত্যকলার জয়গান। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মুখে-মুখে বয়ে গেল সুনামের ঢেউ।

সন্ধ্যার আসর জমে উঠলো চেরিব্লাসমের জলসা ঘরে। একই কথা অনুরণিত হয় এঘর-ওঘরে।

এলো চুলের রাশি ঘাড়ের ওপর থেকে পিঠে নামিয়ে দিয়ে লীনা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চায় বিভোরের মুখপানে: বিভোর! কি দেখছো অমন করে মুখপানে চেয়ে?

দিস্ ইজ মাই কিংডম, লীনা!

জানি।

জানো?

হাঁ।

দাবার বোড়েটা টিপে লীনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—এই কিস্তি। পারবে কাটতে এই বাঁধন?

না।…জিবের লাল সরু ডগাটা দিয়ে পাতলা ঠোঁটের কিনারা দুটো ভরদ্বারিত করে লীনা বলে—বাঁধন তো কাটতে চাইনা বিভোর।

লাভলি! ইউ আর রিয়ালি ভেরি লাভলি, লীনা।… কতটুকু ঐশ্বর্য আছে মিসেস্ খাণ্ডেলওয়ালের! তোমার কাছে—

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বিভোর হাতখানা বাড়ায় লীনার আঙুলগুলো চেপে ধরবে বলে। কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় শিপ্রাকে দেখে।

শিপ্রা আর তার পিছনে অজিত। বালরুকাকে সে আজ আনেনি সঙ্গে।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ঘাড়টা হেলিয়ে শিপ্রা বলে—

মাপ করবেন, প্রোফেসর সেন। হয়তো অসুবিধে করলাম।···রেখাদি আসেনি—মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল?

না। একবার শুধু চোপরা এসে উঁকি দিয়ে গেছেন। হয়তো কথা ছিল আসবার।···বিতোর সেন চোখ নামিয়ে দাবার ছকে মনোনিবেশ করে।

শিপ্রা আর অজিত এগিয়ে যায় হলঘরের দিকে। হঠাৎ বাধা দিয়ে লীনা ডাকে—শিপ্রাদি!

পিছিয়ে এসে শিপ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়ায়।

সলজ্জ হাসির সঙ্গে লীনা বলে—বলতে ভুলে গেছি শিপ্রাদি। কিছুক্ষণ আগে মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল একবার টেলিফোনে খোঁজ করেছিলেন আপনার।

আমার?

হাঁ, আপনাকেই ডেকেছিলেন তিনি বরানগরের কোন গার্ডেন-ভিলা থেকে।

আকস্মিক অন্যমনস্কতায় শিপ্রা হঠাৎ কেমন বিহ্বল হয়ে ওঠে। অপেক্ষা করে না। অজিতকে ডেকে নিয়ে ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে যায় জলসাঘর থেকে।

ক্রমশঃ

বিড়লার মন্দির, দিল্লী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

শিল্পপতির এই মন্দির লেগেছে আমার ভাল,
অর্থের এই সৎ ব্যবহারে নয়ন জুড়ায়ে গেল।
ধাতু ইস্পাত লয়ে বটে কারবার,
পদরজ তবু পেলেন মহাত্মার
তাঁহারি দেউলে প্রথম জ্বলিল পঞ্চদীপের আলো।

২

নাহি পুরাতন শিব মন্দির পুরাতন দেবালয়।
বিধ্বস্ত ও চূর্ণিত হ'ল ধূলি সাথে ধূলিময়।
আঘাতে আঘাতে জাতি হ'ল কাপুরুষ,
শত অপমানে ফিরিয়া এলো না হুঁস,
মন্দির-হীন হইল দিল্লী—বিধর্মীদের জয়।

৩

কোতীদের গড়া যা কিছু দেখিনু উর্ধ্বে তুলিয়া আঁখি
ভাবিনু মাটিতে মিশিতে তাদের কয়টা বা দিন বাকী?
উচ্চে যে আছে তারেও ডাকিছে ধূলি
সকালি তার অনামিকা অঙ্গুলি,
খাসুকী ও যেন হাসি তার ফণা নাড়িতেছে থাকি থাকি।

৪

মন্দিরময় হবে পুনরায় পুরাতন রাজধানী
রহিবে না এর গাত্রে কোথাও ক্ষীণ পরাজয় গ্লানি।
শক্তিকেন্দ্র এ পুরী অর্জুনের,
শান্তি শক্তি কেন্দ্র হইবে ফের,
কমিয়া যাইবে সব রেষারেষি কাটাকাটি হানাহানি।

৫

একক রয়েছে হোক বহু বহু বিড়লার মন্দির
দেবতার উপনিবেশ রটুক সত্র তপস্বীর।
সাধু ও সাধক মনীষী প্রতিভাবান—
নগরীকে দেন অনর্ঘ অবদান
সঙ্গমময় নগর হউক তীর্থ ধাত্রীর।

৬

যাহা ছিল তার চেয়ে সমৃদ্ধ বলী শুচি সুন্দর
হোক উন্নত বিশুদ্ধ চারু নর-দেবতার ঘর।
হিংসা দম্ভ দর্প শব হয়ে
চিরদিন তবে অভিধানে থাক রয়ে
ভারতভূমিকে তব শ্রীনিবাস কর পরমেশ্বর।

আদর্শপুরুষ রবীন্দ্রনাথ

সুদর্শন চক্রবর্তী

অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন বিশেষ মানুষ যে তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে গেলে সে বলার শেষই হবে না। এমনই এক বিস্তৃতিময় জ্ঞান-কর্ম ও প্রেমের আধার তিনি। প্রহ্লাদ সম্বন্ধে জানি, তিনি 'ক' বলতেই কৃষ্ণ চিনেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই যে সমস্ত বিষয়বস্তুর ধারণা ও উপলব্ধি করেছিলেন, অনেক বড় বড় মুনিঋষিরাও তা বহু বৎসর সাধনাতেও পান নাই। এইখানেই তাঁর বাহিরে। প্রথমে তাঁর বংশের দিকে তাকালেও এ শুধু দুর্লভই নয়, সম্পূর্ণ ওধার জন্যেই যেন এ সৃষ্টির সার্থকতা হয়েছে মনে হয়। তারপর যাদের সংসর্গে তিনি বাল্য হ'তে লালিতপালিত তা একমাত্র তাঁর মত ছেলেতেই সম্ভব। মানুষ গড়ার কাজে সাহচর্যও এক অপরিহার্য অবলম্বন,—যার অভাবে আজকাল দেশব্যাপী এত মহাভারত। এতটুকু ধৈর্য নেই, প্রকৃত বিষয়বস্তুর দিকে তাকাবার নেই, অবাধের সহকারে অধ্যয়ন নেই, ঘর ও পিতৃপুরুষের উপরে কোন আস্থা নেই। না আছে তপস্যা, না আছে বিনয়, না আছে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ঐকান্তিক আগ্রহ। অথচ বড় বড় সমস্যা নিয়ে নেতা ও কর্ণধারের দলাদলি প্রচারে তারা পঞ্চমুখ।

শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ—যে শিক্ষা মানুষকে তার স্বাভাবিক স্ফুরণ নির্দিষ্ট করে মহামানব ও নবজন্মবিদ ক'রে তোলে, সেই শিক্ষা নিয়ে তিনি 'কেরাণি গড়া কারখানায়' নিজেকে 'খুন হয়' করে রাখতে পারেননি। আর তাই বোধ হয়—তাঁরপক্ষেই সম্ভব হয়েছে বিশ্ব-প্রেমের দুর্লভ সন্ধানে জীবনের পূর্ণতার জন্য বেদ-বেদান্ত-গীতা-উপনিষদ মন্থন করা প্রজ্ঞালাভ। আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "সজীব চোখ যে কারোরই নয়, ভালো করে দেখে নিতে সময় যে। ঘণ্টায় বিশ মাইল দৌড়ের বেগ তার পক্ষে দুরাশার বেগ। একদা তীর্থযাত্রা ছিল সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল। ভ্রমণের পূর্ণ স্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হত। কলের গাড়ির আমলে তীর্থ রইল, যাত্রা রইল না; শ্রবণ নেই, পৌঁছানো আছে; শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাশ করা থাকে ফলে। রেলকোম্পানির কারখানায় ফলে-ঢালা তীর্থযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বটিকা সাজানো, গিলে ফেললেই চল—কিন্তু চলাই না যে, সে কথা বোঝবারও ফুরসত নেই।"

ধনী কন্যা রবীন্দ্রনাথ—অথচ ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও দুর্ঘটনার প্রতিই তাঁর ছিল সেবাপরায়ণ দৃষ্টি। মাটীর সঙ্গে যে মানুষের যোগ রয়েছে, সেই শ্রমিক, নাবিক, চাষীভাইদের জন্যে তাঁর দরদের অন্ত নেই। নরদেবী নারায়ণকে আহ্বান জানাতে তিনি বলেছেন দেবালয়ে দেবতা নেই—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর কেটে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।"

শ্রেষ্ঠ দান জ্ঞান, আর যা কিছু তা মানুষকে ছোট করে, অপমান করে। তাই অন্ধের যে দান সেই জ্ঞান দেবার জন্য মানুষের মত বীণা হাতে বেরিয়ে এসেছেন জগৎকে উদ্ধার করতে। তাই যা তিনি যা কিছু শেষ লক্ষ্য, এবধানি অধিযাত্রী সমেত বেরিয়ে এলেন দেশে মানুষ-গড়ার কাজে—যুগ স্নান, ভগ্ন-ক্লান্ত শুষ্ক মানুষকে আদর্শের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করতে। অমৃতের পুত্র যে মানুষ, সে কেন নিরানন্দে থাকবে? আত্যন্তিক জীবনযাত্রার জন্যে ছোট ছোট অভাবের মিথ্যা চিন্তাকে বড় করে দেখে যে সব মানুষ আড়ষ্ট হ'য়ে হতাশে বিভ্রান্ত ও অসংযত, তাদের চোখ দিয়ে বলদেন বৃহৎ বনস্পতির বীজকে প্রদান করতে হলে এই সব আপাতায় অপসারণ চাই, অন্ততঃ দিনের জন্যে যেন ওরা টেরই না পায়। মন ভোলাবার এই সব বন্ধন থেকে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান দিতে তিনি বীরভোগ্যা বসুন্ধরাতে প্রকৃত বীরের সাধনাই দেখিয়ে গেলেন—

"ঘরের মঙ্গল শঙ্খ বহে তোর তরে
বহ্নির সন্ধ্যার দীপালোক
বহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্র নাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ,
এই তোর ক্ষত্রের প্রসাদ।"

দুঃখ দুঃখ করে যে সাধারণ মানুষ ভিক্ষাজীবী, তাদের বোঝালেন প্রকৃত দুঃখ কি। দুঃখকে তিনি বলেছেন সোপান। আরো বুঝিয়েছেন,—"কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই সহজ করে তার বাজা নইতেও পারবে। অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেন না সেটা অস্পষ্ট।" মোহ ও মায়াবদ্ধ মানুষ আত্যন্তিক ঘিন-ঘাপনের যে সব পণ্ড চাহিদায় বিকারগ্রস্ত, তাদের এ দুঃখ আসলে বিলাস ছাড়া আর কি? মানুষের প্রকৃত দুঃখ যে কি, তা তিনিই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই প্রকৃত সখা, গুরু, পিতা প্রভৃতি নানারূপে সকল সময় দিনেদিনে একমাত্র অবলম্বন যে পূর্ণতার স্মরণ

তাঁরই বিরহে ডুবুরে কেঁদে উঠেছেন শীতাঞ্জলীর মধ্যে।—বিরহ দুঃখের কাতর আর্তনাদে ভরিয়ে দিয়েছেন সারাটি জীবন তাঁকে চাইতেই, যা পেলে সব চাওয়া ও পাওয়া সার্থক হয়। তাই তিনি বিভীক হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন জীবন দেবতার কাছে—

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।"

সর্বত্যাগী রবীন্দ্রনাথ—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা", "মাগুধ কস্যস্বিদ্ধনম্"—উপনিষদের এই বাণীগুলিই তাঁকে অন্তরে ত্যাগের পরমপরাকাষ্ঠায় একেবারে বৈশিক করে দিয়েছে। তাই সমগ্র জীবনব্যাপী ত্যাগেরই তিনি সর্বোচ্চ আসন প্রদান করেছেন। একদিকে তিনি যেমন বর্ষকে জীবনসর্বস্ব করে নিতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই না চাইবার মধ্য তাতে আকৃষ্ট হতে পারেন নি। ছোট চাওয়াকে বিসর্জন দেয়াই ছিল তাঁর চলার ছন্দ। বাহিরের চাকচিক্যে যে মুগ্ধ, সেত অন্ধ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভিতরের মানুষ। অন্তর তাঁর ত্যাগের আগুনে পরিশুদ্ধ না হলে এমন প্রজ্ঞা ও অসাধারণত্ব অসম্ভব। তাইত সাধারণ জনসমাজ তাঁকে বুঝে উঠ্‌তে পারেনি সহজে। অনেক সময় দোষারোপও করেছে তারা অজ্ঞতার সংস্কারে, যেমন চিরকাল মহাপুরুষদের বেলায় করে থাকে। কিন্তু নির্ভীক ও তেজস্বী ঋষিপ্রবর রবীন্দ্রনাথ তখন গান গেয়ে চলেছেন, "একলা চলরে"। এই ডাক শুনে কেউ না আসায় ফিরে ভ্রূক্ষেপ না করে অন্তরের নির্বাণ দীপশিখাকে নিষ্কম্প রেখে পথ ক'রে দিয়েছেন আলোয় আলোময়।

রাজনীতিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ,—রাজনীতির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত তাঁরের উপর সার্কাসওয়ালার নাচা ও হাঁটার মত আজ যা চলেছে তা নয়। এ নাচা ও হাঁটা যতক্ষণ চলে ততক্ষণই কেরামতির বাহোবা মেলে, একটু বেদামাল হলেই (কিসেরত যেখানে জমজমের ছোটের উপর নির্ভরশীল, আর জমজমের যে দৃষ্টান্ত চারিদিকে চোখে পড়ে) তাকে চিরকালের মত ব্যর্থতার ঘুমিয়ে পড়্‌তে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে রাজনীতি করেছেন, তা সর্বকালের—সর্বসাধারণের—সকল সমাজের —সমস্ত স্তরের। তার শেষ নেই। যেন বিভাগ আর সাম্প্রদায়িকতার যখন দেশের নাভিশ্বাস উঠেছে, সেই ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর—বিলনের জন্যে রাখী উৎসবে খালি পায়ে, নগ্নমস্তকে কলিকাতার রাজপথে বেরিয়ে এসে তিনি জনে জনে বাহুবন্ধনে ভ্রাতৃবদ্ধ করলেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সন্তান আজুথে ঐ কলিকাতা সেদিন মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে রূপায়িত হল।

"আমি প্রতীপ আনবার হাজার বরাট পোয়াতে রাজী আছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধার জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজী নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার পৌঁয়ামিনম।"

"তাজমহলকে ভাল লাগবার জন্যেই তাজমহলের দেশা ঘুচিয়ে দেয়া দরকার।"

"অন্যেরাতরম্ মন্ত্রটি তিনি চুরান্ত করে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি দেবা করতে রাজী আছি, কিন্তু কল্পনা করব যাকে—তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি কল্পনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।" "দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও, তখন আমার লজ্জায় লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে? চুরি করতে পারি নে যে তাই—সেকি বুদ্ধি আছে বলে? না, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ব'লে।"

"আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি; এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোন লজ্জা থাকবে না।"

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"আমরা মনে করি, সেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা। কিন্তু আসলে যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।"

"দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা।"

সংস্কার সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন—"যারা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের সুখদুঃখ ভালো মন্দর মাপকাঠি চিরকালের একই নিচের ঘরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ায় দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ের সীমানেই টিকে থাকে। পাড়কে কেটে বড়ো করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে।"

গুণী সম্বর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ—গুণের সম্মান দিতেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত অসাধারণ, এক জায়গায় তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—"বুড়ো Wordsworthএর নকল করে ভদ্রলোক মহি অন্যায় এমন বেঁচে আছেন।" তারাকুঞ্জ কবি সত্যেন দত্তকে তিনি কি অকুণ্ঠ প্রশংসাই না করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তার কি প্রগাঢ় আন্তরিকতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকেও তার কত শ্রদ্ধা। গান্ধীজীকে তিনিই প্রথম 'মহাত্মা' বলেন, আর জহরীর জহর চেনার মত গান্ধীজীও রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে বরণ করে-ছিলেন। জহরলালকে তিনিই 'কতুরাজ' আখ্যা দিয়েছিলেন,আর তদ্রোধিক আন্তরিক আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে সুভাষচন্দ্রকেও। জাপানের সম্বন্ধে বলেছেন—"লোকে বলে জাপানের ছেলেরা যুদ্ধ কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে ঘাটে করে যাবার সময় মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলা গাড়ী প্রভৃতি মাথা এসে পড়ে সেখানে ঘটের চালক পাশুভাবে অপেক্ষা করে—গাল দেয় না, ঠাকাঠাকি করে না। আমার মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানী মাত্রে ঠেলাঠেলি মারামারি করে নিজের বল ক্ষয় করে না। প্রাণ-শক্তির মাত্রে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।" সে শক্তির সম্বন্ধে তিনি কতই না নমস্কার প্রভাক্ষ করেছেন, সেই শক্তির সম্বন্ধেও তার বাণী—"এ মর্তলোকের স্বর্গ।" শুধু তাই নয়, জাপানের কাছে তাদের মঙ্গল প্রার্থনাও জানিয়েছেন।

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলাটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামূলকতা জানি, কিন্তু তবু এই প্রসঙ্গে কিছু না বললেও কর্তব্যচ্যুতির বাধা পাব। তাই এ ক্ষেত্রে ভাদরীজলে গঙ্গাপূজার মত ওঁর বাণী নিয়েই বলি,—"কবে বেদব্যাস বেদান্ত সূত্রের অন্তিত্বাতক যে আদর্শ নিয়ে কলমে ধার দিয়ে রেখে, ধারিয়ে রেখে, চুল খুলে রেখে, কথা কইয়ে রেখে, সে আদর্শ ভাষা-যাচাইয়ের কাজে লাগাতে গেলে পদেপদেই বাধা পাওয়া যায়।" "চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা যাচাই করবই ; ধর্মনীতি, সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীত ভাবে যদি না আসে ; তবে তার বুদ্ধিগত ভুল যতই থাক, তাকে বিদ্ধিত করে দূর করতে হবে।...সালোয়ানি 'সলোমে' কিন্তু বাস্তবিক নয়, প্রত্যক্ষ ও নয়।" "সাহিত্যে আমি যা করেছি তা যদি আংশিক ও প্রাণেশিক না হয় তবে যার পরম সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে। পরিচয়ের অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব ঘটে তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, চরিত্রার তাতে কোনো ক্ষতি নেই।" "যদি কোন বিশেষ যুগের মানুষ এমন দৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিরূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি সুন্দরীকে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উদ্ভট হতে থাকে, তা হলে বলতেই হবে, এই মনোভাব চিরন্তন মানব স্বভাবের বিরুদ্ধে।...সে আপন সত্য রূপ মুহূর্তেই আপনি ভরা লজ্জা নিয়ে এসেছে, তার অনুসন্ধানে যে শনি সে যত উদ্ভটই হোক তবু সে শনিই বটে।" "সাহসের প্রলোভনেই মানুষকে বিপথে ঘটে, আপনি এসে পড়ে অনতর্কতা। অনতর্কতাই অসম্মান করে কলা-লক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে।"

"সৃষ্টির যে রূপ আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বভৌমিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য।...এ স্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির পরিধি তৎকালীন হেতুবাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ক্ষুণ্ণ। তার ঘনাবার ঘটে।"

তাই তিনি আমায় আক্ষেপও করেছেন—"মুশকিল এই যে, বাঙালি কাউকে তোমো একটা ছলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না।... আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে 'গল্প গুচ্ছ' বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অপ্রদ্ধেয় হবে।" "ছাগলটা হল মুখোস, ল্যাজটা হল মুখই। যারা সাহিত্যের ওজন বলে, যারা নিজের মন রেখে চলে, ল্যাজ তাদেরই। আর যারা আসল মর্মের, রসের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ল্যাজার তাদেরই।...বারোয়ারী তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যবসাদার ব্যাণ্ডপার্টীর ফর্দন জেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসী ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ল্যাজারের, আর বেনারসী হল ল্যাজের। বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে।...হাটের লোকের পায়ে চলা রাস্তার ধারের আবাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে ল্যাজের এত অনাদর। ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ একেবারে স্বর্গের ক্যানান-দুরস্ত দেবতা, বাস্তিক মহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। নিজের ছিল ল্যাজ, এত ওরিজিন্যাল যে, অন্যপক্ষ, মহলারেরা তাঁকে হয়ক্রয়া বেওয়াটা বে-বন্দুর বলে জানত।" "ভাব-নারকেলের মেজাজ অন্য, সে রসের মেজাজ, বুনো নারকেলের মেজাজ বেশী, সে শাঁসের মেজাজ। কবিরা হল অন্তরীণী, ফিলজফারের ফলের গাছপাথর নেই।"

"সেইটেকেই বড় করে রেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা—মানুষের পায়ের তলেকার বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীত যে, মানুষের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদে একথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমাদেরই কর্তৃত্ব।

বাস্তবের রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ কতখানি বাস্তববাদী এই নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায়ই আলোচনা দেখি। কিন্তু বাস্তবের প্রকৃত সংজ্ঞা কি আর এ সম্বন্ধে তাঁর মতামতই বা কি, নিজের কয়েকটি উক্তিতেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়—"সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি—জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব।...খুব বেশী চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়, কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্যরূপে হাঁ ব'লেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব।" আজকালকার সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—"আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে 'যা-তা'। বিষয়কে এমন ধরেছে যে, তাকে ছেনে মধের দোকানে মাতালের আস্তাবে অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে বাহবার বদলে 'হাঁ', কবি বটে' বলবে 'একেই তো বলে রিয়ালিজিম্।' আমি বলছি, বলে না। রিয়ালিজমের বেহাই দিয়ে এ রকম পন্থা কবির অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়।" "সাহিত্য শিল্পকে যারা কৃত্রিম বলে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত, প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়াতাড়া-লাগা আচারে নানা বিকারে কৃত্রিম ; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের নন্দনে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য।"—এই সত্যকেই তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, তাঁর প্রতিটি কথায় ও কাজে সেই উপনিষদের বাণীই ধ্বনিত করে বলেছেন—

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ মিশায়ে আপন সুরে।
যা বলিতে চাই সব ভুলে যাই তুমি যা বলাও আমি বলি তাই.
সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই কোথা ভেসে যাই দূরে।"

বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ—বাংলাদেশে বাঙালীর ঘরোয়া মেলে রবীন্দ্রনাথের সুযোগের অন্ত ছিল না। জাত-কাপড়ের দৈন্য ততটা তাকে মুহ্যমান করতে পারেনি যতটা পেরেছিল চিন্তার-দৈন্য। সারা ভারতের অন্যগামী বাঙালীর চিন্তাধারা যখন বিস্মৃতি ছেড়ে সঙ্কীর্ণতার নীচতায় নিজেদের মধ্যেই ঘুলাঘলি ক'রে ঘর আলোর ঘুরি চালাতে লাগল রাজনীতির কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে, তখন কবি ব্যথিত হয়ে বললেন,—"এই

আমাদের দেশ, এদেশের কোন্ সকল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি। আহুরে ছেলের মত আমরা আবার ঠোঁট ফুলিয়ে তাঁরই কাছেই আসি। বড়ার কাজ ধৈর্যের—পুত্রের। আমাদের দিয়ে তার কোনটা হল না। শুধু ছেলেলি নালিশ-ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না ছাড়া করব, অন্যথা ভিক্ষা ছেঁড়। নিজেরা করব না, কাউকেও কিছু করতে দেব না।"

"একটা বড় আশ্চর্য। ভিক্ষি দেখছি এই বাংলাদেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশ সেবার সম্বন্ধে মাত্র করেন, নিম্ন শ্রেণির মেয়েদের মত যত তাড়াতাড়ির মেলাকেই তারা উচ্চ রাজনীতি বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোক তাই ভিলে ভিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্য বল পাবে না, বল পাবে পড়া জিনিসকে ভাঙ্গবার পৈশাচিক আনন্দে।"

"এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। বুদ্ধির অভাববশতঃ নয়, ওর মধ্যে দুর্বুদ্ধি আছে, আছে পরশ্রীকাতরতা।... অভিভাবকদের অন্ধ পুষ্ট যান্ত্রিকহীন ছাত্রদের নীতি অবজ্ঞের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বাধীনতার দাবী বলে ঘোষণা করে তাদের ক্ষেপিয়ে অপরের সৎকীর্তি দ্বারা ধ্বংস করতে চায়, তারা নামে এবং ধরিয়ায় যেই হোক, আসলে দেশের প্রবল শত্রু। আজকের দিনে তারাই প্রবল হয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আমাদের বাঁচবার কোনও পথই নেই। সমস্ত ভারতবর্ষের গ্লানির বোঝা আজ এই বাংলাদেশ। অথচ বাঙালীর আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে—হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি ক্ষেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালীর ভালো আজ আর কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না।...বড়কে, বৃহৎকে, মহৎকে মানুষ না, পরস্পরের কাঁধে চলে ওপর থেকে কানা ছুঁড়ব এই মনোবৃত্তি থেকে কোনও কল্যাণ আসতে পারে না।"

ভারত-সাধক রবীন্দ্রনাথ—স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলেছেন, জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি—লক্ষ্য জানী। আর তারই বিকাশার্থে ঘাত-প্রতিঘাত ধর্মকর্ম। আসলে মুক্তির জন্য যে আমরা হল জীবনের লক্ষ্য, তা যদি শিশুর সহজ ও সরল বিশ্বাসে প্রহ্লাদের মত প্রথমেই গ্রহণ করে নিই তবে আর কি প্রয়োজন কর্মের—কিইবা অসত্য থাকে তখন? তাই জ্ঞানীর কর্মের প্রয়োজন হয় না। তবে গীতার শ্রীকৃষ্ণকে দেখি, লোকের শ্রীতির জন্য তবু তিনি কর্ম ত্যাগ করেন নি। প্রজ্ঞাপুরুষ রবীন্দ্রনাথকেও দেখি বারেবারে জ্যোতি দর্শনে তিনি বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্রে সত্য-শিব-সুন্দরে আবদ্ধ হয়েও নিখিলের হাটে সব কিছুতেই তা নিরীক্ষণ করেও তবু আমার লোকের শ্রীতির জন্য কর্মও করেছেন সাধারণকে আহ্বান জানিয়ে। যে আনন্দের আস্বাদ তিনি পেয়েছেন, যে অমৃতের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা সকলস্তরের সর্বসাধারণকে দেবার জন্যে তিনিও ভগবানের প্রেরণায় ব্যাকুল হয়ে আহ্বান জানিয়েছেন। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, যে গান গেয়েছেন, যে ছবি এঁকেছেন, যে প্রেরণায় মেতেছেন ও যা কিছু রচনা করেছেন, তা তারতেরই শাশ্বত সার্থ, যা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-মন্থন করা প্রাণ ঢালা প্রজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। অমৃতের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দে নিজেকে জগতের সঙ্গে মিশিয়ে সুন্দর ক'রে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই সুন্দরের অবগুণ্ঠন অপসারণেই কাটিয়েছেন সারাটি মুহূর্ত। জীবন সুন্দর—জগৎ সুন্দর, জীবনও জগতের বিশি স্বামী, তিনি সুন্দর, এই তিন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য, তাইত তিনি বিশ্ব-প্রেমিক! "মন্তকারে ছলনার ভূমিকায়' মত দুঃখকে একটা 'জ্ঞানের নিকট ভান' বলে মেনেছেন; তাই তার কাছে দুঃখ অরের মুখোসমাত্র।' 'জীবনের মিথ্যা ও দুষ্কৃতকে, এই বিভীষিকাকে তিনি 'মৃত্যুর পরিহাস' বলে মেনেছেন। সাধন পথে যে কয়টি যোগের নির্দেশ আছে, একমাত্র ভক্তি বা বিশ্বাস দিয়ে তিনি তাদের সমস্তকেই জয় করেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে, তার এত বৈচিত্র্য কেন? ভগবান স্বয়ং বলেছেন, আমি বহু হব। আর সকল গাছেই শুধু গোলাপই যা ফুটবে কেন? যুঁই, বকুল, বেলা ওরা কি কেউ কম সুন্দর? আসলে যা চাইবার তা যখন ফুরিয়ে যায় গ্রহণের জন্যেই, তাকে যদি প্রথমেই আহরণ করতে পারি,- তবে আর বিড়ম্বনা কেন? শিশু সহজ সারল্যে মায়ের কোলে থাকলেই যেমন সে নিশ্চিন্ত, কোন উদ্বেগ থাকে না; তেমনই শুধু মাত্র বিশ্বাস সম্বল করে ভগবানের উপর নির্ভরতা আনলে মানুষও নিশ্চিন্ত হতে পারে। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের "অদ্বৈতবাদকে আঁচলে বেঁধে" যাওয়ার মত তখন তার অবস্থা! এ শুধু লেখনীর মাধ্যমেই নয়, সারা জীবন দিয়ে তিনি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই বলে গেছেন শেষবেলায়—

যা পূর্ণতার প্রসাদে ভরপুর,—
"মাঝার দিয়ে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধুপান করেছি
ধন্য আমি তাই—
মাঝার দিয়ে এই কথাটি
জানিয়ে দেন যাই
বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই খেলেন খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেন
মৃত্যুবরন ঘেরে
পরশ যাঁরে যায় না করা
সহজ যেচে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—"

প্রেমই করে তার কবি, তার শিল্প, তার জীবনদর্শন, সাহিত্য, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, ছবি, গান সমস্ত কিছুর মধ্যেই যে কৃষ্টির পরিচয় পাই, তা আদি, সনাতন ভারতেরই শাশ্বত ঐতিহ্য। সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে সর্বশেষে অভিজ্ঞতাস্বরূপ পেয়ে তিনি সমস্ত সম্ভারের কেন্দ্রস্বরূপ যে 'শান্তি নিকেতনে' বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন,—এইটাই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাই তার যে কোন দিকেই লক্ষ করি না কেন, রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ পুরুষ বলতে কোন সংশয়েরই অবকাশ থাকে না। আর পূর্বেরই মতন যেমন বলি, বলার শেষ হয় না, তেমনই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তার কথাই খাটে—

"জনে জনি এইখানে শেষ—
তোমা যা হয় শেষ।
আমার তোমার সত্য থেকে
আসে যে আবেশ।

আশ্পাসের ছায়ায়

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম.এ (লণ্ডন), ডি লিট, এম.এ (এড), টি ডি (লণ্ডন)

আকাশের বাতাস যেন জড়িয়ে ধরেছিল। পাহাড়ের গা বেয়ে চ'লেছি, কোথাও পাইন গাছের সারি আবার কোথাও চালু বরফ যায়। মাঝে মাঝে দুই একটি ছায়ার নির্ঝরিণী চোখে পড়ে। বরফ-গলা জলের ধারা ভরা যৌবনের উচ্ছল হিল্লোলে বিভোর। অদূরেই দেখা যায় জেনেভা শহর—বিশ্ব-মৈত্রীসম্মেলনের কেন্দ্রস্থল। কত দেশ থেকে কত মানুষ ভিড় করেছে এই শহরে। রাত্রিদিন—জন স্রোত বইছে। একদিকে সুখের বসতি অন্যদিকে আল্পসের ছায়ায় ঘুমন্ত পুরী।

আজিও এসেছি এই মফঃস্বলে। সকাল থেকেই কাজ সুরু। ঘর সাফ করা থেকে সুরু করে সব কিছুই করতে হয় প্রত্যেককে। আমার সাথের বিটে আছেন মিঃ মুডেণ্ডা—নাইজিরিয়া থেকে আগতেন। ভদ্রলোক একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। তার ওপর তার প'ড়েছে অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করা। দুই একদিনের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল মুডেণ্ডার সঙ্গে। বেশ প্রাণখোলা স্বভাব ভদ্রলোকের। কপালে একটি পুরান ক্ষত চিহ্ন—মিশমিশে কালো চেহারা ও জলজলে দুটি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি! কপালের চিহ্নটি দেখে প্রশ্ন করলাম—! উত্তর দিতে গিয়ে মুডেণ্ডার চোখ দুটি ছল ছল ক'রে এল। বলল—মার হাতে পরিচয় দেওয়া এই ক্ষতচিহ্ন। আমাদের সমাজে প্রত্যেককেই এই ক্ষতচিহ্ন বরণ করতে হয় বৈশব কৈশোরের সন্ধিক্ষণে। আমি একটু বিস্মিত হয়েই মুডেণ্ডাকে ব'লেলাম—"এ সব সংস্কার ছাড়া ত কিছুই নয়…"। মুডেণ্ডা প্রশ্নের যে উত্তর দিল তাতে আমার আর কিছু বলার রইল না।—

সে প্রত্যুত্তরের সুরে ব'লল—"সংস্কারকে বাদ দিলে জীবনে থাকে কি সম্বল পার!—আর……"

মুডেণ্ডার কথায় আমার সম্বিৎ ফিরল। বুঝলাম আমি তার মনের গভীরে আঘাত করেছি। এদিকে কথায় কথায় বেলা বেড়ে উঠেছে। এবার প্রথম সাধারণ অধিবেশনের সময় হ'য়েছে। চারিদিক থেকে অগণিত মানুষের ভিড়। মহামানবের সাগরতীরে নিজেকে তুচ্ছ ব'লেই মনে হয়। আবার শ্রদ্ধা জাগে মানব সমাজের প্রতি। আঙ্গিকের গায়ে এ যেন এক ভিন্ন জগৎ। কত দেশের মানুষ এখানে এসে মানব ধর্ম দীক্ষা নিয়ে যাচ্ছে।

অধিবেশন সুরু হ'ল একটি কোরাস গানের মধ্য দিয়ে। গানটির কথা হ'ল।

"where the whole realm of nature mine,
That were an offering for too small,
Lone so amazing so durine
Demands my soul, my life, my all.

এবার হলাণ্ডের এক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর ভাষণ। সকলেই আকুল আগ্রহে শুনলাম সেই বিদেশী বন্ধুর কথা। বড় চমৎকার তার বাচন-ভঙ্গী। তার সার কথা হ'ল "The energy of ideology is greater than atomic energy" বড় ভালো লাগল তার ছোট ভাষণটি।

'এবার একটু জল-যোগের পালা। যে যার খুশীমত চায়ের পেয়ালা ভরতে লাগল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল একটি সৌম্য কান্তি যুবক। নিজের পরিচয় দিয়ে ব'লল—"আমার নাম লেসলিমার্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের—এম, এ ক্লাসের ছাত্র। লেসলির মুখে যেন একটি গভীর প্রশান্তি—সে যেন সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে কোনখানে। বলল'—"দেখেছ ঐ সুরাভরা পল্লী—ওই স্বপ্নময়ী প্রকৃতি। ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বশান্তির মূলমন্ত্র।

সাগ্রহে ব'ললাম—যাবে একদিন বেড়াতে—

ঠিক হ'ল পরদিন সকালেই দুজনে বেরিয়ে পড়'ব। সেদিন সারাক্ষণ হৈ হৈএর মধ্যে কাটল। সন্ধ্যায় ফিরে এলাম নিজের আস্তানাটিতে। এসে দেখি মুডেণ্ডা তখনও ফেরেনি। কাচের জানালা দিয়ে দেখলাম অদূরেই

আঁধারের প্রাবন। মাঝে মাঝে দুই একটি আলো জ্বলছে নিশুতি রোমাকি পোকার মত। তাঁবুগুলো যেন নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙল মুডেণ্ডার কণ্ঠস্বরে। কণ্ঠে তার উত্তেজনার আভাস রয়েছে। ব'ললাম —ব্যাপার কি? কোথায় গিয়েছিলে—কিসের এত দেরী হ'ল যে···? মুডেণ্ডার চোখে মুখে যেন তখনও কিসের আবেশ লেগে আছে। সে বলে যেতে থাকল—তার পল্লী পরিক্রমার কথা। কি সুন্দর সেই দুই-তিনশ্যাণ্ডোর গ্রাম; কি সুন্দর সরল গ্রামবাসীর জীবন। শুনে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে উঠল। রাতের অবগুণ্ঠন টুটে গেলেই যাত্রা সুরু হবে—ঠিক হ'ল।

ভোরের আলোয় তিন বন্ধুতে পা বাড়ালাম। আঙ্গসের ছায়ায় পথ চলতে বেশ লাগছিল। জামল প্রান্তরের এক কোনে—সূর্য্য উঁকি দিয়েছে, চারিদিকে সোনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এমন নীল-শ্যামলের মেলা আগে আর কোথাও দেখিনি। আঙ্গসের চূড়ার কাজল মেঘের ভিড়, মাঠের কোল ঘেঁষে ছুটে চ'লেছে দুরন্ত নদী। নদীর দুধারে বনফুল আলো ক'রে আছে। আর দূরে দেখা যায় গ্রামশ্রী-মণ্ডিত একখানি কুটীর। ক্রমশঃ কুটীরটির দিকে এগিয়ে চ'লেছি। হঠাৎ দূর বাতায়ন থেকে আমাদের কোন মায়াবিনী যেন হাতছানি দিতে লাগল। আমাদের আসতে দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এল অভিনন্দন জানাবার জন্যে। চোখ দুটিতে তার নীল আকাশের ছায়া—মুখে মাটির মায়া। আমাদের বাড়ী যেতে হবে তোমাদের। পরে বুঝলাম মেয়েটির মুডেণ্ডাকে চেনে।

মুডেণ্ডাও অপ্রত্যাশের মত ব'লে উঠল—নিশ্চয়ই যাব···নিশ্চয়ই— কিন্তু তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। এইবার মুডেণ্ডা আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ব'লল—এই হ'ল লিডিয়া। বড় ভালো মেয়ে—লিডিয়ার খোলাপ্রাণ মুখ সরমে রাঙা হ'য়ে উঠল।

লিডিয়াদের বাড়ীটি ছবির মত। চারিদিকে কাঁচের জানলা, ওপরে স্লেটপাথরের ছাদ। অদূরে অস্পষ্ট আঙ্গস্ যেমান দিয়ে ঘুরিয়ে আছে। কিছুক্ষণ বাদেই লিডিয়ার বাবা ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। আমাদের কথা শুনে তিনি প্রসন্নতাই প্রকাশ ক'রলেন। প্রাণখোলা তাঁর ব্যবহার। লিডিয়ার মা অল্পদিন হ'ল মারা গেছেন। ব'লতে ব'লতে তাঁর বাবার চোখে জল ভ'রে এল। তাই লিডিয়াই তাঁর প্রাণ।·····কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে এল। এবার ফিরতে হবে মণ্টেতে। লিডিয়া বাবার কাছ থেকে মণ্টেতে যাবার অনুমতি নিল।

দূরে গ্রহ গ্রহ ক'রতে থাকে মণ্টে সহর। লিডিয়ার মন কেমন দুলতে থাকে কে জানে?

পথ চ'লতে চ'লতে লিডিয়া অনেক কথাই বলে গেল। ব'লল তাদের দুঃখ কষ্টের কথা—ব'লল তাদের দেশের জনসাধারণের গতানুগতিক জীবনযাত্রার কথা। লেসলির কাছে লিডিয়ার কথা শুনো যেন বড় ভালো লাগছিল। তাই সে সব কথা না শুনেই সাগ্রহে প্রশ্ন ক'রে বসে সুইজারল্যাণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে। লিডিয়া বলে— এদেশের সমাজের উপর প্রাচ্যের জীবনাদর্শের প্রভাবও যেন কিছুটা এসে প'ড়েছে। তাই এদের সহজ সরল জীবনের প্রতি আকর্ষণ এত বেশী। এরা শান্তিপ্রিয়। কিন্তু বিড়ম্বনা এইখানেই যে যুদ্ধকে এরা এড়াতে পারে না—জনসাধারণ এখনো নাকি বর্বর। হঠাৎ চোখে প'ড়ল অদূরের দুরন্ত পাহাড়িয়া ঝরণাটি। বিস্ময়ের বুকে অন্তরঙ্গির রঙ্গরাগে লিডিয়াকে অপরূপ লাগছিল।

পথ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। সারা পথে লিডিয়া হাসি আর উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে চ'লল। কখনও পথের-ধারে নদীর বুকে নিজের ছায়া দেখে, কখনও বনফুল তোলে, কখনও বা গায়ের ছায়ায় গান করে। সে যে গাঁয়ের মেয়ে।

মণ্টেতে এসে পৌঁছলাম লিডিয়াকে নিয়ে। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে যেন সবার মন জয় ক'রে নিল। তার সহজ আচরণে সবাই মুগ্ধ হ'ল। পরণে লালগাউন, লালটুপি—বেশ মানিয়েছিল লিডিয়াকে বিশ্বমৈত্রীর এই মিলন-বাসরে।

সন্ধ্যার আমেজ যেন আকাশ-বাতাসকে মেদুর ক'রে তুলেছিল। তার মাঝে সবার অনুরোধে লিডিয়া গান ধরল। একটি সুইসগীতি। এর অর্থ হ'ল—

"মানুষকে ভালবাস
যুদ্ধকে ঘৃণা কর
বিশ্বপ্রেমে হৃদয় রাঙাও
হে বিশ্ববাসী"

সকলের মনের কথা নিয়ে লিডিয়ার এই গানখানি যেন তৈরী। লিডিয়া তার প্রাণ চোখদুটি যেন কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ ক'রল। দেখলাম, আঙ্গসের কোলে প্রকৃতির কি বিচিত্ররূপ। রাত্রির আঁধার নেমে আসছে পল্লী ও প্রান্তরে। লিডিয়া গ্রামের পথে পা বাড়ায়। সঙ্গে লেসলি। লিডিয়ার মন দুলতে থাকে। পল্লীর পথে দুই একটি গ্যাসের আলো জ্বলছে, আর জ্বলছে গাঁয়ের এই মেয়েটির বুকে আশার মণিদীপ। কারও মুখে কথা নেই। দুজনেই যেন নীরব কবি। একে একে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল দুটি প্রাণী।

আমি আর মুডেণ্ডা ফিরে এলাম আমাদের তাঁবুতে। তখনও যেন কানে বাজছিল লিডিয়ার প্রাণখোলা হাসি আর উচ্ছ্বাস। মুডেণ্ডা ব'লে উঠল—বিশ্ব মৈত্রীর এই পরম অর্থে এসে যা দেখলাম তা কোন দিন ভুলবার নয়। কথার মধ্যে কোথায় যেন বেদনার ইঙ্গিত। প্রশ্ন ক'রলাম "কবে দেশে ফিরবে ঠিক ক'রেছ?" মুডেণ্ডা বলে "আমার সেই বান্ধবের সংসার, সমাজ-সংসারের কলরবের মধ্যে যেতে মন চাইছেনা। মনে হয় এই খানেই থেকে যাই"। মুডেণ্ডার মনটা আজ ভালো ছিলনা—তাড়াতাড়িই সে শুয়ে পড়ল। আমি ভাবছিলাম লেসলির কথা। এখনও ত' সে ফিরল না! কিন্তু কেন? অন্ধকার প্রায়—তার ওপর অজানা। তবে কি···। নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না—বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের পথে। পাহাড়ের গা বেয়ে যে আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে তা যেন তমসার কোলে মুখ লুকিয়েছে। একদিকে—দূরে গ্রহ গ্রহ করছে—হাতছানা নদী, অন্যদিকে ঘুমিয়ে

পড়া নিবুম গ্রাম। তারা-ভরা আকাশ সব মন ক'রে ঘুমন্ত পল্লীর ওপর।

পথ চলেছি কিসের নেশায় কে জানে! ঐ বুঝি সেই ঘরখানির ফুল ফুল গন্ধ। কখন আকাশের কোণে এক ফালি চাঁদ উঁকি দিয়েছে! মাঝে মাঝে বন ফুলের গন্ধ। হঠাৎ কানে ভেসে এল এক উদাস-করা গানের সুর! বিদেশী পথিক আমি। এমন নিশাচরের মত কোন দিন কিসের প্রাণেও যে পা বাড়াই নি। অবাক লাগছিল। সুন্দর লাগছিল এই পথচলাকে। দূরের গির্জ্জার চং চং করে নিশিথের সংকেত জানিয়ে গেল। কিন্তু লেসলি কোথায়! এগিয়ে চ'লেছি সেই সুরটির দিকে। গতি থামল পরিচিত কণ্ঠ শুনে। যমুনার জলরাশির বুকে দুলছে এক ফালি চাঁদ, আর দুলছে দুটি ছায়া। কতক্ষণ চ'লল প্রাণখোলা গীতি সেই রাত্রির ছায়ায়। আমি বললাম লেসলি—ক্যাম্পে ফিরবে না? লেসলি তখন লিডিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে বলল—হাঁ ফিরতে ত হবেই—কাল আবার বিশ্ব মৈত্রী সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন। তাই তার প্রথম পর্ব্ব আজ সেরে নিলাম এই ঘুমন্ত রাত্রে—এই নিবুম গাঁয়ে। লিডিয়ার মুখ রক্তিম হ'য়ে উঠল। সে ব'ল—এবার থেকে আমরা দুজনেই এগিয়ে চ'লব সেই মহান ব্রতনিয়ে, আর তুমি হবে আমাদের বন্ধু ও অর্থধার···

কত রাত্রি হ'য়েছে কে জানে। রাতের পাখী ডেকে উঠল—কানে এল তাদের পাখা ঝাপ্টার শব্দ। বুঝলাম শেষ হয় রাত্রির শেষ প্রহর। চারিদিকে মৌন প্রকৃতি···। সারা রাত্রি কাটল তারই কোলে।

ভোরের আলো উঁকি দিল—আকাশের মাথায় সোনার মুকুট ঝলমল ক'রে উঠল। শিশির-ভেজা পথে শুরু হ'ল পথচলা।

মনে হ'ল রাত্রি কত গভীর কত নিবিড়—আর দিন কত প্রখর নির্মল।

প্রভাত কিরণে আবার জেগে উঠল সেই বিরাট আঙ্গন তার ব্যায়ামবীর অপরূপ লাবণ্য মেখে—শ্রীমদবীণার দুটি তারকে একসুরে বাঁধল লেসলি ও লিডিয়া। চোখে তাদের ফুলে উঠল উদ্দাম ভবিষ্যতের স্বপ্ন—বুকে অফুরান ভালোবাসা।

আর আমাদের কানে ভেসে এল সেই গানের রেশটুকু

"মানুষকে ভালোবাস···

মানুষকে ভালোবাস···

বিশ্বপ্রেমে হৃদয় রাঙাও···

হে বিশ্বধারী···!

ঘুমঘুমন্ত ধ'রে আঙ্গনের বুকেও যেন ঐ গানের প্রতিধ্বনি! কত যুগের বিরহ-বেদনাকে বহন ক'রে সে পাষাণ হ'য়ে অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে! তাই আজ বুঝি তারও স্বপ্ন সার্থক হ'ল!

ভারতীয় সংস্কৃতি ও কবিশেখর

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, কাব্যবেদপুরাণতীর্থ

প্রবীণ কবি কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা হয় নাই। কবিশেখর কলেজে পড়িবার সময় "অন্তর্যামী বৃন্দাবন" নামে একটি গান লিখিয়াছিলেন। আজকাল বড় বলিয়া গানটিকে কবিতা বলা হয়। "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত সেই গানটির দ্বারা দেশে প্রথম তাঁহার কবি-খ্যাতি জন্মে। অনেকের কাছে ঐ একটি গানই পরিচিত। অনেকে মনে করিতেন, এইটিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তারপর তাঁহার "পর্ণপুট" প্রকাশের পর তিনি পল্লীকবি ও ব্রজলীলার কবি বলিয়া খ্যাত হন। আমরা প্রবেশিকাপাঠ্য ও কলেজের পাঠ্য পুস্তকে তাঁহার যে কবিতাগুলি পাইয়াছি সেগুলির প্রত্যেকটি আমাদের শিক্ষাবিভাগে সমাদর লাভ করিয়াছে। সেগুলি অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা—পল্লীকবিতা বা ব্রজকবিতা নয়। যেমন—দুর্ব্বাদল, লালাবাবুর দীক্ষা, চাঁদসদাগর, শ্রীচৈতন্য, বিদ্যাসাগর পথে, ত্রিরত্ন, ভাগীরথী ইত্যাদি। এইগুলি হইতেই বুঝিতে পারা উচিত যে তিনি কেবল পল্লীকবিতা অথবা ব্রজকবিতা রচনা করেন নাই। কবিশেখর আমাদের আজীর শ্রীযুক্ত, বর্ত্তমান সমাজ (অবশ্য বিলাতীয় ভাবাপন্ন নাগরিক সমাজ নয়) ও পার্শ্বস্থ জীবনের সুখদুঃখে আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলির খুঁটিনাটিপূর্ণ ব্যাখ্যামূলক ও ভারতীয় সংস্কৃতি অবলম্বনে রচিত তাঁহার কবিতাগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গাথাজাতীয় কাহিনীমূলক কবিতায়, রসকদম্ব জাতীয় কবিতায়, ঋতুমঙ্গল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমূলক কবিতায় এবং বাঙ্গাত্মক Epigrammatic কবিতার সংগ্রহপুস্তক। তিনি অনেক গান লিখিয়াছেন, সে সকল গানের প্রচার হয় নাই।

আজকাল বিষয়বস্তুর বিচারের দ্বারা কবির বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করা হয়। সেইজন্য বিষয়বস্তুর কথাই বলিতেছি। কবিশেখরের বৈশিষ্ট্য তাঁহার ভারতীয় সংস্কৃতি অবলম্বনে রচিত কবিতাগুলিতেই পরিস্ফুট। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বৌদ্ধসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, বাংলার লোকসাহিত্য—ভারতীয় সংস্কৃতির কোন অঙ্গকেই তিনি বাদ দেন নাই। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারা মনে করেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি লইয়া রচিত কবিতাগুলি বুঝি সংস্কৃতেরই অনুবাদ। আমরা জানি অনুবাদে কবিশেখর সিদ্ধহস্ত হইলেও অনেক

কবিতায় প্রাচীন বিষয়বস্তুর কল্পনে তিনি যেমনভঙ্গী, গঠনসৌষ্ঠব, শ্রী ও লাবণ্য সংযোগ করিয়া অভিনব রূপদান করিয়াছেন এবং অধিকাংশ কবিতা তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির ভাবে আবিষ্ট হইয়া রচনা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতার সংখ্যা তাঁহার এত বেশি যে, একটি প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কবিশেখরের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বিশেষ কোন টীকনী না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি কেবল কবিতার কতকগুলি চরণ উৎকলন করিব। তাহা হইতেই সহৃদয় পাঠক কবিশেখরের রচনাশৈলী সম্বন্ধে আভাস পাইবেন।

কবিশেখরের ভারতবন্দনা ভারতীয় সংস্কৃতিরই বন্দনা। ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে আছে ধর্ম। ধর্মকে বাদ দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি হ্যামলেট-হীন হ্যামলেটের মত। কবি তাই প্রথমেই বলিয়াছেন—

জ্ঞানযোগ-রূপে ধ্যান-যোগ রূপে প্রতি রেণুকণা পবিত্রিত।
তোমার মাটিতে হাঁটিতে সব-সৌরবে তনু রোমাঞ্চিত।

ভারতবন্দনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত চরণগুলি কবিরের নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধরণ করিতেছি না—কবি কি ভাবে সংক্ষেপে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিয়াছেন তাহারই নিদর্শন দেখাইতেছি।

কর্মে তোমার শুধু অধিকার ফলে সঁপিয়া কর্মফল,
বরণ মিথ্যা অমরাত্মার সে ত নব-বাস পরার ছল।
ইন্দ্রিয়াতীত সন্ধান তব, ভোগসুখে জানো তৃপিত কেহ,
সুরধামে ছিল আর সব ফেলি খুঁজে ফিরা নিজ স্বত্বদেহ।
রূপে ভুল তব ঋষিশিষ্যের শুধু তর্জনী হেলনভরে
রথীর কিরীট, উন্নত বাজী, উন্নত ধনু নমিয়া পড়ে।
বৃপতি তোমার প্রকৃতির পিতা জনক শুধুই জন্মেছে,
প্রাসাদ অটবী এপার-ওপার মাঝখানে শুধু ত্যাগের সেতু।
আর্তে তারিতে অন্নতে ধারিতে তব বীরগণ আয়ুধ ধরে,
শির হতে পারে খড় পশি, প্রাণ সঁপে প্রাণাধিক ত্রাতের তরে।

* * * * * *

মনুসন্তান যে আছে যেখানে অমায়িত প্রতি তোমার দেহে,
শ্বেত পীত কালো সকল বর্ণ একাকার তব শুভ্র স্নেহে।
যুগে যুগে কত বন্যা কত না ঝঞ্ঝাকমল এসেছে রুখে,
অমিতা ধন নিয়ে গেছে তারা নিতা হৃদয়ে রেখেছ বুকে।

(পর্যপুট)

প্রথমে বেদের উপর রচিত কবিতাটির কয়েক পঙ্‌ক্তি উৎকলন করি। বেদকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন—

১। চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষ্ক, রবিও হয়েছ নিখিল তমঃ,
আলোক-তৃষায় হারাই তোমায় উৎক্ষেপে তব লক্ষ নমঃ।
২। তব আশ্রয়ে হয়ে আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য, শম,
পুটভেদমুদ্রামৌলিকুসুম হে বিরাট, তব চরণে নমঃ।
৩। হে অমৃত শ্রুতি, বোধের জীবন তব ছন্দলে মুকুতাসম,
তুমি ব্রহ্মের বাঙ্‌ময় রূপ, বন্দিল, তব চরণে নমঃ।
৪। বহু-মানবের মোহন মাধুরী তোমা হতে বয় হে মহনীয়,
লোকযাত্রার উপবীত তব বহুমন্ত্রীর উত্তরীয়।
ইন্দুতে ঘরে, সিন্ধুতে ঝরে, মধুমায় উড়ে মধুর রেণু,
ব্যাধি ক্ষুধা হরে ওষধিলতায়, ভালে মধুমায়া মেদিনী-বেণু।
৫। জীবলোক-ধারা রূপে বহমান ঘটায়ে পাবন শুভোপনয়।

মধু ভোরে মোরা মক্ষীর মত। মধু ঘরোঘরি তোমায় নমঃ।

কবিশেখর আদিত্যদেব সম্বন্ধে দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন। একটিতে ভারতের সৌরোপাসনার সঙ্গে বর্ষ, ব্রাহ্মসৌরব, শিল্পসাহিত্য, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, লোকাচার ইত্যাদির সম্পর্কের কথা বলিয়া আক্ষেপ করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

কেহ আর তব খেঁজন করে না, সৌরতন্ত্র সুপ্ত ক্রমে,
ইতু ঘটে পূজাপর্ব্ব হয়েছে সারা,
স্নান শেষে শুধু পল্লীবাসীরা দিনে একবার তোমারে স্মরে।
পাঁজির পাতায় রয়েছ তুমি হারা।

কিন্তু—

মানবোদয়ের আগে হতে তব নিত্যসেবার যে আয়োজন,
হয়নি বিতথ তার তিল-পরিমাণ।
গিরিচূড়া তোমা বরিছে নিত্য, তোমার আপন চারণগণ
সাঁঝে ভোরে গায় ধীরে নীড়ে জয়গান।
যুগ যুগ হতে যেসেরা অরুণ কেতন উড়ায় তোমার রথে,
সমানই নিত্য উষসী সন্ধ্যা সিঁদুর ছড়ায় তোমার পথে,
তিরদিনই সেই সূর্য্যমুখীরা তোমা পানে চেয়ে ব্রতটি পালে,
কাল-পারাবার কূলায় তোমার গ্রাম।
বহুধায় ঘিরে কনক আসিস পাপিনহস্র সমানই ঢালে
যুগ যুগ হতে লহে সে গর্ভাধান। (পর্যপুট)

আদিত্য সম্বন্ধে আর একটি কবিতায় আদিত্যের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির ও মানবজীবনের গভীর সম্পর্কের কথা বলিয়া কবি উপনিষদের ভাষাতে শেষ করিয়া বলিয়াছেন—

সীমায় যাঁহার আভাস পেয়েছি তাঁরে যেন পেয়ে ভুবায় লভি
রূপের খেয়ালে, রূপাতীত, অরূপ ব্রহ্ম জাগাও, রবি।

কবি আদিত্যকে বিশ্বাত্মিকা দৃষ্টিতে কীরূপে দেখিয়াছেন এই কবিতায় তাহাই সব চেয়ে প্রধান কথা।

বিশ্বাসের তুমি হোমাগ্নি, হৃত্তিল তব অনীম ব্যোম,
সপ্তর্ষিরা হোতা সে যজ্ঞে, সোমরসধারা সোপার সোম।

প্রথম গাহে সামগান তাহে উদ্গাতা তারা সমস্বরে,
ব্রহ্মা স্বয়ং 'ব্রহ্মা' ও-রাগে, মহাকাল সুতে চমর করে।
শ্রেষ্ঠলোক লভে ওঙ্কার-কথা, দেবতা হবা, সোমাঞ্জলি,
ভূতনাথ লভে ভস্মভূষণ, ভূতগণ লভে বিচিত্র-বলি।
চক্র পুরোডাশ লভিছে মানব ওষধি ভক্ষণ প্রসঙ্গে।
তামস পশুর কবির পড়ায় প্রাণী বিপক্ষে বলির যূপে।
(বৈকালী)

যাঁহাদের বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় আছে তাঁহারা এই অংশের অনায়াসে তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"প্রভঞ্জন" একটি দীর্ঘ কবিতা। ঝঞ্ঝাবাতের সহিত অনেক কবিই বিপ্লবের উপমা দিয়াছেন। কবিশেখরের বিশেষত্ব এই যে তিনি বিপ্লব বলার আসল ছন্দটি নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

হাতের করের চমক কাড়িয়া ডিম ডিমি ডিমি বাজাও চণ্ড,
দুলায়ে শিরজটা,
কটি বেষ্টিয়া কন্দুক ক্রীড়া ঘন ঘন ঘন বাজাও গণ্ড,
ছুটি ঘোর ঘন ঘটা।
প্রলয়-পিশাচ নাচুক আজিকে তাথিয়া তাথিয়া বিপুল রঙ্গে
করি সবে কোলাকুলি।
বৎসর-শেষ উৎসবে এস প্রলয়ঙ্কর, শম্ভু সঙ্গে
উড়ায়ে অগ্নি-ধূলি।

কবিতার শেষ হইয়াছে এইভাবে—

তাণ্ডবে কবি যন্ত্রের ধূলি, ঘুচাও সকল মোহের বন্ধ
ব্যাধায় পড় পুষ্টি,
ঘুচাও মনের জঞ্জাল জাল, পুরাতন যেন হিংসা দ্বন্দ্ব,
ফিরাও বিমল প্রীতি।
নেত্র আমার ধূলায় ফিরু, ছিঁড়ে আসুক পতাকা রৈত্রী,
চারিদিক করে ধূ ধূ
লেখা আছে তার শান্তি, অস্তি, মঙ্গল, প্রেম, সাম্য, মৈত্রী,
অনুমানে বুঝি শুধু। (বৈকালী)

বারুণ পর্ব্ব। বরুণকে কবি বলিয়াছেন—রসপরাধর। যজ্ঞ উগ্র তপ করে এই দেবতার কৃপা কণার জন্য। একদিন তাহার সে তপস্যা বরুণের কৃপালাভে সার্থক হইবে। যেন তাঁহার—"পুঞ্জীভূত ব্রাহ্মতেজ-বৌদ্রের ভাণ্ডারী।" তাঁহার রাজরূপের পরিচয়ে কবি বলিয়াছেন—

পুতন্ন রয়েছে ছত্র জলদের সন্ধ্যারক্ত-বসনে,
পর্জ্জন্যের হস্তে উঠে ইন্দ্রায়ুধ ধনুঃ বিপক্ষনে।

বরুণের স্বরূপ—

তোমার সিন্ধু বাপ সিরে মরুপ্রান্তে সিহির সংঘাতে
ধক ধক পদ্মমূলা সিন্দোলাক্ষ মধুমদস্নাতে
ঘালায় নূতন সূর্য। অস্ত ভেদি বাড়বাগ্নি অনল
ধীসহাহ সেতু সম ভেদুমূহসম তার সলে।
তব বলিপুষ্ট প্রাণ ভাসে সদা উল্লোল-কল্লোলে
এ পৃথ্বী প্রহ্লাদসম বক্ষ পরিপ্লুতে সেব ঘোলে।

কবিতার উপসংহারে তীমকান্ত রসস্বরূপ বরুণের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইয়া কবি বলিয়াছেন, রসসরস্বতী আমার রসনায় আসীনা হউন।

তোমার মঙ্গলঘটে কর মোরে সাহিকেলময়
রসসর্গ, হোক তায় রসালের পাখা ছত্র সম,
নির্ব্বাপেক্ষ জীবনের ধূপেতন্ন লও বেদীমূলে
শেষ অর্ঘ্য নিও মোর চিতাভস্মে জাহ্নবীর কূলে। (বৈষ্ণবী)

বেদকবির এক একটি দেবতাকে আশ্রয় করিয়া কবি ভারতীয় সংস্কৃতির এক এক দিক দেখাইয়াছেন। কেবল তাহাই নয়,—কবি তাঁহার জীবনে সংস্কৃতির ধারাগুলিকে উপলব্ধি ও উপভোগ করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ প্রত্যেক কবিতায় পাওয়া যায়। আর প্রত্যেক কবিতা আধ্যাত্মিক অর্থবা ব্রহ্মাত্মক উপলব্ধিতে লাভ করিয়াছে। বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়াই বলি কবির মতে বৈশ্বানর। বৈশ্বানর ত্রিলোচন-ললাট হইতে ঊর্দ্ধমুখীয় যজ্ঞবিধির পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিতেছে—ঊর্দ্ধরূপে সূর্য্যমণ্ডলে, ইন্দ্রের সহস্র নয়নে তড়িৎরূপে, অনন্তনাগের ফণায় বিষধান-রূপে, মরুতে মৃগতৃষ্ণিকায়, মেরুতে অয়োরায়, সিন্ধুতে ঊর্ব্বরূপে, গিরিতে লাভাস্রোতে, হবে যাযাবর রূপে বৈশ্বানর সতত সক্রিয় আছেন। শরীর কোটরে, জীবের হৃদয়ে, পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যার চিতায়, পাপীর অনুশোচনায়, অস্ত্রবৈদ্যের কর্ম্মশালায়, হিংসায়, প্রতিহিংসায়, কবির বচনে, পক্ষপুটের অগ্রভাগে, প্রেমিক প্রেমিকার বিরহে—কোথায় বৈশ্বানর বিদ্যমান নাই? কবি বলিয়াছেন, আমার পাপসমের কৃষ্ণবর্ত্মা হে কৃষ্ণবর্ত্মা, তুমি জ্বলিয়া উঠিয়া আমাকে অগ্নিবর্ত্তি কর, আমাকে তাতাও, আমাকে মাতাও। বৈশ্বানরের বিশ্বাত্মক রূপকে নিজের জীবাত্মার আহ্বান করিয়া কবি উপসংহারে বলিয়াছেন—

যজ্ঞ করিয়া জীর্ণ এ দেহ দিবে মোরে ইহ-মুক্তি যবে,
অগ্নিহোত্র যাখিয়া আমারও পূত্ত শরীর বিবাগী হবে।
তাও হয় যেন আহুতি তোমার, জন্মবন্ধ-বহন নাশি'
নির্ব্বাণ ওরে হে মায়-বৈরী বিশ্বপাবক শরণ যাচি। (আহবণ)

'সোম' কবিতার ছন্দ, সুর, ভাষা সবই চন্দ্রিকাময়। চন্দ্রের চন্দ্রিকার মতীতনু লক্ষ্মীরায় চন্দ্রহারে শোভমান—লাবণ্যময় যেন সৌন্দর্য্যের রূপ ধরে, আর—

"যা কিছু ধ্বস্ত জীর্ণ ক্ষয় যা কিছু কুশ্রী অংশেষ
সবি শোভময়, ছিন্ন বিভাস তারি ধরে রাজহংসবেশ।"

চন্দ্রের প্রভাবে অমুধি তরঙ্গ বাজাইয়া ছন্দানুগামী হইয়া নৃত্য করে আর—

"মহাকাল যাহে তালে তালে পড়ে চরণযুগ।"

কবি সোমকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

আদি কাল হতে বন্দনা গত কালির আঁখরে কবির লেখা
বুকে শশাঙ্ক অঙ্ক আঁকে, তাই বুঝি গায়ে কালিমা রেখা।

* * * *

ষোড়শ কলায় তোমা চাই বিশু শ্যামচন্দ্রের মনোমতনে।
আধেক গ্রামের আধেক সোমের ছুরে ছিলে লীলা পূর্ণ তবে।

* * * *

দুলালী দুলালে আদরে ডাকিতে তব নামে মিঠা শব্দ খুঁজি
কৃষ্ণচন্দ্রে শ্রীরামচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে তোমারে পূজি। (আহরণ)

এই সকল কবিতা Pure Lyric হয়ত নয়—এইগুলি ইংরাজ-কবিদের রচিত odo শ্রেণীর কবিতা। odo গুলি যে হিসাবে লিরিক, এইগুলিও সেই হিসাবে লিরিক। এই শ্রেণীর কবিতা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ কি না, রসজ্ঞদের তাহা বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কবি নিজ জীবনের সহিত এই গুলিতে প্রবাহিত ভাবধারার সংযোগ সাধন করিয়াছেন। এগুলি ভক্তিরসের কবিতা নয়, অদ্ভুত রসের কবিতা। এই গুলির দ্বারা তাঁর দেবাদ্বিতি নয়, বিস্ময়। চিত্তবিক্ষারণের দ্বারা কবির রসসৃষ্টির প্রয়াস এই গুলিতে বিদ্যমান। কবির এই শ্রেণীর কবিতা ইন্দ্র, পদ্ম, হিমাদ্রি, গঙ্গা, অশ্বত্থ ইত্যাদি। ইন্দ্র কবিতায় লক্ষ্যার্থে বর্তমান যুগের ইন্দ্রত্বের লক্ষ্য করা হইয়াছে। পদ্মে আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের সংস্কৃতির রূপ ফুটিয়াছে। হিমাদ্রি কবিতায় ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতার পটে আশ্চর্যরূপে হিমাচল চিত্রিত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক কবির কাছে হিমালয় সম্বন্ধে কবিতা প্রত্যাশা করি। তাহার চোখে হিমালয় কি ভাবে প্রতিভাত তাহা আমরা জানিতে চাই। কবির সৃষ্টির এতবড় উপজীব্য ভারতে আর কি আছে? হিমালয় যে কবির চিত্তকে বিস্ফারিত করিল না সে ভারতের কবি কিসে? কবিশেখরের হিমালয় আকারে প্রকারে ভাবে রূপকল্পনায় হিমালয়েরই উপযোগী। সীতার বিরূপ বর্ণন যে রসের আদি কবিতা—হিমাদ্রি সেই রসের কবিতা। হিমাদ্রি হইতে কয়েকটি চরণ উৎকলন করি। চিত্ত বিস্ফারক উদাত্ত ভাষায় এই অদ্ভুত রসের কবিতার সূত্রপাত।

প্রণমি সহস্রফণ অনন্তের রসময় শিলাস্তম্ভ রূপ,
পরিবৃত সংখ্যাহীন বর্ষ নাগে যোগাসীন জন বরূপ।
শশিসূর্য্যকরাঘাত ভালে তব হয়হাতে সংযত মুকুট,
তব পাদপীঠতলে কুবেরের ধনরাজি ঐশ্বর্য্য সম্পুট।
অভ্রময় তনুত্রাণ অঙ্গে হতে নবঘনে ধরার ধূলায়,
তব হেমজটা মেরি' ঝরা শিশু সম তারে গেলায় দুলায়।

কবিতার উপান্ত অংশে কবি বলিয়াছেন—

কি সংশয়ে উন্মেলিত শিশুর তরল চিত্ত কোন্ আবেগে,
সেই আদিকাল হতে কেবলি করিছে প্রশ্ন শুধু মেগে মেগে!
উত্তরে বলিয়া তুমি প্রেরিছ নবীন স্রোতে নতুনের মত
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় পদে ধীর আলোকের মত।
যুগ যুগ হতে চলে এই প্রশ্নোত্তরলীলা প্রশ্ন না ফুরায়।
সিন্ধুর মনের বিদ্যা ঘনের অশান্তি ক্ষুধা তবু না ঘুচায়।
কোন্ সেই মূল তথ্য যারে জেনে সব সত্য তুমি অধিগত,
ক্ষুদ্র সিন্ধু নাহি জেনে জাগে তায় ত্রাস্ত মনে প্রশ্নই কেবল। (আহরণ)

ভারতের চরম আধ্যাত্মিক বাণীতে কবিতাটি উপসংহৃত।

কবিশেখরের গঙ্গা সেই পৌরাণিক কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত ভারতীয় সংস্কৃতির তরঙ্গিত ধারারূপ। ভাবধারার চিত্রপরম্পরায় ভাষার ছন্দে গঙ্গা কবিতা এবেশের "অতীতের সহিত ভবিষ্যতের যোগবন্ধন ধারা"। কেবল তাহাই নয়, কবি বলিয়াছেন—

তুমি যোগধারা স্বর্গে মর্ত্যে, ইহ পরত্রে, দেবতা নরে,
মহাপারাবারে মহা মহীধরে, অমৃতে ও মৃতে আত্মা জুড়ে।

* * * *

আরতি তোমার মুক্ত জীবের চিতায় শিখায় রাত্রি দিবা
ভারতী নিত্য নূতন ছন্দে বন্দনা গায় নতগ্রীবা।

* * * *

ধূপগন্ধের ধূমে মিশিয়া চিতার ভস্ম তোমাতেধারা।
তর্পণবারি-কর্পূরে তব প্রেতলোক ছেয়ে বংশধারা।

* * * *

অস্তি ভারতে হেরি স্তূপাকারে আজনে তোমা আনিছে টানি,
হেরি তীরে তীরে সতীদেহ শিরে ফিরে সতীহারা পিনাকপাণি।

* * * *

জীবনের ধন তোমারে সঁপিলে অব্যয় ধ্রুব ধনের সাথে
মৃন্ময়ী সব সংসারে চাই যেলেনাটি সঁপি মাতৃহারা হাতে।

* * * *

অজানা তাহা বিদ্যা বোধন বিশ্বাস বল কোথায় পাবে?
যাদুকরে যায় ঘিরে অসুরী চিরতরে গেল কেবলি ভাবে। (আহরণ)

এই কবিতায় কবিশেখর নিজের জীবনের সহিত গঙ্গার এমনই গভীর আন্তরিক সংযোগ দেখাইয়াছেন যে ইহা উচ্চ শ্রেণীর লিরিকও হইয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮

'ঘাটীর আট চালাটিতে আড্ডা জমাইয়াছিল গ্রামের যুবক-বৃন্দ। রামপ্রসাদ, যোগেন, প্রিয়গোপাল তো ছিলই, তাহাড়া ছিল ওকালির তিন ছেলে শিউনাথ, দেওনাথ এবং ভিখন। আর ছিল স্বগার ধাড়ি হালুয়াই-এর দুই পুত্র বোটন ও লোটন। সকলেই মহামুদ্যমে গল্প শুনিতেছিল।

হরকাস জনাইয়া শিকারের গল্প শুরু করিয়াছিলেন।

"বাঘ শিকারের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে মাচায় বসে' শিকার করা। যে জঙ্গলে বাঘের খবর পাওয়া যায় সেই জঙ্গলে প্রথমে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় কোন দিকে বাঘটার থাকা সম্ভব, কোন রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কোথায় পুনোয়, কোথায় জল খায়। এসব জানবার পর তার যাতায়াতের রাস্তায় একটা মোষ বেঁধে রাখা হয়। মোষ-টাকে যদি বাঘে মারে তাহলে সেই মরা মোষটার কাছাকাছি একটা যায়গায় একটা উঁচু মাচা বেঁধে তার উপর বসে' থাকতে হয়। বাঘের স্বভাব হচ্ছে—গরু বা মোষ মেরে তখুনি তার সবটা সে খেয়ে ফেলে না, রক্তটা খেয়ে তারপর আধ-খাওয়া করে' সেটাকে ফেলে রেখে বাঘ চলে যায়। তারপর দিন এসে বাকিটা খায়। সেই সময়ই তাকে মারতে হয়। কিন্তু আমি যে গল্পটা বলছি তাতে মাচার ব্যাপার নেই। আমি একটা প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠে বসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল অ্যালফ্রেড। এ লোকটিকেও অ্যালফ্রেড দি গ্রেট বললে অন্যায় হয় না, যদিও সে সায়েব নয়। কুচকুচে কালো সাঁওতাল ক্রিশ্চান। আমার বেয়ারার পদে বাহাল ছিল সে, কিন্তু আসলে ছিল আমার শিকারের বন্ধু। বেচারাটা অনেকটা বাঁদরের মতো। বেঁটে, রোগা, তরতর করে গাছে উঠতে পারত, গাছের ডাল ধরে' ঝুলে সড়াক করে' অন্য গাছে চলে' যেতে পারত। হাসলে চোখ-মুখের চামড়া কুঁচকে যেত, বুজে যেত চোখ দুটো, বেরিয়ে পড়ত হলদে দাঁতের সারি! চোখের রং কটা ছিল। তাকে দেখে সাঁওতাল মনেই হত না। শুনেছিলাম তার বাপ না কি সায়েব ছিল। এই অ্যালফ্রেড ছিল জঙ্গলের একটি সেরা গোয়েন্দা। জঙ্গলে কোথায় কি হচ্ছে সব তার নখদর্পণে। কোথায় শম্বর আছে, কোন পাহাড় থেকে দুর্দ্ধর্ষ বুনো-গুয়োররা নাবে, কোথায় ভালুকের আস্তানা, মরালসাপ কবে কোথায় হরিণ ধরেছিল—সব খবর তার জানা। সেই আমাকে একদিন খবর দিলে যে বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যে নদীটা চ'লে গেছে তারই একটা বাঁকে একটা বাঘ প্রায় জল খেতে আসে সন্ধ্যা বেলা। বাঁকটার ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড একটা গাছও আছে, তাতে চড়ে যদি বসে থাকি, তাহলে বাঘটাকে অনায়াসে মারা যায়। অ্যালফ্রেড বললে, কাছাকাছি দ্বিতীয় আর একটা গাছও আছে সেটাতে সে থাকবে। লোভ হ'ল। একদিন গিয়ে দেখে এলাম জায়গাটা। আমার বাংলো থেকে বেশ দূরে। মোটরে করে' মাইল দশেক যেতে হবে, তারপর আর মোটর চলবে না। হাঁটতে হবে জঙ্গলের ভিতর। তা-ও প্রায় মাইল দুই। জঙ্গলের ভিতর হাঁটতে খুব ভালো লাগে। সরু সরু পথ আছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

কাটুরেরা রোজ যায় সেই পথ দিয়ে সকাল বেলা। সমস্ত দিন বনে কাঠ কাটে, সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসে আবার। চমৎকার লাগে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব, মাঝে মাঝে রোদের আভাস, কোথাও আলো-ছায়ার অদ্ভুত আলপনা, কাঠঠোকরার ডাক, বন-মুরগীর ডাক, তিতিরের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে, দু'পাশে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ, প্রত্যেক গাছে লতাও জড়িয়ে আছে। লতা বললেই সাধারণত আমাদের মনে যে রকম নরম-নরম রোগা-পাতলা মেয়েলি ধারণা হয় এসব সেরকম লতা নয়। বেশ বলিষ্ঠ লতা সব, কাছির মতো শক্ত—"

"হাতীও বান্‌হা যায়—?"

প্রিয়-গোপাল সরল লোক। সে বিস্ফারিত নেত্রে উৎকর্ণ হইয়া কৃষ্ণকান্তের অরণ্য বর্ণনা শুনিতেছিল। অনেক প্রশ্নই মনে জাগিতেছিল তাহার, কারণ শুধু সে সরল নয়, কৌতূহলীও। কিন্তু কাছির মতো লতার কথা শুনিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আধা-বাংলা আধা-হিন্দীতে উক্ত প্রশ্নটি করিয়া বসিল।

"হাতী বাঁধা যায় কি না পরীক্ষা করে' দেখি নি আমি। তবে খুব সম্ভবত যায়—"

রাম-প্রসাদ একটু ফক্কোড় প্রকৃতির। সে হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়-গোপালকে বলিল—"তাহলে তুই এক কাজ কর না। তোর তুসির ব্যবসা ছেড়ে এই লতার ব্যবসা আরম্ভ করে' দে। জামাইবাবুকে ধরলেই উনি ব্যবস্থা করে' দেবেন। অমন মজবুত লতা যখন, খুব বিক্রী হবে"

প্রিয়-গোপাল চটিয়া গেল। চটিয়া গেলে সে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে।

"দেখো রামপ্রসাদ, ফাজলামি করিও না"

তুলকায় গিটনাথ গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাধা পড়াতে সে বিরক্ত হইল।

"আরে ভাই কচ্‌-কচ্‌ নেহি করো। জামাইবাবু আপনি বলুন, তারপর কি হ'ল"

"তারপর একদিন গিয়ে সেই গাছে চড়লাম।"

"কখন গেলেন? রাত্রে?"

"না, সূর্য্যাস্তের প্রায় ঘণ্টা দুই আগে গিয়েছিলাম। তার আগের দিন ছোটখাটো একটা মাচাও বাঁধিয়ে রেখে-ছিলাম গাছের উপর"

"কি দিয়ে বানালেন?"—ঘোটন প্রশ্ন করিল।

ঘোটন হালুয়াই (খয়রা) এখন আর আত্ত-ব্যবসা করে না। সে এখন কণ্ট্রাক্টরি করিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সে কৌতূহলী।

"খড় বাঁশ আর গাছের ছোট ছোট ডাল দিয়ে। পাতা-সুদ্ধ ডাল কেটে আড়ালও তৈরি করতে হয়, যাতে বাঘ বুঝতে না পারে যে গাছের উপর কেউ বসে' আছে, বা গাছের উপর মাচা বাঁধা হয়েছে"

"ওতে কি মাচান বেশ মজবুত হয়—?"

ঘোটন পুনরায় প্রশ্ন করিয়া ভ্রাতা লোটনের দিকে চাহিল। সে যে বোকা নয়, বুদ্ধিমান—তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা লোটনের নিকট জাহির করিবার কোনও সুযোগ সে ত্যাগ করে না। লোটনের ধারণা ঘোটন জ্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু উলবুক। কনিষ্ঠের এ ধারণা অপনোদন করিবার জন্য সে সর্ব্বদা ব্যগ্র। দুই ভাই অনেকদিন পূর্ব্বেই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কণ্ট্রাকটারি করিতে গিয়া ঘোটন প্রায় সর্ব্বস্বান্ত, অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে লোটনের কাছে তাহাকে হাত পাতিতে হয়, লোটনও যতটা পারে জ্যেষ্ঠকে সাহায্যই করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের সম্বন্ধে তাহার ধারণা উচ্চ নহে।

কৃষ্ণকান্ত উত্তর দিলেন, "যতটুকু হয় কাজ চলে যায় তাতে। একজন বা বড় জোর দু'জন এক রাত্তির বা দু' রাত্তির কাটাতে পারলেই হল। চুপ করে' বসে' থাকা ছাড়া তো কাজ নেই। বেশী মজবুত করতে গিয়ে মহা ফাঁসাদে পড়েছিলাম একবার—"

"কি রকম—"

ঘোটনই প্রশ্ন করিল আবার।

রামপ্রসাদ অর্দ্ধ-স্বগতোক্তি করিল—'লোটন এবার আর টাকা দিচ্ছে না।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "একবার একটা গাছের উপর ছোট একটা চৌকি তুলিয়ে তার পায়াগুলো বেশ মজবুত করে' বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম গাছের ডাল-পালার সঙ্গে। খুব মজবুত হয়েছিল। অনেকগুলো 'বাগ' মেরেছিলাম। প্রায় শতখানেক হবে"

"বলেন কি!"

"হ্যাঁ হে, অসংখ্য ছারপোকা ছিল চৌকিটাতে—"

জিলন এবং দেওনাথ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা ইংরেজি পড়িতেছে, 'বাগ্' মানে যে ছারপোকা তাহা তাহারা জানে। যাহারা ইংরেজি জানে না তাহারা ব্যাপারটার রস ঠিক উপভোগ করিতে পারিল না। জিলন জিজ্ঞাসা করিল—"আসল বাঘ শিকারের কি হল?"

"হল না। বাঘ এল, সামনে দিয়ে হেলতে দুলতে চলে গেল। আমি রাইফেল তোলবার পর্যন্ত সময় পেলাম না। চৌকির বাগ সামলাতে আমি ব্যস্ত তখন। তারপর থেকে গাছের ডাল দিয়েই মাচা বানাই—"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

বলিল, "তারপর কি হল বলুন। বিকেলে গিয়ে সেই মাচানে চড়লেন?"

"আপনি গাছেও চড়তে পারেন বুঝি"

"পারি। কিন্তু ওটাতে চড়েছিলাম ঘই দিয়ে। অনেক উঁচুতে মাচা বাঁধতে হয় কিনা। মাটি থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট উঁচুতে—"

"অত উঁচুতে কেন"

"তা না হলে বাঘে ধরবার সম্ভাবনা থাকে। বাঘ উনিশ কুড়ি ফুট অনায়াসে উঠে পড়তে পারে—"

প্রিয়-গোপাল বিস্মিত হইল এ কথায়।

"গাছে চড়ে যায় বিল্লির মতো!"

"হ্যাঁ, বিল্লিরই জাত তো"

এইবার প্রিয়-গোপাল অদ্ভুত প্রশ্ন করিল একটা।

"আচ্ছা, বাঘ বিল্লির মতো মূসা ভি খায়?

মূসা মানে ইঁদুর।

"বাঘ না খায় এমন জিনিস নেই। গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হরিণ, শম্বর, নীলগাই, শেয়াল কুকুর এমন কি বাঘ পর্যন্ত। শুনেছি কাকের মাংস কাকে খায় না, কিন্তু বাঘের মাংস বাঘে খায়"

"তা হলে মূসা ভি খায় জরুর—"

"এক-একবারে হাজার খানেক মূসা না খেলে তো ওর পেটই ভরবে না। মেহনতে পোষাবে না—"

"পেলে খায় জরুর"

শিউনাথ ধমকাইয়া উঠিল।

"আরে ভাই বেকার কচকচ নেহি করো। বলুন আপনি গল্প বলুন—"

রামপ্রসাদ যোগেনের কানে কানে চুপি চুপি বলিল—"মুসাতে ওর বোরা বোরা ভুসি কেটে সাফ করে' দিচ্ছে। তাই বাচ্চুর মূসার উপর রাগ। তিনটে বিল্লি পুষেছে—"

উচ্চকণ্ঠে সে কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "জামাইবাবু আপনি এবার গিয়ে ওকে একটা বাঘের বাচ্চা পাঠিয়ে দিন। তা না হ'লে ওর ভুসির ব্যবস্থা তো গেল—"

"ফাজলামি করিও না রামপ্রসাদ বলে দিচ্ছি"

"তোমরা গল্প শুনবে, না, ঝগড়া করবে"—আবার ধমকাইয়া উঠিল শিউনাথ। কৃষ্ণকান্ত ইতিমধ্যে একটি দিয়াশলাই কাঠি কানে ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিয়া কান চুলকাইতে ছিলেন। সকলে থামিয়া গেলে আবার শুরু করিলেন।

"তিনটে নাগাদ মাচার উপর গিয়ে উঠে বসলাম। বনের ভিতর তিনটের সময়ই মনে হয় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অ্যালফ্রেড উঠল আর একটা গাছে, সেটার উপরও মাচা বানানো হয়েছিল। তার কাছেও একটা রাইফেল ছিল"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় কর্ণ-বিবরে কাঠি ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিলেন।

"তারপর?"

"তারপর চুপচাপ বসে রইলাম। বাঘ-শিকারে এই বসে' থাকাটাই সব চেয়ে কষ্টকর। শুধু বসে থাকা নয়, একেবারে স্থির হয়ে বসে' থাকা। অনড়, অচল হয়ে বসে' থাকতে হবে। সিগারেট খাওয়া চলবে না, নস্যি নেওয়া চলবে না—"

"কেন—"

শিউনাথ প্রশ্ন করিল এবার। সে একটি পাকা সিগারেট-খোর। তখনও তাহার হাতে অলক্ষ্যে সিগারেট ছিল একটি। সিগারেট-হীন হইয়া এক নিদ্রা দেওয়া ছাড়া যে আর কিছু করা সম্ভব তাহা তাহার চিন্তার অতীত।

"সিগারেটের গন্ধ পেলে বাঘ সরে' পড়ে। তার সন্দেহ হয়। যে কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ পেলেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে সে। বড় বড় শিকারীরা আতর এসেন্স মেখেও

শিকারে যেতে বারণ করেছেন। বাঘের ঘ্রাণশক্তি আর শ্রবণশক্তি দুই-ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চোখের দৃষ্টিও। তাই রংচঙে ডগমগে রঙের জামা-কাপড় পরেও শিকারে যাওয়া মানা। খাকি কিম্বা পাংশুটে রঙের পোষাক ছাড়া অন্য কিছু চলে না। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম মিশে যাওয়া চাই। ঢিলে-ঢালা কাপড় পাঞ্জাবিও চলবে না, হাফস্যান্ট হাফশার্ট পরতে হবে। বাঘ যদি গাছের দিকে তাকায় এবং শিকারীকে যদি দেখতেও পায়—তা হলেও সে যেন ভাবে ওটা গাছেরই একটা অংশ। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে' থাকতে হবে"

যোগেন এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, এইবার বলিল।

"এ তো তা হলে একটা তপস্যা বলুন"

"নিশ্চয়, তপস্যা বই কি। একটু শুধু শুকাত আছে, তপস্বী চায় ভগবান, শিকারী চায় বাঘ"

এ রসিকতায় অনেকেই হাসিয়া উঠিল, হাসিল না প্রিয়-গোপাল।

তাহার কেমন যেন খটকা লাগিল। কোনও যুক্তির বা উক্তির খুঁত থাকিলে তাহার মন খোঁচট খায়। সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "খালি বাঘ চায়? ভালুক, শূয়োর ইসব?"

"হ্যাঁ, ইসবও চায়। আমারই ভুল হয়েছে, বলা উচিত ছিল, শিকার চায়। তবে যে শিকারী বাঘের আশায় বসে আছে সে ভালুক বা শূয়োর দেখে ফায়ার করবে না। করলে বাঘ ভড়কে যাবে"

"তারপর কি হল বলুন—"

"গাছে মাচার উপর ঠায় বসে রইলুম ঘণ্টা দুই। তারপর হঠাৎ ময়ূরের ডাক শোনা গেল। বুঝলাম বাঘ বেরিয়েছে এবার—"

"বাঘ বেরুলে ময়ূর ডাকে নাকি"

"হ্যাঁ, আর ডাকে এক রকম হরিণ, ইংরেজিতে তার নাম 'বার্কিং ডিয়ার', ওদেশে বলে কোটরা হরিণ। এদের ডাক শুনলে শিকারীরা বুঝতে পারে বাঘ বেরিয়েছে। অনেক সময় শম্বরের ডাকও শোনা যায়—"

"শম্বর কি?"—প্রিয়-গোপাল জিজ্ঞাসা করিল।

"এক জাতের বড় হরিণ"

"শুঁইসের মতো? না, তার চেয়েও বড়ো—"

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিল শিউনাথ।

"কি পাগলের মতো যা তা জিগ্যেস করছ। আপনি গল্প বলুন জামাইবাবু। ওর কথায় কান দেবেন না।"

প্রিয়-গোপাল রুখিয়া উঠিল।

"আমার যা জানবার তা জেনে নিব না? তুমি আমাকে মানা করবার কে আছ। জামাইবাবুকে আর ক'দিন পাব। যা শিখবার শিখে নি—"

কলহের উপক্রম হইল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "শম্বর বেশ বড় হরিণ। একটা গরুর মতো প্রায়। খুব প্রকাণ্ড শিং থাকে ওদের মাথায়। ডাল-পালা-ওলা চমৎকার শিং—"

রামপ্রসাদ ফোড়ন দিল—"তুই শুঁইস্ বেচে দিয়ে একটা শম্বর কেন গোপলা। জামাইবাবু, শম্বর কিনতে পাওয়া যায় কি—"

প্রিয়-গোপাল রামপ্রসাদের দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

"বলুন, আপনি তারপর কি হ'ল। এদের কথার জবাব দিতে গেলে [illegible] বলা হবে না আপনার"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া পড়িয়াছিল।

"একটু পরেই বাঘটা দেখা গেল। অ্যাল্‌ফ্রেড্ ঠিক খবরই দিয়েছিল। নদীর বাঁকে এসে জল খাচ্ছে। করলাম ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল বাঘটা। গুলি লেগেছে কিনা বুঝতে পারলাম না, কারণ লাফিয়ে উঠেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি মারবার আর ফুরসৎ পাওয়া গেল না"

"গুলি নিশ্চয় লাগে নি, লাগলে পড়ে' যেত না কি"

"গুলি যদি মাথায় লেগে ব্রেনে ঢোকে, কিম্বা বুকে লেগে হার্টে ঢোকে—তাহলেই বাঘ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। অন্য জায়গায় লাগলে পড়ে না। তখন একটা গুলিকে ওরা গ্রাহ্যও করে না। পায়ে কিম্বা ঘাড়ে গুলি খেয়ে অনেক দূর চলে' যেতে পারে। আর সেই চোট্ খাওয়া বাঘ বড় সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে তখন—"

"কি করলেন আপনি—"

"দু'এক মিনিট চুপ করে' বসে' থেকে আর একটা ফায়ার করলাম যে বনে সে লাফিয়ে ঢুকেছিল সেই বনটাকে লক্ষ্য করে'। অ্যাল্‌ফ্রেডও তাই করলে"

"কেন—"

"হয়ি বাইসন্স লেগে যায় আরও বারো হবে, কিম্বা ভেড়ে-দুঁড়ে বেরিয়ে এসে চার্জ করবে, কিম্বা আরও দূরে যাবে—"

এইবার গল্পটা জমিয়াছিল।

উৎসুক শিউনাথ এমন মুখভাব করিয়া শুনিতেছিল যেন সে-ই এই দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।

"কি হ'ল দ্বিতীয়বার ফায়ারের পর"

"সরেই পড়ল। আর দেখতে পেলাম না। তখন একটা 'সিটি' মেরে অ্যালফ্রেডকে ডাকলাম। সে-ও সিটি মেরে সাড়া দিলে—"

"সিটি ?"

"হাঁ, মুখে আঙুল পুরে খুব জোরে সিটি দেওয়া যায়। বনে জঙ্গলে মনে হয় কোনও পাখা বুঝি ডেকে উঠল। শিকারীরা সিটি দিয়ে পরস্পরের খবর নেয়। সিটি শুনে অ্যালফ্রেড নেবে এল, আমিও নাবলুম"

"তারপর ?"

"তারপর বন্দুক রি-লোড করে' রওনা দিলুম বাড়ির দিকে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার। একটা বাঘের উপর গুলি চলে' গেছে কিন্তু সে মারা পড়েনি। এ অবস্থায় বনের ভিতর দিয়ে হাঁটা খুবই ঝুঁকিবহুল কাজ। কিন্তু প্রাণ হাতে করেও অনেক সময় এরকম ঝুঁকিবহুল কাজ করতে হয়। অনেকে এই করতে গিয়ে মারাও পড়ে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা সেবার বেঁচে গেলাম। বরং জঙ্গল থেকে বেরিয়েই চিতল পেয়ে গেলাম একটা—"

"চিতল মাছ ?"

"না, চিতল হরিণ। রাতে গিয়ে মাংসের কোল আর ভাত খাওয়া গেল"

"হরিণের নামও চিতল হয় না কি"

"হাঁ। গায়ে চিতা চিতা দাগ থাকে বলে ওদের নাম চিতল"

"বাঘটাকে ছেড়ে দিলেন ?"

"পাগল! ও বাঘকে কখনও ছেড়ে দেওয়া যায়। পরদিনই তার খোঁজ করবার জন্য লোক লাগালাম। বিকেলে অ্যালফ্রেডের এক অনুচর এসে খবর দিলে যে সে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে, শুধু দেখতে পায়নি, রক্তের দাগ ধরে' ধরে' সে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছে। তার ধারণা নদীর ওপারে যে দুটো পাহাড় পাশাপাশি আছে বাঘটা সেই পাহাড় দুটোর মাঝখানের সঙ্কীর্ণ গলির মতো জায়গায় ঢুকে বসে আছে। সে দুর্গম স্থান। দু' পাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখানের সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকু কাঁটার জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাছাড়া তার ভিতর দিয়ে একটা ঝরণার ধারাও বেরিয়ে আসছে। সেখানে ঢুকে বাঘ শিকার অসম্ভব"

"কি করলেন তাহলে—"

"অবস্থা অন্য রকম হ'লে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু সে বাঘ গুলি খেয়েছে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাকে মারতেই হবে এই হচ্ছে শিকার-শাস্ত্রের আইন। ছেড়ে দিলে ওই জখম বাঘরাই শেষে মানুষ-খেকো বাঘ হবে। সুতরাং সেইখানে লোক মোতায়েন করে' রাখা হ'ল বাঘটা বেরোয় কি না দেখবার জন্য। কাছাকাছি সুবিধে মতো জায়গা বেছে মাচাও বাঁধা হ'ল একটা, আর একটা ছাগল বেঁধে রাখা হ'ল সেই মাচার কাছাকাছি। আর দিনরাত সেখানে বসে' পাহারা দিতে লাগলাম আমরা। প্রথম দিন এল না, দ্বিতীয় দিনও এল না। তবু দোনো-দোনো করে' তৃতীয় দিনও বসলাম গিয়ে মাচায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও পাত্তা নেই। ছাগলটা সমানে ডেকে চলেছে। মশার কামড় অগ্রাহ্য করে' ঠায় বসে' আছি। পাশে অ্যালফ্রেড। হঠাৎ ছাগলের ডাকটা পট করে' থেমে গেল, বাঘের গোঙরানি আওয়াজও পেলাম। অ্যালফ্রেড সঙ্গে সঙ্গেই (spot light) ফেলতেই দেখতে পেলাম বাঘটা ছাগলটাকে ধরেছে। ছাগলটা ছটফট করছে আর বাঘটা সেইখানেই বসে' তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলাম। আবার লাফিয়ে উঠল ব্যাটা, এবার কিন্তু আর পালাতে পারল না, পড়ে গেল সেইখানেই। আর একটা ফায়ার করলাম। ব্যাঘ্র-লীলা শেষ হল তার—"

"প্রথম গুলিটা লাগেই নি ?"

"লেগেছিল, ভাল করে' লাগে নি। ঘাড়ে লেগেছিল, কিন্তু বেঁধে নি।"

"দ্বিতীয় গুলিটা মাথায় লেগেছিল, আর তৃতীয়টা পেটে"

বাঘের গল্প আরও কিছুদূর হয়তো চলিত, কিন্তু পোস্ট-মাস্টারবাবু আসিয়া একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, ডাকের চিঠি-পত্র তিনি নিজেই বহন করিয়া আনিয়াছেন। চিঠিগুলি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিয়া সহসা তিনি করজোড়ে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "জামাইবাবু, আমি গরীব। আমাকে রক্ষা করুন—"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন।

ক্রমশঃ

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

তৃতীয়ার এক ফালি চাঁদ ভেসে উঠেছে সমুদ্রের বুক থেকে মাটির দিকে। বাদুড়ের কবল থেকে বেচারাকে সমাধিস্থ করলো ওরা নিকটেই। একটা গেওগাছের ডালে বেঁধে রেখেছিল চাট্টি চাল, একখানা পুঁটি, একটা ছেঁড়া মাদুর।

অজানা—অচেনা—অকূল সমুদ্রের তীরে বনভূমিতে তোমাকে ফেলে গেলাম, বেইমানি করিনি, সঙ্গে দিয়ে গেলাম তোমার ক্ষুধার-অন্ন, পরণের বস্ত্র, একটুকু শেষশয্যা।

কেউ জানলো না, কোন গ্রামে তার বাড়ী, সেখানে অপেক্ষা করছে তার স্ত্রী, পুত্র আরও কতপ্রিয়জন। মানুষের মাঝে নরপুঙ্গবের মাটিতে শেষ আশ্রয় তার জুটলো না। বর্ষার জোয়ারে মাতাল সমুদ্র ঘুমুচ্ছে। ওর সেই অদ্বি ক'খানা তুলে বাদুড়ের পাখার ঝড় থেমে যাবে।

বাতাস ভরে উঠেছে সমুদ্রের গর্জনে,...কাফনের মত এক কালি চাঁদও মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে এলো আমরা ডিঙিতে উঠলাম। কারুর মুখে কথা নাই, মৃত্যুর প্রশান্তি স্তব্ধ করে দিয়েছে সবাইকে। জেগে আছে প্রকৃতি—ওই ক্ষুব্ধগর্জন সমুদ্র—আর বনজাউ গেওগাছের বুকে আছড়ে পড়া হিমেল বাতাস। কথা বলে শালি সাহেব।

এইতো যাওয়ালির জীবন। গাং ধারে ধারে এমনি কত অজানা কবর জমে উঠেছে। কত চোখের জলে লোনা হয়েছে গাংএর পানি কেউ তার হদিস রাখেনি।

বড়বা ফেরেননি তখনও। একাই বসে আছি নৌকায়, শরিফ চা এনে দেয়; চোখের সামনে ভেসে ওঠে লোকটার আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখ দুটো, রক্তাক্ত দেহাবশেষ। শিউরে উঠি।

'বাবু!' চেয়ে দেখি মরজান কাছে এসে বসেছে সেই বুড়ো সর্দার।

"পুলিনিা কোনদিকে বাবু, কেমন দেশ? পাহাড় মিঠে-জলের নদী, রাবান গাছপালা আছে সেখানে—বল?"

একটু আশ্চর্য্য হই—"কেন বলোতো?

—সেইখানে আমার দেশ ছিল বাবু, আমি তখন বিশ বছরের জোয়ান, মনে পড়ে মনের খেদে চলে এসেছিলাম এই বাদাবনে। লোকে বললে, ওখানে গেলে যতখুশি পাখি যতটা আমায় করতে পারবি ততটা। এলাম, কিন্তু কোথায় ধান জমি—আর কোথায় বা কি? যে বুনো সেই খুনোই রইলাম। দেশে গেলে বড় মন কেমন করে বাবু, এ মাটি মন টানে না।

চেয়ে থাকি বৃদ্ধের দিকে; ওর ঘোলাটে চোখে ফুটে উঠেছে শাল মহুয়ার ছায়াদেরা পাহাড় বনানী, নীচে দিয়ে ঝরে চলেছে কালো পাথরে পাথরে পা পেয়ে স্বচ্ছ জলধারা, আঁচলা ভরে পান করলে পরমায়ু বাড়ে। বাতাসে ভেসে আসে বহুরা ফুলের মাতাল-করা সুবাস। হরতো জোয়ান সর্দারের মনে আজও বেণু আপার বাঁশের বাঁশী, আর কোন বনসুন্দরীর মিষ্টি হাসি, বর্ষার সুরের মতই স্নিগ্ধ। পথ হারিয়ে নির্বাসনে রয়েছে মাটির সন্তান। হরিতকী গাছের নীচে নিকোন পরিষ্কার কোন সাঁওতালি বস্তী; পাহাড়ীয়া কাপড়-পরা কালো সিটোল-যৌবনা কেউ আজও বৃদ্ধ মনকে ডাক দেয় বিস্মৃতির অতল থেকে।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবু। চায়ে মন বিলাস।

ও নৌকা থেকে গান আসে—জলিল সুর করে টেনিয়েনে বেয়ো পড়ছে—

'আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার,
নবীর জোয়াতে হবে ভব নদী পার।'

জোকয়ার ধল চাপুরি নৌকার খোলে ছোট হাস বার করে টোয়েনটি-নাইন খেলছে। কে একজন বসেছে—সুর করে পড়ছে একটা কিতাব, কাঁইবিচেছ এলে কলকাতায় চাঁদা করে কেনা হয়েছে ওটা।

'হুরী বড় সোনাভান'।

সোনাভান বিবি কেমন করে যুদ্ধে তার স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করলো তারই কাহিনী। বিবির তরওয়াল হাতে যুদ্ধক্ষেত্রের ওলন্দাজ ও কাফের সেকেলে ব্লক ছাপা হয়েছে। একজন পড়ছে—ঘিরে বসেছে অনেকেই বিবির কিচ্ছা শুনতে। বড় নৌকাতে আদি সাহেব রংচটা সুটকেশের চাবি খুলে সন্তর্পণে বার করেছে 'বিষাদসিন্ধু'। বিছানা পেতে বসে চোখে চশমা এঁটে দিয়ে বেঁধে পড়ছে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেকাকে এমনি করেই। কোথাও বিপত মৃত্যুর ছোঁয়া নাই, মৃত্যুকে এরা সহজ-স্বাভাবিক বলে জেনে নিতে পেরেছে।

আমাদের নৌকায় ফিরে এলাম। শুব্ধ হয়ে বসে আছি। শরীফ বলে ওঠে—'বাবুকে বলে আমার ছুটি করিয়ে দিন না।'

—"কেনরে?"

কথা বলে না, লজ্জায় মুখ নামায় সে,—ধীরে ধীরে বলে,—'সাদির সব ঠিক হয়ে গেছে, টাকা কড়িও জোগাড় করেছি। দুমাসের ছুটি করিয়ে দিতে হবে।"

হেসে ফেলি—? আচ্ছা বলবো কাল বাবুকে। বিবি দেখতে কেমন রে?"

হাসে সে—'তা মন্দ নয়, তবে বয়স একটু কম, বারো বছর বয়স। বলবেন তো বাবুকে, তাহলে এই ফেলেই চলে যাবো। মা বড় তাড়া দিচ্ছে।

—"বেশ, বেশ, হবে তোর সাধী।"

—কি করতে যাইরে মেয়ে পরিষ, হঠাৎ নৌকার পাটাতনে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ কানে আসে। ছিঁটকে পড়লো কুড়ুল—কে যেন কণ্ঠ-রোধ করেছে যেন। উঠতে গিয়ে বার দুয়েই অবাক হয়ে যাই। সেই ছদ্মবেশ জলিল আর পরিষ মেয়ের গলা কম্পের মুণ্ড। পরিষকে চিৎকারে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসেছে জলিল, বিশাল দেহ, শক্ত হাতে দুটোটে ওর কণ্ঠনালীতে চাপ দিচ্ছে। টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারিনি, যে যার নৌকার ভিতর বসে রয়েছে—ওদের আসতেও সময় লাগবে। চিৎকার করে উঠি—

—ছেড়ে দে ওকে পরভান ; এখুনি শেষ করে দোব তোকে। হাতে একটা ছোঁড়া দা রেখে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল জলিল।

—আমি সাহেব—অন্যান্য সকলেই এসে হাজির হয়। পরিষ আমাকে কি বলছিল তাই জান করে শুনতে এসেছিল, না কি আমার উদ্দেশ্যে এসেছিল ওই কুড়ুল হাতে করে কে জানে। তবে দেখছি রাগটা ওর পরীক্ষের উপরই বেশী।

—কারণটা ওদের মুখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। বিশ্বাসই করতে মন চায় না। জলিল চৌধুরী দফা রিফ করতে সময় করেছে। মেয়ের বাপকে টাকাও দেবে অনেক। এদিকে সেই মেয়ের সঙ্গে পরিষেরও সম্বন্ধ রয়েছে। মেয়ে—মেয়ের মা'য়ের মত পরিষের সঙ্গেই সাধী হোক্—ও ছেলেমানুষওয়ালা আধবুড়োর হাতে মেয়ে দিতে নারাজ সকলেই। জলিলই তাহলে তাই পরিষকে তার পথ থেকে সরাতে চায় এমনি করে।

মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জলিল, ভুরুকুঁচ করে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে ;

—"ওকে বেঁধে রাখো আলিসাহেব, রাতের বেলায় কিছু করতে পারে। আর ওকে বলে দাও, যদি এই নৌকাতে উঠবার চেষ্টা ওরা করে, আমি গুলি করে গাং জলে ফেলে দোব। বিকে-করা মেয়ের রক্ত ঘুচে যাবে। তারপর আসুন বড়বাবু আমি দেখছি।"

পরিষ সে রাত্রে আবার নৌকাতেই রইল। ঘুম ওর আসছে না, বুড়ো বড় বেকায়দায় ফেলেছিল, একবার এর শোধ নিতে না পারলে ইজ্জত যেন তার থাকেনা, নোতুন বিবি শুনলে বলবে কি!

—"মেয়েটি কাকে বিয়ে করতে চায় রে?"

হু—বাবু মেয়েটার জন্য 'দিয়ানা' হরি খুঁজছিল। তার বাবাকে কত টাকা দিবার জন্য লাগসাগছি। মিছে লোভ মনে হয়।

—"তোর বাড়ীতে কে আছে?"

—"বুড়ী মা, তার জেনাজেদিতেই সাধী করুবো কইছি। বাইল বাজেলার যায় 'খুন ছিচামুক'। তবে মেয়েটা বড় 'সরমী' বাবু।"

—পরীফ বোধহয় খবর রেখে তার রিয়ার।

—"কাইলেন তো বাবুরে ছুটির জন্যে। সাধী করি খেতি পেরছি করুবো ভাবতিছি। শয়তানের পুরীতে আর আদবো না।"

ওর কথা শুনতে শুনতে কখন চোখ বুজে আসে। শোনা যায় মাঝে মাঝে নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুক কাঁপিয়ে কিসের শব্দ পরিষ। সেই ঘুম নয়নতারাই হবে বোধহয়। পরুলের ডাকের শব্দে ওর চাক ভিঙে একাকার হয়ে যেতে। আলোটা জলছে ছই এর খোলা দরজার সামনে ; ঘড়ঘড়া রাত।...কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

হঠাৎ পাটাতনে কিসের শব্দে ধড়মড় করে উঠলাম, পরীফ ঘুমোচ্ছি বোধহয় সে উঠে বসেছে। টর্চের আলোতে দেখি বড়দা ফিরেছেন।

—"এত দেরী হ'ল?"

—"সেকি এখানে? তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখনে।"

সারা রাত কেটেছে খোলা ডিঙিতে, কম্বলটা ভিজে চাপ্‌চেপে হয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় হিম হয়ে গেছে সব। চায়ের জল চাপালো হলো।

—"কাজ মিটলো ওখানে?"

—"হ্যাঁ, আমাকে দিয়েছিলেই এই ঘোড়দৌড় করালো দেখছি। ওই করতে পারতো দিয়ে। তা না করে খামোকাই জোগালে। পাসপোর্টের জন্য তো সাহস করে বলতে পারেনা, ঘোচড়দারে তাই আইনের প্যাঁচ দেখে।"

রাত্রি তিনটে বাজে। শুয়ে পড়া গেল। ঘুম দেখছি এখানে পৌঁছে বেশ গভীর হয়ে উঠেছে। অনুভব করছি নাসিকাগর্জনও হচ্ছে। আগে তো হতো না। বড়দা—শুধু বড়দা কেন, এখানে বাঙালিদেরও শুনেছি নাক ডাকে দুর্দম শব্দে।

মনের মধ্যে নাক ডাকাটা স্বাভাবিক, তাই দেখছি ও বাড়ি আমারও হয়ে গেছে।

সকালবেলায় চা পর্ব শেষ করেই খবরটা পাওয়া যায় ; জলিলকে পাওয়া যাচ্ছে না ; কোথায় গেল...ভাববার কথা। গহন-বন, অকূল গাং, কালই মানুষ মেরেছে বাঘে, সুতরাং এও একটা ভাববার কথা!—বনজঙ্গিসেও খবর গেল ; ইন্দুক কিনছে জেলেডিঙ্গি থেকে মাছ নিয়ে সেইই এসে খবরটা দেয়।

—জলিল একটা বোগাই নৌকা ভরে আজ সকালেই বড় গাং পাড়ি দিয়েছে। আমার সাথে দেখা, বলে গিল—কাজলে আর করবেনা, বাড়ী যাচ্ছে। বাকী মাইনে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জলিল চলে গেল।

জলিল আসে আগে ফিরে সাধীটা মেয়ে নিতে চায়। কালো মুখকো যোয়ান। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট বারোবছরের একটা মেয়ে আর ওই যমদূত!

খবরটা শুনেছে পরীফও, কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নৌকায়, ঝোয়ার হাত থেকে ফসকে গেল অমন বৌ। আবার কোথায় কবে মেয়ের সন্ধান পাবে—তবে সাধী হবে। ততদিন পড়ে থাকবে সে এই দুর্গম—দুস্তর জলে। একেই বলে নসিব।

মনে হয় ভালোই হয়েছে। ঘুটোয় একটা এখান থেকে না গেলে কোনদিন খুনখারাপী হয়ে যেতো। মুখে বলি—

—"ছাড়ে পরীফ, বিয়ের আবার ভাবনা! ওই বুড়ো যদি সাধী করতে তিনটে মেয়ে পায়, তুই যোয়ান ছোকরা, একটাও পাবিনা, এ কি কথা?"

বড়দা শুনে গম্ভীরভাবে বলেন—

—"সে মেয়ে ভাল হয়েছে। তুই খেতে চাস চলে যা। জোর করে কাউকে ধরে রাখতে চাইনা আমি।"

শরীফ ঘাড় নাড়ে—"নাঃ, আমি এইখানেই থাকবো। যাবো কি করতে?"

ডিঙ্গি নিয়ে বার হয়েছি সমুদ্রের বেলাভূমিতে। বিস্তৃত চরের বুকে ঝুরুরে বেড়ায় বড় বড় বাটাম, গ্রাইক কেমো পাখীর দল। দুটো ডিনটে মারতে পারলেই বেশ খানিকটা মাংস জুটে যায়।···ঘুরে বেড়াচ্ছি তারই সন্ধানে। হঠাৎ দেখি ইসুফ কি যেন দেখেছে। কালো একটা ছোটখাট গুবরের মত কি—নড়েচড়ে সমুদ্রের দিকে নামছে।

—"কি ওটা"

—"কাছিম"

"এগিয়ে গিয়ে চেয়ে থাকি। ডিঙ্গিখানার যা দেখেছি এ তার থেকেও অনেক বড়, লম্বিক পিঠে চেপে পড়লো, দেখি তাকে পিঠে নিয়েই চলেছে।···দু'তিনজন মিলেও তাকে চিৎ করা সেলনা, আপন খেয়ালে ফিরে নামলো জলে।

···বালিতে গায়ের দাগ ধরে ধরে একএগারশার এসে ফেরে গিয়ে খুঁড়তেই পাওয়া গেল গোল গোল পিংপং বলের মত ডিম, বেশ তুলতুলে টোল খেয়ে আছে। দু পাঁচটা নয়, প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি হবে।

"খাওয়া যায় ইসুফ?"

—হাঁ। ইসুফ বেশ খুশী হয়নি এতবড় আবিষ্কারে। বলে ওঠে "তুমি দিদ্দি ডিঙ্গিতে। ফিসুরা খায়, আমরা খাতি পারি না—ধর্মে বারে।"

ডিঙ্গি দুলছে ঢেউএর দোলায়, তীর ভূমিতে গিয়ে আছড়ে ফিরে আসছে জলরাশি। নীল কালিচালা জল মাঝেমাঝে ঝাঁঝির দোলানি দেখে ছোপছোপ দাগ তুলেছে। আমি শুদ্ধ হয়ে রৌদ্রস্নাত সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে আছি। অমনি চিন্তার স্রোত চলেছে মনে।

কোথায় কোন অজানা সমুদ্রের তীরে লোকালয় থেকে বহুদূরে বাসাবদলের মত এসেছিলাম। দেখেছি এদের জীবন যাত্রা, অকূল সমুদ্রের বুকে কি এক পরম নিশ্চিন্তে ঢেউএর দোলায় দুলেছি, ডানাঝেপে সি সোয়ালো পাখার ঝাঁক আমার ডিঙ্গির ধারে এসে ফিরে যাচ্ছে, কোন ভয় নাই ওদের বুকে। মানুষকে ঠিক চেনেনি, চিনলে এত কাছে ঘেঁসতো না।

ডিঙ্গির খোলে কুড়িয়েছি একগাদা রং বেরং এর ঝিনুক, সমুদ্রের অতল বুকের স্পর্শ পেয়েছিল একদিন। কি নিবিড় মেহমায় রং ওর বুকে সর্বাঙ্গে আঁকা হয়েছে। ভুলেগেছি সব—ক'দিন ধরে মনেও পড়েনি আমার ফেলে আসা জগতের কথা। সেখানে এমন কর্ম চাঞ্চল্য, মানুষের কলরব, কোলাহল। এখানে আমি একা, আকাশজোড়া নিঃসহতার মাঝে আমার কুড়িয়ে পাওয়া ঝিনুকগুলাকে স্মৃতির রংএ রাঙিয়ে নিয়েছিল। দেখেছি বাওয়ালির জীবন, মৃত্যুর সহজ স্বাভাবিকতা; মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনের মাঝে সুন্দরের আসন প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছি। বাওয়ালীরা পেয়েছে—কিন্তু কই আমিতো পারিনি।

ঘুরে ট্যাকের মাথায় লাল মত কি একটা বোঝের করা হয়েছে··· ইসুফ বলে ওঠে—

—"চলুন বাবু সকে, সারেঙ্গ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাই। যদি খাবার মাল কিছু মেলে।"

—"এখানে সক?"

ইলিশমারা করে নিয়ে যেতে আসে মাঝে মাঝে ওরা, জেলেদের কাছ থেকে মাল কিনে বরফ দিয়ে নিয়ে যায় ক্যানিং। সেখান থেকে ট্রেণে কলকাতা, তারপর শিয়ালদ, ফাসবাজার, ইত্যাদি বাজারে। একটু আশ্চর্য্য হয়ে যাই। মানুষ ব্যবসার কিকিরে কি না করছে। এই দুর্গম দুস্তর সমুদ্রপাড়ি জমিয়ে তুলেছিলাম আমি একাই এসেছি। কি সাবাদই না দিয়েছিলাম, এখন দেখছি পেটের দায়ে এখানেও অনেকেই আসছে। কলকাতার রান্নাঘরের খাল, তোল যোগাবার জন্য বাঘ-ডাকাত-মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে জেলের দল এসেছে, পিছু পিছু এসেছে ব্যবসাবাদার। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে,···

ডিঙ্গি ঢেউ ডিঙ্গিয়ে মোটার দোলায় মত ভাসতে ভাসতে গিয়ে লাগলো সকের গায়ে।

ডিঙ্গিতে একটু ভদ্রবেশধারী একজনকে এই জায়গায় দেখতে পাবে ভাবেনি সারেঙ্গ ড্রাইভার বা খালাসীর দল। তাই আমাকে দেখে এগিয়ে আসে কৌতূহল-ভরা দৃষ্টিতে। নমস্কার জানালো। প্রতি নমস্কার জানিয়ে উঠলাম সকে। ইসুফ মিঞার সেথি যেন খাতির জমে গেছে এদের সঙ্গে।

একটা জিনিষ প্রায়ই লক্ষ্য করেছি খেটিয় মুসলমানদের মধ্যে, সেটার প্রশংসা না করে পারিনা। ওদের মধ্যে যে যে-কোন পদেরই হোক, বয়সের সম্মান তারা দেয় এবং বেশ লজ্জভাবে নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করতে পারে পদমর্য্যাদা ভুলে গিয়েও। সারেঙ্গ আদর করে ইসুফকে পাশে বসালো নিজের।

—"বড় মিঞা, চাল ভাজা খাওয়া যাক এসো।'

সহজ ভাবেই এক পাত্র থেকে চাল ভাজা তুলে খেতে লাগলো।

—'চা খান একটু?"

এগিয়ে দিল চায়ের পাত্র।

পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমান এই সারেঙ্গ, লম্বা কাঁচা-পাকাদাড়ি, কথার মধ্যের একটা বিনয়ের সুর। দিকহীন সমুদ্র অকূল পাং, বুকানের মধ্যে জীবন কাটিয়ে একটি বিষাদ তার মনে বদ্ধমূল হয়েছে দেখলাম—সেটি হচ্ছে ঈশ্বরবিষাদ।

"মানুষের করবার কিছুই নাই বাবু, এই এতবড় পৃথিবী চেয়ে দেখুন—কোথাও এর সীমা নাই, এই তুফান, পদে পদে মৃত্যু। এখানে বেচে আছি যে কদিন তারই ইচ্ছায়। গ্রামা পথ থেকে একচুল সরলেই এখানে মৃত্যু।"

আশে পাশে কয়েকটা জেলেডিঙ্গি রয়েছে। নৌকাগুলোর গড়ন

অনুরূপের। দুপাশে ইলিশমারির মত লক হয়ে উঠে গেছে। এদিকে জল দুই, ওই কেটে ছেড়ে এরা পড়ি।

সবদিন মাছ হয় না, কোন কোনদিন ইলিশের ঝাঁক নজরে পড়ে, জেলিরা যদি ঠিকমত ধরে যায় এক কেপেই মাছ ওঠে তিন শঁচিশ তিরিশ মণ—এমনকি তার চেয়েও বেশী। আবার এমনও হয় যে মাছের অপেক্ষায় কেটে যায় দু'একদিন। তবুও ফেলেনা কিছু।

"ছেলেদের জীবন সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল হয়, অকূল গাংএ কেমন করে মাছ ধরে! তাদের সম্বন্ধেও একটু লেখা দরকার। এতদূর এসে সেইটাই বা ছেড়ে যাই কেন?

"আপনাদের সঙ্গে একবার ঘুরে আসবো ভাবছি।"

সাহেব সোৎসাহে বলে ওঠে—আপনি তো কলকাতায় ফিরবেন, তাহলে এক কাজ করুন, লঞ্চ যাবে ক্যানিংএ, সেই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, এদিকে বোরাও হবে, মাছ ধরাও দেখতে পাবেন।"

"কথাটা মন্দ নয়। অভিজ্ঞতার চক্রবৃদ্ধির মত ঝুলে পড়েছি এই ধরণ মনে, অকূল পাড়ি জমিয়ে, কোথায় কথা যেন মনে হয় নি। হঠাৎ সেই ঢিল পেয়ে বসে। বড় বড় গাং পাড়ি জমাতে হবে এবার ছোট টাপুরি নৌকাতে, যাকে এতদিন পঞ্চাশ সম্বরে বর্জন করে এসেছি।

বড়দার সেই আলাপ। কলকাতার লোক কিন্তু মনেপ্রাণে উনি এই সুন্দরবনের বাসিন্দা। ভেসাতেই পাড়ি জমাতে পারেন। বার কয়েকের Death once and এই রকম গাংএ পড়লে সাঁতরাবার বৃথা চেষ্টা না করাই ভালো, বুড়ো তাকে নিয়ে পরিহাস করে। বার সাঁতার না জানলেই নয়। পড়লো তো মরলো, ধড়ফড়াতে হবেনা বৃথা হাতপা ছুঁড়ে। সাঁতারই দেখেননি তাই। কিন্তু সহজ ভাবে বুকভরে শ্বাস গ্রহণ করতে এখনও শিখি নাই। পরক্ষণেই ভাবি বড়দা কি মনে করবেন! সাহেব সাহেব বলে চলেছেন আপনার সঙ্গে তো কারবার করেছি দেখতিছি, ভালোই হবে, অনেক ছবি তুলতে পারবেন। তবে অসুবিধে হবে হয়তো আপনার। আমরা জলের লোক, এখানে অসুবিধে কিছু হয় না আমাদের, কিন্তু আপনার—"

—না—না। পথে যার হয়েছি এক আধটু অসুবিধা সহ্য করে নিতে পারবো। আপনাদিকে কিন্তু—ধরুন তাড়া, খাওয়া-দাওয়া—

সাহেব সাহেব জিব কাটেন।

—না, না। আমাদের বান্দিকের ছেলেও কাল আসবেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোক 'আপনাদের বড়দাই। আপনি আমাদের সঙ্গে বেড়াবেন একটু এইতো! না হয় দুদিন 'বেহ্যেনই হবেন আমাদের। সেতো আমাদেরই ভাগ্য।

লঞ্চটা ঘুরছে ঢেউএর ঘোলায়। সকালের রোদ বিপন্নকারী সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মাথায় মাথায় হীরের ছাতি ঝড়িয়েছে। ঝোঁ মেরে যায় গাং চিলের ঝাঁক। ঘুরের চরগুলো সব ডুবে গেছে। ভরা জোয়ার এসেছে। জল ঠেকেছে গিয়ে জঙ্গলের বুকে। ভেসে উঠেছে সেবনীসুদ্ধ বোট ক'খানা। ওর বাসিন্দের সাহস অপরিসীম, কাজের সুবিধার জন্য নৌকা ওরা জোয়ারে তুলে নেয় কলের ভিতর, কাঠ বইবার কী কম হয়; ভাটার সময় ডাঙ্গাতেই পড়ে থাকে নৌকা, জল তখন নেমে গেছে। কি দিন-কি রাত্রি খাপসমেত মনে আমরাই পড়ে থাকে। ইদুক বলে 'ওরা ওস্ত গুনিন বাবু, বাঘের মুখ বাঁধি দিতি পারে।

হবেও বা।

পরশু সকাল বেলায় লঞ্চ ছাড়বে ওরা, তারমধ্যে বাঘ ধরে যাবে বোধ হয়, না হলেও ছেড়ে যাবে। আজ একখানা লঞ্চ এলেই। তাতেই আসবেন ওদের বান্দিকের ছেলে।

"শুনলাম সুন্দরবনে কয়েকজন মহাজন লঞ্চ নিয়ে বাঘের কাজ করেন, ক্যানিংএ বীরকান্ত জানা বলে এই লঞ্চগুলো। ওর ছেলে জীবনবাবুই দেখাশোনা করেন এই কারবার।...তা ছাড়া অন্যান্য অনেক ব্যবসাও আছে। তবে মনে হয় যারা সুন্দরবন অঞ্চলে যাতায়াত করেন তারা যে কেবল মাত্র পয়সার লোভেই যান সেখানে ব্যবসার খাতিরে—তাই নয়, বন এবং অকূল গাংএর মায়া, বিশাল প্রকৃতি নীরবে তাদের চিত্তবৃত্তির উপর একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই আনে! যা তাদিকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায় থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। অসামাজিক পরিবেশে বাস করেও তারা সামাজিক, সভ্য ভব্য এবং ভব্য হয়ে ওঠে। মাঝি, মাওলিয়া, জেলে, এখানের ব্যবসায়ীশ্রেণী সকলের মধ্যেই আমি এটা নিবিড় ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু প্রকৃতিদেবী একশ্রেণীর ক্ষেত্রে গোহারান হেরেছেন। তা এই বন বিভাগের কর্মচারীদের বেলায়। তারা একেবারে অন্য ধাতের মানুষ।

বেরেছেন চাকরী মশাই, বনবাসে পড়ে আছি বাড়ী ঘর ছেড়ে।

অথচ শুনতে পাই এই বনবাস থেকে চলে যাবার জন্য যদি বদলীর হুকুম আসে, অনেকেই কেঁদে ফেলেন।

যেখানে নৌকা বেঁধে কিরছি ঘাটের দিকে, এই সময় পথ অনেক সোজা হয়ে যায়, চরের বুকে খাড়া গরান গাছগুলোর বীচ দিয়ে চলেছে আমাদের ডিঙ্গি! সুন্দরবনের বসুর সময় আসছে। গরান আর কেওড়া গাছে ফুটেছে ফুল, তারপর ফুল ফুটবে সুন্দরী, গেঁও-গুণ্ডুল গাছে মৌচাক পড়ে ফুলবে মৌমাছির দল।...এই সময় আমদানী হয় মধুর নৌকা।

প্রাণ হাতে নিয়ে ছোট ছোট নৌকায় আসে এরা; মানুষের যাতায়াত নাই এমনি গভীর বনে দল বেঁধে আসে। এক হাতে কাঁচা সোনালি পাতার তৈরী মশাল, ধোঁয়া যায় হচ্ছে, চুচোখ তাদের নিবদ্ধ উর্দ্ধ আকাশে, উড়ন্ত মৌমাছির পিছন পিছন ছোটে চাকের সন্ধানে বাঘাবন তেন্ন করে। কোনদিকে দৃকপাত করে না, মধুর নেশায় তারাও মাতাল হয়ে ওঠে। এই সময়ই সুন্দরবনের বাঘেদের ছোটে রাজসিক আহার। রামপুরা ছেড়েই গত বৎসর এই মধু সংগ্রাহকদের প্রায় উনিশজনকে বাঘে ধরার খবর পৌঁচেছে, তাছাড়া আরও কত চোরা কারবারী পেয়ে বাঘের পেটে কে খবর রাখে।—'একমাণ-দুমাণ এমনি করে মনে মনে কাটিয়ে তারা তুলো রোজগার করে বাড়ী। মাত্র কিছু পঁচিশ টাকা এবং দু'মাসের গাওয়া; অর্থাৎ বাড়ীতে মনে অবসরের খাটলেও এর থেকে বেশী পেতো, কিন্তু তবুও তারা আসে; দু'একজন

এমনি মধুদেরীকে জিজ্ঞাসা করেছি—'এইতো তোমা পাস—তবে মিছে-মিছি পয়সাটা দিতে যাস কেন? তারা বলে—'নিজা আপনি খরচার পারবেন না বাবু, মধু; মধু পাতি যাই। তার খোরাক পাতি আপনিও দুইটা আসতি চাইবেন।'

মনে চলো মাইকেলের কটা লাইন—

একটা ফলের লোভে ছোবে রে অতল জলে
ধরনে ধীবর।
শত মুক্তাধিক আমু কালসিন্ধু গর্ভতলে
দেখিস পামর।

বলি—"সব মধু যদি খাতিই চলে গেল, থাকবে কি?"

—"সব কি আর খাতি পারি। তাছাড়া গাংএর খোলা পানি তো আছেই—দিবি মিশ খাইতে কি মধুর সাথি। কেউ ধরতি পারে না।"

একটু থেমে বলে—

—"করবেন বাবু মধুর ব্যবসা? বড্ড লাভের কারবার, আপনি শুধু নৌকাতি বসি থাকবেন—ব্যস।"

হাসি আসে ওর কথায়। ইস্কুল মিস্টার সঙ্গে পরিচয় করে আমাদের ডিঙ্গিতে উঠেছে, খালের মধ্যে একটা বোটে যাবে কি কাজে। লোকটা চেয়ে রয়েছে ফুলওয়া কেওড়া গাছগুলোর দিকে। নরুণ চিরোল পাতার বুকে বেতচন্দনের ছাপের মত এসেছে ফুলের রাশ। আকাশে বাতাসে একটা ঠাণ্ডাভাব, লোকটা চোখবুজে প্রাণপণে বুকটেনে নিশ্বাস নিচ্ছে।

—"শুঁকছেন বাবু, কি 'বাস' দেখুন। বাতাস সো সো হয়ে উঠেছে। হরিণ এই গন্ধে মেতে ওঠে বাবু, দেখবেন এখন ওরা ঘুরে বেড়ায় ঝোড়ে ঝোড়ে। এই তো বনে ঘোরবার সময়। দেখুন না সরাপের ফুল যেন চেয়ে রয়েছে। ওর মধ্যে মধুর ভাঁড় আছে বাবু—কাকের চোখির মত-কাঁচাপারা, পরমায়ু বাড়ে। বাতাস বাসে চুকলে 'জান' তর হরি ওঠে।

আমিও ভেবে রাখেছি। বাতাসে বাতাসে ফিসের কানাকানি। বসন্ত এসেছে সুন্দরবনে। এই মৃদু মিষ্টান্নিকাবহ বনেও আসে বসন্ত,··· আসে জীবনের ইঙ্গিত। এরা সেই খবর পেয়েছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে—মধুর নৌকায় বসে আছি। ঘর বেঁধেছি সেইখানেই। মনে মনে ফাগুনের সুরে আমিও সুর মিলিয়েছি। পাটাতন বোঝাই করেছি আধকাটা মৌচাকে,···মেটেতে নিংড়ে রাখছি মধু, সারাদিনমান ঘুমায়িত মধুর ভাণ্ডে ফিরেছি মনে মনে। আকাশ বাতাস মধুর সুবাসে মাতোয়ারা।

লোকটা কোথাও নামলো না, এসে হাজির হ'ল আমাদের সঙ্গে। ইস্কুল মিস্টারকে ইতিমধ্যেই ডাকতে সুরু করেছে 'বড় ভাই' বড় ভাই—

তাকে চাকরীর সন্ধান দিয়েছে। জলিল চলে গেছে—তার জায়গায় একজন যাওয়ালীর দরকার।

জলিলাদের কিন্তু লোকটাকে দেখে মনে ওঠে—কিরে মাঝিক, আবার এলেছিস?

মাঝিক সেলাম করে ঝাঁড়ালো বড়দাকে, বড়দা হাসে।

—তোকে কাজ দোব কি—তুই তো মধুর নৌকা বেদলেই ছুটে যাবি তাদের সঙ্গে। কাঠ কাটা আর মধু ভাঙ্গা এক কাজ নয়।' মাঝিক বেশ চাপে পড়েছে দেখলাম, বলে ওঠে—

—"দুদিন খাওয়া দোটেনি বাবু, বোউমাকির' একবেলা দিয়েলো; খাতি দেন কিছু। 'কসম খেয়ে বলছি আমি সাহেব এবার যদি মধুর বনে ভিড়ি, টুই টাইপা পেরির কামা যদি পুতি আমারে জীবনের শ্যাষ মধু খাওয়াই দিবা। খোদার কসম।

হাসেন বড়দা। আমারও মনে হয় ওকে কেউ ঘরে রাখতে পারবে না। মধুর আকর্ষণ ওকে যাতাল করে তুলেছে। সেই মৌমাছিও শ্রেণীর। মধু এবং মৌমাছির চাক ওর প্রকৃতিতে জড়িয়ে আছে; কতদূর মিশেছে ওর রক্তের সঙ্গে নিজেই তা জানে না। ভয় ধরে গেল মাঝিক।

ক্রমশঃ

মায়ের টান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

পাখীর ছানারা কিচির-মিচির করে;
আমি দেখেছি মা, গাছের পাতার ঘরে।
ওদের মা শুধু এ-বনে সে-বনে ঘুরে।
খাবার খুঁজিয়া আনে যে মুখেতে পুরে;—
ছোট ছোট ঠোঁটে ছানারা খুঁটিয়া খায়;—
তোর কথা মাগো, মনে যে পড়িয়া যায়।

আদর করিয়া পাখার মায়েরই মত
তুমি এনে দাও আমারে খাবার কত!
ডানায় যেমন মা-পাখী ছানারে ঢাকে,
তোমার খোকাও তোমার বুকেই থাকে।
সব খোকা চায় হাসি-মাখা মুখ মা'র;—
মাকে যদি পায় কিছুই চায় না আর।

দেখিয়া দেখিয়া খুসী যে হই মা, কত!—
সকল খোকার মাও যে মা, তোরই মত।

কথা-সঙ্গীত

তাল—দাদরা

কে আমারে ডাক্ দিল গো
ডাক্ দিল মোর প্রাণে।
সুরটী যে তার, উঠলো বেজে,
আমার গানে গানে॥
পশ্চিমের ওই আলো-ছায়ায়,
বেণু-বনের কাজল মায়ায়,
সেই সুরেরই কাঁপন শুনি,
শুনি নদীর তানে॥

আজকে আমি আপন হোতে,
যাই ভেসে সেই সুরের স্রোতে।
বাঁধন-হারা, শত-ধারা,
সুরের সাগর পানে॥
ফুরালো আজ সকল চাওয়া,
বিলিয়ে দিলাম সকল পাওয়া,
সব-হারানো মন্ত্র খানি—
বাজ্‌ছে আমার কানে॥

কথা ও সুর—মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

স্বর-লিপি—কল্যাণী দেবী

(১)

ধ (র্স র্স	নো ধ ধনো	প প ধ	প ম ম
কে • আ	মা রে •	ডা ক্ দি	ল গো •
স স র	গ ম প	গ ম -	
ডা ক্ দি	ল মো র	প্রা ণে •	
প প প	দা প ম	মপনো নো -	দা প প
সু র্ টী	যে তা র্	উ ঠ লা	বে জে •

স স র গ ম প গ ম - - - -
আ মা র্ গা নে ০ গা নে ০ ০ ০ ০

(২)

। ম ম প | ধ ন ন । র্সং র্সং র্সং | ন র্সং র্সং ।
প শ্ চি মে র্ ও ই আ লো ০ ছা য়া য়
ফু রা ০ লো আ র্ স ক ল চা ও য়া

প ধ ন র্সং র্রং র্রং ন র্রং র্সং নো ধ -
যে থা ০ ব নে র্ ফা জ ল মা য়া য়
বি লি মে ছি লা ম স ক ল পা ও য়া

ধ ধ র্জ্ঞ র্রং র্সং র্সং ন র্সং ন ধ প
সে ই সু রে রি ০ কা প ন ও নি
স ব হা রা নো ০ ম ন্ ত্র খা নি

। স স র | গ ম প । গ ম | - - - ।
ও নি ০ ন দী র তা নে ০ ০ ০
যা র্ ছে আ মা য় কা নে ০ ০ ০

(৩)

। স র স | ন্ স স । স রম ম | গ ম - ।
আ জ কে আ মি ০ আ প ন হো তে

র্ গ ম প ধ ধ প ধ নর্সং ন র্সং
মা ই তে সে সে ই সু রে র্ মো তে ০

ধ র্সং র্সং ন র্সং র্সং ধ র্সং নো ধ প -
বী ধ ন হা রা ০ শ ০ ত ধা রা ০

স স র গ ম প গ ম
সু রে র মা গ র পা নে

(৪)

(দ্বিতীয় সুরে গেয়)

উদারা স্ | মুদারা স | তারা - র্সং |
কোমল - গা = জ্ঞ | কোমল - ধা = দা কোমল — নি = নো |
মীর্ = ⌒

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরামপুর মিশনের ট্রাই বাইবেলের অনুবাদে বাংলা গদ্যের বিবর্তনে আগে ঐতিহাসিকতা প্রয়াস নয়। কারণ, একে তো এই অনুবাদের ভাষা পুথিবার ছিল না, তার উপর বাঙালি খ্রিস্টু লেখকসম্প্রদায় দুটীর ধর্মপুস্তকের ভাষা সম্বন্ধরে কোনদিনই বেশি উৎসাহ বোধ করেনি। "শ্রীরামপুরী বাংলা" নামে ই পুস্তকের সহজ কুখ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তীকালের বিভিন্ন সংস্করণগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বারবার সংশোধন ও পরিক্ষেপ সত্ত্বেও মূল বাইবেলের ভাষা কোনদিনই তেমন কুসংস্কার হয় নি। এই ব্যর্থতার কারণ নিশ্চই তখনকার পুস্তকের সাহসা, আর ফুটন ও আড়ষ্ট বাক্যগঠনের অনুবাদের ভাষাও গ্রাম্যকরণের ইংরেজিঘেঁষা। এসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মত এরকম :—

"কুইকের সোবাসুর হিব্রুভাষায় বলে :—ভাবুন, ঈশ্বর কখনকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন ; যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (যোহন ৩ : ১৬)"

সেকালের বড় সাহেব জনসাও এই মতের ছিল :—

"ইংরেজি বর্ণে পদের পরে ইহার সমাচার প্রকাশ হইল প্রায় সকল সংসারে। তাহার অনেক শিষ্যেরা তাহা প্রকাশনের কারণ বর পাইল। বিদেশসকল প্রাপ্ত হইল এবং বিদেশী বর্ণ ছড়িয়া গেল সর্ব পৃথিবীতে। যেমন পিতা করিয়াছিলেন। সকল সমাচার প্রকাশ হইলে পরম ঠাকুর ইস্কারাণী লোপ হইল, লোক ত্যাগ করিল তাহাদের দেবী ও আপনাদের চাহ ছিল তাহিরা ফেলিল পশ্চিমবিদের প্রতিমাকে (৮ ৮ ৩ এবং সে যেমনের ছিল ইটের লোকের পরিচ্ছদ ও চর্মের পটুকা জোহরে, তাহার রক্ষা ও পরপাল, ক্রিষ্ট ও বনবধু।"

বানান সূত্র, পদান্বয়ক্রম, অনন্বয়াকাঙ্ক্ষাবিভাস ছাড়াও রচনার শ্রেণ-চিহ্নের উপযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায় না যা বিস্ময়কর : বিদেশী পদ্ধের অনুকরণে ট্রি বাইবেলি ভাষা রচিত হলেও তার প্রষ্টারা নিজেদের মাতৃভাষার ব্যবহৃত শ্রেণচিহ্নগুলি বাংলা পদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন নি। বাইবেলের ভাষাপ্রয়োগে বিশেষ গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। যদি ধর্মপ্রচারের জন্যে ছাড়া বাংলা পদ্যভাষার ক্ষেত্রে অক্ষয় কেরি ও তাঁর পুত্র ফেলিক্স কেরি, জন ম্যাক, উইলিয়ম, পিয়ার্সন প্রভৃতির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ১৮১৪ সালের পরে প্রকাশিত তাঁদের রচনাবলী নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের তৈরি বাংলা গদ্যের এই দুর্বলতা যে প্রথম তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন নি, তা নয়। কিন্তু তাঁরা গদ্যের প্রতি গভীর মনোযোগ ও ধৈর্য নিয়ে কাজে লাগেন নি। তাঁরা ১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িকপত্রপ্রকাশ করে ব্যাপকভাবে মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। বাংলা পদ্যের যেই অক্ষয় অলঙ্কারগুলি মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে সকলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে, তাদের ব্যবহার করে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রচেষ্টা বিরুদ্ধে উদাসীন থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

চতুর্থ অধ্যায়

(১৮১৪-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)

আমাদের যুগবিভাগ অনুসারে বাংলা গদ্যের বিবর্তনের তৃতীয় যুগে যে বাংলা গদ্যের মূলধারা ফার্সি প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সংস্কৃত প্রভাবের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ১৮১৪—৫৮ সালের মধ্যে বাংলা গদ্যের তথাকথিত সাধুভাষার যাবতীয় বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিসাম্যের ও ব্যাকরণরীতির উপর নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলা গদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই যাঁদের লক্ষ্য ছিল, তাঁরা অচেতন মিশ্রিত মনে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলিও বাংলা গদ্যের ভাষায় মিশিয়ে দিতে লাগলেন। গদ্যের মূলধারা সংস্কৃত প্রভাবের দিকবাহে থেকে মেঝে-ঘাসা শব্দরাশিতে স্ফীতকায় হল, আর তার পরিণামে উদ্ভব-সহল ভাষার মধ্যে যে একটা লঘু চাপল্য ও স্বচ্ছ প্রাণাভার আভাস পাওয়া যায় সে-সব বোধ ক্রমশঃ দূর হল। সে-সময়ের বিশি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা ও তার গদ্য শব্দসম্পদ ও ধ্বনিসাম্যে বিভূষিত হয়ে এক অভিনব সমৃদ্ধি অর্জন করল। বাংলা গদ্যের গঠন হয়ে উঠল বেশ মজবুত। এখন পড়ার সময় ভাষার গাম্ভীর্যের উপর জোর দেওয়ার ফলে ঝোঁকের উপর খুব খারাপ হয়নি। কারণ, এতে ভাষার কাঠামোর দুর্বলতা একেবারে দূর হয়ে যায়।

এই চতুর্থ যুগে বাংলা গদ্য যে কোন গুরুতর বিষয় আলোচনার সম্পূর্ণ

উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। এটা হতে পারত কিনা সন্দেহ, যদি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গদ্যের সহজ ভঙ্গি প্রথাগতের পরিবর্তে সংস্কৃত গদ্য অনুসরণে ভারীর প্রবণতা ও ভারবহনসামর্থ্য অনুশীলন না করা হত। আজ একই কারণে যিনি গদ্যে তৎসম শব্দ বৃদ্ধির চেষ্টা দেখছে। কিন্তু এই যেকুপো বন্ধুর মধ্যে বাংলা গদ্য স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে অন্য ধরণের চাল চলন; তার উৎসে এখন অন্য হিসাবের জলসঞ্চালন সুরু হয়েছে। অন্য সব বলিষ্ঠাগত প্রভাবের মধ্যে সংস্কৃতের স্থান জোরার তা নির্দেশ করে, তাকে যথাস্থানে সীমাবদ্ধ করে, বাংলা গদ্যের মূলধারা এখন আত্মবিকাশের পথ আপন সাধনায় সুগম করে নিয়েছে।

সংস্কৃত ভাষার সাহচর্য ও প্রভাবের দ্বারা বাংলা গদ্যের গঠনকার্য যাঁরা পদ্ধতিবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এঁদের চারজনকেই "বাংলা গদ্যের জনক" বলা হয়েছে। চারজনের কৃতিত্ব সমান নয়। তবু দুই বললে চারজনেই ঐ আখ্যা লাভ করেছিলেন। আরো চারজনের নাম সাধুভাষার গদ্যের প্রথম সংগঠকরূপে করা যায়। এই চারজনই এই ভাষার গদ্যের মূখ্য পথিকৃৎ ছিলেন। এঁরা হলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। এঁদের মধ্যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যুগনায়ক স্থানীয়; মোটামুটিভাবে বললে বলা যায়, ১৮১৫ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত সময়টা রামমোহনের যুগ, আর ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের যুগ। সাধু গদ্য ভাষার কাঠামো এই চারজন চূড়ান্তভাবে গড়ে দিয়েছিলেন। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্যভাষায় লিখিত সাহিত্যে ঘুগান্তর এনেছেন এবং রচনাশৈলীগত পরিবর্তনও সাধন করেছেন। কিন্তু ভাষার গঠনভঙ্গি ও শব্দ উপাদানগত পরিবর্তন আর বিশেষ কিছু করার ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁদের বিশিষ্ট রীতির প্রয়োগে ভাষার যে রূপান্তরই সাধন করে থাকুন না কেন, তাঁদের সাধুভাষা বিদ্যাসাগরীয় সাধুভাষার জের টেনে চলেছে; মূলগত প্রভেদ যা কিছু তা রীতিতে অভিব্যক্ত, ভাষার মূল ভিত্তি তার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপ সমেত অটুট আছে, তৎসম শব্দ তথা সংস্কৃতের প্রভাবও অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র, সকলে একই সাধুভাষার লেখক, রচনাশৈলীতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকলেও। যে-ভাষা আজ সাধুভাষা নামে পরিচিত, তার চূড়ান্তব্যাকরণসম্মত রূপ বিদ্যাসাগর গড়ে তুলেন। ১৮৩৭ সাল থেকে বাংলা গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ সুরু হয় বলা যেতে পারে। কিন্তু ১৮৭৮ সাল থেকেই সাধুভাষার পাশাপাশি বাংলা গদ্যের নতুন ধারার জন্ম হওয়ায় ঐ সময় বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি নতুন যুগ আরম্ভ হল ধরা যায়।

ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানের দ্বারা বাংলা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে—ঐ পথিকৃৎ চারজন আসলে বাংলা গদ্যের মহাসমুদ্রে একটি বিশেষ শাখানদীর সংযোজক। এই যুগ সংস্কৃত ভাষার প্রভাবের যুগ; যুগ-প্রয়োজনে চারজনের রচনাতেই ঐ প্রভাব যথাসম্ভব। ১৮১৫-৭৮ সাল অবধি এই দীর্ঘ যুগের মধ্যে ১৮৫৩-৬২ সাল অবধি আট বছর সময় এমন এক বিশিষ্ট পর্ব—যখন বাংলা গদ্যভাষায় লঘু কথ্যভঙ্গি সঞ্চারিত করার চেষ্টা হয় এবং বাংলা নাটকের সংলাপের গদ্যে মুখ্য-কথ্যভাষা প্রবর্তিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৩) এবং সর্বোপরি কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) এই প্রয়াসগুলির পরিচালক। কিন্তু এঁদের মর্মবাণীই ছিল "সংস্কৃত, আরো সংস্কৃত, সর্বদা সংস্কৃত!" পরিশুদ্ধ সাধিত ভাষার প্রতি প্রবল আগ্রহবশত ১৮৭৮ সালের আগে সীতিগত-ভাবে সংস্কৃতের প্রাধান্য অস্বীকার করা হয়নি।

অনেকে রামমোহনকে "বাংলা গদ্যের জনক" মনে করেন। দেখা যাক, এই মত কতদূর যুক্তিসহ। আমরা দেখেছি যে, আগের যুগে শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তাঁর রচনার নিদর্শন আগে দেখা হয়েছে; এখন তাঁর রচনার ভাষার সঙ্গে রামমোহনের ভাষার তুলনা করা প্রয়োজন। ১৮১৫ সালে রামমোহনের প্রথম বই প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা প্রায় ৭০টি পুস্তকপুস্তিকা থেকে আমরা তাঁর গদ্যরচনার উৎকর্ষ পরিমাপ করতে পারি। দেখা যায়, তাঁর প্রথম রচনা ১৬ বছর বয়সের। কিন্তু ১৮১৫ সালে প্রকাশিত "বেদান্তসার" তাঁর লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এই পুস্তক ও পরবর্তী রচনাবলী থেকে আহৃত উদাহরণসমূহ পর্যালোচনা করা নিতান্ত দরকার উনিশ শতকের প্রথম পাদের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচয়িতা কে, তা নিরূপণ করার জন্যে। রাম-মোহনের লেখার উৎকর্ষ বিচারের আগে তাঁর রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক তাঁর তৈরি ভাষার স্বরূপ বোঝার আশায়।

প্রথম দৃষ্টান্ত ("বেদান্তসার" থেকে):—

"তাঁহাদিগের জিজ্ঞাস্য কর্তব্য যে, যখন তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, জৈমিনি সূত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ব্রাহ্মকে পাঠ করান, তখন তাহাতে তাহার বিষয়ক করিয়া থাকেন কিনা, আর ব্রাহ্মের সেই বিষয়কে শুনেন কিনা—আর মহাশয়েরা, যাহাকে পরম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায়, তাহার প্রোক্ষসকল সূত্রের নিকট পাঠ করেন কিনা এবং তাহার অর্থ সূত্রকে বুঝান কিনা, সূত্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কিনা—আর শ্রাদ্ধাদিতে সূত্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কিনা।"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ("প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ" থেকে):—

"এ অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু, আমারদিগের যে বক্তব্য, তাহারি অন্যথা লিখিয়াছেন, কারণ, সহমরণ, অনুসরণ সকাম স্থির হয়, আর কামা ক্রিয়াকে উপনিষৎ এবং গীতাদি শাস্ত্রে সর্বথা নিশ্চিতরূপে কহিয়া-ছেন, সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া সকাম সহমরণ হইতে বিধবাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আমরা করিয়া থাকি, যে তাহারা শরীরঘটিত নিশ্চিত সুখের প্রার্থনা করিয়া পরম পদ মোক্ষের সাধনে নিবৃত্ত না হয়, এবং বন্ধন পূর্বক যে ক্লেশ আপনারা করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিষেধ না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব, বিশেষরূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে উদ্যুক্ত হই।"

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ("চারি প্রশ্ন" থেকে):—

"যদি ইহাঁরা পণ্ডিতমহাশয়কে বলেন যে, মহাত্মাগণ যাহা লিখিয়া আসিতেছেন তাহার বাদ সমাচার ও সদ্ব্যবহার হয়, ইহাতে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য করি যে, মহাত্মা শব্দে তাঁহাকে স্থির করা যায়? যেহেতু দেখিতে পাই যে শৌরাণ্ড ও বিষ্ণুস্বামী এবং অদ্বিতীয় গোঁসাই ও রূপসনাতন, রামানন্দরায়, চৈতন্যদাস প্রভৃতিকে শৌরাণ্ডী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাত্মা করিয়া তাঁহাদিগের গ্রন্থানুসারে পরমার্থ আচার করিতে উদ্যুক্ত হয়েন এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের শৌনেরা বিরূপাক্ষ ও নির্ঘণ্টাচার্য এবং আনন্দগিরি প্রভৃতিকে মহাত্মা করিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানুসারে আচার করিতে প্রবৃত্ত আছেন, সেইরূপ রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও বেদান্তপ্রদীপকে মহাত্মা করিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও আচারকে সদাচার সদ্ব্যবহার করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এ পর্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে, নিত্যানিত্য বস্তুকে পাপ করিয়া বিবেচনে প্রবৃত্ত হয়েন না, এবং রামবল্লভী ও চাতুরদাসী প্রভৃতিরা পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে মহাত্মা জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রও অধিকারিবিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন। "অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যনেকধা"। কিন্তু এরূপ মহাত্মাত্বের অর্থে মহাত্মন কি অধিবেত্ত, যবন গ্রাহ্যও হয় না এবং ঐ সকল মহাত্মাদের অনুগামীরা পরস্পরকে বিদ্বিষ্ট ও অশুচি করিয়া থাকেন।"

১৮১৪, ১৮১৫ ও ১৮১৬ সালে রচিত এই তিনটি অংশের ভাষায় অমার্জিত কিছু পাই না যাতে বলা যায় যে, বাংলা গদ্যের ইনি আদর্শ তিনিই আবিষ্কার করেন। গতানুগতিকতার অভ্যস্ত সাধারণ লোকে রামমোহনকে "বাংলা গদ্যের জনক" আখ্যায় অভিহিত হতে শুনে শুনে এসে গেছে যে, তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের মিনিই একটা ছাঁচ তৈরি করে যেন। কিন্তু তাঁর গদ্যভাষার গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করতে বসলে আমরা দেখতে পাই, তাঁর রচিত বাক্যগুলি প্রায়ই সুবাবস্থাদোষে দোষী; পদের অন্বয়েও ত্রুটি আছে; পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভূত পরিমাণে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনায় ক্বেচিৎ উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর ভাষা খুব সরল বা সুবিন্যস্ত নয়। তাঁর গদ্যভাষা ঝরঝরে, মৃত্যুঞ্জয় বা হরপ্রসাদের চেয়ে বেশি অগ্রসর নয়। পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দ্বারা খানিকটা অনুপ্রাণিত হলেও আর কোন বড় গদ্যলেখক তাঁর প্রবর্তিত পন্থার অনুসরণ করেন নি। বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার সংস্কার করে যে গদ্য রচনা করেন, তাই পরবর্তীকালে সাধু গদ্যভাষার আদর্শরূপে স্বীকৃত হয়। সাধারণ বাঙালি বিশেষ গদ্যলেখক সাধু গদ্যভাষা ব্যবহারের সময় তাঁর রচিত ভাষাকেই আদর্শ বলে মেনে চলেছে। সুতরাং ভাষাগত উৎকর্ষের বিচারে আমরা বিদ্যাসাগরকে "বাংলা গদ্যের জনক" বলতে পারি, রামমোহনকে নয়। রচনীরীতি হিসাবে পূর্ববর্তী সব লেখকের চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরের হলেও তাঁদের তুলনায় রামমোহনের ভাষা তেমন ভালো ছিল না। তাঁর রচনার প্রথমে যে গুণ প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা এই যে তিনিই বাংলা গদ্যকে যুক্তিতর্ক স্থাপনের কাজে প্রথম দৃঢ় কাজে ব্যবহার করেন। তর্কবিতর্কের কাজে গদ্যভাষা এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে যুক্তির পর যুক্তি সুসঙ্গতভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে যাবের তীব্র দীপ্তিতে সুধালোকে পাঠিত তরবারির মতো ঝলসে ওঠে, আর পাঠকচিত্ত সহজেই প্রত্যেক যুক্তির মর্ম অনুধাবন করে বিরুদ্ধের চমৎকারিত্বে পুলকিত হয়, এই হচ্ছে "বাংলা সাহিত্যের প্রথম "Pamphleteer" রামমোহনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কৃতিত্ব।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াসে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সঙ্গে তাঁর গদ্যের যে তুলনা করেছেন তা সঙ্গত হয় নি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও ভাষানুমোদিতভাবে দেখিয়েছেন যে, বর্ণমালা প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের কাজে বাংলা অক্ষরের ব্যাপক ব্যবহারই রামমোহনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক কাজ। বর্ণসম্পর্কিত বাদবিসম্বাদের ক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক প্রয়োগের সময় রামমোহনকে যে চিন্তার শৃঙ্খলা ও ভাষার তার বিন্যাসচাতুর্য দেখিয়েছেন, তার জন্যে তাঁর বক্তব্য বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। আর সেই জন্যেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন, "যেওয়াজি জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, "নব্য বঙ্গের সৃষ্টিকর্তা রাজা রামমোহন রায়ই বাংলাদেশে গদ্য সাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়াছেন," সে-কথা আদৌ যুক্তিসহ নয়। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন সাহিত্যসৃষ্টিই করেন নি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষানুসারে তাঁর রচনাকে Pamphlet বা বিতর্কবিষয়ক বলাই ঠিক। ঐ ধরণের বর্ণপ্রধান বা তত্ত্বমিশ্রিত গদ্যরচনা বটে, কিন্তু ও সব জ্ঞানগর্ভ রচনার পর্যায়ভুক্ত, যদপ্রাণ সাহিত্যপদবাচ্য নয়। বৈষয়িক দু-একটি বাদপূর্ণ তীক্ষ্ণধার বাক্য রচনা ব্যতীত গ্রন্থ সমষ্টিতে সাহিত্যরস সঞ্চারের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। রামমোহনও সাহিত্য পাঠকের জন্য ঐ সব লেখা লেখেননি। যুক্তিপ্রাণ তথ্যনিষ্ঠ রচনায় মনীষীপ্রবর রামমোহনের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। ঐ সব রচনার সাহিত্যের লক্ষণ···বাংলা সাহিত্যের বা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে একজন অসাধারণ শক্তিধর মহাপুরুষরূপে বর্ণনা করতে হবে, এটা ঠিক নয়। রামমোহনের রচনাবলীই প্রমাণ করে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বইগুলির ভাষার তুলনায় তাঁর ভাষা মোটেই উন্নত নয়, অনেক ক্ষেত্রে অবনত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা রামমোহনের পূর্বে বাংলা গদ্যগ্রন্থ লেখেন এবং তাঁহাদের অনেকের রচনারীতিই রামমোহনের রচনারীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাঁর এই অভিমত বাংলা গদ্যের প্রকৃত পাঠক সত্য বলেই মনে করবেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় বাহির করা হয়েছে যে, "রামমোহন বাংলা সাহিত্যকে সহজ ও পরিমার্জিত করিয়া দিয়াছিলেন।" এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বাংলা সাহিত্য ও রামমোহন সম্বন্ধে পড়াশুনো করলে দেখা যায় যে, রামমোহনের রচনা নিছক গদ্য এবং একেবারে সাহিত্যরসবিবর্জিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও বীতায় করেছেন যে, তাঁর লেখায় "পদের মিলের পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"

কিন্তু রামমোহন যে অজ্ঞাতে বাংলা গদ্যে এক মহাযুগের সূত্রপাত করেছিলেন সেকথা মানতেই হবে। প্রথমতঃ, তিনি পাঠ্যপুস্তকের

বাইরে প্রথম ব্যাপকভাবে গদ্য রচনা করেন এবং অনুরূপ লেখার কাজে সেযুগের রচয়িতাদের উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি বাঙালিদের মধ্যে প্রথম একাধিক বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। বাংলা গদ্য রচনার প্রথম রীতির আভাসও তাঁর লেখায় দেখা গেছে। এমন যুক্তিপূর্ণ ভাষায় নিজের বক্তব্য সপ্রমাণ তাঁর আগে আর কেউ করতে পারেননি। তখন যেসব উদ্ভটগুলক বিদ্রূপাত্মক ধর্মালোচনার চলনবাজে লেখক সমাজে প্রচলিত ছিল, সেদেরও বদলে গদ্যে অচলন ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্য যুক্তিতে লেখার কৌশল তিনিই বাঙালি লেখকদের শিখা যেন। "বেদান্ত চন্দ্রিকা"-র ভাষা ও যুক্তির গমনত্ব ও বিন্যাসের সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধাবলীর তুলনায় বোঝা যায় যে, তাঁমসর্ত বিশ্লেষকরূপে তিনি লেখকের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু শক্তিসামর্থ্যের দিক থেকে তাঁর রচনা পূর্ববর্তী লেখকদের অতিক্রম করেনি, সেকথা জেনে নেওয়া দরকার।

বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। রামমোহনের কৃতিত্ব এই যে, তিনিই বাঙালিদের মধ্যে প্রথম একাধিক বাংলা ও অন্য ভাষায় সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে বিরে তিনি বাংলা গদ্যকে যুক্তিতর্ক প্রয়োগের শক্তিশালী ভাষারূপে গড়ে তোলেন। সাময়িক পত্রিকার বিতর্কের কাজে গদ্যের সার্থক ব্যবহার তিনিই প্রথম দেখালেন। বাংলা গদ্য এর ফলে সাংবাদিকতার উপযোগী হয়ে উঠল। শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকেরা যদি সংবাদপত্র প্রকাশের পর একতরফা নিজেদের কাজ করে যেতেন, তাহলে হয়ত তাঁরাও পোর্তুগীজ পাদ্রিদের মত ব্যর্থ হতেন। রামমোহন তাঁদের বিদ্রোহিতার দ্বারা সহযোগিতা করাতে যাজকদের প্রচেষ্টা স্থায়ী ও উল্লেখযোগ্য গৌরব অর্জন করে। ফলস্বরূপ গদ্যে অভিনবত্ব এবং নিত্য নূতনের সম্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে যা সাংবাদিক জগতের রচনার স্বধর্ম। জনসাধারণ পাঠশীল নতুন গদ্যের কায়দাকানুন সম্বন্ধে ক্রমশ অভিজ্ঞ হতে থাকে দুপক্ষের বাদ প্রতিবাদের ভাষা দেখে দেখে। এইভাবে বাঙালি জাতিকে সাংবাদিকতার অভ্যস্ত করে তুলে রামমোহন বাংলা গদ্যের গঠনে প্রভূত সাহায্য করেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর প্রয়াস মিলিত হয়ে সংস্কৃতের সূত্রপাত হল। পরবর্তী সময়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর অক্ষয় দত্তের প্রয়াসে তাঁর প্রবর্তিত নবমুখীন সাংবাদিকতার এই ধারাটির প্রাবল্য বৃদ্ধি পায় এবং জনচিত্তের উপর এর আধিপত্য অপ্রতিহত থাকে।

রামমোহন বাংলা গদ্যের যে রূপ রচনা করলেন তা সংস্কৃতভাষার একান্ত প্রভাবাধীন হলেও তাতে ইংরেজি ভাষারও প্রভাব দেখা যায়। মূল বাক্যনিরপেক্ষভাবে অন্য বাক্যাংশের সংযোজন বা Parenthesis, পদসমাবেশের কৌশল এবং দীর্ঘ বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য তাঁর গদ্যে ইংরেজি ভাষার সামান্য প্রভাব নির্দেশ করে। "কহা যায়", "প্রত্যবায় আছে" ধরণের প্রয়োগগুলি হিন্দি ভাষার প্রভাবজনিতও হতে পারে। মুহুরার-বাবুর মতে, "হয়" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সংস্কৃত "ভবতি" পদের অনুকরণে অর্থাৎ ভূ-ধাতুর প্রয়োগ হিসাবে করা হয়েছে। বাংলা ভাষার রীতি অনুসারে ঐ সব প্রয়োগকে দোষই বলতে হবে।

প্রথম বাঙালি সাময়িকপত্রপ্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা পত্রিকা "বাঙ্গাল গেজেটি" বা "Bengal Gazette" কলিকাতা থেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু এটি বিভাত্ত বন্ধ হওয়ার প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকেই বাংলাভাষার প্রথম সাময়িকপত্র বলে ধরা যায়। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর থেকে মাসিক পত্র হিসাবে "দিগ্‌দর্শন" প্রকাশিত হল মিশনারিদের উদ্যোগে। এর আকার ছোট হলেও এতে চিন্তাকর্ষক সাংবাদিকতার সব উপকরণই সাজানো ছিল। ধর্মযাজকেরা ১৮১৮ সালের মে মাসে "সমাচারদর্পণ" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশিত করেন। বিখ্যাত মার্শম্যান ঐ সাপ্তাহিকের নামত সম্পাদক ছিলেন। ভবানীগোপাল তর্কালংকার, যিনি মার্শম্যানের চেয়ে কম প্রসিদ্ধ নন, এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন তাঁর প্রথম সাময়িকপত্র "ব্রাহ্মণ সেবধি" বা Brahmunical Magazine বার করেন। এটি ছিল দ্বিভাষিক পত্রিকা; ইংরেজি ও বাংলা দু ভাষাতেই এর কাজ চলতো। ১৮২১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয় সাময়িকপত্র সাপ্তাহিক "সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশিত হয়। ১৮২২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ফার্সি ভাষায় লিখিত প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র তাঁর তৃতীয় সাময়িকপত্র "মিরাত্‌ উল্‌ আখ্‌বার" প্রকাশ করেন। সাত মাসের মধ্যে তিনটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে রামমোহন বাঙালিদের মধ্যে সাংবাদিকতার উৎসাহ এনে দিলেন। তাঁর সহযোগী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) "সমাচারচন্দ্রিকা" নামে আর একটি সাপ্তাহিক ১৮২২ সালের মার্চ মাসে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া রামমোহন "বঙ্গদূত" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকার্যে সাহায্য করেন। ১৮২৯ সালে সেটি প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর আগেই ১৮৩১ সালে বিখ্যাত "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে রামমোহন-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রের উপযোগী গদ্য রচনার কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এর পর অসংখ্য সাময়িকপত্র বাংলাদেশ ছেয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য নয়। কিন্তু সকলের মিলিত চেষ্টাতে গদ্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়।

সেই পরিবর্তনের জন্যে শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকেরা আর রামমোহন বাঙালির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার অধিকারী। ঐ পরিবর্তনের স্বরূপ হচ্ছে সাধারণ বাঙালির প্রতি দিনের লেখালেখির কাজে ব্যবহার্য গদ্যভাষার রূপ নির্ধারণ আর ঐ ভাষে আগে ব্যবহৃত গদ্যভাষার প্রকৃতির আমূল রূপান্তরসাধন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রয়াস সম্পর্কে উদাসীন জনসাধারণ আগে যে ভাসিবহুল গদ্যে চিঠিপত্র প্রভৃতি দৈনন্দিন লেখার কাজ চালাত, তা আমরা দেখেছি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বইগুলির তুলনায় বাংলা সাময়িকপত্র অনেক বেশি সুলভ হওয়ায় তার প্রচার হল অনেক বেশি ব্যাপক। ফলে, সাময়িক পত্রের

সমাজে প্রচলিত সাধারণ লোকের ব্যবহার্য গদ্যভাষার ছাঁচ পরিবর্তন হতে লাগল। সাধারণ-লিখিত সাধারণ আর্থিক অবস্থার পাঠক যখন দেখল, আধুনিক ইতি হচ্ছে সংস্কৃত ঢঙের ভাষা বাদ দিয়ে ও পরিত্যক্ত পদের ব্যবহার, তখন তার মতপ্রাণ সেই ধারা অনুসরণ করল। আধুনিকতায় উৎসাহী ইংরেজি শিক্ষার অনুরাগী প্রগতিশীল বাঙালি হিন্দু খুব তাড়াতাড়ি সংবাদপত্রে পরিবেষিত গদ্যভাষা আয়ত্ত করে ফেলল। এ দুই ধারাতে দুজনের অনেকটা প্রতিযোগিতা চলে পড়ায় ক্রমশিক্ষিত বাংলা গদ্য প্রধানত তার লেখনী আশ্রয় করে। এই ভাবে ১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশের ফলে গদ্যভাষার ইতিহাসে যুগান্তর সংঘটিত হল। এই যুগান্তর সাধনে রামমোহনের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। সেই জন্যে তাঁর গদ্য রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভাব-কাল ১৮১৫ সাল থেকে নতুন যুগের সূচনা ধরা যায়।

১৮১৮ সালে "কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি" নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ সালে সেখান থেকে প্রথম সুলভ মূল্যে বাংলা গদ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হল। তাতে করে নব যুগের পরিবর্তনপ্রবাহ আরো দ্রুতবেগ হল। ১৮১৮ সালে ঐ সংস্থা "নীতিকথা" নামে এক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করেন। তারপর ঐ প্রতিষ্ঠানের দপ্তর কেরি, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের উদ্যোগে নানা বিষয়ে অনেক পাঠ্য বই রচিত ও প্রকাশিত হয়। "নীতিকথা"র রচনাকারে তারিণীচরণ মিত্র পুরোপুরি ছাপাখানা কুরিয়েরের পরিচয় আরো বেশি করে দেবার সুযোগ পান। কিন্তু বইটি তাঁর একার লেখা নয়। সেই জন্যে "নীতিকথা"র তাঁর অংশ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সভ্য রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২১ সালে প্রকাশিত তাঁর এক পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকায় সর্ব প্রথম ঘোষণা করেন :—

"এই বঙ্গদেশের অধো স্থানে স্থানে ভাষার প্রভেদ ও প্রতিকটুতা আছে। কিন্তু গদ্যের উত্তরোত্তর লোকের বাক্য উত্তম ও সুব্রাব্য।"

আর সেজন্যেই যে ঐ বাক্যের দ্বারা পরিচিত ভাষাই একদিন দেশের শ্রেষ্ঠ ও সর্বজনস্বীকৃত লেখা ভাষার পরিণত হবে এবং বাংলা ভাষার আদর্শ কথাভাষারূপেও পরিগণিত হবে, সে কথা বলার সাহস তখনও কারো হয়নি বটে, কিন্তু বাংলা গদ্যের মূলধারা যে ঐ পথেই প্রবাহিত হয়ে একদিন আধুনিকালের শ্রেষ্ঠ পরিণতির সন্ধান পাবে, সে-তত্ত্ব অচিরে কয়েকজন অধিকতর মনীষীর জ্ঞানক্ষেত্রের সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়।

১৮১৮ সালেই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে স্কুলবুক সোসাইটিকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে দেখা যায়। ধর্মযাজকরাও কলেজের কাজে ইংরেজি পাঠ্য-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। সোসাইটির বই কলেজের কাজে এবং ধর্মযাজকদের বই সোসাইটির অধীন বিদ্যালয়সমূহের কাজে লাগতে থাকে। শ্রীরামপুর ও সোসাইটির এইরকম পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারাও ১৮১৮ সাল থেকে বাংলা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

শাশ্বত শ্মশান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

পিপাসা-পিচ্ছিল পথে ঘুরিতে ঘুরিতে,
সংসারের কালানলে পুড়িতে পুড়িতে,
অবশেষে একদিন অর্ধ-দগ্ধ প্রাণ
যেখানে আসিয়া থামে—সে-ই তো শ্মশান।

২

জ্বলিতেছে লোল-জিহ্ব চিতাগ্নি ভীষণ ;—
তা'রই মাঝে মহাকাল করি' পদ্মাসন
ধ্যান-নেত্রে যেন কোন্ ভাবেতে বিভোর ;—
শ্মশানেরও বহ্নি-তাপে কাটে না যে ঘোর।

৩

সে কি ভাবে ;—নিঙাড়িয়া জীবন-নির্যাস
সংসার নিয়েছে সবই ; মেদ-মজ্জা-মাঁস-
কঙ্কাল-কয়োটি-সব—আবর্জনা-ভার
এনেছে শ্মশান-বলি পাবও সংসার !

৪

সে কি ভাবে,—সংসারের দৃঢ়-মুষ্টি হ'তে
অব্যাহতি পেয়ে প্রাণ এল কোন মতে
টলিতে টলিতে এই জ্বলন্ত শ্মশানে
মহাশান্তি-পিপাসায় পিপাসার্ত প্রাণে !

৫

কাঁচা-মাংস নিঙাড়িয়া পারনিকো রস ;
প্রাণে প্রাণ ঘষিয়াও জাগেনি হরষ ;
অনির্বাণ পিপাসায় পোড় খেয়ে খেয়ে,
পতঙ্গ আসিল নাকি বহ্নি দেখে ধেয়ে ?

৬

সমাধিস্থ মহাকাল কি ভাবে—জানি না ;
জ্বলন্ত চুল্লিতে তারই হেরি রুদ্র-বীণা ;—
আচম্বিতে শুনি যেন বাজে বহ্নি-গান :
আমিই সূতিকা-গৃহ—আমিই শ্মশান।

৭

নিদারুণ তৃষ্ণা আমি—শান্তি-পারাবার ;
দেখে লও হর-গৌরী—শ্মশান সংসার।
মহাকাল করে যেথা সুধা-বিষ পান
ভীষণ সুন্দর সে যে বুঝিনু শ্মশান।

রিপোর্টারের ডায়েরী

চৈতন্য

—চার—

ছোটবেলায় মা'কে হারিয়েছি ; সেই সঙ্গে হারিয়েছি ঘরের আকর্ষণ। মরু প্রান্তরে তাঁবু ফেলে না বেড়ালেও, যাযাবর-বৃত্তি আমার মজ্জাগত। কাউকে বা হতাদরে বলতে শুনেছি, গোল্লায় গেছি ; কাউকে বা 'বাউণ্ডুলে' বলে তিরস্কার করতে শুনেছি। শরৎ চাটুয্যের কোন নায়িকা জীবনে এলে হয়ত দুটি হাত চেপে ধরে চোখের জলে যাযাবরবৃত্তির ধ্বনিকা পাত করিয়ে অন্নপূর্ণার মন্দির গড়ে তুলতেন, কিন্তু তাও হয়নি। তাই বিলের গরু বদরের শিরির মতন ঘুরে বেড়াই ঘর-ভর। কখনও ট্রাম-কণ্ডাক্টরদের আখড়ায় ঢোল বাজিয়ে গান শুনেছি, কখনও লালবাজারের চত্বরে বসে সমাজ জীবনের এক বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করেছি, কখনও বা সান্ধ্যকালীন মদ্যপানের আসরে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষসিংহদের বেলেল্লাপনা দেখেছি। কলকাতার রিপোর্টারদের কাছে রাইটার্স বিল্ডিং হচ্ছে যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী। রিপোর্টার হবার পর এই দুয়ছাড়া জীবনের এক বিশিষ্ট অংশ এখানে কাটিয়েছি কারণে-অকারণে। মন্ত্রীদের এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মজলিস করে যেমন মজা পেয়েছি, তেমনি আনন্দ পেয়েছি শঙ্কর গুপ্ত—অমর মুখার্জীদের লাফ-পার্লামেণ্টের সদস্য হয়ে। হেমদার বেয়ারা পঞ্চার পুত্রশোকের সংবাদ 'চুপ' খবরের মতন সাধারণ ভাবে রিপোর্টারদের আকর্ষণীয় না হলেও, প্রাণে যে নাড়া খেয়েছিলাম তা ভোলবার নয়।

নানা কারণে হেমদার ঘরের আকর্ষণ আছে। আলাপে ব্যবহারে তাঁর মতন ডেমোক্রাট মন্ত্রী আজ পর্য্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিং'এ আর কেউ আসেন নি। এর উপর রয়েছে কফি ও পান। হেমদার ঘরের কফি কফি-হাউসের কফিকেও হার মানায়। কফি ও পানের 'ব্লাঙ্ক চেক্' হেমদা পঞ্চাকে নির্ভয়ে দিয়ে রেখে যান আমার মতন ডজন ডজন নিত্যকার আগন্তুকদের জন্য। ঘরের দরজায় হাজির হতে না হতেই পঞ্চা সেলাম মেরে বলবে : তারপর দাদা, হাউ আর ইউ ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন করবে : চা না কফি ?

—কফি।

কফি সেবন করে হেমদা ও পঞ্চাকে ধন্য করতে না করতেই প্লেটে করে আসবে দুটি পান ও যেনারসী জর্দা-কিমাম-মিষ্টি সুপারীর তিনটি রৌপ্যাধার। তটচাজ ব্রাহ্মণ। দুইই সুট-টাই পরে ট্যাগ্ ডিনার বা বুফে-লাঞ্চ খাই না কেন, ককটেল পার্টিতে ঘুরি না কেন, ছাতনা-বাঁধা অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি না। দুটি পান মুখে পুরে আর দুটি হাতে করে বেরিয়ে আসি।

নিত্যকার মতন সেদিনও হেমদার ঘরের সামনে পঞ্চা বসেছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়াল। বেঁটে-খাটো ময়লা চেহারা হলেও, পঞ্চার মুখে হাসি লেগেই থাকে। সেদিন কেমন যেন ফ্যাকাশে ঠেকল।

জিজ্ঞাসা করলাম : কি হলো, পঞ্চাবাবু ? এমন মন-মরা কেন ?

—আর দাদা। মন আর ভাল হবে কেমন করে বলুন। মুখটা একটু নীচু করে ও আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, তা ছাড়া পরশু দিন ছোট্ট বাচ্চাটা মারা গেছে।

বুকের মধ্যে কেমন যেন হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। জানলাম, কিছুকাল ধরেই বাচ্চাটা ভুগছিল। টুকটাক চিকিৎসাও চলছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মায়ের কোল খালি করে সে চলে গেছে।

—আগের থেকে জানাওনি কেন ; একজন ভাল ডাক্তার দেখালেই ত সেরে যেতো।

—ভাল ডাক্তার দেখিয়ে আর কি হতো বলুন। যে যাবার, সে যাবেই।

সবই বুঝলাম। যে যাবার, সে যাবেই, যে থাকবার, সে থাকবেই। কিন্তু এমন দার্শনিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কতকাল দারিদ্র্যকে আমরা ঠেকে রাখব, তাই ভাবি।

পক্ষায় তাই দুঃখ থাকলেও, আক্ষেপ নেই। কারণ আক্ষেপ-বিহীন জীবন এদের কল্পনার বাইরে।

রাইটার্স বিল্ডিং যেতে হয় খবরের সন্ধানে। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে দাঁড়াবার লোভও আমার নিতান্ত কম নয়। তাই সম্ভব হলে খবর ফেলে মানুষের পিছনে ধাওয়া করি। হেমদার কাছে খবর পাওয়া যায় না, একথা সবাই জানেন। তবুও অনেকেই আসেন। আমিও আসি. শুধু আমিই তাঁর কাছে যাই না; তিনিও আমার কাছে আসেন। দুজনের সুখ-দুঃখের কথা হয়। অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তি হেমদার অদৃষ্টে জুটেছে। এসব পেয়েও তাঁর মন পূর্ণ হয় না। সন্তানের দ্বারা সংসার জীবনের যে পূর্ণতা আসে, তা হেমদার অদৃষ্টে জোটেনি। তাই অনেক জনের মধ্যেও তাঁর মুখে ঠিক হাসি ফুটে ওঠে না। আমাদের প্রতি কেমন যেন বাৎসল্যের প্রকাশ করেন যখন তখন। কিছুকাল প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত থেকে ভাল হয়েছি। ডাক্তারী নিষেধ অমান্য করে দিন-রাত্রি টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তার জন্য নিজের মনে কোন উদ্বেগ না থাকলেও, হেমদার অস্বস্তির অন্ত নেই।

আর্কেডিয়া গার্ডেনে একদিন সান্ধ্যকালীন পার্টিতে হেমদার সঙ্গে দেখা। গরম না পড়লেও শীত তখন বিদায় নিয়েছে। গায়ে গরম জামা ছিল না দেখে হেমদার কি রাগ। নিজের গাড়ী করে আমার বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বল্লেন: গরম জামা পরে অফিস যাও। ঠাণ্ডা লাগলে কি হবে সে খেয়াল ত বাবুর নেই।

কোন দিন আবার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বল্লেন: বাবুর কি খবর? আজকে খুব 'busy' নাকি?

—না, তেমন আর কি···

—তবে চৌরঙ্গী পাড়ায় ঘুরে না বেড়িয়ে চল শান্তিপুর ঘুরে আসি।

গেলাম শান্তিপুর। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রীর সঙ্গটি সাধনের জন্য বিরাট ভোজ সভা চলছে। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। খাবার টেবিলে হেমদা আবিষ্কার করলেন, আমি নেই। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমার কাছে এসে বল্লেন: আপনাকে H. M. ডাকছেন।

আমি কাছে গেলাম। আমাকে দেখিয়ে উপস্থিত অফিসারদের বল্লেন: আপনাদের যদি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও থাকে! আমি ওকে টেনে এনেছি কলকাতা থেকে, আর আপনারা ওকেই ডাকেন নি।

আট-দশজন অফিসার যুগপৎ আট-দশখানি খাবার ভর্তি প্লেট হাজির করলেন আমার সামনে। শান্তিপুরের কাঁচাগোল্লা নিয়ে শুরু হলো সাধাসাধি।

কয়েক ডিপার্টমেণ্টের ষ্টীমারে করে সুন্দরবনের নদী-নালা ঘুরে বেড়িয়েছি হেমদার সাথে বহুবার। বুড়ি ভর্তি খাবার নিয়েছেন হেমদা। চায়ের সরঞ্জাম, কফির ব্যবস্থা, পানের বাণ্ডিল, এ্যানোসিন্ ট্যাবলেট, ডেটলের শিশি, দাঁত খোঁচাবার কাঠিটি পর্য্যন্ত সাথে নিয়েছেন সঙ্গীদের জন্য। নিজে খেতে না পারলেও প্রতিটি সঙ্গীকে তুরি তোজে আপ্যায়িত করে হেমদার তৃপ্তি হয়।

সি-আর-দাশ ও জে-এম-সেনগুপ্তের আমল থেকে কংগ্রেস করলেও গান্ধী টুপি হেমদা ব্যবহার করেন না। ষ্টীমারের একজন সহযাত্রী কংগ্রেস-কর্মীর টুপিটা নিজের মাথায় চাপিয়ে লাঠি ঠুকে হেমদা বল্লেন: এ্যাটেনসন্ প্লিজ, হিয়ার ইজ ইওর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সবার চোখে তাক্ লেগে গেল। সত্যি টুপি চাপালে হেমদাকে আর চেনা যায় না—ষ্ট্রাইক লাইক ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ। সবাই একবার মনে মনে যাচাই করে দেখলেন হেমদার ডিটারেশনকে। মুখের আকৃতি ও রঙ দুজনেরই প্রায় একরকম। আর তা ছাড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ জোড়াই কিস্তিমাৎ করেছে।

একটু পোজ্ দিয়ে হাক দিলেন, রিপোর্টার, ওহে হোয়ার ইজ ইওর ফটোগ্রাফার।···

—ফটোগ্রাফার ত নেই দাদা।

—হোয়েস্। এই বলে মাথার টুপিটা খুলে ফেল্লেন।

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি।

রাইটার্স বিল্ডিংএ কত মন্ত্রীরই ত আগমন নির্গমন হয়। কিন্তু মনে রেখাপাত ত সবাই করতে পারেন না। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় ঐতিহাসিক 'রায়' দিয়ে লালালাল বসু সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন কিছুকাল। জীবন সায়াহ্নে শিক্ষামন্ত্রীর আসনে আসীন হয়েছিলেন ডাঃ রায়ের আগ্রহে। সাধারণ রাজনৈতিক মহলে

পান্নালালবাবু বিশেষভাবে উপেক্ষিত হতেন। রাজনৈতিক নোংরামিতে ইনি কৃতিত্বের অধিকারী হননি বলেই বোধ হয় এই উপেক্ষা তাঁর অদৃষ্টে জুটেছিল। অধিকাংশ রিপোর্টারই পান্নালালবাবুকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কি জানি কেন, তাঁর প্রতি আমার অসম্ভব দুর্বলতা ছিল।

নির্বিকারচিত্তে ফাইলে নোট দিচ্ছেন বা কোন চিঠির খসড়া করছেন, এমন সময় অর্ডালী বা বেয়ারাদের কেউ ঘরে ঢুকলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন পান্নালালবাবু। জিজ্ঞাসা করতেন: কিছু বলবেন?

মন্ত্রী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে 'আপনি' সম্বোধন করছেন দেখে বেয়ারারা লজ্জিত হয়ে উঠত। কিন্তু মন্ত্রী লজ্জিত হতেন না। মানুষকে তিনি মানুষই গণ্য করতেন। দশটা বাজতে না বাজতেই অফিস আসতেন। প্রত্যেক দিন ঘণ্টা দুই ধরে বিভিন্ন পত্রের উত্তর দিতেন। কোন নগণ্যতম প্রাথমিক শিক্ষক বা সহায়সম্বলহীন বিধবার পত্রের উত্তর দিতেও কাল বিলম্ব করতেন না। ফাইল পত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত না পড়েও নোট দিতেন না পান্নালালবাবু। অফিসারদের উপর অন্ধবিশ্বাসে কোন ফাইলে বা আদেশে দস্তখত দিতেন না ইনি।

তাছাড়া দরখাস্তে বা ফাইলে কোন ভুল নোট থাকলে ভীষণ রেগে যেতেন। একদিন ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলে উঠলেন: দেখুন তো মশাই, এটা কি ইংরেজি হয়েছে?

দেখি একজন ভুল ইংরেজি লিখেছেন একটা ফাইলে। আমি আর কি বলব! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছি।

—পয়সা-কড়ি দিয়ে এঁরা লেখাপড়া শিখেছেন কিনা সন্দেহ। ইংরেজি না জানেন বাংলায় ত লিখতে পারেন, তাতে ত কোন দোষ নেই। কিন্তু তাই বলে ভুল লিখবেন কেন?

ঘণ্টা বাজালেন, গদাধর এলো। ফাইল ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

শিক্ষা জগতে 'আহা মরি' কিছু করতে না পারলেও, ব্যক্তিগত ভাবে পান্নালালবাবু সব অন্যায় ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন। মন্ত্রী হবার পর একটা সরকারী মোটর তাঁর বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু কোন দিনের জন্যও তিনি সে মোটরগাড়ী নিজের স্ত্রী বা পুত্রদের ব্যবহার করতে দেননি। ডাঃ রায়ের দরবারে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম।' তাঁর কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু আর কোন মন্ত্রী নেই, যিনি হলপ করে বলতে পারেন, সরকারী মোটর গাড়ী তাঁদের পুত্র-কলত্র ছাড়াও ভাগনে বা জামাইরা ব্যবহার করেন না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পান্নালালবাবুর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। নিদেনপক্ষে হাজার খানেক রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান তাঁর মুখস্ত ছিল। রাইটার্স বিল্ডিংএ রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান জানা লোক দুর্লভ। এ কথা সবাই জানেন। তবুও সেখানে বসে দিনের পর দিন অফুরন্ত রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা শুনতে বেশ লাগতো।

হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে বলতেন: আজকাল আর ঠিক পড়াশুনা হচ্ছে না মশাই। রবিবাবুর কবিতাগুলোই আওড়াতে পারি না, কি অদৃষ্ট বলুন তো!

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকবার পরেই বলতেন:

...'সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে সুখানল।—যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।'...

কি লিখেছেন বলুন তো! আচ্ছা তার পরের লাইনটা কি যেন?

স্মৃতিশক্তি রোমন্থন করে অতি কষ্টে বলি—'সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর...

—না, না ভুল হলো। মনে পড়েছে:

'বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।'

তারপর আপনার ঐ 'সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর—'।

আবার বলতেন: অনেক কবির কবিতাই তো পড়লাম, কিন্তু কাউকে তো বলতে শুনিনি 'গ্রহণ করেছ যত খণী তত করেছ আমায়।' মশাই ঋষি না হলে এমন কথা কেউ লিখতে পারেন! তাছাড়া কোন কবিই বা এমন বলিষ্ঠ ভাবে বলতে পেরেছেন—

—'শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ও সুদ্রতারে দিয়া বলিদান
রচিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।'

আমি চুপচাপ বসেই থাকি। নিজের মনে নিজেই বলতে থাকেন, শিবাজী উৎসবের কবিতাটির সবটা আপনার মুখস্ত আছে?

—না, বোধহয় সবটা নেই।

—না কি মশাই, মুখস্ত করবেন। এমন কবিতা আর হয় না। ফাইলের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে বলেন—

...'মরে না, মরে না, কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল মনে কোন কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্মপরম্পরে,
এল সেই সত্য তব পুণ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে।
আজো তার সেই মন্ত্র,—সেই তার উদাত্ত নিশান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ,—
তব তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ আজ
সেই তব কাজ।
সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন,—
দরিদ্রের বল
"এক-ধর্মরাজ্য হবে এ ভারত"—এ মহাবচন
করিব সম্বল।'

রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে অসম্ভব ভালবাসতেন পান্নালালবাবু। দেশবী রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পী বিমলভূষণের বাড়ী যেতেন মাঝে মাঝেই সে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। কয়েকখানা গান শুনবার পর বলতেন, হ্যাঁ মশাই সেই গানটা করুন তো, যার একটা লাইন হচ্ছে, 'আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই ব'লেই কি রইবে থেমে,...আবার কখনো বলতেন, 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না, মা' গানটি করবেন মশাই। এমনি ভাবে অনেক অনেক গান শুনবার পর বলতেন, হ্যাঁ মশাই যদি কিছু মনে না করেন তো 'তাসের দেশে'র 'হরতন রইতন' শুনিয়ে দিন। বড় চমৎকার 'বিমলিক' গান।

অহেতুক কোন আত্ম-মর্যাদা-বোধ পান্নালালবাবুর চরিত্রে দেখতে পাইনি। আদর্শবান ও উচ্চ-শিক্ষিত এবং সর্বোপরি মার্জিতরুচি-সম্পন্ন যুবক শঙ্কর গুপ্ত ছিলেন পান্নালালবাবুর 'কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল এ্যাসিটেন্ট।' পান্না-লালবাবু জানতেন, শঙ্করবাবুর যথেষ্ট পড়াশুনা আছে। তাই কোন বিষয়ে একটু খটকা লাগলেই শঙ্করবাবুর সাহায্য তলব করতেন। নির্বিকারভাবে বলতেন: এটা কি হবে মশাই একটু বলে দিন তো। অথবা ওঁর বানানটা বোধ হয় ঠিক নেই। 'কারেক্ট' করে দিন তো। কোনদিন বা হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন, 'অমুক লেখকের কোন লেখাটা ভাল লাগে বা ঐ বইটাতে কি আছে যেন?

অমর মুখার্জীও পান্নালালবাবুর অন্যতম ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন কিছুকাল। অমরবাবুর স্ত্রীর একবার একটা অপারেশন হয়। উদ্বিগ্নচিত্তে পান্নালালবাবু হাস-পাতালের বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন অপারেশনের খবর নেবার জন্য।

এমন দিনও গেছে, যখন স্বেচ্ছায় ব্যাগ থেকে টাকা বের করে আমাকে দিয়েছেন সিনেমা বা থিয়েটার দেখবার জন্য।

—কাগজে দেখলাম, সেন্সিবিরন পার্টি এসেছে। আমার তো সময় নেই, আপনি দেখে এসে বলবেন কেমন হয়েছে। ভাল ভাবে খেয়াল করবেন, কোট সিনে শাইলক-ক্রটাসের কথাবার্তা।

প্রথম প্রথম সঙ্কোচে এইসব 'অফার' গ্রহণ করতে লজ্জিত হতাম। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে একদিন

বলেছিলেন, আপনি আমার টেনথ্ ছেলের সমবয়সী হবেন। সুতরাং আমার কাছে লজ্জা করবেন না।

তারপর থেকে আমিও লজ্জা পেতাম না। বন্ধুবান্ধব সিনেমা দেখাতে ধরেছে অথচ পকেট গড়ের মাঠ। এক দৌড়ে পান্নালালবাবুর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছি। সিনেমা দেখেছি। হঠাৎ কতদিন আমার বাড়ী গেছেন। অনেকদিন তালাবন্ধ দেখে ফেরৎ এসেছেন। পরদিন রাইটার্স বিল্ডিংএ এসে বলেছেন, কাল আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম। কেউ ছিলেন না।

তীব্রণ লজ্জিত বোধ করেছি।

—লজ্জার কি আছে মশাই। আমি তো আপনাকে খবর দিয়ে যাইনি, সুতরাং দোষ আমারই। হাতে সময় ছিল আর আপনার বাড়ীর পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।

কোন দিন আবার বলেছেন: বিয়ে করার আগে নিজে মেয়ে দেখবেন মশাই। কথাবার্তা বলতে বলতে গলা, চিবুক, হাত ও পায়ের গঠন লক্ষ্য করবেন। মেয়েদের গঠন দেখেই স্বভাব জানা যায়, সে কথা জানেন তো!

আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

—হাসির কি আছে মশাই! রাইট ইয়ংম্যান, সারা জীবন যার সঙ্গে সংসার করবেন, তাঁকে ভালভাবে দেখে নেবেন না!

এককথায় সব মিলিয়ে এমন পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষ আমার কেন বহুজনেরই জীবনে আসে না। তবুও এমন পূর্ণাঙ্গ মানুষটিকেও নিন্দাবাদ শুনতে হয়েছে এ্যাসেম্বলীতে। ডাঃ অতীন বসুর মতন একজন আদর্শব্রতী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এঁকে "ঠুঁটো জগন্নাথ" বলে তিরস্কৃত করেছিলেন এ্যাসেম্বলীতে। বিরোধী পক্ষের আসনে বসে অতীন-বাবুর মতন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গুণীব্যক্তিও মানুষ চিনতে চান না, এটাই দুঃখের বিষয়।

পান্নালালবাবু আজ মারা গেছেন। যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তি বারবনিতার দ্বারা কলঙ্কিত হচ্ছে, যে বাঙ্গালী শিবনাথ শাস্ত্রী—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির নাম ভুলতে বসেছে, যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কফি-হাউসের চত্বরকে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পলাশীর প্রান্তর করে তুলেছে, সে দেশ পান্নালালবাবুর মতন একজন শিক্ষামন্ত্রীকে ভুলে গেছে বা নিকট ভবিষ্যতে ভুলবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ফরাসী দেশের মহাদুর্দিনে রাজা একা-দোকা খেলেছিলেন, সৈন্যাধ্যক্ষ 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং পলাশীর আম্রকুঞ্জে পরাজয় বরণ করার পর পরাভূত সৈনিকদল যাত্রাগান শুনেছিলেন। কেন জানি না, আজকের বাংলাদেশ দেখে ইতিহাসের এইসব পুরানো ইতিবৃত্ত আবার মনে হচ্ছে। আমি নিরুপায়।

ভারতের প্রথম কার্টুনিষ্ট গগনেন্দ্রনাথ

চণ্ডী লাহিড়ী

বাঙ্গালা সাহিত্যে ও শিল্পক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ এখনও বহুল-আলোচিত প্রসঙ্গে পরিণত হননি। অথচ অনুজ অবনীন্দ্রনাথের কোন বৃহৎ সৃষ্টিই অগ্রজের উপরে নির্ভরশীল নয়। অবনীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা আজও জীবিত, তাঁরা আশা করি শ্রদ্ধার সঙ্গে একথা স্মরণ করতে পারবেন যে অবনীন্দ্র-নাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হলে সর্বাগ্রে খুশী করতে হত গগনেন্দ্রনাথকেই।

অবনীন্দ্রনাথের ন্যায় গগনেন্দ্রনাথও তুলি ও কলমচালনায় ছিলেন সব্যসাচী। অথচ অদ্যাবধি তাঁর প্রক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়নি।

গগনেন্দ্র ছিলেন ভারতের প্রথম কার্টুনিষ্ট। সমকালীন, সমাজ ও রাজনীতি দুই-ই ছিল তাঁর উপজীব্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তকে সমালোচকরা বলেছেন যুগসন্ধির কবি। শিল্পক্ষেত্রেও গগনেন্দ্রনাথকে বলা যেতে যুগসন্ধির-শিল্পী। সেকাল ছিল কোট-প্যাণ্টালুন-পরা পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ধুতি-চাদরশোভিত মধ্যযুগীয় সভ্যতার সংঘর্ষের কাল। আর এই সভ্যতার সঙ্কটই ধরা পড়েছে তাঁর চিত্রে। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ উভয়েরই জন্ম অসামঞ্জস্যের মধ্যে। ঈশ্বরচন্দ্র সেই অসামঞ্জস্য দেখে রঙ্গ-রচনা করেছিলেন এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে বাঙ্গালী জাতির বিশ্বাসের বিষ কেটে নিজে আত্মবিশ্বাস ফিরে

এনেছিল যদেশী আন্দোলনের পর থেকে। সাহিত্যক্ষেত্রে যাদের চাবুক হাতে নিয়ে দেখা দিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ।'

শিল্পক্ষেত্রে তুলিকে তলোয়াররূপে ব্যবহারও করলেন গগনেন্দ্রনাথ; শুধু তুলিই নয়, কালি-কলমের অস্ত্রও সন্ধানলেন ছিলেন তিনি নিজস্ব।

গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রাবলী তাঁর নিজের আমলেই পুস্তকাকারে প্রথিত হয়েছে, এবং আরও বহু চিত্র আছে যেগুলি প্রকিপ্ত অবস্থায় কারও ব্যক্তিগত এলবামের শোভাবর্ধন করছে। অথচ সমসাময়িককালের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশিষ্ট সামাজিকদের ওয়াকিফহাল জানতে হলে সেগুলি অপরিহার্য।

প্রথমেই বলেছি, গগনেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় কার্টুনিষ্ট। তিনি তাঁর 'নবহরোড়' গ্রন্থের শিরোনামায় ভারতচন্দ্রের "যেখিবারে যিত্র, তরিলাম চিত্র, এ বড় বিচিত্র হইল তায়"—উক্তিটি ব্যবহার করেছেন। পঙ্ক-সৃষ্টি না করে চিত্রসৃষ্টি করাই ছিল তাঁর কার্টুনের ধর্ম। তিনি মার্ক টোয়েনের একটি বিখ্যাত উক্তি নিম্নগ্রন্থে ব্যবহার করেছেন "Everything human is pathetic, the secret sources of humour is not joy but sorrow. There is no humour in heaven." সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি অঙ্কায় অসামঞ্জস্যের রূপ টিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করাই ছিল তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিম্নগ্রন্থে বলেছেন—"When deformities grow unchecked but are cherished by blind habit, it becomes the duty of an artist to show that they are ugly and vulger and therefore abnormal. This is the only excuse that can be offered to those to whom the following caricatures may succeed in giving offence"

গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রে মেরেছেন ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রকে। কেন্দ্রে যদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন কবি রাজনারায়ণ বসুর কাছে, হিন্দু মেলা, যদেশী মেলা, মোহন-মেলার যদেশীপানায় তাঁর মানসিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে।" একটা স্যাশনাল স্পিরিট কী করে তখন জেগেছিল জানিনে, কিন্তু চারদিকেই স্যাশনাল ভাবের ঢেউ উঠেছিল। এই যদেশীয়ানাই হল গগনেন্দ্র জীবনের যুগমন্ত্র।

ব্যঙ্গচিত্রে যার রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। একদিন পার্টি দিলেন তাঁর বাগান বাড়ীতে। গগনেন্দ্রনাথকেও আমন্ত্রণ করলেন। সেই ভোজসভার আমন্ত্রিতদের মধ্যে সবাই ঘুরোপীয়। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ পরদিনই ব্যঙ্গচিত্র আঁকলেন সেই ভোজসভার। ছবিটির নাম্বার ক্যাপসন লিখলেন find the Indian? ভিতরে সাহেবদের পরিচর্যারত যে বেয়ারাটি ছিল তার গায়ে লিখে রাখলেন Indian! যার রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন গুণগ্রাহী। পরদিনই তিনি গগনেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বন্ধুকে।

কংগ্রেসের প্রথম যুগকে ঠাট্টা করে বলা হল "ব্যারিষ্টোক্রেসী"। গগনেন্দ্রনাথ তৎকালীন একটি ব্যার-লাইব্রেরীর ছবি এঁকে ক্যাপসন দিলেন ব্যার লাইব্রেরী! ছবিতে দেখানো হয়েছে হাট-কোটপরা বেশী উকীলরা ভিতরে বসে আছেন। বাইরে নোটিশে লেখা Indian dress not allowed—Buy or borrow. এবং ভিতরে নোটিশ-বোর্ডে লেখা আছে Chingra, Kachowrees, Rasogollas, mock-swadeshi soup, Indian brief কিন্তু Sedition?" নেতার।

তৎকালীন বেশীর ভাগ মানুষদের মধ্যে যারা হাট-কোট পরে সাহেব সেজে অহরিকায় স্ফীত হয়েছিলেন তাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন Mocking bird club.

যদেশী আন্দোলনের সেই প্লাবনের দিনে কোনরকম সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে তিনি রাজী হননি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সর্বভারতীয় জাতীয়তার পরিবর্তে কেবল বাঙ্গালী জাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য তখন চেষ্টিত ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ আচার্য রায়ের ব্যঙ্গচিত্র আঁকলেন, ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক প্রস্তুতরত অবস্থায় এক ঋষি। মাথায় ক্যাপসন দিলেন—

"যি দিয়ে ভাজো নিমের পাতা
তবু না যায় তার আতের যা' তা।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠা করলেন স্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, ছাত্রদের আহ্বান করলেন পাঠ্যপুস্তকে আগুন লাগিয়ে আন্দোলনের আগুনে ঝাঁপ দিতে। সার আশুতোষ ছাত্রদের অধ্যয়ন-তপস্যা ভঙ্গ করায় পক্ষপাতী ছিলেন না। গগনেন্দ্রনাথ আঁকলেন দুই ছবি, একটিতে চিত্তরঞ্জন পুস্তকে অগ্নিসংযোগে প্ররোচিত করছেন ছাত্রদের, অন্যটিতে আশুতোষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ও হিমালয়ের আয় মেঘিয়ে চপল-গতি ছাত্রকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করছেন। দুই নাম "বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নি-যোগ" ও "বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ।" কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে কয়েকসহস্র মানুষের জীবনাহুতির পরেও মাতৃভূমি-প্রতিশ্রুত বিদ্যুৎ দিনে ভারতবাসী স্বাধীনতা পেল না।

গগনেন্দ্রনাথ ছবি আঁকলেন "প্রথম বাঙ্গালী পাশকর্তার উদয়; কোথায় তিনি?"

তলায় লিখলেন মার্ক টোয়েনের সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতি—Often a hen who had merely laid an egg, cackles as if she had laid an asteroid.

সাময়িক দুর্নীতির প্রতিও তিনি কশাঘাত কম করেন নি।

"প্রজাপতির নির্বন্ধ; চিত্রের ভিতরে লেখা আছে—" কণের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে। শিশু পাত্রীর ডান হাতে স্ফীতকায় টাকার থলি, বামহাতে 'দ্বিতীয়ভাগ।'

আর একটি ছবিতে কন্যাযাত্রপ্রস্থ পিতাকে উদ্ধারের জন্য কি ভাবে অভিমানী কন্যা Mr. Koroseno এর হাতে আত্মীয়স্বজনের সেই মূল্য বেশ্যানো হয়েছে কণক-মণীন রেশমে। আত্মাভিমানী স্বামী প্রবল বৃষ্টির দিনে নিজের মাথার ছাতা চাপিয়ে সিগ্রেট টানছেন, পশ্চাতে সন্তানক্রোড়ে তাঁর স্ত্রী ভিজে চুপ্‌সে গেছেন। আবার কোন ছবিতে আধুনিক স্বামী তাঁর সনাতনপন্থী স্ত্রীকে সোসাইটিতে চালু করার জন্য হাইহিল পরাবার ব্যর্থ চেষ্টায় রত।

লাটসাহেব কারমাইকেল ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। পাঁচ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ীতে তিনি বহুবার এসেছেন এবং চিত্র-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে দুইবন্ধুতে তামাক খেয়েছেন। এই লাটসাহেব পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথের তুলির হাত থেকে রেহাই পাননি। লর্ড ও লেডি কারমাইকেল দুজনেই ছিলেন শিল্পরসিক। গগনেন্দ্রনাথ তাঁদের নিয়ে যে ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছিলেন, তখনকার লাটভবনে সেগুলি উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে শোভা পেত।

গগনেন্দ্রনাথের বিদ্যাসুন্দরীয় বসুমুখা প্রতিভার একটি মাত্র দিক্ ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বর্তমান আলোচনা ও তথৈব নয়। তবে নিছক রেখাচিত্র হিসাবে একে গ্রহণ করে অবিলম্বে বিস্তৃতভাবে এর উপর গবেষণা করা চলতে পারে।

বাদামতলার আদিকথার পর বাদামতলার গল্প।

বাদামতলার চেহারা যারা আগে দেখেছে তারা জানে এখনকার বাদামতলার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ভোলাদের টিনের বাড়িটা ভেঙে মাটালিদের একটা তেতলা বাড়ি উঠেছে। তুষপুকুরের ওপরও বাড়ি উঠেছে দোতলা। আমাদের বাড়ির ছাদে উঠলে এখন আর পেল্লাদ চৌধুরীদের বাড়িটা দেখা যায় না। পেতলাতলার দু'টো পুকুর মাটি-ভরাট করে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনেক দিন পরে একদিন ডেকে পাঠালো বিপিনদা।

নতুন করে যেন বিপিনদা'কে দেখলাম। তখনও বিপিনদা স্থূলে যেতেন। প্রথম পক্ষের বিয়েতে একটাও ছেলেপুলে হয়নি। সুরেশ্বরীদিদি ছিল নিঃসন্তান। কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষের অনেকগুলো ছেলে মেয়ে।

বললেন—তোমরা যদি কয়েকজন আমার একটু উপকার করো তো ভালো হয়, আমার ছোট মেয়ের টাইফয়েড—

টাইফয়েড রোগের ওষুধ তখন এমন বেরোয়নি। শুধু সেবা-শুশ্রূষা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আইসব্যাগ মাথায় দেওয়া, জ্বর দেখা, খাওয়ানো—এই সব।

অনেকদিন পরে আবার বিপিনদার বাড়ির ভেতরে গিয়ে যেন চিনতে পারলাম না। সেই আমড়া গাছের দিকটাতে পাঁচিল দেওয়া হয়েছে। উঠোনটায় আরো গোটা কতক ঘর উঠেছে। বিপিনদার গোটাকয়েক ছেলে-মেয়েতেই বাড়ি ভর্ত্তি। তারপর আধখানা ভাড়া দেওয়া হয়েছে—

বললাম—ওদিকটায় কারা থাকে বৌদি?

এ-পক্ষের বউ একটু লাজুক। বললেন—ওদিকে ভাড়াটেরা থাকে আমাদের—

অমনি ভাড়াটে !

—খোকা শোন এদিকে !

দেখি বেশ নতুন ধরণের চেহারা। হাঁ করে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

বললে—হাঁ করে দেখছো কী খোকা ?

বলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

আমি একটু লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম। কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

—একপো ছোলা কিনে নিয়ে আসতে পারো খোকা, বড় বড় দানা, এই নাও পয়সা নাও, দেখি কী রকম কাজের ছেলে তুমি—

বলে বৌদির দিকে চেয়ে বললে—বেশ লক্ষ্মী ছেলেটি তো ? কাদের বাড়ির ছেলে দিদি ?

বৌদি বললে—এই পাড়ারই, এ-পাড়ার বটুক মিত্তিরের নাতি—

বিপিনদা বাড়িটাকে দু'ভাগ করে ভাড়া দিয়েছিল। বেশ বন্দোবস্ত ! এ-পাশের সঙ্গে ও-পাশের কোনও সম্পর্ক নেই। মাঝখানে শুধু একটা দরজা আছে উঠোনের মধ্যে। সেই দরজা খুললে উঠোনের কলে জল নেওয়া যায়।

বাদামতলার গল্প আজে বলা যায় না। বাদামতলা ছোট জায়গাও নয়। সোজা কালীঘাটের পুল পেরিয়ে লম্বা বালামতলার হাট পেরিয়ে এসেই পড়বে এই গলিটা। গলিটায় ঢুকেই পেয়ারা চৌধুরীদের বিরাট বাড়ি। রাস্তার এ-পাশে বাড়িটা, আর ও-পাশে বিরাট একটা পুকুর। সেই পুকুরে পেয়ারা চৌধুরীদের মাছের কারবার চলতো। আমি, ভোলা, সুজিত, কার্ত্তিক সবাই ওই পুকুরের পাড় দিয়ে একেবারে শেতলাতলার দিকে চলে যেতাম। তার ওপাশে অনেক দূর গেলে কালীঘাট ইস্টিশান।

তখনও জানিনা যে বিপিনদা বাড়ির আধখানা ভাড়া দিয়েছে।

একদিন আসছি ওই পথ দিয়ে চারজনে।

হঠাৎ দেখি বাদামতলার গলি দিয়ে একটা লোক মদ খেয়ে টলতে টলতে আসছে। হাতে মস্ত একটা খাবারের ঠোঙা। একবার রাস্তার এপাশে আসছে, একবার ওপাশে। সোজা স্থির হয়ে চলতে পারছে না।

ভোলা বললে—ওই দেখ লোকটা মদ খেয়েছে রে—

খুব হাসি পেতে লাগলো। পেয়ারা চৌধুরীও মদ খেত শুনেছি। তবে ঘোড়ার গাড়ির ভেতরে তার মাতলামি বাইরের লোক দেখতে পেত না। মাঝে মাঝে দোতলা থেকে রাত্তির বেলা পেয়ারা চৌধুরীর চীৎকার শুনতে পাওয়া যেত। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে সে-চীৎকার কানে এসেছে।

কিন্তু এ-লোকটা নতুন এ-পাড়ায়। বেশ বোয়ান মানুষ।

লোকটাকে এড়িয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু লোকটাও হাসতে লাগলো আমাদের দেখে। একেবারে আমাদের সামনে এসে বললে—খাবার খাবে বাবা—খাবার খাবে ?

ভোলা কিছু কথা বললে না। আমার মুখের দিকে তাকালো, আমি তাকালাম কার্ত্তিকের মুখের দিকে।

লোকটা একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

—নাও বাবা, নাও, মিষ্টি খাও—

আমরা সবাই আরাম করে এক একটা মিষ্টি নিলুম। তবু ছাড়ে না। আরো খেতে হবে। ঠোঙা শুদ্ধু খাবার সব আমাদের খাইয়ে ছাড়লে। সব ফুরিয়ে যাবার পর খালি ঠোঙাটা জুতো দিয়ে মুট্ মেরে পাশের নর্দ্দমায় ফেলে দিলে। তারপর যেন মহা ফূর্ত্তি হয়েছে এই ভাবে হো হো করে হেসে টলতে টলতে গিয়ে ঢুকলো সুরেশ্বরীদিদির বাড়ির সদর দরজায়।

কার্ত্তিক বললে—ওরা ও-বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে রে, আমি দেখেছি—

এ-রকম ঘটনা আরো দু'একদিন ঘটেছে। সুরেশ্বরী-দিদি চলে যাবার পর বিপিনদা'র বাড়িতে আর ঢুকিনি। ঢুকতে ইচ্ছেও করতো না। তাই দেখতে পাইনি ভেতরে ভাড়াটেদের আর কে আছে। কিন্তু বিপিনদা'র ছোট মেয়ের টাইফয়েডের সেবা করতে গিয়েই প্রথম দেখলাম।

ভাবলাম—বোধহয় লোকটার বউ।

বিপিনদার বউ বললে—একটা ঝি ছিল, চলে গেছে, বড় কষ্টে পড়েছে বৌটা—

কিন্তু মাতালের বৌ বললে—কষ্ট ? কীসের কষ্ট দিদি ? আমার কষ্ট হয় না কাজ করতে—উনি বলেন যত কাজ করবে তত গায়ের জোর বাড়বে—

সত্যিই দেখলাম একদিন মাতাল-বউ টিনের চালে মই লাগিয়ে চাল থেকে কুমড়োর শাক পাড়ছে।

কী রকম যেন অবাক লাগলো! মেয়েমানুষকে টিনের চালে উঠতে কখনও দেখিনি। কোমরে শাড়ির আঁচলটাকে কষে জড়িয়েছে। মাথার খোঁপাটা আঁট করে বেঁধেছে।

একদিন বলেছিলাম—জীবনবাবু মদ খায় বলে তোমাকে সবাই মাতাল-বৌ বলে, জানো—

—তাহলে তুই আমাকে মাতাল-বৌদি বলে ডাকিস্—

তা মাতাল-বৌদি সত্যিই আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। আমার মা'কে দেখেছি, জ্যাঠাইমা, কাকা-মাকে দেখেছি, সুরেশ্বরীদিদিকেও দেখেছি। ভোলার বোন খুন্তিদিদিকেও দেখেছি। কিন্তু এমন মেয়েমানুষও আগে কখনও দেখিনি, এমন বৌও আগে কখনও দেখিনি।

টিনের চালের ওপর থেকে আমায় মাতাল-বৌদি বললে—এই শাকগুলো ধর্ তো—আরো নিচের আয়, দেখিস্ মরলা লাগায় নে যেন—

ওপর থেকে মাতাল-বৌদি কুমড়ো শাকের ডগাগুলো কেটে কেটে ফেলতে লাগলো আমার দিকে, আর আমি লুফে লুফে নিতে লাগলুম।

বললাম—এত কুমড়োর শাক কে খাবে?

মাতাল-বৌদি বললে—কেন, আমি! আমি একলাই সব খেতে পারি এ-গুলো, জানিস!

সত্যিই যদি কোনওদিন দুপুরবেলা গেছি মাতাল-বৌদির বাড়ি, দেখেছি হয়ত তখন খেতে বসেছে। মস্ত বড় এক কাঁসিতে একগাদা ভাত নিয়েছে। এক বাটি দুধ। তরকারী মাছ মাংস—প্রায় চারজনের খাবার। আমার দেখে অবাক লাগতো! এত খেতে কেউ পারে!

বলতো—ওই দুধটা একটু এগিয়ে দে তো—

মাতাল বৌদি বলতো—তুইও এমনি খাবি জানিস—

বলতাম—আমি এত খেতে পারবো না মাতাল বৌদি—

—পারবি, পারবি, চেষ্টা করলেই পারবি—না খেলে গায়ে জোর হবে কেন?

জীবনবাবু দেখতাম সকালে একেবারে স্বাভাবিক মানুষ। বেশ গম্ভীর চেহারা। বাদামতলার বাজার থেকে সকালবেলাই দু'হাতে বাজার করে আনতো। দু'টি তো মাত্র প্রাণী। কিন্তু বাজার দেখে মনে হতো পাঁচজনের সংসার।

বাজার যাবার পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতো—বাজারে মাছ কেমন ফটিকবাবু?

ফটিককাকা বলতো—মাছে আর আগুন লেগেছে মশাই—মাছ ছুঁতে পারিনি—

তা হোক, জীবনবাবু সেই বাজারেই মস্ত একলের একটা কই মাছ কিনে ঝুলোতে ঝুলোতে এনে হাজির। শুধু কি মাছ! মাছ, ডিম, মাখন, দই, ডাব—সব।

বিপিনদার মেয়ের টাইফয়েডের যখন প্রথম দিক, তখনই মাতাল-বৌদিকে প্রথম দেখি।

বললেন—খোকা শোন এদিকে—

দেখি বেশ নতুন ধরণের চেহারা, হাঁ করে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

মাতাল বৌদি বললে—হাঁ করে দেখছো কী! একপো ছোলা কিনে নিয়ে এসো তো, বড় বড় দানা, এই নাও পয়সা নাও—

বিপিনদার বউ বললে—একটা কি ছিল, চলে গেছে, বড় কষ্টে পড়েছে বৌটা—

ছোলা কিনে এনে আমার বাড়িতে ঢুকেছি—দেখা নেই। মনে হলো কোথায় রাখি! যদি কাকে খেয়ে যায়। এদিক-ওদিক চাইছি। মনে হলো রান্নাঘরের দিকে গেছে হয়ত। একটু ওদিকে সরে গিয়ে দেখলাম —সেখানেও নেই।

হঠাৎ রান্না ঘরের পাশের দিক থেকে একটা হুম্ হুম্ শব্দ পেয়ে সেইদিকে ফিরতেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখি—দুটো ডাবের নিয়ে ভাঁজছে মাতাল বৌদি। আঁট করে পরেছে শাড়িটা। বোধহয় মালকোঁচাও দিয়েছে। আর সেই অত ভোরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। আর একমনে শরীর চর্চা চলেছে। কোনওদিকে খেয়াল নেই।

বললাম—বৌদি—

মাতাল-বৌদি আমাকে দেখেই এগিয়ে এল।

বললে—ছোলা এনেছিস? ওখানে রাখ—

তারপর ঠোঙাটা খুলতে খুলতে বললে—দেখি কী রকম ছোলা এনেছিস তুই—

মাতাল বৌদি কাগজের ঠোঙাটা খুলে বললে—বেশ বড় বড় দানা, উনি বলেন এই ছোলা খেলেই গায়ে জোর হয়—

কিন্তু আমি তখনও অবাক হয়ে মাতাল বৌদির দিকে চেয়ে আছি। হাতের মাসলগুলো ঠিক পুরুষের মত।

বললাম—তুমি কদ্দিন ধরে একসারসাইজ করছো?

মাতালবৌদি বললে—তুইও আমার মত ডাম্বেল মুগুর ভাঁজ, দেখবি তোরও একদিন আমার মতন শরীর হবে—আর সকালবেলা কলবেরোন ছোলা খেতে হবে—

চেয়ে দেখলাম দুটো সরু সরু মুগুরও পড়ে রয়েছে পাশে। মাতাল-বৌদির গা দিয়ে দর দর করে ঘাম বেরোচ্ছে তখন।

মাতালবৌদি বললে—দেখ্ তো উনুনটা ধরেছে কিনা—

সেদিন আমার চোখে যে বিস্ময় আর আনন্দ ফুটে উঠেছিল—মাতালবৌদি তা ধরতে পেরেছিল কিনা কে জানে! তখন বাদামতলার সমস্ত আকর্ষণ একে একে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর সুরেশ্বরীদিদিও ফুরিয়ে গিয়েছে আমার জীবন থেকে, সেদিন এই মাতাল জীবনবাবুর স্ত্রীই আমাকে কিছুদিন আকৃষ্ট করে রেখেছিল।

কিন্তু তা আর ক'দিনের জন্যেই বা।

প্রথম প্রথম কেউ বিশেষ কিছু বলেনি। ভাড়াটে এমনিতেই তখন পাওয়া যায় না। তখনকার দিনকালই ছিল আলাদা। তখনকার দিনে ভাড়াটে পেতে হলে বাড়ির সামনে "To let" লেখা বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে হতো। একটা ভাড়াটে যখন আসতো, তাকে সাধা-সাধনা করে ধরে রাখতে হতো। তার আবদার-অত্যাচার সইতে হতো।

রাত্রে বাড়িতে শুয়ে আছি হয়ত, হঠাৎ চীৎকার উঠলো সুরেশ্বরীদিদির বাড়ি থেকে। জীবনবাবুর চীৎকার।

বাবা বললে—বিপিনদের বাড়ির সেই মাতাল ভাড়াটে—

জীবনবাবুর সে কী চীৎকার, কথার মানে বোঝা যায় না।

বলে—বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে—বেরিয়ে যা—

তারপর মেয়েলি গলার আওয়াজও শোনা যায়। কান্না মেশানো করুণ গলা। সারা পাড়ার লোকদের ঘুম ভেঙে যায়। সমস্ত পাড়ার লোক বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে—আলালে দেখছি—

ফটিককাকা বলে—কাল রাত্রে কী হল্লা মশাই, ঘুমুতে পারি না মোটে—

বিপিনদা বলে—ভাড়াটে বসিয়ে দেখছি জ্বালা হলো আমার—

রাস্তায় বেশ টলতে টলতে আসে জীবনবাবু। হাতে যদি খাবারের ঠোঙা কি আর যা কিছু থাকে, ছেলে-মেয়েদের বিলোতে বিলোতে আসে। কিন্তু যত চীৎকার বাড়িতে এসে। আশেপাশের বাড়ির লোকজন বিছানায় উঠে বসে। বলে—ওই সুরু হলো গো—

যেদিন সন্ধ্যেবেলা সুরু হয় সে-চীৎকার থামে রাত একটা-দুটোর সময়। যেদিন রাত করে বাড়ি ফেরে জীবনবাবু, সেদিন সারারাতই বোধহয় হল্লা চলে। সেদিন আমাদের আর ঘুমের সুযোগ আসে না।

ফটিককাকা সেদিন আর থাকতে পারলেন না।

রাত্রেই বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। এসে বিপিনদার বাড়িতে সদর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলেন। বললেন—বিপিন, ও বিপিন—

বিপিনদাও বেরিয়ে এল। বললে—কী কাকা—

ফটিককাকা বললেন—ভদ্রলোকের পাড়ায় এ-সব কী কী হচ্ছে শুনি—?

বিপিনদা বললে—আজ্ঞে, কী করবো বলুন, এ-সময়ে বলা বৃথা—কাল সকালে আপনারা সবাই না-হয় এসে বলবেন একসঙ্গে—আমিও বলবো—

কিন্তু সকালবেলা ভারি প্রসন্ন মূর্তি জীবনবাবুর। একেবারে অন্যরকম। সকালবেলাই স্নান সেরে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছে। হাতে বাজারের থলি।

বলে—কী রকম মাছ আজ বাজারে, ভজমশাই?

ছেলেরা সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে গেছে। মাতাল-বৌদি দিচ্ছিল চার আনা। জীবনবাবু বাইরে বেরিয়ে এসেই বললেন—কেন, চার আনা কেন? চার আনায় কী করে হবে? একটা টাকা দাও ওদের—

বিপিনদার বউ প্রথম প্রথম বলতো—কাল রাত্তিরে

অত চীৎকার করছিল মাতাল-বৌ, একটু শাসন করতে পারো না ?

মাতাল-বৌদি বলতো—শাসন করবো কা'কে দিদি ? ও পেটে গেলে কি মানুষের জ্ঞান-গম্যি থাকে—?

—যখন সকালবেলা জ্ঞান হয় তখন তো বলতে পারো ! তখন তো বেশ ভাব তোমাদের, দু'জনে তো বেশ হেসে হেসে গল্প করো দেখেছি !

তা করে ! জীবনবাবু বাজারটা এনে একেবারে রান্না ঘরে গিয়ে ওঠে।

বলে—কি এনেছি দেখ গো—

মাতাল-বৌদি বলে—এত ডিম মাখন মাংস কেন আনো বলো তো ? খাবে তো তুমি একলা, শুধু শুধু পয়সা নষ্ট—অত কে খাবে শুনি ?

জীবনবাবু বলে—কেন তুমি খাবে !

মাতাল-বৌদি বলে—আমার আর খেয়ে কাজ নেই—এমনিতেই খেয়ে খেয়ে গতরে যা জোর হয়েছে—

সত্যিই মাতাল-বৌদির গায়ে খুব জোর হয়েছিল। সকালবেলা দেখেছি খানিকটা ডালের ডেঁজেই আদা ছোলা ভিজোন খেতে বসতো। সমস্ত দিন পরিশ্রম আর খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতো মাতাল-বৌদি।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু মাতাল-বৌদি, জীবনবাবু তো একদারসাইজ করে না ?

মাতাল-বৌদি বললে—তা হলে তো ওঁর গায়ে আরো জোর হবে রে, বেশি জোর হওয়া কি ওঁর ভালো ?

আমি অবাক হয়ে যেতাম।

—কেন, ভালো নয় কেন ?

মাতাল-বৌদি বলতো—দূর, মদ খেলে যে মানুষের গায়ে এমনিতেই খুব জোর বাড়ে, তখন আমি ওঁর সঙ্গে পারবো কী করে ?

কেমন যেন হেঁয়ালির মত লেগেছিল কথাটা সেদিন। সেদিন সত্যিই বুঝতে পারিনি। কিন্তু একদিন স্বচক্ষেই দেখলাম। সন্ধ্যেবেলা সেদিন মেঘলা ছিল বলে আর খেলতে যাইনি। জানালা দিয়ে দেখলাম রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে আসছে জীবনবাবু। সেদিন সন্ধ্যেবেলাই বাড়ি চলে এসেছে।

তারপর বাড়িতে ঢুকেই আরম্ভ হলো হল্লা আর চীৎকার।

দৌড়ে গেলাম মাতাল-বৌদির বাড়ি।

দেখি সে এক ভয়াবহ কাণ্ড।

জীবনবাবু বলছে—বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি—বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে—

মাতাল-বৌদি কিন্তু ভয় পায়নি মোটেই। সমানে দু'হাতে জাপটে ধরে রেখেছে জীবনবাবুকে। মাতাল-বৌদির গায়ের জোরের কাছে জীবনবাবু যেন কাবু হয়ে পড়েছে।

মুখ দিয়ে তখনও বেরোচ্ছে—ছাড় আমাকে, ছাড় বলছি, ছেড়ে দাও—

তারপর একবার ঘুঁসি মেরে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করলে। কিন্তু মাতাল-বৌদির জোরের কাছে যেন জীবনবাবু পারলে না। কিন্তু তারপরেই এক হ্যাঁচকা টান দিতেই মাতাল-বৌদি পিছলে গেল মেঝের ওপর—আর মাথা দিয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো।

সে রাত্রে মনে আছে আমার খুব রাগ হয়েছিল জীবনবাবুর ওপর। রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতেও যেন স্বপ্নে মাতাল-বৌদির রক্তমাখা মাথাটা দেখতে পেয়েছিলাম !

বিপিনদার বাড়িখানাতে এখন অন্য ভাড়াটে এসেছে। এখনও মনে পড়ে সেইসব দিনগুলোর কথা। এই সেদিনও বিপিনদার ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে চোখ পড়লো ভাড়াটেদের অংশটার দিকে। এখনও টিনের চালের ওপর কুমড়ো গাছটা আছে। আর জীবনবাবু যেখানে বাজার করে এসে রান্নাঘরের সামনে চাতালটার ওপর মাছের থলিটা রাখতো, সে-চাতালটাও রয়েছে। মনে আছে সেই ঘটনার পরদিন ভোরবেলা সকলের আগার আগেই মাতাল-বৌদির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছি। মনে মনে ভয় হচ্ছিল, হয়ত দেখবো মাতাল-বৌদির জ্বর হয়েছে। হয়ত রান্না-বান্না চড়ায়নি। জীবনবাবু হয়ত বাজারে চলে গেছে নিয়মমত—তারপর হয়ত নিজেই একলমনে রাঁধতে বসবে। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। যেমন মাতাল-বৌদিকে কষ্ট দেওয়া।

কিন্তু বাড়ির বাইরে কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। সদর দরজাটা খোলাই ছিল। হয়ত জীবনবাবু

আজ ভোরবেলাই উঠে বাজারে বেরিয়েছে। এসে উনুনে আঁচ দেবে, রান্না চড়াবে—আজ তো আর মাতাল-বৌদি রান্না করতে পারবে না!

উঠোনেও কেউ নেই!

আস্তে আস্তে ঘরের দিকে গেলাম। অল্প অল্প ছায়া-ছায়া অন্ধকার। ঘরের রোয়াকে উঠলুম। তারপর ঘরের ভেতরের দিকে তাকালুম—।

জানালাটা খোলা ছিল। হরত বিছানার ওপর মাতাল-বৌদিকে শুয়ে থাকতে দেখবো।

কিন্তু যা দেখলুম—তাতে আমার বাক রোধ হয়ে এল।

দেখি—জীবনবাবু বিছানার ওপর শুয়ে আছে—আর মাথার কাছে মাতাল-বৌদি এসে জীবনবাবুর গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছে!

নিজের চোখ দু'টোকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না।

কানে গেল মাতাল-বৌদির গলা।

মাতাল-বৌদি বলছে—কাল কি বাড়াবাড়িটা করলে বল দিকিনি—হৈ-চৈ করে মেয়ে ধরে একেবারে একশা করে—

জীবনবাবু বলছে—পাড়ার সব লোক এসেছিল বুঝি? দেখেছে নাকি সবাই? ছি ছি···

মাতাল-বৌদি বললে—তাদের জানতে কি আর কারো বাকি আছে? তা কালকে তুমি অত খেতে গেলে কেন শুনি? একটু কম করে খেতে পারো না—?

জীবনবাবু যেন ভিরমাণ হয়ে গেল।

বললে—ও কি আমার হাতের মধ্যে! দোকানে গিয়ে বসলে যে আর জ্ঞান থাকে না—

তারপর একটু থেমে বললে—তা তুমি আমায় মারতে পারলে না? খুব কিল চড় ঘুঁষি মারতে পারলে না? মেরে আমার মাথাটা একেবারে ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিতে পারলে না?

মাতাল বৌদি বললে—হ্যাঁ তোমাকে মারি! শেষে তোমার একটা কিছু হলে আমারই তো শতেক জ্বালা—

জীবনবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

বললে—না না বউ, তুমি মারবে, আমি বলছি তুমি মারবে খুব আমাকে। যদি বেলেল্লাপনা করি তো আমার চুল টেনে ছিঁড়ে দেবে, আর তাতেও যদি না হয় তো খুঁসি মারবে আমাকে—মেরে নাক চোখ ফাটিয়ে রক্ত বার করে দেবে—আর তাতেও যদি না শায়েস্তা হই তো তোমার লোহার ডাম্বেল নিয়ে এই মাথার মধ্যেখানে বসিয়ে দেবে—এই দেখ, ঠিক এই জায়গায়—

বলে জীবনবাবু মাথার মধ্যেখানটা দেখিয়ে দেয়।

মাতাল বৌদি বললে—হ্যাঁ, কী যে তুমি বলো, তাই নাকি কেউ পারে—!

জীবনবাবু তখন উঠে বসেছে। বললে—কেউ না পারুক, তুমি পারবে, তবে কেন তোমায় মুগুর কিনে দিয়েছি, ডাম্বেল কিনে দিয়েছি—কেন ডিম মাখন মাংস খেতে বলি তোমাকে—গায়ের জোর করবার জন্যেই তো—আমি যত মাতলামি করবো, তুমি ততো মারবে আমাকে—যাতে আমার মদের নেশা চিরজন্মের মত ছুটে যায় একেবারে—

মাতাল বৌদি বললে—আর গায়ের জোরের দরকার নেই আমার, তোমার মেরেও দরকার নেই—তার চেয়ে তুমি ও-ছাই-ভস্মটা না খেলেই পারো—

জীবনবাবু বললে—সে হলে তো ভালোই হোত—তা হলে এক কাজ কর—খুব করে ডন-বৈঠক দাও দিকিনি কবে—হাতের কব্জিতে খুব জোর হবে, বেশ লম্বা-লম্বা করে নিশ্বাস টানবে—তখন বেই আমি মাতলামি করবো তুমি দুহাত দিয়ে আমার গলাটা টিপে ধরবে—যেন প্রাণটা বেরিয়ে যায় আমার—পারবে না?

এর কিছুক্ষণ পরেই আমি জানালা থেকে সরে এসেছি।

দেখি মাতাল-বৌদি আর জীবনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্না ঘরের পাশে আড়াল করে দাঁড়াল। তারপর শাড়িটা ভালো করে শরীরে এঁটে নিয়ে মুগুর নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার···

এমনি অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগলো। আর জীবন-বাবু সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারিফ করতে লাগলো।

বললে—হয়নি, হয়নি, আরো পঞ্চাশবার—আরো বার পঞ্চাশেক করো—

কিন্তু সেদিন আর কারো ধৈর্য্য রইল না।

পাড়ার সবাই এসে একেবারে চড়াও হয়েছে। ফটিক-

কাকা সকলের সামনে এসে একেবারে যাচ্ছেতাই করে বলতে লাগলো।

—ইতর, ছোটলোক, চামার কোথাকার—

জীবনবাবুও তখন অসভ্য ভাষায় চীৎকার করে পাড়া মাতিয়ে তুলেছে। মাতাল-বৌদি দু'হাতে জাপটে ধরেও বাগে আনতে পারছে না জীবনবাবুকে! জীবনবাবু মাতাল-বৌদির মুখে-চোখে ঘুষি মেরে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে।

ফটিক-কাকা বললে—তোমাকে আমি পাড়া ছাড়া করিয়ে ছাড়বো, তবে আমার নাম—এ কালীঘাট পাওনি হারামজাদ, এ বাদামতলা, এখানে ভদ্রলোকের বাস, আমরা বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি—

যেন কানে গেল জীবনবাবুর। চীৎকার করে বললে—আমি হারামজাদ না তোরা হারামজাদ্। বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা—এখুনি বেরিয়ে যা—

ফটিক-কাকার গলাও কম নয়। তেমনি সমান তালে চীৎকার করে উঠলো—ইতর জানোয়ার চামার কোথাকার, বউএর গায়ে হাত তোলে সে আবার মানুষ, ছো:—

কিন্তু মাতাল-বৌদি যেন হঠাৎ আগুনের মত ঠিক্‌রে উঠলো।

বললে—আমার বাড়ির ভেতর আমার স্বামী মাতলামী করছে, তাতে আপনাদের কী। আমাকে মেরেছে বেশ করেছে, হাজারবার মারবে—আপনারা কেন এসেছেন! আপনারা এখানে গোলমাল করবেন না—যান, চলে যান্—

আজ মাতাল-বৌদিও নেই, আর বাদামতলাও আর সে-বাদামতলা নেই। আজ পিচের রাস্তা, জলের কল, ড্রেনের পাইপ, ইলেকট্রিক লাইট হয়ে সব মুছে ঘুচে গেছে। সে-মানুষগুলোও আজ আর নেই কোথাও। ভেতরে আমাদের যাই থাক, আমরা বোপচুরস্ত কাপড় পরি, সিনেমায় যাই। বড় বড় কথা মুখে বলি। যারা আমার মতন কয়েকজন পুরোণ লোক বাদামতলার আজো পড়ে আছে তারাও প্রায় আমূল বদলে গেছি। সে-সব পুরোণ দিনের কথা ভাববার সময়ও নেই আমাদের। রুচিও নেই। কিন্তু আমার ছোট ভাইকে যখন মাতাল-বৌদির সেই মুগুর আর ডাম্বেল জোড়া ভাঁজতে দেখি তখন সেই সব দিনের কথা আবার মনে পড়ে যায়।

মনে পড়ে যায় মাতাল বৌদির চলে যাবার দিনটির কথা।

পাড়ার লোকেরা বার বার চেষ্টা করেও যখন জীবনবাবুকে ওঠাতে পারেনি, তখন জীবনবাবুই একদিন চলে গেল হঠাৎ। সত্যিই হঠাৎ। মদের নেশায় টলতে টলতে একদিন অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে আসছে—গোপাল চৌধুরীদের নতুন কেনা মটর গাড়ির ধাক্কা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল জীবনবাবু। তারপর সে জ্ঞান আর ফেরেনি কোনও দিন।

শেষকালে একদিন বাড়ি ছেড়ে দিতে হলো মাতাল-বৌদিকে। দূর সম্পর্কের কে এক দাদা এল নিতে। ঘোড়ার গাড়ির মাথায় মাল-পত্র তোলা হয়ে গেছে। সব তৈরি। মাতাল-বৌদিও গিয়ে গাড়িতে উঠছে—

আমি ছোড়ে গেলাম।

বললাম—তোমার মুগুর আর ডাম্বেল জোড়া যে পড়ে রইল মাতাল-বৌদি—

মাতাল-বৌদি সাদা একটা থান পরেছিল। সেই সাদা থান কাপড়ের মতন একটা ফ্যাকাসে সাদা হাসি ফুটে উঠলো মুখে।

বললে—ও নিয়ে আমি আর কী করবো—

সত্যিই দেখেছিলাম বিধবা হবার পর থেকে ওগুলো আর ছোঁয়নি মাতাল-বৌদি।

গাড়িটা তখন চলতে আরম্ভ করেছে। মাতাল-বৌদি আমার দিকে পেছন ফিরে বললে—ওগুলো তুই নিয়ে যা—তোকে দিলাম।

আজ পুরোণ বাদামতলার সবই বদলে গিয়েছে—কিন্তু ওগুলোর কিছুই হয়নি। ঠিক তেমনি আছে। আমার ছোট ভাই ওগুলো ভোরবেলা রোজ ঘোরায়।

সেই মাতাল-বৌদির গল্প আজ এতদিন পরে মনে পড়বার একটা কারণ আছে। সকালবেলা এক ভদ্রলোক এসে বললেন—আপনার ঠাকুর্দার নামই কি বটুক মিত্র?

বললাম—হ্যাঁ।

—আপনি জীবনবাবুর স্ত্রীকে চিনতেন? জীবনবাবু, যিনি খুব মদ খেতেন, শেষকালে মটর চাপা পড়ে মারা যান এই বাদামতলায়? তখন আমরা খুবই ছোট অবশ্য—

বললাম—মাতাল-বৌদি? আমরা তাঁকে মাতাল-বৌদি বলে ডাকতাম—

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ তিনি আজ মারা গেছেন—শ্মশানে আনা হয়েছে, মারা যাবার আগে আপনাদের নাম করতেন খুব—আপনাদের দেখতে ইচ্ছে ছিল কিন্তু সুযোগ হয়নি, তাই আপনাকে খবর দিতে এসেছি—

বালিগঞ্জের পাশে গঙ্গা পেরিয়েই শ্মশান। কেওড়াতলা শ্মশান। ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম। আমি একাই গেলাম। ভোলা, কার্তিক, সুচিত—আমরা যারা একসার-সাইজ করতাম মাতাল-বৌদির বাড়িতে—আমি ছাড়া তারা কেউ আজ আর বালিগঞ্জে নেই। নানা কাজের চক্রে কে-কোথায় ছিটকে গেছে জানি না।

ভদ্রলোক বললেন—আজ কয়েক বছর ধরে কেবল আপনাদের নাম করতেন—কিন্তু পাড়াগাঁ থেকে এখানে আসা হতো না—ক'দিন হলো চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় আনা হয়েছিল—

চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছিল?

ভদ্রলোক বললেন—হার্ট—

হার্ট! মাতাল-বৌদির হার্ট! সেই চেহারাটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো! সেই মুগুর ভাঁজা, ডাম্বেল ভাঁজা—সেই খাওয়া! সেই শরীরে হার্ট কেমন করে এলো!

ভদ্রলোক বললেন—বিধবা হওয়ার পর তো আর একসারসাইজ করেন নি—এই কুড়ি বছর ধরে হার্টে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন—কেবল শুয়ে পড়ে থাকতেন!

বললাম—মাতাল-বৌদি আপনার কে হতেন?

—মা!

মা! অবাক হয়ে গেলাম। মাতাল-বৌদির তো কোনও ছেলে ছিল না।

ভদ্রলোক বললেন—আমার সৎমা—আমার নিজের মা মারা যাওয়ার পর বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন—আমরা বরাবর মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছি—

আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম। শ্মশানে তখনও মুখাগ্নি করা হয়নি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। এ কেমন পরিবার! বাপ বাপের কর্তব্য করলো না, মা-ও মায়ের কর্তব্য করলো না, অথচ ছেলে?

ভদ্রলোক বললেন—মা'র সারা জীবনটাই কষ্টের—বাবা বেঁচে থাকতেও সুখ পাননি—আর বিধবা হবার পর তো শুয়ে শুয়েই কাটলো—

ভদ্রলোক হয়ত আরো কিছু বলেছিলেন। কিন্তু আমার কানে কিছুই গেল না। আমার প্রশ্নের উত্তরের আশায় আমি ছটফট করছিলাম। মাতাল-বৌদির প্রাণহীন মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম—আমার প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? কে দিতে পারে?

পেল্লাদ চৌধুরীদের অতদিনের বিশ্বাসী ঘরোয়ান, যখন পেল্লাদ চৌধুরীর নাতনীর কাণ থেকে ছ-টাকা ওজনের মাকড়ি চুরি করেছিল, পুলিশের লোকের প্রশ্নে উত্তর দিয়েছিল—সব ঝোটা হ্যায় বাবুজী, ম্যায়নাই ঝোটা হ্যায়—

সুরেশ্বরীদিদিকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম—কোন্ দুঃখে বাড়ি ছেড়ে পাড়ার যতীনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন সুরেশ্বরীদিদিও উত্তর দিয়েছিল—যখন হয়, তখন এমনি করেই হয় রে—

আর আজ এই মাতাল-বৌদি। মাতাল বৌদির আজ আর কথা বলবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যদি থাকতো—তা হলে কি সেই উত্তরই দিত?

মহারাজা নন্দকুমারের লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলায় কতকগুলি প্রবাদ বা গল্প প্রচলিত আছে। এই-গুলি যদি মোটামুটিভাবেও সত্য হয় তাহা হইলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এই গুলিকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে ইহাদের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিব কিরূপে?

মহারাজা নন্দকুমার লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করান ও তাঁহাদের পদধূলি সংগ্রহ করেন। এই পদধূলি নাকি এখনও কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে সংরক্ষিত আছে। এই প্রবাদ বা গল্প বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, তথাপি কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, বলেন যে মহারাজা হয়ত বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়াছিলেন, তাহা হইতে লোক-মুখে, পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ লোকের মুখে বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়াছে।

এই প্রবাদ বা গল্পের সম্ভাব্য সত্যতার বিষয় আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করিব। প্রবাদ যে বাংলার নবাব নাজিম মীরজাফরের দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার নিজবাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করান। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড়মানুষী দেখাইবার জন্য লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করান নাই। মহাভারতের আশ্রম পর্ব্বে আছে যে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে লোকে সর্ব্ব-পাপ-বিমুক্ত হয়। সর্ব্ব-পাপ মুক্তির জন্য তিনি যে এইরূপ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যায়। রাঢ় অঞ্চলে লোক-মুখে একটী ছড়া শুনিতে পাওয়া যায় যে :—

"ভাদুরের নন্দকুমার
লক্ষ বামুন কদলে সুমার
কেউ খেলে মাছের মুড়া
কেউ খেলে বন্দুকের গুঁড়ো।"

মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান ভদ্রপুর—লোকমুখে ভাদুরেতে রূপান্তরিত হইয়াছে। মহারাজার ফাঁসি হয় ইং ১৭৭৫ সালে। মীরজাফর মারা যায়েন ১৭৬৫ সালে —সুতরাং মহারাজার লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করান তাহার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। তখন বাংলায় কি লক্ষ ব্রাহ্মণ ছিল?

ইংরাজের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে বিভিন্ন আদম সুমারীর সময় ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিম্নলিখিত মত ছিল যথা :—

সাল	ব্রাহ্মণের সংখ্যা
১৮৮১	১০,৮০,৩৮৪ জন
১৮৯১	১১,২১,৮০৪ „
১৯০১	১১,৬৬,৯১৯ „
১৯১১	১২,৫৬,৮৩৮ „
১৯২১	১৩,০৯,৫৩৯ „
১৯৩১	১৪,৪৭,৬৯১ „

৫০ বৎসরে ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৩৪·১ জন করিয়া। যদি ১৮৮১ সালের পূর্ব্বের ১১০ বৎসর ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধি এই একই হারে হইয়াছিল ধরি, খুব অন্যায় হইবে না। Geometrical progression হিসাবে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, এই হিসাবে ইং ১৭৭১ সালে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৮৬,০০০ জন। এই সংখ্যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরের সংখ্যা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়িয়াছিল তৎকালীন লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতির মত। হাণ্টার সাহেব ও এই মতের পক্ষপাতী। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যদি এইরূপ এক-তৃতীয়াংশ মারা গিয়াছেন ধরি তাহা হইলে অন্যায় ত হইবেই না, বরং সঙ্গত হইবে। দুই-তৃতীয়াংশ ব্রাহ্মণের সংখ্যা যদি ৩,৯১০০০ হয়, তাহা হইলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের সংখ্যা হইবে ৮,৪৯,০০০ হাজার বা ৮॥ লক্ষ।

বাংলায় যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি লইয়া আমরা হিসাব করিলাম তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নহেন। ইহার মধ্যে উড়িয়া ব্রাহ্মণ আছেন, পশ্চিমা ব্রাহ্মণ আছেন—কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারে পূর্ব্বে ত নহেই, এখনও কেহ বাঙ্গালী, উড়িয়া বা পশ্চিমা বলিয়া কোনও রূপ ভেদ করেন না। সুতরাং এই হিসাবে এই কারণে কোন ভুল থাকিবার কথা নহে। আরও একটী কথা—তখনকার

সুদূর বাংলার মধ্যে যেমন লাক্ষিদিং ও জলপাইগুড়ি জেলার একটী বৃহৎ অংশ ধরা হইত না, তেমনই মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া ও শ্রীহট্ট এবং গোয়ালপাড়া জেলা ধরা হইত। এই সব জেলা ধরিলে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বাড়িবে বই কমিবে না।

দেখা যায় যে সকল দেশেই সকল সময়ে ১৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের জন-সংখ্যা মোট জন-সংখ্যার অর্দ্ধেক। আর মোটামুটী স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান সমান। এই হিসাবে ব্রাহ্মণীবাদ ব্রাহ্মণের সংখ্যা সওয়া চারি লক্ষ; আর ইহার মধ্যে ১৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২,১২,৫০০ হাজার। এই বয়সের সকলেই প্রায় কর্ম্মক্ষম এবং সুদেশ হইতে হাঁটিয়া আসিতে পারেন।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে অল্প বয়সে উপনয়ন হয়। উপনয়ন হইলেই তাঁহারা ব্রাহ্মণপদ বাচ্য হয়েন এবং তাঁহাকে ভোজন করাইলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল পাওয়া যায়। গর্ভের কয়মাস ধরিয়া ৮ম বর্ষে কিংবা জন্মাবধি ৮ম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন প্রশস্ত। গর্ভাবধি ১৬শ বর্ষের পর ব্রাহ্মণের উপনয়নের চরম কাল। ইহার মধ্যে উপনয়ন না হইলে সাবিত্রীপতন ঘটে। বর্ত্তমানে প্রতি হাজার ব্রাহ্মণের মধ্যে ১৪৬ জন ৭ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের। ৮ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে উপনীতদের পরিমাণ যদি হাজার করা ৭৫ জন ধরি তা প্রকৃত তথ্যের খুব কাছাকাছি হইবে। অল্প-বয়স্ক উপনীত ব্রাহ্মণদের মধ্যে অর্দ্ধেক—যাহারা ভদ্রপুরের কাছাকাছি মেলায় বাস করে, তাহাদের ভদ্রপুরে আসা সম্ভব।

এই হিসাবে পূর্ব্বের ৪,২৪,০০০+১৬,০০০=৪,৪১,০০০ হাজার ব্রাহ্মণের পক্ষে ভদ্রপুরে মহারাজা নন্দকুমারের আহ্বানে আসা সম্ভবপর। কিন্তু সকলেই আইসেন নাই। ইহাদের মধ্যে সিকি সংখ্যক লোক আসিলেই মহারাজার লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করান সম্ভব।

দেওয়ান নন্দকুমার একজন প্রতিপত্তিশালী, ধনীব্রাহ্মণ। মৃত্যুকালে তিনি ৫২ লক্ষ টাকা নগদ ও ৫২ লক্ষ টাকার হীরা, মুক্তা জহরতাদি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ১,০০,০০০ ব্রাহ্মণ-ভোজন করান সহজসাধ্য ছিল। বিশেষ করিয়া যখন তাঁহার বাসস্থান ভদ্রপুর (নলহাটী, আজিমগঞ্জ শাখা রেল লাইনের লোহাপুর ষ্টেসনের নিকট) বাংলার প্রায় মধ্যস্থানে। আর ব্রাহ্মণদের ভৌগলিক বিন্যাস এইরূপ যে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী গ্রামে বা তাহার কাছাকাছি গ্রামে তাঁহারা বেশী সংখ্যায় বাস করেন। পূর্ব্বে অধিক সংখ্যায় বাস করিতেন সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়। বর্ত্তমানে বাংলার ব্রাহ্মণদের সিকি অংশ কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই ৬টী জেলায় বাস করেন।

আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে মহারাজা নন্দকুমারের পক্ষে ১,০০,০০০ ব্রাহ্মণ-ভোজন করান সহজ-সাধ্য ছিল এবং তিনি তাহা করিয়াছিলেন।

সে এক পৃথিবী ছিল

ধীরানন্দ ঠাকুর

সে এক পৃথিবী ছিল সৃষ্টির আকাশে
প্রভাতী আলোর হাসি-ঝিলমিল-করা,
সে এক পৃথিবী ছিল
ঝুরো হাওয়া ঝিরিঝিরি যেথা বয়েছিল,
ফুলের বুকের মধু-নেশার মাদনে মেতেছিল।
সেথায় কুসুমগুলি গান হয়ে-হয়ে
চেয়েছিল ফুটে ওঠবার আশ্বাস।

সেই যে জগৎ ছিল—
সে জগতে প্রাণ ছিল, মন ছিল
আর ছিল প্রাণ-মন দেয়া-নেয়া-সাধ
আশা ছিল ভাষার ফসল ফলবার।

ছিটিছাড়া অদ্ভুত সেই এক লোক :
দুপুর না হতে-হতে সেথায় বিমর্ষ হল আলো,
কোথা হতে কালো ঝড়ে দুর্যোগ ঘনালো,
সবুজ ঘাসের মাঠ হল বালি-ঢাকা মরুভূমি,
ফুলগুলো ঝরে পড়ে হল কাঁদা নিরেট পাথর।
সে এক পৃথিবী তবু সত্যিই ছিল—
আমি ছাড়া তাকে দেখেনিকো আর কেউ।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লাতে থাকে রোগের জীবাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লা-জনিত জীবাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত জীবাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এই আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক।

হিন্দুস্থান লীবার লিমিটেড, বম্বে কর্তৃক প্রস্তুত

শান্তিনিকেতন

শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়

হে কবি মনের কোন্ স্পর্শ তুলিকায়,
এঁকে গেছ এক প্রান্তে
শান্তি নিকেতন ;
রাজার ঐশ্বর্য্য নাই, নাহি, নাহি কোন সম্রাটের
'হীরামুক্তা মাণিকোর'
বিবিধ রতন।
তুমি শুধু—কল্পনা লয়ে আপনার মনে,
'কালের কপোলতলে'
বিরামের ক্ষণে ;
একটি মাটীর বুকে ক'দিনের আশা,
নিবিড় করেছো ঘিরে এতটুকু বাসা।
তুমি কহিয়াছ কবি,
জীবনের কোনো ছবি,
রহে নাকো চির-অমলিন ;
তবে কোন ভোলাক্ষণে,
তোমার ধরার 'পরে একদা বিলীন !
মনে পড়িয়াছে বটে,
জীবনের আশা পটে,
এঁকেছিলে মিটাইতে 'কাঁদা আর হাসা,'
তাই তুমি রচে গেলে,
মরণের অবহেলে,
ধরণীর একপ্রান্তে মূর্ত্ত শান্তি বাসা।
কি জানি হে কবি বুঝিতে হ'ত নাকি
বাল্মীকির তপোবনে,
বেদ সামগান,
তোমারও এই শান্তিবাসে, উঠিত যে মৃদুশ্বাসে,
বিশ্বের কল্যাণ মন্ত্র
পূর্ণ করি প্রাণ।
'উদয়ন', 'মালঞ্চ', আজ নতমুখী
অশ্রু-শুষ্ক বুকে,
'শ্যামলী' গুমরি ওঠে ব্যর্থ হাহাকারে
তোমাহীন দুখে।
আজ হেথা স্তব্ধ গান,
নিস্তব্ধ সকল প্রাণ,
মধুপের গুঞ্জরণ, ভাষাহীন
আজ সবি মিছে,
কে শুধাবে বার্ত্তা তারে,
ব্যর্থতায় বারে বারে,
তাই ফিরে যায় তারা
মুক পুষ্পে ঘরে রাখি পিছে।
নীরব নিস্পন্দ ঘরে,
বিরহী আজ ডাকে দূরে,
কি যেন খুঁজিয়া ফেরে,
কি শুনিতে চায় ;
'বাকাহারা' স্পর্শহারা,
ক্ষুধিত পাষাণ কারা
মর্ম্মরিছে যেন আজি
আপন ক্ষুধায়।

জীবনের কতদিন,
কত ক্ষীণ
গোধূলি আলোকে,
রচিয়াছ বিশ্বভুলে, ভাঙা-গড়া খেলা,
সাঁঝবেলা,
আপনার মাঝে বসি আপন পুলকে।
নয়নের দ্বারখানে নয়ন হারায়ে,
তুমি চলে গেছ আজ
সকলি এড়ায়ে।
সন্ধ্যার তারকা উঠি শাঁখেরে শুধায়,
'সূর্য্য বুঝি গেছে পাটে
আপন কূলায়।'

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঘরের কাজে

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

মাউৎস কাজে

ফটো : দয়াপ্রতাপ বাগ

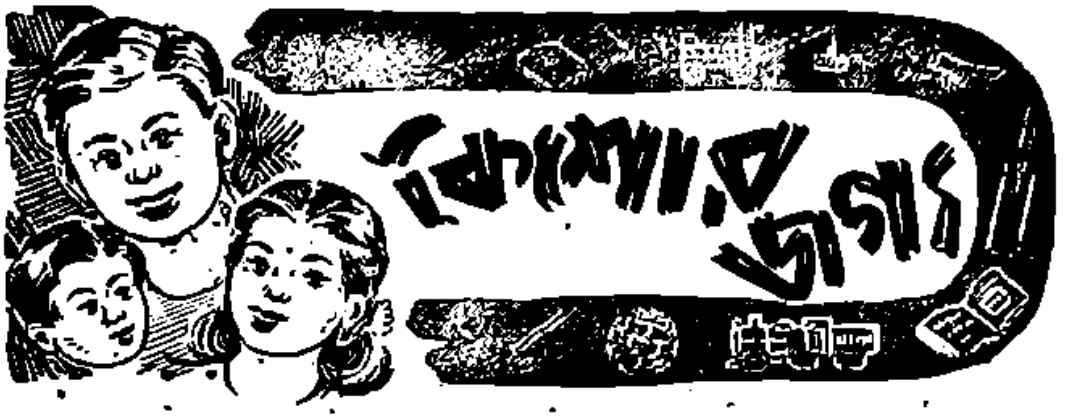

নববর্ষ

উপানন্দ

এলো নববর্ষ। আমরা করি তার স্বাগত বন্দনা।.....এলেছে সে দুরাশা, আশা, রক্ত, ও'র আর হরষাঞ্চ। পুরাতন বৎসরের মহাপ্রস্থানের পথে ছড়িয়ে রইলো মা-বলা কথার কল্পনার কত না কঙ্কাল! চৈত্রের কাছাতে আমরা ফেলে-এলাম যেন কার ক্রন্দনধ্বনি! রেখে এলাম কোথায় আদিগন্ত-ছাওয়া দুখ বালিয়াড়ি! আর মাতালে ঘুরের-ওঠা দীর্ঘশ্বাস! কোন্ অতীতের কাপেক্ষিতা পরী কোথায় অপেক্ষা করছে নতুনের পরশপাথর ভেঙে, তা কে জানে! আসছে কালবৈশাখী ঝারা-ঝঞ্ঝা মৌরভার মাখে, প্রাকৃতিক বাধা আর বিপদকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে—যা কিছু জীর্ণ, ধ্বংস, লয় হয়ে অবলুপ্ত। অনন্ত যাত্রা ফোলো পুরাতন বর্ষের,—লোপামুদ্রা ফেরে আছে পুরপানে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে।

রাত্রির তারার মত ঝলমল্ করে উঠছে অনাগত দিন, যা নেবে আমাদের মহত্তম সম্ভাবনা নিয়ে,—যার রাতে যে কাহিনীর সৃষ্টি-আয়োজন হয়েছিল, আজ প্রভাতে হবে তার উদ্বোধনী তাণ্ডব। সেখানে নেই মনসাধারণের কোন যোগাযোগ, নেই কোন পর-চেতনার সমাচার, সেখানে সূচনা হচ্ছে ক্ষমতাবান মানুষের আবির্ভাব—জ্যাম্পায়ারের মত যে শোষণ করে যাবে বহু জীবের তাজা শোণিত, তারই ঐতিহাসিক ভয়যাত্রার কথা লেখা থাকবে পুঁথির পাতায়, ইতিহাসের এক একটি পরিচ্ছেদ ভরা হবে তাকে উৎসর্গ—সে মরেও হবে অমর, কিন্তু যারা অসংখ্য হাতিয়ার নিয়ে, ফেলে-আসা কোন্ অখ্যাত মরে যাদের হয়েছিল একদিন, তাদের মাটী মাখে মিলিয়ে আকাশে বাতাসে—এইতো মানব সভ্যতার পরিচয়! ইতিহাসের মানুষ দেখা যায়, কিন্তু মানুষের ইতিহাস কোথায়?

আমাদের একটী আয়ুর পাতা পড়লো ঝরে অনন্ত কালের স্রোতে! কাল স্রোতের ভেতর আমরা দিনে-দিনে সংসারের কল-স্রোতের ধ্বনি কতই না শুনলাম! ইতিহাসের বহুস্তর পেরিয়ে এসেছি আমরা সংখ্যাতীত শতাব্দী থেকে। কত শতাব্দীর আবর্তেই না এক একটি ঐতিহাসিক যুগ আকস্মিকভাবে ডুবে গেল! কল্পনার কত হংস-বলাকাই না অতীতের পথে গেল উড়ে! ফেলে রেখে গেল তাদের ডানা থেকে এক একটি শুভ্রপালক—সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আমরা এই নববর্ষের উৎসবের দিনে সাজিয়ে রেখে দেবো আমাদের সংসারের মাথার ওপরে।

আজ নতুনের জন্ম, নতুনের পরিচিতি, নতুন রকম হিসেব, নতুন রকম দৃষ্টিভঙ্গী আর দেখবই হবে আমাদের অবলম্বন—আমাদের জীবনযাত্রা ক্রমে আমূল আলোকে নির্ভর করে—এলো অনাদিও অনন্ত। হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে দেখা গেল কত মানুষের স্থানচ্যুতি আর নতুন করে স্থান-প্রাপ্তি, কালহরণ করে নিল সর্বোচ্চতর মানুষের প্রাণ অপ্রত্যাশিতভাবে, একলিবেরে, যার আকালের দিনে-দিনে বিবিধে তুলেছিল একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সংস্থা—এই রকম কত মানুষের পতন আর মহাপ্রস্থানের ভেতর দিয়ে অপেক্ষা করছে এই নববর্ষের এক একটি দিন—সহস্র ঢেউয়ের ঘুরে শোনা যাচ্ছে ডুবুডুবু চাঁদের রোমন ঝিকিমিকি তারাদের মাখে। সত্য অবিনশ্বর, তার ক্ষয় নেই। এস, তারই জয়ধ্বনি করি।

রৌদ্রের ডানা মেলে দিয়েছে নববর্ষের উড়ে-আসা পাখীটী সৌজন্যের ভিড়ে, ওর কূজনধ্বনি মাখিয়ে দিয়েছে আমাদের মনে বহু শতাব্দীর আগেকার স্মৃতি—সেই ভগবান তথাগতের স্মৃতি—যিনি জীবের জন্যে বেদনায় মনুষ্যে আঁখিয়ে পড়েছিলেন সংসারের সুখৈশ্বর্যগুলিকে ফেলে রেখে—পৃথিবীর বুক ঘুরে তিনি বাঁচিয়ে রেখে গেলেন অনন্তকালের প্রেম—স্বর্গীয় ভালোবাসা। বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্ম, সর্বজ্ঞতা-লাভ, মহাপরিনির্বাণ। এস, আজ তাঁর বন্দনা করি।

বর্ষে বর্ষে মানুষের মন প্রশ্নই করে আসছে—আমি কে? কঃ অহম্—এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে কেবলই, উত্তর মিলছে না। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জানবার জন্যে মানুষের চলেছে চির যাত্রা—চির অভিযান। নিশ্চয় পরিবেশের মধ্য দিয়েই চলেছি আমরা। স্মৃতি রোমন্থন

করতে করতে। পথ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ হচ্ছে পোকাদিকা—কোথায় উপরের আলোক। পোষক আর পালন—এছাড়া আর আছে কি?

আজ আবার হাসপাতাল। কেন পাগলার ছিলের নিকেল চুকিতে খেলতে পারা গেল কি? কেনার ছেলে দিয়ে আবার নতুন বস্ত্র-পরিচয়া শুরু হোলো। ঘর নেই, বর নেই—অভাব কেন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে দুইয়ের লোকের ভোগলক্ষ্য অন্নের অপেক্ষা অতিরিক্তিতে—কেন আর ছেলের লোককে কষ্টই বা ভালোবাসে! দুঃখে সবাই বলে বেশ সেবা করি। প্রকৃত কাজ যেমনকে সেবা করছে? প্রবৃত্তির খেলা-ঘরে আছে আবেগের আলোড়ন। উচ্চাসক্তি কোথায়! মনকে কখন সম্বরে কেমন করে? আমার ছেলের ভিতরে যাহিরে রয়েছে সংস্কারের আধিপত্য, তাই পেটে ভাত পড়েনা, লজ্জা নিবারণ হয়না পরণে কাপড় জড়িয়ে—এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি থাকতে পারে? আমাদের জাতির সর্বদুঃখ গ্লানি তোমাদেরই দূর করতে হবে।

তোমাদের মধ্যে যারা নিজ নিজ জীবনের পরম লক্ষ্য স্থির রেখে ঈমান ও পরম, আশা ও বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে, তারাই আনে নবজাগরণের দিকদের পতাকা রেখে যাবে, জগতের জ্ঞান ও কর্মের ভাণ্ডারে দিয়ে যাবে তোমাদের হৃদয়ের ফসল, দিয়ে যাবে হত সন্ধান। যদি স্বচ্ছন্দে সংসারে থাকতে চাও, তা হোলে যা করা উচিত, তাই তোমরা করবে, নিজের খেয়ালে চলো না।

নতুন বছরের উৎসব পৃথিবীর সবদেশের লোকেই করে, কেননা সবার কাছে নতুন বছর আশার বাণী নিয়ে আসে। তোমরাও নববর্ষের উৎসব করবে। বাদ দেশে কিভাবে উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয়, তাই বলি। তোমরা জানো খৃষ্টান জগতে পয়লা জানুয়ারী নববর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। আজকে ও বাসিদিনে খৃষ্টভক্তরা বহু শতাব্দী আগে থেকে এই উৎসব করে আসছে—বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেওয়া, আমন্ত্রণ করে এনে ভোজন করানো ও নাচগানের দ্বারা আপ্যায়ন প্রভৃতি এই দুই বেলাই প্রচলিত। আমাদের দেশে পয়লা বৈশাখ নববর্ষের উৎসব। ব্যাবিলনে এই দিনটা ছিল খৃষ্টীয় বৎসরের বাইবে ছিলেবর।

চব্বিশ শতাব্দী আগে আর্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যে নতুন বছরের প্রথম দিনে মিষ্টি বিতরণের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, তিন বিতরণও করতেন অনেকে। পারস্যে এই তারিখটা পড়ে মার্চ মাসে। মিসরে জুলাই মাসে নতুন বৎসরের উৎসব হোতো। তখন নীলনদের জল উঠতো ফুলে ফুলে দুকূল ছাপিয়ে, আর মৃত্তিকার আদ্রতা উর্বরতা।

নববর্ষের মহাধুমধাম হত মার্কিনীতে। রাত্রে খৃষ্টমাস গাছে আলোক সজ্জা করা হয়, আর তাতে সুতো বেঁধে মিষ্টি, খেলনা। ছেলেমেয়েরা তাই, তাঁচি দিয়ে কেটে নিতে সুরু করে। একে বলা হয় খৃষ্টকাটা। নৈশ ভোজনের পর খৃষ্টের নাম এক্ষরাতলায় জড়ো করা হোলে, মা বেগুলো ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেন। বেলজিয়ামে বছরের নতুন দিনের উৎসব সকালে বেলা। ছেলেরা চাবিতালা তোপাড় করে ওৎ পেতে থাকে। তারপর যখনই কোন ঘরে ঢুকলে, সে ঘরে তালা চাবি লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়ে ওরা ফোর করে মিষ্টি আদায় করে।

ফ্রান্সে খৃষ্টমাসের চেয়েও নববর্ষের উৎসব সমারোহে খুব বড়। এই দিনে ছেলেমেয়েরা পায় উপহার। রাস্তায় রাস্তায় চলে আমোদ-উৎসব। মধ্য-রাত্রে ঘুড়ি ওড়ে, কামে তালা ধরিয়ে দেয়। ঘরে ঘরে চলে ভোজ। আনন্দ উৎসব। স্কটল্যাণ্ডের উৎসবের মতো স্কটল্যাণ্ডেও এ আসে নবরস। এইদিন পরিবারের ছেলের আসে মিলনের মধু। এইদিনে ছেলেরা বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে বেড়ায়, তার বদলে পুরস্কার পায় আপেল, কমলা, কখনো বা হাতখেপনি। ইংলণ্ডেও এদিনে খুব উৎসবের ধুম। সকলেই সকলকে উপহার পাঠায়। ছেলেরা খৃষ্টমাস গাছ থেকে মিষ্টি ও খেলনা কেটে নিয়ে আনন্দ করতে থাকে।

জাপানে নববর্ষ উৎসবে অনেক পুরাকো আচার অনুষ্ঠান হয়। এইদিনে পাইনগাছের শাখা, সামুদ্রিক আগাছা প্রভৃতি দিয়ে ঘরগুলো সাজানো হয়। জাপানের সম্রাট এ সময়ে বছরের প্রথম স্নান করেন। এই উৎসবটী জাপানে ধর্ম-অনুষ্ঠানরূপে পরিণতি হয়েছে। তাঁদের বছরের নতুন দিন আসে জানুয়ারীর ছুড়ি তারিখ থেকে উনিশে ফেব্রুয়ারীর একটি রাতে। এইদিন ঘরে ঘরে চলে ভোজ ও উৎসব। মধ্যরাত্রির পরে সকলে করর স্থানে গিয়ে কবরের ওপর কাগজ ও পটকা ফোটায়। ইংরেজীর প্রথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নববর্ষের উৎসব চলে, তবে উপহার দেওয়ার কোন পদ্ধতি নেই। যথারীতি গির্জায় আরম্ভ হয় উপাসনা, গান আর ধর্মালোচনা—উপহার দেওয়ার প্রথা দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে।

...নববর্ষারম্ভে আমাদের আজ নূতন খাতার মহরৎ—অক্ষরারোপণ। চতুর্দিকে চলেছে আমন্ত্রিত ব্যক্তির ঘন উৎসবে যোগ দিতে নানা বিপণি কেন্দ্রে, অনেক গ্রামাঞ্চলে বসেছে মেলা। কিন্তু মেলায় আগেকার মত জাঁকজমক নেই কেননা আজ সাধারণ গৃহস্থ ক্রয়শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছে। কৃষকের ঘরে অন্ন আছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের অন্নাভাব, তাই উৎসব অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে—মেহেরাব হতাশায়। তবুও চলে উৎসব।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই আমরা যৌবন সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন তরী ভাসাইতে পারি। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের যে সহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের বিদায় দূর হইয়া যাইবে।'

কবিগুরুর এই বাণীকে তোমরা অন্তর দিয়ে অনুভব কর নববর্ষ দিনে, আর গ্রহণ করো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জাগরণী গান

শ্রীঅখিল নিয়োগী

(স্বপনবুড়ো)

চেয়ে দেখ ভাই আর রাত নাই শিশু-উষা পুবে জাগে
রঙীণ আকাশে বিহগেরা আসে জাগরণীসুর আগে!
বাজে মন্দিরা সোনার কাঠিরা টুটাও তন্দ্রা ঘোর—
বাদ্যের সাথে কারা ওই মাতে ভাঙেনি নিদ্রা তোর?
আয় দলে দল প্রাণ উচ্ছল সোনালী সূর্য্য করে
মুখে মৃদু হাসি দাঁড়া পাশাপাশি সবাকার হাত ধরে।
কে রবে পিছনে ডাক জনে জনে ডাক শতে,ডাক লাখে
কিশোরের দল হ'ল চঞ্চল আসরে প্রাবন জাগে!
অলস জীবন ক্লান্ত গমন আমরা চাহিনা ভাই
ঝটিকার ঝুটি করি নিরে মুঠি এগোবার গান গাই!
আয় ভাই বোন্ মোর কথা শোন্ শরীর শক্ত কর—
নদী কলতান করে আহ্বান জাগে বন মর্ম্মর!
ডাকিছে পবন ডাকে তরুগণ ডাক দেয় মেঘ দল
ডাকে গিরি শির সাগরের নীর ডাকে মাটী ঘরে চল!
রামধনু রঙ বাজায় মৃদং বরণার কলতান—
ডাকে সবে ভাই আর দেরী নাই সবে হও আগুয়ান।
ডাকিছে সবুজ ওরে ও অবুঝ তালে তালে ফেল পা—
নবীন উষায় নতুন ভূষায় নতুনের গান গা!
খেলাধুলা কর বসানা আসর বাঁচিবার মত বাঁচ
প্রাণেরপুলকে দ্যুলোকেভূলোকে সবারে জাগায়ে নাচ।
মিছে কোলাহল একতাই বল এই কথা জেনে রাখ
দলে মিলে ভাই কাজ করে যাই তাই প্রাণে বাজে শাঁখ
তুলি দলাদলি করি গলাগলি তুলিয়া দাঁড়াও শির
কর এই পণ করি প্রাণ পণ হবো হবো মোরা বীর।
জোরে সাঁতরাই বাহু যে বাড়াই তীর বেগে করি পথ
জলকলতান প্রাণেআনেগান পুরে যায় মনোরথ।
হাডুডু খেলায় প্রাণের মেলায় ডাকে তোরে খোলা মাঠ
শুধু খেলা গান প্রাণ অফুরাণ বলা না খেলার হাট।
কুটবল চাই? কোন ভয় নাই খেলোয়াড় সাথে সাথ
চারিদিকে খালি জোর করতালি উল্লাস মনোমোদ।
ব্রতচারী দল বাজানা মাদল সারে দাঁড়া ভাইবোন্
আছে কত পণ মানা অগণন কেউবল—কেউ শোন্।
জেনে রাখ ভাই লাঠি সাঁই সাঁই ঘোরাতে জানিলে ঘোরে
দুর্দিনে ভাই এই লাঠিটাই রক্ষা করিবে তোরে।
আছে দুই লাঠি ছোটও বেনেটি রুখিয়া যদি দাঁড়ায়
এক হাওড়ায় সবারে হারায় শত্রু নিপাত যায়।
কিশোরীর দল হাতে ছুরি চল শয়তানে কর নাশ্,
দেশে অভিলাষ সাধুর আবাস তোরাই পুরাবি আশ!
হবে মজবুত শক্ত অটুট্ সবাকার তনু-মন
নাহিরে শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা ডাকো সবে অনুখণ।
কর ভাই সাফ্ মনলা বেবাক ছোক দেহ নির্ম্মল
দেহ মাঝে মন অরূপরতন নেরে চিনে বীর বল।
খুব কসে খাবি মহাসে লাফাবি পালাবে রোগ বালাই
মনে হবে তোর গায়ে কত জোর মোর মত সুখী নাই!
দেহ মহাশয় সবই জেনো নয় যদি সেবা মানে সোধ
করে যাও ভাব হবেনা অভাব রবে মনে সন্তোষ।
স্বপনবুড়ো যে শক্তিরে খোঁকে চঞ্চল অনুরাগ
আসর বসাও খেলালিখেনাও গাও জাগরণী গান।

উপহার

শ্রীআশাবরী দেবী বি. এ

আশ্বিন মাস সবে শুরু হয়েছে। বর্ষা-ধোয়া পৃথিবী শরত-দেবতার মোহন তুলির স্পর্শে শোভাময় হয়ে উঠেছে। সুনীল আকাশে শুভ্র নবনীর মতো মেঘ রাজহংসের মতো চালকা গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। 'চাঁদের ভরা দীঘি-গুলিতে লাল নীল শ্বেত পদ্মের মেলা বসেছে। খুশীর ছাপ সর্বত্র বিরাজমান। মহাপূজার আর অল্পই দেরী। দুপুরের বিশ্রামের পর মা যখন উঠে সেলাই নিয়ে বসেছেন রুন্টু দৌড়ে এসে মার কোলে বসে পড়লো। মা অবাক হয়ে বললেন, "ও কি রে! ওঠ, ওঠ,—ছুঁচ ফুটবে! বড়ো

মেয়ের আবার কোলে চড়ার সাধ হলো নাকি ?" কণ্টু একটু লজ্জার হাসি হেসে বললে, "না মা শোনো—পিণ্টু কি বলছিলো জানো ? তুমি যেমন আমার, পিণ্টুর আর বাবার জন্মদিনে ভালো রান্না কোরে দাও, আলপনা দিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে চন্দন পরিয়ে খাইয়ে খেতে দাও, আর পুতুল নতুন জামা, বই উপহার দাও—আমরাও তেমন তোমায় দেবো মাগো !" বলেই লজ্জায় কণ্টু মার কোলে মুখ লুকালো। 'উপহার' কথাটা কণ্টু নতুন শিখেছে তাই গম্ভীরভাবে বলতে গিয়েও লজ্জা পেয়ে গেলো। মা হাসতে হাসতে বললেন—"সত্যি—পিণ্টু এতো কথা তোকে বলেছে ?" এবার কণ্টু ধরা পড়ে আরও লজ্জায় "যাও !" বলে মার কোলে আঁকড়ে রইলো। কণ্টুর বয়স ছয় বৎসর পূর্ণ হয়ে সাত আরম্ভ হয়েছে, আর ওর ভাই পিণ্টুর এই সবে তিন পূর্ণ হয়েছে—মুখের ভাষাই তার এখন আধ-আধো। এতো বড়ো প্রস্তাবটা সম্পূর্ণই আসলে কণ্টুর। ও স্কুলের বন্ধু সুনীতার কাছে শুনেছে যে তারা তাদের মায়ের জন্মদিনে মাকে উপহার দেয়—পিণ্টুকে দিয়েই বলাবে ভেবেছিলো কণ্টু, যে মায়ের জন্মদিনটা কবে ? তা পিণ্টুটা জন্মদিন ও উচ্চারণ করতে পারে না—উপহার

মাগো—বলো না কবে তোমার জন্মদিন ?

কথাটাও ঠিক করে বলতে পারে না। এখন মাকে বলতে এসে এতো লজ্জা করছে কিন্তু জন্মদিনের কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই হবে যে ! "ওমা মাগো ! বলো না কবে তোমার জন্মদিন !" মা এবার আদর করে মেয়ের মুখ তুলে ধরে বললেন, "তুমি আমার ছোট্ট মা—জানো না কবে আমার জন্মদিন ?" আদরে গলে গিয়ে কণ্টু বললো—"বলো না মা ?" "বিজয়া—দশমীর দিন !"

বিজয়া-দশমীর দিনটিতেই হলো মায়ের জন্মদিন—তাহলে তো এসে পড়লো ! কণ্টু আঙুলে গুণে হিসেব করে দেখে—তাহলে আর দুদিন পর চতুর্থীর দিন ওদের ছুটি হচ্ছে স্কুলের। তবে তো মাকে আর মাত্র পাঁচটি দিন। কি করা যায়। মায়ের জন্মদিনে উপহার দিতেই হবে—উৎসব করতেই হবে। ছাদের একপাশে ওদের একটু আড়াল দিয়ে মা খেলাঘর করে দিয়েছিলেন। কণ্টু ভাইকে সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ভাইটি ! তোর তো কিছুই ভাবনা নেই দেখছি। আমাদের জন্য কি সুন্দর পূজার জামা এসেছে দেখছিস তো ? মার জন্মদিন আর তিনটি দিন মাত্র বাকী। আমি একা আর কতো ভাববো—বল্না কি উপহার দেওয়া যায় মাকে ?" পিণ্টু চোখ বড়ো বড়ো করে গালের লাটিটা রেখে দিয়ে বললে, "ছত্তি দিদি ভাই, মাল, বাবাল ছব উপহাল চাই এম্নি—" "দূর বোকা ছেলে ! বাবার এখন না—সে সেই ফাগুন মাসে, পাগলামী করিস না—শোন আমার তো জমানো পয়সা এই ঘরেতে—গুণে !" বলে কণ্টু তার ছোট্ট বাক্সটা খুলে উল-গোলা পাকাতে শেখার জন্য চার আনা, ছুঁচে সুতা পরাতে পারার জন্য দু আনা, ফার্স্ট বুক শেষ করার আট আনা ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলো···দু'টাকা ছআনা জমেছে। পিণ্টু ও দেখাদেখি গম্ভীরভাবে নিজের "টিপি"র বাক্সটি নিয়ে এলো। সেটি খুলে কণ্টু দেখলো কতকগুলি নানান্ রঙের খড়ি, দু তিনটি পেনসিল্, গোটা কতক পেরেক, খানিকটা দড়ি, তিনটি ছোট খালি শিশি, কয়েকটি ছেঁড়া রঙীণ ছবি—একটি অর্ধেক-চাটা আমের আঠার ইত্যাদিতে বাক্স বোঝাই—মোটে ভালো বন্ধ হয় না। একটি ফুটো পয়সাও পাওয়া গেলো। কণ্টু তো হেসে আকুল—তার হাসিতে বিরক্ত হয়ে পিণ্টু সব জিনিষ আবার বাক্সে তুলে রেখে দিয়ে এলো।

দেখতে দেখতে আনন্দের দিন কটি ছ হু করে কাটতে লাগলো। মহাঅষ্টমী এসে পড়লো। পূজার আনন্দে বাড়ীতে বাড়ীতে সাড়া পড়ে গেলো। কণ্টুর এখনও "উপহারে"র যোগাড় হয়নি। মাকে হঠাৎ সে লজ্জায়

বলতে পারছে না। মাকে হঠাৎ আশ্চর্য করেই দিতে সে চায়। একমাত্র ছোট্ট ভাইটি ছাড়া আর কাকেই বা মনের কথা বলবে? ঠাকুর দেখে এসে বিছানার ওপর সন্ধ্যাবেলা আধঘুমন্ত ভাইকে ঠেলা দিয়ে রুণ্টু বললে, "শোন পিণ্টু, আমি ভাবচি মাকে গলার হার দেবো। আচ্ছা মাকে বাবা বলেন হার পরোনি কেন গলায়?—মা বলেছে কেটে গেছে।—জানিস্ কাল জগন্নার সঙ্গে গিয়ে ঐ মোড়ের দোকান হতে আমরা হার আনবো—কেমন?"

পরদিন মহানবমীর দিন রুণ্টুর একটু শরীর খারাপ হওয়ায় মা তার কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবা যেন কোথায় গেছেন। পিণ্টু ঘুণাক্ষরেও সারা দুপুর। ঘরের এক কোণে বসে খেলা করছিলো। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো সেই রাতে দিদি বলেছিলো মোড়ের দোকান

এখুনি হার আনা যাবে

হতে জগন্নার সঙ্গে গিয়ে হার আনতে হবে মার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে হাসিভরা মুখে পিণ্টু উঠে পড়লো। দিদি বেচারীর শরীর খারাপ—ও একাই যাবে আনতে জগন্নার সঙ্গে—কতো খুশী হবে দিদি। কুটো পয়সাটা হাতে নিয়ে পিণ্টু নীচে নেমে এলো—আরে জগন্না কই? দোর যে খোলা! খোলা দরজা দিয়ে পিণ্টু পথে নেমে এলো—ঐ তো মোড়ের দোকান দেখা যাচ্ছে—এখুনি এই পয়সা দিয়ে হার কিনে নিয়ে চলে আসা যাবে। পিণ্টু গটগট করে এগিয়ে গেলো—দুমিনিটের মধ্যেই সমস্ত পথ কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। দিশেহারা হয়ে পিণ্টু রাস্তা পার হতে যেতেই একটি মোটর একেবারে পিণ্টুর ওপরে এসে পড়লো। দুধারে রাস্তার লোকে "হায় হায়—গেলো গেলো!" করে উঠলো। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক কষে ছোট্ট ছেলেটিকে বাঁচিয়ে ফেললো! মোটরের দরজা খুলে একটি প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা বিবর্ণ মুখে নেমে এসে অজ্ঞান পিণ্টুকে বুকে তুলে নিলেন—বেঁচে আছে—আঘাত লাগেনি—ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলো! মোটর ছেড়ে দিলো।

বিজয়া-দশমীর হাসি-অশ্রু মাখা প্রভাত। পিণ্টুদের বাড়ীতে শোকের কালো ছায়া সব আনন্দ-কোলাহল ঢেকে দিয়েছে। পিণ্টুর মা মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। রুণ্টুর কাঁদ-কাঁদ স্বর বেড়েছে। পিণ্টুর বাবার অবস্থা পাগলের মতো—বারে বারে পুলিশের কাছে টেলিফোনে খবর নিচ্ছেন।

পিণ্টু ভীষণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে জ্ঞানহারা হয়েছিলো—তার অনিষ্ট কিছুই হয়নি। স্নেহ-করুণ দৃষ্টিতে সেই বিধবা পিণ্টুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই পিণ্টু চোখ মেললো—অস্ফুট স্বরে বললো—"মাগো উপহার পেয়েছো?" শুনে তিনি মাথা নীচু করে বললেন—"কি বলছো নাণিক?" এবার পিণ্টু উঠে বসলো—অনর্গল বলে গেলো মার কথা, দিদির কথা—সব। শেষে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললো, "তুমি কে—আমি তোমায় চিনতে পারি না—একটা উপহার দেবে? এই নাও পয়সা!" বলে পকেট হতে পয়সাটি তাঁর হাতে দিলো। তিনি হেসে সেটি নিয়ে বল্লেন—"আমি যে তোমার দিদি হই ভাই!"

আজ বিজয়া-দশমী রুণ্টুদের বাড়ীও বিসর্জনের সুরে ভরে উঠেছে। রুণ্টুর ঘর কম, মার কাছে বসে কতো কথাই ভাবছে। একমাত্র ছোট্ট ভাই কোথায় গেলো—কি হলো। বুক যেন ফেটে যায় মার কান্না দেখলে।—আজ মার জন্মদিনে তারা ভাইবোনে কতো আনন্দ করবে ভেবেছিলো—সহসা চিরপরিচিত মধুর কলকণ্ঠের শব্দ এলো কানে—মোটর থামলো যেন একটা! ঐ তো ছোট্ট সোনার ভাই পিণ্টুই তো! তার গায়ে সুন্দর নতুন পোষাক ঝলমল করছে···এক মুহূর্তে সমস্ত আলোগুলি যেন

উচ্চতর হয়ে উঠলো। পিণ্টু পিণ্টু—কোথা ছিলি দুই ভাইটি? ফণ্টু জড়িয়ে ধরলো ভাইকে। পিণ্টুর মা আনন্দে ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে পিণ্টুর নতুন দিদিকে প্রণাম করে বললেন—"আমার আজ জন্মদিন সার্থক হলো মা পেয়ে—ছোট্ট বয়সে আমি মাহারা।"

"দিদিভাই! এই উপহারটা মাকে দে—আমার

পিণ্টু মাকে শুধু ছোট একটি চুমো দিলে

পয়টাটা দিয়ে এই হার কিনেছি দিদির কাছেকে—নে।" ফণ্টুর হাতে একটি সুন্দর নেকলেসের বাক্স দিয়ে ফণ্টু মাকে হার পরানো হলে—পিণ্টু মায়ের কোলে উঠে শুধু ছোট্ট একটি চুমো দিলে।

অতি চালাকের গলায় দড়ি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

এখন যেমন বাড়ীর জন্যে সহজে চাকর বাকর পাওয়া যায় না, তখনও ঠিক তেমনটি ছিল। যুদ্ধের বাজার। অনেক বাড়ীর চাকর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বড় ঠিকাদার হয়ে গেল। অনেকে আবার বোমার ভয়ে কোলকাতা ছেড়ে পালাল। তাই ব্যোমকেশবাবু যখন হাওড়া ষ্টেশন থেকে একটি ১৯।২০ বছরের ছেলেকে ধরে নিয়ে এলেন, তাঁর গিন্নীর আর আনন্দ দেখে কে?

ছেলেটি দেখতে বেশ। স্কুলে কিছু লেখাপড়াও করেছিল। বাড়ী মেদিনীপুর আর উড়িষ্যার সীমারেখায়। তাই বাঙালীরা তাকে ওড়ে বলত, আর উড়িয়ারা ডাকত বঙ্গাল বলে। সে যাই হোক, ব্যোমকেশ-গিন্নী জীবনে এমন চাকরের আর সাক্ষাৎ পান নি। না বলতেই সে সব কাজ করে ফেলত। বাজারের কি-কি জিনিস আনতে হবে গিন্নীমাকে কিছু বলতে হত না। সেই বরং অনেক কিছু আনার কথা গিন্নীমাকে স্মরণ করিয়ে দিত। কয়লা, তেল, রেশান সবকিছুই ঠিক ঠিক সময়ে সে জোগাড় করত। যুদ্ধের বাজারে এসব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যোমকেশবাবুও হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু গোল বাধল একদিন। ব্যোমকেশবাবুর হঠাৎ একদিন অসুখ করে বসল। চাকরটি ডাক্তার ডাকল, ওষুধ আনল, বেদানা আঙুর কিনল। তারপর বিকাল বেলায় গিন্নীমার মুখখানা চিন্তিত দেখে সে তাঁর কাছে দুটো টাকা চাইল। গিন্নীমা জিজ্ঞেস করলেন—'কেন?'

খুব বিমর্ষ কণ্ঠে সে বলল,—'রাত্রে ব্ল্যাক আউট্ হয়, কোথাও যাওয়া যাবে না। কর্তার যদি কিছু হয়, একটা খাটিয়া এনে রেখে দিই বেলা থাকতে।'

এই কথার পর যা হবার তাই হল। গিন্নীমা তক্ষুণি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সে বোধহয় বুঝতেও পারল না কেন গিন্নীমার এত রাগ হ'ল।

ভাগ্যিস

স্নেহকণা বসু

ও এলো গটমট করতে করতে—হেলতে দুলতে—গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে। ওর পেছন পেছন ওরা—রোগা—মোটা হাড়জিরজিরে, দাঁত কোকসা—ন্যাড়া সাদা কালো বাদামী—সবাই একে একে। সার বেঁধে কলকল করতে করতে।

ব্যাপার কিরে বাপু! চোখটা ভালো করে রগড়ে নিই। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যে দায় হোল।

আরে আরে এদিকেই যে আসছে। কি মনে করে কে জানে?

আমার কাছে কেন বাবা? আমার মত ত অনেক রয়েছে। যাওনা তাদের কাছে। আমি ত চুনোপুঁটি।

না-না—তোমাকেই আমাদের প্রয়োজন। তোমার কাছেই আমাদের অভিযোগ পেশ করবো। আর যা হোক একটা ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

নাও ঠেলা। এদের আবার অভিযোগ। ওরাও শিখেছে দাবী পেশ করতে।

বেশ বলেই ফেল! না শুনিয়ে ছাড়বে না যখন। আর দেরী করা কেন? হুঁ হুঁ তাড়াতাড়ি—দেরী হ'লে আমার বাপু আর ঘুম আসবে না।

প্রথমটা একটু ইতস্তত করলো। তারপর তাকালো সংগীদের পানে। অর্থাৎ বলি তা হ'লে।

হাঁা হাঁা তুমিই বল! তোমাকে যখন নেতৃত্বে বরণ করেছি, তখন তুমি ছাড়া আর কে আছে আমাদের?

'ও' সুরু করলো। প্রথমে একটু আস্তে, আস্তে,—তারপর ঠিক পাকা নেতার মতো। দেখ, তোমাদের অত্যাচারের শেষ নেই। কেন রে বাপু, আমরা নিরীহ আর তোমরা বুদ্ধিমান মানুষ বলে?

অত্যাচার? অত্যাচারটা কি করা হয় শুনি?

ফোঁস করে প্রতিবাদ করলুম। অত্যাচার ছাড়া আর কি বলবো বলো? রাত নেই, দিন নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, সব সময়ই আমাদের খাটতে হবে। দিনান্তে তোমরা অফিস থেকে এসে বিশ্রাম করো কিন্তু আমাদের দাও একটু সময় বিশ্রাম করার মতো। যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই খাটিয়ে নাও। শরীর খারাপ করলেও কি রক্ষে আছে! যেখানে সেখানে দাও পেরেক সেঁটে।

আরে ও ত রোগ সারাবার ওষুধ। আমাদের দেখনি ডাক্তারের ইনজেকসান দেয়।

ওই বলেই ত চালিয়ে আসছে এতদিন। আর কি ওই কথায় ভুলি? তোমাদের বুলিই এখন একমাত্র ভরসা। ওতে আর মন ভেজে না।

কতটুকু সম্মান করো আমাদের। যেখানেই যাও, সংগে নিয়ে যাও ঠিকই, কিন্তু রাখ কোথায়—না, দোরের বাইরে। একান্ত অনাদরে। নিজের বাড়ীতেও কি এতটুকু সম্মান দেখাও? দরজার বাইরে হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের রাত কাটাতে হয়। কোন কোন দিন আবার শিয়াল কুকুরের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়।

কতটুকু মায়া তোমাদের, আমাদের ওপর?

তোমরা যখন বুড়ো হয়ে পড়ো, তখন তোমাদের পেন্সন দেওয়া হয়। আর আমরা যখন বুড়ো হয়ে পড়ি, তখন আমাদের তোমরা কি দাও? না ছুড়ে ফেলে দাও ডাস্টবিনে। এতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেহপাত করলুম যাদের সেবায়—সেই তোমরা—হৃদয়হীন—বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই ছুড়ে ফেলে দাও, রাজ্যের নোংরার ওপর। বেশ তোমাদের বিচার।

সাংঘাতিক ব্যাপার দেখছি। এ সব কথা এদের শেখালেই বা কে?

শেখাবে আবার কে? আমরা এখন নিজেরা বুঝতে শিখেছি। বুঝেছ?

আর শোন, (এ যে রীতিমত ধমক'নি দেখছি) এই সব অত্যাচারের প্রতিকার যদি না করো, তাহলে দেখবে, আমরা শিগ্‌গিরই বিদ্রোহ ঘোষণা করছি। আজকে চলি, কেমন?

হাঁা যাও। সরে পড়ো দেখি আস্তে আস্তে।

* * *

: ও সেজদা সেজদা। চা জুড়িয়ে গেল যে—

তাই তো ধড়মড় করে উঠে বসি। বেলা যে অনেক হয়ে গেছে। এক্ষুণি যে আবার বাজার যেতে হবে।

গত রাত্রের কথা মনে পড়লো।

জুতোর দিকে আড়চোখে চেয়ে, পা গলাতে গিয়ে দেখি ঢুকতে চাইছে না। ব্যাপার কি? তাহ'লে কি ওরা সত্যিই বিদ্রোহ ঘোষণা করলো?

তারপর ভালো করে চেয়ে দেখি—আরে ধাঃ, ওটা যে ছোট ভাইটার জুতো।

ষ্টীম্ ইঞ্জিন

শ্রীসত্যগোপাল পাল

কেটলিতে চায়ের জল বসিয়েছেন মা। এক কোঁটা ফুটফুটে ছেলে তাঁর বসে আছে উনানের ধারে।

টগবগ ক'রে ফোটে কেটলির জল। জলের ভাপগুলি ধাক্কা মারে, আর তা'লে ঢাকনা নেচে ওঠে কেটলির ঢাকনা। এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই নাচন দেখে বালক। মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়ে ভরে ওঠে তার মন।

নাচনটা বন্ধ করবার জন্ম একটা চামচ দিয়ে চেপে ধরে সে ঢাকনাটা। বার বার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই হয় না। বাষ্পের প্রচণ্ড ধাক্কায় উল্টে যেতে চায় কেটলির সেই ঢাকনা। বাষ্পের ভীষণ চাপে হাত সরে যায় বালকের। বাষ্পের সেই উন্মত্ত বেগকে কোনোমতেই কুলায় না তার।

আপন ভোলা হয়ে বালক মনে মনে ভেবে চলে কত কথা।—'ধোঁয়ার মত উড়ে যায় যে বাষ্প, তার শক্তিতো কম নয়! বেকুব বনে গেলাম আমি তার কাছে!'

পরক্ষণেই এক খেয়াল চেপে বসল তার মাথায়।—'হাঁ, বেশত! বাষ্পের এই শক্তিকে মানুষের উপকারে লাগাতে পারলে মন্দ হয় না। কি ক'রে করা যায় তা?...'

সেই হতে বালক কেবল ভেবে চলে বাষ্পের সেই শক্তিকে কি করে সে মানুষের উপকারে লাগানো যায় সে কথা।

দিন যায়। বছরের পর ঘুরে আসে আবার বছর। ছোট এতটুকুন ছেলেটি ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে ওঠে। লেখা পড়া শেখে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও কোন দিন তার মন থেকে মোছে না বাল্যের সেই স্বপ্ন। বাষ্প দিয়ে কি ক'রে যে কি করা যায় জীবনে এটাই তার এক মাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বছরের পর বছর এত ভাবনা-চিন্তা আর অসাধারণ বহু চেষ্টার পর বড় হয়ে সেই বালক একদিন সত্যি সত্যি সফল ক'রে তুলল তার ছেলেবেলার স্বপ্নকে। বাষ্প-শক্তিকে মানব কল্যাণে প্রয়োগ করবার উপযুক্ত একটি কল তৈরি ক'রে বসল সে। নাম দিল তার ষ্টীম ইঞ্জিন। বাংলায় বলে বাষ্পযান।

যে ছোট্ট ছেলেটি তার বালোর সেই স্বপ্নকে বড় হয়ে এমন সত্যে পরিণত ক'রে তুলল, নাম তাঁর জেম্‌স ওয়াট। ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স আবিষ্কার করেন তাঁর জগৎ বিখ্যাত ষ্টীম ইঞ্জিন।

ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের কত উপকারে যে আসতে লাগলো তার অন্ত নেই। কারখানায় কারখানায়, খনিতে খনিতে এই ইঞ্জিনটি মানুষকে রক্ষা করতে লাগলো মানুষের হাড়ভাঙা খাটুনির হাত থেকে। ধন্য হলেন জেম্‌স। সত্য হ'ল তাঁর স্বপ্ন। সার্থক হল তাঁর সাধনা।

নিমিষের মধ্যে চোখের সমুখ দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে দানবের মত কেমন ছুটে চলে রেলগাড়ী। এর ঝাঁকুনির দাপটে চমকে ওঠে বুক। আগে কিন্তু এমন ছিলনা। তখনকার রেলগাড়ী তো নেহাৎ ছিল খেলাঘরের জিনিষ। —মোষের গাড়ীর মত টিপিটিপি চলতে চলতে সারাদিনই সময় চলে যেত তার।

১৮২৯ সাল। ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের বহু বছর পরের কথা। ইংলণ্ডের আর একজন বালক, নাম তার জর্জ ষ্টীফেনসন্। মাঠে মাঠে মোষ চরানোই ছিল তার কাজ।

তোমাদের মত তাকেও একদিন হঠাৎ ভাবনায় ধরলো নতুন আবিষ্কারের। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর জেম্‌সএর সেই শক্তিশালী ষ্টীম ইঞ্জিনকে রেলগাড়ির সংগে জুড়ে দেওয়ার এক অভিনব ফন্দি বার করল রাখাল বালক জর্জ। রেল ইঞ্জিনের আসল রূপকে পাল্টে দিয়ে তার জন্য নতুন ক'রে ইঞ্জিন তৈরি করতে হ'ল জর্জকে। তার সেই ইঞ্জিনের নাম লোকোমটিভ।

জর্জের লোকোমটিভ আবিষ্কারের ফলে জেম্‌সের ষ্টীম ইঞ্জিনের প্রয়োজন বেড়ে গেল বহুগুণ। বাষ্পের শক্তিকে মানব কল্যাণে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে বালক জেম্‌সের স্বপ্ন এতদিন পরে সত্যিকারের সার্থকতায় পরিণত হ'ল। মোষের মত দীরগামী রেলগাড়ী জেম্‌সের ষ্টীম ইঞ্জিনের টানে ছুটে চলল সহস্র সহস্র ঘোড়ার মত দুরন্ত বেগে।

দিন দিন মানুষের বুদ্ধি বেড়েই চলে কেবল। মানুষ আবিষ্কার করে নিত্য নতুন জিনিষ। মানুষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার কবলে পড়ে এমন যে অভিনব ষ্টীম ইঞ্জিন, লোকোমটিভ—এরাও সব বাতিল হতে চলেছে। ফ্যারাডে এডিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় বৈদ্যুতিক শক্তিতে রেলগাড়ী এখন ছুটতে সুরু ক'রে দিয়েছে আরও দ্রুতবেগে—আরও অনেক সহজে। তোমরা বোধহয় ইলেকট্রিক ট্রেণে চড়তে সুরু করে দিয়েছ। এখন বাষ্পীয় রথের বদলে বৈদ্যুতিক রথ চলতে সুরু করেছে, এর পর হবে এটম রথ। ভবিষ্যতে মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক হয়ত এমন নতুন কৌশল খুঁজে বের করবে, যার ফলে মানুষের জীবন যাত্রার কণ্টকাকীর্ণ পথ অবলুপ্ত হয়ে পুষ্পাচ্ছাদিত পথে পরিণত হবে, আর নেমে আসবে পৃথিবীতে স্বর্গ। তোমরা দেখছ তো আজ বিজ্ঞানের বলে আকাশে গ্রহ তৈরী করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমরাও বড় হ'য়ে এভিধারা নব নব আবিষ্কার করে পৃথিবীর কল্যাণ করবে, এর জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হও।

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিপদ এই যে কাশ্মীরের যে কোনও জায়গায় যাওয়া যায় না কেন আমাদের অনুরক্তিসিক্ত চোখে যেন মায়ার তুলি বুলিয়ে দেয়। নতুন কিছু নয়: সেই পাহাড়, ঘুম, ঝর্ণা, গাছ আর ফুল। কিন্তু তারই মধ্যে বৈচিত্র্য। স্ত্রীলোক তো ধানিক মানে, খানিক ধৈর্য্য, খানিক সজ্জা, খানিক প্রসাধন—কিন্তু প্রতিটী রমণীই কি এক? তেমনি এই শ্রীনগরের আশে পাশে প্রতিটী দর্শনীয় স্থান আপন মাধুর্য্য মহিমায় আপনি সমাকুল। এই যে কাশ্মীরের আকাশ—এতে মেঘের খেলাই কতো রকমের দেখেছি। সব চেয়ে ভালো লাগতো প্রভাতে এবং সন্ধ্যার আকাশে stratus মেঘের ছেঁড়া বাহার, যেন কূর্মপৃষ্ঠের সোণা সোণা দাঁড়ির নিশানার আবডালে দেব দবিত্তার হিরণ্যাভাতি। আবার ঐ আকাশেই তলায়-দাঁড়ি টেনে উর্দ্ধে পিরামিডের মতো স্ফীত হয়ে উঠেছে দেখেছি রাশি রাশি cumulus মেঘ। তার চূড়ায় যখন অস্তরবির আভা পড়ে সোনা ঢেলে দিতো, ঢেলে দিতো কমলার বাহার, চাইতাম দুইদল বিলাসিনীর দিকে,—আকাশ থেকে আকাশে ঘুরছে মেঘের দলের দিকে, আর ঘর করা বৌএর মতো দাঁড়িয়ে থাকা তুষার শৃঙ্গগুলির দিকে। ওদের গায়েও সোনার বাহার তাচ্ছিল্যের নয়। কিন্তু যখন ঘনঘটা করে পাকিয়ে পাকিয়ে আসতো Nairbus তখন বাচ আর এলমের মাথায় লাগতো পাগ্‌লে-যাওয়া মাখানাড়ার ধুম। রাতের আকাশে দেখেছি cirrocumulus এর গুঁড়োয় গুঁড়োয় ছড়িয়ে রূপোর গুঁড়ো, সারা আকাশ ছুড়ে থেকেও বাতাসের পথে জড়ো হয়ে স্রোতের জলে ভাসা ফুলের মত লহরী বন্ধন করে রেখেছে। কাশ্মীরের আকাশই যখন এতো রকম সাজতে পারে কাশ্মীরের বনভূমির তো কথাই নেই।

সেই আখরোট, এ্যাশ, বীচ, পপলার, বার্চ, দাইকামোর, এলম্, দেওদার, পাইন, ওক, ফার্, অশ্ব কিছু নয়। চীনার তো সর্বত্রই। যেখানে চীনার তার বিশাল বপু নিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য করেছে সেখানে অন্য সব গাছ তো নিতান্ত প্রজা। আখ্‌রোট গাছটার বাকল দেখছিলাম এক লক্ষ্যে। বেণু আর বিসেন্ শর্মা কোথায় মিলিয়ে গেছে জানি না। এক পাশে দাঁড়িয়ে রুক্মিণী ছবি আঁকছে। ভর্ত্যাও ছবি আঁকে। বিবি হাস্যমুখ যুবক, আর্টিষ্টের জাবাল্ বুদ্ধি আর আত্মভোলা ভাবটী আছে। পাশে এসে দাঁড়ালো, দেখছেন কি নিবিষ্ট মনে? সিমলে জগজীবন দাঁড়িয়েছে।

"দেখো আখরোটের গুঁড়িটা। কি পুরোনো গাছ। হাট যদি কেটে দুভাগ করা যায় তার ভেতরে মোটা মোটা পেশীর-তারে লালের মতো একটা রাঙা সৃষ্টি করে রেখেছে দেখতে পাবে। আখ্‌রোটের বাকলের গায়ে তাই ঘুমের আক্ষর। প্রত্যেক উঁচু উঁচু বুননের জায়গা-গুলো খোল শক্ত হয়ে আছে। চোখের মতো গভীর লম্বাটে গর্ত সৃষ্টি করেছে। যত গভীর তত পুরোনো গাছ। এ গাছটাকে চিনবে না বলতো, এটা এখনও বাড়েনি। এগুলো আরও উঁচুতে একটু বরফের জায়গায় ভাল হয়। মোটা নৈলে তো কাজই হয় না। ছোড় গাছ। ভূর্জপত্র বলে সংস্কৃতে। ইংরাজী-বার্চ। একেবারে তেলালো গায়ের বাকল্, মাঝে মাঝে আড়া আড়ি খড়েরি রেখা। ওপরটা মতো সাদা, নেপথ্যে ছেতরটায় একটু গোলাপী মিশ্রিত পরেরী আভা: প্রায় গৈরিক বলা চলে। অনেকটা পপ্‌লার গাইট। তবে পপ্‌লারের বাকল এতো

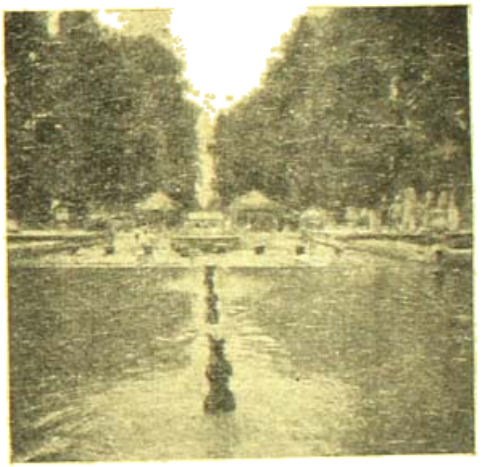

শালামার

খসে পড়ে না পড়তে পড়তে। বার্চের বাহার এর এই কাগজের মতো পরতে। বীচ্ কিন্তু তা নয়। চলো, ঐ দিকে একটা বড় বীচ্ দেখতে পাচ্ছি। এর সব ডাঁশগুলো ওপরদিকে নানা ভঙ্গিতে উঠেছে। বাকলের গঠন তাই আড়াআড়ি নয়, লম্বালম্বি, আর তাই এ দিয়ে শক্ত লাঠি, ডাণ্ডা হতে পারে। তবে ওকের মতো নয়। ওক ভারী শক্ত গাছ। দাইকামোর আর এ্যাশ গাছ আমার প্রিয়। অ্যাশ এই জন্যে যে ক্রিকেটের ব্যাট হয়, আর দাইকামোর এই জন্যে যে ওয়ার্ডসবার্থ দাইকামোর নিয়ে গান গেয়ে গেছেন। এদের চেনা শক্ত নয়। লম্বা তো বটেই, পাতাগুলো ছুঁচলো, তা ছাড়া বাকলের গায়ের ফাটল কেমন ঘন, বৃত্তসংবদ্ধ, গেঁথা-গেঁথি। দেখলেই মনে হয় তার-নই। পাইনের এতো বিক্রম দেখছো,

ওর আর আগের কাছে কিছু নয়। বড় বড় চাকা চাকা ঝাঁকের মত থাকল। গাছ দেখতে বড় ভাল লাগে আমার। এই যে সরল গাছগুলো দেখছো, টীনার, এর চেয়ে এতো বিটম, এতো ছেড, উনি আলাদা ছাড়া আর কিছু নয়। ফাটোন, দেখছো ডালা টক্ টক্ করছে ছেড়েটা —না গাছের পর আর হোলো না। অমিত ছোটো মেয়ে এসে গেছে। যেখানে আছো জমিয়েছে। চলো। এবার যাচ্ছি শালীমার, সেখান থেকে বিশাল।"

জিনপথ থেকে শালামার দশ মাইল। চশমাশাহির খানিক ওপরেই শালীমার।

মামরা শালীমারে এলাম। কাশ্মীরের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় উদ্যান

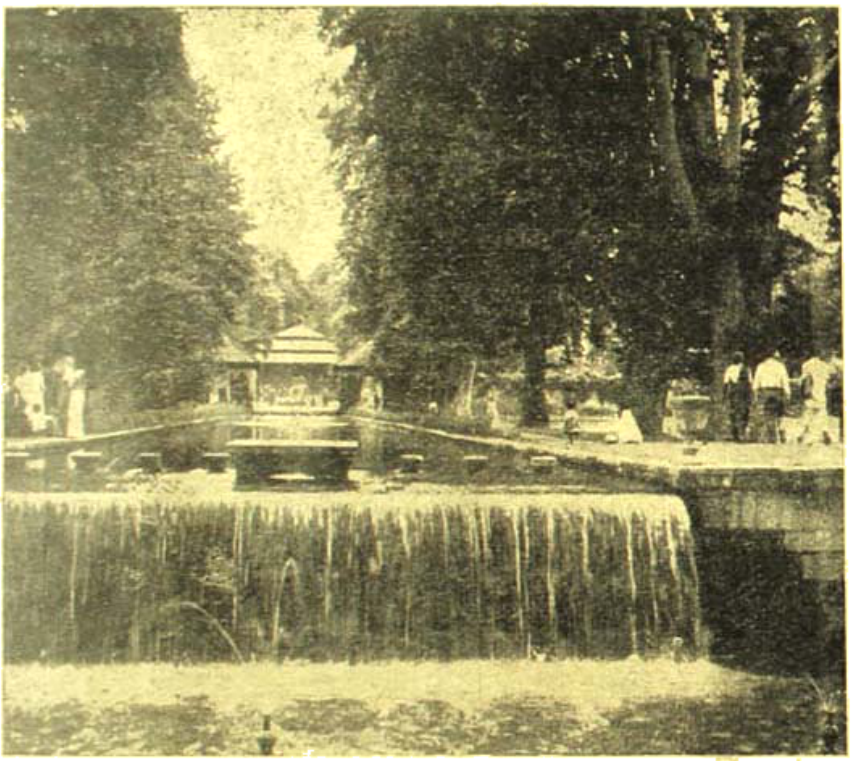

শালামার—অন্তরিক

এই শালীমার। রাজ্ঞী নূরজাহানের সবচেয়ে ওস্তাদি ছিল যে উনি ওঁর মানেজকে চিনতেন, বুঝতেন। ওস্তাদি মেয়ে দুইই বিবুধী বুদ্ধিমতী হোন্ প্রথম নজর তাঁকে বুঝতে হয় যে তিনি রমণী এবং রমণীত্বই তাঁর শোভন উপকরণ। প্রভাবিনী শক্তি ও সাম্রাজ্ঞী প্রতিভা ছাড়া ললনার সমস্ত লালিত্য ব্যর্থ পণ্ডশ্রম। লোদাবংশের তা জানতেন, সুরপাত্রা তা জানতেন, চিতরক্ষিতা তা জানতেন, কষ্টিপি জানতেন—আর এই নূরজাহানও। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের বুদ্ধি আর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে রাজ্যভার ওঁকে দিয়েছিলেন—একথা যে বলে সে ঐতিহাসিক হতে পারে, কিন্তু মানবচরিত্রকে এড়িয়ে গিয়ে। আসলে জাহাঙ্গীর সভয়ে বিশ্বাস করতেন নূরজাহানের ত্রিভুবনবিজয়ী লাস্য ও ললাকলার কারুকার্যে। কাশ্মীরে এসেই স্ত্রীরত্নী অনুধাবন করলেন বাদশার মন বাঁধা পড়েছে এই স্থানটীর মহিমা চাক্ষুষ করে। তাঁর কাশ্মীর শ্রীতিকে ভটাক্ষ করে সম্রাজ্ঞী বলেন,—"সারা হিন্দুস্থানের পাদশা, বাঁধা পড়লেন একখানি পাহাড় ঘেরা জলের ইশারায়? এ নিয়ে যদি হলে হিন্দুস্থান থাকবে কোথায়?

স্মিতমুখে জাহাঙ্গীর বলেন,—"শুধু কাশ্মীর যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি দুনিয়ার সেরা বাদশাহ।"

বাদশাহকে খুশী করতে কাজেই নিজে ফাঁদলেন এক বাগানের বন্যা, সেটা প্রমোদ উদ্যান নয়। প্রমোদ-উদ্যানে যে আধার প্রমোদিনীরা থাকবেন! তা হবে না। জাহাঙ্গীরকে নূরজাহান স্ত্রীলোক দিয়ে বিশ্বাস করেন নি কখনও। বাগানের মধ্যেই বাসঘরী হোলো। রাজসভা হোলো, কাছারি হোলো, স্নান-ঘর, প্রাসাদ। বাগান তার আনুসঙ্গিক। সে এক অভিনব প্রমোদশালা—কাম্—রা জ ঘ র বা ড়—কা ম্—রাজভবন। এর সন্ধার পুরোপুরি সাবাসী নূরজাহানের প্রাপ্য। প্রসিদ্ধ হিন্দুবস্তির পরিহাসপুরের বিষ্ণুমন্দিরের সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তর নির্মিত কারুকার্যের ধরণ দিয়ে তিনি সিংদ্বার তৈরী করেন। রাজ দরবার আর প্রাসাদ আধা-মোড়া মর্মর মণ্ডিত। বারান্দায় ছিল সোনার মোড়া। চারিধার ঘিরে প্রকৃতির সোভা দেখো ছেড়ো। এখানেই লেখা হয় সেই প্রসিদ্ধ কবিতা, যা শাজাহান পরে উৎকীর্ণ করেন দেওয়ান-খাসের মাথায়—

অগর ফরদৌস রবরুয়ে জমীনস্ত
হমীনস্তো হমীনস্তো হমীনস্ত্

এ হোলো ১৬১৯ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার। পরে-ইয়োশিয়ানরা এসে এই মর্মর প্রাসাদে বাস আরম্ভ করেন। অসুবিধা হয় বলে একটা দিকে যেখানে ঝুলে যেওয়া হয়, খালের মুখ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে তাতে। সোনার চিহ্নমাত্র নেই! সব লুট হয়ে গেছে, লুট হলনি শালামারের উপবন, তার নিসর্গ সৌন্দর্য। ধাপে ধাপে ঝর্ণা নেমে আসছে নানা ঢঙের তরঙ্গমালা সৃষ্টি করতে করতে। সমস্ত বাগান সেই জলের কলতরঙ্গে মুখরিত। আর থরে থরে ফুল। প্রাণ-সম্পদ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে মালীরা। ফোয়ারার জল এক এক ধাপে এসে করে পড়ছে, আর নানা আকারের জলাধার রচনা করে সারি সারি আলোর ব্যবস্থা আর কোয়ারার ব্যবস্থা। নন্দন-কানন তো দেখিনি, তবে শালামারের ঐশ্বর্য অতুলনীয়।

কিন্তু ঐ মোর। বড়ই মানুষ, বড়ই ভীড়। তুমি আর আমি কাছাকাছি নই। এমন কি আমাকেই আমি পাইনা, এতো লোক, এতো কথা, এতো রকমেই বিস্তর। মানুষ যেন মানুষকে সমস্ত প্রকৃতি-শোভা একত্রিত করে তার অন্তিপাশে নিয়ে যায় পড়ে পেছে। ভীড় করে মিলনকে ব্যাহত করেছে; বহুর ভোগ্য করে একের পূজা হতে দেয়নি।

এই শালামার স্বপ্ন আসে অনেকজনার চোখে। তিনি কাশ্মীরের গবর্ণর আসফ খান্; মোগলাছ বেগমেরবাগ, সাজাহানের খশুর। তাঁকে বেশী ভাবতে হয়নি, সামনেই ছিল সুরজাহানের স্বপ্ন ঐ শালামার। কিন্তু শালামার তো রাজভবন। আসফ খান করলেন প্রমোদ উদ্যান। নাম দিলেন নিশাত। নিশাতের জন্ত অত সুন্দর পাথরের গেট পান না আসফ খান। তাই সামনে দিয়ে বইয়ে দিলেন ঝরণার জল, আর দুপাশ দিয়ে করে দিলেন উঠবার জায়গা। ধাপে ধাপের বাগান। জল গিয়ে পড়ছে খালের পূর্বতীরে।

নিশাত—প্রবেশ পথ

খাল থেকে শিকারা একেবারে বাগানের ধার পর্যন্ত আসে। ঝরণার দুপাশে দুটো কাঠের দরজা আর চৌকাঠওয়ালা সিংহদ্বার। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে উপরে গিয়ে আবার গেট, আবার সিঁড়ি। এমনি ধাপে ধাপে উঠে গেছে বাগান—১২টী ধাপ। বারোটী রাশির সঙ্গে মিলিয়ে বারোটী ধাপে এক একটা ধাপ। এটি ফুলের রাজত্ব ছিল। এখন আর সে সতীত্ব রক্ষা করা যায়নি। মিঠা তাজার যুগে এমন রকম-ফেরি করা হয়েছে। বারোটী ধাপ আর এখন নেই। এখন আছে এগারোটী। শালামারই বলো, আর নিশাতই বলো—বড় মোটর রাস্তা গেছে একেবারে ওপর দিয়ে। আরো ওলার দেলে নামি খালের বন্যার ভেসে যাবার আশঙ্কা ছিল। বিশে শতাব্দীতে মোটর ছাড়া চলেনা। শালামার নিশাতের একতালি কাটা গেলে কিছু নয়। তাই শালামারেরও শেষ ধাপ নেই, নিশাতেরও তাই। এখন আছে নিশাতের এগারো ধাপ। এগারো ধাপে এক-কালে গ্রহের সঙ্গে মিল রেখে গ্রহের প্রিয় বর্ণের সঙ্গে মিল রেখে ফুল ছোটোনো হোতো। মাঝখানে ফুল। ধারে ধারে বড় বড় ফুলের গাছ, তারপরে নানা লতার বেড়া। তারপরে নেমে দুধারে ফলের বাগান। নানা রকমের ফল। আজ কাশ্মীরে যত ফল পাওয়া যায় তা সবই কাশ্মীরে ছিলনা। ফলের আর গাছের রাজা সেই বাবুর বাদশা বাবরের সাধ আর চেষ্টা এনেছিলেন কাশ্মীরে, তারপর ইংরেজরা এনে লাগালো অনেক ফলের গাছ। ফুল সবচেয়ে বেশী লাগিয়েছেন বাবুর। নিশাতে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ সব ফল আর ফুল গাছই আছে। নিশাত যেন ঝলমল করছে এতো সাজানো, এতো মনোরম। এখান থেকে খাল, খালের পারে পীরপঞ্জোলীর পাহাড়ের সার, অপূর্ব দৃশ্য সে।

কাজেই শাজাহান এসে যখন এইবাগান দেখেন—সহজেই বুঝলেন খশুর সোনা পাননি, বর্বর পাননি, তাই শালামার করতে পারেননি; কিন্তু শালামারের ওপর টেক্কা দিয়ে যে বাগানখানা করেছেন তার কাছে সোনা আর বর্বর শুধুই সোনা আর বর্বর।

শাজাহান তো বরাবরই রসিক লোক। অমন দুর্বার মোগল আর কটা জন্মেছে। জন্ম থেকেই তো বিদ্রোহ। তারপর একেবারে বাপটের সঙ্গে রাজত্ব পড়ে যওয়া। জহুরী তিনি, সুন্দর মালের সওদাত করছেন। দেখেই নিশাতের প্রতি মন টানলো। খুব প্রশংসা করলেন নিশাতের কাছে।

সর্বনাশ! খশুর তো প্রমাদ গণলেন। দেকালের নম্বর বাদশাহ যার প্রশংসা করেন জন্ম হোক্, হওয়ার হোক্, মেরাৎ হোক্ বাদশার মনোরঞ্জনের জন্ত দিতে হবে। কিন্তু আসফ খান জিভ্ কামড়ে রাখলেন দাঁত দিয়ে। 'না' কাড়লেন না।

অদেয় হতে পারেন খশুর; কিন্তু বাদশা এমন অদেয় তার প্রশ্রয় যেন কি করে। সোজাসুজি চেয়ে বসলেন নিশাত তাঁর চাই।

হাসার হলেও মেয়ে দিয়েছেন। হতে পারেন বাদশাহ। তা বলে

জাহাঁই-ও ছোঁ ঘটেন। হিম্মৎ করলেন খানেক খান্। আবারও 'না' কাড়লেন না। শাজাহান দেখলেন মোমতাজের মন পেতে গেলে বিশাত নিয়ে বসন্তকে খাঁচানো চলে না।

কিন্তু আসই নয় শাজাহান। চিরকাল ছোঁ আর শাজাহান ছিলেন না। খুররমও ছোঁ ছিলেন। খুররম যথাযথ খাঁকে তাড়িয়েছে, খুররমের খুড়খুড়ি বেড়ে গিয়েছে। খুনকম চোখ উপচেছে, আকবরাবাদে নিয়ে ফুর্তি করতে গেছেন। আসফ খান্ সেই বসুমতীকে কাঁপিয়ে তুললো। বাদশার ছেওরের খুররম নহলম খাঁর করলো।

বিশাতের কথা আর শালামারের কথার উৎস মুখ একই ছিল। শাজাহান জানতেন শালামারের বাগানে একটা ছোটো নহর কেটে

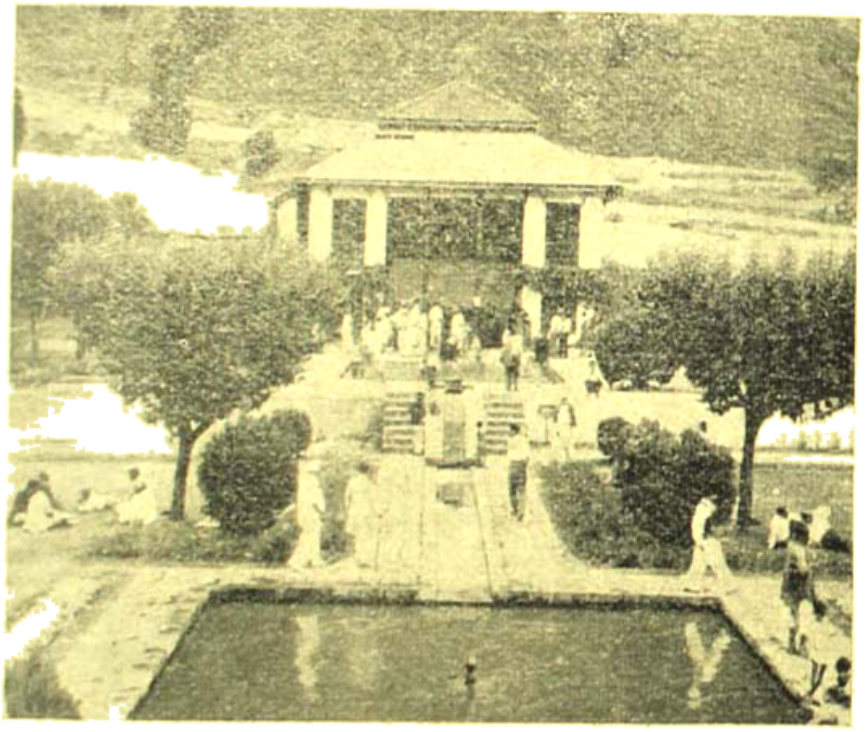

চশমাশাহী

নিলেই বিশাতের সব জল চুরি করে শালামারে আনা যাবে। আর জল চড়া বিশাত তো একটা বাঘ হয়ে দাঁড়াবে।

সেই কথা সেই কাজ। বুড়ো এসে ভরো বোঝালো জাহাঁইকে যে কথার যে পরিমাণ জল শালামারে আসতো তা শালামারের পক্ষে যথেষ্ট। বিশাতকে মারা কেন? কিন্তু শাজাহান তা শোনেন না। বিশাত জলশূন্য হয়ে থাকে দিনের পর দিন। শুকনো বিশাতের চেহারা দেখে আসফখানের বুক ফেটে কান্না আসে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বৃদ্ধ। শেষে তার তখন মৃত্যু আসন্ন। শাজাহান নির্মম হয়ে বসে আছে। বাদশার সঙ্গে দোস্তোকী করলে বাদশা এমনিই করে থাকে। সেই ভয়ে।

শুকনো বিশাতের ধারে নতুন আসফখান্। হঠাৎ কলকল শব্দে চোখ মেলে চায়। বিশাতের শুকনো বুকটা ছাপিয়ে জল এসেছে। শাজাহান ওবে বৎস ছিলেন কি খাপায়। অদ্ভুত ঘটনা। বাদশা নিজে গেলেন দেখতে। আসফ খাঁর প্রিয় এক ভৃত্য প্রভুর মৃত্যু দেখতে না পেয়ে আকুল। মরবার সময় প্রভুকে শান্তিতে মরতে দিতে হবে, জল আনতে হবে বিশাতে। সে গিয়ে সেই প্রস্রবণের ছোড়ের মুখে শুয়ে রইল পাথর মুড়ির সঙ্গে। শাজাহানের নহর বন্ধ করে জল ফিরে চললো পুরোনো পথে। মৃত্যুর দরজা থেকে আসফ-খাঁ সেই জলের শব্দ শুনতে পেল।

শাজাহান বাদশা রসিক বাদশা। এমন প্রভুভক্তি দেখে বলে উঠলেন —"যদি একটাও এমন ভৃত্য থাকতো আমার বলটা বিশাত তৈরী করতাম।" হুকুম দিলেন বিশাতের জল ছেড়ে দিতে।

সেই বিশাত। আমরা এখানে কাঁচা আপেল কুড়োলাম। দুপুরের খাওয়া খেতে বসলাম। আজও এলো ময়োরেরা, আমাদের সঙ্গে খেলো।

খাওয়া শেষ হতে না হতে আবার বাদ শব্দ করতে লাগলো—চলো চলো। এবার চশমাশাহী। বলে এই শাহী চশমার জল এতো পাচক ও পুষ্টিকারক যে এখান থেকে পাত্র ভরে তা দিল্লী আগ্রা যেতো বাদশার তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য। শাহী চশমার কাছেই সেই বাংলোটা দেখলাম—যে বাংলোতে জাহাঁ-গ্রাসাদকে বন্দী রাখা হয়েছিল। চমৎকার বাংলোটি। বাংলোর বীর সন্তান এই শাহি চশমাকে বাঙালীর কাছে তীর্থ করে রেখে গেছেন।

চশমাশাহী শাজাহানের কীর্তি। এখানেও অবজরের খেয়া। পাথরে লেখা—

গুফ্‌তগুশ্‌ বাদর্‌ই চশমা তারিখ এ
গুফ্‌তগুবার গো কাউসর ই শাহি।

মানে—গুণাকর তিথি বরণাধারার বলো। সে কহিল শুধু বরণাধারার কথা। সে কহিল রাজাধারার কথা অবজরে গুনলে তারিখ দাঁড়ায় ১৬৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ।

তখন পাঁচটা বেজে গেছে। প্রাণ বলে চা। চা আর পাই কোথায়। হঠাৎ ছেলে-মেয়ে বেশ একটি কাপেটে বসে চা খাচ্ছে, আর কটি মেয়ের

সঙ্গে গল্প জুড়েছে। কাণ্ড !! আর ব্যাপার !!! অসিত বেখে চোখ ঘুরিয়ে নিলে বিষম মুশ্কিল।

"ওকি অমন করে চোখ কেরালে যে !"

Traitor—চোখের ওপর মেয়েদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখলাম। ছি ছি বেণুদির এমন অধঃপতন ?

কিন্তু ব্যাপার কি বলতো অসিত। একটি ভদ্রলোককে দেখছি। চাকরে চা পরিবেশন করছে। বেণু হঠাৎ এতো জবর মুরগা পাকড়ালো কি করে ?

আমরা বলে এলাম—'পরী বহল বাচ্ছি খাবার সময় ডেকে দেবো।'

খানিকটা এগে গেছি। বেণু আর একটি মেয়ে ডাকলো—'চিনলে না, আমাদের টুলুদি ! আর টুলুর বোন যাঁরা আমার ক্লাস-ফেলো। প্রণবদা যাঁরার বর। ওরা ছুটিসময়ে এসেছে বেড়াতে। কালই এসেছে টুলুদি কলকাতা থেকে প্লেনে। চা খাবে ? চলো না !

আমি গিয়ে বললাম,—"আমি একা খাবোনা। দু কাপ থাকে তো খাবো বেণুর সঙ্গে—"

ভদ্রলোক দেখে শুনে অবাক্। যাঁ বলায়, আপনার বোন ? যাঁরা দেবীর পানে চেয়ে বলেন—"তোমরা দুজনে যে এক ক্লাসে পাঠ পেয়েছো, বুঝতে বাধা হলাম।"

"কেন ?"

"নৈলে বাবা আর বাবার বন্ধুর রসাল বক্তৃতার অত্যেপে বাধ দিয়ে মিষ্টি চা খেয়ে যেতে পারলেন ? প্রফেসার বলেন না যে দুটো হতভাগা আরও আছে।"

প্রণববাবুর অমায়িক আতিথেয়তায় জবর চা হোলো।

"পরীবহল ? সেটা কী ?"

"এমন কিছু নয়। আমার ভাল লাগে খেতে তাই খাবো। একটু পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে এমনি বাগান। তার ভেতর মান মন্দির। বাবা তো পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। হতভাগ্য বাবা এখানে একটা গবেষণাগার করেছিলেন।"

গিয়ে দেখি অত্যন্ত অযত্নে পড়ে আছে একটা বাগান। তার বরণা আছে, জল নেই। শুকিয়ে গেছে। বাবার ভাগ্য যে।

বাসে চড়ে যখন ফিরেছি বোটে তখন ক্লান্তি, অবসাদ। অত্যন্ত বেশী আনন্দ পাওয়ারও ক্লান্তি আছে।

ব্যাবড়া মুখ অসিতের।

"কি খবর ?"

"এঃ পালামায়ে ফটো নিয়ে নিয়ে সবকটা ফিল্ম মাবড়ালাম। অন্ত ক্যামেরাটা যে লোড্ করিনি খেয়ালই নেই। নিশাতে কিছু নিতে পারলাম না। কী প্রাউ সীন্।"

জগজীবন বলে—"নিশাতে গিয়ে সতো খুশি পেলাম, পালামায়ে কিন্তু তা পেলাম না।"

"পাবে কি করে ?" বলাম।

"কেন ?"

"পালামায়ে কি পেলে ?"

"গান্ধীর অথচ মহান্ একটি দৃশ্য। নিশাত যেন চটুল, চপল, চমৎকার।"

"ঠিক বলেছ। নিশাত রাজপরিবারের কল্পিত প্রমোদ-উদ্যান। পালামায় তারত সম্রাজ্ঞীর বরবাড়ী স্বপ্ন !"

"দেখেছিলে বাবা সেই নরওয়েজিয়ান্ বুড়োটাকে ? ওরে কি জানো ঐ বিরাট ঝোলা কাঁধে করে সে সমস্ত ভারতের বুনো ফুটো সংগ্রহ করার ভক্তে। নরওয়ের প্রসিদ্ধ মোটানিষ্ট—নামটা ভুলে গেলাম।"

"আমায় আগে বলি না কেন ? আলাপ করতাম। বেশ বুড়ো। সত্তর তো পার হয়ে গেছে অনেককাল। উঃ কী উৎসাহ !"

অসিত চেঁচালে "ওরে ও হতভাগা রমন্না !"

"জী হুজুর !!"

"জী হুজুর, নয়ে যাচ্ছি সে বেটা—একটু গরম জল দেনা।"

দাঁত বার করে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ দিল এক কেত্‌লী জল। বেণু আর অসিত চা করতে লেগে গেল। ঠিক ফুটছে মনোরমা চায়ের সময়।

রাতে রমন্না কখানা মাছ ভাজা দিলো ঢুকিয়ে। বোটে বসে ফটির সঙ্গে খেলাম। মন্দ লাগলো না। রান্নাটা বাঙ্গালীদের প্রথাই ঘটে। কিন্তু আমরা ওকে যখন আমাদের খাবারের অংশ দিলাম ও নিল না।

"আমরা হাঁড়ি। কাকর খাবার খাইনা।" দেখেছি পরে পরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও খাঁটীরী মুসলমান হিঁদুর রান্না খাবার তো খায়না, হাঁটীরা অন্য মুসলমানের রান্নাও খায়না। কারণ আগেই বলেছি হাঁড়িয়া ছিল হিন্দু। জোর করে মুসলমান করার ফলে জাত ওদের যায় ; তবু জাত ওরা দেয়নি।

জগজীবন বলে—"কে মুসলমান করলো এদের ?"

"কাল বোলো। আজ বড় ক্লান্ত। বেণু ঘুমিয়েই পড়েছে। আজ এই অবধি থাক। ক্রমশ

অভিনয়

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

কোন ভালো বইয়ের অভিনয় দেখতে শহর ভেঙে পড়ে রঙ্গালয়ের সিংহ দরজায়। জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয় উৎসাহ আর উদ্দীপনার অফুরাণ চাঞ্চল্য। কিন্তু অভিনয় যদি তেমন প্রাণস্পর্শী না হয়, তবে অডিটোরিয়ামের জন-সমুদ্রে অসন্তোষের ঢেউ ওঠা কি অন্যায়?

তাই উঠল সেদিন। শান্ত করবার জন্যে মালিকপক্ষ ঘোষণা ঘন ঘন আবেদন, নিবেদনের কাজ নয়—মানুষের অভিনয়। আজকের একটু ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্যে কি আপনাদের কাছ থেকে আমরা ক্ষমা পেতে পারি না?

উত্তরে দর্শক মণ্ডল থেকে শোনা গেল, ও-সব আপিসী কথা রেখে দিন মশাই! পোষ্টারের বহরে তো শহর ভাসিয়ে দিয়েছেন; এমন অভিনয় নাকি আর হয়নি—হবেও না কোনদিন! এখন তবে এমন কেন?

মালিক পক্ষ থেকে আবার অনুরোধ, যারা এতোদিন আপনাদের মনোরঞ্জন করেছিল সে-দুবাদেও কি আজ প্রথম দিন বলে করে'…দেখবেন, কাল নিশ্চয়ই খুশী হবেন আপনারা।

প্রতি উত্তরে শোনা গেল, আজ তবে টাকাটা ফিরিয়ে দিন। দিয়ে দিন টাকা—ইত্যাদি।

এক কথায়, অভিনয়-নৈপুণ্য দেখতে দর্শকেরা যতো-খানি আশা নিয়ে এসেছিল তাদের সে আশা মেটেনি। তারা আশাহত, রেগে আগুন! যাদের বয়েস চল্লিশ তারা কিছু না বললেও ছেলে-ছোকরারা গ্যালারী ভেঙে ফেলে আর কি! মালিক পক্ষের কোন আবেদনই শান্ত করতে পারল না তাদের।

শেষ পর্যন্ত গ্যালারীতে কোলাহল আর মঞ্চে অভিনয়। শান্ত আর অশান্তর মিশ্রিত পরিবেশে কোন রকমে শেষ হ'ল বইখানি। কিন্তু যাকে বলে আসর-জমান অভিনয়, তা' আর হ'ল না। শুধু হ'ল এক দৃশ্যের পর আরেক দৃশ্যের দুয়ার খোলা। অভিনেতারা বলে গেল তাদের মুখস্ত করা পাঠ। নায়ক-নায়িকার প্রাণহীন অভিনয়ের জন্যে পার্শ্ববর্তী চরিত্রগুলোও পড়ল ঝিমিয়ে।

কিন্তু মালিক পক্ষও তো দর্শক। শুধু তাই নয়, সব-চেয়ে বেশী স্বার্থ নিয়ে বিচারক তারা; কতো দিয়ে কি পাচ্ছে সে-হিসেবে তারাই বেশী পাকা। সেদিক থেকে দর্শকদের কাছে একটা উপস্থিত কৈফিয়ৎ দিলেও নিজেদের কাছে সত্যিকারের কোন কৈফিয়ৎ খুঁজে পেল না। বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল তারা। অথচ কাকেও বলার নেই কিছু। নায়ক নাট্য-সম্রাট আর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করল নাট্য-সম্রাজ্ঞী!

নায়ক বিনয়কুমার। মঞ্চপ্রিয় সকলের কাছে বিনয়-কুমারের নাম প্রিয়তম। অভিনয়ে সে পাকা। সুখ্যাতির ভিত্তিতে অভিনেতা জীবনের গোড়া পত্তন করে তখনও রক্তিমের ইঁটে গড়ে চলেছে নিজের জীবন-সৌধ।

নায়িকা বাবলীদেবী। নাট্যসম্রাজ্ঞী সে। বিনয়-কুমারের নামে যেমন সকলে পাগল, বাবলীর নামেও তেমনি পাগল। 'মিলন-তীর্থের' মালিক কাহু ব্যবসায়ী। অনেক টাকার অর্ঘ্য দিয়ে বাবলীকে বরণ করে এনেছে তাদের ঘরে। এনেই সুরু করেছে ঐ নূতন বই।

আগে মঞ্চ-জীবনে দু'জনে দু'জায়গায় অভিনয় করলেও অভিনয় শেষে বিনয়কুমার আর বাবলী দেবীর ঠিকানা ছিল এক। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী। অভিনয় শেষে ফিরত একই গাড়ীতে। গাড়ীতে বসেই আলোচনা করত সেদিনকার অভিনয় নিয়ে।

একদিন তেমন ফেরার পথে জিজ্ঞেস্ করল বিনয়কুমার, আচ্ছা বাবলী। ঐ যে তোমার সেই…সেই রসঘন দৃশ্যে তোমার দিকে নায়কের তাকান ঠিক হয়েছিল? নায়িকার মনে সেন্টপার্সেন্ট খুশী হয়েছিলে তুমি?

দেখুন! অর্দ্ধেকটা সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

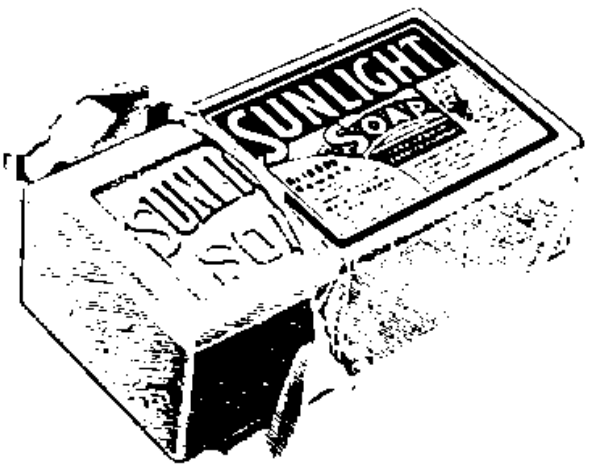

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক, প্রস্তুত

বাব্‌লীদেবীও ছাড়ে না বিনয়কুমারকে। বলে, মেসের ঝিয়ের কাপড়ের আঁচল ধরেছিলে যখন সাবিত্রীর সেই মুখখানা কেমন লেগেছিল তোমার!

হাস্‌তে হাস্‌তে জানায় বিনয়কুমার, সত্যি! অপূর্ব করে শ্যামলী দেবী। আমার সমস্ত কিলিংসকে যেন তোয়ারের মতো এনে দেয় সে।

হাউস্ ফুল্ ছিল?

নিশ্চয়ই—আমি করছি সতীশ। তোমাদের ওখানে?

বাইরে থেকে অনেক চেয়ার এনে দিতে হয়েছিল। তাতেও হ'ল না বলে বাইরে সে কি গোলমাল।

ঠিক এ-কারণেই 'মিলনতীর্থ' অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছিল বাব্‌লীদেবীকে তাদের মঞ্চে আনতে। বিনয়কুমার ছিল ওখানেই। তাকেই প্রথম মালিকপক্ষ জানিয়েছিল অনুরোধ। উত্তরে বিনয়কুমার বলেছিল, শিল্পীর শিল্প-জীবনের ওপর কারোর হাত দেওয়া উচিত নয়; ওটা বাব্‌লীর একান্তই ব্যক্তিগত ইচ্ছা। তাছাড়া টাকা পয়সারও একটা দিক রয়েছে।

'মিলন তীর্থ' রাজী হ'ল 'মঞ্চমজলিস্' বাব্‌লীদেবীকে যা দিচ্ছে তার চেয়েও বেশি টাকা দিতে।

কথাটা হ'ল খুব গোপনে। কিন্তু বাতাসেরও কান আছে। শুনে টনক্ নড়ল 'মঞ্চমজলিসের।' বাব্‌লীদেবী মঞ্চ-জগতের উজ্জ্বল তারকা। সে চলে গেলে তাদের ঘর দীপ্তিহীন। তারাও তখন বাব্‌লীদেবীকে দিল একটা ভালো ইন্‌ক্রিমেণ্ট। উপরন্তু বিনয়কুমারকেও তাদের ওখানে নিতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা সুরু করল। শেষ পর্যন্ত একদিন আবেদন আর অনুরোধ নিয়ে তারা সোজা উপস্থিত হ'ল বিনয়কুমারের দরজায়।

'মিলন তীর্থের' সঙ্গে এগ্রিমেণ্টে আবদ্ধ ছিল বিনয়-কুমার। বাড়ী তৈরীর সময় অগ্রিম অনেক টাকা নিয়েছে। সে-কথাই সে জানাল। জানাল নিজের নামসইকে কোন রকমেই সে অসম্মান করতে পারবে না।

এতে খুশী হ'ল 'মিলন-তীর্থ'। দিল পুরস্কার। বাব্‌লী-দেবীকেও আবার অনুরোধ করল, তাদের ওখানে যোগ দিয়ে 'মিলনতীর্থের' অপূর্ণ মঞ্চলঘট পূর্ণ করতে।

বাব্‌লীদেবী তো প্রথমে সম্পূর্ণ অস্বীকার।

তারপর আবার 'মিলন তীর্থের' সবিনয় অনুরোধ: অভিনয়কে কি ক'রে নৈপুণ্যের ছোঁয়ায় বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তার চাবি-কাঠি দু'জনের হাতে। সুতরাং বাব্‌লীদেবী! আপনারা বাস্তব জীবনে যা' সে-মূলধন নিয়েই অভিনয়কে মধুর-বাস্তবে পরিণত করুন। সেখানে মিলন-ছবি যেমন হবে অপূর্ব হৃদয়স্পর্শী বিচ্ছেদের সুর ও ব্যথার ছন্দ নিয়ে হবে কান্নাভরা। আপনাদের হাসি আর ব্যথায় অডিটোরিয়াম হাসবে আর কাঁদবে—দর্শকেরা হারিয়ে ফেলবে নিজেদের।

কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়া নয়—বেশ পরিষ্কার মতো আল্‌তো হাসি দেখা দিল বাব্‌লীদেবী আর বিনয়কুমারের মুখে। তাকাল দু'জনে দু'জনের দিকে। চোখে চোখে হ'ল কথা। বাব্‌লীদেবীর জিজ্ঞাসা আর বিনয়কুমারের উত্তর ঐ এক সেকেণ্ডেই শেষ।

'মিলন তীর্থের' ভাগ্যাকাশে তখন শ্রেষ্ঠ তারকার অভ্যুদয় হ'ল বলে মালিকপক্ষ চলে গেল পরম খুশীতে। বিনয়কুমার আর বাবলীদেবীকে জানাল অশেষ ধন্যবাদ। কামনা করল নাট্যসম্রাট আর নাট্যসম্রাজ্ঞীর উজ্জ্বলতর মঞ্চজীবন, সুখ দাম্পত্য প্রেম।

তারপরেই সুরু হ'ল সিলেক্‌শন্। সুরু হ'ল পোষ্টারের প্লাবন। নানা রকম পোষ্টার—লাল, নীল, বেগুনী, সবুজ। কোনটায় লেখা: নাট্য-সম্রাটের নাট্য-সম্রাজ্ঞীলাভ! একখানাতে লেখা: বাবলীদেবীর ঠিকানা পরিবর্তন। আরেকখানাতে লেখা: বিনয়কুমার আর বাবলীদেবীর ঘর আর বার সমান। এমন আরো কতো। যতোই এগোতে লাগল অভিনয়ের দিন পোষ্টারের ভাষাও দেখা দিল নূতন চাকচিক্যে।

ওদিকে পুরো মাত্রায় চলেছে বইয়ের রিহার্সেল-নাচ-গান আর বাজনার অর্কেষ্ট্রা। বিনয়কুমার আর বাবলী-দেবীর বলার ঢং অপূর্ব। রোজ রিহার্সেলে যাওয়ার দরকার নেই তাদের। তবুও তাদের যেতে হয় আর সকলের সুবিধার জন্যে।

বাড়ীতে বিনয়কুমার আর বাবলীদেবীর দু'জনের দুখানা পড়বার ঘর। নূতন বইয়ে মন ডুবিয়ে তারা সেখানে রাত। চরিত্র দু'টাকে দু'জনেই বুঝে নিয়েছে বেশ। মনের কর্ম-শালায় তাকে নিয়ে চলেছে প্রস্তুতি।

ওদিকে পাবিব লাভ লোকসান আর অপাবিব সুনাম

আর দুর্নামের সব দায়িত্ব নায়ক-নায়িকার হাতে তুলে দিয়ে মালিক পক্ষের চোখে ধুলো দেবার প্রচার কার্য চালাতে। বিনয়কুমার আর বাবলীদেবীও তা বুঝেছিল। আরো বুঝেছিল, বাইরে তাদের যে অসংখ্য গ্রাহক রয়েছে তাদের অন্তর-যমুনার অদম্য ঔৎসুক্যের কথা! কি আশা নিয়েই না রয়েছে সকলে। ওদের মুখেই তো তাদের টাকা, তাদের অভিনেতা-জীবনের পরমায়ু।

একদিন নাটকের একটা দৃশ্য ভাবতে ভাবতে বিনয়-কুমার হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হ'ল বাবলীদেবীর ঘরে।

বলে উঠল বাবলীদেবী, দিলে তো সব এলোমেলো করে। কেমন সুন্দর গুছিয়ে এনেছিলাম।

হাসল বিনয়কুমার। বলল, নায়ক আমি। আমিই ধরিয়ে দেবো। শোনো, সোফায় বাবলীদেবীর কাছে ঘন হ'য়ে বসল বিনয়কুমার। বইখানা খুলে দৃশ্যটা বের করে বলল, এ-জায়গাতে তুমি কেমন করবে বলোতো?

দেখি!

বইখানি এগিয়ে ধরল বিনয়কুমার। প্রথম লাইন পড়েই বাবলীদেবী বুঝল—ও এই জায়গায়।

হাঁ বলে যাও তো।

সত্যি বলছ?

নিশ্চয়ই।

কি যেন একটু ভাবতে লাগল বাবলীদেবী।

দেরী করছে দেখে বিনয়কুমার বলল, বলে যাও।

বাবলীদেবীর তখনও ভাবনা শেষ হয়নি। চোখ দু'টী তার ঘরের দেয়ালে বাধা। তবুও তার সে-তাকান যেন সীমার মাঝে অসীমের দিকে—দেয়ালকে পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে নিরুদ্দেশের দেশে।

কি এতো ভাবছ?

একটু যেন চমকে উঠল বাবলীদেবী। তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে। সুরু করল বলতে।

শুনলে বিনয়কুমার। বাবলী দেবীর অভিনয় শুনে যতোটুকু ভাব তখন জেগেছিল বিনয়কুমারের মনে তা' নিয়েই সে সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। অভিনেতা অভিনেত্রী—বিশেষ করে নায়কনায়িকা, এদের একজনের অভিনয় নৈপুণ্য নির্ভর করে আরেকজনের ওপর। সেখানে আসল হচ্ছে ফিলিংস্ আনা। বাবলীদেবী যেন বিনয়-কুমারের তেমন ফিলিংস এনে দিতে পারল না। ভাবল বিনয়কুমার, কেন পারল না? কোথায় ত্রুটী হ'ল বাবলীর। অথচ এমন ধরণের দৃশ্যে বাবলীর কৃতিত্বই সব চেয়ে বেশী। অন্তত: সেদিনও সে 'মক-মজলিসে' বাবলীর এমন ধরণের অভিনয় দেখে এসেছে। কি চমৎকারই সেদিন করল। দর্শকদের কাছ থেকে সুখ্যাতি আর সমাদরও পেল প্রচুর। সেই বাবলী এমন ম্লান।

বিনয়কুমার তখন ভাবল, এতোদিন 'মিলন-তীর্থে' নায়িকার ভূমিকায় যে-অভিনয় করেছে সেই শ্যামলীদেবীর কথা। ও-জায়গায় কেমন করত সে।

কিছু মতামত প্রকাশ না ক'রে বিনয়কুমার চলে যাওয়ায় অবাক হ'ল বাবলীদেবী। নিজের মনে মনেই পেল লজ্জা। পরে কি যেন একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে এগোল বিনয়-কুমারের ঘরের দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্ করল, তোমার ভাবনায় ছেদ্ পড়বে না তো?

এসো।

কিছু না বলে চলে এলে যে!

সত্য কথার আঘাত সইতে পারবে তো?

অভিনেত্রী-জীবনের প্রথম প্রভাত থেকেই সত্যি-মিথ্যা সব রকম সমালোচনা সহ্য করার শিক্ষা নিয়েছি।

তবুও আবার জিজ্ঞেস্ করল বিনয়কুমার, বলব?

ম্লান উৎসাহ নিয়ে বাবলীদেবী বলল—বলো।

আমার যেন তেমন ফিলিংস্ এলো না বাবলী।

বাবলী দেবী নীরব। সোফায় বসে আছে একটা জড় পদার্থের মতো, কিন্তু মন তার অভিনয় করে চলেছে মক-মজলিসের নায়ক শিশিরের সঙ্গে—ঠিক এমন ধরণের অভিনয়। নায়ক নায়িকার মিলনের পথে বাধা; নায়ককে না পেয়ে নায়িকার চোখে জল। সেই জল, জল এনে দিল দর্শকদের চোখে। নিজের অলক্ষ্যেই তখন চমকে উঠল বাবলী দেবী—তাড়াতাড়ি মুছল চোখ। সঙ্গে সঙ্গে বিনয়কুমারের একখানি হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে চেপে থাকল আপন মনে। একটু পরেই একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, সময় মতো ঠিক হবে।

অভিনয়ের দিন।

একটু আগেই সুর তুলেছে অর্কেষ্ট্রা। তখন তুলল

সুরু হওয়ার শেষ তান। বিনয়কুমারও শেষবারের মতো বাবলীদেবীকে বল্‌ল, তোমার ওপরেই কিন্তু আমার সব নির্ভর বাবলী।

তোমাকেও কিন্তু আমি সে-কথা বলতে পারি, জানাল বাবলীদেবী।

বইয়ের সুরুতেই বই জমে না। কিন্তু জমানোর জন্যে শিল্পীদের চেষ্টা থাকে প্রথম থেকেই। পর পর চলে গেল কয়েকটী দৃশ্য। দৃশ্যপটে নায়ক এসেছে একা। নায়িকাও একা গিয়েছে ভিন্ন দৃশ্যে। দর্শকদের মনে তখন নানে-না-মানা উৎসাহ। কতো তৃষ্ণা তাদের চোখে, কানে। অভিনয়ের মতো অভিনয় দেখবে তারা।

কিন্তু না। প্রথম যে-দৃশ্যে নায়ক আর নায়িকা এলো সে-দৃশ্য জমল না তেমন। কেমন যেন পূর্ণতার অভাব।

দর্শকেরা ওদের কাছ থেকে তাই-বা আশা করবে কেন? তবুও তারা আশা নিয়ে রইল পরবর্ত্তী দৃশ্যের জন্যে।

গ্রীণরুমে গিয়ে বাবলীদেবীকে ভাই বিনয়কুমার বল্‌ল, কি হচ্ছে বাবলী? প্রাণ ঢেলে এক্‌স্‌প্রেশান্ দিচ্ছ না কেন?

এমন অভিযোগ বাবলীদেবীও করতে পারে বিনয়কুমারকে। কিন্তু অভিনয়ের মাঝে, গ্রীণরুমে আর কথা বাড়াল না সে। শুধু বল্‌ল, চেষ্টার ত্রুটী করছি না একটুও।

পরের দৃশ্য। দর্শকেরা যেমন মনোরম দৃশ্য দেখবে বলে আশা করেছিল, তা' না দেখে তারা নড়ে-চড়ে বসল। পরের দৃশ্যে সুরু হ'ল একটু ওলটপালট। মালিক পক্ষের লোক সুরু করল ছুটাছুটী করতে—একবার গ্রীণরুমে, একবার অডিটোরিয়ামে।

বাবলীদেবীও বুঝল। অভিনয় করার সময়ই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছে অডিটোরিয়ামকে। কিন্তু কেন তা'দের তুষ্ট করতে পারছে না, তাই বুঝতে পারল না সে। আশ্চর্য। কি যে হ'য়ে যাচ্ছে! যেমন করে বলবে বলে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল, মঞ্চে দাঁড়িয়ে তেমনভাবে প্রকাশ করতে পারছে না কেন? লজ্জায় ঘিরে ধরল তাকে। তাকাতে পারছে না বিনয়কুমারের দিকে। তেমন অবস্থাতেই একবার বিনয়কুমারকে বলে ফেল্‌ল, তোমার বলার সেই সাবলীল ভঙ্গী, কথার সুরে সুধা ঢালা দরদ—এ-সব আজ কিছুই বের হচ্ছে না কেন?

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস্ করল বিনয়কুমার, সত্যই কি আসছে না বাবলী? কিন্তু কেন আসছে না। আমি তো চেষ্টার কোন ত্রুটী করছি না!

সত্য, চেষ্টা আর প্রচেষ্টা এর কোনটিরই অভাব ছিল না বিনয়কুমার আর বাবলী দেবীর। তবুও জমল না বইখানা, পারল না বইখানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে: সকলেই তাই অবাক্ বিস্ময়ে হতবাক্! তা'রা আশ্চর্য্য!! তারা জেনেই গেল না বিনয়কুমার আর বাবলীদেবীর শিল্পী-জীবনে এমন ব্যর্থ অভিনয়ের কারণ কি! কেউ বুঝতে পারল না, যা'দের অভিনয়ের যাদুতে কতো অনামী বই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে প্রাণের স্পন্দনে, এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ বইখানিতে তারাই এতোখানি অকৃতকার্য হ'ল কেন?

মালিকপক্ষও মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবল, এর চেয়ে সুপ্ট সিলেক্‌শন্ আর কি হ'তে পারে? নাট্যসম্রাট আর নাট্যসম্রাজ্ঞীর মিলন!

বিনয়কুমার আর বাবলীদেবী কিন্তু দু'জনেই তখন মনে মনে ভেবে চলেছে, সিলেক্‌শান্ মোটেই ঠিক হয়নি।

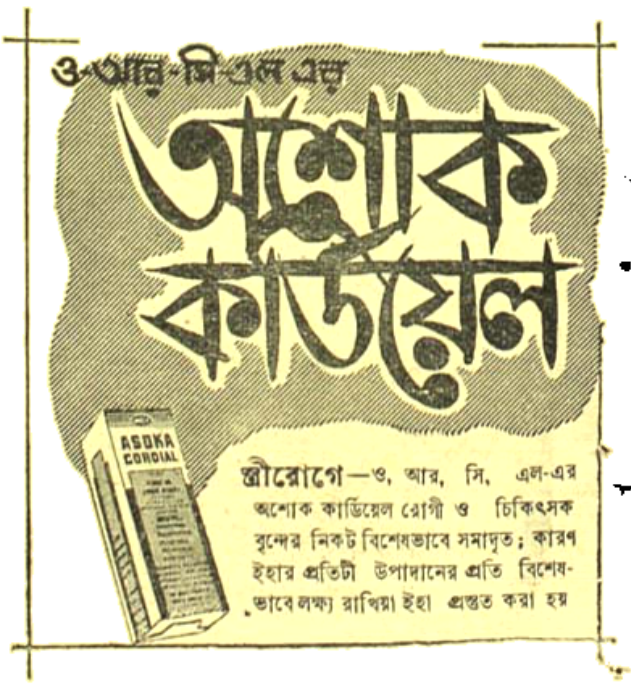

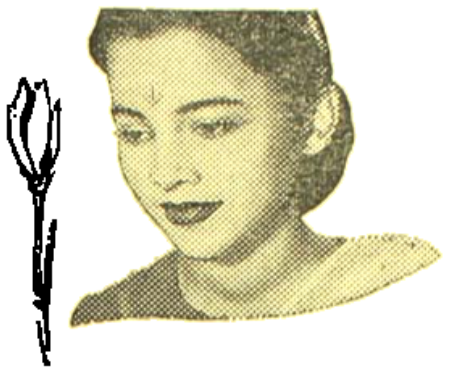

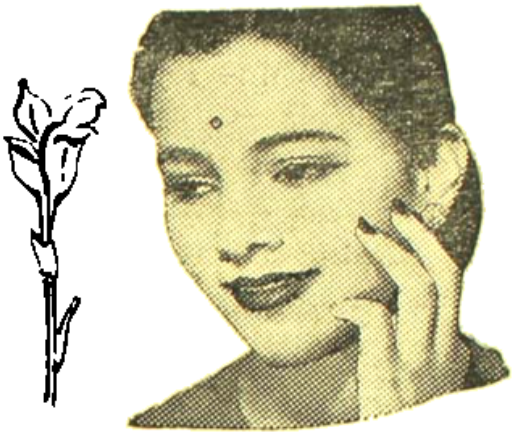

ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য **রেক্সোনা**

ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

B. 131-X52BG

শরণার্থী-সমস্যার জাতীয় গুরুত্ব

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরে যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে, তাহাদের পুনর্বাসন ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহে সুকঠিন সমস্যা। অন্য দিক বাদ দিলেও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের তাগিদ ইহাদের ক্ষেত্রে প্রবল, অথচ ভারতের মত পশ্চাৎপদ কৃষি-কেন্দ্রিক-অর্থনীতির দেশে পুরাপুরি জনসংখ্যার কর্মসংস্থানই হইয়া উঠে না, নবাগতদের সুব্যবস্থা কি করিয়া হইবে? ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন ইহাদের অন্যতম। কিন্তু পরিকল্পনা যতই চমৎকারভাবে অথবা বুদ্ধিমত্তার সহিত রচিত হউক, ইহার কার্যকারিতা অবশ্যই কিছুটা সময়-সাপেক্ষ, আলাদিনের আশ্চর্যপ্রদীপের ন্যায় রাতারাতি দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইতে পারে না। এ অবস্থায় রিক্তহস্তে ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে ভিড় করিতে আসিতে লাগিল বলিয়া ইহাদের বাঁচাইবার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে হইল।* এই ভয়াবহ সমস্যার চাপ আবার পড়িল দেশের বিভাগ-সীমার কাছাকাছি কয়েকটি প্রদেশ বা রাজ্যে- পুরই বেশি। এইরূপ পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সহজেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিম-পাকিস্তানের আগন্তুকদের জন্য ভারত সরকার প্রথম হইতে সক্রিয় সচেতনতা দেখান এবং ফলে পশ্চিম-পাকিস্তানের শরণার্থী-সমস্যার অনেকটা সমাধানও হইয়াছে। এই ব্যাপারে ভারত সরকার পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিত মোটামুটি অধিবাসী ঘুলান্তরের পূর্বে আলোচনা চালাইয়া চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নিকট হইতে প্রভূত সহযোগিতা পান। পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী-সমস্যা প্রথমদিকে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত হইয়াছে, পরে অবশ্য সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক হইতে এই সমস্যার সমাধানে লক্ষণীয় চেষ্টা দেখা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীরা সংখ্যায় প্রায় অর্ধ-কোটি হইলেও একরূপ একই সঙ্গে আশ্রয়লাভের আশায় ভারতে আসে এবং অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টায় দ্রুত পুনর্বাসিত হয়। এছাড়া দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তব দিক হইতে বাধাইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নূতন অবস্থায় যোঝার মনোভাব লইয়া সংগ্রাম করিবার বিস্ময়কর শক্তি ও সাহস এই আশ্রয়প্রার্থীরা দেখাইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু বা পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ হইতে চিরকালের বাসভূমি ও অন্যান্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আসিয়া ইহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে দূর-দূরান্তে, কিন্তু সুদূর কলাণ বা জুলওয়ারী পল্লিকের উপনিবেশে ইহাদের জীবনযাত্রার সম্ভাবনাদ্য ও সামঞ্জস্য সাধনের আগ্রহ লক্ষ্য করিলে অবাক হইতে হয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সমস্যা প্রায় দশ বৎসর হইয়া গেলেও আজও নানাকারণে বহুলাংশে জটিল থাকিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী ১৯৫৮ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ১৭৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার যেখানে মোটামুটি সুষ্ঠু পুনর্বাসন লাভ করিয়াছে, সেখানে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৪০ লক্ষ ১৭ হাজার আশ্রয়প্রার্থী ঐ সময়ের মধ্যে ১২৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা সরকারী ব্যয় সত্ত্বেও মোটেই আশানুরূপ পুনর্বাসিত হয় নাই। জীবনযাত্রার মানের দিক হইতে পশ্চিম-পাকিস্তানের শরণার্থীদের সমস্যা কম নয়। অবশ্য পূর্বাঞ্চল হইতে অল্পতরসংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ার জন্য পরিত্যক্ত জমি-বাড়ীর স্বল্পতা এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সরকারী স্তরে বা পরিচালনার ক্ষেত্রে অক্ষমতা অথবা দুর্নীতিও এজন্য কিছুটা দায়ী হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, ভারতের আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সে হিসাবে এই বিশাল দেশের সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনের জরুরী প্রয়োজনীয়তা আছে। এই পুনর্গঠন সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেই বর্তমান চড়া বাজারে প্রচুর টাকা দরকার। সকলের অসুবিধা হইতেছে পশ্চাৎপদ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রথম দিকে প্রস্তুতি-মূলক বনিয়াদ সংগঠনের যে আবশ্যকতা দেখা যায় এবং তজ্জন্য মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা বা মৌলিক শিল্পপ্রতিষ্ঠার যে কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে অতিরিক্ত অর্থ বা পণ্য চলাচলের দ্বারা অর্থের সাচ্ছল্য সৃষ্টি অথবা কর্মসংস্থান সৃষ্টি বড় একটা হয় না। এ অবস্থায় এইসব অত্যাবশ্যক ব্যয় বহনের অনিবার্য বাধ্যতার সহিত যোগার উপর পাকের আঁটির মত আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার ব্যয় তথা বিপুল বাজার ভারতের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। একথা আলোচনা না করিলেও চলিবে যে, ভারতের মত আর্থিক দুর্গতিগ্রস্ত দেশে শুধু উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে এই ক' বৎসরে ৩০৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় কম কথা নয়।

---

* আশ্রয়প্রার্থী সমাগম তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে, ১৯৪৭ সালের ২৪শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মাত্র সাত মাসের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ প্রসঙ্গে ভারতের অর্থ-সচিব শ্রীষড়মুখম্ চেট্টি ঘোষণা করেন :—

"Financial considerations should not stand in the way of affording relief to these unfortunate people and in alleviating their sufferings is one of the most poignant of human tragedies that could take place outside a war.

১৯৫৯-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান হইতে শরণার্থী সমাগম অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক হইয়াছে। ইহা আশার কথা। তবে এই প্রসঙ্গে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রদানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষীয় কড়াকড়ির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহাড়া আগে পূর্ববঙ্গীয় আশ্রয়প্রার্থীরা ভারতে সহজ ও স্বচ্ছন্দ পুনর্বাসনের যে আশা লইয়া আসিত, বাস্তবক্ষেত্রে তাহা অনেকাংশে দুরাশায় পরিণত হওয়ার উপায় থাকিলে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের ভারতে চলিয়া আসিতে ইতস্ততঃ করাই স্বাভাবিক। তবে পাকিস্তানে হিন্দুদের জীবন, মর্যাদা ও জীবিকার নিশ্চয়তা যতদিন না প্রত্যাবর্তিত হইবে, ততদিন আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না এবং সেক্ষেত্রে অবস্থার অধোগতি ঘটিলে কি করা হইবে তাহা কর্তৃপক্ষের দিক হইতে পূর্বাহ্নে স্থির করিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। সরকারের চেষ্টায় যাহাদের পুনর্বাসন হইয়াছে অথবা যাহারা নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসিত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে করণীয় অনেক কিছুই আছে। ইহাদের প্রশ্ন উপস্থিত ছাড়িয়া দিলেও ভারতে এখন (৩১, ১২, ১৯৫৭ তারিখের হিসাব) আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলিতে যে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার শরণার্থী অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে কাল কাটাইতেছে (শুধু পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের সংখ্যা ২ লক্ষ ১১ হাজার) তাহাদের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। এতদ্ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তান হইতে সদ্যাগত শরণার্থীদের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

পূর্বপাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় আশা করেন। বাঙ্গালী শরণার্থীদের বাংলার মাটিতে আশ্রয়ের আকাঙ্খা নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। সংস্কৃতি এবং মানবতার বিবেচনায় এই আশা সকলেরই সহানুভূতিলাভের যোগ্য। কিন্তু সমস্যা হইতেছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের বর্তমানের প্রস্তুতিপর্বে কর্মসংস্থান যখন যথেষ্ট হইতেছে না এবং বেকারসমস্যা-অধ্যুষিত জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শরণার্থী ইতিমধ্যেই পুনর্বসিত হইয়াছে, তাহাদের মানুষের মত বাঁচিতে দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই যখন সম্ভব হইতেছে না, তখন অন্ততঃ স্যাপ্তির দিক হইতে সমস্যাটিকে নিয়ন্ত্রণ করাতো দরকার। সরকারী স্তরের দুর্নীতির সকল অভিযোগ এবং পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমির সকল হিসাব সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাকে আমরা অসহায় বলিয়াই মনে করি। এক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য পূর্বপাঞ্জাব ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে এবং অপরিচিত স্থানে পুনর্বাসনের সময় বাঁচার দায় সম্মুখে রাখিয়া আশ্রয়প্রার্থীরা যেরূপ দুর্ভাগ্যের সহিত লড়াই করিয়া মোটামুটি বিজয়ী হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। পূর্বপাকিস্তানের সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী চিরকাল শুধু পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসিত হইবে, এই দাবীর পিছনে হৃদয়াবেগ, মানবতাবোধ ইত্যাদি অবশ্যই আছে—কিন্তু এখন যদি সত্যই হয় যে বাস্তব বিচারে এইরূপ দাবীর প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে, তাহা হইলে নিরুপায় বেদনার বিকল্প ব্যবস্থায় শরণ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? আমরা আগেও বলিয়াছি, খাদ্য এবং আশ্রয়প্রার্থী পুনর্বাসন—এই দুই সমস্যার স্থানই রাজনৈতিক জুয়াখেলার বহু উর্ধ্বে। উহার সমস্যাতেই কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সন্তোষ-প্রবণতা মারাত্মক।

পূর্বপাকিস্তানের শরণার্থী সমস্যার অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং সুষ্ঠুসমাধানের উদ্দেশ্যে রায়চরনগরের অন্তর্গত মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সীমান্তের ৮০ হাজার বর্গমাইল বনকারণ্যে এক উপনিবেশ গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, এই উপনিবেশের সম্ভাবনা সুপ্রচুর এবং ইহাতে ১৯ লক্ষ শরণার্থীর আশানুরূপ পুনর্বাসন হইতে পারিবে। এই ৮০ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে ২০ হাজার বর্গমাইল বাসযোগ্য জমি অনতিবিলম্বেই পাওয়া যাইবে এবং মোহানদী, ইন্দ্রাবতী, গুরেমগঙ্গা প্রভৃতি নদীমাতৃক বনকারণ্য মূলতঃ বাঙ্গালী শরণার্থীর পক্ষে অনুপযুক্ত হইবে না বলিয়া তাঁহারা আশা করেন। এই বনকারণ্য পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে কাজ চলিতেছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯৫৭-৫৮ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বপাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য সাধারণভাবে বরাদ্দ ২০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ছাড়াও বনকারণ্য পরিকল্পনার জন্য এই বৎসর ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। আগামী বর্ষার পূর্বেই মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার জয়দেবপুরে প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশাপ্রকাশ করিয়াছেন। উপনিবেশের গঠনকার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীসহ একজন "চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর" নিযুক্ত হইয়াছেন।

বনকারণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে একধরণের আন্দোলন চলিতেছে। ভূমিযোগ বা রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন কিছুটা থাকিলেও এই আন্দোলনের পিছনকার আতঙ্কজনক মনোভাবের সম্বন্ধে বিশ্লেষণও কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই করিতে হইবে। ইতিপূর্বে আন্দামানে আশ্রয়প্রার্থী পুনর্বাসনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত বিশেষ হয় নাই। অপরিচিত ঐতিহাসিক-ভীতিপ্রদ আন্দামানের শরণার্থী উপনিবেশটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসনযন্ত্রের অধীনে আনার প্রস্তাবও কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পুনর্বাসনের জন্য যে সব শরণার্থীকে পাঠানো হইয়াছে তাহাদের অনেককেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে যথেষ্ট। যেভিন্না উপনিবেশ হইতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের দুর্দশা ইহারই মধ্যে অনেকেই ভুলিয়া যান নাই। কাজেই বনকারণ্য পুনর্বসতি উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনায় জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের চেয়ে ভয়ই দেখা যাইতেছে বেশি। এক্ষেত্রে বনকারণ্য পরিকল্পনা যদি সত্যই আশাপ্রদ হয়, তাহা হইলে সেই পরিকল্পনার বাস্তব-সম্ভাবনা সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্যক অবহিত করিবার চেষ্টা কর্তৃপক্ষের করা উচিত। বনকারণ্য পরিকল্পনার যাঁহারা বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তিসমূহ ধৈর্যের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। অবশ্য শরণার্থী পরিস্থিতি দৃষ্টে আমাদের মনে হয় বনকারণ্য-পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে তাহা পশ্চিমবঙ্গের জীবন প্রদায়িনী হইবে। তবে যদি বনকারণ্য পরিকল্পনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলেও কর্তৃপক্ষকে দেখিতে হইবে যাহাতে

শরণার্থীদের বহুই সহজ ধনিষ্ঠভাবে বংসের এলাকায় বাস করিতে পারে এবং অন্যান্য বৃত্তিসমূহের তাহাদিগকে পুনর্বাসনের নীতি গৃহীত হয়। দণ্ডকারণ্য উপনিবেশ এলাকাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য হইতে পৃথক করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শাসনযন্ত্রের অধীনে আনার ব্যবস্থা হইলে খুবই ভাল হয়, তা না হইলে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট রাজ্যে পুনর্বাসিতদের নিজস্ব পরিষদ-প্রতিনিধি যাহাতে থাকে এবং পার্লামেন্টেই যাহাতে তাঁহাদের নিজস্ব প্রতিনিধি থাকেন তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। বাঙ্গালীর কলাকৃষ্টি, বাংলা ভাষা, সমগ্রভাবে বাঙ্গালীর জীবনবৈশিষ্ট্য দণ্ডকারণ্য উপনিবেশে পূর্ণ সংরক্ষণের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি-পূর্বাহ্নেই দিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা ত্রিপুরাতে শরণার্থীদের আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণার যৌক্তিকতা বিশদভাবে ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হওয়াও দরকার।

উপনিবেশ-স্থাপনে যে জাতীয়-শক্তি, ধনবল ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে, ইহা ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের বহু দূরবর্তী মাটিতে আন্দামান প্রত্যাগত প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গের পরিবারকে ছড়াইয়া দিতে হইবে (সহজকথায় পুনর্বাসন নামকরণে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার)। প্রতিটি ক্ষেত্রে খারাপ না হওয়াই কথা। একথা আজ বলাই বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, নূতন ভারতে কোন বৃহৎ ভূখণ্ডই অনুন্নত থাকিবে না। কিছুটা সরকারী কর্তৃপক্ষের এবং কিছুটা আমাদের তথা আন্দামান প্রত্যাগতদের নিজেদের অকারণ আত্মসম্মানের সম্ভাবনা বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে 'দণ্ডকারণ্য'কে বিনাবিচারে হাতছাড়া করা অবশ্যকর্তব্য বিশদ পশ্চিমবাংলার বা বাঙ্গালীর পক্ষে কল্যাণকর নহে। এ সম্পর্কে বিশদ যৌক্তিকতার এবং বীর-শক্তিকে চিন্তা করা দরকার। আন্দামান আমাদের চোখের উপর দিয়া পাঞ্জাবী ও দক্ষিণ-ভারতীয়রা দখল করিয়া লইয়াছে। সুযোগ-সুবিধা থাকিলে দণ্ডকারণ্যকে আমাদের তথা বাঙ্গালীর বিবেচনা করাই উচিত।

মোটের উপর শরণার্থী-পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানের সহিত ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের জীবনমরণ প্রশ্ন জড়ানো রহিয়াছে বলিয়া এসম্পর্কে কল্যাণকর যাহা কিছু করা যায়, তাহারই নিজস্ব মূল্য আছে। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে অথবা পরিপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র-পরিবেশে পুনর্বাসনের চেষ্টার গুরুত্ব আগেই আলোচিত হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে দার্জিলিংয়ে আটটি রাজ্যের পুনর্বাসন-মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়, তাহাতে শরণার্থী শিবিরগুলি যথাসম্ভব তুলিয়া দিয়া সম্ভাব্য ভূমি পুনরুদ্ধার দ্বারা এবং উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা সহ ব্যাপক ছুটনশিল্পের সাহায্যে এই শরণার্থীদের কর্মসংস্থানের তথা পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্তটির মূল্য ইহার কার্যকারিতার উপরই নির্ভর করে।

শরণার্থীসমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে কর্কট রোগের মত, ইহার সমাধান যত বিলম্ব হইবে ততই ইহা আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহা শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, বিরাট সামাজিক সমস্যা। চারিদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া ভগবান সম্বন্ধে বুদ্ধি বিধাতের এখন কেহ যদি এই সঙ্কট সমাধানে আপনার সাধ্যমত চেষ্টা না করেন, তাহা জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। এ কথা আজ সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার যে, আশ্রয়প্রার্থীরা যেমন রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি নয়, তেমনই বেলবিভাগ-জনীয় পবিত্র ভাতীয় প্রতিশ্রুতির নিরিখে তাহারা পরপ্রত্যাশী ভিক্ষুকমাত্রও নয়। অশ্রুপ্লাবিত দুর্ভাগ্যের বন্যস্রোতে আজ তাহাদের চিত্ত বিক্ষোভিত এবং প্রাণপূর্ণ ছিন্নমূল, তাহাদিগকে আপন হীনস্বার্থে ব্যবহার করিবার চেষ্টাও যেমন ঘৃণ্য, ক্ষমতার বলে প্রাপ্য মর্যাদা না দিয়া তাহাদিগকে অবহেলা করাও তেমনি অপরাধ।

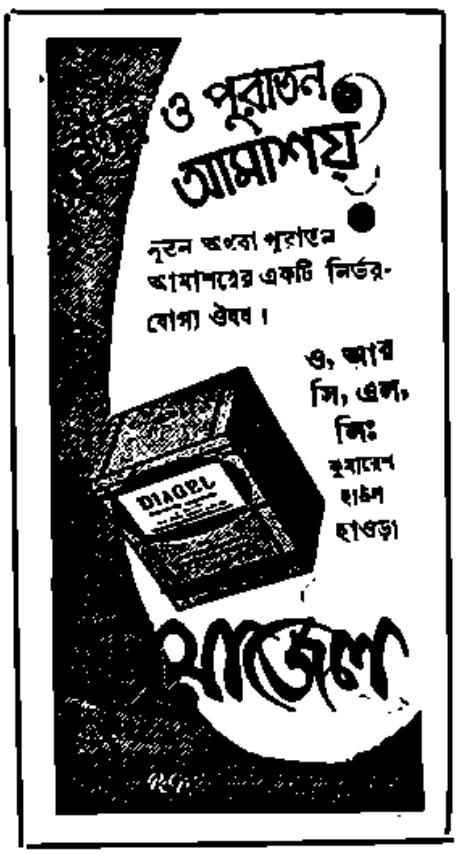

রাখালী গান

শ্রীজয়দেব রায়

রাখালিয়া গান বা Pastoral Songs পৃথিবীর সকল ভাষারই একটি বিশিষ্ট রীতিধারা। আমাদের দেশে গোচারণের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় এই ধারার গানও যেন কতকটা আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত হইয়া পড়ে!

মহিষ চরাইতে চরাইতে রাখালরা যে গান গায় তাহার নাম 'মহিষাল'; আর গোরু চরাইতে চরাইতে যে গান গাওয়া হয় তাহার নাম 'রাখালী'। গাড়ী চালাইতে চালাইতে আবার যে গান গাওয়া হয়, তাহার নাম 'গাড়োয়ানী'। এই তিনটি শ্রেণীর গানই এখন প্রচলিত।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও পূর্ববঙ্গের মৈমনসিং অঞ্চলে মহিষাল গান বেশ কতকটা বৈচিত্র্য অর্জন করিয়াছে।

মহিষ চারণের একটি গানের মধ্যে রোমান্টিক ভাবের সঞ্চার করা হইয়াছে বর্ষায় প্লাবিত নদীর মাধ্যমে—

শাওন আষাঢ়ে নদী পাগল হৈয়া যায়।
নদীর পাড়েতে মহিষাল কান্দিয়া বেড়ায়॥
বইয়া যাওরে পাগলা নদীরুনি তোমার বাথা।
কন্তার নাগাল পাইলে কভু কইও আমার কথা॥
মনের কথা মনেই রাখি কইতে নারি পারি
আমার বুকের বিষম ব্যথা যেথাই কারে চিরি॥

বাঙলা দেশে অবশ্য মহিষচারণের সে প্রকার চলন নাই। বঙ্গে মহিষের সংখ্যাও খুব বেশী নয়; বিহার ও যুক্তপ্রদেশে গৃহপালিত কৃষিসহায়ক মহিষের সংখ্যা অধিক। বলিষ্ঠ চেহারা কোপন স্বভাব, ধর্মগতি সব মিলিয়া মহিষ একটি বিচিত্র রূপলাভ করিয়াছে। নিম্নলিখিত গানে মহিষাল গানের একটি পরিবেশ যেখানো হইয়াছে—

আকাশ ডাকে ঘনঘন আষাঢ় মাস আসে
জন্মিনে পড়িল রাজা আসমানে মেঘ ভাসে॥
আইল আষাঢ় মাস জলে বাড়ে বেগা
আকাশের ডাকে শুনি বর্ষার নতুনা॥
পূবেতে উঠিল ঝড় ঘন্নি উঠে মেঘা;
ঐ নদীতে কূল নাই, ঘাটে নাইক খেয়া॥

মহিষাল গানের মধ্যে একটি পরিবেশ মাধুর্য আছে। পল্লীবঙ্গের শ্রান্ত ক্লান্ত মহিষ রাখালই এইভাবে বৃন্দাবনের সেই ব্রজরাখালে পরিণত হইয়াছে—

মইশাল রে, মইষ রাখো, মইশাল বন্ধুরে,
ক্ষীরনদীর পারে
মরিল অবলার প্রাণ তোমার বাঁশীর সুরে।

রইবে কেন পুড়া মইশালরে—ব্যাঘে তিন্না মরো,
কিলে আছে পটলের গাছা আইনা মাথায় ধরো॥
এক তো শীতল জলের ছাওয়া রে বন্ধু
আর শীতল জালি
তার হইতে অধিক শীতল রে কন্যা
চাদের মধ্যে পানি;
তা হইতে অধিক শীতল মনব্যথার পতি, কন্যারে॥
এই বাঁশী সেই বাঁশী নয়, বাঁশী বাজে মধু তালে,
বিনোদ মইশাল আজি মরিল রাধানে, কন্যারে॥

এই সকল গান কিশোর-কিশোরীদের কণ্ঠেই গীত হয়, তাই স্বাভাবিক-ভাবেই এইগুলিতে বাল্যে প্রচলিত ছড়াগানের কলিগুলিই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, তাহারা গানের বৈচিত্র্যকর বিষয়বস্তুই বা কোথা হইতে পাইবে?

চৈত্রমাসের শুষ্ক বেলায় পাতা ঝরা প্রান্তরে মহিষের পাল ছাড়িয়া দিয়া নদীর কূলে জলপান করিতে বসিয়া মহিষ-রাখালের মনে পার্থিব পরিবেশের কথাই জাগিয়া উঠে—

মইশাল, মইশাল ওরে বন্ধুরে, শুকনা নদীর কূলে
দুখখানি শুকায়ে গেছে, চৈত্র মাইস্যা আমালে।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে॥
আমার বাড়ী ত যাইও বন্ধুরে, এই না বরাবর
খাজুর গাইছা বাড়ী আমার পুব দুয়ারো ঘর।
আমার বাড়ীত যাইও বন্ধুরে বসবার দিব মোড়া
জলপান করতা দিব ও পালধানের চিড়া।
পালধানের চিড়া দিব রে, ঝিনুধানের খৈও।
মোটা মোটা লকরী কলা সামন্ধা পাতা খৈও (ওরে)॥

এই কথাই ছড়াগানেও আছে—

শিব গেল শ্বশুর বাড়ী বসতে দিল পিঁড়া।
জলপান করতে দিল শালিধানের চিড়া।
শালিধানের চিড়া (নয় রে) ঝিনীধানের খই॥

রাখালী গানের মধ্যে বেশ একটা সারল্যমণ্ডিত বাক্সম্বাদুলক ভাব আছে। বৈষ্ণব কাব্যে গোষ্ঠের গানে যেমন রাখাল বালকের ভাগবত-রূপটি আচ্ছাদিত হইয়া উঠিয়াছে, সখ্য ও বাৎসল্য রসের বিস্তার হইয়াছে; এই সকল রাখালী গানের মধ্যেও সেইরূপ পল্লীবঙ্গের নিশ্চিন্ত পার্থিব জীবনের প্রশান্তিময় চিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। গোষ্ঠ-যাত্রার প্রাক্কালে মা যশোদার মতো রাখাল বালকের মাতার আবেদনও রাখাল সখাদের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে—

আরে ভোল রাখাল ভাই ও-রে
তোর মাঠে ধেনু চরিতে রে
খাবার জলে হাত মুখ ধুইয়া গাছের তলাতে বৈতে রে।
দিবা লাগল চৌপলা খুইয়া মুড়ি চিড়া খাইতে রে।
'মায়ের বুকের দুধ খাই' কইয়া ঝাঁওনায় পানি লইয়া,
আড়াই চুমুক খাইতে রে।
হেঁওয়ার মধ্যে সেরুই পাইত্যা পুব শিওরে শুইও রে।
সন্ধ্যার আগে গোল লইয়া—বাড়ীত ফিইরা যাইও রে।

সারাদিন ধরিয়া বেণুর রন্ধ্রকে মাঠে চরাইয়া দিনের শেষে যখন তাহাদের পেট ভরিয়াছে, গোধূলির ম্লান ছায়া গোষ্ঠ প্রান্তরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে, তখন রাখাল বালকের মনে পড়িয়া যায় গৃহকোণে মায়ের কথা। বর্ধমানের কুমুর গানে মা যশোদা যাদে আকুল নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন—

বেলা যাকে ও কানাই, গগনে আর বেলা নাই,
গোঠের লীলা সাঙ্গ ক'রে বেণু লয়ে ঘরে যাই।
ওই মা যশোদা যায় ভাই, দাঁড়িয়ে তোমার তরে,
ও সে ননী হাতে করে রয়।

সবাই বেণুর রন্ধ্রকে প্রান্তর হইতে ফুটাইয়া লইতে পারে না, কানাই-এর বাছুর হারাইয়া যায়, সে ব্যস্তভাবে বাছুর খুঁজিবার জন্য হাঁক দিতে দিতে আর সবাইকে অনুনয় করে—'ভাই একটু দাঁড়া, আমাকে একা ফেলে যাস না।"

দিবা গেল সন্ধ্যা হইল রবি গেল দূর ;
বে-ওয় ধন আমার রাইত, উঘাত উঠা যাস—
কৈ পাইবাম বাছুর আমার লাগবো যার মাস।
দাড়াও তোমরা রাখাল ভাইরে বাছুর সেইকা লই
উঠা আইল উইঠা ডাকি ধীরে ধীরে।

রাখালী গানের পরিবেশটি বড়ই রমণীয়। দিবাভাগের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাখালীর সুর কিরূপ মৌদ্রমীপ্ত দিবাবসান প্রকৃতিতে বাস্তবে সঞ্চার করে—তাহার আভাস পাওয়া যায়—

নয়া দিনে নবে গান বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।
শান্ত প্রান্তরের কোণে ক্লান্ত রবি ডাই শোনে ;
সুদূরের ম্লানকেশে ধূসরতা আঁখি।

শারদার আগমনীগানেও উপভোগ্য গোষ্ঠপালা। রাখালদের কণ্ঠে ধ্বনিত এই গানগুলিতে যেন শ্রীকৃষ্ণের গোকুল লীলারই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। জননীহৃদয় ভক্ত যশোদা তাঁহার স্নেহের দুলালকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। গোপাল মিনতি করিতেছে—

কিবা বন্ধন বাঁধলি মা-রে বন্ধন গেল কসে।
বন্ধনের তাপে মা রে লোহ চলল ভেসে।
কিবা বন্ধন বাঁধলি মা-রে বন্ধন পিঠেমোড়া,
বন্ধনের তাপে মা-রে ছুটল হাড়ের জোড়া।

রাখাল ও ধেনু গান রাখাল বালকেরাই গান। ভাদ্র মাসে ধেনুর পূজা। কিন্তু ঘোষ পাঁচড়া যাদের দেবতা ধেনুর বিজয়াভিমান চলে সারা বৎসর ধরিয়া ; তাই, গোষ্ঠের প্রান্তরে আর পুকুরের ঘাটে ধেনুর জয়গানেরও যেন বিরাম নাই—

ঐ ভাবর বাজা, ঐ কাঁসের বাজা।
এলো এলো ঘরে ধেনু রাজা।
দাদা বাজা তোরা ফুলো বাজা।
এলো এলো ঘরে ধেনু রাজা।
এই-ই ঘণ্টাকর্ণ, ওগো এই-ই ঘণ্টাকর্ণ।
যেন হেঁড়া হাতা বর্ণ।
কানের ঘণ্টা তোরা বাজা বাজা।
কানে ঘণ্টা বাঁধা আমাদের এই ধেনু রাজা।

কোন কোন রাখালী গানের মধ্যে সৎসাহিত্যের সুভাষিত উক্তির প্রতিধ্বনিও পাওয়া যায়। চর্যাপদের আপনা মাংসে হরিণা বৈরীর প্রতিধ্বনি আছে নিম্নের গানটিতে—

কবের হরিণী আমি কার-বা ঘর বারি।
আপন স্নেহের মাসে ঘিরে জগৎ কৈলাম বৈরী।

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, গোবন্দনা গানে নামে একশ্রেণীর গানে গোপালন বিষয়ে নানা নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন—

ধুলায় চিনবে ধরণী চৈত্ত বৈশাখ রে,
কাদায় চিনবে আষাঢ় মাস।
ধান ফুলে চিনবে এই কার্তিক মাস গো
পহ'রে আওল ধেনু ফেরি দিন রে।

গাভীকে বলা হইতেছে সে যেন চৈত্র বৈশাখে ধুলা, আষাঢ়ে কাদা ও কার্তিকে ধানের শিষ ভরা মাঠ দেখিয়া ঘরপানে ফিরিতে পারে। আর একটি ঘসবা-গানে আছে—

আয় ভালা অধিরে বাছুরি বাছুরি ভালা
দুধবারে ধাওয়ালি।
বাছা মোরা বেলি বশীভান
আজিকার দিনে ধরি জিতবে রে বাছুরী
চারিপায়ে বাঁধব নেপুর রে।

গোবৎসকে বাক্‌চাতুর্য ভালভাবে পান করিতে না দিলে সে কি করিয়া সন্তোষ হইবে!

গাড়োয়ালী গানের মধ্যে দুইটি সুর আছে, একটি কর্মব্যস্ততার দ্রুত-লয়ের সুর সারি চড়ের এবং অপরটি গাড়ী হাড়িয়া দিয়া বিস্তৃত উষার মাঠের পানে চাহিয়া গাওয়া ধীর লয়ে উদাসী সুর ভাওয়াইয়া চড়ে। মনের ভাবের রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে গাড়োয়ালের কণ্ঠস্বরও বদলাইয়া যায়—চড়া হইতে খাদে হঠাৎ নামিয়া যায়।

দুধারে ভরাক্ষেতে পাকা ধানের শিষগুলি পাখীর ভারে নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে, মৃদুমন্দ মাতাস-পরশে হইতে কাশবনে মর্মর শব্দ তুলিয়া বহিয়া

আছিটেছে, সোনালী রোদ পড়িয়া তালপুকুরের জলে ঝিকিমিকি ছবি আঁকিতেছে—এইরূপ উদাস পরিবেশে গাড়োয়ানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

মনের পাখী দিয়ে ফাঁকি উড়ে গেল হায়।
দেহপিঞ্জর খালি ক'রে গেল সে কোন অজানায়।
কবের পাখী মনে ছিল উড়ে এল আজিকার
যোগাড় করে আদর করে এনে ঘরে দিলেন ঠাঁই।
কত আশা ছিল মনে সুখের দুখে উদাসী হিয়ার
থাকব, যাবব বাসা দু'জনায়।
হায় হায় উড়ে গেল হায়।

আবার দ্রুত গন্তব্যস্থলে যাইতে হইবে, পথে বিলম্ব করিবার অবসর নাই, বলদদ্বয়ও অধৈর্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, এরূপ অবস্থায় গাড়োয়ানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অন্য সুরে—

ও কি রে গাড়িয়াল ভাই
হাঁ-কা-ও গাড়ি তুই চি-ই-ল যায়ীর ব-অল-ব-অ-রে
যখন গাড়িয়াল টানরে ধীরে ধীরে
নারীর মন মোর ঝুরা হয় রে
হাঁ-কা-ও গা.....ড়ি।

লোকুর কমিটি ও উপকূল পথে পণ্য স্থানান্তর

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম্-এ

শ্রীএস এন লোকুরের সভাপতিত্বে গঠিত রেল-জাহাজ কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রস্তাব করেছেন, উপকূলবাহী জাহাজের সাধারণ মাল এবং কয়লার উপর মালের ভাড়া শতকরা পনের ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে। সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তবে লবণ সম্বন্ধে সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন, বর্তমান ভাড়াই অপরিবর্তিত থাকবে। আসল কথা হচ্ছে" The Rail—Sea Co-ordination Committee has called for urgent steps to ensure the attainment of the target of 412,000 gross registered tonnage for the coastal and adjacent trades fixed in the second five year Plan. As much of this tonnage as possible should be reached by the end of 1959, as a sharp and substantial increase in the demand for additional transport facilities is anticipated thereafter." কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক লোকুর কমিটির সুপারিশ গৃহীত হবার ফলে যে অতিরিক্ত আয় হবে সে আয় থেকে কয় বাষ বিলে যে টাকা অবশিষ্ট থাকবে সে টাকার সম্পূর্ণটা একটা স্বতন্ত্র তহবিলে জমা করা একান্ত দরকার। কেবলমাত্র দুটো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই তহবিল ব্যয় করা যাবে। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনর্বাসন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করা।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পথে অনেকগুলো—অন্তরায় আছে। এই সব অন্তরায়ের মধ্যে পণ্য স্থানান্তরের অসুবিধা হল অন্যতম। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে এমন অনেক অঞ্চল আছে যে সব অঞ্চল রেলপথের সংযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। আবার কোন কোন অঞ্চলে রেলপথের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও মাল স্থানান্তরের ন্যূনতম প্রয়োজনও রেলপথ মেটাতে পাচ্ছে না। অবশ্যি একথা ঠিক যে, রেলপথ ছাড়াও মাল স্থানান্তরের জন্য উপকূল পথে জাহাজের ব্যবস্থা আছে। তবে জাহাজগুলো বিরাট আকারের নয়। ছোট কিম্বা মাঝারি ধরণের জাহাজ যোগে উপকূলপথে মাল স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, জাহাজগুলো প্রয়োজন মেটাতে পাচ্ছে কিনা। প্রকাশিত তথ্যাবলী থেকে মনে হচ্ছে, জাহাজগুলোর সাহায্যে মাল স্থানান্তরের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটান সম্ভবপর হচ্ছেনা।

লোকুর কমিটি যে সব সুপারিশ করেছেন সে সব সুপারিশের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রেলযোগে এবং সমুদ্রপথে পণ্য স্থানান্তরের ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন করাও সুপারিশগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সন্তাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। যদি রেলযোগে এবং সমুদ্রপথে পণ্য স্থানান্তরের ব্যবস্থায় সত্যিকারের সমন্বয় সাধিত হয় তাহলে এতদিন পর্যন্ত পণ্য স্থানান্তরের ব্যাপারে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে সে অসুবিধা দূর হবে বলে আশা করা যেতে পারে। তাছাড়া লোকুর কমিটি মন্তব্য করেছেন "In respect of certain items of traffic a positive policy of diversion to the sea or rail—cum—sea route should be adopted to the extent necessary for adequate utilization of coastal shipping and to afford maximum relief to the railways". তবে কমিটির তরফ থেকে "No enforced diversion to the sea route of any traffic of the private parties except in the case of coal is, however, recommended."

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যে হারে রেলপথে মাল

স্থানান্তরের জন্য মাশুল আদায় করা হয় সে হারের সঙ্গে জাহাজযোগে মাল স্থানান্তরের জন্য যে হারে মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা আছে সে হারের যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে তাঁরা রেলপথ এবং উপকূলবাহী জাহাজের পরিচালক তাঁরা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এর কারণ খুব স্পষ্ট। যদি উপকূলপথে মাল স্থানান্তরের মাশুলের চাইতে রেলপথে মাল স্থানান্তরের মাশুল কম ধার্য্য হয় তাহলে স্বভাবতঃই রেলপথে মাল চালান দেবার জন্য অস্বাভাবিক ভিড় জমে যেতে থাকে। অথচ উপকূলবাহী জাহাজগুলো নিজ নিজ বহন ক্ষমতা অনুযায়ী মাল পায় না। ফলে অল্প কিছু জায়গা খালি রেখে জাহাজগুলো চলাচল করতে বাধ্য হয়ে থাকে। ঠিক এইভাবে জাহাজযোগে মাল স্থানান্তরের মাশুল যদি কম ধার্য্য হয় তাহলে রেলপথের বহন ক্ষমতা অনুযায়ী মাল স্থানান্তর এবং জাহাজযোগে মাল চালানের জন্য ভিড় জমে যেতে থাকে। কাজেই রেলযোগে এবং সমুদ্রপথে পণ্য স্থানান্তরের ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন কতখানি সেটা বোধ হয় আর বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই।

যেহেতু আমাদের দেশে রেলপথগুলো সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে-যেহেতু সরকারই রেলপথ প্রসারের জন্য দায়ী। কিন্তু যে সব জাহাজযোগে মাল স্থানান্তরের ব্যবস্থা আছে সে সব জায়গায় বেসরকারী মালিকানা এবং তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। অর্থাৎ গোটা উপকূল বাণিজ্যবাহী জাহাজ ব্যবসা বে-সরকারী পরিচালনাধীনে চলছে। কাজেই এই ব্যবসাকে যদি প্রসারিত করতে হয় তাহলে বে-সরকারী মালিকদের এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, জাহাজ ব্যবসা প্রসারিত করতে হলে যে মূলধন প্রয়োজনীয় সে মূলধন বে-সরকারী মালিকদের আছে কিনা, কিম্বা সে মূলধন বে-সরকারী মালিকদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভবপর কিনা।

দ্বিধাদ্বিধায় বলা যেতে পারে, সে মূলধন এঁদের নেই এবং এঁদের পক্ষে সে মূলধন সংগ্রহ করা অসম্ভব। অথচ জাতীয় প্রয়োজন মেটাতে হলে জাহাজ-ব্যবসা প্রসারিত না করে উপায় নেই। কাজেই সাহায্য করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য যাতে বে-সরকারী জাহাজ-কোম্পানীগুলো প্রয়োজনীয় মূলধন পেতে পারেন সেজন্য সরকার ইতিমধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বিশেষ করে সরকারের তরফ থেকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ মঞ্জুর করা হচ্ছে। লোকুর কমিটি বলেছেন—"The possibility of granting concessional terms for loans advanced for purchase of ships for coastal operations should be considered."

এ কথা হয়ত উল্লেখ না করলেও চলে যে, ভারতের বৈদেশিক পরিকল্পনা সম্পর্কীয় কাজ যতই অগ্রসর হবে, ততই দেশে মাল স্থানান্তরের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সরকারও অবশ্য এ সম্পর্কে সচেতন। তবে কেবলমাত্র রেলপথ প্রসারিত করলে সমস্যার সমাধান হবেনা। যদি প্রয়োজন অনুযায়ী মাল বহনের ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে উপকূলবাহী জাহাজগুলোর সম্পূর্ণ সুযোগও গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া কেবলমাত্র রেলপথের প্রসার দ্বারা মাল বহনের ব্যবস্থা করা সমীচীন এবং সম্ভবপর কিনা—সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, কেননা জলপথে মাল স্থানান্তর করতে যেমন যে খরচ পড়ে সে খরচের তুলনায় রেলযোগে মাল স্থানান্তরের খরচ বেশী ছাড়া কম নয়। কাজেই উভয় পরিকল্পনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যা'তে অধিকতর পরিমাণে মাল চালান দেওয়া যেতে পারে সেজন্য এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—আর্থীয় দিক থেকে যেগুলোর উপযোগিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবেনা।

লোকুর কমিটি বলেছেন "The question whether freight tariff of the west-coast should not be entirely detached from that of the wider coast at a convenient opportunity should be examined so that rates in respect of each of these services and variations therein made from time to time may appropriately reflect the economics of the particular service."

এই কমিটির ধারণা সমুদ্রপথে, ফসলের চালান বাড়াবার পথে গুরুতর অন্তরায় কিছুই নেই। কাজেই এইভাবে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম উপকূলে যাত্রী-জাহাজে ছয় লক্ষ টন অতিরিক্ত ফসল স্থানান্তর করা অসম্ভব নয়। এছাড়া আমার অন্যদিকে নিম্নেই এবং লবণের চালান করারও সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ নিম্নেই এবং লবণ চালান দেওয়া হচ্ছে সে পরিমাণের চাইতে আরো প্রায় দুলক্ষ টন বেশী মাল পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব্ব উপকূলে স্থানান্তর করা যেতে পারে। অর্থাৎ কমিটি কর্ত্তৃক অনুমিত মোট পঞ্চাশ লক্ষ টন মালের মধ্যে আটলক্ষ চল্লিশ হাজার টন মাল বহনের উপযোগী স্থান খালি পড়ে থাকবে বলে আশা করা হয়েছে; সেটা কিভাবে ভর্ত্তি করা যায়—সে সম্বন্ধে কমিটি আভাষ দিয়েছেন। অবশ্য অতিরিক্ত মাল স্থানান্তরের ব্যাপারে কমিটি বে-সরকারী মালচালানকারীদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে চাননি। তবে কেবলমাত্র ফসল চালানের ব্যাপারে কমিটি খাদ্যতালুকের ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। এর থেকে পারে, উপকূলপথে অতিরিক্ত পণ্য স্থানান্তর সম্পর্কে লোকুর কমিটির এই প্রকার মনোভাবের তাৎপর্য কি। যদিও সরাসরিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবেনা তথাপি মনে হচ্ছে, যা'তে চালানকারীরা ভবিষ্যতে রেলযোগে মাল চালানের জন্য ভিড় না করেন, সেজন্য জাহাজযোগে মাল চালানের জন্য যে মাশুল আদায় করা হচ্ছে সে মাশুলের চাইতে সরকার হয়ত কোন কোন নির্দ্দিষ্ট মালের উপর রেলের মাশুল বাড়িয়ে দিবেন। আশার কথা যাচ্ছে, সরকার সম্ভবতঃ এই সংস্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে সরকারী হিসাবে স্থানান্তরিত মাল ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে সমুদ্রপথে পাঠান হবে। তবে সরকারের আসল উদ্দেশ্য কি সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা লোকুর কমিটি দ্বিধাদ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ কমিটি বলেছেন—"There is scope and need for rationalization of the present tariff on a scientific basis without disturbing the total financial returns and without causing too violent a variation in the relativity of rates at any one time.

বঙ্গদেশের (ও ভাষার) বৈদিক বা আর্য্য ইতিহাস

শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার

ভূমিকা :—এই প্রবন্ধটী বিহার রিসার্চ সোসাইটী পত্রিকা, মার্চ' ৫৫, ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধাদির সাহায্য নিয়ে বিস্তৃততর ভাবে লিখিত। বহু পাঠকের আংশিক বা সম্পূর্ণ মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু আমার বক্তব্য বা যুক্তির মধ্যে কিছু সত্য কেউ যদি দেখতে পান তা হলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। এখানে আমি (ক) বিভাগে বংশ তালিকা বা তথ্য পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত চিহ্ন ও (খ) বিভাগে স্থানকাল-পার্থক্যযুক্ত ও মোটামুটিভাবে কতকগুলি স্থানের পরিচিতি দিচ্ছি। পরে যথাক্রমে ২টী বিভাগে (১) বংশ-তালিকা ও তৎসংক্রান্ত বর্ণনা, (২) (ক) আর্য্য বৈশিষ্ট্য ও (২) (খ) বঙ্গ-সংশ্লিষ্ট-কথিরচিত শব্দাদি ও কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দের বা পরিভাষার সংক্ষিপ্ত বিচার করেছি।

(ক) ঋ=ঋগ্বেদ, ঐ:=ঐতরেয় ব্রাহ্মণ……ম=মৎস্য পু:……। বংশক্রমে বিবিধ=বিবিধ মন্বন্তর ও ভারতযুদ্ধ (সম্ভবতঃ ২য়) কে ১২২২ খৃ: পূ: ধরে প্রতি পুরুষে ২০ বছর নিয়ে সম্ভাব্য কালক্রম ; বেদীয় ঐতিহ্য-মতে যুদ্ধ (৩১০১-২ খৃ: পূ: যা প্রথম কল্পাব্দে, আধুনিক পাশ্চাত্যপন্থী মতে—১০০০—খৃ: পূ:। মহা.=মহাভারত, স.=সমসাময়িক……।

বংশগুলিকে তুলনা করে ও ঘটনানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছি, 'ভারত অংশ-গুলি' কে মহা. আদি, ৯৬-২৫ ; ম. ৫০ ; বিষ্ণু ; হরি প্রভৃতি হতে উদ্ধার করেছি। বিবস্বান্ হতে সৌতম সিদ্ধার্থ বা শেষ বুদ্ধ—১ হতে প্রায় ১৮৭ নাম ও সোম হতে বিম্বিসার পর্য্যন্ত—১ হতে প্রায় ১৮১ নাম।

(খ) বঙ্গ=পূর্ববঙ্গ ; পুণ্ড্র (বর্দ্ধন) =রাঢ়দাহী (মতান্তরে প্রেসি-ডেন্সী ও ঢাকা বিভাগও) ; গৌড়=রাঢ়দাহী ; পঞ্চগৌড়="সারস্বত—কান্যকুব্জ-উৎকল—মৈথিলাশ্চ যে। গৌড়াশ্চ…পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ" যুক্ত=তাম্রলিপ্ত (=তাম্রপর্ণী ?) বা তমলুক (মতান্তরে হুগলী ও হাওড়া অঞ্চলও) ; রাঢ়=বর্দ্ধমান বিভাগ।……

১ম

বংশক্রম এখানে দেওয়া হল। অত্রি (গ) ২৭৮ হতে কুরু ও মরুত্ত যথাক্রমে অজমীঢ় ১ম হতে ৫ ও ৬ পুরুষ পরেও সোম হতে উক্ত অজমীঢ় ২০ পুরুষে। হরি (গ) বিষ্ণুপর্ব ৩৯-৩৭ মতে বিবস্বান্ বংশীয় ইক্ষ্বাকুর (নানা কারণে ২জকে নিয়েছি) পুত্র ২য় মনুর বংশই যযাতি বংশে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

বংশানুক্রমিক ব্যক্তিইতিহাস

১। বিবিধ	২। বিবিধ	৩। বিবিধ	৪। বিবিধ	৫। বিবিধ	৬। বিবিধ	৭। বিবিধ
খাদ্যুষ	ক। ঋতু	ক। ঋতু				
মন্বন্তর —	খ। মনু ১ম	খ। মনু ১ম				
জৈন, শাংখ্য	৫। ঋষভ	গ। দেবশ্রুতি				
ও বৌদ্ধ ধর্ম	ঘ। ভরত ১ম…	ঘ। কপিল…				
— — —	— — —	— — —				
—৪০৬০—	১। বিবস্বান্	১। সোম				
অবতার-গণ	২। মনু ২য়…	২। বুধ…		(১। হিরণ্যকশিপু		
—৪৯৫০—	৩। ইক্ষ্বাকু…	৩। যযাতি	(৩। যযাতি	৪। প্রহ্লাদ		
	— — — —	— — — —	— — — —			
	১৪। শ্রাবস্ত…	…	৭। অনু…	৩। বিরোচন		
	৩১। যুবনাশ্ব	৩০। মান্ধাতার…	২৪। দ্রুহ্যপা	৭। বলি ১ম,		
—৪৩৮০—	৩২। মান্ধাতা	৩২। ইলিন…	২৫। বলি ২য়	(২৪। দীর্ঘতমা		
	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
	…	৩৪। দুষ্মন্ত	২৬। বঙ্গ …)	ও কক্ষীবান্ ২য় ;		
	৩৯। হর্য্যশ্ব ২য়	৩৪। ভরত …		ও গৌতম …)	৩৯। হর্য্যশ্ব ২য়	
	…	৪১। অজমীঢ় ১ম	৩১। অজমীঢ় ১ম	(৩১। অজমীঢ় ১ম ?	৪০। যদু ২য়	
	৪৪। বেদন বা	…৪৫। চ্যবন	…	৫৭। আজমীঢ় ২য়	…	(মার্ক, পু: ৯:…)
	ত্রিশঙ্কু	— বিজবন ?	…	৬২। কুরু ১ম		৬০। ঔর্ব্ব

১। বিবিধ	২। বিবিধ	৩। বিবিধ	৪। বিবিধ	৫। বিবিধ	৬। বিবিধ	৭। বিবিধ
—৩৯০০—	৫০। হরিশ্চন্দ্র	৫৯। সুদাস···	৫৩। বিশ্বামিত্র	৩৩। সুহস্ত্র		৬১। অগ্নীধ্রনেমি
	— — —	— — —	— — —	— — —		
	···	৬২। কুরু ১ম···	···	স হাহুবণ —	৬৭। তালজঙ্ঘ ২য়	৬২। সুদর্শ, শ্রী
সর্বত্র ; মৎস্য ?	৬১। সগর	৬৪। পরীক্ষিৎ ১ম	৬৮। উদ্যানক—	গোত্রদ···?	৬৮। হৈহয় ২য়	সগর-কন্যা প্রভা
	···	৬৫। জনমেজয়	আকৃতি ১ম		···	
—৩৯২০—	৬৪। ভগীরথ	৬৬। ধৃতরাষ্ট্র ১ম	৬৯। অযোধ			৬৩। গরুড়
	— — —	— — —	— — —			···
	···	···	৬০। ঔপোয়ন্ত			৬৭। বিদ্যুৎ
	৮৭। রঘু···		···			(স, বজ্রপাত
	৮৯। দশরথ	১৩৮। জয়াসন্ধ			১২৭। কুরু ৮ম	৬৮। অরিঞ্জয়
	···	(১৪৫। অর্জুন				ঘোষ···)
—১৮২৫—	১০৮। বৃহদ্বল	১৪৬। অভিমন্যু)				
	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	— — —	— — —				
	···	···				
	১০৭। সিদ্ধার্থ	১৮১। বিম্বিসার				
—৩১৭—	১৮৮। রাহুল	১৮২। অজাতশত্রু				
	···	···				
— — —	— ৩ —	— ৩ —	— — —	— — —	— — —	— — —

পুরাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে নব-প্রস্তরযুগের চিহ্ন বঙ্গদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঁকুড়া হতে সংগৃহীত ঐরূপ প্রস্তরকুঠারদ্বয় ও মেদিনীপুরের উত্তরপূর্বের সীমান্তদেশে অনুমিত কোন কোন বিবর্ণ মৃৎভাণ্ড মিটজিয়মে আছে; শুনেছি চট্টগ্রামেও ঐরূপ কুঠারাদির নিদর্শন মিলেছে। কলে। প্রাগৈতিহাসিক "নাইক্রোলিথ্" সভ্যতা সম্বন্ধে ডাঃ টি. এন. রামচন্দ্রন, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারাল, আগ্রার '৫৯ সালে ইতিহাস কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে যা বলেন তার ১০২ পৃষ্ঠার মর্ম এইরূপ :—

"পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বীরভানপুরে শ্রী বি, বি, লাল গুরুত্বপূর্ণ 'নাইক্রোলিথ্' শিল্পের নিদর্শন পেয়েছেন; এগুলির অবস্থিতিস্থল ও 'পটারী'-পূর্ব স্তর এদের অতি প্রাচীনত্বই প্রমাণ করে। তিনিই প্রকাশকের ও সংশ্লিষ্ট পাত্রশিল্প হতে দেখিয়েছেন যে পূর্ব ভারতের নব-প্রস্তর যুগীয় সভ্যতা দক্ষিণ ভারতের এরূপ সভ্যতা হতে বিপরীত-ধর্মী।"

নবপ্রস্তরযুগ ৫০ হাজার বছর হতেও পুরাতন হতে পারে। আবার (১) প্রাচীন ভারতে বহু একতন্ত্র বা কেন্দ্রীয় রাজা ছিলেন ও (২) বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঋষি-রাজ-সন্ন্যাসী হিন্দু প্রভৃতির পরস্পরে যোগা-যোগ ছিল প্রভৃতি হতে মনে হয় যে বিভিন্ন প্রস্তর-সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বা জ্ঞাতিত্ব থাকা সম্ভব। বাংলাদেশের কোন কোন স্থলের মৃৎভিন্নের সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার-সিন্ধুর সম্পর্ক আছে; আর উত্তর রামচন্দ্রান্, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি সেখানে বৈদিক চিত্রের সাদৃশ্যও দেখেন।

এবারে রাজপরিচয়ের কথা বলছি।

১। কূর্ম পুঃ (মাহেশের ৩০।১৪৬—১৬০) এ কথিত আছে :— যে ভরতের নামে ভারতবর্ষ তিনি ঋষভের (—১নং) পুত্র; উক্ত ভরতের পুত্র পঞ্চভূত। তৎকন্যা কুমারিকা সিন্ধের রাজা সিংহল ও প্রাক্তনরাজ্য ভারতবর্ষকে ৭২ খণ্ড বিভক্ত করে ৭২টী রাজপুত্রকে দেন। এই ৭২ জনের মধ্যে ৭২টী খণ্ডের নামকরণ হয়। এগুলির সম্পূর্ণ পরিচয়ের মধ্যে নেপাল, গৌড়, ওড্ডিয়ান, কাশ্মীর, লাড়, গুর্জরাজ্য, পুলস্ত্য, লঙ্কা ও সিংহল প্রভৃতি প্রদেশে যথাক্রমে ১০, ১৮০, ৮০ ও ৬৮ লক্ষ এবং ২১ রাজার গ্রাম (লোক ?) ছিল।

উক্ত গৌড় পঞ্চগৌড়ের ১টী বা বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ উত্তরদেশের গৌড় হতে পারে। ইক্ষুচাষের ফলে শুড় হতে বা মাতাহাভুক্ত গৌড় হতে (বা গুড়, গোড়, গোড়া হ্) গৌড়ের নাম—এই মতবাদেও কিছু সত্য থাকতে পারে। লাড় নামটী সংস্কৃত রাঢ় বা রাঢ় ও বৈদ লাড় ও গ্রীক্ 'রিডস' কথার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে।

২। সূর্যবংশীয় যুবনাশ্ব ১ মের পুত্র (১৪নং) প্রাবস্ত গৌড়দেশে প্রাবস্তী নগরীর নির্মাতা। এই গৌড়কে কেউ কেউ ইষ্ট, পি, র গোণ্ডা জেলা বা বিহারের মধ্যে মনে অনুমান করেন। তবে পূর্বোক্ত ভাষণে দুই মতের মধ্যে কোন প্রাবস্তী থাকার সম্ভব। এই প্রাবস্ত

রাজার সম্বন্ধে কূর্ম পুঃ (প, পূর্ব ২০।১৯) মৎস্য পুঃ (আ, ৪৮।২৯) ও মতই বলে :—

"নিমিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী।"

বিদেহা রূপে এঁর বর্ণনা না থাকায় বরং বংশানুক্রমিক শাসক থাকায় এই কথাই মনে হয় যে এঁদেরই পূর্ববর্তী এমন কি পরবর্তী রাজারাও স্বাভাবিকভাবে বহুদিন বঙ্গ শাসন করেছেন।

৩। (৩২-নং) যৌবনাশ্ব মান্ধাতা সোমবংশীয় অতিনায়কস্তার পুত্র। এই পরিচয়ের ঋষি ক, ১০।১৩৪।৭ দ্রষ্টা। বংশবিচারে ইনি যৌক্তি ভরতের কালের। ঐঃ ব্রাঃ ও শত ব্রাঃ মতে এই ভরতকে দীর্ঘতমা মামতের ঋষি অভিহিত করেন। ঋগ্বেদে উচথ্য বা ঔচথ্য দীর্ঘতমা ঋষি। পুরাণাদি-মতে এঁর বিবিধ পরিচয়। পুরাণমতে ঔচথ্য-ভ্রাতা বৃহস্পতি ভ্রাতৃপত্নী মমতাকে ধর্ষণ করতে গেলে গর্ভস্থ দীর্ঘতমা বাধা দেওয়ায় অন্ধত্বপ্রাপ্ত হন। অন্ধ দীর্ঘতমাকে পত্নী প্রদ্বেষী গঙ্গার জলে বন্ধাবস্থায় নিক্ষেপ করেন, পরে ইনি সুহোত্রপুত্র বলির সভায় নীত হয়ে রাজ্ঞী সুদেষ্ণার গর্ভে ইনি বলিরাজার ৬টী (মতান্তরে ৭টী) ক্ষেত্রজ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও ওড্র, ও দাসীর গর্ভে কক্ষীবান্, গৌতম প্রভৃতিকে উৎপাদন করেন। উক্ত বলি যযাতিপুত্র অনুর বংশে। ভাগবত (প, ৯।২৩) পুঃ প্রভৃতির মত উক্ত কাহিনী বর্ণনাকালে মৎস্য (আ ৪৮।২৯) ও বায়ু পুঃ এই বলিকে অনুর বৈরোচন বলিরূপেও দেখেছে। অন্যত্র এই বিভ্রম দেখা যায় না। বলির রাজ্যের বিভাগের নাম ৬টী পুত্রের নামেই হয়; তন্মধ্যে অঙ্গ বা ভাগলপুরাদি অঞ্চলের প্রাধান্য ছিল বোধ হয়, কারণ অঙ্গ বংশের বর্ণনাই পুরাণে বেঁচে আছে। মৎস্য পুঃ তে আছে—

"তেষাং তু পঞ্চধারাণাং যঙ্গাঙ্গাঃ সুহ্মকাস্তথা।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ তথা অঙ্গস্তু নিবোধত। ২৩"

মহাভা, (আ, শান্তি ৩৯) এ আছে যে, মান্ধাতা বিষ্ণুকল্পী ইন্দ্রকে চীন, কাম্বোজ (দুটীকেই পণ্ডিতেরা উঃ পঃ ভারতে পঞ্চাবাদ্বর্গত মনে করেন), যবন,...পৌণ্ড্র, পুলিন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করছেন।

উক্ত কক্ষীবানের ১।১১৭ প্রভৃতি সূক্ত ও ভাষ্যাদি হতে স্পষ্টই বোধ হয় যে ঘোষা এঁর কন্যা। ঋগ্বেদে শশীয় ও সুকীর্তি ঋষিদ্বয় "কাক্ষীবত" ও সুহস্ত্য ঋষি "ঘোষের" সহজেই একপরিবারস্থ মনে হয়।

৩(ক) বঙ্গদেশ ও মিথিলায় জ্ঞানের চর্চা দেখে ও আজমীঢ়-বংশীয় দিবোদাসের কলিঙ্গীপতি (বা পৌত্রী-পতি) অক্ষপাদ গোতমের নামের (৪২-নং) 'পরে' সম্বন্ধী বাঙ্গালীর নামে বিদেহতঃ চর্য্যাপদে পাওয়ায় এঁরও বাঙ্গালীত্ব অসম্ভব নয়।

৪। (৪৩-৫৪ নং) ঐঃ ব্রাঃ (৪, ৭৩।১৮-২১) মতে অন্ধ্রগণ, পুণ্ড্রগণ (এক পুণ্ড্র বলি-পুত্র), পুলিন্দগণ প্রভৃতি গাধী বিশ্বামিত্র হতে উৎপন্ন (শাপিত ?) আর বিশ্বামিত্র প্রভৃতির (মতান্তরে শতপুত্রের অন্যতমকে, "দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ" হও বলে অভিশাপ যেন। ইউ, পি, র জাতকুল-রাজ বিশ্বামিত্র সিন্ধু-নদীতীরে সমর করেন। তাঁর শতপুত্র বশিষ্ঠের (বৈদিক শব্দাকর বশিষ্ঠ) শাপে বিহত হয়। এই বশিষ্ঠও সম্ভবতঃ মিত্র ও বরুণের পুত্র কারণ বরুণের এক পুত্র ভৃগু এবং তৎপুত্র বা পৌত্র জমদগ্নি, আর জমদগ্নি আবার বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। এই সকলের সঙ্গেই হরিশ্চন্দ্রের সম্পর্কের কথা ঐঃ ব্রাঃ তেও আছে। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম (৬৪) মাতা রেণুকাকে হত্যা করায় কুঠার হস্ত-স্থলে থাকে ও ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করে মুক্ত হন। মতান্তরে তিনি মানস-সরোবর হতে ব্রহ্মপুত্র খনন করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিশ্বামিত্র-বাপ্রেয়ী-হরিশ্চন্দ্রকাহিনী ও বেদের "প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র বা বাচ্য" প্রভৃতি হতে বিশ্বামিত্রের স্ত্রী বাপ্রেয়ী (পূর্বতী একজন অনুবিদ্যা) বোধ হয়।

ঐঃ ব্রাঃ বা ঐঃ আঃ র লেখক বা সংগ্রাহক ঐতরের মহীদাস উক্ত ঘটনার পরবর্তীকালের তা সহজেই বলা যায়।

মহাভা (পুণ্য, শ্লোক ৭০।১২-১৩) মতে ব্রাহ্মণ্য রাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি জয় করেন।

৫। ঋগ্বেদ ১।৭৯ প্রভৃতি অনুসারে রাহুগণ গোতম (৫২ ৬০ নং) কুরু সুরথবের পুরোহিত। শত ব্রাঃ (কাণ্ব) ১১।৪।৩।৯, ১১।৬।২১ ও ১১।৬।৩।১-২ ও বংশতালিকা মতে একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে উক্ত গোতম জনক বৈদেহ ও যাজ্ঞবল্ক্য (৩৪), কহোল কৌষিতকের প্রভৃতি ১৪।২০ জনের সমসাময়িক; উক্ত কহোল আবার সাংখ্যঃ ব্রাঃ (কৌষ্) ৮ অঃ মতে গাধির বিশ্বামিত্রের, যিনি হরিশ্চন্দ্র ও (বৈশোমাদ সৈজবন) সুদাস রাজার পুরোহিতরূপে খ্যাত, কালের। শত, ব্রাঃ (কাণ্ব) ১।৪। ১।১০-তে আছে—

বিদেঘ মাঠব (বিদেহ মাধব) ও উৎপুরোহিত রাহুগণ গোতম বীপ্সু অগ্নির সহিত কোসল ও বিদেহের সীমান্বিত ("কোসলবিদেঘানাং মর্য্যাদা") সদানীরা নদীর দিকে চললেন; এই নদী অগ্নির দ্বারা অনভিদগ্ধ বা অল্প দগ্ধ ছিল ("সদানীরা ইতি উত্তরাৎ গিরেঃ নিধাবতি অনভিদগ্ধা অগ্নিনা)"। ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে গণ্ডকী নদীর পূর্বনাম সদানীরা; কিন্তু এটী অনুমান মাত্র। আবার কোসল ও বিদেহের মধ্যে সদানীরা নদী খুঁজে পাওয়া যায় না। অমরকোষমতে "করতোয়া সদানীরা।" উত্তর বঙ্গে করতোয়া নামে নদী আছে। এই নদীকে প্রদ্যোক্ত নদী মনে করলে কোসল ও বিদেহ বিহার ও উত্তর বঙ্গকে বুঝাবে। গুরেহি উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থলের উপাধিক সঙ্গে মৈথিলীর (মিথিল—বিদেহ) অধিকতর সাদৃশ্য আছে। উক্ত বিদেঘ বা গোতম ঋষি বাংলাদেশে অগ্নিপূজার পুনঃ-প্রচার বা নূতন জ্ঞানের প্রবর্তন করতে পারেন কিন্তু এঁকে বঙ্গদেশে প্রথম আর্য্যসভ্যতা-প্রচারক রূপে ধরা ঠিক নয়।

৫ (ক) মহাভারতের (শান্তি ১৪০) প্রাচীন পরীক্ষিত জনমেজয় ও তাঁকে ব্রহ্মশাপ হতে উদ্ধারকারী সৌমক ইন্দ্রোত প্রভৃতির কাহিনীকে ম পুঃ প্রভৃতি ও বংশতালিকার সাহায্যে মিলিয়ে বোধ হয় যে স্পষ্টতঃ (৩৪ নং এ) এঁরা দেবোক্ত অত্রিসম্ভূত-বংশীয়, তবে বাসুকী ও ভগিনী মনসা (আস্তীকমাতা) এই কালেরও নাগযজ্ঞ এই সম্বন্ধে বোধ হয়। শিব-গোষ্ঠীকে প্রধানতঃ হিমালয় সংশ্লিষ্ট, চাঁদসদাগর প্রভৃতিকে বঙ্গ সংশ্লিষ্ট

ও মনসাপুজা যেন বঙ্গদেশেই চলে—এই ধারণায় এঁদেরও কোন ঐতিহাসিকত্ব বঙ্গদেশীয় ও প্রাচীন বলে বোধ হয়।

৩। ভদ্রবাহু রাজা (৮২ নং ; সম্ভবতঃ ইনিই ঋগ্বেদের অশ্বমাতি রাজার তনয়ের জ্যেষ্ঠের রাজা) বাঙ্গালী হিসাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন মনে হয় ; কারণ—

(১) তাঁর নামে ও পীঠিকা নদী কেবল বঙ্গদেশেই প্রবাহিত ; ও (২) তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করে জয় করেছেন এমন প্রমাণ নেই।

সম্ভবতঃ বুদ্ধ-গৌতম এই রাজা কপিল ঋষির নামে প্রতীচ্যে সমুদ্র-পুরাণির উদ্ধারের জন্য গঙ্গানদীকে হিমালয় হতে (অবতরণ) সাগরে এনেছিলেন। তাঁরা অশ্বমেধযজ্ঞ-পরায়ণ ইন্দ্রকে কপিল ঋষির সমুদ্রপুত্র মনে করে ঋষির অবমাননা করায় ভস্ম হন। এই ঘটনার ঘটক হতে এই কপিলঋষিকে কেউ কেউ বাঙ্গালী মনে করেন। আবার অর্থবাস্থিতে বাঙ্গালী গজবিদ্যাবিশারদ, বঙ্গদেশে উত্তম হস্তী পাওয়া যায় দেখে ও ইন্দ্র ঐরাবতগজ-বাহন দেখে এক ইন্দ্রও বাঙ্গালী ছিলেন মনে করেন।

৭। বিশীলপুত্র রঘুরাজা (৮৭নং) সৈন্য ও যজ্ঞ জয় করেন। বাঙ্গালী মৌদ্গল্যও জানত। কালিদাস রঘু বংশ ৪।৩৮-৩৯ এ এই জয় সম্বন্ধে লিখেছেন :—

অনন্যসাধারণমন্যসাধনং বিনা রথাভ্যামথ বাহিনীমুখে।
আসাদ্য সংরক্ষিতসারমুদ্ধতং সুহৃদ্বৃতিং বাঙ্গবলং বিজিগ্যিবান্ ॥৩৮

তমাত্মকর্ম্মোদয়সাধ্যসাধনং বিচক্ষণোপক্রমভঙ্গসংহতম্।
প্রচক্রমে তোলয়িতুং মহাবলং মহীধরং রাজধরো ধরাধরঃ ॥৩৯

মল্লীনাথ টীকায় লিখেছেন—"বঙ্গাধিপঃ পুনঃ অনন্যসাধারণঃ ক্ষত্রিয়-আচরতে।"

৮। রামায়ণ, অযোধ্যা ১০ম সর্গ হতে রাজা দশরথ (৮৯ নং) কিরাতে বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ প্রভৃতির অধিপতিরূপে কৈকেয়ীর নিকটে পরিচয় দিচ্ছেন ও পুনরায় বাঙ্গালীর প্রশংসা করেছেন।

৯। পাণ্ডবেরা পাণ্ডবেরা বীরশ্রেষ্ঠ বঙ্গদেশ জয় করেন। মহাভারত সভা ৩০।১৩—তে ভূতীপুত্র ভীমের (১৩৫ নং) দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ততঃ সুহ্মান্ সমুদ্রসেনং চন্দ্রসেনং তাম্রলিপ্তকং কর্ব্বটাধিপতিং বীরং সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চ বিজিগ্যে বৃকোদরঃ।
ভারতভাবদীপ ॥১৩

শিশুপালের বন্ধু বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিজেকে মথুরায় বাসুদেব কৃষ্ণের (১২৭—নং) তুলনাতিরিক্ত বলে প্রচার করেন ও দ্বারকাযুদ্ধে ভারতযুদ্ধে চলায় তাঁকে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। এই সময় কলিঙ্গ খৃ ৩১০-২ খৃঃ পূঃ বা ২৪০ খৃঃ পূঃ বা তদন্তরের তৎপরবর্তী কালের অন্যান্য পূর্ব্ববর্তী।

উপরিউক্ত কয়েকটী ঘটনা হতে বলা যায় যে উত্তর প্রদেশের বিশিষ্ট প্রাচীন নেতৃবৃন্দ বহুকাল যাবৎ বঙ্গদেশের উপর ওজ বা অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করেছেন।

১০। খৃঃ পূঃ ৫ম শতকের সিংহ-বংশীয় বিজয় সিংহল-রাজা করেন।

১১। রাজা কোরখর্মনের 'বেলাভা' তাম্রপট্ট, বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিলিপি প্রভৃতি হতে স্পষ্টই জানা যায় যে আত্রেয় গোত্র ও 'চন্দ্র'-বংশীয় রাজারা বাংলায় রাজত্ব করতেন।

মৌর্যরাজা অশোক, কাণ্ব, শৌঙ্গ ও গুপ্তবংশীয় রাজগণ পাটলিপুত্র বা পাটনায় রাজধানী রেখে বহুকাল বঙ্গদেশের অধিকাংশ বিশেষতঃ পশ্চিমাংশ শাসন করেছেন।

খৃঃ পূঃ ১ম শতকের আর্ত্তিমের ইনি—কাব্যেও মেগাস্থিনিসের সংগৃহীত বিবরণী হইতে জানা যায় যে 'গঙ্গা—রিডই' বা গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ় দেশের লোকেরা প্রচণ্ড শক্তি-শালী যোদ্ধা ছিল।

পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড়, ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড় ও হরি-নারায়ণপুর, মেদিনীপুরের তমলুক প্রভৃতি স্থান হতে সংগৃহীত পাত্রলেখ, মূর্ত্তি ও মুদ্রাদি হতে বোঝা যায় যে মৌর্য্য-কাণ্ব-শুঙ্গ যুগের বহু নিদর্শন বঙ্গদেশে ভূ-প্রোথিত অবস্থায় রয়েছে।

সঙ্গীতদামোদরে বংগালী রাগিণীর নাম ও সঙ্গীতরত্নাকরে তার ব্যাখ্যা রয়েছে। হলায়ুধ এক বাঙ্গালা রাগিণীর নাম দিয়েছেন। এটী সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর নিজস্ব।

প্রাচীন বিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক অবঘোষের ললিতবিস্তর ১০ম অধ্যায়ে ৬৪ লিপির নামবিবরণ প্রসঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ ও মগধলিপির নাম আছে। হরত ব্রাহ্মী লিপির শাখা হিসাবে বঙ্গলিপি অন্যান্য প্রাদেশিক লিপির সঙ্গে সঙ্গেই উন্নতি লাভ করে আজও চলে আসছে। (ক্রমশঃ)

একটা অপ্রকাশিত গল্প

অনুবাদ : শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

এ গল্প আমি অত্যন্ত অসুস্থ জনৈক অবসরপ্রাপ্ত লোকের কাছ থেকে শুনেছিলাম। যুদ্ধে তিনি বহুবার আঘাত পেয়েছিলেন। দক্ষিণদেশে এক ফার্মে তিনি বুক কিপারের চাকরী করতেন। নানারকম বাধাবিপত্তির মাঝে যুদ্ধে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হত। তা ছাড়া শত্রুসৈন্যের মাঝে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। তারপর যুদ্ধে তার ডাক এল। ষোলোশসেক বলে তিনি প্রধান বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা পড়ে রইলেন। গরিলা বাহিনীর কম্যাণ্ডার হয়েছিলেন বলে বহুবার তিনি শত্রু দ্বারা পরিবৃত হয়েছিলেন। তা ছাড়া দু' একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী নিয়ে শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে লড়েছেন। গভীর বনে প্যারাসুটে করে তাকে নামতে হত। নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে এবং মৃত্যুর মাঝে তিনি গুপ্ত সংবাদ পাচার করতেন, যুদ্ধের নানা বিপর্যয়ের মাঝে নতুন রসদ ও বাহিনী কোথা থেকে হঠাৎ জোগাড় করে যুদ্ধজয়ের অদম্য ইচ্ছা নিয়ে তিনি শক্তি বৃদ্ধি করতেন নিজেদের। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। একদল লোক আছে যারা চল্লিশের পূর্বে বিয়ে করে না এবং এর ফলে তাদের পত্নীদের ধারালো কথা শুনতে হয়। সমস্ত অবিবাহিতের মতন দেরীতে বিয়ে করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না এবং মোহ তাকে অভিভূত করতে পারে নি। ভীষণ যুদ্ধের পর কবরের পাশে কতকগুলো কাগজ মৃত সৈনিকদের সঙ্গে দেখতে পেলেন। সেগুলো মেয়েদের হাতে লেখা। সিনিয়র সার্জেন লিপডের উদ্দেশ্যে ঐ চিঠিগুলো লেখা তার বিধবা পত্নী কর্তৃক লিখিত। ঠিকানাটা পৃথক ছিল—অর্থাৎ অন্য স্থানের ঠিকানা। চিঠিগুলো পড়ে তিনি অভিভূত হলেন। যখন সৈন্যরা হতাশায় ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন এই চিঠি পড়ে তারা উদ্দীপ্ত হত। তা ছাড়া তাদের কাছে সংবাদপত্র বা বইপত্র ছিল না বলে এই উপায় অবলম্বন করলেন। বৃদ্ধ চিঠি পড়ে কেঁদে ফেলতেন। কারণ তার মনে হত এ যেন তার ব্যক্তিগত অনুভূতি বিবৃত করছে। বৃদ্ধ জানালেন এরকম সুখ তাদের দেশ রাশিয়াতেই আছে। এই সুখী জীবনের আদর্শ সব বাধাবিপত্তি দূর করে দেয়। তারা ভেবেছিল এই সুখী পরিবার দেশে যদি একটি মাত্র থাকে তা রক্ষা করবার জন্য সৈন্যরা যুদ্ধ করবে। যে সব সৈন্যরা নিজেদের সংসারের কাহিনী বলত—তারা দোষ ত্রুটী বার করত আর দোষারোপ করত পরস্পরকে। এ চিঠি পড়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণা চলে গেল। আর বৃদ্ধ ভাবত একক অবিবাহিত জীবন যাপন করে নিজের সুখ হতে সে বঞ্চিত হয়েছে। বৃদ্ধ আরও বললেন সুখী হতে তোমার বাড়ীতে উঁকি দেয় না—তবু উঁকি দেয়। এ দম্ভ যখন বাড়ীতেও শান্তি আনবে। এই চিঠির উদ্দীপ্ত ভাব তাদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার এনে দিয়েছিল। সেই সুখের পরিবার সব সংসারের সাধারণ জীবনকে বিকশিত করেছে। কারণ তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা সব ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে প্রযোজ্য। সেই চিঠিগুলো আপনারা পড়তে পারেন।

আমার প্রিয়তম

আমি যেমন করে উৎসব পালন করি ঠিক সেই রকম ভাবে আমি ডাকঘরে যাই ; কারণ তোমার চিঠি পেয়ে আমি উৎফুল্ল হই। আমি ডাকঘরে যাই কারণ বাড়ীতে আমি থাকতে পারি না। তা ছাড়া বাড়ীতে অন্যমনস্ক থাকতে পারি, অথবা রাঁধতে থাকতে পারি বা জামা

কাপড় পরিষ্কার করতে পারি। এ অবস্থায় তোমার চিঠি গ্রহণ করতে রাজী নই। আমি গোপাল ভায়ার সঙ্গে ব্যবস্থা করে কিছুদিনের জন্য বর্ধমানে গোরবোডাতে আছি। তার ছেলে এবং আমার ছেলেরা একসঙ্গে ঘুমাতে যায়। আমি একটা পর্দার খাটে শুই। জিনাও আমার সঙ্গে শোয়। ওইটুকু বিছানায় দেহ কুঁচকে যায়। তবু একা থাকার চেয়ে এ অবস্থা আদৌ খারাপ নয়। যদি ছেলেরা জানতে পারে তোমার কথা তাহলে তারা আমাকে অস্থির করে তুলবে। তারা প্রশ্ন করবে, তুমি কোথায় আছ। তুমি কী সেখান পৌঁছেছ? আমি মানস চক্ষে দেখছি আমি তাদের সঙ্গে ওকস্‌টক সাগর পার হলাম। ভ্লাডিভস্টক থেকে মস্কোর গাড়ীতে উঠলাম। আমরা যেমন ভ্রমণ করতাম ঠিক সেই রকম ভাবে এ ভ্রমণ সুরু হল। জানলার ধারে বসে ছেলেদের বলতে লাগলাম, এইটা বৈকাল হ্রদ, ওটা উরাল পর্বত। ছেলেরা নিজেদের মধ্যেই মগ্ন থাকে। কিন্তু যখন মস্কো শহরের কাছে এলাম কলটারা সেন্ট চিন্তান্বিত হয়ে বলল: বাবা অনেক দূরে গিয়েছে—পিসিমা তিনি আসবেন ত? তুমি যদি জানতে এতে কতটা ঈর্ষা বোধ করছি। আমি যদি 'তুমি' হতেম তা হলে ছেলেদের ওই কথাতে তোমার স্থান অধিকার করে তুমি যেখানে আছ সেখানে চলে যেতাম। আমার উত্তরের চূড়ান্ত প্রান্তিক স্থানে বাস করি। তুমি যেখানে থাক—আমাদের কাছ থেকে শুধু দূরে—আরও দূরের দক্ষিণদেশে চলে যাচ্ছ এবং এখন সম্ভবতঃ তুমি দক্ষিণ দেশেই আছ। দক্ষিণ দেশের লোকেরা কাব্যের ভাষায় কথা বলে। ওগো তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হও। তুমি আমাদের মধ্যে ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যাও। উত্তর প্রান্তের দেশ আমার কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়।

এ যদি তোমার অসুস্থতা ছাড়া অন্য কিছু হত তা হলে তুমি আর আমি সেই তেমনি ভাবে ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে কাজ চালিয়ে যেতাম।

ওগো তুমি কী জান সেই রাতে আমি কী করি যখন হাওয়া বয় আর তুষার পাত সুরু হয়। আমি মনে মনে বলি তুমি এখানে এসে যদি সেই গরম দেশে নিয়ে গিয়ে আমাকে কাজের মধ্য নিয়োগ কর। কী সুন্দর না হবে? হবে না? সমুদ্র তীরে আমরা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে থাকব আর বাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে মাছ ধরব। আমি শুয়ে চোখ বুজি। সূর্য্য আমার চোখে ভেসে ওঠে; ঠিক যেমন করে সূর্য্য এখন তোমার মাথার ওপর কিরণ দিচ্ছে। সেই সূর্য্যের সৌরভ আমি পাচ্ছি। তুষার ঝড়ের মধ্যে সূর্য্য বাণী দিচ্ছে। ওগো, তাড়াতাড়ি লিখ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আমাদের চলছে। অদ্ভুত লাগে তুমি এখানে না থাকায়। সময় প্রচুর। তাই স্বাভাবিক কাজকর্ম ছাড়া বেতার বিভাগের কিছু কিছু কাজ করি। মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে আসি। আনন্দের সঙ্গে ওরা গান শোনে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনে। ওইগুলো শুনে তারা মনে মনে ভাবে তুমি কেমন আছ। আমি ভাবতেই পারি না ছেলেরা কেন তোমাকে ভালবাসে। আমার কাছে ওদের ভালবাসা যেন একচোখা লাগে। আমি স্বীকার করছি মধ্যে মধ্যে আমার অসূয়া জাগে। সকলে এখানকার কাজে ব্যস্ত। কেউ ঘুরে চলেছে। আমাদের কাছে যদি তুমি থাকতে তা হলে না হয় একটা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের আয়োজন করতাম। তোমাকে আর ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে না দেখলে আমার আর ভিন্ন রূপ থাকে না। তবে এ অস্বীকার করবার উপায় নাই কারণ ছেলেমেয়েদের সেবা যত্ন করতে ও টুকরো কাজ করতেও আমার ভাল লাগে। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মন ভাল নাই। একটা বইও পড়িনি। এমন কি সিনেমাও দেখিনি। সব কিছু কান দিয়ে শুনতে হয় মাঝে মাঝে আমার মনে হয় বুঝি বুঝি ভোঁতা হয়ে যাবে। এখানে যদি তোমাকে পেতাম। সে স্বপ্নও করি না। অবশ্য কল্পনার মধ্যে যাত্রার ফুঁকি নিতাম না, যাত্রার মালপত্র ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিত্যকে মাতাতাম না।

তোমার অসুখ আমার কাছে ও ছেলেমেয়েদের কাছে একটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। তুমি শরীরের যত্ন নেবে। সুস্থ হয়ে সব আগে আমাদের সঙ্গ দান করে সুখী করবে। আমি চিঠি লেখা শেষ করে বেশ গম্ভীর ভাবে ডাকঘরে যাই। পবিত্র অনুষ্ঠানের মত গাম্ভীর্য্য থাকে। ডাকঘরে গিয়ে চিঠি ফেললেই সে চিঠি তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। যে সব চেয়ে ধীর ও নম্র থাকে তাকেই

চিঠি ফেলতে দিই। ক'ছারা দুটো চিঠি ফেলবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। প্যাৎসক একবার চিঠি ফেলেছে—এ কাজে সে আমার সহায়তা পেয়েছে। আগামী কাল বা পরশু তোমার কাছ থেকে চিঠি পাব বলে জিজ্ঞাসা করছি না। কিন্তু আগামী শনিবার সুন্দর পোষাক পরব। উচ্ছ্বসিত মেয়েদের মতন একা চুপি চুপি ডাক ঘরে গিয়ে আরও চুপিসাড়ে নাম করব: আমার কী কোন চিঠি এসেছে। তোমার চিঠিপ্রাপ্তির আশা আমি শনিবারে করছি। ডাকঘরে মেয়ে কর্মচারী যখন 'না' বলে, তখন আমি কত কষ্ট পাই জান? যে-কোন কারণেই হোক লজ্জিত হয়ে উঠি। অকারণে? কেন তা বলতে পার। চিঠি না পেলে সে দিনটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তোমার একটা চিঠি পেলে চেনা মহলে ছুটি। তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিতে যদি তুমি ভুলে যাও তা হলে তোমার হয়ে তাদের প্রীতি জানাই। তোমার মন যত কিছু নিয়েই ব্যস্ত থাকুক না কেন, সব আগে মনে রেখ চিরকালের জন্য আমরা তোমারই। তিনটে চুমু নিও।

—ইতি—

(২)

ওগো প্রিয়তম,

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি আর আমি এক গাছের দুটী শুঁড়ি, যার মূল সেই একই শিকড়। আমাদের অন্তরের ভালবাসা এত নিবিড় যে মনে হয় গাছের ফুল বা কুঁড়িগুলি চূড়ান্ত শীর্ষে আমাদের প্রেমের পুজো করে। ঝড়ের রাতে এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যখন গাছপালা দুলে ওঠে তখন মনে হয় আমার অন্তরের পল্লবিত শাখা বুঝি ভগ্ন হল। সেই ভগ্ন শাখা তোমার মনের শাখাকে আঘাত করে। কিন্তু, ওগো ভুলো না, এ দোষ আমাদের না—এই দোষ সেই বাতাসের, তোমার স্ত্রী দক্ষিণ দেশের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। তুমি সেখানকার দখিনা বাতাস পেয়ে প্রস্ফুটিত হও। আমার ফুটতে দেরী হয়—কারণ এখানে ত আর দখিনা বাতাস নেই যার গুণগুণ গানে আমি ফুটে উঠবো, শ্যামলিমা হতে তাই আমার দেরী লাগে এবং শীত রঙ আমাকে তাড়াতাড়ি বিবর্ণ করে দেয়। কিন্তু শীতের সন্ধিক্ষণে আমার বিবর্ণ পাতা-ঝরা বৃক্ষে যে শেষ ক্রিমসন ফুলের পাতা থাকে সেটার জন্য আমরা বলি নি! এটা আমার, ওটা তোমার। আমরা তখন বলি ও হচ্ছে আমাদের। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমাদের এই ভালবাসা প্রেম বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। অবশ্য স্বীকার করি অনেক গুণী ও সাধু ব্যক্তি আছেন—যাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আছে, কোমল হৃদয় আছে। কিন্তু বিশ্বাস কর—মনে হয় আমাদের মত ভালবাসা দুনিয়াতে নাই। তাদের শিকড় পৃথক মাটিতে প্রোথিত—ভিন্ন আবেষ্টনীর মাঝে লালিত-পালিত। তাদের পাতা অন্য বাতাসে শীতল হয়।

ওগো না—কিছুতেই না। আমাদের এই রকম ভালবাসা আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। কারণ তোমার ও আমার মতন মানুষ দুনিয়াতে আসে নি। আমরা নতুন ধরণের মানুষ। আমাদের মূল, লতাপাতা ও ফুল পৃথিবীর রস নতুনভাবে আহরণ করে। সূর্যের কিরণ আমরা অভিনবভাবে আকর্ষণ করি। পাখীরা অন্য জায়গার চেয়ে এখানে বেশী গান করে। আমাকে ছেড়ে চলে গেছ। দুই হৃদয়ের একক রূপ অভিন্ন হয়ে আছে আমার কাছে। কী অসহ্য বলে মনে হয়—যখন দেখি এক আত্মা আমার অন্তরে নাই। তবে মনে মনে ভাবি, কল্পনা করি যে তুমি আমার পাশেই আছ, আমি যার মাঝ দিয়ে যাই সে হচ্ছ তুমি—আমার প্রকাশ তোমার হৃদয়ের মাঝ দিয়ে আর আমার অন্তরের মধ্যে। আমাদের বিলম্বে বোধিত প্রেম ছন্দময় পত্রে বর্ণাঢ্য করে চিত্রিত করা আমার উদ্দেশ্য। ছেলেরা তোমার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত। তারা ভাল আছে। দক্ষিণ দেশের প্রসংগ আর ওঠে না। যখন আমি চিন্তা করি বর্তমানে তুমি কী করছ, তখন আমি নিজেকে তোমার মাঝে হারিয়ে ফেলি। আমার বিষয়ে আমি যেমন ভাবি—ঠিক সেই রকম ভাবি আমি তোমার মত। তোমার আগের চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম নতুন জায়গায় স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য তুমি বেশ উদ্‌গ্রীব।

আরও জানলাম নতুন জায়গার আবেষ্টনী ও লোকদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য তুমি ব্যস্ত, কারণ সেখানকার কারও সঙ্গে তোমার তেমন পরিচয় নাই। নতুন লোকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ সময় লাগে। আমার বেশ মনে আছে বিয়ের পর তোমার উপস্থিতিতে আমি বেশ ঘেমে উঠতাম। তুমি যদি ডেকে বসতে বা অন্য কিছু

করতে তখন আমার মনে হত তুমি একজন কর্মরত সৈনিক। আমি যখন কিছু কিনতে যেতাম তখন আমার মনে হত তুমি জেগে চমকে উঠতে। আমার জন্য অপেক্ষা করতে এবং যখন তুমি জানতে না পারতে আমি কোথায় কী করছি, তখন আমার ওপর রাগ করে তুমি বকবক করতে। আমি দৌড়ে আসতাম। তুমি চুপ মেরে ঘুমিয়ে থাকতে। ভাবটা তোমার এই, যেন কিছুই হয় নি। এই ভাব দেখিয়ে আমার ওপর অবহেলা প্রকাশ করতে, আমিও কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করতাম। তারপর তুমি চোখ দুটা খুলতে। নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিতাম। নিঃশেষ হয়ে যেতাম। অতীতের রোমন্থন সমস্তকে নিঃশেষে গ্রাস করে। অতীতের স্মৃতি ভেসে আসে। বর্তমানে তুমি কেমন আছ তা আমি দেখতে পাচ্ছি। এবারও আশা করছি তুমি আমাকে একটা দীর্ঘ পত্র লিখবে। যখন লোকে দূর দেশে বার হয় তখন তারা ভাবে প্রত্যেকটি জিনিষের বিশদ বর্ণনা করবে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে লোকের একটা কথাও মনে থাকে না। আমার বন্ধুরা চারিদিকে বেরিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ভ্রমণের নেশায় বার হয়েছে। আমি যেখানে আছি সেখানে একশ চল্লিশ ঘর লোকের বসতি। চার জনের প্রাথমিক শিক্ষা আছে। একজন নিরক্ষর বৃদ্ধা আছেন। একজনের এই মত যে তাদের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবার জন্য একজন অল্পশিক্ষিত লোকের দরকার। সকলে চলে গেছে। আমি একা, ভাল লাগে না আমার। প্রত্যেক সন্ধ্যা আমার কাছে বিসদৃশ বলে মনে হয়। তুমি যেখানে গেছ সেখানে আমরা কোনকালে যাই নি। মনে ভাবি সে জায়গাটা কতই না সুন্দর। আমি গভীরভাবে পূর্বদেশ ভালবাসি। প্রকৃতির রঙের পরিবর্তন তুমি কল্পনা কর ত। এখানে কত কাক চয় তুললে তুমি অবাক হবে, এখানকার সন্ধ্যা পল্লীর দেশের স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। আকাশে সর্বদা রঙ খেলার ছড়াছড়ি। বিদ্যালয়ে ভালভাবে যথা-সাধ্য পড়বার চেষ্টা করছি। তাদের আমি একদিন সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারা আনন্দ পেয়েছিল কারণ সিনেমার বইটা ছিল যুদ্ধের। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে তারা জেগে উঠেছিল। তাই ঠিক করেছি, তাদের মজার বই দেখাব। অর্থের টানাটানি বলতে গেলে আমার নাই। এই কথাটা বললাম এই জন্যে যে সর্বদা আমার অর্থের টান পড়ছে। আমি এখন এতে অভ্যস্ত হয়েছি। তবু শেষ কপর্দকটা যখন আমার খরচ হয়ে যায়, তার জন্যে আমি মনে কিছু করি না। মন শান্ত রাখবার জন্য একটা ইংরেজী অনুবাদ করছি। আমি কী লিখেছি তা জানবার জন্যে ছেলেরা ধরাধরি করে। যে-বই অনুবাদ করছি সেই দেশের স্বপ্ন রাতে দেখি। আমরা ঘুরে বেড়াব। তুমি যখন আসবে তখন আমরা সত্যই বেড়াতে যাব। অনুবাদটা শেষ করে ভাবছি সন্ধ্যাকালীন মার্কস্ ও লেনিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব।

তুমি জান আমি শক্ত বই পড়তে পারি না। শুনে আমি বেশী মনে রাখতে পারি। বক্তৃতাগুলো সুন্দর। ছেলেরা অনেক কথা জিজ্ঞেস করে। তার আমি উত্তর দিই না। তোমার যদি টাকার টান না থাকে তা হলে অনেক বেশী করে 'তার' কর, টাকা কম থাকলে গত দুবারের মতন করবে। আমার প্রিয়তম—

ইতি

তোমারই···

(৩)

আমার প্রিয়তম,

তুমি কত দূরে আছ? ডাকঘরে গিয়ে জানলাম যে তুমি এখন যে অঞ্চলে গিয়েছ, সেখান থেকে চিঠি আসতে প্রায় দু'মাস লাগবে। সে-জায়গা বলে খুব দুর্গম, সুতরাং ঠিক করে নির্ভুল ঠিকানা লিখ। ভুল যেন না হয়। তোমার মাথা চালুনির ছিদ্রের মত সব কিছু তার মধ্য দিয়ে গলে পড়ে। আমার গোত্রর নামটা কী তোমার মনে আছে, আমাকে দু-সপ্তাহ ধরে একখানাও চিঠি দাও নি। আমি অত্যন্ত চিন্তিত আছি এর জন্য, যদি তুমি ভুল ঠিকানা লেখ তা হলে কী সাঙ্ঘাতিক হবে! তোমার লিখিত পত্র আমার হাতে এসে পৌঁছবে না। সুতরাং সাবধান, আমি না বলে পারছি না যে এখানে বসন্ত এসেছে। ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকালও তাড়াতাড়ি আসবে, মৃত পাখীর মত বাতাস এখানে মাথা খুঁড়ে মরছে। আমি মজা পাচ্ছি এই ভেবে যে শরৎ আসবে, চিমনীর মাঝে বাতাস বিষণ্ণ করা তাল তুলে। আধখানা খালি ঘর আমি পেয়েছি, আর আধখানা ঘরে জিনা থাকবে, তিনি

মালা সিনহা বলেন, "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এত শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!"

উজ্জ্বল কালো চোখ, লাবণ্য, সব মিলিয়ে মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মতনই মালা সিনহা ব্যবহার করেন বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান—তিনি পছন্দ করেন মোলায়েম, সুগন্ধ এই সাবানটি।

আপনিও এই বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিন! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যের জন্যে এবং খরচ বাঁচাবার জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

LTS. 550-X52 BO

হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত

একজন মহিলা, গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেন। সন্ধ্যা-বেলায় তিনি অনেক নতুন বইয়ের গল্প করেন ও প্রায়ই পড়েন। আমার পক্ষে খুব মর্মান্তিক হবে যদি তোমার চিঠি ভুল ঠিকানা লেখার জন্য অন্যত্র উড়ে বেড়ায়, তাতে হয়ত অনেক জরুরী খবর ছিল। এ চিঠিতে হয়ত জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। সেই গুলোর উত্তর না পেলে হয়ত নানা ধাচে চিন্তা তোমার মাথার ওপর ভর করবে। আমি ভাবতেই পারি না যে তুমি তোমার কাজে আমাকে আহ্বান করেছ। আমি জানি, হয় ত এ আহ্বানে আমার করবার কিছু নাই। অনিশ্চয়তা একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিষ। এ আকস্মিক অন্ধতার মতন। আজকাল আমার মনে হচ্ছে যে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। বর্ত্তমান বিষয়ে আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। শরৎকালের আগে আমি কী করব, জানি না। শীতকালে নিজেকে কী ভাবে খাড়া করব? যদিও এখন বসন্তকাল, গ্রীষ্ম কত স্বল্পস্থায়ী। তুমি কাছে নাই বলে সময়গুলো দীর্ঘ প্রহর বলে মনে হয়। আমি বুঝছি নিজের অসুখ বিষয়ে তুমি কোন কিছু লিখতে রাজী নও। তোমার হাতের লেখা দেখে বুঝেছি কেমন সুস্থ তুমি আছ। আমাকে আর বেশী ঘাঁটিও না, আমি জানি তোমার শরীর ভাল নাই। তুমি কেন চিঠি লিখছ না। আমি তোমাকে হারাইনি। তুমি যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছ। আমি ভাবতে পারি না কেন তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি কী এ বুঝতে পার না? এ অসম্ভব, সমস্ত ইচ্ছাশক্তি তুমি কেন্দ্রীভূত করবে। তোমার মাকে এ শক্তি আছে। আমি জানি তুমি ভাল হয়ে উঠবে। তোমার স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্য, বিশেষ করে বুকের রোগ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য অনেক ডাক্তারের কাছ থেকে বই ধার করে আমি ডাক্তারী বই পড়ছি। তোমার স্বাস্থ্যের জন্য দক্ষিণে থাকা তোমার বিশেষ দরকার। আমার বিষয়ে চিন্তা করো না। স্বাস্থ্যের দিকে তুমি নজর রেখ। সকালে ঘুম থেকে জেগে বলবে—আমি ভাল আছি, বলবান হচ্ছি এবং শক্তি অনুভব করছি। গত বছরের অভিযানগুলো কী বিমান ডাকে পাঠাচ্ছ? সে সব বিষয়ে তুমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছ। সর্ব্বদা স্ফূর্তি নিয়ে থাকবে। স্ফূর্তি থাকলে আর কোন ওষুধের দরকার হয় না। লিয়ামাণ্টন বলেছেন, মানুষের অন্যের ইচ্ছাকে কেউ রোধ করতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি মানুষের আত্মাকে উজ্জীবিত করে। ইচ্ছা করা মানে খারাপকে ঘৃণা করা, ভালকে ভালবাসা, আনন্দ করা। ইচ্ছাশক্তি সমস্ত জীব-জগতের আদি ও মূল শক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের সৃজনী শক্তির ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়। হতাশ ও আশ্বাসহীনতার মধ্যে মন্ত্রের মত কাজ করে। ওগো প্রিয় শুনছ, আমি চাই তুমি একটা অবাক কাজ কর, তুমি তা অনায়াসে করতে পার। এ করতে তোমার কোনই অসুবিধা নাই, তোমার মতন সকলকার এমন পরিবার নাই। তোমার মতন কেউ ক্রিয়াকর্ম্মা নয়, আমার মনে হয় আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম তোমার দৃঢ়ত্বব্যঞ্জক মুখ দেখে। ওই মুখে আত্মপ্রত্যয় ফুটে বার হত। এইটা আমি দেখেছিলাম তোমাকে চুমু দেওয়ার সময়। আমার অধর তোমার অধরে মিলেছিল, স্বাস্থ্য বিষয়ে একটা গীতি কবিতা লিখে রোজ গান গাও। যেমন পাখীরা গান গেয়ে থাকে। তুমি এটা ভাল করে জান যে ইচ্ছাশক্তি এবং কর্ম্মঠভাব মানুষকে পূর্ণ করে তোলে। তোমরা পুরুষরা ভাব খোসপোষাকী হয়ে থাকলে এবং টেরী বাগিয়ে থাকলে মানুষের স্বাতন্ত্র্য জাহির করা যায়। এগুলো একবারে বাজে ধারণা। মেয়েরা যদি সৌখিন পোষাক ও সুগন্ধি অনুলেপন করে, তার জন্য তুমি মেয়েদের ক্ষমা করতে পার। মানুষকে যা সুন্দর করে তা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিদীপ্ততা—তার শক্তি। এ ছাড়া আর কিছু তা পারে না। বুদ্ধি ও শক্তি যখন যার হয় তখনই তা পুরুষের সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে মুখে এবং সর্ব্বাঙ্গে। আমাদের পরিবারের মধ্যে এগুলো তোমারই ছিল। মা প্রায় বলতেন—খোকা আমাদের সংসারে শক্তির উৎস। এই কারণে আমাদের ছেলে-মেয়েরা তোমাকে ভালবাসে। তারা বোঝে আমার মধ্যে তুমি অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি এনে দিয়েছ, আমার নম্রতা ও তোমার কাজের শক্তি যেন তাদের ওপর বর্ত্তায়। তুমি কাছে থাকলে তারা সাহসী হয়, তাদের কাছে আমি থাকলে ওরা খুব বিনয়ী হয়। তুমি ছাড়া ছেলেরা মারা যাবে, কারণ তুমি তাদের সাহসী ও বলবান করে তুলেছ। এ এখন তারা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করে। প্রিয়তম, আমি তোমাকে ঠিক সেই রকমটি লিখছি—যে রকমটি লিখতাম যখন তুমি ডিনিস্ সীমান্তে থাকতে, আমি

অবাক হতাম। বিছানা ছেড়ে উঠে ভাবতাম তুমি জীবিত কী মৃত। বিছানায় শোবার সময় (লাউড স্পীকারটা) স্বরবর্ষিণী যন্ত্রটা বন্ধ করতে ভয়ে ভুলে যেতাম। ভাবতাম দম বন্ধ হয়ে বুঝি বা আমি মারা গেলাম।

বিজয়ী হয়ে ফিরে এস এই আমি চাই।

তুমি যদি সাময়িকভাবে আমাদের ভুলতে পার, তা হলে ভুলে যাও। কিন্তু তোমার বিষয়ে আমাকে ভাবতে দাও। আমার ভালবাসার রতন। তুমি সেই দিনটার কথা স্মরণ কর যেদিন তুমি ঠিক করলে আমরা একত্রে বসবাস করব। আমি সেদিন বলেছিলাম আমি তোমারই, তা মিথ্যে নয়, সেই কথাটা মনে রেখে সেই রকম ভাবে কাজ কর। তোমার শেষ চিঠির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। চিঠির সংক্ষিপ্তভাব আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তোমার চিঠিতে অনেক নতুন লোকের পরিচয় তুমি দাও। তাদের একাত্তজন বলে ভালবাসি। ছেলেরা সব সময় নিত্য নতুন বন্ধু ভালবাসে। এখানে তাদের সঙ্গে অনেক ছোট ছেলেদের পরিচয় হয়েছে। ল্যাস্ট কোচিনের কথায় আমরা বেশী কৌতুক অনুভব করি। সে যখন খনির সুড়ঙ্গে যায় তখন গরম রোমশ কম্বলের নীচে ছাই পোকার মতন সে ছটফট করে। কিন্তু একজন বৃদ্ধ লোককে নিয়ে আমি বেশী তামাসা অনুভব করি। অনেক প্রবাদ ও জনশ্রুতির উল্লেখ চিঠিতে তুমি করেছ। আমরা কিন্তু বয়স্ক লোকেদের বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক—যে বৃদ্ধ এবং ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে।

আমাকে বিশেষ ধরণের প্রীতি জানিও। সে প্রীতি এমন ভাবে জানিও যে তা যেন অন্যকে আঘাত না করে। কিন্তু গোহাই আমার অন্তরের কথা ভুলে না। আমাদের কাছে তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি।

ইতি

তোমারই···

(৪)

আমার প্রিয়তম,

শীত এসে গিয়েছে, মনে হচ্ছে তুমি যেন অন্য গ্রহে বাস করছ। তোমার কাছে সামান্য চিঠির কথা আশা করা যায় না। তোমার বিষয়ে আমি খুবই কম জানি। এখন আমি আর জানি না—তোমার বিষয়ে কিছু জানতে পারব কিনা। যথাযথভাবে আমি এটা ব্যাখ্যা করছি। তুমি কাছে নাই—এ কথা আমি চিন্তা করতে পারি না। ওগো না—না—না, আমি এ বিষয়ে ভাবতেই পারি না। ভগবান না করুন—তুমি যদি সমুদ্রে মরে যাও, তা হলেও আমি তোমাকে খুঁজে বার করব, তোমার সঙ্গে তখন কী সম্পর্ক হবে। তোমার অস্তিত্বলীনভাবে অনুভব করা যায়—ঠিক পড়ন্ত তারার মত। সম্ভবতঃ তুমি নতুন জীবন সুরু করেছ। সে নতুন জীবন আমি ছবত চিত্রায়িত করতে পারছি না। তা ছাড়া একজন জীবনের সব কিছু বুঝতে পারে না। আমার দুর্বল কল্পনাশক্তি আমি জানি। আমার কাছে সবচেয়ে যেটা বেশী জরুরী, সেটা এই যে তুমি জীবিত অবস্থায় বেঁচে আছ। সর্বদা মনে রেখ আমাদের ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের জন্য বাঁচা দরকার, তারা সব কিছু বোঝে, কিন্তু তারা ভেবে ঠিক করতে পারে না কেন তাদের বাবা গোপনে থাকে। পিতামাতার সঙ্গ ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন ; বিশেষতঃ যারা মা-বাবার বিষয়ে সব কিছু জানে। আমাদের জীবনের ছোট ছোট সাদা বা কালো বিন্দু তাদের মন জল্পনাকীর্ণ করে। তুমি যদি ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে গোপন থাকতে চাও এবং আলাদা পর্বতের মত পৃথকভাবে বাঁচতে চাও—নিজের জীবনের অংশ খানিকটা লুকিয়ে রাখতে পার, তা বলে তুমি মিথ্যে বলতে পার না।

তুমিও আমি পরস্পরের সব কথা জানি। আমরা সাদাসিধে ভাবে বাস করেছি। আমাদের জীবন ছিল মুক্ত। সুতরাং তা এখন গোপন কর না। আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে তোমার প্রতিমূর্তি আমি খোদাই করে দেব। তোমাকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিতে আমি মোটেই উদগ্রীব না। আমি বিশ্বাস করি, তুমি এখনও জীবিত এবং তুমি ভালই আছ। আমার মনে হয় তুমি নীরব আছ, এখন তুমি ভাল হয়েছ। সুস্থ হলে সব কিছুই ভাল। সকলে জীবন নতুন করে তৈরী করতে পারে, কিন্তু পূর্বের জীবন খারাপ বলে তাকে ফেলে আসতে পারে না। তুমি আমাকে লিখবে, অবশ্যই লিখবে। ওগো শুনছ, স্ত্রীকে অনেকে পরিত্যাগ করতে পারে—তা বলে এ ঠিক নয় যে—সে তার ছেলে মেয়েকে পরিত্যাগ করবে। এইটাই শিশুদের সব চেয়ে আঘাত করে। শিশুরা পিতা বা মাতা

কর্তৃক যদি পরিত্যক্ত হয় তবে জীবনে এর চেয়ে আর বড় ট্রাজেডী নাই।

জীবনে যা ঘটুক না কেন—আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার এই ব্যবহারের জন্য ছেলে মেয়েদের ওপর আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। তুমি তাদের জন্মদাতা পিতা—যাদের রক্ত-মাংসে তোমার অংশ আছে। কি করে তাদের তুমি অস্বীকার করছ। আমি তাদের যদি তুমি নিয়মিত চিঠি লেখ। তোমার চিঠি আমি নিজে লিখে তাদের মনে আনন্দ আনি। তারা যেমনটা চায় ঠিক তেমনটী উপহার দিই। তারা তোমাকে নিয়মিত চিঠি লেখে। এ বিষয়ে তারা খুব সচেতন। এখন তুমি স্থানাটোরিয়াম থেকে ছাড়া পেয়েছ এবং দক্ষিণ দেশের কোন এক সীমান্তে ভূতাত্ত্বিকের কাজ করছ। ছেলে-দের আমি যদি তুমি গোপন কাজে রত, সুতরাং তোমার জীবনের সব খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। ভাগ্য ভাল যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলা যায় না। নতুবা আমাকে অবশ্য মিথ্যা কথা বলতে হ'ত। তুমি জান, মিথ্যা কথা বলতে আমি রপ্ত নই এবং বলতেও পারি না। তারা খুব ভাল ছেলে। দিন দিন তারা স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। কিছুদিন আগে তাদের স্বভাব ও ব্যবহারের জন্য তুমি তাদের ধন্যবাদ দিয়েছিলে। তোমার সেই পত্র বিদ্যালয়ে গর্বের সঙ্গে পড়েছিল। যদি তুমি জানতে তারা কত গর্বিত। তুমি সেই গর্বের বস্তু। আগে-কার চেয়ে তারা তোমাকে আরও বেশী ভালবাসছে। যদিও তুমি আমাদের ছেড়ে গিয়েছ তবুও তুমি তাদের কাছে আদর্শ পিতা। কারণ তাদের জন্মদিন কখনও ভোল না তুমি। জন্মদিনে কত কী সুন্দর উপহার পাঠাও। ছুটির সময় তারা তোমার উপহার পায়—আগে এগুলো তোমার কাছ থেকে আশা করা যায় নি। তোমার কতগুলো দোষের মধ্যে তোমার অন্যমনস্কতা আমাকে পীড়িত করত। মনসংযোগ করবার জন্য অনেক সামান্য ঘটনাকে তুমি প্রাধান্য দিতে পেরেছ—এর জন্য আমি কৃতার্থ। একদণ্ডে বহু চিন্তা করতে তুমি কোনকালেই রাজী ছিলে না। তা ছাড়া সেই সঙ্গে নিজের মতে তুমি চলতে।

এখন এখানে শীত। জীবনের এই প্রথম শীত—তোমা বিনা আমার জীবন কাটছে। ছেলেদের জন্য যদি তোমার মন কাঁদে তা হলে সেই সমস্ত দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা ছেড়ে ফেলে দাও। তুমি নিশ্চিন্ত থাক এই ভেবে যে ছেলে-মেয়েরা আমার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে। তোমার দুশ্চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দাও। মাঝে মাঝে তোমাকে বহোমিয়ান বলে মনে হয়। জীবনের অনেক শীত শুধু পথপ্রান্তরে কাটাবে, কবে যে আমার দ্বারে আঘাত করবে। এ স্থান থেকে আমি নড়ব না। যতদিন পর্য্যন্ত তোমার সাড়া না পাই। আজকে বা ভবিষ্যতে বলতে পারবে, আমি তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করেছি। আমি অবাক হই আর ভাবি, তুমি যদি ছন্দময় একটা জাতি রচনা করতে, তা হলে তাতে তুমি কী শব্দযোজনা করতে। সেই শব্দ যোজনার মাঝে আমি আনুগত্য একটি সংযোজন করে দিতাম। সেই সুন্দর নীতিতে এই আনুগত্য একটিই থাকবে। আমি জানি না কোথায় আছ, সেখানে শীত না বসন্ত। সূর্য্য কিরণ সেখানে প্রচুর হোক। উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করুক। হাওয়া যেন বন্যায় রূপান্তরিত না হয়। সমুদ্র ভীম গর্জন যেন না করে। তুষারের শুভ্র পাত স্থানটিকে যেন আবৃত না করে। সমস্ত আশ্চর্য্য ধরণের পাখী সেই স্থানটিকে কূজনে মুখরিত করুক। বইয়ে পড়া সব পাখী তোমার পাশে পাশে বিচরণ করুক, যারা দক্ষিণ ছেড়ে কোথাও যায় না। ওগো আমার অন্তরতম, তুমি সুখে থেক। ইতি……

(২)

আমার প্রিয়তম,

আমার এইটা বোধ হয় শেষ চিঠি, কারণ কোন চিঠিই তোমার কাছে পৌঁচাচ্ছে না। এ চিঠিটাও হয়ত পৌঁছাবে না। কিন্তু না লিখে যে আমি থাকতে পারি না। আজ থেকে আমি 'নতুন জীবন' সুরু করব। তুমি ছাড়া এ জীবন সুরু করব। অন্য জীবনের পিছু-ফেলা জীবন ইতিহাসের জন্য। আর শুধু ভালবাসার কথাই বলব না। অবশ্য সে সব অতীতের কথা এখনও কী সুখ ও আবেশ এনে দেয়। মাঝে মাঝে ভাবি তুমি কী জীবিত আছ? যদি তুমি বেঁচে থাক, আমাদের জন্য যদি তোমার মন কাঁদে তা হলে তোমার কাছে আমাদের ডেক, আমি যদি জীবিত না থাকি তা হলে ছেলেমেয়েরা সেই ডাকে সাড়া দেবে। তখন তুমি

আর পৃথিবীতে একা থাকবে না। ওগো, ক্ষমা কর, ভালবাসার কথার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। কোকিলের মত জীবনের সেই এক গান আমি গাইব—জীবনের সমস্ত ঘটনায়—আচার ও অনুষ্ঠানে। কোনকালে যদি এই গৃহপ্রাঙ্গণে তুমি ফিরে আস এবং আমাকে যদি তুমি না দেখতে পাও তা হলে ছেলেমেয়েদের দেখতে পাবে। তাদের মধ্যে তোমার প্রতিচ্ছবি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং বর্তমানেও আছে। মনে রেখ, আমাদের ছেলেমেয়েরা সত্যিই সুবোধ। শুধু সুবোধই নয় সুশীলও বটে। তাদের কাছে সেই একটা কথা বল—সেই কথাটা হচ্ছে সত্যি। আমি তোমাকে জানাচ্ছি, বসন্ত এখানে শীঘ্রই আসবে।

ইতি তোমারই—

(৬)

আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা,

তোমাদের আন্তরিক প্রীতির পত্র পেয়ে কী দিয়ে যে ধন্যবাদ জানাব, তা আমি বলতে পারছি না। যখন জানলাম আলেকজাণ্ডার মারা গেছে তখন তোমাদের চিঠিই আমাকে উদ্দীপিত করেছে, উৎসাহ দিয়েছে। আমি বুঝি আমারও দিন ঘনিয়ে এল। তোমরা ঠিক সময়েই আমাকে লিখেছ সেই চিঠি। আমি অনুভব করছি তোমাদের মধ্যেই আমি বাস করছি। শেষের যে চিঠি আমি আলেকজাণ্ডারকে লিখেছিলাম তার জন্য আমি দুঃখিত। তাকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারিনে যে সে মৃত, এখন অবশ্য তার জন্য আর দুঃখ পাই না। যখন তোমরা জানালে আমার জীবনের অনেক কিছু সেই চিঠি মারফত বিকশিত হয়েছে এবং আলেকজাণ্ডার আমাকে সাহস ও শক্তি দিয়েছে তখন তার উত্তরে বলব আমার মনে হচ্ছে এইটাই ঠিক এবং এর জন্য আমি গর্বিত। জীবনের ব্যতিক্রম বলে আমি তা ভাবতেই পারি না। কারণ তোমাদের বাবা হৃদয়েরএকান্ত আপনার—তাদের মনের মধ্যে তোমরা নিজেকে প্রকাশ করতে পারনি। জীবনের যে সমস্ত অনুভূতি, ভালবাসা আমি আমার স্বামীকে প্রকাশ করেছি সেগুলো আমারই, আমার অন্তরে সেগুলো দীপ্তভাবে ফুটে উঠেছিল। তোমাদের অন্তরে যেসব ভাব ও অনুভূতি ফুটেছে সেগুলো নাকি আমারই জন্য! না, আমার তা মনে হয় না। আলেকজাণ্ডার কথাটার মাঝে যে গভীর তাৎপর্য ছিল, তা কী তাই আমি বুঝি। আমাকে ওই কথাটা মধ্যে মধ্যে চাঙা করে দিত। প্রচুর ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ে বইত। জীবনব্যাপী সংগ্রামে সে হেরে গেছে। এর জন্য তাকে আমি দোষারোপ করতে পারব না। যে কথাটা আমি বললাম, সে কথাটা তোমরাও যেন বল। আমি তোমাদের বিশ্বাস করি, কারণ আমিও উৎসাহ পেয়ে উৎসাহিত হয়েছি। মাঝে মাঝে অপরের কথা নিজের কথার চেয়ে শক্তি দেয়। তোমাদের চিঠি তা বুঝিয়ে দিল। শারীরিক দিক থেকেও বুঝছি অপরিচিতের কথাও কী শক্তি এনে দেয়। তাতে কত শক্তি আছে। ভূ-তাত্ত্বিক বন্ধু, দুগতিকার এবং খনির শ্রমিকেরা আমাকে পত্র লিখেছে। তাদের কর্মক্ষেত্র ও জীবিকার সম্বন্ধে আমার ভাল জ্ঞান নাই। তবে এইটুকু বুঝি আমার স্বামীর প্রতি আপনারা যেমন ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন আপনাদেরও প্রতি আমার স্বামী সেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। নাটকীয়ভাবে জানতে পারলাম যে আমার চিঠি আপনাদের কর্মে উদ্দীপ্ত করেছে, আপনাদের শান্তি দেয়। আমার ছেলেমেয়েদের আপনারা গভীরভাবে ভালবাসেন এবং আমাকে আপনাদের বান্ধবী বলে স্বীকার করেছেন—এর জন্য আমি ধন্য। আপনাদের চিঠি পেয়ে আমার জীবনে নতুন ভাবধারা ও চিন্তা এসেছে। দুঃখের কাহিনী বিশেষতঃ ব্যক্তিগত দুঃখের কাহিনী আপনাদের ভুলে গিয়ে আমার বলা উচিত না। কিছুদিন আগেও আপনারা আমাকে সংসারের একজন আত্মীয় বলে মনে করেন। আমি যখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি, দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন আপনাদের দূরাগত-কণ্ঠস্বর আমাকে উদ্দীপ্ত করে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি বড় ডাকঘরে যাই এবং চিঠি ফেলি তাদের উদ্দেশ্যে—যারা বহুদূরে জীবন সংগ্রামে লড়ছে। মানুষের শুধু দুটো হাত পা নাই। তারজন্য ক্ষুদ্র ভূখণ্ডও আছে, যেখানে সে খেলে বেড়ায়। মাথার ওপরে মানুষের রয়েছে নীল আকাশ। সবচেয়ে বড় কথা হল মানুষের দেহ নিঃশেষ হলে মানুষ মরে না, কিন্তু মরে গিয়ে সে বেঁচে থাকে। জীবিতের সঙ্গে মৃত মানুষ মিতালী পাতায়। সে মৃতের গতি আছে। যে গতি স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকে। আমি দুই স্মৃতির

যাইক। এক জীবন যা অতীত হয়েছে, আর এক জীবন যা বর্তমানে আছে। এ দুই যোগসূত্র ধরে আমি বেঁচে আছি। স্বামী যারা গিয়েছেন। স্বামী রেখে গেছেন তার অনেক অকৃত্রিম বন্ধু। স্বামী যারা যাওয়ার ব্যথা কম নয়, তবু আপনারা আমাকে শুভ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে দুঃখ দূর করেছেন। আপনারা আমাকে স্মরণ রাখবেন। আলেকজাণ্ডার যারা যাওয়ার পর আমার ছেলেরা আরও বড় হয়েছে। তারা আপনারা সকলকার নাম জানে। তাদের পৃথক পৃথক ভাবে আপনারা চিঠি লিখবেন। দূরের অতীত বন্ধু বা যারা বন্ধুদের সুখ দুঃখের সঙ্গে আপন অনুভূতি মিশিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের চিঠি লেখে। সে চিঠি ছেলেমেয়েদের উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করে।

ছেলেরা বুঝতে পেরেছে, আপনারা এখন আমাদের একজন। বন্ধুগণ, তারা এখন বড় হয়েছে। এখন আমার ছেলে আমার মেয়ে আমাকে জানায়, তারা বড় হয়েছে। গলার সুরে তারা এ জানিয়ে করে। ভগবানকে ধন্যবাদ। কারণ তিনি মিষ্টি, সুস্বাদু পাকা ডুমুর পাঠিয়েছেন। সত্য কথা বলতে কী, ডুমুর যে ফল তা আমি জানতাম না। ডুমুর ফলের বর্ণনার চমৎকারিত্ব এত সুন্দর যে আমার ছেলে মেয়েরা ডুমুর ফলের জন্য লোভাতুর হয়ে পড়েছে। তাদের জিব দিয়ে জল ঝরছে বলা যায়। ইস্কিণে যাওয়ার প্রস্তাব আমি হয়ত রাখতে পারব না। দূর থেকে আমার স্নেহাশিষ দিচ্ছি। আমার স্নেহাশিষ রইল—ভাই-এর প্রতি যেমন বোনের স্নেহাশিষ! কুশীয়ান ধরে তোমরা যুদ্ধ কর। সীমান্তে যুদ্ধ করছ বলে এ-চিঠি লিখলাম। তোমাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সাফল্য আমি কামনা করছি। ভাইয়েরা এগিয়ে যাও—ইতি তোমাদেরই।

সেই পরিবারের কী হল? আমি প্রশ্ন করলাম সেই মেজরকে। চিঠিগুলো তার হাতে ফেরৎ দিতে দিতে বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—তাদের বিষয়ে আর কিছু শুনেছেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বন্ধুসুলভ ভঙ্গীতে বললেন; হাঁ, সঙ্গে সঙ্গে আমরা লোসেভের মৃত্যুর কথা জানলাম, আর অনুমতি চাইলাম তিনি যেন দয়া করে এই চিঠিগুলি আমাদের কাছে রাখেন। যুদ্ধ যারা করত তারা এখনও সেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত চিঠি লেখালিখি করে। গত বছর সেই ছেলেমেয়ে মস্কো গিয়েছে। বড়ছেলেকে নিয়ে আমি ককেশাসে বেড়াতে যাব। বড় ছেলের বয়স হোল। তারপর অপত্যস্নেহে গর্বে বললেন—উপযুক্ত ছেলে বটে।

'পীটর প্যাহ্লেভ্স্কো'র 'অ্যান্ আনপাবলিশ্ট্ স্টোরি' গল্পের সংক্ষেপিত অনুবাদ।

সব মানুষের দুঃখকে আমি বহন করে চলেছি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেছে এই বিশ্বে,
কোথাও নেই বাধা
আমি দেখেছি প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ককে—
একই সুরে সাধা
বধ পড়ছে বার্সিলোনায়, ক্যাণ্টনের রাস্তায়, অনারণ্যে
সংখ্যা গণনার অতীত মানুষের যে কুকীর্তি সবই ঘটছে
আমার মাঝে,
যা কিছু ভাল তাও,
আমিই সেই পশু যাকে সে মারে, প্রাণ নেয়
আমিই সেই পাখী যাকে সে বাঁচায়, প্রাণ দেয়
অনাদি সৃষ্টির রক্ত-হতাশি হতে যে মানস ধারা বহমান
যা এখন অজ্ঞাত, সবই আমাকে করে উচ্ছ্বসিত
করে উল্লসিত, আমার এই নির্জন নিভৃত বুকে
আমি বহন করে চলেছি সব মানুষের দুঃখকে।

(২৩-৩-১৯৩৮ সালে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের কবিতা "The Cosmic" অবলম্বনে)

মেয়েদের কথা

সমাজ জীবনে বাঙালী নারীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

উষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

সেকালে আমাদের দেশে মেয়েদের সামাজিক জীবন বলে কিছু ছিল না বললেই হয়। তাঁরা ছিলেন গৃহ-কোণ-চারিণী অন্তঃপুরিকা। তাঁদের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন থাকতো গৃহসীমানার ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। সেখানে দেশবিদেশের খবরাদি কদাচিৎ পৌঁছতো। তখনকার দিনে গৃহই নারীর একমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচিত হতো। যদি কখনও মেয়েরা পূজাপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে পরস্পরের সংগে মিলিত হতেন, তখন নিতান্ত ঘরোয়া কথাবার্তায়, পরনিন্দায় ও পরচর্চাতেই তাঁদের সময় কাটতো। সেদিন তাঁরা ছিলেন একান্ত ঘরোয়া জীবনেই অভ্যস্ত—পিতৃগৃহে স্নেহময়ী কন্যা ও ভগিনীরূপে—পতিগৃহে স্বামীর প্রেমময়ী জায়ারূপে, সন্তানের কল্যাণময়ী জননীরূপে, সংসারের মমতাময়ী সেবিকারূপে ও সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে তাঁরা পরিবারপরিজন-বর্গের অশেষ আনন্দ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেই তৃপ্ত হতেন। ঘরকন্নার ছোটোখাটো কাজ নিয়েই কাটতো তাঁদের জীবন। তাঁদের কল্যাণ হস্তের সুধাময় পরশে ও সেবায় সংসারের প্রতিটি কাজ হয়ে উঠতো নিখুঁত, সুন্দর ও মধুর। তাঁরা গৃহকে করে তুলতেন অসীম সুখের উৎস-গভীর শান্তির নীড়। তাঁরা নিজগৃহ ও পরিবারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, আশা আকাংখার মধ্যেই খুঁজে পেতেন নারী-জীবনের চরম সার্থকতা। এর বাইরে সেদিন তাঁদের আর কোনও কামনা বাসনা ছিল না। তখনকার দিনে আমাদের দেশে নারীজাতির একমাত্র আদর্শ ছিল—পতিব্রতা ভার্যা, সুমাতা ও সুগৃহিণী। নারীর এই শাশ্বতী কল্যাণী মূর্তি সেকালেও যেমন মানুষকে মুগ্ধ করেছে একালেও তেমনি করে। কিন্তু যুগধর্মকে অস্বীকার করা যায় না বা কালের প্রগতিকেও রোধ করা যায় না। কতকটা যুগ-প্রভাবে, কতকটা বিজাতীয় শিক্ষার ফলে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলার পুরাতন সমাজের রূপ আজ অনেকাংশে বদলে গিয়েছে। সেই সংগে বদলেছে আমাদের সনাতন আদর্শ ও চিন্তাধারাও। আজকের দিনে তাই আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা আর নিছক ঘরোয়া জীবনেই পরিতৃপ্ত থাকতে পারছেন না। তাঁদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কর্মসূচী এখন কেবলই—"রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা"—নয়। ইংরেজি শিক্ষার ফলে বিশাল বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র-ধারার সংগে তাঁদের আজ ঘটেছে গভীর পরিচয়। দেশ বিদেশের নানাবিধ খবরবার্তাও আর তাঁদের অজানা নেই। আজকের দিনে তাঁরা বুঝছেন তাঁদের শুধু গৃহকর্মেই ব্যাপৃত থাকলে চলবে না। তাঁদের উপরে দেশের ও সমাজের যে দাবী আছে তা আজ আর তাঁরা উপেক্ষা করতে পারছেন না। তাই বলে তাঁরা নিজ নারীধর্মকেও বিসর্জন দেবেন না। গৃহের দাবীও তাঁদের কাছে তুচ্ছ নয়। আজ তাঁরা ঘরের দাবী ও বাইরের দাবীর মধ্যে চিরন্তন ঘন্দটি মিটিয়ে উভয়ের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধন করতেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। গৃহ-সীমানার বাইরে যে বৃহত্তর ও প্রশস্ততর কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা করছে, তারই উদার, উদাত্ত আহ্বানে তাঁদের অন্তরও সাড়া দিয়েছে। মানব-কল্যাণের শুভচেতনা তাঁদের প্রাণে জাগিয়েছে সীমাহীন কর্মপ্রেরণা। তাই আজকের দিনে তাঁদের জগৎ আর গৃহের সংকীর্ণ, অপরিসর পরিধির মধ্যে সীমায়িত থাকতে পারছে না। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"গৃহসীমানার মধ্যে আবদ্ধ যে সংকুচিত জীবন তাহারই সংকীর্ণ আদর্শের বহু বেষ্টনবর্জিত উৎকর্ষ লাভ দুর্লভ পদার্থ নহে। তাহার উপাদান অল্প, ক্ষেত্র অপ্রশস্ত, তাহার পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অকঠোর।" সত্যি, এখনকার দিনে যে নারী শুধু "একান্তভাবেই গৃহিণী"—তিনি আমাদের আদর্শ নন, যিনি ঘরে বাইরে "সবতাই কল্যাণী" তিনি আমাদের আদর্শ। আমাদের দেশ যেমন মেয়েদের দেখতে চেয়েছে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা রূপে, কল্যাণের প্রতিমারূপে তেমনি আবার তাঁদের আত্মশক্তির আদর্শরূপেও পূজো করেছে। আজ আদর্শ বাঙালী মেয়ে আর অবলা অন্ত পুর-চারিণীই নন, যাঁর বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না। আজকের দিনে বাঙালী মেয়ের আদর্শ—আত্মশক্তিসম্পন্না আত্ম-নির্ভরশীল। সবলা-যিনি নিজ জীবনের সার্থকতার পথ নিজেই খুঁজে নিতে পারবেন। বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আমাদের দেশের মেয়েদের অবদান নিতান্ত সামান্য নয়। সেদিন তাঁরা যে দুঃসহ

দুঃখ, গ্লানি ও নির্যাতন বরণ করেছিলেন তাই আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারী-প্রগতির পথটিকে অনেকাংশে সহজ ও সুগম করে দিয়েছে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে দেশের অগণিত নরনারীকে নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাতে করে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটিরও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। আজ পুরাতন সমাজের বনেদটিতে ভাঙন ধরতে সুরু হয়েছে। বর্তমানে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্নবস্ত্র সমস্যা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে তাই আমাদের এই রক্ষণশীল দেশেও বহু বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মেয়েকেও পুরুষদের সংগে কঠোর জীবন-সংগ্রামে নামতে হয়েছে—মুকতে হচ্ছে নির্মম নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সংগে। আজকের এই দুর্দিন অর্থসংকটের দিনে আমাদের দেশের মেয়েদের আর ঘরের কোণে বসে থাকবার অবসর কোথায়? আজ জীবনের যাত্রা-পথে তাদের আর পিছিয়ে পড়লে চলবেনা—চলতে হবে পুরুষদের সংগে সমতালে পা ফেলে ফেলে। স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধানে দেশের নর ও নারীর সমান অধিকার ঘোষিত হয়েছে—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। আমাদের মেয়েদের তাই সেই অধিকারের যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে। আজ আমাদের দেশের বহু শিক্ষিতা নারী রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতা আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশকাজে যথেষ্ট যোগ্যতারও পরিচয় দিয়েছেন। আজ অনেক শিক্ষিতা মেয়ে দেশের শাসনতন্ত্রেও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করবার অধিকারিণী হয়েছেন। সুতরাং মেয়েদের আর ঘরোয়া জীবনের অবকাশ কোথায়? আজ আমাদের দেশে অনেককেত্রেই সামাজিক জীবনে নারীকে পুরুষের মতোই সমান দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। মেয়েদের আজকের দিনে মনে রাখতে হবে তাঁরাও সমাজের একটি বিশিষ্ট অংগ। তাঁদের উপরেও সমাজের দাবী আছে। দেশের ও সমাজের বর্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে আজ তাঁদেরও আর নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। স্বাধীনোত্তর ভারতকে নতুন করে সুন্দর করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব বর্তমানে নর ও নারী উভয়েরই সমান। নারীকে আজ শুধু পুরুষের মনসহচরী হলেই চলবে না—তাকে তার কর্মসহচরীও হতে হবে। সমাজ উন্নয়ন কার্যে আজ আমাদের দেশের মেয়েদেরও সক্রিয় সহ-যোগিতা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের নারীদের আদর্শ আমাদের বিশেষভাবে অনুকরণীয়। আজকের দিনে দেশের নারীসমাজের উন্নতি না হলে দেশের সর্বাংগীন উন্নতিই অগ্রগতি ব্যাহত হবে। দেশের ও সমাজের অর্ধাংশ চিরদিনই সপ্তমীর চাঁদের অর্ধেকখানার মত অন্ধকারে ডুবে থাকতে পারে না।

আজ সামাজিক জীবনে দেশের প্রত্যেক শিক্ষিতা নারী ও শিক্ষিত পুরুষেরই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য—দেশের অগণিত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগণের মনে সুস্থ সমাজ-চেতনা (Civic sense) জাগিয়ে তোলা। এর অভাবে আমাদের দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের ও সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে থাকে। আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও দেশের লোকদের সচেতন করা দরকার। তাদের বোঝাতে হবে তারা পরস্পর একই রাষ্ট্রের ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভালোমন্দ হিতাহিতের উপরেই নির্ভর করছে রাষ্ট্রের ও সমাজের ভালমন্দ ও হিতাহিত। ব্যষ্টির স্বার্থ ও কল্যাণ যে গোষ্টির বা সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত, একথা আজও তারা বুঝতে শেখেনি। প্রয়োজন বোধে গোষ্টির বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণের কাছে ব্যষ্টির ক্ষুদ্র সুখ ও স্বার্থকেও যে বলি দেওয়া দরকার—এধারণাও তাদের নেই। আমরা অনেকসময়েই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ করে থাকি। দুই একটি ছোটো খাটো উদাহরণ দিলেই বোধহয় আমার বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হবে। মনে করুন, একটি গ্রামে পানীয় ও নিত্য ব্যবহার্য জলের তেমন সুব্যবস্থা নেই। গৃহস্থালীর বেশীর ভাগ কাজই বাড়ীর নিকটস্থ কোনও পুকুরের জলে করা হয়। একটি পরিবারে একজনের কলেরা বা টাইফয়েড বা অন্য কোনও সংক্রামক রোগ হলো। বাড়ীর লোকরা রোগীর ব্যবহৃত অপরিষ্কার বিছানাবস্ত্রাদি লুকিয়ে লুকিয়ে সেই পুকুরের জলেই কাচলো। প্রতিবেশীরা না জেনে হয়তো ঐ জল ব্যবহার করে ঐ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলো। কারুর বাড়ীতে কোনও সংক্রামক রোগ হলে অনেক সময়েই বাড়ীর লোকেরা জানে না—কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময়ে অজ্ঞতাবশত প্রতিবেশীদেরও জানতে দিতে চায় না। এই রকম করে রোগবিস্তার হতে থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায় এক বাড়ীর আবর্জনা অন্যবাড়ীর কাছে ফেলা হয়। সেবাড়ীর লোকেরা আপত্তি জানালে আবর্জনা ফেলা তো বন্ধ হয়ই না, উপরন্তু অনর্থক কলহ বিবাদের সৃষ্টি হয়। এতে করে যে নিজেদেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে এ জ্ঞান আমাদের দেশের অনেকেরই নেই।

আজকের দিনে দেশের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলায়, প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলায়—মেয়েদের যে কতোখানি দায়িত্ব সে কথাও ভুললে চলবে না। The hand that rocks the cradle rules the World—অর্থাৎ জননীর যে কল্যাণ হস্ত শিশুকে লালন করে, সেই হস্তই জগৎকে পরিচালনা করে। এই উক্তিটির মধ্যে একটি সুগভীর সত্য নিহিত আছে। শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষার বীজটি

মায়েরাই উপ্ত করেন। তাঁরাই শিশুচরিত্রের ভিত্তিস্থাপন করেন। তাঁদের উপরেই ন্যস্ত আছে—এক মস্তো বড়ো সামাজিক দায়িত্ব। সেটি হচ্ছে—আদর্শ গৃহপরিবেশ রচনা করা ও শিশুচরিত্র গঠন করা। সুসন্তান গঠন করবার জন্যে যে উপযুক্ত শিক্ষা দরকার, তা আজ আমাদের দেশের খুব কম মায়েরই আছে। আজকের দিনে দেশের প্রত্যেক জননীকে স্মরণ রাখতে হবে তাঁর আজকের শিশুটিই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিক। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে আমাদের দেশের মানুষগুলির নৈতিক মেরুদণ্ডটি ভেঙে গিয়েছে। দেশে আবার প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলবার গুরুভারটি আজ বিশেষ করে মেয়েদেরই নিতে হবে। তাই আজকের দিনে আমাদের একটি মহাসমস্যা—কিরূপে দেশে সুমাতা গড়ে তোলা যায়। সুমাতা ও সুগৃহিণী গড়ে তুলতে না পারলে দেশে সুসন্তান গড়াও সম্ভব হবে না; সেজন্যে মাতৃজাতির সুশিক্ষার উপরেই আজ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার হয়েপড়েছে। দেশের মায়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারলে আমাদের শিশুশিক্ষার সব আয়োজনই বৃথা। এই জন্যই শিশুশিক্ষার সংগে সংগে বয়স্ক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষারও ব্যাপক এবং যথোচিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু দেশব্যাপী অসীম অজ্ঞতাবশত দেশের অগণ্য অসংখ্য মানুষ আজও এ অধিকার দাবী করতে শেখেনি'। মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিক্ষিতা মেয়ে ছাড়া বাংলার নারী সমাজ এখনও জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত। বিশেষ করে আমাদের দেশের গ্রামগুলি আজ স্ত্রীশিক্ষায় অত্যন্ত অনগ্রসর। মায়েদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে দেশে স্ত্রীশিক্ষার চাহিদা হওয়াও কঠিন। মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আজ যদি মায়েদের আগ্রহ জন্মানো যায়, তবেই দেশে ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হওয়া সম্ভব। আজকের দিনে বয়স্ক-শিক্ষা ও সামাজিক-শিক্ষার জন্যে বিশেষ সরকারী প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও চাই জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। দেশে বয়স্কামেয়েদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের কাজেও যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা কর্মী আবশ্যক। আজকের দিনে গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপিত হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। এই সমিতিগুলির মাধ্যমে মেয়েরা সংঘবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করতে পারবেন। পরস্পরের সংগে অবাধ মেলামেশায় তাঁদের সামাজিক জীবনও শুভভাবে গড়ে উঠবে। আজ অনেক মেয়ের সমাজ-সেবার সাধ থাকলেও হয় তো সাধ্য নেই। একতাই বল। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে মেয়েদের পক্ষে অনেক কাজ ও সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। অন্যদের সমাজের কাজ করতে দেখলে অনেকের মনে হয় তো কর্মস্পৃহাও জাগবে। সমিতির সভ্যারা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনাদির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবেন। সমিতিগুলিতে দেশবিদেশের খবরাদি আলোচিত হতে পারে এবং ভালো বই ইত্যাদিও পড়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে সভ্যারা গ্রামের মেয়েদের আনন্দের খোরাক জোগাতে এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে পারেন। সেকালে পল্লীগ্রামে যাত্রা, গান, কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের লোকদের সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা দেবার যে সব ব্যবস্থা ছিল সেগুলিও আজ ইংরিজি শিক্ষার প্রভাবে প্রায় রহিত হতে বসেছে। গ্রামে এই গুলিরও পুনঃ প্রচলন হওয়া আবশ্যক। এই গুলিই ছিল সেকালে জনশিক্ষা ও সামাজিকশিক্ষার ধারক ও বাহক। বর্তমান কালই হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। তাই আজকের দিনে বেতার ও চলচ্চিত্রই জনশিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এই গুলির সাহায্যে গ্রামের বয়স্কা মেয়েদের সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলে দেশের নারীসমাজের শুভাবহ অজ্ঞতা কতকাংশে দূর করা সম্ভব হতে পারে। মহিলাসমিতির উদ্যোগে গ্রামের বয়স্কা মেয়েদের জন্যে বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আজকের দিনে শহরগুলিতে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আজও উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খুবই অভাব। অনেক গ্রামেই শিক্ষণপ্রাপ্তা উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবে বালিকা-বিদ্যালয়গুলির আশানুরূপ উন্নতি করা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামে ভালো শিক্ষিকা পাওয়াই দুষ্কর। শিক্ষিতা মেয়েরা গ্রামে গিয়ে বাস করতে ও কাজ করতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। অনেক সময়ে কোনও কারণে বাধ্য হয়ে গ্রামে কাজ করতে গেলেও তাঁরা বেশীদিন সেখানে থাকতে চান না। গ্রামে তাঁদের কিছু কিছু অসুবিধাও ভোগ করতে হয়। তাছাড়া সেখানে তাঁরা শহরের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু থেকেও বঞ্চিত হন। আজকের দিনে দেশের শিক্ষিতা মেয়েদেরই উচিত—পল্লীগ্রামে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দিতে চেষ্টা করা। এজন্যে তাঁদের হয়তো কিছু ত্যাগ স্বীকারও করতে হবে। কিন্তু সে ত্যাগ স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হবেনা, যদি তাঁরা শিক্ষাদানকে সমাজসেবা বলেই মনে করেন। শিক্ষিকা ভগিনীদের প্রতি আজ তাই আমার বিশেষ নিবেদন, তাঁরা যেন সমাজসেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করেন। বিদ্যা-বিক্রয়ই যেন তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়। এই সমাজ সেবার আদর্শেই তাঁরা উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করবেন তাঁদের ছাত্রীদেরও—শুধু মৌখিক উপদেশের

দ্বারাই নয়, জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাও। ছাত্রীরা যেন উপলব্ধি করে—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে ছাত্রীদের মনে সমাজ সেবার প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে দরিদ্র সাহায্য ভাণ্ডার, সমাজ-সেবাসংঘ ইত্যাদি স্থাপন করা যেতে পারে। শিক্ষিকাগণ বয়স্কশিক্ষা ইত্যাদি জনহিতকর কাজেও ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে পারেন। তাঁরা যদি বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ সমাজকে রূপায়িত করে তুলতে পারেন তবেই মেয়েরা আদর্শ নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখবে—আদর্শ সমাজ পরিবেশ সৃষ্টি করবার স্পৃহাও তাদের মনে জাগবে। বিদ্যালয় যেন সমাজের সর্ববিধ সংস্কারমূলক শিক্ষার ও গঠনমূলক কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শিক্ষিকাগণ যেখানে কাজ করবেন সেখানকার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গেও তাঁরা সবিশেষ পরিচিত হতে চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক বালিকা-বিদ্যালয়ে মাতৃদিবস নিয়মিত পালিত হওয়া দরকার, যাতে করে ছাত্রীদের মায়েদের সঙ্গে শিক্ষিকাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে। শিক্ষিকা—অভিভাবিকা সংঘ (Parents teachers association) ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁরা পরস্পরকে ভালো করে জানবার সুযোগ পেতে পারেন। শিক্ষিকাগণ নিয়মিত ছাত্রীদের গৃহে গিয়ে তাদের মায়েদের সঙ্গে এবং তাদের গৃহ-পরিবেশের সঙ্গেও পরিচিত হতে চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনবোধে যদি তাঁরা অশিক্ষিতা বা অর্ধশিক্ষিতা মায়েদের—কিরূপে আদর্শ গৃহ-পরিবেশ রচনা করা যায়—কি উপায়ে শিশুদের মানসিক বিকাশের ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়—এই সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবেন। এইখানেও শিক্ষিকাদের উপরে একটি মস্তো বড়ো সামাজিক দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। তাঁরা গ্রামের মহিলা সমিতির মাধ্যমেও অনেক জনহিতকর কাজ করবার সুযোগ পেতে পারেন। এইরকম করে তাঁরা গ্রামের সামাজিক জীবন গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে গ্রামের সমাজের এক একজন বিশিষ্টা সভ্যা বলে পরিগণিত হবেন।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজে কতকগুলি জটিল ও দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্নবস্ত্র সমস্যা ও স্বাস্থ্য সমস্যাই প্রধান।—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।"

দেশব্যাপী ভয়াবহ অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য-হীনতা দূর করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে আজ আমাদের সমাজের সকলকেই—মেয়ে ও পুরুষ উভয়কেই। এই সমস্যাগুলির সমাধান কিরূপ করতে পারা যায় সে সম্বন্ধে আজকের দিনে আমাদের দেশের মেয়েদেরও বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে এবং কাজ করতে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও অর্জিত হয়নি। দেশে জীবিকা সমস্যা, চাকুরী সমস্যা ও অন্নবস্ত্র সমস্যা দিন দিন কঠিনতর হয়ে উঠছে। শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বছরে বছরে যতো ছেলে পরীক্ষা পাশ করছে তাদের সংখ্যা অনুপাতে যথেষ্টসংখ্যক চাকুরীর ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভব নয়। শিক্ষিত বেকার যুবকেরা উপার্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করে সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। এর ফলে মেয়েদেরও অধিক বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থাকতে হচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক পিতামাতাকে বাধ্য হয়েই মেয়েদেরও পড়াতে হয়। উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে গ্রামের অনেক মেয়েই অনেক সময়ে উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পায় না। এজন্য কোনও কোনও স্থানে বালক বিদ্যালয়গুলিকেও সহশিক্ষার প্রবর্তন করতে হচ্ছে। আজকের দিনে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার একটি বিশেষ অন্তরায়। বর্তমানে এই নিদারুণ অর্থ-সংকটের দিনে আমাদের দেশে অনেক মেয়েকেই নিজ জীবিকা অর্জন করতে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষের আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। এই কারণে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা অনেক মেয়েরই আজ কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করে অন্নবস্ত্র সমস্যার আংশিক সমাধান করতে চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের দেশে সব মেয়ের পক্ষেই উচ্চশিক্ষা লাভ করে চাকুরী করা সম্ভব নয়। অনেকের পক্ষে ঘর সংসারের কাজ ও সন্তানাদি ফেলে বাইরে কাজ করতে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা সাধারণত কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে হেয় জ্ঞান করেন। অনেক সময় অনাশনে বা অর্ধাশনে দিন কাটলেও তাঁরা অপরের বাড়ীতে ঝাঁধুনীবৃত্তি বা দাসীবৃত্তি গ্রহণ করাকে অপমানজনক বলে মনে করেন। অবশ্য বর্তমানে কঠোর অভাবের তাড়নায় অনেক ভদ্রঘরের মেয়েকেও কারখানাদিতে শ্রমসাধ্য কাজও করতে হচ্ছে। এই সব অভাবগ্রস্তা মেয়েদের যদি কিছু হাতের কাজ ও

কুটিরশিল্পাদি শেখানো যায়, তাহলে তাঁরা ঘরে বসেই কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করে পরিবার প্রতিপালন বা পরিবারের আয়বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। সুখের বিষয়, দুস্থা মেয়েদের এই রকম হাতের কাজ বা কোনও বৃত্তি শিক্ষা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠে কোনও কোনও স্থানে কতকগুলি মহিলা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে। এই প্রসংগে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—যেমন 'নারী সেবাসংঘ' All bengal women's Union Home, ব্রাহ্ম সমাজ মহিলা ভবন, কংগ্রেস মহিলা শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র, নিখিল ভারত নারী সম্মেলন পরিচালিত শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র, নারীশিক্ষা সমিতি পরিচালিত মহিলা শিল্পভবন ইত্যাদি। কলকাতার নিকটেও কতকগুলি এই রকম মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যে গুলি মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত। এই গুলির মধ্যে শ্রীযুক্তা কমলাদাস প্রথিত ও পরিচালিত হাওড়া বালিকা শিল্পভবন, Kamarhati Women's cooperative Industrial Home, নিমতা হিন্দু বিধবাশ্রম, মধ্যমগ্রামে শ্রীযুক্তা শিবানী ঘোষাল পরিচালিত সংগ্রামপুর মহিলা সমিতি ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকাল গ্রামাঞ্চলেও এই রকম মহিলা শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করবার কিছু কিছু প্রচেষ্টা চলছে। পল্লীগ্রামের মেয়েদের শিল্প-শিক্ষাদেবার উদ্দেশ্যে এইরকম প্রতিষ্ঠান খুলবার আগ্রহ অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই অর্থাভাবে ও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে মহিলাকর্মীদের চেষ্টা ও উদ্যম অংকুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পাওয়াও কঠিন। কোনও কোনও জায়গায় স্থানীয় মহিলা সমিতির উদ্যোগেও মেয়েদের জন্যে শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র খুলবার কিছু কিছু চেষ্টা চলছে। আজকের দিনে গ্রামে গ্রামে মহিলাসমিতি গঠন করা এই জন্যও দরকার হয়েছে। এই মহিলাসমিতিগুলি যদি গ্রামে গ্রামে মহিলাশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেন তবে বাংলার নারী সমাজ খুবই উপকৃত হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে দুঃস্থা মেয়েদের অনেক কুটিরশিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যায়। সুখের বিষয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের উদ্যমে দুইটি সমাজকল্যাণ পর্ষদ (Social welfare board) স্থাপিত হয়েছে। আশা করা যায়, এদের আনুকূল্যে ও অর্থসাহায্যে গ্রামে গ্রামে আরও বেশীসংখ্যক মহিলা শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র অচিরে গড়ে উঠবে। এই শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্রও খোলা যেতে পারে। হাতের কাজের সংগে সংগে গ্রামের বয়স্কা মেয়েদের কিছু কিছু লিখতে পড়তে শেখালেও তাদের কিছু সামাজিক শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা করলে তাঁদের অজ্ঞতা দূর করাও কতকাংশে সম্ভব হবে। তাতে করে দেশের জনশিক্ষা সমস্যারও আংশিক সমাধান হতে পারে।

দেশের শিক্ষা ও অন্নসমস্যার সংগে তার জনস্বাস্থ্য সমস্যাটিও যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একথা বলাই বাহুল্য-মাত্র। অন্নসমস্যার সমাধান করতে না পারলে জনস্বাস্থ্য সমস্যাটির সমাধান করাও কঠিন। যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের অভাবে ও পুষ্টিকর, নির্ভেজাল খাদ্যের অভাবে দেশের দরিদ্র ও বিত্তহীন সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বাস্থ্য-হানি ঘটছে। আজ দেশে যেমন 'অন্ন চাই বলে হাহাকার উঠেছে, তেমনি 'চাই বল' 'চাই স্বাস্থ্য' রবটিও উঠেছে। এ স্বাস্থ্য সমস্যাটি দেশের শিক্ষাসমস্যার সংগেও যে বিশেষভাবে জড়িত একথা আগেই বলা হয়েছে। দেশব্যাপী অজ্ঞতা জন-সাধারণের স্বাস্থ্যহীনতার একটি অন্যতম কারণ। অনেক-ক্ষেত্রে দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত লোকদের অনব-ধানতা বশতই রোগবিস্তার ঘটে থাকে। তারা জানে না কিরূপে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, কি উপায়ে রোগবিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। সুতরাং দেশে ব্যাপক জনশিক্ষা বিস্তার হলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করাও অংশত সহজ হয়ে উঠবে। শিশুরাই দেশের ও সমাজের বিশিষ্ট সম্পদ্। তাই তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। মায়েদের জানা উচিত কিরূপে সুস্থ সবল শিশু গড়ে তোলা যায়। সুস্থ শিশু গড়ে তুলে তাঁরা শুধু জননীর কর্তব্যই সুসম্পন্ন করবেন না, সেই সংগে উপযুক্ত নাগরিকের দায়িত্বটিও পালন করবেন। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুহার খুবই বেশী। এর জন্যে মায়েদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারও কতকাংশে দায়ী। জননীর স্বাস্থ্যের উপরেও শিশুর স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সন্তান জন্মাবার আগে ও পরে প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। ভাবী জননীদের ও প্রসূতিদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে তাঁদের যথোপযুক্ত উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক। আজকাল গ্রামাঞ্চলেও কিছু কিছু মাতৃকল্যাণ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এই গুলির তত্ত্বাবধানের জন্যে শিক্ষণপ্রাপ্তা মহিলা কর্মী দরকার। এই কাজে আমাদের দেশের মেয়েদের আরও বেশী সংখ্যায় এগিয়ে আসা উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক মহিলা চিকিৎসক প্রতি বছরই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে এখনও এঁদের অভাব। মহিলা ডাক্তারগণ সমাজ সেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করেন তবে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। দেশে আরও অনেক শিক্ষিতা ধাত্রী ও সেবিকারও প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রেও মেয়েদের অনেক কাজ করবার আছে। দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ভাবী জননী ও গৃহিণীদেরও তাঁদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব ও

কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা দরকার। গৃহ ও পরিবারের স্বাস্থ্য জননী ও গৃহিণীদের উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং তাঁদের জানা উচিত কিরূপে স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে স্বল্প ব্যয়ে পরিবারের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়—কিরূপে ঘর গৃহস্থালীর কাজ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিষ্পন্ন করা যায়—কিরূপে গৃহ ও তার চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়—কিরূপে রোগ নিবারণ করা যায় ও ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়—কিরূপে রোগ বিস্তার বন্ধ করা যায় ইত্যাদি। সেজন্য বাড়ীর গৃহিণীদেরও উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। এ শিক্ষাটিও জনশিক্ষার একটি বিশিষ্ট অংশ হওয়া উচিত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্তমানকালে নারীর সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সব কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আজকাল যে সামাজিক সমস্যাগুলির আরও সমাধান হওয়া দরকার, সেইগুলির সমাধানে আমাদের দেশের মেয়েরা কিরূপে সাহায্য করতে পারেন তাই কিছু কিছু আলোচনা করতে চেয়েছি। আজ সমাজসেবার আহ্বান আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। দেশের ধনী ও বিত্তশালী সম্প্রদায়েরও অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের অনেক অমূল্য সময় ও উদ্যমও এই কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট কর্মকুশলতার পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁদের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও নিরলস কর্মোদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আজকের দিনে আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজ সেবার জন্যে চাই একান্ত দরদী মন। এ না থাকলে আমাদের সব সেবাই হয়ে উঠবে শুষ্ক কঠিন কর্তব্য—প্রাণহীন ও আন্তরিকতালেশ-শূন্য। আমরা যাদের সেবা করতে চাই সর্বপ্রথমে তাদের খুব ভালো করে জানতে হবে। তাদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে তাদের প্রতিদিনকার জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার ভাগীদার হতে হবে। তাদেরই একজন হয়ে তাদের মধ্যে কাজ করতে চেষ্টা করতে হবে। তবেই সেই সেবা হয়ে উঠবে সার্থক, সুন্দর ও প্রাণবন্ত। আজকের দিনে আমাদের শুধু শহরগুলি নিয়েই মেতে থাকলে চলবে না। ফিরে চাইতে হবে দেশের অসংখ্য অবহেলিত গ্রামগুলির দিকেও। আজকের শহরগুলির চেহারা দেখে দেশের গ্রামগুলির চেহারা কল্পনা করা যায় না। এই গ্রামগুলির অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে দেশের প্রকৃত উন্নতি কখনই সাধিত হবে না। এই সুগভীর সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাই তিনি সেদিন দেশবাসীদের দৃষ্টি গ্রামের দিকেই ফিরাতে চেয়েছিলেন। সেখানে অপেক্ষা করছে এক বিশাল বিরাট কর্মক্ষেত্র—দেশের নর ও নারীর উদ্যমেরই জন্যে আজ কবিগুরুর ভাষায় দেশের ভাগ্নিনীদের এই কাজে আহ্বান জানিয়ে বলি—

"আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই।"

রান্নাঘরের কথা

শ্রীমতী অম্বুজাবালা দেবী

রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। হাতের কাছে রাখা দরকার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র। রান্না করতে বসে রাঁধুনীকে যদি কেবল জিনিষ হাতড়ে বেড়াতে হয়, আর আসন ছেড়ে উঠে বাসন তৈজসপত্র প্রভৃতি মেজে নিয়ে রান্নাদি রাখতে হয়, তা হোলে রান্নার কাজে ব্যাঘাত ঘটে। রান্নাঘরের পাশেই ভাঁড়ার ঘর থাকা দরকার। রান্নার সাজ-সরঞ্জাম সব কিছুই গুছিয়ে রাখতে হবে ভাঁড়ার ঘরে। প্রয়োজনের সময়ে রাঁধুনী এই ঘরে এসে জিনিষ-পত্র সব নিয়ে যেতে পারে, আর তাকে হাতড়ে বেড়াতে হয় না। ভাঁড়ার ঘর এঁদো হওয়া উচিত নয়—এ ঘরে আলো-বাতাসের প্রাচুর্য্য না থাকলে ইঁদুর আরশোলার প্রধান আড্ডা হোতে পারে।

উনুনের অব্যবস্থায় রাঁধুনীকে কষ্ট পেতে হয়, বিশেষতঃ অফিসের রান্নার সময়ে মুস্কিল হয়। কাঠের উনুন স্বাস্থ্যের পক্ষে সব চেয়ে ভালো হোলেও এখন অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে। কয়লা বা কাঠের উনুনে ঘর-দোর ময়লা ও নোংরা হয়। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক উনুন ভালো। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নানা রকম রান্না করে নেওয়া যেতে পারে। রান্না ঘরও ঝকঝকে, তকতকে থাকে—কালিঝুল পড়ে না।

বর্তমান সময়ে আহার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। দৈনিক আহারের ব্যবস্থা বিশেষে যে মুখশ্রীর উন্নতি অবনতি হয়, এটা লক্ষ্য করলেই বেশ বুঝতে পারা যায়। যারা অতিভোজী, তারা কোন সাধনা করতে পারে না বা চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে পারে না। এ শ্রেণীর লোকের মুখমণ্ডলে প্রতিভার সমুজ্জ্বল আভা ফুটে বেরোয় না। যারা মাংসভোজী, তাদের মুখে সৌন্দর্য্য

থাকে না—থাকে কর্কশতা। অধ্যাপক কিয়ু কি বলেছেন, বিশুদ্ধ শোণিতই প্রকৃত মুখশ্রী এনে দিতে পারে। বিশুদ্ধ শোণিত পেতে হোলে বিশুদ্ধ আহার, বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ পানীয় দরকার। শুধু সাবান, ক্রিম মাখলেই সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে না।

বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রধান মশলা লঙ্কা। বাত ও চর্ম্ম-রোগের পক্ষে লঙ্কা প্রশস্ত। কাঁচা লঙ্কাও শরীরের পক্ষে উপযোগী, এ'তে প্রচুর ভিটামিন থাকে। কিন্তু এই লঙ্কা খুব বেশী তরকারীতে ব্যবহার করা উচিত নয়, তা'তে পেটের গোলমাল হোতে পারে। জিরা পরিমিতভাবে ব্যবহার কর্‌লে সমস্ত তরকারীই সুস্বাদু হয়। ইলিশ মাছে জিরা দেওয়া চলে না। এই মশলা পিত্ত ও বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক। আমিষ ব্যঞ্জন তৈরী কর্‌তে হোলেই হলুদ একান্ত প্রয়োজনীয়। ধনে অতিরিক্ত ব্যবহার ভালো নয়, চক্ষুর প্রতিকূল।

আদা, পিঁয়াজ ও রসুন আধুনিক রান্নার পক্ষে প্রধান মশলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাছ, মাংস ও ডিমের রকমারী ব্যঞ্জন তৈরী কর্‌তে গেলে এই তিনটী মশলা বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে। এদের প্রধান গুণ হচ্ছে বল, পুষ্টি, রক্ত, মেধা বৃদ্ধি করা, হজম শক্তি বৃদ্ধি করা—আর বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশ করা, তা ছাড়া এরা চোখের পক্ষে উপকারী।

সর্ষে খুব উপকারী মশলা নয়, তবে রান্নার বিশিষ্ট উপকরণ তো বটেই। টাট্‌কা মাছে সর্ষেবাটা প্রশস্ত। মশলা নির্ব্বাচন ও প্রয়োগের পর রান্নার ভালো মন্দ নির্ভর করে। গরমের দিনে উচ্ছে পটল চচ্চড়ি বেশ মুখরোচক। ছেঁচো আর ঝাল দুই-ই থাকে। অন্যান্য চচ্চড়ির তরকারী-গুলো যেমন এক সঙ্গে করে নিতে হয়, এ ক্ষেত্রে তা না করে, আগে উচ্ছেটা করে নিয়ে, পরে এক সঙ্গে আলু, পটল, কুমড়ো, ঝিঙে প্রভৃতি উপাদানগুলিকে করে নিতে হয়। এই চচ্চড়িতে খানিকটা আদার রস দিলে ভালো হয়।

রক্ত বৃদ্ধি কর্‌তে হোলে পালং শাক খাওয়া দরকার। পালংশাকের কাঁচা অতি উপাদেয়। ডাঁটার অংশ বেশী থাকা দরকার। এর ডাঁটা আমিষেই বেশী সুস্বাদু হয়। সর্ষে-বাটা আর খানিকটা বেশী ঝাল দিয়ে রান্না কর্‌লে উত্তম হয়। আজকাল মৎস্যব্যবসায়ীদের অপকৌশল আর রাষ্ট্রকর্ণধারদের উদাসীনতার ফলে বাজারে মাছ অগ্নি-মূল্যে বিক্রয় হয়ে থাকে, এর কোন প্রতীকার হয় না। ফলে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মাছ খাওয়া এক রকম উঠেই যাচ্ছে। এই সঙ্কট সময়ে মঙরী, মটর বা খেসারীর ডালের বড়া ভেজে তা দিয়ে ডালনা প্রস্তুত করা যেতে পারে, এর সঙ্গে আলু দিতে পারলে আরও ভালো হয়। এ ক্ষেত্রে ধোঁকাও উপাদেয়। সাধারণতঃ ছোলা ও মটর ডাল দিয়ে ধোঁকা প্রস্তুত ভালো হয়। প্রথমে ডালের দানাগুলো জলে ভিজিয়ে নরম করে মিহিভাবে শিলে বেটে নিতে হবে। তারপর তর্কারি বা চৌকো করে কেটে তেল বা ঘিয়ে ভেজে নিয়ে ডালনার মত রান্না কর্‌লেই ধোঁকা হয়। ডাল যত মিহি বাটা হবে, ধোঁকা খেতেও তত সুস্বাদু হবে।

ডালিয়া রান্নার পক্ষে ছোলা, মটর ও মুগই প্রশস্ত। ডালিয়া তৈরীর প্রণালী সোজা। অনেকটা ছক্কারই মত, তফাৎ হচ্ছে ছক্কার মত ঝুরঝুরে হবে না—পায়সের মত ঘন হবে। ছক্কার মশলাই এ'তে চল্‌বে। ডালিয়ার পোনা মাছের টাট্‌কা মাথা দিলে বিশেষ উপাদেয় হয়। অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে কিস্‌মিস্ দিতে হয়।

ডালটা আগে উত্তমভাবে ঝেড়ে-বেছে নিয়ে তারপর ঘিয়ে বা তেলে ভেজে নিতে হয়! আলু কিম্বা মাছের মাথাও রাখতে হবে ভেজে। তারপর রান্না কর্‌তে হবে। পরে মশলা দিলেও চলে, না দিলেও ক্ষতি নেই। দু' একটা কাঁচা লঙ্কা দিলে স্বাদ বাড়তে পারে। ডাল সুসিদ্ধ না হোলে ডালিয়াও সুস্বাদু হবে না।

পাতিলেবুর পোলাও পেতেও যেমন মুখরোচক, তেমনই স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। চাউল একসের, মাংস একসের, আর পাতিলেবুর রস আধসের নিয়ে কি ভাবে পোলাও হোতে পারে তাই বল্‌ছি। উপকরণ হিসেবে নিতে হবে আধসের ঘি, আধসের চিনি, আধপোয়া পেস্তা বাদাম, আধপোয়া কিসমিস, বারো আনার গরম মসলা, আধ ছটাক আদা, সিকিতোলা কুঙ্কুম, তিন তোলা ধনে আর পরিমিত নুন। এইবার উত্তম পুরানো আতপ চাল ঝেড়ে বেছে দু-ছটাক আন্দাজ লেবুর রস নিয়ে মেখে রাখতে হবে। পরে আদা, মাংস, ধনে, নুন প্রভৃতি দিয়ে আকনি করে রাখতে হবে—আর ছেঁকে জল ও মাংস আলাদা থাকবে। ঘিয়ে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আকনির জল ঢেলে দিয়ে তাতে চিনি ও আধপোয়া আন্দাজ লেবুর রস দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। এবপর মাংসে গরম মসলা ও কুঙ্কুম মাখিয়ে ঐগুলির সঙ্গে মিশোতে হবে। তারপর লেবুর রস-মাখা চাউল আধ-সিদ্ধ অবস্থায় যেন গেলে ঐ চাউল ও মাংস একত্র করে উনুনে বসাতে হবে। এর ভেতরই পেস্তা, বাদাম ও কিসমিস ঘিয়ে ভেজে চাউল ও মাংসের মাঝে দিয়ে কয়েকবার আড়া আড়ি করে হাঁড়ির মুখে ভালো করে এঁটে সবে বসিয়ে দিতে হবে। পেস্তা বাদাম মিশিয়ে দেবার সময় প্রথমেই খুব তেলে দিতে হবে। পোলাওকে শুষ্কাক্তি করবার ইচ্ছে হোলে গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া আবশ্যক। এইভাবে পাতিলেবুর পোলাও হয়।

এখনো তোমার নূপুরের ধ্বনি কানে যেন আসে মীরা !

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[illegible] মরতে চুমুক : টানছে নীরবেই !
[illegible] আজো ফুটে বহুদের মধুলোভা :
[illegible] তুমি আজ নহ বাঁশীর মতো,
[illegible] তবু ঘুমন্তের চির-অবসের প্রেমের ফসল পাই,
[illegible] তখন নাও পুষ্ট তোলো কি আজ নিখিল প্রাণ ?
চির-বুন্দে পরাণ-বিহগ গাহে যে তোমারি গান।

এখনো তোমার নূপুরের ধ্বনি কানে যেন
আসে মীরা !
[illegible] পথের গোধূলা-গন্ধা-মদিরে মাতাল করি,
[illegible] যেন যে আজ পথ চেয়ে আছে মোহন মুরলী ধরি,
[illegible] আজ মাতো তুমি কোন্ কিশোর তরুণ-নন্দিরা !
[illegible] তব মধুর চিত্তে সৃষ্টি করে
কানাকানি,
[illegible] আজ আসে ছুটে ছেড়ে বুকে লয়ে তব বাঁশী।

পাতার কুটীরে রূপগোস্বামী কি যেন তোমারে কহে,
রাধাকুণ্ডের কিশলয় ডালে তোমারি প্রদীপ শিখা।
গোবর্দ্ধনের বুকে কি তোমার রথচোড় তীর টীকা,
সেবাকুঞ্জের নৈশ-লীলায় তব উপচার রহে ?
সেবাদেবের রাজরাজেশ্বরীর ধূলি-ধূসরিত দেহ,
মিলনে বিরহে ভাবের আবেশে আজো কি
দেখেছে কেহ ?

ভজের রক্তেতে রঞ্জিতা হয়ে বহুনা-পুলিনে সবা,
কার তরে বসি করেছ ভজন দূরে রাখি সংসার ?
সোনার নূপুর কেন ফেলে দিলে ?—
কার প্রেমে অনিবার
ভুলে গেছ সব ?—কার খেয়াঘরে করেছিলে কর্ণধার !
শত লাঞ্ছনা সহিয়া নীরবে ফিরে লয়ে অপবাদ,
কোন স্বর্গের হার দিয়ে মীরা ? মিটায়েছ কার সাধ ?

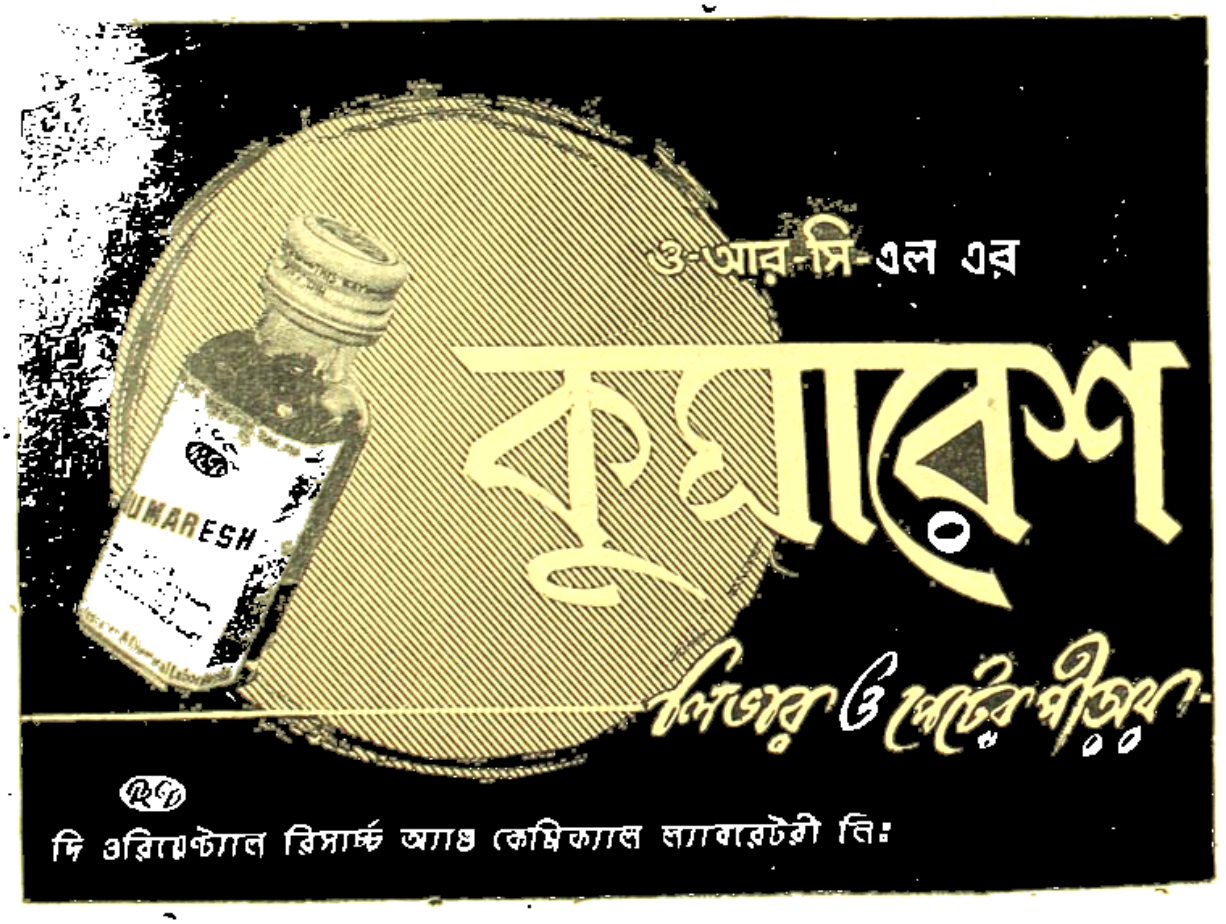

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

গত এক মাসের আন্তর্জাতিক ঘটনা-পঞ্জীতে রুশিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্থানের রাজনৈতিক চিড়িয়াখানার গুঁতাগুঁতিকে যদি সাময়িক উপযোগিতা নেওয়ার লড়াই বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তন এবং পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সম্বন্ধে তাহার একপাক্ষিক সিদ্ধান্তই গত মার্চ্চ মাসের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গত ৩০শে মার্চ্চ পূর্ব্ব পাকিস্থানের গভর্ণর মিঃ ফজলুল হক্ অকস্মাৎ এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আতাউর রহমান খাঁ ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলকে পদচ্যুত করিয়া মিঃ আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রীর পদিতে বসান। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নুরু এক আঘাতে বৃদ্ধ হক্ সাহেবকে কাৎ করেন; হাতাহাতি তাঁহার উকিলী বুদ্ধিতে যায়। সামরিকভাবে মন্ত্রত্ব হাতে লন প্রধান সেক্রেটারী মিঃ হামিদ আলি। পরদিন সকালেই সরকার সাহেবের আবু হোসেনীয় অবদান ঘটে; খাঁ সাহেব বিজয় গর্ব্বে শুষ্ক মুখলে তা দিতে দিতে আমার দুনমন্ত্রিরূপে চাকার হস্তরপানায় চোকেন।

কতকগুলি তৃতীয় শ্রেণীর কমতালোলুপ রাজনীতিকের কুৎসিৎ কামড়াকামড়ি পাকিস্থানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের প্রায় নিত্যকার ঘটনা। তবে ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাটি একটু বেশী নাটকীয়। মাত্রার এই আধিক্য ব্যতীত ইহার অন্য কোনও বৈচিত্র্য নাই। নীরস রাজনীতির ছাত্রদের পক্ষে ইহা মুখরোচক চাটনি।

প্রধান মন্ত্রীর পদে ক্রুশ্চেভ—

গত ২৭শে মার্চ্চ সোভিয়েট রুশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘোষিত হয়। এই দিন সুপ্রীম সোভিয়েটের সম্মিলিত অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভের প্রস্তাবক্রমে মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট মন্ত্রিমণ্ডলের চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মার্শাল্ বুলগানিন্ সোভিয়েট মন্ত্রিমণ্ডলের চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে মিঃ ক্রুশ্চেভ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। এই পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব অতি সামান্যই। মিঃ ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারী, অর্থাৎ পার্টিতে তাঁহার সমর্থকদের সংখ্যাধিষ্ঠতার জোরে তিনি কার্য্যতঃ মন্ত্রিমণ্ডলের ও তাহার চেয়ারম্যানের দ্রষ্টা। ক্রুশ্চেভের সমর্থকদের নীতিই এতদিন সোভিয়েট রুশিয়ার অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহার প্রধান মন্ত্রিত্ব (মন্ত্রিমণ্ডলের চেয়ারম্যান) গ্রহণে, বাস্তব রাজনীতির কোনও পরিবর্ত্তন সূচিত হয় নাই। ক্রুশ্চেভের প্রকৃত মর্য্যাদাও ইহাতে বৃদ্ধি পায় নাই।

ক্রুশ্চেভের সহিত বুলগানিনের কোনরূপ মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। সুপ্রীম সোভিয়েটে বুলগানিন্-মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ গ্রহণের প্রস্তাবে ঐ মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যের প্রতিও অনুমোদন জানান হইয়াছিল। মঃ ক্রুশ্চেভ কৃষির উন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব বিধানের; সরকারী ট্র্যাক্টর ষ্টেশনগুলির ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য কৃষির যন্ত্রপাতি যৌথ খামারগুলির নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া তাঁহার নীতি। মার্শাল বুলগানিন্ এই নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় নাই। মার্শাল বুলগানিনকে অপসারণের পশ্চাতে কোনও নীতিগত বিরোধ না থাকিলেও এই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ঘটিয়া থাকিবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তব সুবিধার জন্য। কম্যুনিষ্ট পার্টি-পালিত সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্রের নীতিতে ও তাহার আন্তর্জাতিক আচরণে পার্টির প্রথম সেক্রেটারীর গুরুত্ব প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষাও বেশী। অথচ, পার্টির প্রথম সেক্রেটারীর কোনও আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা নাই; সরকারী স্তরে যেখানে আলোচনা ও আদান-প্রদান, সেখানে তাঁহার উপস্থিতির কোনও শ্রাসঙ্গত অধিকার নাই। কোনও দেশের রাজনীতিকই শুধু দলীয় নেতৃত্বের দাবীতে আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগ দেন না, অথবা সরকারী স্তরে এক রাষ্ট্রের রাজনীতিকের অন্য রাষ্ট্র পরিদর্শনের সময় প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সহিত দলীয় নেতাকে থাকিতে হয় না। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষেত্রে এতদিন একটা ব্যতিক্রম চলিতেছিল। আন্তর্জাতিক বৈঠকে ও বিশেষ পরিস্থিতে সর্ব্বদা ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন্ মার্কা জোড়ের প্রয়োজন হইয়াছে। অথচ, এই সব ক্ষেত্রে সরকারী পদমর্য্যাদাবিহীন দলীয় নেতাকে আমন্ত্রণ জানানোটা শিষ্টতা মাত্র। বর্ত্তমানে আর একবার রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সম্মেলন আহূত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তখন সে সম্মেলনের গুরুত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী সম্মেলন অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। এই সময়ে স্বাভাবিক কারণেই ক্রুশ্চেভ একাধারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাস্তব (de facto) এবং আইনানুগ (de jure) প্রধান হইলেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—

গত ৩১শে মার্চ্চ সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঃ গ্রোমিকো সুপ্রীম সোভিয়েটে দুইটি পরিষদের সম্মিলিত অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, অন্যের সিদ্ধান্তের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট একাকী পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন্ বোমা—দুইয়ের সম্পর্কেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। ঠিক কতদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন একাকী পরীক্ষা-

নূতন বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবে তাহা বলা হয় নাই। এই সম্পর্কে মঃ ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন, "অস্ত্র যে সব গভর্ণমেণ্টের আণবিক অস্ত্র আছে, তাহারা যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ না করিয়া এইউ ও হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণ চালাইয়া যান, তাহা হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজনে বিস্ফোরণ সম্পর্কে পুনরায় স্বাধীন হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।"

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের উত্তরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের এই চাতুরীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা শিথিল করিবে না। (...The U. S. A. refused to be side-tracked from maintaining its defences by the Soviet Union's annoncement on suspending nuclear tests). মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সত্যই বন্ধ থাকিবে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় নাই; পর পর বহু বিস্ফোরণ চালাইবার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন শুধু প্রচারের সুবিধার জন্য সাময়িক-ভাবে বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; আগামী যে মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ বোমার যে বিরাট বিস্ফোরণ হইবে, সে বোমা প্রায় সম্পূর্ণ নির্দোষ—বায়ুমণ্ডলকে উহা দূষিত করিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত মন্তব্যের উত্তরে মঃ ক্রুশ্চেভ্ বলিয়াছেন—বেশ তো শুধু প্রচারের জন্যই আমেরিকা ও বৃটেন্ বিস্ফোরণ বন্ধ রাখুক না! পোপনে বিস্ফোরণ চলিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেন্-হাওয়ারের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া ক্রুশ্চেভ প্রশ্ন করিয়াছেন যে, বৃটেনের বা আমেরিকার কোনও বিস্ফোরণ কি আজ পর্য্যন্ত গোপনে চলা সম্ভব হইয়াছে? তাঁহারা যদি মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের অভাবের জন্যই আমেরিকা ও বৃটেন বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে "...The U. S. S. R. agrees to international supervision."

বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্তের ফলাফল যাহাই হউক, আপাততঃ প্রচার-যুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বড় রকমের পরাজয় ঘটিল। এই জন্যই আমেরিকার সরকারী মহলে উহা বেশী, বিবৃতিটি মাত্রাতিরিক্ত কড়া, এবং উহা কতকটা যুক্তিহীনও বটে। সোভিয়েট রুশিয়া যে সাম্প্রতিক কালে বহু বিস্ফোরণ চালাইয়াছে, এবং এখন কিছু দিন বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিলে তাহার আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণের কর্ম্মসূচী যে বিঘ্নিত হইবে না, মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের এই কথা অসত্য নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে, রুশিয়া "গোপনে বিস্ফোরণ চালাইতে পারিবে" বলিয়া যে মন্তব্য, ইহা ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই পরিচায়ক। গোপনে বিস্ফোরণ ঘটানো যদি সম্ভবই হইত, তাহা হইলে রুশিয়ার সাম্প্রতিক বিস্ফোরণগুলির উল্লেখ করিয়া তাহার বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের গুরুত্ব হ্রাস করাইবার সুযোগ সে মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরকে কখনই দিত না। তাহার পর, ক্রুশ্চেভের আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহ মানিয়া লইতে সমস্ত হওয়ায় মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্তব্যের অসারতা আরও বেশী প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, সোভিয়েট রুশিয়া প্রচার-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করিয়াছে। অন্য পক্ষ বিস্ফোরণ বন্ধ না করিলে কেহ এই সম্পর্কে একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া এতদিন যুক্তি দেখানো হইতেছিল। ইহার ফলে এই ব্যাপারে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাই-বার জন্য এক পক্ষ অগ্রবর্তী হইয়া বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক—গত কিছুকাল যিনি শান্তিকামী জনগণ ইহাই দাবী করিয়া আসিতেছে। সে দাবীকে সাড়া দিবার সামর্থ্য দেখাইয়া আণবিক শক্তির অধিকারী পাশ্চাত্য দুইটি শক্তিকে রুশিয়া আজ হারাইয়া দিল। বিশেষতঃ, প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যাপক আকারে আমেরিকার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের আয়োজন এখন চলিতেছে। ঠিক এই সময় রুশিয়ার বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত আমেরিকাকে রীতিমত অসুবিধায় ফেলিল। ইহার পর রুশিয়া যদি এই যুক্তি দেখাইয়া পুনরায় বিস্ফোরণ আরম্ভ করে যে, তাহার একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের কোনও ফল হইল না, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহার উপায় নাই, তাহা হইলে প্রচারের ক্ষেত্রে তখন সে বিজয়ীই থাকিবে।

সোভিয়েট রুশিয়াই সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব উত্থাপন করে। গত বৎসর জুন মাসে লণ্ডনে ল্যাঙ্কাষ্টার হাউসে আণ্ডি-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটীর বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জোরিন প্রস্তাব করেন—"আণবিক অস্ত্র ভাণ্ডারে লিপ্ত হওয়া সাপেক্ষ দুই তিন বৎসরের জন্য আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা হউক; এবং আন্তর্জাতিক কমিশন এই বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিয়মিত পরিষদের নিকট রিপোর্ট দিবে; বিস্ফোরণ স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হইতেছে কিনা, তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থানে এবং সোভিয়েট রুশিয়ার অভ্যন্তরেও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পর্য্যবেক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইবে।" এই প্রস্তাবে তখন বিশেষ আশার সঞ্চার হয়; প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার স্বয়ং তখন আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আশাই কাল হইল, "ন্যাটোর" কোনও কোনও পাণ্ডা মার্কিণ নয়র বিভাগ (পেণ্টাগণ) বাঁকিয়া বসিল। "Precisely because of the newly hopeful American manner, disarmament has become the subject of much perplexity and polite dissension among the members of the Atlantic Alliance. This may be because we have all grown too accustomed to "living on the dead level of the cold war" as another American (Mr. James Reston) suggests; "The familiar, unsatisfactory as it is, has become preferable to fear for the unknown." (Economist. 22. 7. 57).

"The Pentagon...is desperately anxious to carry

out its present testing programme.... Alarmed at the progress at Lancaster House, and disillusioned by the fruitless attempts to 'get at' the President, the Pentagon planners have now changed tactics and are busy lobbying Congress." —(Washington Correspondent, 'New Statesman,' 29. 6. 57). স্ট্রাটোর পাণ্ডাদের এবং পেন্টাগণের কর্তাদের এই কিংবাহিতা শেষ পর্যন্ত সফল হইল ; আমেরিকা সোভিয়েট প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। ইহার পরিবর্তে আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন নিষিদ্ধ করণ, সাধারণ অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সমস্যার মীমাংসা প্রভৃতি বিষয় জড়াইয়া জুলাই মাসে নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটীতে এক দীর্ঘ প্রস্তাব আমেরিকার পক্ষ হইতে উপস্থাপিত হইল। সোভিয়েট প্রতিনিধি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, অন্ততঃ তখনকার মত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার ব্যাপারের সহিত অন্য কোনও বিষয় জড়াইতে তাঁহারা প্রস্তুত নন। তখন হইতে সোভিয়েট রুশিয়া বলিয়া আসিতেছে যে, নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটীর ন্যায় ক্ষুদ্র কমিটীতে সমস্যার মীমাংসা হইবে না ; প্রকৃত মীমাংসার জন্য ব্যাপকতর ভিত্তিতে নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্ন আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই যুক্তিতেই সঙ্কীর্ণ ভিত্তিতে নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্ন আলোচনার জন্য জাতি-সঙ্ঘের যে প্রস্তাব, তাহা সে অগ্রাহ্য করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়,গত বৎসর জুন মাসে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব আমেরিকার প্রায় গ্রহণযোগ্য ছিল, সোভিয়েট রাজ্যের মধ্যে পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটি নির্মাণ করিতে দিতে সম্মত হইয়া সে পাশ্চাত্য জগৎকে অবাক্ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির তরপরতার জন্য তাহার ঐকান্তিক আগ্রহ সফল হইতে পারে নাই। "...a fundamental reluctance...to dismantle the cold war fortress, which it took so much money and effort to construct, and on whose preservation so many vested interests depend." (New Statesman).

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার জন্য এই উদার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেও এত দিন সোভিয়েট রুশিয়া এই সম্পর্কে এক পাক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন মহল হইতে আবেদনের উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন জানাইয়াছে যে, অন্য পক্ষের নিকট হইতে সাড়া না পাইলে তাহার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। ইহাতে এই ধারণাই সঙ্গত যে, পরীক্ষার কাজ দ্রুত কিছু দূর আগাইয়া লইয়া তাহার পর বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের দ্বারা আমেরিকা ও কুটনৈককে অস্ত্রবিহীন ফেলিবার প্রস্তুতি বহু পূর্ব হইতেই রুশিয়ার চলিয়াছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই কূটনৈতিক চাল খুবই সফল হইয়াছে। জগতের শান্তিকামী মানুষ বেশিরভাগ—উপযুক্ত তথ্যাভাবের ফলে বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব সে-ই প্রথমে করিয়াছিল, এবং এখন বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংসাহস সে-ই দেখাইল।

আমেরিকার পক্ষ হইতে "নির্দোষ" আণবিক বোমা বিস্ফোরণের কথা বলা হইতেছে, অর্থাৎ এই বোমার বিস্ফোরণে বায়ুমণ্ডল দূষিত হইবে না। গত বৎসর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যখন সোভিয়েট প্রস্তাবে কতকটা আশান্বিত হন, তখন সামরিক বিভাগের (পেন্টাগণের) কর্তারা তাঁহাকে এই নির্দোষ বোমার কথাই শুনাইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, বিস্ফোরিত বোমা সম্পূর্ণ নির্দোষ—এই ধারণা জনসাধারণের মনে সঞ্চার করিতে পারিলে বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ হইবে, এবং আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে প্রতিযোগিতা নিরুপদ্রবে চলিতে থাকিবে ; ঐ অস্ত্র নির্মিত হইলেই যুদ্ধে ও শান্তিতে আমেরিকার স্থায়ী বিজয়। "...Pentagon believes that the principle of 'clean' testing will become established in popular imagination, the agitation against the tests will die down, and they will be allowed to continue the race for the intercontinental ballistic weapon—which they are convinced they will win—in peace and quiet." ইতিমধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট ইউনিয়নের অগ্রগামিতা প্রতিপন্ন হওয়ায় পেন্টাগণের এই যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে ; ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সর্বশেষ অস্ত্র নির্মিত হইলে তখন সেই প্রাধান্যের আসনে বসিয়া অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উদারতা দেখানো যাইবে বলিয়া পেন্টাগণের যে যুক্তি, তাহা এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট চালে হারিয়া এখন আবার সেই "নির্দোষ" বোমার মোহাই দিতে হইতেছে। কৌতূহলের বিষয় এই যে, এক বৎসর পূর্বে বিস্ফোরিত বোমা শতকরা ৯৯ ভাগ নির্দোষ ছিল বলিয়া দাবী করা হয় (Recent tests are claimed to have been 95% "clean".—N. Statesman 29. 6. 57) ; এক বৎসর পরে শোনা যাইতেছে The U. S. A. has perfected a bomb which is officially claimed to be 96% free of radioactive fall-out. এক বৎসরে শতকরা ১ ভাগ অগ্রগতি !

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেবল বায়ুমণ্ডলের বিষদূষ্টি নিবারণের জন্যই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার দাবী ওঠে নাই ; এই সম্পর্কে যদি আণবিক শক্তির অধিকারী তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে আপোষ হইত, তাহা হইলে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সকল অবস্থা, তাহার অন্ততঃ সামান্য পরিবর্তন সম্ভব হইত। পরে, এই বিষয়ে ঐকমত্যকে ভিত্তি করিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয়গুলির আলোচনা চলিতে পারিত।

শ্যামাপ্রসাদ

ছিন্নবাধা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সুবালাদের বাড়ির দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল অভয়। ইতিমধ্যেই বারো বাসরের সদর দরজায় দুটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অভয়ের সঙ্কোচ হল। একেবারে একলা কখনো আসেনি। এসময়ে আসাটা উচিত হল কি না, সেটাও সংশয়।

একটি মেয়েই জিজ্ঞেস করল, কি হল নাগরের।

দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, ভাবনায় প'ড়ে গেছে। আসবে, কি আসবে না—

দুজনেই হেসে উঠল।

অভয়ও হাসল। কাছে এসে বলল, দেরকথা নয় গো ঠাকরুণ, একটু সুবালাদিদির কাছে যাব। দুজনেই চমকে হেসে উঠল। ওমা, এ সেই ভাগিনীদিদির ভাসুর-পো লো! একজন বলল, শালা সন্ধ্যেবেলাতেই বোকা। আজকে আর ছুটবে না কিছু।

আর একজন অভয়কে বলল কপট দীর্ঘশ্বাসে, ওপরতলার মানুষের কাছে এসেছ ভাই, চলে যাও সোজা সিঁড়ি দিয়ে।

কথার কারবারী অভয়। না ব'লে পারল না, উপর-তলা নীচেরতলার বাস দিয়ে কি আর উঁচুনীচুর মানুষ ঠাহর করা যায় ঠাকরুণ? তার কোন লেখাজোখা নেই। সে আছে তোমার আমার মনে মনে।

মেয়েটি বলল, মনের কারবার করি নে, খবরও রাখি নে। পতর নিয়ে নীচুতলায় থাকি, নীচুতলা-ই বুঝি বাপু।

অভয় উঠোন পার হ'য়ে সিঁড়ীতে পা দিল। কথা-বার্তা শোনা যাচ্ছে বিস্তর। সবই যেন একটু মিষ্টি ভাব। ঘরে ঘরে বাতি আছে, মানুষও দেখা যায়। কিন্তু কলরব নেই। কেবল কোন্ ঘর থেকে মেয়ে-মানুষের মোটা গলায় গান শোনা যাচ্ছে। গান নয়, একঘেয়ে একটা সুর, কথাগুলি জড়ানো জড়ানো। হঠাৎ মনে হয়, একটা শোকময় নিষুম বাড়ির কোন্ অন্ধ কোণে ব'সে কে কাঁদছে ইনিয়েবিনিয়ে।

ওপরে সারি সারি তিনটি ঘর একদিকে। একটা ঘরের দরজা বন্ধ: আর একটি ঘরে বাতি জ্বলছে, লোক নেই। তৃতীয় ঘরের বাইরের বারান্দায় একটি মেয়ে, তাকিয়ে আছে বড় রাস্তার দিকে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল।

অভয় দেখল সুবালা। বাঁ হাতে তার ছোট একটি কাচের গেলাস। অভয়কে দেখে কাচের গেলাসের তরল পদার্থটুকু চুমুক দিয়ে শেষ ক'রে, গেলাসটি বাইরেই রেখে ঘরে ঢুকল।

এ সুবালা, অভয়ের সেদিনের দেখা দুপুরের সুবালা নয়। এ সুবালার মুখে রং, চোখে কাজল। বুকের অনেকখানি কাটা পাতলা লাল জামা, তার সঙ্গে মানানসই পাতলা লালপাড়িতে রক্তাম্বরী সুবালা। বারো বাসরের চোখ পোড়াবার মতো আগুন তার সর্বাঙ্গে। হাতে গলায় সিল্কটির অলঙ্কার। ঈষৎ আরক্ত চোখ চকচক করছে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, চাউনি যেন কেটে কেটে বসে।

অভয়কে দেখে একটু বুঝি লজ্জা পেল সুবালা। ঠোঁট মুছে হেসে বলল, রস নিয়ে নিচ্ছি। নইলে পারা যায় না। এস, বস।

সুবালার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কথা যোগায় না অভয়ের মুখে। লজ্জা হয়, সঙ্কোচ হয়, মেয়েমানুষের

রঙিণী রূপ দেখে পুরুষের যে-লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটানো যায় না। তা ছাড়া কেমন একটু ভয় ভয়ও করে। অপরিচয়ের ভয়। ভামিনীর সঙ্গে সেদিন দুপুরের অবসরে কিছুটা ঘরোয়া পরিবেশ ছিল। যাত্রার আসরের আড়ালে সাজঘরের মতো যে যার নিজের পরিচয়ে মন খুলে কথা বলতে পেরেছিল সেখানে। এখানে এখন পুরোপুরি আসর, রং মেখে যে যার ভূমিকায় অবতীর্ণ। মিথ্যে দিয়ে সত্যকে জাহির করার মুন্সীয়ানা যতো, ততো পুরস্কার আর হাততালি এখানে। বুরের গাঁয়ে গঞ্জে মেলায় যে এসব দেখে নি অভয়, তা নয়। অনেক দেখেছে। কিন্তু শহরের বিজলী বাতি ঝলমানো দোতলা বাড়ির এমন সাজানো গোছানো ঘরে সুবালার মতো মেয়ে নয় তারা। ভয় করে বৈকি। নির্ভয় ক্রেতা হিসেবেও কোনোদিন মেয়েমানুষের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। এখানে অস্বস্তি যাবে কেমন করে?

অভয় বলল, মনটা ভাল গাইছে না, অসময়ে এসে পড়েছি নাকি ঠাকরুণ?

সুবালার গোটা শরীরে যেন তরল আগুনের ঢেউ খেলে যায়। হাসি নয়, তবু হাসির মতোই কী যেন ঝপ্‌ঝপ্‌ করে দুই চোখে। বলল, ঘরে আসার এই তো সময় গো। অসময় দেখলে কোথা। কিন্তু ওসব ঠাকরুণ টুকরুণ ব'লো না বাপু। নাম ধরে ডেক তার চেয়ে। দাঁড়িয়ে কেন, বস।—এই যে বসি।

সুবালা হাহা ক'রে উঠল, না না, মাটিতে নয় বিছানায় উঠে বস।

অভয় ততক্ষণে পরিষ্কার চকচকে মেঝের ওপর বসে পড়েছে। সাজানো ধবধবে শাদা বিছানার দিকে চেয়ে প্রায় সভয়ে বলল, আমি মরে গেলেও ওখানে বসতে পারবনা সুবালাদিদি।

সুবালা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল। ক্রমে হাসিটা উঁচু পর্দায় উঠাতে উঠাতে একটি অস্বাভাবিক মত্ততায় বিছানায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সুবালা।

পুতুল এল ছুটে।—কি হল রে সুবলি?

হাসতে হাসতেই হাত নেড়ে জানাল সুবালা, কিছু হয় নি।

পুতুল অবাক হয়ে অভয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, তা-ই ভাল। আমি ভাবলুম, লোক জন আসতে দেখলুম না; সুবলি তো মুখ গোমড়া করেই আছে সব সময়, তার আবার এত হাসি কিসের?

সুবালা হাসির দমকে দমকেই বলল, তা না হেসে কি করে বল্? বিছানায় উঠে বসতে বললুম, বললে, মরে গেলেও নাকি পারবে না।

আর এক চোট হেসে নিয়ে আবার বলল, আর বলে কি না 'সুবালাদিদি' 'ঠাকরুণ'। ওরে, জানিস পুতুল, ভয়ে ভয়ে এসব বলছে। যদি গায়ে প'ড়ে টানাটানি করি, সেই ভয়ে।

পুতুল তাকিয়েছিল বিব্রত অভয়ের দিকে। অভয় তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি নিয়ে মাটিতে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, না, মানে তা নয়। একটু গান শুনব বলে এসেছি। আর শত হলেও নারী ব'লে কথা, মানে মেয়েমানুষ, তাদের একটা লাজ আছে তো। তাই আর কি—

সুবালা তখনো হাসছে। ইতিমধ্যেই দু' চোখ তার কোকিলের মতো রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত মুখে রাক্তাভা, একটি অস্পষ্ট নেশার মত্ততা তার চোখে, ভাব ভঙ্গিতে। বলল, লাজ করার অনেক মেয়েমানুষ পাবে, এই বেলুনেকে কেন? নাও, এবার গান ধর। দে তো পুতুল, হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দে।

পুতুল হারমোনিয়াম নামিয়ে দিল অভয়ের সামনে। অভয় বলল, আমি নয়, ওঁকে দাও, আমি একটু বাঁয়া তবলা বাজাব। হারমোনিয়া বাজাতে পারি নে।

সুবালা বিছানা থেকে নেমে বলল, তা বললে শুনব না। আগে তোমাকেই গাইতে হবে।

অভয় হাত জোড় ক'রে বলল, জমবে না গো। তেমন গান তো আমি জানি না। তোমার গান শুনব বলেই আসা।

ভামিনীর কথা স্মরণ করেই বোধহয় সুবালা চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, শুধু গান শুনতেই আসা? আর কিছু নয়। তা' হলে যে সুবলি বেজার দেমাকই থাকে না গো।

বলে—আর মত্ত খিল্‌খিল্‌ হাসিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে সুবালা।

পুতুল বলল, সন্ধে না হতেই চড়িয়ে বসেছিস্ বুঝি?

সুবালা বলল, চড়িয়ে মরি, না চড়িয়েও মরি। মরার আর বাকী কোথায় লো মুখপুড়ি। ব'লে সুবালা কোলের কাছে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে অভয়কে বলল, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবেনা, সে দিদি বল আর ঠাকরুণই বল।

পুতুল বলল, আমি পালাচ্ছি।

সে চলে গেল। সুবালার আঙুল হারমোনিয়মের রীডের উপর দ্রুতগামী ইঁদুরের মতো সিন্‌সিন্ ক'রে খাদ থেকে চড়া, চড়া থেকে খাদে গেল নেমে।

কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগল অভয়, চোখে উদ্দীপনা। সুর যেন চেনা চেনা লাগে তার।

সুবালা গান ধরল,

আরে প্রাণ! শুধু রূপে কি করে?
আমার মন মজেছে বাঁশি সনে
(আমার) প্রাণো চায় তারে।
কি করে তার ভুলে থাকে
মন কি কারো রূপে ভোলে

আরে প্রাণ! কমল কাঁদে কালো ভোমরার তরে। সোমে এসে তাল শেষ করেই অভয় ব'লে উঠল, নিধু মশায়ের গান, তাই না? সুবালা যেন স্রোতের টানে, তরঙ্গে চলেছে ভেসে। এক অস্বাভাবিক ছটা তার সর্বাঙ্গে। অভয়ের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বলল, ও বাবা, জান দেখছি সব কিছু।

অভয় বলল, তা নয়, গুরুদেবের কাছে শুনেছি কি না গায়ে। আহা, কী কথা আর কী ভাব! প্রাণখানি বুচড়ে যেন কাদা কাদা ক'রে দেয়। আচ্ছা, সেই গানখানি জান? সেই—

গুন্‌গুন্ ক'রে গাইল অভয়,

ভালবেসে ভাল কাঁদালে···
যদি মজিবে না মনে ছিল, কেন মজালে।

তৎক্ষণে সুবালার হাত চলেছে হারমোনিয়মের রীডের ওপর। পরের লাইন সে নিজেই গেয়ে উঠল টপ্পার সুরে,

তুমি যে পরেরি সোণা
(আমার) আগে তা ছিল না জানা
জানলে পরে পরের সোণা
পরিতাপ না কর্‌তুলে।
···ভাল কাঁদালে।

মদ না খেয়েও অভয়ের চোখে মুখে চাপা নেশার উত্তেজনা। সঙ্কোচের বালাই তার গেছে। সুবালা গানটি ধরার পর তবলা বাজাতে বাজাতে, পুরো গানটি সে মনে মনে গেয়েছে। মনটা তার কোথায় যেন একটু খুত্‌ খুত্ করছে। অতৃপ্তি বোধ করছে সে। সেটা সুবালার গলার জন্য। ক্রমেই যেন সুবালার গলা বেশী তীব্র, তীক্ষ্ণ, কর্কশ হ'য়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে বারোবাসরে নিশাচর দু' একজন এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

সুবালার থামবার নাম নেই। আরক্ত চোখ তুলে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হাসছে অভয়ের দিকে চেয়ে, আর হারমোনিয়ম বাজিয়েই চলেছে। এবারকার সুর সহসা ধরা পড়ছে না অভয়ের কাছে।

সুবালা ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে বলল, বাজাও। বল দিকিনি এবার, কার গান? বলে সে ধরল,

আমারে চোখ ইশারায়
ডাক দিলে হায়
কে গো দরদী
খুলে দাও রঙ্‌মহলার
তিমির দুয়ার
ডাকিলে যদি।

বিস্মিত মোহাচ্ছন্ন গলায় ব'লে উঠল অভয়, আরে বাবারে বাবা, কী কথা! এর পরে আর আমাদের গান বাঁধা চলে না।

ব'লে অবাক হয়ে সুবালার দিকে তাকিয়ে রৈল।

সুবালা বলল, দেখছ কি? বাজাও।

ঘাড় কাৎ ক'রে সুর শুনে বলল অভয়, কি বাজাব? ওই গাবদা না গারদা, কি বলে, তাই?

সুবালা যেন গজল ভৈরবীর সুরেই হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে। বলল, সে আবার কি?

জবাবে অভয় তবলায় বোল্ তুলল!

সুবালা গাইল,

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল্ বাগিচায়
পাঠালে লিপি
পাঠালে ঘুরণী দূতী ঝড় কপোতী
বৈশাখে সখী।

অভয়ের তাল ঠিক মিলেছে।

সুবালা আবার হেসে উঠল। হারমোনিয়ম বাজাতে বাজাতেই বলল, ঠিকই তো বাজাচ্ছ। তবে ওসব গাবদা গাবদা, কি বলছ? এ তো কার্ণা।

অভয় বলল, তা হবে। ওসব নামধাম মনে থাকেনা।

হাসতে হাসতেই সুবালা নতুন কলিতে ভেসে গেল।

এমন সময়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরা একটি লোক টলতে টলতে এসে পড়ল সুবালার বিছানায়। চীৎকার ক'রে উঠল, জমদ্‌গার, জমদ্‌গার, মাইরি বলছি।

অভয়ের হাত প্রায় থেমে এল। সুবালার মুখ গম্ভীর হল, কিন্তু গান চলল ঠিক। লোকটি এবার তার শিথিল মত হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সুবালার গলা। তারপর অভয়ের দিকে ফিরে ধমকে উঠল, এই শালা, তুই চুপ কর্।

সুবালা ঝটকা মেরে লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ঝামটা দিয়ে উঠল, সরে বসনা, ধম কোথাকার!

—না সরব না। ও তবল্‌চি শালাকে বেরিয়ে যেতে বল।

অভয় ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রকাণ্ড শরীরটি যেন অপমানে শক্ত উত্তেজিত কিন্তু নত। বলল, গালা-গাল দেবেন না মশায়, শুধু শুধু গালি দেবেন না, চলি।

সুবালাও উঠে এসেছে অভয়ের কাছে। দরজার কাছে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা মজা দেখছিল তখনো।

কিন্তু লোকটি চীৎকার করে উঠল, আলবত্ গালা-গাল দেব। আমি যখন এসেছি, শালা তোকে কুকুরের মত বেরিয়ে যেতে হবে, বুঝলি?

অভয়ের চোখ ধক্‌ধক্ ক'রে জ্বলে উঠল। হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে, লোকটাকে এক হাতে টেনে নামাল সে, হাত তুলতে যেতেই সুবালা তার হাত চেপে ধরল। অভয়ের নির্বাক কিন্তু রুদ্র মূর্তি দেখে সুবালার আরক্ত চোখও শান্ত হয়ে এসেছে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে, অভয় বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

রাঙ্গুমাসী এল চীৎকার করতে করতে, কি হয়েছে কি?

সুবালা বলল, মাতালটিকে দেখিয়ে, একে বার করার ব্যবস্থা কর মাসী, নইলে ঘরে ঢুকব না।

ব'লে সেও অভয়ের পিছনে পিছনে সিঁড়ী দিয়ে নীচে নেমে এল। ডাকল, শোন, শোন গো।

অভয় দাঁড়াল। সুবালা বলল, বেবুশ্যের ঘরে এরকম হয়, আমার ওপর রাগ ক'রোনা যেন।

অভয় বলল, না, তোমার ওপর রাগ করব কেন? আমার কপাল। যার যেখানে ঠাঁই সুবালা ঠাকরুণ, এ আমার ঠাঁই নয়।

সুবালা সামনে এসে বলল, রাগের কথা বলছ। আমি তোমাকে আসতে বলেছিলুম।

—তোমার গান শুনতে জগত সোম্‌দার আসবে, আমি কোন ছার। না বলতে যে আসতে চেয়েছি? তোমার কি দোষ? কিন্তু পদখানি কার গাইলে?

সুবালা বলল, নজরুল ইসলামের।

—মোচলমান?

—হ্যাঁ, বেঁচে আছে এখনো।

—হাজারবার কপাল ঠুকি এসব গুণীর পায়ে। এইটুকুনি আমার লাভ হল তোমার কাছে। যাই।

—আবার আসবে?

—আসব বৈকি। তুমি এত জান, তুমি যে গুরুর তুল্য।

চলে গেল অভয়। কিন্তু তার বুকের মধ্যে বড় কন্‌কন্ করতে লাগল। অপমান, শুধু অপমান আর নিগ্রহ ছাড়া বাইরের সংসারে বুঝি আর কিছু পাওয়ার নেই অভয়ের।

ক্রমশঃ

ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলার অভাব—

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময়ে গত ৩১শে মার্চ সোমবার কলিকাতায় যে দারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিলে সকল মানুষ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন কঠিন হইয়াছে এই অজুহাতে বেলা ৩টার পর হঠাৎ একই সময়ে কলিকাতার প্রায় ২৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা অরাজকতার সৃষ্টি করে। বেলা ২টায় পরীক্ষা আরম্ভ হয় ও তিনটার পর খাতাপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পরীক্ষার্থীর দল পরীক্ষা স্থান ত্যাগ করে ও দলে দলে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া অন্য পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নষ্ট করিয়া দেয়। সমগ্র ব্যাপারটি অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, একদল ছাত্র পূর্ব হইতে উহা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। দেখা গিয়াছে, এবার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল—যেখানে অধিক প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল, সেইখানেই বেশী গণ্ডগোল হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি পরীক্ষা-কেন্দ্র বিদ্রোহী পরীক্ষার্থী ও বাহিরের দুষ্ট-প্রকৃতির যুবকদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়—বাড়ী-ঘর, জিনিষপত্র, আলমারী, বই প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া চুরমার করা হয় ও পরীক্ষার্থীদিগকে জোর করিয়া কেন্দ্র হইতে টানিয়া পথে বাহির করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঘটনা আরম্ভ হওয়ার পর পুলিসকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও একঘণ্টার মধ্যে কোন পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় নাই! শুধু সহর—কলিকাতার নহে, সহরতলীতে ও মফঃস্বলে কয়েকটি স্থানে এইরূপ ঘটনা হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, ইহার পিছনেও একদল রাজনীতিকের প্রেরণা ও উৎসাহ আছে। এ বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত কমিটী গঠন করিয়া অনুসন্ধান করিলে, আমাদের বিশ্বাস, এমন বহু কথা জানা যাইবে, যাহা স্বাধীন দেশের মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা দিতেছে। বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্র এই ঘটনার ফলে তাঁহাদের জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খা হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য হইবেন। আমাদের এই দরিদ্র দেশে এইরূপ মনুষ্যকৃত অপরাধের ফলে কত ছাত্রছাত্রী যে বিপন্ন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই দুর্ঘটনা তাহাদের জীবনে যে বিপদ আনিয়া দিল, কেহই তাহার ক্ষতিপূরণ দানে সমর্থ হইবে না। আমরা ঘটনা লক্ষ্য করিয়া স্তব্ধ হইয়াছি—দেশের পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইতেছি।

মন্ত্রীর পদত্যাগ—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র, তরুণ ব্যারিষ্টার শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থীরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে অন্যতম মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া বিচার ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া বিধানসভায় এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে সরকারী অনাচার ও ত্রুটি সম্বন্ধে বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। বিবৃতিটি পাঠ করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রে তাঁহাকে 'রাগান্বিত যুবক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক দিক দিয়া যেমন ইহা দেশবাসীর মনে নূতন চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই উহা যুবক সিদ্ধার্থশঙ্করের হীন চিন্তাশক্তির অভাব প্রকাশ করিয়াছে। আমরা তাঁহার বিবৃতি পাঠ করিয়াছি—আমাদের মনে হয়, উহার মধ্যে ক্রোধের পরিচয় অধিক না হইলে জনসাধারণ আরও সহানুভূতির সহিত উহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে সমর্থ হইত। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিধান-

সভায় ও সাংবাদিক সভায় শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বহু অভিযোগের উত্তর দান করিয়াছেন। ঐ সকল অভিযোগ ও তাহার উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন লাভ হইবে না। স্বাধীনতা লাভের পর গত ১০ বৎসর ধরিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়কে কত অসুবিধা ও কষ্টের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালনা করিতে হইতেছে, যাহারা তাহার বিন্দুমাত্রও খবর রাখেন, তাঁহারা শ্রীমান সিদ্ধার্থের অভিযোগগুলি পড়িয়া বিচলিত হইবেন। তিনি উদীয়মান কৃতী ব্যারিষ্টার—আদালতে মামলা চালাইবার সময় তিনি যাহা করেন, এখানেও পদত্যাগ সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাহাই তিনি করিয়াছেন। সেজন্য আমরা এই বিবৃতিতে বহু অতিরঞ্জন দেখিতে পাই। তাঁহাকে আমরা এইজন্য অভিনন্দন জানাইব যে, জনগণ সর্বদা যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, তিনি মন্ত্রীর মসনদ হইতে প্রায় সেইরূপ কথা বলায় এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় বা কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার কথা শুনিয়া কর্তৃপক্ষ বহু অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। বহু দোষ ত্রুটির কথা জানিয়াও তাঁহারা এতদিন সেগুলি উপেক্ষা করিতেন—এখন এ বিষয় লইয়া বহুভাবে আলোচনার ফলে কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতীকারে অগ্রসর হইতেছেন। মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁহার বিবৃতির নকল দিল্লীর কর্তাদের নিকট প্রেরণ করায় কর্তৃপক্ষও অবশ্যই এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। বিবৃতিতে শ্রীমান সিদ্ধার্থ রায় শুধু সরকারী দপ্তরের কথাই বলেন নাই, কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ শাসন ব্যবস্থার মধ্যে গলদ ও ত্রুটির সৃষ্টি করেন, তাহাও তিনি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বহু গোপন কথা প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণ মানুষও এখন তাঁহাদের অভাব অভিযোগগুলি কর্তৃপক্ষকে জানাইবার শক্তি ও সাহস লাভ করিয়াছেন। অপরপক্ষে প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায়ও বহু খ্যাতনামা কর্মীকে ব্যক্তিগতভাবে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত এ সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন ও সেই আলোচনার ফলে প্রতীকারের উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। গত কংগ্রেস-সংস্থা নির্বাচনে যে বহু যোগ্য ব্যক্তিকে স্থানচ্যুত করিয়া অধিকাংশ স্থানে নেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য অযোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চ সম্মানিত পদ প্রদান করা হইয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত। কাজেই কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ যদি সে সকল অন্যায়ের প্রতীকারে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে দেশে কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিন কমিয়া যাইবে। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় বহু কর্মী দলের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষায় অধিক মনোযোগী হওয়ায় দেশের জনগণের মনে যে কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কমিয়া গিয়াছে, শ্রীমান সিদ্ধার্থশঙ্কর এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশের মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আইনের দিক দিয়া 'গুপ্তকথা' প্রকাশ করিয়া সিদ্ধার্থশঙ্কর যদি অপরাধীই হইয়া থাকেন, দেশবাসী তাহা সেভাবে না দেখিয়া, সকলের অন্তরের বেদনার ভাব প্রকাশ করায় তিনি বহু দেশবাসীর ধন্যবাদ ও প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ইহা শুধু কংগ্রেস-বিরোধীদের মনের কথা নহে, কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কংগ্রেস সংস্থায় অনাচার দেখিয়া আজ যাহারা অন্তরে বেদনা অনুভব করেন, তাহাদেরও মনের কথা। আমরা আশা করি, ইহার ফলে যেমন সরকারী মহলে দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা প্রবল হইবে, তেমনই কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার মধ্য দিয়া অনাচার দূর করিতে উদ্যোগী হইবেন।

উদ্বাস্তু লইয়া রাজনীতি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে সমর্থ হন নাই একথা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও সত্য যে একদল লোক প্রথম হইতেই গত দশ বৎসর ধরিয়া উদ্বাস্তুদিগকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কঠোরভাবে এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়ায় একদল এই কার্যে প্রবলভাবে বাধা দান আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জমীর অভাব বলিয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না ঐ সকল রাজ্যে বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত সকল উদ্বাস্তুকে বাসস্থান দান করিতে পারিলে খুবই ভাল হইত। কিন্তু নানাদিক দিয়া বিচার বিবেচনা

করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সেজন্য বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রভৃতি স্থানে জমী সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সে সকল স্থানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা অল্প ব্যয় সাধ্য হইবে ও ভবিষ্যতে উদ্বাস্তুদের সেখানে বাস করা কষ্টকর হইবে না। একদল রাজনীতিক নেতা উদ্বাস্তুদিগকে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাবে প্রথম হইতে তাহার বিরোধিতা করিতেছেন, অথচ তাহার কোন বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলিবার মত তাহাদের শক্তি বা বুদ্ধি নাই। দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত বাস্তুহারাদের বড় বড় আশার কথা শুনাইয়া বা ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে। তাঁহাদের চেষ্টায় নানাভাবে প্ররোচিত করিয়া উদ্বাস্তুদের দ্বারা সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বার বার বলিয়াছেন যে দরিদ্র উদ্বাস্তুদের লইয়া রাজনীতিক খেলা করা কাহারও পক্ষে সঙ্গত হইবে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জানা গিয়াছে যে কোন কোন রাজনীতিক নেতা উদ্বাস্তুদের মঙ্গল করিবার লোভ দেখাইয়া তাহাদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ও সে অর্থ তাহাদের কল্যাণে নিয়োগ না করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যয় করিয়াছেন। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীসেন মহাশয় গত কয়মাস ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ভিড় না বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন, যাহারা সরকারী ব্যবস্থার বিরোধিতা করিবেন, সরকার কঠোরতার সহিত তাহাদের দমন করিবেন। একদল লোক এইভাবে উদ্বাস্তুদের বিভ্রান্ত না করিলে বহুপূর্বেই উদ্বাস্তুরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে চলিয়া যাইতেন ও তাহার ফলে লোকের চাপ কমিয়া পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা যেমন উপকৃত হইত, তেমনই উদ্বাস্তুরাও ভাল স্থানে পুনর্বাসন লাভ করিয়া সুষ্ঠু জীবনযাত্রা লাভ করিতে পারিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আজ নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেই সমস্যা একদল লোকের বিরোধিতার ফলে আরও অধিক কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে যদি কঠোরতা অবলম্বন না করা হয়, তবে দেশের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে ও দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা কোন রকমেই সম্ভব হইবে না। আমরা এ বিষয়ে সকল চিন্তাশীল মানুষকে বিষয়টি ধীরভাবে চিন্তা করিতে ও কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া কোন সরকারের পক্ষে দেশে কোন জনহিতকর কার্য্য করা সম্ভব হয় না—সকলে যেন সর্বদা এই কথাটি স্মরণ করিয়া কার্য্য করেন।

বারাসত বসিরহাট নূতন রেলপথ—

খবর পাওয়া গিয়াছে যে বারাসত বসিরহাট লাইট রেলওয়ের স্থানে ঐ অঞ্চলে ৩০ মাইল দীর্ঘ নূতন ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। সে জন্য জমি দখলে বিলম্ব হইতেছিল—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় জমি দখল সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের লোকদিগকে বর্ত্তমানে শুধু বাসে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া সর্বদা ভীষণ কষ্ট ও অসুবিধা হয়। রেলপথ নির্মিত হইলে ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ক্রমে উন্নতি লাভ করিবে!

ধান্য চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

গত ৩রা এপ্রিল কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার কংগ্রেস দলের বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে জেলা কর্ডন ও ধান চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গত কয়েক মাসের সরকারী নীতি ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ৭জন সদস্য লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধেও কমিটী তদন্ত করিবেন। কমিটী সরকারী কাগজ পত্র পরীক্ষার সময় যাহাতে কোন আইনগত বাধা না হয়, মুখ্যমন্ত্রী তাহার ব্যবস্থা করিবেন। দেখা যাউক, কমিটি কি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

রেওয়ায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

পশ্চিমবঙ্গের ৩০টি উদ্বাস্তু পরিবারকে গত ৩রা এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হইয়াছে। সেখানে ২০০ পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে ও শেষ পর্য্যন্ত ২ হাজার একর জমীতে ৩২০টি পরিবার থাকিবে। ঐ স্থানটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যপ্রদেশ সরকারকে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে

নিয়াছেন। সেখানে বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে, সেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, পানীয় জল, বিদ্যালয়, ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক কৃষিজীবীকে সাত একর জমি এবং বলদ, কৃষির যন্ত্রপাতি, বীজ প্রভৃতি কিনিবার ঋণ দেওয়া হইবে। বালিয়াডাঙ্গা ও কুঞ্জবন জেলায় ঐ জমি আবাদের জন্য সংস্কার করা হইয়াছে। এই ভাবে বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালার উদ্বাস্তুদের প্রেরণ করা হইলে পশ্চিমবঙ্গে আর এত অধিক সমস্যা থাকিবে না—বাহিরে যাইয়া উদ্বাস্তুরাও সুখে বাস করিতে পারিবে।

শ্রীকৃপাল সিং—

শ্রীশারঙ্গপাণি পূর্ব রেল পথের জেনারেল ম্যানেজারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করায় শ্রীকৃপাল সিং ঐ পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯০৭ সালে উত্তর প্রদেশের বুলন্দসহরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯২৯ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস-সি পাস করেন ও পর বৎসর রেলের কাজে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আসানসোলের ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি হিন্দী, উর্দু, বাংলা, মারাঠী ও গুরুমুখী ভাষা ভাল জানেন। তিনি কবি ও শিল্পকলা, সাহিত্য ও খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষক।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া অমর কাননে ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১০ মাস ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি বাঁকুড়া জেলা বোর্ডেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২১ হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি সকল জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, পর পর ২ বার বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান কর্মীর সংখ্যা কম।

কর্পোরেশনে বেকার সমস্যার আলোচনা—

গত ২৮শে মার্চ শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কলিকাতা সহর ও পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল এবং উহার সমাধানে সত্বর কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রস্তাবক বাঙ্গালীদের মধ্যে যে বেকার সমস্যা অধিক তাহা দেখাইয়া বলেন—কলিকাতার বহু অবাঙ্গালী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে সকল বাঙ্গালীকে সরাইয়া তাহাদের কর্মকেন্দ্রে অবাঙ্গালী কর্মী নিযুক্ত করিতেছেন। এ কথা সকল বাঙ্গালীকে এখন চিন্তান্বিত করিয়াছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ হইতে বাঙ্গালী বিতাড়ন জোরেই চলিতেছে—কলিকাতায়ও যদি বাঙ্গালী বিতাড়ন আরম্ভ হয়, তবে বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য হইবে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার বাকুলিয়া নিবাসী খ্যাতনামা শিল্পপতি ৺নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীরেন্দ্রনাথ

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জন্মভূমি বাকুলিয়া গ্রামে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন।

কাশীরামদাস

স্মৃতিরক্ষা—

মহাভারত লেখক কাশীরাম দাস ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া হইতে ১২ মাইল দূর সিঙ্গী-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার জন্মভিটা এখনও বর্ত্তমান—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দকে সভাপতি, শ্রীরামরঞ্জন সিংহকে সম্পাদক ও প্রম-

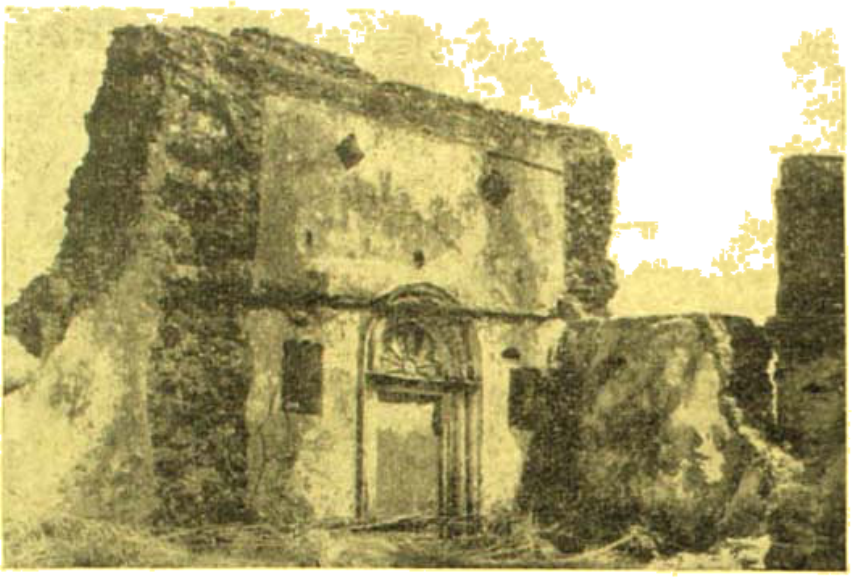

কাশীরাম দাসের জন্মভিটা। এইখানেই কবি মহাভারত রচনা করেন

ময়ী শ্রীআবদুস সাত্তারকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্মৃতি-সৌধ নির্মাণে মোট ২০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে, তন্মধ্যে ৩ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সারা বাংলার গৌরব কাশীরাম দাসের স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

আগামী পয়লা আষাঢ়ে কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষা বিধান করা হইবে। ফলকে ধাপিক থেকে তৃতীয় স্থানে স্মৃতিরক্ষা কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার

হাওড়া গার্লস কলেজ পত্রিকা—

সকল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই বর্ত্তমানে কলেজ হইতে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। হাওড়া গার্লস কলেজের ছাত্রীরাও সম্প্রতি একাদশবর্ষ (১৯৪৭-৪৮) সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক সুকবি ও অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কয়েকজন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার লেখা ছাড়াও বহু ছাত্রীর লেখা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কয়েকটি ছাত্রীর লেখা পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রই তৃপ্ত হইবেন—তাহাদের লেখার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বর্ত্তমান। কলেজ সম্বন্ধেও ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—সম্পাদকীয় মন্তব্য অভি-জ্ঞতার পরিচায়ক। এইরূপ সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করি—কারণ নবীন লেখিকার দল এইভাবে উৎসাহ পাইলে তাঁহাদের লেখার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে। আশা করি, পত্রিকাখানি নিয়মিত প্রকাশিত হইবে ও উত্তরোত্তর অধিকতর সমৃদ্ধ হইবে।

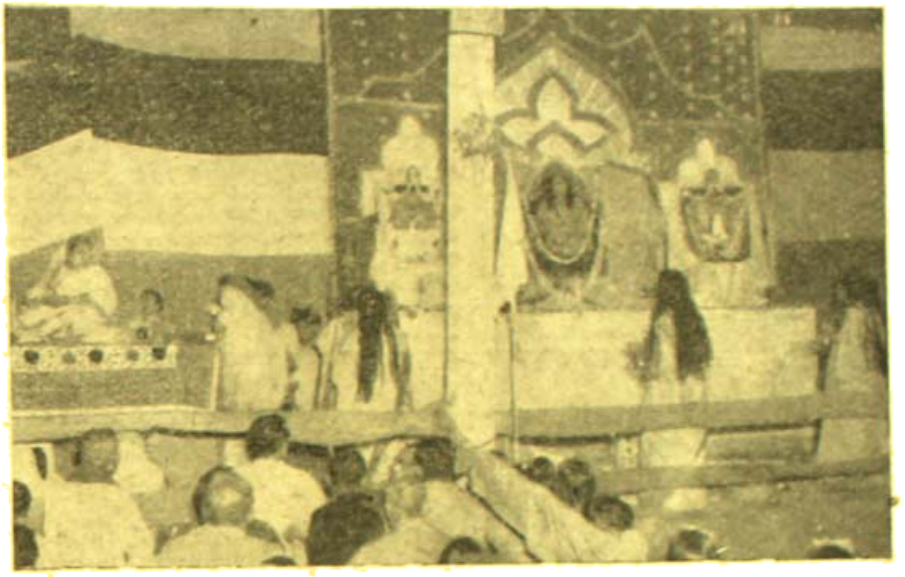

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দীক্ষিতা শিষ্যা চির ব্রহ্মচারিণী মহাসিদ্ধা তপস্বিনী শ্রীশ্রীগৌরী মাতার শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে কলিকাতার আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্রে গৌরীমার সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও মাতা সারদামণির প্রতিকৃতির মধ্যে গৌরীমার প্রতিকৃতি দেখা যাইতেছে। বাম দিকে ব্রহ্মচারী আশ্রম জননী শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী উপবিষ্টা।

নূতন আলো

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

১

অন্ধকার গলি পথে জীবনের সুরু—
পরিল সুড়ঙ্গ বেয়ে এতদিন ছিল আনা গোনা।
সে আঁধার পথে রুপালির রেশ দেখি
যখনই ছুটেছি বেয়ে আলোকের আশে—
কেবলই ফিরেছি শুধু ব্যর্থ মনোরথে
দেখি তাহা আলো নহে আলেয়ার ছায়া।
আশা হারা, তৃষা ভরা জীবনে আমার
যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে,
প্রশান্তির হাসিভরা মুখে, দেখিলাম তারে—
অতীতের স্নেহ-কীর্ণ গ্লানি-ভরা দেহখানি মোর
সঁপিলাম সসঙ্কোচে বাবাকুর মনে।
স্নেহহীন, ক্ষোভহীন সোমা সেই প্রাণের দেবতা
(তাঁর) প্রশস্ত বুকের মাঝে টেনে নিল মোরে
ধুলায় মলিন শীর্ণ অপবিত্র দেহখানি ধরে
দ্বিধাহীন প্রাণে।

২

কিছু-বলা, কিছু-না-বলা-ইতিহাস মোর,
শুনি শুধু কহিলেন ধীর শান্ত ভাবে,
বাঁধিনু তোমারে মোর জীবনের সাথে,
নব উদ্বোধিত মোদের জীবন
আজি হ'তে হোক সুরু,
মনের বন্ধন হোক্
সমাজ বন্ধন হ'তে আরও দৃঢ়তর।

৩

রোমাঞ্চিত দেহ মন মোর,
ক্ষণস্থায়ী প্রণয়ের ধ্বনিকা টানি
স্নিগ্ধ হোল প্রাণ-মন
শান্তির অপূর্ব আস্বাদে।
প্রশস্ত বক্ষের মাঝে নিবিড় সে বাহুর বন্ধনে,
যৌবনের ফেলে আসা পুরাতন সে আকুতি।

আবার কেন জাগে প্রাণে ?
আঁধার রজনী শেষে
জীবন যাত্রার পথে মোর
পাইলাম নূতন আলোক।

—আঠারো—

অবশ্য পাশের ঘরে পালিয়ে আর কতক্ষণ থাকবে পূরবী—ফিরে আসতে হল একটু পরেই।

মা তা করতে গিয়েছিলেন। পূরবী এসে সত্যজিতের পাশের চেয়ারটা ঘরে দাঁড়ালো। কথাটা এখনো জ্বলছে কানের ভেতর। 'কাকিমার প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।' এ-রকম বিশ্রী রসিকতা করবার কী দরকার ছিল ওঁর।

অধ্যাপক সত্যজিৎ অন্য মানুষ হয়ে গেছে এখন। এখন ঘরের ছেলে। পূরবীর গম্ভীর রাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

—কী হল তোমার?

—কিছু হয়নি।

—কোথাও বেরুচ্ছিলে মনে হচ্ছে?

—একটু দরকার ছিল।

সত্যজিৎ আবার ভালো করে চেয়ে দেখল পূরবীর দিকে। চাপা হাসিটা থমকে রইল ঠোঁটের কোনায়।

—বেশ তো বেরোও তা হলে। পড়ানো আজ বরং থাক। আমি উঠি।

—থাক, আমার দরকারের জন্যে ভাবতে হবেনা। নিজের যাওয়ার ছুতো খুঁজছেন—এই তো?

—ভাবল-এজেড্ সোর্ড?—সত্যজিৎ আবার সশব্দে হেসে উঠল: আচ্ছা বেশ, বোসো তবে পড়তে। বার করো 'টেম্‌পেস্ট্'।

পূরবী বসে পড়ল চুপ করে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের কালো দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল।

—কই বই আনো?

তবুও শেল্‌ফের দিকে হাত বাড়ালোনা পূরবী। হঠাৎ চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল: আসেন না কেন?

—নানা কাজে জড়িয়ে থাকি, সময় পাই না।

—ও সব বাজে কথা। ইচ্ছে করে আসেন না।

পূরবী আজ আশ্চর্য মুখর হয়ে উঠেছে—সত্যজিৎ ভাবল। কিন্তু একেবারে মিথ্যে বলেনি। কিছুদিন ধরেই এ বাড়ীতে আসতে তার সংকোচ হয়। সে জানে, পূরবী এখন তার পড়ানো আর ভালো করে শোনে না—যে দৃষ্টি তার মুখের দিকে মেলে রাখে, তার অর্থ তার অজানা নয়। কলেজে যে চাপা গুঞ্জনটা উঠেছে, বীথির কল্যাণে তা-ও তার কানে গেছে। সত্যজিতের খুব খারাপ লাগেনি। মনে হয়েছে—মন্দ কী! দেখাই যাক্ না। জীবনে সঙ্গিনীতো নিতেই হবে একদিন। পূরবীর মনের কাছ থেকে তেমন সাড়া যদি কোনোদিন পায়—সেও দ্বিধা করবেনা। এই যন্ত্রণা—এই অনিশ্চয়ের যুগে এমনি একটি মেয়েই সব চাইতে ভালো। শান্ত, স্থির, আত্মমগ্ন। যে ধরণের মেয়েকে রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী' বলে কল্পনা করেছিলেন। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখবে ঘর, সেবা দেবে, স্নেহ দেবে, পায়ের ধুলো মুছিয়ে দেবে চোখের জলে। একটু বয়েস হয়ে এলে, জীবন একটা বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলে পুরুষমাত্রেই যা চায়।

তারপরেই হঠাৎ যেন কবর খুঁড়ে দেখা দিল বনশ্রী। ফিরে এল আউটরাম ঘাটের সন্ধ্যা, ফিরে এল দুপুরের নির্জন ইডেন গার্ডেনে ঝিলের কালো জলে রোদের ঝিলিমিলি। সম্পর্কটা এখন একেবারে বৈষয়িক। হিমাংশু তাই বলে। বনশ্রী তাই বলতে চায়। সত্যজিৎও তাই ভাবতে চেয়েছিল। সোজাসুজি বিজনেস্—আর কিছু নয়। কিন্তু সেদিন—

"Non Sum Qualis Eram Bonae Sub ragno Cynarae"—

সত্যজিৎ চকিত হয়ে উঠল। প্রায় তিন মিনিট চুপ করে বসে আছে সে। পূরবীর কথার কোন জবাব দেয়নি। আর পূরবী বাইরের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে—কী দেখছে সে-ই জানে।

—চুপচাপ বসে আছো কেন? সত্যিই পড়বে না?

—আপনিই তো চুপ করে আছেন।—পূরবী

'টেম্‌পেস্ট' নামিয়ে আনল শেল্‌ফ থেকে : আর পড়েই বা কী হবে! আমি এবার নিশ্চয় ফেল করব।

বইয়ের পাতা খুলতে যাচ্ছিল সত্যজিৎ, থমকে গেল।

—হঠাৎ নিজের ওপর এত শ্রদ্ধা বেড়ে গেল কেন? ব্যাপার কী?

—আমি জানি।—পূরবী গোঁজ হয়ে জবাব দিলে।

—তুমি জানো?—বইটার ওপরে হাত রেখে সত্যজিৎ বললে, তোমার ফিলসফির প্রফেসারেরা তো অন্য কথা বলেন। তাঁদের আশা আছে পূরবী দত্ত একটা ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারে।

পূরবী টেবিল থেকে একটা লাল পেন্‌সিল তুলে নিয়ে একমনে সেটাকে লক্ষ্য করতে লাগল : ফিলসফির কথা জানিনা, কিন্তু ইংরেজিতে ঠিক ফেল করব।

—হাঁ, ইচ্ছে করে যদি ব্লাঙ্ক-পেপার দিয়ে এসো, তা হলেই।

—ঠাট্টা করবেন না—আমার ভালো লাগছেনা।—পূরবী পেন্‌সিলটা দিয়ে একখানা খাতার ওপর হিজিবিজি কাটতে লাগল :

একটু হেল্‌প করেন না—কিছুই না—

—আমি সাহায্য না করাতেও আগের পরীক্ষাগুলোতে তোমার কোনো ক্ষতি হয় নি, কাজেই ও-সব কথা থাক। কিন্তু সত্যিই বলো তো, আমাকে দেখেই এত মেজাজ খারাপ হল কেন? কাকিমা একটা মুখরোচক আলোচনা করছিলেন—সেইটেতে বাধা দিয়েছি বলে?

পূরবী পেন্‌সিলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণায়। চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল।

—আপনিও ওই সব যা-তা বলবেন? আর পড়াশুনো করবই না আমি। ছেড়ে দেব কলেজ।

সত্যজিৎ হাসতে গিয়েও হাসতে পারলনা। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

—এযে সত্যিই টেম্‌পেস্ট্‌ দেখছি ঘরের ভেতর। একেবারে কলেজ ছেড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা?

—হুঁ।

—তারপর?

—এখান থেকে চলে যাব।

—কোথায়?

—এখনো ঠিক করিনি।

—শুধুই নিরুদ্দেশ-যাত্রা? না অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে?

—জানি না।

কিন্তু কী হবে এ-ভাবে কথা বাড়িয়ে? সত্যজিতের ক্লান্তি লাগছে। নিজের মনেই যথেষ্ট ভার জমে আছে। আর একজনের ভার লঘু করবার উৎসাহ সে খুঁজে পাচ্ছে না।

কাকিমা চা নিয়ে এলেন। একবার তাকিয়ে দেখলেন দু-জনের দিকে। কিছু একটা বোঝবার চেষ্টা করলেন যেন।

—তুমি ক'দিন থেকেই আসছনা বাবা, মন খারাপ করে বসে আছে মেয়েটা।

—হুঁ, বলেছি তোমাকে!—পূরবী জ্বলে উঠল।

—বা-রে, একটু আগেই তো—

পূরবী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : কক্ষনো না—আমি কিছু বলিনি। তুমিই বলছিলে বরং। আমি কেন বলতে যাব ও-সব কথা? ওঁরা কাজের লোক—দয়া করে মাঝে মাঝে আসেন এই ঢের।

সত্যজিৎ কাকিমার দিকে তাকালো : চায়ের পেয়ালায় আজ সত্যই তুফান উঠেছে কাকিমা। আপনার মেয়ে আজ ঝগড়া করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। আপনি নিজের কাজে যান—ওকে আর ঘাটাবেন না।

কাকিমা বললেন, সেকি কথা! ঝগড়া করবে কেন? সত্যিই তো—দয়া করে তুমি পায়ের ধুলো দাও—সেই আমাদের কত ভাগ্যি। ঝগড়া করবে তাই নিয়ে? যতই বড় হচ্ছে, ততই বোকা হচ্ছে মেয়েটা।

—দোহাই কাকিমা, আপনি আর ইন্ধন দেবেন না। বিপর্যয় কাণ্ড ঘটাবার পক্ষে আমি একাই যথেষ্ট। আপনি বরং সেই যে সুপাত্রটির কথা বলেছিলেন—তারই খোঁজ-খবর করুন।

দুমদাম করে শেল্‌ফ থেকে খানকয়েক বই নিচে পড়ল। একটা বই খোঁজবার জন্যে অতগুলো বইকে ফেলে দেবার কোনো দরকার ছিলনা পূরবীর!

কাকিমা বললেন, হ্যাঁ বাবা, ছেলেটি সত্যিই ভালো। ওঁর এক বন্ধুর বিশেষ জানাশোনা—পোর্টকমিশনার্সে ঢুকেছে—

—মা!

কাকিমা চমকে গেলেন : ওই স্যাখো—বিয়ের নাম শুনলেই রণা তোলে সঙ্গে সঙ্গে। থাক বাপু, থাক। অমন করে আর তাকাতে হবে না আমার দিকে। আমি যাচ্ছি।

কাকিমা বেরিয়ে গেলেন।

রেগে আগুন হয়ে বসে আছে পূরবী। একটা ডিক্‌শনারী খুলে দ্রুতবেগে পাতা উল্‌টে চলেছে।

সত্যজিৎ ধীরে সুস্থে চায়ে চুমুক দিলে।

—টেম্‌পেস্ট পড়ানোর নামেই তো টেম্‌পেস্ট উঠল দেখতে পাচ্ছি। তা অভিধান মুখস্থ করছ নাকি?

পূরবী নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একবার। একটু পরে ঝাঁঝালো ভাবে জবাব দিলে, চেষ্টা করছি।

—চেষ্টা করে লাভ নেই, পণ্ডশ্রম হবে। তার চাইতে একটা কথার উত্তর দাও। বিয়ের নাম শুনলেই কাকিমার ভাষার সঙ্গে সঙ্গে রণা তোলো কেন?

—আবার ?

সত্যজিৎ তেমনি শান্তভাবেই চায়ে চুমুক দিলে : তোমার চোখের আগুন দেখে কাফ্রিরা ভয় পেতে পারেন, কিন্তু আমাকে পেয়ে উঠবে না। সত্যি, আপত্তি কেন এত ?

—তা দিয়ে দরকার নেই আপনার।

—আছে দরকার।—পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে সত্যজিৎ কিছুক্ষণ পূরবীর দিকে তাকিয়ে রইল। শান্ত তীক্ষ্ণ মেয়েটি আজ যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে চোখদুটো—অল্প অল্প কাঁপছে ঠোঁটের কোনা—মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চলেছে যেন। সত্যজিৎ ভাবল : আজ একটা কিছু ঘটবে। তারই জন্যে আজ তৈরি হচ্ছে পূরবী—তারই জন্যে হয়তো নিজেও অপেক্ষা করে আছে সে।

সত্যজিৎ বললে, কেন বিয়ে করবে না আমার জানা দরকার। আমি তোমার মাস্টার মশাই।

—আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।

—কোনোদিন না ?

—কোনোদিন না।

সত্যজিৎ চা-টা শেষ করল নিঃশব্দে। একটা কিছু আজ ঘটবে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে পূরবীকে। তীব্র মদের মতো আকর্ষণ করছে। নিজের অজ্ঞাতেই একটা চরম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করছে সত্যজিৎ ?

তার গলার স্বরে নেশা লাগল : এক বছর পরে ?

—তার মানে ?—পূরবী রক্তাভ বিস্মিত চোখ তুলল।

—বি-এ পরীক্ষার পরে ?—এইবার সত্যজিতের চোখ দুটোও জ্বলে উঠল : তখন যদি আমি বাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াই ?—পূরবীর একখানা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললে, তখন যদি আমি এসে প্রার্থনা করি ? ফিরিয়ে দেবে আমাকে ?

মুহূর্তে পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে গেল পূরবী। মুখ থেকে সরে গেল রক্ত। তারপরেই টেবিলের ওপরে নুয়ে পড়ল মাথাটা। নিঃশব্দ কান্নায় কাঁপতে লাগল শরীর।

সত্যজিৎ তখনো তার হাতখানা আঁকড়ে আছে মুঠোর মধ্যে। যা ঘটবার ঘটে গেছে। এখন আর ফেরবার পথ নেই। অনেকদিন, অনেক মুহূর্তের অনিশ্চয়তা এইবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

ইচ্ছে করল, পূরবীর মাথাটা বুকের মধ্যে তুলে নেয়। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি মনে পড়ল ডাউডন। "There falls thy shadow, Cyuara—"

বনশ্রী ! মুঠো খুলে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে পড়ল সত্যজিৎ। বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, আজ চলি, পরশু আবার আসব।

নিঃশব্দ কান্নায় পূরবী দুলে দুলে উঠতে লাগল।

• • •

গ্লোব-ট্রটার রীতেন দি গ্রেট অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। প্রীতিকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছে না। কী লাভলি গেল্ ! হাউ পাথেটিক ফিগার ! হোয়াট এ গোল্ডেন ভয়েস !

অ্যাম আই ইন্ লাভ উইথ হার ? সবিস্ময়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে রীতেন। অ্যাট লাস্ট ! গ্লোব ট্রটার রীতেন ভেবেছিল, একদিন সে তার 'ল্যাদি'কে খুঁজে পাবে—সাম হোয়ার ইন্ কন্টিনেন্ট—তার মোটর সাইকেলে তাকে তুলে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ইন্ দ ওয়াইল্ডস্ অব্ আফ্রিকা—

কিন্তু এ কী হল। শেষকালে এই বাংলাদেশেই ? এ পুরোর বেঙ্গলি 'গ্যাল্' তার মনোহরণ করল ? হোয়াই—আফ্ কোর্স !

গ্লোব ট্রটারের সাইকেলের স্পীড বাড়ছিল। সেই সঙ্গে টগবগ করে ফুটছিল মনটা। শী' জ্ এ বিউটি !

আচ্ছা, প্রীতি তাকে ঠিক—

সেদিন ট্যাক্সিতে ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা আভাস পেয়েছে রীতেন। ইংরেজি গান শুনিয়েছে, বলেছে তার স্বপ্নের কথা—বলেছে এখানে নয়—সাম্ হোয়ার ফার অ্যাওয়ে—কোনো এক সমুদ্রের ধারে, পপ্লার বনের মাঝখানে সে একটা কটেজ তৈরি করবে, বাজাবে হাওয়াইয়ান গীটার, আর মধ্যে মধ্যে পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। কেবল মনের মতো কোনো সঙ্গিনী যদি সে পায়—

প্রীতি জবাব দেয়নি। কেবল কয়েকটা বড় বড় নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনেছে কয়েকবার। ইজ শী উইলিং ? ডাজ্ শী ?—

চিন্তাটা শেষ হলনা। বাই জোভ্ হাউ টেম্পিবল্ !

প্রাণপণে ব্রেক কষেও রীতেন মোটর-সাইকেলটা থামাতে পারল না। সামনের হিন্দুস্থানী বাচ্চা মেয়েটাকে সোজা চাপা দিয়ে সাইকেলটা লাফিয়ে উঠল ফুটপাথে, তারপর ধাক্কা খেলো একটা লোহার পোস্টের সঙ্গে। তিন হাত দূরে ঠিকরে পড়ল রীতেন। যন্ত্রণাভরা একটা অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর—তার মধ্যে তলিয়ে গেল বিশ্বভ্রমণের স্বপ্ন। ক্রমশঃ

পাট ও পীঠ

শ্রী'খ'—

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জলসাঘর" শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় প্রায় সমাপ্তির পথে এসে পৌঁচেছে। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, আর জলসাঘরের তিনটি জলসায় তিনজন ভারতবিখ্যাত শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রথম জলসায় ঠুমরী গানের খ্যাত-নামা গায়িকা আখ্‌তারীবাই ফইজাবাদী গান গেয়েছেন। দ্বিতীয় জলসায় খেয়াল শুনিয়েছেন প্রতিভাধর তরুণ সঙ্গীত শিল্পী সালামত আলি খাঁ, আর তৃতীয়টিতে কথক নৃত্যের বিখ্যাত শিল্পী রোসান কুমারী নৃত্য পরিবেশন করেছেন। এই সব ছাড়াও মিঁয়া বিসমিল্লা খাঁর সানাই-এর সুমধুর সুরও শুনতে পাওয়া যাবে।

• • •

পরিচালক তপন সিন্‌হা আসানসোল ও রাণীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলে ঘুরে তাঁর "কালামাটি" চিত্রের চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ করেছেন। মাটির নীচে কয়লা খনির গভীর গহ্বরে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনার মধ্যেও 'কালামাটির' চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও অসীতবরণ নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাছাড়া পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুর এই ছবির আরও একটি আকর্ষণ।

• • • •

প্রযোজক-পরিচালক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিচারক' চিত্রের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। নায়ক চরিত্রে উত্তম-

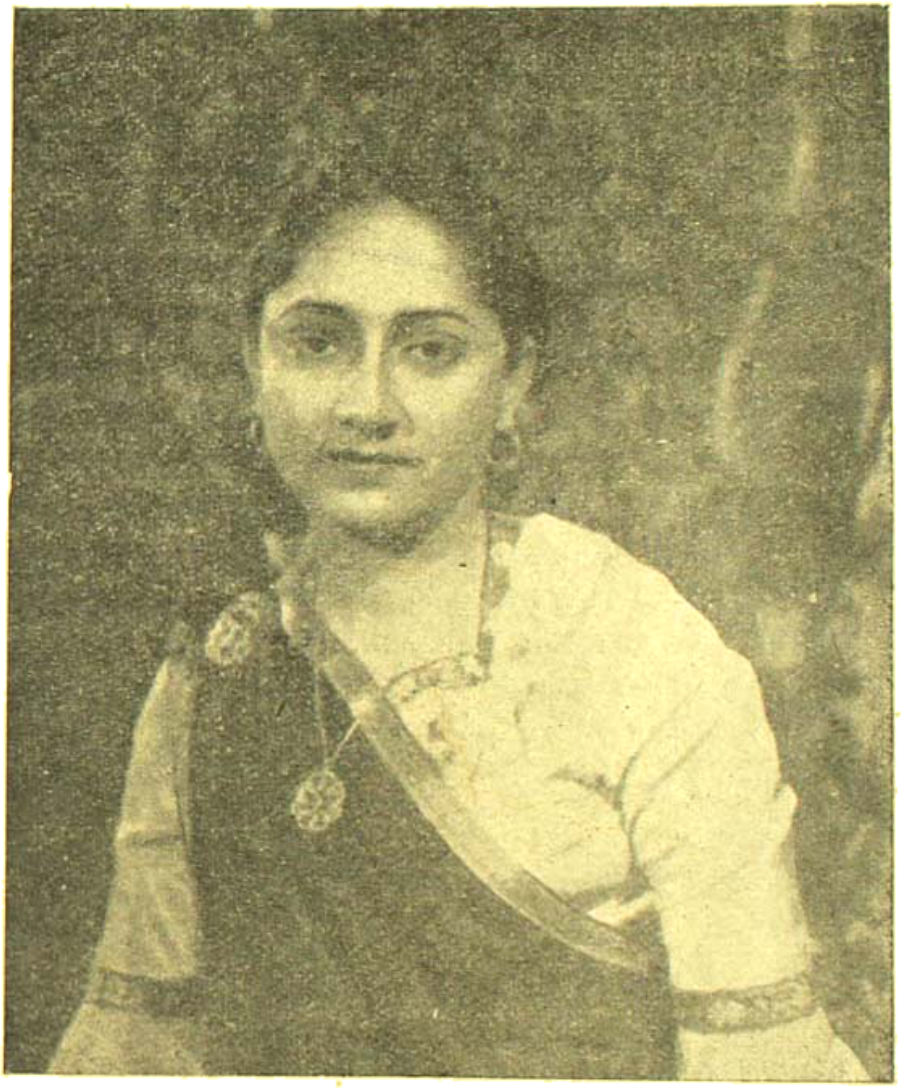

শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

'মাসমহী গার্লস স্কুল'-এ সাফল্যের অভিনয়ের পর 'কালামাটি', 'বিচারক' ও 'বউঠাকুরের সংসার' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করেছেন

দুধার ও নায়িকা চরিত্রে পরিচালকের স্বনামখ্যাতা সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় অভিনয় করছেন।

•

শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গ্রেস্ পিকচার্সের "শনীবাবুর সংসার" চিত্রের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আজকার বাংলাদেশের একান্নবর্ত্তী সংসারের ওপর অর্থনৈতিক ও পাশ্চাত্য ভাবধারার যে আঘাত এসেছে, ও যার ফলস্বরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি আজ যে ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—সেই বিষয় অবলম্বন করেই শনীবাবুর সংসারের গল্প রচিত হয়েছে। অভিনয়াংশে আছেন ছবি বিশ্বাস, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি।

•

বিদেশী সংবাদ ঃ

Deborah Kerr ও Rock Hudson ১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় অভিনেতারূপে Photoplay Magazine-এর পুরস্কার "Gold Medal Awards" লাভ করেছেন। আর "An Affair to Remember" চিত্রটি শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চিত্ররূপে ঐ পুরস্কারটি পেয়েছে। Deborah Kerr এই চিত্রটিতে অভিনয় করেই উক্ত পুরস্কার পেয়েছেন।

• •

অষ্টাদশী তরুণী Millie Perkins-এর অভিনয় কলার কোনও রকম পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রায় দশ-হাজারের ওপর দরখাস্তকারিণীর মধ্যে থেকে তাকেই মনোনীত করা হয়েছে "The Dairy of Anne Frank" নামক চিত্রে Anne Frank-এর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে। The New York Times-এর সংবাদে জানা যায় Millie Perkinsকে নাকি অবিকল নাৎসি কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্পে মৃত্যুবরণকারিণী ইহুদী মেয়েটির মত দেখতে।

• • • •

বিখ্যাত পরিচালক Alfred Hitchcock তাঁর James Stewart ও Kim Novak অভিনীত "Vertigo" চিত্রটি শেষ করে Metro-Goldwyn-Mayer-এর "North By Northwest" ছবিটি পরিচালনার ভার নিয়েছেন। চিত্রটিতে বিস্তৃত ভৌগলিক স্থান ও নানা বিষয়ের মধ্যে Central Intelligence Agency ও আলস্কার Distant Early Warning Radar System এবং চন্দ্রে উড়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখান হবে।

• • • •

কিশোরী কন্যা তার ঘর থেকে শুনতে পেল তার মার শয়ন ঘরে কলহের উচ্চ আওয়াজ। প্রণয়ীর সঙ্গে কলহ হচ্ছে তার মার। মাতার প্রণয়ীর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কঠোর কণ্ঠে শাসিয়ে উঠল তার মাকে। কন্যা আর স্থির থাকতে পারল না।.....হঠাৎ দেখা গেল মার শোবার ঘরের দরজা খুলে গেল আর উন্মুক্ত দরজা দিয়ে চতুর্দ্দশী কন্যা প্রবেশ করল দীর্ঘ ছুরিকা হস্তে। মুহূর্তে শাণিত ছুরিকা ঝল্‌সে উঠেই অমূল প্রোথিত হল মাতার প্রণয়ীর উদরে।.....

ঘটনাটি নাটক বা চলচ্চিত্রের কোনও রোমহর্ষক দৃশ্য নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। ঘটেছে অবশ্য এক অভিনেত্রীর শয়ন কক্ষে। খবরে প্রকাশ যে খ্যাতনামা চিত্রতারকা লানা টার্নারের সঙ্গে যখন তার ঝুঁয়াড়ী প্রণয়ী Stompanatoর কলহ হচ্ছিল তখন লানার পূর্ব্বস্বামীর চতুর্দ্দশী কন্যা Cheryl তার শোবার ঘরে ঢুকে Stompanatoকে রাঙ্গাকরবার ছুরিকার ঘায়ে হত্যা করে। লানা এর আগে পাঁচবার বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে। এই ঝুঁয়াড়ীটির সঙ্গে কিছুদিন থেকে তার প্রণয় চলছিল; কিন্তু তার পরিণতি যে এমন বিয়োগান্ত ও শোচনীয় হবে তা বোধ হয় সে স্বপনেও ভাবে নি।

অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের "কলঙ্কী চাঁদ" চিত্রের একটি দৃশ্যে নবাগতা: শ্রীমতী ঝুমা

"পদ্মার ঢেউরে···
আমার শূন্য হৃদয়-পদ্মনিয়ে যা"

সন্তোষকুমার দে

পদ্মা শুধু একটি নদী মাত্র নয়, একটি জীবন্ত প্রবাহিনী, একটা দেশ একটা জাতির হৃদয় যেন উথলপাথাল হয়ে উঠেছে ওর তরঙ্গে তরঙ্গে। তাতে কত কথা, কত কাহিনী, কত সুর—জোয়ারে-ভাটায়, দিবসে-নিশীথে, প্রভাতে-সন্ধ্যায়। কান পেতে শুনলে যেন প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। পদ্মা ডাক দেয়, তার তরঙ্গে তালি বাজে, কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে দুকূল ছাপিয়ে ছোটে সুরের প্রবাহ, দূর কুমিল্লার নিভৃত প্রাসাদপ্রকোষ্ঠেও সে ডাক পৌছায়, বেরিয়ে আসেন কোমলকান্তি সুকণ্ঠ সাধক শচীন দেব বর্মন, পড়ার পাঠ চুকিয়ে বেরিয়ে পড়েন লোকসঙ্গীত সংগ্রহে।

ত্রিপুরার রাজকুমার, কুমিল্লা কলেজের নামকরা ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভ সম্বর্দ্ধিত স্নাতক, এম-এ ক্লাসের ছাত্র, —শচীন পিতা মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্মণের ব্যবস্থাপনায় বিলাত যাবেন, বিখ্যাত কোনও কেউ-কেটা হয়ে উঠবেন—এই সবাই আশা করেছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরে বাসা বেঁধেছিল সুরের অপরীরা। ত্রিপুরার রাজ-সভার অনেক ওস্তাদের আসর বসত, ছুটি-ছাটা ক্রিয়াকর্ম, পূজা-বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে কুমিল্লা থেকে ত্রিপুরায় ফিরলেই ছাত্র শচীন ভিড়ে যেতেন সেই সব আসরে বালক বয়স থেকেই। কিছু বুঝুন-না-বুঝুন, সুর তাঁকে টানে, গলায় আপনি আসে—যেমন করে জোয়ারের জল কলকল করে ওঠে পদ্মার চরে। গুনগুনিয়ে খুশি হন না, শুনিয়ে দেন যা-কে পান তাকে। যে-শোনে সেই অবাক হয়। এতো মধু যার কণ্ঠ তিনি কি তৃপ্ত হবেন বংশমাত্রে!

শচীন দেব রাজপরিবারের ছেলে হয়েও বেরিয়ে এলেন সাধারণের মধ্যে, অসাধারণ প্রতিভাধর কেউই নিজেকে সোনার খাঁচায় বন্দী করে রেখে খুশি হতে পারে না। আর এক প্রতিভাধর এই ভাবেই চলে এসেছিলেন শহরের বিশাল প্রাসাদ ত্যাগ করে শিলাইদহের কুঠি বাড়িতে, সেখান হতে একেবারে পদ্মার বুকে। তাঁকে ডেকেছিল প্রকৃতির উদার আহ্বান, শচীনদেবকে ডাকলো প্রকৃতির

বুকের বাসিন্দার', তিনি লোকসঙ্গীত সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়ালেন গ্রামে গ্রামে, পূর্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে, আসামে বিহারে, উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে, গুর্জরে, সৌরাষ্ট্রে, অন্ধ্রপ্রদেশে, এমন কি সুদূর গোয়া-দমন-দিউ প্রভৃতি 'বৈদেশিক উপনিবেশে জীবন বিপন্ন করেও তিনি লোক সঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন। চাষী,

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

কুলি, মজুর, জেলে, মাঝি, আউল, বাউল, কীর্তনীয়া, উদাসী সম্প্রদায়ের লোক, কত শ্রেণীর লোকের কাছেই গিয়েছেন তিনি—যদি দুটি পদ পাওয়া যায়, যদি কোন সুর কানে লাগে।

...অজস্র গান গেয়েছেন তিনি। তাঁর 'তাজমহল', তাঁর 'আমি ছিনু একা বাসর সাজায়ে' প্রভৃতি ছাদিকে পরিণত হয়েছে। আবার তাঁর 'বাঁশীটা মোর হাতে দে' কিম্বা 'পদ্মার ঢেউয়ে আমার শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা, ধারে' —সত্যই অবিস্মরণীয়। লোক-সঙ্গীতের মর্যাদা তাঁর হাতে সহস্রগুণে বর্ধিত হয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে—কারণ তিনি লোক-সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ রাগ-সঙ্গীতেও পারদর্শিতা অর্জন করেছেন সদ্‌গুরুর সঙ্গে সহবতে। এম-এ পড়তে পড়তে তিনি স্বনামধন্য গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে তালিম নিতে শুরু করেন, পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ওস্তাদ বাদল খাঁ প্রভৃতির কাছেও তালিম নেন। এই দীর্ঘআচরিত শিক্ষা তাঁকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। রেকর্ডে তাঁর গান যে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার তুলনা পাওয়া ভার। তাঁর গাওয়া সবগুলি গানই রেকর্ড জগতে স্থায়ী হয়ে আছে বলা চলে।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনায় তিনি যে অসংখ্য মৌলিকতা সৃষ্টি করেছেন তাঁর মূলেও রয়েছে তাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে গভীর জ্ঞান এবং তার সঙ্গে লোক-সঙ্গীতের বহু-বিচিত্র সুরবৈচিত্র্য। ফলে একটির পর একটি ছবিতে তিনি জনচিত্ত জয় করেছেন কিন্তু কোন দু'টি ছবির গানে তিনি চর্বিত চর্বণের ধারে কাছেও যেতেননি। আন্তর্জাতিক বিচারের ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন এবং ভারত সরকারের সঙ্গীত-নাটক আকাদামির বিচারেও তিনি ১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে আকাদামি পুরস্কার লাভ করেছেন।

অনেকের ধারণা, বর্তমানের চলচ্চিত্রসমূহ ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে। শচীনদেব এ মত সমর্থন করেন না। তিনি বিদেশের যা ভালো তা গ্রহণের পক্ষপাতী,—যেমন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রা। কিন্তু পুরোপুরি বিদেশী সুরের অনুকরণে কেবল উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টিতে তাঁর আগ্রহ দেখা যায় না। বরং তিনি দেশীয় লোকসঙ্গীতের সুর এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর সংমিশ্রণে নব নব বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে বেশি উৎসাহী এবং সেখানে তিনি একাই এক শ'। চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বিবর্তিত হচ্ছে এবং সমাজের সর্ব-স্তরে ব্যাপ্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে—এ হিসাবে চলচ্চিত্র ভারতীয় সঙ্গীতের কল্যাণ সাধন করছে।

শচীনদেব এখন বোম্বাই-প্রবাসী। বয়সও দেখতে দেখতে ৫২ বছর হ'ল; কিন্তু এই নিরভিমান গুণী গায়কের কণ্ঠের দরদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন্দীভূত হওয়া দূরে থাক, বরং যেন আশ্চর্য ভাবে বেড়েই চলেছে। তাই তো কেবল সঙ্গীত পরিচালনাতেই নয়, নিজ কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনেও তাঁর ক্লান্তি নেই, আর সুরমাধুর্যেও তাঁর সব শ্রেণীর গানই সমান সমৃদ্ধ। আমাদের কামনা তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করে ভারতীয় লোকসঙ্গীতের আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-পাকিস্তান

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তান : ৪০৮ (সয়িদ আহেদ ১৫০, হানিফ মহম্মদ ৭৯) ও ৩১৮ (ওয়াজির মহম্মদ নট আউট ৯৭, কারদার ৫৯। সিবস ৮০ রানে ৫ উইকেট।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৪১০ (জি, সোবার্স ১২৫, সি ওয়ালকট ১৪৫। ঘানি ১১৬ রানে ৫ উইকেট) ও ৩১৭ (২ উইকেটে। সি চার্ল্ট ১১৪, জি সোবার্স নট আউট ১০৯, কানহাই ৬২)

জর্জটাউনে অনুষ্ঠিত ৪র্থটেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেটে পাকিস্তান দলকে পরাজিত ক'রে 'রাবার'লাভ করে। অনুষ্ঠিত চারটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তিনটি টেষ্ট খেলায় জয়লাভ করে এবং একটি খেলা (১ম টেষ্ট) ড্র যায় ফলে পঞ্চম টেষ্ট খেলায় গুরুত্ব কমে যায়।

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২৬৮ (কোলী স্মিথ ৮৬, এভার্টন উইকস ৫১, ওয়ালকট ৪৭। ফজল মামুদ ৮৩ রানে ৬ উইকেট পান) ও ২২৭ (ওয়ালকট ৬২, হার্ট ৪৫। নাসিমুল গণি ৬৭ রানে ৬ উইকেট)

পাকিস্তান : ৪৯৬ (ওয়াজির মহম্মদ ১৮৯, সয়িদ মাসুদ ৯৭, হানিফ মহম্মদ ৫৭। জে টেলার ১০৯ রানে ৪ এবং সিবস ১০৮ রানে ৪ উইকেট পান)

পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান এক ইনিংসও ১ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। ৫ম দিন লাঞ্চের আগেই খেলা শেষ হয়ে যায় ; সুতরাং একদিনের খেলা মাঠে মারা যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কাছে পঞ্চম টেষ্টের কোন গুরুত্ব ছিল না ; কারণ তারা ৪র্থ টেষ্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে 'রাবার' পেয়ে যায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের পাঁচটি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৩ (২য়, ৩য় ও ৪র্থ টেষ্ট), পাকিস্তানের জয় ১ (১ম টেষ্ট) এবং ড্র ১ (১ টেষ্ট)।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বরোদা এক ইনিংস ও ২১ রানে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ৮ বছর পর পুনরায় রঞ্জি ট্রফি জয়লাভ করেছে। এই নিয়ে বরোদা চারবার রঞ্জি ট্রফি পেল ; তারা রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে ১৯৪৩, ১৯৪৭, ১৯৫০, ও ১৯৫৮ সালে।

টসে জয়ী হয়ে বরোদা প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলায় ২ উইকেট পড়ে বরোদা দলের ২৬৯ রান ওঠে। গাইকোয়াড এবং হাজারে যথাক্রমে ১৬১ এবং ১৫০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

২য় দিনে বরোদা দলের ১ম ইনিংস চা-পানের কিছুপর ৪৯৫ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষের প্রাক্তন টেষ্ট ক্রিকেট অধিনায়ক বিজয় হাজারে ২০৩ রান ক'রে প্রমাণ করেন, টেষ্ট খেলার নির্ব্বাচক মণ্ডলীর চোখে তিনি বাতিল হ'লেও দলের পক্ষে আজও তিনি কতখানি নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। বরোদা দলের মোট ৪৯৫ রানের মধ্যে হাজারের একার রানই ছিল ২০৩। ২য় দিনে সার্ভিসেস দল আধঘণ্টার কিছু কম সময় খেলে ২১ রান করে, উইকেট পড়ে একটা।

৩য় দিন সার্ভিসেস দল ৯ উইকেটের বিনিময়ে ২৩৭ রান তুলে। স্পিন বোলারদের কাছে সার্ভিসেস দল নাজেহাল হয়। ফলো-অনের হাত থেকে রেহাই পেতে সার্ভিসেস দলের তখনও ১০৯ রানের প্রয়োজন ছিল।

৪র্থদিনের খেলার ১০ মিনিটের মধ্যে সার্ভিসেস দলের ১ম ইনিংস ২৩৯ রানে শেষ হয়। বরোদা দলের থেকে ১০৮ রানের পেছনে পড়ে সার্ভিসেস দল ফলো-অন্ করে। এবং চা-পানের ৩৫ মিনিট পর সার্ভিসেস দলের ২য় ইনিংস ২০৫ রানে শেষ। ফলে বরোদা ১ ইনিংস ও ২১ রানে জয়ী হয়। পাঁচ দিনের খেলা চার দিনেই শেষ হয়।

বরোদা : ৪৯৫ (হাজারে ২০৩, গাইকোয়াড ১৩২। রমেশ ৭৮ রানে ৩ উইকেট)

সার্ভিসেস : ২৩৯ (মহীন্দর সিং ৭৩, দানী ৫১) ও ২০৫ (মহণ্ৎসিংজী ৫৭, গনেশন ৫২ । হাজারে ১৭ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই গোল্ড কাপ ঃ

বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব হকস ২-১ গোলে গত বছরের কাপ বিজয়ী সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বাংলা বনাম সার্ভিসেস দলের সেমি-ফাইনাল খেলায় সার্ভিসেসদল প্রথম ইনিংসের রানের অগ্রগামী থাকায় জয়ী হয়।

বৃষ্টির দরুণ ৪র্থ বা শেষ দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। বাংলার অধিনায়ক পঙ্কজ রায় খেলা পুনরারম্ভের পক্ষে ছিলেন কিন্তু সার্ভিসেস দলের অধিনায়ক অধিকারী স্বপক্ষে ছিলেন না। আম্পায়ারদ্বয় অধিকারীর মত সমর্থন ক'রে লাঞ্চ সময় পর্য্যন্ত খেলা স্থগিত রাখতে নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খেলা আরম্ভ করার প্রয়োজনই হয় না, বাংলার অধিনায়ক পরাজয় স্বীকার ক'রে নেন।

বাংলা : ৩৬০ (বি চন্দ ৫৮, পি সেন ৫৭, কে মিত্র ৪৮, ফারুকার ৪১)

সার্ভিসেস : ৩৭০ (দুই উইকেটে । আত্মা সিং নট আউট ১৮৪, দানী নট আউট ১২২)

রেসপোর্ট ঃ

কলকাতায় অনুষ্ঠিত রেসপোর্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল :

উইলিংডন ট্রফি : ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব 'এ' ২½ লেংথ দূরত্বে এবং ২ মিঃ ২৩ সেকেণ্ড সময়ে লেক ক্লাবকে পরাজিত করে।

জেনারেল স্কালস : রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ৩ লেংথ দূরত্বে এবং ৩ মিঃ ৪৭½ সেকেণ্ড সময়ে মাদ্রাজ বোট ক্লাবকে পরাজিত করে।

ম্যাকলিন স্কালস : এস মেদোরা (লেক ক্লাব) ৩ মিঃ ২১ সেকেণ্ডে এস দত্তকে (লেক ক্লাব) পরাজিত করেন।

সাহিত্য সংবাদ

কাজল গাঁয়ের কাহিনী : পঙ্কিলপথ রায়গুরু

নিরপ বৈশিষ্ট্যের পরিচিতিতে লেখক বাংলা সাহিত্যে পূর্বেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সুতরাং নতুন করে তাঁর পরিচয় বেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক সাহিত্যে বাস্তবধর্মী লেখক হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন।

'কাজল গাঁ' একটি কাল্পনিক নাম। মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের একটি মহকুমা সহরকে কেন্দ্র করে কাহিনীটি রচিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কোঠায় পা বাড়িয়ে সারা দেশ যখন সভ্যতার আলোকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, তখনও কাজল গাঁয়ের ছায়া-ঘেরা অঞ্চল প্রাক্ দুশীর সভ্যতার গণ্ডী ভেঙে পুরোপুরি আধুনিক হয়ে ওঠে নি। জেলা সহর থেকে আঠারো মাইল দূরে মযাবী দুপের আওতায় না-সহর না-গ্রাম। পরিবেশে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল কাজল গাঁ। পথঘাট যান-বাহনের নানা অসুবিধায় মাঝখানে হঠাৎ ঠাকুর মশায় এক প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে তুললেন মহকুমা থেকে জেলা সহর পর্যন্ত একটী বাস-সার্ভিস খুলে। তার পর ধীরে ধীরে আবর্তিত হয়ে চললো যুগ প্রগতির তালে পা ফেলে কাজল গাঁয়ের সামাজিক ও কূটনীতিক জীবন। স্থানীয় কতকগুলি ঘটনার দ্বারা অবলম্বনে লেখক তাঁর কল্পনার জাল বুনে নিখুঁত ছবি এঁকেছেন এই কাজল গাঁয়ের। ঠাকুরমশায়, রেণুপদ, মদন, চক্রবর্তী মশায় প্রভৃতির চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের তুলিস্পর্শের গুণে। অনিমেষ ডাক্তার, মনীষা, মনু, শচীন, হরেরামবাবু প্রত্যেকটী চরিত্র নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে। লিখনভঙ্গী আগাগোড়া পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে রাখে। একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, উপন্যাস হিসাবে বইখানি সার্থক হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক পটভূমিকার সঙ্গে আপ্যান বস্তু ওতপ্রোত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোথাও যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। লেখকের লিপিকুশলতা প্রশংসনীয়। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ৪·৫০ নয়া পয়সা]

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচয় : ডাঃ ভবোষচন্দ্র দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি মূল্যবান তালিকা এই পুস্তকে নিবদ্ধ হয়েছে। কবিগুরুর রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব, দার্শনিক তত্ত্ব, রহস্যবাদ, সাংকেতিকতা এবং নানা দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র প্রভৃতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব পুস্তক লেখা হয়েছে এই গ্রন্থটি সেই সকলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে বলেই বিশ্বাস। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, ছাত্র ও অনুরাগী পাঠকবর্গও এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হবেন। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—মডার্ণ বুক এজেন্সী। ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। বইখানির ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে আচার্য্য-জীবনের বৃহৎ কথা সুনিপুণভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক পংক্তিতে আচার্য্য-সম্বন্ধে নূতন কথা আছে, অথচ ইহা তথ্য সংগ্রহ মাত্র নহে, কথাগুলির গ্রন্থন একটি সূত্র ধরিয়া সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে। উচ্ছ্বাস নাই ; সংযত প্রচার লেখক এই ছোট বইখানিতে আচার্য্যের বহুমুখী প্রতিভা, চারিত্রিক শক্তি, স্বদেশের চর্চা, সমাজসেবা ও কর্মক্ষেত্রের সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। বইখানি মনোরম হইয়াছে।

[প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ; দাম—১·২৫ নয়া পয়সা]

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

ম্যালিয়া : কুমারেশ ঘোষ

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নন। আলোচ্য নাটিকাখানির মধ্যে উচ্চাঙ্গের রস পরিবেশন করে শুধু হাসি নয়, ভাব্‌বারও অনেক কিছু বিষয় বস্তুর ওপর রেখাপাত করা হয়েছে। নাটিকাটি প্রস্তাবনা ও যবনিকাপতনে সজ্জিত। হরিহর বটব্যালের ব্যাধির ম্যালিয়া নিয়ে গ্রন্থকার হাস্যোদ্দীপক বহু ঘটনার অবতারণা এই নাটিকাটিতে করেছেন। গদ্য কবিতার ওপর প্রেমাত্মক রস পরিবেশন ও কবিরাজের ওপর

প্রতিকৃতি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনায় প্রফুল্লকুমারের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পেয়ে আনন্দলাভ করা গেল। মানুষের নানারঙ্গের মানসিকতার ওপর মানসিক তোজ্য প্রস্তুত করবার ক্ষমতা যে প্রফুল্লকুমারের আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫৮ পৃষ্ঠায় হরিহর ও বিশ্বম্ভরের সংলাপের মাঝখানে দু'বার ডাক্তার এসেছে। আশা করা যায় দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ে এই সংশোধন করা হবে। নাটিকাটি অভিনয় করে নাট্যামোদীরা আনন্দ পাবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[প্রকাশক—গ্রন্থগৃহ। ৫১এ, গড়পাড় রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—১৲ টাকা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গল্প সংকলন "উত্তরণ"—২'৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "বঙ্কু" (৫ম সং)—১'৭৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিন্দুর ছেলে" (২৭শ সং)—২৲

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "প্রতাপ-আদিত্য" (১৭শ সং)—২'৫০

অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "পরীবের মেয়ে" (৩য় সং)—৩'৫০

সন্তোষ রায় প্রণীত নাটক "জীবনটাই নাটক" (২য় সং)—২'৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নয়-বিগ্রহ"—৩'৫০

মুরারিমোহন মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "জাজল-গড়ের কাহিনী"—১'৫০

ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমার রায় প্রণীত হিন্দী "সুধাঞ্জলি" (ইংরাজি অনুবাদসহ)—৩'৫০

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "গাঁটছড়া"—২৲

ওস্তাদ শওকতআলি খান্ প্রণীত "সেনী রীতিমালা" (৪র্থ)—৪৲

শ্রীসরোজচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "সেকালের রান্নাঘরের গল্প"—১'৭২

শ্রীসুযোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "দুষ্কার্জুন"—১'৫০

নতুন রেকর্ড

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82773—শিল্পী মান্নাদে মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি আকর্ষণীয় আধুনিক গান—"তুমি থাকো আমি যাই" ও "যারে যারে কে যেন ডাকে।"

N 82774—শ্রীমতী মধু ওস্তার মধুকরা কণ্ঠে "কে তুমি ঘুম ভাঙালে" ও "এস গো একা ঘরে"—দু'খানি অতুল প্রসাদী গান।

N 82775—"শ্রাবণ মেঘে মেঘে" ও "পথ যদিও দূর" প্রায় প্রাচুর্যে উজ্জ্বল দু'খানি আধুনিক গান—গেয়েছেন নবীন শিল্পী দিলীপ রায়চৌধুরী।

N 82518—নব প্রতিষ্ঠা শিল্পী ও সংগীত পরিচালক রাজেন সরকারের ক্লারিওনেটের মাধ্যমে প্রকাশিত নব রীতি—সুর : ঘুম ও সুর : পূরবী।

কলম্বিয়া

GE 24882—মান্না ভট্টাচার্যের গাওয়া দু'খানি অনবদ্য আধুনিক গান "তুফান মো" এবং "বিদায় নিতে দুঃখ কেন।"

GE 24883—"মৌমাছি গুন্ গুন্" ও "তোমারে চেয়েছি বলে"—দু'খানি আধুনিক গান—নিজের সুরে গেয়েছেন—শিল্পী শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 24884—হৈমন্তী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "বয় সাথে ঢেউ জাগালো" ও "রাত বিদুষ" দু'খানি আধুনিক গান।

GE 24885—কুমারী আরতি মুখোপাধ্যায়ের সুর সমৃদ্ধ কণ্ঠের দু'খানি ভাব মধুর আধুনিক গান—"তোমার মিলন উৎসব রাতে" ও "ঝাউবীথিরে"

GE 24886—দু'খানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত "তুমি তো জাননা" ও "পথ ছাড় ওগো আম"—প্রথমখানি রাগেশ্রী দ্বিতীয়খানি বেহাগ পরিবেশন করেছেন শিল্পী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30390 এবং GE 30391 রেকর্ডে সোনার কাঠি বাণীচিত্রের চারখানি গান GE 30392 রেকর্ডে 'বঙ্কু' বাণীচিত্রের দু'খানি গান ও GE 30393 এবং GE 30394 রেকর্ড দু'টিতে "মানময়ী গার্লস স্কুলের" চারখানি গান বিভিন্ন গৌতিক শিল্পীর কণ্ঠ হতে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী: গৌরী ধাবগুপ্তা কাচের ফাঁকে আলময় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বৈজ্ঞানিক

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"য একো জালবাণীশত ঈশনীভিঃ"। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)
"যে অদ্বিতীয় মায়াবী স্বশক্তিসমূহের সহায়ে শাসন করেন" তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার। যিনি সে মায়ার জাল ছিন্ন কোরতে প্রয়াসী হন এবং তার পশ্চাতে যে শক্তির খেলা আছে—সে শক্তিকে চিনতে সাহায্য করেন এবং আমাদের জীবনে সে শক্তি প্রয়োগ ক'রতে শিক্ষা দিয়ে—সে জীবনকে আলোকিত করেন এবং সহজ করেন—তাঁকেও করি নমস্কার—জানাই আমার শ্রদ্ধা প্রণতি। তিনি যে সমগ্র মানব সমাজের নমস্য।

অজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা' মায়া ও যা' রহস্য—যার নিকট মানুষ অসহায় ও শক্তিশূন্য মনে ক'রে দুঃখে শিশুর মত রোদন করে—সুখে আবার তারই মত নৃত্য করে, সে মায়া বা রহস্য যখন সহজ হ'য়ে প্রতিভাত হয় আমাদের জ্ঞানের আলোতে—যে আলো মানুষকে পথ দেখায় অন্ধকারে যখন মানুষ জানে সে কোন ক্রুদ্ধ বা তুষ্ট দৈবশক্তির দ্বারা চালিত নয়—তখনই তো আসে মানবতার প্রথম জয়।

Comma বীজাণু আবিষ্কারের পর মানুষ আর রইলনা—কোন প্রচ্ছন্ন রুষ্ট দেবীর শাসনে গ্রামের পূজা

মানত কমে গেল—ডাক্তার সে স্থানে অধিষ্ঠিত হ'ল—আর পূজার স্থান নিল Saline Injection—মানুষ হ'ল নিরাপদ, জ্ঞানের আলো হ'ল ধন্য। এক্ষণে মানুষের দেহের উপর আধিদৈবিক যে আক্রমণ ছিল—তা' মুখ লুকাল। অশনি ছিল দুষ্ট ইন্দ্রের অগ্নিপাত—মানুষ যাগযজ্ঞে চাইল প্রতিকার—তা'র দুঃখ থেকেই গেল, ধামখেয়ালী দেবতাকে যে প্রকৃতিস্থ করা যায়না। রাগ তাঁর তো হ'তেই পারে, তিনি যে দেবতা—বৈজ্ঞানিক শায়েস্তা ক'রলেন এই ক্রুদ্ধ দেবতাকে বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের সাহায্যে। দেবতার ত্রিশূলের বজ্র মানুষ পরাস্ত ক'রল নিজের ত্রিশূলে। স্পর্দ্ধাও তো কম নয়!

মহামায়া অসুরকুল-ধ্বংস করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন। মানুষের কাছে অবশেষে এল সে দেবতাগণের পরাজয়। ধন্য বৈজ্ঞানিক। মহামায়া যে মানুষের ভেতরেও আছেন তার বুদ্ধি ও তার চেতনারূপে "সর্বস্য বুদ্ধিরূপেন জনস্য হৃদিসংস্থিতা"। বৈজ্ঞানিক তোমায় নমস্কার। তোমার চেতনা ও বুদ্ধি দিয়ে জয় ক'রেছ তুমি দেবতাকে। তুমি নমস্য। তুমি যে মহামায়ার নূতন সৃষ্টি। কত আশা, কত উদ্দীপনা নিয়ে এসেছ তুমি—তুমিও তো দেবতা, কত—শৌর্য্য কত সৌন্দর্য্য তোমার। মানুষ তো উঠেই চলেছে কতভাবে, সে রহস্যের সব দ্বার একে একে উদ্‌ঘাটন ক'রেছে। "Open Sesame" মন্ত্রটি সে আয়ত্ত ক'রেছ—গহ্বরে লুক্কায়িত ধনরত্ন সব অধিকার করার জন্য। সহস্র আলিবাবা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক, তোমার প্রথম জয় হ'য়েছে। জ্ঞানভাণ্ডারের একটি চাবি তুমি খুঁজে বের ক'রেছ। এ জয়ের গৌরব যেন তোমাকে আত্মগৌরবের মোহে নিদ্রিত ক'রে না রাখে। দেবতাদের আসনে তোমার অধিষ্ঠিত হ'তে হবে—তাঁদের ঈর্ষা, ঘৃণা ও গর্ব ভুলে। মহামায়ার অসুরবিজয় দেবতাদের মুক্ত করেনি তাঁদের আত্মাভিমান থেকে, তাঁদের দেবত্ব যে ছিলনা শুভ চেতনাপূর্ণ। বিস্মৃত হ'য়েছিলেন তাঁরা জয়ের গৌরবে, সে জয়ে তাঁদের ছিলনা প্রকৃত অধিকার। বিস্মৃত হ'য়েছিলেন তাঁরা সেই মহাদেবীকে—যাঁর করুণায় ও যাঁর অপার শক্তিচালনায় তাঁরা লাভ ক'রেছিলেন তাঁদের মুক্তি। অগ্নিদেব তেবে-ছিলেন তাঁরই শক্তি জয় করে বিশ্বচরাচর। দেবাদিদেব ব্রহ্মযক্ষরূপে এসে সে অভিমান দিলেন ভেঙে।

"তদ্বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি কিং বীর্যমিতি";

তোমার কী সামর্থ্য?—হ'লো প্রশ্ন।

উত্তর—"অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।"

এ পৃথিবীতে যা' কিছু আছে তা' সমস্তই আমি দগ্ধ ক'রতে পারি।' তারপর ব্রহ্ম "তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি" ইহা দগ্ধ কর এই বলিয়া তিনি অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন ক'রলেন। কিন্তু "তৎ সর্বজবেন তন্নশাক দগ্ধুম্" কিন্তু তিনি তা দগ্ধ ক'রতে পারলেন না।

(কেনোপনিষৎ)

ভাওলো তখন দেবতাদের অভিমান। মানব, তোমার প্রথম জয়ের গৌরব যেন তোমায় দ্বিতীয় জয়—যা' তুমি এখনও লাভ করনি—তোমায় ভুলিয়ে না রাখে। দেবী তাঁর সম্মোহন মন্ত্রে আমাদের মুগ্ধ করেন—সেই মোহ-কলিলে নিজেকে হারিওনা। সত্যলাভ, প্রজ্ঞাপ্রাপ্তি চাই। কী সে জয়—দেবতারাও যা' লাভ করতে পারেননি? তোমার প্রথম জয়ে তাঁদেরও হ'য়েছিল লাভ—তাঁদেরও আয়ুধ অস্ত্রশস্ত্র-বল ইত্যাদি। তবুও তাঁরা বিতাড়িত হ'লেন দৈত্যকুলের দ্বারা। হারিয়েছিলেন যে তাঁরা আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম। মানুষ তোমার এই দুই প্রহরণ লাভের মন্ত্রের সাধনা ক'রতে হবে, তবেই আসবে তোমার প্রকৃত জয়। তুমি যে জয়ে জয়ী হ'য়ে আজ তোমার জয়রথ চালিয়ে যাচ্ছ, সে রথের সারথি তোমার বুদ্ধি—মনোসংযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি হল তোমার রথ ও বল্গাচারিহিত তার অশ্বদল। তুমি নিজে যে এ রথের রথী তা' জানকি? তুমি রথই চেন—অশ্বচালনা বা সংযোজনা তুমি জাননা। তোমার বুদ্ধি যে তোমার মনকে শান্ত ও সংযত করতে অক্ষম।

সে যে অতিশয় চঞ্চল অথচ শক্তিশালী "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।" মনের নিগ্রহ বায়ু শাসনের ন্যায় দুরূহ।

তোমার রথ নিয়ে ছুটেছে তোমার অশ্ব সারথির দমনের বাইরে। রথ ও সারথি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সারথি তাই শক্তিহীন। রথ তাই বিভ্রান্ত হ'য়ে ছুটেছে আজ

অন্ধকারে—"অন্ধেনৈব নীয়মানা: যথান্ধা:" কত ভীতি সঞ্চার ক'রে তার দুর্দ্দমনীয় বেগে, কত বিনাশসাধন ক'রে কত হাহাকারে আকাশ বাতাস পূর্ণ করে—সারথি ধর অশ্বের বল্গা ধীরহস্তে, রথি, দেখ কোথায় চলেছ ধ্বংসের পথে—কী হবে এই জয়যাত্রায়—ক্ষান্ত হও, রুদ্ধ কর তোমার গতি।—সারথি আগে চেন নিজেরে, চেন রথিরে। জিজ্ঞাসা কর তাঁকে কোথায় যেতে হবে? গন্তব্য তোমার কী?

বৈজ্ঞানিক, তুমি ভেবেছ তোমার রথকে তোমার অশ্বই নিয়ে যাবে তোমার গন্তব্যে। পথ তো তোমার দীর্ঘ—প্রশস্ত বহুমুখী। তুমি চলেছ কিসের অনুসন্ধানে? তোমার উদ্দেশ্য যদি শুধু কাসেমের মত ধনরত্নপ্রাপ্তিই হ'য়ে থাকে, অচিরেই তুমি ভুলে যাবে তোমার মন্ত্র, হারিয়ে ফেলবে তোমার চাবি, প্রাণ হারাবে দস্যুর হাতে।

তোমার জন্ম কি এনেছে তোমার দৃষ্টিতে জ্ঞানের আলো? জান কি তুমি তোমার শক্তির সীমা? মনে রেখ সে শক্তি একটি বৃহত্তর শক্তির এক অংশমাত্র। ভুল কোরনা দেবতাদের মত—ভেবনা শুধু নিজের শক্তির কথা। তুমি ভাব তোমার আগুন তুমি নিজে জ্বালাও, দেখনা কি বর্ষার জলে হঠাৎ তা' যায় নিভে? কত অহঙ্কার তোমার আজ। তুমি নিজের পক্ষ নিজে রচনা ক'রে কত যান ও প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে উড়ে চলেছ। কিন্তু দেখনা কি তুমি তোমার অভিমান ভাঙবার জন্য আসে অতর্কিতে কত বিপত্তি—চূর্ণ করে তোমার ডানা? বায়ু ছাড়া তুমি কি তোমার পাখা বিস্তার ক'রতে পার? তোমার সব আবিষ্কার কি অপরা-প্রকৃতির ভূতপক্ষের উর্দ্ধে কি তাদের বাইরে সম্ভব হয়? তবে তোমার শক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের অর্থ কি? তোমার শক্তির অস্তিত্ব কোথায়? বৈজ্ঞানিক, ভুলোনা তোমার শক্তির সীমানা। পারকি তুমি মৃতদেহে হৃদয়কে সঞ্জীবিত ক'রতে? যতক্ষণ হৃদয় স্পন্দিত হয় জীবিত-দেহে, ততক্ষণ তুমি পার হয়তো সে স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে।—কিন্তু সে স্পন্দনের প্রকৃতি শক্তি বা উৎস কি তুমি যথার্থ অবগত আছ? কত বিরাট কলকারখানা তুমি নির্মাণ ক'রেছ মানুষের নিরাপত্তা ও সুখের জন্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বৈজ্ঞানিক, একটা পিপীলিকাও কি তুমি সৃষ্টি ক'রেছ?

কোন গর্বিত জ্যোতির্বিদ একবার নেপোলিয়নকে নাকি বলেছিলেন, তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে তিনি সারা সৌরমণ্ডল খুঁজেও ভগবান বা তাঁর জ্যোতি দেখতে পাননি। যদি একথা ঠিক হ'য়ে থাকে তবে এই জ্যোতির্বিদকে আমি দুটি কথা জিজ্ঞাসা করব। এক, তাঁর দূরবীক্ষণের শক্তির আধার—তার স্বীয় দৃষ্টিশক্তি তিনি কি নিজে সৃষ্টি ক'রেছিলেন? এই দৃষ্টি ব্যতিরেকে তাঁর দূরবীক্ষণের দৃষ্টি কি সম্ভবপর হবে? দ্বিতীয়তঃ, তিনি যত জ্যোতিষ্মান পদার্থ গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র দেখেছেন সৌরজগতে, তাঁদের জ্যোতির উৎস কোথায়? আর সে উৎস যদি অস্বীকারও করা যায় তবে এ সব জ্যোতি বা আলো যে ভগবানের বা ঈশ্বরের জ্যোতি দেখাতে পারেনা তার প্রমাণ কোথায়?

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চ চন্দ্রতারকম্" এটা তিনি অস্বীকার ক'রতে পারেন কোন যুক্তিতে?

বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যত নির্ভর ক'রবে "জগদ্বিতায়" তাঁর দ্বিতীয় জয়ের উপরে। প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক এখনও তাঁর যুক্তিতে অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা ক'রতে পারেন না। যেমন আমাদের অন্তর্জগতের ভাবরাশি বিশ্বাস শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসা ইত্যাদি। কেহ কেহ যত্নবান হ'য়েছেন এদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখাতে এবং মানবজীবনে তাদের প্রভাব কি তাও বোঝাতে। কিন্তু বিরাট ক্ষেত্র অনাবিষ্কৃত পড়ে র'য়েছে জ্ঞানীদের সম্মুখে।

বৈজ্ঞানিক, তোমায় আবার নমস্কার করি। তুমি যে জ্ঞানের প্রতীক। সত্যের দ্বারের দ্বারী। এখন তুমি নিজেকে চিনবে তোমার স্বরূপে বিশ্বশক্তির অংশরূপে যে শক্তি সত্যের অনন্ত সত্তায় তার আনন্দে ও কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত তখন তোমার রথের অশ্বের রশ্মি তুমি চালাবে সংযত হস্তে—তোমার বুদ্ধির চালনায়। দেখবে সত্যের মঙ্গল আলোকে তোমার পথ:

'অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥

অজ্ঞানতার গহন বলে দেখবে তোমার সম্মুখে অনন্ত আদিহীন বিশ্বসত্তা তার অসংখ্যরূপের মধ্যে। দেখবে

তার স্বপ্রকাশ, তার বহুত্বে দেখবে তার "জ্যোতিরেকং" যে জ্যোতি ঘুচে দেবে তোমার সবদৃষ্টির অন্ধকার ; তখন সব বন্ধনমুক্ত হ'য়ে জানবে তুমি নিজেরে থেমে যাবে তোমার রথের উদ্দাম গতি ; উপলব্ধি ক'রবে নিজের স্থিতি অমৃতানন্দে—বিচ্ছুরিত হবে তোমার চারিধারে সত্য ও জ্ঞান—অনন্ত ও প্রেমের অখণ্ড জ্যোতি—ছিন্ন হবে মায়ার জাল সহস্র রশ্মিতে। ' দেবতারা পরাভূত হবে মানবতার সাধনায় ও সিদ্ধিতে :

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়
সর্বকর্মাখিলামিদং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

দিনান্তে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আশে-পাশে বন,
কাঁঠাল, পেয়ারা গাছ, একটানা কোপকাড়—গভীর গহন।
আলসা মাটির ঘ্রাণ বুনো অরণ্যের
পাই আর পেরিয়ে যাই চেনা-চেনা পথগুলি ভিতরে ঘাসের,
মুছে-যাওয়া ইতিহাস চাপার কলির মত আঁখি মেলে ফের,
মনে মনে ভাসে :
ঝিলমিল করে ওঠে কার মুখ—
এক ঝাঁক মিহি রোদ হাসে ?

অনেক—অনেক দিন আগেকার অনেক কথা সে।
এমনি ধূসর বেলা কত গেছে, মেঘ-রৌদ্রে ছায়া-ছায়া দিন।
মনের কুয়াশা তলে চাপা রোদ আজও অমলিন।
মাটি আর ধূলা নিয়ে কত খেলা—মাটির সাগরে,
কত ছবি—হৃদয়ের এঁকে গেছি অনেক বিস্মৃত অবসরে ;
মাটির ডেলার মালা হয়ত খেলার ছলে কে,
হয়ত-বা ভালবেসে
কত তার গলে দিছি : আজও মনে পড়ে।
মলিন হয়নি রঙ এতদিন পরে তবু : বৃষ্টি আর ঝড়ে।

অনেক গহন বন আমরা হয়েছি পার কত অনায়াসে—
কখনও আমার হাত, কখনও-বা তার হাত আমার
হাতের 'পরে হাসে :

সাদা চাঁদ সবুজ আকাশ।
হয়ত অনেক কথা—কত কথা ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে,
শুধু বুঝি কেঁপে যায় স্বর,
সে ত নেই,—মাটির সবুজ ঘাসে ধূলায় ধূসর।
আমাদেরও এ-জীবন ঘাসের মতন।
মুছে যায় নীল রঙ একদিন শুধু থাকে সবুজের ঘ্রাণ :
ফাল্গুনের হাওয়া এসে দোলা দেয় মনের সবুজ শীষে গান—
ঢেউয়ের মতই অফুরান।
দিনান্তে বৃষ্টির মত ঘাসের হৃদয় ঘিরে সোনা রোদ ঝরে :
কিছু-কিছু অনুভূতি জেগে দেয় শাখায় শিকড়ে :
কেঁপে ওঠে মাটি, ঘাস, বন।
ধূসর আঁধার কত ভেদ করে জেগে ওঠে পুরানো স্বপন
অনেক—অনেক দিন বুঝি আগেকার,
ভেসে এল মুখ তার আর একবার।

ভস্মসা

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

হাততালির ঝড় উঠেছে। আর সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ সেই ঝড়ের আবর্তনে আবর্তিত। অডিটরিয়মে তিল ধারণের স্থান নেই—এত দর্শকের সমাগম। সমস্ত দর্শককুল উত্তেজনায় অধীর। তাদের অধিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে হাততালির ঝড়ে। সে-ঝড়ে কাঁপছে প্রেক্ষাগৃহের আলোক-মালা। কাঁপছে মিলিয়ে-যাওয়া সুরের রেশটুকু। আর দুলছে শ্রোতাদের মন। একখানি গান শেষ হয়ে গেল।

—সুপার। মীড়ের কী সূক্ষ্ম কাজ। বললে একজন।

—শ্রীমতী সেন যাদু জানে। সুরের যাদুকরী। উত্তর দিলে আরেকজন।

সিল্কের আর আস্তির পাঞ্জাবীর মেলা, ফিন্ ফিনে ধুতি পরিধানকারী সঙ্গীত-সমজদার সব দর্শককুল। আর আছে দামি স্যুটের ভিড়। হাভেনার গন্ধ নিষিদ্ধ, তাই। কিন্তু বিলিতি সেন্টের গন্ধে আমোদিত চারিদিক।

বিলাসিনী মেয়েদের দলও আছে। ব্যাঙ্গালোর, জর্জেট, টিসু আর সিল্কএ—চিকচিকে হার, কুণ্ডল আর হীরের ঝক্-মকানি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব নেই কোন ক্ষেত্রেই।

হাততালির শেষ না হতেই ফরমায়েশের গুঞ্জন সুরু হল চারিদিক থেকে—আর একখানা, আর একখানা। কেউ বললে—'নিশি পোহায়ো না।' কেউ বললে—'আমার এ-মন যাতায়ন।

কেউ কেউ আবার আপত্তি প্রকাশ করলে—ওগান নয়, ওগান নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ—'তুমি শুধু আমার। শুধু আমার।' কর্তৃপক্ষ করযোড়ে এগিয়ে এলেন—আমাদের প্রোগ্রামে এখনো অনেক শিল্পি—

কথার মাঝখানেই প্রতিবাদ উত্থিত হল—শুনতে চাইনে। শুনতে চাইনে।

নিরুপায় কর্তৃপক্ষকে পিছিয়ে যেতে হল। চেয়ারে চেয়ারে যে আন্দোলন—বেশি কথা বললে বিপর্যস্ত হতে হবে।

স্টেজ চেঞ্জ-এর হারমোনিয়মে আবার সুর উত্থিত হল। তবলায় চাঁটী পড়ল। গায়িকার সুচিক্কণ কণ্ঠে সুরের দ্যুতি। আবার হাততালির ঝড়। কাঁপতে লাগল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ। দুলতে লাগল আলোক-মালা; আর তার সঙ্গে সমস্ত শ্রোতাদের সুরেলা চিত্ত।

সুজাতা সেন ফিকে হাসির রঙ ছড়িয়ে গুণগ্রাহী দর্শক কুলকে অভিবাদন জানিয়ে গান ধরলে—

'ভালোবাসা কেন কাঁদায়
এমন করে?
যে গেছে সে ঝরা ফুল
তবু গন্ধ ঝরে!'

সুরের ভাঁজে ভাঁজে যে কারুণ্যের মূর্চ্ছনা, সে মূর্চ্ছনায় গায়িকার সঙ্গে শ্রোতারাও একাত্ম হয়ে গেছে। অপূর্ব এ-গানের ব্যঞ্জনা। এ-গান শেষ হতেও আবার সেই উত্তেজনার ঘূর্ণী-হাওয়া। আবার অনুরোধের বন্যা—আর একখানা। একখানা মাত্র। আর সেই গানখানি—'সুখ নিশি ছল করে কেন গো এলে।' এবার আর দর্শকদের নিরস্ত করতে কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসতে সাহস হল না। বার কয়েক কাশির ছলনা করে সুজাতা সেনই বললে—আমার অক্ষমতাকে আপনারা ক্ষমা করুন! শুধু আপনাদের সম্মান-মূল্য দিতেই একখানা গান বেশি গেয়েছি। আমি অসুস্থ—সত্যিই অসমর্থ। আরো বার-কয়েক কাশির শব্দ হওয়াতেই দর্শককুল চুপ করে গেল। নিরস্ত হল উত্তেজনাময় প্রেক্ষাগৃহ। সুউজ্জ্বল আলোগুলির দোলানিও থেমে গেছে।

ক্লিক্ ক্লিক্ করে কয়েকটী শব্দ, আর ক্যামেরার চোখের

ওপরে মাথা থেকে কয়েকটি বাবের আলোক বিচ্ছুরণ। ঝলক্ মেরে উঠল সুজাতা সেনের চোখ-মুখ আর ঝল-জলে শোভা আর সিঁথিমূলে ক্ষুদ্র সিন্দুর রেখা।

উঠে দাঁড়িয়েছে সুজাতা সেন। আর একবার যুক্ত-করে শ্রোতাদের অভিবাদন জানিয়ে সুরের এলায়িত ছন্দে অন্তর্ধান করলে গীতি-প্রভা সুজাতা সেন।

আবার ঝড় উঠল। করতালির ঝড়। আলো কাঁপছে, মন কাঁপছে—সুরের রেশ মিলিয়ে যায় নি তখনো।

বন্যাভবনের আনুকূল্যে চ্যারিটি' শো। মস্ত বড় অনুষ্ঠান। ঘণ্টা তিনেকের প্রোগ্রাম। মোটা অঙ্কের হারে টিকিট বিক্রীত হয়েছে। শহরের গণ্যমান্য অতিথিরা এসেছেন। আর এসেছে নামকরা শিল্পীগোষ্ঠি।

শিল্পীদের মধ্যে আর সবাই না হয় আসতে পারে। কিন্তু সুজাতা সেন! অপ্রত্যাশিত তার আগমন। সাধারণ সভা-সমিতি, কাংক্সন বা জলসার আসরে সুজাতা সেন আসে না। বড়ঘরের বউ সে এখন। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের সঙ্গে আভিজাত্যের সমন্বয়। যেখানে-সেখানে সুজাতা সেনকে তাই পাওয়া যায় না।

ছায়াপটের রূপালি পর্দায় তার অসংখ্য দেহবল্লরীর ছায়া ফুটে ওঠে বটে। তার অভিনয় আর তার কণ্ঠের গাওয়া গান শোনবার জন্যে লোকে পাগল। হাউস ভেঙে পড়ে—ছবি রেকর্ড-সেল পায়। তার কণ্ঠের গানও লোকের মুখস্থ। গ্রামোফনে ডেস্কের পর ডেস্ক প্রিন্ট এবং রিপ্রিন্ট করতে হয়। বোম্বাই-এর শিল্পী। লক্ষ লক্ষ টাকা আর যশ কুড়িয়েছে বোম্বেতে। কিন্তু বাংলার মেয়ে। বাঙালীর সৌভাগ্য শ্রীমতী সুজাতা সেন এখন কলকাতার অধিবাসিনী। হিন্দি ছবি থেকে বাঙলা ছবির প্রতিই দরদ বেশি। শিল্পক্ষেত্রে সুজাতা সেনকে হারিয়ে বোম্বাই কানা হয়ে গেছে।

কলকাতা শহরের বিখ্যাত এ্যাটর্ণী সমরেশ সেন লুফে এনেছেন শ্রীমতী সুজাতা সেনকে বোম্বাই থেকে কলকাতার টালিগঞ্জে। সুজাতা সেনের তাই আসবার কথা নয় উত্তর কলকাতার এই রঙ্গমঞ্চে। আর সবাই আসে আসুক; কিন্তু এ্যাটর্ণী সমরেশ সেনের বিবাহিতা স্ত্রী শ্রীমতী সুজাতা সেন—ক্যামেরার ঈগল চোখে না হয় নিজেকে ধরা দিতে পারে, সে তো তার ছায়া মাত্র; কিন্তু আসল কায়াকে প্রকাশ করবে সর্বজনের সপ্রশংস আর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে—এ যে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আজ প্রেক্ষাগৃহ তাই ভেঙে পড়বার উপক্রম।

সুজাতা সেন স্বেচ্ছায় এসেছে। এসেছে যক্ষ্মা রোগীর প্রতি সহজাত সহানুভূতিতে। আশ্চর্য! সে নাকি নিজেই জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষকে যে চ্যারিটিতে সে যোগ-দান করতে পারলে খুশি হয়।

কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন আর পোস্টারের বিজ্ঞপ্তিতে দর্শক আর শ্রোতার ভিড়।

সুজাতা সেন না হয় উত্তর কলকাতার এই রঙ্গমঞ্চে এসেছে; আর সর্বজনদৃষ্টির সামনে নিজেকে মেলে ধরে দু'খানি গানও গেয়েছে ভাইসে বসে; কিন্তু রমাকান্ত কী বলে এল এই চ্যারিটি শোর জলসায়?

অফিস থেকে ছিটকে এসেছে রমাকান্ত। যক্ষ্মা-ভহবিলে গান করবার মতন সঙ্গতি তার নেই। আর তার চেয়েও বড় কথা—সময় কই তার? অফিস থেকে বেরিয়ে দু'তিনটে ট্যাশানি সেরে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা বেজে যায়। সকালে বাজার-হাট, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার একটু তদ্বির, সময় কই তার? সময় কই তার সিনেমা-যাওয়ার, হৈচৈ করবার, মাঠে ফুটবল খেলা দেখবার, জলসায় গিয়ে গান শোনবার? কিন্তু কী যে মতিভ্রম হল তার সেদিন! ঝোঁকের মাথায় পাঁচ টাকার একখানি টিকিট কিনে ফেললে সে।

সহকর্মী বিকাশ চৌধুরীই তোড়জোড় করে কোথেকে নাকি সংগ্রহ করে এনেছে।—জীবনে ভুলতে পারবেন না যারা, সুজাতা সেনের গান।

—কে সুজাতা সেন?

—সুজাতা সেনকে চেনেন না? আর থাকেন আপনি কলকাতা শহরে?

—না ভাই, সত্যিই চিনি না।

—আচ্ছা চোখে না হয় আসল চেহারা না দেখতে পারেন; কিন্তু সিনেমাতেও দেখেন নি কক্ষণো তাকে?

বিকাশের কথার মুড়ের মতন রমাকান্ত বললে—সময়

কোথায় ভাই সিনেমা দেখবার—সামর্থ্যই বা কোথায়? নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, বোঝ না তো সংসারের চাপ।

বিকাশ প্রতিবাদ জানায়—তা নয় দাদা। আসলে আপনার রুচিই হচ্ছে আলাদা। সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে কলুর বলদের মতন কিছু লোক আছে সংসারের শুধু চোখ-বাঁধা নির্দিষ্ট পথেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত।

এ-কথার উত্তরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল রমাকান্ত; কিন্তু বিকাশ তা থামিয়ে দিলে—বলবেন না দাদা। অংশটাই আপনার প্রতিকূলে—এইটেই তো বলতে চান বড় গলায়? না, তা ঠিক নয়। শুধু কলকাতা শহরে কেন, অন্য পাড়াগাঁয়েও খোঁজ নিয়ে দেখুন—তারা আপনার চাইতে সকলে অবস্থাপন্ন লোক নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কে না চেনে সুজাতা সেনকে? কে না তার অভিনয় দেখেছে? তার গান শোনবার জন্যে কে না পাগল?

—তবে দাও ভাই একখানা টিকিট। এতই বলছ যখন। আর তাছাড়া বন্যা-ভাণ্ডারে সাহায্য করা, তাও তো কর্তব্য! এমনি তো আর মানুষের মতন উচিত কোন কাজই করতে পারি না।—এই কথার সঙ্গে পাঁচ টাকার করকরে একটা নোট বিকাশের হাতে তুলে দিয়েছিল জুনিয়র গ্রেডের পাকা-কেরানি রমাকান্ত মিত্তির।

ডালহাউসি স্কোয়ারের অফিসের পর ছুতোরপাড়া ঘুরে, আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে দুটি ট্যুশানি। তারপর মাঝে মধ্যে মুদিপাড়া কিংবা এখানে-ওখানে আরো এক আধটা ফালতু ট্যুশানি বা উপরি পাওনার তাগিদ সেরে মানিক-তলা ব্রিজ পার হয়ে গিয়ে একতলার ছোট দুখানি ঘরে ঢোকা রমাকান্ত মিত্তিরের সীমা বদ্ধ জীবন।

তার স্ত্রী মেনকা তবু জানে—সুজাতা সেনকে। চেনে বৈকি তাকে। সিনেমার দরজায় ছুটির দিনে এক আধবার গতায়াত তার। শিশু-পুত্র-কন্যাগুলি সামলাবার ভার তখন রমাকান্তের।

মেনকা না হয় জানে সুজাতা সেনকে। এই বয়সেও কী অপূর্ব রূপ-লাবণ্য তার। কী মন-মাতানো কথার ভঙ্গী—কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর। তার অভিনীত বাঙলা এবং হিন্দি ছবি দু'চারখানা দেখেছে সে। আর সিনেমায় গাওয়া গানও শুনেছে।

কিন্তু রমাকান্ত মিত্তির! রমাকান্ত মিত্তির কী কখনো দেখেনি সুজাতা সেনকে? চেনে না তার মুখ-চোখ, তার সুশ্রী দেহ-বল্লরী, তার তারুণ্যের ঝলমলানি? শোনেনি কী তার মিষ্টি কণ্ঠস্বর ইহজীবনে?

পিছনের একখানি চেয়ারে বসে প্রথমে কণ্ঠস্বর শুনেই তাই সে চমকে উঠেছিল—এ কে? কে এই সুজাতা সেন?

দূর থেকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিকেও অতিশয় তীক্ষ্ণ করে তাকিয়েছিল গায়িকার পানে। দেখেছিল—ঝলমলে রূপ শোভা। তারপর? তারপর আর কোন হুঁসই ছিল না তার। থাকবার কথা নয়। এ কী স্বপ্ন দেখছে সে?

আশপাশে গুঞ্জন—বন্যা-ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্যেই সুজাতা সেনকে দেখা গেল। নয়ত পাদ-প্রদীপের সামনে তাকে দেখতে পাওয়ার কোন চিহ্নই ছিল না।

আরো কত মন্তব্য। তার বংশ পরিচয়, তাও কণ্ঠস্থ সকলের।

বাংলাদেশেরই মেয়ে সুজাতা। বিয়ে হয়েছিল সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বন্ধ্যা হয়েছিল এই অপরাধে হৃদয়হীন স্বামী আর শ্বশুর বাড়ি তাকে পরিত্যাগ করে ছিল। তাই সে মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু কতবড় সম্ভাবনা ছিল তার মধ্যে—হৃদয়হীন বোকা স্বামী তার তা যদি জানত! স্থান দেন তাকে এক সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ। অতি আপনজনের মতন প্রতিপালন করেন তাকে। তারপর বয়ে ফিল্ম-এ 'সুজাতা'র আত্ম-প্রকাশ। যশ বাড়ল, খ্যাতির শিখরে উঠল সে। কিন্তু এমনি কৃতজ্ঞতা বোধ, যতদিন সেই ওস্তাদ জীবিত ছিল—ততদিন কেউ তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। কত রাজা-মহারাজা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তার কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে।

বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সলিসিটর সমরেশ সেন—বাংলার প্রতিভাকে বাংলায় ফিরিয়ে এনে। শুধু তাই নয়, শ্রদ্ধাভরে তিনি তাকে স্ত্রী বলে বরণ করে নিয়েছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাকে।

—কোথায় শুনলেন এ-কথা?

পার্শ্ববর্তী একজন দর্শকের প্রত্যুত্তরে আর একজন উত্তর দিলেন—কেন, শোনেননি এ-কাহিনী? পড়েন নি, সুজাতা সেনের আত্ম-কথা?

—কোথায় বেরিয়েছে ?

—এ-সংখ্যার 'দীপকে'।

তবু কী রমাকান্ত অসাড় ? কিছুই কী বলবার নেই এ-কথার প্রত্যুত্তরে ?

সুজাতা সেন নয়। সুজাতার আর এক ছায়া। তমসা।

কেন যে তমসা নাম দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে কত ঠাট্টাই না করেছে রমাকান্ত।

—এমন চাঁপা ফুলের মতন রঙ তোমার। ইস্পাতের মতন চকচকে দ্যুতি, তোমার কী বলে নাম রাখা হল তমসা ?

উদ্ধত, অবিনয়ী, উগ্র স্বভাবের মেয়ে তমসা। বিয়ের দিন দেখেই তাকে দেখে রমাকান্ত দুর্বিনয়ী। আর শুধু রমাকান্ত কেন, সংসারের গুরু লঘু কাউকেই পরোয়া করে না সে। একটা কথায় বলটা কথা শুনিয়ে দেবার মতন রসনায় ধার তার।

স্বামীর কথায় তমসা তাই চটপট উত্তর দেয়—কলুর বলদের ঘরে পড়তে হবে, তাই জেনে-শুনে বাপ-মায়ে খোপার ওপর খোপকাটি করেছিলেন। নাম যদি হত শুভ্রা, তা হলে তোমার এই আলো-বাতাসহীন গোয়াল-ঘরে অমন লজ্জায় মুখ ঢাকবার জায়গা থাকত না।

—তা হলে নাম থাক উষা।

স্বামীর কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিল তমসা—তার থেকে মৃত্যু। কথাটা উচ্চারণ করতে বুকাকরে যদি আটকে যায়, তা হলে সহজ করেই বরফ ডেকো মরণ বলে।

রমাকান্ত অতঃপর বুঝেছিল—মরণ তমসার হয়নি। হয়েছে তারই। কেমন করে এমন স্ত্রী দরিদ্র মসীজীবী কেরানির ঘরণী হয়েছিল তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

রূপ ছিল তমসার অনন্যসাধারণ। আর গুণ ছিল তার কোকিল কণ্ঠ। সময়ে-অসময়ে গান গাইত তমসা। সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার মতন সে-গান। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে বাংলাদেশে এ-গুণের কোন সাংসারিক কিংবা সামাজিক মূল্যই ছিল না—বিশেষ করে দরিদ্র মধ্যবিত্ত সংস্কার-জীবী বাঙালী পরিবারে।

শুধু রূপ দেখেই রমাকান্তের বিধবা মা একমাত্র পুত্রের বধূ করে বিনা-পণে ঘরে তুলেছিলেন তমসাকে।

—তোমাকে আমি একটুও ভালোবাসিনে—অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তমসা তার মনোভাবকে ব্যক্ত করেছিল স্বামীর কাছে বিয়ের পরেই।

—তা হলে বিয়ে করলে কেন ?

মূঢ় রমাকান্তের এ-প্রশ্নে সোজাসুজি জবাব দিয়েছিল তমসা—বিয়ে আমি স্বেচ্ছায় করিনি। জোর করে আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—প্রতিবাদ করো নি কেন ?

—করেছিলাম ; কিন্তু কোন ফল হয় নি।

—কাকে ভালোবাস তুমি ?

রমাকান্তের এ-প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছিল তমসা স্পষ্ট করেই—আমার ওস্তাদজীকে।

—কে তিনি ?

—যিনি আমাকে গান শেখাতেন।

—তাঁকে বিয়ে করলে না কেন তবে ?

—সমাজের বাধা তাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার।

—কিন্তু মনের বাধা তো ছিল না।

—না। তাই অনুরোধ জানাচ্ছি, ছেড়ে দাও আমাকে।

তমসার দেওয়া এ-আঘাতে ভেঙে পড়েছিল রমাকান্ত। তবু সে প্রকাশ করেনি কারুর কাছে তার এত বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আপন ক্ষত আপন বুকেই বহন করে চলেছিল সে।

শাশুড়ি কিন্তু বুঝেছিলেন পুত্রবধূর মতিগতি। আর তার জন্যে কঠিন শাসনও সুরু করেছিলেন। রমাকান্ত ছিল নির্বিকার। বধূ নির্যাতনের ইতিহাস তাই অলীক নয়। অলীক নয় সন্তরণ ওস্তাদের কাহিনী। 'দীপকে'র পাতায় সুজাতার যে আত্ম-কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তা আর কেউ না জানুক এই অগণিত দর্শকদের মধ্যে—রমাকান্ত অন্তত জানে, তা সত্য।

কিন্তু আরও যে কাহিনী আছে—সে কথা বলবে কে ? সে কাহিনী কী কোন প্রকাশ্য আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে না ?

বিয়ের পর থেকেই বুকে একটা তীব্র ব্যথা এসে আশ্রয় নিলে রমাকান্তের, প্রথমে উপেক্ষা করেছিল সে। কিন্তু রোগ যখন ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে লাগল তখন

রমাকান্ত আর চুপ করে থাকতে পারল না। একমাত্র হতভাগ্য পুত্রের জন্যে বিধবা মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন—যথাসর্বস্বের বিনিময়েও ডাক্তার দেখা বাবা।

রমাকান্তকে বাধ্য হয়েই চিকিৎসা করাতে হয়েছিল।

রোগটাকে গোপন রাখা যায়নি। ডাক্তার সন্দেহ করেছিলেন—যক্ষ্মা। সেই যক্ষ্মা থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি। স্বেচ্ছায় রমাকান্ত তমসাকে মুক্তি দিয়েছিল।

তমসা আর ফিরে আসে নি। রমাকান্তও আর কোন খোঁজখবর রাখে নি তার। চিকিৎসায় সুফল ফলেছিল। বছর দুয়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছিল রমাকান্ত।

জিদ করে বিধবা মা আবার ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন—তমসার মতন রূপ নেই মেনকার। কণ্ঠস্বরেও কোন মাধুর্য নেই। কিন্তু মাধুর্য আছে ব্যবহারে, মমতা আছে মনে।

বিধবা মা গত হয়েছেন। সংসারেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মেনকা এখন গৃহিণী। বহু পোষ্য-ভরা সংসার। ইনিয়র গ্রেড কেরাণির স্বল্প আয়ে দারিদ্র্যের কশাঘাত সর্বত্র। অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি নিয়ে বিপর্যস্ত মেনকা—বিপর্যস্ত রমাকান্ত। রমাকান্ত অফিস, ট্যুশানি, বাজার—এরই পরিবেশে আত্ম-কেন্দ্রিক।

তবু সংসার সুখের বৈকি! সেবা আর যত্ন, মমতা আর সহানুভূতি—সংসারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে।

কারা যেন পর পর আরও কয়েকখানি গান গেয়ে গেল। রমাকান্ত তা শোনেনি। শুধু রমাকান্ত কেন, কারুরই আর আগ্রহ নেই। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ভরে সুজাতা সেনের সুর এখনও আছড়াপিছড়ি করছে।

হঠাৎ মঞ্চের সামনে আবার আবির্ভূত হতে দেখা গেল সুজাতা সেনকে। কানের হীরের টব দুটি জল জল করে জ্বলছে—জর্জেটের চওড়া রূপালি পাড় ঝকঝক করছে। করযোড়ে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল—শ্রীমতী সুজাতা সেন। সমাজের গণ্যমান্য সলিসিটর সমরেশ সেনের বিবাহিতা পত্নী—স্টিপ্রভা সুজাতা সেন, ছায়া-মঞ্চের সেরা অভিনেত্রী।

ঘোষক ঘোষণা করলেন—শ্রীমতী সুজাতা সেনের বদান্যতার কাহিনী। পাঁচশ টাকার চেক দিচ্ছেন শ্রীমতী সেন যক্ষ্মা-ভাণ্ডারে।

সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ আবার হাততালির ঝড়ে মেতে উঠল। যে লেখনী দিয়ে শ্রীমতী সুজাতা সেন চেক লিখলেন—দর্শক সমাজের একজন বিশিষ্ট ভাটিয়া ব্যবসায়ী তাই হাজার টাকার সম্মান-মূল্যে কিনে নিলেন। সে-অর্থও জমা পড়ল যক্ষ্মা-ভাণ্ডারের তহবিলে। আবার করতালি। করতালির ঝড় উঠেছে। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ সেই ঝড়ে কাঁপছে—কাঁপছে অগণিত শ্রোতাদের মন, কাঁপছে সহস্র বাতির আলোক-মালা।

পিছনের সিটে উপবিষ্ট রমাকান্তের মনও কী সবার অলক্ষ্যে কাঁপছে? হৃদয়হীনা তমসা নেই। সে-তমসার মৃত্যু হয়েছে—যে তমসা যক্ষ্মারোগগ্রস্থ স্বামীকে ফেলে পালিয়েছিল।

আছে তমসার ছায়া—শ্রীমতী সুজাতা সেন। অন্ধকারের পাশে যেমন আলোকের ঝর্ণা ধারা—তেমনি হৃদয়হীনতার তমিস্রার আবরণ ভেদ করে করুণাময় আলোকের প্রস্রবণ। যক্ষ্মা রোগির প্রতি সুজাতার তাই না এত করুণা!

সেই করুণাময়ী সুজাতা সেন নামছে। নামছে, মঞ্চ থেকে সুবিখ্যাত সলিসিটর স্বামীর হাত ধরে। স্ত্রীর গৌরবে স্বামীও গৌরবান্বিত।

ক্লিক্ ক্লিক্ করে ক্যামেরার শব্দ হতে লাগল—কয়েকটি আলোক-শিখার তড়িৎ ঝলক ঝলকিত হয়ে উঠল। সেই বিজলী আলোকের বিদ্যুচ্ছটার অন্তরালে সহসা পিছনের সিটের দর্শক রমাকান্তর চোখে তমসার ছায়া কিল্‌বিল্ করে ওঠে কেন?

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপাসনা, ব্রহ্মের স্বরূপ, মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভের পথে পাপ-পুণ্য ত্যাগ, দেহ হইতে জীবের যাতায়াত, ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবে উপাসনা প্রভৃতির আলোচনা আছে।

বেদের এক শাখায় বিভিন্ন স্থানে এক উপাসনার উল্লেখ থাকিলে এক স্থানে উপাস্যের যেরূপ গুণের উল্লেখ আছে, অপর স্থানেও সে সকল গ্রহণ করিতে হইবে। বাজসনেয় শাখায় পাণ্ডিত্য বিদ্যার "মনোময় প্রাণশরীর ভারূপ" অর্থাৎ ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান ও জ্যোতির্ময়রূপে আত্মার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ঐ শাখার বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মাকে ইচ্ছাময়, জ্যোতির্ময়, সত্য এবং হৃদয়ের মধ্যে ব্রীহি বা যবের ন্যায় সূক্ষ্ম, সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি বলা হইয়াছে। শেষোক্ত স্থলে যেরূপ অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ আছে, প্রথমোক্ত স্থলেও সেগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বৃহদারণ্যকে একস্থলে ব্রহ্মকে সত্য এবং তিনি সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে বিরাজমান পুরুষ বলা হইয়াছে। এখানে সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ ব্রহ্মের অধিদৈব রূপ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে তাঁহার অধ্যাত্মরূপ। কিন্তু এখানে এই দুই রূপেই উপাসনা ভিন্নভাবে করিতে হইবে। কেননা শ্রুতি বলিয়াছেন আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ ও অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের নাম ও রূপই কেবল এক। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে তাহাদের অন্যগুণ ভিন্ন। ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয়কে পুরুষ বিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু ছান্দোগ্য পুরুষকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কে সেরূপ করা হয় নাই। ছান্দোগ্য পুরুষ-বিদ্যার ফল দীর্ঘায়ুলাভ, তৈত্তিরীয়কে তাহার ফল ব্রহ্মের মহিমালাভ। সুতরাং এখানে এক উপনিষদে বর্ণিত গুণ অন্য উপনিষদে গ্রহণ করা হইবে না।

কৌষীতকি উপনিষদে আছে, যিনি মোক্ষলাভ করেন তিনি পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুর সময়েই পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, মৃত্যুর পরে বিরজা নদী পার হইবার সময় নহে। সকলেই যে দেবযান পথে গমন করিয়া মোক্ষলাভ করেন, তাহা নহে। সাধনার তারতম্য অনুসারে কেহ মৃত্যুমাত্রই মোক্ষলাভ করেন, কেহ বা দেবযান পথে গমন করিয়া মোক্ষলাভ করেন। যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে দেবযান পথে গমন করিবে, যে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহার দেবযান পথে গমনের প্রয়োজন নাই। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক সকলেই দেবযান পথে গমন করেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও কোনও কোনও ঋষি যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা তাঁহাদের কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হইবার পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগের জন্য তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বের কল্যাণের জন্য বেদ-প্রচার প্রভৃতি কার্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য সম্পাদনের জন্য যতদিন প্রয়োজন, ততদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হয়।

মুণ্ডক উপনিষদের (৩,৩।১) "দ্বাসুপর্ণা" মন্ত্রে দুইটা পাখী প্রভৃতি শ্লোকে এবং শ্বেতাশ্বতরের (৪।৬ · "ক্ষরং ত্বিধত্তে" প্রভৃতি শ্লোকে উভয়েই জীব ও ঈশ্বরের কথা আছে। ঈশ্বর কর্মফল ভোগ করেন না। কিন্তু কর্মফল ভোক্তা জীবের সহিত মিলিয়া জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই "ক্ষরং ত্বিধত্তে" বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে (৩,৯।১) যে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম এবং সর্বান্তর আত্মার কথা আছে। উভয়ই এক। উক্ত উপনিষদের (৫।৮।১) শ্লোকে সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ এবং চক্ষুর মধ্যবর্তী পুরুষ একজন। এক ব্রহ্মকেই উভয়প্রকারে উপাসনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্য (৮।১।১) হৃদয়াকাশকে সর্বকামপূর্ণ আত্মা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২২) বলা হইয়াছে যে এই হৃদয়াকাশে আত্মা শয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু উপদেশ দুইটি ভিন্ন নহে। হৃদয়াকাশই ব্রহ্ম।

চৈতন্য শরীরের ধর্ম নহে। দেহে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু দেহ না থাকিলেও চৈতন্য থাকিতে পারে। চৈতন্য যদি ভৌতিক বস্তুর ধর্ম হইত, তাহা হইলে চৈতন্য ভৌতিক বস্তু অনুভব করিতে পারিত না, কোনও বস্তুর ধর্ম তাহার নিজের উপরে ক্রিয়া করিতে পারে না। রাত্রিতে কোনও বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে দীপের প্রয়োজন। তাই বলিয়া উপলব্ধি দীপের ধর্ম নহে। দেহ থাকিলে উপলব্ধি হয়; না থাকিলে হয় না, বলিয়া উপলব্ধিকে দেহের ধর্ম বলা যায় না।

ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাবে উপাসনার বিধি আছে। যে কোনও উপায়ে তাঁহার উপাসনাতেই মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু একটিমাত্র উপাসনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক সঙ্গে বিভিন্ন উপাসনা গ্রহণ করিলে চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে। অনেক যজ্ঞ করিলে বিবিধ স্বর্গে দীর্ঘকাল বাস করা যায়। কিন্তু কোনও এক উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিলে অতিরিক্ত উপাসনার প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান কেবল যজ্ঞযাগের সংস্কারের জন্যে প্রয়োজনীয় নহে, তাহার মোক্ষপ্রাপকতা শক্তি আছে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জৈমিনির মতে বেদের উদ্দেশ্য কেবল যজ্ঞ করিবার বিধি ও উপায় বলিয়া দেওয়া। যজ্ঞে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকলের সংস্কারের যেমন বিধি আছে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্যক্তির সংস্কারের বিধি আছে। এই সংস্কারের জন্যই

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসামূলক বাক্য বেদে আছে। যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়, তাহা হইলে জনক কেকয়রাজ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন কেন? বিদ্যা কর্মের সহায়ক মাত্র। যে কর্ম বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও রহস্য জ্ঞানের সহিত করা যায় তাহার শক্তি বেশী হয় (ছান্দোগ্য—১।২।১০)। "বিদ্যা ও কর্ম পরলোকগত আত্মার সঙ্গে গমন করে" (বৃ আর—৪।৪।২) বৃহদারণ্যকের এই উক্তিদ্বারাও বুঝিতে পারা যায়, যে কেবল বিদ্যাদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। ছান্দোগ্যে আছে (৮।১৫।১) ব্রহ্মচর্য অবস্থায় সমিৎ আহরণাদি গুরুর কর্ম করিবে, অবশিষ্ট সময়ে বেদ অধ্যয়ন করিবে। তাহার পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বেদ অধ্যয়ন ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিবে। তাহাতে মোক্ষলাভ হইবে। সুতরাং জ্ঞানের পরেও কর্মের প্রয়োজন আছে। ঈশোপনিষদে আছে—বিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিবে। এইভাবে পাপ হইতে মুক্তি হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং জ্ঞান হইলেও কর্ম না করিলে মুক্তি হয় না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তৈত্তিরীয়কে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়াছেন। ঈদৃশ ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গসুখ তুচ্ছ বোধ হয়, এবং স্বর্গসুখ প্রাপক কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। ঈশ্বরকে জানিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় ইহা শাস্ত্রে আছে। ইহাতে কর্মের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করিতেছে, ইহা যেমন দেখা যায়, তেমনি সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, ইহাও দেখা যায়। কৌষীতকি উপনিষদে আছে কবিগণ বলিতেছেন "কি জন্য আমরা যজ্ঞ করিব? কি জন্য বেদপাঠ করিব। পূর্বের কবিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ত্যাগ করিয়াছিলেন।" (৪।৪)। "ইহাই অমৃতত্ব" বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা বৃহদারণ্যকে আছে, (৪।৪।১৫)। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কর্মের প্রয়োজন থাকে না কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করিতে পারেন। "বিদ্যা ও কর্ম মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে" ইহার অর্থ বিদ্যা কাহারও অনুসরণ করে, কর্ম কাহারও অনুসরণ করে। বিদ্যা ও কর্ম উভয়ে এক ব্যক্তির অনুসরণ করে না। যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞাদি কর্ম বিহিত হইয়াছে। তাহার বেদ অধ্যয়ন মাত্র হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই তাহার পক্ষে কর্মের প্রয়োজন আছে। শতবৎসর বাঁচিয়া কর্ম করিবে, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই। সুতরাং জ্ঞানীকেও কর্ম করিতে হইবে, ইহা বলা যায় না। বিদ্বান্ যাবজ্জীবন কর্ম করিলেও কর্ম তাহাতে লিপ্ত হয় না, ইহা বিদ্যারই স্তুতি। ইহাতে কর্ম করিবার অনুমতি মাত্র দেওয়া হইয়াছে। বিদ্বান বিদ্যার ফল অনুভব করিয়া সকল কামনা ত্যাগ করেন (বৃঃ আঃ ৪।৪।২২) আবার ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগতের সকল বস্তুই আত্মরূপে প্রতীত হয়। তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে। কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? বৃঃ আঃ ২।৪।১৩ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে করণ, কর্ম এই সকল ভেদের "উপমর্দ" বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী করণ অভাবে ক্রিয়া করিতে পারেন না। ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আশ্রমে বিদ্যা (কর্ম নহে। বিহিত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যা কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না।

জৈমিনি বলেন বেদে সন্ন্যাসাশ্রমের "পরামর্শ" (উল্লেখ) মাত্র আছে, সন্ন্যাসের বিধান নাই। "যে ব্যক্তি অগ্নি নির্বাপিত করে, সে দেবযানের বীর্যহানি করে, (যজুর্বেদ—১।৬।৪)। বাদরায়ণ বলেন "শ্রুতিতে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে প্রকার উল্লেখ আছে সন্ন্যাস আশ্রমেরও সেইপ্রকার উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (২।২৩।১) কর্মের তিন শাখার মধ্যে যাজ্ঞপ্রভ ও সন্ন্যাসেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে সন্ন্যাসের বিধি দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র উল্লেখ নহে। যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। "যজ্ঞ, তপস্যা এবং অনাসক্তির দ্বারা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন।" (বৃঃ আর ৪।৪।২২)। রথ চালিবার জন্য অশ্বের প্রয়োজন। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতির প্রয়োজন। বিত্তলোভ হইলে মোক্ষের জন্য কর্মের প্রয়োজন নাই। (যজ্ঞ দান তপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ, যজ্ঞ দান তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্—গীতা) (যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং) স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ—গীতা। কিন্তু সময়াদির প্রয়োজন আছে। কখন, কোথায় কিরূপে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধও অনুসরণ করা উচিত। তবে প্রাণ রক্ষার জন্য সেই সকল বিধিনিষেধ অতিক্রম করা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আহার শুদ্ধির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান চাহে না, আশ্রম কর্ম তাহার পক্ষেও প্রয়োজনীয়। বর্ণাশ্রমে যে সকল কর্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যেও করিবে, তাহা লাভের ইচ্ছা না থাকিলেও কর্তব্য। যাহারা আশ্রমধর্ম পালন করেন, তাহারা কামক্রোধের বশীভূত হন না।

যাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম নাই, যাহারা আশ্রমবকলের অন্তরালে থাকেন, তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। ত্রৈবর্ণিক ও যাচরুবীয় আশ্রমধর্মে অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মনুসংহিতায় আছে যে ব্রাহ্মণ অন্য আশ্রমধর্ম পালন না করেন, তিনি কেবল জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। জপ, উপবাস, দান প্রভৃতি দ্বারা বিদ্যার অনুগ্রহ লাভ করা যায়। সকল বর্ণের লোকের এই ধর্মকর্মে অধিকার আছে। কিন্তু বিদ্যালাভের জন্য আশ্রম ধর্ম পালন অধিক উপযোগী।

জৈমিনিও বলিয়াছেন সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে পারেন না। স্ত্রীসংসর্গে যে সন্ন্যাসীর পতন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদিও কাহারও কাহারও মতে প্রায়শ্চিত্ত আছে, তথাপি যাহাতে এরূপ পতন না হয়, তাহা করা কর্তব্য। কিন্তু এরূপ পতিত সন্ন্যাসী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাকে বহিষ্কার করা উচিত। বিহিতসাধন অবলম্বন করিলে ইহজন্মেই বিদ্যালাভ হয়। যদি বাধা উপস্থিত হয়, তবে পরজন্মেও হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে উপাসনার সাধনও ফল বর্ণিত

হইয়াছে। আত্মার মনন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে— একবার নহে বারংবার ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপাসনা করিতে হইবে। ইহা প্রতীক উপাসনা নহে। প্রতিমাকে বিষ্ণুজ্ঞানে উপাসনা প্রতীকোপাসনা। কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আত্মা ব্রহ্মের প্রতীক নহে। উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবে। দাঁড়াইয়া অথবা শয়ন করিয়া নহে। স্থিরভাবে উপবেশন না করিলে ধ্যান হয় না। পৃথিবীর অন্যত্র অন্ধ হইয়া যান করিবে। ব্রহ্মকে আত্মারূপে বর্ণন করিবার পরে সে উপাসনার প্রয়োজন থাকিবে না। বর্ণনান্ত অথবা অন্য কোনও কামনায় যে উপাসনা, তাহা মরণ পর্যন্ত করিতে হয়। ব্রহ্মলাভ হইলে তাহার পূর্ববর্তী পাপের বিনাশ হয়, পরবর্তী পাপ ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরবর্তী পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না। শরীরপাত হইলে তাহার মোক্ষ হয়। যে সকল সঞ্চিত কর্মের ফল আরম্ভ হয় নাই, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সেই সকল কর্মের বিনাশ হয়। শরীরপাত পর্যন্ত মোক্ষ হয় না। প্রারব্ধ কর্মের ফল যে পর্যন্ত ভোগ করিতে হয়। অগ্নি হোত্রাদি বৈধিক নিত্য কর্মের ফল জ্ঞান, জ্ঞানের ফল মোক্ষ। জ্ঞানলাভের জন্য এই সকল কর্ম করা কর্তব্য। অন্য বিধ কর্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। বিনা অর্থবাদে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিলে তাহাতেও ফল হয়। কিন্তু সে ফল তত বীর্যবৎ হয় না। আরব্ধ কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান।

দ্বিতীয় পাদে জীব কিভাবে দেহ ত্যাগ করে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

মৃত্যুর পূর্বে বাক্, ও চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়। তখন চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু কথা বলিবার, দেখিবার ও শুনিবার ক্ষমতা থাকে না। ইন্দ্রিয়গণ মনে সংযুক্ত হইবার পরে সব প্রাণে যুক্ত হয়। প্রাণ তখন জীবে অবস্থান করে। প্রাণ জীবের সহিত দেহ ত্যাগ করে। তখন প্রাণ জীবের মধ্যে অবস্থান করে এবং জীব অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতে (সূক্ষ্ম) অবস্থান করে। মৃত্যুর পর কোনো জীব স্বর্গলোকে, কোনো জীব ব্রহ্মলোকে গমন করে। প্রথমটির পথ পিতৃযান, দ্বিতীয়টির পথ দেবযান। এই দুই পথ কতকটা দূর পর্যন্ত অভিন্ন, পরে বিভক্ত হয়। দেবযান পথে গমন করিয়া জীব যে অমরত্ব লাভ করে, তাহা আপেক্ষিক অমরত্ব। ব্রহ্মলোকে গমনকারী দীর্ঘকাল সুখে বাস করেন। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কর্মজনিত সংস্কার তখনো থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সে সংস্কার নষ্ট হয়। মৃত্যুর সময় জীব সূক্ষ্মভূতে অবস্থান করে। সেই সূক্ষ্মভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু মোক্ষলাভ পর্যন্ত সূক্ষ্মভূত জীবের সহিত অবস্থান করে এবং জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে। স্থূল শরীর যখন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হয়, তখন সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না। জীবিতকালে স্থূল শরীরে যে তাপ অনুভূত হয়, তাহা সূক্ষ্ম শরীরের তাপ। তাই মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীর যে পথে স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা উষ্ণবোধ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ দেহ ত্যাগ করে না। দেহের মধ্যেই তাহা লয়প্রাপ্ত হয়। জীব ও তখন ব্রহ্মে লীন হয়। তাহার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণও ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। তখন জীবের নামরূপাদি কিছুই থাকে না।

যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মৃত্যুকালে হৃদয়ের অগ্রভাগ উদ্ভাসিত হয়, সেই আলোকে, হৃদয় হইতে বাহির হইবার দ্বার প্রকাশিত হয়। জীব তখন বুঝিতে পারে, তাহার কোন্ গতি হইবে, তাহার অনুকূল ভাবনা অনুভব করে। যদি ধ্যানফলরূপে উদ্বোধিত হয়, তবে ভাবে "আমি ধ্যান", মননফলরূপে কর্ম উদ্বোধিত হইলে ভাবে "আমি মানুষ"। ইহার পরে উৎক্রমণ হয়। কেহ বা মূর্ধা দিয়া কেহ বা চক্ষু অথবা অন্য পথে বাহির হয়। জ্ঞানী মূর্ধন্যনাড়ী পথে বাহির হন। অজ্ঞানী অন্য পথে বাহির হয়। মূর্ধন্যনাড়ীরূপ ব্রহ্মলোকমার্গ জ্ঞানীর সম্মুখে স্বয়ংপ্রকাশ হয়। তাহারা নির্গত হইয়া ঊর্ধ্বগামী এবং অমৃত হন। মূর্ধন্যনাড়ীর সহিত সূর্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে। জ্ঞানী মূর্ধন্যনাড়ী পথে বাহির হইয়া তৎসংলগ্ন সূর্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া ঊর্ধ্ব লোকে গমন করেন। দিবা ভাগে অথবা রাত্রিকালে হউক তাহাতে কোনও ভেদ নাই। রাত্রিকালেও সূর্যরশ্মির অভাব হয় না।

দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানীর মোক্ষলাভ হয়।

তৃতীয়পাদে দেবযান পথের বর্ণনা ও গম্য স্থানের আলোচনা আছে। যদে দেবযান পথের বিভিন্ন বর্ণনা থাকিলেও এই পথ এক। পথের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা বিভিন্ন স্থানে আছে বলিয়া ভেদ দৃষ্ট হয়। এই পথে অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি যে সকলের উল্লেখ আছে তাহারা আতিবাহিক দেবতা। জীবকে তাঁহারা বহন করিয়া লইয়া যান। জীব তখন থাকে অজ্ঞান (বিদ্যুৎ রূপ অমানব এক পুরুষ চন্দ্র হইতে জীবকে ব্রহ্ম পর্যন্ত লইয়া যান। অগ্নি, দিবস প্রভৃতি মানব পুরুষ। বিদ্যুৎ পুরুষ জীবকে যে ব্রহ্ম পর্যন্ত লইয়া যান, তিনি পরব্রহ্ম নহেন, চতুর্মুখ ব্রহ্মা (যদিও পুংলিঙ্গব্যবহার হয় না)। ব্রহ্মলোকে জীবগণ বহু বৎসর বাস করেন। তখন মোক্ষ হয় না, কিন্তু প্রলয়ে যখন ব্রহ্মার তিরোধান হয়, তখন তাঁহার সহিত জীব মোক্ষধাম (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" বৈষ্ণবিদের মতে দেবযান পথে পরব্রহ্মের নিকটই জীব উপস্থিত হয়। বাদরির মতে উক্তপথে ব্রহ্মার নিকট যাইতে হয়। সূত্রকারের মতে বাদরির মতই সত্য।

যাহারা বিশুদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, মৃত্যুর সময়েই তাঁহাদের মোক্ষ হয়, তাহাদের কোথাও গতি হয় না। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতীক অবলম্বন করেন না, তাঁহারাও ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। প্রতীকোপাসনা-লব্ধদিগের গতি হয় অন্য লোকে। যে যেরূপ ধ্যান করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়। যাহারা প্রতীকোপাসনা করেন, তাঁহাদের দেবযান পথে গতি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে আছে জীব যখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর রূপ আবির্ভূত হয়, কোন নূতন দেহ তাহার হয় না। তাহা দেহসম্বন্ধযুক্ত অবস্থা। তখন ক্রিয়াশক্তি থাকে না। পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব তাঁহার সহিত "অবিভাগে" বাস করে। উভয়ের মধ্যে বিভাগ থাকে না। জৈমিনির মতে

ব্রহ্মলোকের পরে জীব "ব্রহ্মরূপ" প্রাপ্ত হয়। তাহাতে কোনও পাপ থাকে না; কিন্তু সর্বজ্ঞত্ব, সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ থাকে। ঔড়ুলোমির মতে মুক্ত জীবের স্বরূপ "চিতি-তন্মাত্র"—সর্ববিশেষ রহিত। কেবলমাত্র চৈতন্য। বাদরায়ণ বলেন, চিতি-তন্মাত্র হইলেও বিদ্যাপত্ব, সত্য, কাম প্রভৃতি গুণের বাধা হয় না। যোগাভ্যাসে আত্মজ্ঞ পুরুষ যদি পূর্বপুরুষদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা উত্থিত হন' আত্মজ্ঞব্যক্তি "অনন্তাধিপতিঃ" তাহার অন্য অধিপতি নাই। মোক্ষ প্রাপ্তিতে মনের অস্তিত্ব যে থাকে, তাহা ইহা হইতে প্রতীত হয়, কেননা মন না থাকিলে পিতৃপুরুষদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না। কোনও শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীবকে অশরীর বলা হইয়াছে, আবার কোথাও শরীরযুক্ত বলা হইয়াছে; বাদরায়ণ বলেন মুক্ত জীব শরীরযুক্ত ও অশরীরী উভয়ই হইতে পারেন। যখন মুক্ত পুরুষের দেহ থাকে না, তখনও বিবিধ বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে। যখন মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে, তখন জগতে যে সকল বস্তু আছে, সকলেরই উপলব্ধি হয়। মুক্ত পুরুষ এক সময়ে অনেক শরীর গ্রহণ করিতে পারেন। তখন সকল শরীরেই তাঁহার "আবেশ" থাকে। এক প্রদীপ হইতে যেমন অনেক প্রদীপ জ্বালা যায়, সেইরূপ।

সুষুপ্তিতে জীব যখন "স্বং" "অপীত" (প্রাপ্ত) হয়, তখন এবং মুক্তিতে সকলই একাকার হইয়া যায়। কোনও ভেদই থাকে না। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের সহিত মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ঈশ্বরের অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তিলাভ করেন, কিন্তু "জগদ্ব্যাপার বর্জং" জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় শক্তি প্রাপ্ত হন না। ঈশ্বর যেমন জগতের মধ্যে তেমনি তাহার বাহিরেও অবস্থিত। যাহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা না করিয়া তাহার কোনও বিকার মূর্তির উপাসনা করেন, তাহাদের ভোগই ঈশ্বরের সমান হয়, শক্তি সমান হয় না।

যাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন, তাহাদের পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

প্রতিবেশিনী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

ত্রিশবছর আগে হুপুর বেলা খেয়ে ওপরে উঠেছি। হঠাৎ ডাক পড়ল নিচে, ওগো আপনারা কে আছেন দেখে আসুন নিচে, এই আপনাদের মেয়েটির খুব জ্বর এসেছে নিয়ে যান।

তাড়াতাড়ি নেবে এলাম। দেখি, একটি শ্যামবর্ণা মহিলা আমার মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বলেন, ক্লাসে বসে থুকির বড্ড জ্বর এলো দেখলাম। তা একলা আর পাঠাতে পারলাম না। নিজে নিয়ে গেলাম। শুইয়ে দিন ভাল করে। ম্যালেরিয়া বোধহয়। কাঁপছে।'

জ্বরবাজারের ডাকসুলে মেয়ে পড়ত। মহিলাটী সেখানকার শিক্ষয়িত্রী। মেয়েমহলের মিশেই সর্বময়ী কর্ত্রী। তিনি না হলে স্কুলের নানা ধরণের নানা রকমের রক্ষণশীল হিন্দু-ঘরের ছাত্রী সামলানো শক্ত। ধর্মে ক্রিশ্চান, নাম প্রবীলা বোস। ভাবে ব্যবহারে একেবারে হিন্দুর মেয়ের মতই। না বলে দিলে বোঝবার উপায় নেই হিন্দু কি খৃষ্টান। তারপর অনেকবার স্কুলের উৎসবে গেছি। আমার মনে লেগেছিল যা তারি কথা বলছি। ঐ যে নবছে অন্নপূ বালিকাটীকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া—খোঁজ খবর রাখা, সমস্ত ক্লাসের সব মেয়েগুলির কে কেঁদেছে, কে ঝগড়া করেছে, কে কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে, কার পড়ে গিয়ে রক্ত পড়েছে হাঁটু থেকে। সমস্ত শিক্ষিকারা দেখতে পান, জানতে পারেন। ঐ বড়দিদি মিস ঘোষও সব খবর রাখেন। বড় দিদি না হলে লেখাপড়ায় যারা ও সেবায়, স্নেহে—খোঁজ খবর ঠিক চলে না। সকলের বাড়ী ও পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেও আসেন সময় সময়। চকিত চমৎকৃত কলাজননীরা আকস্মিক মেহনাদের সহ দেশী শিক্ষিকার আগমনে বিব্রত ত্রুটিত ও আনন্দিতও হতেন। এঁরা আমাদের ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক নন।

"এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'

... ...

যেথায় আর্য যেথা অনার্য

যেথায় দ্রাবিড় চীন

শক হুন দল পাঠান মোগল,

এক দেহে হ'ল লীন"

ঐ অনেকের মত এঁরাও আর এক আমাদের প্রতিবেশী, সম্প্রদায় বলা যায়। যাঁরা এই মহামানবের সাগর তীরে' এসেন। কিন্তু ফিরে গেলেন। স্থায়ীভাবে থাকলেন না। অথচ এক ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠল তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করে তাঁদের প্রভাবে। তাঁদের আদর্শে গড়ে উঠল নানা সেবার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। লোকে বলে, ধর্ম-প্রচারের জন্য ধর্মান্তর করায় উদ্যমে। কিন্তু সেকথা থাক। তার বিচার বিশ্লেষণ করার দিন আসেনি। শুধু দেখলে যা দেখতে পাই—এই বিদেশী ও বিদেশিনী প্রতিবেশিনীদের যাঁরা নানা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, কিম্বা অমূল্য জীবনের বহুদিন আমাদের দেশে কাটিয়ে গেছেন,—কখনো অনাথ শিশু প্রতিপালনে, কখনো

শিক্ষার প্রচারে, কখনো চরকথাণ কাজে, কখনো বিষম রোগের (ছাঁচি ছুঁইস্রের কারায় এনফ্লুইঞ্জা নামের) সেবায়। এমন অমূল্য দান আর কারা দিয়েছেন? ধর্ম প্রচারের মুখ বা গৌণ উদ্দেশ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি দেখি তাহলে এই দারা ভূমির মানব সমাজের প্রতি কৌতূহলী সকলের সেবার মানবিকতার দিক দিয়ে—এঁদের দান কম নয়—বলেই মনে হয়।

ঐ সময়েই একবার সিংহলে যাবার উপলক্ষে।

সাহেবগঞ্জ থেকে একটী সেই ক্রিশ্চান মহিলা এসেছেন, ওখানকার কর্তৃপক্ষের বড় প্রিয়পাত্রী তিনি।

মহিলাটী খুব সাদাসিধে ধরণের সরলপ্রকৃতির। বেশ ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন। অবশ্য যার সোড়ারকথা হোলো, সেই পুরাতন খরচ আইরিশের অবহেলা বিখ্যাতন কিম্বা আদর না পেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, উচ্চবংশেও বেরে নন, কিন্তু দাদা লাটসাহেব পর্যন্ত সেব অবধি খুষ্ট ধর্মের আশ্রয় এসেন। যেখানে ধর্ম ও আশ্রয় পেলেন এবং পতিতা জীবন গ্রহণ করতে হল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেশ ভাল লেগেছে তো?'

মন খুব প্রসন্ন ও কৃতজ্ঞ, বল্লেন 'হাঁ.....' এক কথায় নির্ভর পেয়েছেন বিস্তার করেননি। তার দরকারও ছিল না। প্রথম প্রয়োজন আশ্রয় ও অন্ন পেয়েছেন। তারপর একসময়ে কৌতূহল বশে ঐধানকারই একজন মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'আচ্ছা এই বিধবা বিবাহে—ধর্মান্তর গ্রহণকে আপনার নিজের কেমন লাগে? আর এই ধর্মান্তরিতের আপনার শ্রদ্ধা করেন—না কৃপা করে গ্রহণ করেন? বলুন, আমরা যে নিজের ধর্ম সংস্কারে গভীরভাবে বদ্ধ রয়েছি। পিতৃপুরুষের ধর্মকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা করি, আপনারাও আপনাদের ধর্ম ও ঈশ্বর, ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদকে তেমনি শ্রদ্ধা করেন...। যারা যে কোনো কারণে ধর্মান্তর গ্রহণ করে তাদের আপনারা মন থেকে হৃদয় থেকে কিভাবে গ্রহণ করেন?.....

মেমসাহেব শুধু একটু হাসলেন। কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন না। অনেকেই এঁরা বেশ ভাল বাংলা জানতেন। বাঙালীর রীতিনীতি আচার ব্যবহারও খুব ভাল জানতেন। প্রাইজের উৎসবে বেনারসী শাড়ী পরে পরম আনন্দে সকলের সঙ্গে আলাপ করছেন তাঁদের জানা বাংলায়। ছাত্রীদের বাড়ীতে উৎসবে গিয়েছে ঘরা কলার পাতায় পুরি পোলাও পাঁচ তরকারী দই মিষ্টির ভোজ খেয়ে খুসিই কথায় 'বড় খুশী হ'লাম' 'বেশ যত্ন করে খাওয়ালে'—বলে যেতেন বিনীত মহিলাদের ঘরে ঘরে।

মনে হ'ল জবাব দেবেন না, তাতে 'বিধা' তাঁদেরও ছিল। অন্যায়কে কৃপা করে নেওয়া এক, আর অন্যায়কে শ্রদ্ধা করা আর এক। এই আমাদের দ্বিতীয় প্রতিবেশিনী। মুসলমান সমাজের মেয়েরা ছিলেন প্রথম।.....দেশে দেশে দিকে দিকে ভারতবর্ষের এঁরা ছড়িয়ে ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের মিশনারী থেকে মেরী কার্পেন্টার, মার্গারেট নোবিলস্ থেকে মিসস্ বর্ণও চার্চের তরফ থেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে এঁরা যে মানব সেবার আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার ও সমাজের গড়া সেবা করেছেন তার মূল্য কম নয় আমাদের মেয়েদের কাছে।

মেমসাহেবের ইচ্ছা কৌতূহল, অপরের মতকে কৌতূহলের সঙ্গে বিচার করে নেওয়া, গুণের দিক দিয়ে—যার তুলনা হয় না (দোষের কথা আমি বলতে যাইনি)।

ক্যাথলিক চার্চের অধীনে যাঁরা কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন তাঁরা ও যেমন, তেমনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের যুক্তিত বন্ধক মাতা মেরীর মত ঘোমটা ঢাকা মাথা 'নান্' এঁরা ও তেমনি মেয়েদের শিক্ষায়, শিশুদের নার্সারী স্কুলের তত্ত্বাবধানে—কর্তৃত্বে অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

আবার দেখি এই প্রতিবেশিনীরা স্বদেশে ফিরে যাবার আগে যাঁদের রেখে যান তাঁরা তেমনি মিশে যান সেই কর্ম জগতে। আশ্চর্য এই যে, শুধু এই বিদেশী তাঁরা নিজেরাই যে সমাজ কল্যাণের কাজে থেকেছেন, তা নয়। যারা তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরাও সেই ভাবে—নিষ্ঠার সহিত সেই পথ অনুসরণ করে চলেছেন। সেবা ধর্মে, শিক্ষাব্রতে সমাজের কাজে এই ধর্মান্তরিত দেশী খৃষ্টানরাও কম অগ্রসর নয়।

আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে অনেক সময় মনে হয়েছে, হিন্দু সমাজের এই যে বিপুল নারী সমাজ—সকলে কিছু ঘর সংসার করতে পায়না, যাঁরা বঞ্চিত জীবন যাপন করলেন, যারা সকলে কষ্ট পেলেন ও সমাজের ভার স্বরূপ হয়ে রইলেন। হয়ত বিধবা, নয়ত পতি-পরিত্যক্তা অথবা বিবাহ হলনা—তাঁরা কেন এই সাধারণ স্কুলের শিক্ষিকা মিসদের মেমেদের মত মিস্ নট মিস্ হস, মিস্ মিচি-মিস শিশু স্কেয়ের মত এমন হাসিমুখে ব্রহ্মচারিণী জীবন গ্রহণ করতে পারেন না? যাঁদের কাছে অবিবাহিত বা বৈধব্য জীবন ভার নয়, দুঃখের নয়। কোথাথেকে এমন একটী আদর্শের ধারা বয়ে আসছে, যা তাঁদের জীবনকে মৃতপ্রায় করে রাখেনি। জীবন্মৃত করেনি।

কোথায় ছিল তাঁদের আশ্রয়ের এই প্রাণ শক্তি, সেবা শক্তি, পরকে আপন করার শক্তি? যা' আমাদের সমাজের মেয়েদের প্রায়ই দুর্লভ। আমরা ছিন্ন না হলেই ভেসে গেলাম, ডুবে গেলাম, পরাজিত হ'লাম, হেরে গেলাম। বিধবা হলেই মরে গেলাম, বিকৃত হলাম, সমাজের চোখে অন্যায়ের চোখেও?

আমাদের :ধর্মও তো আমাদের এরকম থাকতে বলেনি, ওঁদের ধর্মও যেমন বলেনি, তবু মনে হয়—এতথা অনেক সময় মনে হয়েছে এই যে বিপুল মানব শক্তির—তথা নারী শক্তির এমন অপচয়—নিরানন্দ জীবনযাপন—যা' সমাজের মহাপ্রাণশক্তিকে আবদ্ধ করে রাখে, একে অন্তভাবে কেন বদল করা যায় না? কোনখানে আমাদের সমাজ গড়নের একটা গলদ রয়েছে? ঐ বিদেশিনী সন্ন্যাসিনীরা—কালো ঘোমটা পরে কতনা কাজ করে যাচ্ছেন শুধু ধর্মের নামে—পরম আদর্শ নিয়ে।

ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি দার্জিলিঙে গ্রামে সহরে এমন কি, পর্বতবাসী অরণ্যবাসী কোল ভীল, মুণ্ডাদের দেশে তাদের

কালো কোলো শিশুদের স্কুলে নেওয়ার কত হাসপাতালের কাজে অনাথাশ্রমে সেবার নিজেদের এঁরা জড়িয়ে রাখলেন। জীবনে অনেকে আর ফেরেনও না স্বদেশে স্বজনের কাছে। এই আদর্শ এত শক্তি, শুধু ধর্ম-প্রচারের জন্য মনে করা শক্ত। মনে হয় আরো গভীর কিছু গভীরতর যন্ত্র কিছু ভিতরে তাঁদের আছে। যা খৃষ্ট ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দান প্রেমের সেবার আদর্শ। পরকে আপন করার ধর্ম। ভালবাসা দিয়ে সেবা দিয়ে মানবতা দিয়ে ধর্মপ্রচার যার উদ্দেশ্য হয়ত। হয়ত কেহ জ্ঞান ও আছে, কিন্তু এই পরম ত্যাগ যীশুকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতী ধর্মের কথা সর্বভূতে সমদর্শন কথা ভক্তি-সাধনার কথা পাই। মহাপ্রভুরও প্রেমের ধর্ম। ভক্তের জাত নেই, প্রেমের ও জাতি বিচার নেই। আচণ্ডালে যে প্রেম করা যায়। কিন্তু সে সবই ব্যক্তিগত আদর্শের কথা পরম আত্মোপলব্ধির কথা। দেশকালহীন ভগবৎ জ্ঞানের ও দর্শনের শেষ কথা, ব্যক্তি মানুষের পরম আদর্শ কথা। সংঘগত সমষ্টিগত সহজ সেবা ও প্রেমের সাধনা নয়। এই বিদেশীরা ধর্মান্তরিত করেছেন সেজন্য অভিযোগ অনুযোগও আমাদের আছে হয়ত। কিন্তু মাদ্রাজের শেষ প্রান্ত থেকে কাশ্মীর অবধি দেশে দেশে তাঁরা ছোট বড় মিশন করে রইলেন, আজীবন সেবা করে কাটালেন তাও তো দেখলাম। দেখলাম মাদ্রাজের রাণীপেটে নির্বান্ধব বেগমিয়ার লম্প্যাসিনীদের, দেখলাম আজাদ কাশ্মীর আক্রমণে লাঞ্ছিত ও নিহত হলেন যে মহিলারা তাঁদেরও। এঁদের আদর্শনিষ্ঠার কথা ও শ্রদ্ধা তাঁদের স্কুলে যাবার কথা নয়।

এই প্রতিবেশিনীদের বহু সেবার কাহিনীর মধ্যে দুটী একটি মাত্র কাহিনী আজ বলছি। যাঁদের আমরা চিনি, কিন্তু তাঁর পাই বিদেশী বলে, অথচ গৌপভাবে উপকারও পায় যেন।

আমি বলছি যে বিদেশিনী প্রতিবেশিনীর কথা তিনি একশোবছর আগে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মটিও ২৩শে মার্চ্চ। ইষ্টারের শুভ লগ্নে। এঁর নাম অ্যাডা হিল্ডাগার্ড জোনস্।

অ্যাডার স্মৃতিচারণে জানা যায় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কথা, আর যুদ্ধজনিত তাঁর পিতা মাতার নানা অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাটের কথা। নানারকম দৈন্যদের আক্রমণ ও লেখের এবং পিতার ঘনঘনভাবে যার তাঁর মনে ছিল। আমেরিকারও সর্বত্র সেকালে এখনকার মত সুলভ শিক্ষা বা স্কুলকলেজের ব্যবস্থা ছিল না। এদিকে অ্যাডার মনে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল শিক্ষা পাবার। তাঁর চোদ্দ বছর বয়সের সময় তাঁদের বাড়ীতে তাঁর এক মাসী এলেন ওহিও দেশ থেকে। তাঁর কাছে অ্যাডা জানতে পারলেন তাঁর মাসীর দেশে নতুন কলেজ হচ্ছে, এবং অ্যাডা সেখানে থেকে তাঁদের বাড়ী থেকে পড়াশোনা করতে পারবেন যদি তাঁদের বাড়ীর গৃহস্থালীর কাজে কিছু সাহায্য করতে পারেন। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষা তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৭০ সালে অ্যাডা ওহিও কলেজে ভর্ত্তি হলেন।

সেই সময়েই তাঁর মনে ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রথম অভিজ্ঞতা জাগল। এক গভীর ও বিরাট প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা মনে জাগল যে তিনি স্বজন ও স্বদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে যেতে পারেন কিনা।...বহু দ্বিধা ও দুর্ভাবনার পর তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করলেন।...তারপর তিনি চার্চ ও মিশনের কাজ আগ্রহ সহকারে শিখতে লাগলেন।

সেই সময় পরবর্তী বৎসরে একটি যুবক ডেভিডহেরাম লী নামে সেই কলেজে এলেন।

অ্যাডা জোনস্ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করে গ্রাজুয়েট হলেন। তারপর তাঁর মনে হল তিনি এর পর কি করবেন? মনের গোপন কোণে জেগে উঠল পুরাতন আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষে যাবার...। তাঁর জননীরও ভয় ছিল যে অ্যাডা হয়ত ভারতবর্ষে থাকবার চেষ্টা করবেন, জননী তাকে স্বদেশেই রাখবার জন্য ব্যগ্র হলেন...।

কিছুদিন পরে তিনি খবর পেলেন ডেভিড লী ভারতবর্ষে মিশনের কাজে যাচ্ছেন...। এবং তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই একটি আমেরিকান মিশনের মেয়েদের কর্ম কেন্দ্রের কাজের প্রস্তাব পেলেন ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্য।

আরো কয়েকজন সহকর্মীদের সঙ্গে ২২শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ সালে তিনি বম্বে পৌঁছলেন। এবং কলকাতার নারী সমাজের মধ্যে কাজ আরম্ভ করলেন। ১৪০নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কর্মকেন্দ্র হ'ল এবং বাংলা—শিখতে লাগলেন।...

১৮৭৭ সালে লক্ষ্ণৌয়ে ডাক্তার খর্ষর ও মিসেস খর্ষরের কাছে গিয়ে তাঁর বহুদিন পরে আবার ডেভিড লীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পুরাতন বন্ধুত্ব এখন প্রেমে পরিণত হ'ল...। কিন্তু তখনো তাঁর পঞ্চবার্ষিক আরব্ধ কাজ সমাপ্তির দেরী ছিল...বিবাহ স্থগিত রইল। তিনি এলাহাবাদে কর্মভার নিয়ে এলেন। সেখানে তিনি সহসা এক দুর্বৃত্ত ইউরেশিয়ান যুবকের কবলে কয়েকটি ভদ্রপরিবারের বালিকা অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে জানতে পেরে বহু চেষ্টায় তাদের উদ্ধার করেন। পরে একটি খ্রিষ্টিয়ানের ব্রাহ্মণ বালিকাকে উদ্ধার করার সেই দুর্বৃত্ত তাঁকে খুন করবে ভয় দেখায়...। অবশেষে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। কর্মকাল সমাপ্তির আগেই তাঁর ডেভিড লীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল...।

বিবাহের কিছু কাল পরে তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য কিছু খারাপ হওয়ায় তাঁরা আমেরিকা যাওয়া স্থির করলেন কর্মকাল শেষ হবার আগেই। তখন তাঁদের একটিমাত্র কন্যা হয়েছে।

১৮৮০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা স্বদেশে ফেরবার জাহাজে উঠলেন কলকাতা থেকে; তখনকার দিনে নিউ ইয়র্কে 'কেপ অব গুড হোপ' ঘিয়ে ঘুরে আসতে তিনমাস বশদিন সময় লাগত। দীর্ঘ সাত বছর পরে তাঁরা স্বদেশে ফিরলেন।...

তাঁরা স্বদেশে কাজকর্মও পেলেন ও করলেন। তবু তাঁদের মন যেন ভারতবর্ষে ফিরে আসার কথা ভাবত।

মিষ্টার লী' ভাল হবার পর আবার তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তখন তাঁদের মিশনের কাজ হিসাবে

বয়স বেশী হয়ে গেছে। তাছাড়া আরো পাঁচটি সন্তানও হয়েছে। মিশনেরও অর্থাভাব ছিল।

যাই হোক ভগবানের কৃপায় নানাভাবে টাকার যোগাড়ও হ'ল তাঁদের,—১৮৯৬ সালের গোড়ায় তাঁরা ছটি সন্তান নিয়ে ভারতে এলেন এবং শ্রীরামপুরে রইলেন। ততদিনে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে তাঁদের পরিবারের জন্য কিছু সম্পত্তিও যোগাড় হ'ল।

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৯ অবধি এই ভগবৎবিশ্বাসী ও বুদ্ধিমীত দুখী পরিবারের দিনগুলি বেশ ভালই কাটল। শীতকালে এঁদের ছেলে মেয়েরা কলকাতায় থাকত, গরমের সময় দার্জিলিং-এ থাকত।

সহসা বিপদের এলো সেই সুখী জীবনে। ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর দার্জিলিং-এ পাহাড় ধস নেমে এক সঙ্গে তাঁদের দুটী সন্তান প্রাণ হারালেন। শুধু একটি মাত্র শিশু তাঁদের বেঁচে ছিল।...তাঁরা ভগবানের অদ্ভুত কৃপায় এই অসহনীয় দুর্ঘটনা শোককে সহ্য করতে পারলেন। এই পরের মত সহ্য ঘটনা ও বিপদ থেকেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও কৃপায় রক্ষা পেয়ে গেল। বহু অনাথ দরিদ্র দুর্ভিক্ষপীড়িতকে তাঁরা বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। শোকার্ত হৃদয়ের ও অসহায় অনাথা কিশোরী বালক কিশোরকে সন্তানরূপে পালন লালন করতে আরম্ভ করলেন।

১৯০৭ সালে গড়ে উঠল কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের স্কুল বাড়ীটি। একে একে হোষ্টেল, চ্যাপেল, অন্যান্য বাড়ীও তৈরী হ'ল। মিসেস লী ও মিস্টার লীর শোক জয়ের সাধনা সার্থক হয়ে উঠল বহু অনাথ দরিদ্র খৃষ্টান শিশুর মাঝে তাদের আপন করার স্নেহে ও সেবায়। স্কুলের ও কাজের যা অনাথ শিশুদের বিবরণ নতুন করে বলবার দরকার নেই, কেন না, কলকাতার মধ্যস্থলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি আপনার কাজ করে চলেছে সবাই জানেন।

এবারে ১৯১৮ সালে যে মাসে আমি সহসা দেখলাম, হাসিমুখ, আনন্দিত, কয়েকটি মেয়েকে দার্জিলিংয়ে। দার্জিলিংয়ের কাছে একটি ষ্টেশনে (ঘুমটী নামের) এপারে একটি গার্লস গাইড ক্যাম্প হয়েছিল, তাঁদের দেখলাম সেখানে। ক্যাম্পের দুটি বাঙালী মেয়ের নাম শুনলাম, করুণা লী, অরুণা লী। তাদের পরিচয় পেলাম লী পরিবারের পরিচয় থেকে তাঁরা আরো আছেন কয়েকজন ঐ নামের পরিচয় বহন করে। লী পরিবারের বিপদের বিষয় এবং কাজের তখন পরিচয় জানতে পারলাম।

ক্রিশ্চান ও বাঙালী নামের শ্যামা মেয়েগুলি, ক্যাম্পে আমাদেরই নাম স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে কাজ করছেন, থাকছেন, গল্প করছেন আতিথেয়তা করছেন। আনন্দে-ভরা উৎসাহে-উজ্জ্বল মুখগুলি। ক্যাম্পে এসেছিলেন মানবীয় স্বর্গীয় রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মানবীয়া স্ত্রীমতী বসন্তবালা দেবী। আমাদের সাধারণ বাঙালীর মতই আচার ব্যবহার। সৌজন্যে অনুপমীয়, শিক্ষায়, জ্ঞানে, ধ্যানে, ধারণায় সম্পদী। বলতে পারি আজো হিন্দু নয়, কিন্তু আদর্শ হিন্দু ও আদর্শ খ্রীষ্টান।

সেদিন আমার মনে হ'ল ধর্মান্তরিত এঁরা সকলে হয়েছেন বটে, কিন্তু জাতি যাই হ'ন না কি। নেপথ্য যা জাতিতে তাঁরা অন্তরে বাহিরে ভারতবর্ষের মানুষ। আমাদের চিরকালের আপনার জন, পরম আপনারই আছেন। এইখানে খৃষ্টধর্মের ঐতিহ্য বহনকারী ও ভারতবর্ষের সন্তান এক হয়ে আছেন। এই ধর্মান্তরিত প্রসঙ্গে দু একটি সামান্য ঘটনা বলি, কৌতূহলেরও বটে, ভালও লাগার মত। বছর ১৩।১৪ আগে, শিয়েছি ওয়াই, চন্দ্র, সি, এ, তে কি একটা মেয়েদের সভায়।

পাশাপাশি বসেছি সবাই। আমার পাশে বসেছেন একটী ছুড়ি এদুশ বছরের মেয়ে। খানিক পরে কি একটু দরকারে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। খানিকটা গল্প কথাও হ'ল। মেয়েটীর নাম জিজ্ঞাসা করলাম (নামটী আর মনে নেই) তিনি নাম বলে পরিচয় দিলেন তাঁরা ক্রিশ্চান। আমি একটু বিস্মিতভাবে বললাম, 'আমি ভেবেছিলাম তিনি হিন্দু।' (এত সময় ধরোয়া ধরণের আলাপ করছিলেন তিনি মনে হচ্ছিল ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ে।)

এবার তাঁর আশ্চর্য হবার পালা। তিনিও হেসে বল্লেন, 'আমিও কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি ক্রিশ্চান। আমাদেরই ধরণের লোক।' অসবর্ণী দুজনেই এবারে খুব হাসলাম। তখন তিনি নানা পারিবারিক গল্প কাহিনী করেন, কিন্তু সংঘাতের কথাও শুনলাম। অবশ্য হিন্দু খৃষ্টান সংঘাত নয়, অন্য কথা।

ফিরে এলাম। নাম তাঁর মনে নেই, বয়সংঘাত বাঙালী ক্রিশ্চান পরিবারের মেয়ে তিনি ছিলেন। মনে রইল কিন্তু ঐ কথা, তিনি আমাকে ক্রিশ্চান ভেবেছিলেন, আমি ভেবেছিলাম হিন্দু।

আশ্চর্য এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে আমরা এক হয়ে গিয়েছি। কয়েক মুহূর্তের জন্য জানতেও পারি নি ধর্মের সম্প্রদায়ের ভেদাভেদের কথা।

আর একবার—আন্ধ্র রাজ্যের রাজমুন্দ্রীতে।

রাজমুন্দ্রী ছোট সহর—কারখানা সহরই বলা যায়। প্যারী কোম্পানীর লঞ্চঘর, চামড়া এসিড ও পটাশীয় মস্ত বড় কারখানা। সাহেব সুবো প্রধান এবং দেশীয় প্রধান-অপ্রধান মিলিয়ে বিরাট ব্যবসা। দেশী বিদেশী মিলিত স্কুল আছে, ক্লাব আছে, মিশন আছে, মিশনারী মেমসাহেবরা ও পাদ্রী সাহেবরা আছেন। একটি গির্জাও আছে ঘোরহর রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ। কালো ঘোমটা দেওয়া বিদেশিনী সন্ন্যাসিনীরাও (নান্) আছেন। বাজারে বেরুলে দেখতে পাই মাঝে মাঝে।

আমাদের কোয়ার্টারের সামনেই গির্জাটা। সহসা একদিন সকালে বম্ বম্ করে বিলিতী ব্যাণ্ড বেজে উঠল গির্জার প্রাঙ্গণে। ব্যস্ত নাস্তিনীরা ছুটে বেরিয়ে গেল, কি ব্যাপারও জেন। আমরাও গিয়ে দাঁড়ালাম। গির্জার বাজনা কি উপলক্ষে?

দেখি দেশী ব্যাণ্ড কোম্পানী পরমানন্দে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে আসছে। মাঝখানে অনেক লোক—মেয়ে পুরুষ। তাঁতে মোটা মোটা ঝিয়ের বাজারনীর মত এক ধরণের শাড়ী দেখা যায় বাজারে—ওখানে চালাই ধরণের ফুলতোলা, সেই রকম শাড়ী পরে একটি শ্যামবর্ণা মেয়ে আর সাদা জামা পাঁচ খুতি-চাদর পরা একটি ছেলেকে ঘিরে সবাই এগিয়ে আসছে। মেয়েটির মাথায় খোঁপায় ফুলের মালা

জড়ানো। ভাগ্যবতীর চিহ্ন দেশী প্রথায়। শাড়ী ও দেশী ছিটের শাড়ীই সঙ্গিনীরা ও সঙ্গীরাও সব একরকমের কাপড় পরা। মাথায় ফুল, মুখে হাসি, রঙীণ শাড়ী মেয়েদের, আর পুরুষদের অর্ধী পাড় চাদর বুকফাঁক খুতিপরা লুঙ্গির ধরণে। মাতাজীরা শুধু কোঁচা দিয়ে ধুতি পরেন।

ব্যাণ্ডপার্টী বাইরে বাদ্য বাজাতে লাগল। বরকনেকে নিয়ে পিতৃ-মাতৃপক্ষ দু দলের গির্জায় প্রবেশ করলে। বিশুদ্ধ খৃষ্টধর্মানুসারেই বিয়ে হল নিশ্চয়। ধর্মযাজকটী যখন বেরিয়ে এলেন বেশভূষায় তিনি দেশীয় খৃষ্টান।

পারিবারিক বিয়ে হয়ে গেল আমার সকলে ঘরোয়াভাবে করে সমারোহে বিয়ে গেল। ছোট সহর, সকলেই সকলের চেনা জানা কাছেই বাড়ী। আমার ছেলের আফিসে কাজ করত যারা তারাও ওদেশী ক্রিশ্চান।

তাদের কাছে শুনলাম বরকনে সম্পর্কে মামাতো-পিসতুতো। ক্রিশ্চান হলে কি হয়। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার, মাতৃতন্ত্রের প্রথা। মামা ভাগ্নীকে বিয়ে না করলে পিসির সম্পত্তি হাত থেকে বেরিয়ে যায়। এর পর একদিন একজনের বাড়ীতে বেড়াতে গেলাম, দেখি পাশা আলপনা দেওয়া দাওয়া, ঘর, দুয়ার, দেওয়াল। একটি কুলুঙ্গীতে ঠাকুরঘরও একটি আছে দেশী। অর্থাৎ দুর্গা, কালী শিব, রাম, কৃষ্ণের সঙ্গে যিশু ও আর একজন গৃহ দেবতারূপে ফেড়েছেন মাত্র। এদেরও বিয়ের ঠিক আছে। এখানে কিন্তু ১৪।১৫ বছরের ছেলে বর—ভাগ্নী বড়সে কিছু বড়। বৈষয়িক ব্যাপারে সবই হয় দেখা যায়। রঙীণ শাড়ী মাথায় ফুল, ঘরে আল্পনা, মামাভাগ্নী বিয়ে এবং ধর্ম ও জাতকুল সব একসঙ্গে জড়িয়ে এক চমৎকার সমাবেশ হয়েছে। মনে হল ক্ষতিই বা কি? একশ্রেণীর অজ্ঞাত হিন্দু ধর্মান্তরের পথে শিক্ষা পাচ্ছে, সম্মানও পাচ্ছে। আমরাতো তাদের 'পকথা' করেই রেখেছিলাম। বড় তো তারা হয়নি। আর লিখতে বসে মনে পড়ল ধর্মীয় আবেষ্টনের মহাপরের তীব্র তীক্ষ্ণ ক্ষোভের কথা। বড় না হতে পারার ক্ষোভ। ছোট হয়ে থাকার দুঃখ।

আর একবার ছিলাম শিবপুরে। বাড়ীতে স্কুল হয়েছে—মজুর লাগিয়ে বাড়াচ্ছি। কালো কালো সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ দুটি সাঁওতাল এলো কাজ করতে। নাম শুনলাম জন আর যোসেফ। তাদের লোকে তাকে 'মিঠা' বলে। 'মিঠা' কেন জানি না। ভারি সরল ছেলেদুটি। ঝক-ঝকে দাঁতের হাসি কালো মুখে ভারি মানান সই। ভাঙা বাংলায় কথা বলে। বুড়ি দিয়ে একবাটি করে চা পেয়ে ভারি সন্তুষ্ট।

কবে কোথায় ধর্মান্তরিত হয়েছে কোন পুরুষে তা জানে না। গ্রামের গির্জার পাদ্রী সাহেবকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। নাম কে রেখেছে? জানে না। একটু লেখাপড়া শিখেছে। তাতবিদ্যে, নাচ, গ্রামোদ, পানীয় বা হাঁড়িয়া কিছুরই দেশী যখন হয় নি সাধারণ স্তরে, একটু ওর মধ্যে শিক্ষিত বা প্রচারক কারুর ছাড়া। কিন্তু মানুষের মত শিক্ষা ও মর্য্যাদা নিতে শিখছে।

আমাদের বলবার কি আছে? ধর্মান্তরিত হলেও ওরা উচ্চস্তরে অন্তর্ভুক্ত তো হয় নি। আমরা যে শ্রদ্ধা ম্যা' দিইনি তা' ওরা অন্য ধর্ম থেকে পেয়েছে। তবু তো জাতিচ্যুত হয়নি। তাদের সকল মানুষ সকল দেবতা নিয়ে ওরা আমাদের আপনার লোক হয়েই থাকবে। এও খৃষ্ট ধর্মের প্রচারের শ্রেষ্ঠের ও সেবার দান। অস্বীকার করা যায় না।

মনে হ'ল মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের কথা—জন্ম যাঁর কপোতাক্ষ তীরে পিতা রাজনারায়ণ জননী জাহ্নবী। মনে হল, রাম বাগচীর দত্ত পরিবারের কথা। অকালে গত কবি তরুণ অরুণদত্তর কথা। মনে পড়ল প্রথম কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোকটেলস্ অব বেঙ্গলের লেখক রেঃ লালবিহারী দের কথা। স্বদেশীয় (রাজা পালের) হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। আরো কত জন যাঁদের নাম করা হ'ল না, এঁরা যারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করলেন কিন্তু আত্মীয়রা ত্যক্ত, জাতি ত্যক্ত হলেন না। অন্য ধর্মের ও স্বজাতির ঐতিহ্য সমান ভাবেই বহন করলেন, দেশসেবায়, সাহিত্যে, স্বদেশ প্রেমে। ধর্মান্তরিত হয়ে বিদেশী অন্য জাতি হয়ে গেলেন না। এই আমাদের দুশো বছরের প্রতিবেশী সমাজের পরম দান।

এই প্রতিবেশী যাঁরা কয়েক বছর কয়ে মাত্র এদেশে বাস করেছেন, কিন্তু অসীম আগ্রহে দেশের মানুষকে চেনবার চেষ্টা করেছেন, তাদের উপকার করার ও চেষ্টা করেছেন। যাঁদের মধ্যে আমরা—পাই দীনবন্ধু এনড্রুজ সাহেবকে, পিয়ার্সন সাহেবকে আমার এল উইলকে যিনি অখ্যাত কুষ্ঠাশ্রমে সেবা করতে গিয়ে নিজে রোগাক্রান্ত হয়ে ছিলেন। স্কটীশচার্চ কলেজের ডব্লু. সি. আর্কুহার্ট সাহেবের স্ত্রী মিসেস্ আর্কুহার্টকে বাংলার নারী সমাজ ভুলবার নেবিকা। রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধাবান বন্ধুদের কথা শুনি। আরো কত সমাজ-সেবক ও সেবিকা যাঁদের কথা বলা হল না, যাঁদের নাম আমার জানা নেই—শুধু শ্রদ্ধা ভরে তাঁদের সকলের উদ্দেশে কবিগুরুর কথা বলি।

প্রতিটির তীর্থ হতে প্রাণ রস ধারা
এনেছ হে বন্ধু তোমা করি নমস্কার।

আমাদের কবির কথাতেই বলতে হয় এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে আমাদের সঙ্গে এঁরা এক হয়েই থাকবেন ভারতীয় জাতি ও খৃষ্টান ধর্মকে সমানভাবে বহন করে এই এঁদের ঐতিহ্য। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যাঁরা এক হয়ে আছেন জাতি এক-ধর্ম পৃথক হলেও।

অরবিন্দ-কাব্যে প্রেম

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(সাবিত্রী)

শ্রী অরবিন্দের 'সাবিত্রী'কে যথেচ্ছভাবে মহাকাব্যের আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে যদি মনে করি সারস্বতী প্রজ্ঞাদৃষ্টি কেবলমাত্র বিশ্বা বিরাজতি

(ঋগ্বেদ, প্রথমমণ্ডল, তৃতীয় সূক্ত ১২)

মুহূর্তের মহাপ্লাবন, আপন প্রভাবে যিনি রক্ষিত করে তুলেছেন, সঞ্জীবিত করেছেন, উদ্ভাসিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের কাব্য-জিজ্ঞাসার মূল খুঁজতে গেলে এই আলোকোজ্জ্বল প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত মানসের কথাই তার অন্তত রূপটিকে পাওয়া যায়, যে অলোক আলোক শুধু মনের প্রদীপেই জ্বিলা করছে না, বাইরের জগতেই প্রতিফলিত হচ্ছে না, প্রদীপ্তায়িত করছে সৃষ্টি-তত্ত্বকে সমগ্র সত্তাকে, সমস্ত চিন্তার ধারাকে। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। অনেকের মতে আজকের যুগে মহাকাব্যের দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন গতি আর প্রগতির যুগ, বিরামহীন, বিশ্রামহীন। সে দীর্ঘ দিবস রাত্রি, দীর্ঘ যুগযুগান্ত নেই, জীবনে এসেছে প্রচণ্ড বেগের দ্রুত তাই এখন আর রচিতে চাহিবে, শুনে মনে মহাকাব্যের কল্পনা বিলাস করা চলে না—সে মন নেই, সে যুগ নেই, সে সময় নেই। তা ছাড়া অনেকেই বলে থাকেন আজকের যুগের লেখার ভঙ্গী, রচনা শৈলী কাব্যের যুগল রীতির পরিধিতে রসোত্তীর্ণ হয় না। জানি না, এই রসোত্তীর্ণতা কথাটা বলতে যত সহজ, বিচারবুদ্ধির পরিমাপে এত সহজ ও সাবলীল কিনা। আমরা কথায় কথায়, বিশেষ করে সাহিত্য বিচারে বলে থাকি, এই লেখাটি রসোত্তীর্ণ হয়নি—অর্থাৎ এক কথায় আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু এই ভালো লাগার মানদণ্ড কি—সেটা কি নির্ভর করে না শিক্ষা-দীক্ষা, বিচারবুদ্ধির সূক্ষ্ম রূপের উপর। সেই জন্য আমার পিতামহের কিম্বা যে সাহিত্য রসসমৃদ্ধ মনে হতো আজকের মনে তা হয়তো সে রকম সাড়া জাগায় না। কিন্তু এ কথা, ঠিক সাহিত্যে যখন কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনায় একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের আমার এটা হচ্ছে তাঁর বিরল মৌলিক। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় কাব্য সাহিত্যের বিচার তার মহান আদর্শে বা বিষয়ের গৌরবে না, রূপকারের কৃতিত্বে, কবির আলোকে। আলঙ্কারিকরা বলেন—এই কবিই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ, রসপিণ্ডের লাবণ্যের মত। এই কবির যে কারোর তা শুধু মুখ প্রকৃতির প্রাণেই নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবলোকে প্রবেশ করে অধিকারী ভেদে। পূর্বে যে কথা বলেছি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করবো—সাধারণ সাহিত্যে আমরা খুঁজি আমাদের পরিচিত জীবনের ছবি, তার ব্যাখ্যা, তার পারিপার্শ্বিক বস্তুত্ব উল্লেখ, উল্লাস, বেদনা, কিন্তু যাদের জীবনে মহাজীবনের সমন্বয় ঘোষণা তাদের Realism ও শুধু সেইটুকুতেই তৃপ্ত নয়। অন্যান্য জীবনের যা মানস চেতনার কথা আমার কাছে হয়তো মিথ্যা, কিন্তু যাঁর অনুভূতি হয়েছে তার কাছে সেটা অতিমাত্রায় অতিসত্য। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' বিচারে এই দুটি প্রশ্নই সাধারণতঃ তোলা হয়—আজকের দ্রুত যুগে মহাকাব্য লেখার সার্থকতা আছে কিনা এবং এই ধরণের বিশেষ কাব্যে রসসৃষ্টি কতটা হয়। যাঁরা এ প্রশ্ন তোলেন তাঁরা প্রথমতঃ ভুলে যান তাঁর কাব্যের বিরাট পরিধি আর বিপুল সম্ভাবনার কথা, হয়তো সমগ্র মহাকাব্যের কোথাও 'thought comes in and profoundity keeps out poetry' কিন্তু সেটা হচ্ছে ভাব ও ভাষার মন্থনে কবি এমন একটা মানস লোকের সৃষ্টি করলেন যা সাধারণ ভাবে 'ইহার পরে যুক্তির শোচন নাহি আর, সেই ভাবের। এটা ঠিক কাব্য সৃষ্টির দোষ নয়, কাব্যরস-গ্রহীতার মানসিক অনগ্রসরতার কিছুটা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবে অর্থাৎ ভাব ও ভাষার কারুকার্যে, চিত্ররূপায়ণে সাবিত্রী 'মহাকাব্য' হলেও যে অসার্থক হয়েছে সে কথা বলা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন—When it is not understood, it is be cause the truths it expresses are unfamiliar to the ordinary mind or belong to untrodden domain or enter into a field of intuitive experience. যদি প্রাচীনকালের বীজমন্ত্রের ভাষাগুলিকে বিরাট পরিধিতে ফেলে একটি সূত্রে ভাব ও ভাষার রসায়নের পবিত্র সৌষ্ঠবের মত রেখে তোলাই এপিক্ কাব্যের মর্ম কথা হয় তাহলে বাল্মিকী ব্যাস, হোমার ভার্জিল অথবা কালিদাস, দান্তে মিলটন টাসোই যে মহাকাব্যের রচয়িতা তা নয়, শ্রীঅরবিন্দও। সে মহাকাব্য একটী কাহিনীকে অবলম্বন করে মানবাত্মার শাশ্বত অভিসারের কথাই রূপে রসে নিবিড় করে তোলে একথাও স্বীকার্য—এখানে কাব্য জিজ্ঞাসা, আলঙ্কারিক আর জিজ্ঞাসাতে সৌন্দর্যের এর পরিধি, শুধু ইতিহাসের গণ্ডীতে নয়, উর্দ্ধ মানসের শুভতম ঐতিহ্যে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জিনে, সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে অন্তরতম দিনের যুগ পর্যন্ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে কবি সাধারণ 'প্রেম'কে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তারই আর একটু বিশদ আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রাধাসুন্দর বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা রূপাতীত প্রেম সাধনার ভিতর দিয়ে নূতন ধরার আস্বাদ পেয়েছি।

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস
ব্রহ্মজায়ী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ বশ

এখানে প্রেম রস বিশুদ্ধরূপে পরিণাক করে যে বিশেষ বিলাসলোকের সৃষ্টি হলো তাকেই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তীরা 'রাস' নাম দিলেন। পরম ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তার দিকটার উপরই জোর দিয়েছিলেন, পুরুষোত্তমের দিকে নয়, যে পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ঘুরতি ধরিয়া আপিয়া ওরে আমার

কেবলাদ্বৈতবাদের স্বরূপ; সংস্কার যুগোপযোগী, যুগানাং যুগতঃ, শ্রীশ্রীচণ্ডীর যুগধর্ম। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম বললেন যিনি একরূপে নিত্য তিনিই আর একরূপে লীলাময়। শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাটাই আরো এগিয়ে দিয়ে বললেন—নেতি নেতিই শেষ নয়, তারপরেও আছে—Everlasting yea এবং সেই জন্যই তাঁর কাব্যের প্রেম কল্পনায় দেহ-গত বা দেহাতীত হলে কোন প্রশ্ন নেই—

Even the body shall remember God—এই মাটির কায়কলেবর দেহ ও ভগবানকে স্মরণ করবে। বালবয়স্তা নাটকে কবি অরবিন্দ তাদের যা কথা সরিৎসাগরের নায়িকাকে প্রেমের নূতন জগতে দিয়ে গেলেন—

O Basabadutta, when thy heart awakes
Thou shalt obey thy sovereign heart
Nor yield allegiance to the cleanneyed
selfish gods

যখন তোমার চিত্ত জেগে উঠবে সে চিত্ত যেন লোভী আত্মপরায়ণ দেবতাদের ভোগে না লাগে, তোমার অন্তরের দেবতাকেই যেন মানে। প্রেমের এই একমুখী ব্যাপকতা, সব বৈতের, দ্বন্দ্বতার সমন্বয়ে যে প্রত্যক্ষ অখণ্ড অনুভূতি অরবিন্দ প্রেম কাব্যের সেইটি হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। প্রেমের এই অপরা শক্তিই পরাকাষ্ঠায় ব্যাপ্ত হয়, সব জীর্ণ করে, নব জন্মের উপাদানে পরিবর্তিত করে, সত্তাকে রূপান্তরিত করে। এর কাছেই আবার হার মানেন স্বয়ং বেদ অগ্নি, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থাৎ যে শক্তি জড়-চেতনায় বিকশিত, বৈশ্বপ্রেরণায় বিস্তৃত। প্রেমের শক্তি দেবাসুরশক্তি 'সত্তৈবৈনিসূচাং'—এর দুই রূপ, ভোগ ও ত্যাগ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। উষাকে খুঁজতে সবযানকেই যেতে হয়েছিল।

'সাবিত্রী'র পঞ্চম পর্ব—The Book of Love—উর্ধ্বশীমানবাত্মার প্রতীক যোগী অশ্বপতির তপস্যায় যে শক্তি তাঁর ঘরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কন্যারূপে গিরিরাজ দুহিতার মত, সেই যৌবনবতী সাবিত্রী আজ পর্যন্ত মনোমত পতি পাননি, নিঃসঙ্গ, একাকিনী তিনি অনন্তের পথে যাত্রী। বন জঙ্গল লতাপাতা তাঁর ভালো লাগে অরণ্যের বিহঙ্গম যূথ। কবি দেখাতে চাইলেন সাধারণ মানুষের কাছে সাবিত্রী দুর্বোধ্য "too great was her demand, too pure her face" তাঁর দাবী তাঁর শুচি শুভ্র পবিত্রতার কাছে সাধারণ মানুষ ম্লান হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ব-বিধাতার বিধানে মিলনলগ্ন ঘনিয়ে আসছে। কবি দেখছেন সময় নিকট "But now the destined spot and hour were close. কবি অরবিন্দ গভীর নিভৃত শুদ্ধ অরণ্যের যে রহিমার মধ্যে সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রথম শুভদৃষ্টি মুগ্ধ উন্মোচন করেছেন পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যে তা প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে। প্রকৃতির বর্ণনায় যে রুচির রম্য শুচিস্নিগ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে কাব্য সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখি তা শুধু ভাবে ও ভাষায় নয় উপমায় ও ব্যঞ্জনায় অনবদ্য। প্রথম রবিকর স্নাত সেই তপস্যাপূত বনে প্রভাত যেন জ্যোতির্ময় দ্রষ্টার (morning like a lustrous seer) রূপে দেখা দেয় এবং অনন্ত বসন্তের সেই গভীর নিঃস্বন যেন (titan murmur of the endless wood) সেই অরণ্যকেই জানি। সেখানে বনে বনে মরকত দ্যুতিতে (dream of emerald woods) বন্য ধরিত্রী উঠছে, ময়ূর ও পারাবত মণি-মাণিক্যময় হয়ে খেলা করছে (Peacock and parrot jewelled soil and tree), শেত সারস শুদ্ধ অচঞ্চল-রেখালীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (the white crane stood, a vivid motionless streak), আমরা শুনতে পাচ্ছি চক্রবাকের করুণ কাতর মিলন মায়ের আকাশে বাতাসে (The dove's soft moan enriched the enamoured air) এ যেন—

Earth couched alone with her great lover Heaven
Uncovered to her consort's purple eye.
In her luxurious ecstasy of joy
She squandered, the love music of her notes,
Wasted the passionate pattern of her blooms
And festival riots of her scents and hues.

অভিসারিকা ধরিত্রী রূপে রসে গানে মোহনী হয়ে তার প্রিয়তম আকাশকে বাসর সজ্জায় ডাকছে—সে নিজেকে ধরিত্রীর কাছে লাস্যভরে উন্মুক্ত করে দিয়েছে—শুধু তাই নয়, তার প্রেম আকুলতায়, গরবগভীরতায় পথে, স্বর্গে সে অমিতব্যয়ী হয়ে উঠেছে—Squander, waste, riot এই সব কথাগুলির প্রয়োগে কবি ধরণীর ঐশ্বর্যের অতিশয়োক্তির দিকেও আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এখানে তখন ও পুরানী শান্তি (primevoil peace), তখনও মানুষ আসেনি, যে মানুষ শুধু কৃত্রিমতার পূজারী—জীবনের ছন্দপতন হয়নি, ভোরবেলা মহামায়া প্রকৃতি শুয়ে আছেন আনন্দে, সব কিছু তাঁরই প্রথম ভোরবেলার সঙ্গে মেলানো।

The mighty mother by outstretched at ease.
All was in line with her first satisfied plan'

এমনি দিনে, মধ্যপ্রকৃতির এই নিরঙ্কুশ অবস্থায় সাবিত্রীর সামনে এসে দাঁড়ালেন—

A stranger on the sorrowful roads of Time,
Immortal under the yoke of death and fate,
A sacrificant of the bliss and pain of the spheres
Love in the wilderness met Savitri.

মহাকালের যাত্রাপথে, একাকী দাঁড়িয়ে সত্যবান—মৃত্যুর বিধানের জোয়াল ঘাড়ে করেও তিনি অমরতার তীর্থযাত্রী—সারা বিশ্বের দুঃখ ও আনন্দের কাছে এই প্রেম ধরা দিয়েছে—অর্থাৎ মানুষী প্রেম হচ্ছে দুঃখ ও আনন্দের ঘনীভূত রূপ—এই দ্বৈতকে এক করে অদ্বৈতের যে সাধনা, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের যে অনুভূতি তারি সার্থকতা সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনীতে।

সাবিত্রী দেখলেন সত্যবানকে, সত্যবান দেখলেন সাবিত্রীকে।

Comrade and Sovereign eyes that claimed her soul
তার সাথী তার সখী যে তার আত্মাকে দাবী করছে, যে সত্যবান Erect

lofty like a spear of God ভগবানের বর্শাফলকের মত সোজা ও খাড়া। A mystic tumult from her depths arose তার অন্তঃস্থলের গভীরতা থেকে জাগলো এক আকুতি, এক রহস্যময়ী অভিব্যক্তি জেগে উঠলো।

The soul recognised the answering Soul আত্মা চিনলে আত্মাকে

To live, to love are signs of infinite things

Love is a divine power by which all can change

বেঁচে থাকা মানেই ভালবাসা—ভালবাসা অবশ্যেই সন্তান—যে বিশ্বশক্তি রূপান্তর করতে পারে সত্যকে বদলে দিতে পারে

An hour began, the matrix of new time, a new age, a new creation—সত্যিকার ভালবাসতে পারলেই জীবনের ধারা বদলে যায়, জীবনে নূতন সূর্যোদয় উদয় হয়, নূতন দিগন্তে নূতন সুর নূতন সৃষ্টি নূতন দৃষ্টি লাভ হয়। কিন্তু এই প্রেমের, মাটির পৃথিবীর সঙ্গে যেমন গভীর সম্পর্ক স্বর্গের সঙ্গেও তার চিরন্তনী ঘনিষ্ঠতা। সাবিত্রী শুধু স্বর্গের নয়, ধরণীরও Near to Earth's wideness, ultimate with Heaven সেইজন্য সাবিত্রী "a priestess of immaculate ecstasies" জীবন যজ্ঞের প্রতিটি আত্মোদ্ঘাটন আহুতির তিনি পুরোহিতা। যেদিন সত্যবান যখন সাবিত্রীকে দেখলেন তখন—

In her he found a vastness like his own,

In her he met his own eternity.

তিনি দেখলেন নিজেরই মত এক উদার বিস্তৃতিকে, ঐ নারীর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে। সাবিত্রীর জীবন ও দেহ ঘরে গেলো সত্যবানের নিজেকে যার উপর দিয়ে বিচরণ করবেন নিশ্চয় রেখে গেল বিষ্ণু, তিনি অনুক্ষণ অনুক্ষণে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। সত্যবান "Gathered all savitri into his clasp." সমগ্র সাবিত্রীকে তিনি গ্রহণ করলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে কবি all savitri বলছেন অর্থাৎ যে সাবিত্রী অখণ্ড, তার প্রতিটি সত্তা, প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কার্য্য, প্রতিটি সংস্কার, তার দেহ, মন, চিত্ত, যাকে সব দিয়ে—অর্থাৎ যে সাবিত্রীতে দ্বৈতের বোধ নেই, অজ্ঞান নেই, সব সীমাহীনের মহাসাগরে বিলীন। ভালবাসার শেষ কথা হচ্ছে মিলিয়ে যাওয়া—ব্রহ্মানন্দ সহোদর যাকে, আনন্দময় চিন্ময় অখণ্ড অনুভূতিতে—তুমি ও নেই, আমিও নেই—দুই মিলিয়ে এক। এই অখণ্ড অখণ্ড জ্ঞান যেখানে সত্য সেইখানে মৃত্যুর সঙ্গে যোঝাপড়া করতেই হয়—মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, দ্বৈতকে স্বীকার।

এই পথে তাই দেখি দেবর্ষি নারদ সেই কথা আমাদেরই স্মরণ করাচ্ছেন। এই সেই ঋষি বীণায় সপ্তম অখণ্ড গতি, বীণা হাতে হরিগুণ গান করতে করতে তিনি লোকে লোকান্তরে ভ্রমণ করেন। নারদ কে না তিনি নরের ঊর্ধ্বে নারদ—সেই জ্ঞান দান করেন—নারায়ণায়নারদম্ জ্ঞানম্ প্রদাতি। ঋষি অরবিন্দের হাতে এই নারদ চরিত্র কি রূপ ফুটেছে তা লক্ষ্য করবার বিষয়। ঋষি প্রথম নারদের মর্ত্যের দিকে—মহাপুরুষের ভিতর দিয়ে—শত সহস্র লক্ষ কোটি সূর্য্য ঘুরছে—অসীম নীলের বর্ণন করছে। এই মর্ত্য সীমার ওপারেই (bordering the mortal plane) বিরাট শান্তির সুধাময় (a wide expanse of brilliant peace), নিম্নে বিলীন পৃথিবী—একটা অন্ধকারের হাতে ঘুরছে জীবন্মৃতের মত।

ঋষি বলছেন—নারদের পৃথিবীতে নামা মানেই—

He passes from Mind into material things

Amidst the inventions of the Inconcient self.

তিনি মানবের ভূমি থেকে অন্ধের ঘরে এসে মানবের যেখানে দুঃখ আছে, বেদনা আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আশা আছে, অভীপ্সা আছে, জীবন আছে,

To a world of toil and quest and grief and hope

To these rooms of See-Saw game of death and life

.....He felt a sap of life, a sap of death.

এই জীবন মৃত্যু মিলিয়েই অগ্নির আহুতি—যে আহিতাগ্নির মধ্যেই সৃষ্টির শুভতম প্রজ্ঞার শক্তি। বৈদিক ঋষিরা সাধকের দৃষ্টিতে এই সত্যকে পেয়েছিলেন তাই তাঁদের যজ্ঞের প্রথম মন্ত্রই হচ্ছে—অগ্নিমীলে পুরোহিতং—যে শক্তি অগ্রণী তাকেই সুদৃঢ় স্থাপিত করলেন তাঁরা—যে অগ্নি কখনো নিভে যায় না। মহাপুরুষের মধ্যে আসার পথে নারদ দেখলেন সৃষ্টিকর্ত্তার কাজ—কতো পৃথিবী গড়ছে, কতো রূপান্তর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানের সুর বদলে যেতে আরম্ভ করলো—তাঁর বীণার অনাহত ধ্বনি অন্য মূর্চ্ছনা বয়লো—তার মধ্যে এলো তাদের রূপ, অনুকম্পার প্রেরণা—মাটির সুর মিশছে—তার মধ্যে চির আঁধারের গান, প্রেমের অবিনশ্বর শাশ্বত রূপ অন্ধ খোঁড় দিচ্ছে, অন্ধ সুর বদলে, অন্ধ তালে নাড়া দিচ্ছে। পৃথিবীর অন্ধকারের ছায়া, তার অজ্ঞানতার মোহ তাঁর হৃদয়ে আজন্ম কামনা কামনা দুঃখ বেদনার, আবর্ত্তন নাড়া দিলেও সেই তমসার মধ্যেও পরম আলোর রূপ আশা হারা নয় ধ্বনি—

And Love that broods within the dim abyss

And waits the answer of the human heart

And death that climbs to immortality

Of the glory and marvel still to be born

সেই পরিপূর্ণ প্রেম, সমর্থা ভক্তি যার জন্য মানুষের মন গভীর অন্ধকারের মাঝেও অপেক্ষা করে থাকে, উন্মুখ হয়ে থাকে, যা মৃত্যুর সীমা পার হয়ে চলে অমরতার দিকে—যে জ্যোতি ও মহত্ত আজও অজ্ঞাত।

নারদ এসে পৌঁছলেন মহাপুরুষে, অধিপতি যোগী তিনি যাজ্ঞযোগে জেনেছেন মহারাত্রির শক্তির কথা—The mystery of God's Covenant with the night. তিনি মহাপুরুষ লোকে লোকান্তরের পথে জীবনের উত্থান ও পতনকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং জেনেছিলেন যে জীব ও শিবের মধ্যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে (There was no barrier between world and God) কোন ভেদ নেই। নারদের প্রথম ধাপে মর্ত্যসীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের লীলাপথে যাত্রা (transcending the human formula), দ্বিতীয় ধাপে

উত্তরোহণ, তৃতীয় স্তরে মহাশক্তির অবতরণ। সাবিত্রী সেই শক্তিরই প্রতীক।

One shall descend and break the iron law তিনিই স্বর্গের উষারাগের মূর্তিমতী সৌন্দর্যলক্ষ্মী।

অশ্বপতির সহধর্মিণী অর্থাৎ সাবিত্রীর মাতাকাপায় যিনি মাতা তিনি beautiful, passionate, wise—তিনি সুন্দরী' তিনি আবেগবতী এবং ধীসম্পন্না, প্রজ্ঞাযুক্তেপা স্থিরধীসমন্বিতা। তিনি ঊর্ধ্বমুখী সত্তা যিনি যে জানতে চায়, যার অভীপ্সা আছে যজ্ঞহুতাগ্নির শিখার মত (aspiring like a Sacrificial flame.)

নারদের মুখ দিয়ে কবি অরবিন্দ যে নিত্য সত্যের আভাসই দিলেন তা নয় অপূর্ব কাব্য রচনা ও করলেন

He Sang to them of the lotus heart of love

With all its thousand luminous buds of truth

বিকশিত বিশ্বচেতনার মূলে যে অনাদি প্রেম পদ্ম কোরকের মত স্থিত তাকেই সহস্র সহস্র ভাবরূপে প্রস্ফুটিত করে তুললেন কবি, তিনি গাইলেন এমন গান, যা

It trembles at each touch, it strives to wake

প্রতিটি স্পর্শে স্পর্শে পরিমুণ্ডেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে ওঠে, জেগে উঠতে চায় মরমের ভিতর দিয়ে হৃদয় ভরিয়ে, প্রবেশ করতে চিরমনের আনন্দ উদ্যানে। কবি উপমা দিলেন—She is seized by her discovered lord. একই সঙ্গে পত্নী আবিষ্কার করছে পরমপতিকে আর সেই পতি কর্তৃক বৃত হচ্ছে। এই অনুভূতির মধ্যেই বিশ্বসত্তির আরতি। এই হচ্ছে নারদের তথা অরবিন্দের প্রেম স্বরূপ ব্যাখ্যা।

নারদ যখন অশ্বপতি ও তার মহিষীর সঙ্গে এই সব কথা বলছেন তখনই হলো সাবিত্রীর আবির্ভাব—সে সাবিত্রী তখন সত্যবানের কাছে সত্যবদ্ধ, প্রেমের জটীকা তার ললাটে শোভমান—কে এই জ্যোতির্ময়ী লোকললাম ভূতা—পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের মিলনকে যিনি সফল করবেন ...কিন্তু পিছনে যে মৃত্যুর অভিশাপ—কালো ছায়া—Chased by a sudden and stupendous light—একটা বৃহৎ মহৎ আলো তাকে তাড়া করছে। সমস্ত মানব জাতির এই আশা—ছায়ার পিছনে যে কায়া আছে তার জন্যে আছে আলোর বাণী।

সাবিত্রী বললেন—I have obeyed my heart and have heard its call

আমি আমার মনের বাণীকেই গ্রহণ করেছি, আমি শুনেছি তারই ডাক।

স্নেহাতুর মায়ের মন মানে না, রাণী জিজ্ঞাসা করেন, অশ্বপতি বললেন—ভবিষ্যতে কি আছে দেখে বরকার নেই

To light one step in front is all his hope

চলার পথে এক পা এগুনো, একটি প্রদীপ জেলে রেখাই সব চেয়ে বড় আশা।

তাই সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী যমকে বললেন—হে মৃত্যুদেব আমি তোমাকে স্বীকার করি না—মৃত্যু একটা মুখোস—অনন্তজীবনেরই আবরণ।

মৃত্যু হাসে—মনে কিসের শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন বিধানকে উড়িয়ে দিতে চাও, হে নারী—

সাবিত্রী বলেন—My God is Love ·I Shall remake thy universe O. death—আমার দেবতা হচ্ছেন প্রেম—আমি নতুন বিশ্ব গড়ে তুলবো

যমরাজ বললেন—বাতুল, আমিই তমসা, মোহ আমার মধ্যেই তোমার বিকাশ, তোমার প্রকাশ, সেখানে সবাই লীন, সেখানে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, অমৃতত্ব নেই, আছে শুধু চরম একাকীত্ব, অবশ্য সেটি, আমি তারই প্রতীক—

সাবিত্রী বিশ্লেষণ করলেন—ভুল করেছো প্রভু—তোমার ঐ নিরুপাধিকের চেয়ে আছে মাতৃশক্তি—মন স্থির থাকলেও জল, হেরে গেলেও জল—তাই সে বলে—

I am, I love. I see, I act, I will

আমি আছি অমরত্ব ভোগ, আমি ভালবাসি, মহাভাবে আমি প্রাণবান, আমি দেখি, আমি স্রষ্টা পুরুষ, আমি কাজ করি, শুধু ধ্যান নই, যীশু, আমি ইচ্ছা করি, অকাতরে, অমৃতে—তুমি ভুল করেছো যমরাজ নিষ্ক্রিয়, শক্তিহীন, নিশ্চিহ্নতা, নাবিকল্প, স্বর্গ মর্ত্য জীবন মৃত্যু সব নিয়েই তিনি।

যমরাজ তখনও তর্ক করেন—তোমাকে জানতে হবে You should know

সাবিত্রীর উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট—

When I have loved forever, I shall know

আমার জানা তখনি সম্পূর্ণ হবে যখন আমি চিরকালের জন্য ভালো বাসবো। ভগবান এই আমামাটির মধ্যেই আছেন God lives hidden in the clay. ঐ তো তিনি মাটির আমার বক্ষলালা, প্রিয় প্রিয়তর, প্রিয়তম। এই মর্ত্যের আবরণের মধ্যেই তিনি লুকিয়ে আছেন, কাম কামনা লোভ লালসার মধ্যেও, ভাগবত বীজ সেখানেও সুপ্ত—তাকেই জাগতে হবে, জাগাতে হবে, গণ্ডীকে বাড়িয়ে দিতে হবে, পালিয়ে গিয়ে নয়, কামকে ঘৃণা করে নয়, আত্মকাম হয়ে, সত্যকাম হয়ে। পুত্রের বা জায়ার প্রীতির জন্যই পুত্র বা জায়া প্রিয় নয়, আত্মার প্রীতির জন্য।

কবির অপরূপ ভাষায় সাবিত্রী বললেন—Our earth starts from mud and ends in sky—আমার পৃথিবীর মাটিতে আরম্ভ আর আকাশে শেষ—দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ। রূপান্তরিত করে দাও, পরিশোধিত কর

When unity is one, Strife is lost

সেই বিরাট প্রেমের জীবনে মুক্ত হতে পারলেই বলা যেতে পারবে—হেরে জেলে তুমি প্রভু এই লুকোচুরির খেলায়

And all is known and all is clasped by Love
My whole being is filled with Love

এই যে প্রেম, এই যে ভালবাসা, এই যে পাওয়া মিলন কেন

Not for my heart's sweet poignancy
Nor for my happy body's bliss alone
I have claimed from the living satyavan
But for his work and mine—our sacredcharge

এই প্রেম দেহের ভোগের জন্য নয়, মনের সুখের জন্য নয়—জগদ্ধিতায়—এই যুগলজীবন যুক্ত বেদীর জন্য—মানুষকে উর্দ্ধে উন্নত করবার জন্য।

Our love is the heavenly seal of the supreme
For love is the bright link twixt earth and heaven
Love is the fer transcending angel here
Love is the man's lien on the absolute.

প্রেমই হচ্ছে স্বর্গ ও পৃথিবীর সেতু, দিব্যের বাহন, এক ও অনাদির কাছে ছাড়পত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

যে মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে
আমরা অমৃতে আজি সবারে লাগাব
জন্ম মৃত্যু ভূমার শিখরে
কোন মহাশ্বেতা কোন তপস্বিনী বিরাজে অচল
স্তব্ধ অচঞ্চল
অন্তরের সঞ্চারিয়া কহিল সে ঊর্দ্ধে তুলি আঁখি
তুমিও একাকী

অরবিন্দ আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন—তুমিও একাকী, আমিও একাকী নয়, আমরা সব সময়েই মিলিত—সে মিলন অমল, অপূর্ব, অসীম। তার মধ্যে মৃত্যুর অধিকার নেই খণ্ডের, বোধ নেই, মিলতির নির্দেশ নেই।

আমার আহুতি নিল শেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে
লহ এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম

এই পূর্ণ পরিণামের কথাই সাবিত্রীর ব্রতকথা।

পেঁর

অনুরূপা দেবী

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের অন্তঃপাতী মার্সে প্রদেশের পাতু-দু-লোয়ার নামক স্থানে এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর গৃহে পীয়ের ফ্রাঁসোয়া কীলিয়ের (Pierre Francois Cuiller) জন্ম হইয়াছিল। উত্তরকালে ভারতবর্ষে তিনি স্বীয় পৈতৃক নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পেঁর (Perou) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসও তাঁহাকে ঐ নামেই জানে। ব্যবসায়ে মন্দার যখন তাঁহার পিতার কারবার বিনষ্ট হয় তখন পীয়ের নিতান্ত বালকমাত্র; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহাকে তখন হইতেই উদরান্নের জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। জনৈক ধনাঢ্য আত্মীয়ের নিকট সাহায্য-প্রার্থনায় ব্যর্থকাম হইয়া বালক নিজ বংশমর্য্যাদা পুঁজিতে কয়েকটী জিনিষ কিনিয়া নিকটবর্ত্তী নগরে সামান্য কিছু লাভের আশায় সেগুলি বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হইল না; তখন বাণিজ্য-লক্ষ্মীর নিকট চিরতরে বিদায় লইয়া পীয়ের উক্ত সময়ের সাহকারী তোপ-ঢালাইয়ের কারখানায় মজুররূপে প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তরকালে এই-খানে অর্জ্জিত বিদ্যা তাঁহার শিক্ষিত কার্য্যকরী হইয়াছিল। ইহার পর ফরাসী রাজকীয় বাহিনীতে প্রবেশ করিয়া পীয়ের বীর রেজিমেণ্টের সহিত বহুদিন দ্বীপে আসিয়াছিলেন (১৭৭৪ খৃঃ)। এই সময়ের সকল কথা ঠিক জানা যায় না। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী এডমিরাল সার্ফ্রাঁ নৌবহরে সাধারণ মাল্লা বা মতান্তরে marine বলের সার্জ্জেণ্টরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় (১৭৮০ খৃঃ)।* তখন এ দেশে ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা বলেন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বড় আবর। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দূরদৃষ্টা, কর্ম্মী, উদ্যমশীল যুবকের জাহাজের সামান্য কর্ম্মে জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনজন বন্ধুর অভাব হইল না। সকলে একদিন গোপনে পোত পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের মাটিতে ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে অবতরণ করিলেন। এই সময়েই তিনি স্বীয় নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন পুনরায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তখন তিনি হিন্দুস্থানে সোহরের রাণার কতকগুলি সেনাধ্যক্ষ সেনার অধীন একজন সৈনিক। বাঙ্গিপাত্য হইতে পেঁর সরাসরি উত্তর ভারতে আসিয়া-ছিলেন অথবা মধ্যবর্ত্তীকাল বিভিন্ন দরবারে অতিবাহিত করেন তাহা জানা যায় না। দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর পেঁর "নন্-কমিশন্ড অফিসার" এর পদলাভ করেন। ফ্রান্সোয়ের কামান ঢালাই-কার্য্যে দক্ষতা ছিল, সম্ভবতঃ পেঁর তাঁহার তোপখানার কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই পেঁর মাথেলিন বেরিঞ্জকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

* কর্ণেল ম্যালিসন বলেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ব্রিগেড (বা আধুনিক ফ্লোয়ার) sardigne এ সাধারণ নাবিকরূপে পেঁর প্রবেশ আসিয়াছিলেন (Final French struggles in India, 149)।

মহাদজী সিন্ধিয়ার হস্তে পরাজয়ের পর রাণা তাঁহার সেনাবল ভাঙিয়া দিলে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক আবার নূতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাধিপতি রণজিৎ সিংহের পাশ্চাত্যসমরপদ্ধতিতে গঠিত ক্ষুদ্র একটী সেনাবল ছিল। কাপ্তেন লেস্টিনো নামক জনৈক ফরাসী সৈনিক ছিল উহার অধ্যক্ষ। মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে পেরঁ এই দলে কোয়ার্টার-মাষ্টার সার্জেণ্টএর চাকরী জুটিল। দলের সহিত তিনিও চাকলালা ও sardina নগরপোতে তিনি এদেশে আসেন (Europonn Military Adventurers of Hindusthan,) ও আগ্রার যুদ্ধে এবং দিল্লী অধিকারে উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে দি বইন প্রসঙ্গে সে সকল কথা বলা হইয়াছে। লেস্টিনোর পলায়নের পর রণজিৎ সিংহ ব্রিগেড ভাঙিয়া দিলে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক আবার কর্ম্মহীন হইলেন। শুনা যায় এই সময় তিনি বেগম সমরুর বাহিনীতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেগমের তখন বিষাদময় দুঃসময়। দীর্ঘকাল বেতনাভাবে সৈনিকগণ বিদ্রোহোন্মুখ; নূতন ব্যক্তিকে কর্ম্মদান করিবার মত অবস্থা তাঁহার তখন ছিল না।

জাহাজ হইতে পলায়নের পর দীর্ঘ নয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, এমন সময়ে এমন একটি ব্যাপার ঘটিল যাহার ফলে পেরঁর জীবনের গতি এবং পরবর্ত্তী ইতিহাসের ধারাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। সহাদজী সিন্ধিয়া এই সময় দি বইনকে তাঁহার জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত বাহিনী সংগঠনের আদেশ দিয়াছিলেন। সেজন্য উপযুক্ত অফিসার প্রয়োজন। পেরঁকে দি বইন পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন, সাহসী কর্ম্মঠ উৎসাহী সৈনিক বলিয়া তাঁহাকে জানিতেন। বর্ত্তমানে যে তিনি কর্ম্মহীন, তাহাও তাঁহার অজানা ছিল না। নবগঠিত ব্যাটালিয়ন দুইটির মধ্যে একটির অধ্যক্ষতা তিনি পেরঁকে দিয়াছিলেন। পেরঁ সকল বিষয়ে দি বইনের মনের মত সহযোগী ছিলেন। অল্পকালমধ্যে নিয়মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী সৈনিক কর্ম্মের মধ্যেই আনন্দলাভ করিতেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে নিজ সৈনিকগণকে শিক্ষাদীক্ষার উৎকর্ষে আদর্শ স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পাটন এবং মেরতা যুদ্ধে (১৭৯০ খৃঃ) পেরঁ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। রাজপুতদিগের নিকট হইতে মরধির আজমীর প্রদেশের শাসনভার তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইস্‌মাইল বেগ এবং বেগম সমরুর খাঁর নিকট হইতে দুর্জ্জেয় কনৌজ দুর্গ অধিকার তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের অন্যতম নিদর্শন (১৭৯২ খৃঃ)। ইহার পর তিনি মেরতে পদে উন্নীত হন। কিন্তু অবরোধকালে সংঘটিত একটি দুর্ঘটনার ফলে তাঁহাকে অঙ্গহীন হইতে হইয়াছিল। একদিন ব্রিগেড পরীক্ষা করিবারকালে দুর্ভাগ্যক্রমে একটির আকস্মিক বিস্ফোরণে তাঁহার দক্ষিণ হস্তটী এরূপভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে উহাকে ছেদন করিয়া ফেলা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সিপাহীগণের মুখে তাঁহার নাম ইতিপূর্ব্বে "পীয়ের সাহেব" এ রূপান্তরিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার আর এক নাম হইল "একহত্ত" সাহেব। ফরাসীতে হস্তকে হস্ত বলে।

দ্বিতীয় ব্রিগেড গঠিত হইলে দি বইন উহার পরিচালনভার পেরঁকে দিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ারও অফিসর কর্পস শ্রেষ্ঠ প্রথমটীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এইরূপে সিন্ধিয়ার কর্ম্মে প্রবেশের তিন বৎসর কালের মধ্যেই তিনি ৮০০০ পদাতিক, ৮০০ অশ্বারোহী এবং ৪০টি কামান লইয়া গঠিত এক সেনাদলের অধ্যক্ষতালাভ করিয়াছিলেন। পদ মর্য্যাদায় তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের ব্রেজ-জেনারেলগণের সমকক্ষ বলা চলে। বেতন এবং ভাতা মিলাইয়া তাঁহার মাসিক আয় এই সময় দুই হাজার টাকার ন্যূন ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে যে ব্যক্তি মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম হারাইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিল তাহার পক্ষে এ উন্নতি অচিন্ত্যনীয় ভিন্ন আর কি বলিবার আছে।

পেরঁ ইহার পর অযোধ্যা ইত্যাদি এবং রণধীর সঙ্গে মেবার যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হোলকারের সেনাপতি ফ্রেঞ্চাদিগের দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে লাখেরী যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি ঐতিহাসিকপ্রবর সার যদুনাথ সরকার নবপরিজ্ঞাত তথ্যসমূহ অবলম্বনে এই যুদ্ধের (১৭৯০) একটী মূল্যবান বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন।

পেরঁর দরবারে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া মহাদজী কিছুকাল হইতে পুণায় অবস্থান করিতেছিলেন। হিন্দুস্থান হইতে তিনি সেনাসাহায্য চাহিয়া পাঠাইলে দি বইন পেরঁকে তথায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া পৌঁছিবার কয়েক দিবস পূর্ব্বেই মহাদজীর মৃত্যু হইয়াছিল (১২।২।১৭৯৪)। তাঁহার দেহান্তে যে মারাঠারাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলার সঞ্চার হয় নাই এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাওয়ের পক্ষে যে নির্ব্বিঘ্নে গদীতে আরোহণ সম্ভব হইয়াছিল, পুণার উপকণ্ঠে দল ব্যাটালিয়ন শিক্ষিত সৈনিকসহ পেরঁর অবস্থান তাহার কারণ।

খড়দা যুদ্ধে (১২।৩।১৭৯৫) পেরঁ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনানায়ক জেনারেল ডেমঁ প্রসঙ্গে সে ইতিহাসে অনুক্ত প্রবন্ধ হইয়াছে। এই বৎসরের শেষভাগে দি বইন কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লন। তখন তাঁহার পরিত্যক্ত পদের অধিকার লইয়া পেরঁ এবং তাঁহার শ্যালিকার জামাতা কর্ণেল রয়ঁ সাধারণের মধ্যে বিরোধ বাধে। ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল ফ্রেঞ্চেরও মৃত্যু হওয়াতে পেরঁ প্রধানতম অফিসর হইয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার সান্নিধ্যে অবস্থান ও তাঁহার পক্ষে কার্য্যকর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে দলবলও এই সময় বিদ্রোহ দমনকার্য্যে সুদূর বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। ফলে পেরঁই বাহিনীর অধ্যক্ষতা লাভ করিলেন। অবশ্য দলবলও এবং তাঁহার মধ্যে যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আর প্রশমিত হয় নাই।

কাপ্তেন ফ্রঁচ্যর হস্তে স্বীয় ব্রিগেডের ভার ন্যস্ত করিয়া পেরঁ বম্বায়ে আসিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ রাণ্ডুর হস্ত হইতে সেনাপতির গ্রহণ করেন (ফেব্রুয়ারী ১৭৯৭)। দি বইনের অবসর গ্রহণের পর হইতে তিনি একদিন অস্থায়ী ভাবে অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। দি বইনকে প্রদত্ত যাবতীয় অধিকার তাঁহাকে অর্পিত হইয়াছিল। প্রথম বৎসর বিভিন্ন বিষয়ে খুঁটিনাটি কাজলাভে এবং সৈন্যদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ

প্রভৃত সোনার বিনিময়ে কাবুলের শাসন ব্যবস্থা করিতে রাজি হইয়া গেল। তাহারপর পেঁয়ের অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মকলে আয়কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা-কল্পে মনোনিবেশ করিলেন। দিল্লী এবং আগ্রার বিদ্রোহীগণ এবারে পেঁয়ের অধিকার মানেন নাই। বরং সিন্ধিয়া পেঁয়ের হস্তে সমর্পণের আদেশ দিলেও প্রধান মন্ত্রী বলরাও অম্বিয়া গোপনে তাঁহাকে সে আদেশ পালন না করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ব্যাপারটা রাজনীতিতে এবারের ব্যাপার অর্থাৎ রাজার মন্ত্রীতে বিদ্রোহ, প্রায়ই ঘটিত। অযোধ্যা রাজ্যের প্রয়োজনের জিন্দাবাদ পেঁয়কে বাধাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ববিধ আবেদন অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হইলে পেঁয় আগ্রাকে বেতন দ্বারা দিল্লী অধিকারে গমন করিলেন। বৃদ্ধ অন্ধ বাদশাহ যাহাতে আলমের বাহাতে পারিতেন না হয়, সেজন্য দুর্গের উপর আক্রমণের পরিবর্তে অবরোধ দ্বারা বাহাতে ঘটান অথবা ষড়যন্ত্র ও উৎকোচ প্রদান প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুর্গ অধিকার করিতে তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মারহাট্টা সম্রাটের নামের তখনও এমন প্রভাব ছিল! আর মাত্র বৎসর পরে পাণিপথ যুদ্ধের পর সেই দিল্লীদুর্গ তথা শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন; সম্রাটবংশের তথা কেহ কেহ বিচারের পর, অনেক বন্দী অবস্থায় বিচারের পূর্বেই বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন! পাঁচ সপ্তাহ অবরোধের পর "স্বর্ণের সংস্পর্শে আসিয়া দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল" (gates were assigned to the impulse of gold); কাপ্তেন লে মার্শ নামক ইংরেজ ফরাসী অধিনায়ক কিল্লাদার এবং বাহাদুরের রক্ষক বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

আগ্রার কিল্লাদার ও তিনটী সহযোগী প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমার বন্ধুর বাড়িয়ার আতা ছিলেন। মাত্র একদিন অবস্থিতির পর আলিগড় হইতে সসৈন্যে আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১৯।২।১৭৯৯)। তিনি যে অত দ্রুত আসিতে পারিবেন তাহা কেহ মনে ভাবে নাই। কিন্তু যুদ্ধ সময় তাঁহার হস্তগত হইল; কিন্তু দুর্গের ভিতরের সৈন্যগণ আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। আগ্রাদুর্গে অন্ধকূপের কোন বালাই ছিল না। দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া অবরোধ চলিবার পর আক্রমণকারিগণ বারুদযোগে (mining) দুর্গপ্রাকারের একাংশ চূর্ণ করিয়া দেওয়ালে রন্ধ্রপথে হতাশ হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। এই যুদ্ধে পেঁয়ের দলে জনপঞ্চ সৈনিক হতাহত হইয়াছিল। সুতরাং ব্যাপারটা নিতান্ত সামান্য হয় নাই বলিতে হইবে। আগ্রা অধিকৃত হইবার পর পেঁয়ের শক্তি তাঁহার জায়গীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি সমগ্র দ্বিমুখাবে বীর কর্তৃত্ব স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে Asiatic Annual Register পত্রে পেঁয়ের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে একটী সংবাদ সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার একাংশ এখানে দেওয়া যাইতেছে—রাজপুতিনা এবং দোআ উভয়স্থলে সমান দক্ষ এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেনানায়ক পেঁয় নামক ইংরেজ ফরাসী জাতীয় সৈনিকপুরুষ—দ্বিমুখাবে মৌলবাদ সিন্ধিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। সামরিক এবং অসামরিক উভয় বিধ বিষয়ের সকল বিভাগেই তাঁহাকে পূর্ণ এবং অপরিমেয় ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। যে কোন স্বাধীন নরপতির ক্ষমতার অতিরিক্ত এই ক্ষমতা তিনি যথেষ্ট সংযম এবং এপ্রকার বিচারবুদ্ধি ও নৈপুণ্যের সহিত পরিচালনা করেন যে উহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে তিনি প্রচুর গুণসম্পন্নও বটে। তাঁহার ইউরোপীয় অফিসারগণ সকলেই খুব ভাল সৈনিক হইলেও দলের মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতা-শালী বা চরিত্রবান আর কেহ নাই। অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নীত হন এবং বাল্যকালে শিক্ষার সুবিধালাভ না করার জন্য উঁহাদের মধ্যে কেহই বীর সেনার বহির্ভূত কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখা যায় নাই: কিন্তু এ অসুবিধা তিনি সহজেই দূর করিতে পারিবেন। ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে তিনি তাহা করিতে পারিবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই কারণ তখন সামরিক বা অসামরিক উচ্চপদের যোগ্য অল্পসংখ্যক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক তাঁহার পরামর্শের আশ্রয় লইবে। বাণিজ্যের উপকূলবর্তী মারাঠা বন্দর সমূহ যোগে উহারা সহজেই তাঁহার নিকট আসিতে পারিবে। ইতোমধ্যেই কিছু কিছু সমরসম্ভার ঐ পথে তাঁহার নিকট পৌঁছিতেছে। সুতরাং অচিরেই আমরা দ্বিমুখাবের উন্নতিকল্পে অক্লান্তব্রত এবং প্রভাবশালী ফরাসীগণের দ্বারা পরিপূরিত দেখিবার আশা করিতে পারি।"

হল অন্যায় জয়ী ঐ

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

শত যুগ পরে আজিও হাঁকিছে দুর্মতি কুরুকুল—
নাই শুধু নাই যুগের পার্থ ভাঙিতে তাদের ভুল
দুর্যোধনের বিরাট হস্ত আজও পুনঃ ধীরে ধীরে
পাণ্ডবগণে পাঠায়ে দিতেছে বনবাসে ফিরে ফিরে।
মরে নাই আজও সমাজ হইতে দুঃশাসনের দল—
চক্রী শকুনী আজও বেঁচে আছে রচিতে নতুন ছল।
নাই শুধু আজ ন্যায়ের প্রতীক বৃদ্ধ সে ধৃতরাষ্ট্র
নাই আজ নাই পার্থ-সারথী গড়িতে ধর্মরাষ্ট্র।
ন্যায়েরে দলিয়া দিকে দিকে হল অন্যায় জয়ী ঐ
গড়িতে সমাজ গড়িতে রাষ্ট্র পাণ্ডবী আগে কই?

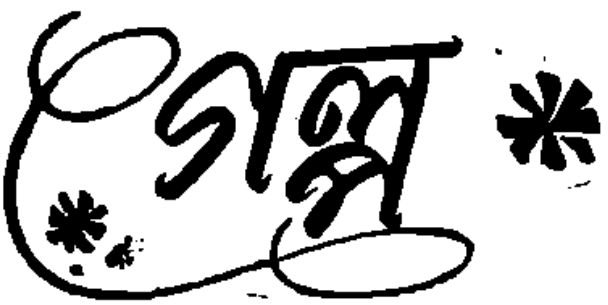

অশ্বত্থামার ছেলে

সন্দীপন

হুইসিলের তীব্র শব্দটা কানে যেতেই চোখ ফেরালো আঙুর। না ট্রেণ নয়, খালি একটা ইঞ্জিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

কোন ট্রেণ আসার সঙ্গে সঙ্গে আঙুরের বুকটা কেঁপে ওঠে। তাড়াতাড়ি ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখে—লোক্যাল না এক্সপ্রেস। লোক্যাল ট্রেণ হলেই বুকের উপর থেকে যেন একটা ভারী পাথর নেমে যায়। কিন্তু এক্সপ্রেস ট্রেণকে তার কেন এত ভয় বুঝতে পারে না আঙুর। সবই তো তার নিজের দেশের লোক আসছে। কত পরিচিত মুখ চোখে পড়ছে। সবই তারই মতো দাদার ঘরে, ঘরভাঙা। এই তো সেদিন দেখা হয়ে গেলো পটলী মাসীর সঙ্গে। একই গ্রামের লোক। শুধু গ্রাম বলে ভুল করা হবে। একেবারে পাশাপাশি বাড়ী। সেই যে কথায় বলে—আমার ঘরে পিদীম জ্বাললে তোমার ঘরে আর আলো জ্বালতে হয় না। তেমনি প্রতিবেশী। এখানে চলে আসার দিন রাত্রে পটলী মাসি চুপি চুপি এসেছিলো ওদের বাড়ী। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে চোখের জল ফেলেছিলো।—তোরা যাচ্ছিস, যা। আর এখানে থেকেই বা কী করবি। আসল মানুষটাই যখন রইলো না, তখন কিসের থাকা বা এখানে। আর তোকে সামলাবেই বা কে এখানে। এই সোনার বয়েস। ওদের চোখে পড়লে কি আর রক্ষে আছে। এই তো কাল দিনে দুপুরে হরিকাকার পুত্র-বউটাকে ধরে নিয়ে গেলো। চোখের জল মুছে পটলী মাসি বলেছিলো—আহা জোয়ান বলে জোয়ান। আট দশটা গ্রাম খুঁজলে অমনটি চোখে পড়েনা। তার ওপর ঘরে এই কচি বউ। আর এই দুধের বাচ্চা ছেলে। ওদের প্রাণে কী দয়া মায়া নেই। কেমন করে বুকে ছুরি মারলে! হাত কাঁপলো না?' ট্রেণের বেশি সময় ছিলো না। তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নিচ্ছিলো আঙুর। মাত্র দুদিন আগে কপিল খুন হয়েছে। সেই রক্ত ছবিটা আঙুরের চোখের সামনে কে যেন পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন আঙুরের চোখে এতটুকু কান্না ছিলো না। এতটুকু শিহরণও না। চুপচাপ শান্ত নির্বিকার। দুদিন আগেকার যেন ঘটনা নয়। যেন অনেক দূরে ফেলে আসা অতীতের কোন একটা অস্পষ্ট ছবি। চাঞ্চল্য, ব্যথা, বেদনা—সব কালের অতলে ধুয়ে গেছে। দুদিনের সামান্য ব্যবধানকে জোর করে পিছনে ঠেলে দিয়ে আর একটা দুশ্চিন্তা তার মাঝখানে এসে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলো। দুদিন, হিমশীতল বিষবাহী সাপের মতো আঙুরের সমস্ত চেতনার উপর দিয়ে যেন কিলবিল করে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। প্রতি মুহূর্তে শুধু দংশনের আশঙ্কা। কিন্তু সে ভয়টা কী ছিল শুধু তার নিজের জন্যে। না স্বামীর শেষ চিহ্নটুকু এই রক্ততাণ্ডবের ঘূর্ণী-স্রোতের ওপারে কোন নিশ্চিন্ত নিরাপদ উপকূলে নিয়ে যাবার একটা তীব্র ব্যাকুল কামনা। কারণ যাই হোক, সেদিন আঙুর শুধু পালিয়ে আসতে চেয়েছিল।

পটলী মাসির কথায় আচমকা হাত দুটো থেমে গিয়েছিল আঙুরের। চোখের সামনে টাঙানো ছবিটা একবার জীবন্ত হয়ে দুলে উঠেছিল। ঠিকই বলেছিল পটলী মাসি। আটদশটা গ্রামে কপিলের মতো অমন জোয়ান আর ছিল না। কাঁধের কাছটা কী অসম্ভব রকমের চওড়া। বুকের উপর যেন দুটো পাথর বসান। কি সাংঘাতিক জোর ছিল ওর গায়ে। আঙুরের এই ভারী দেহটা এক হাতে যেন পুতুলের মতো তুলে নিত।

খুব ভোরে, যাকে বলে কাক-সকাল—নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ত কপিল। ফিরত দুপুর গড়িয়ে গেলে। কোন কোন দিন আরো অনেক পরে। নির্দিষ্ট সময়

পার হয়ে গেলে চুপচাপ নদীর ধারে এসে দাঁড়াত আঙুর। বর্ষার আগুন-লাগা পদ্মা ঐ দূর আকাশটাকে পর্য্যন্ত ছুঁয়ে ফেলেছে। সশব্দে ছুটে চলেছে গৈরিক জলের ধারা—পাক খেয়ে খেয়ে, দুলে দুলে, দুষ্টু সর্ব্বনাশী মেয়ের মতো খল খল করে হেসে হেসে, কুটিকুটি হয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত আঙুর। মাছ ধরার নৌকোগুলো কালো বিন্দুর মতো ভাসতে ভাসতে আসছে। একে একে কূলে ভিড়ত তারা। মাছ ভর্ত্তি জাল কাঁধে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যেত। কিন্তু তাদের মধ্যে কপিল থাকত না। জানা শোনা কোন মানুষের দেখা পেলে উদ্বেগ ব্যাকুল চিত্তে আঙুর জিজ্ঞাসা করত—আমাদের ওনাকে দেখলে গা? নাতো—জবাব আসত। তারপর পদ্মার বুকের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জানাশোনা মানুষটি আবার বলত—ওর বড় লোভ। অল্পে তুষ্ট নয়। এ ভাল নয় বলেছিলাম। পদ্মার সঙ্গে চালাকি। বার বার বুকের উপর দিয়ে যাতায়াত—ও কখখনো সইবেনা। একদিন ঠিক ওই রাক্ষুসীর পেটে যাবে বলে দিচ্ছি—তখন দেখবে মজা। কপিল ফিরত সেই সন্ধ্যে বেলা ছাইরঙা আকাশে কাঁচ পোকার টিপের মতো ঝিকমিক করত সন্ধ্যাতারাটা। আত্মীয় স্বজনেরা ঠিকই বলত—বড় লোভ ছিল কপিলের। নৌকো ভর্ত্তি মাছ না ধরা পর্য্যন্ত ও যেন শান্তি পেত না। রাগে থমথমে মুখ নিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকত আঙুর। হাসিমুখে কপিল কাছে এসে দাঁড়াত—কী বউ, রাগ করলে নাকি? সারাদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রম, তবু এতটুকু ক্লান্ত দেখাত না কপিলকে। দিব্যি ভালা মানুষটি। দপদপ করে গলার কাছে মোটা একটা শির ওঠা-নামা করছে। বুকের বলিষ্ঠ পেশী দুটো আরো যেন ফুলে উঠেছে। ঘামে-ভেজা মুখখানার উপর সন্ধ্যা-তারার ঝিলিকটা জড়িয়ে গিয়ে বড় সুন্দর দেখাত ওকে। আচমকা একটা টান দিয়ে আঙুরকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে কপিল হাসত মানিনী আমার মান করেছে।—থাক, অত সোহাগে কাজ নেই। মুখটা ঘুরিয়ে নিত আঙুর। তারপর সেই আত্মার মানুষটির কথাটাই পুনরাবৃত্তি করত—অত লোভ ভাল নয়। ঐ সর্ব্বনাশীর পেটে একদিন যাবে তুমি। অভিমানী আঙুরের চোখ দিয়ে টপটপ করে জলের ধারা নামত। কথাটা বলে ফেলেই চমকে উঠত আঙুর। ছিঃ ছিঃ! একি কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। পদ্মার দিকে চেয়ে মনে মনে ঘাট মানত সে। এমনটি যেন কোন দিন হয়না ঠাকুর। তোমার অবোধ সন্তানকে ক্ষমা কোরো। আঙুরের কথা শেষ হবার আগেই হো হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠত কপিল। ওই সর্ব্বনাশীর কাম না কপিল মিয়া পেটে পোরে। একটা কেন ওই রকম দশটা পদ্মারে আমি ডরাই না। তারপর আঙুরের হাত ধরে একটা টান দিয়ে বলত—বাড়ী চল বউ। খিধেয় পেট জ্বলছে'।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে আঙুর বলত—কাজ কী বাপু আমাদের অত পয়সায়। দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে তো চলে যাচ্ছে।' অত টাকায় কী হবে? ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে পড়ত কপিল।—বলিস কী বউ? তারপর আঙুরের সর্ব্বাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গলার স্বরটা একটু নামিয়ে দিত কপিল—দুদিন পরে ব্যাটা আসছে। টাকা না জমালে চলবে কেন? ওকে আমি পদ্মায় মাছ ধরতে দেবোনা। ও লেখাপড়া শিখে স্টীমারের বাবুদের মতো আপিসে বসে কাজ করবে। লজ্জায় মুখে কাপড় চাপা দিত আঙুর।—এ লাজের কথা নয়। একটু থেমে কপিল আবার বলত—আর একটা কথা তোকে বলে দিলুম আঙুর, ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হয়, তখন তোর একদিন, কী আমার একদিন। ওকে কুচিয়ে ওই পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবো। স্বামীর কথায় এবার খিলখিল করে হেসে উঠত আঙুর। আগে মেয়ে হোক, তখন দেখবো কেমন করে কাটো।

সেই মানুষটাকে পদ্মা গিলে নেয়নি। গিলে নিলে সামান্য একটা মানুষে। তাও মানুষের মতো মানুষ হলে বুঝতো আঙুর। তা না ঐ খোঁড়া বেঁটে রহিম শেখটা চুপি চুপি পিছন থেকে এসে পেটে ছুরি বসিয়ে দিলে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার চেয়ে বেশি প্রাণময় একটা চঞ্চল জীবন চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।

একটা আচমকা শব্দে চমক ভেঙে গিয়েছিল আঙুরের। দিগন্তের গায়ে রক্তের মতো আগুনের শিখাগুলি দাউদাউ করে জ্বলছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বুকফাটা একটা করুণ চীৎকার ছাড়িয়ে পড়ছে। বুঝতে পেরেছিল আঙুর, সাউদের বাড়ী লুট করছে ওরা। ছেলেকে কোলে তুলে

নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। তাহলে আসি পটলী মাসি। ওগো মা। চোখের জল মুছতে মুছতে পটলী মাসি বলেছিল—ভয় নেই তোর। যেমনি ঘর রেখে যাচ্ছিস তেমনি থাকবে। এতটুকু এদিক ওদিক হবেনা। দাদা পামলে তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু। শেষ পর্যন্ত পটলী মাসিরাও থাকতে পারেনি। সেদিন এসেছে ওরা। এই কবছরে কী ভীষণ অথর্ব হয়ে গেছে হরিপদ মেসো। শনের মতো সাদা চুল। শুকনো তোবড়ানো গাল। গর্তে ঢোকা চোখ। অমন সোজা শক্ত সমর্থ মানুষটা বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে গেছে। পটলী মাসির বা কী হাল হয়েছে। ষ্টেশনে নেমে কেমন অসহায়ের মতো চাইতে চাইতে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল আশুর। ডাকতে সাহস হয়নি তার। কি জানি, ওরা যদি তার কাছে একটু আশ্রয় চেয়ে বসে। আশ্রয় দেবার মতো জায়গা থাকলে আর কাউকে না দিক, ওদের নিশ্চয়ই দিত আশুর। কিন্তু জায়গা কোথায়। সমস্ত ষ্টেশনটা গিজগিজ করছে লোক। আর তিল ধরণের স্থান নেই। থাকবে কোথা থেকে। পঙ্গপালের মতো সব দলেদলে আসছে। এই এক মাসের মধ্যে সমস্ত স্টেশনটা ভরে গেছে। তারপর বাহিরের ফাঁকা মাঠ। ফুটপাত। পয়ার জলের মতো সব থৈথৈ করছে। একটু উঠে বাহিরে পর্য্যন্ত যেতে ভয় করে আশুরের। কিজানি সেই সুযোগে কেউ যদি এসে দখল করে নেয় তার জায়গাটা।

আশুর একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল। তার ঠিক পাশে বিপিন পোটো ভাঙ্গা টিনের বাকসটা ঠেসান দিয়ে বসে আছে। দুটো ছানি-পড়া চোখ মরা ইলিসের মতো দেখাচ্ছে। সামনে একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা। তার উপর একটা ময়লা পুঁটলি। একটা বেতের চাঙড়ীতে টুকিটাকি গৃহস্থালীর জিনিষ পত্তর। কোনের দিকে একটা গড়গড়া বসান। লম্বা নলটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে মাদুরের উপর পড়ে আছে। মাঝে মাঝে অনমনস্ক হয়ে বিপিন নলটা টেনে মুখে দেয়। হাসি পায় আশুরের। কোন রকমে মুখে কাপড় দিয়ে হাসি থামিয়ে বলে—উকী করছো কাকা। তোমার হুকোয় কী আর তামাক আছে। টানছ যে। তাড়াতাড়ি নলটা ফেলে বিপিন গুছিতের মতো বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর পাকা দাড়ি-ভর্ত্তি শুকনো গালে একটা বিবর্ণ হাসি ফুটিয়ে বলে অনেক দিনের অভ্যেস কিনা মা, মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিপিন আবার বলে—বড় মনের জিনিষ মা এটা। সেই বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়ে কিনে এনেছিলেম এটা। মূর্ত্তি গড়ার সময় এটা না হ'লে কাজে কিছুতেই মন বসতো না।

আশুর ব্যথিত স্বরে বলে—'তামাকে বলতে পারো না কাকা। দু পয়সার তামাক এনে দেবে'।—আর তামাক মা, ওর কাপড়টার কী অবস্থা হয়েছে তাই কিনতে পারে না। আর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিপিনের। আজ মহালয়া, না মা আশুর।' 'কি জানি কাকা, এখানে এসে দিনক্ষণ মাস—সব কিছুর হিসেব গুলিয়ে গেছে।' বিপিনের বিবর্ণ মুখে আবার একটু হাসি ফুটে ওঠে—আমার কিন্তু ঠিক হিসেব আছে। এই মহালয়ার দিন চৌধুরীদের প্রতিমার চক্ষুদান করতে হোত। একেবারে কড়া নিয়ম। একটু নড়চড় হবার যো ছিলনা। একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করে বিপিন—এখানে পুজো হয়না—না আশুর। আশুর জবাব দেয়, সেকী কাকা। এর মধ্যে সব ভুলে গেলে। আর বছরে বিজয়ার দিন কত ঠাকুর এখান দিয়ে গাড়ী করে নিয়ে গেল'।—হাঁ হাঁ মনে পড়ছে—মাথা নাড়ে বিপিন। তারপর বলে—কিন্তু যতই পুজো হোক, সানাই না বাজলে পুজোর মানেই হয় না। চৌধুরীদের বাড়ীতে একমাস আগে থাকতে মহৎসব বসতো। রোজ ভোরে ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সানাইয়ের শব্দ কানে আসতো। কৈলাস থেকে উমা আসছে। সে কি যা তা একটা ব্যাপার। মানুষের মতো আচমকা এসে পড়লেই হোল। সে হোল আগমনী। সানাইয়ের শব্দের সঙ্গে তার পায়ের শব্দ বুকের মধ্যে না বাজলে—পুজোর অঙ্গহানি হয়। এখানে সব উল্টো। ভাঙ্গা ক্যানাস্তারার মতো মাইক না কি ছাই একটা বাজায়।' বিপিন কথা শেষ করে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। আশুরের মনে হয় চৌধুরী বাড়ীর সেই সানাইয়ের মিষ্টি শব্দটা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছে বিপিন কাকা।

আঙুর চেয়ে দেখল—বিপিন কাকা প্রতিদিনকার মতো গুড়গুড়ির নলটা হাতে নিয়ে বসে আছে।

বিপিনের ঠিক পাশে একটা ময়লা বিছানার উপর শুয়ে আছে প্রকাশ। সনাতন ভট্টাচার্যির নাতি। দুটো পাশ দিয়ে তিনটে পাশের পড়া পড়ছিল। এমন সময় দাদা বেঁধে উঠল। প্রকাশের বাবা মরল। বোনটাকে ধরে নিয়ে গেল। বুড়ি মাকে সঙ্গে নিয়ে আঙুরের সঙ্গেই পালিয়ে এসেছে প্রকাশ।

প্রকাশের পায়ের কাছে নীত পাওয়া কুকুরের মতো একেবারে গুটিয়ে এতটুকু পুটলি হয়ে বুড়িটা ঘুমুচ্ছে।

এখানে আসার পর একটা চাকরীর জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল প্রকাশ। কিন্তু জোটেনি। রোগ ধরেছে ওর। শরীরটা দিনের পর দিন শুকিয়ে আসছে। অমন ফর্সা রংটার উপর কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। দিনরাত খুক খুক করে কাশে। জ্বর হয় মাঝে মাঝে। আঙুর দেখল—প্রকাশ প্রতিদিনকার মতো শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। বইটা চোখে পড়তেই আর আচমকা জ্বলে উঠল আঙুর। গলার স্বরটা একটু চড়িয়ে দিয়ে নিজেকেই যেন উদ্দেশ করে আঙুর-বয়ে—আ মরণ, সখ দেখে আর বাঁচি না। পেটের ভাত জোটে না—বই পড়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবার স্বপ্ন। লাথি মারো অমন পড়ার মুখে।

বইটা মুড়ে এক পাশে রেখে দিয়ে প্রকাশ আঙুরের দিকে চায়।—আমায় কিছু বলছো বৌঠান।

—হাঁ বলছি, একশো বার বলছি। পুড়িয়ে দাও এ বইগুলোকে, বেঁটিয়ে ফেলে দাও। কি হবে পড়ে শুনি। আমাদের কর্তা বলতো—ছেলেকে মাছ ধরতে দেবো না। লেখাপড়া শেখাবো। কৈ তুমি শিখেছো—একটা নয়, দু'দুটো পাশ। ম্যাজিস্ট্রেট হলে? না, হিসাবের বাবুদের মতো চাকরী জুটলো?

উত্তর না দিয়ে প্রকাশ ব্যথিত চোখে কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে থাকে। টানা বারান্দের খোলা, কলার খোসা ছেঁড়া কাগজে ডাষ্টবিনের মতো চারিদিক নোংরা আর দুর্গন্ধময়। একটা ছোট ছেলে সামনে বমি করেছে। একঝাঁক মাছি জায়গা কালো করে রেখেছে। চোখ বন্ধ করল প্রকাশ। আবার জ্বর আসছে। জ্বরের প্রথম দিকটা বড় কষ্ট হয়। মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা যেন কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে থাকে। সমস্ত শরীরটা ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু জ্বরটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সমস্ত শরীরটা যেন আস্তে আস্তে হাল্কা হয়ে উঠছে। আর ব্যথাতেই যন্ত্রণা নেই। নেশার মতো কেমন একটা আচ্ছন্নতা এসে সব কিছু ঝাপসা করে দেয়। একটু পরে আর কিছু দেখা যায় না। ষ্টেশনভর্তি লোকজন, ট্রেনের হুইসিল, ছোট ছেলের কান্না কিছু কানে আসে না। একটা গাঢ় নীল অন্ধকারের মধ্যে কেমন আস্তে আস্তে তলিয়ে যাওয়া। ছেঁড়া কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে পাশ ফিরল প্রকাশ।

প্রকাশের ঠিক ওপাশে হরিমতীর আস্তানা। বাল-বিধবা। সংসারে কেউ ছিল না। ঘুড়ি ভেজে দোকানে দোকানে বিক্রী করত। একটা মানুষের দিব্যি চলে যেত। বড় পাখীর সখ ছিল হরিমতীর। ঘরভর্তি পাখী। সে এক দেখার জিনিষ। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত, ছেলে পুলে তো ভগবান দিলে না। ওরাই আমার সব ছেলে মেয়ে। একলা বাড়ীতে থাকি। কথা বলার জন্যেও তো একটা মানুষের দরকার। ওরাই আমার সে অভাব পূরণ করেছে। মিথ্যে বলত না হরিমতী। চমৎকার বুলি বলত ওর পাখীর দল। আসবার দিন খাঁচা খুলে সব উড়িয়ে দিয়েছে। কেবল একটা চন্দনার মায়া ছাড়তে পারেনি। হরিমতী বলত—জানো ওটা আমার কর্তা। একটু খাবার দিতে দেরী হলে কী ধমকানি রে বাবা। উনি আবার খাতা জিনিষ মুখে দেন না। ফল, না হয় ছানার জিনিষ। না পেলে উপোষ দিয়ে থাকবে সারাদিন।

আঙুর দেখল খাঁচার বাটিতে একটু বাসি খিঁচুড়ি রয়েছে। হরিমতীর পাখাটা ভ্রষ্ট মনে তাই ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

হরিমতীর ডান পাশে নদী যুদ্ধির জিনিষপত্তর এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। শতছিন্ন মাদুরটার উপর হাত পা ছুঁড়ে একটা ছেলে তারস্বরে চীৎকার করছে। বিরক্ত মুখে আঙুর এদিক ওদিক তাকাল। যুদ্ধিং অপিসের কোনের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে যশোদা। নদী যুদ্ধির যোড়শক্ষের স্ত্রী। সরু সরু হাত পা। কিন্তু পেটটা ধামার মতো উঁচু। আঙুর অনেক দিন আগেই জানতে পেরেছে যশোদার

আবার বাচ্চা হবে। বশোদার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আচমকা জ্বলে উঠল আঙুর। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়েছে ওটা। পেটে ভাত নেই, অথচ সখ আছে ধোলো আনা। গলার স্বরটা চড়িয়ে দিল আঙুর—এ্যাই বশোদা, কানে কালা হইছিস্ নাকি? ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে মরলো।

মরুক, মরুক—পেতনীর মতো বিশ্রী ভাবে দাঁত খিঁচল বশোদা।—মরলে নিঃশেষ ফেলে বাঁচি। হাড়ে বাতাস লাগে আমার। যত সব আপদ এসে জুটেছে। ছোট একটা ঠোঙা থেকে চীনাবাদাম খেতে খেতে বশোদা ষ্টেশনের কোনের দিকে চলে গেল।

আঙুর বুঝতে পারল বাচ্চাটা পেটে আসার পর থেকে বড় লোভ হয়েছে বশোদার। ছেলেটাকে চীনাবাদামের ভাগ দিতে হবে বলে অমন লুকিয়ে লুকিয়ে খেড়াচ্ছে।

বুকিং অপিসের ঠিক সামনে নূতন একটা মাদুরপাতা। টিনের একটা রংচঙে সুটকেশ। এ্যালুমিনিয়ম আর কলাইয়ের খান কয়েক ঝকঝকে বাসনপত্তর। দড়িতে একটা রঙিণ সাড়ি মেলে দেওয়া। চারিদিকে এই আবর্জনা স্তূপের মাঝখানে পদ্মের মতো একটা মধুর সুষমা নিয়ে যেন ফুটে রয়েছে সতীদের এই ছোট সংসারটুকু। সামনে পথের ধারে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সর উপর কয়েক প্যাকেট সিগারেট, দু এক বাণ্ডিল বিড়ি। সাজা পান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিহি গলায় যাত্রীদের অনুরোধ করছে সতী। নিয়ে যান বাবুরা, ভাল পান, বিড়ি, সিগারেট। সতেরো আঠারো বছরের মেয়ের কাঁচা মুখের টলটলে লিভতাটুকু দু'একজন খদ্দেরকে টেনে আনে বৈকি।

কিন্তু আঙুর জানে সতীদের সংসারের এই লক্ষ্মীশ্রীটুকু কেবল ঐ একফোঁটা সিগারেটের দোকানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। সন্ধ্যা বেলায় সতী দোকানে বসে না। ছোট বোনটার হাতে দোকানটা ছেড়ে দিয়ে স্টেশনের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। চুলটা খোঁপা করে বাঁধা। কালো মুখটাকে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ঘসে ঘসে চকচকে করে তোলে। ঐ লাল সাড়ীটা, চার আনা দামের পাখর বসান ইয়ারিংএ সতীকে এই স্টেশনের বাসিন্দা বলে মনে হয় না। বড় হল ঘরের মতো পার্শেল রুমটার ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দু'একজন বাবুর সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখেছে আঙুর। এই নিয়ে দু'একদিন আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু এখন সব চুপ হয়ে গেছে। বড় ভাল সতী। লোকের দায়-অদায়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। সাধ্য মত সাহায্য করে। প্রকাশের উপর ওর টানটা সব চেয়ে বেশি। নিত্য নৈমিত্তিক ফল এনে দেয়। কোন কোন দিন প্রকাশের জ্বরটা বেশি বেড়ে উঠলে সেদিন সন্ধ্যে বেলায় সতী আর বাইরে যায় না। সারারাত ওর মাথার কাছে বসে থাকে। আঙুর বুঝতে পারে প্রকাশকে ভালবাসে সতী। মাঝে মাঝে ওদের দিকে চেয়ে কষ্ট হয় আঙুরের।

সতীদের ঠিক পাশে মাহিন্দ কবরেজ। বয়েসটা ঘাটের কোঠায় হলে কী হবে—এখনও দিব্যি শক্ত মজবুত চেহারা। নূতন তামার পাতের মতো গায়ের রং। মাথার চুল দাড়ি এমন কী ভ্রুগুলি পর্য্যন্ত মেহেদী দিয়ে রাঙান। রাতদিন বসে বসে মোটা মোটা কবিরাজি বইগুলির পাতা ওল্টায়। আশে পাশে কারুর অসুখ বিসুখ হলে ছুটে যায়। বিদ্-ঘুটে যত সব রোগের নাম বলে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বলার পরই আচমকা ছুটে পালায়। জনবহুল প্ল্যাটফর্ম্মের কোন বেঞ্চিতে গিয়ে চুপ চাপ বসে পড়ে। তারপর ঠোঁট নেড়ে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় নিজের মনে মনে কী সব বলে। মাঝে মাঝে ট্রেণের যাত্রীদের দিকে চেয়ে মুখ ভেংচায়। লোকেরা হাসে। বলে সেই পাগলাটারে। ঠাট্টা করার জন্যে চেঁচিয়ে বলে—ও কবরেজ মশাই, বৃহৎ অষ্টাদিকচূর্ণ আছে? ক্ষেপে যায় মাহিন্দর। বলে তোর বাবার মাথা চূর্ণ আছে। অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার। বেঞ্চি ছেড়ে আবার নিজের বিছানায় এসে বসে মাহিন্দর। এক একদিন সোজা আঙুরের কাছে চলে আসে। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি বলে—জানলে কপিল-বউ, প্রকাশের বড় সাংঘাতিক রোগ। যক্ষা—ভাল চিকিৎসা না হলে বাঁচবে না। আঙুরের মুখটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়।

মাহিন্দর যেমনি আচমকা এসেছিল—তেমনি করেই চলে যায়। মাঝপথ থেকে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আবার ফিরে এসে আঙুরের পাশে অসহায় ভঙ্গিতে বসে পড়ে। তারপর জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করতে করতে বলে—খুব ভুল করেছি কপিল বউ, খুব ভুল করেছি। তখন যদি এই ছাই-পাশ বইগুলো না এনে যদি ওষুধ কিছু আনতুম, তাহলে চোখের উপর এতগুলি লোক মরতো?

আবার উঠে পড়ে মাহিন্দর। তারপর এক রকম প্রায় ছুটতে ছুটতে রাস্তার দিকে চলে যায়। আঙুর জানে মাহিন্দর যায় কোথায়। সামনে রাস্তার মোড়ে মস্তবড় একটা কবিরাজী দোকান। শিশি ভর্ত্তি সব ওষুধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আঙুর চেয়ে দেখল মাহিন্দর কবিরাজের বিছানাটা খালি। এইটুকু হোল ওর চেনা চৌহদ্দি।

এর পরে আরও কত রয়েছে। তাদের সঙ্গে পরিচয় নেই। আঙুরেরা বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর, চাটগাঁ, নোয়াখালি—সমস্ত পূর্ব-পাকিস্থান থেকে যেন ঝেঁটিয়ে এসেছে ওরা। নৌকো ভর্ত্তি গুড়ের কলসীর মতো গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করে জড়ো হয়ে রয়েছে। একটা বড় আশ্চর্য্য লাগে আঙুরের। সবাই তাদের মতো ছেলে নয়। বামুন কায়েত হাঁড়ি নমশুদ্র সবাই মিলে যেন পুরীর শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আঙুরের চোখ পড়ল—বলাই ছুটতে ছুটতে এই-দিকে আসছে। উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে আঙুর জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে রে বলাই?

—আমাদের সেই মগটা কোথায়। দাও তো মা শিগ্‌গির। আহা তাড়াতাড়ি, সব ফুরিয়ে গেল।

মগ কী হবে—এই বলাই, এই যাস কোথায়?

বিছানার কোণের দিকে মগটা পড়েছিল। আঙুরের কথার উত্তর না দিয়ে সেটা হাতে নিয়ে বলাই এক ছুটে বেরিয়ে গেল। আঙুর বলাইয়ের অপসৃয়-মান মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। তেলচিটচিটে প্যাণ্টটার পিছনের দিক ছিঁড়ে অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। মাথার চুল বড় হয়ে লতিয়ে ঘাড়ের কাছে নেমেছে। শীর্ণ দুর্বল চেহারা। পাঁজরার হাড়গুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখে জল এসে গেল আঙুরের। কত আদরের ছেলে। কপিল চেয়েছিল লেখাপড়া শিখবে। ভদ্রলোকের মতো হবে। কিন্তু কী হোল। ভদ্রলোকের মতো হওয়া দূরের কথা—একটা মানুষের ছেলে বলে বোধ হয় না। খেঁকি কুকুরের সমান হয়ে গেছে। পেটের জ্বালায় ষ্টেশনের এদিক ওদিক পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে উদ্গত কান্নাকে রোধ করে আঙুর।

একটু পরে বলাই আবার ফিরে এল। উত্তেজনাহীন করুণ মুখখানা নিয়ে। একটু আগে কেঁদেছিল বোঝা যায়। একটা শুকনো জলের ধারা চোখের কোণে এখনও চিকচিক করছে।

শান্ত গলায় আঙুর জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে রে?

শূন্য মগটা দশব্দে সিমেন্টের মেঝের উপর ফেলে দিয়ে মার কোলের কাছে বসে পড়ল বলাই। তারপর কান্না-জড়ানো গলায় ফুঁপিয়ে উঠল। শালারা ছোটলোক। এত করে বললুম মার অসুখ। উঠতে পারে না। দুধ না খেলে বাঁচবে না। একটু দুধ দাও। তোমাদের গায়ে পড়ছি। তবু দিলে না। বলাইয়ের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আঙুর ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—কী বোকারে তুই বলাই। তোকে দুধ দেবে কেন? দুধ শুধু ঐ পোলাপানদের জন্যে দেয়।

—তাও বলেছিলুম। বললুম—আমার ছোট ভাইটার ভীষণ অসুখ। বিছানা থেকে তুললে মরে যাবে। ওর জন্যে একটু দাও। তাও দিলে না।

আঙুর শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে শুকনো গলায় বললে—কেন মিথ্যে বলতে গেলি বলাই। মিথ্যে কথা বলা ভীষণ পাপ।

—পাপ না ছাই। খেঁকিয়ে উঠল বলাই। ওই যে রাও মোড়ল—মাহুদির পোলাটাকে দেখিয়ে এক মগ দুধ নিয়ে এল।

নিজে খাবে বলে আঙুর দু-পয়সার চানাচুর কিনে ছিল। আঁচল খুলে বলাইএর হাতে দিলে—এই নে খা। চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে বলাই নির্লিপ্তের মতো বসে রইল। পেটে অত ক্ষিদে, অথচ চানাচুর খাবার মতো তার উৎসাহ দেখা গেল না।

মার মুখের দিকে চেয়ে বলাই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল—দুধ খেতে খুব ভাল, না? খেলে খুব মোটা হয়। গায়ে জোরও হয় খুউব—না মা। একটু থেমে বলাই আবার বললে—দেখোনা কী রকম রোগা হয়ে গেছি আমি।

বুকের ভিতরটা লোহা কী শীসে দিয়ে তৈরী হলে এতক্ষণ ফেটে যেত আঙুরের। মাংসের বলে রবারে

ফুঁ দেওয়া বেলুনের মতো ফুলে উঠে আবার চুপসে গেল।

শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করল—আঙুর দুধ খেতে তুই বড় ভাল বাসিস, না বলাই।

খুউব—বলাই ঘাড় নাড়ল সজোরে।

দাঁড়া দেশে ফিরে যাই। আমাদের সেই কালো গরুটা বালতি ভর্তি দুধ দেয়। দেখবো তখন কত দুধ খেতে পারিস তুই।

দেশে কবে যাবে মা—বলাই মাকে সজোরে জড়িয়ে ধরল।

দুদিন সবুর কর। সব মিটে যাক। তারপর ট্রেণে চেপে আমরা সব ফিরে যাবো। প্রকাশ সতী সবাই যাবে। আমরা কেউ আর এখানে থাকবো না। মাষ্টারবাবুরা ইষ্টিশনে বসে বসে দিন রাত শুধু মাছি তাড়াবে। হি হি করে হাসতে সুরু করে দেয় আঙুর। হাসি থামলে আবার বলে—উঃ কতদিন যে পদ্মা দেখিনি। কথাটা শেষ হবার আগেই আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আঙুরের। ঝড়ে ঐ পদ্মার বুকে কত মানুষ ডুবত রে বলাই। তখন তুই এতটুকু। দোলায় শুয়ে শুয়ে শুধু ঘুমুতিস। আর জেগে উঠলে ট্যাট্যা করে কাঁদতিস।

যাও মিথ্যে কথা। বলাই তার লজ্জিত মুখটা সজোরে মার কোলের ভিতর চেপে ধরে।

ছেলের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আঙুর বললে—তুই জানতিসনা রে বলাই। জল ঝড়ের রাতে ঐ সর্বনাশী পদ্মা কত মানুষকে গিলে খেতো। দিন-রাত্তির ভয়ে বুক কাঁপতো। ভাবতুম ওই সর্বনাশীর মুখ আর কোনদিন দেখবো না—না হয় দেব দুটো মুখের ভাত, পরণের কাপড়। কিন্তু তাই বলে এমন শয়তানি। বাঁধা ঘর এমনি করে ভেঙে দেওয়া। কতদিন তোর বাপকে বলতুম পালিয়ে চল এখান থেকে। সংসারের সামনে থেকে কাজ নেই। কোন দিন তোমারে গিলবে। তুমি না থাকলে এ সংসারের দরকার কী। তুমি তো রাতের বেলায় বাজারে যাও। কোন দিন এসে দেখবে আমি নেই। বলাই নেই। সর্বনাশি আমাদের সব গিলে নেছে। তোর বাবা শুধু হাসতো।

আঙুরের মুখের ভাব আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়। চোয়ালের হাড় দুটো কঠিন হয়ে উঠল। যেন বলাইকে ও কোন কথা বলছে না। বলাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্য কাউকে কথাগুলি বলছে। পদ্মার আর কটা মানুষ খায়। দাদার আর কটা মানুষ মরেছে। এই ইট-পাথরের দেশ। এই ইষ্টিশন, এই প্ল্যাটফর্ম—তার চেয়ে আরো বেশি খায়। রোজ খাচ্ছে। আরো খাবে বলে যেন হা করে আছে।

একটু থেমে এবার পরিষ্কার-তরল কণ্ঠস্বরে বলাইকে জিজ্ঞাসা করে আঙুর। তোর বাপের মতো মাছ ধরতে পারবিতো বলাই।

খুউব—বলাই আনন্দে আটখানা হয়ে ঘাড় নাড়ল। মাছ ধরবো। নৌকো বাইবো। সাঁতার কাটবো। কী মজা। মার কোল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল বলাই। তারপর দিব্যি খুশী মনে চানাচুর চিবুতে চিবুতে প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে সুরু করল।

শীর্ণকায় কালো আর একটা ছেলের সামনা-সামনি হয়ে গেল বলাই। পন্টু বললে—চানাচুর কোথায় পেলিরে বলাই। ওই ওখানে বাবুরা দিচ্ছে যা না। তারপর খিল খিল করে বলাই হেসে উঠল।

চানাচুর যে বাবুরা দেয়না তা পন্টু জানে। বলাইয়ের মুখের দিকে লোভীর মত কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বললে—দিবি দুটো।

এ্যাই লে, প্যাকেটটা বলাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল বলাই। কিন্তু পন্টু হাত বাড়াতেই বলাই বুড়ো আঙুলটা ওর দিকে উঁচু করে ধরে এক লাফে ওদিকে সরে গেল। পন্টু কাঁদোকাঁদো মুখে বলাইয়ের এই রসিকতাটুকু হজম করতে লাগল।

বলাই ওর ময়লা দাঁতগুলি বের করে হিহি করে হাসতে লাগল। হঠাৎ কী মনে হল কে জানে। কাছে সরে এসে পন্টুর কাঁধের উপর হাত রেখে বললে—খাবিনে। প্যাকেটটা প্রায় শূন্য করে পন্টুর হাতে ঢেলে দিল।

পন্টু মুখ নাড়তে নাড়তে বলল—বেশ ভাল তো। দিব্যি মুচমুচে।

ভাল না ছাই। ও খেলে গায়ে জোর হয় না। কিছু হয় না। চল ওদিকে—বলাই পন্টুর হাত ধরে টান দিলে। ভীড়ের মধ্যে দিয়ে গলাগলি করে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বলাই বললে—দুধ খেলে গায়ে খুব জোর হয় জানিস পন্টু।

বিজ্ঞের মত ঘাড় দুলিয়ে আঙুরের কথাগুলি যেন পুনরাবৃত্তি করলে পল্টু—দুধ, দুধ ঐ পোদ্দারপানরা খায়। তোর হয় মাছ খেলে।

—ধ্যাৎ তুই কিচ্ছু জানিস না। পল্টুকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বলাই। ঐ হোটেলে দেখেছিস পাঞ্জাবীরা সব দুধ খায়। গেলাস ভর্ত্তি দুধ। সেই জন্যে ওদের চেহারা ঐ রকম।'

বলাই এইমাত্র চানাচুর দিয়েছে। ওর সঙ্গে আর বেশি তর্ক করতেও সাহস হল না পল্টুর। বলাইয়ের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে হাঁটতে বলল—দুধ খেলে গায়ে জোর হয়, কিন্তু মাছ খেতে খুবই ভালো। বেশ কেমন গন্ধ। ভাজা ইলিশ মাছ দিয়ে এক হাঁড়ি ভাত খাওয়া যায়। বলাই কোন কথা না বলে অন্যমনস্কের মত অল্প একটু ঘাড় নাড়ে। তারপর বলল—রাণাঘাট লোক্যালটা এসে গেলরে পল্টু। তাড়াতাড়ি না গেলে শালারা সব টুপ-টাপ গলে পালাবে।

ট্রেণটা থেমেছে। প্ল্যাটফর্ম ভর্ত্তি লোকজন। ওরা দু'জনে ছুটতে ছুটতে এক কোণের দিকে দাঁড়াল। এই-খানে দু'একখানা রেলিং ভাঙ্গা। তার মধ্যে দিয়ে বিনা টিকিটের যাত্রীরা বেশিভাগ পালিয়ে যায়। বলাই জানে টিকিট কিনে যারা এসেছে তাদের কাছে গলা কাটিয়ে অনুরোধ করলে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদলেও হাত দিয়ে একটা পয়সা গলবে না। এখান দিয়ে যারা পালায় তাদের ভাল করে ধরতে পারলে দু একটা পয়সা মিলে যায়। দু একজন লোক ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে বলাই মুখটা কাঁদো কাঁদো করে, রগড়ে রগড়ে চোখে জল এনে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে বলে—একটা পয়সা দেন বাবু। পায়ে পড়ি আপনার। ছোট ভাইটার বড় অসুখ। দুধ না খেলে মরে যাবে। দয়া করে ছুঁড়ে দেন বাবু। ভগবান আপনার মঙ্গল করবে। দুধ কিনবো বাবু, দিয়ে যান। অনেক অনুরোধ করার পর কেউ পয়সা না দিলে বলাই একটু উগ্র হয়ে ওঠে। লোকটার পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে বিদ্রূপ করে—জাননা বাবু। রেলের টিকিট ফাঁকি দেওয়া পয়সা। রোগে খাবে, ডাক্তারে খাবে। হজম হবে না—এই বলে দিলুম।

লোকটা রেগে ফিরে দাঁড়াতেই বলাই ছুটে পালিয়ে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খিল খিল করে হাসে।—'শালা, তোর কোথাকার।' আবার নতুন যাত্রীর পিছু নেয় বলাই।

প্ল্যাটফর্মটা সব ফাঁকা হয়ে গেছে। এ পথ দিয়ে আসবার মতো আর একজনও চোখে পড়ছে না। বলাই পল্টুর কাছে এসে দাঁড়াল।—দেখি কত পেয়েছিস তুই। পল্টু হাতের পাতাটা মেলে ধরে।

—মোটে দু'পয়সা!

—তুই?

পকেটে হাত দিয়ে গোনে বলাই—চারটে। তারপর ফিরতে ফিরতে বলল—শালারা সব কিপটে হয়ে গেছে। দিতে চায় না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ষ্টেশনের বড় বড় আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। এখন আর ট্রেণ আসবে না। পথ সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে পারশেল রুমের পাশ দিয়ে অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন পথটা ধরে হাঁটা দিল ওরা। হঠাৎ পল্টু বলাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে উঠল—এই সতীদি রে। ভাঙ্গা-চোরা প্যাকিং বাক্স ছড়িয়ে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। সেই দিকে চাইতেই বলাইএর চোখ পড়ল। একটা ফর্সা জামা কাপড় পরা লোকের পিছন পিছন একটা মেয়ে যাচ্ছে। ওদিকটায় আলো নেই। ভাল করে দেখা যায় না। তবু বলাই বুঝতে পারল পল্টু ঠিকই ধরেছে। সতীর পরণে সেই নতুন লাল রংয়ের সাড়ীটা। বলাই জানে, সতী রোজ এমন ওর সন্ধ্যেবেলা এই পথ দিয়ে কোথায় যায়। পল্টুকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলাই সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে সতীর পিছনে দাঁড়াল। তারপর আচমকা একটা কান্নার ভেঙ্গে পড়ল—গরীবের মা বাপ আপনারা, দয়া করে দুটো পয়সা দিয়ে যান। মার বড় অসুখ। তিন দিন কিছু খাইনি বাবু। দিয়ে যান বাবু, দয়া করে দিন।

সেই ফর্সা জামা কাপড় পরা লোকটা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সতীর সঙ্গে বলাইয়ের মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখে চোখে কী যেন কথা হয়ে গেল। দ্রুতপদে লোকটার কাছে সরে গিয়ে নীচু গলায় সতী বললে—দু আনা পয়সা দিয়ে দাও দিকিন। তা না'হলে আবার পিছন পিছন আসবে।

বিরক্ত মুখে লোকটা দু আনা বলাইয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে একটা ধমক দিয়ে উঠল—ভাগ এখান থেকে, সতীর চোখে অল্প একটু চাপা হাসির তরঙ্গ খেলে গেল।

প্যাকিং বাক্সর পিছন দিক দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ, লাইনের পাশে কুলিদের বস্তী পর্য্যন্ত নেমে গেছে। সতী লোকটার পিছন পিছন সেইদিকে চলতে সুরু করল।

উদ্‌গ্রীব পল্টু জিজ্ঞাসা করল—কত দিলেরে বলাই। বলাই হাসতে হাসতে ফেটে পড়ার উপক্রম।—শালারা এমনিতে এক পয়সা ঠেকায় না। সতীদি বললে—তাই একেবারে দু আনা। সতীদি বড় ভাল—নারে পল্টু। এবার শালা রোজ সন্ধ্যে বেলায় এখানে এসে দাঁড়াবো।

পল্টুকে এক আনা দিয়ে বলাই বললে—চল বড় রাস্তার দিকে যাই। তারপর পল্টুর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলাই আবার বললে—কাল ঠিক এখানে আসবো কিন্তু।

যদি ব্যাটারা না দেয়—পল্টু বলাইএর মুখের দিকে চাইল।

ক্ষেপেছিস তুই। ঠিক দেবে, দেখিস্। না দিলে পিছন পিছন যাবো। বলাই আবার ঠাট্টা করে হেসে উঠল। শালা দেবে না—শালার বাবা দেবে।

পল্টু কী একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—সতীদি রোজ কোথায় যায়রে বলাই।

—কি জানি।

—একদিন ওর পিছন পিছন গিয়ে দেখবি?

—আচ্ছা—বলাই ঘাড় নাড়ল!

বাজারের সামনে প্রচণ্ড ভীড়। পল্টু আর বলাই টিনের কৌটো নাড়তে নাড়তে এদিক ওদিক লোকের পিছনে ছোটাছুটি করছে। একটা পচা ঙ্গাসপাতি ফলের দোকান থেকে ফুটপাতের উপর ছুড়ে ফেলে দিতেই দুটো উপোষী হেংলা কুকুরের মতো দুজনে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু ঙ্গাসপাতিটা তার আগেই একটা চলতি মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে চ্যাপটা হয়ে গেছে। বলাই লোকটাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিল। পল্টু ক্ষুব্ধ মনে ঙ্গাসপাতিটার টুকরোগুলি হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগল। ভুর ভুর করে কেমন একটা মিষ্টি খোসবাই বেরুচ্ছে। জিব দিয়ে একটা টুকরো দু-একবার চাটল। পথের ধুলোবালি মুখের ভিতর কিচ কিচ করে উঠতেই পল্টু টুকরোগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—এই বলাই, হনুমানজীর ওখানে যাবি না?

বড় রাস্তার উপর গীর্জের সামনে হনুমান সীংজীর দোকান। প্রতি সন্ধ্যায় পঞ্চাশ জন ভিখারীকে একআনা করে দান করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন সীংজী। বলাই ঘাড় নাড়ল—তুই যা।

পল্টু চলে যেতে বলাই আস্তে আস্তে সরে এসে একটা পাঞ্জাবী হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। বিরাট বিরাট দৈত্যাকার শিখের দল টেবিল চেয়ারে বসে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। একবার সেইদিকে চাইল বলাই। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। দোকানের এক পাশে বিরাট একটা কড়া ভর্ত্তি দুধ উনুনের উপর বসান রয়েছে। উপরে সরের আস্তরণ জমেছে। বলাইয়ের দৃষ্টিটা সেই কড়ার সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেল। মদের ভাঁড় দেখলে মাতালের যেমন হয় তেমনি একটা অনুভূতি বোধ করতে লাগল বলাই। শিরায় শিরায় একটা দুরন্ত পিপাসা। কান্নার মতো অস্থির হয়ে বুক চাপড়ে মাথা খুঁড়ছে।

একটা ছেলে এসে এ্যালুমিনিয়মের একটা মগ কড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মগ ভর্ত্তি দুধ তুলে নিল। সামনে সারি সারি ঝকঝকে কাঁচের গেলাস। চিনি মেশান দুধ গ্লাস ভর্ত্তি করে ছেলেটি একটা শিখের হাতে তুলে দিলে। দুধের গেলাসটা চুমুক দিয়ে চলেছে শিখটা। ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাওয়া ওষুধের মতো ঐ সাদা দুধের নির্য্যাস দাড়ি গোপ আকীর্ণ মুখের ভিতর কেমন আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোটা মোটা শিরা-প্যাচানো শিখের গলাটার সঙ্গে বলাইয়ের গলাটা কেমন একটা অন্তর আকর্ষণে উঠানামা করতে সুরু করেছে।

খাওয়া শেষ হয়ে যেতে বয় শূন্য গ্লাসটা হাতে করে কলঘরের দিকে চলে গেল। বলাই আবার দুধের কড়ার দিকে চাইল। দুধারে ঘন সরের আস্তরণ মাঝখানের কেটে নেওয়া জায়গাটা থেকে টগবগ করে ফুটন্ত দুধ বড় বড় আবর্ত্ত রচনা করে নেচে চলেছে। তার আশে পাশে সাবানের বুদবুদের মতো আস্তে আস্তে সরের প্রলেপ পড়ছে। বলাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

ছেলেটা মগ নিয়ে খাবার কড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলাই একটা ভীতু দৃষ্টি নিয়ে এদিক ওদিক চাইল। তারপর সরে গিয়ে ফিসফিস করে ছেলেটিকে বললে—এই আমাকে চার পয়সার দুধ দিবি।

একটা আচমকা চীৎকারের সঙ্গে ছেলেটি উনুনের ধারে পড়ে থাকা লোহার বড় চিমটেটা তুলে নিল। বলাই এক লাফে দোকানের ভিতর থেকে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা ফিকে বেগুনি আলোয় সমস্ত স্টেশনটা যেন রূপকথার যাদুপুরীর মতো রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অন্ধকারে যা আত্মগোপন করে থাকে আলোর মাঝে হয় তার প্রকাশ। কিন্তু এ যেন ঠিক তার উল্টো। শীর্ণ কাঙ্ক আবর্জনার মতো শত শত মানুষের অপমান সংসার এই আলোতে প্রকাশ পাইনি। আলো নয় তো, যেন বেগুনী হালকা একটা সিল্কের আচ্ছাদন। শ্মশানের সব বীভৎসতা আড়াল দিয়ে রেখেছে।

দূরগামী একটা ট্রেণ ছাড়বে। দামী দামী মোটর আর ট্যাক্সিতে গিজগিজ করছে সামনের কম্পাউণ্ড। সুবেশ নরনারীর দল প্ল্যাটফর্মের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

দুঃখ মনে ফিরে আসছিল বলাই। একটা গানের শব্দ কানে আসতেই ওর পা দুটো স্থির হয়ে গেল। সেই বুড়ো বৈরাগীটা গান গাইছে।

"মন কাঁদেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা
আমার শান্তিরগেহ সুখের স্বপনরে
দরদী কে দিল ভাঙিয়া—"

এই মেল ট্রেণটা ছাড়ার ঠিক আগে বুকিং অফিসের পাশে ঐ বেঞ্চিটায় বসে পাগলা ভৈরব রোজই এই একই গানটা গায়। বোধ হয় মেল ট্রেণটা দেখলেই ওর দেশে যাবার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে উঠে।

বলাই দেখল—ভৈরব বুড়ো স্থির হয়ে চোখ বুজে গান গেয়ে চলেছে। মাথার উপর আলোটার সর্বাঙ্গ ঘিরে একরাশ আলো পোকা সোনালি জলের রেখার ঝিল ঝিল করছে।

গানটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু বলাই নয়, স্টেশনে শুয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষগুলির দেহে যেন একটা নতুন সঞ্জীবনীর ছোঁয়া এসে লেগেছে। বুড়ো বিশিন পোটো শূন্য গড়গড়ার নলটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চরকের বইটা কোথায় পড়ে রইল খেয়াল রইল না কবিরাজের। ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে চীনাবাদাম-খাওয়া ননীমুদির হেংলা বউটা পর্যন্ত তীর্থযাত্রীর মতো একটা শ্রদ্ধা বুকে নিয়ে ভৈরবের চারিদিকে এসে জমা হতে লাগল। এ গান কলকাতার নয়। এর ভাষাও বিজাতীয় নয়। এর মরমীয়া সুর ভেসে এসেছে অনেক দূর থেকে। কত দূর তা বোঝবার বুদ্ধি নেই কারুর। শুধু মনে হয় সে অনেক দূর। অনেক পথঘাট ঘরবাড়ী রেল লাইন পার হয়ে গেলে তবে তার দেখা মিলবে। লক্ষ লক্ষ মায়ের বুক-ভরা গভীর স্নেহ নিয়ে আছড়ে আছড়ে কাঁদছে পদ্মা। উদাহারা মেনকার মতো। বাউলের কণ্ঠে কণ্ঠে সে ডাক পাঠিয়েছে। ঘরে ফেরার আকুল আহ্বান। চোখের পাতাগুলি ভিজে ওঠে সকলের।

শুধু আসুর যায়নি। মাদুরের এক কোনে একটা পুটলী মাথায় দিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। মনের সব গ্লানি মুছে গেছে তার। নিয়নের আলো জ্বলা স্টেশনটাকে মনে হচ্ছে মস্তবড় একটা স্টীমারের মতো। দুঃখ রাতের শেষে সবাই মিলে যেন ফিরে চলেছে ঘরে-ফেরা ভাঁটার টানে। মনে হচ্ছে বাবুগঞ্জ যেন পার হয়ে গেছে। নারকেল সুপরি গাছের ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে তাদের সেই গ্রামটা। পদ্মার কোলের কাছে মাথা গুঁজে দুই মেয়ের মতো সে ঘুমিয়ে আছে।

ছুটতে ছুটতে বলাই এল।—মা আমাদের মগটা। বিছানার এক কোনে মগটা উপুড় হয়ে পড়েছিল। আসুর দুহাতে সেটা চেপে ধরল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলাই বললে—তাড়াতাড়ি দাও না মা।

কঠিন কণ্ঠে আসুর জবাব দিল—না। কী হবে বল আগে?

ওরা দুধ দিতে এসেছে। শীগ্‌গির দাও। এক্ষুণি ছুরিয়ে যাবে—ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বলাই।

—বোস এখানে বলছি। আসুর ধমকে উঠল। ওরা তোকে দুধ দেবে না।

—দেবে বলছি। চিলের মতো ছোঁ দিয়ে বলাই মগটা কেড়ে নিয়ে ছুট দিল।

প্রাটফর্মের কোণের দিকে দুধবাবুকে ঘিরে প্রচণ্ড ভীড় লেগে গেছে। বলাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে ওরা। শূন্য মগটা হাতে নিয়ে বলাই এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। দুধবাবুর চাপরাশি মগ ডুবিয়ে ডুবিয়ে দুধ দিচ্ছে। সেই দুধ যা হোটেলে বলাই দেখে এসেছে। টগবগ সব করে কেমন ফোটে। ঘনমোটা কাগজের মতো সরের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে মোটা মোটা সর্দারজীরা খায়। সকালে সাদনের গলিতে সেই বেঁটে কালো হিন্দুস্থানীটা প্রকাণ্ড একটা পাটনাই গাই নিয়ে আসে। মর্ত্তমান কলার মতো মোটা পুষ্টু বাঁট থেকে দুধের ঘন ধারায় বালতিটা কেমন ভরে ওঠে। তার পাশে জালতি দিয়ে মুখ-আটা কচি বাছুরটা সেই দুধের দিকে চেয়ে একটা অস্থিরতা নিয়ে ছটফট করে।

বলাই-এর চোখে জল এসে গেল। ঐ কচি বাছুরটার মতো তার মুখে কে যেন নির্দয় কঠিন হাতে একটা জালতি বেঁধে দিয়েছে। শুধু মুখটা নয়। তার শরীর। তার সমস্ত আত্মা। ছটফট করতে লাগল বলাই।

সতী দ্রুতপদে বলাই-এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বলাই ছুটে গিয়ে ওর হাতটা জড়িয়ে ধরল।—কিরে বলাই, কাঁদছিস কেন? জিজ্ঞাসা করল সতী।

তোমার সঙ্গে দুধবাবুর ভাব আছে, আমার জন্যে একটু বলে দেবে সতীদি। বেশি নয়, শুধু একটুখানি দুধ দেবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে সতী কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—প্রকাশদার জন্যে আমি যে দুধ নিতে যাচ্ছি। দেবে কী? আচ্ছা চল দেখি।

সতীর পরণে সেই নতুন শাড়ীটা। মুখে সস্তা স্নোর উপর হালকা পাউডার ছিটানো। কানে দুটো সাদা পাথর। কাজল পরা চোখ দুটোয় একটু ঝিলিক টেনে আনল সতী। তারপর মুখে একটা মোহিনী মাদকতা নিয়ে একবারে দুধবাবুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

শতছিন্ন বিছানার উপর রোদে বেঁকে যাওয়া কাঠের মতো বলাইয়ের দেহটা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে একদল মানুষের উদ্বেগ ব্যাকুল মুখ। মাথার কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আসুর। চোখে জল নেই। দুশ্চিন্তা নেই। পাথরের মতো মুখে কেমন একটা কঠিন নির্দয়তা।

ভীড় সরিয়ে মাহিন্দর কবিরাজ আস্তে আস্তে পাশে গিয়ে বসল। তারপর ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। না—চিনতে তার ভুল হয়নি। সেই পরিচিত লক্ষণগুলি বলাইয়ের সারা অঙ্গে কেমন পরে পরে সাজান। সূচনাতেই ধরতে পেরেছিল মাহিন্দর—ধনুষ্টঙ্কার। তারপর থেকে সারা রাত চোখে ঘুম আসেনি। চরকের সেই বইটা বুকে চেপে ধরে পাগলের মতো ছটফট করে ষ্টেশনের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে।

গালের এক পাশটা বেঁকে গেছে। চোখের তারা দুটো মরা মাছের মতো বিবর্ণ স্থির নিষ্কম্প। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যেন মরে গেছে। কিন্তু কান পেতে শুনলে এখনও শোনা যায় জীবনের ধীর মন্থর পদক্ষেপ। আস্তে আস্তে দূর থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছে। বলাইয়ের হাতটা ছেড়ে দিল মাহিন্দর।

হঠাৎ বলাইয়ের দুটো চোখে একটা চাঞ্চল্য যেন আস্তে আস্তে নড়ে উঠল। তারপর সমস্ত দেহে। ক্ষীণ দুর্বল অনেক দূর থেকে ডাকা মানুষের মতো একটা অস্পষ্ট স্বরে কথা বলে উঠল বলাই—মা।

আসুর দু-হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল—কিছু বলছিস বাবা। খিদে পেয়েছে, খাবি?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বলাই। তারপর অল্প বিবর্ণ একটা হাসির সঙ্গে ফিস ফিস করে বলতে লাগল—আমি দুধ খেয়েছি মা। সতীদি বলে দিয়েছিল। তাই এক ঘটি দুধ দিয়েছিল ঐ দুধবাবু। তোমার জন্যে নিয়ে আসছিলুম। পল্টুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে সব পড়ে গেল। হাসিটুকু মুছে গিয়ে বলাইয়ের চোখের কোণ দিয়ে একটা শীর্ণ জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দু'টো আবার আস্তে আস্তে নড়ে উঠল বলাইয়ের। একটা ডাবের খোলার মধ্যে শুধু একটুখানি পড়েছিল। ওটুকু আমি নিজেই খেয়েছি। আঃ, কী মিষ্টি!

আসুরের একটা অস্পষ্ট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল বলাই।

পাগলের মতো উঠে দাঁড়াল মাহিন্দর। চরকের বইতে এত নির্ভুল সমাধান লেখা রয়েছে, তবু কেন এই অপমৃত্যু। কেন মিথ্যে এই জীবনের অপচয়। বইটা সে সশব্দে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বস্তাগ্রস্ত প্রকাশ শুয়ে শুয়ে এ টেল অব টু সিটিজ বইটা পড়ছিল। অতিরঞ্জিত চোখের সামনে হরফগুলি ঝাপসা হয়ে গেল। প্যাটারসনের এই একটা মৃত্যু ফরাসী বিপ্লবের হাজার হাজার মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ অতি সাধারণ করে দিয়েছে। এমন সুন্দর পটভূমিকা। তবু কেন বিপ্লব আসছে না।

প্রকাশ। ঐ পাগলা কবিরাজ ষ্টেশনের সবাইকে সচকিত করে দিয়ে হঠাৎ ট্রেণের হুইসিলের মতো একটা তীব্র শব্দে ছড়িয়ে পড়ল। কঠিন দৃষ্টিতে আসুর প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। না এক্সপ্রেস নয়। লোক্যাল ট্রেণও নয়। একটা শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা কচিছেলের কান্না।

বুকিং অফিসের কোণের দিকে সতীর সেই লাল কাপড়টা দিয়ে ঘেরা হয়েছে। তার ভিতর ননীমুদির সেই পোয়াতি বউটা একটা নতুন বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।

পরিকল্পনা ও আমাদের দেশ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম্-এ

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হয়েছিল এই কারণে যে আমাদের বৈদেশিক অর্জিত মুদ্রার একটা বড় অংশ ব্যয়িত হত বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর জন্য। অতএব খাদ্যে যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সেই অংশটা শিল্পোন্নয়নে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। কৃষিপ্রধান প্রথম পরিকল্পনার রূপায়ণ কালে দেশে যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেখা দিল। সরকারী হিসাব মত পরিকল্পনার লক্ষ্যের চেয়েও শস্যোৎপাদন অধিকতর হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশনের আশানুযায়ী ফলন বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৭০ লক্ষ টন। সেই স্থলে বার্ষিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েও হয়েছিল ১ কোটি—১০ লক্ষ টন। এই ফলন বৃদ্ধি লক্ষ্য করে সরকারী মহল থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হল—পরবর্তীকালে সেই সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণিত হয়েছে বলেই অনেক মহল থেকে এলো সমালোচনা। প্রাকৃতিক অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশের ফলে হঠাৎ ফলনের সাফল্যকে সরকার ভুল করলেন প্রথম পরিকল্পনা রূপায়ণের সাফল্যের নিদর্শন বলে ধরে। তাই খাদ্য সম্পর্কে যে আত্মসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তার উপর প্রচণ্ড আঘাত এলো—দেশে পর পর বন্যা ও অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায়; অর্থাৎ প্রমাণিত হলো এখনও প্রাকৃতিক অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা মুখ্যতঃ খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার বা কম হওয়ার প্রধান কারণ, পরিকল্পনা—নয়। এই অভিযোগে পরিকল্পনার (বিভিন্ন দিকের) সমালোচনা এলো বিভিন্ন মহল থেকে। কোন কোন মহল মনে করলেন বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে যদি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হত তাহলে হয়ত বা পরিস্থিতি অন্যরূপ ধারণ করতো। বহুল-প্রচারিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র অমৃতবাজারপত্রিকাও সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছেন—সরকারী মহল থেকে নিরূপিত হল যে ভারতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসে গেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে বন্যা ও অনাবৃষ্টির ফলে সঙ্কট দেখা দেওয়ায় সরকারের নিকট লজ্জাকর ঘটনা প্রতিভাত হল। একথা অস্বীকার করার আর কোন উপায় নেই যে আমাদের দেশে কৃষি এখনও বহুলাংশে নির্ভরশীল—প্রকৃতির খামখেয়ালীর উপর। এখনও প্রকৃতিকে মানুষ বশে আনতে পারেনি। আমাদের পরিকল্পনা যদি আজকে ত্রুটিপূর্ণ না হতো, তাহলে এই নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমান সম্ভব হত। বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার উপর পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনাবৃষ্টি হেতু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সঙ্কট নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছে যে, ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার দ্বারা এর চেয়ে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যেত।

ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনায় গুরুত্ব না দেওয়ার ত্রুটি থেকে হয়ত বা প্রথম পরিকল্পনা মুক্ত ছিল না। (প্রসঙ্গত প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা মারফৎ ৭০ লক্ষ একর এবং ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা মারফৎ ১ কোটি একর জমিকে আবাদ যোগ্য করা হয়েছিল)। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মতানুসারে বৃহৎ সেচ ব্যবস্থার উপরে অতটা গুরুত্ব আরোপ না করে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার উপর অধিকতর গুরুত্ব-আরোপ হয়ত বা খাদ্যোৎপাদনে অধিকতর সহায়ক হতো। কিন্তু এর অপর একটা দিকও রয়েছে। খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তি শিল্পোন্নয়নে অপরিহার্য, অথচ আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই অনুভূতি থেকে এসেছে গুরুত্ব আরোপ বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার উপর—যাহাতে যুগপৎ জমির সেচ-ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়। একথা অনস্বীকার্য যে রাশিয়া আজ যে শিল্পোন্নতির শিখরে সমাসীন, তার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি অনেকখানি দায়ী। ১৯২০ সালে রাশিয়ার যুক্তিসংগ্রামের প্রধান সেনাপতি লেনিন এর নির্দেশক্রমে Mr. G. N. Kuchizhonovsky এর নেতৃত্বে প্রায় ৭০ জন বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের এক কমিশন গঠিত হয় রাশিয়াকে যথোচিত বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা রচনার

হয়। তদনুরূপ পরিকল্পনা রচনা করে তার বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে রাশিয়া যে বিরাট সাফল্য অর্জন করল নিম্নলিখিত ঘটনার দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় :

১৯২৮ সালে যেখানে শতকরা ৮৪টা কলকব্জা হস্ত-পরিচালিত হত, সেখানে ১৯৩৪ সালে শতকরা ৭৮টা বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্রের হল। (Industrial planning why + how. Chapter XII—Dr. N. Das) অবশ্য ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উপকরণাবলী রাশিয়ার মত অনুকূল নহে।

ভারতের পক্ষে অসুবিধা হ'ল যে—তার কয়লার সংস্থান একটি বা দুটি রাজ্যেই বিশেষিত এবং খনিজ তেলেও ভারত তদ্রূপ সমৃদ্ধিশালী নয়। কাজেই তাকে তার বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য নির্ভর করতে হবে জলের সম্পত্তির উপর।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম পরিকল্পনায় দামোদরের বাঁধ, ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ, হীরাকুঁদ বাঁধ ও হিরাকুঁদ বাঁধ প্রভৃতি বাঁধ পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে জাতীয় সরকার অগ্রণী হয়েছিল এই আশায় যে সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদ্বারা সম্ভব হবে প্রচুর পরিমাণে জলীয়-বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন এবং তাহা দ্বারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সস্তায় ও সুচারুরূপে বিদ্যুৎ শক্তির বণ্টন সম্ভব হবে। এই বিস্তৃত বিদ্যুৎবণ্টন ব্যবস্থা একটা মস্ত বড় উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে আমাদের অধুনালুপ্ত বা অর্ধমৃত গ্রামীণ ও কুটীর শিল্পগুলিতে। গ্রামে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে বিদ্যুৎশক্তি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ সম্ভব করবে নূতন জীবন গ্রামীণ ও কুটীর শিল্পকে আধুনিক-করণে সহায়তা করে। (বৈদ্যুতীকরণ কুটীরশিল্প ও গ্রামীণ শিল্পে কি করে নবজীবন এনে দেয় তার বিশদ আলোচনা আমরা প্রবন্ধান্তরে করবো।) তাছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তি শিল্প, ধাতু-নির্গলিত উৎপাদন (metallurgical Production) এবং অজৈব সার (Inorganic fertilisers) উৎপাদনের যথেষ্ট সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে Mr. Heinrich Rau-র [Vice Chairman of the council of ministers and minister for foreign trade and inner German Democratic Republic] বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, তিনি "Roll of German Democratic Republic in Europes Economy" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন—"The production of electric energy and coal indicates the economic strength of a country." অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তি ও কয়লা উৎপাদনের দ্বারা একটা দেশের অর্থনৈতিক শক্তির নির্দেশক। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনা করবারও অপর একটা দিক রয়েছে। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কটের অন্যতম কারণ অর্থাৎ প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় খাদ্যসমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার অনুসিদ্ধান্তরূপেই এই সংকট দেখা দিয়েছে। এছাড়া অবশ্য আভ্যন্তরিক বাজার দর পরিকল্পনা রচয়িতাদের হিসাবাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া, প্রতিরক্ষা প্রয়াসি,ক্রমের চাপ, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাঁচামাল আমদানী ইত্যাদিও আর্থিক সংকটের কারণ। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজনাল নেহেরু National development Council-এ ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে শিল্পোন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেছেন "The import of food grains year after year is really an impossible proposition." দেশকে খাদ্যে স্বাবলম্বী হ'তে হবে। বছরের পর বছর বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে থেকা চলতে পারে না। দেশের অগ্রগতি তা'হলে কোনমতেই সম্ভব হ'বে না। পরিকল্পনার বার্ষিক ৪৮ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানীর যে হিসাব করা হয়েছিল, তা প্রয়োজনানুরূপ ও হয়নি। ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যশস্য আমদানী খাতে ব্যয় অত্যন্ত দ্রুত ১০২ কোটি টাকাতে অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ গিয়ে দাঁড়ায়। যে পরিকল্পনা রূপায়ণ ব্যতীত জাতীয় জীবনযাত্রা উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা নাই সেই দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই বিষয়ে সুফল পেতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলম্বন আশু কর্তব্য :—

১। চাষীদের ভিতরে উন্নততর বীজ বণ্টনের ব্যবস্থা করা,

২। জমির উর্বরা শক্তির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সারের ব্যবস্থা করা।

৩। ভূমি সংস্কার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা। যদিও কোন কোন রাজ্যে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে, এমনকি জমির মালিকানার একটা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পরিমাণও নির্দিষ্ট হয়েছে—কিন্তু হয়নি কোন পরিকল্পিত জমিবণ্টনের ব্যবস্থা। জমিদারী উচ্ছেদ আইনের শুধু প্রচার দ্বারা ভূমি সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়, ভূমি সংস্কারের প্রথম এবং প্রধান কথা হল ভূমিহীন কৃষকসমূহের মধ্যে জমি বণ্টন করা; জোতসত্বের নিরাপত্তা বিধান এবং খাজনার চাপ কমানো। ভূমি সংস্কারের সামাজিক দিকের এই মূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে হবে।

৪। কৃষকদের ভিতর যৌথ বা সমবায় প্রথায় চাষ-আবাদ ব্যবস্থার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা। যৌথ বা সমবায় প্রথায় চাষ করে যে সকল দেশ আজকে কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে সেই সকল দেশের দৃষ্টান্ত তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। লেনিনের সেই অনবদ্য ও পথনির্দেশক রাশিয়ার কৃষি উন্নয়ন প্রসঙ্গে লেনিন যে কথা বলেছিলেন, আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থারও তা প্রযোজ্য। রাশিয়ার কাম্যনিষ্টরা মহাবতি লেনিন লেনিন বলেছিলেন,—

"There is no escape from poverty for the small farm." [Lenin Selected works, vol. III P. 195] অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে জমি চাষ করে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছেন,—"If we continue as of old on our small farms, even as free citizens on free land, we shall still be faced with inevitable ruin." [Lenin : Selected works vol. III. P. 370] অর্থাৎ পুরাতন প্রথামত বিচ্ছিন্নভাবে জমির চাষ করা হলে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হলেও আমরা আমাদের অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পাব না। আজকে

আমাদের দেশের চাষী-ভাইদেরও বোঝাতে হ'বে যে তাদের অভিযোগ দূর করার অন্যতম প্রধান উপায় যৌথ বা সমবায় প্রথায় চাষ আবাদের প্রবর্তন। অবশ্য আইন করে যদি আজকে যৌথ বা সমবায় প্রথায় চাষের প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে হ'বে ঘোরতর ভুলের ভুল। স্বভাবতঃই আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত চাষী ভাইরা তাদের জমির মালিকানাকে যৌথ বা সমবায় মালিকানায় রূপান্তরিত করতে প্রথম প্রথম কখনই উৎসাহ বোধ করবে না। এই প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন "...To attempt to introduce Common cultivation of land by decrees and legislation would be the height of folly: that an insignificant number of enlightened peasants might agree to this, but that the vast majority of Peasants had no such object in view." (Lenin: Selected works, vol. VI. P. 490) আইন করে যৌথ খামার প্রবর্তন করা শিশু শিক্ষার পরিচায়ক হবে, কারণ খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত চাষী হয়ত এতে রাজী হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকেরই যৌথ চাষের কোন ধারণাই নাই। সেখানে সরকারী তরফ থেকে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত কৃষকদের দ্বারা (তাদের সংখ্যা খুবই অল্প)। বিচ্ছিন্ন কিছু জমিতে যৌথপ্রথায় চাষ আবাদের ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বৃহৎ চাষী শ্রেণীর কাছে তার সুফল তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া তাদের বোঝাতে হ'বে যে যৌথ বা সমবায় প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করলে একজনের যে উন্নতন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়—তাহা সম্ভব হ'তে পারে। তাদের সামনে এমনি উদাহরণ স্থাপন করে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।..."To wait until as a result of their own experience and their own struggles, a progressive movement grow up." (Lenin selected works, vol. VI P. 490) রাশিয়ার যৌথখামার সাফল্যের মূলে যে লেনিনের এই মূল্যবান উপদেশ Stalin তাঁর অনুচ্ছেদে স্বীকার করে গেছেন, অক্টোবর বিপ্লবের রাজত বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, "The reason why the Party achieved this great victory on the front of collective farm-development is that it observed the tactical advice of Lenin to letter" অর্থাৎ যৌথ চাষ প্রবর্তনের জন্য লেনিনের বিভিন্ন উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্যই যৌথ খামারের সাফল্য সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করে যৌথ খামার বা সমবায় প্রথায় চাষে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

৫। চাষ আবাদের বৈজ্ঞানিক উন্নততর যন্ত্রপাতির ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। অবশ্য কৈবেশিক অর্জিত মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করে আপাততঃ এই পঞ্চম ব্যবস্থা মুলিত রাখা ছাড়া উপায় নাই এবং যখন আমাদের দেশের আর্থিক সঙ্গতির এই সব যন্ত্রপাতি তৈরী করা সম্ভব হবে তখন থেকেই তার প্রচলন করতে হ'বে। প্রথমতঃ আমাদের দেশের একর প্রতি ফলন অন্যান্য দেশের চাইতে অনেক কিছু।

নিম্নলিখিত তালিকা হ'তেই তা প্রতিভাত হবে :—

(১) একরপ্রতি গড় উৎপাদন (পাউণ্ডের হিসাব)

	চাউল	গম	তুলা
ভারত—	৯৬১	৫৮৩	৮০
পাকিস্থান—	১,২১৩	৬৩৩	১৮৪
বার্মা—	১,২৪০	—	—
চীন—	২,১৪৯	৮৭৪	১৪৩
জাপান—	৩,৩৩৩	১,৬৩৮	৪৮
ইন্দোনেশিয়া—	১,৯৪৪	—	—
ইজিপ্ট—	২,৩৩৩	১,৩৮০	৪২৮
যুক্তরাষ্ট্র—	২,৩১১	৯৪৯	২৭৪
রাশিয়া—	১,৯১৮	৮৩০	৬৮৫

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "The scope for increasing the area under cultivation is extremely limited." এই উক্তির যথার্থতাকে স্বীকার করে নিলেও (যদিও আমাদের দেশে যে জমি আবাদ হয় তার তুলনায় পতিতজমি ৭৭ ভাগ জমি আবাদযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে।) উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় আবাদী জমির বৃদ্ধি সাধন ব্যতিরেকেই ফলনের হার বৃদ্ধি করে উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা বর্তমান। সভাই ক্ষোভের বিষয় যে আজও ভারত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবচেয়ে দেশের পশ্চাতে পড়ে রয়েছে একর প্রতি গড় ফলনের দিক থেকে। এখন প্রশ্ন এসে যায় যে দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় ও পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থের সীমার ভিতরে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা। এবিষয় সকলের কাছেই সুপরিজ্ঞাত যে ভূমিসমস্যার দুটি প্রধান দিক রয়েছে—(১) পরিমাণের দিক (যার মূলকথা ভূমি সংস্কার) ও (২) কারিগরী দিক (যার মূলকথা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সেচ, সার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা)। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি আশানুরূপভাবে হ'তে পারে না, যদি উক্ত সমস্যাদ্বয়ের সন্তোষজনক সমাধান না হয়। আপাততঃ আর্থিক সংকটের দিক বিবেচনা করে দ্বিতীয় দিকের উপর আর্থিক সামর্থ্যমত জোর দিয়ে ভূমি সমস্যার প্রথম দিকের সমাধান আশু কাল বিলম্ব না করেই সম্ভব—কৃষির জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ ব্যতিরেকেই। তাতে কৃষকদের অর্থও আসবে এক নূতন অনুপ্রেরণা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। দেশের বর্তমান বিভিন্ন দিক বিচার করে এই দুইটিকে নিয়ে সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়। বৈদেশিক মুদ্রাসংকট প্রসঙ্গে বলা চলে যে সংকটের কালো মেঘ

(১) [K. P. Subramanya. Menon : Aspects of agriculture in Second Plan.]

তিরোহিত না হলেও তার আড়ালে যে রূপালী রৌদ্র দেখা দিয়েছে তা আমাদের পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রচেষ্টার পক্ষে আশাপ্রদ। আমেরিকা, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন, জাপান প্রভৃতি যেসব দেশ থেকে আমরা সাহায্য বা সাহায্যের আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। (গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৫৮, আমদানী উপলক্ষে। বৈঠকে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীনেহরুজী যেসব ভাষণ)। তাছাড়া ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতভ্রমণকালে চেক্ প্রধানমন্ত্রী মিঃ সিরোকীর (Siroky) ভারত ও চেকোশ্লোভেকিয়ার মধ্যে একটি ঢালাই ও পেটাই (Forge Foundry) কারখানা তৈরীর চুক্তির কথাও উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তি অনুযায়ী কারখানার লাভসরঞ্জামের মূল্য পরিশোধের সময় ১৯৬১ সাল অবধি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। রুরকেলার ইস্পাত কারখানার যন্ত্রপাতিরও মূল্য বিষয়ে পরিশোধের জন্য ফেব্রুয়ারীর (১৯৫৮) শেষ সপ্তাহে ভারতের পক্ষে "ঘনে" ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী এ, সি, এন্, নাম্বিয়ার এবং পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর ব্রেনটানোর মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট জার্মান প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় মোট ৬৬ কোটি জার্মান মার্ক (প্রায় ৭৪ কোটি টাকা) পরিশোধের মেয়াদ ১৯৬১ সাল অবধি পিছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রায় সাতশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ঘাটতি (Foreign exchange Gap) আশঙ্কা করা হয়েছে। এই ঘাটতির ভিতর এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (সরকারী এবং বেসরকারী সূত্রে) কাছ থেকেই ৩০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রত্যাশা করা হয়েছিল। অবশ্য সে ক্ষেত্রে মাত্র সাড়ে বাইশ কোটি ডলার সাহায্যের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র করেছে। যদিও প্রস্তাবিত এই মার্কিণ সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম—যার জন্য ঘরোয়া বা কোন কোন মহলে পরাজিত মনোভাব দেখা দিয়েছে এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিরূপ সমালোচনা এসেছে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে অতি-উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বলে অভিহিত করে। কিন্তু পরাজিত মনোভাব নিয়ে বিষয়টিকে দেখবার চেষ্টা না করে আমরা যদি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, প্রস্তাবিত সাহায্য আমাদের উন্নয়নমূলক আরও কর্মপ্রচেষ্টাকে একবছর কি দেড়বছর চালিয়ে নেবার মত আও চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতেও আমাদের সাহায্যের সম্ভাবনা যখন রয়েছে এবং সে রকম আশ্বাস যখন পাওয়া গেছে তখন পরিকল্পনার কোন অংশের ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুতাই চিনাইএর [President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry] গত ত্রিবার্ষিক অধিবেশনের বিষয় নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য; তিনি বলেছেন,—The loan announced by U. S. A. was very timely though not sufficient. We have been assured that united states Government would be glad to consider further help to us as per our needs." অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ঋণদানের সাহায্য খুব সময়োপযোগী হয়েছে। যদিও ঋণের পরিমাণ খুব আশানুরূপ নয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমাদের প্রয়োজনানুপাতে আরও সাহায্যদানের আশ্বাস দিয়েছে। এতদ্ব্যতিরেকে গত ফেব্রুয়ারীর (১৯৫৮) প্রথম সপ্তাহে Ford foundation team আমাদের কৃষি কুইঞ্চিদের উন্নয়নের জন্য সাড়ে একুশ লক্ষ ডলার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তথা অস্থায়ী অর্থমন্ত্রীর ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশকালীন ভাষণ থেকে আমরা বৈদেশিক সাহায্যের এবং সাহায্যপ্রাপ্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটা মোটামুটি হিসাব পাচ্ছি। তিনি উক্ত বাজেট অধিবেশনে জানিয়েছেন যে, গত ১৯৫৭ সালের মার্চমাসের শেষ অবধি ভারত তার বিভিন্নবন্ধুরাষ্ট্রগুলির কাছ হতে তার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ৪৬০ কোটি টাকার মত আর্থিক সাহায্যলাভ করেছে এবং আগামী বছরেও আনুমানিক ৩২৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ সাহায্যপ্রাপ্তির আনুমানিক হিসাবের ভিত্তি হ'ল সেই সব বৈদেশিক সাহায্যচুক্তি বা ব্যবস্থা—যার দ্বারা ভারত বিদেশ হতে সাহায্য পাচ্ছে এবং পেতে পারে—একথাও শ্রীনেহরু বলেছেন। এইসব সাহায্য এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সকল রূপায়ণেই শুভ ইঙ্গিত নিয়ে আসে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। স্বার্থান্বেষী কোন কোন মহল অবশ্য এরূপ সমালোচনা করে থাকেন যে বর্তমান সরকারের প্রয়োজনীয় ও প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণের নীতি আমাদের বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। কিন্তু এই সমালোচনার অন্তঃসারশূন্যতা অতি সহজেই ধরা পড়ে আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামান্যতম বিশ্লেষণে। একথা সত্য যে জাতীয় উন্নয়ন সমিতি (National Development Council নির্দেশ দিয়েছেন যে, "The second five year plan should be drawn up so as to give concrete expression to policy decisions relating to socialistic pattern of society." [Introduction, A draft outline, Second five year plan, Planning Commission, Government of India 1956] অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা করতে হবে যাহাতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠনের সিদ্ধান্ত তাতে বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হয়। সেই উদ্দেশ্য সাধন প্রসঙ্গে পরিকল্পনার পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, "The second five year plan has been formulated with reference to the following principal objectives:

(a) A sizable increase in national income so as to raise the level of living in the country; (b)

rapid industrialisation with particular emphasis on the development of basic and heavy industries.

(c) a large expansion of employment opportunities &

(d) reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power [A draft outline, second five year Plan. P. 7.]

অর্থাৎ নিম্নলিখিত প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে :—

(ক) জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা ;

(খ) শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা, বিশেষ করে ভারী এবং মূল শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

(গ) জীবিকা সংস্থানের বিস্তৃত ব্যবস্থা করা এবং

(ঘ) ধন এবং আয় বৈষম্যের হ্রাস সাধন করা এবং ধন বণ্টন ব্যবস্থাকে অধিকতর সাম্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলীর আশানুরূপ ফল পেতে হলে "The public sector has to expand rapidly and the private sector has to play its part within the frame work of the comprehensive plan accepted by the community [A draft outline, second five years plan. P. 8.] অর্থাৎ সরকারী প্রচেষ্টা এবং প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকতর করে তুলতে হবে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার কাঠামোর ভিতরে তার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এর দ্বারা কোথাও বেসরকারী প্রচেষ্টা বা প্রতিষ্ঠানকে বিনষ্ট করা হয় নাই। শুধু দেশের এবং ধনের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আসমান-জমির ধন-বৈষম্যের হ্রাসকরণ এর প্রধান উদ্দেশ্য ; মোট কথা পরিকল্পনার অনুসৃত নীতি মিশ্র অর্থনীতি। স্বভাবতঃই এখন মনে হয় যে স্বার্থান্বেষী মহল নব নব ধন-বণ্টন ব্যবস্থার নীতি গ্রহণে আগ্রহান্বিত হবেই—আজকে আওয়াজ তুলবে বৈদেশিক অর্থ সাহায্যপ্রাপ্তির অসুবিধার কথা ইত্যাদি বলিয়া। আমরা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাতার দিকে যদি একটিবার দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব মিশ্র অর্থনীতির কথাত দূরের কথা, এমন কি জাতীয়করণের নীতিও বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার পথে কোনই অন্তরায় সৃষ্টি করে না। তাহলে সমাজবাদী যুগোশ্লাভিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পেত না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীএস,কি পাটিল গত ত্রিবান্দ্রিতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সভায় অর্থনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে আমরাও এই সব সমালোচকদের প্রত্যুত্তরে বলবো "It is not that our economy is going to change the views & outlook of others···Let us have dollars without dollarism." অর্থাৎ বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য আমরা আমাদের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি থেকে বিচ্যুত হতে পারিনা। আমাদের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতেই আমরা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করবো।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ

নবপর্যায়ে গঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লিখিতেছি ; নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তৎসহ নূতন আইনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যের পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৫১ দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার সাধিত হয়েছে। বস্তুত এই আইন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের কার্যে ক্রমতর পুরোমাত্রায় প্রচলিত হয়েছে। নবপর্যায়ে গঠিত সিনেট সভাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শাসন সংস্থা অর্থাৎ supreme governig body অভিহিত করা হয়েছে এবং এখন সিনেটের অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচিত হন, পূর্বের আইনে যেমন অধিকাংশ সদস্য মনোনীত হইতেন। নূতন আইনে প্রথম সিনেট নির্বাচন ১৯৫৩তে অনুষ্ঠিত হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন কার্যক্রম আরম্ভ হয় ১২ই মার্চ ১৯৫৩। ঐ দিন তদানীন্তন উপাচার্য ডাঃ আশুতোষ ঘোষ ও নূতন সিণ্ডিকেটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনকার্যভার গ্রহণ করেন, পরে সংশোধনী আইনদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সংস্থার কার্যকালবৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে সিনেট ইত্যাদি সংস্থার দ্বিতীয় নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত হয় এবং নবগঠিত সিণ্ডিকেটসহ গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে তাহাদের দ্বিতীয় কার্যকাল আরম্ভ করিয়াছেন। নবপর্যায়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কার্যকাল শেষ হইয়াছে ; এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ছাত্রকল্যাণ ও গঠনমূলক বহু কার্যও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরব-উজ্জ্বল প্রথম শতাব্দী শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াছে। দেশের সকলে ইহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যের বা

অগ্রগতির সহিত সম্যক পরিচিত নহেন বলিয়া এই প্রবন্ধে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থানসহ মানবিধ গঠনমূলক কার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। নবপর্য্যায়েগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সংস্থাগুলির পরিচয় জানা থাকিলে কিসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সিনেট : নূতন আইনে গঠিত সিনেটসভার সদস্য সংখ্যা ১৮০ ; তন্মধ্যে পদাধিকার বলে যাঁহারা সদস্য তাঁহাদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য, উপাচার্য্য, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (প্রফেসর) প্রভৃতি, ইহা ব্যতীত ৪ জন আজন্ম সদস্য এবং বিভিন্ন কেন্দ্র দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্য ১০২ জন আছেন। সিনেটের বিভিন্ন নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চসংখ্যা অর্থাৎ ২৫ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট দ্বারা। পূর্ব্বে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কি ছিল দশটাকা, এখন নূতন নিয়ম অনুসারে মাত্র তিনটাকা ফি দিয়া দুইবৎসরের জন্য তালিকায় নাম রাখা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সংস্থা সিনেট ; সিণ্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের প্রস্তাব পুনঃ বিবেচনা করার ও পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা সিনেটের আছে।

সিণ্ডিকেট অর্থাৎ কার্য্যকরী সমিতি : ইহার সদস্য সংখ্যা ২০—তন্মধ্যে পদাধিকার বলে আছেন ৪ জন, বাকি ১৯ জনের মধ্যে শিক্ষক নহেন এমন ৮ জন আছেন। সিণ্ডিকেটের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনা করা ; সম্পত্তি ও অর্থের তত্ত্বাবধান করা ও যথাযথভাবে ব্যয় করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী সিণ্ডিকেট প্রস্তুত করিয়া সিনেট সভায় পেশ করেন।

একাডেমিক কাউন্সিল : ইহা নূতন আইনের সৃষ্টি ; শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সংস্থা। সদস্য সংখ্যা ৭৭ জন, তন্মধ্যে শিক্ষক নহেন এমন সদস্য আছেন মাত্র ৮ জন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, বোর্ড-অব্-স্টাডিস্ প্রভৃতি আছে।

নূতন আইনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম বেতন-ভোগী উপাচার্য্যের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এইরূপ পদের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেন।

নূতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষের পদও সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ফাইন্যান্স কমিটিও নিযুক্ত করা হইয়াছে ; উহার অনুমতি ব্যতীত কোনও অর্থব্যয় করা যাইবে না।

আর্থিক অবস্থা : গত আর্থিক বৎসর ১৯৫৬-৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ছিল ৭৮,৯৯,৮৭২ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ৭৬,২২,০৫২ টাকা এবং চলতি বৎসর ১৯৫৭-৫৮সে বর্দ্ধিত মোট আয় ধার্য্য হইয়াছে ৮৮,৬৪,৭৪, টাকা, অনুমান হয় যায় ইহা অপেক্ষা বেশী হইয়া প্রায় ৮ লক্ষ টাকার উপর ঘাটতি দাঁড়াইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের একটি মোটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক মোট দান ২১'৫২ লক্ষ টাকা ব্যতীত বিভিন্ন খাতে আরও কুড়ি কুড়ি দান আছে। ছাত্রদের নিকট বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাবদ পাওয়া যায় ২৬,৮৮০,৮০ অন্যান্য ফি বাবদ পাওয়া যায় ৩,৭০,৭০০ টাকা। ইহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমন্ত্রী কমিশন বিভিন্ন পরিকল্পনা বাবদ বহুটাকা সাহায্য করিতেছেন। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমন্ত্রী কমিশন এককোটি টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ; তন্মধ্যে প্রথম অংশ হিসাবে ৭৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে, আরও টাকা এই চলতি বৎসরে পাওয়া যাইবে। শতবার্ষিক উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য ৭,৭৮৩১৮-১২-০ টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং উহা দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। শতবার্ষিক উপলক্ষে জনসাধারণের নিকট হইতে মোট ২-২৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেনা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোডে সুপরিচিত Emerald Bower এ বিশ্ববিদ্যালয়ের Economic Departmentএর জন্য নূতন ভবন প্রস্তুত হইয়াছে এবং আশা করা যায় আগামী জুলাই সেসন হইতে অর্থনীতি বিভাগ সেখানে স্থানান্তরিত হইবে। অর্থনীতি-বিভাগে ২টী নূতন অধ্যাপক (প্রফেসর) পদ সৃষ্টি করা হইতেছে এবং এই বিভাগের বহুবিধ সম্প্রসারণ করা হইতেছে। বিশ্বভারতী ব্যাঙ্ক বার্ষিক ২৪ হাজার টাকা দিতেছেন, ইহার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে Industrial Finance এ অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ডাঃ সরোজকুমার বসু এই পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন গ্রহণের বয়স ৬২ বৎসর করা হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে সিণ্ডিকেট এক বৎসর হিসাবে আরও তিন বৎসর কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। অধ্যাপক পদের জন্য নূতন গ্রেড ৮০০০-১২৫০, রিডারদের ৫০০-৮০০, লেকচারারদের জন্য ২৫০-৬০০ করা হইয়াছে। লেকচারারদের বেতনের হার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব বিবেচনা করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বস্তরের শিক্ষক নহেন এমন কর্ম্মচারিদের বিদায় গ্রহণের বয়স ৫৫ হইতে ৫৮ করার প্রস্তাব সিনেট সভা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার পরও এক বৎসর হিসাবে আরও ২ বৎসর অর্থাৎ মোট ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মচারি তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন—যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে সিণ্ডিকেট তাহা প্রয়োজন মনে করেন। এই নূতন বিষয়টি এখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

১৯৫৬-৫৭তে সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ নহেন এমন সমস্ত কর্ম্মচারিদের বেতনের হার সংশোধিত করিয়াছেন। ইহার ফলে বার্ষিক প্রায় ৬০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হইতেছে এবং কর্ম্মচারিরা উপকৃত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত সিনেট সভায় বহু পূর্ব্ব ১৯৫৩র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল কর্ম্মচারিদের জন্য বিদায় গ্রহণ কালে অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে একমাসীন প্রত্যেককে ১৫ মাসের বেতন অথবা সাত হাজার দুইশত টাকা, যেটি কম হইবে তাহা দিতেছেন।

স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্য ৯ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি

হোষ্টেল নির্মাণ করিতেছেন, এই বাবদ রাজ্য সরকার ৮৭০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন ; ইহা ব্যতীত দুই হাজার কলেজ ছাত্রের উপযোগী ২টি ইউনিভার্সিটি হোষ্টেল নির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্থসচিব কমিশন উপযুক্ত অর্থসাহায্যের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং দুইটি হাজারবাস নির্মাণের জন্য Interest free loan দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সিণ্ডিকেট প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যথোপযুক্ত জমি সংগ্রহ না হওয়াতে নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইতেছে।

উচ্চশিক্ষা : উচ্চশিক্ষাবিস্তারে বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র গতানুগতিক নীতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছে তাহা নহে, বরং বহুবিধ অভিনব প্রস্তাব কি ভাবে প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন নিম্নলিখিত তথ্যগুলিতে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে—

অনুমোদিত কলেজ সমূহের সংখ্যা	১৯৪৩-৪৭	১৯৪৭-৪৮
	১১৬	১৩৮

ছাত্রসংখ্যা যাহা ১৯৪১-৪২তে ২২,০৮৭ ছিল তাহা বর্ত্তমান বৎসরে এক লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছে।

বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা—

	১৯৪৪	১৯৪৫	১৯৪৬	১৯৪৭
আই-এ	৫৯৪৫	৭৯৪৮	১০৮১১	১০৭১০
আই-এস-সি	৫৭৫১	৮১৪৬	৭৯৮৮	৮৯১৩
বি-এ	১৭৮৯	১৯৫৭	৩০২৬	৩৬৩৬
বি-এস-সি	১৮২৪	২২৭৩	২৯৪৪	২১৫০
বি-কম্	১১৪৪	১৪৯৩	২০০০	২১৪৩
এম-এ ও এম-কম	৭৮৩	৮৫০	৯৮০	১০৩২
এম্-এস-সি	২১৩	২৩৯	২৮৭	২৯৪

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭তে পরীক্ষার সংখ্যা ছিল ৯৬, ১৯৪৭তে সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৯, এবং বৎসরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৬৯ দিন কন্ট্রোলার ডিপার্টমেন্ট নানাবিধ পরীক্ষার অনুষ্ঠান করেন।

উচ্চ শিক্ষা প্রসারের প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য।

মোট পরীক্ষার্থীর অনুপাতে ছাত্রী সংখ্যা—

	আই-এ	আই-এস সি	বি-এ	বি-এস-সি
	সংখ্যা ও হার	সংখ্যা ও হার	সংখ্যা ও হার	সংখ্যা ও হার
১৯৩৩	২৮৮ ৩.৯	৩০ ০.৮	১৩৩ ৪.৮	৮ ০.৮
১৯৪৪	৩৯০০ ৩৪.৫	৪৪২ ৫.২	১৯৪৪ ৫৪.৮	৮০০ ৫.২
বৃদ্ধির হার	১৩৫২	১৭০৭	১১৩৬	৭৪০০

ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অনেক বেশীসংখ্যক ছাত্রী কলা অপেক্ষা বিজ্ঞান বিষয় সমূহে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ববিদ্যালয় External students দের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও প্রথম পর্য্যায়ে এই নিয়মটি ৫ বৎসরের জন্য করা হইয়াছে ; যেভাবে শিক্ষার্থীরা ইহার সুযোগ লইতেছেন আশা করা যায় এই নিয়মটি স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বে সাধারণতঃ ছাত্রীরা ও শিক্ষকরা নন-কলিজিয়েট হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারিতেন এই ব্যবস্থাও বজায় আছে। ইহার সঙ্গে বিপুলসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী যাহারা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য দিনে চাকুরী করিতে বাধ্য হন অথচ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতি করিতে উৎসুক তাঁহারা External student অর্থাৎ বাহিরের ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রকম নিয়ম আছে। কেবলমাত্র যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন তাঁহারা ঐ পরীক্ষা পাশের তিন বৎসর পরে External student হিসাবে পরবর্ত্তী পরীক্ষাটি দিতে পারিবেন এবং কেবলমাত্র I. A. B. A. ও B. Com. এ External student হিসাবে পরীক্ষা দেওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড হইতে যাঁহারা স্কুল ফাইনাল পাশ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত রিফিউজি ছাত্র ছাত্রীরা, এই সুযোগ পাইতে পারেন।

External পরীক্ষার্থীদের পাশের সংখ্যা দেওয়া হইল :—

	আই, এ,	বি, এ,	বি, কম,
১৯৪৬	৮৬৫	২৯১	১৪৫
১৯৪৭	১৭৪৫	৩৪০	২৫৩

১৯৪৮এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এইরূপ :—

৭৪৭৮	২৬৭৫	১৪৭২

ক্রমবর্দ্ধমান এই সংখ্যাগুলি প্রমাণ করিতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয় করিয়া যাহাদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণে কি ভাবে সাহায্য করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন কলেজ : নবপর্য্যায়ে গঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অবদান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন কলেজ স্থাপন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা, পাঠ ও গবেষণার ব্যবস্থা। ডাঃ সুরেশ মিত্রের বহু বৎসরব্যাপী চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। ১৮ই জানুয়ারি ১৯৪৭তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন কলেজের উদ্বোধন করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। Basic Medical Sciences কোর্সে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা পাঠ করিতেছেন এবং ইন্টার্ণ ডিগ্রিপ্রাপ্তদের জন্য গবেষণা করিতেছেন এবং কয়েকজন রিসার্চ স্কলার নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন এবং এতদ্বারা তাঁহাদেরই বহুদিনের একটি অভাব দূর হইল। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন কলেজ-নিলয় গগনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

College of Home and Social Sciences : ইহা নবপর্য্যায়ে গঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গঠনমূলক কার্য্য। আলিপুর বেঙ্গল ল্যাম্পস ষ্টাডিসের ভবনে উহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রায় ১১'৫০ লক্ষ টাকায় এই পরিকল্পনাটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বিহারীলাল মিত্র ভাণ্ডার হইতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবিটি সংগ্রহ করিয়াছেন, ভারত সরকার তখন নির্মাণের জন্য ৩.৮৮ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, এখনও প্রায় ৩.৬২ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিহারীলাল কলেজের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে—মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য শিক্ষিকাদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং এতদ্বারা স্ত্রীশিক্ষার মান ও ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীরা এখানে ৪ বৎসরকাল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ করিয়া ডিগ্রিলাভের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন—

১। পার্থিবা কলা ও বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রায় উহার ব্যবহার ;

২। শিশুদের যত্ন ও শিশু শিক্ষা, তৎসহ মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশুদের পরিচালনা ;

৩। পার্থিবা বিজ্ঞান—খাদ্য ও পুষ্টি—খাদ্যের সহিত নিজের ও পরিবারের সম্পর্ক এবং জাতীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা।

৪। সমাজ বিজ্ঞান—সমাজ কল্যাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ;

৫। সঙ্গীত ;

যাঁহারা শিক্ষিকা হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই চার বৎসরের পাঠ সমাপনান্তে পাশ করিয়া পরবর্তী এক বৎসরকাল হাতে কলমে শিক্ষকতার কার্য্য করিবেন।

পার্থিবা বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা পল্লী অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরাও যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন সেজন্য বিহারীলাল কলেজে গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোক কর্ম্মীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে ; সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১। শিক্ষা, পল্লী স্বাস্থ্য ও জন স্বাস্থ্য ;

২। সমবায় পদ্ধতি ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা ;

৩। অর্থনীতি, কলা ও শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দ্বারা পল্লী অঞ্চলের পার্থিবা জীবনের উন্নতি বিধান ;

৪। শিক্ষা ও কুটীর শিল্প ;

স্বর্গত বিহারীলাল মিত্র স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে প্রভূত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন এই কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা—তাঁহার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্তা জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্ত এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গৌরব ইহার আশুতোষ মিউজিয়ম। আলোচ্য সময়ে কয়েক সহস্র দ্রব্যাদি মিউজিয়মে সংগ্রহ করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঘাত্রিকত্ব দানও আছে। শ্রীযুক্তা শ্যামা দেবী তাঁর পরলোকগত স্বামীর স্মরণার্থে প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের ৪২ খানি রাজপুত ও মোগল যুগের রবি ও নেপাল হইতে সংগৃহীত ২টি ধর্ম্মপুঁথি, (একটি অষ্টলোকিতেশ্বরের, অপরটি পদ্মপাণির উপর বিষ্ণু) দান করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন ক্লোরাইট পাথরের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, মহিষমর্দ্দিনী, বসনা, বরাহি, নবগ্রহ, অনেকগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীশুভেন্দু সিংহরায় মধ্যযুগের প্রস্তরের এক চামুণ্ডামূর্ত্তি দান করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ রাজ্য সরকার এলাহাবাদ পাথরের গায়ের মেঘের একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল উত্তরে ২৪ পরগণা জেলায় প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়-বেড়াচাঁপার মাটীর ঢিলা হইতে মৌর্য্য ও শুঙ্গরাজত্বের অনেক মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পোড়া মাটির একটি সূর্য্যরথ ও গুপ্তযুগের একটি স্বর্ণমুদ্রা। এই মূদ্রা সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের, ইহাতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার দেবীর বিবাহের চিত্র আছে। তমলুক অঞ্চলে খনন কার্য্য কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে এবং প্রাচীন মৌর্য্য ও শুঙ্গ যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গার মোহনায় তাম্রলিপ্ত বন্দরের নিকট, হরিনারায়ণপুরে খ্রীষ্টীয় অনুমান ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে একটি বন্দর ছিল, সেখান হইতে কিছু তাম্র মুদ্রা ও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ২৫ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ে যে খনন কার্য্য চলিতেছে এবং সেখানে প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে দেখা যায় যে এই অঞ্চলে মৌর্য্য, শুঙ্গ ও গুপ্তরাজত্বে মানুষের বসবাস ছিল। যদিও এই অঞ্চলে খনন কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয় যথা পরিশ্রম করিতেছেন ভারতসরকার তাহার উপর পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন, তথাপি মনে হয় এই অঞ্চলে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের প্রচুর সম্পদ মৃত্তিকা গর্ভে রহিয়াছে ; তাহা সম্পূর্ণরূপে এবং শীঘ্র লোকচক্ষুর সামনে তুলিয়া ধরিতে হইলে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতেও অধিক অর্থ সাহায্য আবশ্যক। চন্দ্রকেতুগড়ে আশুতোষ মিউজিয়মের কর্ম্মিবৃন্দ যেভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। দেশ বিদেশ হইতে সুধীগণ আসিয়া আশুতোষ মিউজিয়মের সংগ্রহ দেখিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, নিজস্ব ভবন ও সংগ্রহশালা না থাকায় মিউজিয়মের দ্রুত সম্প্রসারণ ব্যাহত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক ভবন নির্ম্মিত হইলে সেখানে মিউজিয়মের জন্য প্রচুর স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭ ডিসেম্বর হইতে Post Graduate Diploma course in Museology প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—মিউজিয়ম পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্বারা একদল নিষ্ঠাবান কর্ম্মী গড়িয়া উঠিবে যাঁহারা বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন মিউজিয়ম স্থাপনে ও পরিচালনায় সাহায্য করিতে পারিবেন।

লাইব্রেরী : বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী। ইহার পুস্তক সংখ্যা ও পাঠক সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। স্থানাভাবে ইহার সুষ্ঠু সম্প্রসারণ সম্ভব হইতেছে না। গত বৎসর পুস্তক ক্রয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুর করিলেন এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। U. S. A. India Wheat Loan Exchange Programme অনুযায়ী ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের পুস্তকাদি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। লাইব্রেরীর জন্য নূতন ভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে ; বর্ত্তমান সিনেটহল ভাঙ্গিয়া উহারই এক অংশে ইহা স্থাপিত হইবে। আধুনিকতম ব্যবস্থাসহ

পুস্তক সংরক্ষণের ও পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হইবে। নূতন লাইব্রেরী-ভবনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষমহুরী কমিশন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সাংবাদিকতা বিভাগ: বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাকে ক্যাকাল্‌টির মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে এবং সাংবাদিকতার under-graduate teaching ও post graduate teachingএর বিভাগ হইয়াছে।

Textileএ B. Sc. degree দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গতবৎসর হইতে শ্রীরামপুর বয়ন কলেজকে ডিগ্রিকোর্স পড়ানর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এবারে ছাত্রেরা পাশ করিয়া কেবলমাত্র ডিপ্লোমা পাইতেন, উহা যেন শিল্প ক্ষেত্রে উচ্চ চাকুরীলাভে তেমন সহায়ক ছিল না। এতদ্বারা ছাত্রদের বহুদিনের একটি অসুবিধা দূর হইল।

I. A. S. প্রভৃতি পরীক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবৎসর প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ করিতেছেন।

আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ গবেষণার জন্য একটি ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল অনুমোদন করিয়াছেন। বিষয়টি এখন সেনেট কমিটি বিবেচনা করিতেছেন।

কতকগুলি কোর্স Three years degree Course প্রবর্তন করা হইবে মোটামুটি এই স্থির হইয়াছে।

শতবার্ষিক উৎসব:

আলোচ্য সময়ে ১৯৫৭র জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান করেন। শতবার্ষিক উৎসবের এক বিবরণী ইতিপূর্বে "ভারতবর্ষ"-তে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতসরকার বিশ্ব-বিদ্যালয়কে যে এককোটি টাকা দান করিতে সম্মত হইয়াছেন উহার সাহায্যে নিম্নলিখিত ভবনগুলি নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে—

১। শতবার্ষিক ভবন—পুরাতন সিনেট হল ভাঙিয়া সেইখানে নির্মাণ হইবে।

২। বিজ্ঞান কলেজ ভবন—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে;

৩। ল' কলেজ ভবন—ইহার স্থান এখনও ঠিক হয় নাই।

ইহা ব্যতীত ঐ টাকা হইতে কতকগুলি নূতন অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হইবে এবং অনুমোদিত কলেজের ছাত্রদের সুখসুবিধার জন্য কিছু অংশ ব্যয় করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের একান্ত চেষ্টায় এবং ভারতসরকারের বদান্যতায় উন্নয়ন কার্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অভাব নাই। অভাব জমির। জমি না থাকাতে সম্প্রসারণকার্য দুঃখজনক ভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। মনে রাখিতে হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদনুপাতে স্থান প্রয়োজন। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও জনসাধারণের সহযোগিতায় কলেজস্কোয়ার অঞ্চলে নূতন ভবনসমূহের জন্য জমি পাওয়া যায় খুব ভাল হয়। কলেজ বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

গতায়ু হলেও

শ্রীউমাপদ নাথ

এখন চেয়ারে শোয়া। তথাপি দু-চোখ খোলা, দেখি।
লাল-নীল বেপরোয়া কৃত্রিম চাঁদেরা
আকাশে যে ফেলে পদধূলি, তাদেরও মিছিল দেখি।
এখন ভাবনা অন্য। এখন ভাবনা শুধু—এ কী!
আমারও বয়স ছিল, আমারও শরীর ছিল ভাল;
আমারও ব্যাকুল ডানা বহু ছোট খেয়েছিল উড়ে।
এখন স্তিমিত বুক রোগ-ধ্বসা রং-খসা কালো
উত্তর-যৌবন দিনে জীবন অশ্রীভূত আলো।
যুবক ক্যানাল কাটে, যুবতীরা ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি
সরায় শক্ত দেহে। গাইতি কোদাল চলে দেখে।
ময়ূরাক্ষী ভাকরার নিষ্কলুষ সুস্থ ও খাঁটি
বিন্দু বিন্দু রক্তস্রুতি বহুবর্ষ বেড়াইবে হাঁটি।
তার মাঝে চুপিসাড়ে আমার বিস্মিত প্রেতদেহ
দাঁড়াবে একান্তে দূরে, এখানের ভাড়াকরা ঘরে
চেয়ার-জীবন চলে শেষ। আবার তো এসে যাবে কেহ
ক্ষণভঙ্গী মানব-মানবী, বয়সের শারীরিক স্নেহ
ছড়াবে এখানে। আর আমার অদৃশ্য দুটি হাত
তখন মাখাবে দেহে মাটির পরশ। অবশ্য তখন ঢের রাত।

(পূর্বানুবৃত্তি)

৯

"কি ব্যাপার, কে আপনি ?"

"আমি এখানকার পোস্টমাস্টার। নতুন এসেছি বদলি হ'য়ে। এখানকার হাল-চাল কিছুই জানি না। বড়ই বিপদে পড়ে' গেছি জামাইবাবু—"

"কেন, কি হ'ল"

"একদিন রাত্রে একটা জরুরি তার এল কুমারবাবুর নামে। রাত্রে তার এলে এখানে রাত্রে সেটা ডেলিভারি হয় না, কারণ কোনও পিওন রাত্রে থাকে না। 'তার'টা সকাল বেলা পাঠিয়ে দিলাম। রাধানাথবাবু বলছেন—অত জরুরি তার আমার নিজেরই এসে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পোস্টমাস্টার নিজে বাড়িতে গিয়ে 'তার' দিয়ে আসবে এ রকম কানুন তো কোথাও নেই—"

শিউনাথ মন্তব্য করিল—"এখানকার কানুন আলাদা, আপনার দিয়ে আসাই উচিত ছিল। আপনার আগে ছিলেন নিয়ামৎআলা, জরুরি তার রাত্রে এলে নিজেই দিয়ে যেতেন বাড়িতে। দুঃসংবাদ থাকলে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা সে খবর জেনে তবে দিতেন। ডাক্তারবাবুর বাড়ির 'তার', আপনার দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বই কি"

"আমি নতুন লোক, কিছুই জানতাম না"

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে হয়েছে কি। আর আমাকেই বা এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন, আমি কি করতে পারি"

"আপনি রাধানাথবাবুকে বলুন একটু, তিনি আমার নামে রিপোর্ট করেছেন। আপনি জামাই মানুষ, আপনার অনুরোধ উনি রাখবেন"

"রাধানাথবাবুর রিপোর্ট কি খুব মারাত্মক হবে ?"

"হবে। তিনি আমার নামে লিখেছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, তিনি ওঁর জামাই। আর পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার নামে লম্বা এক ডি. ও. এসেছে জবাবদিহি চেয়ে—আমি কেন পাবলিকের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করছি। তাতে আরও লেখা আছে—এন্‌কোয়ারি করবার জন্যে একজন ইন্‌স্পেক্টার আসবেন, আমি যেন সেজন্য প্রস্তুত থাকি। দোষ সাব্যস্ত হ'লে শাস্তি হবে। মানে, রাধানাথবাবু যা বলবেন তাই হবে। আমি যিরুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই টেলিগ্রামটা করেছিলেন, তিনি খুব চটে আছেন দেখলাম। বললেন, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত। কুমারবাবু বললেন, আমি ওসবের মধ্যে থাকতেই চাই না। আমি রাধানাথবাবুকে কিছু বলতে গেলে তিনি আমাকেই ধমকে দেবেন। আপনি যদি কাকাবাবুকে দিয়ে বলাতে পারেন কাজ হবে, উনি কাকাবাবুর ছাত্র। চন্দ্রবাবুর কাছে গেলাম। তিনি ভদ্র ব্যবহার করলেন খুব। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আমি ব্রাহ্মণ শুনে আমার পিতার নাম, পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম, অতিবৃদ্ধপিতামহের নাম এই সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ঠাকুরদার বাবা কিম্বা ঠাকুরদার নাম আমি জানতাম না। এইতেই খুব চটে' গেলেন তিনি মনে হল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—গায়ত্রী জানি কিনা। গায়ত্রী সেই বিশ বছর আগে শিখেছিলাম, তা কি আর মনে আছে ? বললাম সে কথা। তখন তিনি প্রশ্ন

করলেন, চক্ষুলজ্জা করেন না রোজ? সত্যি কথাই বলতে হল, করি না। এ শুনে তিনি ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার দিকে, তারপর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, সুবিধা হবে না। যোগেনবাবু তখন বললেন, আপনি জামাইবাবুদের মধ্যে কাউকে যদি অনুরোধ করেন, তাহলে হয়তো কাজ হবে। জামাইদের খাতির হয়তো উনি রাখবেন। আপনি যদি একটু দয়া করেন গরীবের উপকার হয়—"

কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

"আমার সঙ্গে তেমন আলাপ তো নেই ভদ্রলোকের, হবে আপনি যখন এত করে' বলছেন তখন অনুরোধ করে' দেখব। ওই যিনি মুখের সামনে মাঝে মাঝে হাত চাপা দেন, তিনিই তো রাধানাথবাবু—"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, তিনিই—"

"আচ্ছা, আমি বলব"

পোস্টমাস্টারবাবু চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল—"লোকটা একের নম্বর হারামি। ঠিক করেছেন রাধানাথবাবু—"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কিছু তো ঘোষ করে নি বেচারা। আইনত ওর কোন দোষ নেই"

"সব সময় আইন চালাতে গেলে কি চলে' জামাইবাবু। সেদিন আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছিল, মনি-অর্ডারটা নিলে না"

রমেশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

রামপ্রসাদ বলিল, "এই রমেশবাবুকে জিগ্যেস করুন না"

রমেশবাবু জিজ্ঞাসুদৃষ্টি কৃষ্ণকান্তের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

"এই এখানকার পোস্টমাস্টারবাবুর কথা হচ্ছে"

"এসেছিল বুঝি তোমার কাছে। তুমি রাধানাথকে বললে হয়তো বেঁচে যাবে বেচারা। তা না হলে ওর অদৃষ্টে দুঃখ আছে"

"যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বেচারার তেমন দোষ নেই বিশেষ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টেলিগ্রাম আর কোন পোস্টমাস্টার দিয়ে আসে বলুন—"

রমেশবাবু চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

রমেশবাবুর মুখখানা চাকার মতো গোল এবং তালের মতো নিভাঁজ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। বেশ ভারিক্কি গোছের চেহারা। যখন কাহারও সহিত কথা বলেন বাম হাতটি পিছন দিকে কোমর এবং পিঠের সন্ধি-স্থলে স্থাপন করেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণ-কান্তের মন্তব্যটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর পুনরায় কৃষ্ণকান্তের দিকে মুখ ফিরাইলেন। পৃষ্ঠস্থ বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি একবার খুলিয়া আবার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। উত্তেজিত হইলে এরূপ করেন।

"দেখ বাবা, যখন যেখানে যাচ্ছি। আমাদের এ গ্রামটি ছোট এবং সেকেলে। অনেক কিছুই নেই এখানে। ট্রাম, মোটর, ফোন, সিনেমা—এসব কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে। এখনও আছে। এই গ্রামের ডাক্তার, মাস্টার, দারোগা, স্টেশন মাস্টার, পোস্ট মাস্টার, কাছারির ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা, মানে গ্রামের ছোট বড় সবাই আমরা একটি পরিবারের মতো বাস করি। এতকাল করে এসেছি, আর যতদিন আমরা থাকব ততদিন করব। আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ নিতে হবে। এই এখানকার আইন—অন্য কোন আইন চলবে না এখানে। খোদ লাট সাহেবও যদি এখানে বাস করতে আসেন তাহলে তাঁকেও আমার হাওয়ায় বসে গুড়ুক টানতে টানতে পাখার আড্ডায় বসতে হবে। এখনও এই ভাবটি বজায় আছে আমাদের। আমরা যতদিন আছি। ওই টেলিগ্রামটি রাত্রে না দিয়ে ওই পোস্টমাস্টার গ্রাম-শুদ্ধ লোককে চটিয়েছে। ওই বুড়ো ডাক্তারবাবু আমাদের গ্রামের মাথা। তাঁকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি। শুধু আমরা কেন, এ অঞ্চলের সবাই করে। তাই তাঁর নাত-বৌয়ের সাধ দেওয়া হবে বলে দশখানা গাঁয়ের মাতব্বরেরা মাথা ঘামাচ্ছে। ওঁর টেলিগ্রামটা আটকে রাখা উচিত হয় নি ছোকরার। ওঁর অপমানে আমরা সবাই ক্ষুণ্ণ হয়েছি। কোনও গয়লা ওকে দুধ দেয় নি তা জান? কুমারই ওকে দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরকম ব্যাপার শুধু আজ নয়, বরাবরই চলে আসছে। ডাক্তারবাবুকে অপমান করে' কেউ রেহাই পায় নি

কখনও। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। শুনবে ?"

"বলুন"

"তখন আমি নেহাৎ ছেলে মানুষ, সবে এসে স্টেটের চাকরিতে বাহাল হয়েছি। ডাক্তারবাবুর তখন তুমুল প্র্যাক্টিস্। তিনটে বড় বড় ঘোড়া বাঁধা বাড়িতে। আর সে সব কি সাধারণ ঘোড়া ? বড় বড় পাহাড়ী ঘোড়া। সাধারণ ঘোড়া ওঁকে বইতেই পারত না। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হ'লে আর একটা ঘোড়ায় চড়তেন। সেটা ক্লান্ত হ'লে আর একটায়। এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র ডাক তখন ওঁর। মালদ থেকে পর্য্যন্ত কল আসত। হাতী আসত, নৌকো আসত, পালকি আসত, সে একদিনই ছিল আলাদা। ডাক্তারবাবু প্রায় সমস্তদিন বাড়ির বাইরেই থাকতেন। ফিরতেন রাত্রি বেলা। ফিরেই থিয়েটারের রিহার্সালে আসতেন। ওঁর বাড়িতেই থিয়েটারের আখড়া ছিল তখন"

"উনি থিয়েটার করতেন না কি"

"করতেন মানে"

রমেশবাবু সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিলেন।

"উনি যদি ডাক্তারি না করে' পেশাদার অভিনেতা হতেন তাহলে গিরীশ ঘোষ দানীবাবুর মতোনই হতে পারতেন। সীতার বনবাসে উনি রামের পার্ট যা করতেন তেমনটি আর কখনও দেখি নি। সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালে রোজ রিহার্সাল হ'ত। এ হাসপাতাল তখন ছিল না। তখন ছিল মাটির প্রকাণ্ড একটা চোয়াড়ি। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা ঘর, চার-পাশে বড় বড় বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দার কোণে কোণে ঘর। মাঝের বড় ঘরটায় রিহার্সাল হ'ত। রিহার্সাল দেবার জন্যে বাইরে থেকেও লোক আসত, কাটিহার থেকে সাহেবগঞ্জ থেকে প্রায়ই আসত অনেক ছোকরা। বলাবাহুল্য, বিনা-টিকিটেই আসত সবাই। সবই তো চেনা-শোনা ছিল। এখানকার স্টেশনে এসে কেউ যদি বলত—'ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যাব—কেউ আর টিকিট চাইত না। এই রেওয়াজ ছিল। হঠাৎ এক নতুন টিকিট কালেক্টার বদলি হ'য়ে এল। ছোকরা যেমন তিরিক্কি মেজাজের, তেমনি দুর্মুখ। একদিন তার খপ্পরে পড়ে গেল কাটিহারের ভূষণ। আলিবাবার রিহার্সাল হচ্ছে তখন, ভূষণ আবদারা সাজবে, সপ্তাহে দু'দিন রিহার্সাল দিতে আসে। বরাবরই সে উইদাউট্ টিকিটে এসেছে। নতুন টিকিট কালেক্টার টিকিট চাইতে সে বরাবরই বলেছে, ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব। নতুন টিকিট-কালেক্টার কপালের উপর ভুরু তুলে বলে উঠল—'ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব মানে ? ডাক্তারবাবু কি রেল-কোম্পানীর মালিক, না জামাই ? ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব বললেই ছেড়ে দিতে হবে !' ভূষণ রুখে উঠল এ কথায়। পকেট থেকে পেনালটি শুদ্ধ গাড়ি-ভাড়া বার করে বললে, 'ডাক্তারবাবু কে, তা দু'দিন পরে জানতে পারবেন। এই নিন্, ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন আমাকে।' রসিদটি পকেটে পুরে চলে এল ভূষণ। ডাক্তারবাবু সেদিন এক দূরের কলে গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন—শক্ত রোগী ফিরতে হয়তো দিন দুই দেরি হবে। তবু আমাদের রিহার্সাল বসল। ভূষণ আমাদের কারো কাছে কথাটি ভাঙলে না। চুপি চুপি ভাঙলে কেবল উদিৎ সিংয়ের কাছে। উদিৎ সিং নামে ডাক্তারবাবুর এক সিপাহী ছিল তখন। লিক্‌লিকে লম্বা চেহারা, কিন্তু খাপ-খোলা তরোয়াল একটি। সর্ব্বদাই মারমুখী হ'য়ে থাকত। তার ভয়ে থর থর করে কাঁপত সবাই। ডাক্তারবাবুর জমি বাসন ঘর দুয়ারের সেই ছিল রক্ষক। ডাক্তারবাবুকে ভক্তি করত দেবতার মতো। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল, যেই সে শুনলে যে নতুন টিকিটকালেক্টার ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে অপমানসূচক কথা বলেছে। তারপর দিন হাটবার ছিল। ডাক্তারখানার সামনেই হাট। তারপর দিন টিকিটকালেকটার এসেছে হাট করতে। আর যাবে কোথা। ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর উদিৎ সিং, গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এল তাকে হাসপাতালের সামনে। বললে, 'ডাক্তারবাবুর নামে কাল কি বলেছ হারামজাদা, শুয়ার কি বাচ্চা, এখন তোমার কোন বাপ তোমাকে বাঁচাবে—"। ছুতিয়ে লোকটাকে শুইয়ে ফেললে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেন নি কল থেকে। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া উদিৎ সিংকে রোখবার সামর্থ্য আর কারও ছিল না। উদিৎ সিং লোকটাকে ছুতিয়ে গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বললে, 'যাও

শালা, ঘর ঘরমে যাকে হামলুয়া খাও!' সে কিন্তু ঘরে গেল না, গেল থানায়। থানার দারোগা ছিলেন তখন হরচন্দন সিং। ডাক্তারবাবুর পরম বন্ধু। একটা অজ্ঞাত-কুলশীল লোক তাঁর চাকরের নামে নালিশ করতে এসেছে দেখে একটু অবাক হলেন তিনি। তাঁর এক হাবিলদারকে ডেকে বললেন, তুমি একটু খোঁজ করে' এসো তো, ব্যাপার কি। হাবিলদারের সঙ্গে উদিৎ-সিংয়েরই দেখা হয়ে গেল। বন্ধুত্বও ছিল দু'জনের। তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার শুনে দারোগা হরচন্দন সিং উপরের ঠোঁটের উপর নীচের ঠোঁটটি চড়িয়ে দাড়ির ভিতর আঙুল চালালেন খানিকক্ষণ। চমৎকার চাপ-দাড়ি ছিল তাঁর। তারপর হাবিলদারকে আড়ালে ডেকে বললেন, "এই লোকটিকে আমি হাঁসপাতালে পাঠাব মেডিকেল রিপোর্টের জন্য। তুমি কম্পাউণ্ডারবাবুকে বলে' এস সে যেন এর জামায় খানিকটা অ্যালকহল ঢেলে দেয়; আর আমাকে যেন চিঠি লিখে জানায় যে লোকটা মত অবস্থায় হাটে এসেছিল প্রথমে, তার পর ধাক্কা করতে করতে হাঁসপাতালে এল, তাই উদিৎ সিং ওকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সেই জন্যেই পড়ে গিয়ে নাকে লেগেছে ওর।" হাবিলদার চলে যাবার পর টিকিট-কালেক্টারকে বললেন, "আপনি আগে হাঁসপাতালে যান, সেখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসুন, তারপর আপনার ডায়েরি লিখব।" হাঁসপাতালে ফিরে এল সে। হাঁসপাতালে কম্পাউণ্ডার তখন হাবুল মামা। ওই যে পাকা চাপ-দাড়ি, ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই তখন ছিল কম্পাউণ্ডার। সে লোকটার গা ড্রেস করবার ছুতোয় তার জামায় কাপড়ে বেশ করে' অ্যালকহল ঢেলে দিলে, আর দারোগা সাহেব যেমন লিখতে বলেছিল তেমনি লিখে দিলে। সেই রিপোর্টটি নিয়ে যেতেই দারোগা সাহেব হুকুম দিলেন—একে অ্যারেস্ট করে' 'ঠান্ টি' ঘরে রেখে দাও। আমি এন্‌কোয়ারি করে' দেখি আগে কি হয়েছে। কম্পাউণ্ডারবাবু যা লিখেছেন তাতো ভয়ানক। 'ঠান্‌টি' ঘর মানে ঠাণ্ডা ঘর, যে ঘরে ঢুকলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, অর্থাৎ গারদ। হাবিলদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলে। কিছুক্ষণ পরেই কান্না-কাটি পড়ে' গেল ছোকরার বাড়িতে। তার কচি বউ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হল ডাক্তারবাবুর অন্দরমহলে একেবারে বৌদির কাছে। ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেন নি। বৌদিও তখন ছেলেমানুষ। তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাকে খেতে দিলেন। মেয়েটি বসে রইল। ডাক্তারবাবু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়েও গেল। তিনি ফিরে এসেই ছোকরাকে হরচন্দনের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। উদিৎ-সিং আর ভূষণকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন। আর একটা কাজও করলেন তিনি। ওই টিকিটকালেক্টার কোয়াটার পায় নি, আর একজনের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মানে, একেবারে আপন করে' নিলেন তাকে। সে এখন কোথায় আছে জানি না, কিন্তু যদি বেঁচে থাকে আর খবর পায় যে ডাক্তারবাবুর সতীশ অসুখ তাহলে ঠিক ছুটে আসবে, যেখানেই থাকুক। এই হচ্ছে এখানকার দস্তুর। ওই পোস্টমাস্টার টেলিগ্রামটি আটকে রেখে বেদস্তুর কাজ করে' ফেলেছে। তুমি যদি ওকে বাঁচাতে পার বাঁচাও। কিন্তু ওই রাধানাথ গোপ একটি জাঁতি-কল। ওর খপ্পরে পড়লে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। তবে তুমি জামাই মানুষ, তোমার মান হয় তো রাখতে পারে। দেখ একবার বলে"

রমেশবাবু এ প্রসঙ্গে হয়তো আরও বক্তৃতা দিতেন কিন্তু পিছন হইতে নিখিলবাবুর ধমক খাইয়া থামিয়া গেলেন।

"রমেশ তুমি এখানে বেশ আড্ডায় জমে' গেছ দেখছি। আড্ডা পরে দিও, এখন পরিবেশনের ব্যবস্থাটা আগে ঠিক করে' ফেল দিকি। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, কোন ব্যাচে কাকে নেবে লিষ্ট কর আগে—"

"আজ্ঞে সেইজন্যেই তো এদের কাছে এসেছি। এখানে চাই ক'জন আছে কি না। প্রিয়গোপাল, দেওনাথ, জিলন, ঘোটনলোটন, রামপ্রসাদ—"

প্রিয় গোপাল বলিল, "হামাদের যা বলবেন তাই করব"

এ আলোচনাতেও বাধা পড়িল। হাঁসপাতাল হইতে একটা বুক-ফাটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। সকলেই সেদিকে ছুটিয়া গেলেন। দেখা গেল হাঁসপাতালের বারান্দায় বসিয়া একটি যুবতী কাঁদিতেছে, তাহার কোলে

একটি শিশু। সে যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। গতরাত্রে সে নাকি তাহার সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া ঘরে শুইয়াছিল, একটি শৃগাল কখন যে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটিকে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল সে কিছুই জানিতে পারে নাই। একটু পরেই বাহিরে ছেলের কান্না শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন বাহিরে গিয়া দেখে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ছেলের হাতের খানিকটা চিবাইয়া দিয়াছে, ঘাড়েও দাঁত বসাইয়াছে। ছেলেটি তখনও বাঁচিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—বাঁচিবার আশা কম। খুব বেশী রক্তক্ষয় হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত একধারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি শিউনাথকে বলিলেন,- "বাঘ মানুষ খায় জানি, কিন্তু শেয়ালের এত বড় স্পর্দ্ধা হবে তা ভাবতে পারিনি। আচ্ছা—"। তিনি আরও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোরুদ্যমানা জননীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিখিলবাবু দাঁড়ান নাই, তিনি কাছারির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সাধারণত জনতার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলেন। রমেশবাবু তখনও দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "ওহে, চল চল আর দেরি করা নয়। নিখিলবাবু চলে' গেছেন, হয় তো অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য—"

"আমাকে কি করতে হবে"

"পরামর্শ! তোমার মতো একটা-মাথা সহায় থাকলে ভারী নিশ্চিন্ত হব আমি। নিখিলবাবু আমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছেন। নানা জাতের এতগুলি লোককে পরিবেশন করে' খাওয়ানো, বুঝতেই পারছ। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, তুমি না সহায় হ'লে চলে?"

বিনোদিত হইয়া শিউনাথ বলিল, "কিন্তু আমি মোটা মানুষ, আমি কি পরিবেশন করতে পারব?"

"তোমাকে পরিবেশন করতে কে বলছে। তুমি পরামর্শ দাও, লোক জোগাড় করে' দাও। চল, প্রিয়-গোপাল, লোটন, ঘোটন তোমরাও এস—"

রামপ্রসাদ বলিল, "ডাক্তারবাবুর অসুখ, অথচ বাড়িতে ধুম লেগে গেল দেখছি। অসুখের বাড়িতে সাধারণত কান্নাকাটি হয়, এ ঠিক উল্টো হচ্ছে—"

"হবে না? পুণ্যাত্মা লোক যে। এখন পৃথ্বীশ আর উষনা এসে পৌঁছলে বাঁচা যায়। প্রথম নাতবৌয়ের সাধে ওরা থাকবে না। একথা ভাবাই যায় না। এসে পড়বে ঠিক"

"সাধ কবে"

"আগামী শুক্রবার। চল, চল, নিখিলবাবু চটছেন এতক্ষণ"

সকলকে লইয়া রমেশবাবু কুঠির দিকে অগ্রসর হইলেন। জমিদারের কাছারি এখানে কুঠি নামে পরিচিত।

ভিতর হইতে পদ্মা আসিয়া কৃষ্ণকান্তকে চুপি চুপি বলিল, "দিদি আপনাকে ডাকছেন—'

কৃষ্ণকান্ত অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বুঝিলেন অনেকক্ষণ অদর্শনের ফলে কিরণ চঞ্চল হইয়াছে।

ক্রমশঃ

তারপর আরও

দিব্যেন্দু পালিত

দেবার মতো ছিল না তার কিছুই ;
সে নিজেও দিতে চায়নি।
তবুও হৃদয় দুয়ারের খিল স'রেছে ;—
ক্ষমা চেয়ে তবু পায়নি।
সে যেখানে থাকে, দু'চোখ সেখানে মুগ্ধ ;
আর চারিদিক নিঃস্ব!
হারাই হারাই, পেলাম না, ভয় মনে ;—
দু'হাত বাড়িয়ে নিল সারা প্রেম,- বিশ্ব।

পেল যতোটুকু, আর একটু চাই, ভাবলে—
তারপর আরও, আরও, শেষকালে আরও!
ভেসে গেল বুক, তবু কামনায় অন্ধ—
আর সে পেল না, মাথা কুটে একবারও।
বিকেলের রঙ সন্ধ্যায় মুছে গেল ;
সন্ধ্যা সকালে, কতো বড় এলো, দিন গেল বৎসরে—
চাতকিনী প্রাণ ঘুরে ঘুরে হলো ব্যর্থ আকাশ পথে—
ভালবাসা আজ ডুকরে ডুকরে, শোকে বুক ফেটে মরে।

কলিকাতায় মাছ আমদানী

কালীচরণ ঘোষ

কলিকাতায় যত মাছ বিক্রীত হয়, তাহার সমস্তই কলিকাতার বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়; গঙ্গায় ইলিশ সময় সময় মিটে-কোঁচা অভাব দূর করে। কলিকাতায় এখনও পুষ্করিণীর চিহ্ন আছে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার জল সম্পূর্ণ নিরামিষ, অর্থাৎ পনেরো বিশ বৎসর আগে যে সকল পুকুরে, বিশেষতঃ কলের ধোবায়, যেমন প্রভৃতি কর্পোরেশনের এবং পরেশনাথের পুকুরে যে মাছ দেখা যাইত, তাহা আর নাই। মাছের সে স্থান পূর্ণও হয় নাই। জলের কলের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পুষ্করিণী, সময়-সময় সংস্কারক, বিশেষতঃ কলেরা বিস্তারের সহায়তা করে এই অনুহাতে, এবং পুকুর ভরিয়া মাঠ করিতে পারিলে প্রচুর ঘরে জমি বিক্রয় হইতে পারে, এই সকল বিষয় ভাবিয়া সরকারী, আধা সরকারী এবং ব্যক্তিগত মালিকে মিলিয়া কলিকাতার অধিকাংশ পুকুর মাটি দিয়া ভরিয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং পুকুরের যে মাছের সাহায্য হইত তাহা হইবার সম্ভাবনা দূর হইয়াছে।

এখনও কয়েকটী, মাত্র কয়েকটি, পুকুর কলিকাতায় আছে, তাহার উপর বর্দ্ধিত কলিকাতার এক "লেক" যোগ হইয়াছে। এই সকলের সহিত সাধারণের কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবল মাঝে মাঝে সরকারী প্রচার-পত্রিকা দ্বারা জানিতে পারা যায়, অচিরকালের মধ্যে এই সকল পুষ্করিণীতে এত মাছ জন্মিবে যে, তাহাতে আর কাহারও মাছের অভাব থাকিবে না। সরকারী বিজ্ঞান চেষ্টা শেষ হইয়াছে, এইবার যে-সরকারী চেষ্টা উদ্যানবাটীতে পরিণত হইয়াছে। সরকারের মৎস্য বিভাগ মৎস্য "চাষ" সম্বন্ধে কত বড় করিতকর্মা তাহার প্রমাণ ইহা হইতেই পাওয়া যায়।

যাহাই হউক, সরকারী পরিচয় যাহা পাইবার তাহা আর কালারও অপেক্ষা নাই। কলিকাতার সন্নিকটে যে সকল "জলা" অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অগভীর জলাশয় ছিল, তাহা ব্যক্তিগত মালিকের। কিন্তু সে সকল বন্ধিয়া যাইতেছে, আর তাহাতে মাছ ত জন্মেই না। উপরন্তু কচুরী পানা, হোগলা, শর, পাতি প্রভৃতি জন্মিয়া তাহা বিপদের আকর হইয়া উঠিতেছে। কাছে যে সকল নদীতে প্রচুর মাছ জন্মিত তাহা ক্রমেই জলাট হইয়া উঠিতেছে, আর মাছ জন্মে না। সুতরাং কলিকাতার যত নিকটে সেখানে "মাছ-চাষের ক্ষেত" সকল লোপ পাইতেছে, আর অগণিত মৎস্যাশী লোক বৃদ্ধি পাইতেছে, সেখানে মাছের জন্য হাহাকার পড়িবে এবং মৎস্যের দর যে আট দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। সবার উপর, পাকিস্তানী মাছ ভারতের বাজার প্রায় পরিত্যাগ করায় সমস্যা একেবারে ঘোরালো পূর্ব হইয়াছে।

তবুও কলিকাতায় মাছ আসে। রেলে করিয়া আসিতে একদিনে পচিয়া না যায়, এমন দূর হইতে মাছ আসে বলিয়া এখনও কলিকাতায় লোক চর্মচক্ষে মাছ দেখিতে পায়। সাধারণতঃ নদীতে মাছ ধরিয়া নৌকার গহ্বর বা খোলে ভর্তি করিয়া পাইকারী মৎস্য বিক্রয়কেন্দ্রে আনিয়া জেলেরা মাছ বিক্রয় করিয়া যায়। আবার "ভেড়ি" যাহারা জমা লইয়া রাখিয়াছে, তাহারা নিয়মিত মাছ ধরিবার সুযোগ পায় এবং রেলের সাহায্যে কলিকাতার মাছ চালান দিয়া থাকে। এ সকল জলা, ভেড়ি বৎসরে বা তিন বৎসর অন্তর "ডাক" হয় এবং খাজনার তারতম্যে লোক বুঝিয়া "জমা" দেওয়া হয়। সুতরাং যাঁহার ভেড়ি, তিনি এক মস্ত টাকা লইয়া নিশ্চিন্ত।

তাহার পর যাহারা মাছ ধরিল, তাহারা সেইখানে বা নিকটবর্তী স্থানে কড়িয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। দ্বিতীয় দলা মাছের ঘর চড়িল।

এখন মাছের কলিকাতায় আসার পালা। একদিন প্রাতঃকালের একটী চিত্র দেওয়া যাইতে পারে। কলিকাতার নিকটে একটী রেল ষ্টেশন। ভোর বেলা, কয়েকজন ম্যাটকর্মে পায়চারি করিতেছেন, কেহ উত্তরে কলিকাতা আর না হয় দক্ষিণগামী ট্রেণ ধরিয়া ক্যানিং বা মাংলা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি যাইবেন। লম্বা ম্যাটকর্ম, মধ্যস্থলে টিনের চাল দেওয়া তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীর বিশ্রামের বিস্তৃত স্থান। সেখানে আবার সম্প্রতি বিজলী পাখা দেখা দিয়াছে। ম্যাটকর্মের মধ্যস্থলে উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে ভাগ করিয়া বিরাটকায় কাঠের দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে। দুই পাশে কতকটা ফাঁক থাকায় যাত্রীর পক্ষে এ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যাইবার অসুবিধা নাই।

সকালে কেবলমাত্র চা-গরম, সঙ্গে পাঁউরুটী-বিস্কুট পাওয়া যাইতেছে। সংবাদপত্র এবং বহিং অহীর্ণ, আম, পেটকাপড়ানি, বস্ত্রবয়ন, কাটা ঘা, পোড়া ঘা প্রভৃতি ঔষধ বিক্রয়কারীরা থাক বা ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া দিনের বেসাতি লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চীনাবাদাম, চানাচুর, নকলদাঁতা, মাদুলী, কবচ, কাপড়পুঁথি, বোতাম, বাঁশী, বুমবুমি, দাদুস প্রভৃতি বিক্রেতারা তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। একজন যাত্রী পায়চারি করিতেছেন; হঠাৎ দেখা গেল ম্যাটফর্মের দক্ষিণাংশে প্রায় শতখানেক "ঝুলি" আসিয়া ইতস্ততঃ চড়াইয়া পড়িল; মাথার উপরে অজস্র কাক চাঁচামেচি সুরু করিল; কতক ইলেকট্রিকের তারে বসিয়া পড়িল; এবং অন্ততঃ পঞ্চাশটী চিল আসিয়া মাথে মাথে নিম্নে ছোঁ মারিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ কারণ বুঝিতে পারা যায় নাই, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ঝরঝা খোলা, পা-ধোয়া প্রভৃতি ভরা, মানুষের মাথের উপর মানুষ চড়াইয়া, নানারূপ পাত্র লইয়া যখন একখানি ট্রেণ দক্ষিণ হইতে আসিয়া ম্যাটফর্মে পৌঁছিল তখন আর কারণ বুঝিতে বাকী রহিল না। আশ্চর্য্য হইল, ম্যাটফর্মের

উত্তরাংশে এই কারণে কুলির ভিড় হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের সঙ্গেও উপযুক্তসংখ্যক কাক চিল ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অভ্যাসের ফলে কি গুরুতর শ্রম করিতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিপক্ষতা করিতে পারেন তাহা এই ম্যাটকর্মেই প্রমাণ পাওয়া গেল। গাড়ীখানি মাছ বোঝাই হইয়া আসিয়াছে। তত পুরুষ তত স্ত্রীলোক। গাড়ীর দরজা সবই খোলা। গাড়ীর ভিতর হইতে টানিয়া দরজার নিকট নানা আকারের ঝুড়ি, ঝোড়া টিনের বড় পাত্র (ট্যাঙ্ক বা "ট্যাঙ্কি", কুলির সাহায্যে ম্যাটকর্মে নামাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। এই কাজে স্ত্রীলোকের বৈধিক ("ঋষিক" বা ঋষ সংক্রান্ত) শক্তি পুরুষ অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন নহে।

তাহার পর কুলির সাহায্যে মাছ ম্যাটকর্ম হইতে বাহিরে লইবার জন্য ব্যবস্থা হইতে চলিল। সে এক বিরাট কলরব ; ট্রেণ পৌঁছাইবার অব্যবহিত পূর্ব হইতেই ম্যাটকর্ম একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল। কাক, চিল আর কুলি আসিয়াছে বলিলে নবাগতের তালিকা পূর্ণ হয় না। এটা শীতকালের কথা ; কালো গরম কাপড়ের পোষাক পরা, কাঁধে ধাতুর অক্ষর আঁটা কয়েকটী "সাহেব" আসিলেন। কয়েকটী উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘুরিতেছিল, মনে হইতেছিল ভিক্ষা তাহাদের উপজীবিকা—আর তাহা না হইলে তাহাদের উপজীবিকার প্রকাশ্যতঃ কোনও পথ নাই, যাহাকে চলতি কথায় বলে "no ostensible means of livelihood" তাহারা বেশ সজাগ হইয়া উঠিল, কোথা হইতে সংগৃহীত ছোট টিনের পাত্র বা ঝোড়া হাতকড়ার কুলি লইয়া ঘুরিতে লাগিল। এতক্ষণ একজন যাহাকে পাগলী মনে করা যাইতেছিল, অবান্তর বকিয়া হাতে একটা গাছের বড় ডাল লইয়া দেশ, সমাজ, দুরন্ত লোক প্রভৃতি শাসনের অভিনয় করিতেছিল এবং উপযুক্ত বক্তৃতা দিতেছিল, সেও দেখা গেল মাছের পাত্রের আশে-পাশে ঘুরিতেছে এবং মাটীতে পতিত মাছ পাইলে মালিকের অলক্ষে, স্নেহসংলগ্ন একটী অর্দ্ধ কুলিতে ফেলিয়া পাগলামির পুনরাবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। তখন মনে হইল "এ পাগলী ত পাগলী নয়," দেবতা মিস্তাই নয়, কিন্তু একেবারে কাজের পাগলী। "সাহেব" হইতে নানা রকম বাঙ্গালী সকলেই আপন আপন উপায়ে মাছ সংগ্রহ কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ম্যাটকর্মের মধ্যেই কয়েকজন লোক কয়েকটা ঝোড়া বাছিয়া ঘর করিল, অনেক ক্ষেত্রে বনিবনা হইয়া যাওয়ায় সে সকল পাত্র কিছুক্ষণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিবার পর কুলি সাহায্যে স্থানান্তরিত হইল। এখানে মাছের তৃতীয় দফা দর চড়িল।

কুলির মাথায় মাল উঠিতেই কাক চিলের কার্যারম্ভ হইল। কাক অপেক্ষা চিল এ বিষয়ে তৎপর ; অনাবৃত পাত্র হইতে ছোঁ মারিয়া কেহ কেহ কৃতকার্য হইল। মাল চলিল দুই দিকে। প্রতি ফুট দুই হইতে তিন বার মাল বহন করিল ; কোনও বোঝা বেড় মণের কম ওজন হইবে না। মাছ আসিল ভেট্‌কি, ওজন, পারসে, টাংরা, চিংড়ি, মেলে ভেড়ো, বোল, লাঠা প্রভৃতি এবং টিনের পাত্রে "ঔলি" যায় কই, মাগুর, সিঙ্গী। কোনও কোনও পাত্রে বরফ দেওয়া আছে ; অনেক ক্ষেত্রে মাছ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, ষ্টেশনে বরফ আনিয়া মাছ ঢাকা দেওয়া হইল। মুটের মাথা হইতে অবশ্য ধারায় আঁশটে জল বেহ বহিয়া পড়িতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। বাঙ্গালী কুলি এমনই দেখিতে পাওয়া যায় না ; মাছ বহন কার্যে একটিকেও দেখা গেল না।

একদল ম্যাটকর্মের বাহিরে অপেক্ষমান লরীতে মাছ বোঝাই করিয়া লইল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক, এক বোঝা দুই বোঝা মাছ লইয়া কলিকাতার বাজারে খুচরা বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। অপর দল ষ্টেশনের দক্ষিণবর্তী আড়তে চলিয়া গেল। সেখানে মাছের পাইকারী নিলামের ডাক হইবে। আড়তদার ঠাকিলে দর স্থির হইল। এখানে আবার মাছের দর চড়িল। দেখা গেল, অধিকাংশ লোকই মাছের ঝাঁকা উঠাইয়া লইয়া গেল, টাকা দিল না ; কেহ কেহ দিল। কিন্তু যাহারা মাছ লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা আড়তদারকে ছাঁকিয়া রহিল। তাহারা তক্তপোষে ফেঁড়া মানুষের পুরাতন কাঠের বাক্সের ধারে বসিয়া আড়তদার একে একে দর চুকাইয়া দিতে লাগিলেন। তখন মুটের মজুরি পরিশোধ করিয়া (ইহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়) কলিকাতা হইতে দেশের দিকে যাইবার ইপ্সিত ট্রেণ চাপিয়া ব্যাপারী ফিরিল। নূতন ব্যাপারী মাল লইয়া গিয়া বাজারে খুচরা বিক্রেতার নিকট প্রয়োজন হিসাবে মাছ ছাড়িয়া দিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর বাজারের শেষে অথবা সপ্তাহের শেষে আদায় হইবে। প্রায় ব্যাপারীর বাঁধা খরিদ্দার আছে, সুতরাং এখানে তাহাদের পক্ষে কাজ তত জটিল নয়। বলা বাহুল্য দরের ভারি বোঝা, এখানে আবার ভারি হইয়া উঠিল।

বাজারে মাছ ছাড়িয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপারী আড়তদারের নিকট যায়, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে। আড়তদার মাছের ওজন হিসাবে, নয় মাছের দরের উপর কমিশান হিসাবে (ad valorem) আপনার প্রাপ্য বুঝিয়া লন। সাধারণতঃ টাকায় এক আনা বা দেড় আনা হিসাবে দিতে হয়, অনেক সময় তাহা অপেক্ষা বেশীও পড়ে। বিশেষতঃ যে ব্যাপারী টাকা দিতে বিলম্ব করে, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার নির্দিষ্ট থাকে।

বলা বাহুল্য, ব্যবসায় এখন আর কেবলমাত্র বাঙ্গালীর মধ্যে নিবদ্ধ নাই। মাঝে মাঝে এক এক স্তরে অবাঙ্গালী প্রবেশলাভ করিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে আপনার আসন দখল করিয়া লইতেছে। ইহাতে যাহারা দুঃখিত হন তাঁহারা বড়ই অযুক্ত। যাহার শক্তি আছে, জীবন ধারণের জন্য সে তাহা প্রয়োগ করিবে ; শক্তিহীন পথ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইবে।

মাছের বাজারের ইহা একটী দিক ; কিন্তু ইহা হইতেই নানা স্তরে মাছের দর কি ভাবে বাড়িতে থাকে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পল্লীতে উৎপাদিত প্রায় সকল পণ্যের দর এইভাবে বৃদ্ধি পায় বলিয়া শেষ ক্রেতাকে উৎপাদনের দর অপেক্ষা বহু বেশী দর দিতে হয়। যে মাছ পচিয়া যায়, তাহার ক্ষতি ব্যবসায়ী বেশী দর করেন না, শেষ পর্যন্ত বিক্রয়যোগ্য মাছের উপর চাপাইয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং

যাত্ত যেখানে প্রথম ধরা পড়ে, সেখানে সহজে বহু পাইবার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ট্রেণের মধ্যে "হাওড়া" ঘর কয়লিনে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু কলিকাতাতেও অধিকাংশ বাড়ীতে ধরা পড়িবার ব্যবস্থা আজও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তাহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সকল ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ করিতে পারিলে পচনশীল দ্রব্যের এখন যে ক্ষয় আছে, তাহা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। উৎপাদন বৃদ্ধি চেষ্টা মূলা হ্রাসের একটি উপায়। উৎপাদিত দ্রব্য অপচয় হইতে রক্ষা করা ইহার দ্বিতীয়, অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয়—উপায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই দিকে সরকারী মনোযোগ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, কিন্তু প্রয়োগ বিষয়ে কোনও তৎপরতা আছে বলিয়া মনে করিবার কোনও হেতু নাই।

কার হয় মৃত্যু

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বাহিরের জগতের সাথে সম্পর্ক জীবের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক। তাদের অর্জিত সমাচার মনের গোচরে এলে তবে অনুভূতি হয় বাহির হতে সংগ্রহ করা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, গন্ধের। মন যদি ব্যস্ত থাকে—উপলব্ধি হয়না তেমন আহরণ করা সমাচারের। নিদ্রাতুরের ইন্দ্রিয় স্পর্শ করে, শোনে, ঘ্রাণ করে—কিন্তু সে অভিজ্ঞতা পৌঁছে না দেহীর মনে। মন থাকে সুপ্ত। মন না জাগলে আসে না জ্ঞান। তাই মনও এক ইন্দ্রিয়। এ নির্ণয় হিন্দু শাস্ত্রের।

মাত্র ইন্দ্রিয়-লব্ধ বোধ ব্যতীত অন্য এক প্রথা আছে জ্ঞানের। সে সংস্কার। বহু ইচ্ছা জাগে অন্তরে—যার অনুভূতি আসে অন্তর হ'তে। শ্রীমন্দিরে দেবতার সম্মুখে জাগতে পারে নরহত্যার বাসনা—আবার পশুশালায় নাংদাপ্ত সিংহের দৃষ্টি ঘ্রাণ এবং শব্দের মাঝে জাগতে পারে জগজ্জননী সিংহবাহিনীর দিব্যমূর্ত্তি।

আর একটা বিষয়ও আশ্চর্য্য করে মানুষকে সে যখন স্থির হয়ে ভাবে। ব্যাপারটা সাধারণ, এ রহস্যটাই জীবন। সুতরাং প্রসন্ন মনে ওঠে না। আজকের আমি—বিশ বছরের পূর্ব্বের আমি, গত কল্যের সকল কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, সারা জীবনের সুখদুঃখের ভোক্তা আমি—এ জ্ঞানের মূলে কোন্ সত্য বিদ্যমান? স্মৃতি এনে দেয় জ্ঞান—কার স্মৃতি? এই একত্বের মূল কোথা? আমাকে ঘিরে। কে সে আমি। কলাকাষ্ঠার পরিণাম হচ্ছে—পরিবর্ত্তন হচ্ছে সারা বিশ্বের। কিন্তু সকল পরিবর্ত্তন যাকে ঘিরে সে যে আমি, ইংরাজি ভাষায় ইগো। এই অহং বলছে কে, ভাবছে কে, উপলব্ধি করছে কে? সুতরাং অহঙ্কার জীবনের সকল স্মৃতির কর্ত্তা। অহংকারই জীব।

আরও আছে বিশেষত্ব, সেই অহমের। শিশুকাল হ'তে চিরকাল প্রত্যেক "আমি"র চিন্তা ও আচরণের ধারা আছে, যাকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তার পার্থক্য অপরের চিন্তা বা আচরণের ধারা হ'তে। যেমন সম্পূর্ণ এক আকারের দুটি নরদেহ দেখা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ এক প্রকারের দুটি জীব পাওয়া যায় না—যার চিন্তাধারা এবং আচরণ একেবারে অভিন্ন। এর মূলে আছে সংস্কার বা প্রত্যেক অহমের নিজস্ব। এই সংস্কার নিশ্চয় পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিণত জ্ঞান।

বিশ্লেষণ যত করা যায় ততই আশ্চর্য্য হতে হয় যে অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি এবং স্থূলদেহ ঘিরে থাকে সূক্ষ্ম এক তত্ত্বকে। সে তত্ত্বের এরা সঙ্গী—জ্ঞান এবং কর্ম্ম তাকে ঘিরে। এ বোধ সকল দর্শনের। কিন্তু এদের বিভিন্ন মত। দেহের উপাদান স্থূলজাত। অণু-পরমাণুর সমষ্টি নরদেহ—তথা বৃক্ষ বা পাথরের দেহ। এরা জড়। কিন্তু জীবের দেহে পরিণত হ'লে জড় অণু-পরমাণুতে জ্ঞান আসে কোথা থেকে? অজ্ঞানে অজ্ঞানে সংযোগ সৃষ্টি করে জ্ঞানের অহমের বুদ্ধি? তাই মনে হয়, এ কথাটাই সত্য যে থাকে ঘিরে দেহ, সে জ্ঞানী।

দেহের জন্ম হয় এ জগতে—অথচ জন্মের সোসর মৃত্যু। মৃত্যুর পর দেহকে কেহ দাহ করে, কেহ পোঁতে মৃত্তিকা গর্ভে, কেহ বা নিভৃত নিভৃত প্রাঙ্গণে তাকে রাখে—যার ফলে ধ্বংসাদি জাবে উদরসাৎ করে প্রাণহীন দেহ।

তাই প্রশ্ন ওঠে, এ প্রাণ কি ? মৃত্যুর সাথে কি এর চিরতরে পরিসমাপ্তি ?

হিন্দু শাস্ত্র বলে মরে দেহ। কিন্তু যার দেহ সে শাশ্বত, অমর। জীবাত্মা ঘিরে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। এক দেহ যায়, আবার অন্য জড় দেহ ধারণ করে আত্মা। জীর্ণ-বসন পরিত্যাগ করে নর যেমন নব বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি। আত্মা অবিনশ্বর—নশ্বর দেহ, রক্ত মাংস প্রভৃতিতে যেরা পরিচ্ছদ।

আত্মা চিরজীবী, এ শিক্ষা গীতার।

খৃষ্ট ধর্ম বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর শাশ্বত জীবন আছে। এ বিষয়ে সকল তত্ত্ব আর্য্য শাস্ত্রের অনুরূপ না হলেও, এ বিশ্বাস হিব্রু ও খৃষ্ট ধর্মে দৃঢ় যে যদিও জন্মিলে মরতে হয়, মৃত্যু জীবনের শেষ কথা নয়। জীবন আছে মৃত্যুর পর—যার সুখ-দুঃখের নিয়ামক এই জীবনের কর্ম-ধারা—অহমিকার প্রবৃত্তি ও মতির গতিতে যার প্রবাহ। ভারতবর্ষ বলে বহু জন্ম পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে হয় নিজের কর্ম ফলে। হিব্রু ও খৃষ্ট ধর্ম ভক্ত বলে একটি মাত্র জীবনের ফল চিরদিনের আনন্দ নিরানন্দের গতি স্থির করে। মোট কথা এঁরা মানেন যে এ জগতে যে মরে সে বাঁচে অন্য-ধামে—যায় নরকে বা স্বর্গে। আমি যতটুকু জানি—মুসলমানেরও ঐ মত—দেহ যায় আত্মা থাকে মৃত্যুর পর।

বৌদ্ধ মানে না শাশ্বত আত্মা। ভগবান বুদ্ধ দেশের দর্শনের কথাই বলেছেন—মরণ দেহের। ব্যক্তিত্বের নয়। প্রত্যেককে সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে সংসার জগতে—বহুবার, বহু যোনিতে। হিন্দু বলে—জীবন আত্মা ঘিরে। বৌদ্ধ বলে—দেহ স্কন্ধ ঘিরে। মানুষ নিজের কর্ম ও চিন্তার ফলে একটা সমষ্টি ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। জীবন একটা প্রবাহ, পরিবর্তনশীল। শেষ অবধি এই বাসনা ও কর্মগড়া সত্তা যতক্ষণ থাকবে—মরণ ও পুনর্জন্মের অভিনয়। সব বাসনা ও কর্ম ফলের নিবৃত্তিতে মুক্তি—নির্বাণ। হিন্দুও বাসনা-মুক্তিকে নির্বাণের লক্ষণ বলে। কিন্তু সে বলে মুক্তি শাশ্বত আত্মার—যে আত্মা পরমাত্মার অংশ। নদী এবং মহাসমুদ্র একই প্রবাহে আবদ্ধ। নদীর প্রবাহ যখন সাগরে মিলে যায়, সে পৌঁছে যায় স্বস্থানে। তাই গীতার নির্বাণ—ব্রহ্মনির্বাণ।

হিন্দু ও বুদ্ধ মানে মরণের পর জীবন। তার রূপ দেয় কর্মফল। একই সত্তা কভু পায় পণ্ডিতের রূপ, কভু পায় গর্দভের। ভগবান বুদ্ধ জাতক-কথায় বুঝিয়েছেন যে তিনি বহু রূপ ধারণ করেছিলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে।

ভারতবর্ষের লোকায়ত সম্প্রদায় চার্ব্বাকপন্থী। তারা মানে না আত্মা বা ঈশ্বর। জড়ের প্রকৃতিই জীব-প্রকৃতি। তাই বৃহস্পতির মুখে চার্ব্বাক বলেছিলেন—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ।

যতদিন জীবন আছে সুখে বাস কর। ঋণ করে ঘৃত পান কর। ভস্মীভূত দেহের আবার পুনরাগমন কি।

জীবনের উৎকৃষ্টতা কোন উপায়ে লাভ হয় সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান বুদ্ধ একমত—চরিত্র গঠন। উভয়ের শিক্ষা নিজের উৎসাহ, উদ্যম ও কর্মপ্রেরণা ব্যতীত মুক্তি-লাভ অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে বলেছেন—ভক্তি চরিত্র-পথ দেখিয়ে দেয়। শরণে মানুষ পায় অন্তরের সহায়তা। শরণ সত্যই সমাধি। সকল কর্ম ব্রহ্মার্পণের ফলে আত্মদৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছেৎ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

তাঁর শরণ গ্রহণ কর সকল ভাবে, হে ভারত। তাঁরই প্রসাদে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হবে। যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ। সর্ব্বভাবকে এক-কেন্দ্র ক'রে ব্রহ্ম শরণে অন্য ভাব বর্জ্জিত হয়। তখন দিব্য-দৃষ্টি লাভ হয়।

এইরূপ শিক্ষা গীতার সর্ব্বত্র। কর্ম অপরিহার্য্য। কিন্তু তার দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুঝিয়ে দেয়—তৎত্বমসি—ব্রহ্ম।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলম্। ৭।২৯।

যাঁরা জরা মরণ হ'তে মুক্তি পাবার জন্য আমাকে আশ্রয় উপলব্ধি দ্বারা সাধনা করেন তাঁরা "তৎ" শব্দের লক্ষ্যস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ আমাকে জানেন এবং তার ফলে অধ্যাত্ম বিষয়ক সকল কর্ম্মের জ্ঞান লাভ করেন।

মানবের শেষ লক্ষ্য যদি হয় জীবাত্মার উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির ফলে পরমাত্মার পরিচয়, তাহ'লে একান্ত

শরণ উদ্বুদ্ধ করে মানবের মনে প্রকৃত জ্ঞান। সেই জ্ঞান হওয়া চাই পূর্ণ—যার ফলে অর্জ্জিত হয় পূর্ণতা। কারণ পরব্রহ্ম পূর্ণ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

পূর্ণ তাহা পূর্ণ ইহা
পূর্ণ হ'তে পূর্ণ ওঠে জানি।
পূর্ণ হ'তে পূর্ণ নিলে
পূর্ণ থাকে বাকী।

মানুষের অন্তরে যদি বিদ্যমান থাকেন আত্মা—তাহ'লে মৃত্যু হয় মাত্র দেহের। ধ্বংস হয় এ জীবনের ইন্দ্রিয় কর্ম্ম, কিন্তু তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান থাকে ভবিষ্যৎ জীবনে সংস্কার রূপে। ক্রমে সেই নিজের বাসনা ও তৃষ্ণায় গড়া অহংকে মায়াময় এই বিশ্বের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করলে আত্মা হয় প্রকাশ।

নিছক ধর্ম্মের ভিত্তিতে গড়া ধর্ম্ম বলে আমিত্বের বিচার হয়—বাহ্যিক পায় শাশ্বত পবিত্র ধাম। দুর্বৃত্তের চিরবাস নরকে। বৌদ্ধ বলে জীবনটা বাসনা কামনা ও তৃষ্ণার প্রবাহের পর প্রবাহ। তৃষ্ণা ত্যাগ হ'লে প্রবাহ বন্ধ হয়—আসে মোক্ষিতা, পরে নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণ অনির্ব্বচনীয় অবস্থা।

আত্মা অবিনশ্বর। গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সে পরিচয় একটু আলোচনা করলে জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হবে। তখন বোঝা যাবে মৃত্যু মাত্র বেশ পরিবর্ত্তন। জীর্ণ আবাস হ'তে নতুন গৃহে গৃহ-প্রবেশের জন্য পুরাণ আবাস পরিত্যাগ। অথচ—

পুরাণ আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।

শ্রীভগবান বল্লেন—

আত্মা কদাচিত না জন্মে না মরে। এ পূর্ব্বে ছিল না বা ভবিষ্যতে থাকবে না—এমন নয়। আত্মার জন্ম নাই (অজ) আত্মা নিত্য শাশ্বত এবং পুরাতন। দেহের হত্যায় আত্মা নিহত হয় না।

কাজেই আত্মাকে অবিনাশী, অজ এবং অব্যয় জানলে বধ করা বিনাশ করার প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য অন্যায় রূপে দেহ নষ্ট করিলে নরহত্যার পাপে জীবকে ভীষণ পীড়া সহ্য করতে হয়। সে কথা স্পষ্ট। দেহ মরে, আত্মা মরে না—এ সত্যও ধ্রুব।

শস্ত্রসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না—অগ্নির সামর্থ্য নাই আত্মাকে দহন করবার, জল পারে না আত্মাকে আর্দ্র করতে। বায়ুর কী ক্ষমতা তাকে শুষ্ক করবে।

দেহ ছেদন ক'রে কষ্ট দিতে পারে আততায়ী। কিন্তু হিংস্রককে ভোগ করতে হয় প্রতিফল। এ মায়ার খেলা। অসাবধানী অগ্নিতে পুড়তে পারে, দেহের কষ্ট হয় তাতে। কিন্তু কর্ম্মের শুভ অনুষ্ঠানে এবং সুকৃতির ফলে দৈব দুর্বিপাক হ'তে জীব আত্মরক্ষা করতে পারে। অগ্নিদহন, শস্ত্রপীড়ন প্রভৃতি পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল নিঃসন্দেহ। কিন্তু আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য। নিত্য বস্তু আত্মাতো শুকিয়ে যাবার বস্তু নয়। যেহেতু পরমাত্মার স্বরূপ জীবাত্মা তাই মায়ার আবরণ মুক্ত হ'লে আত্মা সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অপরিবর্ত্তনশীল এবং চিরন্তন।

বলা বাহুল্য এ নিত্য বস্তু ঠিক বাক্যের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সীমাবদ্ধ মনে চিন্তারও অতীত।

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ব্রহ্মার মুখে শুনি—

প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্টে যত জীবরূপ
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ।

উপনিষদ সমূহকার জীবকে যখন শুনি—

অণোরণীয়ান মহতোমহীয়ান আত্মা
গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

সূর্য্য হ'তে সূক্ষ্মতর মহৎ হ'তে মহত্তর আত্মা জন্তুর অন্তরে অবস্থিত।

মৃত্যু হয় দেহের। আত্মা অবিনশ্বর। জন্ম-জন্মান্তরে চিরতরে মানুষের স্থির একতার উপলব্ধি হয়—কারণ এ শরীর, এ দেহ এ সংসার মায়াময়ের মায়ার খেলা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও কবিশেখর

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, কাব্যবেদপুরাণতীর্থ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"অশ্বত্থ" কবিতায় ভাব, ভাষা, রচনাভঙ্গী, আকৃতি, প্রকৃতি সমস্তই বনস্পতির উপযোগী। ইহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী মিলন হইয়াছে। কবি বলেন, ভারতের অশ্বত্থ একাই একটা আশ্রম রচনা করে। অশ্বত্থের শেষ স্তব চরণ মাত্র উদ্ধৃত করি।

ইষ্টক শিলায় নয় গড়ে তুমি মন্দির সুন্দর,
অন্ধকারে বন্ধঘরে বন্দী দেব যাচিত কাতর।
তুমি গড়ো শ্রীমন্দির বিশ্বারি সে হেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি অন্তে তব লভে শান্তি-সুখ।
যুগে যুগে মূঢ় নর গড়ে শুধু দেব-কারাগার,
চূর্ণ জীর্ণ করি তায় দেবতারে করিও উদ্ধার। (বৈশাখী)

'গোপীচন্দ্র' সহজিয়া বাউলদের নিজস্ব সাধনা সংস্কৃতির, 'তুলসী' বৈষ্ণবসংস্কৃতির এবং 'জবা' শাক্তসংস্কৃতির প্রতীক। পৌরাণিক সংস্কৃতির কবিতা বিশ্বামিত্র, ঋষীচি, দুর্ব্বাসা, ভাষ, একলব্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, কার্ত্তিক, মেনকা, কৃষ্ণা, রাজর্ষি-ভরত, সীতা, লক্ষ্মণ ইত্যাদি।

বিশ্বামিত্রের চারিটি চরণ উদ্ধৃত করি।

তব যোগভঙ্গবলে চতুঃষষ্টি কলাসিদ্ধ জন্মে কালে কালে,
শিঞ্জি-শঙ্খেরা তারে বক্ষপুটে স্নেহনীরে পক্ষপুটে পালে।
আজো গায়ত্রীর লহ অতিবলা বিদ্যা তব তপ প্রভাবে,
সত্য-শিব পুত্র-সতী মিলনের প্রজাপতি রাজর্ষি-ভরতে।

রাজর্ষি ভরত কবিতার শেষ চারি চরণ :—

বৈরাগ্যের প্রেম যদি অনুসরে নিয়মিত
প্রেম-শুষ্ক ত্রাণ কোথা পায় ?
সব চাই হতে তারে তাড়াইলে বারে বারে
মুগমঞ্চে বাঁধিবে কুলায়। (পর্ণপুট)

'মেনকা' কবিতাটিতে মেনকা মাতৃত্বের প্রতীক। কবি বলিয়াছেন—মা মেনকার অশ্রুধারাই বর্ষার হিমালয়নিঃসৃত বারিধারারূপে বঙ্গ-ভূমিকে মাতৃমমতায় উর্ব্বরা করিয়াছে। তাই বাংলার প্রকৃতিতে ও বাংলামায়ের ঘরে ঘরে বৎসলতার উৎস যাহার পরিবিক্ত সেই মমতাকে নানারূপে দেখিতে পাই। শুধু তাই কেন—কবি বলিয়াছেন—মা মেনকা,

বঙ্গমাতার হলো সোনা নয়নময়া তোমার স্নেহে।

শুধু মানবী জননী নয়—

বন-জননীর ভুজলতায় ফুটলো স্নেহ শ্যামলতায়,
মোহমায়ার গুণ্ঠনখানা ভাসল সোহাগ উথ্‌লে পড়ে।
ছায়া-ঢাকে বৎসলতার বেণু আজি বনের সুরে।
পক্ষিমাতা মুক্তের পাখায় শাবকগুলি আগলে রাখে,
গর্ভাধানে বলাকা যায়, চখী প্রসব ধারায় ডাকে।
মীনজননীর ডিম ফুটে অমৃতে তার বিশ্ব উঠে,
মক্ষিমাতা অনন্তাত বংশধারার জন্ম চাকে
আপনি রয়ে বঞ্চিত সে প্রাণের বহু শক্তি রাখে। (বৈশাখী)

পৌরাণিক চরিত্রগুলি কবিশেখরের কবিতায় সবই Symbolical—বাচ্যাতীত অর্থে মণ্ডিত। বৌদ্ধসংস্কৃতি অবলম্বনে কবিশেখরের বহু কবিতা আছে, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে রচিত কবিতার সংখ্যা বেশ বারোটি। অম্বপালী, উৎপলা, কুবলয়, পটাচারা, মালিনী, পূর্ণিকা, অর্দ্ধকাশী ইত্যাদি গৌতমের জীবনকথা লইয়া রচিত কাহিনী-মূলক কবিতা আছে অনেকগুলি। এইগুলি ছাড়া বন্ধুজনাপ্তি, আনন্দ, তরঙ্গায়িত ও কুবলয়, উপক ও চাপা, কৌণ্ডেয় ও কাষায়, তথাগত ইত্যাদি বহু কবিতা বৌদ্ধসংস্কৃতির মূর্ত্তপ্রতীক রূপে বরণ করিয়াছে। কবি আনন্দের স্বরূপনির্দ্দেশচ্ছলে বলিয়াছেন—

যেন রায় বঞ্চিত-লক্ষণ
অসম্পূর্ণ তথাগত তোমা ছাড়া। তিনি ত সঙ্ঘিৎ
হলেন সঙ্ঘিৎবন্ধ মুক্ত হয়ে তোমার সহিত। (আষাঢ়ী)

তথাগতকে আহ্বান করিয়া কবি বলিয়াছেন—একদিন প্রভু তুমি এই ভারতে যুগনবের অমৃতহাসে মৃগতৃষ্ণিকার গরল হরণ করিতে আসিয়াছিলে। হোমের ধূমে তুমি রাজীব ফুটাইলে, তোমার করুণায় ধরিত্রী আমার শ্রীষ্ম পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

মুছাইলে তার দাহতাপ স্নেহে বুলাইলে তব করুণ পাণি,
ঘুচাইলে তার ক্লিন্নতাপের তাপ, ভুলাইলে তার সকল গ্লানি।

তোমার ভারত আজ তোমার বাণী ভুলিয়া গিয়াছে, হে প্রভু, এখন তুমি নির্ব্বাণ সম্ভোগ করিলে চলিবে কেন ?

এস তথাগত পুনঃ ব্যথাহত ভারতের বোধি-তরু তলে,
জরা পীড়া ক্ষয় মরণের তব দূর কর প্রেম-করুণা-বলে।
ছটা-ছটিলতা ঘটা সমারোহ দূর কর তুমি হেটলে ঘাটে,
তব করুণার সহকার-পাখা রাখো ভারতের ছবিপটে।
ছিলের শিলায় বিশ্বাবন্ধেরে পিষিয়া ঘুচাও সকল ভেদ,
চতুর্ব্বেদের পুণ্য আশ্রমে শুনাও আমায় নূতন বেদ।
তোমার অশোক অভয় বাণীটি ভুবন আবার চাহিবে কবে ?
বনতন্ত্রের মণতন্ত্রের পাদপে ধ্বনিত হবে সে রবে।
বৈহিকতায় ঐহিকতায় জ্বালায় জ্বলিবে বিশ্বজন,
তব বাণী ছাড়া নির্ব্বাণশুরু কিসে হবে জ্বালানির্ব্বাপণ ! (আষাঢ়ী)

কবিশেখরের ঐতিহাসিক সংস্কৃতির কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারত, গ্রীক আক্রমণ, হর্ষবর্ধন, বঙ্গুপ্তবর্ধনদেব, উৎকলিঙ্গ, কালিদাস, চীন-পরিব্রাজকের প্রতি ইত্যাদি কবিতা উল্লেখযোগ্য। হর্ষবর্ধন কবিতায় কবিশেখর হর্ষের জীবনেরই কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়া বলিয়াছেন—

ইতিহাসে তোমা সবে হলো যবে সাক্ষাৎ প্রথম
তখন তো দুজনার একই বয়সের।
সেইদিন হতে হলে মিতা
জানি না জনমান্তর সৌহৃদের ফলে হলো কি তা।
তোমরা তিনটি ভাইবোনে
চিরদিন আছ মোর মনে
ধরাতল বাসুদেব সুভদ্রার নবরূপ ধরি
হৃদয়মন্দির আলো করি। (জয়ন্তী পত্রিকা)

ঐতিহাসিক চরিত্রের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন কবিশেখরের বিশেষত্ব। তাঁহার বৈষ্ণবসংস্কৃতির কবিতাগুলি তাঁহার ব্রজরেণুতে আছে। তাঁহার পরবর্তী ব্রজলীলার বহু কবিতাতেই যাচ্যাতীত অর্থের ইঙ্গিত আছে। সেইখানেই কবির বিশেষত্ব। কবি দোল, ঝুলন, অভিসার, নৌকাবিলাস, বাসুর ইত্যাদি লীলার মুখোসধারী অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রেম-বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা :—

শুধু সৌরীর রূপ করে ইষ্ট নয় রূপ এ গভীর প্রেমে,
ঘুমে ঘুমিয়া পর অবশ পাখিতে সুর রয়ে যায় থেমে।
বিরহ-নিশায় শেষে মিলন বরণ এসে কাঁদায় কাঁদিয়া,
দুই কাঁদে দুই ফোঁড়ে দুই তীরে যায় তোরে হৃদয়ে বাঁধিয়া।
(আহরণ)

কবিশেখরের কবিতায় মাধুরের একাধিক ব্যাখ্যা মিলে। (১) যৌবন-লোকে ওঠার অনিবার্য আবির্ভাবই মাধুর। (২) স্বর্গলোক হইতে মানব জগতে অবতরণই মাধুর। (৩) মাধুর্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের সমাবেশই মাধুর। (৪) মধুর ভাবের সাধনার মাস্তরূপে বিকৃতিই মাধুর। আর একটি ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়তর্পণ (Sensuous) জীবনে তৃপ্তি না পাইয়া কবিচিত্তে শেষ পর্যন্ত যে একটা অতীন্দ্রিয় আকৃতি আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা, তৃষ্ণার জন্য ব্যাকুলতা (yearning) পূর্বের সহিত ব্যবধানের ফলে বিরহবোধ জন্মে কবি তাহাকেই মাধুর বলিয়াছেন।

ক্রমের সঞ্চয়রাশি যত যুগ যত পাখা লয় ভরি'
হইল কি বেগে বেগে ঘুরে ঘুরে ফিরে এসে শত শত কবি।
তাদের বিরহরাগে তাদের আকৃতি লাগে হইয়া অরূপ,
তাদের সকল প্রীতি সব ভালোবাসা স্মৃতি করেছে করুণ।
ফুরায় সে শুধু ব্যথা কোন্ সুদূরের কথা তৃষার পিয়াসা,
তাহাদের গানে গানে ছুটিছে অনন্ত পানে অন্তর জিজ্ঞাসা।
নিখিল ভুবন জুড়ি' বিশ্বসীমা অতিক্রমি লক্ষ্য নাহি জানি
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশ-কালাতীত সুরে তাহাদের বাণী।
(আহরণ)

কবিশেখর যে সুপরিচিত বৈষ্ণবভাবের লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন, সেগুলি তাঁহাদের ধারায়। কীর্তন নয়—সেগুলিতে তিনি আপন মনের মাধুরী দিয়া বৈষ্ণবভাবের নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবধর্মীর অনুকম্পাচলে নাই—স্বয়ং তাহাদের সম্বন্ধে অনুকম্পিতভাব পোষণ করিয়াছেন কতকগুলি কবিতায়। কবির আত্মিক জন্ম হইতে পুনর্জীবিত কর্ণাট, গঙ্গা ভারতের সংস্কৃতির ধারা, সরস্বতী কবিবন্দেবন্দনাশ্রী, দুর্গা শারদশ্রী আর লক্ষ্মী বাংলার ক্ষেত্রপালিকা-দেবীর লক্ষ্মী। ভগীরথ যেমন শঙ্খনাদ করিয়া গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্তে আনয়ন করেন, বাংলার কবিকুল তেমনি আগে আগে শঙ্খনাদ করিয়া কবির লক্ষ্মীকে ক্ষেত্র হইতে ভবনে আনয়ন করে। আর বিষ্ণুকে কবি শুধু শুধু ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর বিশ্বরূপ, ক্ষীরোদসাগরশায়ী নারায়ণ, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারী, বিষ্ণুর মুরলীধর—এইভাবে নামাইতে নামাইতে নিজের মুটীরে শালগ্রাম শিলায় শিলারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইভাবে বাঙ্‌ময়ঠাঠে ব্রহ্ম ব্রহ্মানন্দে রূপান্তরিত হইয়াছেন কবি-কল্পনায়।

শিবের মত কোন দেবতাই কবিচিত্তে রসসঞ্চার করিতে পারে না —এ কথা রবীন্দ্রনাথই ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলেন। রবীন্দ্রগুরু কালিদাস হইতে রবীন্দ্রপ্রিয় কালিদাস পর্যন্ত এই শৈবধর্মের ধারা প্রবাহিত হইয়া এইবার বোধ হয় বিলুপ্ত হইল। কবিশেখর শিবের বহুবিধ রূপ লইয়া কবিতা রচনা করিয়া শেষে তাঁহাকে 'কাঙালের ঠাকুর' পরিণত করিয়াছেন।

আমরা তোমায় ভালবাসি কি আছে অই মুখে,
ইচ্ছা করে তোমায় ঠাকুর আঁকড়ে ধরি বুকে।
অঙ্গপাড়ায় আর বেও না ক্ষেপায় ওরা বড়,
বোসো সাথেই তামাক টানো গল্প শুনব কত।
বাজাও শিঙা নৃত্য কর বোসের আঙিনাতে,
ডমরু বাজায়ে মোরা নাচবো তোমার সাথে। (আহরণ)

এই শেষোক্ত কবিতা হইতে আর একটি ছাড়া উদ্ধৃতি তুলিবার পরিসর নাই। দুর্গার শারদশ্রী রূপের একটু পরিচয় দিই।

এস আজ তুমি আজ না জননী আশা আনন্দ নিতে,
প্রতিমায় তুমি আসনাকো আর মাটির অর্ঘ্য নিতে।

* * *

তবু আজ তুমি আসিতে যেমন শরতের সেই প্রাতে,
যখ রাজারো অন্ন যখন হয় নাই অন্নপাতে।
আজ তুমি সেই শারদ গগনে আজ তুমি সেই কমল কাননে
আজ তুমি সেই নবীন জীবনে শিশির নদী তটীতে।

আজ তুমি তাই উজ্জ্বল হয় শরতের বিভাবরী,
অমলা, তুমি আজ ভুবনের মাঝে আমার ভরি।
তুমি হেমাঙ্গী হৈমবতী মা বিশ্বলিত হলো তোমার প্রতিমা
প্রাতে রবিকরে রাতে চন্দ্রের মন্ত্রিকা-মাধুরীতে। (বৈকালী)

অন্যান্য যে সকল কবিতায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে কবি নানা ভাবীরূপ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিশ্ব ওন্নিত্র (পর্ণপুট), অশোক (বৈকালী), কপিক (বৈকালী), জীবনযজ্ঞ (পর্ণপুট), প্রাচীন ভারত (বৈকালী), কদম্ব (বৈকালী), পঞ্চশর (আহরণ), যজ্ঞ (আহরণ), অন্ধকার (আহরণ), তপোবন (বৈকালী) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইগুলির মধ্যে 'অশোক পুষ্প' প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতীক। অশোককে আহ্বান করিয়া কবি বলিয়াছেন—

অনাবৃত আজ তব রসধারী কেহ নাহি মুখে,
কবি আজ উদাসীন, কবিরাজ রসায়নে খুঁজে।
ও লাবণ্যে আজ রূপ-রসিকেরা চিত্ত নাহি ভরো,
স্বর্গের সিঞ্চনে দিন, ক্ষেত্র হতে নালা আজ বড়।

* * *

তাহাতে কিসের ক্ষোভ, থাকেনাক তো অশোকের শোক।
বিচিত্রতা যোগের মাঝে এ দুর্দিনে পাকৃতরা হোক। (বৈকালী)

'যজ্ঞ' কবিতায় রুদ্রের দক্ষিণ মুখের বাণীঃ বাণীর প্রতিধ্বনি শেষ দুই চরণ :—

মঙ্গলার হাতে মরণ, মঙ্গলের হাতে তুমি মূল,
আপনারে ক্ষুদ্র ভাবি যজ্ঞ, মোরা মিথ্যা করি ভুল। (আহরণ)

অন্ধকার এ বিশ্বের আদি নিদানের ঘোর রহস্যময় প্রতীক।

বেদান্তের ব্রহ্ম তুমি, আদ্যাশক্তি তুমি পুরাণের
সৌগতের শূন্য তুমি, তুল সত্য জড়-বিজ্ঞানের।
মহাকাল, আমি তব ঘটনাথ, করি নাক ভয়
ঘট যবে চূর্ণ হবে তোমাতেই পাইব বিলয়। (আহরণ)

বিশেষ বিশেষ স্থান অবলম্বনে কবিশেখর যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সরল বর্ণনা, আর কতকগুলিতে স্থলগুলির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্কই দেখানো হইয়াছে। এইশ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে ইলোরা, অজন্তাগুহায়, পুরীধামে, মন্দিরে না—বিশ্বনীড়ে, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অজন্তাগুহার বৃদ্ধশিল্পী মহাস্থবির জীবনান্তকে বলিলেন—সারা জীবন পাহাড়ের গায়ে ছেনীই যা দিলাম—তবরক্ত ছেনীর উপায় কি হইবে ভবন্ত? জীবনান্ত কাষায়বসনপ্রান্তে শিল্পীর অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন—

হে শ্রাবক, তোমার ছেনী
শুধু শিলা নয় তব ছেদিয়াছে জন্মের রজনী।
ইহলোকে তব সৃষ্টি রয়ে যাবে অক্ষয় সমান।
আমারে ফিরিতে হবে। তুমি বহু লভিবে নির্বাণ
(জয়শ্রীঃ পত্রিকা)

এইভাবে কবি শিল্প-সাধনাকেও পারমার্থিক সাধনা বলিয়া শিল্প-সাধনার গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। পুরীধামে গিয়া কবির চিত্তে সংশয় জাগিল—জগন্নাথ মন্দিরে না—সিন্ধুনীরে? পরক্ষণেই কবি বলিতেছেন—

বেশকলে ভেবে রয় না বিধায় দুরুদুরুনি বুকটিতে,
বন্ধ আগে যেমন আজ—তেমনি আজ মুক্তিতে।
রথোপরে তেমনি আজ যেমনি আজ পাস্থিতে,
ভক্তে আজ ভক্তে আজ উত্তালতায় আস্থিতে।
শান্ত সাকার তুমিই আমার অপ্রপাশ নিরাকার,
বাঙ্‌মনসাতীত হয়েও যোগক্ষেমের বইয় ভার।
উপচারের পুষ্পের আধে দুস্ত তোমার পদদ্বয়,
প্রচণ্ড তাণ্ডবে আমার ঠেলয় পায়ে অর্ধাচল।
শ্রীমন্দিরে তোমার পাতা রত্নপুরীর সিংহাসন,
উদ্বেল উদ্ধগুলীলায় সিন্ধু তোমার বৃন্দাবন।
মানব তোমার চাবর চুলায় দানব তুলায় ভরাবাত,
শাক্তরক্ষ, বারিরক্ষ, তোমায় নমি জগন্নাথ।

(পর্ণপুট)

কবিশেখরের এইসব সংস্কৃতিমূলক কবিতার রসসৃষ্টি রোমান্টিক শ্রেণীরই। প্রকাশভঙ্গী, আলঙ্কারিকতা ইত্যাদি ক্লাসিকাল ধরণের। এই যুগে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক ধারার মিলন যদি কোন কবির মধ্যে হইয়া থাকে তবে তাহা মোহিতলাল মজুমদার ও কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বনে কবিশেখর যত কবিতা রচনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভবের শিব ও গৌরী, মেঘদূতের মেঘ, উত্তরচরিতের সীতা, বিক্রমোর্বশীর পুরূরবা, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা, রঘুবংশের ইন্দুমতী, এই কবির রচনায় অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে আবিষ্ট কবিতা তাঁহার অজস্র। ঋতুমঙ্গলের অধিকাংশই তো এই শ্রেণীর। অন্যান্য বহু কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ঘাতে (allusion) পরিপূর্ণ। কবিশেখর সংস্কৃত সাহিত্যকে মন্থন করিয়া তাহার সুধাটুকুই আমাদের দিয়াছেন। ঋতুমঙ্গলে জয়দেব পর্যন্ত সংস্কৃত কবিদের তিন ঋতুর বর্ণনাগুলি গুন্থিত করিয়া এক একটি অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সাহিত্যের সৃষ্ট স্বর্গলোকের সঙ্গে কবি তাঁহার জীবনের সম্পর্কের কথাও দুএকটি কবিতায় বলিয়াছেন। যেমন কালিদাসের প্রতি কবিতায়—

রামগিরি চূড়াশিরে সিক্ত করি আঁখি নীরে প্রাণের আবেগ
পাঠালে প্রিয়ার তরে কার করে মনে পড়ে? আমি সেই মেঘ।
পাঠাইলে যে বারতা তাহার পরন রাখা জন্মে জন্মে রই,
কিন্তু হায় তব সখা স্বর্গলোকে সে অলকা খুঁজে পেল কই?
আমার জীবন ধরি কত যুগ গেল চলি খুঁজিতেছি তাই,
তুমি আজ কল্পধামে, নয়নে বরষা নাবে কাহারে শুধাই?
তুমি দিলে যেই দিশা সে পথে দিবস নিশা চলি প্রাণপণে,
বৃথা খোঁজা বিশ্বভূমি, পাপাস্তে মিলেছ তুমি সে প্রিয়ার সনে।

যদিচেছি আমি চহু দে বারতা আনো প্রভু মোর মুক্তি নাই,
নিখের বিহারিণে মন্দাকান্তা কলস্বনে আজিও শুনাই।

(শ্রমিকাদের চিঠি)

'স্বরাজ' কবিতার প্রথম স্তবকে যে কবিচিত্র 'পশ্চার ঘুরে যায়,' দ্বিতীয় স্তবকে সেই চিত্র, ঘুরিয়া বেড়ার বেলার চীরে। তৃতীয় স্তবকে আবার—

হরণী হিমিরে অবগুণ্ঠিত বহুকণ্ঠে ক্রন্দন যাচে
চপলা চমকে মাঝে মাঝে ঘটে, বিগুণিত হয় আঁধার তাহে।
মন ছুটে যায় উজয়িনীর পুরপথে হাতে লইয়া বাতি
অভিসারিকার হইতে সাথী। (আহবণ)

শেষ স্তবকে কবি বলিয়াছেন—

আমার ভারত কবির ভারত, যুগে যুগে আমি তাহার কবি,
গাহিয়াছিনা বরবার বেরি পত্র জনমের স্বপন ছবি
যুগে যুগে ক্রত সঙ্গীত কত ভুলায় আমার তৃষিত শ্রুতি,
বরবা আমার স্মৃতির পুটী।

আর একটি কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

সে ভারত যেন সোনার কমল মৃণালকণ্ঠ আমি,
পদ্মে রচিত তাহারি বক্ষ বেষ্টিতেছি নিরবধী।
তাহারি নিশাসে মৃণাল বক্ষবামি
সুখদুঃখ ধরি শুধু এবে টানি,
যত টানি তত বাড়িয়াই চলে এ কি এ কর্মভোগ—
বাধবান বাড়ে, ছিন্ন হয়না যোগ।

'অতীত' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার, বর্তমান অসহ্য, কোলাহল, মারামারি, বৈজ্ঞের পীড়ন ও নানা অসহায় বিপর্যয়। প্রাণটা জুড়াই কোথায়? তাই অতীতের সেই শান্তিময় নিরুদ্বেগ ছায়াপথে আমার কল্পনা ঘুরিয়া বেড়ায়। এই Escapitus কবিতাটি।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পদাবলীর প্রভাব কবির কবিতায় যে আছে তাহা ত সকলে জানেন, প্রাচীন বাংলার অবশিষ্ট সমস্ত সাহিত্যও কবির কল্পনাকে প্রেরণা ও উপাদান যোগাইয়াছে। তাহার ফলে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইয়াছে। এইগুলি কবির আদরের আদর। এই গুলিতে বাংলার সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রেম আছাদিত। এইগুলির কোন-কোনটি Symbolical যেমন —চাঁদসদাগর, বেহুলা, গোপীচন্দ্র, মাদারের, মেনকা ইত্যাদি। Symbolical কবিতার অংশ বিশেষ তুলিয়া লাভ নাই, সম্পূর্ণ কবিতা না তুলিলে রস উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। এইগুলি ছাড়া—শুক সোয়কবাস, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, পদাবলীর রাইচেতন, (গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী সিন্ধু কবিত অমৃতে রচিত), গোপাল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, উমা ও মেনকা, শ্রিহরা, বাংলার পল্লী শিউলীমী, বাঙ্গালীর সাধ, পল্লিনী তীর্থে, সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ, দুর্নীতিদেবতা, রাম-প্রসাদ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি হইতে উদ্ধৃতি দিতে গেলে প্রবন্ধের আকার বাড়িয়া যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য শুদ্ধা সহকারে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা এইগুলির রসমর্যাদা বুঝিবেন।

কবিতারচনার জন্য কবিরা আপন আপন প্রিয় ও আত্মীয় বিষয়-বস্তুই নির্বাচন করেন। বিষয়বস্তু যাহাই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কবির প্রকাশভঙ্গীই রসসৃষ্টির পক্ষে মূল্য উপাদান। পাঠকের মনে রসসৃষ্টির পক্ষে কিন্তু বিষয়বস্তুর মূল্য রহিয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষ ভালো করিয়া উপলব্ধি করে না তাহাদের পক্ষে বিষয়বস্তুই প্রধান সম্বল। কবিশেখর সংস্কৃতিমূলক কবিতাগুলিতে যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করিয়াছেন তাহার সহিত বর্তমান বাংলার খুব অল্প লোকেরই পরিচয় আছে। কবিশেখর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যৌবনকালেও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বহু লোকের সুপরিচয় ছিল। কবি তাঁহাদের তরফেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে যৌবনে বিশেষতঃ অধিকাংশ মূলেখকের কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচন করেন। ক্রমে দেশের লোক ঐ সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—কবির তাহাতে খেয়াল নাই। কবি তন্ময়চিত্তে তাঁহার নিজস্ব ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এদিকে তাঁহার সংস্কৃতিমূলক কবিতার পাঠক প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। তাই কবিশেখরকে ব্রজলীলার ও পল্লীজীবনের কবি বলিয়াই এযুগে কবিখ্যাতি রক্ষা করিতে হইতেছে। সাধারণ পাঠক তাঁহার এই সংস্কৃতিমূলক কবিতার মূল্য মর্যাদা বুঝিবে না, কিন্তু এখনও আশা করি দেশের উচ্চতর শিক্ষাসংঘ একদিন এই-গুলির মূল্য মর্যাদা স্বীকার করিবে।

পার্শ্বস্থ জীবন ও পল্লীজীবনেরও যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে—অদূর ভবিষ্যতে লোকে রবীন্দ্রশিষ্যদের রচিত ঐ দুই জীবনের কবিতা-গুলির মাধুর্য্য ও রসাস্বাদ উপলব্ধি করিবে কি না সন্দেহ। আশা করা যায়, ইহাদের কাব্যোক্ত জীবনের সঙ্গে যখন ভবিষ্যতের সামাজিক জীবনের ব্যবধান আরো বেশি বাড়িয়া যাইবে, তখন হয়ত ঐ কাব্যোক্ত জীবন দূরত্বের ফলে Romantic হইয়া উঠিবে—তখন হয়ত ঐ সব কবিতার সমাদর ফিরিয়া আসিবে। তখন হয়ত বৈচিত্র্যসুখ বাঙ্গালী নব্য কাব্যধারার প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িবে।

সংস্কৃতিমূলক কবিতার সম্বন্ধে সেরূপ আশা করা যায় না, কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে অচিন্ত্য লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আশঙ্কা হয়—অদূর ভবিষ্যতে ইহা আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংযোগ হারাইবে। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ফলে অভিনব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছে। তাহার প্রবল অভিঘাতে ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসের গবেষণার বস্তু হইয়া পড়িবে। বর্ণ-বিশ্লেষক ভারত ক্রমে সংস্কৃতি-বিশ্লেষক হইয়া উঠিতেছে—ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে আত্মীয় জীবন ক্রমে দূরে বহু দূরে চলিয়া যাইতেছে। এখন সাধারণ লোক সংস্কৃতি বলিলে

ঠুংরি নাচ-গান, খেয়ালখুশী, আমোদ-প্রমোদ ও লঘু তরল সাহিত্য বুঝে। এইরূপ বাংলার আসল সাহিত্য বর্তমান সংস্কৃতি হইতে বাদ পড়িয়া যাইতেছে। কোনদিন দেশের মতিগতি ফিরিলেও লাভ হইবে না। দেশের সংস্কৃতিমূলক সাহিত্য আশ্রয়ের অভাবে হয়ত তৎপূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবলোকে মাঝে মাঝে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু বিশ্বের নানা ক্ষেত্র হইতে তাঁহার আহ্বান পড়িত—কাজেই তাঁহাকে বহু আহ্বানের দাবি মিটাইতে হইত। সেই ভাবলোক হইতে বিশ্বকবিকে নানা পথে যাত্রা করিতে হইত। কোন আবেষ্টনীর প্রতি তাঁহার অন্ধ মমতাও ছিল না। কাজেই তাঁহার সাহিত্যালোকে প্রবেশ করিবার বহু দ্বার উন্মুক্ত। তাঁহার শিষ্য কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐ ভাবলোকে প্রবেশ করেন—কিন্তু তাঁহার চাক পড়ে কেবল বাংলার প্রকৃতি ও বাংলার নিরবিচ্ছিন্ন সংসারের সুখদুঃখের পক্ষ হইতে। ফলে অধিকাংশ সময় তাঁহাকে হয় প্রাচীন ভারতের ভাবলোকে—নয়ত বর্তমান অন্তর্বিদ্ধ বাংলার অ-নাগরিক বাস্তবলোকে সাধনা করিতে হয়। তাঁহার সাহিত্যের মুক্তির অভিযানে প্রবেশ করিবার দুই তিনটির বেশি দ্বার নাই। তাঁহার সাহিত্য সম্পর্কে তিনটি দ্বার যদি দুর্বিপাকে রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে এই দুই প্রবাসীর সন্ধেবেলার বন্ধু হইয়া থাকিবে। কবি নিজে তাহা উপলব্ধি করেন—তাই অবিচারের কথা চিন্তা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

কবির যাহা পুঁজিপাটা বিধায় নিল যদি,
তাহার সাথে বিধায় নিল কবি। (আহরণ)

ভারতের তথা বাংলার সংস্কৃতি যদি লুপ্ত হয়—তবে কবি বলেন—

ডুবুক আমার গান, দুঃখ নাই, বঙ্গোপসাগরে। (আহরণ)

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮১৮ সাল থেকে বাংলা গদ্যরচনার প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। এখন থেকে গদ্যরচনা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হল। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে রামমোহন ও তাঁর দ্বারা উৎসাহিত লেখকদের রচনাবলী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত গদ্যরচনাগুলি। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল শ্রীরামপুর কলেজ ও স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যমে প্রকাশিত পাঠ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গদ্যরচনা। তিন শ্রেণীর গদ্যরচনার সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত তৎসমবহুল সাধু গদ্যভাষার পূর্ণ ব্যবহার। ঐসব রচনায় চলতি ভাষার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গদ্যরচনাসমূহে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গদ্যভাষার গঠনকার্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখা যায় না। তবুও বাংলা গদ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে এদের প্রয়োজন ও সহায়তা অমূল্য। একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় লিখিত ও মুদ্রিত এই শ্রেণীর গদ্য লেখার কাজে বহুবান্ বাঙালি গদ্যলেখকদের সাধনা ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পর অভাবনীয় উৎকর্ষলাভ করে। ১৮৬৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর থেকে এই শ্রেণীর গদ্যরচনাই বাংলা সাহিত্যে মুখ্য স্থান অধিকার করে। এগুলি স্বাধীন ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না নিয়ে প্রকাশিত হলে লেখকদের পক্ষে বেশি কৃতিত্বের পরিচায়ক। লেখক রাজা, জমিদার বা কোন বড় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা বাদ দিয়েই এযুগে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। আর্থিক লাভের আশা না রেখেই বাঙালি গদ্যলেখক যে নিজেই নিজের বই প্রকাশ করতে সুরু করেছেন তা নিশ্চয়ই গর্ব ও গৌরবের কথা। বিশেষত, তখন বই ছাপানো আরো বেশি কষ্টকর ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সাময়িকপত্রগত গদ্য রচনাবলীই আজও বাংলা ভাষা গঠনে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। সাধারণ লোকের ব্যবহার্য গদ্যভাষা গঠনের কাজে এই শ্রেণীর রচনার প্রাধান্য ও প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। ১৮৪০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। ১৮৩১ সালে ঈশ্বরগুপ্ত "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশিত করে বাংলা সাহিত্য গড়বার কাজে অনেক সাহায্য করলেও তিনি নিজে বা তাঁর অনুগামীরা বাংলা গদ্যে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভবপর করে তুলতে পারেন নি। তিনি "ফলেনীয় কবিতাযুদ্ধ" প্রবর্তন করলেও স্বয়ং বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তনে প্রচলিত অবস্থা বজায় রেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেন নি। তাঁর অনুগামীদেরও ঐ অবস্থা। ১৮৪৩ সালে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র মারফৎ দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব ঘটায় সাময়িকপত্রজগতে নতুন উদ্যম ও প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। এই গুরুদ্ধ পথিকৃতের প্রভাব পরবর্তী প্রায় তিন বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর ১৮৭২ সালে বঙ্কিমগোষ্ঠীর প্রাধান্য ঘোষণা করে বাংলার প্রথম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হলে আবার এক নতুন যুগ সূচিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর গদ্যরচনাসমূহ বাংলা গদ্যের গঠনের প্রথম দিকে উল্লেখযোগ্য হলেও পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যভাষার প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে এদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৪১ সালে "জার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি" বা "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাঠ্য গ্রন্থসমূহের দ্বারা গদ্যভাষা সংগঠনের প্রয়াস তিমিত হয়ে যায়। পরের যুগে বড় বড় সাহিত্যিক ও গদ্যলেখকেরা নিজেদের সাহিত্যসৃষ্টির দরকারে গদ্যভাষার রূপ-পরিবর্তন ও অভিনব সংযোজনার পর পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতারা তাঁদের নির্দিষ্ট পথে সন্তর্পণে পদক্ষেপ করে সাহিত্যিকদের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত গদ্যে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৮৭২ সালে যখন বাংলা সাহিত্যের গদ্য বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন গদ্যভাষা গঠনের ভার পাঠ্যগ্রন্থলেখকদের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে গিয়ে কেবল সাহিত্যিকবর্গের উপর ন্যস্ত হয়েছে। ১৮৭২ সালের আগে পর্যন্ত শুধু সাহিত্যের সাহায্যেই গদ্যভাষার দিক্‌নির্ণয়ের কথা ভাবা যেত না। গদ্যভাষা গঠনের প্রথম দিকে যা উনিশ শতকের প্রথম পাদে পড়ায় বই ছিল গদ্যরচনার প্রথম সম্বল। তখন সাহিত্যের অভাব খুব বেশি থাকায় গদ্যভাষার গতিপথ নির্ণয়

করতে হলে যে কোন গদ্যরচনার সাহায্য নিতে হত। কিন্তু ১৮৭২ সাল থেকে যে-সময় এল, সে-সময় থেকে সাহিত্য প্রধানত গদ্যভাষা গড়ার কাজ পুরোপুরি অধিকার করায় অতঃপর কেবল গদ্যসাহিত্যের আলোচনার দ্বারাই গদ্যের গতিপথ নির্ধারণের উপায় ও ব্যবস্থা হল। তার আগের সময়টাতে, ১৮১৮ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত ৫৪ বছরের গদ্য রচনাবলীকে, পূর্বোল্লিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করে আলাদা ভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার গুণাগুণ বিচার করলে তবে আমাদের আলোচ্য ১৮১৪-৭৮ শতাব্দীর মধ্যের বাংলা গদ্যভাষার অগ্রগতি, পরিবর্তন এবং আলোড়নের রহস্য বোঝা যায়।

যদিও ওই তিন রকমের গদ্য রচনা আজও অব্যাহত আছে এবং চিরকাল থাকবে, তাহলেও আমাদের অনুসন্ধানের জন্যে ১৮৭২ সাল থেকে ওই শ্রেণী বিভাগ নিষ্প্রয়োজন। ১৮০১ সাল থেকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত গদ্যরচনা সুরু হয়। ১৮১৮ সালে এর ধারাটি পরিপুষ্টিলাভ করে। ১৮৭২ সাল থেকে গদ্যভাষার উপর এর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ১৮১৮ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর গদ্য রচনা সুরু হয়। ১৮৭২ সালে ঐ গদ্য প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত মৌলিক সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই সময় থেকে সাময়িকপত্রিকায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থকারের প্রকাশের আগে মাসিক বা অন্যধরণের সাময়িক পত্রিকায় মূল রচনা প্রকাশের রেওয়াজ আরো আগে দেখা গিয়েছিল। এই সময় থেকে তার প্রবণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই ধারার প্রভাব আজও বজায় আছে। এখন অনেক বড় লেখক তাঁদের উল্লেখযোগ্য রচনা মাসিক বা অন্য সাময়িকপত্রে না দিয়ে গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশ বাঞ্ছনীয় মনে করেন বটে, কিন্তু সাময়িকপত্রের সাহিত্যপ্রকাশগত প্রাধান্য এখনও দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা যায়। ১৮১৪ সালে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসলি ধারার অভিনবত্ব সঞ্চারিত হয়। "সবুজ পত্র" পত্রিকার আবির্ভাব এর কারণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর গদ্যরচনা। এই ধরণের রচনার প্রথম স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন সমগ্র বাঙালি জাতির বরেণ্য। সম্ভবতঃ এই জন্যে তাঁকে "বাংলা গদ্যের জনক" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে যে, উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে পড়ে যে ধরণের রচনা, তিনিই সে-সবের প্রবর্তক। স্বাধীনভাবে গদ্যগ্রন্থ রচনার প্রয়াস ১৮১৪ সালে আরম্ভ হয় বলেই আমরা এই নিবন্ধে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের চতুর্থ যুগ এই সালে সুরু বলেছি। ১৮১৪ সালে আরম্ভ হয়ে এই শ্রেণীর গদ্যরচনা উত্তর কালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে; এই ধারাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শাখাও বলা যায়। অবশ্য, খাঁটি গদ্য রচনার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। স্বাধীনভাবে লিখতে প্রবৃত্ত সাহিত্যিকরাই পরে গদ্যভাষার গতিনিয়ামক হন। ১৮১৪ সালে সুরু এই ধারা ১৮৭২ সালে মুখ্য প্রভাবশালী হয়ে উঠে গদ্যের পথ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হয়। ১৮৭৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম মাত্র বিশুদ্ধ সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে গদ্যের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে একটা স্পষ্ট প্রস্তাব বিস্তারে সমর্থ হলেন। ১৮৬১ সাল থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে নিজ প্রচেষ্টায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশপরীক্ষের দ্বিধাগামীর ছিলেন। ১৮৬৪ সালে সাধুভাষার গদ্যে নতুন রীতি সৃষ্টি করার পর বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় এক যুগ নানা পরীক্ষার পর ১৮৭৮ সালে বাংলা গদ্যের প্রকৃত সার্থকতার পথ খুঁজে পান। ইতিমধ্যে ১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার দ্বারা বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি নিজের একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেন। কাজেই ১৮৭৮ সালে তিনি যখন নতুন পথনির্দেশ ঘোষণা করলেন,—তখন সহজেই নবযুগের সূত্রপাত হল। ঐ প্রথম একজন বাঙালি সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষভাবে বাংলা গদ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত ও কৃতকার্য হলেন। ১৮৭৮ সালে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে নতুন প্রাণের আবেগ সঞ্চারিত হল। ঐ বছরে বাংলা সাহিত্য ও গদ্যের ইতিহাসে এক নতুন যুগ আরম্ভ হল। নবীন প্রাণের প্রবাহে উচ্ছ্বসিত তরুণ রবীন্দ্রনাথ খাঁটি কথ্য ভাষায় মুললিত সাহিত্য রচনা করলেন ঐ সালেই। আরও কয়েক বছর পরে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ঋষির মতো বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষার স্থান ও মর্যাদা নির্দেশ করলেন। সেই স্থান ও মর্যাদা ফেরার জন্যে চূড়ান্ত প্রয়াসে ব্রতী হলেন প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ সালে।

রামমোহনের ভাষা নিয়ে আলোচনার পর সাময়িকপত্রগুলির সাংবাদিক অথচ অসাহিত্যিক প্রচেষ্টায় যে গদ্য গড়ে উঠল, তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা উচিত। একালের পরিভাষায় "সংবাদ-সাহিত্য" নামে যে বিচিত্র গদ্যরচনা প্রচলিত হয়েছে তা কিভাবে উদ্ভূত হল, সে এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস। "দিগ্‌দর্শন" থেকে "বঙ্গদর্শন" পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, নানা ছল ও ঘটের কথা-কাটাকাটি,ঘাত প্রতিঘাত প্রকৃতির আলো ফুলে একদিকে যেমন সমসাময়িক কালের সমাজচিত্র প্রকাশ পেয়েছে আর সেই সঙ্গে মানব-হৃদয়ের বিদ্বেষ, অসূয়া, ব্যঙ্গপরায়ণতা ইত্যাদি গ্লানি মেজিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি যুক্তির সাহায্যে নিজস্ব স্থাপনের আবেগে তাদের চিন্তার শৃঙ্খলা আর তার সঙ্গে প্রতিপক্ষকে হেয়ের দ্বারা ঘায়েল করার চেষ্টায় তাদের ব্যঙ্গরস রসের আবেগ দেখা গেছে। দুটি বৈশিষ্ট্যই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সদা সতর্ক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সর্বদাই বিপক্ষের তুলনায় নিজের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তূণে শাণিত যুক্তির বাণ সঞ্চিত করেছে। অন্য সব পত্রিকার তুলনায় নিজের পত্রিকার আদর্শ বৃদ্ধির জন্যে সম্পাদকমাত্রেই একদিকে যেমন বিষয়বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ভাষার সরসতা ও প্রসাদগুণ বৃদ্ধির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে। তার পরিণামে ভাষা ক্রমশঃ মসৃণ, স্বচ্ছন্দ, সরল ও সরস হয়ে উঠেছে। বক্তব্য বিষয় সাজিয়ে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে গেছে। সাধারণ বাংলা পত্রিকার জীবন তুই করার দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা হত বলে খুব উচ্চাঙ্গের ভাব প্রায়ই স্থানলাভ করত না বটে, কিন্তু সরল ও চটুল বিষয়ে হাল্কা আলোচনার অভাব ছিল না বলে অনেক সময় এই সব কাগজের সম্পাদকীয় মতামত বা টীকাটিপ্পনীর ভাষা সমকালীন অন্য সব গদ্যপুস্তকের ভাষার চেয়ে বেশি প্রাঞ্জল ও উপভোগ্য মনে হত। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রভৃতি দুই একটি কাগজে ভালো জ্ঞানগর্ভ আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে থাকত।

"সমাচার দর্পণ" খ্রিস্টানদের কাগজ বলে তাতে হিন্দু ধর্মের দোষ-

ফুট নিয়ে অনেক আলোচনা ছাপা হত। সে-সবের প্রতিবাদ না হলে হয়তো সব সময়ে তাদের কাছে "ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হত না এবং "হিন্দুদর্পণ", "সমাচারদর্পণ" প্রভৃতি মারফৎ প্রচারিত বাংলা গদ্য সংক্রান্ত প্রয়াস মাঠে মারা যেত। রামমোহন "ব্রহ্মণসেবধি" প্রকাশ করে একদিকে যেমন নিজ ধর্ম ও সমাজের পক্ষ সমর্থন ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডনের ব্যবস্থা করলেন, অন্যদিকে তেমনি বিশপারি-দেরও "বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়া" থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবানী-চরণ, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির মতো উৎসাহী সম্পাদকেরা নিজেদের পত্রিকার সাহায্যে ভাষার পুষ্টি ও সরলতা বাড়িয়ে চললেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের আগেই এই সব কারণে যথেষ্ট পরিমাণে কৌতুকময় সরসরচনা পড়তে জানত বা খুব নিকৃষ্ট রচনা নয়। যার সংবাদ-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত আর সামান্য পরিমাণে হলেও সাহিত্যগুণসম্পন্ন এই সূত্রপাত অথচ সরল, চিন্তাপূর্ণ অথচ উপভোগ্য রচনার নমুনা বিচার করলে মনে হয়, সাংবাদিকতার সে-যুগে বাঙালির অগ্রগতি প্রশংসনীয়।

"সমাচার দর্পণ" থেকে উদ্ধৃত ১৮২২ সালের একটি ভাষা-নিদর্শন দেখা যাক :—

"বুদ্ধিল লোকেরা বিদ্যা ও ধন-রহিত। আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না, উহাতে বংশবৃদ্ধি কিরূপে চলে? কেবল অন্যায়সমাধ্য চুলকাটা, ঠেলা মোটা, লম্বা কাজা, উঁচে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয়। তাহারা ইঙ্গরেজির ভাণ এক এক বাবুর সহিত বন্ধুতায় আলাপ দ্বারা দর্শন সহবাসে করিয়া প্রীতি জন্মায়, সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়।"

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক ১৮৩৭ সালের "সংবাদ প্রভাকর" থেকে :—

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি, সৌভাগ্য, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমত ইহাকে স্থাপিত করেন।"

১৮৪১ সালের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" থেকে নেওয়া একটি দৃষ্টান্তের ভাষা এই সময় ভাষা পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে :—

"আমাদিগের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু ভরসা করি, তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎ পত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে বণিক এবং ব্যবসায়ি আপন আপন কর্ম হইতে অবকাশক্রমে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাবর্গে পরযোগে ক্রীড়াস্থলে এই পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে মূর্খগণ ইঙ্গরেজী-য়ীয়ক গ্রন্থ সকল পরিহরণপূর্বক উপকারক বিষয় সকলের চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি বুদ্ধিজনক বিষয়ে সম্ভালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য, এবং ঐ কারণ নিস্কার্থে যাহাতে এই পত্র সকলে পাঠ করিতে পারেন, ইহা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।"

এই দৃষ্টান্ত তিনটির ভাষা বেশ উপভোগ্য ও মার্জিত হলেও বালক-বালিকার উপযোগী বলে মনে করা যায় না। ১৮৪৩ সালে অক্ষয়কুমার বিদ্যার আর পাদ্রীদের নিয়ে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" নামে এক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে ঐসব দৃষ্টান্তের ভাষার চেয়েও সুবোধ্য ভাষার সাময়িকপত্র চালাবার চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টা ফলের মিলিত সাধনায় বহু দূর অগ্রসর হয়। কিন্তু এই পত্রিকার গদ্যভাষা সেকালের যে কোন কাগজের ভাষার তুলনায় সহজ হলেও আমরা যাকে কথ্যভাষা বা চলতি ভাষা বলি, ঠিক সে-ভাষা নয়। সে-ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ভাষণ হচ্ছে, "সধুক পক্ষ"; এটিই চলতি ভাষায় লেখা প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা। সেই রকম, ১৮৭২ সালে প্রকাশিত "বঙ্গদর্শন" প্রথম সাধুভাষায় সাহিত্য-পত্রিকা। তার আগে "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা," "বিবিধার্থ সংগ্রহ", "মাসিক পত্রিকা" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোনটিই বিশুদ্ধ সাহিত্যিক লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্যে প্রকাশিত নয়। ঐ ধরণের পত্রিকাগুলির প্রায় সব কটিরই লক্ষ্য ছিল সংবাদ-পরিবেষণ ও জ্ঞানোদ্দীপক প্রস্তাব বা প্রবন্ধ রচনা করা। জনসাধারণ সাহিত্য-রচনাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে, সংবাদ পরিবেষণের সঙ্গে সঙ্গে কাম্য যার ছিলে, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহের ভাষা ও বিষয়বস্তুগত উৎকর্ষবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রথম ব্রতী হল "বঙ্গদর্শন"। তার আগে একমাত্র "মাসিক পত্রিকা" কেবল জ্ঞানচর্চায় সন্তুষ্ট না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সাহিত্যরচনার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু প্রথম সর্বাঙ্গীণ সাহিত্যিক প্রয়াস সুরু হয় "বঙ্গদর্শন"-এ। এতেই কয়েক বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের বর্তমান পথ সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট দিশা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৭৮ সালই এই জন্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর যে, প্রথম এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র কথ্যভাষার ছেঁদের নির্ভুল ঘোষণা করলেন, আর রবীন্দ্রনাথ আদর্শ কথ্য ভাষায় প্রথম গল্পগ্রন্থিতা সৃষ্টি করলেন; অনেকের যে ধারণা, ১৮৫৪ সালে "মাসিক পত্রিকা"-য় প্রকাশিত "আলালের ঘরের দুলাল" কথ্যভাষায় বিরচিত প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থ, তা মোটেই ঠিক নয়। এ বিষয়ে প্রথম গৌরব রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে অর্জন করেন। ১৮৮২ সালের "হুতোম-পাঁচার নক্সা" কেন ঐ গৌরব লাভের অযোগ্য, পরে তা আলোচনা করা হবে।

জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ সাধারণত রচনা-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। প্রবন্ধ এখন রচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করা খুবই সম্ভবপর আর বাংলা ভাষায় তা প্রচুর পরিমাণে করা হয়েছে যে রচনা-সাহিত্যে একাধারে রস ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধিত। কিন্তু "বঙ্গদর্শন"-এর আগের পত্রিকাগুলিতে সাধারণত যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হত সেগুলি ছিল নীরস তথ্যপূর্ণ ও তত্ত্বপ্রধান। যদি চিন্তাকর্ষকের উপাদান তাতে কিছু পরিমাণে থাকত, তবে তা উপাদান হিসাবেই পাঠকের চিত্ত হরণ করত, রচনাকৌশলের কোন গুণে পাঠকের মনোরঞ্জনের উদ্বোধন হত না। বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্য" বা "কমলাকান্ত", চন্দ্রনাথ বসুর "সুলের ভাষা," রবীন্দ্র-নাথের "পঞ্চভূত"-এর মতো রসপ্রধান প্রবন্ধ, যে ধরণের রচনায় প্রধান চিন্তাশীলতা ও উজ্জ্বল সরলতার সমাবেশ সংসাধিত, সে ধরণের রচনা ১৮৭২ সালের আগের যুগে বড় একটা পাওয়া যেত না। ১৮১৮-৭২

সালের মধ্যবর্তী যুগে অন্যান্য পত্রিকাগুলি প্রধানত রসহীন কিন্তু জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধাবলীর রচনাবৃদ্ধিতে উৎসাহ দান করে গিয়েছে। ঐ সব গদ্যরচনা সাহিত্যপ্রবন্ধরূপে গণ্য হবার যোগ্য না হলেও ভাষা-গঠনে, রীতিকৌশলের উদ্ভাবনে, সাধারণ্যে ইঁচু মানের গদ্যের আদর্শ প্রচারে ও স্থাপনে এদের দান অসামান্য। কখনও কখন দু একটি রসপ্রাণ তাত্ত্বিক প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে; কদাচিৎ তথাকথিত গদ্য-বিষয়েও লেখকচিত্তের রস-উৎস আনন্দনির্ঝরিণী প্রবাহিত করেছে। কিন্তু রামমোহনের মতোই ১৮৭২ সালের আগে তাঁর পরবর্তী প্রায় সব গদ্যলেখকের রচিত প্রবন্ধগুলিতেও বিদ্যাবত্তার সঙ্গে রসিকচিত্ততার সার্থক সংযোগ দেখা যায় না। প্রথম সাহিত্যপ্রবন্ধময় পত্রিকা হিসেবে এদিক থেকেও "বঙ্গদর্শন" নবযুগের সূচনা করল।

এই যুগে কোন কোন পত্রিকা পূর্বোক্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলির যৌলতে পাঠ্যপুস্তকোচিত গাম্ভীর্য অর্জন করেছিল। সাধারণ এক সংখ্যা "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" কিংবা "এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ" ঠিক পড়ার বইএর মতো সাহিত্যগুণবিবর্জিত, শুষ্ক ও জ্ঞানগ্রন্থ বিষয়ে পূর্ণ, সাধুভাষায় লেখা প্রবন্ধের সঙ্কলন ছিল। এই সব গুণের জন্যেই প্রথম বাংলা সাময়িকপত্রগুলির অন্যতম "বিদ্যদর্শন" স্কুলবুক সোসাইটির অধীন বিদ্যালয়ে পড়ার বই হিসাবে গৃহীত হয়। এখনকার দিনের "শিশুসাথী"-র মতো পত্রিকারও এই সৌভাগ্যলাভ হয় নি। তার প্রয়োজন তখন হয়েছিল উপযুক্ত পড়ার বইএর অভাবে, এখন সে-অভাব নেই, তাই সে-ব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না যে, মাসিক কাগজগুলিতে পাঠ্যপুস্তক ও সাময়িকপত্র হাত-বদলাবদলি করে চলবে। তখনকার দিনে সম্পাদকদিগের একাধারে সাংবাদিক ও পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা। আর পড়ার বই আর মাসিকপত্র একাগ্রভাবে বিভিন্ন হয়ে গেছে—যেমন হয়েছে পাঠ্যপুস্তক আর গল্পসাহিত্য। তখন পাঠ্যপুস্তকই বাংলাভাষার সবে-ধন-নীলমণি-গোছের গল্পসাহিত্য বলে গণ্য হয়েছে। তখনকার মাসিকপত্র ছিল পাঠ্যপুস্তকের অনুরূপ। সাপ্তাহিক কাগজগুলিতেই অনেকাংশে লঘু ও চটুল রচনাগুলি ছাপা হত। ১৮৩৮ সালের আগে বাংলা দৈনিক কাগজ বলে কিছু ছিল না। ঐ বছর থেকে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হয়। এখনও তার ইংরেজি রূপান্তর মহা সমাদরে প্রচলিত।

সাংবাদিকতায় বাঙালির উৎসাহ বরাবরই খুব বেশি। দুর্ভাগ্য বশত সে-উৎসাহ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। এই উৎসাহের জন্যেই ১৮১৮ সালের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়ের পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে নানারকম সাময়িকপত্রের অভাব কখনও হয়নি। এদের অধিকাংশই স্বল্পায়ু ও ক্ষীণজীবী হলেও বাংলা গদ্যের বিকাশপ্রবাহ এদের প্রচেষ্টায় যুগে যুগে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অন্য সব দেশের মতোই। আর সব কাগজের কথা ছেড়ে দিলেও কেবল "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"-র প্রভাব বাংলা গদ্যকে রসসৃষ্টির উপযুক্ত ভাষার পরিণত করেছে, একথা অসঙ্কোচে বলা যায়। কেবল সারগর্ভ নিবন্ধ প্রকাশের কাজে নিযুক্ত থাকলেও এইসব পত্রিকার রচনার গুণেই ভাষা ক্রমশ বেশি ভারবহনসমর্থ হয়ে উঠে পরিশেষে এমন একটা অবস্থা প্রবাহগতি আয়ত্ত করল যে, শক্তিমান্ লেখক কেবল ইচ্ছা করলে সেই ভাষায় উত্তম রস সৃষ্টি করতে পারেন, এমন অবস্থা হল।

সমস্ত বাংলা সাময়িকপত্র সংগ্রহ করে পড়তে পারলে আধুনিক বাঙালি জাতির প্রায় সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রায় সমগ্র সাহিত্য এবং তার ক্রমবিকাশও উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়। তার কারণ আর কিছুই নয়, খুব সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বিখ্যাত লেখকের গদ্যে ও পদ্যে লেখা প্রায় সমস্ত বিখ্যাত রচনা প্রথমে কোন-না-কোন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রতি লেখকবর্গ সাময়িকপত্রের প্রভাব খানিকটা অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবে সরাসরি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন। ফলত এর ফলে এক সময় দেখা যাবে যে, বাংলা গদ্যের গঠনে আজ যেমন পাঠ্যপুস্তকের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, সাময়িকপত্রের অবস্থাও প্রায় সেইরকম হতে চলেছে এবং মাত্র "সংবাদসাহিত্য" রচনা করেই পত্রিকাগুলির কাজ ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে-অবস্থা এখনও বহু দূরে। বিশুদ্ধ সাংবাদিকতার দ্বারা পত্রিকা-পরিচালনা এদেশে এখনও মাসিক ও সাপ্তাহিকের জগতে সুরু হয় নি। এমনকি, দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও সাহিত্যের প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

তবে, আজকের দিনে বাংলা গদ্যের উপর প্রধান প্রভাব বিস্তার করছেন পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর গদ্যলেখকেরা; যতটা স্বাধীনভাবে, ততটা পত্রিকাসমূহের মারফতে নয়। পত্রিকাগুলি তাঁদের পত্রিকানিরপেক্ষ-ভাবে প্রকাশিত রচনাবলীর আদর্শে গদ্য রচনা করে যাচ্ছে এবং সেই গদ্য বাংলাদেশের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। তার দ্বারা আধুনিক-তম ও উন্নততম সমাজরচনার আদর্শসমূহ জনচেতনা পর্যন্ত আন্দোলন-বিস্তারে সমর্থ হচ্ছে। পরিণামে প্রবর্তিত পরিবর্তন সমাজের সব স্তরে এইভাবে প্রসারিত হচ্ছে। অল্প ও অল্পশিক্ষিত মফঃস্বলবাসীও এইভাবে উপকৃত হচ্ছে। এক শতাব্দী আগে অবস্থা অন্যরকম ছিল। তখন বাংলাগদ্যের গঠনে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল "তত্ত্ববোধিনী"-র মতো পত্রিকার প্রভাব।

রামমোহনের ভাষার তুলনায় তাঁর পরবর্তী সাময়িকপত্রের ভাষা যে বেশি সরল ও সরস, তা আমরা আলোচনা করে দেখলাম। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৮২২ সালেই ধর্মযাজকের কাগজ "সমাচার দর্পণ"-এর ভাষা এমন একটা সমগতি ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করেছে, যার অনুরূপ দক্ষতা রামমোহনের শেষের দিকের রচনাতেও পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর ঈশ্বর গুপ্ত যে-ভাষায় গদ্য রচনা করে "সংবাদ প্রভাকর" পরিচালনা করতেন, সে-ভাষাও "সমাচার দর্পণ"-এর ভাষার তুলনায় অনেক বেশি গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতঘেঁষা। তার কারণ, ধর্ম-যাজকেরা যেমন দেশীয় ভাষায় পরধর্মের অতিনিন্দা সহ্য করতেন না বলে অনাবশ্যক ফার্সিবাহুল্য গদ্যভাষা থেকে সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলে-ছিলেন, রামমোহনের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও ধর্মনেতাদের বাদপ্রতিবাদের সময় তেমনি অতিরিক্ত সংস্কৃত-শব্দপ্রয়োগও সযত্নে পরিহার করেছিলেন। ফলত

বিদ্যুতের ঐ তার-বাহনটির প্রতি বিদ্যালয়ের আরো বেশি ঝোঁক। রামমোহনের রচনায় আবার এই ঝোঁক বেশি পরিমাণে সংস্কৃত প্রভাব এনে ফেলে যে, তিনি বহুলের মেলা সম্পর্ক সমকালীন সমাজ ও বিদেশির দৃষ্টিতে ঠাঁই করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্যে সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ও প্রভাব অপরিহার্য।

ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজদের চোখে দেখতেন। তিনি নিজেও ছিলেন বঙ্কিমের ভাষায় "খাঁটি বাঙালি।" তাই তিনিও সংস্কৃতানুগ শব্দের ধার অনুসরণ করে গেছেন। তা ছাড়া, মুখরুচি উদ্রেকের মতো সাহিত্যিক প্রতিভা ও বাক্তি তাঁর ছিল না।

রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন উদ্যোগী হয়ে ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্ররূপে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ করলেন, তখন তিনিও মূলত রামমোহনের ধারা অনুসরণ করে চললেন। পরে তাঁর হাত অনেক দৃঢ় ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠলেও তাঁর গদ্যের মূল প্রকৃতি অপরিবর্তিত থেকে যায়।

সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে "তত্ত্ববোধিনী" ছিল অসাধারণ। এই পত্রিকাকে অবলম্বন করেই অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভা প্রথম বিকাশ লাভ করে। তিনি এই পত্রিকার প্রথম বারো বছর (১৮৪৩-৫৫) সম্পাদনার কাজ করেন। তারপর ভার বিদ্যাসাগর নেওয়ার গ্রহণ করেন. দেবেন্দ্রনাথও এই কাগজে লিখতেন। কিন্তু শুধু দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর নন, তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সকলেই এতে কম-বেশি লিখতেন। এটি ছিল সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা। বাংলা গদ্যে রীতিকৌশলের অবতারণাই হল এই পত্রিকার শ্রেষ্ঠ দান।

১৮৫১ সালে পূর্বোক্ত "স্কার্‌সিডিউলার লিটারেচার সোসাইটি"-র আনুকূল্যে বিদ্যাবাচস্পতি ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামে এক মাসিকপত্র বার করেন। বাংলা গদ্যরচনার কাজে এর দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা এই কাগজে প্রথম সুরু হয়।

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদের "মাসিক পত্রিকা" বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্যে অভিনবত্ব নিয়ে এল। এর প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হল, "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।" অবশ্য পুরোপুরি কথ্যভাষার অর্থাৎ মাঝারি-রকমের ভাষায় গদ্য রচনা করা প্যারীচাঁদের পক্ষেও সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু ঐ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল, তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বাড়ানো, কথ্য-ভাষার ঐতিহ্যে কাব্য রচনা করা, ক্রিয়ার সুযোগ্য বিন্যাস, কথা আর লেখা দুই ভাষায় ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—যে সব গুণ অসাধারণ প্রগতিশীল-তার পরিচায়ক। পরে প্যারীচাঁদের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

সাময়িকপত্রের গদ্যভাষা নিয়ে আলোচনার পর পাঠ্য পুস্তক ও অনূদিত বইএর সাহায্যে বাংলা গদ্যের কি রূপ-বদল ঘটেছিল, তার আলোচনা করা দরকার। ১৮১৭ সালের সুল বুক সোসাইটি ১৮১৮ সালের শ্রীরামপুর কলেজের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রচুর পড়ার বই মৌলিক রচনা এবং অনুবাদ দু'ভাবেই প্রকাশ করে। কিন্তু "ধর্মতলাবানুবাদক সমাজ" অনুবাদের প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে ১৮৪২ সাল থেকে বাংলা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ সুরু করায় শ্রীরই সুলবুক সোসাইটির প্রচেষ্টাকে অনেকাংশে অতিক্রম করে যায়। এর পর থেকে সুলবুক সোসাইটির প্রকাশনী গদ্য-ভাষার গড়ার ব্যাপারে তেমন কার্যকরীও হয়নি। স্কার্‌সিডিউলার সোসাইটি অনূদিত পুস্তকের ক্ষেত্রে এই নতুন প্রয়াস বিস্তার করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ১৮৫৮ সালের মধ্যে বাংলা গদ্যের কি পরিণতি সাধিত হল, তা লক্ষ্য করা উচিত। (ক্রমশ)

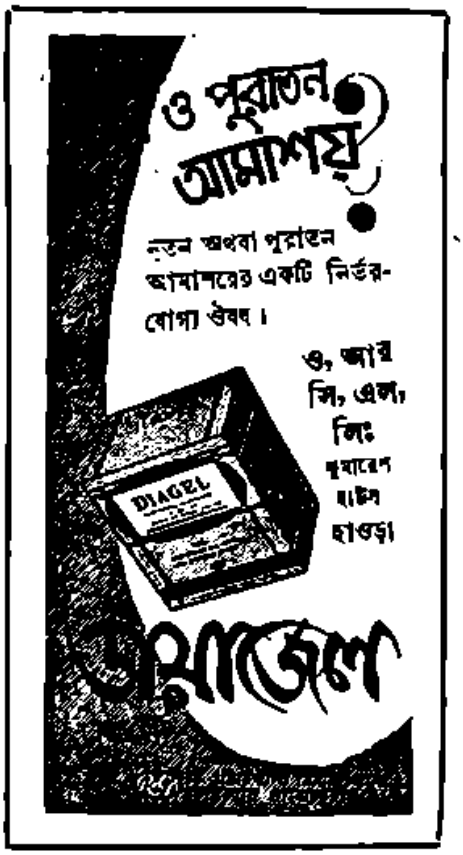

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ পাহাড়ী দৃশ্য ফটো : ভূপেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ওয়েস্ট ফ্রিজ ফার্ণস

পাহাড়ী মেয়ে

শ্রীঃ গোপকুমার রায়

তোমরা আর সাগর পারের ছেলেমেয়েরা

উপানন্দ

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যেন উন্নয়নের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করছি, তোমরাও শিক্ষার মর্যাদা দিতে শিখলে না। এটি গভীর অনুতাপের বিষয়। তোমাদের অসংযম, অধৈর্য্য, উত্তেজনা ও সাময়িক উন্মাদনা সময়ে সময়ে শুধু বিদ্যায়তনগুলিকে নয়, আমাদের সমাজসংস্কারকে বিপন্ন করে তোলে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার অধিকার থেকে তোমরাও বঞ্চিত নও—কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলা, শালীনতা ও সংযমের সঙ্গে প্রতিবাদ করাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকূল। প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে ঝড় আনা শক্ত নয়, কিন্তু সে ঝড়ের পরিণতি কতখানি লোচনীয় পরিস্থিতি এনে রেখে, তাও আগে ভেবে দেখা আবশ্যক—সংহার যত সোজা, সংগঠন তত সোজা নয়। একটি জীবন নেওয়া যত সোজা, একটি জীবন দেওয়া তত সোজা নয়। এবার সহরের বুকে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে যে সব ছাত্রের মৃত্যু হয়ে গেল, তার পরিণতি যে জাতির অগ্রগমনের পথটীকে কণ্টকাকীর্ণ করে তুলেছে, এটা অবশ্য তোমরা স্বীকার করবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনরাষ্ট্রে এরূপ বর্ব্বরতা কোন শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কখন ছাত্রসমাজ ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি নিয়ে শিক্ষা মন্দিরগুলি কলুষিত করে নি,—এরূপ মনোবৃত্তি আত্মহননেরই দ্যোতক বলে মনে করে। তোমরা পরীক্ষাকেন্দ্রে, স্কুলে, কলেজে যেভাবে হট্টগোল আর গণ্ডগোলের সৃষ্টি করো তা দেখে শুধু আমরা লজ্জা অনুভব করিনা, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা আমাদের নিন্দা করে থাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার দিকে খুব জোর দিয়েছে, দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা, বিশেষতঃ বাংলার ছেলেমেয়েরা যেন হটে আসছে। তার কারণ শিক্ষালাভের দিকে আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব ঘটছে। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার অন্যতম মূল বিষয় হচ্ছে সার্থকতার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে পারা—শিল্প-কলা, সাহিত্যে ও লেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে শেখা, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষলাভ করা। এগুলির অভাব ঘটলে প্রগতি-মূলক কোন কাজেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। বিশ্বের ছেলে-মেয়েরা আমাদের ছেলেমেয়েদের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও বর্ব্বরতা দেখে উল্লসিত হয়ে উপহাস করবে। এটা আমরা কেমন করে সহ্য করবো। তাই বলি তোমরা মানুষ হও,—মানুষের মত মানুষ হও। ছুটির সময়ে তোমরা শুধু পড়াশুনাই করবে না, গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সেখানে কিছু কিছু দেশের কর্ম্মপ্রচেষ্টার কাজও করবে, তাতে আনন্দ পাবে আর সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভও হবে।

মার্কিণের লোকেরা বলে—দেখবার আমার বয়েস—তাই ওদের দেশে নাতিপুতি হয়েছে এমন বহু নাতিপুত্র দেখাশুনা করতে লজ্জাবোধ করেনা। ওদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পরিণত বয়সে যাতে রাষ্ট্রের জীবন-যাত্রার সাংস্কৃতিক ও কারিগরি মানকে উন্নত করতে পারে, তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে। অবশ্য এদের প্রচেষ্টার মূলে নানা ভাবে রাষ্ট্র শক্তির সহায়তা লক্ষ্য করা যায়, এদিকে আমাদের রাষ্ট্রশক্তি সচেতন না থাকায় অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এ দেশের ছেলে-মেয়েদের চলতে হয়। হাইস্কুল অবধা কলেজেই মার্কিণ শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ কথা নয়, বিশেষ বিশেষ স্তরের ব্যবস্থা নানা ভাবে ছড়ে রয়েছে। এগুলো সে অঞ্চলের বাসিন্দারা পরিচালনা করে থাকেন। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা-পরিচক্র দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করেছে। যুবকদের শুধু কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরাই পড়াশুনা করে না, প্রাপ্তবয়স্কেরাও করে থাকে—এদের ক্লাস সাধারণতঃ রাত্রে কোন সরকারী বিদ্যালয় ভবনে অথবা টাউন হলে বসে। ১৯৫০ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে বিভিন্ন শিক্ষাসূচী অনুযায়ী প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক বিভিন্ন বয়সের পড়াশুনা করেছিল। এই সব যুবক পড়ুয়াদের মধ্যে আছেন সংসারের বউ ঝিয়ি, কেরাণী শ্রেণীর কর্ম্মচারী, কারিগর, শ্রমিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষ। শিশু বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েরা খোঁজ জীবনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

করতে দেখে। এ থেকেই তারা উত্তরকালে সমাজ জীবনে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে আর মার্কিন মুলুকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সীমা কতখানি জানো?—উত্তরে ডোমিনিয়ন অব কানাডা, দক্ষিণে মেক্সিকো, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর—আর পশ্চিম পূর্বে মেক্সিকো উপসাগর—এই হোলো যুক্তরাষ্ট্রের সীমা। এর আয়তন হচ্ছে ৩০,২২,৩৮৭ বর্গ মাইল। সহর কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে যারা বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে পড়ে তাদের সংখ্যা মোট ছাত্রদের প্রায় ৫৫ পার্সেণ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক বালক-বালিকার শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ রাজ্যে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে পড়ার নিয়ম। সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকাল ৮ বৎসর, আর মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪ বৎসর। ১৯৪৩-৪৪ শিক্ষা বৎসরে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩,৫৯,৯০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রী পেয়েছে। এদের মধ্যে ব্যাচিলর, অথবা পেশাগত বিষয়ে ডিগ্রী পেয়েছে ২,৯১,৮২৪ জন, তার মধ্যে ছাত্রী ছিল ১,০৪,২৮৭ জন, মাষ্টার ডিগ্রী পেয়েছে মোট ৫৬,০৮৮ জন, তার ভেতর ছাত্রী ছিল ১৮,৩১১ জন, আর ডক্টরেট পেয়েছে ৮১১ জন নারীসহ ৮,৩৮৫ জন। মার্কিনরা কর্মঠ জাত। আমেরিকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩,৪০,০০০০০ —তার মধ্যে প্রায় ১,৪২,০০,০০০ লোক বেতন বা মজুরীর বিনিময়ে অথবা নিজে ব্যবসায়ে নিযুক্ত। আমাদের দেশে যেমন অন্ন-বস্ত্রের কঠিন সমস্যা, তেমনটি ওদের দেশে নেই।

কৃষিপ্রধান অঞ্চলে ছেলেমেয়েরা একদঙ্গে কৃষিবিদ্যা, গৃহস্থালী, আর ব্যবহারিকশিল্পের কারিগরী শেখে। জুনিয়র হাইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের জন্যে বিভিন্ন সংগঠন আছে, যেটাতে আগ্রহ বেশীতেই যোগ দেওয়া যেতে পারে। অধিকাংশে হাইস্কুলেই নাটক, ফটোগ্রাফি, বিতর্ক, সঙ্গীত, সাংবাদিকতা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আর শিল্পকলা সম্বন্ধীয় ক্লাব আছে। অর্কেষ্ট্রা, ব্যাণ্ড আর গান শেখার ক্লাবও বর্তমান। বড় বড় স্কুলগুলোতে অবসর সময়ে বিমান ও মোটর চালানো শেখাবার ব্যবস্থা আছে, আছে নানারকমের খেলা-ধূলার জন্যে আন্তঃকলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের টীম।

বহু ছেলেমেয়ে স্কুলের পর কিছুক্ষণ কাজ করে পারিবারিক আর্থিক-সঙ্গতির উন্নতি বিধান করে। যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার কিশোর পাড়ায় খবরের কাগজ বিক্রী করে বেশ টাকা রোজগার করে, পরে কলেজে পড়বার সময়ও তারা কিছুক্ষণ কাজ করে উচ্চ-শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করে। আমাদের দেশে পিতামাতা বা অভিভাবক-গণের ওপর খুব চাপ দিয়েই ছেলেমেয়েরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, —কি ভাবে নিজেদের লেখাপড়ার খরচ নিজেরা আয় করে চালাতে পারে সে সম্বন্ধে ভেবে দেখে না। বাবা যখন মাথার ওপর আছেন ভাবনা কি? এমন কথা কোন মার্কিন ছেলেমেয়ে বলেনা। তারা ছেলেবেলা থেকেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত বিলাসী—কিন্তু তারা বিলাস ব্যসনের জন্য পয়সার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে পায় না। এই আত্মনির্ভরতা জানই মার্কিন ছেলেমেয়েদের ভাবীজীবনকে গৌরবময় করে তুলছে—তারা সহজে কারো কাছে হাত পাতেনা। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মত, আর ছাত্রজীবনে এদেশের ছেলেমেয়েদের মত বাবুয়ানি করে বেড়ায় না। স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েরা পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। গরমের ছুটির সময় বহু ছেলেমেয়ে বিভিন্ন দল বেঁধে বাস করে। এইভাবে মার্কিণ ছেলেমেয়েরা গড়ে তোলে তাদের জীবন। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে নেই বলেই চলে—কিন্তু আমাদের দেশে হাজার হাজার নিরক্ষর অশিক্ষিত রয়েছে, লজ্জার বিষয় বই কি! সোভিয়েৎ দেশে রাষ্ট্র সরকারই শিক্ষার সকল রকম ব্যবস্থায় গ্রহণ করেছেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক। কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় শিশুমনের উপযোগী নানা বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। পক্ষপাতিত্ব নেই, রাষ্ট্রের চক্ষে সবাই সমান। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষা পাবার জন্যে ব্যবস্থা তো আছেই, তাছাড়া তাদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করবার জন্যে বৃত্তি দেওয়া হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ মর্যাদা আছে। রাশিয়াতে অসংখ্য বিদ্যালয়। পড়াশুনায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা অত্যন্ত মনোযোগী। শিক্ষান্তে যাতে উভয় ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে কাজ পায়, আর সেইসব কাজের দায়িত্ব নেবার জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হোতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। ছুটির দিনে এরা যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্যে পুলিশের কাজ নেয়, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ওরা থিয়েটার চালায়। ছাত্রছাত্রীদের কথা যার যেমন খেয়াল, সেইরকম শিক্ষা দেওয়া হয়। এক স্কুলের ছাত্রছাত্রী অন্য স্কুলে প্রায়ই বেড়াতে যায়, পর্যবেক্ষণ করাই আসল উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় এরাও অংশ গ্রহণ করে। তোমরাও এইসব দেশের ছেলেমেয়েদের উচ্চ আদর্শগুলি গ্রহণ করে মানুষ হয়ে ওঠো, আর রাষ্ট্রের মুখোজ্জ্বল করো—অশিষ্ট আচরণের দ্বারা নিজেদের দর্শনীয় করোনা, লেখাপড়ায় অবহেলা করে স্বাস্থির কলঙ্ক-ভাজন হয়োনা।

বুদ্ধ পূর্ণিমাতে

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

হে প্রভু তথাগত
করগো অপগত
সকল ভীতি তুমি পৃথিবী হ'তে,
তোমার মধুবাণী
শান্তি দিক আনি—
বেদনা হোক দূর করুণা স্রোতে ॥
আশিসে তব প্রভু
না লাগে যেন কভু
হিংসা-মলিনতা হৃদয় মাঝে ;
মিলন-মধু গীতি
জাগুক হেথা নিতি—
আসুক উৎসাহ সকল কাজে ॥
মিথ্যা-মেঘ কালো
ঢেকেছে আজ আলো,
যুদ্ধ হানাহানি জগৎ জুড়ে ;
বুদ্ধ মহাপ্রাণ করগো সবে ত্রাণ
কণ্ঠ হতে ঝরা প্রেমের সুরে।

করুণাময় সিদ্ধার্থ

রমেন গুপ্ত

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করে রাজগিরিতে গিয়ে সাধনা সুরু করেছিলেন। জরা মৃত্যু শোক দুঃখ দেখে কিশোর কুমারের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। আর্ত মানবের পরিত্রাণের জন্য তিনি প্রচার করেছিলেন অমৃত বাণী। হিংসা জর্জর পৃথিবীকে শুনিয়ে ছিলেন অহিংসার মহা মন্ত্র। শুধু মানুষের জন্যই নয়, মূক পশুর জন্যও তাঁর অন্তরে ছিল স্নেহের সুধাভাণ্ড—করুণার অফুরন্ত উৎস। বাকশক্তিহীন পশুর অব্যক্ত বেদনাও তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

একদিন অপরাহ্নে রাজগিরি নগরীর প্রান্তে সিদ্ধার্থ একাকী ভ্রমণ করছিলেন। সবুজ তৃণক্ষেত্র আর বিচিত্র ফুলের নয়ন মনোহর শোভা দেখতে দেখতে তিনি পথ চলছিলেন। এমন সময়ে দেখলেন একপাল ছাগশিশু ও মেষ নিয়ে একটী লোক পথ চলেছে। সারাদিনের পথ চলার ক্লান্তিতে ছাগল ও মেষগুলি অতি কষ্টে পা ফেলছে এবং পালক এক রকম জোর করেই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থর অন্তর বিগলিত হল। কাছে গিয়ে তিনি পালককে বললেন, ওহে, সূর্য্য এখনও অস্ত যায়নি। মাটি এখনও উত্তপ্ত। প্রচণ্ড রৌদ্রের মাঝেই বোধ করি এদের নিয়ে বেরিয়েছ। তোমার প্রাণে কি মায়া মমতা নেই ?

সন্ন্যাসীর কথা শুনে মেষপালক বললে, রাজার আদেশ সাধু। আজই সন্ধ্যায় সুরু হবে রাজার যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে একশোটি ছাগ ও মেষ বলি হবে।

এই কথা শুনে শিউরে উঠল সিদ্ধার্থর দেহটা। ক্ষণিক চিন্তা করে বললেন, দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। মেষপালকের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন করুণার অবতার গৌতম। অনেক মাঠ ঘাট পার হয়ে চলতে লাগলেন। একটি রুগ্ন মেষশাবককে কোলে নিয়ে সহরের সীমানা ছাড়িয়ে গেলেন। তাঁর শান্ত সৌম্য ভুবন-ভোলানো রূপ দেখে পথের মাঝে থমকে দাঁড়ায় পথচারী। নগরীর প্রবেশপথে বাতায়নের জানালায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে অন্তঃপুরচারিণী পুরনারী। রাজপ্রাসাদের প্রবেশ-দ্বারে কাজ ভুলে ভক্তিনম্র হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রহরারত দ্বারী। আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণবিস্তৃত বেদনা-কাতর নয়ন যুগল, দিব্যজ্যোতির্ময় পবিত্র সৌম্য দেহ। ধীরপদে এগিয়ে চলেন সিদ্ধার্থ। রাজপ্রাসাদে মহাযজ্ঞের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। বলিদানের বেদীতে তখন একটি ছাগ-শিশু। আর ঘাতকের উদ্যত খড়্গ তখনই দেহ থেকে তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এই পৈশাচিক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে উন্মত্তের মত এগিয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ। রাজাসনে উপবিষ্ট নরপতির কাছে গিয়ে বললেন, হে রাজন, ওই

অসহায় ছাগ শিশুকে হত্যা করা বন্ধ করুন। আপনার এই মহাযজ্ঞে একান্তই যদি রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে ওই ছাগের বিনিময়ে আমি আমার নিজের জীবন দিচ্ছি। নররক্তে আপনি যজ্ঞপূর্ণ করুন। ছাগলটিকে মুক্তির আদেশ দিন।

অনুষ্ঠানের মাঝে এই অভূতপূর্ব ঘটনায় রাজা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন সিদ্ধার্থর দিকে। মন্ত্রমুগ্ধ ঘাতকের হাত থেকে খড়্গ খসে পড়ল। সিদ্ধার্থ বললেন, হে রাজন, আপনি যত খুশি প্রাণ বলি দিতে পারেন, কিন্তু প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আপনি প্রাণ দান করতে পারেন না। জীবহত্যা বন্ধ করুন। মৈত্রীর বাণী প্রচার করুন। ক্ষমা আর ভালবাসা মানুষকে বড় করে, পৃথিবীকে সুন্দর করে।

মৌলিক বসনে ভূষিত শান্তির দূত সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থর কথা রাজাকে একটা নতুন পথের আলো দেখালো। সেই মুহূর্তেই অশ্ব সমাপ্ত যজ্ঞ বন্ধ হল।

নিশিত রাত্রি জেগে রাজার মনে শুধু সিদ্ধার্থর কথাগুলোই বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কাতর প্রাণীর অব্যক্ত ব্যথা সেই দিনই প্রথম অনুভব করলেন রাজা। স্থির করলেন হিংসার পথ থেকে সরে আসতে হবে। অহিংসার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে নিজের জীবনকে দীক্ষা দিতে হবে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে। পরদিন প্রভাতে রাজা ঘোষণা করলেন তাঁর রাজ্যে কেউ পশু হত্যা করতে পারবে না। নগরীর পথে পথে ঘরে ঘরে রাজাদেশ প্রচার করল নগরপাল।

মায়াদ্বীপ

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

শুধু জল আর জল। সবুজ সবুজ ঢেউয়ের উদ্দাম নৃত্য। সেই ফেনিল উত্তুঙ্গমালার উপর দিয়ে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে মধুরপন্থী সপ্তডিঙা। অবন্তীপতির রাজকুমার ইন্দ্রদ্যুম্ন বেরিয়েছেন দিগ্বিজয়ে। সে কতদিন আগের কথা সঠিক জানা যায় না। ইতিহাসে তার কোনো উল্লেখ নেই। সবার সেরা ইন্দ্রদ্যুম্ন এগিয়ে চলেছেন পূর্বদিকে। শুনেছেন সেখানে নীল সমুদ্রের বুকে সবুজ দ্বীপে আছে সুগন্ধি ধনলতা, আছে হীরা, আছে মুক্তাচূর্ণী পাত্র, আর আছে অজানা দেশের বিদেশী রাজকন্যার নিমন্ত্রণ লিপি।

দারা দিনে রাতে অসংখ্যবার রং বদলায় দিগন্তপ্রসারী সমুদ্র। সকালের সোনার আলোয় সোনা ঘরে যায় তার জল, দুপুরে গড়িয়ে পড়ে রুপো। সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে আবির ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। শুক্লপক্ষের রাতে সমুদ্রের শোভা তাদের পাগল করে দেয়—আকাশ থেকে নেমে আসে রেশম আর জরীর জাল। আর কৃষ্ণপক্ষের রাতে ঢেউগুলো যেন রাজার হাজার নাগকন্যার মতো মাথায় মণি জ্বেলে উঠে আসে পাতাল থেকে।

দিকচিহ্নহীন অফুরন্ত সমুদ্রের বুকে হু হু করা বাতাস নীল আকাশ ছোঁয়া রাজহাঁসের পালকের মতো শুভ্র পাল তুলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ইন্দ্রদ্যুম্নের ময়ূরকণ্ঠী রঙের মধুরপন্থী সপ্তডিঙা। শুধু ঢেউয়ের দোল খাওয়া সমুদ্রের বুকে উপুড় হয়ে আছে আকাশ। অসীম জলরাশি—মাটির চিহ্ন নেই।

ভয় নেই, ডর নেই! তাদের দুঃসাহসিক তরুণ প্রাণে আছে শুধু এগিয়ে যাবার দুরন্ত নেশা, আর বিদ্বিজয়ের দুর্বার বাসনা।

কিন্তু সমুদ্র যে চিরদিনই দুরন্ত, চিরদিনই নির্দয়। তাই একদিন বিপদ ঘনিয়ে এলো বৈশাখের অপরাহ্নে। বন্ধুদের সনে পাশা খেলার মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন সহসা আকাশের বাদুড়কালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে একখণ্ড কালো মেঘ। পাশা ফেলে উঠে দাঁড়াল আর সকলে। দেখতে দেখতে নিবিড় কালো মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ। সন্ধ্যার পূর্বেই ঘনিয়ে এলো দুর্যোগের ইংগিত; পাল নামাতে নামাতেই দুরন্ত ঝঞ্ঝাবেগে মত্ত হয়ে উঠল সমুদ্র। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে করাল অন্ধকারে প্রলয় ঝঞ্ঝার আর বৃষ্টির মধ্যে ভূখণ্ডের মতো ভেসে চলল ইন্দ্রদ্যুম্নের ডিঙা।

ঝড় যখন থামল পূর্ণিমার চাঁদ তখন মধ্য গগনে। ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখলেন তাঁরা একটা দ্বীপের কাছে এসে পড়েছেন। কিন্তু ভয় ভয় করে দেখলেন কোনোদিকেই সঙ্গীদের ডিঙার কোনো চিহ্নই নেই।

রাত্রি শেষ হল। ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গীরা প্রাণে বাঁচলেন, আশ্রয়ও পেলেন। কিন্তু আহার কোথায়? জল কোথায়? রাত্রের নিদারুণ

ক্লান্তির পর সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। অজানা দ্বীপে আনা অজানা হিংস্র জন্তুর ভয়। দ্বীপের মধ্যে তাঁরা এগিয়ে যেতে সাহস করলেন না। এরিয়াবে দুদিন অতিবাহিত হল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথর বোলয়ে তুলে, কিন্তু তৃষ্ণার জল কোথায়। ডিঙার সঞ্চিত জল তখন শেষ হয়ে গেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে একাই দ্বীপের মধ্যে এগিয়ে গেলেন—যদি কোথা আহার্য ও পানীয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

কোনো দিকে জনপদের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু অর্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করতেই ইন্দ্রদ্যুম্ন শুনলেন—বনের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে এক আশ্চর্য ধ্বনি ডিং ডং ডং! ডিং ডং ডং! সেই শব্দ লক্ষ্য করে কিছুদূর এগোতেই রাজপুত্রের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল এক সুরম্য প্রাসাদ। প্রাসাদসংলগ্ন অদূরত্বাবে পঠিত এক বিশাল মন্দিরের মাথায় বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে রক্ত পতাকা।

আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল রাজকুমারের বুক। আশ্রয় লাভের আশায় দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। কিন্তু অল্প কিছু অগ্রসর হতে না হতেই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। অরণ্যের আড়াল থেকে ছুটে এল একটি লোহিত বর্ণের বন-বিড়াল। ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে ছুটোছুটি করে বার বার কাঁদতে লাগল। রাজকুমার প্রথমে লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু আরও অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেই আরও কাতর হয়ে উঠল বিড়ালটা।

সহসা রাজপুত্রের মনে উদয় হল বিড়ালটির অদ্ভুত আচরণ যেন কী অর্থপূর্ণ। যেন সে তাঁকে এগিয়ে যাবার পথে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। রাজপুত্র চিন্তা করলেন, তাঁর জন্য হয়ত কোনো অমঙ্গল অপেক্ষা করছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নানা কথা চিন্তা করে সেখানেই দাঁড়ালেন। তারপর ফেরার উদ্যোগ করলেন। আশ্চর্য, বিড়ালটিও সেই মুহূর্তে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরবার পথে ইন্দ্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন সমস্ত দ্বীপে মানুষ দূরের কথা ঐ বিড়ালটি ছাড়া কোথাও প্রাণীর চিহ্ন চোখে পড়ে না। একটি পাখীরও ডাক শোনা যায় না ডালে পালায়। অথচ আশ্চর্য, মন্দিরে অবিরাম ঘন্টা বাজছে। ডিং ডং ডং, ডিং ডং ডং।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ফিরে আসতে সেনাপতি কেতুবর্মণের সঙ্গে আগ্রহে এগিয়ে এলেন বহু জন সঙ্গী। কিন্তু রাজকুমারের মুখে সমস্ত শুনে তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তারা যত প্রস্তাব করল, একটি সামান্য বিড়ালের জন্য রাজপ্রাসাদের কাছ থেকে ফিরে আসা রাজপুত্রের উচিত হয় নি। ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মতি পেলে তারাই একবার দেখে আসতে পারে সমস্ত কিছু। কিন্তু সমস্ত দিক চিন্তা করে ইন্দ্রদ্যুম্ন তাদের সম্মতি দিলেন না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত নানা বিষয় চিন্তা করলেন রাজকুমার।

কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন জানলেন না প্রভাতে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গের পূর্বেই সেনাপতি কেতুবর্মণের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদের সন্ধানে।

অর্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করতেই কেতুবর্মণের দল শুনলেন সেই ঘন্টা-ধ্বনি—ডিং ডং ডং। ডিং ডং ডং।

রাজপুত্রের সতর্কবাণি উপেক্ষা করে আশ্রয়ের আশায় উৎফুল্ল হয়ে সকলে রাজপুরীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই বনের আড়াল থেকে ছুটে এল সেই বিড়াল। কিন্তু তার করুণ কান্নাকে উপেক্ষা করেই তাঁরা এগিয়ে চললেন রাজ-প্রাসাদের দিকে। ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল ঘন্টাধ্বনি। চারিদিকে সুন্দর ধাঁধাঁলো পথ, পুষ্পশোভা নয়নাভিরাম, আর সুন্দর উপবন; কিন্তু কোনো দিকে মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। সে যেন এক আশ্চর্য দেশ।

উপবনের পাশ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন তাঁদের সামনে দিয়ে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছে একটি অপরূপ বিচিত্র বর্ণের হরিণ। কাছাকাছি যেতেই হরিণটি চলে গেল না। আপন মনে পাশ দিয়ে চিবুতে চিবুতে তোরণের দিকে এগিয়ে চলল। হরিণকে অনুসরণ করে কেতুবর্মনের দল তোরণ পার হয়ে গেল। তোরণ অতিক্রম করতেই শুরু হল ঘন গাছের সারির নীচে দীর্ঘ পথ। গাছের পাতা ফেল করে নীচে সূর্যালোক আসে না। সে পথে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে আলোআঁধারের কুহক। হরিণের পিছনে পিছনে এগিয়ে যেতে যেতে ধীরে ধীরে ক্রমশ নিবিড় হয়ে উঠল। হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করল, তাদের সুমুখে হরিণটি নেই—এগিয়ে চলেছে একটা প্রকাণ্ড কুকুর। এইমাত্র হরিণটি ছিল, সেটি কোথায় গেল? আর কুকুরটাই বা এলো কোথা থেকে? আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত নেত্রে তাঁরা দেখল সেই কুকুর নয় প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ, পিছন দিয়ে তাঁরা পলায়নের উদ্যোগ করল। কিন্তু অল্প ঘুরে না যেতেই নারী কণ্ঠের কলহাস্যে পিছন ফিরে তাঁরা তাকাল। কোথায় নেকড়ে? তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অনার্য নারী।

অনার্য রমণী এগিয়ে এসে সহাস্যে তাদের অভিবাদন করে বললে, আসুন সেনাপতি, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন আমাদের রাণী। তিনি সংবাদ পেয়েছেন সমুদ্র ঝড়ের আপনারা বিপদে পড়েছেন।

এতক্ষণ পর মানুষ দেখে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কক্ষের পর কক্ষ, বিশাল দ্বারের পর দ্বার, বহুলের পর বহুল অতিক্রম করে তাঁরা এগিয়ে চলল সেই রমণীকে অনুসরণ করে। ঘরের আলোর যেন জোয়ার স্বপ্নময় সাবলা। বিচিত্র কারুকার্যখচিত গৃহ, প্রাচীর-পাত্র, দ্বার। যেন এক অপরূপ স্বপ্নপুরী।

হঠাৎ এক জায়গায় তাঁরা থমকে দাঁড়ালো। পথ সংকীর্ণ হয়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্ধকারে অদৃশ্য কণ্ঠের নির্দেশে তাঁরা এগিয়ে চলল।

আরো কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা এক জায়গায় থামতেই শুনতে পেল ডিমটি করতালিধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আলো। আর সেই সঙ্গে শিউরে উঠলেন কেতুবর্মনের দল। তাদের দু'পাশে দাঁড়িয়ে দু'টি প্রকাণ্ড সিংহ আর সিংহী। মুহূর্তে যেন উবে গেল তাদের প্রাণবায়ু। চেয়ে দেখলো তাদের সম্মুখে গজদন্ত আর স্বর্ণখচিত পালংকে স্মিতমুখে বসে

হয়েছে এক পরমা সুন্দরী নারী। চতুর্দিক থেকে চামর দিয়ে বাতাস করছে তিনটি অনাথ কন্যা। কেতুবর্মন বুঝলেন, ইনিই এই প্রাসাদের রাণী। রাণীর হাতে একটা প্রকাণ্ড উলঙ্গ চাবুক। রাণী এগিয়ে আসতেই বিকট আওয়াজ পাশের কক্ষে অন্তর্হিত হল সিংহ আর সিংহী।

স্মিতমুখে এগিয়ে এলেন রাণী। বললেন, আপনাদের বিপদের সংবাদ আমি আগেই পেয়েছি। আমরা আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম। আপনাদের আহার ও বিশ্রামের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। এখানে আপনারা যতদিন ইচ্ছা বিশ্রাম করতে পারেন। কিন্তু তার পূর্বে এই রাজ্যের প্রথা অনুযায়ী প্রথমে আমাদের সিংহের মন্দিরে দেবদর্শন করে আসুন।

প্রহরীরা সেই অনাথ বালক তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বিচিত্র কারুকার্যখচিত রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত মন্দির তোরণে প্রবেশ করে বিস্ময়ের কিছু এগিয়ে চললেন কেতুবর্মনের বন্ধু শুক্লের পর শুক্লের সারি। মন্দিরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই বিচিত্র গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি—ডিং ডং ডং! ডিং ডং ডং।

পরিচারিকার নির্দেশে দাঁড়ালো কেতুবর্মনের দল। সম্মুখের অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দৃষ্টিগোচর হলনা। তারপর ধীরে ধীরে তাদের সম্মুখে মশালের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল বিকটের বড় কালো পাথরের এক বিশাল বিগ্রহ। বিগ্রহের দেহ মানুষের, কিন্তু মস্তকটী অশ্বের প্রকাণ্ড মাথা। দুচোখে তরুণের দৃষ্টি। বিগ্রহের সম্মুখে নারী পুরোহিত প্রকাণ্ড মশাল হাতে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পূজা করছে। বন্ধুগুলি ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কেতুবর্মণের দল। পূজার শেষে এক গণ্ড তপ্ত সিঁদুর মশালে তিলক এঁকে দিলেন পুরোহিত-রমণী।

দেবদর্শনের পর কেতুবর্মণেরা আবার ফিরে এলো রাণীর কক্ষে। রাণী পাশের আসনে তাদের বসতে অনুরোধ করে বললেন, পাশের কক্ষে আপনাদের আহারের আয়োজন করা হয়েছে, তার পূর্বে আপনারা স্নিগ্ধের চরণামৃত গ্রহণ করুন। পরিচারিকার হাত থেকে রাণী স্বর্ণ-ঝারি গ্রহণ করলেন, তারপর সাতটি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে তাদের সাত-জনকে পরিবেশন করলেন সুগন্ধি চরণামৃত। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে পান করলো সেই অতি সুস্বাদু পানীয়।

কিন্তু মুহূর্তে ঘটে গেল এক আশ্চর্য ব্যাপার। ওষ্ঠ থেকে পাত্র নামাতে না নামাতেই হাসি মুখেতিনজন হাততালি দিলেন রাণী, আর নিমেষে নিভে গেল কক্ষের সমস্ত আলো। সূচিভেদ্য অন্ধকারে বিষণ্ণ হয়ে গেল চারিদিক। উচ্চ কণ্ঠে যেন উঠল অনাথ পরিচারিকার দল। তারপর অন্ধকারে শোনা গেল রাণীর কণ্ঠে দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ। তারপর আবার তিনবার করতালি ধ্বনির সঙ্গে জ্বলে উঠল ঘরের সমস্ত আলো। আর সেই মুহূর্তে দেখা গেল কোথায় কেতুবর্মণ আর তার দলবল। তাদের হাতগুলি বাঁধিয়ে রয়েছে সাতটি পাটল বর্ণের বেত। রাণী সেই দীর্ঘ চাবুক হাতে এগিয়ে এসে বন্ধুদের তাদের পিঠে আঘাত করলেন। তারপর তাদের খোঁয়াড়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। খোঁয়াড়ের পথে মুখ বীচু করে খান দিঁড়তে দিঁড়তে সেই অনাথ পরিচারিকার সঙ্গে গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে এগিয়ে চলল সাতটি মেষ।

সারাদিন অপেক্ষা করেও যখন কেতুবর্মণেরা ফিরে এলো না তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আশঙ্কা করলেন, বন্ধুরা নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে। রাত্রিটা নানা রকম দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করে প্রভাতে নিদ্রা থেকে জেগেই কটিতে দীর্ঘ তরবারি বেঁধে বন্ধুরা থেকে তীরে নামলেন।

সমুদ্রের বাতাসে দোলায়িত নারিকেলবীথি-শোভিত দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে সকালের সোনার আলো। ইন্দ্রদ্যুম্ন দুরু দুরু বুকে এগিয়ে চললেন,—এই রহস্য-ঘেরা দ্বীপে কি বিপদ লুকিয়ে আছে, কে জানে!

কিছুদূর অগ্রসর হতেই কানে ভেসে এলো সেই পথ ডিং ডং ডং! ডিং ডং ডং। এবারও পথরোধ করল সেই বিড়াল। কিন্তু বন্ধুদের কথা চিন্তা করে রাজকুমার মুহূর্তমাত্র দাঁড়ালেন না। কিছুদূর এগোতেই মনে হল সেই সুরম্য রাজপুরী তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। উন্মুক্ত তোরণের সুমুখে বিচরণ করছে একটি সুন্দর হরিণ।

কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন তখনই সেদিকে গেলেন না। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হল, জনহীন দ্বীপের ওই রাজপ্রাসাদে নিশ্চয় কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। রাজকুমার প্রথমে স্থির করলেন—প্রথমে তিনি রাজপুরী প্রদক্ষিণ করে দেখবেন ভিতরে প্রবেশ করা নিরাপদ কিনা। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে প্রাসাদের পিছনে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। মনে হল কোথা থেকে কেউ যেন তাঁকেই ডাকছে। কিন্তু আশে পাশে তাকিয়ে কোন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না। তখন ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন ডালপালার আড়ালে একটি ক্ষুদ্র গর্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। আলুথালু তার চুল। বড়ো বড়ো কালো চোখে যেন কিসের ছায়া। সেই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাজকুমার সবিস্ময়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মেয়েটি বললে, আপনি কি মহেন্দ্রগড়ের রাজপুত্র···

রাজকুমার বললে, হাঁ আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন। আপনি আমার সাত-বন্ধুকে দেখেছেন?

হাঁ, সংবাদ পেয়েছি তাঁরা প্রাসাদের মধ্যে গেছেন। কিন্তু রাজকুমার, আপনি আর তাঁদের ফিরে পাবেন না। এই প্রাসাদের মধ্যে যে প্রবেশ করে সে আর জীবিত অবস্থায় ফেরে না।

ইন্দ্রদ্যুম্ন আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

মেয়েটি বললে, রাজকুমার আপনি নিশ্চয় জানেন না এ এক মায়া-বিনীর দ্বীপ। এ দ্বীপেও একদিন মানুষ, রাজা, রাণী, রাজপুত্র সবই ছিল। ওই মায়াবিনীর অসীম ক্ষমতা। সে অস্ত্রের শক্তিতে মুহূর্তে মানুষকে গাছ, পশু, পক্ষীতে পরিণত করতে পারে। এই রাজ্যের রাজা আর রাণীকে সে সিংহ আর সিংহীতে পরিণত করেছে। রাজকুমারকে পরিণত করেছে বিড়ালে। আমি এ দ্বীপের রাজকন্যা, আমাকে বন্দী

করে রেখেছে। ওরে এ দ্বীপের সমস্ত মানুষ পালিয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েই আপনার সাতজন সঙ্গীকে মায়াবিনী বেশে পরিণত করেছে আজ বিগ্রহরে। তাদের সিংহোর মন্দিরে বলি দেবে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমার বন্ধুদের বাঁচাবার কি কোনো উপায়ই নেই রাজকন্যা?

রাজকন্যা বললেন, যা রাজপুত্র, যদি প্রাণে বাঁচতে চান তো আপনি ফিরে যান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, আমার বন্ধুদের উদ্ধার না করতে পারলে আমি আর ফিরে যাবনা রাজকন্যা। আপনি বলুন—উদ্ধারের যদি কোনো উপায় থাকে। আমি প্রাণের মায়া করিনা।

রাজকন্যা বললেন, উপায় আছে—কিন্তু সে কোনো সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি রাজার ছেলে, আপনার দ্বারা সম্ভব হলেও হতে পারে।

রাজকন্যা ক্ষণেক কি চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, এই প্রাসাদের পশ্চিমদিকে কোণের মধ্যে একটি ছোটো মন্দির দেখতে পাবেন। কোণের মধ্যে আছে একটি প্রকাণ্ড অজগর। সেদিকে হত্যা করে আপনাকে প্রবেশ করতে হবে মন্দিরে। মন্দিরের বিগ্রহ সরালেই দেখতে পাবেন একটি সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পৌঁছুবেন একটি প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণে। সেই প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটি মন্দিরে আর একটি অজগরের কুণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে একটি দেববিগ্রহ। সেই বিগ্রহের নীচে স্বর্ণপাত্রে আছে বৈদূর্য-মণির মন্ত্রপূত আংটি। সেই আংটি যার আঙুলে থাকবে মায়াবিনীর কোনো মন্ত্রই তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবেনা। সেই আংটিতেই আছে ওই মায়াবিনীর মৃত্যুবাণ।

রাজকন্যা বললেন, আশা করি রাজপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনি বিফল হবেন না। সময় নেই আপনি এখনই যান—ঈশ্বর আপনার সহায় হবেন।

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে কোষমুক্ত তরবারি হাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন তখনই দ্রুত এগিয়ে গেলেন প্রাসাদের পশ্চিম দিকে। রাজকুমারের দেহে তখন সহস্র অসুরের শক্তি। ঘন কোপ সমারোহে মাথার ওপর ফণা তুলে কোঁস করে উঠল এক ভয়ের অজগর। কিন্তু কুণ্ডলী ছাড়িয়ে কাছে আসবার আগেই রাজপুত্র অতি দ্রুত কৌড়ে গিয়ে তীক্ষ্ণতরবারিতে দ্বিখণ্ডিত করলেন তার দেহ। তার সেই দ্বিখণ্ডিত দেহের লেজের আঘাতে তোলপাড় করে দিল সমস্ত কোপ। মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহ সরাতেই দেখা গেল প্রকাণ্ড গহ্বর। সেই গহ্বরের মধ্যে সোপান পথে নেমে গেলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুলেন সেই উচ্চ প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণে। মন্দিরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেলেন অজগরের ক্রুদ্ধ গর্জন। ইন্দ্রদ্যুম্নর পায়ের শব্দে মন্দিরের মধ্যে থেকে করাল ফণা তুলে বেরিয়ে এলো সেই ভয়ঙ্কর অজগর। রাজপুত্রের বুক কেঁপে উঠল। বুঝলেন আর রক্ষা নেই। সাক্ষাৎ মৃত্যু এগিয়ে আসছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন মুহূর্ত মধ্যে মাথার উষ্ণীষ খুলে ছুঁড়ে দিলেন অজগরের উদ্যত ফণার সম্মুখে। সর্পরাজ ফণা নামিয়ে সবলে ছোবল দিল সেই উষ্ণীষে। আর সেই মুহূর্তে ইন্দ্রদ্যুম্ন তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করলেন তার ফণা।

রাজকুমার মন্দিরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর বিগ্রহ সরিয়ে স্বর্ণ আধার থেকে তুলে নিলেন বৈদূর্যমণির মন্ত্রপূতঃ আংটি। তারপর সেটি নিজের আঙুলে পরে আবার এগিয়ে গেলেন সুড়ঙ্গের দিকে। সোপান পথে উঠে এলেন উপরে।

রাজপুত্রকে দেখে আনন্দে রাজকন্যার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। রাজকন্যার কাছে আরও কয়েকটি কথা জেনে নিয়ে রাজপুত্র এগিয়ে গেলেন তোরণের দিকে।

হরিণকে অনুসরণ করে ইন্দ্রদ্যুম্ন এগিয়ে গেলেন তোরণের ভিতর। গুহামুখ পথে এগিয়ে যেতে যেতে ঘন পরিণত হল কুহুরে, তারপর নেকড়েতে। কিন্তু রাজপুত্র ভয় পেলেন না। রাজকন্যার কাছে আগেই সব শুনেছিলেন।

অনার্য রমণী অভিবাদন করে বলল, আসুন রাজপুত্র—আমাদের রাণী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনার বন্ধুরাও আপনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পথ চেয়ে রয়েছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন মৃদু হেসে সেই অনার্য রমণীকে অনুসরণ করলেন।

রহস্যপুরীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেই অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজপুত্র। করতালি ধ্বনির পর আলো জ্বলে উঠল। সিংহ-সিংহীকে দেখেও আতঙ্কিত হলেন না ইন্দ্রদ্যুম্ন। মায়াবিনী রাণী চাবুক হাতে এগিয়ে আসতে তারা দূরে সরে গেল। মায়াবিনী কাছে এসে স্মিতহাস্যে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করে পালঙ্কে বসালেন। বললেন, রাজকুমার আপনি নিশ্চয় ক্লান্ত, এখানে আপনি যতদিন খুশি বিশ্রাম করতে পারেন। কিন্তু তার পূর্বে অনুগ্রহ করে আমাদের বেষধর্মন করে আসুন। পরিচারিকা রাজকুমারকে সিংহের মন্দিরে নিয়ে গেল।

মন্দির থেকে ফিরে আসতে মায়াবিনী সিংহোর মন্দিরের সুবাসিত চরণামৃত পান করতে অনুরোধ করলেন ইন্দ্রদ্যুম্নকে। রাজকুমার হাসি মুখে নিষেধ করলেন সেই রৌপ্যপাত্র। সেই মুহূর্তে ওষ্ঠের কোণে হেসে তিনবার করতালি ধ্বনি করলেন মায়াবিনী। কিন্তু আলো বিজলনা। উঠে দাঁড়ালেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। তরবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে গেলেন মায়াবিনীর দিকে। রাজকুমারের আঙুলে বৈদূর্যমণির আংটির দিকে নজর পড়তেই মায়াবিনীর মুখচোখে ফুটে উঠল নিদারুণ আতঙ্কের চিহ্ন।—ধীরে ধীরে পিছনে সরে যেতে লাগলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বজ্র মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরে তরবারি উদ্যত করলেন। আতঙ্কে প্রাণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল মায়াবিনী। পরমুহূর্তেই বুঝি শিরশ্ছেদ করবেন রাজপুত্র। অনার্য রমণীরা ঘরের কোণে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন চিৎকার করে উঠলেন, পিশাচী এখনই তোকে হত্যা করব। কি করেছিস্ তুই আমার বন্ধুদের।

মাদাবিনী কেঁদে কেঁদে বললেন, কমা করুন রাজপুত্র। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। এরূপের মতো আমায় আর ভিক্ষা দিন। আমি চিরদিন আপনার দাসী হয়ে থাকব।

ইন্দ্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ মা মাদিনে বললেন, আগে আমার বন্ধুদের মনুষ্য মূর্তিতে ফিরিয়ে দিয়ে আর পরে দাসী।

মাদাবিনীর নির্দেশে তখনই সেই অশ্বারী পরিচারিকা ঘোড়ার পেছন থেকে নিয়ে এলো লাঠি থেকে। মাদাবিনী তাদের শরীরে মন্ত্রপূত বারি ছড়িয়ে দিতেই ধীরে ধীরে তারা আবার মনুষ্যদের লাভ করল। কেতুকেতুর সঙ্গে আর সব বন্ধুরা ছুটে এসে অশ্রুলোচনে রাজকুমারকে আলিঙ্গন করলো।

কিন্তু এইখানেই শান্ত হলেন না ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাজার রাজা, রাণী আর রাজপুত্রকেও মনুষ্যমূর্তিতে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন মাদাবিনীকে। রাজকন্যাকে মুক্ত করলেন অন্ধকার পাষাণ কক্ষ থেকে।

মাদাবিনীকে আদেশ দিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন অবিলম্বেই যেন সে তাঁর অন্যান্য সঙ্গিনীদের নিয়ে দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যায়।

দ্বীপের রাজা রাণী দুর্গাদ্যুত হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আশীর্বাদ করলেন রাজকুমারকে। রাজপুত্র আলিঙ্গন করলেন ইন্দ্রদ্যুম্নকে। আর রাজকন্যা ইরাবতী নিজের হাতে পঞ্চাশব্যঞ্জন রান্না করে পরিবেশন করলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন ও তাঁর বন্ধুদের।

মাছ শিকারী

দু'টি তারে ভর দুপুরে—
মাছ ধরিতে যায়,
ছিপ্‌টি ফেলে এক মনেতে
কাহনা পানে চায়।
মাছের আশায় সজাগ অতি—
নেইকো কথা মুখে,
ভাবছে যদি গাঁথতে পারি—
মৎস্য খাব সুখে।

শ ক চ

ফটো : পাঁচকড়ি দে

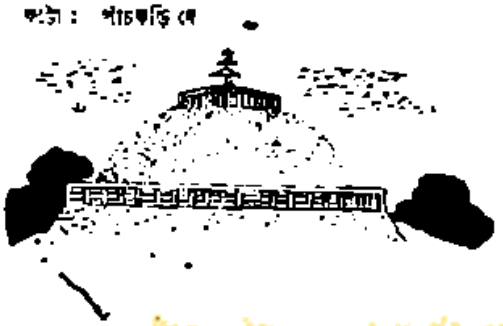

কোটা দেবী

৪২৮ খৃষ্টাব্দে। ৬ষ্ঠ শতকে হূণদের বিজয় চলেছে ভীষণ ভাবে। সমগ্র এশিয়া ইয়োরোপ তৃণও খর খর হূণদের অত্যাচারে, হিংস্রতায়। বড় বড় সভ্যতা যা গড়তে লেগেছিল শত শত বৎসরের অধ্যবসায়, মাত্র ফুৎকারে শেষ হয়ে গেল। হূণেরা ভারতে এসে বাসবে প্রধানতঃ গণ্ডগোল করে। যশোধর্মদেবের হাতে পরাজিত হয়ে মিহিরকুল কাশ্মীরে পালিয়ে আসে একটু আশ্রয়ের জন্য। এই আশ্রয়দাতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মিহিরকুল রাজা হলেন ৫১৫ খৃষ্টাব্দে। হূণ মিহিরকুলের কি মায়া কাশ্মীরের জন্য? ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য।...কে যেন বলেছে মিহিরকুলকে চন্দ্রভূলা নদীর মুখের পাহাড়ে সতীনারীর স্পর্শে নড়বে। অমনি নারীদের আহ্বান। পাথর না নড়লেই বধ। অসতী নারী রাখবেন না তাঁর রাজত্বে। সহস্র সহস্র নারীবধ হয়ে গেল একটা খেয়ালে। দ্বিতীয় খেয়ালের নিশানা কাশ্মীরে হস্তীভগ্ন পর্বত।...হস্তীভগ্ন পর্বতের মধ্যে গিরিবর্ত্ম। অত্যাচারিত জনসাধারণকে মিহিরকুল বললেন—তোমরা চলে যেতে পারো অন্যত্র বাধা পাবে না। দলে দলে নরনারী, শিশু বৃদ্ধ গিরিপথে চলতে লাগলো পরিত্রাণ পাবার আশায়। হঠাৎ একটা হাতী পড়িয়ে পড়লো পাহাড় দিয়ে। বিকট চিৎকার, বিচিত্র গতি সেই অতিকায় শিশু নেমে গিয়ে পড়লো জনসাধারণের ঘাড়ে। সে কি ভয়ন্ত কোলাহল। চমৎকৃত হোলো মিহিরকুল। ভারী মজার খেলা হতো। তখুনি হাতীর পর হাতী পড়িয়ে দেওয়া হোলো জনতার ঘাড়ে। হাতীর চিৎকারে, জনতার আর্ত্তনাদে মিহিরকুল চিরদিনের কীর্ত্তি রেখে গেলেন হস্তীভগ্ন পর্বত।

এর পরে আসে ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দ। কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্বের শেষ। হিন্দু রাজত্বের সুরু করেছিল রাজা হর্ষদেবের সময় থেকেই। পাগল রাজা বলা চলে। চমৎকার রাজ্যশাসন করতেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের প্রতি সন্দেহ হওয়ায় নাতির জন্য অধীর হয়ে পড়েন। সন্দেহ ও অযথা ভালবাসার ফলে উৎপীড়ন, নিগ্রহ, অনাচার সুরু হয়। ১১০১ খৃষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয় পর বিদ্রোহে। হর্ষকে তার স্থান ঘরে যখন হত্যা করা হয় তখন সে কাতর নিবেদন করে তার পৌত্র ভিক্ষাচারের জীবনের জন্য। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা উচ্চল এই কিশোর কুমারের প্রাণের আশ্বাস দেন। জনতা সিংহাসনে বসালো রাজার ভাই উচ্চলকে। উচ্চল আর সুস্সল দুই ভাই-ই বিপুল শাসক। উচ্চল রাজা হয়েও রাজা নন্। সাধারণ মানুষের মতো জনতার মধ্যে ঘুরে বেড়ান লোকের দুঃখসুখের কাহিনী শুনে। ভোগাযোগ, ঘুষ, অত্যাচার বন্ধ হওয়ায় যাদের ঘরে তাপ পড়লো তারাই চক্রান্ত করে উচ্চলকে হত্যা করলো ১১১১ খৃষ্টাব্দে। তখন সুস্সল রাজা। ভিক্ষাচারের বয়স একটা দল তখন সুস্সলকে সরিয়ে ভিক্ষাচারকে রাজা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প। সুস্সল মারা যান ১১২৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর ছেলে জয়সিংহ একেবারে কৌটিলীয় রাজনৈতিকের রাজসংস্করণ। ফলে, বলে, কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা তার একমাত্র উদ্দেশ্য। একে একে সব পক্ষকে একটি একটি করে বিনাশ করে জয়সিংহ রাজ্যে শান্তি আনলেন বটে, কিন্তু জয়সিংহের মৃত্যুর পর থেকে সুহারদেবের রাজত্ব পর্য্যন্ত বেড়শত বৎসরে জয়সিংহের নীতি ও হর্ষের অবিমৃষ্টকারিতার ফল সমাজ জীবনে বিষময়কার করে গেল। ঘুণ ধরলো চন্দন কাঠে। শেষ হোলো কাশ্মীরে ললিতাদিত্যের মহিমা।

সুহারদেবের সময়েই কাশ্মীরে আক্রমণ হয় আরবদেশের। আরবদেরা মাত্র জিহার নির্দ্দেশে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দেই কাশ্মীরে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। দক্ষিণ দিকে সিন্ধুদেশে ধালুড়, হূণ, উপজাতির আক্রমণ নিত্য দৈনন্দিন ঘটনা ছিল; উত্তরে এই আফ্রিদি উপজাতিদের লুটতরাজ তেমনি একটা বহুকালব্যাপী ঘটনা। নতুনএর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। ১৩৩৯ সালে আক্রমণ ঘটলো সুলতিকার খানের অধীনে। এসে লুট করলো কাশ্মীর বিদেশে। এতেটুকু প্রতিরোধের সামর্থ্য হারিয়েছে তারা যারা ললিতাদিত্যকে পুরোভাগে রেখে অযোধ্যা থেকে কর আদায় করে এনেছে। কাশ্মীরের এই চরম বলাৎকারের দিনে সুহারদেব পালিয়ে যাঁড়লেন কিষ্টওয়ারে। কিন্তু পালাতে পারেনি সুহারদেবের মন্ত্রী রামচন্দ্র। পালাতে পারেনি ছোট একটী কিশোরীর কবায়। কিশোরী তার মেয়ে নাম কোটা। রাজা পালিয়ে গেছে। কাশ্মীর লুট হয়েছে। শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে। এ সময়ে তারাও পালাবে তাদের প্রিয় দেশভূমি ছেড়ে দিয়ে? কাতর হয়ে রামচন্দ্রকে কোটা বলে—থাকো বাবা। যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়া পালানোর চেয়ে সহজ।

রামচন্দ্র বলে "এই ছোটো দুই হাতে কতো যুদ্ধ করবি মা?"

কোটা বলে "আমার হাজার হাজার হাত। যার করলেই হোলো।" সুলতিকার আবার আসছে কাশ্মীরে, শুনে কোটা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিরোধের জন্য বিপ্লব গড়িয়ে তুললো। করতে হোলোনা সংগ্রাম। লোহ্রি-নার পথে আবার তুষারপাত আরম্ভ হোলো। সুলতিকারের সমস্ত সৈন্য আর মাল তুষারে চাপা পড়লো। কিন্তু কাশ্মীর তখন প্রাণহীন। এই সুযোগে কাশ্মীর আবার নিজেকে গড়ে তুলতে পারলো না। দিন দিন তার অধোগতি হতে থাকলো। আরো হোতো;

পেলোনা কোটার উৎসাহে উদ্দীপ্ত রামচন্দ্রের তৎপরতায়। কিছুদিনের মধ্যে সুহাদেবকে ঠেকে আনলেন রামচন্দ্র।

এবার রামচন্দ্র একা এলেন না। সঙ্গে আনলেন দুই অতিথিকে। তিব্বতের এক ছত্রভঙ্গ রাজপুত্র বিহুন কাশ্মীরে পালিয়ে এসে রামচন্দ্রের কাছে আশ্রয় পান। তুলোনারের মতো সেই তরুণের দীপ্তি, আগুনের মতো লাহন। সুহাদেবের পরম প্রীতির ধন। অন্য জন শাহ্-বীর বা শাহ্-বীর। খাহ্ উপত্যকার এই বালক বেদ পালন করতো। কে ফকীর তার হাত দেখে বলেছে—সে কাশ্মীরের রাজা হবে। তাই সে চলে এসেছে কাশ্মীরে। তার কথা অকপটে নিবেদন করেছে সিংহাসনে সুহাদেবকে। আকর্ষণ, সুহাদেব শাহ্-বীরকে রীতিমতো শিক্ষা দিয়ে যোদ্ধা করে গেলেন। এই দুই অতিথিকে তিলকের মতো ধারণ করে সুহাদেব জীবনরণে এলেন। বিভিন্ন প্রাসাদে রাজকীয় ভাবে বীর বিহুন ও শাহ্-বীরকে রাখা হোলো। দাবা কাশ্মীরে এদের খ্যাতি বিস্তৃত হোলো। কিন্তু সুহাদেবকে উল্লুখলার মত দিতে হোলো। অন্তরঙ্গে যারা ছেলেন। রামচন্দ্র তখন চেষ্টা করেন যে সুহাদেবকে এবে রাজা তার যেন। বিহুন এই অনাচার সহ্য করেন না। উত্তরাধের কাপুরুষ, স্ত্রীলোকের চেয়েও দুর্বল। সে কবে সহাদেবের শূন্য সিংহাসনে? তা হোলে কৈলাস থেকে কাশ্মীরে এসে সকল বিদ্যা সঞ্চয় করে তার লাভ কি হোলো? রামচন্দ্রকে বিহুন আক্রমণ করলো। একান্তে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে শাহ্-বীর মারা গেলো। সুহাদেব তার পিতৃতুল্য। কাজেই সে তার প্রিয় মন্ত্রী বৃদ্ধ রামচন্দ্রের বিপক্ষে লড়াই করবে না।

বৃদ্ধ রামচন্দ্র যুদ্ধে নামলেন। বিহুন প্রসিদ্ধ বীর, যুবক, বহু সৈন্য তার। রামচন্দ্র বৃদ্ধ। বিহুন ভেবেছিল রামচন্দ্রের বাধা বিনাযুদ্ধে ধূলিসাৎ করবে। কিন্তু সেই রামচন্দ্র বিনা অস্ত্রাঘাতে বাধা বিহুনকে। প্রতি রাতে ভাবে বিহুন—আজ সন্ধ্যায় পথ পাবো; প্রতি সন্ধ্যায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে ফিরে আসে। রামচন্দ্রের সৈন্য নেই অথচ প্রবল প্রতিরোধ। তার রাজ্যের নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেকে পথের বাধা সৃষ্টি করছে। বাধা ঘুরিয়েছে বিহুনের, যুদ্ধের নায়কার ফের হয়ে এসেছে, অনুগামীরা সূত্রের মান পাচ্ছে না বলে উদ্ধত হতে আরম্ভ হয়েছে, বিহুন বুঝতে পারেনা বৃদ্ধ রামচন্দ্র এতো বড় বাধা দেবার ক্ষমতা অর্জন করলো কি করে।

সংবাদ পেলে বিহুন—রামচন্দ্র সন্ধি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাধা দেয় কোটা। গ্রামে গ্রামে ঘুরায় কোটা উন্মাদিনীর মতো। চাষা, মজুর, মালী, গৃহস্থ সকলকে তার আলাপের বক্তৃতায় আর অপরূপরূপে মোহিত করে আসে। রামচন্দ্রকে বারম্বার সে উত্তেজিত করে তোলে। কোটার নাম, কোটার গুণ, কোটার রূপ যুবক বিহুনকে উদ্দীপিত করে তুললো। "চাই না আমি কাশ্মীর, কোটাকে চাই। যদি কোটা আমায় বিবাহ করে, কাশ্মীরে শাসন করবো।"

সেদিনকার সন্ধ্যায় একজন যাদক-যাদিকা বাধা দেবে প্রতিরোধ সংগ্রামে। কোটা তাদের মধ্যে হতাহতের সেবা করছে। কোটার গায়ে বারবার হোঁয়াচ হচ্ছে; ওলো ছুঁড়, এতো ছুঁড়! কোটা চিৎকার করে উঠলো—"কেউ বলে যাক্ নইলে, বুদ্ধিকে মরতে থাকতে নইবে, কিন্তু বীরদান আমি নষ্ট হতে দেবোনা। কে কোথায় আছো চাক বিহুনকে। আমি আমার পথ দেখে রাখে—বাঁচুক কাশ্মীর।"

বৃদ্ধ রামচন্দ্রের কতো আকাঙ্ক্ষা, কতো সাধ, কোটার পুত্র কাশ্মীরের রাজা হবে। কাশ্মীরের সুহাদেবের বংশ প্রতিষ্ঠা হবে। অথচ কোটা একী বলছে। বিধর্মী বিহুনকে বিবাহ উদয়দেবকে ছেড়ে?

"মতিভ্রম? বিহুনকে বিয়ে করবি তুই?"

"বিয়ে?" ভেরনাগের জলের মতো নীল চোখ মেলে কোটা বলে—"বিয়ে করবো কাশ্মীরকে। কাশ্মীরের ইজ্জৎ আর তুলোনারে তারই পায়ে আমার মাথা। বিহুন বীর, সে কাশ্মীরকে ভালোবাসে। আপত্তি কোথায় বাবা?"

"আছে আপত্তি। সে বিধর্মী। চল্ কোটা পালিয়ে যাই। বিহুন নিক্ কাশ্মীর। তোকে আমি মর্যদের হাতে তুলে দিতে পারবোনা। ওর শিক্ষা নেই, সংস্কৃতি নেই। আর তুই? না মা, পারবোনা। চল্ তার চেয়ে যুদ্ধ করে মরি।"

"সে মুসলমান? সে তো পলায়ন। জীবন থেকে পলায়ন বাহিনীকে এড়িয়ে। অথচ এই প্রাণের বিনিময়ে যেন বাঁচাতে পারি আমি; এ দেহের বিনিময়ে যাকে বাঁচাতে পারো তুমি। ভেবে দেখো যে তোমার মাকে ধর্ষণ করবে যে, সে যদি তোমার কন্যাকে পেয়েই খুশী হয় তা কেন বলি মেয়েনা?"

"কোটা তুই উদয়দেবের স্ত্রী। ধারুবতা। এখন অন্যের অঙ্কশায়িনী হবি? এ আঘাত সইবে কি করে? আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? তোর মতন মার মুখে কি করে?"

পৃষ্ঠিতা মায়ের কোলে বসে সতী নামের লোভ আমার নেই। স্বাধীন কাশ্মীরে অসতী কোটা পরাধীন কাশ্মীরের সতী কোটার চেয়ে ঢের পবিত্র। আমার সতীত্বের মূল্যে তোমার মাকে আমি হস্তার হাত থেকে ফিরিয়ে নেবো।

মানলো না কোটা। লাজলজ্জা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে বিহুনের শিবিরে গেল। সেদিন সে পেছনে ফেলে এলো সমস্ত গৌরব, সমস্ত সম্মান, সমস্ত হৃদয়ের আকুলতা। ইতিহাস ফেলে এগিয়ে গেলো সে সমাজের অন্ধকারের দিকে।

বিহুন চমকে গেল। এতো রূপ! এতো তেজ! কিন্তু সাধারণ নারী তো নয় এ। বিহুন অভিভূত হয়ে গেল কোটার রূপে। পরদিন সকালে বিহুনের সৈন্যরা চাইলো তাদের রাণী। কাশ্মীর জয় করতে এসে একটা মেয়ের কাছে তারা বিক্রিত হতে চায়না। কাশ্মীর চাই। কাশ্মীরের যৌবন চাই।

বিহুন, বলে—কাশ্মীর তারা পাবে, কিন্তু সূত্রের জন্য নয়, সুশাসনের

আপনার লাবণ্য

আপনার কাছে চিত্রতারকার লাবণ্যের মতই প্রিয়!

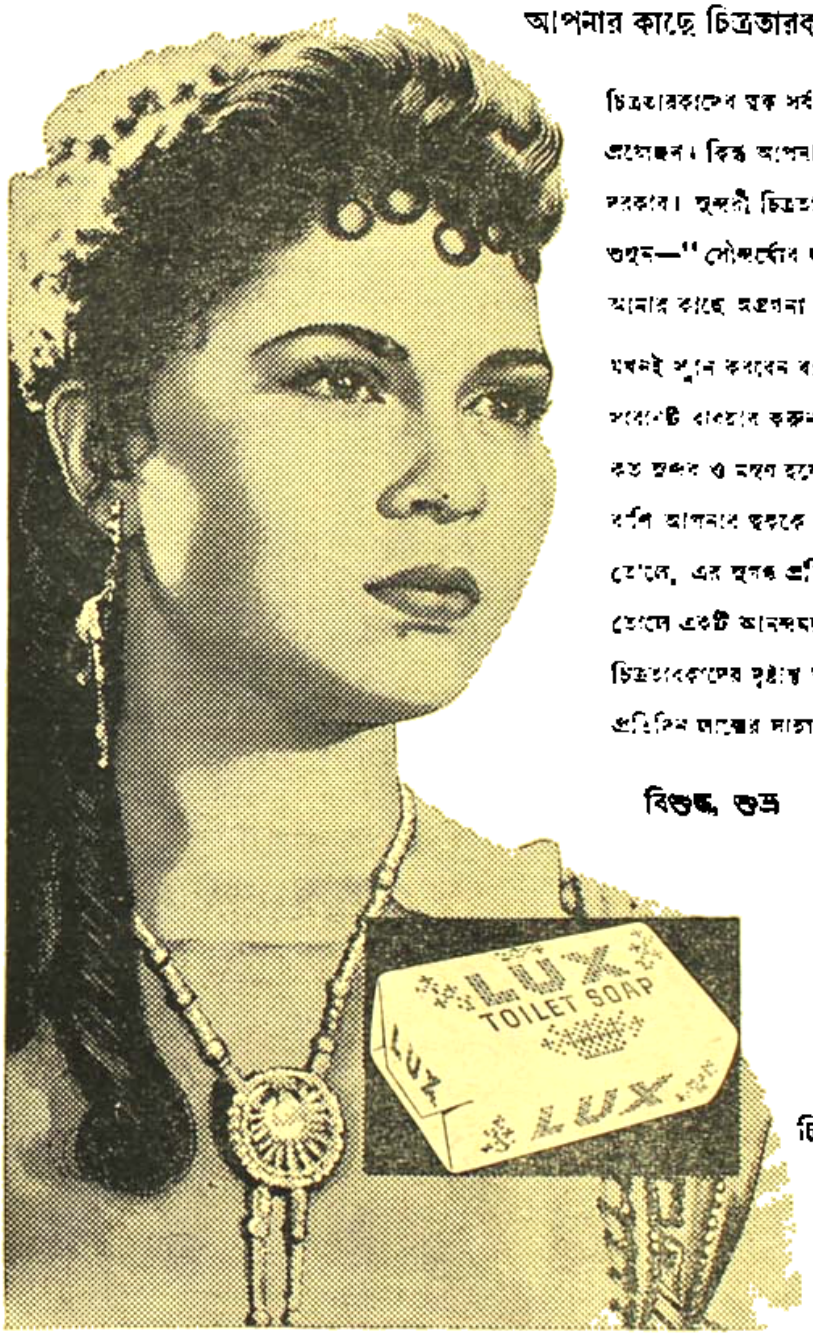

চিত্রতারকাদের ত্বক সর্বদাই মসৃণ ও সুন্দর রাখা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার নিজের ত্বকেরও যত্ন নেওয়া দরকার। সুন্দরী চিত্রতারকা নিরুপা রায় কি বলেন শুনুন—"সৌন্দর্যের জন্য আমি টয়লেট সাবান আমার কাছে অপরিহার্য।"

যখনই শুনে করবেন বা মুখ ধোবেন এই শুভ্র, বিশুদ্ধ ফেনাটি ব্যবহার করুন—দেখবেন আপনার ত্বক কত সুন্দর ও মসৃণ হয়ে উঠেছে। এর ফেনার মত ফেনায় বেশি আপনার ত্বকের পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে তোলে, এর সুরভি প্রতি বারের স্নানকে করে তোলে একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান। সারা পৃথিবীর চিত্রতারকাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন—প্রতিদিন স্নানের সময়ে আপনার ত্বকের যত্ন নিন।

বিশুদ্ধ শুভ্র **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

নিরুপা রায় মুক্তি ফিল্মের 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' চিত্রের সুন্দরী তারকা

LTS. 561-X52 BG

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড, বম্বে প্রকৃত।

ভক্ত। কাশ্মীরের দুঃখ মৈত্র, কাশ্মীরের কাপুরুষতা কিসে ঘোচে এই পরামর্শ রিঞ্চন আর কোটা করতে থাকে। সেই রিঞ্চন হলো কাশ্মীরের শাসক, কোটা হোলো রাণী। এরপরে কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত হোলো অভূতপূর্ব সুশাসনের। রিঞ্চনের নাম সকলে ভুলতে বসলো। রাণী কোটার রাজত্বে সকলেই মহাখুশী।

এদিকে বিয়ের পর দিন এই রমণীর উৎসাহ, উদ্দীপনা, সংগঠন ক্ষমতা দেখে রিঞ্চন বিস্মিত অন্তরে। কোথা থেকে পায় এ এতো বীর্য এতো তেজ?—"সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম" বলে কোটা। "আমার বর্বর বন্ধু, তোমার আরণ্যক বৃত্তি, তোমার অনেক অভাব, তোমাদের বীর্যকে লৌহকে হিংস্র করেছে, শোধিত করেনি। পর্বতের জল-প্রপাত তোমরা, নদীর স্রোত নও। সর্বনাশা ক্ষমতাকে তোমরা সর্বহারার কাজে লাগাতে পারোনা।"

"কি করলে পারি?"

"ধর্মের অনুশাসনে আবদ্ধ হলে।"

"কোন্ ধর্মের অনুশাসন?"

"ধর্ম সবগুই এক," বলে কোটা। "ধর্ম মানুষকে কর্তব্য শেখায় মানুষের প্রতি। সে কর্তব্য শেখ তুমি;—যেদিন তা পারবে সেদিনই আমি তোমার পতিব্রতার সহধর্মিণী হবো।"

"আমার ধর্ম কি? তোমার ভালবাসা ছাড়া আমার আর কি ধর্ম আছে কোটা?"

মনে পড়ে কোটার বৃদ্ধ রামচন্দ্রের সেই ছলো-ছলো দৃষ্টি। রিঞ্চনের সৈন্যরা যেদিন রণে রামচন্দ্রকে বিদ্ধ করে সেদিনও রামচন্দ্র কোটাকে বলেছিলেন—"শোক করিস না কোটা। এটা দেবের ভুল নয়, দেবতার আশীর্বাদ। বৈশি তুই। রিঞ্চনকে হিন্দু করতে যদি পারিস, কাশ্মীরী করিস। যেকোনও ধর্ম ধর্মহীনতার চেয়ে ভালো। তোর ধর্ম যদি সে নাও মানে, তাকে কোনও ধর্ম দেখাস্। তাই কোটা মনে মনে জানে রিঞ্চনকে হিন্দু করবার লাগিয়ে তার। কেবল দেশকে শাসন নয়। কাশ্মীরের পতীতে যে হিন্দু নরপতি চাই। তাই রিঞ্চনকে বলে—"কে বলে তোমার ধর্ম নেই?—আছে। তুমি বীর। বর্বর পার্বত্য বীর তুমি। তুমি জলপ্রপাত। অসীম শক্তি ধরো তুমি। বলো কাশ্মীর তোমার মা। এই মা-কে তোমার ধর্ম করো।"

"সে ধর্মে তুমি আমায় দীক্ষা দাও। তুমি হও আমার গুরু।"

কিন্তু পারেনি কোটা। হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে ছেলে ঘুরছে কোটা। রিঞ্চনকে তারা বিদ্রূপ করে বিক। ব্রাহ্মণরা রাণী হোলোনা। পতির ধর্ম আর কোটার ধর্মের বিরোধ সে ঘোচাতে পারলোনা।

"কেবলে তোমার ধর্ম কোটা? আমার স্থান নেই।"

"কে বলে নেই, আছে। একটা ধর্ম এখনও আছে যেখানে অনাহূত আহ্বান পায়। সেই ধর্ম গ্রহণ করো।"

"আমি মুসলমান হবো।"

"তাই হও। শুধু ধর্ম মানো।"

রিঞ্চন একদিন দাদু বুলবুল-শার' বাগান থেকে আসছে হ'ল। সকলকে নিয়ে যে পূজা যে ধর্ম, তাই হোক আমার ধর্ম। রিঞ্চন মুসলমান হয়ে গেল। বুলবুল শার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন রেখে গেছে রিঞ্চন বুলবুল-শাহার মসজিদ তৈরী করে।

রিঞ্চনের বিদ্রোহ আর কোটার সঙ্গে বিবাহের পর রাজত্ব এরূপ ভালো লাগেনি শা-মীরের। কোটা শুনে সে বিদ্রোহের সুযোগ সন্ধানে তৎপর হয়েছে।

শা-মীরকে কোটা ডাকে।

শা-মীর অক্ষ, শান্ত, ধীর। কোটার কথায় আসে তার প্রাসাদে।

কোটা বলে—"মহামেঘকে একদিন তুমি পিতা বলেছো—কারণ তিনি কাশ্মীররাজ এবং তোমায় পুত্রবৎ স্নেহ করে কাশ্মীরের ভরসার স্থল করতে চেয়ে ছিলেন। আমি তোমায় পুত্রের মতো দেখবো। বলো আমি তোমার মা, কাশ্মীর তোমার মা, বলো, নৈলে তোমার সামনে আমি আত্মহত্যা করবো। আমি রিঞ্চনে তোমার কোনও বিদ্বেষ রাখবো না।"

অদ্ভুত কোটার রূপ। অদ্ভুত তার আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর। তরোয়াল খুলে কোটার পায়ে রেখে যুবক শা-মীর বলে—"মা-ই আমার তুমি! মা! আমি এ তরোয়াল তোমার বিপক্ষে তুলবো না।"

"সে কিন্তু নয়!" বলে কোটা। "বলো কাশ্মীরের বিপক্ষে তুলবে না।"

"তাই! মুসলমান রক্ত যদি গায়ে থাকে কাশ্মীরের উপকার ছাড়া কোনও অপকার হবে না আমার দিয়ে।"

কোটা শা-মীরকে কণ্ঠহার পুরস্কার দেন।

শা-মীর সত্যই তখন কোটার মন্ত্রচালিত। কাশ্মীরে অখণ্ড শান্তি। এমন সময় মারা গেলো রিঞ্চন। বজ্রাঘাত হোলো যেন।

কোটার এক ছেলে হোলো। পুত্রমুখ দেখে রিঞ্চন মারা গেল। মাত্র আড়াই বৎসর ছিল কাশ্মীরের গদিতে। এই আড়াই বৎসর রাজত্বে কাশ্মীরের শ্রী যেনো ফিরে গেছে। রিঞ্চন যাদু, কোটা শক্তি: রিঞ্চন দেহ, কোটা প্রাণ। রিঞ্চনের মৃত্যু তাই কাশ্মীরকে ততটা বিপন্ন করেনি, কোটাকে যতোটা করেছে। পিতৃহত্যা ভুলেছিলো কোটা কাশ্মীরের কল্যাণ কামনা করে। রিঞ্চন তার বাহুবলে কোটার ঘর-সাধনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলো।

হঠাৎ মারা গেলো! কোটার কোলে শিশু, বুকে কাশ্মীর!

পাশে দাঁড়ায় শা-মীর! জ্বল্ জ্বল্ করে শা-মীরের চোখ। কবীর বলেছে কাশ্মীরের রাজা হবে। কৈশোর কেটেছে ঘরে, তারপর গেছে সাধনায়। এখন পথ মুক্ত। "মা!" পূর্ণকণ্ঠে ডাকে শা-মীর!

কোলের শিশুকে তুলে দেয় কোটা শা-মীরের কোলে। "আমার ছেলে মীর। তোমার ভাই। একে কোলে নিয়ে রাজ্য শাসন করতে পারবে না?"

মনে পড়ে যায় শা-মীরের সেই লাঞ্ছিত, রিক্ত, বিড়ম্বিত কৈশোর।

ঘাটের মাঠ, গরু, ভেড়া আর ধূলিজীর্ণ স্মৃতি। মনে পড়ে যায় উজ্জ্বল সুহাদেবের স্নেহ, মায়া। মনে পড়ে রিঙ্কনের সৌহার্দ। কোলে তুলে নেয় রিঙ্কনের ছেলে। "আমার ভাই। আমি এর ভাবেয়া!"

হঠাৎ যেন যুক্তি পেয়ে গেলো কোটা! হঠাৎ যেন বুঝলো আর বিপদ নেই কাশ্মীরে। শা-মীর, মীর, অমাত্যিক, উয়ন শা-মীর তার নিজের কাশ্মীরের শিশুরাজার প্রধান আমাত্য হবে। তবে আর কেন? বৈধব্য যাপন করবে সে কোনও গিরিকন্দরে।

হিন্দু অমাত্যরা হাঁ-হাঁ করে। শা-মীর তো মুসলমান। রিঙ্কনের ছেলে তো মুসলমান? সে রাজা হবে কাশ্মীরের? কেন? উয়নদেব, সুহাদেবের ভাই তো এখনও বেঁচে। কিষ্টওয়ারে সে তো এখনও আছে!

সর্বনাশ! মস্তকে বাঁড়ার কোটা। উয়ন? মঙ্গল, লম্পট, রোগজীর্ণ উয়ন হবে কাশ্মীরের রাজা? তার হাতে পড়া কাশ্মীর ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। শা-মীরকে ডাকলো কোটা। কোটার ডাক···! শা-মীর দৌড়ে আসে,—"কী মা?"

সোনার পালঙ্কের একপাশে হাত ধরে টেনে বসায় কোটা শা-মীরকে। "আজ বড়ো বিপদ! শুনেছো বাবা!"

বাহিরে উয়ন কোলাহল, "কাশ্মীরে রাজা চাই—সুহাদেবের বংশ চাই, লঙ্কর বর্মণ, জয়সিংহের বংশ চাই। বিধর্মী নাশ হোক!"

"শুনছো বাবা?"

"শুনেছি। কাশ্মীর আমারও নয়- রিঙ্কনের ছেলেরও নয়। আশ্চর্য দুদিনেই এরা সব ভুলে গেল!"

গর্জন ওঠে জনসমুদ্রে "জয় কোটা রাণীর জয়!"

"তোলেনি ওরা। কিন্তু করেছে কেউ।"

"আদেশ করো। শাসন করি।"

কোটা বলে "এখনই নয়। ওরা আমায় চায় এখনও। এখনই আমার পরীক্ষার সময়। বানপ্রস্থ নেওয়া হবে না। আবার আমায় সাজতে হবে।"

"কার জন্যে সাজবে তুমি? উয়ন তোমায় দেখলে তোমার সম্মান বিপন্ন হবে জানো? বিধবা হলেও এখনও তুমি বৃদ্ধা নয় জানো?" বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে অসহিষ্ণু শা-মীর।

"সব জানি। উয়নকে শান্ত করার একমাত্র উপায় এইরূপ। কেবল তুমি আমার ভুল বুঝোনা। তুমিই আমার ভরসা। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র।"

দৃপ্তায় মুখ ফিরিয়ে শা-মীর বলে,—"উপযুক্ত পুত্র থাকতে মা কখনও আত্মদান করে? ভরসা রাখো। আমি তোমায় উয়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবো।"

কোটা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তার দুচোখ দিয়ে জল পড়ে। রাজোদর দূরে চক্রবাক ডাকে। দরদ গাছের নিবিড় ছায়ায় রাখাল বাঁশী বাজায়। ধীরে ধীরে বলে কোটা,—"শত শত বৎসরের অরাজকতার পরে সবে কাশ্মীরে শান্তি এনেছি। পরীবেরা এখন বিশ্বাসে খেতে পায়; মা তার শিশুকে বুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে, চাষীরা ক্ষেতের ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ে না। এখুনি গৃহবিবাদ সে ভয়ঙ্কর হবে মীর। আমায় ক্ষমা করো তুমি। আমি রিঙ্কনকে বিবাহ করিনি, কাশ্মীরকে আত্মাহুতি দিয়েছিলাম; নৈলে পিতাকে যে হত্যা করেছে তাকে কি পতি বলে গ্রহণ করে? আমি তো বিধবা নই। আমি বলির ছাগ। কাশ্মীর আমায় আবার চাইলে আবার বলি হবো। তুমি যাও। প্রস্তুত থেকো।"

শা-মীর ছটফট করে। "কিন্তু মা!"

"কিন্তু নয় শা-মীর। আমি চাই তুমি এখন রিঙ্কনের ছেলেকে সঙ্গে রাখো। দরকার হলেই ডাকবো।"

* * *

চক্রান্তকারীরা উয়নদেবকে শ্রীনগরে নিয়ে এলো। কোটা উয়নদেবকে বিবাহ করে রাজত্ব করতে লাগলো। এমন সময়ে হঠাৎ এলো তুরুষ্ক আক্রমণ। ডামাডোলের মধ্যে কাশ্মীর লুঠ করাই উয়নের উদ্দেশ্য। কিন্তু পারেনি। কোটা রুখে দাঁড়ালো শা-মীরকে নিয়ে। হতভাগিনী যুদ্ধ জয় করে ঘরে ফিরে দেখলো ঘরে উয়নদেবের পলায়িত। বিরাট অট্টহাসি হেসে শা-মীর বলে—"রাণী কোটা দেবী, ইনি হিন্দু কাশ্মীর রাজ! আর আমি মুসলমান, কাশ্মীরের কেউ নই।"

কোটাকে আরেও পনের বৎসর এই বিদ্রূপের মধ্যে কাটাতে হোলো। উয়নদেব ফিরে এসে পনের বৎসর কোটার তত্ত্বাবধানে মদ্যপান করে রোগক্লিষ্ট জীবন যাপন করে দেহরক্ষা করলেন।

কোটা নিষ্কৃতি পেলো। এবার শা-মীরকে রাজা দিয়ে সন্ন্যাসিনী হতে তার বাধা নেই। কাশ্মীর উন্নতির চরম শিখরে, প্রাচুর্যে সে দেশ তখন স্ফীত।

চলে গেল কোটা সন্ন্যাসিনী হয়ে। যাবার সময় রিঙ্কনের ছেলেকে দিয়ে গেল শা-মীরের কাছে। "ছোট ভাই রাজা, বড় মন্ত্রী। কেমন মীর?"

"তাই মা!" কিন্তু দিনে দিনে ভ্রূকুঞ্চিত হয় শা-মীরের। কথা ছিলো সে রাজা হবে, মন্ত্রী নয়। কোটার রাজনীতির ফাঁকিরে সে মুসলমান বলেই অবহেলিত। ক্রমে এই রুদ্ধ ধারণা অধিকার করলো। শা-মীর নিজেকেই রাজা বলে ঘোষিত করলো। কোটা পর্বতের গভীর প্রেমে তীর্থে বসে শুনলো সেই কাহিনী।

ফিরে এলো কোটা জয়াপীড়ের প্রতিষ্ঠিত জয়পুর নগরীতে। শ্রীনগর থেকে দিবস উত্তর পশ্চিমে ঝিলাম নদীর তীরে উলারে পড়েছে। মাঝামাঝি পথে ঝিলামের ওপরেই নগর নগর। এই নগরই প্রাচীন জয়পুর। আজই এখানে এই নামে ছোটো গাঁ আছে। জয়াপীড়ের জীবন জন্মভূমি ছিল। এই জন্য পরিষ্কার করে নগরী স্থাপন করেন জয়াপীড়। মাঝে দুধ। দুধের মধ্যে দুর্গ, নাম অন্তর্কোট। বর্ষায় তখন সব ডুবে গেছে। দুধ জলে পরিপূর্ণ। একটী মাত্র সেতু পথ। এই পথে কোটা অন্তর্কোটে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে ডেকে পাঠালেন শা-মীরকে।

শা-মীর সে ডাক উপেক্ষা করতে পারেনি। রিঙ্কনের তরুণ পুত্র

হাসলকে সঙ্গে করে শা-মীর এলো অন্তর্কোটে। বছরখানের পায়ের সাক্ষাৎ। শা-মীর কোটার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

সন্ন্যাসিনী কোটা বলে—"আজও যে তোমার ওপরেই ভরসা রাখি বীর। আজও তুমিই তুমি হিন্দুদের বন্ধু। আমার ছেলে। কথা দাও কাশ্মীরে শান্তি থাকবে। আমায় মুক্তি দাও।"

কোটার কথা কিছুতেই এড়াতে পারে না শা-মীর। কথা দেয়। কোটা আবার চলে যায় তীর্থে। শা-মীরের ওপর তার ভরসা তীব্র।

শা-মীর পারেনি ষড়যন্ত্রীদের উপহার সহ্য করতে। আবার সে লিখেকে রাজা বলে ঘোষিত করে হিন্দুদের ছেলেকে রাখলো কারাগারে।

এবার লাগলো সংগ্রাম। প্রজারা ক্ষেপে উঠলো এই অসঙ্গত অত্যাচারের বিপক্ষে। কোটার সন্তান কারাগারে তারা সহ্য করলোনা।

পরিপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে ভরসা শুধলো, শা-মীর শুধলো কোটা আছে। কোটার নামে সব শুদ্ধ হয়ে গেল। আবার সেই অন্তর্কোট।

এবার কোটা প্রস্তুত হয়ে এসেছে। "রাজত্বে যার পিপাসা, রাজা হবার স্বপ্ন যার চোখে, তার শান্তি বিধাতাই কেড়ে নিয়েছেন। রাজত্ব চাও তুমি, নাও। সবটা নয়, অর্দ্ধেক। আমি অর্দ্ধেক সিংহাসন, তুমি অর্দ্ধেক। আমায় দানে রাজত্ব করো; শান্তির উত্তরে।"

শা-মীর মাথা নীচু করে।

"সম্মত?"

"হাঁ। তোমার সন্ন্যাস?"

"কাশ্মীরই আমার সন্ন্যাস!"

রয়ে গেলো কোটা রাজপ্রাসাদে। প্রজারা স্থির হোলো। অর্দ্ধেক সিংহাসনের ব্যাপারটা তারা পুরো বুঝলো না।

কিন্তু শা-মীর তখনও অবিবাহিত। কোটা উপযুক্তকে বিবাহ করেছে, তার আগে হিন্দুকে। কাশ্মীরের রক্ষার জন্য। তখনই বা তা হবেনা কেন?

শা-মীর বিবাহ করেনি। কেন করেনি? এতদিনে শা-মীর বুঝেছে যৌবনে সে কোটা ছাড়া অন্য কারুর চিন্তা করেনি। কোটাকেই সে ভালবাসে। কোটাকে তার চাই।

শুনে কোটা শুব্ধ!

"সিংহাসনের অর্দ্ধেক বলে শয্যারও অর্দ্ধেক?"

"কেন নয়?"

"যে শয্যায় তোমার একদিন পুত্র বলে কাছে নিয়ে শুয়েছি। যে পাপে মা বলে প্রণাম করেছো—"

"ওসব কথা ছাড়ো। এক নয় সম্মতি, না হলে কাশ্মীরের চরম দুর্গতি।"

চিৎকার করে বলে ওঠে কোটা—"উপরন্তু স্ত্রীত্বের প্রতিশোধ নিবি তুই? তাই হোক! প্রথম থেকে কাশ্মীরে আমার তৃতীয় বিবাহের কথা। সন্তানকে যা বিবাহ করবে প্রচারিত হোক এই হতভাগা কাশ্মীরের প্রতি মায়ের কাছে। আজ রাত্রে বিবাহ বাসর হবে। সাজসজ্জা উৎসবের আয়োজন করো কাশ্মীররাজ।"

সে রাত্রে কোটা নতুন অভিনারিকার বেশে সেজেছিলো। সে রাত্রে উৎসব আনন্দে রাজপ্রাসাদ কলকোলাহলপূর্ণ হয়েছিল। নগরীতে দীপমালা জ্বলেনি, প্রজাদের হাহাকার শুধু শুনি,-শুধু তো রাজপ্রাসাদে চলেছে মৃত্যু-পীত-উৎসব। মধ্যরাত্রে শা-মীর সুসজ্জিত শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। "কোটা!"

"দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও। তোমায় আলিঙ্গন করবো। তার আগে আমার শা-মীরকে একবার শেষ আলিঙ্গন করে নিই—যে শা-মীরকে ছেলে বলে আদর করেছি।"

কোটা দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ছিলো শা-মীরকে। শা-মীর দেখে কোথায় একটা ধাক্কা লেগে। কোটার দেহ তার বাহুর ওপর এলিয়ে পড়লো।

চমকে দেখে শা-মীর আমূল বিদ্ধ ছুরিকা কোটার হৃদয়ে।

মরবার সময় কোটা বললে—"কাশ্মীর রইলো শা-মীর। তোর মার কাশ্মীর! আর ভয় নেই। আমার ছেলেকে আমি শেষ করে এসেছি! তাকে মইলে কাশ্মীরের চলবে। কিন্তু শা-মীরের বলিষ্ঠ হাত থেকে কাশ্মীর খসে যেতে পারেনা এখন।"

এই পরিণতির আশঙ্কা করেনি শা-মীর। যে নির্মম আঘাত সে পেলো, তার ফলে সে সার্থক করে তুলেছে কোটার বর। শুধু যে কাশ্মীরকে সে শাসন করে সে ইচ্ছেমতো পরিপূরিত করেছে তা নয়, সমস্ত জীবন ধরে সে হয়েছিল হিন্দু। যে ধর্ম কোটার মতো সাধ্বীর জন্য, সে ধর্মে সে সন্তান করেছে যে ধর্মে শা-মীরের মতো দুরন্তমার জন্য তার মুক্তি।

এই হোলো কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ। ললিতাদিত্য অবন্তী বর্মণের বহু ঘরে গেল সেবার কাশ্মীরের তর্পণে।

শুধু কাশ্মীর মুসলমান হয়নি। সে হোলো আরও পরে। সেকন্দরের আমলে একবার এক ফতোয়া এলো কাশ্মীরে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী থাকবেনা। সমস্ত হিন্দু ধন রেখে যারামুলার পথে যেতে লাগলো। সমগ্র যারামুলা গিরিবর্ত্ম হিন্দুতে ভরে গেল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু কাশ্মীর ছেড়ে পলায়ন করলে। হঠাৎ গিরিবর্ত্মের দুইদিক বন্ধ করে আরম্ভ হোলো হিন্দু হত্যা। প্রাণ পেলো তারা—যারা মুসলমান হোলো। একদিনে কাশ্মীরের তাবৎ হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল।

পরে যখন বিপদ কেটে গেল, এইসব মুসলমানীকৃত হিন্দুরা কাছে আবেদন জানালে আবার হিন্দু সমাজে ফিরে আসার জন্য। পণ্ডিতরা—কাশ্মীর হিন্দুধর্মী পণ্ডিতরা মত দিলেননা। পরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় বাংলায় এই শুদ্ধি আন্দোলন স্বীকৃত হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ, মালবীয়জী এরকম অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু মেদিনের কাশ্মীরে দয়ানন্দ, মালবীয়, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন না, তাই কাশ্মীর, যা ছিল হিন্দুর লীলাভূমি তা হয়ে রৈল ইসলাম। আয়াহীন এক বর্ষণের মুসলমানের যাদের চরম বিগ্রহ বারবার হয়েছে ভাঙ্গপাল, পাঠান আফ্রিদীর হাতে।

কিন্তু এই ধর্মান্তরী করণের পশ্চাতে কোনও সার্থকতাবোধ আবেদন ছিল না, কোনও প্রাণের স্পর্শ ছিলনা। তাই কাশ্মীরী মুসলমান পুরোপুরি মুসলমান হোলোনা। এ ওর হাতে খায়না, বৈবাহিক আদান প্রদানে বাধা আছে। কাশ্মীরী মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরু বিভাগ হয়ে গেলো। কাশ্মীরেই একমাত্র দেখেছি হিন্দু মন্দির অবয়বসাথে মুসলমান প্রবেশ করে, পরম শান্তির স্নিগ্ধ সঙ্গে তদবধান পরমকে পূজা নিবেদন করছে। এ পূজায় তারা গর্ব বোধ করে।

কাশ্মীর সব হিন্দু মুসলমান হয়ে গেলো—এর ইতিহাস মোটামুটি এই পর্যন্ত। তবে এই কথা বলতে বলতে শ্রীনগর পার হয়ে এখন সিন্ধুর উপত্যকা দিয়ে চলেছি। এই সিন্ধু নদীই নাগা পর্বত, একনাথা তাজ, কন্দম, তাও, সিন্ধু একই নদী হয়ে বিলাসে দিকে বিলাস হয়ে গেছে। সিন্ধুর নানা নাথা ঘটার প্রবলের জন্যে টুকরো টুকরো হয়ে ভাগ হয়েছে, আবার মিশেছে, আবার ভাগ হয়েছে। জীবণ তরঙ্গ সঙ্কুল পর্বতে বৈরব নদী। সিন্ধুর উপত্যকায় এসে পড়ে যেদিকে তাকাই পাহাড় আর নদী। অদ্ভুত যেন। এতদিনে এতো সুন্দর, এমন রমণীয় যেন দেখিনি। এ যেন চোখে চোখে পরতে পরতে দেখতে হয়। আমরা অধিকাংশ বা আজ্ঞাহলে সেলাম না। ওয়াজাখ্, মালার মুখে এই প্রকরণে বহু পর্যটক আসে। আমাদের যান ওয়াজাখ্ নালা দিয়ে চলতে লাগলো।

ক্রমশঃ

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে

এই তাজা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরভিত ও সতেজ রাখবে।

হিমালয় বোকে স্নো

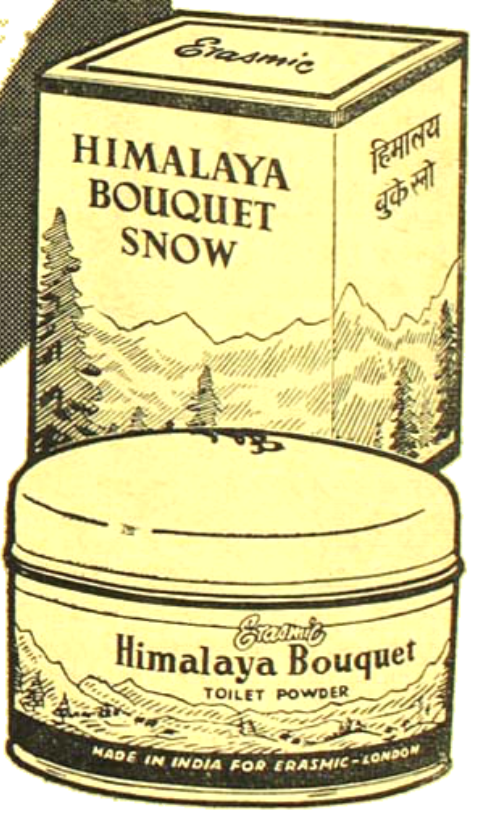

এই বোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।

হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার

[illegible]

[illegible]

প্রতিশোধ

অনুবাদক : শ্রীকানু রায়

[আমেরিকার মতো পৃথিবীর এমন একজন বিরল গল্প লেখক যাঁর প্রতিটি রচনাই এক একটি অপরূপ শিল্পকর্ম। নিখুঁত চরিত্র চিত্রায়ন, একদম উপস্থাপনার আঙ্গিক কলাকৌশলে, সর্বোপরি গল্পের অভিনিবেশ তাঁর সমস্ত সাহিত্যকে একটি অপরূপ মহিমা উপহার দিয়েছে। তাঁর বি আর্ডেক্সার নামে ছোট গল্পটি বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে, অনুবাদের সব ত্রুটি সত্ত্বেও, তৃপ্তি অনুভব করছি—অনুবাদক]

আর সহ্য করা যায় না। ফিলর সিগারেট মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে উপযুক্ত শাস্তিই দিতে হবে। যাকে তিনি এতদিন ধরে মনে-প্রাণে ভালবেসে এসেছেন, যার সুখশান্তির জন্য তিনি এতটুকু সময় স্থির থাকতে পারেননি, প্রাণপণে প্রয়োজনের সব দাবী মিটিয়ে এসেছেন সে কিনা শেষটায় এমন একটা···

ছি ছি ছি। মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে আর রাগে ফুলতে ফুলতে সিগারেট একটা অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদের দোকানে এসে হাজির হলেন। দোকানটার নাম স্মাক্স্ কোম্পানী। খুব নামজাদা দোকান। ঢুকেই তিনি একটা রিভলবার চেয়ে বসলেন। তাঁর গলার স্বর গম্ভীর। রাগে, দুঃখে আর অমন ভয়াবহ একটা সিদ্ধান্তের জন্যই হোক—কিংবা অন্য কোন কারণেও হতে পারে—তাঁর মুখের ভাব বড় অস্বাভাবিক লাগছিল। খানিকটা অস্থিরও বটে।

তিনি মনে মনে ভাবলেন : আমি জানি আমি একটা ভয়াবহ কাজ করতে যাচ্ছি। কিন্তু উপায় কি? আমার সমস্ত সম্মান ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে, চুনকালি পড়েছে আমাদের বংশের মুখে। শয়তান তুমি জয়ী হবে ভেবেছ? তা আমি হতে দেবনা। আমি সৎ নাগরিক, এতদিন ধীরে সুস্থে দিন কাটিয়ে এসেছি। এবার আমি প্রতিশোধ নেব। প্রথমে আমার স্ত্রীকে হত্যা করব, তারপর তার প্রণয়ীকে, আর তারপরে আমাকে—

সিগারেট অবশ্য কোনদিন রিভলবার কেনেন নি, জীবনে তিনি একবারও গুলি চালান নি। তবু কল্পনায় তাঁর চোখের সামনে এক সঙ্গে অনেক কিছুই ভেসে উঠল। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর রিভলবারের গুলিতে কাদের পাঁজরা যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, ক্ষতস্থান থেকে বীভৎসভাবে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসছে, কৌতূহলী জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, কানাকানি ফিসফাস আর অনুসন্ধান চলছে। সিগারেট আরো দেখতে পেলেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা যেন কেমন ভীত ত্রাস্ত হয়ে গেছে; প্রতিবেশীদের মধ্যে ভয়ের একটা অনুভূতি বারবার শিরশির করে উঠছে। তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী অশান্তি, উদ্বেগ, লজ্জায় একেবারে ভেঙে পড়েছে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হেডলাইনে এই ভয়াবহ খবর। পারিবারিক ভাঙনের কাহিনী নিয়ে দীর্ঘ সম্পাদকীয়। আরো কত কি!

দোকানদারটি দেখতে ছোটখাট হলে কি হবে বেশ চালাক চতুর। শাদা একটা কতুয়া পরে আছে সে, তার ছোটখাট দুঁড়িটি দেখা যাচ্ছে। কতকগুলি বিভিন্নধরণের রিভলবার এনে সে কাউন্টারে রাখল। তারপর একগাল হাসি হেসে বলে : স্যার, যদি কিছু মনে না করেন—এই রিভলবারটি নিন। এটা খুব ভালো রিভলবার। স্মিথ-ওয়েসন কোম্পানীর সব চেয়ে নতুন আমদানী, আর সবচেয়ে নতুন ধরণের। ছ'ঘরা রিভলবার, ট্রিগার টিপবার কায়দাটাও অদ্ভুত। তাকিয়ে দেখুন না স্যার, কেমন জিনিষ। আজ-কাল তো এই ধরণের রিভলবারেরই চাহিদা। বললে

বিশ্বাস করবেন না, দৈনিক ডজন ডজন বিক্রী করছি। ধরুন না কেন—ডাকাতি, রাহাজানি, বুনো-নেকড়ে, খুন-জখম, ছাঁচড়া-চোর, কত আর বলবো স্যার—এসব ঠেকাতে অস্ত্র চাই তো? তা' লোকে এ ব্যাপারে এই জাতীয় রিভলবারই পছন্দ করে। এর বুলেট যেমন জোরে ছুটবে তেমনি একচুল এদিক-ওদিক হবে না, লক্ষ্যভেদ ঠিক করবে। তা ছাড়া এর সাহায্যে বেশ দূর থেকেও গুলি ছোঁড়া যায়। ধরুন কারুর স্ত্রী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল—তাহলে এ ব্যাপারে এ রিভলবার একেবারে মোক্ষম। শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীটিকে নয়, তার প্রেমিকটিকে পর্যন্ত সাবাড় করে দিতে পারে। আর যদি আত্মহত্যার কথা বলেন, তাহলে আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, এর চেয়ে ভালো অস্ত্র আর হতে পারে না—

বলতে না বলতেই লোকটা রিভলবার তুলে নিল; তারপরে উপরের দিকে তাক করে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল। পরম যত্নে, পরম সমাদরের সাথে সেটি সিগারেটের হাতে তুলে দেয়! তার উৎসাহ যেন তর সইছে না। মনে হচ্ছে সে যদি স্মিথ-ওয়েসন কোম্পানির এমন চমৎকার একটা রিভলবার পায়, তাহলে বোধহয় এক্ষুণি ছুটে গিয়ে ঐ জাতীয় কোন কাজ করে বসবে।

সিগারেট জিজ্ঞেস করলেন: তা' এটার দাম কত?

: বেশী নয় স্যার, মাত্র পঁয়তাল্লিশ রুবল।

: হুঁ, বড় বেশী বেশী লাগছে যে।

: কি যে বলেন স্যার! তা' আপনি যদি সস্তায় চান দিতে পারি, কিন্তু অন্য ধরণের হবে। হরেক রকমের মালই আমরা রেখেছি স্যার। তা' না হলে দোকান চলবে কেন? এই দেখুন না—এটা হ'ল ফরাসী কোম্পানীর। এর দাম মাত্র আঠারো রুবল, বলতে বলতে লোকটা একটু নাক সিঁটকায় আর পরম অবহেলার সংগে বলে, কিন্তু হলে কি হবে এ একেবারে ঘাচ্চাতা-চংএর। কিছু গরীব বুদ্ধিজীবী আর মহিলা ছাড়া আজকাল এসব রিভলবার কেউ কেনে না। এ দিয়ে আত্মহত্যা করা কিংবা বৌকে মারতে যাওয়া সমান অসভ্যতা বলেই গণ্য করা হবে। ভদ্রলোকের সমাজ স্মিথ-ওয়েসন ছাড়া অন্য কোন কোম্পানীর রিভলবারকে স্বীকারই করেন না।

সিগারেট একটু গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন: দেখুন ওসব ব্যাপার নয়। আত্মহত্যা কিংবা কাউকে খুন করার মতলব আমার নেই। আমার বাড়ীর চারপাশে আজকাল চোরের বড় উপদ্রব হয়েছে তাই আমার একটা আগ্নেয়াস্ত্র দরকার।

লোকটা যদ্দুর সম্ভব ভদ্রতার সংগে, কিন্তু একটু তির্যকভাবে জবাব দেয়—আপনি কেন কি জন্য রিভলবার কিনতে যাচ্ছেন সে খবর জানবার জন্য আমরা অবশ্য ব্যস্ত নই। আপনিই বলুন, প্রত্যেকটা খদ্দেরের কাছ থেকেই যদি রিভলবার কেনার কারণ জিজ্ঞেস করতে হয় তবে ব্যবসা চলে কী করে? ব্যবসার জন্যেই তো দোকান দেওয়া হয়েছে। তবে একটা কথা না বলে পারছি না স্যার, চোর-ডাকাত তাড়াবার পক্ষে এই রিভলবার খুব সুবিধে নয় কারণ এর আওয়াজটা তেমন জোরালো নয়। আপনি বরং একটা মর্টিমার পিস্তল কিনে নিয়ে যান—এ দিয়ে লোকেরা ডুয়েল লড়াইও অবশ্য করে থাকে।

লোকটার শেষ কথাটা শুনে সিগারেটের মাথায় চমৎকার একটা বুদ্ধি খেলে গেল—স্ত্রীর প্রণয়ীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে কেমন হয়? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল: না, এমন একটা পশুর সাথে ডুয়েল লড়াই-এর কোন মানে হয় না। এতে সম্মান হানি হবে। ঐ সব লোকদের কুকুরের মত গুলি করে মারা উচিত।

দোকানী কোন কথা না বলে হাসতে হাসতে আরো কতকগুলি রিভলবার কাউন্টারের উপরে এনে রাখল। যে কোন কারণেই হোক, স্মিথ-ওয়েসন কোম্পানীর একটা রিভলবারই সিগারেটের মনে ধরে গেল। তিনি একটা হাতে তুলে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। চোখের সামনে আবার ভবিষ্যতের দৃশ্যগুলি এক এক করে ভেসে উঠল।

…তাঁর স্ত্রীর ঠিক মাথার দিকে তাক করে তিনি ট্রিগার টিপলেন। গুলিবিদ্ধ মস্তকের ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে রক্তের ধারা বেরিয়ে এল। রক্ত, রক্ত…লাল লাল রক্ত। তারপর সেই বেইমানী বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী ক্ষোভে, দুঃখে, অনুতাপে ছটফট করতে করতে মৃত্যুর দরজায়—

কিন্তু তারপরেই সিগারেটের মনে হ'ল: না, এতে চলবে না। তাকে আমি রেহাই দোব। আগে হত্যা করবো তার প্রেমিকটিকে, তারপর নিজেকেও খুন করবো।

আর তাকে বেঁচে থেকে থেকে সব দুঃখ, জ্বালা, গ্লানি, অন্তের উপহাস ঘৃণার কাহিনী হয়ে থাকতে হবে। মৃত্যু নয়—এই হবে তার যোগ্য শাস্তি।

কাজেই এবার দৃশ্যটা সামান্য একটু পালটে গেল··· তারী মোটা গম্ভীর স্বরে কারা যেন শোকগাথা গাইছে। কবরে শুয়ে আছেন একটি ভদ্রলোক। ক্রুদ্ধ, আহত বঞ্চিত একটি ভদ্রলোক। তার নাম ফিলর সিগারেভ। তাঁর স্ত্রী শবযাত্রায় যোগ দিতে চলেছে—ফ্যাকাশে রক্তশূন্য তার মুখ। অনুতাপে সে একেবারে ভেঙে পড়েছে। লোকের ঘৃণা আর অনুকম্পা মেশানো তীব্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টির হাত থেকে সে নিজেকে কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে পারছে না। হতভাগিনী একটি মেয়ে চরম লজ্জা আর অপমানে তার অপরাধের মাশুল দিচ্ছে।

দোকানদারটি তাঁর চিন্তায় হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠল: আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধহয় স্মিথ-ওয়েসন কোম্পানীর রিভলবারই পছন্দ করছেন। যদি আপনার কাছে এর দামটা খুব বেশী মনে হয়, তবে আপনাকে পাঁচ রুবল কমেই না হয় দিচ্ছি। অবশ্য আরো নানান ধরণের রিভলবার আছে সেগুলির দামও কিছু সস্তাই হবে।

এই কথা বলে লোকটা আরো রিভলবার এনে হাজির করে।

: এই দেখুন, এটার দাম তিরিশ রুবল। খুব বেশী মনে হচ্ছে কি? একে তো আমাদের মুদ্রার মান দিন দিন কমছে, আবার সেই অনুপাতে আমদানী-কর দারুণ ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তাইতো, কি বলবো স্যার, যদিও আমি একেবারে সাধারণ লোক তাহলেও প্রতিবাদ না করে পারছি না। আপনিই বিচার করে দেখুন, দিন দিন যা অবস্থা হচ্ছে তাতে কেবল বড়লোকরাই ভালো রিভলবার রাখবার মত বিলাসিতার খরচ যোগাতে পারবে। গরীবদের রাশিয়ান কোম্পানীর বাজে মাল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। রাশিয়ার তুলা অঞ্চলে সাধারণতঃ রিভলবার তৈরী হয়। স্যার সেগুলি এত বাজে, কি আর বলবো! আপনি যদি আপনার বৌকে গুলি করতে যান তো উল্টে আপনার কাঁধেই চোটটা লেগে যাবে।

সিগারেভ বড় মন-মরা হয়ে গেলেন। সত্যিই তো তিনি যদি মারা যান তবে বেইমান স্ত্রীর শোচনীয় পরিণতি কে দেখবে। প্রতিশোধের আনন্দ কেবল তখনই রসে সমে চেটেপুটে উপভোগ করা যায়, যখন নিজে বেঁচে থেকে অপরাধীর কঠোর শাস্তি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। সিগারেভ নিজেই যদি আগে মারা যান তবে আর লাভটা কি হল? তাঁর স্ত্রী শাস্তি পেল কি পেল না, অনুতপ্ত হ'ল কি হ'লনা—সে খবরে তাঁর কি?

তিনি তাই মনে মনে ভাবলেন: এক কাজ করা যাক্। আগে প্রেমিকটিকে খতম করি। পরকীয়া প্রেমের মজা তোমায় বোঝাচ্ছি। আগে তোমায় শেষ করে, তোমার মৃতদেহ কফিনে পুরে তবে আমি মারা যাব। কিন্তু একটু অসুবিধা আছে। লোকটাকে মারলেই তো লাল পাগড়ী এসে হাতকড়া লাগাবে, রিভলবারটাও হয় তো ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো—আগে প্রেমিকটিকে হত্যা করছি, প্রেয়সীটিকে অবশ্য আপাতঃ ছেড়ে দেব···হুঁ তারপর আমাকে অ্যারেষ্ট করা হবে। হ্যাঁ সেই ভালো। জেলখানাই ভালো—আত্মহত্যা আমি করতে পারবো না। আর তাছাড়া বিশেষ দরকার হলে জেলে বসেও অনায়াসে আত্মহত্যা করা যায়।

বেশ—তাহলে খুন করলাম, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বিচারের জন্য··· হ্যাঁ আদালত। সেখানে আমার পক্ষ সমর্থন করবার সুবিধে হবে। সমবেত জুরি, জজ আর জনতা সবার কাছেই প্রেয়সীটির হীন কীর্তিকথা তুলে ধরতে পারবো। আমি যদি আগেই মারা যাই তবে, আমার স্ত্রীটিকে তো ভালো করেই চিনি যা অসম্ভব চালাক, হয়ত এমন কাঁদুনি গাইতে আরম্ভ করবে লোকে ভাববে ঐ সিগারেভ ব্যাটারই যত দোষ। এমন সতী সাধ্বীকে অযথা সন্দেহ করে কত কষ্ট দিয়েছে। হয়তো সমাজের সবাই তার কথা মেনে নেবে। আর হয়তো কে জানে—আমার এই আত্মহত্যার জন্য সবাই হাসাহাসি করবে। বলবে সিগারেভটা এমন বোকা—

সিগারেভ কিছুই স্থির করে উঠতে পারেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার ভাবতে লাগলেন; আত্মহত্যা করলে লোকে তো আমাকেই সন্দেহ করে বসবে। আমাকেও সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত স্বামীদের দলে ফেলবে। আসল কথা, আমার জীবনটা এতই ফ্যালনা নাকি? আমি কোন্ দুঃখে মরবো? আত্মহত্যা মানেই কাপুরুষতা।

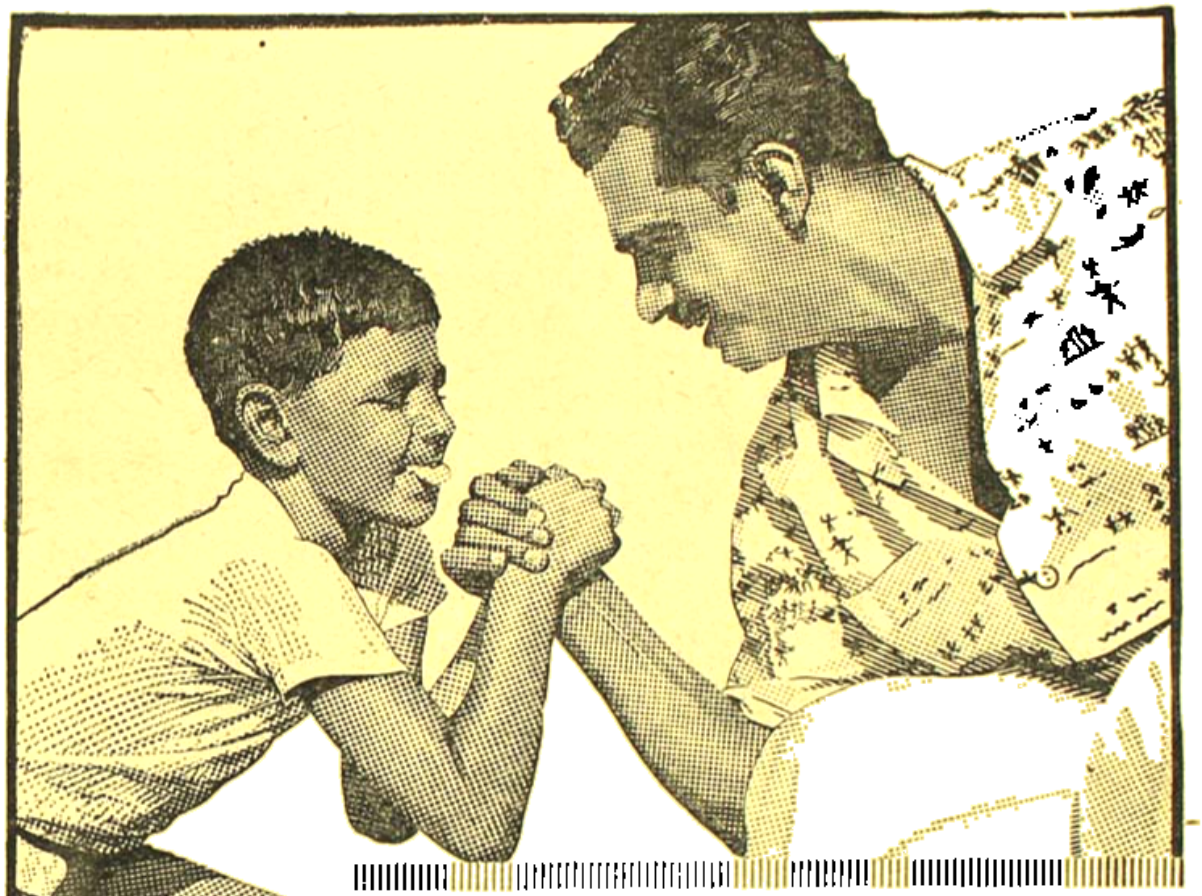

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** দিয়ে স্নান করেন

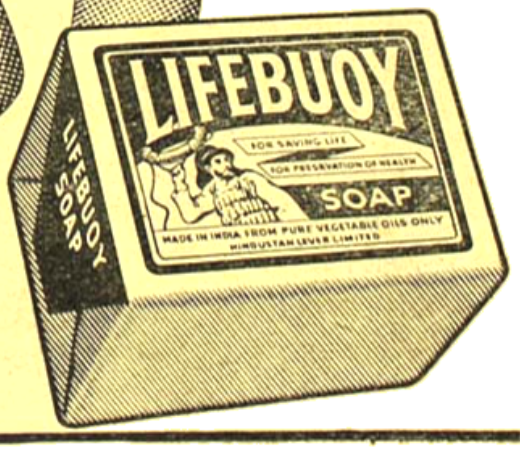

খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড, বম্বে এরিয়া।

L. 278-X52 BG

না, না এ দুর্নাম সহ্য করতে পারবোনা। তার চেয়ে একটু আগে যা ঠিক করেছি তাই স্থির সিদ্ধান্ত। প্রেমিকটিকে খুন করে ফেলেই না হয় যাব। বিচারে তো প্রেয়সীটিকে সাক্ষী থাকতেই হবে। আমার উকিলরা যখন তাকে চেপে ধরবে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে নাজেহাল করে ছাড়বে আঃ কী চমৎকার দৃশ্য। আমি নিশ্চিত জানি, জনমত আমার পক্ষেই থাকবে।

দোকানদার কিন্তু নাছোড়বান্দা। রিভলবার সে বিক্রী করবেই। হরেক রকমের চীজ এনে টেবিলের উপরে স্তূপাকার করে ফেলেছে।

: এই দেখুন, এগুলো কিছুদিন আগে ইংলণ্ড থেকে এসেছে। কিন্তু কি বলবো স্যার, স্মিথ-ওয়েসন কোম্পানীর সংগে পাল্লা দিতে পারে এমন কোম্পানী আজো জন্মায়নি। তা'হলে স্যার একটা ছোট গল্প বলি, অবশ্য খবরের কাগজে এর বিবরণী বেরিয়েছিল—একেবারে সত্যি ঘটনা কিনা স্যার। আশা করি আপনি কাগজে পড়েছেনও। একজন হোমড়া-চোমড়া মিলিটারী অফিসার এই কোম্পানীর রিভলবার কিনেছিলেন, এই আমাদের দোকান থেকেই। অফিসারের বৌ-এর সাথে আবার কোন মক্কেলের খুব পেয়ার। তা' বুঝতেই পারছেন মিলিটারী স্বামী। এসব কেলেংকারী সইবে কেন। ক্ষেপে গিয়ে সোজা প্রেমিকটিকে গুলি করে বসলেন। তারপর কি হ'ল জানেন স্যার? বুলেটটা ধাঁ করে তার বুকটাকে বিদ্ধ করে, একটা ব্রোঞ্জের প্রদীপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পিয়ানোতে গিয়ে ধাক্কা লাগল। আর তাতেই কি শেষ! পিয়ানো থেকে বুলেটটা রিবাউণ্ড করে এসে একটা স্প্যানিয়েল কুকুরকে মেরে, ভদ্রলোকের স্ত্রীটিকেও বেশ আহত করে ফেলল। বুঝুন স্যার কেমন মোক্ষম রিভলবার। কিন্তু ভেবে দেখুন, এখন মিলিটারী অফিসারটিকে গ্রেপ্তার করে এই অপরাধের জন্য বেশ কয়েক বছরের জন্য সাইবেরিয়াতে পাঠানো হয়েছে। আইন এমনই এক জিনিষ! এর হাত থেকে কারুরই রেহাই নেই। আপনাকে কী আর বলবো স্যার, আজকাল যেমন জজ তেমনই জুরী সবাই ঐ প্রেমিকদের বড় সহানুভূতির চোখে দেখেন। তাঁরা ভাবেন রাশিয়ার মত এতবড় দেশে একটা স্বামীর সংখ্যা কমলেই বা কি—অতএব ব্যাটাকে ফাঁসিতে লটকাও কিংবা সাইবেরিয়াতে পাঠাও। আর আজকালকার সমাজও তেমনি হয়েছে। এর মেয়ে ওর সংগে পালাচ্ছে, এর বউ ওর সংগে প্রেম করছে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কালে কালে এ কি হ'ল? ভাবতেই তো গা শিউরে ওঠে। দেশে কি আর আইন ধর্ম বলে কিছু থাকবে না নাকি? আরে বাবা! বিয়ে-করা বউ কি সিগারেট নাকি যে এর মুখ থেকে ওর মুখে যাবে, কিংবা গল্পের বইয়ের মত এর হাত থেকে ওর হাতে।

একটু দম নিয়ে দোকানদারটি আরো বলে, দিন দিন আমাদের ব্যবসা বড় মন্দা যাচ্ছে। স্বামীরা ক্ষেপে গিয়ে যে এক আধটা খুন-খারাপি করবে তারও উপায় নেই স্যার। আইন আছে, আদালত আছে, পুলিস—আরো কত হাঙ্গামা। এই সব ঝামেলার ভয়ে কোন স্বামী আজকাল রিভলবারই কিনতে চায় না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দোকানদারটি ফিসফিস করে বলল: আপনিই বলুন স্যার, এ ব্যাপারে কার দোষ? আমার তো মনে হয় আমাদের সরকারই এ জন্য দায়ী।

সিগারেটও মনে মনে ভাবলেন: সত্যিই তো খুন করে জেলখানায় পচে কি আর লাভ? তা ছাড়া আমি যদি সাইবেরিয়াতেই যাই তবে আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই আর একটা বিয়ে করে ফেলবে; তার দ্বিতীয় স্বামীকেও হয়তো ঠকাবে। কাজেই ব্যাপারটা বড় গোলমেলে হয়ে গেল। তাকে অবশ্য হত্যা করবো না, নিজেকেও খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আইনের জ্বালায় হতভাগা প্রেমিকটাকেও কিছু করা যাবে না দেখছি। কাজেই আমাকে অন্য কোন পথ খুঁজে নিতে হবে। যাতে আইনের কোন ফাঁক থাকবে না, যা বেশ সহজেই করা যাবে, অথচ আরো বেশী নির্মম—আরো বেশি কষ্টদায়ক প্রতিশোধ হবে। আমি ওদের ঘৃণা করি। ওদের কোন সংস্পর্শে থাকতে চাই না। আমি আজই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করব। তখনই সব কেলেংকারী প্রকাশ হয়ে যাবে। দুনিয়ার লোকে জানবে সতী-সাধ্বী পত্নীটি কি সাংঘাতিক মেয়ে।

দোকানদার আরো এক ডজন রিভলবার আনল।

: দেখুন স্যার, এগুলি একেবারে আনকোরা। হাতে

নিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখুন না। এর ধনুপাতির কৌশল কী চমৎকার।'

সিগারেত স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন তাঁর আর রিভলবার দরকার নেই। আপাততঃ এই দোকানের বাইরে যেতে পারলেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ওঃ দোকানদারটা যেন আঠার মত লেগে আছে। একটা না একটা রিভলবার তাঁকে দিয়ে কেনাবেই। লোকটার ধৈর্য অপরিসীম।

সিগারেত বল্লেন, দেখুন আপাতত সুবিধে মত কিছু যখন পাওয়া যাচ্ছে না—তখন আমি না হয় আর একদিন আসবো, কিংবা···কিংবা কাউকে পাঠিয়ে দেব। তারপর সিগারেত তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে ভাবলেন, না একটা কিছু দেখছি কিনতেই হবে। কিন্তু সস্তায় কি কেনা যায়? তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। দরজার কাছে জালের মত কি একটা ঝুলছে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা—ওটা কি?

: স্যার! ওটা পাখা ধরবার জাল।

: তাই নাকি, তা' ওটার দাম কত?

: আজ্ঞে আট রুবল।

: হুঁ, সিগারেত ভারিক্কী চালে বললেন, একটা পাখী ধরবার জালই আমি খুঁজছিলাম। এই রইল আট রুবল।

বলে পকেট থেকে রুবল বার করে দিয়ে, জালটা হাতে নিয়ে সটান পথে নেমে এলেন।

সংশয়

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন দিনে পেয়েছি আমি অনেক কিছু দান
জীবনে মোর জোয়ার লেগেছে লঘু-ভোলার তান
পুরাণো পৃথিবীর তিনটি সাথী—
যাদের লয়ে ছিলাম মাতি
মনের কুজনে, প্রাণের গুঞ্জনে, স্তুতি আরতিতে প্রচুর
সুন্দরী, সুরা, আর সুর
প্রেম মদিরা, আর গান
দিয়েছিলো যারা জীবনের মোর রসিকের অবদান
ছন্দে গন্ধে মধুরতায়
রসসিঞ্চিত বিহ্বলতায়
এই প্রথমেরা লভিত যদি শ্রেষ্ঠের সম্মান
উর্দ্ধতমের আস্পৃহাতে পূর্ণতমের তান্।

(কবি শ্রীঅরবিন্দের প্রথম যুগের একটি কবিতা অবলম্বনে (Moro Poems)

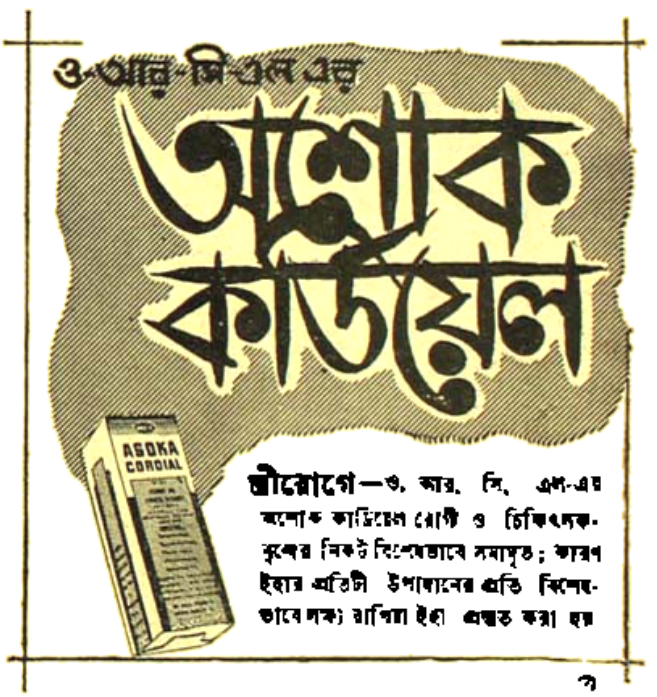

সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী

যিনি গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল বাংলার সাহিত্য ও সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা বিকাশ করিয়া দেশকে গৌরবে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন, যিনি তথাকথিত স্কুল ও কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিতা না হইয়াও গৃহে শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার আদর্শ জীবনে গ্রহণ ও প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন, যিনি সারাজীবন উপন্যাসাদি রচনার দ্বারা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধানের সহিত গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আদর্শ পরিবার সৃষ্টি ও পালন করিয়াছিলেন, সেই মহীয়সী বাঙ্গালী মহিলা সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী গত ৬ই বৈশাখ শনিবার সকাল প্রায় ১১টার সময় ৭৬ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করায় বাংলার লোক ও বাংলা সাহিত্য কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা বুঝিবার সময় আজও আসে নাই।

ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মুকুন্দদেবের কন্যারূপে তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বাগবাজারে মাতামহ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা সমাজে সুপরিচিত ছিলেন এবং বাংলাদেশের নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দদেবের ৪ কন্যা জন্মলাভ করায় এবং তাঁহার পিতার তিনি দ্বিতীয়া কন্যা হওয়ায়—ভূদেববাবু সে সময়ে পৌত্রের অভাবে অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবারে পুত্রসন্তান হওয়ায় ও শৈশব হইতে অনুরূপা দেবীর অসাধারণত্ব প্রকাশ পাওয়ায় তিনি পিতামহের বিশেষ আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন। ফলে তিনি বাড়ীতেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাল করিয়া শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার মাতার সংগৃহীত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন। মাত্র ১০ বৎসর বয়সে ১৮৯৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী উত্তরপাড়া নিবাসী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শেখরনাথ বিহার-মজঃফরপুরে উকীল ছিলেন, কাজেই অনুরূপা দেবীকে সারা জীবন মজঃফরপুরে বাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী শেখরনাথের উৎসাহে তিনি সাহিত্য-রচনা আরম্ভ করেন এবং শেখরনাথ নিজে একদিকে যেমন তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষা দিতেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার রচনায় সাহায্য করিয়া বা লেখায় তাঁহাকে প্রেরণা দিয়া এ কার্য্যে তাঁহার সহায়ক হইতেন।

'ভারতী' মাসিক পত্রের সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকটও তিনি সাহিত্য-রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে নানা-রূপ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী দেবী মজঃফরপুরে বাস করিতেন—মাধুরী দেবীর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফলে তিনি শুধু সাহিত্য-সেবা ক্ষেত্রে নয়, সমাজ-সেবা ক্ষেত্রেও উৎসাহ লাভ করেন—উভয়ে মিলিয়া সেখানে এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত করিতেন।

প্রথম জীবনেই তিনি লেখিকারূপে খ্যাতি লাভ করেন এবং ৪৫ বৎসর পূর্বে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের সময় হইতে তিনি ভারতবর্ষে তাঁহার উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ করেন। তাঁহার সহিত আজীবন ভারতবর্ষের মধুর সম্পর্ক ছিল এবং স্বর্গলাভের মাত্র কয়দিন পূর্বে তিনি ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া একটি রচনা প্রেরণ করিয়াছিলেন (তাহার একাংশ এই সংখ্যা ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হইয়াছে)। তাঁহার লিখিত অধিকাংশ উপন্যাসই ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের পরিচালক মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাঁহার প্রায় সকল পুস্তকেরই প্রকাশক।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী বিহারের সর্বধ্বংসী ভূমিকম্পে তাঁহাদের মজঃফরপুরের গৃহ ভূমিসাৎ হয়—অনুরূপা দেবী নিজে সাংঘাতিক ভাবে আহতা হন এবং তাঁহার ১০ বৎসর বয়স্ক এক পৌত্রী বাড়ীচাপা পড়িয়া মারা যান। তাহার পর হইতে শেখরনাথবাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতনাথ অকালে পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার স্বর্গলাভের বৎসরাধিককাল পূর্বে তাঁহার স্বামী শেখরনাথেরও দেহান্ত হয়। তাহার পর হইতে তিনি প্রায়ই তাঁহার পৌত্রের নিকট রাণীগঞ্জে বা কনিষ্ঠপুত্র অশোকনাথ আই-এ-এসের নিকট তাঁহার কর্মস্থলে বাস করিতেন। মৃত্যুর ২দিন পূর্বে তিনি অশোকনাথের সহিত কলিকাতায় ৫০নং রামতনু বসু লেনে (সিমলা) তাঁহার এক ভগিনীর গৃহে আগমন করেন—বৃহস্পতিবার কলিকাতায় পৌঁছিয়া শুক্রবার বিকালেই তথায় তিনি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং শনিবার সকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী

তিনি ৩০খানিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাংসারিক কাজই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। তিনি সারাজীবনই অধিকাংশ সময় সংসারের কাজ অর্থাৎ রন্ধন, স্বামীপুত্র-পরিচর্য্যা প্রভৃতিতেই ব্যয় করিতেন। সমাজ সেবার কাজ তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি সকল প্রকার নারী-কল্যাণ কার্য্যের সহিতই নিজকে যুক্ত রাখিতেন ও তাঁহার শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা বহু মহিলা-প্রতিষ্ঠানকে উপকৃত করিতেন। আমাদের তাঁহার সহিত বহুস্থানে বহু সাহিত্যসভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হইয়াছে, আমরা লক্ষ্য করিয়াছি সভারম্ভের বিলম্ব দেখিলেই তিনি পল্লীর গৃহে গৃহে গমন করিয়া গৃহকর্ত্রীদিগের সহিত মেলামেশা করিতেন ও তাঁহাদের নানা সদুপদেশ দানে উপকৃতা করিতেন। তাঁহার গৃহে কোন অন্তরঙ্গ পরিচিত লোক গমন করিলে তিনি তাহাদের না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না—প্রাচীন রীতিতে অতিথিকে অন্নদান করা তিনি পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। মজঃফরপুরে বাস কালে কোন সাহিত্যিক তথায় যাইলেই শেখরনাথের গৃহে তাঁহাদের অতিথি হইতে হইত ও

অন্নপূর্ণা দেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু স্থান হইতে বহু সম্মান, উপাধি, পদক প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতিতে সভানেত্রী হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার জীবনীতে প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন-কর্ত্রী, পরীক্ষক, লীলা-অধ্যাপক প্রভৃতি সম্মান ও দান করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া, ভুবনমোহিনী ও জগত্তারিণী পদক দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মচন্দ্রিকা, সরস্বতী, ভারতী, রত্নপ্রভা প্রভৃতি বিবিধ উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মা, মহানিশা, রাসলতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে। তাঁহার বহু পুস্তক নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বহু গ্রন্থ সিনেমায় রূপান্তরিত হইয়া লক্ষ লক্ষ দর্শককে আনন্দ দান করিতেছে। জ্যোতিহারা, উত্তরায়ণ, পথহারা, চক্র, বিবর্ত্তন, সর্ব্বাণী, হিমাদ্রি, গরীবের মেয়ে, হারানো খাতা, সোনার খনি, ত্রিবেণী, জোয়ার ভাঁটা, রামগড়, পথের সাথী, প্রাণের পরশ, রাঙা শাঁখা, মধুমল্লী, চিত্রদীপ, উল্কা, বিস্মরণী, কুমারিল ভট্ট, বর্ষচক্র, উত্তরা খণ্ডের পত্র, বিচারপতি প্রভৃতি তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার রচনা যেমন বাংলাদেশের সাধারণ জীবন সম্পর্কিত বলিয়া সকলের নিকট আদৃত হইয়াছে, তেমনই তাঁহার অসাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালী বাঙ্গালী মাত্রকেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যুগের লেখিকা হইয়াও তিনি কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হন নাই—বাল্যকাল হইতে যে পারিবারিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন, যে পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া জীবনকে গঠন করিয়াছিলেন, পিতৃগৃহে বা স্বামী-গৃহে যে আদর্শনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি লক্ষ্য ও অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্য দিয়া দেশবাসীকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধাই তাঁহাকে সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনযাপন করিয়া তিনি তাহাকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকদীর্ণ জরাজীর্ণ দেহ সাধনোচিত ধাম লাভ করিয়াছে। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ যেন দেশবাসী অনুসরণ করিয়া তাহাদের জীবন উজ্জ্বলতর ও মধুরতর করিতে সমর্থ হয়।

ক্ষুদ্রতা

শ্রীসতী সেনগুপ্ত

সংকীর্ণ মনের স্রষ্টা ক্ষুদ্র পরিবেশ
বিশেষ সীমায় বদ্ধ তার পরিণতি।
খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর নাই স্বপ্নলেশ
পরিমিত জীবনে পায় সুখ অনুভূতি।
মুক্ত জীবনে তার নাই কোন লোভ
ভবিষ্যের স্বপ্ন তার সীমার বাঁধনে—
অতীতের 'পরে তার নাই কোন ক্ষোভ
সদা আতংকিত প্রাণ মরণ স্মরণে।
আনন্দের গান তার ঝিঁ ঝিঁ কলরব—
বিষাদের ছায়া সদা নয়ন তারায়—
আত্মদ্বন্দ্বে নিত্য তার জীবন উৎসব
নাহি জানে নবসজ্জা বিস্মৃতি আশায়।
পাকেও ফুটিছে কমল চিত্ত বিনোদন
আঁধারে জোনাকি সেও উপেক্ষিত নয়,
তবুও পরিত্যক্ত পাক ধর্ম্ম সনাতন
উপহাস জোনাকির আলো-অভিনয়।
ক্ষুদ্রতা হরিছে শক্তি করিছে দুর্ব্বল
সংকীর্ণ বাঁধনে লুপ্ত স্বাধীন মনন
অগ্রগতি পথে শক্তি করিছে বিকল
গুপ্ত আবরণে আনে সমাধি সমন।

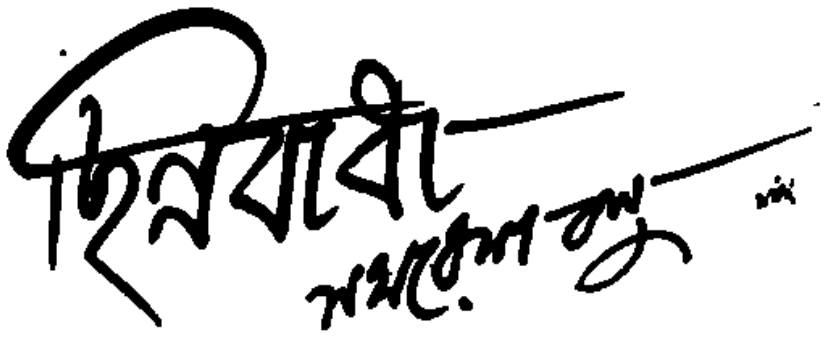

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জন্মক্ষণ থেকে অভয়ের ভাগ্যে এমনি অযাচিত আঘাত অপমান আর নিগ্রহই জুটেছে। জীবনের এটা নিয়ম কিনা সে জানে না। সুবালার ঘরে আজ তার কুলশীলের প্রয়োজন হয়নি। ব্যস্ততার ফাঁকে, কোনো এক সময় বিষধর সাপ আবির্ভূত হওয়ার মতো মাতালের প্রবেশ ঘটেছিল। অভয় ভাবে, শুধু তারই ভাগ্যের পায়ে পায়ে এসেছিল লোকটা।

গাঁয়ে সাঁতরা-কবিরাজকে আঘাত-করা বিদ্রোহী মানুষটি কখনো তাকে ছেড়ে যায় না। তাতে রাগ যদি বা কমে, বুকের ব্যথা মরে না।

সুবালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু সান্ত্বনার জন্ত মনটা ছটফট করতে লাগল। এ সান্ত্বনা অভয়-খুড়োর কাছে নয়। খুড়ির কাছে, অনাথ গুরুর কাছেও নয়। নিমির কাছে সান্ত্বনা চায় অভয়।

মন এমনি জিনিষ। তাকে কেউ দেখতে পায় না। সে কতখানি নির্লজ্জ, মানুষকে দেখে সব সময় টের পাওয়া যায় না। খুড়ো খুড়ি অনাথ, সকলে যথার্থ ভালবাসে অভয়কে। কিন্তু মন বলে, সে ভালবাসা নিমির অনাস্বাদিত ভালবাসার মত ভালবাসা নয়। দুঃখের মধ্যেও নিজেকে কেমন যেন বেহায়া-বেহায়া লাগে। তবু নিমির অনাস্বাদিত ভালবাসার কাছেই নিজের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে চায় অভয়। নিমির কাছে, নিমিকে বুকের কাছে নিয়ে ভালবাসতে বাসতে জীবনের রীতিনীতির নামে নিষ্ঠুর অনিয়মের কথা বলতে চায় সে। ভালবাসার এইটুকুই সুখ যে, জীবনে অনেক দুঃখ আছে, গ্লানি আছে। দুঃখের জন্তেই ভালবাসা। ব্যথার কথা বলার জন্তে। দুঃখ আর ব্যথা তাতে ভোলা যায় কিনা কে জানে। বলা যায়, সেইটুকুই অনেকখানি। বলার জন্তেই বুঝি মানুষে মনের মানুষ খোঁজে। সেই মনের মানুষটি চায় অভয়। নিমিকে সে মনে মনে মনের মানুষের আসনে বসিয়েছে।

চায়, কিন্তু যেতে পারে না কাছে। সময় না হ'লে যাওয়া যাবে না। শুধু নিমিদের বাড়ির কাছ দিয়ে চলে গেল অভয়। আশা, একটু যা নিমির গলা শুনতে পাবে। শুনতে পেল, নিমি হাসছে। আর কথা শোনা যাচ্ছে পুরুষের গলায়। বোধহয় বিশুর গলা।

সেখান থেকে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে, ফিরে এল অভয়। অন্ধকার রাস্তা ধরে চলে গেল গঙ্গার ধারে।

সুরীনের বাড়িতে বর-যাত্রার তোড়জোড়। অভয় আজ বিয়ে করতে যাবে। এপাড়া ওপাড়ার ব্যাপার, কিন্তু তোড়জোড় কিছু কম নেই। কেবল ভামিনীর তেমন গা নেই।

দিনটি শনিবার। একবেলা কাজের দিন গেছে। তার ওপরে সুরীন সোম মঙ্গল দুদিন ছুটি নিয়েছে। বলেছে, 'কথায় বলে জন্মো মিত্যু বে'—চাট্টিখানি কথা নয়।'

সন্ধ্যাবেলাতেই কাপড়কাচা সাবান দিয়ে চান করেছে সুরীন। ধোপার বাড়িতে কাচা সাটের গলার বোতামটি পর্যন্ত এঁটেছে কষে, চাদর বেঁধেছে কোমরে। তারপর নিজের হাতে সাজিয়েছে অভয়কে।

বড় নাকি আনন্দের দিন। অনেকদিন থেকে এঁচে রেখেছিল যেমনটি, তেমনটি ঠিক করেছে। দুপুরে পুরো দুটি এক নম্বর দেশী বোতল কিনে এনেছে নিজের হাতে। সেই থেকে ঢুকু ঢুকু চলেছে, কামাই যায়নি।

তা' ছাড়া, বরযাত্রীরা এসেছে। তাদের মধ্যে সুরীনের সমবয়েরাও খেয়েছে একটু আধটু।

অভয়কে নিজে সে খেতে বলে নি। খেলে বোধহয় খুশিই হত। অভয় খায় নি। কিন্তু সাজিয়েছে নিজের হাতে। ভামিনীকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে, কয়েকবার মুখ খারাপ করেছে। তারপর সামলাতে না পেরে কষিয়েছে দু'ঘা।

ভামিনীকে মেরে না দিলেও বোতলের পদার্থের উপর তার বড় টান। সে নিজেই লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছে। মেজাজ তারো বড় ভাল ছিল না।

এ অবস্থায় তা না না না লাগত ভালই। হরি আর অনাথ মিত্তিরি থামিয়েছে। সুরীনকেই বকেছে ধমকেছে তারা। ছি ছি, এমন একটা শুভদিনে সুরীনদার কি মাথা খারাপ হয়েছে।

অভয়ের কোরা ধুতির কোঁচা কুঁচোতে কুঁচোতে সুরীন অপরাধ স্বীকার করে চলেছে, মাথা এতে খারাপ না হয় কার? তুই কেন মাগী করকে মরছিস্।

হাঁ? এই সিদিনে পারে পা' দিয়ে শৈলদিদির সঙ্গে ঝগড়া করেছে, পুকুর ঘাটে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছে মিত্তিরের সঙ্গে। আজ সারাটা দিন একটা কথা পর্যন্ত বলে নি।

ভামিনীও ফুলে উঠেছে, শৈলীরই বা গায়ে পড়ে অত মেয়েগিরি ফলাতে আমার কি আছে? ছেলে আমার, আমার বাড়িতে আছে, তাকে আমি কি বলছি না বলছি, তাতে সে মাগীরই বা টাটায় কেন?

সুরীন চীৎকার ক'রে উঠেছে, আলবৎ টাটাবে, তুই দোষ করেছিস্।

অনাথ নায়েবান থেকে আবার উঠেছে চীৎকার ক'রে, তা হলে আজ আর যে'থার দরকার নেই, তোমরা মাগ-ভাতারে লড়ালড়ি কর, হারজিৎ দেখে আমরা বাড়ি যাই।

পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছিল, তারা একবাক্যে বলেছে সবাই, তাই না বটে। এরা আরম্ভ করলে কি গো!

তারপরে থেমেছে দুটিতে। সুরীনকে সরিয়ে মেয়েরা এগিয়ে এসেছে অভয়কে সাজাতে। পাউডার মাখিয়েছে মুখে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়েছে, চোখে পরিয়েছে কাজল। কিন্তু পাউডার মাখিয়ে অভয়ের কালো রংটির যে সর্বনাশ হয়েছে, চোখ থাকলে তা হত না।

এ পাড়ায় বিয়ে বড় একটা হয় না, সকলেই ঘর করে। বিয়ের অনুষ্ঠান হলে, সেটা প্রায় ঐতিহাসিকতার পর্যায়ে পড়ে। সকলেরই কিছু না কিছু ভূমিকা থাকে। মেয়েরা সকলেই বরের-পিসী কনের-মাসী। দু' জায়গাতেই তাদের ছুটোছুটি। এই একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই অনেক-দিন ধরে সকলে এ পাড়ার কত স্মৃতিকে স্মরণ করবে। নিজেদের জীবনের অনেক কথা তাদের মনে পড়বে।

মেয়েদের হাতে অভয়কে ছেড়ে দিয়ে, সুরীন তার অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত হল। ইয়ারদের সবাইকে মদ খাওয়াল। চীৎকার চেঁচামেচির তো কথাই নেই। ভামিনীর অপেক্ষা না ক'রে নিজেই সিলভারের হাঁড়িতে ক'রে চায়ের জল দিল উনুনে চড়িয়ে। শুধু অভয়ের মনটার একদিকে আলো, আর একদিকে অন্ধকার। ভামিনী খুড়ি তাকে একবারো ডেকে কথা বলেনি সারা-দিনে। সুবালার ওখানকার সংবাদটা চাপা থাকেনি। চাপা থাকবে কি প্রকাশ পাবে, তা নিয়ে কোনো ঘোঁট পাঁচালি হ'তে পারে, সে-কথা ভাবেনি অভয় একবারো। দশজনকে লুকিয়ে যায়নি সে সেখানে। কিন্তু শৈলর কানে কথাটি ঢোকা মাত্র, ভামিনীকে ধরেছিল সে। কোন্ সাহসে ভামিনী ওই ছেলেকে সুবালার কাছে নিয়ে গিয়ে-ছিল। এই কি খুড়ির কাজ যে, ভাসুরপো'কে নিয়ে সুবালার রংখানায় গানের আসর বসাতে হয়! ওরে বুক কেঁপেছে শৈলবালার। এ সবের অর্থ কি সে বোঝে না? কিন্তু শৈল ভামিনীর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে যে, সে ভাল মানুষ অভয়কে বেগড়াবার তালে আছে?

ভামিনীও ছাড়ে নি। বলেছে, সৈতে পুড়িয়ে সব বামুন হয়েছে, রাঁড়ের আবার সতী-পনা। যা করেছে, বেশ করেছে ভামিনী।

সুরীন আর অভয় কারখানায় ছিল। ঝগড়া চলেছে সারাদিন ধরে। শৈলবালা যেখানে গেছে, সেখানেই পেড়ে বসেছে সেই বৃত্তান্ত। ফলে গোটা পাড়াটাই জড়িয়ে পড়েছে এই কথার মধ্যে। কেউ ভামিনীর, কেউ শৈলর পক্ষে।

শৈলদের ঘর-করা পাড়া আর বারোবাসর পাড়ার

অন্তর্গেশে আছে একটি বড় পুকুর। সবচেয়ে বড় রকমের আসর সেখানেই বসে। 'কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া, চান করার জন্ত সকলের দেখা শোনা সেখানেই হয়। শৈলবালা ভামিনীর সাক্ষাতে সেখানেও কথা তুলেছে। শৈল আর ভামিনীর যখন হাতাহাতি হবার উপক্রম, তখন নিমিও আর সহ্য করতে পারেনি। ঘাটের হ'য়ে সে-ই ভামিনীর দিকে এগিয়ে এসেছে। সে-ই প্রথম পাঁক ছুঁড়ে মেরেছে ভামিনীর গায়ে মুখে। ভামিনীও ছাড়ে নি।

তারপর সন্ধে-বেলায় বাড়ি ফিরেছে সুরীন অভয়। শৈলবালা সেখানে এসে আজি করেছে। সেদিনো ভামিনী কয়েক ঘা খেয়েছে সুরীনের কাছে। মাঝখান থেকে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে আছে অভয়। কিন্তু তাকে কেউ একটি কথাও বলে নি।

আজ সে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিন্তু ঝগড়াটা মেটে নি। এই ভেবে তার মনের একদিকে অন্ধকার। আর একদিকে আলো, নিমিকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এ তো তার বিয়ে নয়, দুঃখ রাখবার ঠাঁই পেতে যাচ্ছে সে।

ওদিকে শৈলর বাড়ি থেকে তাড়া আসছে ঘন ঘন। বাগ্‌দি ব্রাহ্মণ কৈলাস বরাবর এ পাড়ার সব কাজ ক'রে থাকে। সেও তাড়া দিচ্ছে এসে। লগন নাকি ব'য়ে যায়।

হরি মিত্তির, অনাথ, সুরীন, আরো জনা দশ বারো কারখানার বন্ধু অভয়কে নিয়ে এল শৈলর পাশের বাড়িতে। শৈলর বাড়িতে বিয়ে হওয়ার উপায় নেই। জোড়ে এসে উঠবে কোথায় তখন? আর তো সুরীনের বাড়িতে পাঠানো যায় না। জামাই তার নিজের ঘরেই উঠবে একেবারে। শাঁখ বাজল মালীপাড়ার আকাশ কাটিয়ে। মালীপাড়া নয়, ঘর-করাদের পাড়াই বলা যায়।

বিয়ে বাড়ির উঠোনে, বাতাবীদেবু গাছের ডালে ঝুলছে ছাগাক। এদিকে ওদিকে আরো দু' ছুটো কারবাইডের বাতি।

শৈলবালাই ডেকে বসাল সবাইকে। এস ভাই সুরীনদাদা, অনাথদা এস, হরিদাদা এস। এস, এস, আমার বাবা এস।

তীব্র খুশিতে অভয় বোবা, মোহাচ্ছন্ন। জীবনে এমন দিন সে কল্পনা করেনি। গাঁয়ের লোক কেউ নেই, তার গুরু নিতাই ভট্‌চায নেই, সেই বড় আফসোস অভয়ের।

সুরীন বরকর্তা। কিন্তু অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। চোখ রক্তবর্ণ, হাত পা'ও টলমল। প্রায় সমস্ত বুড়ো-বুড়িদের মুখেই ভুরভুর করছে মদের গন্ধ। শৈলবালাও বাদ যায় নি। গোটা পাড়ার মেয়ে পুরুষেরা এসে জুটেছে।

এমন কি সাঁঝবেলায় আসর ছেড়ে। বারো-বাসরের মেয়েরাও অনেকে ছুটে এসেছে বিয়ে দেখতে।

বিয়ে! এই একটি শব্দ আজ এপাড়া ওপাড়াকে সচকিত ক'রে তুলেছে। যেন এমন বিস্ময়কর ব্যাপার তারা আর দেখেনি, শোনেনি কোনোদিন। কোন্ এক জগত থেকে যেন তারা আজ মানুষের জগতে একটি খেলা দেখতে এসেছে।

যখন তারা মানুষ ছিল তখন হয়তো কারুর কারুর বিয়ে হয়েছিল, কারুর কারুর হয়নি। এখন সে-জগতটা তাদের কাছে একটি অস্পষ্ট ছায়ালোকের মত। গত জন্মের স্মৃতির মত।

কিছুক্ষণের জন্তে যেন সবাই হাসিমস্করা ভুলে যায়। গত-জন্মের স্মৃতিটাকে হাতড়ে ফেরে সবাই।

কেবল কৈলাসের অর্থহীন অনুস্বার বিসর্গযুক্ত মোটা উঁচু গলা তারস্বরে বাজতে থাকে।

তারপরে এক সময়ে বর কনের বাপের নাম জিজ্ঞেস করে সে।

অভয়ের পিতৃপরিচয় দেয় সুরীন নিজে। নিমির পিতৃপরিচয় দেয় শৈলবালা। দিতে গিয়ে কয়েকবার থতিয়ে যায় সে। দু' তিনটে নাম নিয়ে সে যেন হিসেব কষতে আরম্ভ করে। কৈলাসের তাড়া খেয়ে তাড়া-তাড়ি একটি নাম ব'লে ফেলে, যাকে নিমি কোনদিন দেখেনি, চেনে না। কিন্তু তা' নিয়ে কোনরকম বাক্-বিতণ্ডা হাসিমস্করা হল না।

কেবল অভয়ের প্রাণে কি এক অচিন রসের প্লাবন। নিমিকে দেখে সে প্রথমে চিনতে পারেনি। টকটকে লাল শাড়ি, হাল ফ্যাসানের জামা, সোনার সরু এক-খানি হার, কানে দুল, হাতে কাচের সঙ্গে চারগাছি

চুড়ি। নিমি, তার নিমি। বুকের কাছে নিয়ে, ভালবাসতে বাসতে মনের কথা বলবে সে তাকে। দুঃখের কথা সে-সব।

ছ'দিনাতলা থেকে বাসরে গেল বর কনে। শৈল সবাইকে খাইয়েছে মন্দ নয়। লুচি ভালা ডাল তরকারি, বৌয়ে আবার লইও।

বারো-বাসরের মেয়েরা ফিরে গেল। এই রাত্রের নগদ বেচাকেনার কারবারে বিয়ের কথাটা তাদের মনে রইল কি রইল না, সেটা খেয়াল থাকল না। সুরীনেরা বিদায় নিল। যাবার আগে দেখা ক'রে গেল অভয়ের সঙ্গে। অভয় প্রণাম করল মনে মনে, কিন্তু মন যে তার অন্তখানে, সেটা চাপা থাকল না। নেশা ধরে গেছে তার।

ঘাড়াকটার রোশনাই কমে গেছে। বাতাবীলেবু গাছটার তলায় বসে, অন্ধকার ছায়া ফেলে শৈলবালা তাকিয়েছিল মেয়ে জামাই বাসর ঘরের দিকে। জীবনের একটি বড় রকমের সাধ মিটিয়ে চোখ ফেটে তার জল এসেছে।

আর সুরীন বাড়ি গিয়ে, অন্ধকার ঘরে হাতড়ে হাতড়ে ভামিনীকে তুলে নিয়েছে বুকে। বহুক্ষণ পরে, কেমন একটি বিষাদ অবসাদে বড় ভার ভার লাগছিল বুকটা। অন্ধকারে, ভামিনীর গালে হাত দিয়ে টের পেয়েছে, জলছে সে। সুরীনের চোখ দুটিও আলা ক'রে উঠেছে। বলেছে, কাঁদিস্ নে গো ভামিনী, তোর দুঃখু বুঝি।

এ ভামিনী আর সে ভামিনী নয়। সেও ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, ছাই বোঝ তুমি। ছেলে একটা আনলে ঘরে, তাকে দিয়ে এলে আর এক ঘরে। আমি কি ছেলে বউ নিয়ে ঘর করতে পারতুম না?

—পারতিস্?

—তবে? তিন সন ধরে তোমার এই জমি ঘর মৌরস হয়েছে। এসব আমরা কাকে দিয়ে যাব?

সুরীনের কিছুক্ষণ কথা সরে না মুখে। তারপর বলল, সোম্‌সারে লোকের অভাব কি ভামিনী। কেউ না কেউ আসবে। বিয়েতে আজকে অভয়ের বাপ ব'লে পরিচয় দিয়ে এসেছি। আমার নাতী-নাতনিরা থাকবে। আমাদের ঘরে আসবার মত ছেলের অভাব নেই এদেশে। ভদ্রলোকদের ঘরে, হাসপাতালে, আঁতাকুড়ে কত পাওয়া যায়।

ভামিনী তবু সেই আগের দিনের মত সোহাগী সুরে আবদার করে, তবু ছেলে বউকে এসে থাকতে হবে ক'দিন আমার ঘরে। শৈলীকে তুমি ব'লে দিও। সুরীন তাকে আদর করে বলল, তা' দেব।

এদিকে বাসর-জাগা জমেছে ভাল। নিমিই শুধু মুখ ঘুরিয়ে আছে। এত লজ্জা হওয়ার কথা নয় নিমির। তবু আজ সবাই বিশ্বাস করে নিয়েছে, লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে সে।

অভয়কে ধরেছে সবাই গানের জন্য। জানাশোনা গান নয়। নতুন গান বেঁধে গাইতে হবে।

তাই গাইল অভয়। চোখ ঘুরিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে, হাত নেড়ে নেড়ে গাইল। মেয়েরা গড়াগড়ি গেল হেসে।

কিন্তু নিমি ফিরেও তাকাল না। এমন কি হাসল না একবারো।

মেয়েরা চলে যাওয়ার পর শৈলবালা শুয়েছিল সেই ঘরে। রাত্রি তখন প্রায় ভোর। নিমি অনেকখানি ঘুরে শুয়েছিল মুখ ফিরিয়ে। বাকী রাতটুকুনি শুধু তার মুখ-ফেরানো মূর্তি দেখে কেটেছে অভয়ের।

পরদিন কালরাত্রি গেল।

ফুলশয্যা হল শৈলর বাড়িতে। আজকের যাবৎ খরচ করল সুরীন নিজে। ভামিনীও ছিল।

আড়ি পাতাপাতি খেলার শেষে, বাইরের উৎসব যখন নীরব হল, তখন অভয় ফিরে তাকাল নিমির দিকে।

ক্রমশঃ

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনার কিছু অভাব। তবে উপরে এই প্রশান্ত ভাব বজায় রাখিয়া জগতের আয়ুধ দ্রুত সঞ্চিত হইতেছে; চরম বিপর্যয়ের মুহূর্ত হয়ত আরও নিকটবর্তী হইতেছে। গত এপ্রিল মাসে এই আন্তর্জাতিক প্রশান্তিতে কিঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে ফ্রান্সে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন, ক্রুশ্চেভ-আইসেনহাওয়ার পত্র-বিনিময়, ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহীদের ক্রমবর্ধমান পরাজয় ইত্যাদি।

ফরাসী মন্ত্রিসভার পতন—

গত এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তর আফ্রিকার সমস্যা আবার ফরাসী মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইয়াছে। গত তিন বৎসর যাবৎ উত্তর-আফ্রিকা-সমস্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংঘাতে ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলের উত্থান-পতন ঘটিতেছে। পাঁচ মাস পূর্বে বুর্জোয়া-র‍্যাডিক্যাল মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইয়াছিল আলজেরিয়া সমস্যা। গত কয়েক মাসে গাইয়ার মন্ত্রিসভা এই সমস্যাকে জটিল করিয়াছেন। তাঁহাদের নীতির ফলে অপেক্ষাকৃত শান্ত টিউনিসিয়াও গা ঝাড়া দিয়া বসিয়াছে।

গত জানুয়ারী মাসে টিউনিসিয়ার পূর্ব সীমান্তবর্তী সাকিয়েৎ-সিদি নামক গ্রামে ফরাসী বিমানের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে টিউনিসিয়া জাতি-সঙ্ঘে অভিযোগ করিয়াছিল। তাহার অভিযোগ উপস্থাপিত হইবার পরই ফ্রান্সের পক্ষ হইতে এই পাল্টা অভিযোগ করা হয় যে, টিউনিসিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট আলজেরিয়ান্ বিদ্রোহীদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। জাতি-সঙ্ঘ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক কমিশনের উপর আপোষ-মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অনমনীয় মনোভাবের জন্য মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ইঙ্গ-মার্কিণ মিশনের মীমাংসা-প্রয়াস ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইলে প্রেসিডেণ্ট-আইসেনহাওয়ার মঃ গাইয়ারকে জানান যে, ইঙ্গ-মার্কিণ কমিশনের কাজ যাহাতে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা যেন করা হয়। ইহার পর, ফ্রান্কো-টিউনিসিয়ান সম্পর্ক পুনঃ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনা চালাইবার এক প্রস্তাব ফরাসী জাতীয় পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল। বামপন্থী প্রতিনিধিদের সম্মিলিত বিরোধিতায় প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়। ইহার পর স্বভাবতঃ গাইয়ার মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করেন। অদৃষ্টের পরিহাস—পাঁচ মাস পূর্বে বাম ও দক্ষিণপন্থীরা একত্রে মঃ গাইয়ারকে প্রধান মন্ত্রিত্বের গদিতে বসাইয়াছিল; আবার সেই বাম ও দক্ষিণপন্থী শক্তিই যে পথে হইতে তাঁহাকে টানিয়া নামাইল।

উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে ফরাসী নীতি আমেরিকাকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলিয়াছে। আমেরিকার নিকট হইতে ফ্রান্স যে আর্থিক সাহায্য পায়, তাহার বৃহত্তর অংশ যে আলজেরিয়ার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। "স্কাটোর" জন্য সংরক্ষিত এবং "স্কাটোর" ব্যয়ে পরিপুষ্ট সমরসজ্জা ও সেনাবাহিনী এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। আমেরিকার সম্মতিতে (অন্ততঃ তাহার আপত্তি না থাকার জন্যই) "স্কাটোর" সমরায়োজন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে। সুতরাং, ফ্রান্সের আচরণে আমেরিকা উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহা ছাড়া, "স্কাটোর" সমরায়োজনে উত্তর-আফ্রিকার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; "স্কাটোর" বহু ঘাঁটী এই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে যদি অশান্তি চলিতে থাকে, তাহা হইলে উত্তর আতলান্টিক চুক্তি সংস্থার অভ্যন্তরে বড় রকমের দুর্বলতা থাকিয়া যায়। অতএব, ফ্রান্স কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না। যে নীতি সে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহা সমাধান হইবার কোনও সম্ভাবনাও নাই। বরং, ফরাসী নীতির জন্য বন্ধুত্বাপন্ন অন্য আরব রাষ্ট্রগুলিও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে আমেরিকার উৎকণ্ঠার কারণ ইহাই। কিন্তু তাহার অসুবিধা এই যে, ফ্রান্সের উপর বেশী চাপ দেওয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়। সুয়েজ সঙ্কটের সময় আমেরিকা যেরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, সেরূপ নীতি আলজেরিয়া সম্পর্কে গ্রহণ করা চলে না। ফ্রান্সের শাসনক্ষমতা যাহাতে বামপন্থীদের হাতে চলিয়া না যায়, সেদিকে আমেরিকাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। সে যদি ফ্রান্সকে ঋণ দিতে অসম্মত হয়, অথবা অন্য কোনরূপ অর্থনৈতিক চাপ দেয়, তাহা হইলে ফ্রান্সের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের পক্ষে শাসনক্ষমতা হাতে রাখা অসম্ভব হইবে। বামপন্থী সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের মিলনে পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে ফ্রান্সের এতাবৎকাল অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিবে।

ইন্দোনেশিয়ার গৃহ-যুদ্ধ—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সুমাত্রায় বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইন্দোনেশিয়ায় যে গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্টের পরাজয়ে সে যুদ্ধের অবসান নিকটবর্তী হইয়াছে। এই মে মাসের প্রথমে পশ্চিম সুমাত্রায় বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র বুকিট টিঙ্গি সরকার পক্ষের হস্তগত হইয়াছে; সরকারী সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের সর্বশেষ ঘাঁটী বাটু দাকরের দিকে অগ্রসর হইতেছে; সেসিবিস্ দ্বীপে বিদ্রোহের প্রায় অবসান হইয়াছে।

সুমাত্রার বিদ্রোহীরা কোথ হইতে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য এতদিন পাওয়া যায় নাই। গত এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরের একখানি পত্রিকার বুকিট উজিহিত সংবাদদাতা এই সম্পর্কে বিস্তারিত ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "অস্ত্রগুলি যে আমেরিকার তৈয়ারী, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ আমি নিজের চোখে উহা দেখিয়াছি। তবে, কোথা হইতে ঐগুলি আসিয়াছে এবং কে ঐগুলি বিদ্রোহী এলাকায় নিক্ষেপ করিয়াছে, সে কথা স্বতন্ত্র। কেহ কেহ মনে করেন যে, জেনারেল ফ্রেডার এয়ার সার্ভিস নামক বেসামরিক পরিবহন কোম্পানী এই কাজ করিয়াছে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঐ কোম্পানী এই ধরণের কাজে হাত পাকাইয়াছে।" সংবাদদাতার মন্তব্য—"যখন সুমাত্রার আট হাজার সৈন্যকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার উপযোগী প্রচুর মার্কিণ অস্ত্র বিদ্রোহী গভর্নমেন্টকে সরবরাহ করা হইয়াছে। বিদ্রোহী গভর্নমেন্টের প্রধান মন্ত্রী মিঃ সহরুদ্দীন আজ এই কথা এখানে প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের যত অস্ত্র ও গোলাগুলি প্রয়োজন, উহা তাহাদের আছে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইন্দোনেশীয় গভর্নমেন্ট সম্প্রতি আমেরিকার নিকট অস্ত্র চাহিয়া পাঠান নাই। ইহার পর ইন্দোনেশীয় গভর্নমেন্ট অস্ত্রের জন্য কম্যুনিষ্ট শিবিরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইতিমধ্যে কিছু বিমান ও অন্যান্য অস্ত্র কম্যুনিষ্ট শিবির হইতে ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছিয়াছে। প্রত্যেক দেশের আইনসঙ্গত গভর্নমেন্ট প্রয়োজনমত অস্ত্র যে দেশ হইতে ইচ্ছা সংগ্রহ করিতে পারেন। অথচ, আমেরিকা কেন ইন্দোনেশীয় গভর্নমেন্টকে অস্ত্র দিল না, সে সম্পর্কে মিঃ ডালেসের বৈফিয়ৎ—মার্কিণ করদাতার টাকা ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে ব্যয় হইবার আশঙ্কা যখন নাই, তখন ২৫-৩০ কোটী ডলার মূল্যের অস্ত্র দিয়া সে কি করিবে? ইহা ছাড়া, তিনি বলেন যে, কি ইন্দোনেশীয় গভর্নমেন্ট, কি বিদ্রোহী পক্ষ কাহাকেও অস্ত্র সরবরাহ করাটা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করে না। আমেরিকার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া ইন্দোনেশিয়া যখন কম্যুনিষ্ট শিবিরের দ্বারস্থ হয়, তখন মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগ ইহার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কৌতূহলের বিষয় এই যে, যদি সুমাত্রার আট হাজার বিদ্রোহী সৈন্য মার্কিণ অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার জন্য কি মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগের, কি পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেসের কোনও দুঃখ বা লজ্জা নাই। মিঃ ডালেসের মতে ইন্দোনেশিয়ার বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কাহাকেও সমর্থন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু আট হাজার বিদ্রোহী সৈন্যকে সজ্জিত করিবার উপযোগী আধুনিক মার্কিণ অস্ত্র কি মিঃ ডালেসের এবং তাঁহার মত অন্য সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির অজ্ঞাতেই ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছিয়াছে এবং ইহা তাহাদের একেবারে ঔদাসীন্যের ব্যাপারে? আমেরিকা ব্যক্তি-স্বাধীনতার দেশ, সত্য। কিন্তু সেখানকার অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কি এতই স্বাধীনতা যে গভর্নমেন্টের অজ্ঞাতে ও সরকারী নীতির বিরুদ্ধে তাহারা যেখানে ইচ্ছা অস্ত্র প্রেরণ করিতে পারে? সুমাত্রার বিদ্রোহী এলাকার মত মালয়ের জঙ্গলেও যদি মার্কিণ অস্ত্র আকাশ হইতে পড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেও মার্কিণ গভর্নমেন্ট কি উদাসীন থাকিবেন?

রাজনৈতিক পত্রালাপ—

গত এপ্রিল মাসে রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের লিখিত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনায়কদের গুরুত্বপূর্ণ পত্র-বিনিময় হইয়াছে। এপ্রিল মাসের প্রথমে মঃ ক্রুশ্চেভ প্রধান মন্ত্রীরূপে সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিল্যানের নিকট পত্র লেখেন। এই পত্র দুইখানিতে বৃটেন ও আমেরিকাকে রুশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরীক্ষামূলক পরমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। মঃ ক্রুশ্চেভ জানান যে, পরমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যে সমস্যা জনসাধারণকে সন্ত্রাসগ্রস্ত উৎকণ্ঠিত করিয়াছে, তাহার সমাধান হইবে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস সহযোগিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে উহা সহায়ক হইবে। মঃ ক্রুশ্চেভ ইহাও জানান যে, তাঁহাদের এই আবেদন অগ্রাহ্য হইলে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করিয়া পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে তাহারা বাধ্য হইবেন। এই পত্রের উত্তরে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার লেখেন,—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার: প্রচণ্ডতম কতকগুলি বিস্ফোরণ শেষ করিবার পর বড় বড় শিরনামায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, আর বিস্ফোরণ ঘটানো হইবে না; তাহার পরই ছোট শিরনামায় বলা হইল যে, তোমাদের (আমেরিকার) অমুক দিন হইতে আয়োজিত বিস্ফোরণ যদি বন্ধ না হয়, তাহা হইলে কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হইবে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মন্তব্য করেন —পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণটা তো সমস্যা নয়—সমস্যা হইল পারমাণবিক অস্ত্র; সুতরাং আসুন পরমাণবিক অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শান্তিমূলক কার্যে পরমাণুর ব্যবহারে আমরা প্রবৃত্ত হই। এই প্রসঙ্গে তিনি বিমানযোগে দুই পক্ষের রাজ্যাঞ্চলের সমরায়োজন পর্যবেক্ষণের পূর্ববর্তী প্রস্তাবটি উল্লেখ করেন। মহাসমুদ্রকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে বলেন। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে মঃ ক্রুশ্চেভ এই পত্রের জবাব দিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যেমন বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সম্পর্কে মঃ ক্রুশ্চেভের প্রস্তাবের সোজাসুজি উত্তর দেন নাই, তেমনি পরমাণবিক অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শান্তিমূলক কার্যে পরমাণুর ব্যবহার সম্পর্কে আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাবটি ক্রুশ্চেভ এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি কতকটা বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছেন যে, আমেরিকাও তো তাহার একবারের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শেষ হইবার পর বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিতে পারিত। বিমানে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, রুশ বিমান যদি আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উড়িতে থাকে এবং মার্কিণ বিমান যদি সোভিয়েট রুশিয়া প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কোনও দেশের জনসাধারণই স্বস্তি বোধ করিবে না। আর, সামরিক উদ্দেশ্যে মহাসমুদ্রের ব্যবহার বন্ধ করিতে হইলে আমেরিকার বৈমেশিক ঘাঁটিগুলির অবসান প্রয়োজন।

ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

দুই পক্ষের উত্থাপিত যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হইবে যে, যুক্তিরই অধিকতর সঙ্গত মনে হইবে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ঠিকই বলিয়াছেন—পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সমস্যা নয়—প্রকৃত সমস্যা হইল পারমাণবিক অস্ত্র। কিন্তু সেই পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করিবার প্রথম সোপান হিসাবে বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। সোভিয়েট রুশিয়া অনেকগুলি বিস্ফোরণ শেষ করিবার পর বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে সত্য। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, সিদ্ধান্তটী তাহার একপাক্ষিক। ইতিপূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একবার তাহার কতকগুলি বিস্ফোরণ শেষ হইবার পর দুই পক্ষের বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার প্রস্তাব করিয়াছিল,—সে একটী চাল বন্ধ রাখিতে প্রস্তুত হয় নাই। অবশ্য, বিস্ফোরণ বন্ধ করা সম্বন্ধে সোভিয়েট রুশিয়ার সিদ্ধান্তের নৈতিক মূল্য এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের আমেরিকার স্বপক্ষে বিস্ফোরণ হইতে বন্ধ রাখার কথা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আরোজিত বিস্ফোরণ শেষ হইবার পরই সোভিয়েট রুশিয়া যদি তাহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তাহা হইলে তখন প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, বিশ্বের জনমতের সমক্ষে আণবিকাস্ত্রে হের করিবার উদ্দেশ্যে সে একটা চাল দিয়াছে,—মানব জাতির প্রতি বস্তুত অথবা শান্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহে সে উদ্বুদ্ধ হয় নাই। তাই, এখন পরমাণু বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার একপক্ষীয় সিদ্ধান্তের জন্য যে সমালোচনার প্রশংসা পাইতেছে। পরমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করিবার প্রথম ইতিপূর্ব্বে বন্ধ করার আলোচিত হইতেছে কিন্তু অস্ত্র নির্মাণ নির্মাণ করিবার এবং মজুত অস্ত্র নষ্ট করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই পক্ষ একমত হইতে পারেন নাই। মজুত অস্ত্র আমেরিকার প্রধান; সুতরাং মজুত অস্ত্র নষ্ট করিবার ব্যবস্থা না হইলে শুধু অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ রাখার প্রস্তাবে সোভিয়েট রাশিয়া সম্মত হইতে পারে না। তাহার পর, বলাবাহুল্য সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রশ্ন। বর্ত্তমানে সোভিয়েট রুশিয়াকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের যে ঘাঁটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এই সকল ঘাঁটী হইতে অল্পসংখ্যক বিমান মুহূর্ত্তের মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়াকে আঘাত করিতে পারে। আক্রমণ শক্তিতে পাশ্চাত্য পক্ষের এই প্রাধান্যের একমাত্র ভারসাম্যকারী উত্তর সোভিয়েট রুশিয়ার হাইড্রোজেন-বোমা বা মহাবোমা। সুতরাং, সামরিক উদ্দেশ্যে মহাবোমার ব্যবহার বন্ধ করিতে হইলে সোভিয়েট রুশিয়া সঙ্গতভাবেই এই দাবী উত্থাপন করিতে পারে যে, তাহাকে পরিবেষ্টনকারী ঘাঁটিগুলি উচ্ছেদ করিতে হইবে। বিমানযোগে পর্য্যবেক্ষণের জন্য আইসেনহাওয়ারের পুরাতন প্রস্তাবটি সম্বন্ধে ক্রুশ্চেভ, যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবেচনার বিষয়। দুই পক্ষের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা যদি না কমে, তাহা হইলে বিমানযোগে পর্য্যবেক্ষণের ও চিত্র গ্রহণের ব্যবস্থার উদ্ভাবনা দ্বারা পাইবে বলিয়া মনে না করাই সঙ্গত।

রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের প্রস্তুতি—

গত অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন আহ্বানের যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে গত ছয় মাস ধরিয়া বিতর্ক চলিতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদ—এই সম্মেলনের প্রস্তুতির পর্য্যায়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৈঠক সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সম্মত হইয়াছেন; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ফরাসী রাষ্ট্রদূত পৃথকভাবে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মিঃ গ্রোমিকোর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে এখন রাজী।

আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সোজাসুজি আলোচনার জন্য দুই পক্ষের রাষ্ট্রপ্রধানদের মিলিত হইবার প্রস্তাব প্রথম আসিয়াছিল সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে। রাষ্ট্রপ্রধানগণ প্রত্যক্ষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলির জটিলতা কাটিয়া যাইবে, এবং মীমাংসার পথ আপনা হইতে সুগম হইবে বলিয়া সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ধারণা। বিশেষতঃ শান্তির জন্য প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের আন্তরিকতায় সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস আছে। কিন্তু মিঃ ডালেস্ এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণার অন্য পাণ্ডারা তাঁহাদের প্রেসিডেন্টকে অসাবধানে রুশ ভল্লুকের মুখে সামনে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নন। বার বৎসর পূর্বে ইল্টা সম্মেলনে দরদী বিশ্বাসী মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিন্ কূটনৈতিক চালবাজীতে ঠকাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের ধারণা। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন। তাঁহাদের কথা—রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন ডাকিতে হয়, পরে ডাকা যাইবে; তাহার পূর্ব্বে সমস্ত বিষয় পররাষ্ট্র সচিবের পর্য্যায়ে আলোচনা করিয়া সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন সেই সিদ্ধান্তে চেরা কাটিয়া সম্মতি জানাইবে মাত্র,—কোনও অমীমাংসিত বিষয় আলোচনার সূত্রপাত রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে হইবে না। দুই পক্ষের মতিগতীর এই মূলগত বৈপরীত্যের জন্য এই ব্যাপার লইয়া আজ তর্ক খুব টান্‌টান্ হ্যাঁচড়া চলিতেছে।

ব্রত

পরেশ রায়চৌধুরী

না, দোষ বোধ হয় কারো নয়। অমলেরও নয়, অনুপমারও নয়। ভাড়াটে বাড়ীতে থাকতে গেলে অমন ঘটনা হয়ত হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু তবুও আজকের এই ঘটনার জন্য নিজের উপর ভীষণ রাগ হল অনুপমার। কোন মতেই ও যেন আজ নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না।

কি দরকার ছিল ওর নীচে নেমে কলতলায় স্নান করতে আসবার! আজও তার তোলা জলে স্নান করলে হত। আর যদিও বা ও এল, তাহ'লে ও যথেষ্ট পরিমাণে সাবধান হল না কেন? না, ভাড়াটে বাড়ীর বে-আবরু কলতলায় স্নান করতে এসে তার মত একজন বয়স্থা মেয়ের এতখানি বেহুঁস হয়ে পড়া মোটেই উচিত হয় নি। ছি, ছি—ওকে কি ভাবল অমল! হাঁ, নির্জ্জন দুপুর কেউ কোথাও নেই দেখে আজ একটু দুঃসাহসের কাজ করেছিল অনুপমা। একেবারে সরাসরি কলতলায় নেমে এসেছিল। আর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গায়ের কাপড় আলগা করে দিয়ে পিঠে-ঘাড়ে সাবান মাখছিল। এমন সময় অমল স্নান করতে এসেছিল। অমল এসেছিল এক রকম নিঃশব্দেই—অনুপমা অমলের উপস্থিতি টের পাইনি। হঠাৎ দুজনের চোখাচোখি হল। লজ্জা পেয়ে অমল অবশ্য আর দাঁড়ায়নি। মুখ নীচু করে চটপট চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। অমল ত, ওকে বিবস্ত্র বেশে দেখে ফেলেছে।

অমলকে অবশ্য জানে অনুপমা। পাশের ঘরের ভাড়াটে বাসিন্দা নতুন মাসীমার ছেলে অমল। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! অমলের সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। অমলের সঙ্গে কথা বলা ত দূরে থাক, কোনদিন অনুপমা অমলের সামনে পর্য্যন্ত বার হয়নি। চলে যাবার সময় দু-একদিন অমলের পিছন দিকটা শুধু তার নজরে পড়েছে। তা থেকেই অনুপমা বুঝে নিয়েছে—অমল সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। নতুন মাসীমার মুখে শুনেছে—অমল নাকি আর্টিষ্ট, ছবি আঁকে। কিন্তু কি ধরণের ছবি আঁকে—সেই সম্বন্ধে অনুপমার মনে কোন কৌতূহল হয়নি।

না, অনুপমার বোধ হয় আর কোন কিছুতে কৌতূহল জাগে না। ওর জীবনে বোধ হয় সব কৌতূহলেরই একে একে অবসান হয়েছে। তাই সব কিছু থেকে অনুপমা নিজেকে একেবারে নির্ম্মমভাবে সরিয়ে এনেছে। অনুপমা জেনেছে—যে মেয়ের রূপ নেই বলে ক'নে দেখার আসরে বসে পুরুষের চোখে সাত-সাতবার নাকচ হয়ে গেছে, তার আবার জীবনের দাম কী? কোন কিছুতে কৌতূহল প্রকাশ করে না। নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে নিজের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছে। পুরুষের হৃদয়হীন ব্যবহারে আর নারীত্বের অবমাননায়—অপরাজিতার মত বিষাক্ত ব্যথায় নীল হয়ে গেছে অনুপমা। আজকাল ও যেন বড় শান্ত হয়ে গেছে।

নতুন মাসীমার সঙ্গে অনুপমারা নিজে থেকে পরিচয় করে নি। পরিচয় করবে কী? নিজেদের ব্যথায় নিজেরাই যে মুহ্যমান। অনুপমার দুর্ভাগ্য দেখে সমগ্র পরিবারটা ঝিমিয়ে পড়েছিল।

এখানে আসার দিন-তিনেক পরে একদিন দুপুরবেলা আলাপ করবার জন্যে নতুন মাসীমাই নিজে থেকে ওদের ঘরে এলেন। অনুপমার মাকে বললেন: তোমাদের কাছে এলাম ভাই, একটু দেখো।

অনুপমার মা তাড়াতাড়ি নতুন মাসীমাকে বসতে আসন দিলেন। হাসি মুখে জবাব দিলেন: দেখব বৈকি দিদি, দেখব না? এক জায়গায় আছি যখন।

: এই ত আপনকনের মত কথা হল। নতুন মাসীমা হাসিমুখে আসনে বসলেন।

অনুপমা তখন ঘরে ছিল না। খানিক পরেই অনুপমা এসে ঘরে ঢুকল। অনুপমার মা পরিচয় করিয়ে দিলেন: তোমার নতুন মাসীমা হন, অনু। পাশের ঘরে এসেছেন। প্রণাম কর।

নতুন মাসীমা কিন্তু অনুপমার প্রণাম নিলেন না। অনুপমার পায়ে হাত দেবার আগেই নতুন মাসীমা অনুপমাকে কোলে টেনে নিলেন। অনুপমার চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহে বললেন: কুমারী মেয়ের পায়ে হাত দিতে নেই মা, ওতে পাপ হয়। আমি তোমাকে এমনিতেই আশীর্বাদ করছি। তোমার ভাল বর-বর হোক।

কথার শেষে নতুন মাসীমা মিষ্টি করে একটু হাসলেন! নতুন মাসীমার হাসিটা ভারী ভাল লাগল অনুপমার।

সেদিন নতুন মাসীমা ওদের ঘরে অনেকক্ষণ ছিলেন। নানা-বিষয় নিয়ে ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। কথায় কথায় প্রকাশ পেল একমাত্র ছেলে অমলকে তিনি অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছেন। কিন্তু বিধি বাদ সাধলেন। তাই স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে তাঁকে চলে আসতে হল। কথার শেষে নতুন মাসীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন! নতুন মাসীমার দুঃখ ওদের স্পর্শ করল।

তারপর দিনে দিনে যা-খাওয়া এই দুই পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্টতা জমে উঠেছে। বরং অনুপমার সঙ্গেই যেন নতুন মাসীমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বেশী। নতুন মাসীমা অনুপমাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করেন। ঘরে ভাল কিছু রান্না হলে অনুপমাকে না খাইয়ে নতুন মাসীমা স্বস্তি পান না। কারণে অকারণে তিনি অনুপমাকে ডেকে পাঠান। অনুপমা না গেলে ব্যথা পান: অভিমান করেন। তাই আজকাল দুপুর বেলাটা অনুপমা নতুন মাসীমাকে রামায়ণ পড়িয়ে শোনায়, কোনদিন বা নতুন মাসীমার মাথার পাকা চুল তুলে দেয়।

সেদিনের সে ঘটনার পর আজ দু'দিন হল অনুপমা নতুন মাসীমার ঘরে অনুপস্থিত। না, সে যে ইচ্ছা করে যায় নি এমন নয়। মানে—যেতে পারেনি। কোথা থেকে একটা লজ্জা এসে অনুপমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। তাই অনুপমা যায় নি।

আজ দুপুরবেলা অনুপমা এসে আবার স্বাভাবিকভাবে নতুন মাসীমাকে ডাকল: মাসীমা।

নতুন মাসীমা ছেলের ঘরে শুয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি সাড়া দিলেন: কে অনুপমা? এই যে অমুর ঘরে শুয়েছি মা, এখানে আয়।

অনুপমা ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকল।

নতুন মাসীমা উঠে বসে হাসিমুখে অনুপমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। জিগ্যেস করলেন: আজ দুদিন আসিস্ নি কেন মা? বলত? সময় পাসনি, না মাসীমার উপর রাগ করেছিস্?

অনুপমা মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলল: রাগ করব কেন মাসীমা, এমনি সময় পাইনি।

: তা-ত হবেই। সায় দিলেন নতুন মাসীমা: সংসারের খুঁটিনাটি কাজ ত কম নয়। আয়, বস। নতুন মাসীমা অনুপমাকে পাশে বসবার জন্য আহ্বান জানালেন।

নতুন মাসীমার পাশে বসতে গিয়ে টেবিলের উপর নজর পড়ে যেতে হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল অনুপমা। নতুন মাসীমার বোধ হয় এই সূক্ষ্ম বিষয়টার প্রতি নজর পড়ল না। তাই নতুন মাসীমা কিছু জানতে পারলেন না। অনুপমাও বড় রকমের একটা লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু নতুন মাসীমা যদি জানতে পারতেন তা হলে কি হত? অনুপমা ভাবতে লাগল। কতবড় লজ্জা সে আজ পেত। ভগবান ওকে আজ রক্ষা করলেন। অনুপমা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল।

কিন্তু চমকে উঠবার মত ব্যাপারই যে। অন্ততঃ অনুপমার মত ভীরু মেয়েরা ত চমকাবেই। আশ্চর্য্য, শিল্পী অমল কিনা শেষ পর্য্যন্ত তারপত্ত একজন অরূপা মেয়ের ছবি এঁকেছে!

ছবিটা অবশ্য এখনও শেষ হয়নি। অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় টেবিলের উপর পড়ে আছে। তা না হোক, তবে ছবিটা যে অনুপমার, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। সেদিন অমল অনুপমাকে যেভাবে বসে সারাক্ষণ দেখেছিল—ঠিক সেই ভাবেই এঁকেছে অমল। একটুও পরিবর্ত্তন করেনি। সেই ঘাড়-পিঠ খোলা, এলোমেলো বেশবাস। দেহের উর্দ্ধাংশে আর হাতে শুধু রং দিয়েছে অমল। নীচেটা

এখনও রঙ দেয়নি। হয়ত রং দেবার সময় পায়নি ও। কিন্তু তাতেই ছবিটা সুন্দর হয়েছে, আর প্রতিকৃতিটা অনুপমার বলে চেনা যাচ্ছে।

কিন্তু ওর ছবি আঁকতে গেল কেন, অমল? অমল পাগল নাকি? হঠাৎ একটা চিন্তার ঝড় অনুপমার মনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। আর অমলের উপর কেমন রাগ হল অনুপমার।

অনুপমাকে আড়ষ্ট হতে দেখে মাসীমার যেন এক সময়ে খেয়াল হল। শংকিত হয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে রে অনু, হঠাৎ অমন চুপ হয়ে গেলি কেন? শরীরটা কী ভাল নেই তোর?

: না মাসীমা, আমার ত কিছু হয়নি, একটু থতমত খেয়ে জবাব দিল অনুপমা। আপনি ঘুমোন, আমি আপনার চুল তুলে দিই, বলে অনুপমা যেন জোর করে নতুন মাসীমার মাথাটাকে নিজের কোলের দিকে টেনে নিল।

খানিক পরেই নতুন মাসীমার নাক-ডাকার শব্দ শোনা গেল। নতুন মাসীমা ঘুমিয়ে পড়লেন। কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনুপমা আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর পায়ে পায়ে সে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল—যেখানে অমল ছবিখানাকে রেখে দিয়েছে।

ছবির উপর ঝুঁকে পড়ল অনুপমা।···অমলের শিল্প-নৈপুণ্য দেখে ও যেন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। সত্যি, ওকে বড় সুন্দর করে এঁকেছে অমল। অবিকল তার মুখ। কেমন ভাসা ভাসা চোখ। ধনুকের মত টানা ভ্রু-যুগল। শিল্পী অমল তার শিল্পের প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে অনুপমাকে যেন জয় করে ফেললে। তাই খানিক আগে অমলের উপর অনুপমার যে বিদ্বেষ জমে উঠেছিল—এখন যেন সে বিদ্বেষ আর তার নেই। মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুপমা শুধু ছবিখানা দেখে যেতে লাগল।

কিন্তু খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর অনুপমার মনে হল—নাঃ, অমল যেন তাকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সে'ত সত্যিই অত সুন্দর নয়। না, মোটেই সে সুন্দর নয়। তার গায়ের রঙ কাল। আর এই কারণেই সে কনে দেখার আসরে বসে পুরুষের চোখে বার বার নাকচ হয়ে গেছে। অমল কি চোখে ওকে দেখলে?

ভাবতে গিয়ে অনুপমার মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠে। বুদ্ধি-বৃত্তি ওর গুলিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অনুপমা।···

এরপর নিজের মনের সঙ্গে কদিন ধরে অবিরাম সংগ্রাম চলল অনুপমার। অবশেষে সে এই সিদ্ধান্ত করল—হোক সে সুন্দরী, কিংবা কুরূপা, তা বলে তার ছবি আঁকার কোন অধিকার অমলের নেই। সে নিজে গিয়ে অমলের কাছ থেকে একদিন ছবিখানা চেয়ে নেবে। তারপর তার সামনেই সে ছবিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলবে। দেখবে অমল ওকে কি বলে। সেই সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকে অনুপমা।

অবশেষে সত্যই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগ এসে গেল অনুপমার। নতুন মাসীমা সেদিন বাড়ী ছিলেন না। ভাই-পো বেড়াতে এসেছিল, তাকে নিয়ে কালীঘাটে কালী দেখতে গিয়েছিলেন। অমল বাড়ী ছিল। এই সুযোগে অনুপমা সরাসরি অমলের ঘরে এসে হানা দিল।

অনুপমাকে দেখে অমল যেন একটু বিব্রত হল। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল: "আর কাছে এসেছেন বুঝি? কিন্তু মা-ত বাড়ী নেই। খানিক আগেই মা বেরিয়ে গেলেন। কালীঘাটে গেলেন।"

: না, আপনার কাছেই এসেছি। অমলের চোখে চোখ রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে গেল অনুপমা। কিন্তু তার গলাটা কেমন কেঁপে গেল। অবশেষে অনুপমা বলিল, "আমার ছবিটা দিন, নিতে এলাম।"

: ছবি! অনুপমার কথায় অমলের কণ্ঠে বিস্ময় জাগল। জিগ্যেস করল, "কোন ছবির কথা বলছেন বলুন তো?"

: কেন, আমার ছবি। দৃঢ়কণ্ঠে অনুপমা এবার বললে: এই ত' কিছুদিন আগে আপনি যে ছবিটা আঁকছিলেন, সেই ছবি। ওই ত' ছবিখানা এখনও টেবিলের উপর রয়েছে। অনুপমা এগিয়ে গিয়ে ছবিখানা অমলকে দেখিয়ে দিলে।

অনুপমার রকম দেখে অমল এবার না হেসে থাকতে পারল না। অমল হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে অমল বলল: ওঃ তাই বলুন! ওই ছবিটার কথা বলছেন? কিন্তু আপনি ভুল করেছেন অনুপমাদেবী। স্বর পালটে শান্ত স্বরে অমল বলে যেতে লাগল: ও ছবি আপনার নয়। আপনাকে দেখে আমি ও ছবিখানা আঁকবার প্রেরণা পেয়েছিলাম বটে, তবে ওটা একটা বিলিতি সাবানের বিজ্ঞাপনের ছবি। জানেন ত' কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট আমি। এই করেই আমি সংসার চালাই।

অনুপমার পায়ের নীচেকার মাটিটা সরে গেল নাকি?···

লক্ষ্মী কমলা!

আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায়!

এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না। কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া দরকার খাঁটী আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়

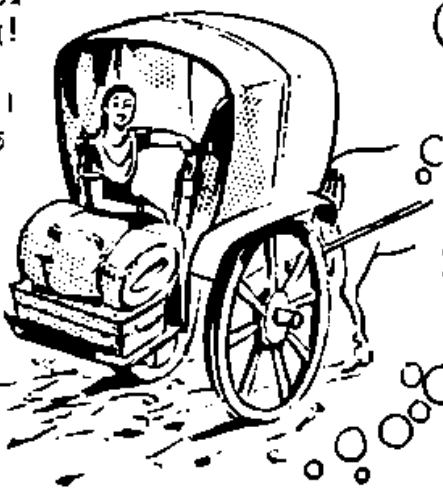

জামাকাপড়েরও ক্ষতি হয়না এবং হাতেরও কোন অনিষ্ট হয়না।" সে সানলাইট সাবান এনে আমায় দেখাল যে সানলাইটে কাচা জামাকাপড় কত পরিষ্কার হয়। সত্যি, একটু ঘষলেই ফেণা হয় কত। আমি যখন ওকে কাপড়কাচার জিনিষটা দিলাম, কমলা বলল—"না, পিসীমা, সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। শুধু একটু সাবান ঘষে দাও প্রচুর ফেণা হবে এবং জামাকাপড় বিনা আছাড়েই পরিষ্কার হবে।"

সত্যিই কাচার পরে কাপড়জামা এত সাদা আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে আমার যেন আর শুকোবার জন্যে তর সইছিল না; তখনই পরতে ইচ্ছে করছিল। কমলা সত্যিই চালাক মেয়ে! সে বলে যে সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় এত সাদা আর উজ্জ্বল হয় তার কারণ সানলাইটের প্রচুর ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।"

সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বাড়ীটা চালাতে হয়তো আমাকেই। সেইজন্যে ওকে আমি আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—"কিন্তু সানলাইটের দাম যে বড্ড বেশি।" কমলা একগাল হেসে বলল—"পিসী, ওটা তোমার মিথ্যে ভয়!" আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন কমলা বলল: "একটা সানলাইট সাবানে একগাদা কাপড় কাচা যায়। সানলাইট দিয়ে জামাকাপড় কাচলে সত্যিই খরচ বাঁচে।" সানলাইট সাবান সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ আমার খুব ভাল লাগে। সানলাইট দিয়ে কাচার পরে জামাকাপড়ের গন্ধটাই কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে আর এর ফেণা হাতকে রাখে কোমল ও মসৃণ।

কমলা বাড়ীতে আসার পরেই আমি প্রথম জানলাম যে পরিবারের সমস্ত জামাকাপড় যেমন আমার স্বামীর সার্ট, পায়জামা, তোয়ালে, ন্যাপকিন, বিছানার চাদর, পর্দা, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়—এক কথায় আমার ছোটবড় সব জামাকাপড় কাচার জন্যে সানলাইটের থেকে ভাল সাবান আর কিছুই নেই। এটি যে শুধু জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে তাই নয়; সানলাইটের একটি সাবানেই এক গাদা জামাকাপড় কাচা যায়। এতে পয়সাও বাঁচে আর পরিষ্কার জামাকাপড়ও পরা হয়।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

B. 264 B-X52 BG

নারদ-স্মৃতি

শ্রীফ'

সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর পি-সি লাহিড়ী প্রকাশিত ও কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট প্রেসে মুদ্রিত নারদ-স্মৃতি নামক একখানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহা টীকানুগত ভাষানুবাদ সম্বলিত এবং ভাটপাড়ানিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ তাহার সম্পাদক ও অনুবাদক। গ্রন্থের মূল্য সাড়ে তিন টাকা। প্রথম ৬ পৃষ্ঠায় স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের মুখবন্ধ, ২ পৃষ্ঠা বিষয় সূচী, ৬৮ পৃষ্ঠা দেবনাগরী অক্ষরে মূল গ্রন্থ এবং শেষে ১০১ পৃষ্ঠাব্যাপী অনুবাদ। অনুবাদ বাংলা অক্ষরে ও বাংলা ভাষায় লিখিত।

মুখবন্ধের প্রথমেই পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন —"অতীতে কি ছিল এবং বর্তমানে তাহার কি পরিণতি হইয়াছে, ইহা পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিবার আগ্রহ মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই অতীতের স্মৃতি যত পুরাতন হয়, তাহার অনুশীলন তত শ্রেয় হয়। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত সভ্য জাতির শাসনতন্ত্র পরিচালনার মধ্যে পুরাতত্ত্বের পুনরালোচনার (রিসার্চের) জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। অতীতকালে সহস্রাধিক বর্ষের পরাধীনতার মধ্যেও ভারতে ইংরাজের রাজত্বকালে উহার ব্যতিক্রম ছিল না।

"আজ কয়েক বৎসর হইল, ভারত দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং অবধি বিপাকে নানা প্রকার সমস্যায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিচালকবর্গ যে ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র সংবাহক সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাতে এই আশার লক্ষণ সূচিত হইতেছে যে, অতীতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ যে স্তরে উপনীত হইয়াছিল, একণে তাহা কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ হইতে পারে এবং এই প্রকার তুলনামূলক জ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ব-গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায়ও নির্ণীত হইতে পারে।

"ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান দান শ্রুতি। কালক্রমে উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শিথিল হইলে এবং স্থলবিশেষে বা শাখাবিশেষে শ্রুতির লোপ সম্ভাবনা হইলে পরবর্তীকালে ভারতীয় মনীষিবৃন্দ শ্রুতির স্মরণ পূর্বক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এ দেশে স্মৃতি নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম ধর্মশাস্ত্র। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছে—'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।

"সত্যই মানব সভ্যতার উন্নতির মূল হইতেছে ধর্ম। ইহার উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অতীতকালে বিদেশীয় আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রভৃতি বহুবিধ ধ্বংসকর বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি বিশ্ব মাঝে বিদ্যমান রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক ধর্মাদি শাস্ত্রসমূহের সারগর্ভ বাণী বিশ্বের চিন্তাশীল বিদগ্ধ সমাজে বরণীয় ও বন্দিত হইয়া রহিয়াছে। অথচ ইহার সম-সাময়িক বহু জাতির সংস্কৃতি কালের আবর্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাও ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়।

"সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় যাহাতে নিহিত করা আছে, সেই পুরাতন ধর্মশাস্ত্রের পুনরালোচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করা বিজ্ঞোচিত বলিয়া নিবেচিত হইতে পারে না, বরং ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়—ইহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। নারদ স্মৃতি বা নারদীয় ধর্মশাস্ত্র ঐ পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত থাকায় উহার বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করার চেষ্টা পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭৬, ১৮৮৪ ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে নারদ স্মৃতি প্রকাশ করা হইলেও ঐ পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, প্রাচীন নারদ-স্মৃতির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এই জন্য এই বিষয়ে পুনরনুশীলনের আবশ্যকতা ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালকবর্গের বিবেচনায় উপস্থিত হওয়ায়, নারদ-স্মৃতির বিশুদ্ধ সংস্করণ বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদন করিবার ভার কেন্দ্রীয় ভারতরাষ্ট্র-শাসনতন্ত্রের কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বঙ্গদেশীয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযদানন্দ ভাদুড়ী মহাশয় আমার উপর অর্পণ করেন। আমি প্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধসমূহ যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া বহু পরিশ্রমে নারদ-স্মৃতির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার ও তাহার বঙ্গানুবাদ অবসরে প্রকৃত ব্যাখ্যা বিদ্বজ্জনের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।"

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—মনু সর্বপ্রথম ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা। সে জন্য মনুকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। অন্যান্য বচন হইতে দেখানো হইয়াছে, মনু সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু ভৃগুপ্রোক্ত-মনুস্মৃতির যে আকার দৃষ্ট হয়, তাহা মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের আকার হইতে অনেক সংক্ষিপ্ত। ভারতবর্ষে সর্বদা যে ১৯জন ধর্মশাস্ত্র প্রণেতার নাম স্মরণ করা হয়, তাহাতে নারদের নাম নাই। তাঁহারা—

মনুত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরা।
যমাপস্তম্বসম্বর্তা কাত্যায়নো বৃহস্পতি॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥

এখানে নারদের নাম না থাকিলেও প্রচলিত মনুস্মৃতিতে ১০জন প্রজাপতির মধ্যে নারদের উল্লেখ আছে। নারদ নিজে ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজক নহেন, মনুস্মৃতির সংক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র, সে জন্য বোধ হয় ১৯ জনের মধ্যে তাঁহার নাম নাই। স্মৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ জ্যোতিষ, শাস্ত্র প্রণেতৃগণের মধ্যে নারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যথা—

সূর্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
লোমশো পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥

খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দেও জ্যোতিঃশাস্ত্র পূর্ণ বিকশিত ছিল। উৎপাত সময়ে মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে মহাভারতে যে নারদ-বচন উদ্ধৃত আছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, নারদ স্মৃতি মহাভারতেরও পূর্বের। সামাজিক ব্যবহারের উল্লেখ হইতেও বুঝা যায় যে, ক্ষেত্র হইতে দুইটি মূলা বা ইক্ষুদণ্ড গ্রহণে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের কোন অপরাধ হইত না, ব্রাহ্মণ বিনা ভাড়ায় খেয়া নৌকায় পণ্যদ্রব্য আনিবার অধিকারী ছিলেন, ঐ সময়ে অপরাধ নিরূপণের জন্য তুলা, জল, অগ্নি প্রভৃতি নানা প্রকার দিব্য পরীক্ষার প্রচলন ছিল। এই সকল হইতে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, এই নারদ স্মৃতির প্রচলনকাল যে কৌটিল্যের ও মহাভারতের পূর্ববর্তী তাহা অসঙ্গত নহে।

নারদ স্মৃতি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে বিচারসভা ও বিচাররীতি এবং উত্তর ভাগে অষ্টাদশ ব্যবহার পদ ও পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত।

পণ্ডিতপ্রবর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নারদ স্মৃতির অনুবাদ প্রকাশের প্রথমে নারদ প্রদর্শিত মনুস্মৃতির এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে আছে :—

মানব সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সর্বজনপূজ্য ভগবান মনু শ্রুতি ও স্বকৃত শিষ্টাচারময় ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদের কালে বিচার শাস্ত্রের আবশ্যক না থাকিলেও কালক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভমূলক অনুচিত আচরণের সম্ভাবনা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বপ্রাণীর হিতকামনায় অনুগ্রহপূর্বক আচারও যাহাতে সকলে সুখে থাকিতে পারেন, তাহার উপায়মূলক শাস্ত্র (শাসনরীতির বোধক কর্তব্যাকর্তব্যাদি বোধক গ্রন্থ) প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এই শাস্ত্রে (১) প্রথমে লোকসৃষ্টি
(২) প্রাণীদিগের শ্রেণীবিভাগ
(৩) ধার্মিক ব্যক্তির স্থিতির জন্য পবিত্র দেশ (অর্থাৎ আর্যাবর্ত যাহাকে বলে তাহা)
(৪) সৎ ও অসৎ কার্য্যাদির বিবেচক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমবায় (অর্থাৎ সভার লক্ষণ বা আইন সভা)
(৫) বেদ ও বেদাঙ্গশাস্ত্রে উক্ত যজ্ঞের বিধি
(৬) সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানরূপ আচার
(৭) ধর্মাধিকরণে বিচার ও তাহার রীতি
(৮) দুষ্টব্যক্তির দমন
(৯) রাজার আচরণ (রাজধর্ম)
(১০) ব্রাহ্মণাদি ধর্মের বিভাগ
(১১) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস আশ্রম
(১২) বিবাহরীতি (বিবাহাদি নিরূপণ ও তাহাতে পূজার ভেদাদি)
(১৩) পতিপত্নীর ব্যবহারাদিরূপ সম্পর্ক
(১৪) সম্বন্ধাধীন লোকে যে ধন প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে যে ক্রমে অধিকারী হয়
(১৫) শৌচ (শুদ্ধি প্রকার) ও আচার (নিত্য কর্তব্য-কর্ম)
(১৭) ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য নির্ণয়
(১৮) কোন বস্তু বিক্রয় যোগ্য
(১৯) কোন বস্তু বিক্রয়ের যোগ্য নহে ইহার নিরূপণ।
(২০) পাপভেদ, সৎকর্ম ও অসৎকর্মের ফল।
(২১) স্বর্গ ও নরক বর্ণনা।
(২২) পাপানুষ্ঠাতার নরকাদি ভোগ হইলে তাহার প্রতিকার স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত।
(২৩) উপনিষদ (দুঃখময় সংসারে জন্মমরণাদি ক্লেশের প্রতিকার করে জ্ঞানসাধন শাস্ত্র)।
ও (২৪) রহস্য স্থান।

এই চতুর্বিংশতি বিষয় সুবিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। মনু লক্ষসংখ্যক শ্লোকে ইহা লিখিয়াছিলেন। নারদ উহা বৃহৎ বলিয়া ১২ হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে দেন—মার্কণ্ডেয় তাহা ৮ হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা পাইয়া ভৃগু-বংশীয় সুমতি ৪ হাজার শ্লোকে উহাকে পরিণত করেন। উহাই নারদীয় ধর্মশাস্ত্র নামে মনুস্মৃতি সমাজে পরিচিত।

গ্রন্থে কি লিখিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। (১) মনুষ্য যখন ধর্মৈকরত, সত্যবাদী ও বিদ্বেষশূন্য ছিল এবং অপরের শুভদ্বেষী ছিলনা, কেহ কাহার দ্রব্য অপহরণ করিত না, অপরের দ্রব্য আপনার বলিত না, এবং অপরের অভ্যুদয়ে নিজের লঘুতা কল্পনাও করিত না, তখন কেহ কাহার বস্তু লইয়া নিজের বস্তু বলিয়া দাবী করিত না বলিয়াই প্রথম অবস্থায় বিচার কার্যের প্রয়োজন ছিল না। (২) পরে ঐ ধর্মভাব নষ্ট হইলে একের বস্তুকে অপরে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে,

ঐ দ্রব্য আপনার নহে আমার' এই প্রকার মিথ্যার আশ্রয়ে বা 'আমা হইতে কেন ঐ লোক বড় হইবে'—এই প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধিতে নানা প্রকার কপটতার অবলম্বন হইলে তখন লোক রাজদ্বারে উহার বিচারার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল ও তখন রাজা তাহাদের ঐ বিষয়ে বিচার করিয়া দিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন। ঐ বিচারের নাম হইল ব্যবহার। ব্যবহার শব্দ সংস্কৃত। উহার অর্থ হইল—নানা বিষয়ে সন্দেহের হরণকারক ব্যাপার। (৩) সন্দিগ্ধ বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদকারী বাদী ও প্রতিবাদী কাহার কথা সত্য, ইহা নির্ণয়ের উপায় হইতেছে দুইটি—একটি লিখিত পত্র অর্থাৎ দলিল, অপরটি হইতেছে সাক্ষী। বিচার দর্পন নামক প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৭টি অধ্যায়ে বর্তমান গ্রন্থ সমাপ্ত। শেষে পরিশিষ্টে কতকগুলি নূতন বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা সাধারণত ইংরাজি আইনের বই পাঠ করিয়া আইনজ্ঞ হইয়া থাকি। আমাদের দেশে ধর্মশাস্ত্রে কি ছিল, তাহা জানিবার চেষ্টা করি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সুলভ নারদ-স্মৃতি প্রকাশ করায় আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া লাভবান হইতে পারিবেন।

যে মূল সংস্কৃত দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে, তাহা দুর্বোধ্য নহে। যে কেহ চেষ্টা করিলে তাহা পড়িতে পারিবেন। তাহার উপর ঐ অংশের সহজ ও সরল বঙ্গানুবাদ থাকায় তাহা পড়া ও বোঝা আরও সহজ হইয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা ইহা সম্পাদিত ও অনুবাদিত হওয়ায় উহা যে নির্ভুল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়া ঐরূপ অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থেরও বঙ্গানুবাদ করাইয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে দেশবাসী তদ্দ্বারা উপকৃত হইবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণকে দিয়া এইরূপ গ্রন্থের আলোচনা করাইলে আরও অধিক লোক ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কলিকাতা হাইকোর্টের বহু এডভোকেট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। আমরা এই নারদ-স্মৃতি গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি মাত্র আকর্ষণ করিলাম। প্রার্থনা করি, তাঁহাদের ও আইন কলেজের অধ্যাপকগণের চেষ্টায় যেন ইহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা হয়।

বঙ্গদেশের (ও ভাষার) বৈদিক বা আর্য্য ইতিহাস

শ্রীরমাপ্রসাদ মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

২য়

(ক) জাতিত্ব :—

ঋগ্বেদের প্রায় ৪৫০ জন ঋষির মধ্যে ঋষিকা প্রায় ৩০ জন ; অনেক ঋষিই অন্য সূক্তে দেবরূপে (যেমন ইন্দ্রাদি) বা অন্যরূপে পরিচিত। এঁদের মধ্যে ১১০ জন বিশ্বামিত্র, গোম প্রভৃতি ঋষি, তাদের সাধারণ বা সমকালিক ঋষির অন্তর্গত, আর ১১৪ জনকে তাঁদের বংশীয় বা শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ধরা যায়—যদিও সেরূপ ক্ষেত্রে পূর্বাপর সম্পর্ক স্থলে প্রায়ই সন্দেহের বা বিচারের অবকাশ থাকে। বিশ্বামিত্র-বংশীয় দশরথ, রাম প্রভৃতি রাজারা উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত রাজ্য শাসন করতে থাকেন। সোমবংশীয় পুরুরবা, যযাতি, কুরু প্রভৃতি রাজারা প্রতিষ্ঠানপুর বা প্রয়াগ (মতান্তরে সোমবংশীয়দের উৎপত্তিস্থান বা কাশীর), হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশ বা পাঞ্চালাদি প্রদেশ), ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রাজত্ব করেন। এ জন্য এঁদের আর্য্য-কুষ্টি বা আর্য্যগোষ্ঠির লোক অর্থাৎ সংক্ষেপে আর্য্য বলা যায়। আবার ঋগ্বেদকে "আর্য্য দলিল" বলে ঋষি, রাজর্ষি ও দেবতাদের 'আর্য্য' বলে ধরার কোন বাধা দেখা যায় না। ঋষিদের মধ্যেও দেখা যায় যে :—

(১) অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, ভারদ্বাজ, কক্ষীবান্ প্রভৃতি মহর্ষিরা (ঐরূপ সভাকবি ভারদ্বাজ, ব্যাস প্রভৃতিও) বিদ্বদ্‌গুণ বা বিজাতীয় যোনিতে জাত ;

(২-৩) ভারদ্বাজ অর্বাবসু প্রভৃতি ঋষিরা দর্শঋষি এবং ঋষি কবষ ঐলূষ শূদ্র-ঋষি। এইরূপে পক্ষীরূপে পরবর্তীকালে খ্যাতি হলেও ঋষি তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি ঋগ্বেদে অতি পূজ্য। সুপর্ণ তার্ক্ষ্যও ঋষি। ঐরূপে পক্ষীও সূক্তীসূক্ত—অরিত্র, শ্রোণ, সারিসৃক্ষ ও ঘর্ঘাভিমেরা ও ঘ. ১০।১৩৪।৫ ঋষি চতুষ্টয়। 'কক্ষপুট নারায়ণ' ১০।১৫৩।৭ ঋষি।

এরূপ ঋষি ও তাঁদের পরম্পরাকে কেউ কি অনার্য্য বলতে পারেন? তাহলে সংহিতাদি ও অনার্য্য বলিয়া হবে। চন্দ্র বা বরুণদের সাহায্যে বহু আর্যবংশীয় মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে বলে পুরাণাদিতে বলা আছে। যাস্ক, সায়ণ প্রভৃতিরা আর্য্য শব্দের অর্থ 'উত্তম যজ্ঞকারী' প্রভৃতি বিশেষণের সাহায্য করেছেন, জাতিবাচক হিসাবে নয়। বৃত্তত্ত্ব-বিদেরাও আর্য্য বলে জাতি স্বীকার করেন না। "ইন্সাইক্লোপে" ত ১৭।৭।৩০ তাঃ এ স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে—"জাতীয় (রেস) সার্থক্য-বিচারের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই।...একটীই মানব-জাতি

আছে তার নাম হোমো-স্যাপিয়েন্স"। ঐরূপ ধুয়েই অর্থাৎ একজাতি বা একসম্পত্তি বা একস্থান হতেই মানুষের আদি পুরুষেরা উৎপন্ন—এইরূপ মনে করে চার্লস্ ডারউইন প্রভৃতি 'মনোজেনিষ্টে'র মত, বৃত্তত্ত্ববিদ্, জীবতত্ত্ববিদ্, ঋগ্বেদ (১।১৩৪, ৩।৫৪ ও তাহার সায়ণভাষ্য দ্রঃ) পুরাণ, মহাভা (শান্তি ১৮৮), বাইবেল ও কোরাণের 'জেনেসিস্' এক বা প্রায় একমতই ঘোষণা করে ; সমস্ত বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করা মানুষের ক্ষমতা বললেই হয়।

বৈবস্বত শ্রাদ্ধদেব মনু বা ষষ্ঠান্তরে পূর্ব্বতন বৈবস্বত মনু, মনবর্ষ প্রভৃতিরা দ্রবিড় জাতি বা সম্প্রদায় বা দেশকে শাসন করেছেন। বংশলতা বিচার করলে ভাগবত প্রভৃতি পুরাণমতে 'রাজর্ষির পিতামহ পুলস্ত্য ঋষি বৈ: মনু-দিষ্ট-বংশীয় দ্রবীর (সম্ভবতঃ এক দ্রবিড়-জনক) এর ভগিনী ইলবিলাকে বিবাহ করেন, ও 'ঋষি যাঃ মনু-বংশীয় ক্ষত্রের পুত্রদের নাম দ্রবিড়, কীকট প্রভৃতি'। দ্রবিড়ীয় ভাষায় রাবণ-গাথা বিখ্যাত হওয়ায় অনেকের ধারণা রাবণও এক দ্রবিড়-শ্রেণীভুক্ত। মনু ১০।৪৩—৪৪ এ লিখিত আছে :—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে
ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ৷৷৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ
কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ৷৷৪৪

অর্থাৎ পুণ্ড্র রাজ্যবাসী (পোষ ? পুঁড়ে ?), উড়িষ্যা, দ্রবিড় প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় ; কিন্তু ক্রিয়ালোপ বা ইজ্যাচার ও ব্রাহ্মণবর্জ্জিত হওয়ায় এঁরা ক্রমে বৃষলত্বপ্রাপ্ত বা পতিত।

দ্রবিড়ীয় ভাষাগুলির শব্দ-ধাতু প্রত্যয়াদি সংস্কৃতবৎ বা হলেও এদের শতকরা প্রায় ৭০।৮০-টী শব্দ সংস্কৃত হতে গৃহীত বা সাধারণ মূলযুক্ত। এই যুক্তিচতুষ্টয়ের সাহায্যে এবং বর্ত্তমান জাতিতত্ত্বের ব্যাপক ত্রুটী দেখে জোরের সঙ্গেই অনুমান করা যায় যে পৌণ্ড্র-দ্রবিড়াদিরা আর্য্য।

ফলে বাঙ্গালীর মধ্যে টন টন দ্রবিড় রক্ত, মণ-মণ মঙ্গোল বা অন্যজাতির রক্ত আছে বলে বললেও বাঙ্গালীকে রক্তগত অনার্য্য বলে নিশ্চিতভাবে স্থির করা যায় না।

এখন পাশ্চাত্য বা ইংরেজ-পন্থী আধুনিক পণ্ডিতেরা বাঙ্গালীর অনার্য্যত্বের অজ্ঞাত যে প্রধান যুক্তিগুলি দেখান সেগুলিকে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থাদির সাহায্যে খণ্ডিত করছি।

গ্রন্থ হতে সাধারণতঃ তাঁরা নিম্নোক্ত যুক্তি দেন :—

(১) বিশ্বামিত্র (ঐঃ ব্রাঃ ৭ঃ) পুণ্ড্রাদিকে 'দস্যবাং ভূয়িষ্ঠাঃ" বলে শাপ দিয়েছেন ; দস্যুরা অনার্য্য।

(২) ঐঃ আরণ্যক (২য়, ১।১।১৩—২১) এ আছে—

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রোহ আয়য়ুরং স্তাসীন্নাসি বয়াংসি
বয়া-বয়সা-ক্ষেয়জনপদাবাক্ত্যা অর্কবন্তিতঃ বিবিদ্ধ ইতি।

(ঋগ্বেদ ৮।১০।১৩ তে জমদগ্নির "প্রজাহ তিস্রো অত্যায়মীয়ুঃ···" প্রভৃতি এর মূল সূত্র বোধ হয়।)

আনন্দতীর্থ ব্যাখ্যায় ধাতুপাঠাদিতে বঙ্গাদির অর্থ করতে গেয়ে বঙ্গ-ধাতু-প্রসূত বঙ্গ প্রভৃতির অর্থ 'যারা ভূমিলগ্নভিত্তে চলে' প্রভৃতি বলেছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী অনেকস্থানে বলেই নিয়েছেন। সায়ণাচার্য্যও কষ্ট কল্পনায় ব্যাখ্যা করতে গেয়ে বলেছেন :—"···ত্রিবিধাঃ প্রজাঃ···বৈদিকস্ত অতিক্রমঃ প্রাপ্তাঃ।···সামান্যতঃ প্রোক্তাবাঃ···বিশেষ নির্দ্দেশাঃ। 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ···আকাশে···একো ভাগঃ। 'বঙ্গা' বনস্পত্যা বৃক্ষাঃ। 'অবগধাঃ' অবস্থি···পুথিবস্থে···ওষধয়ঃ···দ্বিতীয়ো ভাগঃ···। 'ইরম্পাধাঃ' উরম্পাধাঃ সর্পাঃ···" শ্লোকটীর মূলার্থ ঘোষণার এই রূপের—উক্ত জনপদবাসীরা লাফাতে 'বয়াংসি' বা পাখীর প্রতীক ধারণ করে (লাফাতে লাফাতে ?) 'অর্ক' বা সূর্য্যের দিকে (= আলোর পথে ? সূর্য্যমন্ত্রিরে ? ইরাক্ বা এরেন্ বেদে ?) চলেছিল। এই শ্লোকে অনেকের দৃষ্টিতে বাঙ্গালী প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা দেখা যায়।

(৩) অন্য প্রাচীন এক স্মৃতি বিষয়ে আছে—

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এখানেও অবজ্ঞা।

(৪) বৌধায়ন স্মৃতি ১।১—৩২এ আছে :—

অবজ্ঞয়োহঙ্গ মগধাঃ সুরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ। উপাবৃৎ সিন্ধুসৌবীরা
এতে সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ ৷৷৩১৷

আরটান্ কারকারান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গ কলিঙ্গান্ প্রাপ্নুয়াদিতি ৷ গত্বা পুনঃ স্তোমেন যজেত, সর্ব্বপৃষ্ঠ্যা বা ৷৩২। এখানেও পূর্ব্বোক্তরূপে মিশ্রিত দেশগুলির তালিকায় পুণ্ড্র ও বঙ্গের নাম।

অনার্য্যজাতিত্ব—খণ্ডন প্রসঙ্গে যথাক্রমে বলা যায় যে—

(১) পৌণ্ড্র প্রভৃতিরা দস্যু বা ডাকাত ধরিও হয় (অবশ্য পাপকালে অত্যুক্তিও থাকে) তবুও বিশ্বামিত্র-জাত (পুত্র বা আত্মীয়) হিসাবে নিশ্চয়ই এঁদের রক্তে আর্য্য বলা যায়। এই বিশ্বামিত্র যদি কান্যকুব্জ-রাজ বলে খ্যাত, এটী আমার পক্ষপোষক ১টী।

(২) পক্ষীজাতীয়রাও বেদে সম্মানিত ঋষি পূর্ব্বে বলেছি। সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির পক্ষীরূপ বেদে ও বাল্মিকীরামায়ণে আছে। ঐতরেয় মহীদাসের কালে বা পূর্ব্বে বঙ্গীয়াদির পক্ষীবৎ আচার-ব্যবহার বা পক্ষি-চিহ্নযুক্ত (টটেম) পতাকাদি বা অলঙ্কার বা মূর্ত্তি থাকতে পারে, কিন্তু এর অর্থ স্পষ্টপ্রমাণাভাবে এইরূপ হয় না যে প্রতিবেশী বা পার্শ্বস্থ ভারতীয়েরা সভ্যই সভ্যতায় সমুন্নত অন্ততঃ জাতিতে অন্য।

(৩) কয়েকটি স্মৃতি বা স্মৃতি-সংশোধকদের চক্ষে বাঙ্গালী অনাচারী বা অবজ্ঞাপাত্র হতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা মহাপাপীর বা রক্তে অনার্য্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ (১) স্থানীয় লোকেই প্রয়োজনবশে স্মৃতি সংস্কার করে, আর মনুমতে (২) "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ···সঃ সদাচারঃ···"। পক্ষান্তরে অবজ্ঞাসূচক শ্লোকগুলিতে সিন্ধু সৌবীরাদি এমন কি প্রায় পূর্ণ ভারতবর্ষের নাম আছে। মহেঞ্জোদরো ও বৈদিক সভ্যতার আদিভূমি বা আদিনিবাস ক্ষেত্ররূপে বা আর্য্যরূপে

যে নিছু গৌরীয়াদি অঞ্চল বা রীতি এত প্রসিদ্ধ এবং আধুনিক ঐতিহাসিককালে যাঁরা ভারতবর্ষে ইংরাজীর হিসাবে দাঁড়াতে অক্ষম তাঁদের নামও অবজ্ঞাভরে !

উক্ত বৈদিক বা পার্শ্ব লেখকেরা নানা ভারতবর্ষের বা নানাকালের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করতে পারেন না, কারণ শত-সহস্র বৎসরের ব্যবধানে ভাষার ক্রমে বিবর্তন হয়েছে। এই ফলে এগুলির ব্যবহার বা পারম্পর্যের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে বিরোধ ও বিকল্পের সৃষ্টি হয়েছে—যেমন ঘোষকাল, পদক্রম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয়, দেবদেবাদি বিষয়ে। নিরুক্ত, পূর্বমীমাংসা ও পরবর্তী গ্রন্থকেরা স্থানকাল পাত্রভেদে সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

(৪) আর একদিক দিয়ে এমন মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে আদি বৃহৎ কবিল বা ভক্তিমার্গ বা নীতির দিক দিয়ে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যের আদি প্রবর্তক কবিল ও পরবর্তী বৌদ্ধেরা ও মহাভারত-ভাগবতাদি গ্রন্থ আদি জিন ঋষভ ও পরবর্তী জৈনেরা ভারতবর্ষের বহুকাল হিন্দু হিসাবেই গণ্য হয়েছে অথবা হিন্দুধর্মের পাশাপাশিই স্বতন্ত্রভাবে চলেছে। মোহেনজোদড়োতে আদিদেব হিরণ্য-গর্ভকে কবিল বলা হয়েছে আর ঋষভ শব্দও নামও হিন্দুরূপে বহুস্থলে উক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থ ও মঙ্গলকাব্য হতে জানা যায় যে ২৪জন তীর্থঙ্করের মধ্যে অন্তত ২০জনও বহু বৌদ্ধ গ্রন্থকার বঙ্গদেশে এসেছিলেন। বহু বৈদিক দেবদেবীর নামও বৌদ্ধ-জৈনগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়েছে।

(৫) অন্যান্য বহু প্রদেশের মত বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে, অন্তত যা সর্ব সমস্যার বা তান্ত্রিক ঐতিহ্য বা লোকনীতিতে পূর্ণ। শিব নিশ্চয়ই এক একটি বিখ্যাত বৈদিক দেবতা। আবার শিব শব্দের মানেও মঙ্গলবাচক শব্দ। শিব সর্পবিভূষিত, আর সাপের বেলায় পাণিনীয় ব্যাকরণের সুদর্শন কবীরধন সাপের সূত্রের প্রমাণ। সর্পেরও ঋষি এবং জিনদীয় ভাস্কর্যের মুকুটে সর্পমূর্তি দেখা যায়। ঋগ্বেদের ২য় শব্দের উৎপত্তি 'ধারণ বা পোষণ (বা ধনন ?) করা', এই অর্থের ভৃ ধাতু থেকে। বহ্নিকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া অবশ্য, অর্থাৎ, কামসূত্র প্রভৃতিতে বহুস্থলে আছে, আর তান্ত্রিক মূর্তি বা ঐরূপ অবস্থায়। বিভিন্ন প্রকার বা ধাতুর 'বিভৃগ' (অংশোদ্রাবড়াতে অনেক পাওয়া গেছে। কাজেই প্রক্রিয়া পার্থক্যেই ভিন্নজাতির সিদ্ধ হলনা।

(৬) ঋগ শব্দের সঙ্গে সমস্ত, কতকগুলি পারস্য ও সম্ভবতঃ আরাকানের রূপেরও সম্বন্ধ থাকতে পারে। ভবিষ্যপুরাণে, ১৩৯।৪২—তোক্তে হয়েছে :—

কেশোরুম্ বিভিন্নংস্থলা ঘটোহহং লম্বিচরণা। তস্মাৎ মম:
সমুৎপন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩৮
...পরম্ভ ইতিখ্যাতঃ যবনকীর্তি বিবর্ধনঃ। অগ্নিজাতা মম:
প্রোক্তা: সোমজাতা দ্বিজাতয়: ॥৪৪
...বিশ্বামিত্রেণ যেনেন মগা গাধস্তাতো মগা ।...

অতএব ইরাণের মগের অবৈদিক বা বিদগ্ধ (—রাজ ?) রূপে বেদপাঠক, ভিন্ন জাতি বলা চলেনা।

বাঙালীর আর্যত্ব বা উচ্চসম্ভ্রান্ততা সম্বন্ধে প্রত্যেক মত দেখাচ্ছি। (১) মহা ভা- (কা) কর্ণ. ৪৪।১৬-১৪ ও আদি ১০৩।৩০, (২) ব্রহ্মাণ্ড পু: (গ) ৭১।৫১-৬২, (৩) বিষ্ণু পু: (সি চি) ২।৩।১৮ গ্রন্থগুলিতে যথাক্রমে আছে :—

১। "কোশলা: কাশলৌড্রাশ্চ কলিঙ্গা যাগযাজ্ঞিকা:। যেষাঞ্চ মহাভাগ ঋষি: জামদগ্ন্য শাশ্বত্।..." ও "অঙ্গো বঙ্গ-কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র: সুহ্মশ্চ তে সুতা:। তেষাং দেশা: সমাখ্যাতা: যথাবর্ণবিভাগ তুমি ॥"

২। অন্তর্গিরাশ্চ বহির্গিরাশ্চ তাম্রলিপ্তাংকৌশিকীমেব চ। এতান্ জনপদান্ যাম্যা ভাবয়ন্তে শুভান্ ॥৭২

৩। বঙ্গান্ত মাগধাশ্চৈব মানদা মদ্যগাস্তথা। তথা ব্রাহ্মত্তমিক্ষা মাগধা: ক্ষত্রিয়াস্তথা ॥ ঐরাবত মানসাস্তেষাং তু মগধা: ॥৯৯

রিজলি সাহেব ও তৎপন্থীরা বাঙালী হতে দ্রাবিড়—মঙ্গল জাতির রক্ত দেখেন। ডা: রমাপ্রসাদ চন্দ এর প্রতিবাদ করেছেন। ডা: সুনীতিকুমার দত্ত প্রভৃতিরা উক্ত মতের বা 'নিষাদজনী ফোক'—অষ্ট্রিক রক্ত মিশ্রণাদি মতের ও 'ভারতে আর্য আগমন' প্রভৃতি মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। অতএব এরা বা পুরাতত্ত্বাদি হতে বাঙালীর অনার্যরক্তের কোন প্রমাণ মেলে না। কালে কালে বিভিন্ন বৃত্তিগত ও বর্ণগত জাতির ('জাই') উদ্ভব ও মিশ্রণ হয়েছিল বলা যায়।

২য়

(খ) ভাষা :—

পূর্বোক্ত পঞ্চ-গৌড় বা অন্তত:পক্ষে অঙ্গ-বঙ্গাদি ৫।৬টী প্রদেশ অগ্নির বলি (২) রাজা ও পরে তৎপুত্রাদির দ্বারা শাসিত হত। সঙ্গতভাবে এরূপ অনুমান করা চলে যে এইরূপ রাজা বা প্রদেশগুলির এক সাধারণ ভাষা ছিল অথবা একই ধরণের ভাষা ছিল যেগুলি একভাষাই উপভাষা। ঐ একভাষাকে আর্যভাষা সংস্কৃত জাতীয় ও সাধারণের বোধগম্য ছিল এরূপ মনে করা যায়। বঙ্গাদির সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটী ঋষির কথা বলছি।

(১) অঙ্গিরা ২য়ের পুত্র ও বৃহস্পতি ২য়ের ভ্রাতা উতথ্য বা উচথ্য ঋ ৪।২৪-৩২ ও ৩টী সূক্তে ও ১৭টী ঋকে 'পরমান সোম' দেবতার (বা রসের) উপাসনা করছেন। ইনি সম্ভবত: সপরিবারে বলি-রাজার রাজ্যের (অঙ্গ বা ভাগলপুর ? অংশে ও গঙ্গার পশ্চিম ভূভাগে বাস করতেন।

(২) তৎপুত্র 'দীর্ঘতমা উচথ্য' ঋ, ১।১৪৭-১৫৪ এই ২৭টী সূক্তের ও ২৩২টী ঋকের ঋষি। ঐ ব্রাহ্ম, পুরাণাদি মতে ইনি 'মামতের' বা মমতার পুত্র। শুক্র-বৃহস্পতিশাপে ইনি জন্মান্ধ হন। তাঁর স্ত্রী প্রদ্বেষী একদিন বিবাদকালে তাঁকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করেন। ভাসমান অবস্থায় বলির রাজ্যে ও পরে রাজপ্রাসাদে নীত

হন। ইনি সম্ভবতঃ বিহারী ছিলেন। এই বলিরাজার অথবা অসুর বলিরাজার (উত্তরেই ?) রাজধানী পোণ্ড্রিপুরে ছিল। এটী সম্ভবতঃ পঃ দিনাজপুরের বিখ্যাত 'বাণগড়ে' বা দিনাজপুরে। এই ঋষি ঋ, ১।১৪৪।৬৩ বহুদেবের একত্বের প্রচারক, বলেছেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" * ইনি জগতী প্রভৃতি ছন্দে অগ্নি প্রভৃতির স্তুতি আপ্রী-সূক্ত প্রভৃতি লিখেছেন। ১।১৩০এ ইনি বলছেন :—

বেধিষদে শ্রিয়ধাধায় সুদ্রুবতে ধায়িসিব প্র ভরা যোনিমগ্নয়ে।

জন্মেব যস্মা জনুষা পুরূণ্যুশোজিষ্ঠং তরুষন্তমোমন্‌…"

(৩) বলির রাণীর ঘাসীয় গর্ভে ঐ দীর্ঘতমার কক্ষীবান্ ঋষি (ইনিই বৈদিক ঘোষা-ঋষিকার পিতা ঘোষ হয়) গোতম প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিপুত্রের জন্ম হয়। জ্ঞানসাত্র-প্রবর্তক এক মহাঋষের শিষ্য ও ব্যাসগুরু অঙ্গপাদ গোতম পরবর্তী ও দিব্যোদাসের জামাতা বা পৌত্রী-পতি তা পূর্ব্বেই বলেছি। ইনি বৃহৎ বঙ্গীয় হলে বাঙ্গালী তার্কিক ও 'ঘট-পট-নির্ম্মাণপটু' ছিল বলা যায়। কক্ষীবান্ দৈর্ঘতমস ঋ, ১।১২৭। ১-৯ ও সম্ভবতঃ এই ঋষিই অতিরিক্ত বিশেষণ 'ঔশিজ' রূপে ঋ, ১।১১৬-১২৬ ও ১।১২৮।১-৫ এই মোট ১৫ সূক্ত ও ১৪৩টী ঋক লিখেছেন। এঁকে বৃহত্তর বঙ্গের এক অধিবাসী হিসাবে ধরা চলে। ঋ, ১।১১৬।৩ প্রভৃতিতে ইনি স্বয়ং "নৌ"-চালনাবিদ্‌ কথা বলেছেন। চর্য্যাপদে নৌকার উপমা দিয়ে ডোম্বপা গায়ত্রী-ঋকের মত বলেছেন—"কৌড়ী অলেই কৌড়ী অলেই ত্রিভুবণ পার করই।" ঋ, ১।১১৭।১২ ও সায়ণভাষ্য হতে দেখা যায় যে, অশ্বিদ্বয় ও রেভ উশনা কাব্যের (১৯:) প্রশংসা শুনতে উৎসাহী। ১।১১৬ ও সায়ণ হতে দেখি যে শরের পিতা ঋচীক, বিশ্বাপুর পিতামহ কণ্ব, বিশ্বকপিতা কৃষ্ণ, খেল ও তৎপুরোহিত অসমাতি, ঘোষা, পুত্রাধিত্যক চাবন, জহু (১৯ ?); ত্রসদস্যু, দিবোদাস, সুবন, পেদু, পৃথুশ্রবা, যদ্বিংবতী (হিরণ্যহস্তমাতা), কুৎস্য, ভরদ্বাজ, বশ, বিশ্বক, বিশ্বাপু, বিশ্পলা, ত্রাব, হিরণ্যহস্ত প্রভৃতি 'বোদ্ধাবিজ্ঞপে উল্লিখিত।

১।১২৬এ তিনি তাঁকে দানের জন্য স্বয়ং রাজার স্তুতি করছেন। ১।১২৬এ স্বয়ং ভাবব্য ও স্ত্রী রোমশা তাঁর সমকালিকরূপে উপস্থিত, ও তৎকালে ২ রাজা—মন্দর্শার ও অন্তর ছিলেন। ত্রিষ্টুভাদি ছন্দে ইনি অশ্বিনী ও ইন্দ্রাদির স্তুতি করছেন; ১।১১৩ ইনি বলছেন :—

নাসত্যাভ্যাং বর্হিরিব প্রবৃক্ণ ক্ষোণী ইব প্রবণে পপ্রথানে।

বাবৃধ্বাংসা বিদথা জায়মানা সেনেব সৃষ্টামং দধাত ইন্দ্রে ।৩

(৪) শরের কাক্ষীবত ১০।১৩৯ সূক্তে ৭টী ঋকের দ্রষ্টা। ১০।১৩৯।১ এ "সো"—বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইনি বলছেন :—

অযোহুর্বাতো অতি বাতুমা উর্দ্ধঃ তস্থৌরোধসী বিশ্বজন্যে।

পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃ পিবন্ত্বপাং নপাত্ সেদু হোত্রা উ নঃ ।১

(৫) সুকীর্ত্তি কাক্ষীবত ১০।১৩১ ও ৭টী ঋকের দ্রষ্টা। ১ম ঋকে ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে বলছেন :—

অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বাঁ অমিত্রানপাপাগো অভিভূতে সুবজ্র।

অপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্ম্মন্ মদেম ।১

ঐঃ ব্রাঃ (সত্য, ৪।২।১০) এ যেন প্রসূতিবিদ্যা-আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছে :—

দৈব্যৌ চ মানুষে চ নাভানেদিষ্ঠৌনৈব রেতোঽসিঞ্চৎ তয়োর্দেব্যাপ্তি-র্যাকরোৎ সুকীর্ত্তিমা কাক্ষীবন্তং যোনিং যাচাপয়৭…।

এ দ্বারা সুকীর্ত্তি নাভানেদিষ্ঠাদির কালের হলে উক্ত কক্ষীবানেরও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী হবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যের ভেদের কথা এখানে আলোচিত এ ক্রমে করলে সমসাময়িকত্ব সিদ্ধ হয় না। ব্যাখ্যাকালে সায়ণ সুকীর্ত্তিকে কক্ষীবানের পুত্র বলেছেন।

(৬) কক্ষীবান্ ১।১১৭এ নিজের ঘোষার সম্বন্ধে পরোক্ষ—বা উদাসীন ভাবে বলছেন :—

তদ্ বাং নরা শংস্যং পাজিষ্ঠেব কক্ষীবতা রাসতা পরিজ্মন্।…৩

ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্যন্তা অশ্বিনাবতক্তম্।…৭

সায়ণ ব্যাখ্যা করেন—"ঘোষা নাম ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবতো দুহিতা।" ঘোষা ১০৩৯-৪০এ ২৮টী ঋকের দ্রষ্টা। অশ্বিদ্বয়ের বরে বৃদ্ধ চাবনের সঙ্গে বিবাহ হয়; পরে উভয়েরই পুনর্যৌবনলাভ হয়। এই বৈদিক ও সম্ভবতঃ বৃহৎ বঙ্গীয় চাবনকে "ভৃগু চাবন ভার্গব" বোধ হয় না। ১০।৩৯।১ এ ঘোষা অশ্বি-স্তুতিতে বলছেন :—

যো বাং পরিজ্মা সুবৃদশ্বিনা রথো ঘোষাদুহানো হব্যো হবিষ্মতা।

শতোতমাসস্য বামিনং বয়ং পিতুর্ন নাম সুহবং হবামহে ।১

(৭) ঘৌষেয় (সম্ভবতঃ ঘোষাপুত্র) সুহস্ত্য ১০।৪১ এ ৩টী ঋকের দ্রষ্টা। অশ্বিদ্বয়ে ইনি বলছেন :—

সমানেন্দ্র ত্যং পুরুহূতমুক্থ্যং রথং ত্রিচক্রং সবনা গতিষ্টতম্।

পরিজ্মানং বিদথ্যং সুবৃক্তিভির্বিপ্রা বৃন্দা উষসো ব্যুষ্টিষু ।১

কক্ষীবান্—গোটী পরিচয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখছি :—(১) "প্রক্ষিপ্ত" —অপধার-প্রস্থ ১০ম মণ্ডলের মধ্যে অনেকের স্থান; (২) তিনজনের "পরিজন্"—পদপ্রয়োগ; ও (৩) ত্রিচক্র রথের উল্লেখ।

বৈদিক "বঙ্গঃ" বা পক্ষীয় শ্রেণীভুক্ত হিসাবে বঙ্গ-বগধ-চেরপাদ বাসীদের ধরলে নিম্নোক্ত ঋষিদেরও বঙ্গবেদ বা তাহার সঙ্গে যোগ থাকা বিচিত্র নয়। (সিংহ, বাঘ, নাগ, হাতী বা হাইড প্রভৃতি উপাধি বঙ্গদেশেও বহু আছে।)

(ক) অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য ১০।১৭৮এ ৩টী ঋকের ঋষি। ইনি আত্ম-স্তুতি প্রসঙ্গে নৌকার উল্লেখ করে বলেছেন :—

তার্ক্ষ্যং যু বাজিনং দেবজূতং সহাবানং তরুতারং রথানাম্।

অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ।১

ইন্দ্রস্যেব রাতিমাজোহবানাঃ স্বস্তয়ে নাবমিবা রুহেম ।…।২

দাদ্বেষ, শুক্র-কৃষ্ণযজুঃ য় মত ঋ, ১।৮১।৩ এ পূর্ব্বোক্ত গোতম রাহুগণ —দৃষ্ট ঋক্—

---

* প্রাচীন চর্য্যাপদে ও একজন (হাড়ি সিদ্ধা) বলেছেন :—
"এক ণৌ বহু আসম ঠীআই। তহুলি ঘরণী কিন্তু পরিহাণই।"

অস্তি ন ইন্দ্রোমৃডয়াঃ…অস্তি নস্তাকে॥ অরিষ্টনেমিঃ…।৩

প্রভৃতিতে অরিষ্টনেমি সম্মানিত।

(খ) সুপর্ণতার্ক্ষ্য (মতান্তরে ঊর্ধ্বকৃশন যাযাবন) ১০।১৭৮এ ৪টী ঋচ্‌ রচনা করেছেন। ইনি ইন্দ্রস্তুতি প্রসঙ্গে লিখছেন :—

অহং হি তে অমতা ইন্দ্রমোকো ন পরাচৈঃ। মধো বিনামুর্বধয়ে।১

…ঃ সুপর্ণঃ পরাবতঃ শ্যেনস্য পুত্র আততঃ। শতচক্রং যোধমো বিভর্তি।৩

এখানে এঁর পরিচয় 'শ্যেনপুত্র' যোধয়ন্ন। ৪।২৬এর (বালখিল্য সূক্ত) সুপর্ণ তাই ভিন্ন ঋষি বোধ হয়। সুপর্ণ নামও বেশ সুপরিচিত। অথর্বের মতে ঋ, ১।১৯৯।২০তে (উক্ত দীর্ঘতমাসূক্ত) "যা সুপর্ণ সমুজা সখায়া…" আছে; ঐতরেয়ব্রাহ্মণ-ন্যাখ্যান-নিদানাদিতেও পক্ষীরূপী দেখা আছে।

(গ-১) মার্কণ্ডেয়াদি-মতে সাবর্ণী পক্ষীজাতীয়া ঋষিকা ও দণ্ডিতায় পুত্রে সন্তানাদি ; ঋষি সাবর্ণকরূপে ঋষিতাদি শ্লোপাদি পুত্র উৎপন্ন করেন। ঋগ্বেদের ১০।১৪১ সূক্তে "সার্ণ" পরিচয়ে পরিচিত ঋষিকা, শ্লোপ, সাবিত্রক ও পুত্রদ্বিত—এই ঋষিচতুষ্টয় যথাক্রমে ৭টী করে মোট ২৮ মন্ত্রের ঋষি। এঁরা অনুক্রমণিতে লিখছেন :—

ঋগ্বেদে ঋষিকা যে অনুষ্টুপি সহসঃ সূনো নহুষস্যাপ্যাম্।…১

ইন্দ্র যা তে সবি বৃষণ্বি বসবাহোয়ত উতস্য ঋষাবঃ।…৩

যদে চমে অমুবর্তন্তাসো গুহ্যং ত্র্যানাময়েষি কৃষিম্।…৫

অপাধিকং শ্লোপং সমুদ্রং বিবেদনম্।

ঋষঃ কৃপুবতঃ পন্থাং তেন যাহি যশা অনু।৭

আমনে তে পরাবতে দূরং বোধন্ত পুত্রিনী।

দুহানঃ পুত্রনীকাদি সমুদ্রং পুরা ইয়ে।৮

এর সূক্তে বহু নদী বা সাগরের বর্ণনা, কৃষির উপমা ও পুত্রিনীরূপে দুর্বাকৃশের বর্ণনা আছে বোধহয়।

সিদ্ধান্তের যা যজ্ঞযানী বা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের চর্যাপদে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে। বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দু মতের ও প্রচারকদের মধ্যে ভাবের ও রক্তের সাদৃশ্যও যথেষ্ট দেখান যায়; ব্যাখ্যা এ অবকাশে হয়ত ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের এরকমটী ঋষির কথা বলেছি। আরও ২।১টী উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) বেদব্যাসী বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের জৈন ও সাধারণ পুরাণে প্রসূচিত। বৈদিক সাহিত্যে ব্যাস নামের সঙ্গে বহু কাহিনী যুক্ত। ঋগ্বেদের ২ জন ব্যাস ঋষির মধ্যে ১০।১৩৬ঃ ব্যাস বৈয়াশ্ব" ঋষিই হয়ত পূর্বোক্ত ব্যাসদেব (ব্যাস্নু=ব্যাপ্ত=বিরাট ?)।

(২) সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শনের 'দুঃখ-নিবৃত্তি'—তত্ত্বাদিতে অনেক সাদৃশ্য আছে। দুইদলই কপিলের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। হিরণ্যগর্ভ কপিল বেদোক্ত, উপ. প্রভৃতিতে আদিপুরুষ বা আদি বিদ্বান্ রূপে পূজিত। ঋ, ১০।১২১এ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি 'ক' বা প্রজাপতির স্তুতি (যেন আত্মস্তুতিও) করতে গেছে বললেন :—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।…১

ইনিও একই কপিল ঋষির এগুলি পরিচয়।

(৩) এক শঙ্করাচার্য যোগসূত্রের "মূত্র ভাষ্যেহি বনাগমকৃতাঃ… অর্থবন্তঃ ভাবন নিত্যাঃ…" শ্লোকগুলি লিখেছিলেন। এগুলিতে বাঙালী শঙ্করদেবের গীতগোবিন্দের শ্লোকের মত অন্ত্যানুপ্রাস আছে; বিরাট সংস্কৃত-সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া শক্ত। উক্ত শ্লোকের মত অমিত্রযুক্ত (অন্ত্যানুপ্রাস প্রবেশিক ভাষার স্বাভাবিক) ও রামকৃষ্ণদেবের মত সর্বধর্মসমন্বয়ীরূপে এক চর্যাপদে তিলোপাদ লিখছেন :—

যথা বিহরু মহেসুর দেবা। (বোহিসত্ত্ব ন করহ দেবা)।

বাস্তবিকই বিভিন্ন উপভাষা ভাষা ও ভাবের গতি ও সমকালিকত্ব নির্ণয় এখনও গবেষণার বিষয়। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (Pasnate) প্রভৃতি 'ব্রাত্যস্তোম'দির সাহায্যে দেখিয়েছেন পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণদের নিকট ঋণ (অধিকাংশে ?) সূত্র ধার করেছেন। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে ও দুর্বোধ্য ও প্রাচীন ভাষার পাশে পাশেই 'সাধু' প্রভৃতির উদাহরণে অতি সহজ পাণিনীয় বা তদ্ভাতীয় ভাষা।

(৮) গাথী বা গাথিন বিশ্বামিত্র গাথিন-বা গাথিনী মন্ত্রদৃষ্ট ৫১টী সূক্তের দ্রষ্টা। ইনি পঞ্চগৌড়ের এক গৌড় ব্রাহ্মণকুলের রাজা হিসাবে পরিচিত। পুত্র মধুচ্ছন্দা অঘমর্ষণাদি সহ ১১ সূক্ত লেখেন। গৌণ্ডাদি এঁদের আত্মীয়রূপে কথিত।

(৯) ব্রাহ্মণ গৌতম বৃহদ্দেবতাদিতে কুরু ও পঞ্চাল বা সৃঞ্জয়দের পুরোহিত ও শতঃ ব্রাঃ মতে বিদেহ মাঠর বা বিদেহ মাথবের পুরোহিত। ইনি ঋ ১।৭৪-৯৩, ৮।৩১।১-৩ ও ৯।৬৭।৭-৯ এই ২৯টী সূক্তের ২১টী মন্ত্রের ঋষি। "নভরীনামেকঃ গোতমঃ" (হয়ত উক্ত গোতমের নামান্তর) ১০।১৩৭।৬এর ঋষি। ইনি গায়ত্র্যাদি ছন্দে অগ্নি ইন্দ্রাদির স্তব করেছেন। ১।৭৬এ অগ্নির উদ্দেশে বলেছেন :—

উপ প্রক্ষে মধুমতঃ মক্ষঃ যোবেষাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে।১

বঙ্গদেশে ভাত বা বঙ্গীয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট উক্ত ঋষিদেরই মত বিভিন্ন ছন্দে ও কঠিন বৈদিক ভাষায়ও সূক্ত রচনা করতেন। বৈদিক ভাষার শুধু প্রাচীন-অর্বাচীন হিসাবে না করে এককালের বা ভিন্ন-কালের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা হিসাবেও গণ্য করা যায়। প্রাতিশাখ্যপাণিনি—মহাভাষ্যাদিতে আঞ্চলিক ভাষাভেদকারিণী আছে। বেবর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বৈদিক ভাষাকে প্রাচীন প্রাকৃতরূপে গণ্য করেছেন। ডাঃ হৃষিকেশ বেদান্তশাস্ত্রীও আমার নিকটে বহু সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের মূল মাত্র বেদেই আছে বলে প্রতিভাত হয়েছে; যেমন ভল=ভাল, পুরোডাশ=পরোটা বা রুটী।

ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে নিম্নোক্ত শব্দগুলিকে ভারতীয় ও সংস্কৃতমূলক বলে প্রমাণ করা যায়, অথচ অনেক এগুলি বৈদেশিক বা বৈদেশিক-প্রভাব জাত বলে যেখানে ঠেকেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি :—(১) পাণিনীয় 'তামলিপ্ত' শব্দ মূলে তাম্রলিপ্ত-লিপ্তাদি পরমূলের প্রয়োগ। এ ধারা

বাঙ্গালীর মধ্যে তামিল রক্ত দেখাতে পাওয়া যাবে না। (২) বৈদিক 'দাক্ষায়ণ' শব্দের বহুবিধ ব্যাখ্যা আছে (বৈয়ঃ ৩।৪-২৩) দিয়েছেন। এতে শব্দটি 'অস্থিক' বা 'অনার্য্য' মনে করার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। (৩) 'বঙ্গ-আল' বা বেত-আল (=বঙ্গ) শব্দের 'আল' প্রত্যয় টী যে দ্রবিড়ীয় এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় না। কৃৎ 'কালন' বা তদ্ধিত 'আল' প্রত্যয়েও ঐ শব্দ সিদ্ধ হতে পারে, যেমন স্বার্থাদি অর্থে বৈদিক শক-আল বা পকাল শব্দ সিদ্ধ। কেউ বলতে পারেন যে আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে বহ (বঙ্গিণী) ? তাতা ভূখণ্ডের সীমায় 'আল' স্তূপ নির্ম্মাণ করতেন, এইরূপ অর্থেই বঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন। ঐ অর্থে 'আল' যদি দ্রবিড়ীয় হয় তাহলেও বলা যায় না যে বঙ্গে (=বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গে) দ্রবিড় প্রভাব ছিল ; যদি তাও হয় জাতি বা রক্তের কোন কথা তোলা যায় না।

পাণিনীয় সূত্রাদিতে বঙ্গাদির উল্লেখ দেখাচ্ছি। (১) ৬।২।১০০ সূত্রে আছে 'অঙ্গিষ্ঠ-গৌড়পূর্ব্বে ঠ', এই সূত্রানুসারে গৌড়পূর্ব্ব শব্দ সিদ্ধ। (২) ৪।২।১০৮ সূত্র 'গহাদিভ্যশ্চ'র গণপাঠ সূত্রে 'অঙ্গ, বঙ্গ---' আছে। (৩) ৪।১।১৭০ সূত্রে আছে—'ষ্যঙ্ক্‌যগবকলিঙ্গ সুরসাদগ্‌' ; অর্থাৎ ত্রিবর শব্দ, মগধ প্রভৃতিতে অণ্ প্রত্যয় চলবে। অণ্ যুক্ত ত্রিবর শব্দের উদাহরণে ভট্টোজী লিখেছেন—অঙ্গ, বঙ্গ, মৌক্য। (৪) জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে 'লাঢ' বা রাঢ় শব্দ আছে ; একে গুজরাটের 'রাঢ়' মনে করার কারণ নাই। (৫) জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি প্রভৃতি শব্দে গুড়ি শব্দ বা প্রত্যয় দেখেই কোল ও নিষাদ নামে পৃথক রক্তগত জাতি মানার প্রয়োজন কি ? যদি জাতির তালিকায় কেউ এদের নাম দিতেও পারেন তবু এটা মনে রাখতে হবে যে এদের স্থান ও প্রভাব গৌণ। (৬) পূর্ব্বোক্ত 'অনতিদম্যঃ অগ্নিনা' পদের স্বাভাবিক অর্থ 'অগ্নি দ্বারা অতিদগ্ধ নয় অর্থাৎ অল্পদগ্ধ'। কাজেই 'অনার্য্য বঙ্গদেশ অগ্নিপুড়া জানত না' ধরণের মতের কি মূল্য আছে ? (৭) বেদাঙ্গোক্ত প্রাচ্যদেশ ও প্রাচ্যভাষার মধ্যে বঙ্গদেশ ও সংস্কৃত (বঙ্গ) ভাষা ছিল—এ অনুমান করা যায়। গৌড়ীয় প্রাকৃত বররুচির প্রাকৃত প্রকাশ প্রভৃতির মতে মাগধী প্রাকৃতের রূপান্তরে বা মতান্তরে গৌরসেনী প্রাকৃতের রূপান্তর হতে পারে তবে মতান্তর দেখা যায়। হয়ত প্রাচীনতর গুজরাতের অধুনাপ্রাপ্ত নাটকাদি, দণ্ডীর কাব্যাদর্শন বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতিতে গৌড়ীয় রীতির বৈশিষ্ট্যবর্ণা দেখা যায়। (৮) পূর্ব্বোক্ত ৩৪ লিপির মধ্যে বঙ্গলিপি হয়ত ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত হতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশেই প্রচলিত ছিল বলা যায়।

এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা এই বৃঢ় অনুমান করতে পারি যে যেমন বর্ত্তমানে সেইরূপ বৈদিক বা প্রাগৈদিক যুগেও বাঙ্গালা-দেশে প্রধানতঃ আর্য্যভাষা আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্যরক্ত বিদ্যমান ছিল।

আকুতি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নীড়ের জীবন নয়, ভীড়ের জীবন।
শঙ্খের গর্জ্জনে যেথা মুখর পবন,
পাঞ্চজন্য করে যেথা নিজে ভগবান
ভক্তেরে সংগ্রাম ক্ষেত্রে করেন আহ্বান—
সেথা মোর ঠাঁই হোক। রবোনা মূর্চ্ছিত
নিজীব শান্তির বক্ষে। ঐ নিপীড়িত
কাঁদে আর্ত্ত মানবতা! উদ্ধত অন্যায়
কষাঘাত করে তারে। নির্ব্বাসিত ন্যায়,
পদাহত স্বাধীনতা। তুমি এসো, বীর;
তোমার তূণীরে আনো বাছা বাছা তীর!
তোমার গাণ্ডীবে দাও প্রচণ্ড টঙ্কার।
নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও যত অনাচার।
নবসূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যাক্ চ'লে;
স্বর্গ নিয়ে এসো, বীর, মৃত্তিকার কোলে!

লুকোচুরি

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বুঝি তব নীরবতা, কারণ তাহার;
এ ত নয় অকরুণা তব; অভিনব
প্রণয়ের এ যে অন্য রূপ। তাই তব
নীরবতা বুকে মোর তুলিছে ঝঙ্কার।
মোর প্রতি জানি তব নাই অসন্তোষ।
কেমনে সম্ভব তাহা? তুমি ত পারনা
আমারে করিতে হেলা, আমার কামনা
দলিতে কঠিন পায়ে করি ক্রূর রোষ।
এ কঠিন নীরবতা শুধু লুকোচুরি
প্রণয় খেলায়, হার জিতে সুমধুর,
যত ধরা দিতে চাও তত রও দূর;
এ আগুন আলাহান প্রীতি-ফুলঝুরি।
ক্ষমা করো, কথা কও, মানি পরাজয়,
তব কাছে পরাজয় সেও মধুময়।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছোট থাকল সেইদিন বৈকালে আষাঢ়ের মাঝের মাঝেই একটা পুরানো গামছার ফোটায় থেকে হাত পুরে বার করে আনলো একটা মৌচাক।—চমকপ্রদ ভাবে ওরা যাবিবি, আমাদের বন্ধু-টিক বাখলো।

আমীনাদের বক্তব্য—কের দুক করেছিল মৌচাককে হার দিতে।

—বছরে পড়ি গেল, আমলায় বাবুদের অভি।

এতদিন কিন্তু ওটা কারুর চোখে পড়েনি, যদিও ওর নীচের ঘাসে বাস করছি এতদিন।

যাক্‌গেই কাটুক এই জীবন জগতের সঙ্গে কোন যোগ নাই। পরোও খবর করবার কোন উপায় নাই। ইচ্ছা করলেও পকেট থেকে পয়সা বার হবে না। এই পনেরো দিন হাতে পয়সা টাকা কিছুই স্পর্শ করিনি। দেখলাম আমিও জীবনে ওই টাকা মূল্যহীন অসার। রাত্রে মাঝে মাঝে শোনা যায় দু'একটা এরোপ্লেনের শব্দ! উর্ধ্ব আকাশে তাকে আলো ফেলে অনুসন্ধানের ফিরে—না হয় বেলুনের পানে। আবার সব স্তব্ধ হয়ে যায় সভ্যতার কোলাহল। ব্যাটারি সেট রেডিওটা নীরব হয়ে গেছে। বোধ গাংএর জল বাতাসে কি করে তিনদিনের পরমায়ু একবারে খতম করে নির্বাক করে গেছে। ভালোই হয়েছে।

আলোড়ন তুললো একখানা নৌকা। পথে এসেছিল চাল চালান দিতে, মাল কাটাতে। ডাকাতের দল চড়াও হয়ে সব কেড়ে নিয়েছে, মাঝিদিকে মারধোরও করেছে খুব। একজনের মাথায় চোট লেগেছে, একজনের হাত পা ফুলে উঠেছে, উত্থানশক্তি রহিত। দু'দিন, দুরাত কিছুই খেতে পর্যন্ত পায় নি, ফিরবারও সামর্থ্য নাই, কোনরকমে এসে পৌঁছেছে এখানে।

দেখতে গেলাম; নৌকাখানার ভূমে চোখে আতঙ্ক আর অসহায়ের ছাপ। ওঁদের একজন মাঝি। অনুপস্থ বলতে কিছু-মাইডিন, বেদনেম, আর সালফাসাবাদের ট্যাবলেট। তাই দিয়ে যা হয় করা গেল। বড়বাই দিলেন কিছু চাল ডাল।

—"সব খেয়ে যাবু।"

—"জান তো যায় নি, আবার সব হবে।"

ওদের মুখ দেখে আমরাও আতঙ্কিত হই। ভুলে যাওয়া সেই আগের দিনগুলো মনে পড়ে।...তবে এখন মনে হয় মুক্তিপ্রদ দেখাতো হয়েছে, ফেরবার পথে যদি ওদের সঙ্গেই দেখা হয় অন্ততঃ দুজনকে দেখার বাবা আর রবে না। নিত্য ঘুরেই চলে থাকে ওরা। তবে ওই দুইযোগ সহ্য করা যার তার কম্মো নয়, নেহাৎ বাওলিয়ার পরাণ তাই পেরে উঠেছে। ভুলে যাওয়া রাত্রিগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আসছে। পশ্চিমমুখের আকাশ গায়ে দিনের শেষ বেলা মনে। ক'টা বাঘ বাসার মাঝখানে একটা পুকুর একভাগে ছোট কোন বস্তির। তাকে কেন্দ্র করেই মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে আসে যাত্রী, দোকান পসার বসে। রাত্রিবেলা জ্বলে ওঠে হেজাক গ্যাসের আলো। নির্জন প্রান্তর ক'দিনের জন্য মুখর হয়ে ওঠে, শোনা যায় যাত্রার বলের কর্নেট ফ্লুটের সুর। ঢোল বাজে দুপ্তের দুরে।

অরেকদিন মাত্র। আবার সব দোকান পসার উঠে যায়, বিলিয়ে যায় যাত্রীর দল। ক'টা বাঘে আবার নেমে আসে শুব্ধ প্রশান্তি। অষ্টাহের আনন্দ কোলাহলের সাক্ষ্য দিতে পড়ে থাকে ভাঙা উনুন, এঁটো পাতপাতার স্তূপ আর ছাই গাদা। যাত্রীদল দোকানীরা তো যাই-ই, আশপাশের গাঁয়ের ছিয়ে ভাঙা ঝোঁয়াওঠা কুড়েগুলোও আবার যে যার বাঁই ফিরে যায়। নির্জন বাঘটা নীরবে বাসে যায়।

কেদোর চরের অবস্থাও তাই। এ কূপের কাম শেষ হয়ে আসছে। অনেক নৌকা চলে গেছে, যারা আছে তারাও এই কেপ বাদ বোঝাই হয়ে গেলেই পাড়ি জমাবে। মক্ষিণা বাতাসে ওঠবার আগেই সমুদ্র ও বড় গাং এর আওতায় বাইরে যেতে হবে। সকলেই তাড়াতাড়ি করবে। নীরব মরুভূমিতে আবার মেতে আসবে আরণ্যক গুঞ্জন। ক'দিন এসেছিল মানুষ, তাদের কোন চিহ্নও রাখবে না শিশুর প্রকৃতি, জোয়ারের জলে সব ধুয়ে মুছে দিয়ে যাবে। আমরাও যাবার তোড়জোড় করছি।

ফিরে যাবো, বাওলিয়ারা যাবে অন্ধ বনে, আমি ফিরবো সহরের মানুষ, সহরে। সেখানে বিদ্যুতের আলোয় শীতে রেডিয়ো ঘরে কোন হতুলোকের বন্ধুর ঘরে গল্প হবে এই আদিম জীবনের, ওই অসীম রহস্যময়ী বাওলিয়াদের, দুস্তর গাং এর। চোখের সামনে ভেসে ওঠবে ওই ডাকাতপড়া নৌকায় মাঝিদের কাতর চাহনি, আর্তনাদ। মাঝের দুখে সেই বাওলিয়ার মেয়েটা, বসুন্ধরা স্কুলমে হারিয়ে যাওয়া লক্ষিকের বাপের কথা, হয়তো শুনবে বোপদুরস্ত ভদ্রলোকরাই; তাদের উপন্যাসের পাতায় লেখা কোন ঘটনা। যারা হক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে আমার দেবার যোগাড় যোগাল তারা অজানাই থেকে যাবে। তারা যান করবে সেই গহন অরণ্যে। আজ যাদিকে দেখে যাচ্ছি, যদি ভবিষ্যতে কোনদিন ফিরে আসার সুযোগ হয় তাদের অনেককেই পাবো না সাধনে। কেউ নেই দুজনে—কেউ বা অজ্ঞানের দুর্ঘটনায়। প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় ওরাও এক একটি অংশ। সহরে মানুষ ওদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করুক না করুক ওরে কিছু এসে যায় না তাদের। ওরা এই বনভূমি গাং বনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তুলো সর্দার মাঝিক আলীনাদের আর সে'দিন জমের পরাণ কেওড়া গাছ—

ওরা সমগোত্রীয়। শত বিপদ, দুর্যোগ, দুঃখের মাঝেও কৃপণ প্রকৃতির দেওয়া এতটুকু কৃপণতাকেই বহু বলে মেনে নিয়েছে। কারুর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ নাই অভিযোগ নাই।

বাদুড়ের সন্ধ্যা নামছে। জলকল্লোল এসে আঘাত করে ফিরে যায় তীরে তীরে। ঘোমটা টাকা সলজ্জবধূর মত অভিসারে এলো সন্ধ্যা। আমার জীবনে আর কোনদিনও এমনি নিবিড় প্রশান্তি ঢাকা দিনশেষ নেমে আসবে কিনা জানি না; কৃপণের সোণার মত সারাদেহে চেয়ে থাকি ওই রংএর মধুমেলার দিকে। কেমন যেন সবুজ গাঢ় আভা লুটিয়ে পড়েছে জলে।

কেমেছিলাম আসবার সময়, কি পাবো এই দুর্গম পথের প্রান্তে? কি লাভ হবে আমার? তীর্থে যাচ্ছি না—মুক্তির বিলবার আশাও নাই। তবে কেন এই পরিশ্রম, এই দুশ্চিন্তা, মৃত্যুর মুখোমুখী অভিযান!

আজ মনে হয়—ব্যর্থ হইনি। এ যা সম্পদ কুড়িয়েছি এই কদিনে জীবনের মণিকোঠায় তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। দেখেছি রূপের অন্তরালে প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ কল্যাণময় রূপ। বিস্ফুব্ধ চিত্তকে ওরা ফিরিয়ে স্পর্শ, অনুভব করেছি পদে পদে কতখানি আমার জীবন, কি এক মহাদেবতার করুণা কুড়িয়ে জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস নিয়ে চলেছি। বার বার মনে হয়েছে তুচ্ছ আমি, তুচ্ছ আমার মনে অভিমান, বরদা আমার বিশ্বা অম্বিকা। মাথা নুইয়ে এসেছে আকাশযোড়া আসন পাতা দেবতার পায়ের তলে। বামমুখে তার হাসে, দক্ষিণমুখ ভরে উঠেছে কল্যাণের স্নিগ্ধতায় অপরূপ সৌন্দর্যে। দিনের প্রান্তে এই সীমাহীন বিস্ময়ের নীচে দুহাত যোড় করে আমিও প্রণাম জানিয়েছি—

—ওঁ তৎ সৎ কল্যাণতমং তৎতে পশ্যামি।

এমন প্রাণঢালা প্রণাম কোনদিন করতে পারিনি। বাধা হয়ে এসেছে আমার পাওয়া না পাওয়ার চিন্তা, আমার অভিমান। এখানে সব জীবন আমার গলে গেছে, একটি মুহূর্তও জীবনে এসেছে, যে পরম ক্ষণে আমি ফিরে গেছি উপনিষদের আরণ্যকযুগে—লাভিয়াছি করেছি এক বিদেহী বন্ধনহীন আত্মার, যে পৃথিবীর দিকে দিকে প্রদক্ষিণ করে এসেছে, ললাটে যার বহু হাতের কল্যাণস্পর্শ; সব বন্ধনহীন একটি মুহূর্তে আমি প্রণাম করেছি।—হে দেবতা তুমি জানো কোন কামনার লেশ মাত্র তাতে ছিল না, সীমাহীন নিস্তব্ধতায় বিনাতে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্মিত একটি মানুষ তোমার বিরাট স্বরূপকে প্রণতি জানিয়ে ছিল কী অপরিসীম আনন্দে। এইটুকু স্মরণ রেখো।

জীবনের একটি মুহূর্তের এই নিঃশেষ আত্মনিবেদন তুমি গ্রহণ করো; একটি প্রণাম যেন আমার জীবনের পথে এতটুকুও আলোর স্নিগ্ধতা আনে।

…তোমাকে দেখে গেলাম, কুড়িয়ে নিয়ে গেলাম তোমার প্রণাম, নিঃস্বজীবন আমার পূর্ণ হয়ে উঠলো। হিসাব করি কি পেলাম এই পথের প্রান্তে, অনুভব করতে পারি কি এক আনন্দ আমার মনে, ব্যর্থ আমি হইনি।

নৌকায় ফিরেছে মাঝিমাল্লার দল। চৌমি ছেলে ঘুমোচ্ছে ওদের চালের আড্ডা। কে যেন পড়ছে সুর করে সেই বহুপঠিত কিতাব খুলি বড় সোনাডাঙ্গা। বড় নৌকায় বসেছে বন্ধুদের দল, আলো কমিয়ে দিয়ে গল্প শুরু করেছে—জিন পরীর গল্প, আশেপাশের নৌকা থেকে আরও কে কে এসে জুটেছে। আমরা কানে আসে।

—ঘুট ঘুটে আঁধার—ঘন জমে ঘন। গাঙ পড়লি কুলো হয়, ডাল পড়লি চিঁচি, আসছে সোয়ার নীল ঘোড়ায় টগবগিয়ে, ডাঙ্গের ওপর থেকে কোঁস করি উঠলো অজগর।

ছেলেবেলার গল্প শোনার দিনগুলো মনে পড়ে। কত সন্ধ্যায় আমনি মনে শুনতাম রাঙাপুকুর বেজমা-বেজমীর গল্প। ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়লো এই বনরাজ্যে এসে। কর্মকান্ত জীবনে এতটুকু বৈচিত্র্য আনতে ওরা আশ্রয় নিয়েছে সেই জলকথার। কিন্তু ওদের গহন মনের কথা নিঃসঙ্গে ধরা দিয়েছে তা ওরাই জানেনা।

বৈকালে একটা ছেলে এসে দিয়ে গেছে প্রায় আধসেরটাক মাছ, পয়সা নেবে না। বড়মা তাকে কিছু চাল দিলেন। মহাখুশী ছেলেটা। কয়েকটা বড় ছেলেমেয়ের জিমে নোনা জল ছেলে রেখেছি মাছগুলো বড় বড় পাত্রগুলোতে, আড়ঙ, পাবদে। এতক্ষণ পাবদে বাঁচে যায় না।

কিন্তু বাঁচলো না। কলতাটা নিয়ে মাথার চেষ্টা করলাম কিন্তু ওরা নারাজ। কিছু জিনিষের ভক্ত রেখে দিয়ে বিদায় যাওলিয়া দিলাম। "মুলতান আর গজনী" বলে পিঠে লম্বা ঘিয়ে লাল রং এর ঝোল করেছে দেখলাম। লঙ্কা ঝিক্ ঝিক্ করছে ঝোলে, এত তেজ যেন দেখলাই কাঠি জ্বালালে দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

কাল এই সময় কোথায় থাকবো জানিনা, তবে আজ রাত্রিই কেরোয় চরে আমার শেষ রজনী।…কি যেন একটা মায়া পড়ে গেছে এই ছোট্ট গাঙ, দুপাশের বন বন, ওই যাওলিয়াদের উপর। যেন কতদিনের পরিচিত ওরা।

বড়মা বাড়ীতে চিঠি লিখছেন। লঞ্চ উঠলে ২দিনেই কলকাতায় পৌঁছবো যোবহর।

সকালে ঘুম হতে এলাম খাল থেকে লঞ্চের উদ্বেগ। প্রথম আলো লুটিয়ে পড়েছে সমুদ্রের ছেটজাল জলে। পিছনে পড়ে রইল জলভূমি—এদিকে চলেছি লঞ্চ যেখানে ছিল সেইদিকেই। কিন্তু কোন চিহ্নই নাই লঞ্চের। জেলেনৌকাগুলোও বেপাত্তা। জনহীন সমুদ্র জনহীন তীরভূমি নীরবে পরিহাসভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

কিরেই চল, বড়মার লঞ্চ তো আসেই, ওতেই ওঠা যাবে।' অর্থাৎ সেই টাপুরি নৌকা।

হঠাৎ ইসুফ চীৎকার করে ওঠে—আব্ ওই যেমুন লঞ্চ, আমাদের খালে ঢুকতিছে।

আমরা তখন অন্যমনস্ক, বীফ ভাত কলাসেদ্ধ খাচ্ছি। এদিকে, লঞ্চ খালের এমুখে ঢুকে যদি ওমুখে বার হয়ে যায় তাহলে

তো ওদের এবং আমাদের পরিচয়ই মিথ্যা। বাধ্য হয়ে পলার মাঝনাইটা খুলে নৌকার উপর দাঁড়িয়ে 'সিওয়াক দি সেলারের' মত অবাস্তব ভাষায় চীৎকার করতে থাকি—ও···ও:···হোই।'

মাঝনায় বাড়ি আর চীৎকার করি প্রাণপণে। বনভূমি থেকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসে ওই চাক, লক কিন্তু খালের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেন।

—ফিরে গিয়ে খালের মুখে বসে থাকি, ওরা এদিকে বেরুবে নিশ্চয়।

নৌকা ফিরলো। ঘুরে মিলিয়ে গেল লকের শব্দ।···আকাশ বাতাস শুদ্ধ হয়ে আসে, জেগে থাকে গাংচিলের চাক।

—চাঁ্যা—চাঁ্যা—

ওরাও যেন বন্ধ দেখছে।

শেষ পর্যন্ত লক এইদিকেই ফিরলো। অযাচিতভাবে বিনা পয়সার যাত্রী আমি, তাকে তুলে আনবার জন্ত গুল গুটিয়ে গাং পাড়ি দিয়ে যে লক ফিরে ফিরে হাজির হবেন জীবনবাবু তা ভাবতেই পারিনি। প্রথমে আমাদের খালের সন্ধান করতে পারেননি, এদিক ওদিক ঘুরে শেষতক সন্ধান পান খালের। শুধু বিনা পয়সার যাত্রী নই, পাইখোয়াকীও টেনে তাঁদিকেই দিতে হবে, তবুও তাঁরা ফিরে-ছিলেন লক ফিরে বেশ কয়েক মাইল দুস্তর গাং পাড়ি জমিয়ে।

আলাপ পরিচয় হোল জীবনবাবুর সঙ্গে। মালপত্র নীচে রেখে আমাকে নিয়ে উঠলেন ছাদে সারেঙের ঘরে। এটা অবশ্য একটা লক সেই বুদ্ধিমান ভদ্রলোক আছেন যে লকখানা চলছে আরও ওপরে। ফ্লেনেভিন্সির কাছে।

লক পাড়ি জমিয়ে চলেছে নদুমের প্রণালীর বুকে। লকাসে উঠছে ঘষিনা বাতাসে। যে বলয় পবন রোদাপের স্বপ্ন করে আনে অতনুর, সেই বলয় পবন যে পরাণ আঁতকে তুলতে পারে তার নমুনা দেখলাম এই গাং এ। লক আছাড় পড়ছে ঢেউএর মাথায়, লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে ঢেউএর উপরে। আড়মুখ পাড়ি ধরে লক প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে নদীর মোহনায় এসে পৌঁছল। জল এখানে লাল-দিয়ে। বাঁ পাশের বনভূমি ঘিরে চলেছে লক।—জীবন-বাবু ইঁয়ারিং ধরেছেন, অবশ্য লকের ইঁয়ারিং আর ইঞ্জিন দুটো আলাদা আলাদা, ড্রাইভার ইঞ্জিন চালুরেখেই খালাস, ঠিক পথে দিয়ে যাবার ভার ওই ইঁয়ারিং যার হাতে তারই।

দুচোখ নদীর জলের দিকে নিবদ্ধ। হঠাৎ কেমন যেন একটা আলোড়ন সুরু হ'ল জলের বুকে। লকের শব্দ পেয়ে মাছের ঝাঁক দুটোছুটি আর লাফালাফি করেছে। নীলজলের বুকে রূপোর পাতের মত চকচকে মাছগুলো খই ভাজার মত ছিটকে যায় এদিক ওদিকে। ইলিশ মাছ!

এত মাছ। প্রায় আধ মাইল ধরে চলেছে ওরা ঘন বেঁধে উল্লাসে!···তাড়া খেয়ে আরও বেঁধে চলেছে ওরা। দেখা যায় সেই লকখানা পিছনে কয়েকটা ডিঙি বেঁধে এগিয়ে আসছে। ওরাও বোধহয় ঝাঁকের সন্ধান পেয়েছে। নৌকাগুলোকে ছেড়ে দিতেই এগিয়ে আসে তারা। বেশ ক'খেপখানা 'দুট' নৌকা সেই মাছগুলোকে জাল ফেলতে ফেলতে ক্রমশঃ অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলে বাকী কয়েক-খানা নৌকা থেকে মাঝি জেলেরা জলের বুকে লগির ঘা মেরে আর চীৎকার করে ঝাঁকটাকে তাড়া দিতে এগিয়ে আসে সেই জলের খেরার মধ্যে। ঠিক যেন খাপোস ধরার মতই। একদিকে জাল ফেলে অন্তদিক থেকে দল বেঁধে সাওতালরা চীৎকার করে শিকারকে তাড়া দেয় জালের দিকে। জালের কাছে এলেই ঠেঁকিয়ে তার পক্ষ প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেয়।

মাছের দলও তেমনি তাড়া পেয়ে জালের সীমায় এসে আটকে পড়ে, ক্রমশঃ জাল তুলতে তুলতে নৌকা দুটো দূরত্ব কমিয়ে আনে। জালের প্রস্থ কম করে নব্বইটি একশো হাত কিন্তু যে জায়গাতে মাছ ধরা হচ্ছিল সেদিন—সেখানের গভীরতা একশো হাতের চেয়েও বেশী। তাই ঝাঁকটাকে ঠিকমত কায়দা করতে পারেনি! জাল তুলতে তুলতে উঠে আসছে রূপোর পাতের মত, ইলিশমাছের ঝাঁক। ছটফট করছে, জালের মধ্যিখানের ঠাইটা মাছের লাফালাফিতে ওরে উঠেছে···ছোট ডিঙি খোলের টপটপ করে তুলছে মাছগুলো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। বাঙালীর মাছ সম্বন্ধে দুর্বলতা চিরন্তন, তাতে আবার ইলিশমাছ। তারা তো পরের কথা, মাছ দেখেই জিব সরস হয়ে ওঠে।

—লক পাশে গিয়ে ভিড়েছে। বাতাসে দুলছে নদীর জল, লকও দুলছে তালেতালে। জেলেরা একখেপ মাছ ধরে আবার নদীর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে, কোথায় দেখা যাচ্ছে মাছের ঝাঁক। দেখা যাচ্ছে বটে, ঢেউএর বুকে লাফিয়ে ওঠে দু'একটা মাছ, কিন্তু জল সেখানে এত গভীর যে জালে কায়দা করা যাবেনা। একক্ষেপেই বেগতিক দেখে সেদিন ধরা পড়লো প্রায় আটাশো কুড়ি সের মাছ।

লকের খালাসী ক'জন লেগেছে বরফ ভাঙতে, কেউ বা ঘোলে মাছ ধোয়াই করছে। বরফ চাপা দিয়ে না রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গিরীন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বস্তিতে বস্তিতে আবার লেগেছে মড়ক। মহামারী নয়। বসন্ত, ওলাওঠা বা টোটাকোলার মহামারী হলে ওরা বেঁচে যেত। ঘরে ঘরে মুঠির চাল সেধে না-হয় ভিক্ষামাগা পয়সার চাঁদা তুলে, হয়তো মা-শীতলা বা ওলাইচণ্ডীর পুজো দিত ওরা বস্তির কল্যাণে। কিন্তু হঠকারি মরবার সুযোগ পেয়ে, বেঁচে থাকার হাত থেকে রেহাই পেত। এমন করে কতদিন আর বাঁচবে ওরা! তিল তিল করে দিনগুণে বেঁচে থাকার যে কি কষ্ট, তাতো বোঝে না কেউ। ওরা জানে যে, বাঁচতে ওরা আসেনি দুনিয়ায়। তাই বাঁচবার জন্যে যারা রাত্রিদিন ছুটোছুটি করে, কাতারে কাতারে গাড়ীঘোড়ার ভিড় জমিয়ে গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে, তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে ওরা পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়ায়। তবু যেন জায়গা হয় না। পথের কিনারে, গলির আনাচে-কানাচে আর একদল মানুষ ভিড় জমিয়ে ওঁত পেতে থাকে—কখন ছিটে-ফোঁটা ছিটকে পড়বে ওই জ্যান্ত মানুষগুলোর হাত ছাপিয়ে! ডাস্টবিনে বা ফুটপাতের কিনারায় পড়বে আধ-খাওয়া রুটির টুকরো, কিংবা ওদের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত বাসি খানিকটা ডাল-তরকারি স্যালাড!

এমনি করে যে ক'দিন চলে! চলতে চলতে হয় যেন ফুরিয়ে যাবে, ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। রক্ত-শূন্য হয়ে ধীরে ধীরে চোখ দুটো কাকাশে হয়ে আসবে। তারপর পা দুটো ফুলে উঠবে। চোখের কোণে জল জমবে। পেটটা ফুলে ডিগডিগ করবে। হাড়-পাঁজরা জেগে উঠবে। মাথাটা শুকিয়ে তালের আঁটির মত খটখট করবে। দুদিন পরে শ্বাসকষ্ট সুরু হবে। গলাটা ঘড়ঘড় ক'রে কখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, টেরও পাবেনা।

পরপর দু'টা লোক মরেছে ওই একই ব্যামোতে। আজ সকালে মরলো পুঁটি পল্লানির সাত বছরের ছেলেটা। মরলো না তো, বেঁচে গেলো: অতসী ভাবে।

ভাবতে ভাবতে চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

ওর বাবা যখন সান্নিপাতিক-রোগে ভুগে অন্ধ হয়ে গেল, অভাবে পড়ে ঘটি-বাটি যাকিছু ছিল, সব বিক্রি করেও মা কুল কিনারা পেলে না, সংসারে গোটা গোটা উপোসের পালা সুরু হলো। শুকিয়ে শুকিয়ে ছোট ভাইটা মরলো আগে—দিনের পর দিন না খেয়ে। তারপর মরলো মা....ঠিক—ঠিক এমনি করেই হয় তো মরেছিল তারা। অতসী তখন এতখানি বুঝতো না। তবে একথা বেশ বুঝতো যে, না-খেয়ে-খেয়ে বত্রিশটা নাড়ী ওদের চুঁইয়ে চুঁইয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল।...শেষে?

শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল সব। নিরুপায় হয়ে ওর অন্ধ বাপের হাত ধরে এসে ও উঠেছিল এই সহরে। সেই থেকে ওরা ভিকিরী হলো। পাড়ায় পাড়ায় গেরস্তদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে একমুঠো চাল না-হয় একটা পয়সার জন্যে হাত পেতে বেড়াতে লাগলো।...সব কথা আজ ওর ভালো করে মনেও পড়ে না। তখন কতই বা বয়েস!

মাথার মধ্যে অস্পষ্ট স্মৃতিগুলো কেমন পিলপিল করে ওঠে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে অতসী চোখদুটো বন্ধ করে। নিজেকে সামলে নিতে ও শিখেছে এখন। তবে সেই মটরগাড়ীর ধাক্কা খাওয়ার পর থেকে শরীরটা যেন কেমন বিকল হয়ে গেল। দুঃখ সামলালেও কোঁক সামলাতে দেরী লাগে। থেকে থেকে পাঁজরার ভিতর ডানাকাটা পাখীর মতন প্রাণটা যেন ওর ছটফট করে। অবসন্ন দেহটা থরথর করে কাঁপে।

কি গো, তোমার বাবু কতি গেল?

অতসী সাড়া দেয় না।

মেয়েটা কাঁদাল গলায় আবার বলে ওঠে: শুনতে তো পাবাই না এখন। ধার দেবার বেলায় মনে থাকেনা?

ধার! কে ধার নিয়েছে তোমার কাছে?

আহত পাখির দৃষ্টিতে অতসী মুখ তুলে চায়।

মেয়েটা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে: জানো না বুঝি? ন্যাকা! খাবার বেলায় মনে ছিল না?

এতক্ষণে অতসী চিনতে পারে। গলির মোড়ের তেলেভাজার দোকানের সেই ছুঁড়িটা। হয়তো পয়সার তাগাদায় এসেছে ওদের বস্তিতে।…কিন্তু ওর কাছে কেন? ও তো কোনদিন আনেনি কিছু ধারে।

তুমি আনবা কেনে। এনেছে তোমার বাবু—সেই লম্বা রোগা লোকটা।…দিবারণ।

কি বললে?

অতসীর মগজে যেন দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। নিমেষে ঝড় ওঠে ওর মস্তিষ্কে। প্রচণ্ড আঘাতে চির-খাওয়া কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে ওঠে জলভরা চোখের কোণে: খবরদার বলছি, অমন কথা মুখে আনবে না কোনদিন। তেলে-ভাজার দোকানে রাতদিন তাড়িখোরের ভিড় জমে কিনা, তাই। নইলে—নইলে—

অতসীর মুখে আর কথা সরে না। উত্তেজনার ভাঁটায় ওর সমস্ত সত্তা ভেঙে পড়তে চায়। দুহাতে মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ে মেঝের। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মেয়েটা হতভম্বের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে নেমে গেল পরচালা থেকে।

অতসী যে কতক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল ঘরের মেঝেয় তা নিজেও জানে না। দুঃখের উত্তাপ জুড়িয়ে আসতে এখন আর ওর দেরী লাগে না, তাই পরক্ষণেই কান্না থেমে যায়। চোখের জল শুকিয়ে আসে। কিন্তু সর্বাঙ্গ বয়ে নামে একটা অবসাদ। রোগজীর্ণ হাড়-পাঁজরার ফিতিয়ে আসে ঠাসা-ঠাসি উপোসের সীমাহীন অবসন্নতা। চোখের পাতা দুটো মেলতেও যেন সে হাঁপিয়ে ওঠে। মন চায় না আবার উঠে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার মাটিতে পা বাড়াতে।…এমনি করে যদি আস্তে আস্তে থেমে যেত ওর শরীরের সব কলকব্জা! নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যেত ঘুমের ভিতর! অতসী বেঁচে যেত। আর পারে না। আর পারে না সে জীবনের বোঝা বইতে।

দুপুর গড়িয়ে যায়। বস্তি-বাড়ীর ভাড়াটেরা সব বেরিয়েছে দিক্-দিগন্তরে রুজির সন্ধানে। কেমন একটা থমথমে নীরবতা আর স্যাঁতসেঁতে গন্ধে মন বন্ধ হয়ে আসে। সেই নিস্তব্ধতাকে নাড়া দিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসে পুঁটি গয়লানির চাপা কান্না। এখনও বুঝি কাঁদছে সে মরা ছেলেটার শিয়রে বসে। গলার সুর নরম হয়ে এসেছে। এবার ক্লান্তি নেমেছে পুত্র-শোকাতুরা মায়ের দেহমনে। আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে গড়িয়ে পড়বে ছেলেটার একপাশে। কান্নার সুর টানতে টানতে অবসাদে শিথিল হয়ে আসবে ফুসফুস দুটো। কখন ঘুমিয়ে পড়বে, বুঝতেও পারবে না।

ভূত দেখেছ অতসী, ভূত?…হাড়ে হাড়ে গাঁট-বাঁধা চামড়ায় ঢাকা কঙ্কাল! হাত ধরাধরি ক'রে সারি সারি ঘুরে বেড়াচ্ছে বস্তির আনাচে-কানাচে, বড় বড় ফটকওয়ালা বাড়ীগুলোর সামনে, না-হয় ডাস্টবিন বা নর্দমার ঘুলঘুলিতে কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে এক মুঠো পচা বাসি ভাত—যা মানুষের দরকারে লাগে নি বলে ফেলে দিয়েছে।…দীনুর কথাগুলো অতসীর মগজে নড়েচড়ে ওঠে। শরীরটা ওর কাঠ হয়ে আসে। গা-টা কেমন ছমছম করে।

ঠিক বলছো, ঠিকই বলছো দীনু। ভূত ছাড়া আর কি? অনিশ্চিত সমাধে ভূতের মতনই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে ওরা। মরেও মরেনি। তাই হাড় কখানা আজও চামড়ায় ঢাকা আছে। রাত্তিরদিন পেটের ভিতর হাউ হাউ করে যে আগুন জ্বলছে তাই থেকে থেকে উঁকি মারছে রক্তশূন্য চোখগুলোর কোণে। সেই জন্যেই তো চোখগুলো অমন চক্‌চক্ করে।

খোকা মরে খালাস পেয়েছে। না চাইতে যেমন চুপিচুপি এসেছিল, আবার তেমনি অজান্তে কখন হাত-পিছলে পালিয়েছে। ঠিক তার বাবার মতনই এলো আর পালিয়ে গেল সে।…তা যাক। বেঁচেছে, বেঁচেছে সে। সারাজীবন ঘরে ঘরে মরার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।

ওইটুকু বয়েস থেকে ধুকধুক করে বেঁচে থেকে কি

লাভই বা হতো! পৃথিবীতে আর একটা ভিকিরীর বংশ গজিয়ে উঠতো ওকে ঘিরে।···যীশু ঠিকই বলেছিল।··· সত্যি!···মগজে কত বুদ্ধিই না ছিল তার। ভদ্দরলোকের ছেলে। অমন চেহারা ছিল, বিদ্যে ছিল, বুদ্ধি ছিল—সবই ছিল, তবুও কপাল দোষে কেমন করে এসে পড়েছিল ওদের এই নরককুণ্ডে।···আসতে সে চায়নি। অতসীই জোর করে টেনে এনেছিল। কিন্তু অত চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারেনি। থাকবার যা নয়, তা কি থাকে কখনো?

যারা যায়, তারা রেহাই পায়। যে থাকে, সে তিল তিল করে মরে। নিমু গয়লা যতদিন বেঁচে ছিল, কেনা দুধে জল ঢেলে বাড়ী-বাড়ী যোগান দিত। সাত পাঁচ করে দুবেলা দু-মুঠো ভাত যোগাতো ওই দুধের ছেলেটা আর তার মায়ের মুখে। চুলে এক খাবলা তেল দিয়ে, কপালে একটা সিঁদুরের টিপ প'রে গয়লানি রোজ সাঁঝবেলায় বস্তির এ-ঘরে ও-ঘরে এক পাক ঘুরে যেত। কালো নিটোল চেহারা সিঁদুরের টিপ আর খয়েরি পাড়ের শাদা শাড়ীতে যেন ঝলমল করতো। কতদিন অতসী আপন ভোলা হয়ে চেয়ে থেকেছে ওর মুখপানে।

কপালে সইল না। আচমকা একদিন মুখে রক্ত উঠে, নিমু গয়লা বিছানা নিলে। অমন পাট্টা জোয়ান! দেখতে দেখতে খারেল হয়ে গেল। কোথায় বা ওষুধ, কোথায় বা এক ফোঁটা পথ্যি। সাবু-বার্লি আর কলের জল খেয়ে যে ক'দিন চলে চললো। দুদিন যেতে না যেতেই পাওনা-দারেরা এসে বাড়ী কাদা করতে লাগলো। অতি কষ্টে নিমু তাদের কাছে মাসকাবারি যোগানের টাকা বরাত করে দিয়ে মুক্তি নিলে। তারপর এমনি এক সকাল বেলায় হঠাৎ পুঁটি চীৎকার করে মাথা কুটতে লাগলো ঘরের ভেলগড়ে উপুড় হয়ে পড়ে। ফুরিয়ে গেল সব। সেই টকটকে লাল সিঁদুর, শাঁখা, নোয়া, আর তার কোলে জাফরানি রঙের পলতোলা মোটা দুটো কাঁচের চুড়ি—সব ঘুচে গেল। আতেলা চুলের গোছা পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়ে সধবার চিহ্ন ধুয়ে মুছে পুঁটি শুকনো মুখে এসে দাঁড়ালো উঠোনের একটা কোণে। ঘুঁটের আগুনে হাত-পা সেঁকে ঘরের ভিতর গিয়ে হেঁটমুখে বসলো কপালে হাত দিয়ে। ছেলেটা হতভম্বের মতন একবার সামনে, একবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো। তার হাতে দেবার মত একমুঠো শুকনো মুড়িও তখন ছিল না ওর ঘরে।

নিশ্চিন্তে দুদিন কাঁদবার সুযোগও মিললো না পুঁটির। গতর ছিল। তাই খেটেখুটে ছেলেটাকে মানুষ করবার মন্ত্রে পুঁটি বেরিয়ে পড়লো কোমরে কাপড় জড়িয়ে। জীবন ঠাকুরের হোটেলে দু'টাকা মাইনেতে ঝিয়ের কাজ নিলে। দুবেলা দু'থালা ভাত আর মাসে দু'টাকা নগদ! পুঁটি যেন বর্তে গেল। ছেলেটাকে পেট ভরে ভাত দিত তিনবেলা। রোজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখে পানতোক্তা গুঁজে একবার করে এসে বসতো অতসীর ঘরে। অতসী তখন শুয়ে বসেই থাকতো। পথে বেরুবার ক্ষমতা তার হয়নি তখনো।

গল্প করতে করতে সাহস দিয়ে বলতো: অত ভাবনা করিস না। শরীরটা সারলে হোটেলে একটা কাজ নিবি। আমি যোগাড় করে দেবো তোকে।···দুবেলা পেট ভরে খেয়ে তো বাঁচবি।

অতসী কোন উত্তর দিত না। নিষ্প্রভ চোখে পুঁটির মুখপানে তাকিয়ে থেকে, নীরবে শুধু ঘাড় নাড়তো। ক্ষীণ একটু মরা হাসি ফুটে উঠতো অতসীর মুখে।

রোজ ভোরে উঠে পুঁটি কাজে বেরিয়ে যেত। একবার ফিরতো বেলা দুটোয়, আর একবার রাত বারোটায়। ছেলেটা সারাদিন খেলা করে বেড়াতো বস্তির পিছনে ওই খালি জায়গায়, না-হয় গলির মোড়ে।

সে আর ক'দিন!

কয়েক মাস যেতে না-যেতেই পুঁটির ব্যামো ধরলো। ব্যামোটা কি, তা পুঁটি কোনদিনই বললে না। তবে কাৎরে কাৎরে শুধু শুয়ে-বসে বেড়াতে লাগলো এ-ঘরে ও-ঘরে। কাজে তার কামাই আরম্ভ হলো। ফলে, বন্ধ হয়ে গেল দু-বেলার সেই দু'থালা ভাত। মাইনের পাওনা টাকা ক'টা এনে ভেঙে ভেঙে খেতে লাগলো। তারপর আবার যেমনকার তেমনি অবস্থায় পড়লো পুঁটি। দুবেলা সেই হরিমটর সুরু হলো।

ছাই-চাপা আগুন কতক্ষণ আর গোপন থাকে! নিটোল চেহারা দুদিনে সিটিয়ে গেল। কালি-ঝুল হয়ে এলো ডবডবে চোখের চাউনি। সারা গায়ে ফুটে

বেরুলো সিফিলিসের ঘা: দগদগে গরী ঘায়ের চাকা উঠলো চোখে মুখে।

ঠাকুরমশায়, এ কি হলো আমার?···কাঁদতে কাঁদতে পুঁটি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল হোটেলওয়ালা জীবন ঠাকুরের কাছে।

জীবন ঠাকুর মুখতুলে তাকায়নি। হাতবাক্স থেকে একটা সিকি বের করে ছুঁড়ে দিয়েছিল ওর সামনে।

পুঁটির ঠোঁটের কাছে জবাব এসেছিল। কিন্তু বলতে সে পারে নি কোন কথা। হাড়ে-ঘুণধরানো অভাবের তাড়নায় হেঁটমুখে সিকিটা কুড়িয়ে নিয়ে, চোখের জল মুছে, হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর সেমুখো হয়নি। ছেলেটা ছিল দুদিন ধরে উপোসী। তাই পারেনি সিকিটা জীবনঠাকুরের মুখে ছুঁড়ে মারতে। মায়ের প্রাণ অতবড় হেনস্তা মাথা পেতে নিয়েছিল মুখ বুঁজে।

তার পরের দিন থেকেই পুঁটি ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়েছিল।

কখন যে বেলা গড়িয়ে গেল অতসী তা বুঝতেও পারেনি। মগজে চিন্তার কুণ্ডলীগুলো রেলগাড়ীর চাকার মত একটার পর একটা সমান গতিতে ছুটে চলেছিল। নিতান্ত নিষ্ক্রিয় হাত-পাগুলো ছড়িয়ে জড়পদার্থের মত সে চোখ দুটো বন্ধ করে পড়ে ছিল ঘরের মেঝেয়। পুঁটির ছেলেটার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো, ওর খোকা বুঝি হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চৌকাঠটা পার হয়ে!

ইচ্ছা হলেও চোখ খুলতে পারেনা। ভয় হয়, পাছে ওর সেই মুহূর্তের অনুভূতিটুকু হারিয়ে যায়। যদি না থাকে খোকা! যদি কেন, নাই। নিশ্চয়ই নাই সে।

নিঃশ্বাসটা যেন বুকের ভিতর আটকে আসে। মাথাটা তাঁকিয়ে নিয়ে অতসী নিজেকে একটু সজীব করে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

রক্তশূন্য হয়ে পুঁটির ছেলেটার যখন হাত-পা আর গাল দুটো টোপলা হয়ে ফুলে উঠেছিল, পদ্ম একদিন হেসে বললে—এবার তোর ছেলেটার গায়ে শক্তি লেগেছে পুঁটি। ব্যামো ওর সেরে গেল।

পুঁটি হাঁ-না কিছুই বলেনি। কিন্তু অতসীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল: কি যে বলছো পদ্মদিদি!

হঠাৎ অতসীর চিন্তায় বাধা পড়লো। এলোমেলো ভাবনার কুণ্ডলীগুলো আবার মগজে মিলিয়ে গেল।··· নিবারণবাবু—নিশ্চয়ই নিবারণবাবু এসে দাঁড়িয়েছে ওর মাথার কাছে।

ঠিক তাই।

অতসী!

এঁ্যা: তাড়াতাড়ি আঁচলটা বুকে পিঠে টেনে দিয়ে অতসী উঠে বসে।

এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে নিবারণ জিজ্ঞেস করে—উনুন ধরাওনি?

না।

সে কি! সারাদিন তো খাওনি কিছু?

খিদে আজ আর পায়নি।

কি হলো আবার? না খেয়ে-খেয়ে শরীরটা যে শেষ হয়ে যাবে। তুমি খেতে চাওনা বলেই তো পাইস হোটেল থেকে ভাত আর আনিনা।

থাক: অতসী যেন হঠাৎ জ্বলে উঠলো।···কেন আপনি আমার জন্যে ভাত আনবেন নিবারণবাবু? যে ক'দিন সোয়ামী ছিল না, ওষুধ এনেছেন, ভাত এনেছেন, দুধ এনেছেন। অনেক কিছু এনে আমাকে দয়া করেছেন। কি দরকার ছিল তার? আমি তো আপনার কেউ নই। পাশের ঘরের ভাড়াটে, ভিকিরীর মেয়ে আমি।···আপনার দুটি পায়ে পড়ি নিবারণবাবু, অত দয়া আপনি করবেন না। বেঁচে কি করবো আমি? বাঁচবার কোন দরকার তো ছিল না আমার।

ছিঃ, অমন করছো কেন, অতসী?

না-না-না। ছিঃ নয়। ঠিকই বলছি আমি। জীবনে যেটুকু বাকী ছিল, তার জন্যে আর আপনি আমায় দয়া করবেন না নিবারণবাবু। আমার মতন একটা মেয়েমানুষ বেঁচে থাকলে, পৃথিবীর কলঙ্ক বাড়বে বৈ কমবে না।··· আমি পারবো না, পারবো না সইতে। আপনার পায়ে ধরি নিবারণবাবু, আপনি বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে। আর কোনদিন আসবেন না।

আপনার ওষুধ আর দুধ-ভাতের পয়সা আমি ভিক্ষে করে শোধ দেবো।···যান, যান, যান নিবারণবাবু।

আকস্মিক উত্তেজনায় অতসী কেমন উন্মাদ হয়ে ওঠে। অপদেবতা ভর-করা মেয়াসিনীর মত মাথাটা চালে। রুক্ষ চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ে ঘাড়ে কপালে। চোখে মুখে ফুটে ওঠে অস্বাভাবিক আর্ততা: আপনার পায়ে ধরি, আপনি যান নিবারণবাবু। আসবেন না—আর কোনদিন আসবেন না এঘরে।

নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত নিবারণ পিছিয়ে সরে দাঁড়ায়: বেশ, তাই হবে। আর আসবো না কোনদিন। তুমি অসুস্থ ছিলে, তাই—

সাতমহলের পাপে যারা কাঙালের ঘরে জন্মায়, তাদের আবার অসুখ কি নিবারণবাবু?···উত্তেজনার ঝোঁকটা অতসী সামলে নেবার চেষ্টা করে। একটু থেমে, বিড়বিড় করে বলে—ব্যামোতে ওষুধ না খাইয়ে যদি একচোক বিষ গিলিয়ে দিতেন নিবারণবাবু, অনেক পুণ্যি হতো আপনার। আমিও বেঁচে যেতাম।

কি লো অতসী!···দোরাগ কাড়ছিস্?

দুপাশের চৌকাঠে দুই হাত দিয়ে পদ্ম দাঁড়ালো এসে দরজার সামনে! হাসে, খিলখিল করে হেসে ওঠে অতসীর দিকে আড়চোখে চেয়ে।···পিছনে দাঁড়িয়ে এক ফেরিওয়ালা মিন্‌সে। পিঠে বেসাতির বোঁচকা।

ঘর ভাড়া নিতে এলাম তোদের বস্তিতে: পদ্ম আবার হাসে। গহাকাটা ঠোঁটখানার ফাঁকে একফালি করাতের মত খাঁজকাটা হাসি ঝলক দিয়ে ওঠে।

অতসীর বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। মনে হয় ঘরের মাটিটা বুঝি সরে যাবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বরফের স্রোত নামে তরতর ক'রে। ক্রমশ

স্বীকার

রত্নেশ্বর হাজরা

'তুমি যদি ফুল হও আমি হবো সকালের পাখি':
আমি কি বলেছি এই? যদি বলে থাকি জেনো ফাঁকি,
ভুল? না—না ভুল নয়, মিথ্যাই বলেছি তোমাকে
দুপুরের রোদ মেখে,তুমি বলো,ফোঁটা-ফুল কতক্ষণ থাকে।
সেদিন ফাল্গুন্ ছিলো মহুয়ার আণে মৃতপ্রায়
তুমি খুব কাছে ছিলে: 'এ হৃদয় দিলাম তোমায়,'
এই বলে হয়তো বা তোমাকে দিয়েছি কণ্ঠহার
তবু বলো, কোনদিন আর তুমি পেয়েছো কি
সে দিনের হৃদয় আমার?
কারণ সেদিন আর এ দিনেতে তফাত অনেক
জীবনে প্রহর আজ, সেই দিন একটি ক্ষণেক
শুধু ব্যয় হয়েছিলো ও-কথাটা তোমাকে বলতে—
অবশ্য সত্যই যদি বলে থাকি বসে কিংবা চলতে চলতে,
সেদিন দিয়েছি ফাঁকি—এ কথায় ভুল নাই নাই
অতীত মিথ্যার কথা আজকে স্বীকারে রেখে যাই।

অজন্তা

বাণী মজুমদার

আধা-চাঁদ আকারের পাহাড়ে
খুদে খুদে গুহাগুলো কী?
রোদ্দুর দেখা কভু যায়না
আলো-হাওয়া পথ ভুলো কী?
সাগরের গহ্বরে রত্ন
কন্দরে সুন্দর সৃষ্টি
থরে-থরে পাথরের পটে
গাথা-চিত্রের নব-সৃষ্টি।

কোন্ সে যুগের পটুয়া
পটু হাতে চালিয়েছে রং
মাথা-পরে সুখচিত চাঁদোয়া
প্রতি দেয়ালেতে আলেখ্য—আড়ং।
ধন্য সে বুদ্ধের শিষ্য
যার তরে বিস্মিত বিশ্ব।

শতায়ু ডাক্তার কার্ভে –

গত ১৮ই এপ্রিল মহারাষ্ট্রবাসী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী ডক্টর ডি-কে কার্ভের বয়স ১০০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ভারতের সর্বত্র সভা করিয়া তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক উৎসব করা হইয়াছে। একজন মানুষের পক্ষে ১০০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষম দেহ লইয়া জীবিত থাকা সত্যই অসাধারণ। ডাঃ কার্ভে প্রায় গত ৭৫ বৎসর কাল দেশ সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীর সহিত আমরাও তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই ও প্রার্থনা করি, বহু লোক তাঁহার মত সৌভাগ্যলাভ করুন। ঐ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডাক্তার কার্ভে প্রতিষ্ঠিত, পুনার নিকট হিরদেনে সহরে অবস্থিত শিক্ষা সংস্থাকে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ স্থানে ডাঃ কার্ভে প্রথম মহিলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। ডাক্তার কার্ভের সচিত্র জীবনী প্রকাশ করিয়া ভারতের সর্বত্র প্রচারের ও পঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ এ কার্যের ভার গ্রহণ করিলে ভাল হয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ঐ দিন বোম্বাই যাইয়া ডাঃ কার্ভের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

মেয়র ও ডেপুটী মেয়র –

গত ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় নূতন বৎসর ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। গত বৎসরের মেয়র প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেকটার ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেন বিনা বাধায় এবার মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন—বিরুদ্ধ দলের সদস্যরা তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে এ ভাবে মেয়র নির্বাচন এই প্রথম হইল। পুরাতন ডেপুটী মেয়র শ্রীকেশবচন্দ্র বসু আবার ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ৪৭ ও বিপক্ষে ৩৩ জন কাউন্সিলার ভোট দিয়াছেন। আমরা মেয়র ও ডেপুটী মেয়র উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি ও কামনা করি। তাঁহাদের দ্বারা কলিকাতা সহরের উন্নতি হউক।

বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের সম্মান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ এস-কে মিত্র ও ডাক্তার এস-এন বসু সম্প্রতি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটীর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই সুপণ্ডিত ও খ্যাতিমান। ডাক্তার বসু বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। ইতিপূর্বে ডাঃ সি-ভি রমণ, কে-এস কৃষ্ণান, এচ-জে ভাবা, এস-চন্দ্রশেখর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও ডি-এন ওয়াদিয়া এফ-আর-এস হইয়াছিলেন। স্বর্গত শ্রীনিবাস রামানুজম্, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, বীরবল সাহানি ও এস-এস ভাটনগরও এফ-আর-এস ছিলেন। আমরা ডাঃ মিত্র ও ডাক্তার বসুকে তাঁহাদের এই অসাধারণ সম্মান লাভে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

সংস্কৃত ভাষাকে মর্য্যাদা দান—

গত ২০শে এপ্রিল পাটনায় বিহার সংস্কৃত সমিতির সম্মেলনে সভাপতি হইয়া বিশিষ্ট পণ্ডিত, ভাষাবিদ, পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—ইংরাজী ও হিন্দীর সহিত সংস্কৃতকেও সরকারী ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া উচিত। আচার্য্য সুনীতিকুমার ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা কমিশনের সভাপতি ছিলেন। কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন—উচ্চ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় হইবে। সংস্কৃত ভাষা বিশ্বের শুধু প্রাচীনতম ভাষা নহে, পূর্ণতম ভাষা। তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভাষা মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছে। সমগ্র ভারতে এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল—কাজেই উহা জাতীয় ভাষার পরিণত হইবারই আছে। আচার্য্য সুনীতিকুমারের উক্তিগুলি সকলের অনুধাবন করা কর্তব্য।

সাহিত্যিকদিগের সম্মান—

ভারতের শ্রেষ্ঠ আধুনিক ভাষা বাংলা ভাষার সাধনা যাঁহারা প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়া করিয়া থাকেন, সেই বাঙ্গালী সাহিত্যিকবৃন্দকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিবার যে প্রথা অধুনা বাংলা দেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা যে সত্যই প্রশংসার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই এবং উদ্যোক্তাদিগের এই প্রচেষ্টাও অভিনন্দন যোগ্য।

গত ৭ই বৈশাখ রবিবার কলিকাতায় এক সাহিত্য আসরে বাংলা দেশের তিনখানি প্রধান দৈনিক ও তিন-

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

খানি সাময়িক পত্রের পক্ষ হইতে ৭জন খ্যাতনামা নবীন ও প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিককে সম্মানিত করা হয়। সাহিত্য সাধনার জন্য শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও বৎসরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য শ্রীসমরেশ বসু "আনন্দ পুরস্কার" (এক হাজার টাকা), মৌলিক গবেষণার জন্য শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী) "শিশিরকুমার পুরস্কার" (এক হাজার টাকা), ছোট গল্প লেখায় অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের জন্য শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় "মতিলাল পুরস্কার" (এক হাজার টাকা), শিশু সাহিত্য রচনার জন্য শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় "মৌচাক পুরস্কার" (৫শত টাকা) এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার জন্য শ্রীসুভাষমুখোপাধ্যায় ও শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী "উল্টো-রথ পুরস্কার" (প্রত্যেকটি ২১০ টাকা) লাভ করেন। আচার্য্য যদুনাথ সরকার আসরে সভাপতিত্ব করেন এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীরও শ্রীরাজশেখর বসু প্রমুখ বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবি সভায় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল যাবৎ 'ভারতবর্ষ'-তে নিয়মিত লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার প্রায় সমস্ত উপন্যাস ও বহু ছোট গল্প 'ভারতবর্ষ'-তে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কথাশিল্পীরূপে পরিচিত করিয়াছে এবং আজিও তাঁহার সে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন। উদীয়মান ঔপন্যাসিক শ্রীসমরেশ বসুও আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা

শ্রীসমরেশ বসু

অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার একটি উপন্যাস 'ভারতবর্ষ'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও 'ভারতবর্ষ'-তে লিখিয়া থাকেন। আমরা শরদিন্দুবাবু, বিভূতিবাবু ও সমরেশবাবুকে এবং পুরস্কৃত অন্যান্য সাহিত্যিকবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

নেতাজীর বক্তৃতা ও রচনা সঙ্কলন—

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীবি-ভি কেসকার গত ২১শে এপ্রিল লোক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন—গভর্ণমেণ্ট

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মী ও বন্ধুদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনাবলীর সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্যে যাবতীয় তথ্য ও উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব যেরূপ নেতাজী-বিরোধী, তাহাতে সরকারী চেষ্টায় কোন দিন নেতাজীর রচনা ও বক্তৃতা সংগৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ।

স্কুল ছাত্রদের স্বাস্থ্য—

কলিকাতার বিদ্যালয়গুলির বেশীর ভাগ ছাত্রের স্বাস্থ্যের অবস্থাই খারাপ। ছাত্রদের শতকরা প্রায় ৬০ জনই কোন-না-কোন রোগে ভুগিতেছে। ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমাজ ও রাষ্ট্রের উদাসীনতাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। গত ২৬শে এপ্রিল ভারতীয় মেডিকেল এসোসিয়েসনের কলিকাতা শাখার কার্যালয়ে এক সম্মিলনে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শিক্ষকগণ কলিকাতার বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে নানা কথার সভায় অবতারণা হইয়াছিল। সহরের ঘরের মধ্যে বহুসংখ্যক ছাত্রকে আটকাইয়া স্কুল করিলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। স্কুলগুলিকে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব আবাসিক করিয়া মফঃস্বলে স্থানান্তরিত করা না হইলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব হইবে না। কে এ কার্যের ভার লইবে? সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্মীদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন সচেতনতা দেখা যায় না।

উদ্বাস্তু সমস্যার কথা—

গত ২৬শে এপ্রিল মালদহে মালদহ জেলা কংগ্রেস সম্মিলনে সভাপতি হইয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলিয়াছেন—"উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান না হইলে পশ্চিমবঙ্গের বাঁচিবার সমস্ত পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। এ সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত প্রয়োজন। ৫।৬ বৎসর ধরিয়া আশ্রয় প্রার্থী শিবির থাকা যে কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং ইহার যে কুফল তাহার জন্য সেই সব শিবিরের অধিবাসীরাই দায়ী নহেন—যে সরকার উহা সমাধানের দায়িত্ব লইয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে দায়ী তাহারাই। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান আজও কেন হইল না, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সে বিষয়ে তৎপরতার সহিত কাজ করা কর্তব্য। ইহার জন্য অপরকে দায়ী না করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হন না কেন?

আর-জি-কর কলেজ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার আর-জি-কর কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। বহু দিন হইতে ঐ কলেজ পরিচালনায় নানারূপ গোলযোগ চলিতেছিল। সে জন্য এক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটী হেলথ ডিরেক্টর ডাঃ হেমন্তকুমার ইন্দ্র উক্ত কলেজের কর্মকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উহা হয় ত মন্দের ভাল ব্যবস্থা—কারণ সরকারী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে অর্থের অভাব হইবে না। কিন্তু যাহাতে কলেজ ও হাসপাতাল সত্যই জনকল্যাণ সাধন করে, তাহা দেখিবার লোক কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা—

গত এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে কর্মপ্রার্থী বেকারের সংখ্যা শতকরা ৪১ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। তুলনামূলকভাবে কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত না হইয়া সঙ্কুচিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান-পরিস্থিতি এক গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে কর্মনিয়োগ কেন্দ্রসমূহের তালিকায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার প্রার্থীর নাম আছে—জুন মাসের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে আরও ৫০ হাজারের অধিক বেকার সৃষ্ট হইবে। ১৯৫৭ সালে কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রে ২১১০২২ জন প্রার্থী নাম লিখাইয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র ১৮০৮০ জনের কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেরাণী ও অদক্ষ কর্মীর সংখ্যাই অধিক। কি করিয়া এত বেকার লোকের কর্মের ব্যবস্থা হইবে তাহা কেহ ভাবিয়া পান না। সমবায় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় যদি সরকারী ব্যবস্থা সত্যই সাহায্য করে, তবে এক সঙ্গে বেকার সমস্যা ও খাদ্য-সমস্যা দূর হওয়া সম্ভব। কিন্তু কে সে বিষয়ে চিন্তা করিবে?

মেয়েদের কথা

নারী জাগরণ

জ্যোৎস্নারাণী দত্ত কাব্যভারতী

বর্তমান যুগে এ অভিশপ্ত বাংলাদেশেও নারীজাতির মধ্যে জাগরণের যে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে একথা আজও অনেকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—কতকগুলি প্রগল্ভ মাসিক, সাপ্তাহিক ও কতকগুলি স্ত্রী স্বভাব বিশিষ্ট পুরুষেরাই তাহাদের সেই নিষ্ফল স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে মাত্র। মূলতঃ নারীজাতি যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষের অধীন ও বিলাসের ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নহে।

কিন্তু ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়—জগতের যে সকল মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া জাতি ও সমাজকে [illegible] করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়,—তাঁহাদের অধিকাংশই গর্ভধারিণীর নিকট হইতে প্রতিভার [illegible] হইয়াছেন। নারী যেমন জাতিকে প্রসব করিতেছে ঠিক তেমনি তার প্রাণশক্তির মূলেও সেই নারীই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং আমাদের এই উত্থানের দিনে আজও যদি সেই নারীকে সম্পূর্ণ জড় করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে কাঁচা ভিতের উপর পাকা ইমারতের মতই তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবেনা, হইতে পারেনা।

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই সুখের আশা করিয়া থাকে। সেই সুখের চরম স্ফূর্তি তার স্বাধীনতা। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যেক নরনারীরই আকাঙ্খিত বস্তু। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় পুরুষ নারীকে তাহার প্রাপ্য স্বাধীনতা স্বীকার করিতে কোনমতেই স্বীকৃত হয়না। তাঁহারা বলেন স্বাধীনতার দাবী তাহারাই করিতে পারে যাহারা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। শিশু যতদিন হাঁটিতে অপটু থাকে ততদিন তাহাকে পরের অঙ্ক আশ্রয় করিয়া থাকিতেই হইবে।

কথাটি অমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ যে সত্য একথা স্বীকার করা যায়না। অপরকে হাঁটিতে দেখিয়া যখন শিশুর অন্তরস্থ হাঁটিবার সুপ্ত বাসনা আকুল আগ্রহে জাগিয়া উঠে, তখন যদি তাহার উদ্যম ব্যর্থ হইবে আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা হয়। অথবা কোনও খেলনা দিয়া ভুলাইয়া যদি তাহার এই আত্মনির্ভরতার মূলে কুঠারঘাত করা হয় তবে তাহার এই অনির্দ্দিষ্ট পঙ্গুত্বের জন্য দায়ী কে? সেই উৎকট শিশুবাৎসল্য শত্রুতারই নামান্তর নহে কী?

দীর্ঘ দাসত্বের পর আজ আমরা যেমন স্বাধীনতা লাভ করিয়া আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি এবং এই ব্যাকুলতা যেমন শুভসূচক ঠিক তেমনি মঙ্গলদায়ক নারীজাতির জাগরণ। জাতিকে উন্নতির চরম সোপানে স্থাপন করিতে হইলে যথার্থ নারী চাই। যে নারী বীর পুত্রের প্রসবিনী, বীর ভ্রাতার ভগিনী, বীর স্বামীর সহধর্ম্মিণী সেই নারীর কণ্ঠে প্রেরণার বাণ্ড যতদিন না বাজিবে ততদিন জাতির উন্নতি যে নাই একথা অনস্বীকার্য্য।

অনেক স্বার্থান্ধ পুরুষ নারীকে 'অবলা' বলিয়া অভিহিতা করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যিই কী নারী অবলা? একমাত্র ট্রামে বাসে উঠিতে অথবা পথে ঘাটে চলিতে গিয়া তাহারা পুরুষের মত অশ্লীল আচরণ করিতে পারেনা ইহাই যা তাহাদের একমাত্র অপরাধ। কিন্তু যে-দেশের নারীর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বীর মাতা জনা-সুভদ্রার, ধীশক্তিশালিনী গার্গি-লীলাবতীর, পুণ্যানুষ্ঠান পরায়ণা ভবানী-শরৎসুন্দরীর দেশাত্মবোধসম্পন্না রাণী দুর্গাবতীর ন্যায় আদর্শ নারীর রক্ত প্রবাহিত সে দেশের নারীকে 'অবলা' বলিয়া অভিহিতা করার অর্থ মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

তাহা ছাড়া পুরাকালে মুনি ঋষিরাও বিশেষ অবহিত হইয়া দেখিয়াছেন নারীজাতি শক্তিরূপা সনাতনী! সতী সাবিত্রী দময়ন্তীরই শুধু অংশভূতা এঁরা নয়—সৃষ্টি, স্থিতি,

প্রলয়েরও অধিকারিণী এই নারী! সুতরাং সেই নারীকে অবহেলা করাও যেমন চলেনা ঠিক তেমনি 'অবলা' বলিয়া অভিহিতা করাও ঘোরতর অন্যায়!

নারীকে উপলক্ষ করিয়াই সমাজ, নারীর জন্যই সাম্রাজ্য সুতরাং যাহা লইয়া সংসার, স্বরাজ বা স্বাধীনতার এত আয়োজন তাহাকে ঔদাস্যের আবর্জ্জনার মধ্যে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে কেন? একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নারী! যে জাতির মধ্যে যত বেশী আদর্শ নারী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন সে জাতি তত সম্পন্ন, তত পূর্ণ, তত ধন্য! সুতরাং সেই নারীকে আজও যদি অবহেলায় ও উদাসীনতায় পরাধীনতার পূতিগন্ধময় কারাকক্ষ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বাধীনতার আলোকজ্জ্বল পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য না করা হয় তাহা হইলে দেশ তথা সমগ্রজাতির উন্নতি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে।

লাউ-পালংঘণ্ট

উপকরণ—একটি মাঝারি সাইজের লাউয়ের চার-ভাগের একভাগ লাউ, কচি পালং শাক এক পোয়া, হলুদ, লঙ্কা (রুচিমত), জিরে, ধনে, অল্প গোলমরিচ, তেজপাতা, তৈল ও সামান্য মিষ্টি।

প্রথমে লাউটিকে সরু সরু করে কুটে রাখুন এবং শাকগুলি বেশ করে ধুয়ে জল ঝরতে দিন। তারপর কড়াতে তেল দিয়ে, তেল গরম হলে দুখানা তেজপাতা, লঙ্কা ও জিরে দিয়ে লাউগুলি ঢেলে দিন। বেশ ভাল করে নেড়েচেড়ে নিয়ে হলুদ-লঙ্কা-ধনে-জিরে-গোলমরিচ বাটা দিয়ে এবং পরিমাণ মত লবণ ও মিষ্টি দিন। তারপর শাকগুলি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। এতেও ঝোল থাকবে না; কিন্তু একবারে শুকনোও যেন না হয়, নামাবার আগে সামান্য আটা ছড়িয়ে দিয়ে একটু ঘি দিয়ে দিবেন। এখন এই গরমের দিনে লাউ-পালংঘণ্ট খেতেও যেমন ভাল লাগে খরচও তেমনি কম।

বেগুনের পাতুরি

উপকরণ—বেগুন আধ সের, পিয়াজ আধপোয়া, হলুদ, লঙ্কা, সরিষা বাটা ও পরিমাণ মত লবণ। বেগুনগুলি ছোট ও কচি দেখে নিবেন। যে কোনও পাতুরি রান্নায় সরিষা-বাটা পরিমাণে একটু বেশী দিতে হয়।

প্রথমে বেগুনের বোঁটা কেটে চারফালা করে কেটে নিন, তারপর পিয়াজগুলি সরু সরু করে কুচিয়ে রাখুন। এবার কড়ায় তেল দিয়ে পিয়াজগুলি প্রথমে ভেজে নিয়ে বেগুনগুলি দিয়ে দিন। বেশ ভালভাবে ভাজা হয়ে গেলে সরিষা-হলুদ-লঙ্কা-বাটা দিয়ে পরিমাণ মত লবন দিয়ে দিন। জল এমনভাবে দিবেন যাহাতে সিদ্ধ হবে অথচ জল থাকবে না। বেগুনগুলি যেন গোটা গোটা থাকে। নামাবার আগে একটু তেল ছড়িয়ে দিয়ে নামাবেন। বেগুনের পাতুরি খেতেও যেমন মুখরোচক, পরিজনের পাতে পরিবেশন করেও তেমন আনন্দ পাবেন।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

আজকাল যে সব বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে সেগুলি —অবশ্য কয়েকটি ছাড়া—গুণের দিক থেকে খুব বেশি উৎকর্ষের দাবী না করতে পারলেও বৈচিত্র্যের দিক থেকে যে কিছুটা সাফল্যের দাবী করতে পারে তা অনস্বীকার্য্য,—আর বাংলা কথাচিত্রের বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের পক্ষে এই অনাদৃত দিকটির উন্নতি হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা কথাচিত্রের প্রযোজক ও পরিচালকরা যে এই বিষয়ে অর্থাৎ চিত্রকে একঘেয়েমীর বন্ধন থেকে মুক্ত করে এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বৈচিত্র্যপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদ ও অভিনন্দনের পাত্র, আর সব ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত না হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার্হ।

তাই আশা হয় পারিবারিক ও সামাজিক গল্পের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের বাংলা চিত্র শুধু নির্মিতই হবেনা—এ বিষয়ে পূর্ণ সফলতা লাভও করবে; আর এই প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করতে বাংলার প্রযোজক-পরিচালকেরা সে সকল বাধা-বিঘ্ন ঠেলে এগিয়ে আসবেন সে বিশ্বাস আছে বলেই এ আশাকেও দুরাশা বলে মনে করি না। যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা কথাচিত্র শুধু গুণের দিক থেকেই নয়—বৈচিত্র্যের দিক থেকেও ভারত তথা [illegible] চিত্র-জগতের আদর্শ হয়ে উঠবে।

• • •

ভারতের বাইরে যে সব দেশে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয় সেইসব দেশের দেশীয় ভাষায় যে সব ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হবে সেগুলিকে 'ডাব্' করিয়ে নেওয়া এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ইরাণে, যেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশেষ চাহিদা রয়েছে সেখানে পারস্য ভাষায় ভারতীয় চলচ্চিত্রকে 'ডাব্' করার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। মার্কিণ ও ইতালীয়ান্ চলচ্চিত্র নির্ম্মাতারা ইরাণে প্রদর্শিত তাঁদের চিত্রগুলিকে পারস্য ভাষায় 'ডাব্' করতে আরম্ভ করেছেন। ভারতকেও ইরাণের চলচ্চিত্র বাজারে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ভারতীয় চিত্রকেও পারস্য ভাষায় 'ডাব্' করিয়ে প্রদর্শনকরা উচিত। আশা করি ভারতীয় চিত্র নির্ম্মাতারা এই ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ইরাণের বাজার হাতছাড়া হতে দেবেন না।

• • • •

Canes-এর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ তিনটি চিত্র পাঠিয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চিত্র "পরশ পাথর" ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। পরে "পরদেশী" ও "মাও" নামক ডকুমেণ্টারী চিত্রটি প্রদর্শিত হবে।

• • • •

রঙমহল নাট্যমঞ্চে শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের নতুন নাটক "মায়ামৃগ" শ্রীবীরেশ্বরকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় ১লা বৈশাখ থেকে অভিনীত হচ্ছে। এই নাটকটির শেষ মিলনাত্মক হলেও এর কাহিনীটি করুণ। ধনী ব্যারিষ্টারের একমাত্র পুত্র শুভ্র জানত না সে যাঁদের পিতা ও মাতা বলে জানে তাঁদের সে আপন সন্তান নয়। শুভ্র আসলে ব্যারিষ্টার অমিয়নাথের পত্নী সাবিত্রীর ছোট বোন সীতার পুত্র। সীতাকে তার বাপ তাঁরই অধীনস্থ এক গরীব কায়স্থ কর্ম্মচারীর পুত্রকে গোপনে বিয়ে করায় বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেন। সীতা খুবই দুরবস্থায় পড়ে এবং তার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে উপায়ন্তর না দেখে তার দিদি নিঃসন্তানা সাবিত্রীর শরণ নেয় ও সাবিত্রীর হাতেই তার সন্তানকে চিরদিনের জন্য তুলে দিয়ে তার বিনিময়ে চল্লিশ হাজার টাকা গ্রহণ করে বর্ম্মায় চলে যায়। সীতার এই ছেলেটিকে সাবিত্রী নিজের ছেলের মতন করে মানুষ করে এবং অঘোরনাথ ও সাবিত্রীর পুত্র রূপেই সে পরিচিত হয়, আর শুভ্র যে তাঁদের নিজের সন্তান নয় একথা শুভ্র তো নয়ই অন্য কেউই জানত না। কিন্তু হঠাৎ বর্ম্মা থেকে সীতা তার দ্বিতীয় ও কৃতি পুত্রকে জন্মের মত হারিয়ে তার পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে সাবিত্রীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। সাবিত্রী এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ভীত হয়ে পড়ে। তার ভয় হয় সীতা বোধহয় তার আপন সন্তানসম শুভ্রকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। সীতাও তার আপন সন্তানের প্রবল আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে না, শুরু হয় দুই মায়ের প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব। তারপর নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষে দুই বোনের আবার মিলন হয়।

ব্যারিষ্টার অমিয়নাথের ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রীর ভূমিকায় সরযূবালা ও সীতার ভূমিকায় কেতকী দত্তের অভিনয় প্রাণস্পর্শী হয়েছে। শুভ্রের ভূমিকায় নবকুমার ও মহেন্দ্র জুয়াড়ীর ভূমিকায় রবীন মজুমদারের অভিনয়ও প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য ভূমিকাগুলির অভিনয় চলনসই হয়েছে।

———

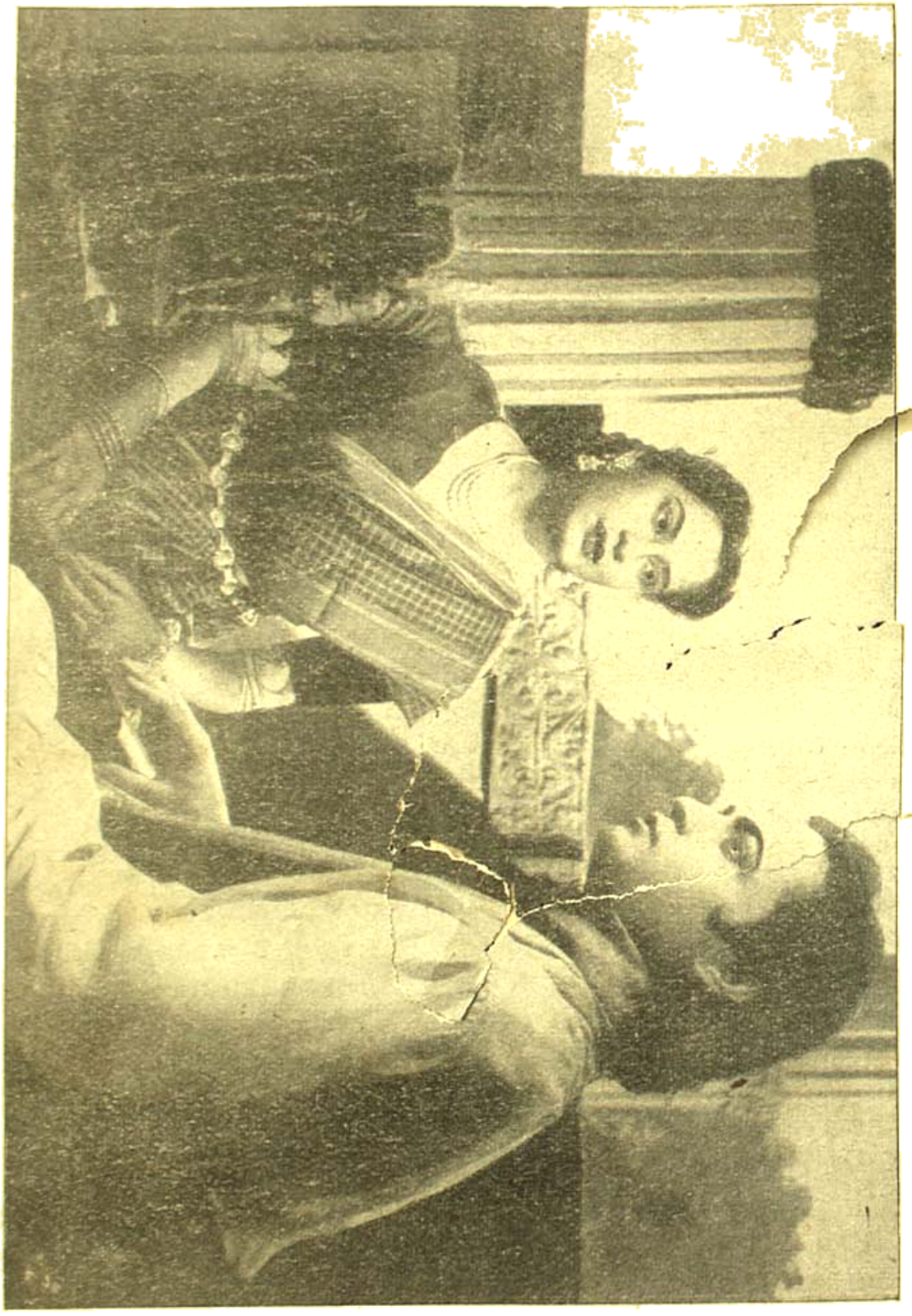

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিভাগের হকি লীগ ঃ

১৯৪৮ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় গত তিন বছরের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। মোট ১৮টি খেলায় মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং সমান ৩২ পয়েন্ট পেয়ে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করে। তখন চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্দ্ধারণের জন্য এই দুই দলের মধ্যে বিশেষ খেলার প্রয়োজন হয়। মোহনবাগান সে খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দলকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে লীগ বিজয়ের সম্মান লাভ করে।

এই নিয়ে মোহনবাগান ৭ বার লীগ বিজয়ী হ'ল, তার মধ্যে ৬ বার অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। প্রথম বিভাগের লীগ খেলার ইতিহাসে কাষ্টমসের এবং রেঞ্জার্সের পরই মোহনবাগান ক্লাব অধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করেছে। কাষ্টমস জয়ী হয়েছে ১৭ বার এবং রেঞ্জার্স ৮ বার।

এ বছরের খেলায় মোহনবাগান ক্লাব যথার্থ ই লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে। ১৮টা খেলায় মোহনবাগানের জয় ১৪, ড্র ৪, হার ০, স্বপক্ষে গোল ৫২, বিপক্ষে ৬। অপর দিকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের জয় ১৫, ড্র ২, হার ১, গোল স্বপক্ষে ৩৪, বিপক্ষে ৫।

প্রথম বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে গেছে দুটি দল—ডবলিউ বি জি প্রেস এবং অরোরা ক্লাব। এই দুই দলের শূন্য স্থান দখল করেছে দ্বিতীয় বিভাগের অপরাজেয় লীগ চ্যাম্পিয়ান আর্মেনিয়ান্স এবং রানার্স-আপ রেলওয়ে স্পোর্টস্ ক্লাব। তৃতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে গ্রেল ক্লাব।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ তালিকা

প্রথম চারটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
মোহনবাগান	১৮	১৪	৪	০	৫২	৬	৩২
মহঃ স্পোর্টিং	১৮	১৫	২	১	৩৪	৫	৩২
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১০	৬	২	৩৬	৩	২৬
কাষ্টমস	১৮	১০	৬	২	৩৩	১৫	২৬

মোহনবাগান দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড সি এস শুক্লং মোট ২১টি গোল দিয়ে ১৯৪৮ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বাধিক গোল দেওয়ার সম্মান লাভ করেছেন।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৪৮ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী রেলওয়ে হকি দল ১-০ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি দু'বার বিজয়ী হয়েছে।

গত বছরের ফাইনালে রেল দল ২-১ গোলে বোম্বাই দলকে হারিয়েছিল। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ২২টি দল যোগদান করেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল রেল-দল, বাংলা, উত্তর প্রদেশ, সার্ভিসেস, পাঞ্জাব, মহীশূর, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। সেমি-ফাইনালে উঠেছিল রেলদল, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই এবং পাঞ্জাব। সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে বনাম উত্তর প্রদেশের খেলার মীমাংসা হ'তে চার দিন লেগেছিল। প্রথম তিন দিন খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়। ৪র্থ দিনে রেল দল ৫-৩ গোলে উত্তর প্রদেশকে

হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ১-০ গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়ে ফাইনালে যায়।

বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইনালে রেলদলের সঙ্গে খেলে। প্রথম দিন খেলাটি ২-২ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাংলা ০-১ গোলে পরাজিত হয়।

কোয়ার্টার ফাইনাল

রেলওয়েজ (২) (১)	:	বাঙলা (২) (০)
উত্তরপ্রদেশ (১) (০) (২)	:	সার্ভিসেস (১) (০) (০)
পাঞ্জাব (১) (২)	:	মহীশূর (১) (০)
বোম্বাই (২)	:	মাদ্রাজ (০)

সেমি-ফাইনাল

রেলওয়েজ (১) (১) (১) (৫)	:	উত্তরপ্রদেশ (১) (১) (৪)
বোম্বাই (১)	:	পাঞ্জাব (০)

ফাইনাল

রেলওয়েজ (১)	:	বোম্বাই (০)

বাইটন কাপ ঃ

১৯৫৮ সালের বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে কোর অফ্ ইঞ্জিনিয়ার্স দলকে পরাজিত করে। ফলে এই নিয়ে দু'বার মোহনবাগান ক্লাব একই বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ এবং বাইটন কাপ জয় লাভ করলো।

একই বছরে হকি লীগ কাপ এবং বাইটন কাপ তারা প্রথম জয়লাভ করে ১৯৫২ সালে। সেমি-ফাইনালে কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্স দল ৩-০ গোলে রেঞ্জার্স দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে মোহনবাগান ২-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কাষ্টমস দলই সর্বাধিক বার (৮ বার) একই বছরে হকি লীগ কাপ এবং বাইটন কাপ জয়লাভ করেছে। এই ৮ বারের মধ্যে উপর্যুপরি জয়লাভ করে, ২বার (১৯০৯-১৯১০) এবং ৩বার (১৯৩০-১৯৩২)

এফ এ কাপ ঃ

উইম্বলডন মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের এফ এ কাপ (ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ) ফাইনালে বোল্টন ওয়াণ্ডারার্স ২-০ গোলে বিখ্যাত ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড দলকে পরাজিত করেছে। এই নিয়ে বোল্টন ওয়াণ্ডারার্স দল চারবার এফ এ কাপ জয়ী হ'ল। এবারের ফাইনালে ওয়াণ্ডারার্স দলের অধিনায়ক সেণ্টার ফরওয়ার্ড স্টাট লফটু হাউস দলের পক্ষে দু'টি গোলই দেন।

পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যাণ্ড ঃ

পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ৫ম বা শেষ হকি টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ৫-০ গোলে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' পেয়েছে। পাকিস্তান ১ম টেষ্ট খেলাতেও ৩-০ গোলে জয়ী হয় এবং ২য় টেষ্ট খেলাটি ২-২ গোলে ড্র যায়।

নিউজিল্যাণ্ড সফরে পাকিস্তান দল অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে। মোট ২২টি খেলার মধ্যে পাকিস্তানের জয় ২০, খেলা ড্র ২।

জাতীয় সাইকেল চ্যাম্পিয়ানশীপ ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের জাতীয় সাইকেল চ্যাম্পিয়ানশীপস প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

দলগত বিভাগ : দিল্লী

পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগ : অমর সিং (দিল্লী)

মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগ : ভাষা ভাল্লা (দিল্লী)

প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশের সাফল্য : এন. সি. বসাক ১,০০০ মিটার স্প্রিণ্টে ৩য় স্থান; ডগ্লাস প্রেমজী ১,০০০ টাইম ট্রায়ালে ৩য় স্থান; বাংলা ৪০০০ মিটার টিম প্যারাস্যুটে ৩য় স্থান; ১,০০০ মিটার স্ক্র্যাচ (ফুনিয়ার্স): ১ম ডিঃ দিল্লী; ৩য় এক ক্রেমজী ৩য়। ৪০০০ মিটার স্ক্র্যাচ (ফুনিয়ার্স): এস ব্যানার্জি ১ম, জন ক্রিষ্ণকা ২য় এবং টি ওয়াং ৩য়।

২৫ মাইল রেস : ডেনিস মিলি: ১ম (সময় ৫৮ মিঃ ৪০ সেঃ), জন ক্রিষ্ণকা ২য়, পি দুই ৪র্থ ও কে কে সরকার ৬ষ্ঠ।

১৭ মাইল রেস : পি সি বসাক ৬ষ্ঠ।

ফুটবল প্রসঙ্গে ঃ

ক'লকাতায় ফুটবল মরশুম আরম্ভ হয়েছে। তাজার খবর, এবছর ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ওঠা-নামা বন্ধ থাকবে। ইংরেজদের অনুকরণে আমাদের দেশেও ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় এবং তাদেরই ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিযোগিতায় ওঠা-নামা চালু করা হয়। এটা অন্ধ অনুকরণ নয়। খেলায় উৎকর্ষতালাভের জন্য লীগপ্রতিযোগিতা এবং ওঠা-নামার ব্যবস্থা সকল দেশেই স্বীকৃত।

স্থানীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ মহল এই ওঠা-নামা স্থগিত রাখার পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা 'হবু চন্দ্র রাজার গবু চন্দ্র মন্ত্র'র আমলেই সম্ভব হত।

ওঠানামা বন্ধ হওয়ার ফলে যোগসাজসে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি বেশী ক'রে হবে। খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার থেকে যোগসাজসে পয়েন্ট লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রবলভাবে দেখা দেবে। নীচের বিভাগে নেমে যাওয়ার বিপদ না থাকায় পয়েন্ট ছাড়তে আপত্তি কিসের—বিশেষ করে যদি এই ফাঁকে কিছু মিলে যায়।